সুনীলের সেরা ১০১

suvom
suvom

অর্ধশতাব্দী ব্যাপী বাংলা সাহিত্যের বিরামহীন পথিক যখন লেখেন, 'মনে মনে ভাবতাম, সারা জীবন শুধু কবিতাই লিখে যাব। কিন্তু কার্য-কারণবশত আমাকে গদ্যের রাজত্বেও ঢুকে পড়তে হয়। তারপর গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ-কিশোরসাহিত্য মিলিয়ে পৃষ্ঠা ভারিয়ে ফেলেছি কয়েক লক্ষ,' আমরা অভিভূত হয়ে যাই। তিনি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।

ভাগ্যিস তিনি গদ্যের রাজত্বে ঢুকে পড়েছিলেন! আমরা সৌভাগ্যবান। তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

তার ছোট গল্পগুলি যেন এক আশ্চর্য বাগিচা। সেই বাগিচা আলোকিত করে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন অসংখ্য ফুল, যাদের রূপ ও সৌরভ বিমোহিত করে তাঁরই প্রিয় পাঠকদের।

তাঁর কোনও গল্প উঠে এসেছে সমাজের দ্বিধাদ্বন্দ্ব থেকে, কোনও গল্প আবার উপজীব্য করেছে আশ্চর্য 'মিথ', ইতিহাস, কোনও-কোনও গল্পে ফুটে উঠেছে প্রান্তিক গ্রাম্যজীবনের আনন্দ-বেদনার আলোছায়া, কোনও গল্প ভ্রমণ কাহিনির আধারে সৃজিত, কোনও-কোনও গল্প হঠাৎ-হঠাৎ দেখা দিয়েছে লেখকের 'স্বপ্নে'। কোনও গল্পের উৎস এসেছে সংবাদের অলক্ষ থেকে। এই বৈচিত্র্য তুলনাহীন।

'সুনীলের সেরা ১০১' গ্রন্থটি তাঁর ৫০ বছরের আলোকসামান্য সাহিত্যজীবনের অপরূপ পথ-পরিক্রমা। এখানে তাঁর সদ্য-প্রকাশিত গল্প যেমন আছে, তেমনই রয়েছে দুষ্পাপ্য, অগ্রন্থিত অসংখ্য গল্প।

স্মরণীয় কথাশিল্পীর দুর্লভ সম্মানীয় বিশাল এই বই প্রকাশের সুযোগ পেয়ে পত্র ভারতী গৌরবান্বিত। আমারা প্রত্যয়ী, প্রিয় পাঠকদের প্রীতিধন্য হয়ে 'সুনীলের সেরা ১০১' বেঁচে থাকবে বহু-বহুকাল। হয়ে উঠবে কালজয়ী। **suvom**

সুনীলের সেরা

১০১

দু-চারটি কথা

প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে টুকটাক করে অনেক গল্পই তো লিখে ফেলেছি। সংখ্যাটা দেখে আমি নিজেই মাঝে-মাঝে অবাক হয়ে যাই। প্রথম জীবনে শুধু কবিতা লেখা দিয়েই শুরু করেছিলাম সাহিত্যের অভিযান এবং মনে-মনে ভাবতাম, সারা জীবন শুধু কবিতাই লিখে যাব। কিন্তু কার্য-কারণবশত আমাকে গদ্যের রাজত্বেও ঢুকে পড়তে হয়। তারপর গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ-কিশোর সাহিত্য মিলিয়ে পৃষ্ঠা ভরিয়ে ফেলেছি কয়েক লক্ষ।

সাধারণত সাহিত্যে কবিতা ও গদ্য-কাহিনির মধ্যে একটা স্পষ্ট বিভাজন রেখা থাকে। কবিরা এক ধরনের আভিজাত্য নিয়ে গল্প-উপন্যাসকে একটু নীচু স্থান দেন, ওসব নিয়ে সময় নষ্ট করেন না। আবার গল্প-উপন্যাসের মহারথীরা কবিতা রচনায় তাঁদের অক্ষমতার কথা জানিয়ে দেন। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে, যেমন সর্বাগ্রে রবীন্দ্রনাথ। এবং বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র। জীবনানন্দ দাশ কবি হিসেবে মান্য হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন এবং মৃত্যুর পর সবিস্ময়ে জানা গেল, তিনি অনেকগুলি উপন্যাস, প্রচুর ছোটগল্পও লিখেছেন, সবগুলিই অপ্রকাশিত! আমি এঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করেছি।

আমার ছোটগল্পের বই-ও বেরিয়েছে অনেকগুলি। ছোটগল্পের বইয়ের তেমন পুনর্মুদ্রণ হয় না। কিছুদিনের মধ্যেই হারিয়ে যায়। সেইজন্যই প্রকাশকরা বড় আকারের সংকলনের দিকে ঝুঁকেছেন। এরকম সংকলনও আমার বেরিয়েছে কয়েকটি। বর্তমান সংকলন সেইরকমই আর একটি। এর মধ্যে একেবারে নতুন এবং কিছু পুরোনো গল্প মিলেমিশে থাকে। যেমন, এই সংকলনের প্রথম গল্পটি বলা যেতে পারে সদ্য রচিত, কোনও গ্রন্থে স্থান পায়নি। আবার কিছু-কিছু গল্প অন্যান্য গ্রন্থ থেকেও ধার নেওয়া হয়েছে। এসব সংকলনের নির্বাচন আমি নিজে করি না। অন্য কেউ সেই দায়িত্ব নেয়। এই সংকলনের নির্বাচনের ভার নিয়েছে রাহুল দাশগুপ্ত নামে এক নবীন লেখক এবং প্রকাশক ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় নিজে।

গল্পগুলির নামের তালিকা দেখতে-দেখতে কোনও-কোনওটির লেখার সময়ের কথা মনে পড়ে যায়। গল্পের বিষয়বস্তু পাওয়া যায় নিজের জীবনের নানান অভিজ্ঞতা থেকে। কখনও-কখনও কোনও দৃশ্য, কোনও নাম কিংবা একটি মাত্র শব্দ থেকেও ঝলসে ওঠে কাহিনি। জীবনের সর্বত্রই তো ছড়িয়ে আছে গল্প, কিন্তু ঠিক কোন মুহূর্ত থেকে শুরু করতে হবে, সেটাই রচনার মূল সূত্র।

যেমন, লিলিথ এই নামটি থেকেই মাথায় এসেছিল একটা গল্পের কথা। সে গল্পের নাম 'প্রথম মানবী'। কে এই লিলিথ? বাইবেলের সৃষ্টি রহস্য অনুযায়ী ঈশ্বর অ্যাডাম আর ইভ নামে প্রথম দুই মানব-মানবীকে সৃষ্টি করেছিলেন। যদিও আমাদের রামায়ণ-মহাভারত কিংবা ইলিয়ড-ওডিসি বাইবেলের চেয়েও অনেক বেশি পুরোনো, কিন্তু ক্রিশ্চিয়ানদের বিশ্বাসটাই সারা পৃথিবী মেনে নিয়েছে। কিন্তু এক সময় এটা-সেটা পড়তে-পড়তে হঠাৎ আমি জানলাম যে ইহুদিদের প্রাচীন বিশ্বাসে ইভের আগেও অ্যাডামের একজন বান্ধবী ছিল। অর্থাৎ অ্যাডাম প্রথম মানুষ, কিন্তু ইভ প্রথম মানবী নয়। প্রথম মানবীর নাম লিলিথ। এটা জানার পরই অ্যাডাম আর লিলিথের মধ্যে কেন বিচ্ছেদ হল, তাই নিয়ে লেখা হয়ে গেল গল্প।

আর একটি গল্পের পশ্চাৎপটও বলা যেতে পারে।

আমি মাঝে-মাঝেই শহর থেকে অনেক দূরে কোনও সাধারণ গ্রামে গিয়ে থেকেছি। কোনও হোটেল কিংবা গেস্ট হাউসে নয়। কোনও গৃহস্থ বাড়িতে। আমার পূর্ব বাংলার গ্রামে জন্ম,

পশ্চিমবাংলার গ্রাম চিনেছি এইভাবে। এক আধবার নয়, অনেকবার গেছি, গ্রামের মানুষের সঙ্গে মিশে গেছি। সেই রকমই একবার গিয়েছিলাম ফিরোজ চৌধুরীর গ্রামে। ফিরোজ কলকাতায় বাসা ভাড়া করে থাকত। তার মুখে প্রায়ই শুনতাম তার গ্রামের গল্প। কলকাতা থেকে খুব একটা দূরে নয়, কিন্তু তখনও যে গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছয়নি। বড় রাস্তা থেকে সেই গ্রামে পৌঁছতে গেলে সাইকেল কিংবা পায়ে-হাঁটা। সে গ্রামটির অধিবাসী সবাই মুসলমান, মাত্র তিনঘর হিন্দু, তারা মুচি ও কুমোর। কোনও মুসলমান গ্রামে আমার থাকার অভিজ্ঞতা নেই বলে ফিরোজ যখন তার গ্রামে একবার বেড়াতে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানাল, আমি রাজি হয়ে গেলাম সাগ্রহে।

টানা সাতদিন ছিলাম সে গ্রামে। কিছুই করতাম না। শুধু লোকজনের কথাবার্তা শুনতাম। লেখা-টেখার কথা কিছুই ভাবিনি। একদিন দুপুরে শুয়ে-শুয়ে কাগজ পড়ছি, জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে, দু-তিনটি মেয়ে ধান ঝাড়ছে উঠোনে। ওদের মধ্যে একটি মেয়ে ফিরোজদের বাড়িতে পার্টটাইম কাজ করে, তার নাম হাসিনা। স্বামী মারা গেছে, অভাবে পড়েছে। একদিন সেই মেয়েটিকে আমার কাছে টেনে এনে ফিরোজ ধাঁধার উত্তরের মতন জিগ্যেস করেছিল, সুনীলদা, বলুন তো এর কত বয়েস? আমার দেখে মনে হয়েছিল, কুড়ি-একুশ হবে, একটু বাড়িয়ে বলেছিলাম, চব্বিশ-পঁচিশ। তা শুনে সবাই হেসে উঠেছিল। হাসিনার বয়েস নাকি পঁয়ত্রিশ। ওর চারটি ছেলেমেয়ে আছে। আর কখনও ওই মেয়েটির সঙ্গে আমার সামনাসামনি কথা হয়নি।

উঠোনে কাজ করতে-করতে তিনটি মেয়ে কলকল করে কথা বলছিল নিজেদের মধ্যে। যেন কিছু নিয়ে তর্ক হচ্ছে। এক সময় হাসিনা দৌড়ে এল আমার ঘরের জানলার কাছে। গরাদ ধরে ছলছল চোখে বলল, দাদা, আপনারে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব? আপনি কন তো, কোনও ছেলেমেয়ের যদি মা বেঁচে থাকে, তাইলে কি তাদের অনাথ কওয়া যায়?

আমি এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে তার দিকে চেয়েছিলাম একদৃষ্টিতে। স্পষ্ট দেখতে পেলাম, ঠিক চলচ্চিত্রের মতন, তার মুখের ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে একটা লম্বা গল্প। সেই গল্পেরই নাম 'দেবদূত অথবা বারোহাটের কানাকড়ি'।

কোনও-কোনও গল্প অনেকটা ভ্রমণ কাহিনির ধার ঘেঁষে যায়। যেমন 'বহুলাড়া'। আমাদের ছেলে যখন কিশোর বয়েসি। তখন তাকে নিয়ে স্বাতী আর আমি একবার বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। কোনও সভা-সমিতি উপলক্ষে নয়, নিছকই ভ্রমণ। ঠিক করেছিলাম, ঘুরব শুধু বাঁকুড়া জেলায়। স্বাতী ভ্রমণের গাইডবুক দেখে-দেখে জায়গা ঠিক করছিল, তার থেকেই বেছে নেওয়া হয় বহুলাড়া।

এ নাম আমরা কেউ আগে শুনিনি, বাঁকুড়ারও অনেকেই চেনে না, জানে না। ম্যাপ দেখে-দেখে কোনওক্রমে সেখানে পৌঁছে আমরা পেয়ে গেলাম একটা অপ্রত্যাশিত, দর্শনীয় প্রাচীন মন্দির। সেই প্রাচীন মন্দির ও তার কাছাকাছি যে সমসাময়িক বাস্তবতা, তার উপলব্ধি নিয়েই গল্প।

বাংলাদেশে সানালবাবা নামে এক সাধকের আশ্রমে গিয়েছিলাম কয়েকজন লেখক বন্ধুর সঙ্গে। সেখানকার অভিজ্ঞতা মনে বেশ দাগ কেটেছিল। 'চূড়ামণি উপাখ্যান'-এ সেটাই কাজে লেগে যায়।

অনেক গল্পের পটভূমির কথা এখন আর মনে নেই। কিছু-কিছু গল্প আমি পেয়েছি স্বপ্নে। খবরের কাগজে পড়া কোনও-কোনও ঘটনাও গল্পের উৎস হয়েছে, কিন্তু সেগুলি আমি উল্লেখ করতে চাই না। তাতে রহস্য ফাঁস হয়ে যাবে।

সব গল্প নিশ্চয়ই সব পাঠকের মনঃপূত হবে না! অন্তত কিছু গল্পও যদি স্মরণীয় মনে হয়, তাতেই আমি ধন্য হব।

২৭ নভেম্বর ২০০৮
কলকাতা

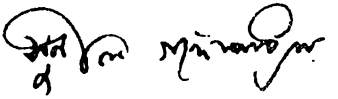

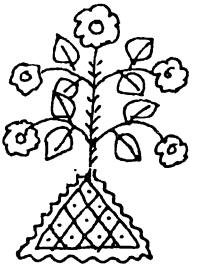

সূচি

একটি গ্রাম্য পটচিত্র ১৩
চূড়ামণি উপ্যাখ্যান ২৯
প্রথম মানবী ৪২
ভূমি ও আকাশ ৫৪
জল নয়, যেন অমৃত ৬৪
মাংস ৭০
সাঁকো ৭৭
এলাচের কৌটো ৮৩
গরম ভাত অথবা নিছক ভূতের গল্প ৯০
দেবদূত অথবা বারোহাটের কানাকড়ি ১১৪
ওরা এই পৃথিবীর কেউ নয় ১৩২
বিষ্ণু জ্যাঠামশাইয়ের প্রত্যাবর্তন ১৩৯
মাত্র আধখানা শতাব্দী ১৪৮
তাজমহলে এক কাপ চা ১৫৮
সাপলুডোর সিঁড়ি ১৬৭
ভীষ্মের দীর্ঘশ্বাস ১৭৫
ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী ১৭৮
জেটিঘাট ২০২
অলীক নগরী ২১০
দশ বছর আগে পরে ২১৫
রহস্য কাহিনি নয় ২২১
দুই বন্ধু ২২৯
নিম্নগামী ২৩৪
বহুলাড়া ২৪৫



বিরলে নিরালায় ২৫০
অপ্রেম পত্র ২৫৭
চেতন মিত্তিরির গল্প ২৬১
উন্মোচনের মুহূর্তে ২৬৩
শাস্তি ২৮০
কয়েকটি দৃশ্য ২৮৭
সমান্তরাল ২৮৮
প্রবাসী ২৯৪
রেলের কামরার গল্প ২৯৯
দুটি চরিত্র ৩০১
ট্রেন কাহিনি ৩০২
মোমচোর ৩০৪
সুখস্বপ্ন ৩১০
জ্বর ৩১৩
ভালোবাসা ৩১৭
দেখা না দেখা ৩১৯
জঙ্গলের মধ্যে মন্দির ৩২৪
তালভঙ্গ ৩২৮
তিন সঙ্গী ৩৩৩
ছাব্বিশটি কান ও বধির বিচারক ৩৩৮
গন্ধ ৩৪৩
সুনেত্রার কথা ৩৪৬
বুড়োর দোকান ৩৫৪
রূপকথা নয় ৩৬৪
মর্মবেদনার ছবি ৩৭৭
মিট্টাগড়ের রহস্যময়ী ৩৮৫
প্রথম নারী ৩৯৩
সহযাত্রী ৪০২



সেতুর ওপরে ৪০৭
সার্থকতা ৪১১
অশোক উপাখ্যান ৪১৫
ভাঙা বারান্দা ৪২২
অলৌকিক ৪২৭
সোনামণির অশ্রু ৪৪১
ফিরে আসা ৪৪৬
স্বর্ণলতা ৪৫২
চোখাচোখি ৪৬১
ট্যাক্সির হর্ণ ৪৬৭
অন্য আয়না ৪৭৫
ভেজাল ৪৮১
নিশীথকুসুম ৪৮৭
নীল আগুন ৪৯৪
নারী ৪৯৯
মেয়েদের ভয় ৫১৭
মাছ ৫২৪
গোপন ৫৩১
শিকার কাহিনি ৫৩৮
সূর্যকান্তর প্রশ্ন ৫৪৫
মা ৫৫১
পুরোনো স্পর্শ ৫৬২
দুজন ৫৬৬
চেয়ার ৫৯২
স্বপ্নের নেশা ৫৯৭
যূথপতি ৬০৬
তিনু ও তিন্নি ৬১১
মৃত্যুদণ্ড ৬১৫



ঘড়ি ৬২০
বাবা ৬২১
সেই গাছটির নীচে ৬২৮
ভুল মানুষের গল্প ৬৩২
সুধাময়ের বাবা ৬৩৭
নদীর মাঝখানে ৬৪২
শিল্পী ৬৪৮
পরম ও দীপালি ৬৫৫
অদৃশ্য বাঁশি ৬৬২
নদীর দু-ধারে ৬৬৮
ত্রয়ী ৬৭৬
ঝুটো পাথর ৬৮৫
যে জীবন দেখা হয়নি ৬৯১
ভালোবাসার দিনগুলি ৬৯৯
বংশধর ৭০৭
যমজ কাহিনি ৭১২
শ্মশানবন্ধু ৭২০
রূপকথার রাজারানি ৭২৫
দৃশ্যাবলী ৭৩০
ময়নার বোন ৭৪৮
সোনার কাঠির স্পর্শ ৭৫৫



একটি গ্রাম্য পটচিত্র

একদিন সকাল দশটা-এগারোটায় দিলারাবিবিকে তালাক দিয়ে বসল ইরফান আলি। তিন-চারজন সাক্ষীর সামনে। হ্যাঁ, রাগের মাথায় কাজটা করে ফেলেছে বটে, কিন্তু তুমি হাসতে-হাসতে বললে না চোখ পাকিয়ে চিৎকার করে বললে, শরিয়ত তো তা দেখতে যাবে না। ধর্মের বিধান মানতেই হবে।

হয়েছে কী, দু-দিন আগেই বাড়ির পুকুরধারের বেলগাছ থেকে পাঁচটা পাকা বেল পাড়া হয়েছে। অত বেল কে খাবে? বাড়িতে অতিথ্ এলে বেলের পানা করে দিলে তারা খুশি হয়। তাতে চায়ের খরচও বাঁচে। সেটেলমেন্ট অফিসের দুজন কর্মচারী, পঞ্চায়েতের সুখেন্দুবাবু আর ইরফানের এক চাচার সঙ্গে কথাবার্তা বলছিল ইরফান। উঠোনে, জামরুল গাছের ছায়ায় বসে। কাজের কথা শেষ হয়ে গেছে, তবু সেটেলমেন্টের বাবু দুটির ওঠার নাম নেই। দুপুরবেলা একবার কোর্টে যেতে হবে ইরফানকে। তাই সে স্ত্রীর উদ্দেশে হেঁকে বলল, দিলু, বেলের সরবত বানিয়েছিস তো সকালে? কয় গেলাস দিয়ে যা।

দিলারা সাড়া দিল না। সে ঘরের মধ্যেই আছে, শুনেছে নিশ্চয়ই।

এই বর্ষায় নদীর ভাঙন হয়েছে খুব। এপারেই ভেঙেছে বেশি, ইস্কুল বাড়িটাও গেছে। চর জেগে উঠেছে ওপারে। সেই চরে এর মধ্যেই জবরদখল শুরু হয়ে গেছে। তা নিয়ে জোর আলোচনা চলছে ক'দিন ধরে। লাঠালাঠি আসন্ন। ওপারে এক দারোগার শালাই দখল নিয়েছে অনেকখানি জমি।

আরও কিছুক্ষণ কথা বলার পর ইরফান আবার হাঁক দিল, কই রে দিলু, সরবত পাঠাইলি না?

গোয়ালঘরের পিছনের জমিতে এবার পেঁয়াজের চাষ করেছে দিলারা। ভালোই কলি উঠেছে। সেখান থেকে মাটিমাখা হাতে বেরিয়ে এল দিলারা। মাথায় ঘোমটাটা টেনে দিয়ে সে বলল, সরবত এখনও হয় নাই।

ইরফান বলল, হয় নাই? তুরন্ত বানায়ে ফেল। মেহমান এসেছে, দেখছিস না?

দিলারা বলল, আমার এখন টাইম নাই। শাহেদরে বলেন।

ইরফান বদমেজাজি মানুষ। বউয়ের এরকম উদ্ধত জবাব তার সহ্য হবে কেন? তা ছাড়া ইদানীং একটা ব্যাপার ঘটেছে, তার জন্য সবাই তার সঙ্গে খাতির করে কথা বলতে শুরু করেছে। শুধু নিজের বউয়ের কাছেই মান বাড়েনি।

ইরফান বলল, তোর টাইম নাই? কী এমন রাজকার্য কচ্ছিস? যা, শিগগির যা!

দিলারা দু-হাতের মাটি পরিষ্কার করতে-করতে বলল, কইলাম তো, আমি এখন পারব না। আগে গোসল না করে—

সে আড়চোখে একবার দেখল ইরফানের চাচা খালেকের দিকে। এই লোকটি এখন রোজ আসে, ইরফান যতক্ষণ বাড়িতে থাকে, ততক্ষণ মাছির মতন লেপটে থাকে তার গায়ের সঙ্গে।

ইরফান উঠে দাঁড়িয়ে গর্জন করে বলল, তোর বেশি বেশি বাড় বেড়েছে, না? কথা কইলে কানে যায় না, আমার কথা গেরাহ্য করিস না। তুই দূর হয়ে যা! এ বাড়িতে আর ঠাঁই নাই। যাঃ! তালাক—

অন্যরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। খালেক দু-হাত তুলে ব্যাকুলভাবে বলল, ওরে ইরফান করিস কী, করিস কী, থাম!

ইরফান সে অনুরোধ অগ্রাহ্য করে আরও দুবার উচ্চারণ করল, তালাক, তালাক!

ব্যাপারটার গুরুত্ব প্রথমটায় ঠিক বুঝতে পারল না দিলারা। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মাঝে-মাঝে কোন্দল তো হয়ই, লোকজনের সামনে ফুঁড়ে বেরুলে পীড়া হয় বেশি।

সে আরও ফুঁসে উঠে বলল, ঠাঁই নাই মানে? সারাটা জীবন বাঁদীর মতন খেটে-খেটে মুখে রক্ত উঠে গেল, আপনে আমারে—

হঠাৎ থেমে গেল দিলারা। তালাক শব্দ তিনবার, এবার তার মর্মে আঘাত দিল। নিজের মায়ের মৃত্যুসংবাদ শোনার পর তার যা অবস্থা হয়েছিল, থরথর করে কেঁপে উঠেছিল শরীর, সেইরকম ভাবেই থুপ করে বসে পড়ল মাটিতে, উলটে গেল চক্ষু দুটি।

অপর চারজন স্তম্ভিতের মতন দাঁড়িয়ে পড়েছে। এইরকম সময় তাদের উপস্থিতিরও একটা দায়ভাগ আছে। যেন চোখের সামনে একটা হত্যাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করা। বিচারকের সামনে তা স্বীকার করতেই হবে।

সুখেন্দু আর খালেক ইরফানকে কিছু বলতে গিয়েও কথা খুঁজে পেল না, আর তো বোঝাবার কিছু নেই।

বাতাসে এসব কথা নিমেষে ছড়ায়। ছুটে এল পাড়াপড়শিরা।

এ মহকুমায় সুলতানপুর নামেই দুটি গ্রাম আছে। এখানে নদী অনেকটা বাঁক নিয়েছে বলে এ গ্রামের নাম মুখে-মুখে বাঁকা সুলতানপুর। অন্তত দশ বছরের মধ্যে এখনকার কোনও পরিবারে তিন তালাকের মতন ঘটনা ঘটেনি। সেরকম কিছু কারও স্মরণে নেই। কোনও পুরুষেরই বউ নেই একটার বেশি। শুধু মোতাহার মোল্লা এ গ্রামে একটি পরিবার থাকা সত্ত্বেও গোবিন্দপুর গঞ্জে সিরাজ শেখের মেয়ে ফতিমাকে বিয়ে করে গোপনে দ্বিতীয় সংসার পেতেছিল। দু-নৌকোয় পা দিয়ে চালাচ্ছিল কিছুদিন, তবে এসব কথা বেশি দিন চাপা থাকে না। জানাজানি হতেই মোতাহার গ্রাম ছেড়ে পালায়, প্রথম পক্ষের বিবিকে তালাকও দেয়নি, আর এমুখোও হয় না।

হঠাৎ ইরফান আলি এরকম একটা কাণ্ড করে বসল? তাও এত সামান্য কারণে? বেলের সরবত!

জনগণের মধ্যে ফিসফিসানি চলতে লাগল কয়েকদিন। নানান গুজবের মধ্য থেকেও আসল সত্যটা বেরিয়ে আসে। এমন কিছু করতেই তো পারে ইরফান, তার যে নতুন ডানা গজিয়েছে। রাগের মাথায় না ছাই। আগে থেকে ভেবেচিন্তে, কয়েকজন বাইরের লোককে সাক্ষী রেখে সে মাকালার মতন তেজি গলায় তিনবার তালাক উচ্চারণ করেছে, যাতে কারও বুঝতে অসুবিধে

না হয়। দিলারাকে ত্যাগ করার জন্য সে বদ্ধপরিকর।

খোদা যাকে দেন, তাকে ছপ্পড় ফুঁড়েও দেন। ইরফানের এখন সেই অবস্থা।

জমিজিরেত বেশি নেই ইরফানের। বাপ-দাদার জমি শরিকি ভাগাভাগির পর ইরফান পেয়েছে চার বিঘে। দো ফসলি। তাও আমন চাষটা ভালো হয়, পরেরটা তেমন সুবিধের না। সম্বৎসরের খোরাকিটা কোনওরকমে হয়ে যায়। এ ছাড়া বাজারে একটা টেলারিংয়ের দোকান আছে তার। সে দোকানের আয়ও যৎসামান্য। একটাই সেলাই মেশিন, কখনও ইরফান নিজে চালায়, শিবু নামে একটি অল্প বয়েসি ছেলেকেও রেখেছে। লুঙ্গি আর ফতুয়াই সেলাই করে, অন্য বিশেষ কিছু সুবিধে করতে পারে না। পারলেই বা কী হত! বছরদেড়েক আগে একটা রেডিমেড বস্ত্রালয় খুলেছে মহাপাত্ররা দুই ভাই, সে দোকান এখন চলছে রমরমিয়ে। সব কিছুই পাওয়া যায়, দামও একটু সস্তা। কেউ এখন আর ছিটকাপড় কিনে সেলাই করাতে চায় না।

বস্ত্রালয়ের পাশে ছিদামের মুদিখানা, তার পাশে গণেশের চায়ের দোকান। সেই দোকানের বাইরে নুলো নিতাই বসে থাকে একটা টুল পেতে। আর কোনও কাজকর্ম সে পারে না, সে লটারির টিকিট বিক্রি করে। পাশের গ্রাম চর ভাংরাহাটির বাজারে শ্রীকৃষ্ণ গড়াইয়ের বড় লটারির দোকান, নুলো নিতাই তার সাব-এজেন্ট। খ্যানখেনে গলায় নিতাই চায়ের দোকানের খদ্দেরদের টিকিট কেনার জন্য ঝুলোঝুলি করে। অনেক টাকার আশায় সবাই একবার-দুবার পাঁচ-দশ টাকার টিকিট কিনেছে, কিছুই হয় না, টাকাটাই জলে যায়। পাঁচ টাকা-দশ টাকার দামও কম নাকি? এখন আর কেউ কিনতে চায় না। নিতাইকে নতুন লোক ধরতে হয়। বার করতে হয় নতুন-নতুন উপায়।

ইরফান লটারির টিকিট কেনেনি। তার দোকান থেকে নিতাই একটা ফতুয়া সেলাই করার জন্য অগ্রিম দিয়েছিল পাঁচ টাকা। মাল ডেলিভারির সময় বাকি দশ টাকা পরে দেবে বলে যায়। তারপর দেয় না। ইরফান একদিন রূঢ়ভাবে তাড়া দিতে নিতাই কাঁচুমাচু হয়ে বলল, ভাইডি, বড় টানাটানি যাস্যে, যদি একটা উবগার করো, এই সিকিম লটারির একখান টিকিট তুমি জমা রাখো। এ টিকিটের দাম কুড়ি টাকা, তোমারে কিছুই দিতে হবে না, আর যদি কপালে লেগে যায়, ফার্স্ট প্রাইজ এক কোটি টাকা, তুমি রাজা-বাদশা বনে যাবে। লোকে যে ভাবে কেউ পায় না, তা ঠিক নয় গো। হরিদেবপুরের নবীন সাঁতরা পেয়েছে বিশ লাখ, তারপর ধরো করম শেখ, সেও একবার...

কোনওরকম আশাই করেনি ইরফান, নেহাত নিতাইকে ক্ষমাঘেন্না করে সে টিকিটটা নিয়েছিল। তার ভাগ্যেই শিকে ছিঁড়ল। চর ভাংরাহাটির শ্রীকৃষ্ণ গড়াই নিজে এসে নম্বর মিলিয়ে বলে গেল, সিকিম রাজ্য লটারির থার্ড প্রাইজ পেয়েছে ইরফান আলি, দশ লাখ টাকা!

দশ লাখ? সে যে কত টাকা, সে ধারণাই নেই ইরফান আলির। একের পিঠে ক'টা শূন্য? কোথায়, কত দূরে সিকিম রাজ্য, সেখান থেকে তারা বেছে নিল বাঁকা সুলতানপুরের ইরফান আলিকে! টিকিটটা কোথায় রেখেছিল মনেই ছিল না। একটু খোঁজাখুঁজিতেই পাওয়া গেল অবশ্য।

এই টাকা কীভাবে পাওয়া যায়? সিকিম যেতে হবে?

কত লোক যে কত কথাই বলে। এখন ইরফানের ধারে-কাছে সব সময় বহু মানুষের ভিড়। সবাই উপদেশ আর পরামর্শ দেওয়ার জন্য ব্যস্ত। অনেক কিছুই ইরফানের মাথায় ঢোকে না।

তারপর এল নিখিল মাস্টার। সে শুধু মাস্টার নয়, পার্টি করে, মিছিল করে। বছর পঁয়তিরিশেক বয়েস, ছিপছিপে চেহারা, গলার জোর আছে। সে সবাইকে সরিয়ে দিয়ে ইরফানকে নিয়ে বসল দর্জিখানার ভেতরে, বাইরের আগল এঁটে দিল।

প্রথমেই সে জিগ্যেস করল, টিকিটখানা কোথায়?

ইরফান সতর্কভাবে বলল, আছে। কিন্তু এখন সঙ্গে নাই।

নিখিল বলল, বেশ। কারওকেই হাতে দেবে না। কেউ দেখতে চাইলেও দেখাবে না। আমাকেও দেবে না। তোমার ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট আছে?

ইরফান দু-দিকে মাথা নাড়ল।

নিখিল বলল, কী করতে হবে, মন দিয়ে শোনো। একশো টাকা দিয়ে ব্যাঙ্কে একটা অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে। তার আগে তোমার ফটো তোলাতে হবে। নাম সই করতে জানো?

ইরফান বলল, জানি স্যার। ক্লাস থিরি পর্যন্ত পড়েছি।

নিখিল বলল, ঠিক আছে। ফটো তুলিয়ে ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলবে। তারপর ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের হাতে টিকিটটা জমা দেবে। সঙ্গে দু-তিনজনকে নিয়ে যাবে, সাক্ষী থাকবে তারা। স্টেট ব্যাঙ্কের ম্যানেজার মনোজিৎবাবুকে আমি চিনি, মানুষটা খাঁটি। তিনি টাকাপয়সার সব ব্যবস্থা করে দেবেন। তোমাকে আর কিছু করতে হবে না। হঠাৎ এত টাকা পেয়ে তুমি কী করবে ভেবেছ?

ইরফান চুপ করে তাকিয়ে রইল।

নিখিল বলল, কিছুই কোরো না। যেমন চলছিল তেমনই চালাও। ব্যাঙ্কে টাকা থাক, তুমি একেবারে চেপে থাকো। হঠাৎ পাওয়া টাকা অনেকেরই ভাগ্যে সয় না। হঠাৎই শেষ হয়ে যায়। কত লোক এসে চিলুবিলু করবে। নানান ছুতোয় ভাগ চাইবে। টাকা ওড়াবার কু-পরামর্শ দেবে। ইরফান আলি, মাথা ঠিক রাখো, যে-রকম মোটা চালে চলছিলে, সেই রকমই চালাও, ও টাকা পরে কাজে লাগবে। নানান পার্টির লোক এসে চাঁদা চাইবে, দেবে না। বলবে, এক বছর পর। শুধু একজন লোককে তোমার এখনই হাজারদশেক টাকা অন্তত দেওয়া উচিত, কাকে বলো তো?

ইরফান বলল, দশ হাজার? কারে?

নিখিল বলল, নিতাইকে। তুমি তো দাম দিয়েও টিকিট কেনোনি, নিতাই তোমায় পাইয়ে দিয়েছে, সে গল্প শুনেছি। যদি ও এই টিকিটটা নিজের কাছে রেখে দিত? ও বেচারা অসহায় নিঃস্ব মানুষ, ওকে কিছু দিলে তোমার পুণ্য হবে।

নিখিলের কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করল ইরফান। মাস্টারবাবু তো নিজের জন্য কিছু চায়নি। পার্টির জন্যও চায়নি। যা-কিছু বলেছে, তার ভালোর জন্যই। সত্যি, ব্যাঙ্ক থেকেই তার সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। ম্যানেজারবাবু তাকে দিলেন একটা সাদা রঙের পাস বই, আর একটা নীল রঙের চেক বই। কী করে টাকা তুলতে হয়, তা বুঝিয়ে দিলেন। ইনকাম ট্যাক্স ইত্যাদি কেটেকুটে ইরফানের নামে এখন জমা আছে সাত লক্ষ কুড়ি হাজার চারশো টাকা। তার বাপের জন্মে কেউ এত টাকার স্বপ্নও দেখেনি।

নিতাইকে অবশ্য সে প্রাণে ধরে দশ হাজার দিতে পারেনি। প্রথমবার দশ হাজারই তুলে নিতাইকে দিল পাঁচ। এত বড় একটা কাণ্ডের পর নিজের জন্য কিছু খরচ করবে না, তাও কি হয়? আত্মীয়স্বজনকে একদিন দাওয়াত তো দিতেই হবে, বাড়ির টিউকলটা কতদিন ধরে সারাবার কথা ভাবছিল, এবার না সারালেই নয়! আগে মাঝে-মাঝেই যাকে মহাজনের কাছ থেকে চড়া সুদে টাকা ধার করতে হত, এখন সেই মানুষটির যদি ব্যাঙ্কে সাত লাখের বেশি টাকা থাকে, তা হলে তার চালচলন কি পুরোপুরি অগের মতন হতে পারে? এখন কত মানুষ তাকে খাতির করে কথা বলে। আগে যারা ইরফানকে পাত্তাই দিত না, এখন তারা ইরফানের সঙ্গে চোখাচোখি হলেই দেঁতো হাসি হাসে। ইরফানের কাছ থেকে যাদের কিছুই পাবার আশা নেই, তারাও এখন ইরফানকে সম্ভ্রম দেখায়, টাকার এমনই গুণ। পাঁচজনের মধ্যে দাঁড়িয়ে কথা বলার সময় আগে কেউ তার কথায় আমলই দিত না, এখন অন্যরা হঠাৎ থেমে গিয়ে বলে, হ্যাঁ, ইরফান, তুমি কী বলছিলে? ঠিকই তো বলেছ!

এরকম অবস্থায় পোশাক-পরিচ্ছদ আগের মতন রাখলে চলে? বিড়ির আগুনে তার নীল রঙের কুর্তাটা দু-জায়গায় ফুটো হয়ে গেছে। পায়ের জুতো কিংবা চটি দেখলেই বোঝা যায় কে চাষাভুষো, কে বাবু শ্রেণির। তাদের সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা দাড়িতে মেহেন্দি লাগায়। সবচেয়ে চমকপ্রদ কাজ করল ইরফান, একদিন গড়বন্দিপুরে গিয়ে চোখের ডাক্তারকে দেখিয়ে চোখে চশমা

নিল। সোনালি ফ্রেমের চশমা। তার চেহারা তো মন্দ না, এমন চশমায় তার রূপ খুলে গেল, এখন সে সত্যিকারের বাবু।

সই করে চেক কাটলেই টাকা তোলা যায়, এতে সে বেশ মজা পেয়েছে। মাঝে-মাঝেই সে টুকটাক টাকা তোলে, খুব বেশি না, দু-হাজার পাঁচহাজার। নতুন নোটগুলোর দিকে মুগ্ধভাবে তাকিয়ে থাকে, গন্ধ শোঁকে। আগে হাজার টাকা রোজগার করতে শরীরের রক্ত পানি করতে হয়েছে, আর এখন শুধু ইরফান আলি নামটা লিখলেই যত ইচ্ছে টাকা আসে।

নিখিল মাস্টারের কথা তার মনে পড়ে মাঝে-মাঝে। ঠিকঠাক পরামর্শ দিয়েছিলেন তিনি। এখনও ইরফান তো দু-হাতে টাকা ওড়ায় না, কারওকে কিছু দেয়ও না। কেউ এসে বাপের অসুখ, মায়ের অসুখ বলে কেঁদে পড়লে কিংবা টাকা ধার চাইলেও সে বলে, এক বছরের আগে টাকা তোলা যাবে না রে ভাই, আমার উপায় নাই। তাদের টালির ছাদের বাড়িটাতে নতুন রং করার শখ ইরফানের অনেক দিনের, পাছে লোকের চক্ষু টাটায় তাই সে ইচ্ছেটাকে এখনও দমন করে রেখেছে।

নিখিল মাস্টারকে একখান ধুতি আর কুর্তা কিংবা তাঁর মায়ের জন্য একটা শাড়ি পাঠালে কেমন হয়? ইরফান প্রায়ই ভাবে একথা, কিন্তু ওই ভাবনাটুকুই সার। নিখিল মাস্টারের কাছে সে কৃতজ্ঞ ঠিকই, কিন্তু সহসা সে আর তাঁর সামনে যেতে চায় না। দূর থেকে কখনও সে নিখিল মাস্টারকে দেখলে চট করে অন্য দিকে সরে যায়, কেন সরে যায়, তা সে নিজেই জানে না।

বাড়িতে বউয়ের কাছে নতুন করে কিছু খাতির পায়নি ইরফান। সাতাশ বছরের বিবাহিত জীবন, এর মধ্যে সংসারের অনেক দুর্যোগ সামলেছে দিলারা। একসময় ইরফানের বাপ রোগ-ব্যাধিতে শয্যাশায়ী হয়ে ছিল পাক্কা তিন বছর, তখন তার গু-মুত পরিষ্কার করা থেকে সব রকম সেবা তো দিলারাই করেছে, কোনওদিন মুখে রা কাড়েনি। একসময় খুবই খাটতে পারত সে, এতদিনে খাটতে-খাটতে তার শরীরটা ভেঙেছে। এখন আর তার শরীরে রস নেই, শয্যায় সুখ দিতে পারে না। চুয়ান্ন বছর বয়েসে ইরফান এখনও সা-জওয়ান, কিন্তু তার বউ যেন একটা বুড়ি।

শরীরে রস নেই, জিভেও যে একটুও মিষ্টত্ব নেই দিলারার। মেজাজ হয়েছে খিটখিটে। সংসারের কাজ কিংবা স্বামী-সেবার ত্রুটি নেই, বৃষ্টিতে ভিজে ইরফান যখন জ্বর বাধায়, তখন তাকে ওষুধ খাওয়ানো, কপালে জলপট্টি দেওয়া কিংবা রাত জেগে পাখার বাতাস সবই সে করবে, কিন্তু বকুনি দিতেও ছাড়বে না। দিলারার আর একটি অযোগ্যতাও প্রকট, এ পর্যন্ত সে একটিও পুত্রসন্তান প্রসব করতে পারেনি, তিন কন্যাসন্তানের মধ্যে প্রথম দুটি বেশি দিন বাঁচেনি, ছোট মেয়েটির বয়েস সাত বছর। আর তার সন্তান-সম্ভাবনা নেই।

ইরফান এখন বড়লোক হয়েছে, এখনই তো তার ভোগবিলাসের সময়, নইলে টাকা দিয়ে সে কী করবে? টাকা কেউ পরলোকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে না, পাঁচভুতের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েই বা কী হবে? নারীসঙ্গ ছাড়া কি ভোগবিলাস হয়? এই গ্রামের মধ্যে ব্যভিচার চলে না, সবাই সব কিছু জেনে যায়। তাই দিলারাকে তালাক দেওয়ার মতলব ইরফান কিছুদিন ধরেই এঁটে রেখেছিল।

শরীর ভাঙলেও সংসারের সাশ্রয়ের জন্য দিলারা যথাসাধ্য খাটে এখনও। লটারির টাকার মর্ম সে ঠিকমতন বোঝেনি। ইরফান তাকে দেয়নি নতুন কিছু। দিলারা বাগান-চাষ ভালোবাসে, বাড়ির মধ্যে যেটুকু জমি তাতেই সে বেগুন-মুলো ফলায়, লেবু আর লঙ্কা গাছ আছে, ফুলকপিও করেছিল গত শীতে, এখন সে পেঁয়াজ নিয়ে মেতেছে। ইরফান জানত, সকালবেলা বাগানের কাজ দিলারা সহজে আসবে না, শাহেদ নামে বাড়িতে একটা [illegible] আছে, সেইফরমাস তাকে সে বেলের সরবত বানাতে বলতে পারত না? ও বানাতে আর এমনকি গুণ লাগে? সামনে সে দেখল যে তার বউ তার কথার অবাধ্য, চোপা করে, তাই রাগের [illegible] তালাক উচ্চারণ করলে তা কি দোষের হবে?

তালাক তো হয়ে গেল, এরপর সাতবছরের মেয়ে তিন্নিকে নিয়ে দিলারা যাবে কোথায়? তার তিন কুলে আর কেউ নেই। বাপের বাড়ির গুরুজনরা সবাই মরে-হেজে গেছে। সাতাশ বছর ধরে সে এখানে আছে, পুরুষরা বেশির ভাগ সময়ই বাড়ির বাইরে থাকে, মেয়েরাই ধরে রাখে সংসারের শ্রী। এ সংসার ছাড়া দিলারা আর কিছুই জানে না, চেনে না। তালাক হয়ে গেলে স্বামীর বাড়ির অন্ন গ্রহণ করাও নিষিদ্ধ। মেয়েকে নিয়ে যেতে হবে এতিমখানায়? সেটাই বা কত দূরে?

ঘরেই আর ঢুকল না দিলারা। ফোঁপাতে-ফোঁপাতে পুকুরধারে গিয়ে একটা অশথগাছের তলায় বসে রইল। তিন্নি খেলতে গিয়েছিল এক ফুফাতো বোনের সঙ্গে। কেউ তাকে বাড়িতে দিয়ে গেল। মা কেন গাছতলায় বসে কাঁদছে, তা সে বুঝলই না।

দুপুরবেলা শাহেদ এসে দিয়ে গেল এক থালা ভাত, ডাল আর লাউঘন্ট।

দিলারা থালাটা দূরে ঠেলে দিল। তাকিয়ে রইল সেদিকেই। তার সাতাশ বছরের সংসার কয়েকটা মাত্র শব্দে শেষ হয়ে গেছে, তার সাতাশ বছরের স্বামী আর তার স্বামী নয়, তা হলে এই অন্ন সে মুখে তুলবে কোন অধিকারে?

শুধু একবার চকিতে তার মনে প্রশ্ন জাগল, লাউঘন্টটা রান্না করল কে? শাহেদ নাকি? ও রান্নার কী জানে? ওই লাউঘন্ট ইরফানের মুখে রুচবে? রান্নাবান্না নিয়ে তার বেশ নাকছাঁটা আছে। বেশি পরিমাণ পেঁয়াজ হয়ে গেলে মাছের ঝোল মিঠা হয়ে যায়, তা ইরফান খাবেই না, মেজাজ দেখাবে!

এইভাবেই কেটে গেল দু-দিন।

তিন্নি মায়ের কাছে এসে বসে থাকে, মাঝে-মাঝেই জিগ্যেস করে, আম্মু তোর কী হয়েছে? ঘরে যাইস না কেন?

উত্তর দেয় না দিলারা, এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে মেয়ের মুখের দিকে। এত মুখরা ছিল সে, এই দু-দিন মুখ দিয়ে একটাও শব্দ বার করেনি, যেন তার বাধ্যক্য হয়ে গেছে।

কন্যাসন্তান সংসারে অবাঞ্ছিত। তাই মেয়েকে প্রকাশ্যে এখনও স্নেহ-মমতা দেখায়নি দিলারা, সেসব যেন সে ভুলেই গেছে। মাঝে-মাঝে শাহেদ এসে তিন্নিকে প্রায় জোর করেই বাড়িতে নিয়ে যায় ইরফানের আদেশে। তিন্নি বাবাকে কিছু বলতে সাহস পায় না, বাবাকে সে ভয় পায়।

পাড়া-প্রতিবেশিনীদের মধ্যে দুজন নারী দিলারাকে তাদের বাড়িতে আশ্রয় দিতে চায়, তাতেও সাড়া দেয় না সে। এরা দয়া দেখাতে চায়, ভালো কথা, কিন্তু কতদিন দয়া বজায় থাকবে? দিলারা মুখ ফিরিয়ে থাকে।

বাড়িতে টিউকল চালু হয়েছে। ইরফান আর গোসল করার জন্য পুকুরঘাটে আসে না।

অশথগাছটায় অনেক পাখির বাসা। পাখিরা ডাকাডাকি করে, ফুরুৎ করে উড়ে যায়। আবার এসে বসে। মনে হয় যেন, দিনাগত রাতে, আবার দিনে এক ভাবে ঠায় বসে থাকা এই স্ত্রীলোকটিকে দেখে তারা বেশ অবাক হয়েছে। অবশ্য পাখিদের চোখের পাতা থাকে না বলে এমনিতেই তাদের দৃষ্টিতে সবসময় বিস্ময়ের ভাব থাকে। কিংবা হয়তো সেই জন্যই এই দুনিয়াটাকে তাদের প্রতিনিয়ত বিস্ময়কর স্থান বলে মনে হয়।

যখন দুপুর একেবারে শুনশান, কাছাকাছি কেউ থাকে না, তখন দিলারা চোখের জল মুছে পাখিদের দেখে। ওরা ইচ্ছে মতন যেখানে খুশি উড়ে যেতে পারে। কখন কোন গাছের ডালে বসবে তারও কিছু ঠিক-ঠিকানা নেই।

তালাক দিয়েছে বটে, কিন্তু ইরফান তো সম্পূর্ণ হৃদয়হীন মানুষ নয়। বাড়ির কাছেই গাছতলায় বসে আছে তার প্রাক্তন স্ত্রী, এক দানা অন্ন মুখে দেয়নি, এ সংবাদ শুনে তো সে বিচলিত বোধ করবেই। আকাশে মেঘ জমছে, দু-একদিন পরেই শুরু হয়ে যাবে বৃষ্টি, তখনও সে ওখানেই বসে থাকবে?

খালেকচাচাকে সঙ্গে নিয়ে সে এসে দাঁড়াল গাছতলায়।

গম্ভীর গলায় সে বলল, শোনো তিন্নির মা, এইভাবে পুকুরধারে তোমার বসে থাকা মোটেই শোভা পায় না। আমিনাভাবী তোমাকে তাঁর বাড়িতে ঠাঁই দিতে চেয়েছিলেন, তাও তুমি যাও নাই। হাকিমপুরে তোমার খালাতো ভাই সিরাজুল থাকে, তার বড়া গোস্তের কারবার ভালোই চলে, যদি সেখানে যেতে চাও শাহেদ তোমাকে পঁহুছিয়ে দিয়ে আসবে, অথবা—

এবারেই প্রকাশ পেল তার আসল উদারতা। তার দেনমোহন দেবার কোনও বাধ্যবাধকতা নেই, তবু সে বলল, অথবা বাজারে আমার যে টেলারিংয়ের দোকান আছে, সেটা তুমি নিতে পার। পিছনের কুঠুরিতে থাকার জাগা হয়ে যেতে পারে। দোকান তুমি চালাও, আমি লাভের বখরা নিতে যাব না। দোকান তোমার। মেশিনের নীচে এক দেরাজে দুই শত তিরিশ টাকা আছে, তা দিয়ে প্রথম খরচ চালাবে। এই নাও চাবি—।

মাটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসে রইল দিলারা, একবারও সে তাকায়নি আর সাতাশ বছরের স্বামীর দিকে। কোনও সাড়াশব্দও করল না।

দু-তিনবার একই কথা বলার পর চাবিটা ছুড়ে দিয়ে চলে গেল ইরফান।

পরদিন ভোরবেলা পুকুরে জল সইতে এসে পল্লির নারীরা দেখল, অশথগাছের ডালে ঝুলছে দিলারার নিস্পন্দ শরীর। অনেকগুলি পাখি ডাকাডাকি করছে এ-ডালে ও-ডালে। এই সময় তো পাখি ডাকেই।

প্রতিবেশিনীদের অনেকেই মনে করল, দিলারা ঠিক কাজই করেছে। শুধু-শুধু ঝঞ্ঝাট বাড়িয়ে লাভ তো কিছু হত না। বাজারের দোকানঘরে কি কোনও স্ত্রীলোক থাকতে পারে? গোসল করবে কোথায়?

এই সব মানুষদের স্মৃতি বড় তাড়াতাড়ি মুছে যায়। ছবিটবি থাকে না, কোনও চিহ্নও থাকে না বলতে গেলে। শুধু দিলারার যত্ন করা পেঁয়াজকলিতে পেঁয়াজ হয়, বেগুনে গত্তি আসে, মাচা থেকে দুলতে থাকে কচি-কচি শশা। সেসব খাওয়াও হয়ে যায়।

প্রথম কয়েকটি দিন তিন্নিকে নিয়ে রেখেছিল পাড়ার বউরা। সমবয়েসি পেয়ে মেয়েরা খেলাধুলোয় তাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে রেখেছে। তারপর তো বাড়ির মেয়েকে বাড়ি ফিরতেই হবে। মেয়েটার স্বভাব বড় ছটফটে, এক জায়গায় বেশিক্ষণ বসতেই পারে না, একটু ফাঁক পেলেই বাড়ির বাইরে দৌড়ে চলে যায়। অথচ পড়াশুনোতে মাথা আছে। এর মধ্যেই আঁক কষতে শিখেছে, বাংলাও পড়তে পারে, যুক্তাক্ষরের বানান ভেঙে-ভেঙে। গ্রামের ইস্কুলটি গতবার গেছে নদীগর্ভে, এখন মসজিদের পিছনে হোগলার ছাউনি দেওয়া খানিকটা জায়গায় ক্লাস হয়, সেখানে যেতে তিন্নির খুবই উৎসাহ। কিন্তু তারপর আর বাড়ি ফিরতে যেন ইচ্ছেই করে না।

দিলারার ইন্তেকালের ঠিক পাঁচ মাস পর ইরফান শাদি করল লায়লা অঞ্জুমান বানুকে। তার চেয়ে প্রায় কুড়ি বছরের ছোট, ফরসা হিলহিলে চেহারা, সারা শরীর দিয়ে লাবণ্য যেন ঝলকে-ঝলকে পড়ছে। পাতলা ঠোঁটে সব সময় দেখন-হাসি। এই উপলক্ষে গ্রামসুদ্ধ সবাইকে ভোজ দিল ইরফান, পিরের মাজারে চাদর চড়াল।

এ বিয়েতে গ্রামের মানুষ বেশ খুশি। অন্যায় তো কিছু নেই! আগের স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ন্যায্য অধিকার আছে ইরফানের। তার সঙ্গে বনিবনা না হলে আর কী উপায় উত্তরাধিকারীও উপহার দিতে পারেনি সে। তার খোরপোষেরও ব্যবস্থা করেছিল ইরফান, সে সুখ তার কপালে সইল না, তাতে আর কী করা যাবে! তা বলে ইরফান কেন তার জাগতিক সুখ থেকে বঞ্চিত হবে! আগের অবস্থায় সে এমন সুন্দরী যুবতীকে বউ করে ঘরে আনলে লোকে বলতে পারত গরিবের ঘোড়া রোগ, কিন্তু এখন সে এ-তল্লাটের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি। টাকা থাকলে কত রকম সুখই তো কেনা যায়!

লায়লাকে সবারই খুব পছন্দ, তার সরল-সরল কথা শুনতে বেশ মজাই লাগে। তবে তার বাপের বাড়ির লোকেরা মাঝে-মাঝে এসে বড় উৎপাত করে। লায়লা এরকম ধাদ্ধারা গোবিন্দপুরের মেয়ে নয়, বাড়ি গঞ্জ অঞ্চলে, বিশাল একান্নবর্তী পরিবার, নানারকম সম্পর্কের ভাই-বোনের লেও অনেক, তারা তো নতুন দুলাভাইয়ের বাড়িতে আসতেই পারে। প্রায়ই তারা আসে মোটরসাইকেল হাঁকিয়ে, একবার এল একটা সাদা রঙের গাড়ি ভাড়া নিয়ে সাত-আটজন। এখানে নদীর পাড় ভাঙছে, ভেঙেই চলেছে, সেটাই নাকি একটা দর্শনীয় ব্যাপার।

তরুণী ভার্যার মনোরঞ্জনের জন্য পুরুষ মানুষ কী না করতে পারে। এর মধ্যে মুঠো আলগা করেছে ইরফান। নিখিল মাস্টারের উপদেশ আর তার মনে পড়ে না। ঘনঘন টাকা তোলে ব্যাঙ্ক থেকে। এর মধ্যে একটা পাকা দালান বানানো হয়েছে, নদীর খেয়াঘাটে ডাক দিয়ে পারানি কিনেছে এক বছরের জন্য। এক লপ্তে দশ বিঘে জমি কেনারও কথাবার্তা চলছে। লায়লার দুই ভাই-ই এখন তার প্রধান পরামর্শদাতা।

এ বাড়ির চেহারাই পালটে গেছে এখন। প্রতিদিনই জমজমাট ভাব। লায়লার বাপের বাড়ির থেকে রান্নার জন্য একজন মেয়েলোক আনানো হয়েছে, তার নাম সেতারা। লায়লাকে সে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছে, এখন বয়েস হলেও শরীরে যথেষ্ট তাগদ, এক হাতে সে কুড়ি-পঁচিশ জনের খাদ্যদ্রব্য পাক করে ফেলতে পারে অনায়াসে।

বাড়িতে এক সঙ্গে এত মানুষ দেখলে তিন্নি মাঝে-মাঝে ঘাবড়ে যায় বটে, কিন্তু তার কোনও অযত্ন হয় না। লায়লা প্রথম থেকে তাকে সুনজরেই দেখেছে। তার নিজের মধ্যেই একটা বালিকা-ভাব আছে এখনও। সৎমা শুনলেই কেমন যেন হিংসুটি, ভয়ঙ্করী মনে হয়, লালয়ার মধ্যে সেরকম ভাব একটুও নেই। সে নিজে গঞ্জের স্কুলে ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়েছে, তিন্নিকে সে পড়াতে বসায় বিকেলবেলায়। ছড়া শেখাবার সময় দুজনে একসঙ্গে ছড়া বলে। মাঝে-মাঝে দুজনেই এক সঙ্গে হেসে গড়িয়ে পড়ে।

লায়লার দুই ভাই খালেক আর বদন, এর মধ্যে বদনের স্বার্থবুদ্ধি বেশি, আর খালেক অনেক দিলখোলা। তিন্নি সম্পর্কে এদের মনোভাবও বিপরীত।

ইরফানের স্নেহ-বাৎসল্য বোধ কম, সে মেয়েকে নিয়ে কখনও আদিখ্যেতা করেনি, সে আছে, ঘোরে ফেরে, খায় দায়, ইরফান দেখে, সেটাই যথেষ্ট।

কারও-কারও স্নেহ-ভালোবাসা হয় বড় বেশি একমুখী। সেতারার নিজের সন্তানাদি নেই, বালবিধবা, দ্বিতীয়বার আর নিকে হয়নি, সব স্নেহ সে উজাড় করে দিয়েছে লায়লাকে। লায়লার শ্বশুরবাড়িতেও সে এসেছে স্বেচ্ছায়, তাকে সে চোখে হারাতে চায় না। শ্বশুর-শাশুড়ির ঝামেলা নেই, লায়লা এখানে সুখের রাজত্ব গড়বে, পাশে থাকবে সেতারা। কিন্তু এর মধ্যে তিন্নির স্থান কোথায়?

প্রথম-প্রথম কয়েকদিন সে তিন্নির ওপর নজর রাখে। বাচ্চা মেয়েটার মধ্যে সে দোষের কিছু দেখতে পায় না। শুধু ওর অস্তিত্বটাই দোষের। ও না থাকলেই তো ভালো ছিল। প্রথম-প্রথম সে ভাবত, আছে তো থাক না, ওর খাওয়াপরার কতই বা খরচ-খরচা লাগে। কিন্তু ও মেয়ে তো বড় হবে, তখন ওর দাবিও বাড়বে। ও যদি লায়লার সমান হতে চায়? তারপর অবস্থা অনুযায়ী মানানসই শাদি দিতে হবে, সেও বহু টাকার ধাক্কা। ওর স্বামীটাই বা কেমন হবে, যদি একটা চশমখোর হয়? যদি সে ভালোমানুষ ইরফান মিঞাকে নিত্য শোষণ করে?

এখনও আট বছর বয়েস হয়নি তিন্নির, তবু তার দিকে তাকিয়ে সেতারাবিবি অনেক দূর পর্যন্ত দেখে ফেলে। ভয়ে তার শিহরণ হয়। এখন যে বাচ্চা মেয়েটি হাসছে, খেলছে, দৌড়োদৌড়ি করছে, কয়েক বছরর পরে এ মেয়েই হবে হিংস্র বাঘিনী। লায়লার জীবন বিষময় করে দেবে। লায়লারও নিজের সন্তান হবে, তাকে বঞ্চিত করবে এই মেয়ে।

এইসব আশঙ্কার কথা সেতারা অনবরত লায়লার কানে ঢালতে লাগল। প্রথম-প্রথম লায়লা

বিরক্ত বোধ করত। কী সব অলুক্ষুণে কথা, তিন্নি বেশ মেয়ে। কিন্তু দিনের-পর-দিন একই কথা শুনলে ক্রমশ বিশ্বাসযোগ্যতা এসেই যায়। ইরফানের গোচরেও যায় এই বৃত্তান্ত। ইরফান কোনও মন্তব্যই করে না। যৌবনের স্বাদ পেয়ে সে এখন উন্মত্ত, লায়লা একদিন সামান্য একটু মুখ ভার করলেই সে নতুন শাড়ি-গয়না কিনে আনে।

কয়েক মাসের মধ্যেই পোয়াতি হল লায়লা। খবরটা দেওয়ার সময় মসজিদে এক হাঁড়ি রসগোল্লা বিলি করল ইরফান। তার দৃঢ় ধারণা, এবার সে পুত্রসন্তান পাবে। শুধু সম্ভোগ নয়, লায়লা তার সৌভাগ্যও এনে দেবে, তার বংশরক্ষা হবে।

বউকে নিয়ে মাঝে-মাঝে নদীতে বেড়াতে যায় ইরফান। সন্ধের পর খেয়া চলে না। নৌকোর মালিক এখন ইরফান নিজে। মাঝি ইদ্রিশ রাত্রিবেলা তার বাড়িতেই খায়, সুতরাং তাকে দিয়ে বেশি কাজ করানোও যায়। প্রতিদিন নদী পারাপার করে ইদ্রিশ, এই নদীই নবিগঞ্জে তার বাড়ি খেয়ে নিয়েছে। তার বউ এখন বাপের বাড়িতে মুখঝামটা খেয়েও বাধ্য হয়ে তিন ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকে ছেলেটার আবার পোলিও।

এক বিকেলে সেজেগুজে বেরুবার সময় লায়লা বলল, আয় তিন্নি, তুইও চল আজ আমাদের সঙ্গে। শাড়ি পরবি? আমি তোকে শাড়ি পরিয়ে দিচ্ছি। লখার মাঠে আজ সিনেমা দেখাবে, তুইও দেখবি বেশ।

তিন্নিকে শাড়ি পরিয়ে, গালে পাউডার মাখিয়ে, কপালে টিপ লাগিয়ে সাজিয়ে দিল লায়লা। অনভ্যস্তভাবে পুতুলের মতন পা ফেলে-ফেলে বাবা-মায়ের সঙ্গে চলল তিন্নি। আকাশে অল্প-অল্প মেঘ, তবে সহসা ঝড়ের সম্ভাবনা নেই। আর ঝড় উঠলেও সামাল দিতে পারবে ইদ্রিশ।

ভরা বর্ষার নদী, ফনফন করছে পানি। সারা শীতকাল আর গ্রীষ্মকাল এ নদী না খেয়ে উপোসী হয়ে থাকে, চেহারা হয়ে যায় শুকনো দড়ির মতন, কিংবা শয্যাশায়ী মুমূর্ষুর মতন। এখন এই কয়েকটা মাস তার সারা অঙ্গে যৌবনতরঙ্গ। আর যৌবনে খিদেও হয় সাঙ্ঘাতিক। অনবরত পাড় খায়, গাছপালা, বাড়ি-ঘর সমেত ভূমি গ্রাস করে নেয়। তবে শুধু এক দিকের পাড় খেয়ে তার আশ মেটে না, স্বাদ বদলের জন্য দু-তিন বছর পর আবার অন্য পাড় খায়। সেখানকার মাটির স্বাদ বুঝি আলাদা।

সন্ধে হয়-হয়, বদর-বদর করে ইদ্রিশ নৌকো ছেড়ে দিল। এরই মধ্যে চাঁদ উঠেছে, মেঘের ফাঁকে-ফাঁকে লুকোচুরি খেলছে। পাশাপাশি বসেছে ইরফান আর লায়লা। আজ ইরফান পরেছে সিল্কের সবুজ কুর্তা আর মাথায় ফেজটুপি, আর টুকটুকে লাল শাড়ি পরা লায়লা যেন সাক্ষাৎ এক হুরি, খোঁপায় গুঁজেছে সাদা ফুল। কী সুন্দর মানিয়েছে দুজনকে। তিন্নি একবার এদিক আর একবার ওদিকে মুখ ফিরিয়ে দেখছে নদীকে। বৈঠার আওয়াজের সঙ্গে-সঙ্গে পাড় ভাঙার অনবরত ঝুপ-ঝুপ শব্দও শোনা যায়।

খানিক বাদে লায়লা বলল, তিন্নি একটা ছড়া বল না। সেই শেয়াল পণ্ডিতের ছড়াটা।

তিন্নির লজ্জা হয়েছে, সে মুখ খোলে না। ফিকফিক করে হাসে। সে আজ সিনেমা দেখবে, আর কত লোক দেখবে তার শাড়ি পরা চেহারা।

ফিরতে রাত হবে, তাই সঙ্গে আনা হয়েছে পরোটা আর আলুভাজি। খানিক বাদে খাওয়া হল সেসব। লায়লা যত্ন করে তিন্নিকে খাওয়াল, বলল, আর একটা পরোটা নে তিন্নি, এই তো এত ভাজি রয়েছে, কে খাবে? নে, নে!

কয়েক বোতল ভরতি পানিও আনা হয়েছে, তাতেই হাত ধুয়ে খানিকটা গলায় ঢেলে নিল ইরফান আর লায়লা। তিন্নি হাত ধোয়ার জন্য ঝুঁকে নদীতে হাত ডোবাল।

তখনই একখণ্ড কালো মেঘ ঢেকে দিল চাঁদটাকে। একেবারে আঁধার হয়ে গেল চারিদিক।

ইরফান ফিসফিস করে বলল, দে ইদ্রিশ, এবার।

ইদ্রিশ পানি থেকে বৈঠা তুলে খুব জোরে একটা ঘা মারল তিন্নির ঘাড়ে। তারপর পাছার তলায় হাত দিয়ে ঠেলা মারল। তিন্নি উলটে পড়ে গেল নদীতে। গুপুস করে একটা শব্দ হল শুধু।

তারপর কিছুক্ষণ তিন জনই নিশ্চল। নৌকোও স্থির। কোনও শব্দ নেই। কালো মেঘটা সরে গিয়ে আবার ফুটল একটু ফ্যাকাসে জ্যোৎস্না। দূরে-দূরে দেখা যাচ্ছে আর কয়েকটা নৌকোর আলোর বিন্দু। মেয়েটা একেবারে তলিয়েই গেছে।

ওইটুকু একটা প্রাণ, গেল কী থাকল, তাতে পৃথিবীর কী-ই বা আসে যায়। এমন তো কতই যায় হর রোজ। তিন্নির জন্য শোক করার কেউ নেই, বরং সে ডুবে গিয়ে কিছু মানুষের জীবনে স্বস্তি এনে দেবে।

কিন্তু হঠাৎ অন্য রকম প্রতিক্রিয়া হল লায়লার।

নৌকো যখন লখার মাঠের কাছাকাছি এসে গেছে, দেখা যাচ্ছে সিনেমাওয়ালাদের আলো, শোনা যাচ্ছে উৎসুক জনতার মৃদু গুঞ্জনধ্বনি, সেই সময় লায়লা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, মেয়েটাকে খতম করে দিলে, অ্যাঁ? সিনেমা দেখবে, কত আশা করেছিল, হায় আল্লা, এ কী করলে তোমরা?

পরিকল্পনাটা সবই জানত লায়লা, সে সম্মতি জানিয়েছিল, এখন সে দুষতে লাগল তার স্বামী আর ইদ্রিশকে! শুধু তাই নয়, সে এমনই বিকৃত গলায় চিৎকার করতে লাগল যে তাকে সামলানোই এখন কঠিন। ইরফান তাকে জড়িয়ে ধরলেও সে ছিটকে সরে যেতে চায়। সর্বনাশ, এখন জানাজানি হলেই যে সকলের হাতে দড়ি পড়বে। লায়লাও ছাড়া পাবে না।

সিনেমা দেখার আর প্রশ্নই ওঠে না, নৌকোর গলুই ঘুরিয়ে দিল ইদ্রিশ। লায়লাকে জোর করে শুইয়ে তাকে চেপে ধরে রইল ইরফান, পাশ দিয়ে দু-একটা নৌকো যাচ্ছে, তারা কেউ অবশ্য লায়লার গোঙানি শুনতে পায়নি।

ফিরে আসা হল ভালোয়-ভালোয়। ঘাটে নেমে নিজেই খুব চেঁচিয়ে কান্না শুরু করল ইরফান। এখন সব লোককে জানান দিতে হবে। বাড়িতে এসেও শুরু হল কান্নার রোল, সেতারাও যোগ দিল তাতে। এটাই নিয়ম, মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে সকলকেই কান্নার জোকার তুলতে হয়।

দু-দিন পর এ বাড়িতে এলেন পুলিশের দারোগা নিয়ামত খান। এ গ্রামে থানা নেই, দারোগা এসেছেন নবিগঞ্জ থেকে। নিয়ামত খানের দশাসই চেহারা, বদমেজাজি, সবসময় মুখে পান। সবাই জানে, এ দারোগা যেমন ঘুষখোর, তেমনই স্বেচ্ছাচারী। সরকার কিংবা সংবিধান থাকেন অনেক দূরে, এখানকার পুলিশদের ওপরওয়ালা কেউ নেই, এখানে কর্তার ইচ্ছেতেই সব কর্ম হয়।

উঠোনেই একটা কুর্সি পেতে দেওয়া হল নিয়ামত খানের জন্য। মুখ ভরতি পান, তবু তিনি একটা সিগারেট ধরালেন। দিলারার আত্মহত্যার পরও তিনি একবার এসেছিলেন, নিয়মরক্ষার জন্য আসতেই হয়। তখন বে-আইনি কিছু পাননি, তবে কোনও বাড়িতে এলেই কিছু প্রণামী তার পাওনা হয়, তা পেয়েছিলেন, ঠিকঠাক রিপোর্ট দিয়েছিলেন।

এবারের ঘটনা একটু আলাদা।

গ্রামের আর দশ জনের মধ্যে যে একজন, সে যদি হঠাৎ আঙুল ফুলিয়ে কলাগাছ হয়, তবে তার সম্পর্কে অন্য ন'জনের রাগ কিংবা ঈর্ষা হবে না? এটাই তো মানুষের স্বভাবধর্ম। তাও লোকটির ব্যবহার না বদলালে অন্যরা মেনে নিতে পারত, কিন্তু বিনা উপার্জনের সম্পদে বিষ থাকবেই। সেই বিষে মাথা বিগড়ে দেয়। চতুর্দিকে এখন আলোচনা চলছে, ইরফান আর লায়লা নিজে তাদের আগের পক্ষের মেয়ে তিন্নিকে খুন করেছে। সরিয়ে দিয়েছে পথের কাঁটা।

এরকম জনমতের চাপে পুলিশকে কিছু করতেই হয়। তাই তো এসেছেন নিয়ামত খান। কিন্তু তিনি অনুত্তেজিত। ডাকাতি নয়, দু-চারটে লাশ পড়ে যাওয়ার ব্যাপার নয়, একটা বাচ্চা মেয়ের উধাও হওয়ার ঘটনা, তার জন্য আর কত সময় দেওয়া যেতে পারে।

উঠোনের কুর্সিতে বসে সিগারেট টানতে-টানতে নিয়ামত খান ইরফানকে জিগ্যেস করলেন,

বলো দেখি বৃত্তান্তটা। সন্ধে থেকে পরপর কী হল?

এর মধ্যে অন্তত একশোবার মনে-মনে ঘটনার পুনরাবৃত্তি করেছে ইরফান। প্রথম রাত্তিরে সে তো ঘুমোতেই পারেনি। সুতরাং বর্ণনা দিতে ইরফানের কোনও অসুবিধে হল না।

মাঝে-মাঝে মাথা নাড়তে লাগলেন নিয়ামত খান। যেন তিনি সব বুঝতে পারছেন। একটা দুরন্ত ছটফটে মেয়ে বেশি ঝুঁকেছিল নদীর পানিতে হাত ডুবিয়ে, সে তো পড়ে যেতেই পারে। এরকম দুর্ঘটনা মাঝে-মাঝেই ঘটে। বর্ষার নদীতে সকলকেই সাবধান হতে হয়। এ কেসে বাপ-মায়ের কোনও ক্রিমিনাল অফেন্স তো প্রমাণ করা যায় না।

নিয়ামত খান ভোজনরসিক, তাঁর জন্য খাঁটি ঘিয়ের বিরিয়ানি রান্না করে রেখেছে সেতারা। সেই বিরিয়ানির প্লেট দেওয়ার আগে দারোগাবাবুর হাতে একটি মোটা খাম দিল ইরফান। খামটা একবার খুলে দেখলেন নিয়ামত খান, মনে হল হাজার দশেকের নোট। তিনি মৃদু হেসে খামটা রাখলেন প্যান্টের পকেটে। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল ইরফান।

মুখ তুলে উদারভাবে নিয়ামত খান বললেন, ইরফান সাহেব আপাতত আপনাদের নামে কোনও কেসই দাঁড়ায় না। তবু একবার আপনার বিবির সঙ্গে কি কথা বলা যেতে পারে?

ইরফান বলল, হজুর সেদিন থেকে আমার বিবি শয্যাশায়ী। খুব ভালোবাসতেন তো মেয়েকে। কারও সঙ্গে বাতচিৎ করছেন না, শুধু কাঁদছেন। তবু যদি আপনি চান—

নিয়ামত খান হাত তুলে বললেন, থাক, থাক। এরকম সময় জেরা করা খুবই ইনহিউম্যান, বুঝতেই তো পারছি তাঁর মনের অবস্থা। থাক, থাক।

তারপর তিনি নীচু গলায় বললেন, ইরফান সাহেব, এখন কয়েকটা দিন বাড়ি থেকে আর নাইবা বেরোলেন। চুপচাপ থাকুন। পাড়ার লোক নানা কথা বলবে, কান দেবেন না।

উঠে দাঁড়িয়ে চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়েও তিনি থেমে গেলেন। হঠাৎ মনে পড়ার মতন তিনি বললেন, ইদ্রিশ আলি গেল কোথায়? তার সঙ্গে যে একটু কথা বলতে হয়।

ইদ্রিশ ডিউটি দিচ্ছে খেয়াঘাটে। দারোগা নির্দেশ দিয়ে গেলেন, সে যেন এক ঘণ্টার মধ্যে থানায় গিয়ে হাজিরা দেয়।

আকাশ কাঁপিয়ে বাজ ডেকে বৃষ্টি নামল একটু পরে। খবর এল, নদী দুটো তালগাছ খেয়েছে এক ঘণ্টা আগে। একটা আখের খেতেরও যায়-যায় অবস্থা। নদীর বুঝি এখন মিষ্টি খাবার সাধ হয়েছে। বাধা দেওয়ার কোনও উপায়ই নেই।

মাথায় একটা টোকা দিয়ে বৃষ্টির মধ্যেই ইদ্রিশ যখন থানায় পৌঁছোল, তখন দারোগাবাবু অফিসঘরে টেবিলের ওপর দু-পা তুলে চুরুট টানছেন। দোক্তাপান, সিগারেট, চুরুট এরকম একটা কিছু তামাকের নেশা তাঁর সব সময় লাগে। চুরুট টানতে-টানতে মাঝে-মাঝে ভালো লাগার আবেশে তাঁর চোখ বুজে আসে।

ইদ্রিশের আপাদমস্তক দেখার পর তিনি নরমভাবে বললেন, তুমি ঘাটোয়াল ইদ্রিশ মিঞা। আগে কখনও দেখিনি। তোমাদের তো বড় পরিশ্রমের কাজ। বসো, বসো, মিঞা। তোমাকে আমি বেশিক্ষণ আটকাব না। সেইদিন সন্ধের পর ঠিক কী-কী ঘটেছিল পর পর বলে যাও তো! আমাকে তো রিপোর্ট লিখতে হবে!

দু-দিন সময় পাওয়া গেছে, এর মধ্যে ইদ্রিশ আর ইরফান অনেকবার ঠিক করে নিয়েছে, যাতে দুজনের বয়ানে কোনও অমিল না থাকে। ইদ্রিশের বুদ্ধি তেমন তীক্ষ্ণ নয়, তা সে পুরো বিবরণটি প্রায় মুখস্থ করে নিয়েছে। তোতাপাখির মতন গড়গড় করে বলে গেল সব।

মাঝপথে একবারও বাধা দিলেন না নিয়ামত খান। যেন তিনি সন্তুষ্ট। এবার নিশ্চিন্ত রিপোর্ট দিয়ে দিলেই হয়। কিন্তু তিনি চুরুটটা নিভিয়ে সোজা হয়ে বসলেন। ইরফানকে তিনি কোনও জেরা করেননি, কিন্তু ইদ্রিশের কাছে একই কাহিনি শোনার পর তিনি জিগ্যেস করলেন, ইদ্রিশ সাব, একটা

বাচ্চা মেয়ে পানিতে তলিয়ে গেল, আর আপনারা তাকে বাঁচাবার কোনও চেষ্টা করলেন না? লোকে তো এই কথা জানতে চাইবেই।

ইদ্রিশ উত্তেজিত হয়ে বলল, চেষ্টা করিনি? কী বলছেন সাব! আমি মেয়েটারে ধরবার জন্য তৎসাথেই নদীতে লাফ দিয়েছি। খানিক দূরে রতন সাউয়ের না ছিল, আমার হাঁক শুনে সে কাছে আসে। সে সব জানে। তাকে জিগ্যেস করবেন সার।

নিয়ামত খান বললেন, আপনি নদীতে লাফাবেন, সে তো স্বাভাবিক। সারা জীবন পানির সঙ্গে সহবাস, আপনি তো পানির পোকা। তবু মেয়েটাকে বাঁচাতে পারলেন না!

ইদ্রিশ কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলল, বহুৎ আফসোস কি বাৎ হুজুর। এরকম মুসিবৎ আমার জীবনে কখনও হয়নি। অতটুকু মেয়ে পানিতে পড়ে গেল, আমি একটুও দেরি করিনি। তবু তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না! খোদা কা কেয়া মর্জি!

দারোগা বললেন, খোদার নামে অহেতুক দায় চাপিও না, ইদ্রিশ। তিন্নি পড়ে গেল নৌকোর ডান ধারে, আর তুমি লাফ দিলে অন্য ধারে, তাই না? তা হলে আর তুমি মেয়েটাকে পাবে কী করে?

দারুণ বিহ্বলভাবে ইদ্রিশ বলল, আপনি এসব কী বলছেন, হুজুর। ডান ধারে, অন্য ধারে, এসব তো আমি কিছুই বুঝছি না।

দারোগা বললেন, বিপদের সময় এসব মনে রাখাও শক্ত। আচ্ছা ইদ্রিশ, বলো তো, মেয়েটার লাশ গেল কোথায়? এইসব পানিতে ডোবা কেসে লাশ ভেসে ওঠে। তিন্নির কী হল?

ইদ্রিশ নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়ে, পুলিশের সামনে একজন সাধারণ মানুষের নাগরিক অধিকার সামলে নিয়ে বলল, সে আমি কেমনে জানব? নদীর গর্ভে কত কী তলিয়ে যায়। এখন আবার কুমির-কামঠের উপদ্রব শুরু হয়েছে। কোনও কামঠই ওকে টেনে নিয়ে গেছে মনে হয়।

নিয়ামত খান আর-একটা সিগারেট কিংবা চুরুট খোঁজার জন্য এ-পকেট সে-পকেট হাতড়িয়ে তারপর সামনের একটা রেকাবি থেকে এক খিলি পান মুখে দিয়ে আধ মিনিট সময় নিলেন।

তারপর বললেন, কামঠে নিয়ে গেছে। কামঠ-কুমির আছে জেনেও তুমি কেন পানিতে ঝাঁপ দিলে? তোমার প্রাণের মায়া নেই?

ইদ্রিশ বলল, হুজুর, গরিবের তো প্রাণের বিপদ প্রতি পদে-পদে। ওসব ভাবলে কী চলে?

এরকম একটা আপ্তবাক্য শুনেও হা-হা করে হেসে উঠলেন নিয়ামত খান। আপন মনে বললেন, যাত্রা আর টিভি সিরিয়ালের এমন ডায়ালগ সবাই শিখে গেছে।

তারপর তিনি হাঁক দিলেন, দরোয়াজা!

একজন সেপাই পাশের ঘরের দরজা খুলে দিল। নিয়ামত বললেন, ইদ্রিশ ওই দিকে ভালো করে দ্যাখো!

ইদ্রিশের তখন ভূত দেখার মতন অবস্থা।

সে ঘরের একটা টুলে বসে আছে তিন্নি, তার মাথায় একটা ব্যান্ডেজ। সে একটা ভুট্টার দানা খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে!

ইদ্রিশের মুখে আর কোনও কথা নেই।

নিয়ামত খান বললেন, তুই ওর মাথায় মেরেছিলি। আঘাতটা তেমন-তেমন জোর হয়নি। তোরা ভেবেছিলি, ও মরেই গেছে! তুই কিংবা তোর মুরুব্বিরা কেউ জানতই না যে তিন্নি এই বয়েসেই সাঁতার শিখে নিয়েছে। যে সাঁতার জানে, সে জ্ঞান থাকলে ডুবে মরে না! বুঝলি?

ইদ্রিশ বিস্ফারিত চক্ষে চেয়ে রইল।

নিয়ামত বললেন, ও মেয়েটার যদি মৃত্যু হত, তা হলে তোরও নির্ঘাত মৃত্যুদণ্ড হত, বুঝলি? মৃত্যু ঘটাবার চেষ্টাও বিরাট অপরাধ। বছরদশেক তোকে ঘানি ঘোরাতে হবে তো নিশ্চিত।

ইদ্রিশ বলল, ঠিকই তো!

নিয়ামত একটু কৌতূহলভরে জিগ্যেস করলেন, কী বললি? কী ঠিকই তো?

ইদ্রিশ বলল, আমি পাপী হুজুর। অর্থলোভে এ কাজ করেছি। নিজের ছেলের চিকিৎসার কথা ভেবে, না, হুজুর, কোনও কারণেই অপরের প্রাণ নেওয়া যায় না। আমার যা হয় হোক হুজুর, আমি তিন্নির মৃত্যুর জন্য দায়ী, আমাকে শাস্তি দিন।

নিয়ামত বাঁকা সুরে বললেন, এখন ধরা পড়ে তুই শালা আমাদের মন ভেজাবার চেষ্টা করছিস। শাস্তি তোকে পেতেই হবে। ওসব অভিনয় আমরা অনেক দেখেছি। ইরফানের কাছ থেকে যা টাকা পেয়েছিস, সব লুকিয়ে রেখেছিস অন্য জায়গায়। তোর ছেলে-মেয়েদের তুলনায় তিন্নির জীবনের বুঝি কোনও দাম নেই?

ঘুষখোর, বাজখাঁই ধরনের দারোগা নিয়ামত খান তিন্নিকে ডেকে আনলেন সামনে। তার দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে বললেন, ওয়ান্ডার। লাইফ ইজ ফুল অফ ওয়ান্ডার্স।

হরিদেবপুর শ্মশানে সবাই প্রথমে তিন্নিকে প্রেতযোনিই ভেবেছিল।

তখন মধ্যরাত্রি। এ সময়ে শ্মশানে কোনও শবদেহ আসেই না বলতে গেলে, কিন্তু বেশ কিছু গেঁজেল সেখানে আড্ডা মারে। দুজন সাধুর আখড়ায় ধুনি জ্বলে।

সেই সময় নদী থেকে উঠে আসা এক জীবের ক্রন্দনশব্দ শুনে শ্মশানচারীরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল। হামাগুড়ি দিয়ে আসছে প্রাণীটি, মনুষ্য আকৃতি, শরীরে এক বিন্দু সুতো নেই, রক্ত-কাদা মাখা, মাঝে-মাঝে থামছে আর ফোঁপাচ্ছে।

সাঁতার জানে বলেই বেঁচে এসেছে তিন্নি, তার পরনের শাড়িটাড়ি কোথায় খুলে গেছে। চেহারাটাও তখন এমনই বীভৎস যে দেখলে ভয় লাগারই কথা। শেষপর্যন্ত সেই শ্মশানের লোকেই তাকে খাদ্য-বস্ত্র দিয়েছে। ব্যান্ডেজ বাঁধা হয়েছে মাথায়। আশ্রয় পেয়েছে বান্ধব সমিতিতে।

দু-দিন আগে যে সাক্ষাৎ যমের গ্রাস থেকে ফিরে এসেছে, তিন্নির মুখ দেখে তা বোঝার উপায় নেই। দিব্যি কামড়ে-কামড়ে খাচ্ছে ভুট্টার দানা।

বেশ কয়েক পলক তিন্নির দিকে তাকিয়ে থাকার পর নিয়ামত খান হুকুম দিলেন ইদ্রিশকে গারদে আটকে রাখার।

লায়লা না হয় সৎমা, কিন্তু ইরফান তো সাক্ষাৎ পিতা। সেই পিতা হয়ে সে নিজের কন্যাকে খুন করার ব্যবস্থা করেছিল, এরকম একটা ঘৃণ্য অপরাধের মূল আসামি তো ইরফানই। অথচ, কী আশ্চর্যের ব্যাপার, ওই স্বামী-স্ত্রীকে ধরার কোনও চেষ্টাই করলেন না দারোগা সাহেব।

যদিও তিনি ঘুষ খেয়েছেন, কত খেয়েছেন, তা জানতে থানার কারওরই বাকি নেই। ও ঠিক জানাজানি হয়ে যায়। কিন্তু অত বড় ক্রাইমের জন্য ওই সামান্য টাকা? অন্য সময় তিনি অন্যদেরও কিছু ভাগ দেন, এবার কিছু দিলেন না। অবশ্য ওই টাকার ভাগ-বাটোয়ারাই বা কী হবে! দারোগা সাহেব কি আরও কিছু আদায় করার আশায় আছেন?

পুলিশের কাজে যারা ঝানু হয়ে গেছে, তারাও জানে, শত ঘুষ দিয়েও সব অপরাধ চাপা দেওয়া যায় না। পাবলিক খেপে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই মাঝে-মাঝে কিছু কাজ দেখাতেই হয়। এটাও একটা বেশ বড় ঘটনা। হাটে-বাজারে মানুষজন এ নিয়েই কথা বলছে, তাদের চুপ করানো যাবে না, দারোগা সাহেব তা বুঝছেন না কেন?

হলও তাই। পরদিনই চার-পাঁচজন লোক সঙ্গে নিয়ে থানায় এলেন নিখিল মাস্টার। দারোগা সাহেবের সঙ্গে তার আলাপ আছে, ভালোই সম্পর্ক। কিন্তু এখন উত্তেজিতভাবে, চক্ষুলাল করে, তেতেফুঁড়ে বললেন, এটা আপনি কী করছেন বলুন তো। একটা বাচ্চা মেয়ে খুন হতে যাচ্ছিল।

সেই খুনিদের আপনি ধরবেন না? তাদের শাস্তি হবে না?

বেশিক্ষণ পা ঝুলিয়ে বসলে নিয়ামত খানের পা ফুলে যায়। তাই টেবিলের ওপর পা তুলে বসা তাঁর অভ্যেস।

নিখিল মাস্টারকে দেখে তিনি পা নামালেন। শান্তভাবে বললেন, খুনি বলছেন কাদের? খুনটা হল কোথায়? মেয়েটা তো দিব্যি বেঁচে আছে।

আরও রেগে গিয়ে নিখিল মাস্টার বললেন, মেয়েটা বেঁচে আছে ওর আয়ুর জোরে। ওকে মেরে ফেলতেই চেয়েছিল। মাথায় আঘাত করেছে, ভরা নদীতে ফেলে দিয়েছে, ইনটেনশান টু মার্ডার। এটা ক্রাইম্ নয়? এর জন্য লাইফ টার্ম হতে পারে!

নিয়ামত খান বললেন, দাঁড়ান, দাঁড়ান, অত চিৎকার করছেন কেন? আপনারা সবাই বসুন। নৌকোয় ছিল তিন জন অ্যাডাল্ট, আর ওই খুকি। বড়রা তিন জনই বলছে, এটা দুর্ঘটনা। শুধু ওই বাচ্চা মেয়ের কথায় ক্রাইম প্রমাণ করা যাবে? বাবা আবার বিয়ে করলে অনেক ছেলেমেয়েই তা মেনে নিতে পারে না। তারা বানিয়ে-বানিয়ে মিথ্যে কথা বলে।

টেবিলের ওপর প্রচণ্ড চাপড় মেরে নিখিল মাস্টার বললেন, আপনি বায়াস্‌ড। আপনি ঘুষ খেয়েছেন।

দু-দিকে মাথা নাড়তে-নাড়তে জিভ দিয়ে চুকচুক শব্দ করে দারোগা বললেন, উঁহু। না, না, হাতে-হাতে ধরা না পড়লে ঘুষ খাওয়ার অভিযোগ করাটা কি ঠিক? এটা কি ভদ্রতাসম্মত স্যার?

নিখিল মাস্টার বললেন, রাখুন আপনার ভদ্রতা! একটা নিষ্পাপ মেয়ে, অতটুকু বয়েস, তাকে ওরকম নৃশংসভাবে হত্যার চেষ্টা, তাও নিজের বাবা, এরকম খুনি বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াবে? আপনারা কিছু করবেন না?

দারোগা বললেন, কী করব বলুন মাস্টার সাহেব, আইন তো অন্ধ, প্রমাণ ছাড়া কিছুই বোঝে না! দেখুন যদি আপনারা কিছু করতে পারেন।

নিখিলের পাশ থেকে আর একজন বললেন, আমরা তো ব্যবস্থা নেবই। জনগণ ওকে ছাড়বে না!

গভীর সন্তুষ্টির সঙ্গে দারোগা সাহেব বললেন, আজকাল তো জনগণই ভরসা।

তারপর তিনি অকারণে হাসলেন।

সেইদিনই দুপুরের দিকে ধেয়ে গেল কয়েকশো মানুষ ইরফানের বাড়ির দিকে। ইরফান আর লায়লা দুজনকেই টেনে ছিঁচড়ে নিয়ে গেল নদীর ধারে অর্ধেক ইস্কুল বাড়ির পাশে। সেখানে শুরু হল সালিশি সভা।

দারোগা সাহেব আজ একবারও বেরোননি। হঠাৎ আজ অস্বাভাবিক গুমোট, সবাই ঘামছে দরদর করে। দারোগা সাহেব পুরো দস্তুর পোশাক পরে আছেন বটে, কিন্তু বুকের বোতামগুলো সব খোলা।

বিকেলবেলায় তাঁর জলখাবার মুড়ি আর তেলেভাজা। টেবিলের ওপর খবরের কাগজ পেতে ঢালা হয়েছে আড়াইশো মুড়ি। মাখা হয়েছে সর্ষের তেল দিয়ে, আনানো হয়েছে গরম-গরম ফুলুরি আর আলুর চপ। আর কাঁচালঙ্কা-পেঁয়াজ। দারোগা সাহেব টিয়াপাখির মতন কচকচ করে লঙ্কা খেতে পারেন।

তিনি এস.আই. নিত্যলাল সাহাকেও ডেকে নিলেন।

নিত্যলাল খুবই ঢ্যাঙা, ছ'ফুটের বেশি, গায়ের জামা ঢলঢল করে। তার চোখ দুটো লাল থাকে সব সময়, কিন্তু সে গাঁজা খায় না, কোনও রোগ আছে চোখের।

এক গাল মুড়ি চিবোবার পর নিত্যলাল বলল, আজ যেখানে ইস্কুল বিল্ডিং ফান্ডের মিটিং ছিল দুপুরে, সেখানেই এখন চলছে সালিসি সভা।

দারোগা সাহেব বললেন, হুঁ।

নিত্যলাল বলল, দুটো গাধা জোগাড় করেছে। একটা নাপিতকেও বসিয়ে রেখেছে সেখানে। ওদের ভয় দেখানো হচ্ছে, শাস্তি হিসেবে দুজনের মাথা ন্যাড়া করে ঘোল ঢেলে উলটো গাধায় চাপিয়ে দু-তিনখানা গাঁ ঘোরাবে। ওরা কিছুতেই দোষ স্বীকার করছে না।

লঙ্কায় কামড় দিয়ে দারোগা সাহেব বললেন, তাই বুঝি?

নিত্যলাল বলল, স্যার একটা কথা জিগ্যেস করব? এখন নদীর যা তেজ, সাঁতার না জানলে বাচ্চা মেয়েটা নির্ঘাত ডুবে মরত। খুনের অভিযোগ স্পষ্ট। তবু আমরা ওই স্বামী-স্ত্রীর বিরুদ্ধে কোনও অ্যাকশান নিলাম না, ঠিক মতন এনকোয়ারিও করা হল না, তা নিয়ে পাবলিক নানা কথা বলাবলি করছে। অনেক লোক খুব ক্ষেপে আছে। সালিসিতে হঠাৎ যদি মারধর শুরু করে, গণধোলাইতে ইরফান আর তার বউকে যদি একবারে মেরেই ফেলে, তা হলে আমাদের থানার নামে—

একটা হাত তুলে প্রশান্তভাবে দারোগা বললেন, মারবে না, মারবে না। ওরা বড়লোক। বড়লোক কখনও গণধোলাইতে মারা যায় শুনেছ? কক্ষনও না। গরিব মানুষদেরই পিটিয়ে মারা সহজ!

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে নিত্যলাল আবার বলল, আপনি আসল কালপ্রিটকে কিছু বললেন না, আর ইদ্রিশ মিঞাকে আটকে রাখলেন, মানে, এতে লোকের মনে, কয়েকজন আমাকে শুনিয়ে-শুনিয়ে বলেছে, ইদ্রিশ একটা গরিব মানুষ, ওর টাকাপয়সা খরচা করার সামর্থ্য নেই, তাই পুলিশ ওকে শাস্তি দিচ্ছে। আর ওর মালিকরা—

এবারে হাত তুলে নিত্যলালকে থামিয়ে দিয়ে দারোগা সাহেব বললেন, এসব কথা লোকে বলছে, না তুমি নিজেই আমাকে বলছ? তোমার বিবেক চেগে উঠেছে? তা হলে তোমার বিবেকবাবুকে বলো একটু বুদ্ধি খাটাতে। ইদ্রিশ গরিব বলেই তাকে আটকে রেখেছি, তা ঠিক। কিন্তু কেন? ইদ্রিশই মেয়েটার মাথায় ডাণ্ডা মেরেছে, এ কথাটা জানাজানি হলে লোকের রাগ প্রথমেই এর ওপর গিয়ে পড়ত। একদল লোক ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওকে চিঁড়ে-চ্যাপটা করে দিত যদি? আমরা ওকে বাঁচাতে পারতাম? ওকে বাঁচাবার জন্যই গারদে ভরে রেখেছি। আরও বলছি শোনো—দেশলাই আছে? দাও! ফস করে একটা সিগারেট ধরিয়ে দারোগা বললেন, ওই ইরফান হারামজাদা আর ওর ওই ছেনালি বউটার নামে অনেকগুলো কেস সাজিয়ে কাঠগড়ায় তোলা যেত ঠিকই। কিন্তু খুন তো হয়নি, তাই ওদের ফাঁসি হত না, বড় জোর আট-দশ বছরের মেয়াদ। তাতে ওদের কী আর এমন শাস্তি হত? আট বছর পর ড্যাংডেঙিয়ে জেল থেকে বেরিয়ে আবার সুখের পায়রা ওড়াত। আসল শাস্তি হত কার? ওই মেয়েটার? এই আট-দশ বছর সে কোথায় থাকত, কে তাকে খেতে দিত? এ যুগে কেউ বেশি দিন স্নেহ, দয়া, মায়া দেখায় না! পয়সা চাই, পয়সাটাই আসল, বুঝলে? এখন জনসাধারণের যুগ, জনসাধারণকেই কেসটা হ্যান্ডল করতে দাও। বিবেককে ঘুম পাড়িয়ে রেখে আরও দুটো আলুর চপ খাও আর চায়ের ব্যবস্থা দ্যাখো।

নিত্যলাল চুপ করে গেল বটে, কিন্তু মুখ দেখে মনে হয়, এখনও তার মনটা যেন খুঁতখুঁত করছে। থানার উপরি রোজগার যখন ভাগ-বাটোয়ারা হয়, তখন সেও কিছু পায়, তখনও তার মন খুঁতখুঁত করে!

যেখানে সালিসি সভা বসেছে, সেখান থেকে থানার দূরত্ব বড় জোর মাইল দু-এক। ঘনঘন সেখানকার খবর এসে পৌঁছোচ্ছে থানায়। দারোগা সাহেবের কড়া নির্দেশ, কোনও পুলিশ সে সভার ধারে-কাছে যাবে না। এখন পুলিশের ওপর মানুষের খুব রাগ।

সন্ধের দিকে খবর এল, সালিসি সভায় খুব শোরগোল চলছে, কী যেন একটা মিটমাট হয়েছে, দোষ স্বীকার করেছে স্বামী-স্ত্রী। রসগোল্লা আসছে বিষ্টু ময়রার দোকান থেকে।

একথা শোনা মাত্র উঠে দাঁড়িয়ে দারোগা সাহেব বললেন, রসগোল্লা? তার মানে তো নিশ্চিত

খোসখবর। রসগোল্লা খেলে সকলেরই মেজাজ ভালো হয়ে যায়, তখন আর পুলিশের ওপরেও রাগ থাকে না।

কোমরের বেল্ট আঁটতে-আঁটতে তিনি হেঁকে বসলেন, চল হে নেত্যলাল, আমরাও রসগোল্লা খেয়ে আসি। তবে গানটাও সঙ্গে নিও, বলা তো যায় না।

নিজের রিভলভারটাও তিনি গুঁজে নিলেন।

এ থানার একটা গাড়ি ছিল বটে, অনেকদিন আগেই সেটা বরবাদ হয়ে গেছে। নতুন গাড়ির স্যাংশান হয়নি।

তবে, দারোগা সাহেবের নিজস্ব মোটরবাইক আছে। নিত্যলালকে চাপিয়ে নিলেন পিছনে।

জিপগাড়ির চেয়েও মোটরবাইকের আওয়াজের দাপট বেশি। পুরো জনতার দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত হল পুলিশদ্বয়ের দিকে।

স্কুলবাড়ির আধখানা চলে গেছে নদীগর্ভে, বাকি অর্ধেক ঝুলছে বলা যায়। একটা বড় আমগাছ কাত হয়ে পড়েছে, তার শেকড় থেকে খসে গেছে অনেকটা মাটি। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, গাছটা যেন বাঁচবার জন্য আর্তভাবে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু তাকে বাঁচাবার কোনও উপায় নেই।

লালু শালুতে স্কুল বিল্ডিং ফান্ড কমিটির আবেদন লেখা নিশানা বাঁধা আছে দুটো বাঁশের খুঁটিতে। সামনে দুটো চৌকি পাতা, সেটাই মঞ্চ। স্কুলের মিটিং হয়ে গেছে দুপুরে, সেটা বিশেষ জমেনি, সালিসি সভার জন্য শেষ করে দিতে হয়েছে তাড়াতাড়ি। একটা ক্যানেস্তারায় কিছু পঞ্চাশ-একশো টাকার নোট পড়ে আছে। এইসব সভায় বক্তারা গলা ফাটিয়ে নিজেদের সরকারকে বাঁচিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের মুণ্ডপাত করে, নিজেদের পকেট উপুড় করতে চায় না।

সেই মঞ্চের ঠিক সামনে ধরা পড়া চোরের মতন মুখ নীচু করে বসে আছে ইরফান আর লায়লা। শোনা যাচ্ছে একটু-একটু ফোঁপানির শব্দ। দু-হাঁড়ি রসগোল্লা পৌঁছেছে সবে মাত্র।

কিছুক্ষণ আগেও মঞ্চের ওপর বসিয়ে রাখা হয়েছিল, এখন আর তাকে দেখা যাচ্ছে না, সে মিশে গেছে ভিড়ের মধ্যে।

দারোগা সাহেবকে দেখে এগিয়ে এলেন নিখিল মাস্টার। হাসি মুখে জিগ্যেস করলেন, খবর পেয়েছেন তো সব?

নিয়ামত খান বললেন, জনগণের বিচারে কী ফয়সলা হল?

নিখিল মাস্টার বললেন, মেয়েটা যখন প্রাণে বেঁচেই গেছে আর ওকে ভালোভাবে বাঁচিয়ে রাখাই আমাদের প্রধান কাজ, তাই দোষ স্বীকার করলেও ওর বাবা-মাকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হল না। ক্ষতিপূরণ আর জরিমানা দিতে রাজি করিয়েছি।

ভুরু নাচিয়ে নিয়ামত খান জিগ্যেস করলেন, কত?

নিখিল মাস্টার বললেন, ব্যাঙ্ক থেকে আগেই হিসেব আনিয়েছিলাম। এর মধ্যে অনেক টাকাই উড়িয়েছে। যা বাকি ছিল, স্কুল বিল্ডিং ফান্ডে দিয়েছে পঞ্চাশ হাজার। আর মেয়েটার নামে আড়াই লাখ। মোটামুটি আগের অবস্থায় ফিরিয়ে এনেছি। এখন থেকে ইরফান আলিকে আবার খেটে খেতে হবে। আর ফুটানি চলবে না।

ঊর্ধ্বনেত্র হয়ে দারোগা সাহেব হিসেব করলেন, আড়াই লাখ? ফিক্সড ডিপোজিট যদি ন'পার্সেন্ট হয়, তা হলে হলগে নয় দুগুনে আঠারো, আর সাড়ে চার, মানে সাড়ে বাইশ হাজার বছরে, প্রতি মাসে প্রায় দু-হাজারের মতন। যথেষ্ট। মেয়েটা থাকবে কোথায়?

নিখিল মাস্টার বললেন, ওই যে দেখছেন, একলাসউদ্দীন, টাক মাথা মানুষটি, স্কুলে আমার সহকর্মী, ওর স্ত্রী অতি ভালো মানুষ, দুটি ছেলেমেয়ে আছে, এ মেয়ে থাকবে ওদের বাড়িতে, সেখানে লেখাপড়া শিখে মানুষ হবে।

দারোগা সাহেব বললেন, বাঃ!

তারপরে নিখিল মাস্টার ও তিনি পরস্পরের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে ভুরু নাচালেন। যেন দুজনেই কোনও ষড়যন্ত্রের অংশীদার।

পরমুহূর্তেই তিনি মেজাজ পালটে গলা চড়িয়ে বললেন, টাকা দিয়েছে বলেই মাথা কিনে নিয়েছে নাকি? এত বড় অপরাধের শাস্তি হবে না? নাপিত চলে যায়নি তো? ও দুটোর মাথা কামিয়ে গাধায় চাপিয়ে ঘোরানো হোক।

কয়েক পা এগিয়ে তিনি পকেট থেকে দশ হাজার টাকার বাণ্ডিল সমেত খামটা অবহেলার সঙ্গে ফেলে দিলেন স্কুল বিল্ডিং ফান্ডের ক্যানেস্তারায়।

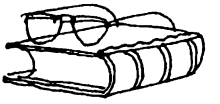

চূড়ামণি উপাখ্যান

ঘোড়ার পিঠে চেপে তারা আসে, শেষ রাত্তিরের দিকে। কোথা থেকে আসে আবার কোথায় চলে যায়, কেউ জানে না!

ঘোড়াগুলো ছোট হলেও দারুণ তেজী, চৈত্র মাসের ঝড়ের মতন হঠাৎ শোনা যায় তাদের আগমন-শব্দ। কিছুই সামাল দেওয়ার সময় পাওয়া যায় না, আবার উধাও হয়ে যায় চোখের নিমেষে।

সংখ্যায় তারা জনাছয়েকের বেশি নয়, যদিও বাড়ি ঘেরাও করার পর তারা এমনভাবে ছোটাছুটি করে যেন সবদিকেই কেউ-না-কেউ আছে, এক-একজনকেই মনে হয় অনেকজন। তবে প্রত্যক্ষদর্শীরা ঘোড়াগুলো গুনেছে।

এমন নয় যে তারা শুধু অমাবস্যার রাতে মিশমিশে অন্ধকারের মধ্যে লুকিয়ে-লুকিয়ে আসে। গত কোজাগরী পূর্ণিমায় ফুটফুটে জ্যোৎস্নার মধ্যে তারা এসেছিল। সেদিন পীতাম্বর গড়াই-এর বাড়িতে লক্ষ্মীপুজো। সারাদিন তুমুল ধূমধাম, সন্ধেবেলা কীর্তন গানের আসর বসেছিল, রাত্তিরে আত্মীয় কুটুমরা পাত পেড়ে খেয়েছে, সবাই বাড়ি ফেরেনি, থেকেও গেছে কয়েকজন। সব কাজকর্ম মিটিয়ে হ্যাজাক নেবাতে-নেবাতে রাত প্রায় একটা। ওরা এল তার প্রায় দু-ঘণ্টা পরে।

শেষ রাতের ঘুম বড্ড গাঢ় ঘুম। চোখ মেললেও সহজে চৈতন্য আসে না। কী হয়েছে বুঝতে-না-বুঝতেই সব শেষ। উঠোনে খাটিয়ে পেতে শুয়েছিল মোংলা, সে নাকি প্রথম থেকে সব দেখেছে। এবারে ঠান্ডা-ঠান্ডা ভাব এসে গেছে আগে আগেই, একটা কম্বল চাপা দিয়ে শুয়েছিল মোংলা, কপাকপ্-কপাকপ্ ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনে তার ঘুম ভাঙলেও সে ভেবেছিল বুঝি ঘুটিয়ারি শরীফে ঘোড়-দৌড়ের স্বপ্ন দেখছে। তারপর সেই আওয়াজ একেবারে তার ঘাড়ের ওপর এসে পড়তেই সে ধড়মড় করে উঠে বসল। কিন্তু খাটিয়া থেকে নামবারও সময় পেল না, একটা বিকট কালো মূর্তি দাঁড়াল তার বুকের ওপর এক পা চাপিয়ে। সেই পা জগদ্দল পাথরের মতন ভারী, তার ওপর মোংলার নাকের ডগার কাছে তরোয়াল।

মোংলার বর্ণনা মিথ্যে বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, কারণ তার কপালে রয়েছে তরোয়ালের খোঁচার ঘা, ডাকাতরা যাওয়ার সময় তার এক চোখের ওপর চাবুক মেরে গিয়েছিল, তারপর থেকে সে আর বাঁ-চোখটা খুলতে পারে না। তবু সেই অবস্থার মধ্যেই মোংলা অনেক কিছু দেখে ছিল। পীতাম্বর গড়াইয়ের বাড়ি মেটে বাড়ি হলেও দু-মহলা। ডাকাতরা সে বাড়ির অন্ধিসন্ধি সব আগে থেকেই জানে। তারা অন্য কোনও ঘরে খোঁজাখুঁজি করেনি, তাদের মধ্যে দুজন সোজা পীতাম্বরের

ঘরের সামনে গিয়ে দুই লাথিতে দরজা ভেঙেছে। পীতাম্বরের চুলের মুঠি ধরে খাট থেকে নামিয়ে তাকে শেষ করেছে এক কোপে, তারপর এক ঝটকায় বিছানা থেকে তোশকটা তুলে নিয়েছে। তারা জানত, পীতাম্বরের সব টাকা ওই তোশকের মধ্যে সেলাই করা।

পীতাম্বরের ঘরে যখন এইসব কাণ্ড চলেছিল, তার মধ্যেই মোংলা শুনতে পাচ্ছিল জল ছেটানোর শব্দ। কেউ যেন সারা বাড়িতে গোবর ছড়া দিচ্ছে। আসলে জলও নয়, গোবর ছড়াও নয়, ডাকাতদের একজন কেরোসিন ছিটিয়ে দিচ্ছিল। চটপট কাজ হাসিল হতেই আগুন লাগিয়ে দিল, গোটা বাড়ি জ্বলে উঠল একসঙ্গে।

এই রকম করে ওরা, যাওয়ার সময় আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে যায়, তাই কেউ আর ওদের পিছু ধাওয়া করতে পারে না। সবাই তখন প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত।

কেমন চেহারা ওই ডাকাতদের? মোংলার বর্ণনায় তাদের সকলেরই কুচকুচে কালো পোশাক, মুখও কালো কাপড়ে ঢাকা, তাই তাদের সকলকে একরকম দেখায়। তাদের বয়েস বোঝা যায় না। মোংলার মতে তারা 'শয়তানের জীব'। অনেকে এটা বিশ্বাস করে। কারণ, খলসেখালির রতুবাবু এ ডাকাতদের দিকে বন্দুক চালিয়েছিলেন বলে শোনা যায়, রতুবাবুর বন্দুকের জোর আছে, তিনি একবার একটা বাঘ মেরেছিলেন, ধান লুটের সময় দুটি মানুষও মেরেছিলেন, কিন্তু তাঁর গুলিতে ওই ডাকাতদের গায়ে আঁচড়ও লাগেনি, তাদের ঘোড়াগুলোও জখম হয়নি। এক পক্ষকাল পরে তারা ফিরে এসে রতুবাবুর বাড়ি জ্বালিয়ে তাঁর গলা কেটে দিয়ে গেছে।

ওরা যে শুধু ধনবান লোকদের বাড়িতেই টাকা লুট করতে আসে তাও নয়। হারুণ শেখ মানুষটা তেজী, কিন্তু তার ধন সম্পদ তো বিশেষ ছিল না। সেই হারুণ শেখের বাড়িতেও এক রাতে ডাকাত পড়ল। ঘোড় সওয়াররা হারুণ শেখকে শুধু খুন করেনি, তার হৃৎপিণ্ডটাই নাকি উপড়ে নিয়ে গেছে। এমন হৃৎপিণ্ড ওপড়াবার ঘটনা আরও শোনা যায়। আবার কোনও-কোনও বাড়িতে আসে ওরা যুবতী মেয়ে লুঠ করার জন্য। জীবন নায়েকের বাড়িতে পাঁচ ভরি সোনা ছিল। সে খবর ডাকাতরা পায়নি, সে বাড়ি থেকে জীবন নায়েকের সোমত্থ সুন্দরী বউটাকে শুধু তুলে নিয়েছে, অবশ্য সে বাড়িতেও আগুন জ্বালিয়ে যেতে ভুল করেনি।

অশ্বারোহী ডাকাতদের তাণ্ডবে গোটা তল্লাটের মানুষজনের রোম খাড়া হয়ে আছে। হাট-বাজারে, গঞ্জে এই ডাকাতদের কথা ছাড়া আর কোনও কথা নেই। গল্পও উড়ছে নানারকম। তবে আসল ঘটনাই এমন নৃশংস যে তার ওপর বেশি রং চড়াবার মতন কল্পনাশক্তি এদিককার মানুষদের নেই। রাত্তিরবেলা দূরে কোনও গ্রামে আগুন জ্বলে উঠলেই বোঝা যায়, এইমাত্র ডাকাতরা টগবগিয়ে চলে গেল। কোথায় যায় ওরা? এই প্রশ্নের কোনও হদিশ নেই বলেই অলৌকিক কথা মনে আসে। 'শয়তানের জীব', ওরা ঘোড়া সুদ্ধু ডুব দেয় গাঙের জলে।

এই নদী-নালার দেশেও ঘোড়ায় চড়ে ডাকাতি, ঘোড়া কোথায় এদেশে? বড়-বড় নৌকোয় যারা বিদেশ থেকে ব্যাবসা করতে আসে, তারা এই প্রশ্ন করে।

দিনেরবেলা ফনফন করে ওড়ে নোনা বাতাস, পাতলা রোদ্দুরে দুলে-দুলে উড়ে যায় বগেরি পাখির ঝাঁক, মাছ ধরা ডিঙিগুলো রূপোলি জলে ছায়া ভাসে। রাত্তিরের ওই বিভীষিকা তখন মনে হয় অলীক।

হ্যাঁ, এই জল-কাদার দেশে ঘোড়া আছে। এখানে জঙ্গলে আছে বাঘ, জলে আছে কামোঠ-কুমির। কিন্তু ঘোড়া এমনই তেজী প্রাণী যে সাঁতরে নদী পার হয়ে যায়, কুমির কামোঠ তাকে ছুঁতে পারে না। জঙ্গলের বাঘ নাগাল পাওয়ার আগেই ঘোড়া জঙ্গলের পথ কাবার করে দেয়। তাই বর্ধিষ্ণু লোকেরা কেউ-কেউ ঘোড়া রাখে। বনমালি ডাক্তার ঘোড়ায় চেপে রুগি দেখতে যান। তা ছাড়া ঘুটিয়ারি শরীফে ঘোড়দৌড় হয়। ইস্কুল ডাঙার মাঠে সত্যিকারের ঘোড়দৌড়, প্রতি হাট-বারে, দশ-টাকা বিশ-টাকার বাজি থাকে প্রতি দৌড়ে। সাত-আটটা ঘোড়া দৌড়োয়, বেশ

কিছু টাকার লেনদেন হয়।

প্রথমে সন্দেহ হয়েছিল, ওই ঘোড়দৌড়ের ছেলেগুলিই বুঝি ডাকাতি শুরু করেছে। কিন্তু এই ছোঁড়াগুলো যে বড়ই বাচ্চা। এদিককার ঘোড়াও বেশ ছোট, প্রায় গাধার সঙ্গে উনিশ বিশ, বয়স্ক মানুষদেরও বহন করতে পারে বটে কিন্তু তাহলেও ছোটার গতি থাকে না। তাই ঘোড়দৌড়ের সওয়াররা সবাই পাতলা চেহারায় কিশোর। যে ছোঁড়াটা প্রায় প্রতিবারই ফার্স্ট হয়, সেই কামরুল তো অন্যান্য দিন কাজ করে বাজারের মুদিখানায়। রোগা ডিগডিগে শরীর, মুণ্ডুটা বড়, মনে হয় এক চড় মারলে ঘুরে পড়ে যাবে। কিন্তু ওই কামরুলই যখন ঘোড়া ছোটায়, কী তার তেজ, মাথার চুলগুলো সব খাড়া হয়ে যায়, বাতাসের বেগকেও যেন সে জয় করে নিতে পারে, ছপটি মারতে-মারতে এক-এক সময় সে যেন দাঁড়িয়ে পড়ে ঘোড়ার পিঠে। কামরুলের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর নাম বলরাম, কালু মিস্তিরির ছেলে, তার সারা গায়ে পাঁচড়া হলে কী হয়, গলার জোরেই সে তার ঘোড়াকে ক্ষেপিয়ে ছোটায়।

এই কামরুল, বলরাম, আনিসুল এরা কী ডাকাত হতে পারে?

অনেকে বলাবলি করতে লাগল, আজকাল গুঁড়ো-গাঁড়াদেরও বিশ্বাস নেই। দিনকাল পালটে গেছে। এখন মায়ের পেট থেকে পড়তে-না-পড়তেই এরা বুলি শেখে। দশ-এগারো বছর বয়েস হতে-না-হতেই টাকা পয়সা চিনে যায় খুব, মুখে শোভা পায় জ্বলন্ত বিড়ি। বগলে চুল গজাবার আগেই এরা মেয়েলোকদের দিকে নজর দিতে শুরু করে। চৌদ্দ বছর বয়েসেই এক-একজন লায়েক।

এদের চেহারা ডাকাতসুলভ না হলেও এদের সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি সন্দেহের কারণ এদের অশ্বশক্তি। এমন জোরে ঘোড়া ছোটাতে তো আর কেউ পারে না এ তল্লাটে। ইস্কুল মাস্টার মধু নস্কর জনসাধারণের প্রতিনিধি হয়ে থানা পুলিশের কাছে আর্জি জানালেন এই ছোঁড়াগুলোর বিরুদ্ধে। ঘুটিয়ারি শরীফের ঘোড়দৌড়ে প্রতি হাটবারে অনেক চাষী তাদের রক্তজল করা পরিশ্রমের টাকা জলাঞ্জলি দেয়। লাভের টাকা যায় ঘোড়ার মালিকদের ঘরে। যে ছোঁড়াগুলো ঘোড়া ছোটায় তারা পায় মাত্র দশ টাকা করে, তবু ওই ছোঁড়াগুলোর ওপরেই মধু নস্করের রাগ বেশি।

এক হাটবারে পুলিশ এসে ঘোড়দৌড় মাঝপথে থামিয়ে কামরুল, বলরাম, কাদের, এককড়ি, আনিসুল সবাইকে কোমরে দড়ি বেঁধে ধরে নিয়ে গেল। যারা ঘোড়দৌড়েব বাজি খেলতে এসেছে, তারা অসন্তুষ্ট হল খুব, ডাকাতির কথা তাদের তখন মনে নেই।

যেন মধু নস্কর আর তার জনসাধারণকে উপহাস করার জন্য সেই রাত্রেই ডাকাত পড়ল মধু নস্করের কাকা যাদব নস্করের বাড়িতে। গভীর রাতে সেই রকমই ঘোড়া ছুটিয়ে এল ছ-জন ডাকাত, যাদব নস্করের ধানের গোলায় আগুন লাগিয়ে, দু-জনকে খুন করে একেবারে সর্বনাশ করে দিয়ে গেল। যাদব নস্করের সদ্য বিধবা শাপ-শাপান্ত করতে লাগল মধু নস্করকে।

এই অঞ্চলে থানা পুলিশের ওপর মানুষের ভরসা নেই। খুন-জখম, ডাকাতি লেগেই আছে। পুলিশকে খবর দিলেও গা করে না। যদি বা কখনও পুলিশ আসে, এসে আস্তানা গাড়ে গ্রামের সবচেয়ে বর্ধিষ্ণু গৃহস্থের বাড়িতে, পেট ভরে খাওয়া-দাওয়ার পর দারোগা সাহেব হাই তুলতে থাকেন। লোকজনের অভিযোগ শুনতে-শুনতে তাঁর চোখ টেনে আসে ঘুমে।

কেউ-কেউ বলে, ওই পুলিসও যা, ডাকাতও তা। রূপকথার গল্পে যেমন থাকে, দিনের বেলা যে পাটরাণী, রাত্তিরবেলা সে-ই রাক্ষসী। সেইরকম দিনের বেলায় যারা পুলিশ রাত্তিরে তারাই ডাকাত। যে রক্ষক সেই ভক্ষক বলে কথা আছে না?

তেঁতুলছড়ি গ্রামে এখনও ডাকাত পড়েনি। আশ-পাশের কোনও গ্রাম ও প্রায় বাদ যায়নি, সবাই ভাবে এবারে তেঁতুলছড়ির পালা। কবে আসবে, কবে আসবে এই ত্রাস। এই গ্রামের মানুষ

রাতের-পর-রাত জেগে কাটায়, যদিও জানে, রাত জেগে পাহারা দিয়েও লাভ নেই, ওই ডাকাতদের রোখার সাধ্য নেই তাদের। এক বাড়িতে ডাকাত পড়লে অন্য বাড়ির কেউ ছুটে আসবে না, সাধ করে কে নিজের প্রাণটা খোয়াতে চাইবে।

তেঁতুলছড়িতে অবশ্য সেরকম ধনবান কেউ নেই, প্রায় সবই চাষাভুষো আর কয়েক ঘর জেলে-তাঁতী। রতনমণি ঘোষের বাবা গোয়ালা ছিল, এখন ওরা নিজেদের কায়স্থ বলে পরিচয় দেয়, ওদের জমি-জমা কিছু বেশি, আবার ও বাড়িতে পোষ্যও অনেক। কিছু জমা ধান-চাল থাকলেও টাকা-পয়সা সোনা-দানা বিশেষ নেই, ছ'জন ডাকাতের এক রাত্তিরের খরচা পোষাবে না।

কিন্তু টাকা পয়সা পাবার আশা না থাকলেও তো ওরা আসে। এমনি-এমনি এসে বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়, মানুষ খুন করে। তাতে সন্দেহ হয়, ওরা বুঝি আসল ডাকাত নয়। ভাড়ায় ডাকাতি খাটে। এই কারুর ওপর কারুর রাগ আছে, অমনি কিছু টাকা খরচ করে লেলিয়ে দেওয়া হল ডাকাত। হারুণ শেখের বেলাতেই পাকা হয় সন্দেহটা। টাকার জোর ছিল না তার মোটেই কিন্তু হিম্মতের জোর ছিল, কারুকে সে ছেড়ে কথা কইতো না, রামলাল ব্যাপারীকেও সে মুখের ওপর তুড়ে দিয়েছিল। ডাকাতরা এসে তাকে কচুকাটা করে গেল নিশ্চয়ই অন্য কারুর প্ররোচনায়।

তেঁতুলছড়ি গ্রামে অবশ্য সেরকম তেজী মানুষও কেউ নেই। তা বলে কি আর পাড়া-প্রতিবেশীর মধ্যে ঝগড়া হয় না কিংবা ভাই-ভাইকে মারতে দা উঁচিয়ে তেড়ে যায় না! কিন্তু ওই বাপ-মা তুলে গালমন্দ কিংবা তেড়ে যাওয়া পর্যন্তই, তার চেয়ে বড় কোনও ঘটনা অনেকদিন এখানে ঘটেনি।

তবু ভয় যায় না। নিজের অজ্ঞাতেই কে, ভিন্ গাঁয়ের কার চক্ষুশূল হয়ে বসে আছে, তার ঠিক কী? তাছাড়া দু-পাঁচটি স্বাস্থ্যবতী কন্যা বা বউ রয়েছেই এ গ্রামে, সেও তো কম বিপদের কথা নয়। বাড়িতে অমন রমণী থাকা আর হরিণ পুষে রাখা তো একই কথা।

সন্ধ্যে হলেই ভয় গা-ছমছম করে। গরম ভাতের গ্রাস মুখে তুলতেও সুখ আসে না। কারুর সঙ্গে কারুর কথা বলতেও ইচ্ছে করে না। ছোট কোনও বাচ্চা চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলে বড়রা রেগে যায়, তারা বাচ্চাটাকে থাবড়া মারে।

ইদানীং আর এদিকে বাঘের উপদ্রব নেই। বুড়ো বুড়িদের মুখে শোনা বাঘের গল্প এখন পানসে লাগে। বাঘ তো ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে যেত না।

কেউ-কেউ ভাবে, ডাকাতরা একবার এসে পড়লে বাঁচি। রোজ-রোজ এই ঘাড় শক্ত করে থাকা সহ্য হয় না। ডাকাতরা এলে একখানা-দু-খানা বাড়ি পোড়াবে। দু-চারজনকে মারবে বড় জোর, তারপর তো অন্য সবাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারবে।

মেয়েদের বাড়ির বাইরে যাওয়া একেবারে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মেয়েরা তা শোনে না। কাজে-কর্মে তাদের মাঠে যেতে হয়, দোকানে যেতে হয়। সন্ধের পর একবার নদীর ধারে না গেলে তো চলবেই না।

নদীর ওপারে একটা বাঁশের সাঁকো। সেই সাঁকো পার হয়ে ওপারের গ্রামে গেলে পাওয়া যায় মিষ্টি লোনা পুকুর। ওই পুকুরের জল ছাড়া ডাল রাঁধা যায় না। ওই গ্রামে আছে বড় মুদির দোকান, পাওয়া যায় সর্ষের তেল। সেই গ্রাম পেরিয়ে তার পরের গ্রামে শুক্কুরবারের হাট।

নদীর ধারে গ্রামের স্ত্রীলোকেরা সার বেঁধে বসে। তখন পুরুষ মানুষদের এদিকে আসা নিষেধ।

প্রথম প্রহরের জ্যোৎস্নায় ওই সাঁকোর ওপর দাঁড়িয়েছিল মল্ল পাইকারের ছেলে শ্রীধর। কেষ্ট ঠাকুরের মতন সে বাঁশি বাজায়। সেই শ্রীধর তেঁতুলছড়ি গ্রামের বাতাসীকে একলা

পেয়ে কুপ্রস্তাব দিল। বাতাসী তো আর শ্রীরাধিকের মতোন আলুথালু নয়, ঢলানীও নয়, বড় তেজী মেয়ে সে, জঙ্গল থেকে সে মস্ত বড় কাঠের বোঝা মাথায় করে আনে, একবার সে জ্বলন্ত চ্যালা কাঠ দিয়ে একটা গোখরো সাপ পিটিয়ে মেরেছে। বংশীবাদক শ্রীধর যখন বাতাসীর হাত চেপে ধরতে গেল, তখন বাতাসী তাকে ঠেলে ফেলে দিল জলে। তারপর তার কী হি-হি-হি হাসি! সেই হাসি যেন মাছরাঙা পাখির ডাক!

এই ঘটনায় তেঁতুলছড়ি গ্রামে আরও জাঁকিয়ে বসল ভয়। বাতাসী এ কাজটা বড় মন্দ করেছে। এখন শ্রীধর রাগের চোটে যদি ডাকাত লেলিয়ে দেয়?

এতদিনে সবার খেয়াল হল যে কাঠকুড়ুনী বাতাসীর শরীরে একটা জেল্লা আছে। অল্প বয়সে বিধবা হয়েছে সে, তার নিজের সাধ আহ্লাদ না থাকতে পারে। কিন্তু তাকে দেখে দুষ্ট প্রকৃতির লোকদের সাধ আহ্লাদ তো জাগতেই পারে! যারা বাতাসীর দিকে আগে ভালো করে তাকিয়ে দেখেনি, এখন দেখতে শুরু করল।

কেউ-কেউ অবশ্য বলল, না-না, শ্রীধর অমন মানুষই নয়। সে একটু তরলমতি হতে পারে, কিন্তু চোর-ডাকাতদের সঙ্গে তার কোনও সংশ্রব নেই। তবু ভয়ের কাঁটা খচখচ করে। শ্রীধর না বলুক অন্য কেউ তো রটিয়ে দিতে পারে যে তেঁতুলছড়ি গ্রামে আছে বাতাসীর মতন এক আগুনের ঢেলা। আগুনের টানেই তো আগুন আসে।

তেঁতুলছড়ি গ্রামের প্রবীণরা শলাপরামর্শ করতে বসে অশত্থতলায়। কারুর-কারুর হাতে হুঁকো, কয়েকজনের হাতে বিড়ি। অনেক তামাক পুড়ে যায়, কোনও বুদ্ধি আসে না। কেউ-কেউ বলে, বাতাসীকে এ গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিলে কেমন হয়? কাঠ কুড়োনোই যার জীবিকা, সে তো যে-কোনও গ্রামেই থাকতে পারে; সাঁকোর ওপারে শ্রীধরদের গ্রামেই গিয়ে থাকুক। তারপর বাতাসীকে শ্রীধর খাবে না ডাকাতরা খাবে, সে তারা বুঝবে, তেঁতুলছড়ি গ্রামের লোক তো বাঁচবে!

কথাটা অনেকের মনঃপূত হয়, কিন্তু কে যে বাতাসী বা তার মাকে এই কথাটা বলবে, তা ঠিক হয় না। সকলেরই বুকের মধ্যে থাকে একইসঙ্গে গরম আর ঠান্ডা। যার মনে হয় যে বাতাসীটাকে তাড়াতে পারলেই শান্তি, সে-ই আবার ভাবে, যতদিন আছে থাক না, তবু তো পাছা-ভারি মেয়েটিকে দু-চোখ ভরে দেখেও খানিকটা আরাম পাওয়া যায়।

বাতাসীর মায়ের নাম তুলসি হলেও লোকে তাকে আড়ালে বলে কাঁদুনী। কারণ তার গলার আওয়াজটা খোনা-খোনা। মা আর মেয়ে এই দুজনের সংসার। দুজনেই বাল্যবিধবা। গ্রাম-প্রধানদের প্রস্তাবটা ক্রমে বাতাসীর মায়ের কানে আসে।

এক সন্ধেবেলা অশত্থতলায় গিয়ে কাঁদুনী এক দঙ্গল পুরুষ মানুষের সামনে কপাল চাপড়ে ডুকরে কেঁদে উঠে বলে, হায় রে, এ গ্রামে কি পুরুষ মানুষ নেই? মেনিমুখোরা আমাদের তাড়িয়ে দিতে চায়! আমরা কারুর সাতে-পাঁচে নেই, দিন আনি দিন খাই, ভিটে মাটি থেকে উচ্ছেদ করবে আমাদের? আজ যদি থাকত চূড়ামণি...আজ যদি থাকত চূড়ামণি...

চূড়ামণি নামটা শুনেই থেমে যায় সব গুঞ্জন। কেউ আর বিড়ি টানে না, যার হাতে হুঁকো, সে গুড়ুক টানতে ভুলে যায়। এ-ওর মুখের দিকে তাকায়। চূড়ামণি নামটায় যেন একটা জাদু আছে। অশত্থতলায় যারা জমায়েত হয়েছে তারা অনেকেই চূড়ামণিকে চোখে দেখেনি, কিংবা অল্প বয়েসে দেখলেও এখন আর স্মরণে নেই। কিন্তু সকলেই চূড়ামণির কথা শুনেছে। তার নাম শুনলেই রোমাঞ্চ হয়।

শুধু এই তেঁতুলছড়ি গ্রাম নয়, আশপাশের পাঁচ-দশখানা গ্রামের নয়নমণি ছিল ওই চূড়ামণি। যেমন ছিল তার হাসিমাখা সুন্দর মুখ, তেমনই ছিল তার লোহার মতন বুকের পাটা। সংসারে আর

কেউ ছিল না তার। যে-কোনও লোকের বিপদ আপদের কথা শুনলে সে দৌড়ে গিয়ে বুক পেতে দিত। একবার এ গ্রামের একটি শিশুকে কুমিরে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, চূড়ামণি জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে কুমিরের সঙ্গে লড়াই করে সেই শিশুটিকে উদ্ধার করে। কুমিরটাকে ছিঁড়ে দু-ভাগ করে দিয়েছিল সে।

এই কাহিনির কতটা সত্য আর কতটা কল্পনায় রঙিন তা এখন জানার উপায় নেই। এখন নদীটিকে দেখলে বিশ্বাস করাই শক্ত যে-কোনওদিন ওখানে কুমির আসা সম্ভব ছিল, তবু লোকে চূড়ামণির ওই বীরত্বের কথা বিশ্বাস করে। আর, অনেক কথা রটেছে তার নামে। সে নাকি একবার শুধু কয়েকটা ধমক দিয়ে বাঘ তাড়িয়ে দিয়েছিল। এক খুনে ডাকাতের হাত থেকে বন্দুক কেড়ে নিয়ে চূড়ামণি তার চুল ধরে এমন টান দিয়েছিল যে সেই মুহূর্তে ডাকাতটি ন্যাড়া। সারা জীবনে তার মাথায় আর চুল গজায়নি। নিশ্চয়ই অনেক গুণ ছিল চূড়ামণির, নইলে তার নামেই বা এতসব কথা রটবে কেন?

যখন পূর্ণ যৌবন বয়েস তখন হঠাৎ-ই একদিন চূড়ামণি এই গ্রাম ছেড়ে চলে যায় চিরতরে। কেন যে সে গেল, কোথায় গেল তা কেউ জানে না। তার অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে জনশ্রুতি আরও বাড়তে থাকে। যে-কেউ বিপদে পড়লেই কপাল চাপড়ে বলে, আজ যদি চূড়ামণি থাকত, তাহলে আর দুঃখ ছিল না!

এসব বিশ-পঁচিশ বছর আগেকার কথা। অনেকদিন পর বাতাসীর মা কাঁদুনির মুখে শোনা গেল সেই খেদ বাক্য। অমনি সকলের মনে পড়ে গেল!

এরপর কয়েকদিন ঘোড়সওয়ার ডাকাতদের কথা উঠলেই কেউ-না-কেউ বলে ওঠে, হায় রে, আজ যদি চূড়ামণি থাকত! দুর্দমনীয় ডাকাতদের একমাত্র প্রতিপক্ষ সেই অতীতের চূড়ামণি।

নতুন করে চূড়ামণির কীর্তি-কাহিনীর কথা মুখে-মুখে ছড়ায়, অল্প বয়েসিরা রোমাঞ্চিত হয়ে শোনে। সবাই ভাবে, চূড়ামণি থাকলে সব মুশকিল আশান হয়ে যেত। সে নেই, তাই এত দুর্দশা। ডাকাতগুলো এসে কবে যে কার গলা কাটবে তার ঠিক নেই।

এর মধ্যেই একদিন অন্য গ্রামে আর-একবার ডাকাতির খবর এল। অর্থাৎ তারা থেমে নেই। তেঁতুলছড়ি গ্রামে তারা একদিন আসবেই! পাশের গ্রামে শ্রীধরকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সে কি তবে ওই ডাকাতদের সন্ধানেই গেছে? শীতের রাতে বাতাসী তাকে জলে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল, সেই অপমানের প্রতিশোধ সে নেবে।

বাতাসীর অবশ্য বিশেষ ভয় ডর নেই। সন্ধে গাঢ় হলে নদীর ধার থেকে অন্য স্ত্রীলোকেরা চলে এলেও সে একা-একা দাঁড়িয়ে থাকে সাঁকের ধারে।

জ্যোৎস্নায় ধু-ধু করে ওপারের মাঠ। দূরের তালগাছগুলোকে মনে হয় সারি-সারি ঠুঁটো জগন্নাথ। বাতাসে মিশে থাকে ভীতু মানুষদের নিঃশ্বাস। বাতাসী তাকিয়ে থাকে শূন্যের দিকে। সে যেন হঠাৎ কল্পনার চোখে দেখতে পায় চূড়ামণিকে। সেই এক রূপবান যুবক, পরের দুঃখে যার পাথরের মতোন বুকখানা কাতর। সে মাঠ ঘাট জঙ্গল পেরিয়ে আসছে, সে বাতাসীর পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলবে, আমি তো আছি, তোমার ভয় কী!

যারা অল্প বয়েসে চলে যায়, তাদের বয়েস বাড়ে না।

কিছুদিন ধরে চূড়ামণির কাহিনি খুব চলবার পর ছিরু বৈরাগী একটা নতুন কথা শোনাল। চূড়ামণি ঠাকুর মারা যায়নি গো, নিরুদ্দেশেও যায়নি। কয়েক মাস আগেই ছিরু বৈরাগী তাকে দেখেছে পিয়ালী নদীর বাঁকে কানা ফকিরের আখড়ায়। অবশ্য এখন তাকে চেনাই যায় না, সে এখন বুড়ো, নেশাখোর, আত্মবিস্মৃত। সবসময় কাঁদে। চূড়ামণি ঠাকুর এখনো শুধু নিজের নামটা শুনলে জেগে ওঠে।

ছিরু বৈরাগীর কথা শুনে সকলের মনে আঘাত লাগে, আবার কেউ পুরোপুরি অবিশ্বাসও

করতে পারে না। ভিক্ষে করতে-করতে ছিরু বৈরাগী দেশ-বিদেশে চলে যায়। সে ক্যানিং, মোল্লাখালি, মুর্শিদাবাদ, যশোর এইসব দূর দেশের গল্প বলে। এককালের চূড়ামণি দাস এখন চূড়ামণি ঠাকুর হয়ে গেছে শুনেও কেউ আপত্তি জানায় না।

পিয়ালী নদী তো বেশি দূরে নয়। সে নদীর যতগুলো বাঁকই থাক, শেষ পর্যন্ত পৌঁছোতে এক বেলাও লাগবে না। গ্রামের কয়েকটি অল্প বয়েসি ছেলে কানা ফকিরের আখড়া খুঁজে বার করবার জন্য বেরিয়ে পড়তে চায়। তাই শুনে বাতাসী বলল, আমিও যাব, আমিও যাব!

কানা ফকিরের যে-চক্ষুটি ভালো সেই চক্ষুটি যেন বেশি জ্বলজ্বলে। মাথা ভরতি চুলের জঙ্গলে উকুনের বাসা। মাঝে-মাঝেই সে ঘ্যাস-ঘ্যাস করে মাথা চুলকোয়। খিদে পেলে সে খায় কিন্তু আঁচায় না, অর্ধেক খাবার লেগে থাকে দাড়ি-গোঁফে! চরস-গাঁজার নেশায় সে সারাদিনই প্রায় বোম্ হয়ে থাকে। যখন একটু মাথা পরিষ্কার হয় তখন সে উরুতে চাপড় মেরে গান ধরে।

যদি সুন্নৎ দিলে হয় মুসলমান
নারীর তবে কী হয় বিধান
বামন চিনি পৈতা প্রমাণ
বামনী চিনি কিসে রে!

তার বেশিরভাগ গানই তার নিজের রচিত নয়, লালন ফকিরের। এক দঙ্গল চেলা জুটেছে তার, তাদের কে হিন্দু, কে মুসলমান বোঝার কোনও উপায় নেই। সকলের মুখেই ওই এক গান, চরস গাঁজার দিকে চেলাদের টান বেশি ছাড়া কম নয়। দিন-রাত তারা নেশার ঘোরে, গানের ঘোরে মহানন্দে আছে।

বাতাসী আর তার দলবল সেই কানা ফকিরের আখড়ায় এসে পৌঁছল সন্ধের ঝোঁকে। তারা যে কয়েকজন নতুন মানুষ এসে দাঁড়াল, তাতে কারুরই কোনও হুঁস বোধ নেই। জায়গাটা ধোঁয়ায় ধোঁয়াক্কার, তার মধ্যেই চলছে চ্যাঁচামেচির সঙ্গীত।

একবার গান শেষ হওয়ার পর কানা ফকির যখন আবার ছিলিম সাজতে বসল, চ্যালারা ব্যগ্রভাবে তাকিয়ে রইল তার দিকে, সেই সময় এক অপেক্ষাকৃত তরুণ সুপুরুষ চ্যালার পায়ে বাতাসী আর তার সঙ্গীরা ঝাঁপিয়ে পড়ে বলল, চূড়ামণি ঠাকুর, আমাদের বাঁচাও!

যেন পায়ে আগুনের ছ্যাঁকা লেগেছে এইভাবে আঁতকে উঠে সেই চ্যালাটি বলল, আরে, আরে, আরে, এ কী উৎপাত! আমি কে, তোমরা কে, চূড়ামণি ঠাকুর কে? কেউই না! তুমি ওই! তুমি ওই!

সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, তুমি ওই! তুমি ওই!

বাতাসীরা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। কানা ফকির তার জ্বলজ্বলে একচক্ষু দিয়ে বাতাসীকে নেক নজরে লক্ষ করে গেয়ে উঠল,

কিবা রূপের ঝলক দিচ্ছে উজলে
রূপ দেখলে নয়ন যায় ভুলে
ফণী মণি সৌদামিনী
জিনি এ রূপ উছলে...

তুমি কে বাছা? কার খোঁজে এয়েছ?

বাতাসী হাত জোড় করে ভক্তিভরে বলল, বাবা, আমরা তেঁতুলছড়ি গ্রামের মানুষ। আমাদের বড় বিপদ। আমরা এসেছি চূড়ামণি ঠাকুরের খোঁজে! শুনেছি তিনি আপনার ছিরি পাদপদ্মে আশ্রয় নিয়েছেন।

তখন মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকা প্রায় অচেতন একজন চ্যালা মাথা তুলে জড়ানো গলায় বলল, কে রে? কে রে? কে রে? কে আমার নাম ধরে কথা বলে? তুমি ওই! তুমি ওই!

কানা ফকির বলল, তোমরা চূড়ামণির খোঁজে এয়েছ? ওই তো চূড়ামণি! এখানে তোমাদের কোনও ডর নেই, যা প্রাণে চায় খুলে বলো!

কানা ফকির যার দিকে আঙুল দেখালেন, সেই লোকটির বয়েস ষাটের কাছাকাছি, মাথার অর্ধেক চুল পাকা, একদা বলবান শরীরটি এখন দড়ির মতন পাকানো, শিরাগুলি স্পষ্ট দেখা যায়, চোখ দুটি পাকা করমচার মতন লাল।

বাতাসীর সঙ্গে যারা এসেছে তাদের ভক্তি চটে গেছে এরই মধ্যে। তারা ভাবল, তারা ভুল জায়গায় এসেছে। কিংবা ওই মরকুট্টে বুড়োটা যদি চূড়ামণি হয়, তবে তার খুরে-খুরে দণ্ডবৎ, দরকার নেই ওই ঝামেলাটিকে গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে। তাদের একজন আর সকলকে বলল, চল রে চল, এখনও হাঁটা শুরু করলে লোকালয়ে ফিরতে পারব।

কানা ফকিরের কিন্তু কৌতূহল জন্মেছে। তিনি বাতাসীর মুখ থেকে দৃষ্টি না ফিরিয়ে বললেন, জয় রাধেশ্যাম, জয় সত্য পীর! তুমি ওই! তুমি ওই! এবারে খুলে বলো তো বাছা, তোমার বৃত্তান্তখানি।

বাতাসী তখন সবকথা সাত কাহন করে সবিস্তারে শোনাল।

তাই শুনে কানা ফকির দয়ার্দ্র কণ্ঠে বলল, ওরে চূড়ামণি, তুই অবোধমণি হয়ে আছিস। তোর গ্রামের মানুষের মাথায় বিপদের খাঁড়া, তুই গিয়ে তাদের পাশে দাঁড়া। সাঁই-এর কৃপা হলে তুই আবার ফিরে আসবি।

দড়ি-পাকান চেহারার বুড়োটি এই আদেশ শুনে কাঁদতে শুরু করে দিল ভেউ-ভেউ করে।

কানা ফকির তার দিকে ছিলিম এগিয়ে দিয়ে বললেন, লে বেটা! দু-তিন টান দে! তারপর সুস্থ হয়ে সবকথা বুঝে দ্যাখ। আহা রে, এরা এসেছে কত দূর থেকে তোর নিয়তি ধরে টান দিতে। এই নারীটির বদন যেন ছাই বর্ণ হয়ে গেছে। এদের সাথে না যাস যদি তবে তোর মুক্তি হবে না। তুমি ওই! তুমি ওই!

ছিলিমে কয়েক টান দিয়ে সেই দড়ি-পাকানো চেহারার লোকটি অনেকটা তাজা হলে বলল, বাবা, তুমি সব পারো! এরা যা চায়, তুমিই সাধ মিটিয়ে দাও না! এই বুড়োকে নিয়ে টানাটানি কেন?

আরও কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটির পর কানা ফকিরের চরম আদেশ হল এই যে, দড়ি-পাকানো চেহারার চূড়ামণিকে যেতেই হবে তেঁতুলছড়ি গ্রামে। বাতাসীকে তিনি বললেন, যাওয়ার পথে ওরা যেন চূড়ামণিকে কোনও পুকুরের পানিতে চুবিয়ে নিয়ে যায়। তাতে ওর জ্ঞান ফিরবে!

বাতাসী আর তার দলবল অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিয়ে চলল চূড়ামণিকে। এ বুড়োকে গ্রামে নিয়ে গিয়ে কী উপকার হবে? তাও সে নিজে চলতে পারে না, ধরে-ধরে নিয়ে যেতে হয়। মাঝে-মাঝে হোঁচট খেয়ে পড়ে। এক-একবার চেঁচিয়ে ওঠে। বড় তৃষ্ণা, জল দে! জল! গুরু, তুমি কোথায় পাঠাচ্ছ আমাকে? তুমি ওই!

খানিক দূরে যাওয়ার পর পথের পাশে দেখা গেল এক পুষ্করিণী! কানা ফকিরের কথা মতোন বাতাসীরা বুড়োটাকে সেখানে ঠেলে ফেলে দেওয়ার উদ্যোগ করছে, তার আগেই সে ছুটে গিয়ে পুকুরের জলে উপুড় হয়ে পড়ল। শোঁ-শোঁ শব্দ হতে লাগল এবং এক পুষ্করিণী ভরতি জল কিছুক্ষণের মধ্যেই সে পান করে নিল চেপেপুটে।

তারপর পাড়ে উঠে সে কাঁদতে লাগল। অস্ফুটভাবে বলতে লাগল, যে-দেশে ভালোবাসা নাই, সে দেশে বাসা নাই আমার! এই একই কথা বারবার বলতে লাগল আর ঝরতে লাগল তার চোখের জল। সে কী কান্না! ক্রমে তার চোখের জলেই আবার প্রায় ভরে গেল সেই পুকুরটা।

এই কাণ্ড দেখে বাতাসী ও তার দলবলের বাক্যরহিত হয়ে গেছে। তারা আরও চমৎকৃত

হল, যখন সেই বৃদ্ধ বাতাসীর দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করল, তুমি তুলসি না? ডাক নাম কাঁদুনী?

পাশের ছেলেটিকে বলল, তুমি ভূধর না? তার পাশের ছেলেটিকে বলল, তুমি তো একলাস? আর তুমি মঈনুদ্দিন?

একে-একে প্রত্যেকের বাবা-মায়ের নাম নির্ভুল বলে গেল সে। তখন আর সন্দেহ রইল না যে, এই লোকটিই প্রকৃত চূড়ামণি। সে নতুনদের চেনে না পুরোনোদের চেনে।

তেঁতুলছড়ি গ্রামে পৌঁছবার আগেই আরও কিছু কাণ্ড হয়ে গেল চূড়ামণিকে নিয়ে। কয়েক পা করে হাঁটার পরই সে বসে পড়ে আর হাত-পা ছড়িয়ে কেঁদে বলে, ওগো, আমায় নিয়ে যাচ্ছ কেন? ডাকাত তাড়াবার মতন শক্তি কি আমার আছে? আমি যে সর্বস্বান্ত হয়ে গেছি!

কিন্তু বাতাসীরা তখন তাকে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। এ বুড়োকে দিয়ে ডাকাত আটকান যাবে না ঠিকই, কিন্তু এতকালের প্রবাত-প্রসিদ্ধ চূড়ামণিকে দেখে গ্রামের মানুষ আবার তো নতুন করে গল্পের উপাদান পাবে! একটা মানুষ হারিয়ে গিয়েছিল, সে আবার ফিরে এসেছে, এ রকম ঘটনা গ্রামে তো সচরাচর ঘটে না। চূড়ামণির একটা অদ্ভুত ক্ষমতা তো তারা একটু আগে নিজের চোখেই দেখল।

তেঁতুলছড়ি গ্রামে পৌঁছবার প্রায় এক ক্রোশ আগে চূড়ামণি হঠাৎ বেশ স্বাভাবিক হয়ে উঠল। নেশার ঘোর কেটে যাচ্ছে। অন্যদের হাত ছাড়িয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সে বলল, এ আমি কোথায় হারিয়ে যাচ্ছি? তোমরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছ আমাকে?

বাতাসী বলল, ঠাকুর, তুমি ফিরে যাচ্ছ তোমার নিজের গ্রামে। তোমার গ্রামের নাম তেঁতুলছড়ি, মনে নেই?

চূড়ামণি জিগ্যেস করল, সেখানে কী ভালোবাসা আছে?

বাতাসী চট করে উত্তর দিতে পারল না। অন্যরাও নিরুত্তর। ভালোবাসার কথা কেউ জানে না।

চূড়ামণি গান গেয়ে উঠল, যে দেশে ভালোবাসা নাই, সে দেশে বাসা নাই আমার! আমি তেঁতুলছড়ি গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম কেন জানিস? সেখানে কেউ কারুকে ভালোবাসে না।

বাতাসী চূড়ামণির হাত ধরে সকাতরে বলল, চূড়ামণি ঠাকুর, আমাদের বড় বিপদ, তুমি আমাদের বাঁচাও। তোমাকে সবাই ভালোবাসবে।

চূড়ামণি আকাশের দিকে আঙুল তুলে চেঁচিয়ে বলল, তুমি ওই! তুমি ওই! কে কাকে বাঁচায়? কে কাকে মারে? মানুষ নিজেকেই নিজে মারে। নিজেকেই নিজে বাঁচায়।

বাতাসী এবার হাঁটু গেড়ে চূড়ামণির পা চেপে ধরল।

চূড়ামণির একদৃষ্টে চেয়ে রইল তার দিকে। আবার তার চোখ ছলছল করে আসছে। তার মুখে কথা নেই। সন্ধের আকাশ জুড়ে কালি-কালি মেঘ। অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে গাছপালা। বাঁশ বনে শোনা যাচ্ছে শেয়ালের রা।

চূড়ামণি একটুক্ষণ স্থির হয়ে থেকে কাতরভাবে বলল, আমার শরীরের তাগৎ কমে গেছে। তোরা একটু-একটু ভালোবাসা দিলে যদি শক্তি ফিরে পাই! দিবি? তোরা ভালোবাসা দিবি?

বাতাসী বলল, আমার বুকে যত ভালোবাসা আছে সব তোমায় দেব।

গঙ্গাধর, কামাল, মাণিকচন্দ্র, সঈফুদ্দিনরাও বলল, হ্যাঁ দেব, হ্যাঁ দেব।

চূড়ামণি হাত বাড়িয়ে বলল, দে, ভালোবাসা দে!

এমনভাবে কী ভালোবাসা দেওয়া যায়! মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল সকলে।

চূড়ামণি এগিয়ে গিয়ে একটা বাঁশঝাড়ের সামনে দাঁড়াল। একটা বাঁশ ধরে টানাটানি করে বলল, দ্যাখ, বুড়ো হয়ে গেছি, হাড় ঝুনো হয়ে গেছে, শরীরে বল নাই। তোরা ভালোবাসা দে, তবে যদি মনের বল ফিরে পাই! তোরা আমার গায়ে হাত বুলা।

তখন সবাই চূড়ামণিকে ঘিরে তার গায়ে হাত বুলোতে লাগল। বাতাসী তার মুখখানা ঘষতে লাগল চূড়ামণির পিঠে।

আস্তে-আস্তে যেন চূড়ামণির শরীর সোজা হয়ে যেতে লাগল, খুলে গেল চুলের জট, চাপা পড়ে গেল হাতের শিরা-উপশিরা, চক্ষে ফুটে উঠল জ্যোতি।

চূড়ামণি হুংকার দিল, তুমি ওই! তুমি ওই!

তারপর একটানে সে পট করে তুলে ফেলল একটা মস্ত বড় বাঁশ!

তাই দেখে বাতাসী আর গঙ্গাধর আর কামালরা কাঁদতে লাগল ঝরঝর করে। তাদের ভালোবাসার যে এত জোর তা তারা নিজেরাই জানত না এতদিন!

চূড়ামণি বাঁশটাকে মাটিতে ফেলে উলটোদিকে ফিরে দু-হাত জোড় করে বলল, আমার গুরু কানা ফকির, তিনি সব দেখতে পান, তিনিও কাঁদছেন তোদের জন্য। বাবা, তুমি আর কেঁদো না, এরাই এখন আমায় সামাল দেবে।

আবার খানিক দূরে যাওয়ার পর চূড়ামণি দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, আমার যে বড় ক্ষুধা পেয়েছে। কে আমাকে খেতে দেবে?

বাতাসী বলল, ঠাকুর, আর মাত্র দু-ক্রোশ পথ। তুমি গ্রামে গেলে সবাই তোমাকে খাবার দেবে।

চূড়ামণি বিহ্বলভাবে বলল, সবাই আমাকে খাবার দেবে? বলিস কী?

বাতাসী আর তার সঙ্গীরা একসঙ্গে বলল, হ্যাঁ ঠাকুর দেবে।

চূড়ামণি বলল, আমি যে অনেক খাই!

—তুমি যত চাও সব দেবে। তুমি পেট ভরে খেও।

—সত্যি দেবে? শেষে কথা ফিরাবি না তো?

ওরা গ্রামে পৌঁছোবার পর এমন হইচই পড়ে গেল যে, এদিক-ওদিকের গ্রামের লোক ভাবল ডাকাত এসেছে বুঝি!

ভিড় ঠেলেঠুলে একেবারে সামনে এসে ছিরু বৈরাগী বলল, হ্যাঁ, এই তো সেই মানুষ! বাতাসী অতদূর থেকে ধরে এনেছে, অসাধ্য সাধন করেছে মেয়েটা।

কিন্তু অনেকে মানতে চায় না। অনেকের চোখেই সন্দেহ। এই কি সেই অজেয় বীর চূড়ামণি। এই মাথার চুল পাকা, খসখসে বুড়ো? এরকম নেশাখোর চেহারার মানুষ তো যে-কোনও শ্মশানঘাটে দেখতে পাওয়া যায়!

তাদের চোখে চূড়ামণির চেহারা হবে নব কার্তিকের মতন। কোথায় সেই কপাট বুক, কোথায় সেই চোখের দীপ্তি! পঁচিশ বছর আগে যে উধাও হয়ে গেছে, সে কি আর ফিরে আসতে পারে?

তবু কেউ-কেউ বলল, হ্যাঁ, এই-ই সেই! অন্যরা প্রতিবাদ করে ওঠে। ঘর থেকে মেয়েরা ছুটে-ছুটে এসে ওই বুড়োকে দেখে থমকে যায়। হতাশায় তাদের মুখ ঝুলে পড়ে।

প্রতিবাদীর সংখ্যা বাড়তে থাকে ক্রমেই। বাতাসী আর তার সঙ্গীরা আসার পথে যা-যা অদ্ভুত ঘটনা দেখেছে তা বলতে যেতেই হা-হা করে হেসে উঠে অনেকে। এই অপদার্থটা এক পুকুর জল শুষে খেয়েছে, একটা আস্ত তলতা বাঁশ উপড়ে তুলেছে? গাঁজাখুরি গল্প বলার আর জায়গা পাওনি? এই লোকটা তো গাঁজাখোর বটেই, বাতাসীরাও কি গাঁজা টেনে এসেছে কানা ফকিরের আখড়া থেকে?

চূড়ামণি কোনও কথা বলে না, কোনও সাড়া শব্দ করে না। ঠায় বসে থাকে অশত্থতলার চাতালে। ক্রমেই সে যেন বেশি বুড়ো হয়ে যাচ্ছে। হই-হই চরমে উঠতে সে একপাশে ঢলে পড়ল। অজ্ঞান হল না মরেই গেল তা বোঝা গেল না।

চূড়ামণিকে গড়িয়ে পড়ে যেতে দেখে এক নিমেষে থেমে গেল গোলমাল। সবাই থমকে

গেছে।

বাতাসীর মা কাঁদুনী ছুটে এসে চূড়ামণির বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হাউহাউ করে বলে উঠল, ওগো, তোমরা ওকে মেরে ফেললে? মানুষটা অ্যাদ্দিন বাদে ফিরে এল তাকে তোমরা কেউ কিছু দিলে না?

বাতাসীর মনে পড়ল, মানুষটা বলেছিল খিদে পেয়েছে!

ছিরু বৈরাগী বলল, ওর নাম ধরে ডাকো। ওকে ডাকলে ও জেগে ওঠে।

বাতাসীরও সেই কথাই মনে হল। কানা ফকিরের আশ্রমে নাম শুনেই চূড়ামণি উঠে বসেছিল।

সে চূড়ামণির কানের কাছে মুখ নিয়ে ডাকল, চূড়ামণি ঠাকুর! চূড়ামণি ঠাকুর! ফিরে এস!

আরও অনেকে সেই নাম ধরে চেঁচিয়ে উঠল।

ছিরু বৈরাগী দু-হাত তুলে সকলকে উদ্দেশ করে বলল, সবাই ডাকো। সবাই ডাকো! জোরে, আরও জোরে।

দেখাই যাক না কী হয়, এই ভেবে যারা অবিশ্বাসী তারাও গলা মেলাল। যখন আর একজনও বাকি রইল না, সবাই সমস্বরে ডাকছে, তখন চোখ মেলল চূড়ামণি। আস্তে-আস্তে উঠে বসে বলল, আমায় ডাকছিলে কেন গো? আমি তো দিব্যি ফিরে যাচ্ছিলুম, কেন ডেকে আনলে?

ছিরু বৈরাগী বলল, মানুষটা এতদিন বাদে গ্রামে ফিরল, তোমরা কেউ ওকে একটু খেতেটেতে দেবে না? অন্তত একটু জল-মিষ্টি দাও!

বাতাসী বলল, চূড়ামণি ঠাকুর, তুমি আমাদের বাড়ি চল, তোমাকে ভাত রেঁধে খাওয়াব।

চূড়ামণি বাতাসীর চোখের দিকে তাকিয়ে তারপর মুখ ফিরিয়ে সমস্ত মানুষদের দেখল, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তুমি খাওয়াবে? তবে যে বলেছিলে, গ্রামের সব মানুষ আমায় খাওয়াবে?

বাতাসীর মা কাঁদুনী বলল, আমরা কাঠকুড়ুনী, তবু তোমায় পেটভরা ভাত দিতে পারব। চলো ঠাকুর।

চূড়ামণি তবু বাতাসীকে জিগ্যেস করল, তুমি যে বলেছিলে, গ্রামের সব মানুষ খাওয়াবে? তুমি কথা রাখলে না।

তারপর অবুঝ শিশুর মতোন মাথা নেড়ে-নেড়ে সে বলতে লাগল, না, আমি খাব না। সবাই মিলে আমায় না খাওয়ালে আমি খাব না।

সবাই অবাক। একটা মানুষের জন্য সব বাড়িতে রান্না হবে নাকি? এ কি মানুষ না রাক্ষস?

ছিরু বৈরাগী বলল, আরে না, না, চূড়ামণি ঠাকুর সে কথা বলেনি। তোমরা সব বাড়ি থেকে পাঁচ দানা করে চাল দাও। তারপর সেই চাল একত্র করে একজন কেউ ফুটিয়ে দিক। তাহলেই সবাই মিলে খাওয়ান হবে।

একটা মাটির সরা নিয়ে বাতাসী আর অন্য ছেলেরা ঘুরল সব বাড়ি-বাড়ি। গ্রাম শেষ করে ঘুরে আসার পরেও, সেই সরা অর্ধেক ভরল না।

বাতাসী সেই সরাটা এনে ছিরু বৈরাগীর সামনে এসে খুব দুঃখী গলায় বলল, এইটুকু চালে কি এত বড় মানুষটার পেট ভরবে? তুমি কেন মাত্র পাঁচ দানা বললে?

সেই কথা শুনে চূড়ামণি মিটিমিটি হেসে ছিরু বৈরাগীর দিকে তাকাল। ছিরু বৈরাগী কপাল চাপড়ে বলল, ওরে, ভিক্ষের তণ্ডুল আমি ভালোই চিনি! সবাই পাঁচ দানা দেয়নি। কেউ-কেউ দিয়েছে তিন দানা, কেউ-কেউ দিয়েছে দু-দানা, কেউ-কেউ দিয়েছে ভুষি! যে গ্রামের মানুষ এত তঞ্চক হয়, সে গ্রামের মানুষকে ডাকাতে মারবে না তো কী?

তখন লজ্জা পেয়ে আরও অনেকে দু-দানা, তিন দানা করে চাল দিয়ে গেল। শুধু তিনজন

এসে বলল, আমাদের ঘরে এক দানাও চাল নেই, ঠাকুর! দোষ দিও না। ইচ্ছে থাকলেও দেওয়ার সাধ্য নেই। আর একদিন দেব।

বাতাসী ভাত ভুটিয়ে এনে কলাপাতায় বেড়ে দিল। সঙ্গে একটু নুন, দুটি লঙ্কা। সেই ভাতই অমৃতের মতন খেল চূড়ামণি। তৃপ্তির সঙ্গে বলল, আঃ!

ছিরু বৈরাগী বলল, ঠাকুর, এবার তুমি একটু শোও। আজকের রাতটা ঘুমিয়ে নাও। কতদূর থেকে এসেছ? কাল সবকথা শুনো।

কিন্তু বিশ্রামের সময় পাওয়া গেল না। কয়েকজন ছুটতে-ছুটতে এসে আছড়ে পড়ে বলল, আসছে! আসছে! নদীর ওপারের মাঠে ধুলোর ঝড় এসেছে, ডাকাতরা আসছে।

সবাই একদৃষ্টে তাকাল চূড়ামণির দিকে। এইবার। আসল না নকল তার প্রমাণ দাও! দেখি তোমার কেমন মুরোদ!

বাতাসী ব্যাকুলভাবে বলল, ঠাকুর, ওঠো, ডাকাতরা আসছে।

চূড়ামণির মুখে ভয়ের ছায়া। শরীরটা যেন কুঁকড়ে যাচ্ছে। সে মাটিতে মিশে যেতে চায়।

বাতাসী তার হাত ধরে টেনে বলল, ঠাকুর, ওঠো! নদী পেরিয়ে ওরা এক্ষুনি এসে পড়বে।

চূড়ামণি কাতরভাবে বলল, আমি ঠাকুর নই, আমি শুধু চূড়ামণি। আমি কী করে পারব অতগুলো ডাকাতের সঙ্গে? আমার যে শরীরে আর সেই শক্তি নেই। আমাকে তোমরা ভালোবাসা দাও!

বাতাসী অমনি উন্মাদিনীর মতন সকলের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বলল, ওগো, তোমরা সবাই এসো। চূড়ামণি ঠাকুরকে ভালোবেসে ছুঁয়ে দাও। হাত বুলিয়ে দাও।

ডাকাতরা এসে পড়ল বলে, আর দ্বিধা করার সময় নেই। সবাই ছুটে এসে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল চূড়ামণির গায়ে-মাথায়।

চূড়ামণি বলতে লাগল, আরও দাও, আরও ভালোবাসো। ভালোবাসায় আমার মন ভরে না! আরও দাও!

বাতাসী চুমো দিতে লাগল চূড়ামণির সারা শরীরে। তার দেখাদেখি অন্য মেয়েরাও। সে কী ব্যাকুলতা। যেন মাঝখানে চূড়ামণি নেই, সবাই সবাইকে চুমু দিচ্ছে।

হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে সবাইকে সরিয়ে উঠে দাঁড়াল চূড়ামণি। দু-দিকে দু-হাত ছড়িয়ে বলল, এবার আমি বল পেয়েছি! আর ভয় নেই।

সকলেই দেখল, চোখের নিমেষে যেন রূপান্তর হয়েছে চূড়ামণির। তার শরীরে ঝকঝক করছে তেজ। তার ম্লান মুখে ফুটে উঠেছে হাসি, সেরকম হাসি আগে কেউ কখনও দেখেনি। তার বুক যেন লোহার কপাট আর দুই হাত যেন মুদ্গর। মাথার চুল তো পাকা নয়, ধুলোবালি মাখা।

চূড়ামণি বলল, আমার অস্ত্র কই?

ডাকাতদের কাছে কত মারাত্মক অস্ত্র থাকে, তাদের বিরুদ্ধে চূড়ামণি একা খালি হাতে দাঁড়াবে কী করে? একটা অস্ত্র তো নিশ্চয়ই চাই। কিন্তু এ গ্রামে লাঠি-সোঁটা ছাড়া আর বিশেষ কিছু নেই। শুধু রতনমণির কাছে আছে একটা রাম দা। সে সেটাই এনে দিল।

চূড়ামণি বলল, শুধু ওতে তো হবে না। সকলের কাছ থেকে কিছু-কিছু চাই। আর যদি কিছু দিতে না পার তো প্রত্যেকে মাথা থেকে একগাছা চুল ছিঁড়ে দাও!

সবাই পট-পট করে ছিঁড়তে লাগল মাথার চুল।

বাতাসী নিজের চুল ছিঁড়তে যেতেই কেঁপে উঠল তারা সারা শরীর। একটা সাঙ্ঘাতিক ভয়ের তরঙ্গ। এই মানুষটা পারবে তো? ডাকাতরা এসে যদি এক কোপে এর মাথাটা কেটে ফেলে?

সে ফিসফিস করে বলল, ঠাকুর, তুমি পালাও, তুমি পালাও! তুমি ডাকাতদের সামনে যেও না।

ডাকাতরা নদী পেরিয়ে এসেছে, কপাকপ্ শোনা যাচ্ছে ঘোড়ার পায়ের শব্দ। অন্য সবাই ভয়ে পালাচ্ছে ঘর বাড়ি ছেড়ে মাঠের দিকে।

চূড়ামণি বলল, এখন আর কোথায় পালাব? আর যে উপায় নেই!

বাতাসী বলল, তুমি কি পারবে ওদের সঙ্গে? একলা কি কেউ পারে? তোমায় ওরা ছাড়বে না!

চূড়ামণি বলল, পালালেই গ্রামের লোক কি আমায় ছাড়বে? আর যদি বা ডাকাতদের সঙ্গে পারি, কিন্তু তারপর আমার কী হবে? আমার ভয় করছে কীসের জানো, তারপর আর আমি মানুষ থাকব না। বাতাসী, আমার খুব মানুষ হয়ে থাকতে ইচ্ছে করে!

বাতাসী বলল, তুমি মানুষ থাকবে না তো কী হবে?

চূড়ামণি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, মাটি! মাটি!

মূল রাস্তার ওপরে এসে গেছে ডাকাতেরা। চূড়ামণি দৌড়ে মাঝ রাস্তায় বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে হুংকার দিল, তুমি ওই!

এই প্রথম দুর্ধর্ষ ডাকাতের দল থমকে গেল।

পরপর ছ'জন ঘোড় সওয়ার, তাদের সারা শরীর কালো কাপড়ে ঢাকা, তাদের মুখও দেখা যায় না। তাদের তিন জনের হাতে জ্বলন্ত মশাল।

চূড়ামণি নিজের মাথা থেকে একটা চুল ছিঁড়ে হাতের চুলের ডেলাটার সঙ্গে মেশাল। তারপর সেই ডেলাটা মাটিতে ছুড়ে দিয়ে বলল, তোরা আগে এইটা কাট, তারপর আমার মাথা কাটবি।

একজন ঘোড় সওয়ার ঘোড়া থেকে নেমে এগিয়ে এল। তার হাতে খোলা তলোয়ার। সে চুলের গোছাটা কাটার জন্য তলোয়ার তুলতেই অট্টহাসি করে উঠল চূড়ামণি। সে হাসিতে যেন মেঘের গর্জন। সে হাসিতে সমুদ্রের ঢেউ।

তলোয়ারের প্রচণ্ড কোপে সেই চুলের গোছার একটাও কাটল না। ডাকাতের সর্দারটি পরপর তিনটে কোপ লাগাল, চতুর্থ কোপে দু-টুকরো হয়ে গেল তার তলোয়ার।

চূড়ামণি আবার হেসে উঠে বলল, আর একটা অস্ত্র আন। এবারে আমার মাথায় একটা কোপ মেরে দ্যাখ কী হয়!

ডাকাতদের সর্দার ভাঙা তলোয়ারটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে চূড়ামণির সামনে হাঁটু গেড়ে বসে কম্পিত গলায় বলল, ঠাকুর, আমরা অনেক পাপ করেছি। তুমি আমাদের কী শাস্তি দেবে দাও। আমরা তোমারই অপেক্ষায় ছিলাম এতদিন।

চূড়ামণি তার ডান পা-টা তুলে ডাকাত সর্দারের মাথার ওপরে রাখল।

অন্য ডাকাতরা ঘোড়া থেকে নেমে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে রইল দূরে।

চূড়ামণি আর ডাকাত সর্দার সেই একই জায়গায় একই ভঙ্গিতে স্থির হয়ে রইল। আস্তে-আস্তে তাদের দু-জনেরই শরীর থেকে খসে-খসে যেতে লাগল মাংস, তাদের হাড়ের খাঁচাটা হয়ে গেল কঙ্কির, তার ওপর লাগল মাটি আর রং।

যারা ভয় পেয়ে দূরে পালিয়ে গিয়েছিল, তারা ফিলে এল, কাছে এসে গোল হয়ে দাঁড়াল। কেউ-কেউ উচ্চারণ করতে লাগল দোয়া, কেউ-কেউ নিয়ে এল ফুল আর বেলপাতা। শুধু বাতাসী ভাসল নয়নজলে!



প্রথম মানবী

ভোরবেলা সেই নারী প্রবেশ করল আদিম উদ্যানে। তখন পৃথিবীর সৃষ্টিরও ঊষাকাল। কোথাও কোনও শব্দ নেই। যত দূর দৃষ্টি যায় মনুষ্য আকারের আর কোনও প্রাণী নেই। লতা-গুল্মে, ক্ষুদ্র-বৃহৎ তরু-বৃক্ষে ফুটে আছে বিভিন্ন বর্ণের ফুল, সেগুলিরও নাম নেই। কোথাও ফুল থেকে ফল ফলেছে, কোনও-কোনও গাছের শাখা ফলভারে নুয়ে পড়েছে, সেইসব ফলও নামহীন।

এখানে ফুলের সৌরভে আর কোনও কটু গন্ধ মেশেনি। বাতাস স্নিগ্ধ। মাঝে-মাঝে বয়ে চলেছে তরঙ্গময় নির্ঝরিণী, তাদের জল স্ফটিক-স্বচ্ছ। একেবারে তলদেশের পাথরগুলি পর্যন্ত মালিন্যহীন।

বাতাস ও ঝরনা ছাড়া আর যা সঞ্চরণশীল, তা কুয়াশা। যেন আকাশের মেঘ নীচে নেমে এসে ভূমি স্পর্শ করতে চাইছে। তবে পূর্ব গগনের তরুণ সূর্য আস্তে-আস্তে এদের ভক্ষণ করতে শুরু করেন। কুয়াশাই সূর্যের প্রাতরাশ।

আস্তে-আস্তে পা ফেলে হাঁটছে সেই রমণী। তার শরীরে কোনও আবরণ নেই, আভরণ নেই। সুদীর্ঘ চুল পিঠ ছাড়িয়ে নেমেছে মসৃণ নিতম্বে। দুই বাহু ও ঊরুসন্ধিতেও নবীন তৃণের মতন রোম। নাসিকা তীক্ষ্ণ, ভ্রূদ্বয় গাঢ়, অক্ষিপল্লব সূক্ষ্ম। তার বক্ষের দুটি ঢেউ এবং কটিদেশের খাঁজ কোনও শিল্পীর নিপুণ হাতে গড়া। ঢেউ দুটিতে ভাসছে স্ফুটনোন্মুখ দুটি কুঁড়ি। চাঁদের অর্ধ কলার মতন নাভি।

রমণীটি যেন ঈষৎ উন্মনা, কোনওদিকেই স্থির দৃষ্টিপাত করছে না।

তার কোনও বয়স নেই। তার বাল্য, কিশোরীকাল নেই, ভবিষ্যৎ জরা সম্পর্কে কোনও উপলব্ধি নেই। সে যৌবনজাত। সে দেখেছে মাত্র কয়েকটি ঋতু, বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা এবং শীত। এবারেও সে টের পাচ্ছে আসন্ন শীতের মিহিন বাতাস।

এই আদিম উদ্যান সে ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল এক বর্ষার রাতে। আশ্রয় নিয়েছিল দূরবর্তী এক পাহাড়ের গুহায়। এখানে তার ফেরা নিষেধ, তবু মাঝে-মাঝে তার শরীর তোলপাড় করে দেয় এক ঘূর্ণি হাওয়া, তার সবক'টি আঙুলের অগ্রভাগ, এমনকী কানের লতিতেও জ্বালা ধরায়। অনেক গণ্ডূষ জল পান করলেও তৃষ্ণা মেটে না। ঘুম আসে না রাত্রে। যেমন কাল সারারাত সে চক্ষু মেলে শুধু অন্ধকার দেখেছে।

পর্বতগুহা ছেড়ে সে যে আজ প্রত্যূষে চলে এসেছে, তা সে নিজেই জানে না। এক জলপ্রপাতে স্নান সেরে সে হাঁটতে শুরু করেছিল বিপরীত দিকে। সচেতন সিদ্ধান্ত ছাড়াও মানুষ এমনভাবে কখনও-কখনও যায়। দিনের-পর-দিন একাকিত্ব তার অসহ্য বোধ হচ্ছিল, সে নেমে এসেছে সমতলে।

এ উদ্যানে কোনও নির্দিষ্ট পথ নেই। কখনও-কখনও বৃক্ষগুলির শাখা-প্রশাখা দু-হাতে সরিয়ে যেতে হয়। পায়ে লাগে লতাজাল। কখনও পার হতে হয় অপ্রশস্ত সরণি।

হঠাৎ ঝুপঝুপ করে বর্ষণ শুরু হল। এখানকার বৃষ্টি শীত-গ্রীষ্ম মানে না।

রমণীটি একটি বৃহৎ বৃক্ষের তলায় এসে দাঁড়াল। সেখানে একটি দুগ্ধবতী গাভীও আশ্রয় নিয়েছে, তার গাত্রবর্ণ পিঙ্গল। এই প্রকার গাভীদের চক্ষু সব সময় সজল থাকে।

সে গাভীটির গলকম্বল স্পর্শ করে স্নেহ জানাতেই গাভীটি সন্তোষজনক শব্দ করল। অর্থাৎ সে এই নারীকে চিনতে পেরেছে, কয়েক বিন্দু দুগ্ধক্ষরণ হল তার বাঁট থেকে।

সে এবার অনুভব করল, অনেক গাছপালাও যেন তার উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন। নানারকম অদৃশ্য তরঙ্গ লাগছে তার শরীরে।

সে সহাস্যে বলল, কেমন আছ তোমরা সকলে? আমি এসেছি বলে খুশি হয়েছ তো?

হাসিটি সত্য, কথাগুলি অনুচ্চারিত। এখনও মনুষ্য ভাষার সৃষ্টি হয়নি। এই রমণী হাসতে পারে, সশব্দে কাঁদতে পারে, কণ্ঠ দিয়ে কখনও দু-একটি সুর ধ্বনিত হয়। কিন্তু অর্থবহ কোনও শব্দ সে জানে না।

ভাষা নেই, কিন্তু ভাব তো আছে। তাই অনেক কথা হয়, অনেকের সঙ্গে, নিঃশব্দে, মনে-মনে।

তার নিঃশব্দ প্রশ্নের উত্তরে সে নানা দিক থেকে যেন তরঙ্গে-তরঙ্গে ধ্বনিত হল। অনেকদিন পর এলে, তোমাকে দেখে খুশি হয়েছি অবশ্যই। তুমি আরও সুন্দর হয়েছ!

একটি গাছ থেকে একটি বর্তুল গড়নের পাকা ফল এই মুহূর্তে খসে পড়ল মাটিতে। এটাও যেন ভাষা। গাছটি স্বাগতম জানাচ্ছে তাকে।

যুবতীটির মন ভার ছিল, গত রাতে তার বুক ভরা ছিল কান্নায়, এখন সে অনেক স্বচ্ছন্দ বোধ করল। বৃষ্টি থেমে গেছে, সে ফলটি তুলে নিয়ে গিয়ে বসল এক ঝরনার ধারে পাথরের পইঠায়।

সারা আকাশ জুড়ে রামধনু ফুটে উঠেছে।

সে এখন যে পাহাড়ের গুহায় থাকে, সেখান থেকে কোনওদিনই রামধনু দেখা যায় না। এখন পরিচিত রামধনুকে দেখেও সে প্রশ্ন করল, কেমন আছে?

রামধনু উত্তর দিল কি না, তা বোঝা গেল না।

আকাশ থেকে চোখ ফিরিয়ে সে তাকাল জলের দিকে। দেখতে পেল নিজের মুখের প্রতিবিম্ব। এই জন্যই সে বারবার জলের ধারে বসে। দিনের-পর-দিন নিজের মুখচ্ছবি ছাড়া সে আর কোনও মানুষকে দেখে না। নিজের সঙ্গেই শুধু কথা হয়।

ঝরনার ওপাশ থেকে কী যন একটি প্রাণী সাঁতার কেটে আসছে। এদিকে আসার পর বোঝা গেল, একটি সাপ। বেশ দিঘল চেহারা। চক্ষু দুটি কপালের ওপরে, জলেই অর্ধেক শরীর ডুবিয়ে সে চেয়ে রইল রমণীটির দিকে।

ভয় পাওয়ার প্রশ্ন নেই। এই সাপটিকে সে এখানে আগেও কয়েকবার দেখেছে। কাছাকাছি এসে চেয়ে থাকে এক দৃষ্টিতে। কী যেন বলতে চায়। কিন্তু সাপের মনের তরঙ্গের সঙ্গে এই রমণীর মনের তরঙ্গ মেলে না, তাই সে কিছু বুঝতে পারে না।

রমণীটি তাকে বলল, তুমি যাও!

তবু সাপটি স্থির হয়ে রইল এক জায়গায়।

রমণী তখন হাঁটতে শুরু করল পুনরায়।

ঝরনাটি কিছুটা নীচের দিকে নেমে গিয়ে মিশে গেছে আর-একটি স্রোতস্বিনীর সঙ্গে। দূর থেকে সেই সঙ্গম স্থানটি দেখা যায়।

সেখানে জংঘা পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একজন পুরুষ।

এই রমণীরই মতন সে-ও নিপাট নগ্ন। তার শরীর অনেকটা রোমশ, দীর্ঘ কেশ, মুখমণ্ডল শ্মশ্রুতে প্রায় আবৃত। সুঠাম বক্ষ।

পুরুষটিকে দেখা মাত্র রমণীটির আশিরপদনখ শিহরিত হল। তারপর জ্বালা। তারপর উত্তাল বক্ষস্পন্দন। তার ইচ্ছে হল তৎক্ষণাৎ ঝড়ের মতন ছুটে যেতে। ওই কঠিন বক্ষে তার কোমল বক্ষ মেলাতে। তার শরীরের প্রতিটি অণু-পরমাণু ওই মানুষটির সঙ্গে লীন হতে চায়।

তবু নিজেকে সংযত করল সে।

এ উদ্যান তার জন্য নিষিদ্ধ। এখানে সে বিধি ভেঙে এসেছে। যদি ওই পুরুষ তাকে প্রত্যাখ্যান করে? যদি আরও কঠিন হয়ে উঠে তাকে দূরে ঠেলে দেয়? এখানে অলক্ষ্যে কোথাও আছে সৃষ্টিকর্তার তিন প্রহরী, যদি পুরুষটি তাদের ডাকে?

সে আপনমনে বলল: হে সখা, তুমিও তো নিঃসঙ্গ। আমরা বিবাদ করেছি, তবু তো আমি দূরে সরে থাকতে পারছি না। তোমারও কি মন উচাটন হয় না? তুমি তো কখনও এই উদ্যান থেকে বেরিয়ে পর্বতগুহায় আমার সন্ধানে যাওনি। তুমি কি এখনও ক্রোধ পুষে রেখেছ?

শরীর চাইছে ধেয়ে যেতে, মন টেনে ধরছে রাশ, রমণীটি এক স্থানে স্থির অথচ দোদুল্যমান।

আকাশে রামধনুটি এখনও মিলিয়ে যায়নি। প্রকৃতিতে চলেছে সুন্দরের কত রকম খেলা, বাতাসে মুগ্ধতার আবেশ, তবু ওই পুরুষটিকে দেখার পর রমণীটির আর কোনও দিকে মন গেল না, নিদারুণ তৃষ্ণার্তের মতন সে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল পুরুষটির দিকে।

একটু পরে পুরুষটি মিলিয়ে গেল জঙ্গলের আড়ালে।

কোথাও একটা পাখি খুব জোরে ডেকে উঠল।

তার ধ্বনিটি অনেকটা যেন টিট্টিভ, কিংবা লিল্‌লিথ! একবার মনে হয়, টিট্টিভ, আর একবার মনে হয়, লিল্‌লিথ।

রমণীটি ঘোর ভেঙে পাখিটিকে খুঁজতে লাগল। এই পাখিটির ডাকটি শুনেছে সে, কখনও দেখতে পায়নি। কিছু-কিছু পাখি শুধু ঘন পাতার আড়ালে বসে ডাকে, কিন্তু যখন প্রকাশ্যে আসে কিংবা উড্ডীয়মান, তখন ডাকে না।

রমণীটি ব্যাকুলভাবে বলল, ওরে পাখি, আরও জোরে ডাক। নীচের দিকে নেমে যা। আমার পুরুষ যেন এই ডাক শুনতে পায়। তা হলে হয়তো আমার কথা তার মনে পড়বে।

এই পাখির ডাক থেকেই রমণীটির নাম—লিলিথ।

সৃষ্টিকর্তা প্রথম যে মানব সৃষ্টি করেন, সে পুরুষ। জল, মৃত্তিকার মতন প্রকৃতির উপাদান দিয়েই সে গড়া। প্রাণপ্রতিষ্ঠার পর মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে তিনি বললেন, তোমার নাম দিলাম আদম। পরে তুমি বহু নামে পরিচিত হবে। তুমি স্বচ্ছন্দে এই স্বর্গোদ্যানে বিচরণ করো।

কিছুদিন পরেই তিনি বুঝতে পারলেন, তিনি একটা গভীর ভুল করেছেন। তিনি প্রথম মানুষটি গড়েছেন অনেকটা নিজের শরীরের আদলে, কিন্তু তিনি তো নারীও নন, তাঁর তো এক থেকে বহু হওয়ার প্রয়োজন নেই, তিনি অদ্বিতীয়, তিনি এলোহিম। কিন্তু মানুষটিকে তিনি পুরুষলিঙ্গ দিয়েছেন, সে অবিরাম বিপরীত লিঙ্গের একজনকে চাইবে। তাঁর অন্যান্য সব সৃষ্টিই তো এক থেকে বহু হয়।

আদমের উপভোগের সব উপাদানই আছে এই কাননে, তবু প্রায়শই সে নিরানন্দ থাকে। কারণটা সে নিজেই জানে না, কিন্তু দূর থেকে তাকে লক্ষ করে তার স্রষ্টা বোঝেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তির মনোবেদনা দেখে তিনি ব্যথিত হন নিজেও।

আবার একদিন সময় করে তিনি শিল্পকার্যে মন দিলেন। প্রকৃতির সব কিছুর সৌন্দর্য থেকে ছেনে-ছেনে তিনি গড়ে তুললেন এক তিলোত্তমা মূর্তি। পুরুষের তুলনায় এর সব কিছুই কোমল, এমনকী হাতের আঙুলের লীলায়িত ভঙ্গি পর্যন্ত।

প্রাণসঞ্চার করা মাত্র শায়িত মূর্তিটি উঠে দাঁড়াল, একবার পুরুষটির মুখোমুখি। দুজনে এমন ভাবে চেয়ে রইল যেন সেই দৃষ্টিতে রয়েছে একটি সেতু।

আর তখনই শোনা গেল সেই পাখিটির ডাক, টিট্টিভ! লিল্‌লিথ!

তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল সৃষ্টিকর্তার মুখে। এতদিনে সম্পূর্ণ হল তাঁর সৃষ্টির কাজ।

তিনি এই মানব-মানবীকে বললেন, এবার তোমরা এই পৃথিবীকে চালনা করার ভার নাও। আদম, ওই পাখিটির ডাক অনুযায়ী তোমার এই সঙ্গিনীর নাম রাখা হল লিলিথ। তোমরা পরস্পরের পরিপূরক হও। কখনও কোনও সংকট হলে আমার শরণাপন্ন হোয়ো। আমি তোমাদের শব্দ দেব, ভাষা দেব। কিন্তু তা আয়ত্ত করতে তোমাদের সময় লাগবে। ততদিন তোমরা মুখোমুখি দাঁড়ালেই তোমাদের মনের তরঙ্গ বিনিময় হবে। মুখ দিয়ে কিছু উচ্চারণ না করেও তোমরা পরস্পরের সব বাক্য হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হবে।

সৃষ্টিকর্তা অদৃশ্য হয়ে যেতেই আদম তার সঙ্গিনীকে বলল, এখন তোমার শরীরে ধূলি লেগে আছে। এসো, আমরা অবগাহন করি।

তারপর কাটতে লাগল দিনের-পর-দিন। দুজনের পরিচয় প্রগাঢ় হল। অবশ্য শরীর মিলনের চেতনা জাগল না। তারা দুই কুরঙ্গ-কুরঙ্গীর মতন পাশাপাশি বিচরণ করে। স্নান করে একসঙ্গে, ফলমূল ভাগ করে খায়, শুয়ে থাকে কাছাকাছি। এক মুহূর্তের জন্যও বিচ্ছেদ নেই। এমনকী ঘুমের মধ্যেও এক-একবার জেগে উঠে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকে।

একদিন একটা গাছ থেকে একটি সুপক্ক ফল পাড়তে গেল লিলিথ, আদম বলল, ও ফলটি নিও না।

সরল কৌতূহলে লিলিথ জিগ্যেস করল, কেন?

আদম বলল, কোন ফলটি ভালো, আমি তোমায় চিনিয়ে দেব। আমি আহরণ করে দেব তোমার জন্য।

লিলিথ সহাস্যে বলল, হে সখা, তুমি দেবে, আমি অঞ্জলি পেতে গ্রহণ করব।

আর একদিন এক নতুন জলাশয়ে অবগাহন করতে চাইল লিলিথ, তার এক বাহু চেপে ধরে আদম বলল, ওখানে নেমো না।

লিলিথ বিস্মিত হয়ে জানতে চাইল, কী কারণে?

আদম বলল, এই সরোবরে কয়েকটি ফুল ভাসছে। এই ফুলগুলি আমি আগে দেখিনি। জলে কেন ফুল ভাসবে? চল, তোমাকে আমি অন্য নির্মল সলিলে নিয়ে যাব।

নতুন সরোবরটিতে আর ওদের অবতরণ করা হল না।

এক অপরাহ্নে আকাশ ধারণ করল রুদ্র রূপ।

সূর্য হারিয়ে গেলেন ঘন কালো মেঘের আড়ালে। সেই মেঘও যেন পাথরের মতন কঠিন। পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে শব্দ হতে লাগল প্রচণ্ড। যেন সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে স্পর্ধা করছে তাঁর কোনও প্রবল প্রতিপক্ষ, আজ সমস্ত সৃষ্টি ধ্বংস করে দেবে। মাঝে-মাঝে যেন সূর্যের চেয়েও তেজি বিদ্যুৎ চমক।

আগে একবার আকাশে এরকম রণ-হুংকারের সময় সৃষ্টিকর্তা আদমকে দর্শন দিয়ে অভয় জানিয়েছিলেন। আদম তাই জানে, আকাশে যতই তর্জন-গর্জন হোক, এক সময়ে থেকে যাবে। লিলিথ দেখেনি আকাশের এই রূপ। কোনও অজানা আশঙ্কায় কম্পিত হচ্ছিল তার বুক।

তারপর শুরু হল ঝড়। তার এমনই শক্তি এবং তীব্র বেগ যে বহু বৃক্ষের শাখা ভেঙে পড়তে লাগল। কোনও-কোনও বৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত হয়ে চলে গেল সুদূরে। এরকম সময়ে পাহাড়ের গুহা তবু নিরাপদ।

ওরা দুজনে বসে রইল একটি প্রায় শুষ্ক নদীর খাতে। তার এক দিকটা প্রাচীরের মতন, ওপর দিয়ে অনেক কিছু উড়ে গেলেও ওদের গায়ে লাগে না।

ঝড়ের পর এল বর্ষণ। প্রস্তর মেঘ এখন দ্রব। আকাশ যেন এখন এক হ্রদ, একসঙ্গে নেমে আসছে মাটিতে।

নদীর খাতে ওরা দুজন কিছুটা আশ্রয় পেয়েছে বটে, কিন্তু কিছুক্ষণ ধারাপাতের পর ওদের শৈত্যবোধ হল। পাথরে হেলান দিয়ে বসেছিল পাশাপাশি, একসময় আদম বলল, লিলিথ, তুমি কাঁপছ? তুমি শুয়ে পড়ো, আমি তোমাকে আচ্ছাদিত করে থাকব।

পরম যত্নে সেই পুরুষ তার সঙ্গীনিকে শীতের বাতাস এবং বৃষ্টির ছাঁট থেকে রক্ষা করার জন্য সর্বাঙ্গ আবৃত করে রইল। বুকে বুক, মুখে মুখ, হাতে হাত, উরুতে উরু।

একটু পরেই মিলিয়ে গেল শীত বোধ। এককভাবে সমস্ত নারী ও পুরুষেরই শরীরে শীত আশ্রয় নিতে পারে, কিন্তু দুজনে আলিঙ্গনাবদ্ধ হলে শীত পলায়ন করে। তখন সেই দুই শরীরের দখল নেয় উষ্ণতা।

ওদের এই অভিজ্ঞতাই ছিল না, দুজনেই বিস্মিত হয়ে পরস্পরের নাম ধরে ডেকে উঠল, আদম! লিলিথ!

উষ্ণতা ক্রমশ সঞ্চারিত হতে লাগল শরীরের প্রতিটি রন্ধ্রে-রন্ধ্রে। আগুনের মতন এতে দহন নেই, আছে পরস্পরের মধ্যে মিলিয়ে যাওয়ার জন্য আশ্লেষ। একসময় আদম অনুপ্রবেশ করল লিলিথের গভীরে।

স্বয়ং প্রকৃতি তাদের নির্দেশ দিতে লাগলেন।

মনুষ্য জীবনে যে এত সুখও আছে তা জানত না দুজনের কেউ।

একসময় এই মিলনখেলা সাঙ্গ হওয়ার পর শ্রান্তভাবে পাশাপাশি শুয়ে রইল এই নারী ও পুরুষ। অবিলম্বেই ঘুম এসে গেল।

এরপর কয়েকটি দিন, সকাল নেই, দুপুর নেই, সন্ধ্যা নেই, রাত্রি নেই, যে-কোনও সময়, যে-কোনও স্থানে ওরা মেতে উঠতে লাগল এই মিলনখেলায়। সমস্ত পশু-পক্ষী, বৃক্ষলতা, কীটপতঙ্গের মধ্যেও যে অনবরত এই মিলনখেলা চলছে, তা আগে ওরা লক্ষই করেনি। এবার সকৌতুকে ওদের লক্ষ করতে লাগল প্রাণীকুল।

দিন কেটে যাচ্ছে এক রোমাঞ্চকর উন্মাদনায়। এখন বৃষ্টি, রৌদ্র, ঝড়, বিদ্যুৎ সবই বেশি-বেশি ভালো লাগে। সময় বড় মোহময়।

একদিন সেই নদীর খাতে, যেখানে নরম তৃণভূমিতে ওরা এখন একটি শয্যা নির্মাণ করেছে, আদম লিলিথের হাত ধরে মিলনের আহ্বান জানাল।

লিলিথ আদমের বুকে মুখ ঘষতে-ঘষতে বলল, সখা, অনেকবার আমরা মিলনসুখ পেয়েছি, আমি নীচে, তুমি ওপরে। আজ আমরা বিপরীত বিহার করি না কেন? তুমি আগে শয়ন করো।

আদম বিস্মিতভাবে বলল, আমি নীচে থাকব? কেন?

লিলিথ বলল, দেখি না, কেমন লাগে?

আদম বলল, না, তা হয় না?

লিলিথ চপলভাবে বলল, কেন হবে না। এসো না পরীক্ষা করে দেখি।

আদম বলল, তা হয় না, লিলিথ! প্রথমবার আমরা যেমনভাবে শুরু করেছি, সেটাই প্রকৃতির নির্দেশ। পুরুষের ইচ্ছাটাই নারীর মান্য। নারীর ওপর পুরুষ।

এবার লিলিথের বিস্ময়ের পালা। ভুরু উত্তোলন করে বলল, প্রকৃতি কে? তিনি আমায় কেন নির্দেশ দেননি?

আদম বলল, প্রকৃতি আমাদের সৃষ্টিকর্তারই এক প্রতিনিধি।

লিলিথ বলল, কিন্তু সৃষ্টিকর্তা যে আমাদের বলে গেলেন, আমরা পরস্পরের পরিপূরক।

আদম বলল, অবশ্যই। ক্ষুদ্র ও বৃহতেও তো পরিপূরক হয়। দুর্বল এবং সবলে। আমি তোমাকে সর্বসময় রক্ষা করব, তুমি আমায় মাধুর্য দেবে। এইভাবে আমরা পরিপূরক।

লিলিথ বলল, একেবারে সমানে-সমানে পরিপূরক কি আমরা হতে পারি না?

আদম কিছু না বলে শুধু হাসল।

লিলিথ আবার বলল, এক-একদিন আমি আগে অবগাহনে নেমে তোমাকে ডাকি। আবার কোনওদিন তুমি আগে ঝাঁপ দাও। এও তো সে রকম।

আদম বলল, অবুঝে হোয়ো না সখি। এও সেরকম নয়। পুরুষের ওপরে নারীকে যেতে নেই। এসো, আমি উত্তপ্ত হয়েছি।

কেন যেন লিলিথের মনটা বিষাদাচ্ছন্ন হয়ে গেল, সে আদমের বক্ষে থেকেও তাপ বোধ করল না। সে উঠে গিয়ে নদীতে নামল। একা দাঁড়িয়ে রইল কটিতট নিমগ্ন জলে।

পরদিন আদম আবার তাকে আহ্বান জানাল, আজও লিলিথের সেই একই শর্ত। সে ওপরে থাকবে।

আদম তাকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করল। কিন্তু এই কোমলাঙ্গী তরুণীটি যে এমন কঠিন-প্রতিজ্ঞ হতে পারে, তা কল্পনাই করা যায়নি।

লিলিথ বলল, আমরা সারা দিনক্ষণ সব কিছু একসঙ্গে করি, তবু কেন আমরা দুজনে সমান হতে পারব না, তা বুঝিয়ে দাও! আমি লক্ষ করেছি, আমি কোন গাছের ফল খাব, কোন সরোবরে স্নান করব, সে ব্যাপারেও তুমি আমাকে নির্দেশ দিতে চাও। আমার বোধ-বুদ্ধি তোমার তুলনায় কিসে কম? সরোবরে ফুল ভাসলে সে সরোবর কেন অস্পৃশ্য হবে?

আদম বলল, আমার কথা অনুযায়ী চললে তোমার কদাচ বিপদ হবে না। আমি তোমার সব ভার নিয়েছি, তাই তুমি সবরকম চিন্তা থেকে মুক্ত থাকতে পারো।

লিলিথ বলল, তোমার শরীর যেসব উপাদান দিয়ে গড়া, আমার শরীরও সেরকম। আমাদের একই রকম প্রাণ, এক জীবন। তবু কেন অসমান হবে? আমি যে বুঝতে পারছি না সখা। আমাকে বুঝিয়ে দাও।

আদম বলল, তোমাকে এত কিছু চিন্তা করতে হবে না। তুমি তোমার কেশে দুটি পুষ্প গুঁজে নেবে? তাহলে তোমাকে আরও সুন্দর দেখাবে!

লিলিথ করুণ কণ্ঠে বলল, আমি সুন্দর হতে চাই না, আদম। আমি তোমার সঙ্গে জীবনের প্রতিটি ব্যাপার সমানভাবে ভাগ করে নিতে চাই।

আদম এবার ঈষৎ বিরক্তভাবে বলল, পুরুষ আর নারী কখনও সমান হতে পারে না— এটাই সৃষ্টিকর্তার নির্দেশ। তা কি অবহেলা করা যায়!

লিলিথ বলল, তুমি আগে একবার বলেছিলে, প্রকৃতির নির্দেশ। এখন বলছ সৃষ্টিকর্তার নির্দেশ। তুমি কী করে এই নির্দেশ পাও, আমি কেন পাই না?

আদম গম্ভীরভাবে বলল, চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করলে যে অভিজ্ঞতা হয়, তা থেকেই এই নির্দেশ বোঝা যায়। সিংহ থেকে শশক পর্যন্ত যে-কোনও প্রাণীদের নিরীক্ষণ করো, সব সৃষ্টির মধ্যে পুরুষই কি প্রধান নয়? পুরুষ উপরে, নারী নীচে।

লিলিথ বলল, পশুজগৎ...কী জানি...সৃষ্টিকর্তা বলেছিলেন, আমরা তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।

আদম বলল, যদি সব ব্যাপারে সমানই হতে হবে, তা হলে সৃষ্টিকর্তা পুরুষ আর নারীকে পৃথক রূপ দিয়ে সৃষ্টি করলেন কেন? আমাদের শরীরের গড়ন কি কিঞ্চিৎ পৃথক নয়? তুমি কি আমার তুলনায় কিঞ্চিৎ দুর্বল ও খর্ব নও?

লিলিথ বলল, তা ঠিক। হ্যাঁ, ঠিকই তো? আমি এতটা বুঝতে পারিনি। তবে, আর-একটা কথা জিগ্যেস করব, রুষ্ট হোয়ো না, আমাদের হৃদয়, আমাদের মস্তিষ্ক, তাও কি ছোট-বড়? চিন্তাশক্তিতেও কি আমি তোমার চেয়ে ন্যূন?

আদম বলল, বলেছি তো, তোমাকে এসব চিন্তা করতে হবে না।

দুজনেই কিছুক্ষণ চুপ।

তারপর লিলিথ আবার আদমের দেহ স্পর্শ করে কোমল কণ্ঠে বলল, থাক মিছে তর্ক। সখা একবার অন্তত আমরা বিপরীত বিহারের পরীক্ষা করে দেখিই না। যদি তাতে উপভোগ আরও বেশি হয়?

আদম বলল, এই ক'দিন আমরা যেভাবে মিলিত হয়েছি, তাতে কি আমাদের উপভোগের চরম হয়নি? তুমি তৃপ্তির পূর্ণতা লাভ করোনি? বলো, বলো, তবে কেন এবং কীসের জন্য অন্য পরীক্ষা?

আদম মুখ ফিরিয়ে রইল। লিলিথ চলে গেল অন্য দিকে। এইভাবে কাটল কয়েকটা দিন।

তারপর আবার এক মেঘাচ্ছন্ন দুপুরে, মৃদুমন্দ বাতাস বইছে, পাখিরা ডাকছে পরস্পর মিলন কামনায়, ফুলেরা সৌরভ ছড়িয়ে আহ্বান জানাচ্ছে তাদের দয়িতদের, আদমও কামমোহিত হয়ে আলিঙ্গন করতে গেল লিলিথকে।

সে আলিঙ্গনে ধরা দিয়ে লিলিথ অনুনয় করে বলল, একবার বিপরীত বিহার হোক, অন্তত একবার! তুমি আমার এই ইচ্ছেটুকুর মূল্য দেবে না?

এবারে ধৈর্যচ্যুতি হল আদমের। ক্রোধে জ্বলে উঠে সে বলল, বারবার শুধু ওই এক কথা! আমাকে অপদস্ত করতে চাস তুই নারী? তোর ইচ্ছে আবার কী? আমার সকল ইচ্ছে মেনে নেওয়াই তোর জীবনের সার্থকতা।

আদম সবলে লিলিথকে ভূপতিত করতে যেতেই লিলিথ কোনওক্রমে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড় দিল।

পুরুষ ব্যাঘ্রের মতন তাকে তাড়া করে গেল আদম।

উত্তেজনায়, দুরন্ত বাসনায়, ক্রোধে চিৎকার করতে লাগল আদম। কিছুতেই ধরা দিচ্ছে না লিলিথ। একটি সুবৃহৎ বৃক্ষের কাণ্ড প্রদক্ষিণ করে সে ঘুরছে, হাসছে সকৌতুকে।

আদমের মুখে হাসি নেই। তার চক্ষু দুটি জ্বলন্ত।

তার চিৎকারে সমস্ত কাননভূমি যখন কম্পিত, তখন অকস্মাৎ তিনটি প্রাণী সেখানে আবির্ভূত হল। এদের আকৃতি প্রায় মানুষেরই মতন, আবার পক্ষীর মতন ডানাযুক্ত। আকাশচারী এই তিন প্রাণী সৃষ্টিকর্তার দূত, এদের নাম সেনয়, সানসেনয় এবং সেমনগেলফ।

এই তিনজন লিলিথকে ঘিরে ফেলে প্রশ্ন করল, কী ব্যাপার, এই উদ্যানে এমন অশান্তি কেন?

লিলিথ কিছু বলার আগেই রাগে ফুঁসতে-ফুঁসতে আদম বলল, এই নারী আমার অবাধ্য। আমি ওকে যেভাবে কামনা করি, ও তা মেনে নিতে চায় না। ও যদি আমার কথা না শোনে, তবে এমন সহচরীর প্রয়োজন নেই আমার।

লিলিথ এবার কিছু বলতে যেতেই তাকে থামিয়ে দিয়ে ওদের একজন বলল, এ কী মতিভ্রম তোমার, নারী? সবসময় পুরুষের প্রীতি অর্জন করতে পারলেই তো তুমি সুখী হবে। অবাধ্যপনাতে শুধু অশান্তি।

লিলিথ বলল, আমার একটি কথা শুনুন—

অন্য একজন বলল, শোনার তো কিছু নেই। তুমি এই পুরুষটির অনুগমন করো।

তৃতীয়জন কৌতুকহাস্যে বলল, নারী-পুরুষের এরকম ক্ষুদ্র কলহ তো মাঝেমধ্যে হতেই পারে। সৃষ্টিকর্তা অন্য পশু-প্রাণীদের এই বোধ দেননি, শুধু মানুষকেই দিয়েছেন, তার নাম মান-অভিমান। এই মান-অভিমানও মিলনখেলার অঙ্গ। যাও নারী, আমরা অন্তর্হিত হচ্ছি, তোমরা মান ভেঙে উপগত হও!

লিলিথ এবার অস্থিরভাবে বলল, আমার কথাটা শুনতেই হবে। পুরুষ যে বলল, ওর অবাধ্য হলে আমার মতন সহচরী ও চায় না, তা হলে আমিও কি বলতে পারি না, ও আমার অবাধ্য

হলে আমিও ওর মতন সহচর চাই না?

তৃতীয়জন হাসতে-হাসতেই বলল, ওসব তো কথার কথা।

প্রথমজন কিন্তু কঠোরভাবেই বলল, সহচর নির্বাচনের অধিকার তোমার নেই, নারী! তুমি পূর্ব-নির্দিষ্ট। পুরুষের প্রয়োজনেই তোমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, এটা সবসময় মনে রাখবে।

এইসব কথার মধ্যে আদম এসে লিলিথের এক বাহু ধরে হ্যাঁচকা টান দিল। অন্য তিনজনও তাকে ঠেলে দিতে লাগল পুরুষটির দিকে।

পাশবদ্ধ হরিণীর মতন ছটফটিয়ে লিলিথ বলতে লাগল না, না, আমাকে পাবে না, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে শরীর পাবে না, কিছুতেই না, না, না।

এরপর যা কাণ্ড হতে লাগল, তাতে আর যাই হোক, মিলনখেলা কিছুতেই সম্ভব নয়। বলপ্রয়োগে নারীকে পরাস্ত করা যায়, কিন্তু তার কাছ থেকে মাধুর্য আদায় করা যায় না।

এক সময় অন্য তিনজনও রুষ্ট হয়ে উঠল। একজন বলল, আদম, তুমি যদি একে না চাও, তবে একে এই পবিত্র উদ্যান থেকে দূর করে দেওয়া যাক!

আদম বলল, আমি আর ওর মুখ দর্শনও করতে চাই না! আমি নিঃসঙ্গ থাকব, সে-ও ভালো।

সকলে মিলে টানতে-টানতে অনেক দূর নিয়ে গিয়ে লিলিথকে কাননের বাইরে নিক্ষেপ করল। সে জায়গাটি ঢালু হয়ে নেমে গেছে নীচের দিকে। সেখান থেকে গড়াতে-গড়াতে সে গিয়ে পড়ল পাহাড়ের সানুদেশে এক নদীতে। ভাসতে লাগল, অচেতন হয়ে।

তবু তার প্রাণ গেল না। তারপর থেকে সে আশ্রয় নিয়েছে এক গিরিগুহায়। এ পাহাড়েও কিছু গাছপালা আছে। তেমন বৈচিত্র্য নেই বটে, তবে ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য যথেষ্ট ফল পাওয়া যায়।

প্রথম কয়েকটা দিন কেটেছিল শুধু কান্নায়।

সে বুঝতেই পারে না, তার কী দোষ হয়েছিল? সে শুধু আদমের সঙ্গে সব ব্যাপারে সমান হতে চেয়েছিল, সে অধিকার তাকে কেন দেওয়া হবে না? সে তো অতিরিক্ত কিছু দাবি করেনি!

মানুষের এত কান্না কোথায় জমা থাকে? অবিরত ক্রন্দনেও অশ্রু ফুরোয় না।

কান্নাতে কোনও কিছুর উত্তরও পাওয়া যায় না।

সৃষ্টিকর্তা মানুষকে দিয়েছেন মান-অভিমান, অন্য কোনও প্রজাতি এই বোধ পায়নি। এই অভিমান কখনও এমন তীব্র হতে পারে যে কোনও-কোনও মানুষ স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করতেও দ্বিধা করে না। লিলিথও কয়েকবার নদীর জলে আত্মবিসর্জন দেওয়ার কথা চিন্তা করেছে, শেষপর্যন্ত পারেনি।

কিছুদিন পরে তার মন দুর্বল হয়ে গেল। দিনগুলি তবু কাটে কিন্তু রাত্রিগুলি যেন শেষই হতে চায় না। নিঃসঙ্গতা তাকে অসহ্য অস্থির করে দেয়। আদমের সঙ্গে তার কয়েকটি ঋতু একসঙ্গে সহবাস করার সুখস্মৃতি তার মনে পড়ে সর্বদা। সেই স্মৃতিতেই তার সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ হয়।

একদিন সে ঠিক করল, এভাবে জীবনযাপন করা অর্থহীন। বরং আদমের প্রভুত্ব মেনে নেওয়াও ভালো। আদমের সব ইচ্ছা সে মান্য করে চলবে। আদমের কাছে গিয়ে দয়া ভিক্ষা করলে কি আদম তাকে ফিরিয়ে নেবে না?

পুরুষের নীচে থাকাই যদি নারীর নিয়তি হয়, তবে তা অস্বীকার করে লাভ কী?

এই সবকথা সে ভাবে, মনস্থির করতে পারে না, ফিরে যাওয়ার মতন মনোবলও আসে না। এরই মধ্যে এক প্রভাতে সৃষ্টিকর্তার সেই তিন দূত এসে উপস্থিত হল তার সামনে।

প্রথমজন, সেনয় বলল, তোমাকে নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হয়েছিল, সেই দণ্ড প্রত্যাহার করা যেতে পারে, যদি তুমি পূর্বশর্তগুলি মেনে নাও।

দ্বিতীয়জন, সানসেনয় বলল, তুমি আর চাপল্য দেখিয়ে পুরুষের সমান হতে চেয়ো না। তোমার আরও সুখের দিন আসন্ন। আদমের অনুগত হয়ে তুমি থাকবে সেই পবিত্র কাননে।

তৃতীয়জন, সেমনগেলফ কিছুটা কৌতুকের সুরে বলল, দ্যাখো, কালে-কালে পুরুষ নিজেই তোমার অনুগত হতে চাইবে, তুমি মুখে কিছু বোলো না।

লিলিথ তো সব শর্ত মেনে নিতে রাজিই। এক মুহূর্তও বিলম্ব না করে সে ফিরে যেতে চায় এই কন্দর ছেড়ে। শুধু তার একটিই আশঙ্কা আছে।

সে নতনেত্রে কম্পিত কণ্ঠে জিগ্যেস করল, আদম বলেছিল, সে আমার মতন সহচরী চায় না। এমনকী সে আর আমার মুখদর্শনও করতে চায় না। তার ক্রোধ কি প্রশমিত হয়েছে? সে কি আমাকে পুনঃগ্রহণ করতে রাজি আছে?

প্রথমজন বলল, আমরা বুঝিয়ে বললে সে অবিশ্যি রাজি হবে। কারণ, এখন তোমার গর্ভে তার সন্তান।

সন্তান? সে আবার কী বস্তু?

তবে কয়েকদিন ধরে লিলিথ অনুভব করছে বটে যে তার নিম্ন উদরটি কিছুটা স্ফীত হয়েছে, মাঝে-মাঝে উদরের গভীরে কী যেন নড়াচড়া করে।

আহত অভিমানে লিলিথ বলল, আমার জন্যে সে ব্যাকুল হয়নি। আমার গর্ভে কিছু একটা এসেছে বলেই সে আমাকে গ্রহণ করতে চায়?

দ্বিতীয় দূত বলল, শোনো নারী, তোমার মধ্য দিয়ে পুরুষ তার বংশ বিস্তার করবে বলেই তোমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। নইলে আদমের সঙ্গী হিসেবে তো আর একটি পুরুষকেই নির্মাণ করা যেত! সৃষ্টিকর্তা তো নিজ হাতে বারবার মানব সৃষ্টি করতে পারেন না, সে ভার দেওয়া হয়েছে পুরুষকে। তুমি হবে ভবিষ্যৎ মানবদের গর্ভধারিণী।

লিলিথ বলল, আমি ধারণ করব? বেশ! কিন্তু কখন, কোন ঋতুতে আমার শরীর গ্রহণক্ষম হবে, তা আমি ঠিক করতে পারব না? আমারই তো শরীর?

প্রথম দূত বলল, শরীর তোমার। তুমি আধার মাত্র। তোমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না।

আবার দপ করে জ্বলে উঠল লিলিথের তেজ।

সে বলল, আমার বাসনার কোনও মূল্য দেওয়া হবে না? আমি চাই না অমন মিলন। আদমকে গিয়ে বলুন, আদম নিজে এসে যদি আমাকে যাচ্ঞা করে, তবেই আমি ফিরে যাব। নইলে আমার গিরিকন্দরই ভালো।

এরপর কিছুক্ষণ ধরে তিনজন দূত নরম ও গরম ভাষায় লিলিথকে বোঝাবার চেষ্টা করল, কিন্তু অনড় হয়ে রইল লিলিথের জেদ। আদম নিজে এসে তার মিলন ভিক্ষা না করলে সে এখান থেকে এক পাও নড়বে না!

তখন প্রথম দূত আঙুল তুলে অভিশাপ দিল, তবে থাক তুই এখানে চিরনির্বাসিতা হয়ে। তোর গর্ভের সন্তানকে আমি ধ্বংস করে দিচ্ছি! পুরুষের বীর্যে আর তোর অধিকার রইল না। তুই আর কোনওদিন সন্তান পাবি না।

সেই অভিশাপে প্রায় দগ্ধ হয়ে ভূপতিত হয়ে রইল লিলিথ।

গর্ভ নষ্টে অসুস্থ হয়ে রইল দিনের-পর-দিন। তবু তার অদম্য প্রাণশক্তি। তার মৃত্যু হল না।

আবার শরীরের বল ও রূপ ফিরে পেয়ে সে সিদ্ধান্ত নিল, আর তার সঙ্গীর প্রয়োজন নেই। সে পশু-পাখি, বৃক্ষ-লতাপাতার সঙ্গেই বন্ধুত্ব করে নেবে। যদি আকাশকে আপন করে নেওয়া যায় তাহলে আর কোথাও শূন্যতা থাকে না।

তবু মন যে মানতে চায় না। এক-এক সময় বড় বেশি উতলা হয়ে ওঠে। জল যেমন জলের দিকে ধায়, তেমনই শরীর পেতে চায় আর-একটি শরীর। রতি-অতৃপ্তির জন্য দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

এইভাবে আরও দুটি ঋতু পার করে দেওয়ার পর আজ সে আর নিজেকে সংযত রাখতে পারেনি সারারাত নিদ্রহীনতার মধ্যে সে শুধু আদমের কথাই চিন্তা করেছে। সমস্ত শরীর-মন আকুল হয়ে আছে সেই পুরুষটির জন্য।

তাই ভোরের আলো ফোটার আগেই দীর্ঘপথ পার হয়ে সে গোপনে প্রবেশ করেছে আদিম কাননে। সে শুধু একবার মাত্র আদমকে প্রশ্ন করবে, সখা, তুমি সত্যিই আমাকে আর চাও না? তুমি আমাকে ঘৃণা করো? যদি তাই হয়, তাহলে আমি আর কখনও তোমার সম্মুখে আসব না। তোমাকে আর আমার মুখদর্শন করতে হবে না। আমি চিরবিদায় নেব! আমাদের সেই মধুর দিনগুলি তোমার কাছে তুচ্ছ হয়ে গেছে।

দূর থেকে একবার আদমকে দেখেও লিলিথ তার নিকটে যেতে সাহস পেল না। যদি আদম রূঢ় বাক্যে তাকে প্রত্যাখ্যান করে, তবে তা সে সইতে পারবে তো? বরং দূর থেকে যতক্ষণ পারা যায়, আদমের জীবনযাত্রা লক্ষ করা ভালো, সে যদি আপনমনে কখনও লিলিথের নাম উচ্চারণ করে ফেলে, কিংবা যে-যে স্থানে তাদের রতিশয্যা পাতা হয়েছিল, সেইসব স্থানে যদি আদম একাকী গিয়ে শুয়ে থাকে, তবে হয়তো তার স্মৃতিকাতরতা বোঝা যাবে।

ছায়ার মতন আদমকে অনুসরণ করতে লাগল লিলিথ।

না, ঠিক ছায়া বলা যায় না, মাঝখানে দূরত্ব অনেকখানি। আর সে সবসময় নিজেকে আড়ালে রাখে। হাঁটে নিঃশব্দে। আদম কোথাও থেমে গেল সে-ও কোনও বৃক্ষের নীচে অপেক্ষা করে।

একবার আদম সেই শুষ্ক নদীর খাতের ধার দিয়ে গেল, যেখানে এক বর্ষণমুখর দিনে তাদের প্রথম মিলন হয়েছিল। আদম সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করল না।

লিলিথ লক্ষ করল, আদমের যেন কিছু-কিছু পরিবর্তন হয়েছে এর মধ্যে। মাঝে মাঝে সে কণ্ঠে একটা সুর তুলছে গুনগুন করে। আগে এমন শোনা যায়নি। বৃক্ষ-লতাদের মধ্যে শুধু ফলবান বৃক্ষদের প্রতিই ছিল তার আকর্ষণ, তার প্রিয়, নির্বাচিত ফল আহরণের জন্য। ফুলের প্রতি মনোযোগ দিত না। এখন সে স্নেহস্পর্শে দিচ্ছে ফুল্ল কুসুমকে। কোনও লতাকে জড়িয়ে দিচ্ছে বনস্পতির গায়ে।

এক স্থলে একসঙ্গে অনেক ফুল ফুটে আছে, সেসব ছিঁড়ে নিয়ে আদম বসে পড়ল মাটিতে। তারপর গাঁথতে লাগল মালা। লিলিথের বেশ কৌতূক বোধ হল। যখন দুজনে একসঙ্গে ছিল, তখন লিলিথ কখনও-কখনও মালা গেঁথেছে বটে, পরেছে নিজের গলায়। আদমকেও পরাতে গেছে, কিন্তু আদম স্বস্তি বোধ করেনি, ছিঁড়ে ফেলেছে একটুক্ষণ পরেই।

আজ আদম মালা গাঁথছে নিজের কণ্ঠে ধারণ করার জন্য? তবে কি লিলিথের কথা মনে পড়ছে তার? এবার সে আদমের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারে?

তার দ্বিধা কাটার আগেই আদম মালাটি গেঁথে, উঠে দাঁড়াল। নিজের গলায় দিল না। মালাটি হাতে নিয়ে ছুটতে শুরু করল। উচ্চকণ্ঠে কী যেন একটা শব্দ বার করছে।

লিলিথও তাল রক্ষা করে ছুটতে লাগল, সেই দিকে।

একটুক্ষণ পরেই সে থমকে দাঁড়াল। হঠাৎ যেন শ্বাস বন্ধ হয়ে গেল তার। আর-একটি নারী!

আদম ছাড়া এ উদ্যান জনশূন্য বলে ধরেই নিয়েছিল সে। তা তো নয়, এর মধ্যেই আদমের একটি সঙ্গিনী এসে গেছে। সৃষ্টিকর্তা গড়ে দিয়েছেন আর-একটি নারী? সৃষ্টিকর্তাও লিলিথের সব অধিকার প্রত্যাহার করে নিয়েছেন?

অপর নারীটিও প্রায় লিলিথেরই আদলের। শুধু সে লিলিথের মতন তীক্ষ্ণনাসা নয়, চক্ষু দুটিতে ঘুম-ঘুম ভাব। এ ছাড়া তার বক্ষের ডৌল, কোমরের খাঁজ ও নিতম্বের গড়ন একেবারে নিখুঁত।

সেই নারীটি কয়েকটি বড়-বড় গাছের পাতার ওপর কিছু ফলমূলের আবরণ-ত্বক ছাড়িয়ে রাখছে। আদমকে দেখে সহাস্যে সম্ভাষণ জানাল।

আদম সেখানে বসে পড়ে মালাটি পরিয়ে দিল নারীটির কণ্ঠে। নারীটি পুলকিত হয়ে ফুলগুলি দেখল প্রথমে। তারপর একপাতা ফল তুলে একটি-একটি করে খাওয়াতে লাগল তার পুরুষকে।

লিলিথ কখনও আদমের মুখে ফল তুলে দেয়নি, কখনও একই ফল ধরেছে দুজনে দু-দিক থেকে। কিংবা যার যখন ক্ষুধা বোধ হয়েছে, বৃক্ষ থেকে ফল আহরণ করে ভক্ষণ করেছে।

ওদের আহার শেষ হওয়ার পর নারীটি চলে এল আদমের পিঠের দিকে। সেই ঘর্মাক্ত, প্রশস্ত পৃষ্ঠদেশে হস্ত সঞ্চালন করতে লাগল সে।

কৌতূহল সংবরণ করতে না পেরে অতি সন্তর্পণে লিলিথ আর-একটু কাছে এল।

আদমের পৃষ্ঠদেশে ছোট-ছোট সাদা সাদা কী যেন হয়েছে। ওগুলি ঘর্মচর্চিকা, অন্য নারীটি তার নখ দিয়ে চেপে ধরেছে সেগুলিকে। বেশ আরাম বোধ হচ্ছে আদমের।

তারপর আদম লম্বা হয়ে শয়ন করল। আবার এদিকে চলে এসে নারীটি পদসেবা করতে লাগল তার। আদমের চক্ষু বুজে এল, তরুণীটি দু-হাতে মর্দন করতে লাগল তার পা।

এসব কিছু জানেই না লিলিথ।

সে আর অশ্রু সংবরণ করতে পারল না। পাছে তার কান্নার শব্দ হয়, তাই দ্রুত সরে গেল সেখান থেকে।

একটি ঝরনার ধারে এসে ঝুঁকে পড়ে সে তার অশ্রুবিন্দু মেশাতে লাগল জলে।

দু-একবার আদমের ডাক শুনে সে বুঝতে পেরেছে, ওই দ্বিতীয় নারীটির নাম হবা। এখন এই পবিত্র উদ্যান শুধু ওদের দুজনের। লিলিথ আর এখানকার কেউ নয়। আদম আর কোনওদিন তাকে কামনা করবে না।

কতক্ষণ মনোবেদনায় আচ্ছন্ন হয়ে রইল লিলিথ তার ঠিক নেই। এক সময় নিদ্রিত হয়ে পড়ল সেখানেই। সর্বসন্তাপহারী নিদ্রা।

আবার যখন যে জাগরিত হল, তখন দিনমণি অস্তাচলে গেছেন। আকাশের অধিপতি এখন চন্দ্র। আজ আকাশ একেবারে নির্মেঘ। চন্দ্রকিরণে সমস্ত কানন অপরূপভাবে আলোকিত হয়ে আছে। সুপবন আমোদিত হয়ে আছে ফুলের সৌরভে।

ফিরে যেতে হবে, তবু পা উঠছে না লিলিথের। আজ থেকে সে একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেল। কোনও আশাও রইল না।

বঞ্চনার দুঃখ থেকে হঠাৎ-হঠাৎ দপ করে জ্বলে উঠতে পারে রোষবহ্নি। লিলিথের রক্তপ্রবাহ দ্রুত হল, নাসারন্ধ্র দিয়ে বেরোতে লাগল উষ্ণ নিশ্বাস। জ্বলন্ত হল দুই চক্ষু।

সে তার সব অধিকার ছেড়ে দেবে? কী অপরাধ করেছে সে! সে এখনও মনে করে, সৃষ্টিকর্তা তাকে আর আদমকে সমানভাবে গড়েছেন। তবু কেন আদমের প্রতি তাঁর এই পক্ষপাতিত্ব?

সৃষ্টিকর্তা কি জানেন, নারীর মান-অভিমান বোধের চেয়েও আর-একটি বোধ কত প্রবল হতে পারে? তার নাম ঈর্ষা।

পূর্বাপর চিন্তা না করে সে ধেয়ে গেল আদম ও হবার সন্ধানে।

এক স্থানের ঘন লতাকুঞ্জের মধ্যস্থলে খানিকটা ভূমি পরিষ্কার করে লিলিথ রাত্রিযাপন করত আদমের সঙ্গে। স্থানটি প্রায় চারদিক ঘেরা। প্রথমেই লিলিথ গেল সেদিকে।

ঠিক সেখানেই শুয়ে আছে দুজনে। এ নীড় তো লিলিথেরই গড়া, এখানে অন্য নারীকে স্থান দিতে একটুও চক্ষুলজ্জা হল না আদমের?

দুজনেই নিদ্রায় বিভোর। আদম শুয়ে আছে আকাশমুখী হয়ে, হাত-পা ছড়িয়ে। এটাই তাঁর শয়নের নিত্যদিনের ভঙ্গি। হবা একটু দূরে গুটিসুটি হয়ে ঘুমন্ত।

একটুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে রইল লিলিথ। শুধু আকাশের চন্দ্র ছাড়া আর কেউ তাকে দেখছে না। ঈষৎ শীতের বাতাসের মধ্যেও তার শরীরে ফুটে উঠেছে বিন্দু-বিন্দু স্বেদ।

হঠাৎ আর আত্মসংবরণ করতে পারল না লিলিথ। সে সোজা গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল আদমের উন্মুখ বক্ষে।

সঙ্গে-সঙ্গে জেগে উঠল আদম। স্পর্শমাত্রই সে বুঝেছে, এ তার বর্তমান সঙ্গিনী নয়, পূর্বের নারী।

সে চিৎকার করে বলল, আবার তুই এসেছিস।

সে ঠেলে সরিয়ে দিতে গেল লিলিথকে। লিলিথও কিছুতেই নিজের দাবি ছাড়বে না।

ধস্তাধস্তির শব্দে জেগে উঠল হবা। সে বিস্ময়ে বিহ্বল। সে লিলিথের অস্তিত্বই জানে না। সে ভাবল, এ বুঝি কোনও অপ্রাকৃত উৎপাত।

সে-ও টেনে সরাতে গেল লিলিথকে। লিলিথের শরীরে যেন এখন দারুণ শক্তি, ওরা দুজনে মিলেও তাকে নিরস্ত করতে পারছে না।

অচিরে হাজির হল সৃষ্টিকর্তার সেই তিন দূত। এবারে লিলিথের চুলের মুঠি ধরে দাঁড় করিয়ে দিল তারা। আর শুধু ভর্ৎসনা বা কটুবাক্য নয়, নির্মমভাবে প্রহার করতে-করতে নিয়ে চলল এই নারীকে। রক্তাক্ত হয়ে গেল লিলিথের সর্বাঙ্গ।

এক ঘৃণ্য প্রাণীর মতন কাননপ্রান্তে তাকে ছুড়ে দিয়ে সেই দূতত্রয় বলল, এই শেষবার! আবার এখানে এলে তোর মৃত্যুদণ্ড অনিবার্য।

অত প্রহার সত্ত্বেও লিলিথ ভয়ও পায়নি, তার ক্রোধও কমেনি। প্রতিশোধস্পৃহায় তার রক্ত এখনও ফুটন্ত।

গুহার দিকে যেতে-যেতে সে একটি বৃক্ষের নীচে একটি বিচিত্র প্রাণীকে দেখতে পেল। এ সেই স্থূলকায় সর্পটি, খোলস এখনও লেগে আছে, তার থেকে বেরিয়ে এসেছে একটি প্রায় মনুষ্যাকৃতি মুখ, তার মস্তকে দুটি ছোটো শৃঙ্গ।

মনুষ্য ভাষায় সে বলল, 'দাঁড়াও, লিলিথ। তুমি আমাকে চিনতে পারোনি। তোমার সৃষ্টিকর্তার চেয়ে আমি কিছু কম শক্তিশালী নই। আমর নাম ইবলিশ। তুমি আমার সঙ্গিনী হও। আমরা দুজনে মিলে তোমার সৃষ্টিকর্তার এই অবিচারের প্রতিশোধ নেব!

লিলিথ তার সৃষ্টিকর্তাকে দেখেছে। সে ছিল আদমের মতন সুপুরুষের মিলনসঙ্গিনী। সে এখন এই কদাকার প্রাণীটির সঙ্গিনী হবে? তার ঘৃণাবোধ হল। প্রতিশোধ নিতে হলে সে একাই নেবে। সে সদর্পে বলল, তুমি দূর হও।

লিলিথ ফিরে চলল তার গুহার দিকে। সে ঠিক করেছে, সে আর কখনও কাঁদবে না।

আহত বাঘিনীর মতো সে চাটতে লাগল নিজের শরীরের ক্ষতস্থানগুলি।

সে রাত্রে বিস্ময়ে ও ভয়ে বড় বেশি আপ্লুত হয়ে পড়েছিল হবা। আদম অনেকক্ষণ ধরে নানারকম সান্ত্বনা বাক্যে তাকে আশ্বস্ত করতে সমর্থ হল। প্রকৃতির উপাদান নয়, হবাকে গড়া হয়েছে আদমেরই একটি পঞ্জর দিয়ে। তাই সে আদমের সঙ্গে একাত্ম, সে সবসময় আদমের কথা মান্য করে। আদম বারবার বলল, ওই হিংস্র রমণীটি আর কখনও আসবে না। সৃষ্টিকর্তার দূতরা নজর রাখবেন, ওই রমণী আবার এই কাননে পদপাত করলেই মৃত্যুমুখে পতিত হবে। তুমি আর চিন্তা কোরো না, হবা। সব চিন্তার ভার আমার।

কিন্তু কয়েকদিন পরেই ফিরে এল লিলিথ। দূতদের অগোচরে।

মধ্যরাত, আদম ও হবা দুজনেই নিদ্রাবিষ্ট। যথারীতি হবা একটু দূরে, কারণ আদম ঘুমের মধ্যেও হাত-পা সঞ্চালিত করে। চিৎপাত হয়ে শয়ন করতেই ভালোবাসে সে।

অকস্মাৎ আদম টের পেল তার বক্ষের ওপর কেউ এসে পড়েছে। চেনা স্পর্শ, অবশ্যই লিলিথ। আদম তাকে ঠেলে সরাতে গেল, কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, তার হাত দুটি শক্তিহীন অবস্থায় পাশে পড়ে রইল, উঠল না। চিৎকার করতে গেল, ফুটল না কণ্ঠ। সে পাশ ফিরে হবাকে ডাকতে

গেল। সক্ষম হল না। এমনকী সে মেলতেও পারল না চক্ষু। সে নীচে, ওপরে লিলিথ তার সর্বাঙ্গ জুড়ে আছে। তাকে নিজের গভীরে নিতে চাইছে। তার দুই রম্ভোরু দিয়ে দিচ্ছে প্রবল চাপ। বাধা দেওয়ার সব শক্তিই চলে গেল আদমের। আবেশ ছড়িয়ে পড়ল দেহ জুড়ে। তার রেতঃপাত হয়ে গেল একসময়।

তারপরই ধড়মড় করে উঠে বসল আদম।

কোথায় লিলিথ? সে তো নেই। সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ রাত, ভূমিতে খসে পড়া শুষ্ক পত্ররাজিতেও কোনও পদশব্দ শোনা যাচ্ছে না। হবাও জাগেনি, নিশ্চিন্তে নিদ্রিত। তবে কি লিলিথ হানা দিয়েছিল শুধু স্বপ্নে! কিন্তু সে বীর্য হরণ করেছে, তা স্বপ্ন নয়, সত্য।

হবাকে কিছুই বলল না আদম। বিমূঢ় হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ।

তারপর কেটে গেল বহু ঋতু ও যুগ। অনেক পুত্রকন্যার জন্ম দিল দুজনে। তাদেরও সন্তান-সন্ততি হল। বৃদ্ধ হয়ে পিতামহ ও পিতামহী হিসেবে সুখ ভোগ করে এক সময় আদম ও হবা বরণ করল মৃত্যু।

লিলিথ কিন্তু রয়ে গেল।

অতৃপ্ত, বঞ্চিত, অপূর্ণ রতির ক্ষোভ নিয়ে সে বেঁচে রইল যুগের-পর-যুগ। তার নশ্বর শরীর অদৃশ্য হয়ে গেল বটে, তবু সে দেখা দেয় যুবা পুরুষদের স্বপ্নে।



ভূমি ও আকাশ

প্রথমেই গণ্ডগোল লাগল ফাগুলালের সঙ্গে। প্রতিবছরই এরকম হয়। লোকটা যেমন বেপরোয়া, তেমনি ঠ্যাটা।

সব গ্রামেই সাধারণত এক ধরনের মানুষ থাকে, বাপ-ঠাকুরদারা যা বলে গেছেন, তা মেনে চলে, গণ্ডির বাইরে যেত চায় না, সরপঞ্চ বা গুনিনদের নির্দেশ অমান্য করতে সাহস পায় না।

আবার প্রত্যেক গ্রামেই থাকে একজন নিরেট বোকা। সে সব কথায় হে-হে করে হাসে, যেমন ছোটে কুঁয়ার। আর থাকে একজন অতি চালাক। সে এই ফাগুলাল।

ছোটে কুঁয়ার মোটাসোটা, মাঝারি উচ্চতা, লুঙ্গি পরে, কখনও-কখনও একটা ছেঁড়াখোঁড়া খাকি প্যান্ট, কিন্তু কেউ কোনওদিন তার ওপর গায়ে জামা-টামা কিছু দেখেনি। তার বাবা আর্মিতে ছিল, পুঞ্চের যুদ্ধে মাটি নিয়েছে। ওই খাকি প্যান্টটা ছোটে কুঁয়ারের বাবার উত্তরাধিকার।

আর ফাগুলাল লম্বা, ছিপছিপে, মাথা ভরতি চুল, সে ফুলপ্যান্ট আর শার্ট পরে, খুব গরমের সময় গেঞ্জি, আর সবসময় তার গলায় বাঁধা থাকে একটা সবুজ রুমাল। তার গলার আওয়াজ তীক্ষ্ণ, তাতে মিশে থাকে বিদ্রূপের ছোঁয়া।

ফাগুলাল মাঝে-মাঝে শহরে ফুরন খাটতে যায়, তার মুখে পড়েছে সেই শহুরে ছাপ। অকারণেই সে রোজ দাড়ি কামায়।

ভালু আর গণেশদাস তার কাছে চাঁদা চাইতেই, সে ডান হাতের পাঞ্জা নাড়তে-নাড়তে অবজ্ঞার সঙ্গে বলল, 'ভাগ হিঁয়াসে। চান্দা। যত্ত সব বুজরুক!'

গণেশদাস বলল, 'আরে হারামি, পঞ্চায়েত থেকে বলে দিয়েছে, সবকোইকো পাঁচ রুপ্যে

চান্দা দেনেই হোগা।'

ফাগুলাল হাসতে-হাসতে বলল, 'আমি হারামি, তুইও হারামি। ঠিক হ্যায়? তোর বাপও হারামি। আমি পঞ্চায়েতের খাই না পরি? আমি টাউন থেকে পয়সা রোজগার করে আনি; সেই পয়সায় খাই। কখনও মাঠে যাই না!'

পেছন থেকে ছোটে কুঁয়ার হে-হে করে হেসে উঠল।

গণেশদাস একটু চুপসে গিয়ে বলল, তুই পুকুরে গোসল করিস, সেটা পঞ্চায়েতের।'

ফাগুলাল বলল, 'সেটা আমার বাপের।'

গণেশদাস মনে-মনে ঠিক করল, সরপঞ্চের কাছে এর নামে নালিশ করতে হবে। সে আর কথা বাড়াল না।

ওরা হাঁটতে লাগল অন্য একটা বাড়ির দিকে।

আকাশে যেন গড়াচ্ছে আগ্নেয়গিরির লাভা। আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি চলে এল। এখনও একটুও বৃষ্টির নামগন্ধ নেই, এ-বছরে মেঘেরা যেন বুন্দেলাখণ্ডের কথা ভুলেই গেছে।

ভালু একবার পেছন ফিরে দেখল, ফাগুলালও আসছে তাদের সঙ্গে। ছোটে কুঁয়ারও আছে, কিন্তু তার তো কোনও কাজকম্ম নেই, মানুষ দেখলেই সে পেছন-পেছন ঘোরে।

ভালু জিগ্যেস করল, 'তুই কোথা যাচ্ছিস রে ফাগু?'

ফাগুলাল বলল, মজাক মারতে যাচ্ছি, দেখি কে-কে চাঁদা দেয়!'

ভালু বলল, 'শালা, তুই ছাড়া আর সব আদমি দেবে! তোর মতন আর তো কেউ টৌনে গিয়ে কেরেস্তান হয়নি!'

ফাগুলাল বলল, 'তোর এক চাচা টাউনে গিয়ে সেপাই হয়েছিল, তাই না? সে কি কেরেস্তান?'

এরা কেউই তর্ক করা পছন্দ করে না। দুটো-একটা কথার পরই যুক্তি ফুরিয়ে যায়। তাই ভালু বলল, 'যা ভাগ।'

ফাগুলাল তবু সঙ্গ ছাড়ল না।

একটা খেজুরগাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে সাহেবঝরি। তার সাদা কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম। ফুটিফাটা মাঠে পড়ে আছে তার হাত-লাঙল। এখন মাটি চষার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

তার নাম কেন সাহেবঝরি, তা এখন আর কেউ জানে না। ছেলেবেলা থেকে সবাই এই নাম শুনে আসছে। ওর গায়ের রং অন্য অনেকের তুলনায় ফরসা। বাবুদের মতন।

গণেশদাসের হাতে একটা থলি। সে বলল, 'এ-সাহেবুয়া, দে, পাঁচ রূপ্যে চাঁন্দা দে!'

সাহেবঝরি তার গামছার খুঁট খুলতে-খুলতে বলল, 'তিন রূপ্যে এখন নিয়ে যা। আর দু-রূপ্যে পরসোঁ দিয়ে দেবে, কিরিয়া করে বলছি। ঠিক দিয়ে দেবে! আজ ঘরে ভাত নেই রে বুবুয়া!'

গণেশদাদা বলল, 'বৃষ্টি না হলে যে সব্বাইকে না খেয়ে মরতে হবে! পরসোঁয় ঠিক দিবি তো বাকি দু-রূপ্যে?'

ফাগুলাল এগিয়ে এসে বলল, 'দিস না ঝরি। এক পয়সা দিস না। সব বুজরুকি!'

গণেশদাস আর ভালু দুজনেই তার দিকে ফিরে দাঁড়াল। এটা অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ। ফাগুলাল নিজে দিতে চাইছে না, সেটাই ক্ষমার অযোগ্য, তার ওপরে সে অন্যদের বাধা দিচ্ছে? এ গ্রামে এরকম কখনও হয়নি।

মুখখানা হিংস্র করে ভালু বলল, 'শালে, এবার এক ঝাপড় খাবি!'

ভালুর গাঁট্টাগোঁট্টা পেটা চেহারা, সে এরকম কথা বলতে পারে। তার সারা গায়ে, এমনকী হাতের তালুর পেছন দিকেও বড়-বড় লোম, সেই জন্যই বোধহয় তার ডাক নাম ভালু।

কিন্তু সে কিছু করবার আগেই ছোটে কুঁয়ার ছুটে এসে এক চড় কষাল ফাগুলালের গালে। বেশ জোরেই মেরেছে। ফাগুলাল একটু টলে গেল।

এসব ক্ষেত্রে কেউ বাধা দেয় না। অন্যরা একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখে।

ফাগুলাল প্রত্যাঘাত করল না, হাত বুলোতে লাগল গালে। তার পেশিতে আছে বিদ্যুৎগতি, শরীরে আছে নিহিত শক্তি। সে ইচ্ছে করলে ছোটে কুঁয়ারকে মেরে ছাতু করে দিতে পারে।

কিন্তু ফাগুলাল ভাবল বেচারি অবোলা, অবোধ। কেন মেরেছে তা ও নিজেই জানে না। কয়েক মুহূর্ত বাদে সব ভুলে যাবে।

শান্তভাবে ফাগুলাল বলল, 'এইসান কভি নেহি মারনা কুঁয়ার। মানুষকে মারলে তার খুব লাগে। তোকে মারলে তোরও খুব লাগবে। তখন কী করবি?'

ছোটে কুঁয়ার কী বুঝল কে জানে, হেসে উঠল হি-হি করে।

এই সময় দেখা গেল, দূর থেকে দু-একজন প্রবীণ ব্যক্তি হেঁটে আসছে। এ গ্রামের সবাই তাদের খুব ভক্তিশ্রদ্ধা করে। সে সম্মান শুধু বয়েসের কারণে, নইলে দুজনের চেহারাতেই দারিদ্র্যের চিহ্ন প্রকট। একজনের গায়ে জড়ানো গামছাটাও শতছিন্ন।

সব বৃত্তান্ত শুনে, তাদের মধ্যে যার নাম শিবুমামা, সে বলল, 'এ কী কাণ্ড তুই করছিস রে ফাগু? তুই চান্দা দিবি না, তোর নাম আমি খারিজ করে দিয়েছি। কিন্তু তুই অন্যদের বারণ করেছিস কোন সাহসে?'

ফাগুলাল বলল, 'বেঙা-বেঙরি বিয়ে দিলে বৃষ্টি হবে? ইয়ে সব বাকোয়াস! গরিবদের কাছ থেকে শুধু-শুধু চান্দা নিচ্ছ!'

অন্য প্রবীণটর নাম মগনরাম। সে বলল, 'আলবাত হোবে! দু-সাল আগে হয়েছিল। মনে নেই? সবকোইকো ইয়াদ হ্যায়?'

ফাগুলাল হেসে উঠে বলল, 'বেঙা-বেঙরি বিয়ে? মামা, তুমি বলো তো, কোনটা বেঙা আর কোনটা বেঙি কেউ চেনে? বলো না, কেউ চেনে?'

ব্যাং পাওয়া মোটেই সহজ নয়। বর্ষার সময় ব্যাং ডাকে, এই প্রখর গ্রীষ্মে তারা কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে যায়।

প্রধান পানীয় জলের পুকুরটাও এখন শুকিয়ে-শুকিয়ে কাদা-কাদা। সেখানে অনেক খুঁজে দুটো ব্যাং পেলেই হল। ডাক শুনে, ব্যাঙের লিঙ্গ চেনার মতো কান এখানকার কারোরই নেই।

তবু দুটো ব্যাং পাওয়া গেলেই তাদের ফুল-দুব্বো দিয়ে পুজো করা হয়। যে-কোনও বিয়ের দৃশ্যের মতনই বউ-ঝিরা গান গায়, পুরুষরা নাচে, চাঁদার টাকায় মদ ও মাংস আসে। বেশ একটা উৎসব উৎসব ভাব। খরাক্লিষ্ট মানুষরা এই সময় একটা দিন অন্তত দুশ্চিন্তা ভুলে আনন্দে মেতে ওঠে।

যেহেতু আষাঢ় মাস, তাই দেরি হলেও বৃষ্টি তো হবারই কথা। ওই উৎসবের দু-এক দিনের মধ্যে হুড়মুড়িয়ে বৃষ্টি নামলে সবাই ধরে নেয়, ব্যাঙের বিয়ের জন্যই বৃষ্টি ঢেলে দিল আকাশ।

শত-শত বছর ধরে এই ব্যাপার চলে আসছে। এর একটা ভালো দিক তো আছে অবশ্যই।

অন্য কেউ যদি এরকম বেয়াদপি করত, তা হলে পঞ্চায়েতের সামনে কঠিন শাস্তি দেওয়া হত তাকে।

ফাগুলালের ব্যাপারে সবাই একটু নরম, তার কারণ তার বাবা ছিলেন এ-অঞ্চলের অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি। বহুদিন ধরে তিনি ছিলেন পঞ্চায়েত প্রধান। গরিব দুঃখীদের জন্য তার মনে ছিল অনেক দরদ। তিনিই নিজের উদ্যোগে একটা পুকুর কাটিয়েছিলেন। সেই সিয়ারাম ভগত-এর নাম উঠলেই এখনও অনেকে কপালে হাত ঠেকায়। তিনি হঠাৎ মারা গিয়েছিলেন সাপের কাপড়ে।

ফাগুলাল তার বাবার কোনও গুণই পায়নি। ছেলেটা একেবারে লাফাংগা। খালি চ্যাটাং-চ্যাটাং কথা বলে। ও তো টাউনে থাকলেই পারে, মাঝে-মাঝে ফিরে আসে কেন? ওর মা এখনও বেঁচে আছে, সে বুড়ি এখন অন্ধ। ফাগুলাল কি ফিরে আসে তার মায়ের টানে? মোটেই না। প্রতিবেশীরা

দেখেছে, মায়ের সঙ্গে ও মোটেই তেমন সময় কাটায় না। এদিক-ওদিক ঘুরে খালি ফোঁপরদালালি করে, আর লোকের পেছনে লাগে।

সিয়ারাম ভগতের প্রতি শ্রদ্ধাতেই তার ছেলেকে এখনও পর্যন্ত কোনও শাস্তি দেওয়া হয়নি। কিন্তু এই অবস্থা কতদিন চলবে তার ঠিক নেই। অল্পবয়েসি ছেলে ছোকরারা সিয়ারাম ভগতকে দেখেনি, তারা ফাগুলালের আস্পর্ধা সহ্য করবে কেন? কেউ-কেউ বলে, 'পঞ্চায়েতের মিটিন্-এ সবার সামনে যদি ওকে শাস্তি দেওয়া না যায়, তা হলে একদিন মাঠের মধ্যে ওর গলাটা কেটে রাখলেই তো হয়!'

শিবুমামা বলল, 'তোকে চান্দা দিতে হবে না। তুই যা এখান থেকে। আর কথা বাড়াসনি!'

ফাগুলাল বলল, 'আমি মন বদলে ফেলেছি। হাঁ, চান্দা দিব। জরুর দিব। বিশ রূপ্যে। তবে এখন নয়। বেঙা-বেঙির শাদি হওয়ার দু-দিনের মধ্যে যদি বরাত শুরু হয়।'

শিবুবাবা বলল, 'যা যা, আভি ভাগ হিঁয়াসে।'

শনিবার দুপুরে বেঙা-বেঙির বিয়ে হল। তার মধ্যে একটা কোলাব্যাং, আর-একটা বড়ই ছোট। তাদের কি আর-একজায়গায় বসিয়ে রাখা যায়? কোলাব্যাংটার বোধহয় বিয়ে করার একেবারেই ইচ্ছে নেই, সে মাঝে-মাঝেই তিড়িং করে এক লাফ দিয়ে পালাতে চায়, আবার তাকে ধরে আনতে হয়।

হাঁড়িয়ার মদ জোগাড় হয়েছে প্রচুর। কয়েকজন ঢোল বাজাচ্ছে, স্ত্রীলোকেরা গাইছে সমস্বরে গান। এই একই গান তারা গায় বহু যুগ ধরে।

সন্ধে পর্যন্ত অনেক আমোদ ফূর্তি হল। কয়েকজন এমনই মাতাল হল যে মাটি থেকে আর উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। সারারাত ওখানেই শুয়ে থাকবে।

কোলাব্যাংটা শেষপর্যন্ত পালিয়েছে। ছোট ব্যাংটার নড়বার লক্ষণ নেই, মাঝে-মাঝে কোঁক-কোঁক শব্দ করছে। সে বেচারি বোধহয় বিয়ের দিনেই স্বামীহারা হয়ে দুঃখে কাঁদছে।

এই উৎসবের সময় ফাগুলালকে ধারে-কাছে কোথাও দেখা গেল না। সে একটা গাছতলায় শুয়ে থেকে একটা ঘাসের ডগা মুখে দিয়ে চিবোয়। এটা তার খুব পছন্দের জায়গা।

একদিন, দু-দিন, তিনদিন, তবু বৃষ্টির দেখা নেই। সকাল থেকেই সূর্য কটমট করে তাকিয়ে আছেন। তিনি কোনও মেঘকে এদিকে ঘেঁষতে দেবেন না।

সবার চোখ আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে চোখ লাল হয়ে যায়। এই সময় বীজতলা তৈরি করতে না পারলে আর ফসল তোলার আশা থাকবে না।

ভালুর সঙ্গে একদিন ফাগুলালের দেখা।

সে মিচকি হেসে বলল, 'বিশ রূপ্যে পেলি না তো?'

ভালু বলল, 'আরে যা-যা। তোর টাকায় আমরা মুতে দিই। তোকে তো আর খেতির কাম-কাজ করতে হয় না।'

ফাগুলাল বলল, 'আমি টাউনে চলে যাব। সেখানে বরখা হচ্ছে, খবর পেয়েছি।'

বুড়ো গটগাছতলায় কয়েকজন প্রবীণ লোক প্রায় সব সময়েই বসে থাকে। বিকেলের দিকে মাধো নামে একটি ছেলে ছুটতে-ছুটতে এসে একটা সাংঘাতিক খবর দিল।

পাশের গাঁ বরমোতিয়ায় একটা সার্কাসের দল এসে তাঁবু ফেলেছে।

এই সময় সার্কাস? লোকের হাতে পয়সা নেই, কোনও বাড়িতেই প্রতিদিন উনুন জ্বলে না। পানীয় জলেও টান পড়েছে। এ গাঁয়ের পুকুরটা একেবারে খটখটে শুকনো, মেয়েরা তিন মাইল দূরের এক ঝোরা থেকে কলসি করে জল আনে। সে ঝোরাও এখন ছিরছিরে, একটা কলসি ভরতেই অনেকক্ষণ লাগে, মেয়েদের মধ্যে ঝগড়া লেগে যায়।

তবু সার্কাস দেখতেও যায় মানুষ। যেমন মদের ঠেক এই দুর্দিনেও বন্ধ হয় না।

একজন বলল, 'সার্কাসে এবার হাঁথি এনেছে? হাঁথি?'

শিবুমামা দারুণ ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠল, 'চুপ শালো! হাঁথি? হাঁথি তোর ইয়েতে আমি ঢুকিয়ে দেব! ওই সার্কাসের হারামিরা এসেছে, এখন এক মাইনা এক ফোঁটাও বৃষ্টি হবে না!'

সার্কাসের সঙ্গে অনাবৃষ্টির কী সম্পর্ক তা কেউ-কেউ বুঝতে পারে না। এ-ওর মুখের দিকে তাকায়।

শিবুবাবা বলল, 'ঝড়-বৃষ্টি হলে সার্কাস চলে? তাই ওই শুয়োরের বাচ্চারা বৃষ্টি রুখে দেয়।'

'ওরা কী করে বৃষ্টি রুখে দেয়?'

'তুক করে।'

'কী করে তুক করে?'

'ওরা তাঁবু খাটাবার জন্য বড়-বড় পেরেক আর গজাল পোঁতে মাটিতে। ওই লোহার গজালে মন্ত্র পড়ে দেয়। যতদিন সেই গজাল পোঁতা থাকবে, ততদিন আকাশে মেঘ আসবে না!'

যুক্তিটা এবার সবারই অকাট্য মনে হয়।

সত্যিই তো, বৃষ্টি পড়লে ওদের বেওসার ক্ষতি। বৃষ্টি হলে মানুষজন যাবে না। তাই ওরা মেঘ তাড়িয়ে দেয়। আর বৃষ্টির অভাবে যে এতগুলো গ্রামের মানুষ ধুঁকছে, তা ওদের খেয়াল নেই।

সার্কাসওয়ালাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ জমতে থাকে। প্রথমে কেউ-কেউ বলে, সার্কাসের ম্যানিজারকে গিয়ে অনুরোধ করবে, সেই মন্ত্রপড়া গজালটা তুলে দিতে মাটি থেকে।

ম্যানিজার যদি সে কথা না শোনে? কিংবা লোক দেখানোভাবে অন্য একটা গজাল তুলে দিয়ে বলে, 'এই তো ফেলে দিলাম।'

দল বেঁধে সবাই চলল সেই সার্কাসের তাঁবুর দিকে। ক্রমশ দল বাড়তে লাগল। কারুরই এখন কোনও কাজ নেই, এই একটা ভর-উত্তেজনার ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে।

ম্যানিজারবাবু প্রথমে ওদের কথা হেসে উড়িয়ে দিল। তারপর শুরু হল তর্কাতর্কি। আচমকাই শুরু হয়ে গেল ভাঙচুর।

লোকজনের হল্লার সঙ্গে মিশল জন্তু-জানোয়ারের নানারকম রব। বাঁদর আছে। দুটো ভাল্লুক, তিনটে হাতি, এমনকী একটা বাঘও রয়েছে।

খুব বেশি ক্ষতির সম্ভাবনা দেখে ম্যানিজারবাবু একটা বন্দুক নিয়ে এসে দুবার গুলি চালাল আকাশের দিকে।

তারপর কড়া গলায় বলল, 'ঠিক হ্যায়। তাঁবু গুঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। কত গেরাম আমাদের সেধে-সেধে ডাকাডাকি করে, আমাদের কি যাওয়ার জায়গার অভাব? কিন্তু কেউ যদি আমার জানোয়ারদের গায়ে চোট লাগায়, তা হলে আমি গুলি চালাব!'

দু-দিনের মধ্যে উৎখাত হয়ে গেল সার্কাস। তবু, কোথায় বৃষ্টি?

সার্কাসের তাঁবুগুলোর খুঁটি যখন উপড়ে ফেলা হচ্ছে, তখন কাছাকাছি দাঁড়িয়ে বিড়ি টানছিল ফাগুলাল। যেন একটা মজার দৃশ্য।

গোটাতিনেক মেয়েও ছিল সার্কাসের দলে, তারা ঝলমলে জাঙিয়া আর গেঞ্জি পরে খেলা দেখায়। তারা নিজেদের পুঁটুলিগুলো বুকে নিয়ে গরুর গাড়িতে উঠতে-উঠতে যা-তা গালাগালি দিয়ে গেল এই গ্রামের মানুষদের।

দু-দিন পরেও যখন বৃষ্টি হল না, ফাগুলাল ভালুকে রাস্তায় ডেকে বলল, 'লোহার খুঁটি আর গজালগুলো সব উঠাকে লে গিয়া কি নেহি, তা ভালো করে দেখেছিস তো? উ লোগ রাগ করে যদি মন্তর করা গজালটা পুঁতে রেখে যায়, তা হলে এ-বছরই বৃষ্টি হবে না!'

তাই তো, এ-কথাটা তো ঠিক। অনেকে দৌড়ে গেল সেই পরিত্যক্ত মাঠে। তন্নতন্ন করে খোঁজার পর দেখা গেল, সত্যিই তিনটে গজাল এখনও পোঁতা আছে মাটিতে। সেগুলো তুলে ফেলা

হল, এর মধ্যে কোনটা মন্ত্রপূত? এদের ফেলা হবে কোথায়?

এক জায়গায় কাঠকুঠো জড়ো করে আগুন লাগিয়ে তার মধ্যে ফেলে দেওয়া হল সেই তিন লোহার টুকরোকে। সবাই জানে, আগুনের আঁচে সব খারাপ মন্ত্র খারিজ হয়ে যায়।

ওদিকে উজ্জয়িনীর মহাকাল মন্দিরে শুরু হয়েছে যজ্ঞ। এজন্য চান্দা লাগে না। মন্দিরেরই অনেক সম্পত্তি আছে। প্রতিদিন সেখানে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলে। শিপ্রা নদীর ধারে বহু মানুষ জমায়েত হয়ে দেখল সেই যজ্ঞ। কাঠ পুড়ল কয়েক মণ। তার মধ্যে কিছু চন্দন কাঠ। সত্যিকারের টিকি আর মোটা পৈতেধারী ব্রাম্ভনদের উঁচু গলায় মন্ত্র শুনে খুবই ভক্তি শ্রদ্ধা হয়। উপস্থিত সবাইকে দেওয়া হল খিচুড়ি ভোগ।

তবু তো বৃষ্টি আসে না। গুজব শোনা গেল, এই যজ্ঞের ফলে সুদূর রেওয়া জেলায় কালো মেঘ জমেছে, কিন্তু এদিকে হাসিরপুরে আকাশ এখনও খাঁ-খাঁ করে আছে।

এরপর আর একটাই পূজা বাকি আছে। তাতে উদ্যোগ নিতে হয় শুধু মেয়েদের। এ তল্লাটের নারীরা অনাত্মীয় পুরুষদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে না। এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি যাওয়ার সময় তারা মাথা ঢেকে রাখে পাল্লুতে। হিন্দু, মুসলমান সব একইরকম। এবারেই তো সরপঞ্চ হয়েছে শবনম বানু, খুবই তেজি নারী। কিন্তু পুরুষদের সঙ্গে কথা বলার সময় একটা পরদার আড়াল থাকে।

এ গ্রামে কখনও ইলেকটিরি আসেনি, দূরদর্শন নেই, কিন্তু রেডিয়ো তো আছে কয়েকজনের। তারা আকাশবাণীর হিন্দি সমাচার শোনে। এ বছর পরধানমন্ত্রীর সিংহাসনে সোনিয়াজি না নিয়ে মনমোহন ভাইয়াকে ছেড়ে দিলেন, তা সবাই জানে। বাজপেয়িজি হেরে গিয়ে মনের দুঃখে এখন সারাদিন ঘুমিয়ে থাকেন, ইন্দিরাজির ছোটি বহু বলে দিয়েছেন, আদমি লোগোকো মরনে দেও, লেকিন গরু-ভঁইস জবাই নেহি চলেগা। এসব খবরের চেয়েও সবাই শুনতে চায় মেঘের কথা।

ভগবানকা কেয়া বিচার, একই তো দেশ, তবু বঙ্গাল আর গুজরাতে এত বৃষ্টি হয়েছে যে গাঁও কে গাঁও ডুবে যাচ্ছে, আর বুন্দেলাখণ্ডে ছোট ছেলের কান্নার মতন কয়েক ফোঁটা বারিষও দিলে না? বুন্দেলাখণ্ড কী দোষ করেছে?

একজন বলল, 'আরে ভগ্বানকো আউর বহোত কাম-কাজ আছে, উসি লিয়ে ভগবান অন্য দেবতাদের ডিউটি ভাগ করে দিয়েছেন। বারিষকা দেওতা মালানদেব।'

এরা এখানে ইন্দ্রকে বলে মালানদেব। তাঁকে পুজো করার অধিকার শুধু নারীদের । সে সময় পুরুষদের ধারে-কাছে যাওয়াও নিষেধ!

বহু বছর ধরেই এরকম ইন্দ্রপূজা চলে আসছে। কিন্তু গত দু-বছর হয়নি, কারণ কিছু ঝঞ্ঝাট শুরু হয়েছে। খবর পেলেই টৌন থেকে ক্যামরা কাঁধে করে দলে-দলে লোক ছুটে আসে, তারা কোনও কথাই শোনে না, ফটাফট তসবির খিঁচে নেয়। যে পূজা পুরুষদের দেখাই নিষেধ, তা তসবির যদি তুলে নেয়, তা হলে সারা গ্রামের মানুষেরই যে পাপ হয়।

তাই ওই পূজা বন্ধ করে দেওয়ারই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। সেই জন্যই কি মালানদেব ক্রুদ্ধ, এই আকাশে মেঘ পাঠাচ্ছেন না?

বয়স্ক পুরুষরা কয়েকজন মিলে ঠিক করল, এবার ওই পূজা আবার চালু করতেই হবে। উপায় তো নেই। এটাই শেষ চেষ্টা।

তবে সব কিছু সারতে হবে অতি গোপনে।

ইন্দ্রপূজা হয় অমাবস্যার রাতে।

সরপঞ্চ শবনম বানো ঢেঁড়া পিটিয়ে ঘোষণা করে দিল, ওই দিন রাতে, সূরযদেও অস্তাচলে যাওয়ার পর কোনও পুরুষ আদমি ঘর থেকে বার হবে না। বড়কা মন্দিরের পূজারিণী রুকমাণি দেবীও জানিয়ে দিল যে, সেদিন কোনও বেহুদা কিংবা মতলববাজ যাই-ই হোক, পুরুষ যদি বিশেষ একজন রমণীকে দর্শন করে ফেলে, তা হলে সে-পুরুষটির তো শাস্তি হবেই, নারীটিকেও দিতে হবে

প্রচুর জরিমানা। কেন, নারীটিকে জরিমানা দিতে হবে কেন? নারীটি নিশ্চয়ই আগে কোনও পাপ করেছে কিংবা পুরুষটিকে জাদু করে টেনে এনেছে। স্ত্রীলোকটির সে জরিমানার পরিমাণ কম নয়, গ্রামশুদ্ধ সবাইকে খাওয়াতে হবে এক রাত। তাতে যদি তার ঘটি-বাটি, চাটি হয়ে যায় তা হোক।

একটাই রাস্তা বাইরে থেকে এ-গ্রামে ঢুকেছে। সাত-আটজন নওজোয়ান বিকেল থেকে গ্রামের বাইরে একটা কালভার্টের ওপর বসে থাকবে। তারা আর সারারাত ঘরে ফিরবে না। টোনোর কোনও আখবারের লোক কিংবা ক্যামরাওয়ালারা যদি ইন্দ্রপূজার খবর শুনে ছুটে আসতে চায়, আটকানো হবে তাদের। প্রয়োজন হলে এরা লাঠি-ডান্ডা চালাতেও পিছপা হবে না। যেমন করে হোক এরা গ্রামের ইজ্জত রক্ষা করবেই।

সমস্যাটা হতে পারে ছোটে কুঁয়ারকে নিয়ে। সে বুদ্ধুটা কিছুই না বুঝে রাত্রে বেরিয়ে পড়তে পারে। তাকে একটা ঘরের মধ্যে শিকলি এঁটে রাখা হল। সূরযভান আর জুগনু নামের দুটো লোক, এক-এক রাতে খুব বেশি নেশা করে ফেলে, তখন তারা কী করে ফেলবে ঠিক নেই। সূরযভান তো এক রাতে চুরচুর হয়ে, তার নিজের চাচিকে জাপটে ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল ঝোপের দিকে, চাচির চ্যাঁচামেচি শুনে অনেকে ছুটে এসে সূরযভানকে বেদম মার দিয়েছিল। এদের দুজনকে রাখা হবে চোখে-চোখে।

আর ফাগুলাল? সেটাকে তো সামলানো দরকার। বাপের সুনাম ভাঙিয়ে সে হারামিটা আর কত বেয়াদপি চালাবে? কয়েকজন অবশ্য বলল, 'না, না, ওকে কিছু বোলো না, দেখি না, ও কী করে?' মেয়েদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ওকে দেখলেই সবাই মিলে একসঙ্গে চিৎকার করবে। তারপর মেয়েরাই ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ভেঙে দেবে ওর শিরদাঁড়া। একজন মেয়ের হাতে তো শাবল থাকবেই। এরপর দেখা যাবে, ফাগুলালের কত রস!

কিন্তু ফাগুলালের দেখাই পাওয়া যায়নি গত দু-দিন। ভালো করে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, সে চলে গেছে টোনে। একবার গেলে সে একমাসের মধ্যে ফেরে না।

বৃদ্ধরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। মারামারি জিনিসটা ভালো নয়। আর যাই হোক, সে তো সিয়ারাম ভগত-এর ব্যাটা। তাকে হাড়গোড় ভাঙা অবস্থায় দেখলে অনেকেরই দিমাগ খারাব হয়ে যেত।

ইন্দ্রপূজা হয় একটা অশত্থগাছের তলায়।

এ-পূজায় কোনও মূর্তি লাগে না, একটা কাঠের দণ্ডের ডগায় লাগানো থাকে একটা তেকোনা সাদা ঝাণ্ডা। চিঁড়া, গুড় আর কলা হচ্ছে এই দেবতার উপচার। আগে তিলের সন্দেশও দেওয়া হত, কিন্তু এবারে সে পয়সার বড়ই অনটন।

সবাই জানে। বহুত বরস আগে একবার বৃন্দাবনে এরকম বর্ষণের খুব অভাব হয়েছিল। তখন অন্য মহিলাদের সঙ্গে রাধামাঈ এই পূজা করেছিলেন। সেবারে যা কাণ্ড হয়েছিল! পূজা শেষ হওয়ার আগেই কিষণজি কোথা থেকে দৌড়ে এসে পূজা কা পরসাদ খেতে শুরু করেছিল। আরে ছি, ছি, ছি, ইন্দর দেবতা অন্য কোনও পুরুষের দর্শনই সহ্য করতে পারেন না, এখন কী হবে? পূজা সব বিফলে গেল? সকলের মাথায় হাত, ভয়ে মুখ আমসি।

তখন আকাশে দৈববাণী হয়েছিল। স্বয়ং ইন্দ্রদেব হাসতে-হাসতে বলেছিলেন, 'আরে আনপড় আদমিলোগ, তোরা জানিস না, কিষণজিতো হামসে ভি বহুত বড়া দেওতা, সব দেওতাসে বড়া। আমি কিষণজির ওপর রাগ করতে পারি? হাঁ, দুসরা কোই আদমি এইসান কিয়া তো আমি তোদের গ্রামে আগ লাগিয়ে দিতাম!'

কিষণজি তো এই কলিযুগে যখন-তখন আসেন না, তাই কঠোর নিয়ম হয়েছে, কোনও পুরুষের ছায়াও দেখা যাবে না এই পূজাকা টাইমমে।

রাধামাঈ যে-গান গাইতেন, সেই গানই চলে আসছে যুগ-যুগ ধরে ঃ

চিঁড়া কুটেছি ইন্দর দেবতার জন্য, ফুলের মতন তাজা
এসো এসো ইন্দর দেবতা, তুমিই তো আমাদের রাজা।
কেলা এনেছি, গুড় এনেছি, মিশিয়েছি বুকের লহু
লহু হল মধু আর কাউয়া কোয়েলা কুহু।
কিষণ মহারাজ, দূরে থাকো, আমরা দুখিনী নারী
বালবাচ্চার মুখ সুখা হল, গানা ভি গাইতে না পারি!

মোটামুটি এই কয়েকটা পংক্তি, একই রকম সুরে, গাওয়া হতে লাগল বারবার। মোট একশো আটবার। কে শুনল কে জানে?

গান শেষ হওয়ার পরে গড় হয়ে মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে প্রণাম করল সবাই। এসময় বেশ কিছুক্ষণ চোখ বুজে থাকতে হয়।

এরপরে আসল পর্ব।

ইন্দ্র দেবতাকে গান শোনানো হল, খাদ্য-অর্ঘ্য দেওয়া হল, তারপর তাঁকে অন্যভাবে খুশি করতে হবে না?

এখন এইসব নারীদের মধ্যে একজনকে নির্বাচিত করে পাঠানো হবে কৃষির মাঠে। যাকে নির্বাচন করা হবে, তার শরীরে কোনও রোগ-ভোগ থাকবে না। খোস-পাঁচড়া, ঘা, কাঁটা-ছেঁড়া থাকবে না, স্বাস্থ্য হবে ভালো।

আগে বসেই অনেকটা ঠিক করা ছিল, সকলেই একবাক্যে বলল, প্রথমে পাঠানো হবে সরিতাকে। তার উমর খুব কম নয়। দেড় কুড়ি আরও পাঁচ তো হবেই। সরিতা আবার বিধবা, সন্তানও নেই।

সরিতার আর শাদি হবে না, কিঁউকি পণ্ডিতজি ছক কেটে বলে দিয়েছেন, আবার শাদি হলে আবার তার দুলহা মরবে। তার ভাগ্যে তার নিজস্ব ঘর-সংসার নেই। সে থাকে তার বড় ভাইয়ের বাড়িতে।

অন্তত চার-পাঁচজন জোয়ান মরদ সরিতাকে ঘরওয়ালি করতে চেয়েছিল। কিন্তু পণ্ডিতজির গণনা শুনে পিছিয়ে গেছে। একজন মেয়েমানুষের জন্য কে আর মরতে চায়।

হাতে একটা লোহার শাবল নিয়ে এক-পা এক-পা করে এগোতে লাগল সরিতা, তার সঙ্গে চলল আরও দুজন। ঠিক মেপে-মেপে পঞ্চাশ পা গিয়ে থামবে, এরপর আর সঙ্গে কেউ যাবে না।

শাড়ি খুলল সরিতা। বুকের জামা, কোমরের শায়া সব খুলতে হল। সারা গায়ে আর একটুও সুতো নেই। তার, ছাড়া-পোশাক নিয়ে চলে গেল অন্য মেয়ে দুটি। ওরা পৌঁছে গেলে সবাই মিলে কয়েকবার উলু দেবে, তারপর সরিতার একলা যাত্রা শুরু।

একেবারে মিশমিশে অন্ধকার, নিজের হাত-পাও দেখা যায় না।

মেয়েমানুষ নিজের স্বামীর সামনেও নিভৃতে সব বস্ত্র খোলে না, স্নানের সময়ও কাপড় পরে থাকে, অর্থাৎ জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই সারা শরীর ঢাকাঢুকি দিয়ে রাখাই অভ্যেস হয়ে গেছে। এই প্রথম সে পুরোপুরি নগ্ন, কেউ না দেখলেও হাঁটতে গেলে জড়তা এসে যায়। কিন্তু ইন্দ্রপূজার যে এটাই রীতি।

কেউ দেখছে না, কিন্তু ইন্দ্র দেবতা তো দেখছে। দেওতারা আন্ধারেও দেখতে পায়। ইন্দর দেওতা তো পুরুষ। সরিতা যেন সেই পুরুষের দৃষ্টি টের পাচ্ছে।

আন্দাজে-আন্দাজে হেঁটে সরিতা পৌঁছে গেল কৃষির মাঠে। ঝিঁঝি পোকার ডাক ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। এই সময় মাঠ পানিতে ভিজে-ভিজে থাকার কথা। আহা রে, এক ফোঁটাও জল না পেয়ে ঝিঁঝি পোকাগুলোরও ডাক যেন ফাটাফাটা।

হাতের শাবলটা তুলে মাটিতে একটা কোপ দিল সরিতা। ঠিক সাতবার কোপ দিতে হবে।

তারপর সেই গর্ত ঘিরে নাচতে হবে সাত পাক। তবে যদি ইন্দর দেওতা খুশ হন। আজ রাত্তিরেই যদি বারিষ হয়, তবে বুঝতে হবে ইন্দর দেওতার খুব পসন্দ্ হয়েছে এই মেয়ের নাচ।

মাটি এত শক্ত যে এক-একবার ঠংঠং করে শব্দ হচ্ছে শাবল মারার পর। ভালো করে গর্ত খুঁড়তে হবে, কাল সকালে এসে পরীক্ষা করে দেখবে পুরুষরা। যদি বোঝে যে মেয়েটি ফাঁকি মেরেছে, তা হলেও শাস্তি পেতে হবে।

কোনও-কোনও বছর ইন্দ্র দেবতা নাকি এই সময় একেবারে মেয়েটির সামনে এসে দাঁড়ান।

শাবল চালাতে-চালাতে সরিতা ভাবতে লাগল, আকাশের দেওতা কি সত্যি-সত্যি জমিতে পা ছোঁয়ান? বারবার সে এদিক-ওদিক ফিরে-ফিরে দেখতে লাগল, যদিও সে জানে, এত অন্ধকারে কিছুই দেখা যাবে না!

কিংবা দেওতাদের গায়ের রং-ই তো চেরাগ বাতির মতন।

মোটামুটি একটা গর্ত খোঁড়া হয়ে গেছে। এইবার নাচ।

জীবনে আর কোনও পুরুষের মনোরঞ্জনের জন্য তাকে কিছু করতে হবে না। পুরুষরা তাকে ভয় পায়। তার স্পর্শেই আছে মৃত্যু।

দেওতাদের তো সে ভয় নেই। দেওতারা অমর।

এক পাক নাচের পরই শরীরটা কেঁপে উঠল সরিতার। কিছু একটা শব্দ শোনা গেল কি? না, কীসেরই বা শব্দ হবে। একটু বাতাসও নেই যে উড়বে গাছের শুকনো পাতা।

একটু পরে আবার শব্দ। কেমন যেন অশরীরী, অপ্রাকৃত ব্যাপার।

সরিতার একবার ইচ্ছে হল, ছুট্টে ফিরে যেতে। সাত পাক নাচ হোক বা না হোক, কেউ তো বুঝবে না।

কিন্তু দেবতা ঠিক বুঝবে। পূজার নিয়ম ভাঙা হবে। পাপ হবে সারা গ্রামের মানুষের।

মন দিয়েই সে সম্পূর্ণ করল সাত পাক নাচ।

তারপর চোখ তুলে সামনের দিকে তাকাতেই মনে হল, এক জায়গায় যেন অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে। পুরুষ মূর্তির মতন।

তার বুক ধড়াস-ধড়াস করতে লাগল। সে কি চোখে ভুল দেখছে? এখানে এখন কোনও মানুষ আসবে কী করে? তবে কি দেবতা স্বয়ং? তাও কি হয়?

দেওতা হলে সেই চেরাগ বাতি কই?

ছুটে যে পালাবে সরিতা, সে সাধ্যও নেই, পা-যেন গেঁথে গেছে মাটিতে। কাঁপা-কাঁপা গলায় সে জিগ্যেস করল, 'কউন?'

সে খুব আশা করেছিল, কোনও উত্তর পাবে না। ওখানে আসলে কেউ নেই। ওই জমাট অন্ধকার তার মনের ভুল।

কিন্তু উত্তর এল।

এক ভরাট পুরুষকণ্ঠ বলল, 'ম্যায় হুঁ মালানদেও।'

সঙ্গে-সঙ্গে যেন সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গেল সরিতার। কেটে গেল ভয়। মালানদেও না ছাই! ও গলার আওয়াজ সে চেনে না!

লজ্জা নিবারণের জন্য এত হাত বুক ও অন্য হাতে যোনিদেশ চাপা দিয়ে সে বলল, 'আরে বেওকুফ কাঁহিকা! তু ইধার আয়া? মরনেকা ডর নেহি তুহার?'

লঘু হাস্য করে সেই অন্ধকার মূর্তি এক-পা এগিয়ে এসে বলল, 'তেরা নাচ বহোত আচ্ছা লাগা! আগেই থামলি কেন? পুরা সাত পাক হয়নি। তুই ফাঁকি মেরেছিস!'

সরিতা বলল, 'আলবাত সাত বার নেচেছি। তা ছাড়া, তুই গুণবার কে? তুই কি নালিশ করতে যাবি?'

ফাগুলাল বলল, 'না, নালিশ করতে যাব না। আর একটু নাচ না!'

সরিতা বলল, 'তুই তো এখনই মরবি! এবার ভগতজির নামেও কেউ তোকে বাঁচাবে না!'

ফাগুলাল বলল, 'আমায় কে মারবে? কার সাধ্য আছে?'

সরিতা বলল, 'আমি চিল্লাব। সবাই ছুটে আসবে, তোকে ছাতু করে দেবে! যদি ওরা দেরি করে, আমার কাছেও লোহার শাবল আছে!'

আবার হেসে ফাগুলাল বলল, 'তুই মারবি আমাকে? তা হলে তো পণ্ডিতজির কথাই সত্যি হয়ে যাবে। তোর কাছে এলে মরদরা বাঁচে না। তবে, মার আমাকে।'

সে আরও কাছে এসে সরিতার কাঁধে হাত রাখল।

সরিতা বলল, 'সত্যি আমি চ্যাঁচাব! আরে ছি-ছি, তোর একটুও কি শরকম নেই রে? আমি মালানদেরও-র পূজা দিতে এসেছি, তুই ছুঁয়ে দিলি, আমার কত পাপ হল। এখন মালানদেরও আর বারিষ দেবে না! রাগ করে আকাশে আগুন ছড়িয়ে রাখবে!'

ফাগুলাল বলল, 'শোন সরিতা, আমি পাপ জানি, পুণ্যও জানি। গাঁয়ের বেহুদা আদমিলোগ শাস্তর ভুলে গেছে, পড়া লিখা তো কিছু করে না। এই ইন্দ্রপূজার রাত, যে পূজা দিতে আসে, সে হয় ভূমি। আর পুরুষ হয় আকাশ। ভূমি আর আকাশের মিলন না হলে বারিষ হবে কী করে? সরিতা, তুই বুঝিস না, আমি তোর জন্যই টাউন থেকে বারবার গাঁয়ে ছুটে আসি। তোকে আমি টাউনে নিয়ে যাব, মন্দিরে পূজা দিয়ে তুই আমার ঘরওয়ালি হবি। টাউনে কেউ জাতের পরোয়া করে না।'

সরিতা এবার কান্নাভেজা গলায় বলল, 'অমন কথা বলিস না! তুই আমায় শাদি করলে তোর মরণ হবে। তুই যা, যা, এখনও চলে যা! আমি তোর মরণ চাই না!'

ফাগুলাল বলল, 'আমি চাই। তুই আমাকে মেরে ফ্যাল সরিতা, তা হলে আমার শরীর জুড়োবে! আর ছোটাছুটি করতে হবে না। মরণের আগে, শুধু একবার...

সরিতা বলল, 'না, না। ফাগু, তুই কেন মরবি। আমি মরলে বরং কারুর ক্ষতি নেই দুনিয়ায়। আমার মতন বেওয়ারিশ মেয়েমানুষের তো মৃত্যুতেই মুক্তি মেলে!'

ফাগুলাল বলল, 'টাউনে গিয়ে তুই আমার সঙ্গে বাঁচতে পারিস। অন্তত যতদিন বাঁচা যায়। ভালোবাসা দিয়ে আমরা পণ্ডিতজির কথা মিথ্যে করে দিতে পারি।'

সরিতা বলল, 'এসব তুই কী বলছিস ফাগু? আমার সারা শরীর কাঁপছে। হা ভগওয়ান, আমায় আর কত দুঃখ দেবে?'

হঠাৎ আকাশ চিরে দেখা গেল বিদ্যুৎঝলক। সেই আলোকে সরিতাকে দেখল ফাগুলাল। একেবারে আদিম মানবী।

তার কয়েক মুহূর্ত পরেই বজ্রগর্জন।

সরিতা বলল, 'ওই দ্যাখ, মালানদেরও ক্রুদ্ধ হয়ে আমাদের ধমকাচ্ছে!'

ফাগুলাল বলল, 'বারিষের আগে আকাশ ডাকে। সেই গর্জন তো পৃথিবীকে ধমকায় না! ঝড়কে বকুনি দেয়। বলে, হঠ যাও, হঠ যাও! এখন আর কেউ থাকবে না! এখানেও আর কেউ নেই। আয় সরিতা।'

তারপর সরিতা হল ভূমি আর ফাগুলাল হল আকাশ। তাদের মিলন হল। সেই মিলনখেলা যেন চলতে লাগল অনন্তকাল।

খানিকবাদে দুজন শুয়ে রইল পাশাপাশি। দুজনেরই শরীরে বিন্দু-বিন্দু ঘাম। আকাশে বিদ্যুৎচমক এখন ঘনঘন। বৃষ্টি একেবারে আসন্ন। কাকতালীয়। আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি, বৃষ্টি একদিন-না-একদিন তো আসবেই। তবু আজই, এখনই বৃষ্টি নেমে সরিতাকে পুণ্যবতী করে দিল।

জুঁইফুলের মতন এক-একটা বৃষ্টিবিন্দু ঝরে পড়তে লাগল ওদের শরীরে।

সরিতা আবেগ-জড়ানো কণ্ঠে বলল, 'যা ফাগু, তুই এবার জঙ্গলের দিক দিয়ে চলে যা!'

ফাগুলাল বলল, 'তুই আমার সঙ্গে টাউনে যাবি না?'

সরিতা ত্রস্ত হয়ে বলল, 'ওই যেন অনেকের গলা শুনতে পাচ্ছি। যা, এখন যা। তোকে দেখলে সব ঝুট হয়ে যাবে!'

ফাগুলাল বলল, 'আমার যেতে ইচ্ছে করছে না যে!'

তবু সরিতার তাড়নায় তাকে উঠতে হল। নিজের পোশাক তুলে নিয়ে সে মিলিয়ে গেল বিপরীত দিকের অন্ধকারে।

আগে ছুটে এল মেয়ের দল। একজনের হাতে সরিতার শাড়ি, জামা। তারপর এল গাঁয়ের সমস্ত পুরুষ। সবাই ইন্দ্রদেবতার নামে জয়ধ্বনি দিচ্ছে। নাচ শুরু করেছে মেয়েরা, সরিতা তাদের মধ্যমণি।

মাটিতে পড়ে আছে ফাগুলালের কয়েক ফোঁটা বীর্য। এখুনি তা বৃষ্টির সঙ্গে মিশে যাবে!

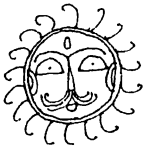

জল নয়, যেন অমৃত

কয়েক হাত মাটি খোঁড়ার পরই শাবলে ঠংঠং করে শব্দ হতে লাগল। শক্ত পাথর। এখানে জল উঠবে না। মিস্তিরিরা হতাশ হয়ে বসে পড়ল।

এই নিয়ে চারবার।

টিউবওয়েল বসাবার চেষ্টা হচ্ছে, বড়-বড় পাইপ কেনা হয়ে গেছে, টাকাপয়সারও অভাব নেই, কিন্তু জল পাওয়া যাচ্ছে না। এই বৈশাখ মাসে জলের জন্য চতুর্দিকে হাহাকার।

একটা পাকুড় গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছে বড়কা মাহাতো। গ্রামের মানুষদের চেয়ে তার চেহারাটা অন্যরকম। জিনসের প্যান্ট আর টি-শার্ট পরা, মাথার বাবরি চুল ঠিকঠাক আঁচড়ানো, দাড়ি কামানো চকচকে মুখ।

বড়কা এই ভীমাগড় গ্রামেরই ছেলে, কিন্তু অনেকদিন সে এখানে ছিল না।

যখন তার চোদ্দো বছর বয়েস, তখন সে একা-একা বদরপুরের হাটে গিয়েছিল, তারপর আর ফেরেনি।

কেউ-কেউ বলেছিল, তাকে ছেলেধরারা চুরি করে নিয়ে গেছে, কেউ বা বলেছিল, খরগাঁও-এর গুণিন তাকে মন্ত্রবলে ভেড়া বানিয়ে ফেলেছে। মোট কথা এক বছর, দু-বছর, দশ বছর, এক কুড়ি বছরের মধ্যেও বড়কাকে কেউ আশেপাশের কোথাও দেখেনি।

এক মাস আগে ফিরে এসেছে সে হঠাৎ, গায়ে তার শহুরে বাবুদের মতন জামা আর পায়ে বুট জুতো। সঙ্গে আবার মোজা।

বড়কার বাবা এর মধ্যে মরে গেছে। তার এক বড় ভাই আর দুটো বোন ছিল। এক বোনের বিয়ে হয়ে চেলে গেছে অন্য গ্রামে, অন্য বোনটার বিয়ে হয়নি, কারণ তার গায়ে শ্বেতি আছে। বড় ভাইটার একটা পা ট্রেনে কাটা গেছে। তাই সে মাঠে কাজ করতে পারে না। বাড়িতে বসে বিড়ি বাঁধে।

আর বড়কার মা এখন অন্ধ। ছেলে এতদিন পরে ফিরে এসেছে বলে সে বুড়ির কী আনন্দ!

কিন্তু ছেলেকে সে দেখতে পায় না। গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বোঝার চেষ্টা করে। কিন্তু চোদ্দো বছরের যে ছেলেকে সে দেখেছিল, তার বয়েস এখন চৌতিরিশ বছর। তার গায়ে হাত বুলিয়ে কি ছেলেকে চেনা যায়? তবু সে আনন্দে খলখলিয়ে হাসে।

তুই এতদিন কোথায় ছিলি রে বড়কা?

অনেকেই জিগ্যেস করে একথা। বড়কা সঠিক উত্তর না দিয়ে বলে, চলে গিয়েছিলাম সমুদ্দুর পেরিয়ে এক মরুভূমির দেশে।

এ গ্রামের কোনও লোক সমুদ্র দেখেনি। মরুভূমি কাকে বলে তাও জানে না।

বড়কা এখন মাঝে-মাঝে ইংরেজি বলে ফেলে। তার পকেটভরতি অনেক টাকা। সে তো বাবু সেজে শহরেই থেকে যেতে পারত। কিন্তু সে ফিরে এসেছে গ্রামে, তার মাকে দেখবার জন্য।

এতদিন পরে কেন?

তার উত্তর সে দেয় না। কতদিন থাকবে, তাও ভালো করে বলে না।

তাদের মাটির বাড়ি, খোলার চাল, তাও ভেঙে পড়েছে প্রায়। বড়কা মিস্তিরি ডেকে সে বাড়ি সারিয়ে ফেলল খুব তাড়াতাড়ি।

কোনও হারানো মানুষ ফিরে এলে গ্রামের সব মানুষকে খাওয়াতে হয়। এটাই বহুদিনের নিয়ম।

বড়কা একদিন বিরাট ভোজ দিল। যে যত পারো ভাত আর মুরগি খাও। কয়েক হাঁড়ি মিঠাইও আনানো হল দূরের শহর থেকে। সবাই খুব খুশি। গ্রামের সব ছোট ছেলেমেয়েরা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে বড়কার দিকে। সে যেন এক অজানা দেশের মানুষ।

ছোট বোনটাকে একটা গোরু কিনে দিয়েছে বড়কা। সে বেচারির যদি বিয়ে না হয়, গোরুর দুধ বিক্রি করে সে নিজের খরচ চালাতে পারবে!

অন্ধ মা একদিন বলেছিল, ও বড়কা, এই গাঁয়ে তুই পানি এনে দিবি? দে না বাবা!

সেই থেকে বড়কার মাথায় ঢুকেছে, গ্রামে একটা-দুটো টিউবওয়েল বসাতে হবে।

গ্রামের সব লোককে সে জানিয়ে দিল, এ গ্রামের দু-দিকে পানিকল বানিয়ে দেবে সে, খরচ যা লাগে চিন্তা নেই। কিন্তু গ্রামের লোকদেরই পরিশ্রম করে গর্ত খুঁড়তে হবে।

পরিশ্রম করতে তো অনেকেই রাজি। কিন্তু মাটির খানিকটা তলাতেই যে শক্ত পাথর। ইচ্ছে করলেই তো সব জায়গায় টিউবওয়েল বসানো যায় না!

খুব কাছেই পরপর দুটো পাহাড়। তার একটা পাহাড়ের ওপাশে আছে একটা বড় পুকুর। জল আনতে হয় সেখান থেকে। কিন্তু পাহাড় পেরিয়ে গিয়ে জল আনা কি সোজা কথা? কেউই এক কলসি, দু-কলসির বেশি আনতে পারে না।

সবচেয়ে বেশি কষ্ট হয় এই গ্রীষ্মকালে।

একসময় এই গ্রামের পাশে একটা ছোট নদী ছিল। দ্বিতীয় পাহাড়টার গা দিয়ে গড়িয়ে আসত একটা ঝরনা, নীচে নেমে সেই ঝরনাটাই হত নদী। কেন যে সেই ঝরনাটা শুকিয়ে গেল, তা কেউ জানে না।

এখনও সেই নদীর খাতটা আছে, কিন্তু প্রায় সারা বছর শুকনোই থাকে। খুব বর্ষার সময় খানিকটা জল হয়। তাতে পায়ের গোড়ালিও ডোবে না। বর্ষাকাল শেষ হয়ে শরৎকাল আসতে-আসতেই সে জলও পালিয়ে যায়।

চারবার টিউবওয়েল বসাতে ব্যর্থ হয়ে সবাই যখন হতাশ হয়ে পড়েছে, বড়কা মাহাতো তখনও হার মানতে চায় না।

সে বলল, চলো তো, ওই শুকনো নদীটার খাতে গিয়ে গর্ত করি! পানিকল না হোক, কুয়ো তো হতে পারে? কুয়ো হলেও কাজ চলবে!

সবাই মিলে গেল সেই নদীর কাছে।

এবার বড়কা নিজেও তার জামাপ্যান্ট খুলে ফেলল। শুধু একটা জাঙিয়া আর গেঞ্জি পরে সে-ও নেমে পড়ল শাবল হাতে।

কালো পাথরের মূর্তির মতন তার শরীর। সে লাফিয়ে-লাফিয়ে প্রচণ্ড জোরে কোপ মারতে লাগল মাটিতে।

দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত ন-দশ জন মিলে খুব পরিশ্রম করল। তবু কোনও লাভ হল না। সাত-আট হাত নীচেই নিরেট শক্ত। শাবল মারলে আগুনের ফুলকি বেরিয়ে আসে। জলের দেখা নেই।

তাহলে এ গ্রামের মানুষ কি চিরকাল জলকষ্টেই থাকবে?

তখন একজন বুড়ো লোক বলল, ওরে একবার দুজ্জয় সিংকে পুছে দ্যাখ না। সে পাকা কথা বুলে দিবে।

অন্য একজন বলল, দুজ্জয় সিং কি এখনও বেঁচে আছে? সে নাকি মাটির তলায় সেঁধিয়ে গেছে কবে।

আর-একজন বলল, না, আমি তাকে এক হপ্তা আগে হাটে দেখেছি। সে সবসময় গাঁজা টেনে বুঁদ হয়ে থাকে।

দুজ্জয় সিং-এর বাড়ি বুড়োশিবতলা মন্দিরের পাশে। তার সংসারে আর কেউ নেই। সে থাকে একা।

বড়কা কখনও দুজ্জয় সিংকে দেখেনি। তবে ছোটবেলায় সে শুনেছিল, এই মানুষটা নাকি জলের গন্ধ পায়। বক্রেশ্বরে যেখানে গরম জলের ঝরনা আছে, সেখানে গিয়ে দুজ্জয় মাঝি নাকি আরও তিনটে ঝরনা আবিষ্কার করেছিল। আরও অনেক গল্প আছে। হিরণমারি গ্রামে যখন একটা বড় কুয়ো খোঁড়া হয়, তখনও এইরকম হয়েছিল। কোথাও জল উঠছিল না। দুজ্জয় সিংকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হল সেখানে। সে নাকি এক জায়গায় মাটিতে পা ঠুকতেই সেখানে তীব্র বেগে জল উঠে এসেছিল। এইরকম আরও কত গল্প।

বড়কা বলল, ঠিক আছে, দেখা যাক, দুজ্জয় সিং কিছু করতে পারে কি না!

পাহাড়ের নীচে যে জঙ্গল, সেখানে বুড়োশিবতলার মন্দির। এ মন্দিরে এখন আর পুজো হয় না। একটা শ্মশান আছে, সেখানেও এখন আর কেউ আসে না।

একটা খাটিয়ায় শুয়ে আছে দুজ্জয় সিং, খুবই বুড়ো হয়ে গেছে, বেরিয়ে গেছে বুকের হাড়-পাঁজরা। সে কী খায়, কে তাকে খেতে দেয়, কে জানে!

বড়কাদের দলবল দেখে সে উঠে বসল।

তাদের প্রস্তাব শুনে সে মিটিমিটি হাসতে-হাসতে দু-হাত নেড়ে বলতে লাগল, আর তো হবেনি! আমার কোটা শেষ হয়ে গিয়েছে। এক সাধুবাবা আমারে এই বিদ্যে শিখিয়েছিল। সেই সাধুবাবা বারবার বলে দিয়েছে, ওরে পাগলা, এই বিদ্যে পাঁচবারের বেশি ব্যবহার করবি না। কারোর কাছ থেকে পয়সা নিবি না। সাবধান, পাঁচবারের বেশি লোভ করবি না!

বড়কা দেশ-বিদেশ ঘুরেছে, সে এসব কথা বিশ্বাস করে না।

সে বললে, তোমার পাঁচবারের কোটা শেষ হয়ে গেছে। তার বেশি হলে কী ক্ষতি হবে? এ তো মানুষের উপকারের জন্য!

দুজ্জয় সিং বলল, ওরে বাচ্চা, মাটি হচ্ছে আমাদের মা জননী। তার বুকে বারবার কোপ মারলে কি তার কষ্ট হয় না? আমি সেই পাপ আর করতে পারবনি!

বড়কা বলল, দাদু, মাটি আমাদের মা। মায়ের সন্তানরা যদি জলের অভাবে ছটফট করে মরে, চাষের ক্ষতি হয়, তাতে মাটি-মায়ের কষ্ট হয় না? মা যে তার জল বুকের মধ্যে

লুকিয়ে রেখেছে।

দুজ্জয় বলল, ওসব আমি বুঝি না। তোরা কি আমায় মারতে চাস?

বড়কা বললে, তুমি মরবে কেন? আমরা রয়েছি না? আমরা সবাই তোমাকে পাহারা দেব।

সঙ্গের অন্যরাও বলল, আমরা আপনাকে বাঁচিয়ে রাখবই!

দুজ্জয় সিং মাথা নেড়ে বলতে লাগল, পারবি না, পারবি না! আমার গুরুজি বলেছেন, মাটি-মা আমাকে ভেতরে টেনে নেবে!

বড়কার আসলে খুব দেখার ইচ্ছে, দুজ্জয় সিং-এর সত্যিই এরকম ক্ষমতা আছে কি না! কারোর যদি এরকম সত্যি ক্ষমতা থাকে, তাহলে সে পাঁচবারের বেশি ছ'বার সেটা ব্যবহার করলে মরে যাবে কেন? মাটি কি কোনও মানুষকে টেনে নিতে পারে? সেটাও দেখতে হবে!

সে প্রায় জোর করেই দুজ্জয় সিংকে তুলে নিয়ে গেল।

গ্রামে এনে আগে খাওয়ানো হল ভালো করে। সাতখানা রুটি, অনেকখানি ট্যাঁড়শের তরকারি আর আস্ত একটা ঝলসানো মুরগি!

তারপর এক ছিলিম গাঁজা টেনে বলল, ওরে, বুড়ো হয়েছি বটে, কিন্তু তবু এখনও মরতে ইচ্ছে করে না। তোরা আমাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবি তো?

বড়কা জোর দিয়ে বলল, আমি সবসময় থাকব তোমার পাশে।

দুজ্জয় সিং বলল, তাহলে আমাকে এক বাটি জল এনে দে!

এল এক বাটি জল।

দুজ্জয় সিং কিছুক্ষণ সেই বাটির জলের দিকে তাকিয়ে কী যেন বিড়বিড় করে। তারপর হাঁটতে শুরু করে।

বেশ কয়েক পা হেঁটে গিয়ে সে এক জায়গায় হঠাৎ থেমে গিয়ে একেবারে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে। তারপর মাটির গন্ধ শুঁকতে থাকে কিছুক্ষণ ধরে।

বড়কা ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকে। মাটির অনেক নীচে থাকে জল, ওপর থেকে সেই জলের গন্ধ পাওয়া কি সম্ভব? সবটাই গাঁজাখুরি ব্যাপার নয় তো?

এইরকমভাবে, মাটিতে দণ্ডি কেটে এগোবার পর, সাত বারের পর, এক জায়গায় দুজ্জয় সিং উঠে দাঁড়িয়ে বলল, মিল গিয়া! এখানে খোঁড়ো, পানি পাবে!

বড়কা কিছু বলার আগেই অন্য লোকরা মহা উৎসাহে সেই জায়গাটা খোঁড়া শুরু করল।

আশ্চর্য ব্যাপার, অনেকটা খুঁড়েও এবার কোনও পাথরে ঠংঠং শব্দ হল না। নরম মাটি।

এবারে বসানো হতে লাগল টিউবওয়েলের পাইপ।

পাইপগুলো বেশ সহজেই ঢুকে যেতে লাগল। পরপর দশখানা পাইপ। এরপর অবশ্যই জল পাওয়ার কথা।

বড়কা এইটুকু জানে যে মাটির তলায় বিভিন্ন স্তর ঠিক সমতল নয়। ঢেউ খেলানো। তলায় যেখানে ঢেউটা বেশ গভীর, সেখানে জল জমে থাকতে পারে। ওপরের দিকটা থাকে শক্ত পাথর।

সেরকম একটা ঢেউ-এর জায়গাই দুজ্জয় সিং খুঁজে বার করেছে। কিন্তু ওপর থেকে গন্ধ শুঁকে বোধহয় এরকম বিশেষ ক্ষমতা থাকে। এর মধ্যে ম্যাজিক কিছু নেই!

অতগুলি পাইপ বসিয়ে ওপরে লাগানো হল টিউবওয়েল যন্ত্রটি। এবার ওপর থেকে বেশ কিছুক্ষণ জল ঢেলে-ঢেলে পাম্প করতে থাকলে একসময় তলা থেকে জল উঠে আসতে শুরু করে।

সেরকম চেষ্টা চলল পুরো একবেলা ধরে। কিন্তু জল উঠল না।

এ কী অদ্ভুত ব্যাপার!

যারা অন্য গ্রামে টিউবওয়েল বসানো দেখেছে, তারাও হতবাক।

এতগুলো পাইপ ভেতরে ঢুকে গেল, ওপর থেকে এত জল ঢালা হচ্ছে। তাও বসে যাচ্ছে নীচে, তাহলে জল উঠছে না কেন? এ কী অদ্ভুত ব্যাপার।

হাতের বাটির জলটা এক চুমুক খেয়ে নিয়ে দুজ্জয় সিং বললে, এ আমার পাপ। মাটি-মায়ের গায়ে চোট লেগেছে। এবার দেখবি, এক জায়গায় মাটি ফাঁক হয়ে যাবে, আর ধরিত্রী আমাকে পাতালে টেনে নেবে!

বড়কা বলল, দাদু, আমি আপনার পাশে থাকব সবসময়। দেখি, কে আপনাকে টেনে নেয়।

সেই শুকনো টিউবওয়েলের পাশে টাঙানো হল একটা তাঁবু। সেখানে সবসময় শুয়ে থাকে দুজ্জয় সিং, আর তার পাশে জেগে বসে থাকে বড়কা মাহাতো!

আর জল ঢেলে-ঢেলে সেই টিউবওয়েল থেকে জল বার করার চেষ্টা চালাতেই লাগল।

এর মধ্যে কে যেন বলল, এবছর ইন্দ্র দেবতার পুজো হয়নি, তাই বৃষ্টিও আসছে দেরিতে। ইন্দ্রদেবতাকে খুশি করতে পারলে বৃষ্টিও নামবে তাড়াতাড়ি। তখন টিউবওয়েল থেকে জলও উঠবে।

ইন্দ্রদেবতা নাকি নাচ-গান ভালোবাসে।

তাই গ্রামের সব মেয়েরা নাচ-গান শুরু করল সেই তাঁবুর পাশে। তবু আকাশের কোনও দিকে মেঘের দেখা নেই।

দুজ্জয় সিং এখন আর কিছু খেতেও চায় না। শুধু গাঁজা টানে।

আর বারবার আপন মনে বলে, ধরিত্রী ফাঁক হয়ে যাবে, আমাকে ভেতরে টেনে নিয়ে যাবে! কেন যে আমি লোভ করলাম রে!

বড়কা বলে, দাদু, যদি ধরিত্রী ফাঁক হয়, আমিও যাব আপনার সঙ্গে। পাতাল দেখে আসব!

এরকমভাবে কেটে গেল চার-পাঁচ দিন।

অন্যান্য গ্রাম থেকেও দলে-দলে মানুষ আসে এই তাঁবু দেখতে। টিউকলে জল আসবে, না মাটি দু-ফাঁক হয়ে দুজ্জয় সিংকে টেনে নেবে? কিছুই হয় না। টিউকলেও জল আসে না!

হঠাৎ একটা জিপ গাড়ি এসে থামল সেই গ্রামে। তার থেকে নামল ছ-সাতজন যুবক, তাদের তিনজনের সঙ্গে বন্দুক। তারা বড়কাকে খুঁজতে এসেছে।

তারা কিন্তু মারামারি করতে আসেনি। তারা বড়কাকে খুঁজতে এসেছে।

বড়কার সঙ্গে তাদের কী কথা হল কেউ জানে না।

একসময় বড়কা উঠে গেল সেই জিপ গাড়িতে। তার মাকেও কিছু বলে গেল না।

গ্রামের লোক ধরেই নিল, বড়কাকে আর কোনওদিন দেখা যাবে না। এরকম তো প্রায়ই হয়। জল পাওয়া তাদের ভাগ্যে নেই। এতকাল ধরে তাদের ভাগ্যে যে কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে, তাই-ই চলবে এটাই তাদের নিয়তি।

কিন্তু দুজ্জয় সিং-এর কী হবে?

সে যে দিন-দিন দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। টিউবওয়েলেটাও শুকনো।

বড়কা চলে যাওয়ার পরের দিন বিকেলবেলা ঝড় উঠল।

প্রথমে ফিনফিনে হাওয়া। তারপর শোঁ-শোঁ শব্দ। তারপর যেন শুরু হল প্রলয়। আকাশেও প্রবল বজ্র গর্জন।

দুজ্জয় সিং যেন হঠাৎ চাঙ্গা হয়ে উঠছে।

তাঁবু থেকে বেরিয়ে দুজ্জয় সিং নাচতে শুরু করে। বলতে লাগল, এসেছে রে। এসেছে। এবার মাটি ফাটিয়ে আমাকে নিয়ে যাবে। পালা, তোরা পালা!

কিন্তু কে কোথায় পালাবে?

এই পাহাড় আর জঙ্গল ঘেরা গ্রাম ছাড়া কেউ তো আর কোনও জায়গা চেনে না। আর যতই প্রলয়ের ঝড় উঠুক, নিজের বাড়ি-ঘর ছেড়ে কেউ কি যেতে চায়?

বিকেল, সন্ধে, সারারাত ধরে চলল সেই ঝড়।

সকালবেলা দেখা গেল দুজ্জয় সিং-এর তাঁবুটা একেবারে উড়ে গেছে। দুজ্জয় সিং-ও কোথাও নেই।

কিন্তু মাটি কোথাও দু-ভাগ হয়নি। কোথাও ফাটল নেই। তাহলে দুজ্জয় সিং গেল কোথায়? কেউ জানে না। কেউ দেখেনি!

একটু বেলা হতেই এল জিপ গাড়ি। তার থেকে নামল বড়কা মাহাতো।

বড়কা ফিরে এসেছে। কী আশ্চর্য কথা! এই হতভাগা জায়গায় কিছুই পাওয়া যাবে না। জলও পাওয়া যাবে না। বড়কার তো এখন অনেক টাকা। সে তো তার অন্ধ মাকে নিয়ে শহরে থাকলেই পারে!

বড়কা গাড়ি থেকে নেমেই জিগ্যেস করলে, দুজ্জয় সিং কোথায়?

লোকে নানারকম গল্প বানাতে ভালোবাসে। কেউ-কেউ বলল, তারা স্বচক্ষে দেখেছে দুজ্জয় সিং ঝড়ের তোড়ে আকাশে উড়ে যাচ্ছে!

বড়কা তাদের ধমক দিয়ে বলল, দূর! মানুষ কখনও আকাশে উড়তে পারে নাকি? যতই ঝড় হোক।

কিন্তু দুজ্জয় সিং গেল কোথায়?

ধরিত্রী তো তাকে টেনে নেননি। ভূমিকম্পও হয়নি। কিন্তু বুড়োটা, দুর্বল দুজ্জয় সিং কোথাও নেই। একথাও ঠিক!

বড়কা তখন একদল সঙ্গীকে নিয়ে দুজ্জয় সিংকে খুঁজতে বেরোল! তবে কি সে ফিরে গেছে বুড়োশিবতলায়? এত ঝড়ের মধ্যে সে একা-একা যাবেই বা কী করে?

বড়কারা কিছু দূর এগিয়েছে, এমন সময় শোনা গেল পেছন দিকে একটা দারুণ কোলাহল।

শব্দটা আসছে টিউবওয়েলের তাঁবুটার কাছ থেকে। সেটা ভয়ের, না আনন্দের ঠিক বোঝা গেল না!

প্রথমেই মনে হয়, ওখানে কোনও বিপদ ঘটল নাকি? গত বছর ওই জায়গায় একটা পাইথন সাপ বেরিয়েছিল।

বড়কার সঙ্গীরা পেছন ফিরে দৌড় শুরু করেছে।

বড়কাও যোগ দিল তাদের সঙ্গে।

সেখানে পৌঁছে দেখল, না। পাইথন সাপ বেরোয়নি, অন্য কোনও বিপদও হয়নি। সবাই আনন্দের ধ্বনি করছে।

সেই শুকনো টিউবওয়েল থেকে বেশ তোড়ে বেরিয়ে আসছে জল। কয়েকজন পাম্প করছে। অন্যরা অঞ্জলি পেতে পান করছে সেই জল, ছিটিয়ে দিচ্ছে চোখে-মুখে।

কী ঠান্ডা, কী সুন্দর স্বাদ, জল নয়, যেন অমৃত!



মাংস

সকালবেলায় মেঘ ছিল, তাতে বাচ্চাদের মন খারাপ। আজ যেন বৃষ্টি না হয়, আজ যেন বৃষ্টি না হয়! তবু সেই কালো মেঘ যেন ঝুঁকে এল শ্মশানতলায় বড় বটগাছটার মাথায়।

গ্রামের নাম ছোট সাতুড়ি। বিভুপদ গড়াইয়ের দু-খানা খড়ের ঘর, সামনে একচিলতে উঠোন। সেই উঠোনে দাঁড়িয়ে তিনটে ছেলেমেয়ে, তারা আকাশের দিকে তাকিয়ে মেঘ তাড়াতে চাইছে। লেবুপাতা করমচা, দূরের বৃষ্টি দূরে যা! লেবুপাতা করমচা, দূরের বৃষ্টি দূরে যা!

মেঘ সেই শিশুদের কথা শোনে। তবে এত কাছে এসে কিছুটা বর্ষণ না হলে মেঘেরও তো মান থাকে না।

প্রথমে ছিল গুমোট হঠাৎ হাওয়া উঠল শনশনিয়ে, বড়-বড় ডালপালা উথালপাতাল। তারপর গুরু-গুরু গর্জন বলল, আসছি। এল একেবারে বড়-বড় ফোঁটায় ঝমঝমিয়ে। বড়জোর মিনিটদশেক, আবার আকাশ একেবারে ফরসা। ঝলমলিয়ে দেখা দিল সূর্য। ঠিক যেন হাসছে। হাসবেই তো, মাত্র মাসদুয়েক আগেই ছিল বৃষ্টির জন্য কত হাহাকার কত প্রার্থনা কত ব্যাং মেরে উলটে দেওয়া, আর এর মধ্যেই আবার বলে কি না, বৃষ্টি চাই না। মানুষ বড় বিচিত্র।

ও মেঘ আবার ফিরে আসবে, এখন শুধু এই বাচ্চাদের আবেদনে সরে গেল কিছুটা দূরে। আজ ওরা বেড়াতে যাবে। রাস্তাঘাট এমনিই থিকথিকে কাদা, বৃষ্টি চলতেই এখন বেরবার প্রশ্নই ছিল না। বাচ্চারা আর ধৈর্য ধরতে পারছে না।

বিভুপদ দাঁড়িয়ে আছে বাইরে, সুরবালার একটু দেরি হচ্ছে।

বিভুপদ একবার হাঁক দিল, কই রে, আর দেরি করলে...বেলাবেলি পৌঁছোতে হবে তো।

মেয়েটাও চেঁচিয়ে বললে, মা, আয়। মা, আয় মেয়েটার বয়েস সাত, ভাই দুটোর একটা নয়, একটা ছয়। একেবারে ছোটটাকে নেড়া করা হয়েছে কিছুদিন আগে, খুব উকুন হয়েছিল।

হাতে একটা পুঁটুলি নিয়ে বড় ঘরখানি থেকে বেরিয়ে এল সুরবালা, দরজায় শেকল তুলে একটা ছোট তালাও লাগাল।

সুরবালার বয়েস তিরিশের এধারে-ওধারে, ঢ্যাঙা চেহারা, অদ্ভুত নিথর ধরনের মুখ, সে মুখে রাগ, দুঃখ-আনন্দ, অভিসার কিছুই যেন ফোটে না।

চাবিটা বিভুপদকে দিয়ে সে বলল, তাহলে চলা করো।

একটু আগে পত্নীকে সে তাড়া দিচ্ছিল, এবার সে চাবিটা হাতে নিয়ে একটুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে জিগ্যেস করলে, সত্যি যাবি?

সুরবালা বলল, হ্যাঁ, যাব ঠিক করিছি।

বিভু আবার জিগ্যেস করল, ছেলেমেয়েদের নিয়ে যাওয়া।

সুরবালা বলল, হ্যাঁ, চলুক ওরা। তিনটি বাচ্চাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, আমরা যাব, আমরা যাব!

ঠিক পাশাপাশি আর কোনও ঘরবাড়ি নেই। গ্রামের প্রান্তসীমায় খালপাড়ের জমিতে ছড়ানো ছিটানো কয়েক ঘর বসতি।

সোজা রাস্তাটা শ্মশানতলার দিকে। ছেলেমেয়ে তিনটে দিনের বেলাতেও এখান দিয়ে যেতে ভয় পায়। মানুষের হাড়-গোড় এদিক-সেদিক পড়ে থাকে। কাঠ কেনার পয়সার অভাবে যারা পুরো লাশ পোড়াতে পারে না, তারা শুধু মুখে আগুন দিয়ে ফেলে রেখে যায়, তারপর তাই নিয়ে ভোজ হয় শেয়াল-শকুনের।

আজ বাবা-মায়ের সঙ্গে যাচ্ছে, আজ আবার ভয় কী? বাবা-মা আর তিন সন্তান, এই পুরো পরিবার এর আগে কোনওদিন একসঙ্গে কোথাও বেড়াতে যায়নি। বাবার সঙ্গে দু-একবার হাটে গেছে বটে, তাও মেয়েটা বাদ, মা-ও যায় না।

বটতলায় কোথা থেকে এক সাধু এসে ত্রিশূল গেড়ে বসেছে। সবাই সেখানে দাঁড়াল। সুরবালা এগিয়ে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে প্রণাম জানাল সাধুবাবাকে। তিনি হাত তুলে বিড়বিড় করে কিছু একটা আশীর্বাদ শোনালেন, কিন্তু প্রণামী দেবার মতন কিছু নেই সুরবালার সঙ্গে।

সে ফিরে আসার পর মেয়েটা জিগ্যেসা করল, মা, সন্নিসি ঠাকুররা গায়ে ছাই মাখে কেন?

সুরবালা তাকাল তার স্বামীর দিকে। এইসব প্রশ্নের উত্তর পুরুষদের দিতে হয়।

বিভু বলল, উম্‌ম সন্নিসি ঠাকুররা সবাই শিবঠাকুরের চ্যালা। শিবঠাকুর বলে দিয়েছেন, গায়ে ছাই না মাখলে আমার চ্যালা হতে পারবি না।

ছোট ছেলেটা জিগ্যেসা করল, বাবা, ঠাকুরের মাথায় সাপ থাকে কেন?

বিভু বলল, উম্‌ম, সাপ থাকে, মানে, এমনিই সাপ থাকে। এখন চল তো তাড়াতাড়ি।

ছেলেমেয়েরা দৌড়ে-দৌড়ে অনেকটা এগিয়ে যায়। আবার তাদের ডেকে থামাতে হয়।

এরপর রথতলা। এ অঞ্চলে মোটামুটি সম্পন্ন লোকেদের বাস। দোল-দুর্গোৎসবও হয় এখানেই। এক পাশে রয়েছে কয়েকটা ভ্যানগাড়ি।

অনেকটা দূরের পথ। হেঁটে যাওয়া যেতে পারে বটে, তাতে ফিরতে-ফিরতে ঢের রাত হয়ে যাবে। তা ছাড়া বিকেলের আগেই গন্তব্যস্থানে পৌঁছবার কথা।

এক ভ্যানগাড়ির চালক পাশে দাঁড়িয়ে ছোট কাচের গেলাসে চা খাচ্ছে, তার কাছে গিয়ে বিভুপদ সারা শরীর মুচড়ে বলল, ভালো আছ তো গোবিন্দদা? তোমার গাড়ি এখন ছাড়বে?

গোবিন্দর সঙ্গে আগেই কথা বলে গেছে বিভুপদ। এ গাড়ি ভাড়া করার সামর্থ তার নেই। সনাতনপুরের হাট থেকে দশখানা গুড়ের নাগরি নিয়ে আসার অর্ডার আছে গোবিন্দর। এখান থেকে যাওয়ার পথে যদি প্যাসেঞ্জার না পায়, খালি গাড়ি যায়, তা হলে সে বিভুপদর পরিবারকে খানিকটা দূর পৌঁছে দেবে।

গোবিন্দ যেন সে-কথা ভুলেই গেছে। সে বলল, প্যাসেঞ্জার তো দেখছি না। গাড়ি ছাড়তে হবে। কিন্তু তোদের এতগুলোনকে তো বিনি ভাড়ায় নিতে পারব না! এত লোড থাকলে গাড়ি টানতে পরিশ্রম হয় না?

বিভুপদ মুখ চুন করে চুপ করে রইল।

গোবিন্দ বলল, অন্তত যা নায্য ভাড়া হয়, তার অর্ধেক তো দিবি? পার হেড পাঁচ টাকা।

বিভু বলল, ঠিক আছে, দেব। একেবারে ছোটটারও কি?

গোবিন্দ বলে, পনেরোটা টাকাই দে।

সে হাত বাড়াল বিভুর দিকে।

বিভু খুবই সংকুচিতভাবে বলল, এখন তো দিতে পারব না। পরে শোধ করে দেব। মা কালীর দিব্যি বলছি।

গোবিন্দ ভারিক্কি চালে বলল, ধার? আজ নগদ, কাল ধার। একবার দিলে ধার, এ পথে সে চলে না আর। কত দেখলাম।

বিভু বলল, আমার কথার খেলাপ হবে না। মা কালীর কিরে বললাম তো।

গোবিন্দ অবজ্ঞার সঙ্গে বলল, যা দিনকাল পড়েছে, লোকে ঠাকুর-দেবতার কিরেও মানে না। নে, ওঠ।

বাচ্চাগুলো জুলজুল করে তাকিয়ে সব শুনছিল, এবার তারা লাফালাফি করে উঠে পড়ল ভ্যানগাড়িতে। সুশীল বয়েসে বড়, সুতরাং স্থান নির্বাচনে তারই অগ্রাধিকার। সে একবার সামনে, একবার পাশে দেখতে লাগল কোনটা সুবিধেজনক। সুধা আর ছোটুকে পা ঝুলিয়ে বসতে দেওয়া হল না, তারা ভেতরে বসল বাবু হয়ে।

সুশীল তবু এর আগে কয়েকবার চলন্ত ভ্যানের সঙ্গে দৌড়ে-দৌড়ে উঠে বসেছে, আবার চালকের তাড়া খেয়ে নেমেও পালিয়েছে। সুধা আর ছোটুর এমন সৌভাগ্য এই প্রথম। হাঁটতে হয় না, অথচ রাস্তা ফুরিয়ে যায়, এ কী মজা! রাস্তা দিয়ে অন্য লোকরা যাচ্ছে, তারা কেমন পিছিয়ে যাচ্ছে, তারপর আর তাদের দেখাই যায় না!

তিনজনেরই এই প্রথম নিজেদের গ্রামের বাইরে যাওয়া! ওদের কাছে উন্মোচিত হচ্ছে নতুন জগৎ। এদিককার সব গ্রামের চেহারাই প্রায় এক, ওদের চোখে যেন বৈচিত্র্যের শেষ নেই।

ও মা, দ্যাখ-দ্যাখ, একটা তালগাছের গা দিয়ে আর-একটা অন্য গাছ উঠেছে। একসঙ্গে দুটো গাছ।

একটা কুকুর ওই বড়-বড় পাখিগুলোকে তাড়া করে খাচ্ছে, ওগুলো কী পাখি?

শকুন।

শকুন বুঝি মাটিতে নামে?

বাবা, কাঁধে দু-খানা বাঁশ নিয়ে ওই লোকটা কোথায় যাচ্ছে?

যাচ্ছে, নিজের বাড়িতে।

বাবা, ওই মন্দিরটা ভাঙা কেন?

কেন আবার কী? ভেঙে গেছে, তাই ভাঙা। একটু চুপ করে বোস।

ছোটটারই প্রশ্ন বেশি। সে চুপ করে থাকতে পারে না। একটু পরেই সে আবার কিছু জানতে চায়। তাকে ধমকও খেতে হয় সেইজন্য।

খানিক দূরে যাওয়ার পর গোবিন্দ জিগ্যেস করল, মাগ ছেলেপুলে নিয়ে কোথায় চললি রে বিভু?

বিভু বলল, যাব রণকালীপুর। ইয়ে, মানে বউয়ের বাপের বাড়ি। কয়েকটা দিন থাকবে?

গোবিন্দ বলল, বউয়ের বাপের বাড়ি। তোর শ্বশুর বাড়ি। ছেলেমেয়েগুলোর মামার বাড়ি। বাঃ, ভালোই কাটাবি। মামাবাড়ির ভারি মজা, কিল, চড় নাই। মামাবাড়ি দুধভাত দুয়ারে বসে খাই!

বিভু ঘরামির চেয়ে ভ্যানরিকশা চালক গোবিন্দর সামাজিক অবস্থান খানিকটা উঁচুতে। তার কথায় সেই সুর ফুটে ওঠে।

সুধার কোঁচড়ে বাঁধা ছিল মুড়ি। এখন তিন ভাইবোন খাচ্ছে।

সুশীল ফিসফিস করে মাকে জিগ্যেস করল, মা, আমরা মামাবাড়ি যাচ্ছি? কতদিন থাকব?

সুরো তাকাল বিভুর দিকে।

বিভু বলল, সে দেখা যাবে তখন। গাড়িটা লাফাচ্ছে, দেখিস, মুড়ি পড়ে না যায়।

সুধা জিগ্যেস করল, বাবা, তুমি খাবে?

বিভু বলল, নাঃ! তোরা শেষ কর।

ছোটু আবার শুরু করল প্রশ্নমালা।

চিল আর শকুনের মধ্যে কে বেশি উঁচুতে ওড়ে?

ওই মেয়েটা কাঁদছে কেন?

মোষ কি গরুর বাবা?

ভাইবোনেরা হাসে কিন্তু মা-বাবারা কেউ হাসে না। বিভু ধমক দিয়ে বলে, তুই থাম তো। আবার কথা বললে কান ছিঁড়ে দেব।

রাস্তা খোদলে ভরতি, তার মধ্যে আবার একটা লরি ঢুকে পড়েছে। ভ্যানরিকশার যাওয়ার পথ নেই। গোবিন্দ নেমে গিয়ে হল্লা শুরু করল।

ছোটদের কাছে এটাও বেশ রোমাঞ্চকর ব্যাপার। লরিটা কত বড়, তেমনই বড় চেহারার ড্রাইভার, তার সঙ্গে টক্কর দিচ্ছে গোবিন্দ। কে জিতবে?

গোবিন্দ ফিরে এসে ভ্যানরিকশাটাকে প্রায় ধানখেতে নামিয়ে দিয়ে উঠল গিয়ে লরিটাকে ছাড়িয়ে রাস্তার অন্য দিকে। তা হলে গোবিন্দ জিতেছে, গোবিন্দ জিতেছে, তিনজনে হাততালি দিয়ে উঠল।

সুরো তার স্বামীর একেবারে ঘাড়ের কাছে মুখ দিয়ে নীচু গলায় জিগ্যেস করল, তুমি ওদের রেখে খাওয়াতে পারবে?

বিভু বলল, ফেন-ভাত ফুটিয়ে দেব। সে আর এমনকী কথা।

সুরো বলল, এই সময় আলু সস্তা হবে। সুধাও একটু-একটু পারবে। শুধু ওকে চুলো ধরাতে দিও না।

বিভু বলল, সে তুমি চিন্তা করো না। বড়টাকে এবার ইস্কুলে পাঠাব।

সুধা জিগ্যেস করলে, মা, তোর পুঁটুলিটায় কী?

সুরো বলল, দু-খানা শাড়ি।

বকুনি খেয়ে একটু চুপ করে থাকা ছোটু আবার ফস করে বলে উঠল, মামাবাড়িতে আমাদের ক'টা মামা?

সুশীলই এবার বলে উঠল, গ্যালেই তো দেখতে পাবি। বোকা।

এরা কেউই আগে মামাবাড়িতে যায়নি। মামাবাড়ি নামক রহস্যময় জায়গা সম্পর্কে কিছু শোনেওনি।

অদূরে সনাতনপুরের হাট। ভ্যানরিকশা থামিয়ে গোবিন্দ জিগ্যেস করল, তোরা তো রণকালীপুরে যাবি বললি? এইখানে নেমে যা, বাঁ-দিকে রাস্তা। বেশি দূর না। বিভু, মনে থাকে যেন!

এই রাস্তাটা অপেক্ষাকৃত ভালো। অত ফুটোফাটা নয়। পাশ দিয়ে পাশ দিয়ে চলেছে কেলেঘাই নদী, যাতে প্রচুর কচুরিপানার ফুল ফুটে আছে।

গ্রামের মূল বসতি থেকে বেশ কিছুটা দূরে, নদীর ধারেই এক জায়গায় টালির চালের আট-দশখানা ঘর। গোটা দু-এক মনোহরির দোকান।

সমানে বাঁশের কঞ্চির বেঞ্চে বসে গুলতানি করছে কয়েকজন পুরুষ।

খানিকটা দূরে ওরা থমকে দাঁড়াল। চেয়ে রইল সেই ঘরগুলির দিকে।

বিভু তার পত্নীর একটা হাত ধরে কিছুটা আবেগের সঙ্গে বলল, সুরো, সত্যিই যদি?

সুরোর নিরেট মুখে কোনও রেখা নেই, গলা কাঁপে না। সে বলল, হ্যাঁ, যাব তো।

বিভু বলল, এখনও ফিরে যাওয়া যায়।

সুরো বলল, আমি যাব ঠিক করিচি।

বিভু বলল, আমি কিন্তু তোকে জোর করিনি।

সুরো বলল, না, তুমি জোর করোনি, আমিই ঠিক করিচি।

উতলা হয়ে যাচ্ছে বাচ্চারা। ওই তো দেখা যাচ্চে মামারবাড়ি, তবু দেরি কেন?

সুশীল বলল, বাবা, চলো।

বিভু এবার খাঁকরি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বলল, শোন রে তোরা। মামাবাড়িতে তোদের মা, এখন একলা যাবে। আমরা বাড়ি ঘুরব।

তিনজনের একই প্রশ্ন, কেন, কেন, আমরা যাব না কেন?

বিভু বলল, ওখানে ছোটদের যেতে নেই। মা আবার আসবে। ততদিন তোরা আমার সঙ্গে থাকতে পারবি না?

মেয়েদের বুদ্ধি আগে পাকে। ছোটদের মামাবাড়ি যেতে নেই, এটা সুধার কাছে ঠিক বিশ্বাসযোগ্য মনে হল না। মামার বাড়িতে দুধভাত তা হলে কারা খায়। শুধু বড়রা?

তার প্রশ্নের উত্তরে বিভু বলল, উমম্, মামাবাড়িতে একজনের খুব অসুখ। তাই ছোটদের যেতে নাই। সুরো, তুই হলে এগিয়ে পড়, বেলা পড়ে আসতেছে।

ছোটু ওসব বুঝল না। সে মায়ের উরু জড়িয়ে ধরে শাড়ির মধ্যে মুখ গুঁজে খুব কাতরভাবে আবেদন করল, মা, আমি তোমার সঙ্গে যাব। একটুও চেঁচাব না।

স্বামী ও অন্য দুই সন্তানের দিকে ক্রমান্বয়ে তাকাল সুরো। তারপর ছোটুকে আস্তে-আস্তে ছাড়িয়ে নিয়ে সে বলল, তোকে পরে নিয়ে যাবে ছোটু। আজ বাড়িতে যা। বাড়িতে লক্ষ্মী হয়ে থাকবি।

সুধাকে বলল, ভাইকে ধর। তুই ছোটুকে সামলে রাখবি।

নীচু হয়ে সে স্বামীর পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। তিনটি সন্তানকে জড়িয়ে ধরল একসঙ্গে দু-হাত দিয়ে ঘিরে। আর কোনও কথা নেই।

তারপরই হঠাৎ ওদের ছেড়ে দিয়ে সে হনহন করে এগিয়ে গেল ঘরগুলোর দিকে। একটু পরে থেমে, মুখ ঘুরিয়ে বলল, তোমরা এখনি যেও না।

একটু থাকো।

গুলতানি করা লোকগুলোর পাশ দিয়ে যেতেই একজন আঙুল দেখিয়ে বলল, এই পাশ দিয়ে যাও, দেখবে একটা বড় ঘরের দাওয়া—

গলিতে প্যাচপেচে কাদা। ঘরগুলোর পাশ দিয়ে যেতে সুরো দেখল, সব জানলা দিয়ে উঁকি মারচে নানান বয়সের মেয়েরা।

এক জায়গায় গলিটা তিন ভাগ হয়ে গেছে, কোন দিকে যাবে বুঝতে না পেরে সুরো দাঁড়িয়ে পড়তেই একজন কেউ বলল, ওই তো ডান দিকে গো। রণকালীপুরের রণচণ্ডীকে দেখতে পাচ্ছনি?

বড় দাওয়ায় একটা পানের বাটা নিয়ে পা ছাড়িয়ে বসে আছে এক বিশালবপু রমণী। তার পাশে একজন একেবারে শালিকের মতন রোগা মেয়ে।

শালিকটিই বলল, ও মাসি, এরই তো আজ আসবাব কথা ছিল না?

মুখ ভরতি পানের পিক, রসস্থ গলায় সেই মাসি বলল, এসো গো, এসো বাছা। বোসো।

সর্বাঙ্গে কয়েকবার দৃষ্টি বুলিয়ে নরম গলায় মাসি বলল, কপাল পুড়েছে? এয়ো না বেধবা?

সুরোর উত্তর না শুনেই সে আবার বলল, সিঁদুর রয়েছে তো, আগে দেখিনি, আমি কি চোখের মাথা খেয়েচি? তা সে লোকটি বুঝি ভেগে পড়েছে?

সুরো বলল, না, বাড়িতেই থাকে।

মাসি বলল, বুঝিচি। মাজা ভাঙা। রোজগার করে খাওয়াতে পারে না। খাওয়ার মুখ আর ক'টা।

সুরো বলল, আমার তিনটি ছেলেমেয়ে।

চোখ কপালে তুলে মাসি বলল, অ্যাঁ? বলিস কি, তিনটে?

আবার সুরোর সর্বাঙ্গে চোখ বুলিয়ে মাসি বলল, মেয়ের বয়েস কত?

সুরো বলল, ছয়-সাত হবে!

মাসি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আহা রে! তার তো বিয়ের বয়েস হতে ঢের দেরি। অতদ্দিন পালতে হবে। গভ্যে ছেলেমেয়েদের ধরি, তারা আমাদের খেতে আসে। এটা দাও, সেটা দাও। তারপর

ডানা গজালেই ফুড়ুত করে উড়ে যায়। আমরাও তো দুই ছেলে ছেলো। আজ কোথায় তারা, মায়ের খোঁজ রাখে?

শালিক-মেয়েটি বলল, আমার ছেলেটাও।

নিজে একখিলি পান মুখে পুরে, এক খিলি সুরোর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, নে খা! কী করবি বল, সবই নিয়তি। বাবা-মা খরচা করে বিয়ে দেয়, তার পরেও সোয়ামি যদি দু-বেলা দুটো ভাত দিতে না পারে, তার ওপর ছেলেপুলের হাঁ, সবসময় খাই-খাই। তা সে লোকটা জোর করে তোকে এখানে পাঠাল?

সুরো বলল, না, আমি নিজেই এসেছি।

মাসি বলল, বেশ করেছিস। বাঁচাতে হবে তো। কথায় বলে, আপনি বাঁচলে বাপের নাম। এমনি-এমনি ফৌত হয়ে গেলে কেউ চোখের জল ফেলতেও আসবে নাকো। সে লোকটা যদি কখনও এদিক পানে আসে, তাকে জোড়া পায়ে নাতি মারবি। আমার লোকও তাকে ধোলাই দিয়ে ভাগাবে।

সুরো বলল, তার কাশির অসুখ।

মাসি মস্ত একটা হাত নেড়ে বলল, থাক, থাক, ওসব কথা ঢের শুনিচি। আর শুনতে ইচ্ছে করে না। পুটুলিটায় কী?

শাড়ি দুটো দেখে মুখ ভেটকে মাসি বলল, ও চলবেনি। কাজের সময় একখানা অন্তত জড়ি পার শাড়ি লাগবে। এখেনেই দোকান আছে। আজ কিনতে পারবি?

সুরো দু-দিকে মাথা নাড়ল।

মাসি তাতে বিরক্ত না হয়ে বলল, ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমার কাছে পুরোনো আছে দু-একখানা, তা দিয়ে ক'টা দিন কাজ চলে যাবে। এখেনে বাপু খাওয়ার ব্যবস্থা যার-যার নিজের। আমার কোনও দায় নেই। এই শেফালি তোকে বুঝিয়ে দেবে। তবে, আজই তোকে ঘর দিতে পারব না, থাকবি মোক্ষদার সঙ্গে। মোক্ষদার উদরি হয়েছে, কোনও খাওয়ার দ্রব্যই সহ্য হয় না। তার দরুন মেজাজ খিটখিটে, হাড়-মাসে একটু রস নেই। খদ্দেরদের সঙ্গেও মেজাজ দেখায়। তিন-চারজন নালিশ করেছে আমার কাছে। বোঝে ঠ্যালা, ঠিকমতন যত্ন-আত্যি করবে না। তার ওপর খ্যাট-খ্যাট করবে। ছ্যা-ছ্যা-ছ্যা। খদ্দেরদেরই নাকি দোষ! খদ্দের হল লক্ষ্মী, তাদের কোনও দোষ ধরতে আছে? মোক্ষদা আড়াল থেকে যদি শোনে তো শুনুক, তাকে আমি এবার তাড়াব। দু-তিন দিনের মধ্যেই। দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল অনেক ভালো। সে যদি তোর ওপরেও চোপা করে, তুই কিছুটি বলবি না। মুখ বুজে থাকবি। যা বিহিত করার আমি করব। যা, এখন শেফালির সঙ্গে যা, ও ঘর দেখিয়ে দেবে।

সুরো তবু বসে রইল মাসির মুখের দিকে চেয়ে।

মাসি বলল, কী হল ওঠ! হাই ভাঙার সময় হল। এবার খদ্দেররা আসবে।

মাটির দিকে মুখ নীচু করে সুরো বলল, আমায় দুশো টাকা দেবেন?

এবার মাসির মুখের ভাব বদলে গেল একেবারে। মেঝেতা ভরা মুখে যেন আগুনের আঁচ।

কড়া গলায় সে বলল, টাকা? কীসের টাকা! আমি বাপু, তোমার পায়ে ধরে সেধে আনিনি। নিজে এসেচ, কাজ-কাম করতে চাও তো করো। আমার এখানে ফেলো কড়ি মাখো তেল। রোজগার করবে খাবে। এখনও যার রোজগার শুরুই হল না, সে টাকা চায় কোন মুখে।

সুরো বলল, আমার আজই টাকার খুব দরকার।

মুখঝামটা দিয়ে মাসি বলল, টাকার কার না দরকার। বল না, বিশ্বসংসার কে না টাকার জন্য হ্যাজাচ্ছে? আমি কি এখানে দানছত্তর খুলে বসিচি? তোমার বাপু এখেনে যদি না পোষায় তুমি চলে যেতে পারো। আমি কারুকে ধরে রাখি না।

সুরো বলল, ছেলেমেয়েগুলো বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, ওদের হাতে কিছু না দিতে পারলে কাল

ওদের কিছু খাওয়া জুটবে না।

আরও কিছু ধমক দিতে গিয়ে থমকে গেল মাসি। এবার তার চক্ষুতে ফুটে উঠল বিস্ময়।

সে বলল, ছেলেমেয়েরা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে? তাদের সঙ্গে এনিচিস? এ কেমন ধারা আক্কেল? এসব হল পাপী-তাপীদের জায়গা। গুণ্ডা-বদমায়েশেরা ঘোরাফেরা করে, ছোট বাচ্চাদের এখান থেকে দূরে রাখতে হয়। এইটুকু অন্তত ধম্মোজ্ঞান তো থাকবে। ওরে, এখানকার রাক্কোসরা সাত বছরের বাচ্চা মেয়েকেও খেয়ে ফেলতে চায়।

সুরো আবার বলল, দয়া করো। কিছু টাকা না পেলে।

মাসি বলল, দয়া? দয়া-টয়া করলে এ কারবার চলে না। ওরে শেফালি আমাকে একটু ধর তো।

শেফালি এক হাত ধরে টেনে তুলল মাসিকে তারপর মাসি নিজেই থপথপিয়ে চলে গেল ঘরের মধ্যে।

মুখ নীচু করে বসে রইল সুরো।

তার স্বামী তাকে জোর করে পাঠায়নি, সে নিজের ইচ্ছেতেই এসেছে, এটা ঠিক কথা। বিভুর কাশরোগ, তার শরীর দুর্বল হয়ে গেছে, মাঝে-মাঝে গলা দিয়ে রক্তের ছিটে বেরোয়। সরকারি হাসপাতালের ওষুধ খেয়ে সারে না। তারা পুষ্টিকর খাদ্য খেতে বলে।

শরীর দুর্বল, তাই ঘরামির কাজ আর ভালো পারে না বিভু। ইদানীং কাজ তেমন জোটেও না। তাকে ডাকে না কেউ। ইট-সিমেন্টের কাজও শেখেনি বিভু। দিনের-পর-দিন বাড়িতে বসে থাকলে স্ত্রী-সন্তানরা খাবে কী?

সুরো নিজে উপার্জনের চেষ্টা করেছে। মুড়ি ভাজা, লোকের বাড়িতে বাসন মাজা, ঘর পরিষ্কার করা। তার জন্য বাবুদের পাড়ায় যেতে হয়। তারা কেউ ঠিকা লোক চায় না। বাড়িতে থেকে সবরকম কাজকম্ম করবে, বাচ্চাদের গু-মুত পরিষ্কার থেকে রান্নাবান্না, তবে তো। তাও খোরাকির সঙ্গে মাত্র কয়েকটা টাকা। তাতে কি পোষায়? দিনের-পর-দিন এমন চলছে, নিজেরা তবু না খেয়ে, আধপেটটা খেয়ে চালিয়ে দিতে পারে। কিন্তু ছেলেমেয়ে তিনটে, ওদের খিদের কান্না সহ্য করা যায় না। ওদের এই পৃথিবীতে আনা হয়েছে, ওরা ইচ্ছে করে আসেনি, ওদের দোষ কী!

ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়ে পড়লে বিভু আর সুরো গালে হাত দিয়ে ভবিষ্যতের কথা ভেবে-ভেবে কূল পায়নি। বাড়িতে ঘটি-বাটি যা ছিল সব বিক্রি হয়ে গেছে। বিক্রি করার মতন আর কিছুই নেই। শুধু সুরোর গায়ের মাংস ছাড়া। এত অনাহারেও সুরোর শরীর একেবারে চিমসে হয়ে যায়নি। মা হয়ে সে সন্তানদের জন্য এইটুকু করতে পারবে না?

দু-টাকা পাঁচ টাকার নোট মিলিয়ে শ'খানেক টাকা আর একটা জড়ির পাড় বসানো ঝ্যালঝেলে শাড়ি নিয়ে ফিরে এল মাসি।

টাকাসুদ্ধু হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে মাসি বলল, যা দিয়ে আয়। এর আগে আমি কাউকে আগাম দিইনি, এই শেফালিরা জানে। এগুলো দিয়ে এসে কাজে লেগে পড়। আর যেন কখনও সে মিনসে আর কাচ্চাবাচ্চারা এদিক পানে না আসে, এই বলে দিলাম!

সুরো আবার বাইরে এসে দেখল, একটা পাকুড়গাছের তলায় ঠায় দাঁড়িয়ে আছে বিভু। তার হাত ধরে সুধা। ছেলে দুটো মনোহরির দোকানের সামনে ঘুরঘুর করছে হ্যাংলার মতন।

মাকে দেখে তারা দৌড়ে ফিরে এল।

টাকাগুলো বিভুর হাতে দিয়ে সুরো বলল, বেশি করে চাল কিনে নিও।

বিভু বলল, এখানকার হাটে একটুও সস্তা হবে।

সুরো বলল, নতুন চালে ফেনাভাত ভালো হয়। পেটও ভরে। আলু-আদা এখন সস্তা। নুন নিও মনে করে। আজকের দিনটায় অন্তত ছেলেমেয়েরা যেন ভালো করে খায়।

সুধা বলল, মা, মামাবাড়িটা ভেতরটা একবার দেখে আসতে পারব না? আমরা একটাও কথা বলব না।

সুরো বলল, আজ না। আর-একদিন।

বিভু বলল, মা তো ফিরে আসছেই। বেশিদিন নয়।

সুরো বলল, হ্যাঁ। ফিরে আসব।

ছোটু হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

সুরো বলল, ওদের ক-টা লজেঞ্চুস কিনে দাও। সুধা, ভাইয়ের হাত ধর।

লজেঞ্চুসের কথা উচ্চারিত হতেই সুশীল সঙ্গে-সঙ্গে দোকানটার দিকে। তার পরেই সুধা আর ছোটু।

বিভুর মুখোমুখি কয়েক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সুরো। তার নিরেট মুখে কোনও ভাবলেশ নেই।

একটু পরে সে বলল, যাই। সাবধানে থেকো। রক্ত পড়লে নুনজলে কুলকুচি করবে।

সুরোর বদলে বিভুই চোখ ছলছল করছে। এরকম সময়ে কী বলতে হয়, তা সে জানে না। সে জামার খুঁট দিয়ে চোখ মুছল, তারপর আবার মুখ তুলতেই দেখল, সুরো ফিরে গেছে অনেকখানি।

একটা করে লজেন্স মুখে, একটা হাতে। অমৃতের স্বাদ নিতে-নিতে লাফিয়ে-লাফিয়ে এগিয়ে চলল তিনটি ছেলেমেয়ে। একটা পা তুলে-তুলে, নাচের ছন্দে দুলে-দুলে ছোটা। এরকমভাবে ছুটতে শুধু বাচ্চারাই পারে।



সাঁকো

ওরা আমার হাত দুটো পেছনদিকে মুড়ে বাঁধল নাইলনের দড়ি দিয়ে। চোখে বেঁধে দিল নিরেট কালো কাপড়। মুখের মধ্যে একটা বেশ বড় তুলোর গোল্লা ভরে দিয়ে ঠোঁটে আটকে দিল স্টিকিং প্লাস্টার। তারপর বুঝতে পারলুম, দু-তিনজন লোক আমাকে উঁচু করে তুলে বেশ খানিকটা বয়ে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল একটা কাঠের তক্তার ওপরে।

একজন খুব ঝকঝকে পালিশ করা গলায় বলল, এবারে তুমি হাঁটো সামনের দিকে। তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই, এক-পা এক-পা করে হাঁটো।

আমি এক-পা বুলিয়ে দেখলুম, কাঠের তক্তাটা মাত্র বিঘতখানেক চওড়া, তলার দিকে শূন্যতা।

এটা একটা সাঁকো? নীচে কোনও পাহাড়ি নদী? জ্যোৎস্নাহীন রাতে আমরা আসছিলুম একটা পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে, গাড়ি থেমেছিল একটা জঙ্গলের মধ্যে। এমন নিস্তব্ধতা যে বাতাসেরও কোনও শব্দ নেই।

যেন আমার মনের কথা বুঝতে পেরেই আততায়ীদের একজন হেসে বলল, হ্যাঁ, এটা তিস্তা নদীর ওপর একটা অস্থায়ী সাঁকো। জল প্রায় পাঁচ-ছ'শো ফুট নীচে। যদি পা পিছলে পড়ে যাও সঙ্গে-সঙ্গে ছাতু হয়ে যাবে। তোমাকে আর খুঁজেও পাওয়া যাবে না।

আমি বুঁবুঁ শব্দ করে বলতে চাইলুম, আমাকে এই সেতুটা পার হতে বলছ কেন?

সে ঠিক বুঝতে পেরে বলল, এটা একটা খেলা।

আমি ওইভাবেই আবার বললুম, এ-খেলা যদি আমি খেলতে না চাই?

সকৌতুক উত্তর এল, তাহলে তোমাকে ঠেলে ফেলে দেওয়া হবে। তুমি গড়াতে-গড়াতে পড়বে, আমরা সেটা টর্চ ফেলে দেখব।

এরপর আমি নিজেই জিগ্যেস করলুম, আর যদি ওপারে পৌঁছোতে পারি?

আবার হাসির সঙ্গে উত্তর এল, তখন দেখবে কী হয়। নিশ্চয়ই একটা কিছু খুব মজার ব্যাপার হবে। নাউ স্টার্ট। আমরা ঠিক দশ গুনব, তার মধ্যে এগোতে শুরু না করলে...এক, দুই, তিন...

প্রথম পা ফেললুম সামনের দিকে। খুব একটা শক্ত কিছু মনে হল না। কাঠের পাটাতনটা বেশ মজবুত। এক পা সামনে দিয়ে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে তারপর দ্বিতীয় পা এগিয়ে ঠিক মতোন বুঝে নিয়ে সেটা ফেলতে হবে। এইরকম ভাবে প্রত্যেকবার। একটুও অন্যমনস্ক হলে চলবে না। অসম্ভব কিছু নয়। এর থেকেও অনেক শক্ত খেলা আছে পৃথিবীতে।

ওদের গোনা শেষ হওয়ার আগেই আমি তিন পা এগিয়ে এসেছি। কী ভাবে ওরা আমাকে? ওরা গায়ের জোরে আমাকে ধরে এনেছে বলেই আমি ওদের কাছে হার স্বীকার করব? ওরা কি ভেবেছিল, আমি কেঁদে কেটে, প্রথমেই ভয় পেয়ে গিয়ে দয়া চাইব ওদের কাছে? আমাকে এখনও চেনে না।

এই সাঁকোটা কতখানি লম্বা? তিস্তা নদী তো কম চওড়া নয়। জুবিলি ব্রিজ পার হয়েছি অনেকবার। উঁচু পাহাড়ের ওপরে হয়তো কিছুটা সরু। এ জায়গাটা কোথায়?

এ কী, আমার পা কাঁপছে কেন? মাথা ঠিক আছে, তবু পা কাঁপছে? সামনের দিকে এগোবার জন্য একটা পা তুলতেই অন্য পা-টা যেন শরীরের ভর রাখতে পারছে না। মানুষ তো এক পায়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। কিন্তু এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় সামনের দিকে পা বাড়ানোই দারুণ শক্ত। পাশের দিকে নয়, শুধু সামনের দিকে। একেবারে সোজা হাঁটতে মানুষ জন্ম থেকেই শেখে না।

ওদের একজন চেঁচিয়ে জিগ্যেস করল, কী হল, থামলি কেন? গুঁতো খাবি কিন্তু।

আমার মুখ বন্ধ, আমি উত্তর দেব কী করে? ওরা তা জানে না? অবশ্য ওদের ওই প্রশ্নের কোনও উত্তরও হয় না।

আবার ওরা বলল, হয় গুঁতো খাবি, নইলে গুলি করা হবে। থেমে থাকা চলবে না। আবার দশ গুনছি, এক-দুই-তিন...

একটা যদি লাঠি দিত ব্যালান্স রাখার জন্য! হাঃ, লাঠি, হাত দুটোই খোলা রাখেনি। ছেলেবেলায় যখন কোনও পাঁচিলের ওপর দিয়ে কিংবা রেললাইনের ওপর দিয়ে হেঁটেছি, হাত দুটো এমনিতেই দুপাশে সোজা হয়ে গেছে, হাত দুটো তখন ডানা হয়ে যায়।

অন্ধকার রাত্তিরে চোখ খোলা থাকলেও এরকম একটু সরু সাঁকো পার হওয়া কথার কথা নয়। তবু ওরা চোখ বাঁধতে গেল কেন? তেমন প্রয়োজন হলে মানুষ নাকি অন্ধকারেও দেখতে পায়। চোখ খোলা থাকলে, আর কিছু না হোক শুধু ও তো দেখা যেত। অন্ধকার কি দেখার জিনিস নয়। অন্ধকার কতরকম। পৃথিবীতে কোথাও খাঁটি কালো অন্ধকার নেই।

না, অসম্ভব পা কাঁপছে। আমি পারব না। এরই মধ্যে একবার টলে পড়ে যাচ্ছিলুম আর একটু হলে। এটা অন্যায় খেলা।

ওরা আর লাঠি-ফাঠি নিয়ে গুঁতো মারতে পারবে না। তার থেকে দূরে চলে এসেছি নিশ্চয়ই! গুলি করতে পারে। কিন্তু ওদের গুলি খেয়ে আমি কিছুতেই মরব না। ওরা গুনতে শুরু করলে নয় পর্যন্ত গোনার পরই আমি ঝাঁপ দেব।

—নীলু! নীলু!

বাবার গলায় আওয়াজ। বাবা মারা গেছেন অনেকদিন আগে। বাবা এখানে এই নদীর ওপর এসে আমায় ডাকতে পারেন না। মানুষের আত্মা বলে কিছু যদি থেকেও থাকে, কিন্তু সেই আত্মা কি পাখি যে অন্ধকার নদীর ওপর এসে উড়বে? এটা আমার কল্পনা, গল্প-উপন্যাসে এরকম থাকে। অবচেতনে আমি কি শিশু হয়ে গিয়ে বাবার সাহায্য চাইছি?

—নীলু, নীলু, তুই পারছিস না? আমি তোর হাত ধরব?

—বাবা, আমার হাত বাঁধা। তোমারও কি হাত আছে?

—না, আমার হাত নেই। কিন্তু তোকে থামলে চলবে না। তুই এগিয়ে আয়, আস্তে-আস্তে, মনে কর, একটু সামনেই তোর মা বসে আছে।

—মা কি সামনে থাকে, না পেছনে?

একটা দমকা হাওয়া দিল। এতক্ষণ বাতাসের অস্তিত্বও টের পাওয়া যাচ্ছিল না। বেশ গরম, কিন্তু বেশি জোর হাওয়া ভালো নয়। একটা পা তুললেই আমার শরীরটা যেন একটা শুকনো ফুলের পাপড়ির মতন পলকা হয়ে যাচ্ছে। বাতাসের ধাক্কাতেও পড়ে যেতে পারি।

আমি আর এগোতে পারছি না। না, পারব না।

পেছন থেকে ওরা গুনছে, এক দুই তিন...সাত আট...

—নীলু, নীলু, ঝাঁপ দিও না।

মায়ের গলা? না তো, অন্যরকম, অথচ খুব চেনা-চেনা। কে, তুমি কে?

—নীলু, ঝাঁপ দিও না। এসো সামনে এসো। তুমি আমায় চিনতে পারছ না নীলু?

—রিনি! সত্যি প্রথমটা চিনতে পারিনি। অথচ ভেবেছিলুম, সারা জীবনে তোমাকে ভুলব না। আশ্চর্য।

—সত্যিই তুমি আমায় ভুলে গিয়েছিলে, নীলু?

—না, রিনি, ভুলে যাইনি, আবার অনেকদিন মনেও পড়েনি তোমার কথা। এতদিন কোথায় হারিয়ে গিয়েছিলে?

—আমি তো হারিয়ে যাইনি, তুমিই অনেক দূরে চলে গেলে।

—রিনি আমার চোখ বাঁধা, তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না। তুমি কি আগের মতোই আছ? ঘুঘু পাখির চোখের মতন অবাক-অবাক ভাব, একটা উড়ন্ত পালকের মতন তোমার শরীর।

—কথা বলো না, নীলু, এগিয়ে এসে আমার হাত ধরো।

—আমি পারছি না রিনি, আমি আর পারব না, এই দ্যাখো, একটা পা তুলতে কতক্ষণ সময় লেগে যাচ্ছে।

—তুমি একসময় তোমার সবকিছু ছেড়ে আমার দিকে ছুটে এসেছিলে।

—আমি ছুটে গিয়েছিলুম না তুমি আমাকে চুম্বকের মতন টেনেছিলে? এখন আবার সেই রকমভাবে টানতে পারো না?

—মাঝখানে কতগুলো বছর...নীলু, তুমি সামনাসামনি না এগিয়ে পাশ ফিরে হাঁটো। দ্যাখো, তাহলে পা তুলতে হবে না। একটা পা ঘষে-ঘষে এগোবে। পা কাঁপবে না। আমি হাত বাড়িয়ে আছি তোমার দিকে।

—তাই তো, পাশ ফিরে হাঁটা কিছুটা সহজ লাগছে। রিনি তুমি কী করে জানলে? তোমাকে কি এরকম সাঁকো পার হতে হয়েছে কখনও?

আর কোনও উত্তর নেই। রিনি আসেনি। আবার অবচেতন? পাশ ফিরে হাঁটার বুদ্ধিটা রিনি দিয়ে গেল, না আমি নিজেই উদ্ভাবন করলুম? বহুদিন রিনির কথা মনে পড়েনি, রিনি হারিয়ে গেছে, না আমি দূরে চলে গেছি? একসময় রিনির খুব কাছে পৌঁছনোর জন্য সাংঘাতিক ব্যাকুলতা ছিল। কত আছে? রোদ্দুর যেমন বহু লক্ষ মাইল দূর থেকে ছুটে এসে মানুষের শরীরের ওপর ঝাঁপিয়ে

পড়ে, তারপর শরীরের প্রতিটি রোমকূপ দিয়ে ভেতরে চলে যায়, অন্ধকার মজ্জা-মাংস শিরা-রক্তে আলো জ্বালিয়ে দেয়, সেইরকম? না, আমি আলো জ্বালিনি, রিনিই জ্বালিয়েছিল, এক চিল-ডাকা দুপুরে ওদের বাড়ির একতলায় বসবার ঘরে রিনি আমার চোখের সামনে ওর একটা হাত তুলে বলেছিল, এই আঙুলের ডগায় কী আছে বলো তো? আমার মনে হয়েছিল, সেখানে থেমে আছে অনন্ত মুহূর্ত।

তবু আমরা পরস্পরকে হারিয়ে ফেললুম কী করে? আর রিনিকে ছাড়ব না, এবার রিনিকে পেতেই হবে। মনে করা যাক এখান থেকে ঠিক দশ পা দূরে দাঁড়িয়ে আছে রিনি, সেই আঙুলটা তুলে, আমার ওই পর্যন্ত যেতেই হবে।

—নীলু, আমি কিন্তু ঠিক দশ পা দূরেই দাঁড়িয়ে আছি। তুমি গুনে-গুনে পা ফেলে এসো।

—রিনি তোমার কাছে পৌঁছোলে তুমি আমার চোখের বাঁধনটা অন্তত খুলে দেবে? তোমাকে একবার দেখব।

—তোমার চোখ বাঁধা আছে, তাতে এক হিসেবে ভালোই হয়েছে। নীচের দিকে তাকালে তোমার মাথা ঘুরে যেত। নদীর জলে একটু আলো চিকচিক করছে। অনেক নীচে।

—নীচের দিকে তাকাব না, শুধু তোমার আঙুলের ডগাটা আর-একবার ভালো করে দেখব।

এই দশ পা যেতে আমার পা কাঁপল না। রিনি সেখানে নেই। কীসের শব্দ, অনেক নীচের নদীর জলস্রোতের? ওহে অবচেতন, তুমি আরও শক্তিশালী হয়ে রিনিকে রক্তমাংসে তৈরি করতে পারলে না? কী গাধা আমি, মাত্র দশ পা দূরে রিনি থাকবে, কেন একথা ভাবতে গেলুম? যদি ভাবতুম পঞ্চাশ পা দূরে, কিংবা সাঁকোর ওপারে দাঁড়িয়ে আছে রিনি, আকাশে কালপুরুষের দিকে তার কোমল আঙুলখানি তুলে, তাহলে সেই টানে হয়তো পৌঁছে যাওয়া যেত।

কৃপণের মতন আমি মাত্র দশ পা উচ্চারণ করে রিনিকে খরচ করে ফেলেছি। এখন অবচেতন তোলপাড় করলেও আর রিনি ফিরে আসবে না।

পেছন থেকে কর্কশ হুংকার ভেসে এল—এই হারামজাদা, দাঁড়িয়ে পড়লি কেন? আমরা কি এখানে সারারাত কাটাতে এসেছি? গুলি চালাব?

ওরা কি টর্চ ফেলে দেখছে আমাকে? ওরা সব মিলিয়ে ছ'জন, আমি গুনেছি। ওদের বাধা দেওয়ার কোনও উপায় ছিল না। ওরা কি অপেক্ষা করে আছে, কখন আমি পড়ে যাব? কিংবা ওরা নিজেদের মধ্যে বাজি ফেলেছে? সিনেমায় এরকম দৃশ্যে থাকে, হঠাৎ একবার পা ফসকে পড়ে যায় নায়ক। দর্শকদের বুক ধড়াস করে ওঠে। নায়ক কিন্তু সত্যি-সত্যি পড়ে যায় না, শেষ মুহূর্তে ধরে ফেলে এক হাতে। ঝুলতে থাকে। তলায় হাঁ করে আছে কুমির। নায়ক সেই অবস্থাতেও উঠে আসে কায়দা করে।

আমি পড়ে গেলেও ধরতে পারব না, আমার হাত বাঁধা। মুখ দিয়ে কাঠটাকে কামড়ে ধরারও উপায় নেই। আমার এক চুলও ভুল করলে চলবে না। তা ছাড়া আমি নায়কও নই। এটা সিনেমা নয়, এটা বেঁচে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা।

বাঁচতেই যে হবে, তার কী মানে আছে! একটা কুঁড়েঘরের চাল থেকে ঝুঁকে পড়া রোমশ, হালকা সবুজ লাউডগায় বসে আছে একটা লালচে রঙের ফড়িং, তিরতির করে কাঁপছে তার ডানা, কী নিশ্চিন্ত ও আনন্দময় তার বসে থাকার ভঙ্গি, যদিও যে-কোনও মুহূর্তে একটা শালিক তাকে ঠোঁটে চেপে নিয়ে যেতে পারে। কেন এই দৃশ্যটা মনে আসছে!

আর কত দূর যেতে হবে? অর্ধেক এসেছি কি? একটা মুহূর্ত, যদি লাফ দিয়ে পড়ি, তাহলে আর কোনও যাতনা সহ্য করতে হবে না। অনেক উঁচু থেকে পড়লে বাতাসের চাপেই নাকি নিশ্বাস শেষ হয়ে যায়। অন্য যে-কোনও মৃত্যুর চেয়ে নদীর বুকে হারিয়ে যাওয়া অনেক ভালো।

দুলছে, দুলছে সেতুটা, দুলছে। ওপার থেকে কি ওরা ইচ্ছে করে দোলাচ্ছে? তাহলে ওদের

খেলাটা এই, আমাকে কিছুতেই পার হতে দেবে না। মাঝ নদীতে ফেলে দেবে।

কিংবা এত লম্বা কাঠের সেতু, নীচে যদি কোনও সাপোর্ট না থাকে, তাহলে মাঝখানটা বেঁকে যেতে তো পারেই। এইখানটা চালু হয়ে গেছে, দুলছে। মানুষ নয়, এই কাঠের তক্তার দুর্বলতাই ফেলে দেবে আমাকে।

—নীলু, নীলু তুমিও তোমার শরীরটা দোলাও। নইলে ভারসাম্য রাখতে পারবে না।

—কে, গগনদা? আপনি কোথা থেকে এলেন?

—কথা বলার সময় নেই নীলু। নিজের শরীরটা দোলাও, তারই সঙ্গে একটু-একটু করে এগিয়ে এসো।

—আমি আর পারছি না, গগনদা। জল আমাকে টানছে। আর, গেলাম...

—না-না, তুমি পারবে, তোমাকে পারতেই হবে, নীলু। কাঠের তক্তার দুলুনির সঙ্গে শরীরটা দোলাও সেইসঙ্গে একটা পা বাড়িয়ে দাও, মনের জোর আন, শরীরে জোর আন, নীলু—তুমি ঠিক জয়ী হবে।

আঃ এসব কী হচ্ছে, অবচেতন! গগনদাকে কোথা থেকে এনে হাজির করলে? একইসঙ্গে শরীর দোলাব, পা বাড়াব, মনের জোর আনব, আমি কি ভেল্কিবাজি জানি? কলেজ জীবনে গগনদা আমাকে যত রাজ্যের ভুল জিনিস শিখিয়েছিলেন। বলেছিলেন, গ্রামের মানুষের সঙ্গে গ্রামের ভাষায় কথা বলতে শেখ। বলেছিলেন, বিপ্লবের জন্য অস্ত্র তুল নাও। বলেছিলেন ব্যক্তিগত জীবনে প্রেম-ভালোবাসা বিসর্জন দাও। বলেছিলেন আদর্শের জন্য বন্ধুর বুকেও ছুরি মারবার জন্য তৈরি হও। সবগুলো এক সঙ্গে, আমার মাথা গুলিয়ে গিয়েছিল, আমি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলুম। যখন আমি চোখ মেললুম, তখন দেখলুম গগনদা নিজে এসব কিছু মানেননি, নিজে দিব্যি ফুরফুরে জীবন কাটাচ্ছেন। আমাকে চোখ মেলতে দেখেই তিনি বললেন, তুমি কে, আমি তোমাকে চিনি না।

বাবা, রিনি, গগনদার কথা অবচেতন থেকে উঠে আসছে কেন? এটা কি রূপক নাকি? অন্ধকার রাত্তিরে একটা খরস্রোতা পাহাড়ি নদীর ওপরের বিপজ্জনক সাঁকো দিয়ে আমি একলা পার হচ্ছি, এটা কোনও প্রতীকের ব্যাপার। ক্ষুরস্য ধারা নিশিতয়া...ধারালো ক্ষুরের ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার নামই জীবন, উপনিষদ-ফুপনিষদে এরকম কিছু গালভরা কথা আছে না? ষাঁড়ের পেচ্ছাপ। রূপক-টুপক কিছু না হলে বাঁচা যেত। ছ'খানা উৎকট আততায়ী জোর করে আমাকে ধরে নিয়ে এল, কেন আমার ওপর তাদের রাগ তা জানি না, আমাকে এক গুলিতে খতম না করে তারা আমাকে এই বীভৎস তামাসায় নামিয়ে দিয়েছে, সামান্য পদস্খলন হলেই সোজা মৃত্যু, এটাই কঠোর বাস্তব। আমার জীবনে আজকের এই রাতটা শেষ হবে না বোধহয়।

—এই দুই-তিন-চার-পাঁচ...

—যাচ্ছিরে বাবা, যাচ্ছি। বাঁচতে কার না সাধ হয়? যে-কোনও উপায়ে, দাঁতে দাঁত কামড়ে সবাই বেঁচে থাকতে চায়। যাচ্ছি-যাচ্ছি।

—কাঠের তক্তার দুলুনিটা থেমে গেছে হঠাৎ। তাহলে সম্ভবত পেরিয়ে এসেছি মধ্যপথ। খুব গরম লাগছে। জামাটা খুলে ফেলতে পারলে ভালো হত। এই অন্ধকারে প্যান্টটা খুলে ফেললেই বা ক্ষতি কী ছিল, শরীরটা আরও হালকা হত। ওরা একটা ভালো কাজ করেছে, হয়তো ভুল করেই, আমাকে খালি পায়ে আসতে দিয়েছে। পায়ের আঙুলগুলো আমার বহুকাল আগের পূর্বপুরুষের মতন আঁকড়ে ধরেছে তলার অবলম্বনটা।

—নীলু তুই ভয় পাসনি, আমি সবসময় তোর সঙ্গে আছি।

—বাবা, তুমি আবার এসেছ? বাবা, তুমি যখন সঙ্গে থাকতে, তখনও কি আমি অনেক অচেনা রাস্তায় হারিয়ে যাইনি? আমি নিজেই তো শেষপর্যন্ত পথ খুঁজে পেয়েছি।

—নীলু সেইসব সময়েও বাবা-মায়ের স্নেহ ঘিরে থাকে সন্তানকে। সন্তানেরা বোঝে না, স্নেহ

নিম্নগামী বলেই তারা বোঝে না, তারা বাবা-মায়ের কথা ভুলে গিয়ে নিজের সন্তানদের দিকে তাকিয়ে থাকে...

ভাই অবচেতন, কেন বাবাকে ফিরিয়ে আনলে? এতে যে আমি আরও দুর্বল হয়ে পড়ব। বাবার মৃত্যুশয্যার পাশে আমি উপস্থিত থাকতে পারিনি, বাবার অনেক সঠিক নির্দেশ আমি মানিনি, বন্ধুবান্ধব সান্নিধ্যে, একটা অদ্ভুত ছটফটানির মধ্যে মত্ত হয়ে ছিলুম। কিন্তু এই কি সেইসব ব্যাপার নিয়ে অনুশোচনার সময়? যদি কারুকে আনতেই হয়, রিনিকে নিয়ে এসো। আর কিছু না হোক, রিনির কণ্ঠস্বরই আমাকে সঞ্জীবনী শক্তি এনে দেবে।

ওঃ হো আমার নিজেরই অবচেতন, অথচ আমি তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি না। চাইলুম রিনিকে, নিয়ে এল গগনদাকে। ওগো প্রিয় অবচেতন, তুমিও কি ওই ছ'জন অপরাধ কর্মীর মতন মজা মারছ আমাকে নিয়ে? নইলে এখন গগনদাকে নিয়ে আসার কী মানে হয়? গগনদার মতন মানুষেরা চিরকালই এইরকম বড়-বড় গালভরা বাণী দিয়ে যাবে। তা শুনে হয়তো দু-চারজন শেষ পর্যন্ত পৌঁছোবে মুক্তির দরজায়, আর বাকি যে কয়েকশো বা কয়েক হাজার টুপটাপ করে খসে পড়ে যাবে অতলে, তাদের হিসেব কে রাখবে? আমি ওই খসে পড়ার দলে। অথচ আমার বাঁচতে ইচ্ছে করে। সত্যি বলছি, মা কালীর দিব্যি, আমার ভীষণ বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে। যারা নেমন্তন্ন বাড়ির বাইরে বসে এঁটো পাতা চাটে, আমি তাদের একজন হয়েও বেঁচে থাকতে চাই। আমি নদীতে আছড়ে পড়ে টুকরো-টুকরো হতে চাই না।

ডান পা, বাঁ-পা, ডান পা, বাঁ-পা, ডান পা, বাঁ-পা। আমার অবচেতন নেই। এখন সমস্ত মন শুধু আমার পায়ে। আমার চোখ বাঁধা, মুখ বাঁধা, আমার হাত বাঁধা। শুধু পা দুটো খোলা। এই পা নিয়েই আমাকে বাঁচতে হবে। আমি পিছিয়ে যেতে পারব না। আমি থেমে থাকতে পারব না। ওরা রাইফেল উঁচিয়ে টর্চ ফেলে কি এখনও দেখছে আমাকে? আর কত দূর, কত দূর, কত দূর, আমি কতক্ষণ ধরে হাঁটছি!

কাছেই যেন গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। সত্যি-সত্যি মানুষের গলা, অবচেতন নয়, পিওর অ্যান্ড সিম্পল বাস্তব। আমি কি তাহলে পৌঁছে গেছি, বেঁচে গেছি। ব্রিজের এপারেও মানুষ আছে, তারা কথা বলছে। ভাগ্যিস ওরা আমার কানও বেঁধে দেয়নি। আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি।

একজন বলল, বাক আপ! বাক আপ! এসে গেছে! এসে গেছে! আর কয়েক পা!

আর-একজন বলল, মাই গড, সত্যি হারামজাটা পৌঁছে গেল?

আরও একজন বলল, ওনাট ইজ টু ফোর। আমি বলেছিলুম না, প্রাণের টান বড় টান। এ শালা ঠিক পার হয়ে যাবে। আমার বাজির টাকা দিতে হবে কিন্তু।

আমি থমকে গেলুম। কণ্ঠস্বরগুলো আমার চেনা। এরাই ওপারে ছিল, এরাই আমাকে জোর করে ধরে এনেছে।

কাছাকাছি আর কোনও সুবিধেজনক, নিরাপদ, সংক্ষিপ্ত সেতু আছে নিশ্চয়ই, তা দিয়ে ওরা পেরিয়ে এসেছে! সেইসব সেতুর সন্ধান, এমনকী এই অন্ধকার রাত্তিরেও ওরাই শুধু জেনে যায়। ওরা সবকিছু সহজে পায়।

ওদের একজন বলল, থামলি কেন রে। এবার জোর কদমে চলে আয়, আর কোনও ভয় নেই।

অন্য একজন বলল, এই লোকটা যে কামাল করবে, ভাবতেই পারিনি। একে একটা কিছু পুরস্কার-টুরস্কার দেওয়া উচিত

আর-একজন বলল, নিশ্চয়ই, আমরা স্পোর্টসম্যান স্পিরিট দেখাতে জানি। ও এপাশের মাটিতে পা দিলেই ওকে উইনার বলে ডিক্লেয়ার করব। ওরে, তুই কী চাস, দেড় বিঘে জমির ওপর বাড়ি, ফরেন ট্রিপ, ওষুধের এজেন্সি, রাস্তা তৈরির কন্ট্রাকটরি—কী চাস বল?

আমার পা দুটো ঠকঠক করে কাঁপছে। ছেলেবেলায় একটা কথা শুনেছিলুম, খেজুর গাছের তিন হাত। সাধারণ লোকের পক্ষে খেজুর গাছ বেয়ে ওঠাই শক্ত, সবচেয়ে শক্ত শেষ তিন হাত ওঠা। তীরে এসে যেমন তরী ডোবে। আমি আর এগুতে পারছি না। না, আর-এক পা-ও বাড়ানো যাবে না।

আমার অবচেতন বলল, যাঃ, এ কী করছ মাইরি। এখানে সাঁকোর তলায় জল নেই, মাটি, তুমি এখন এক দৌড়ে পার হয়ে যেতে পারো।

আমি হেসে পেছন ফিরলুম।

ওপারে পৌঁছলেই লোকগুলো আমাকে কিছু পুরস্কার দেবে বলছে। এটা ওদের খেলা। সবাই বাঁচতে চায়, অমিও বাঁচতে চাই। কিন্তু বেঁচে থাকার মধ্যে একটা আত্মগরিমা থাকবে না? তা না হলে শুধু পোকামাকড়ের মতন...। শুধু একটা বাস্তব জীবন? কেউ সামনে একটা গাজরের টুকরো ঝুলিয়ে রাখবে, তাই দেখে ছুটে যাওয়া? আমাদের ওদের নিয়মে খেলতে হবে!

আমি উলটো দিকে ফিরে পা বাড়াতেই এপারের লোকজন হইহই করে বলে উঠল আরে-আরে লোকটা পাগল হয়ে গেছে নাকি? ওরে গাধা, কোন দিকে যাচ্ছিস? এদিকে আয়, দৌড়ে আয়, তুই বেঁচে গেছিস...

আমার মুখ বন্ধ, তবু আমি বললুম, এবার শুরু হবে আমার নিজস্ব খেলা।



এলাচের কৌটো

সাইকেল রিকশা নিয়ে বাড়ি থেকে খানিকটা এগোবার পরেই রত্নার মনে পড়ল একটা জিনিস নেওয়া হয়নি। সে ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, এই এই, একটু থামো তো ভাই, একবার ফিরে যেতে হবে।

রিকশাচালক অপ্রসন্নভাবে মুখ ফিরিয়ে তাকাল। এই সময় দু-দিক থেকে দুটো ট্রেন আসে, অনেক যাত্রী, তাই রিকশাওয়ালাদের পোয়াবারো। কলকাতার ট্যাক্সি ড্রাইভারদের মতন রুক্ষ হয়ে ওঠে। কী যেন নিজের মনে গজগজ করতে-করতে রিকশাটা ফেরাল।

সদর দরজা খুলিয়ে যেতে হল দোতলায়। নিজের ঘরের টেবিলের ওপর রাখা আছে কৌটোটা। সেটা তাড়াতাড়ি ব্যাগে ভরে নিয়ে ফিরে যেতেই টান পড়ল আঁচলে। টেবিলের কোনায় যে চলটা উঠে আসে, সেখানে আটকেছে।

আঁচলটা ছাড়াতে গিয়ে শরীরটা কেঁপে উঠল রত্নার। আসল জিনিসটাই তো সে ভুলে গেছে। তার আইডেনটিটি কার্ড। এটা না থাকলে তো সে ঢুকতেই পারত না। আঁচলটা আটকাল বলেই তো মনে পড়ল। এটা যেন অলৌকিক ব্যাপার। ঠিক কেউ যেন তার আঁচল ধরে টেনে মনে করিয়ে দিল! ঠিক যেন ব্যাখ্যা করা যায় না।

রিকশাচালক বলল, অনেক টাইম লেগে গেল, দিদি। এক টাকা বেশি লাগবে।

তর্ক করতে ইচ্ছে করল না রত্নার। দেবে সে এক টাকা, কিন্তু কথা খরচ করবে না।

এই সময়টাতেই মফস্‌সল শহর সবচেয়ে বেশি জেগে ওঠে। ট্রেন আসে, দোকানপাট খোলে, ইস্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েরা বেরোয়। হাসপাতালেও ভিড় হয়। এই হাসপাতালের সামনেই আটকা

পড়তে হয় ট্রাফিক জ্যামে। সামনে আবার একটা ময়লার গাড়ি। রত্না কয়েক দানা এলাচ মুখে দিল।

জেলখানার গেটে পৌঁছতে বেজে গেল সাড়ে দশটা। অবশ্য ইস্কুলে যাওয়ার মতন সময়ের অত কড়াকড়ি নেই। এক মাস ধরে ইস্কুলে যেতে হচ্ছে না রত্নাকে, তার ডিউটি পড়েছে জেলে। ন'বছর ধরে ইস্কুলে একই জিনিস পড়াতে-পড়াতে একঘেয়েমি এসে গিয়েছিল, সেই তুলনায় এখানকার কাজ তার ভালোই লাগছে—অন্যরকম অভিজ্ঞতা।

গেটের কাছে এসে কার্ডটা বার করল রত্না। তাতে তার ছবি লাগানো আছে। প্রথম দিন তাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন সুতপাদি, তিনি হাসতে-হাসতে বলেছিলেন, কার্ডটা সাবধানে রাখিস। দেখিস, ভেতরে যেন কেউ জোর করে কেড়ে না নেয়। তাহলে কিন্তু তুই আর বেরোতেই পারবি না। এই গেটে আটকে দেবে।

কেউ অবশ্য কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করেনি এর মধ্যে। তবে, দু-তিনজনের চোখের দৃষ্টি দেখলে ভয়-ভয় করে।

জেলখানা। প্রথম দিন ঢুকে সত্যিই খুব অবাক হয়েছিল রত্না। জেলখানার ভেতরটা কেমন হয় তার স্পষ্ট ধারণা ছিল না, গল্প-উপন্যাস পড়ে মনে হত, অন্ধকার-অন্ধকার ঘর, লোভী আর হিংস্র চেহারার পাহারাদার, লোহার দরজা, ডান্ডাবেড়ি, আর মানুষ হয়েও অনেকের অমানবিক ব্যবহার। আগেকার দিনের রাজবন্দিদের লেখা কয়েকটা বই পড়েছে রত্না, অল্প বয়সে, ভালো মনে নেই। বেশি মনে আছে, সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' আর জয়া মিত্রের 'হন্যমান'। জাগরীতে একটা অধ্যায়ের নাম 'আওরৎ কিতা ঃ মা', আর জয়া মিত্রের বইতেও জেলের মধ্যে মেয়েদের কথাই প্রধান। সতীনাথ ভাদুড়ীর একটা গ্রন্থাবলি আছে বাড়িতে, এখানে আসবার পর রত্না একবার ভেবেছিল 'জাগরী'টা আর একবার পড়ে ঝালিয়ে নেবে। ওরে বাবা, কী সাংঘাতিক বই, খানিকটা পড়তে-পড়তেই চোখের জলে পাতাগুলো ঝাপসা হয়ে আসে। বিলুর ফাঁসি হবে, সেই রাতে তার মা-ও জেলে, তিনি নানাভাবে মনটাকে ফেরাবার চেষ্টা করছেন, এক জায়গায় বলছেন, 'ছেলে তো নয়, একটা শত্রু। ছেলেদের কথা যত ভেবেছি, তার অর্ধেকও যদি ভগবানের কথা ভাবতাম, তাহলে নিশ্চয়ই ভগবানকে পাওয়া যেত।' এই জায়গাটা পড়তে পড়তে রত্না ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল।

প্রথম দিন এসে জেলখানা সম্পর্কে তার পুরোনো ধারণা কিছুই মিলল না। এ যেন একটা বাগানবাড়ি। সত্যিই বেশ বড় বাগান, কত ফুল ফুটে আছে, বড়-বড় গাছও কয়েকটা, মাঝখানের বাড়িটার রং সাদা। শুধু চারদিকটা উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা।

অবশ্য আজকাল আর জেলখানা বলে না, নতুন নাম হয়েছে সংশোধনাগার, আর এটা শুধু মেয়েদের জন্য। এখানে একজনও পুরুষ নেই।

বাগানের মধ্যে একটা খড়ের চালাঘর। তার ভেতরে তিনখানা সিমেন্টের তৈরি বেঞ্চ, একটা প্লাস্টিকের চেয়ারও আছে। আজ অবশ্য শীত পড়েছে একটু-একটু, রোদ বেশ মোলায়েম, বাইরেও বসা যায়।

নানা বয়সের নারী, তবে আঠারোর নীচে কেউ নয়, ওপরের সীমা পঁয়তাল্লিশ-পঞ্চাশ। কেউ উৎকট গম্ভীর, কেউ বেশি কথা বলে, কেউ ঝগড়া ছাড়া থাকতে পারে না। অনেকেরই শরীরে রূপ নেই, স্বাস্থ্যও ভালো নয়।

রত্না ধীর পায়ে বাগানের মধ্যে দিয়ে হেঁটে এসে চালাটার মধ্যে চেয়ারে বসল। সে নিজে থেকে কারোকেই ডাকে না। মিনিটপাঁচেক সে বসে রইল চুপ করে। তারপর দুটি তরুণী দৌড়তে-দৌড়তে এসে দাঁড়াল, হাত পাতল তার সামনে।

রত্না কৌটো খুলে কয়েকটা করে এলাচদানা দিল ওদের হাতে।

টপ করে তা মুখে পুরেই ওদের একজন জিগ্যেস করল, দিদি, আপনি পান খান না?

এই প্রশ্নটা তাকে এখানকার অনেকেই করে, প্রথম দিন থেকে। অর্থাৎ ওদের পান খাবার

নেশা। রত্নার পান খাওয়ার অভ্যেস থাকলে নিশ্চয়ই সে পানের ডিবে রাখত, ওরা চেয়ে নিত। কিন্তু রত্না কখনও পান খায়নি, এমনকী বিয়েবাড়িতেও সে পান নেয় না। পানের পিক ফেলার দৃশ্যটা তার অশ্লীল মনে হয়।

অনেকদিন থেকেই এলাচদানা খায় রত্না। আগে তার কাছে একটা ছোট্ট রূপোর কৌটো থাকত, এখন এখানকার অনেককে দিতে হয় বলে, সে একটা বড় টিনের কৌটো রাখে। এলাচের দামও বেশ।

রত্না লক্ষ করেছে, এরা অনেকেই বাইরে থেকে কিছু-কিছু জিনিস আনায়। কী উপায়ে, তা সে জানে না। কেউ-কেউ শুধু দোক্তা খায়, কয়েকজনকে সে বিড়ি টানতেও দেখেছে। এক মাঝবয়েসি, স্থূলাঙ্গিনী একদিন তাকে ফিসফিস করে বলেছিল, দিদি, আমার জন্য ইসবগুলের ভুসি এনে দেবে? আমি তোমায় পয়সা দেব। রত্না রাজি হয়নি। যত তুচ্ছ জিনিসই হোক, বাইরে থেকে এদের জন্য কিছু এনে দেওয়ার নিষেধ আছে। এখানকার সুপার সুতপাদি বলেছিলেন, তুই এরা কে, কোন কারণে জেল খাটছে, তা কখনও জিগ্যেস করবি না। এদের জীবনকাহিনি জানতে চাইবি না। তাহলে এক-একজন সম্পর্কে মনের মধ্যে একটা ধারণা গেঁথে যাবে। বরং খোলা মন নিয়ে সবাইকে সমান মনে করাই উচিত।

রত্না কখনও কাউকে কিছু জিগ্যেস করেনি। তবু কী করে যেন জেনে গেছে, এখানে তিনজন খুনের আসামি। নিজের হাতে খুন করেছে, যাবজ্জীবন বন্দিনী। তাদের মধ্যে একজন রত্নার ছাত্রী।

জেল কর্তৃপক্ষ ঠিক করেছিলেন, এখানকার মেয়েদের নানারকম হাতের কাজ শেখাবার সঙ্গে-সঙ্গে লেখাপড়া শেখাবারও চেষ্টা হবে। যাতে কারাবাস থেকে মুক্ত হওয়ার পর, তারা সুস্থ জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কিন্তু লেখাপড়া তো জোর করে শেখানো যায় না। বেশিরভাগই সমাজের গরিব, নীচু শ্রেণির নারী। জীবনে বই কখনও ছুঁয়েও দেখেনি। বেশি বয়সে তারা একেবারে প্রথম থেকে শেখার আগ্রহ পায় না।

তবু নিয়মমাফিক দুজন শিক্ষয়িত্রী আসে। তারা কয়েকজনকে এ-বি-সি-ডি, অ-আ-ক-খ শেখাতে চেষ্টা করে। রত্না অবশ্য বলে দিয়েছিল, সে অত প্রাথমিক স্তরে পড়াতে রাজি নয়। রত্নার ডাক পড়েছিল অন্য কারণে।

সুতপাদি একদিন জানতে পেরেছিলেন, খুনের আসামি বাসন্তী নামে একটি মেয়ে ঝগড়ার সময় ইংরেজিতে গালাগালি দেয়। সোয়াইন, ব্লাডি, বাস্টার্ড, বিচ, এইসব গালাগাল তার মুখ দিয়ে অনর্গল বেরিয়ে আসে। তার কেস হিস্ট্রিতে দেখা গেছে, সে একটি ধনী পরিবারে আয়ার কাজ করত। সেই বাড়িতে তাদের মুখ থেকে শুনে-শুনে সে ওইসব গালাগাল মুখস্থ করেছে। সুতপাদি তার সঙ্গে কথা বলে বুঝলেন, সে ইংরেজি-বাংলা পড়তেও পারে, আলেকজান্ডার এবং সম্রাট অশোকের নাম জানে, অর্থাৎ প্রায় ক্লাস এইট-নাইনের বিদ্যে। সুতপাদি একে জিগ্যেস করেছিলেন, তুই আরও পড়তে চাস? সে ঘাড় নেড়েছিল। বছরখানেক পড়ালে এ মেয়ে মাধ্যমিকও পাশ করতে পারে। তেমন যদি হয়, তাহলে এই সংশোধনাগারেরও বেশ নাম হবে, ছবি উঠবে কাগজে। তাই সরকারি স্কুলে আবেদন করে রত্না হালদারকে তিনি আনিয়েছেন এখানে। বাসন্তীকে পড়াতে গিয়ে রত্না দেখেছে, এ মেয়েটির মেধা আছে, যা পড়ে, তা বেশ মনে রাখতে পারে। চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়স, মুখখানা সুন্দর নয়, কিন্তু শরীর বেশ আঁট, বুকের গড়ন যেন বেশি-বেশি। মাঝে-মাঝে সে বেশ সরলভাবে হেসেও ওঠে। এ মেয়ে কেন দু-দুটো খুন করেছে, তা জানার জন্য রত্নার মনটা আকুলি-বিকুলি করলেও প্রশ্ন করার উপায় নেই। নিজে থেকে যদি সে কখনও কিছু বলে।

বাসন্তী বইখাতা নিয়ে এসে বসল তার সামনে।

ওকে পড়াতে-পড়াতে রত্নার মনে হল, পরীক্ষায় পাশ করলেও সে-বিদ্যে নিয়ে ও কী করবে? ও কি কোনওদিনও ছাড়া পাবে? যাবজ্জীবন মানে চোদ্দো বছর, এই কেসে অনেকের ধারণা, গুড

কনডাক্টের রিপোর্ট থাকলে বারো বছর পরেই খালাস হয়ে যেতে পারে। কিন্তু সে ব্যবস্থা তো আর নেই। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ আছে, যাবজ্জীবন মানে সারা জীবনই পচতে হবে জেলে। অন্তত কুড়ি-বাইশ বছরের আগে রিভিউয়ের প্রশ্ন নেই। সংশোধনাগার নাম হোক আর যাই-ই হোক, আসলে তো কারাগার।

আর একটি মেয়ে, সে রত্নার কাছে পড়তে আসে না, কিন্তু এই সময়টায় সে একটা খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসে থাকে। সে কোনও কথা বলে না, কোনও প্রশ্ন করলেও উত্তর দেয় না। বৃষ্টির সময় বাসন্তী তাকে বলেছিল, এই মেদ্দা, বসে-বসে ভিজছিস কেন, ভেতরে উঠে যা!

তা শুনেও মেয়েটি উঠে আসেনি, একই জায়গায় বসে-বসে ভিজেছে।

রত্না জিগ্যেস করেছিল, ওর নাম কী বললে মেদ্দা? এ আবার কীরকম নাম? মানে কী?

ঠোঁট উলটে বাসন্তী বলেছিল, কী জানি। সবাই তো ওই নামেই ডাকে। ও আমারও আগে থেকে আছে।

নাম শুনে বোঝাও যায় না, বাঙালি কি না। কথাও বলে না। তবু ও একদিন চমকে দিয়েছিল।

সেদিন বাসন্তী ছাড়াও অন্য চারটি মেয়ে ছিল এখানে। এরকম মাঝে মাঝে অন্যরাও আসে। পড়াশুনোর জন্য নয়, রত্নার কথা শোনে বড়-বড় চোখ মেলে। সেইসব দিনে রত্না বই খুলে পড়ায় না, নানারকম গল্প করে।

একটি মেয়ের নাম সবিতা। তাকে রত্না জিগ্যেস করেছিল, তুমি তোমার নামের মানে জানো?

সবিতা দু-দিকে মাথা নাড়ে কৌতূহল ও বিস্ময় মিশিয়ে। যেন এই প্রশ্নটা আগে কেউ তাকে জিগ্যেস করেনি। রত্নাও কম অবাক হয় না। নিজের একটা নাম, সারাজীবন বয়ে বেড়াবে, অথচ তার মানে জানবে না?

সে জিগ্যেস করে অন্য মেয়েদের নাম। লতা, রুবাত আর প্রমদা। এর মধ্যে একমাত্র লতাই তার নামের অর্থ বোঝে, লতা-পাতা। সে অবশ্য হেসে বলল, রাত্তিরবেলা সাপকেও লতা বলে, সেই ভেবেই বোধহয় বাপ-মা তার ওই নাম রেখেছিল।

রুবাত শুনে রত্নার খটকা লেগেছিল। এ আবার কী ধরনের নাম! মেয়েটির নাকে একটা নাকছাবি, মুখে এমন একটা ভাব আছে, যাতে মুসলমান বলে মনে হয়। কী ভাবের জন্য এমন মনে হয়, তা বলা শক্ত। তার নাম আরও কয়েকবার জিগ্যেস করে রত্না বুঝল, তার অনুমানই ঠিক। মেয়েটির নাম রুবাইয়াত। ঠিক উচ্চারণ করতেও পারে না।

সে বলেছিল, তোমার নামের মানেটা খুব সুন্দর। রুবাই হচ্ছে চার লাইনের এক ধরনের কবিতা। কবিতা জানো তো—পদ্য, কিংবা ছড়ার মতন। তার থেকে রুবাইয়াত। ওমর খৈয়াম নামে একজন বড় কবি রুবাইয়াত লিখেছেন, সে গল্প অন্য একদিন বলব। আর প্রমদা হচ্ছে সুন্দরী মেয়ে। হ্যাঁ, প্রমদা, তুমিও তো সুন্দর। আর সবিতা, তুমি হচ্ছ আকাশের সূর্য। সূর্যের অনেক নাম আছে। যেমন, আদিত্য, অরুণ, ভাস্কর, রবি—এ সবই কিন্তু ছেলেদের নাম হয়। রবি নামটা নিশ্চয়ই শুনেছ, অনেকেরই নাম রবি হয়। বাসন্তী, তুমি তো রবি বানান জানো। র আর ব-এ হ্রস্বই। কিন্তু যদি রবীন্দ্র হয়, তাহলে কিন্তু ব-এ দীর্ঘই হয়ে যাবে। বদলে যাবে।

সবিতা জিগ্যেস করল, কেন বদলে যাবে?

এ প্রশ্ন শুনে খুশি হয়ে রত্না বলল, এই যে তুমি কেন জিগ্যেস করলে, তার মানে, তোমার পড়াশুনো করার ইচ্ছে আছে। ওটা ব্যাকরণের ব্যাপার, পরে একদিন বোঝাব। তোমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম শুনেছ?

হায়, আমাদের এই বিশ্বকবির নাম গ্রাম-বাংলার অনেক নারীই জানে না। অনেক পুরুষও বোধহয় তাই। এদের মধ্যে একমাত্র বাসন্তী জানে।

রত্না জিগ্যেস করেছিল, বাসন্তী, তুমি রবীন্দ্রনাথের কোনও কবিতা বা গান মুখস্থ বলতে পারো?

বাসন্তী দু-দিকে মাথা নাড়ল।

রত্না বলল, তাঁর কত গান তো শোনা যায়, রেডিওতে, পুজো প্যান্ডেলে, সিনেমায়। তার একটাও মনে নেই?

বাসন্তী বলল, কী জানি।

রত্নার মনে হল, শুনেছে নিশ্চয়ই। কিন্তু কোনটা রবীন্দ্রসঙ্গীত তা সে জানে না।

এই সময় সেই কাণ্ডটা হল, রত্না সচকিতে মুখ ফেরাল।

খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে থাকা মেদ্দা একটাও কথা না বললেও, সে নিশ্চয়ই এদের সব কথা কান খাড়া করে শোনে। সে এখন গুনগুন করে গাইছে, অশ্রু নদীর সুদূর পারে, ঘাট দেখা দেয়, তোমার দ্বারে...

সুর নির্ভুল তো বটেই, উচ্চারণও স্পষ্ট। শিক্ষার ছাপ আছে।

একটুখানি মুগ্ধভাবে শুনে রত্না উচ্ছ্বসিতভাবে বলে উঠল, তুমি এত ভালো গান জানো? কোথায় শিখেছ?

সঙ্গে-সঙ্গে মেদ্দা থেমে গেল তো বটেই, উঠে গেল সেখান থেকে।

ওই একদিনই, আর কখনও সে কথাও বলেনি, গানও গায়নি। রত্না তার সঙ্গে ভাব জমাতে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে।

যার সম্পর্কে কিছু জানা যায় না, তার সম্পর্কেই কৌতূহল থাকে বেশি। সে এমন পরিশীলিত গলায় গান গাইতে পারে, তাও রবীন্দ্রসঙ্গীত, সে কেন নির্বাক? আর মেদ্দার মতন একটা বিচ্ছিরি নামই বা তার হবে কেন?

বাসন্তীকে পড়াতে হলেও তাকে ঠিক পছন্দ করতে পারে না রত্না। প্রথম-প্রথম তাকে সরল, সাধারণ মনে হলে, ক্রমশ বোঝা যায়, সে বেশ লোভী। রত্না নতুন শাড়ি পরে এলেই সে হাত বুলিয়ে-বুলিয়ে দেখে। চোখে-মুখে ফুটে ওঠে ভিক্ষের ভাব। ইচ্ছে করলে রত্না ওকে একটা শাড়ি তো দিতেই পারে, কিন্তু কিছু দেওয়া যে নিষেধ। ওরা কেউ শাড়ি পরে না, একটা ঝোলা সেমিজের মতন পোশাক সবার। শাড়ি থাকলে গলায় ফাঁস বেঁধে কেউ যদি আত্মহত্যা করে?

একদিন রত্না এক জোড়া দুল কানে দিয়ে এসেছিল। বাসন্তী হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে কানে হাত দিয়ে দুলটা দেখতে লাগল। শিউরে উঠেছিল রত্না, এটা একটা খুনির হাত তো বটে।

একদিন বাসন্তী নিজের থেকেই বলল যে, এখান থেকে ছাড়া পেলে এসে আর লোকের বাড়িতে কাজ করবে না। কোনও ইস্কুলে চাকরি নেবে।

শুনে খুবই অস্বস্তি বোধ করেছিল রত্না। খুনি হিসেবে যার শাস্তি হয়েছে, তাকে কি কোনও স্কুল চাকরি দেবে? মনে হয় না। তা ছাড়া, ওর মেয়াদ শুরু হয়েছে মাত্র তিন বছর আগে। যদি কখনও ছাড়াও পায়, তাও পনেরো-কুড়ি বছরের আগে নয়। তখন ওর বয়েস কত হবে?

এসব কথা বলে ওকে নিরাশ করতে চায়নি রত্না।

যারা পড়াশোনা করতে চায় না, তারাও রত্নার কাছে এসে এলাচদানা চায়। সবাইকে নিয়মিত খাওয়াতে গেলে সে দু-দিনেই ফতুর হয়ে যাবে। সেইজন্য সে একটা শর্ত আরোপ করার কথা ভেবেছিল একবার। যে-যে পড়তে চাইবে, শুধু তাদেরই দেবে। তার পরই মনে হয়েছিল, জোর করে পড়িয়েই বা কী হবে? না পড়াশুনো করলেই বা কী আসে যায়! সামান্য কয়েকটা এলাচদানা, প্রত্যাখান করা যায় না। তাই এখন, যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ দেয়, ফুরিয়ে গেলে কৌটোটা উলটে দেখায়। সে এখন ছোট এলাচের বদলে বড় এলাচ কেনে, একটু সস্তা হয়।

মেদ্দা নামের মেয়েটি কোনওদিন এলাচ চায়নি। রত্না তাকে নিজে থেকে একদিন দিতে গিয়েছিল, সে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

ফেরার জন্য রত্না উঠে দাঁড়ায়। বাগানের চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে মেয়েরা। সারা দুপুর তারা

এখানেই থাকে। কয়েকজন দল বেঁধে কী সব খেলে, কয়েকজন নিজেদের মধ্যে কথা কাটাকাটি করে। দুজন মহিলা ওয়ার্ডেন বেঁটে লাঠি হাতে পাহারা দেয়, কোথাও যদি কথা কাটাকাটি এক সময় হাতাহাতিতে গড়িয়ে যায়, তখন ওয়ার্ডেনরা এসে তাদের মারে। বেশ নিষ্ঠুরের মতনই জোরে-জোরে পেটায়।

রত্না মনে হয় এই যে এতজন মেয়ে, এদের দেখলে বোঝাই যায় না, এরা সবাই জেল খাটার মতন অপরাধ করেছে। বাইরের সাধারণ মেয়েদেরই তো মতন। অবশ্য বাইরের সেইসব সাধারণ মেয়েদের মধ্যেও কি অপরাধী নেই? সবাই ধরা পড়ে না। রত্না নিজেও তো এখানে থাকতে পারত।

সব এলাচদানা ফুরিয়ে যাওয়ার পরেও যে মেয়েটি এসে চাইল, রত্না বলল, কাল এসে প্রথম তোমাকেই দেব।

মেয়েটি হঠাৎ চোখ ছলছলিয়ে বলল, দিদি, আমি কিন্তু মুনশিবাড়ির গয়না চুরি করিনি। চুরি করল পারুল, আর ধরল আমাকে। আমাকে মিথ্যেমিথ্যি আটকে রেখেছে। আপনি একটু বলে দিন না। বাড়িতে আমার দুটো ছেলে...

রত্না দুর্বলভাবে বলল, আমি বললে শুনবে কেন?

মেয়েটি বলল, হ্যাঁ দিদি, আপনারা লেখাপড়া জানেন, আপনার কথা শুনবে!

এই মেয়েটির বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে কোনও জ্ঞানই নেই। হয়তো ওর কোনও উকিলও ছিল না।

তার হাত ছাড়িয়ে চলে আসতে-আসতে রত্না ভাবে, মেয়েটি কি সত্যি কথা বলছে, না অভিনয়? বিনা দোষেও অনেকে নিশ্চয়ই জেল খাটে। মুখ দেখলেই বোঝা যায়, এখানকার অধিকাংশ মেয়েই গরিবঘরের। গরিবরাই আইনের সুবিচার থেকে বঞ্চিত হয় অনেক সময়। যাদের পয়সা আছে, তারা আইনের লম্বা হাত দুমড়ে মুচড়ে দিতে পারে পয়সার জোরে।

সুতপাদির সঙ্গে দেখা হল এক বিয়েবাড়িতে। তাঁর সঙ্গে অনেক আগে থেকেই পরিচয় ছিল রত্নার। তাপসের সঙ্গে যখন ছাড়াছাড়ি হয়, তখন সাংঘাতিক মানসিক বিপর্যয়ের মধ্যে এই সুতপাদিই অনেকখানি শুশ্রূষা করেছেন তার মনের। তাপস ওঁর পিসতুতো ভাই, তবু তিনি বলেছিলেন, তুই ওকে বিয়ে করতে রাজি হওয়ার আগে আমাকে জানাসনি। ও তো একটা স্কাউন্ড্রেল। চেহারাটা চকচকে, বাইরে থেকে কিছু বোঝা যায় না। ও তো ওর মায়ের গায়েও হাত তোলে, তোকে মারধর করবে, এ আর আশ্চর্য কী!

বিয়েবাড়িতে সুতপাদির সঙ্গেই তার বেশি গল্প হয়। কেমন সে পড়াচ্ছে, বাসন্তী পাশ করতে পারবে কি না, জেলের মেয়েদের সম্পর্কে তার ধারণা কী, এইসব প্রশ্ন করেন খুটিয়ে-খুঁটিয়ে। নিছক চাকরি নয়, নিজের কাজটা ভালোবাসেন সুতপাদি।

এক সময় রত্না জিগ্যেস করে ফেলল, ওই মেদ্দা নামের মেয়েটাকে একেবারে বুঝতে পারি না। কথা বলে না কারও সঙ্গে। অথচ ভালো গান গায়। ওর আসল নামটা কী?

সুতপাদি হেসে বললেন, যে-কোনও কথা বলে না, সে তো রহস্যময়ী হবেই। খুব একটা রহস্য নেই। সাধারণ ঘটনা। রাগের মাথায় একজনকে খুন করে ফেলেছে। একটা ব্যাপার তো আমি দেখছি, এই যে এতগুলো মেয়ে প্রিজনার, এদের প্রায় প্রত্যেকেরই ক্রাইমের সঙ্গে কোনও-না-কোনও পুরুষ জড়িত। পুরুষরাই তাদের অপরাধের পথে ঠেলে দেয়। যেমন ধরো, নারী পাচারের কেস আছে কয়েকটা, মেয়েরাই বোকাসোকা মেয়েদের ফুসলিয়ে এনে দেহব্যবসায় চালান দেয়। কেউ-কেউ ধরা পড়ে, শাস্তি হয়। মেয়েটা দোষী, কিন্তু ফ্লেশ ট্রেড তো চালাচ্ছে পুরুষরা। আসল ক্রিমিনাল তো তারাই। তারা ধরা পড়ে না।

রত্না চমকে গিয়ে বলল, এই মেদ্দাও সেইরকম কোনও কেসে ধরা পড়েছে নাকি?

সুতপা বলল, না। বললাম না, ওর খুনের কেস। ওর নাম মাধবী। কেন ওকে অন্যরা মিদ্দা না মেদ্দা বলে তা আমি জানি না। ও ছিল তোরই মতন স্কুল টিচার। মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। অনেক ক্ষেত্রেই যা হয়, একজনের প্রেমে পড়ল, সে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তার মধ্যে রেগুলার সেক্স রিলেশানও হল। এর মধ্যে একটা মন্দিরের সামনে গিয়ে বিয়ের ভানও করেছিল। তারপর মাধবী প্রেগন্যান্ট হতেই সে হারামজাদা নিজের মূর্তি ধরল। অ্যাবোরশান না করালে সে মাধবীকে ঘরে নিতে পারবে না। বিয়েই যদি হয়, তাহলে অ্যাবোরশানের প্রশ্ন উঠবে কেন? এই নিয়ে গালমন্দ, মারধর। মাধবী তখন গেল তার শাশুড়ির কাছে, সুবিচার চাইতে। সেই দিনই ঘটল ঘটনাটা। সেই মহিলা শুধু যে পুত্রস্নেহে অন্ধ তাই-ই নয়, তিনি এই সম্পর্কের কথা কিছুই জানতেন না। অন্য মেয়ের সঙ্গে তাঁর ছেলের বিয়ে ঠিক করে রেখেছিলেন। তিনি কুকুর-বেড়ালের মতন দূর-দূর করে তাড়াতে চাইলেন মাধবীকে। খুব খারাপ ভাষায় গালাগালি দিতে-দিতে ওকে বলেছিলেন, বাজারের বেশ্যা। সেটাই সহ্য করতে পারেনি মাধবী। ওর সেই স্বামীটা, তোর তাপসের মতনই হারামজাদা, তখন বাড়িতেই লুকিয়েছিল। গালাগাল শুনে মাধবী ওর শাশুড়িকে এসে একটা ধাক্কা দেয় খুব জোরে। মহিলাটা ধড়াস করে পড়ে গেলেন, সঙ্গে-সঙ্গে অক্কা। ডেড। কোনও চিকিৎসাও করা যায়নি।

রত্না বলল, এটা কি মার্ডার? খুনের কোনও ইনটেনশান ছিল না।

সুতপাদি বললেন, ম্যান শ্লটার বলা যায়। কিন্তু ওদের পক্ষের উকিল ভয়ংকরভাবে কেসটা সাজিয়েছিল। একটা হাতুড়ি, মার্ডার ওয়েপন হিসেবে দেখিয়েছিল, জজ লাইফ ইমপ্রিজনমেন্ট দিয়ে দিলেন। অবশ্য একটা আপিলের মামলা এখনও ঝুলে আছে। এর মধ্যে ওর পেটের বাচ্চাটাও নষ্ট হয়ে গেছে। এখানেও তুই দ্যাখ, সব নষ্টের মূলে ওই হারামজাদাটা, কিন্তু তার কোনও শাস্তি হল না। আইনের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে গেল।

সুতপাদি মাধবীর পাষণ্ড স্বামীটার সঙ্গে তাপসের তুলনা করায় রত্না কেঁপে উঠেছিল। হ্যাঁ, তুলনা করা যায় তো বটেই। কিন্তু রত্নার মনে পড়েছিল অন্য কথা। তাপস যেদিন তাকে প্রথম লাথি মারে, সেদিন অপমানে, দুঃখে সে শুধু কেঁদেছিল। মাঝে-মাঝেই এরকম চলার পর, তাপস আরও নৃশংস হয়ে উঠল, একদিন তার উরুতে সিগারেটের ছ্যাকা দিয়েছিল। সেদিন কি রত্না ভাবেনি সে তাপসকে খুন করবে? পরপর কয়েকদিন সে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য খুনের পরিকল্পনা করেছিল। বিষ খাওয়াবে না ঘুমের মধ্যে ওর গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেবে। কাগজে সেই সময় একটা খবর বেরিয়েছিল, বিদেশে একটি মেয়ে তার স্বামীর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে তার পুরুষাঙ্গটা কেটে নিয়েছিল।

শেষপর্যন্ত রত্না কিছুই পারেনি। তার সাহসে কুলোয়নি। এক বস্ত্রে পালিয়ে এসেছিল। খুনের ইচ্ছেটাও কি অপরাধ নয়? সত্যি-সত্যি খুন করলে রত্নারও স্থান হত ওই জেলে। তার উরুতে এখনও সেই পোড়া দাগটা আছে।

দিনদুয়েক পরে জেলের বাগানে গিয়ে রত্না একটা অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখল। সেই চালাঘরটার মাঝখানে দাঁড়িয়ে গান গাইছে মেদ্দা অর্থাৎ মাধবী, তাকে ঘিরে আছে কুড়ি-পঁচিশটি মেয়ে। কয়েকজন তাল দিচ্ছে গানের সঙ্গে।

মাধবী গাইছে, মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে, তাতা থইথই, তাতা থইথই, তাতা থইথই...।

রত্না কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই অনেকে মিলে কলস্বরে জানাল, মেদ্দা খালাস হয়ে গেছে।

আপিলে বেকসুর মুক্তি পেয়েছে মাধবী। হাইকোর্টে খারিজ হয়ে গেছে অভিযোগ। হাতুড়িতে শুকনো রক্তের দাগ মানুষের নয়, মুরগির। ওর শাশুড়ির গুরুতর হৃদরোগ ছিল। আগে দুবার অ্যাটাক হয়ে গেছে। মাধবী যে তাকে ধাক্কা দিয়েছে কিংবা কতটা জোরে, তার কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই, ঠিক সেই সময় অন্য কেউ সেখানে উপস্থিত ছিল না। বাড়ির দাসীটি স্বীকার করেছে, সে ছিল কলতলায়, শব্দ শুনে ছুটে আসে। অত্যধিক উত্তেজনায় ওরকম রোগীর হঠাৎ

হার্ট ফেলিওর হতে পারে।

রত্না ভেবেছিল, মাধবীর যে মুহ্যমান অবস্থা এবং কারও সঙ্গে কথা না বলা, তা বোধহয় গভীর অনুতাপের জন্য। মধ্যবিত্ত ঘরের শিক্ষিত মেয়ে, খুন-টুনের মতন ব্যাপারে নাম জড়িত হওয়াটা তো চরম অপমানই। কিন্তু তা তো নয়। মুক্তির খবর শুনেই সে এত খুশি। গান শেষ করে সে এক-একজন মেয়েকে জড়িয়ে ধরে বিদায় জানাচ্ছে। এতদিন সে কথা বলত না, তবু সে সকলেরই নাম জানে, নাম ধরে ডাকছে।

এবার সে রত্নার দিকে ফিরতেই রত্না বলল, আমিও খুব খুশি হয়েছি।

রত্না এলাচের কৌটোটা খুলে বাড়িয়ে দিল তার দিকে।

বেশ কয়েকটা এলাচদানা তুলে নিয়ে মুখে দিল মাধবী। একটু চিবিয়ে নিয়ে বলল, বাঃ, কী সুন্দর স্বাদ হয়ে গেল মুখে। আগে খাইনি কেন?

রত্না বলল, আমি তো আগেও তোমায় দিতে চেয়েছিলাম। তুমি নাওনি।

আরও দুবার বাঃ-বাঃ করে মাধবী বলল, ঠিক আছে। ফিরে এসে আবার খাব। আমি তো শিগগিরই ফিরে আসছি এখানে।

রত্না চকিতভাবে বলল, কেন, ফিরে আসবে...কেন? তোমার তো পুরোপুরি...ওরা কি সুপ্রিম কোর্টে যাবে?



গরম ভাত অথবা নিছক ভূতের গল্প

ওরা আসে নিশুতি রাতে। প্রতি অমাবস্যায়।

তখন ঘুটঘুটে অন্ধকার চারদিক শুনশান অদৃশ্য। মনে হয় এখানে কেউ বেঁচে নেই, কোনও বাড়ি-ঘর নেই। বাতাসে গাছের ডগাগুলো কাঁপে, বাঁশবনে একটা বাঁশের সঙ্গে আর একটা বাঁশের ঘষা লেগে শব্দ হয় কর-র-র কর কর-র-র কর। লিচুগাছে ঝাঁক বেঁধে এসে বসে বাদুড়, দু-একটা প্যাঁচা খ্যারখেরে গলায় ডাকে, পাঁচলা মোড়ার বড় অশথগাছটায় একটা তক্ষক ঠিক সাতবার তক্‌খো করে। ওই তক্ষকটা নাকি সাড়ে তিনশো বছর ধরে বেঁচে আছে।

সেই সময় ওরা আসে। ঝুমঝুম-ঝুমঝুম শব্দের সঙ্গে লণ্ঠনের আলোয় কাঁপতে থাকে কয়েকটা ছায়া।

তখন শোনা যায় খকর খক করে কোনও পুরোনো রুগির কাশির শব্দ, দু-একটা শিশু তেড়ে কেঁদে ওঠে। তখন বোঝা যায়, এই অন্ধকার-ঢাকা নিস্তব্ধ ভুমিতে মানুষের জীবন বহমান।

দু-একটা জানলা খুলে যায়। দাওয়ায় এসে দাঁড়ায় কয়েকটি ছায়ামূর্তি। আলো ও ঝুমঝুম শব্দ কাছে এগিয়ে আসে। তারা পাঁচলা মোড়ের অশথতলায় থামে।

মোট এগারোজন উঠতি বয়েসের ছেলে। তাদের সঙ্গে দুটি লণ্ঠন। দুজনের হাতে দুটি বর্শা, চারজনের পায়ে ঘুঙুর বাঁধা। লণ্ঠন দুটো মাটিতে রেখে তারা প্রথমে শীত কাটাবার জন্য হাতে হাত ঘষে, শরীরের যেখানে-সেখানে ধপাধপ করে চাপড়ে মশা-মারে। তারপর তারা সকলে মিলে বিকট মোটা গলায় একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে।

হে রে রে রে রে রে রে

জাগো রে, গ্রামবাসিগণ জাগো রে।

পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ এই চারদিকে ফিরে-ফিরে তারা চারবার হুঙ্কার দেয় এরকম। তারপর অন্যরা, গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়ালে তার মধ্যিখানে এসে ঘুঙুর-পরা চারজন পা ঝুমঝুমোয়। সবাই তালে-তালে হাততালি দেয়। হঠাৎ শুরু হয়ে যায় গান।

ভূত কিনিতে এয়েছি ভাই ভূত কিনিতে এয়েছি
ভূতের তেলে ওষুধ হবে স্বপ্ন আদেশ পেয়েছি।
বিপিন খুড়োর নতুন কলে
তুলসিপাতা গঙ্গাজলে
ভূতের কেঠো হাড়ের গুঁড়ো মিশায়ে রস খেয়েছি
ভূত কিনিতে এয়েছি ভাই ভূত কিনিতে এয়েছি।

তাদের সেই তারস্বরে গান ও ঘুঙুরের শব্দে অশথগাছের কয়েকটি কাক হঠাৎ ঘুম ভেঙে কা-কা-কা করে ওঠে। দু-তিনটে শেয়াল ছুটে পালায়। কাছেই কোনও বাড়ির দাওয়ায় তামাক টানার মটমট শব্দ শোনা যায়।

ওরা আবার গায় ঃ

ভূতের নাতি ভূতের পুতি বুড়ো হাবড়া ছোঁড়াছুঁড়ি
যেমন-তেমন ভূত পেলে ভাই হবে না আর ছাড়াছাড়ি।
মামদো ভূত বা ব্রহ্মদৈত্যি
দেখাও যদি তিন সত্যি
দশটি করে টাকা পাবে হাতে-হাতে দোকানদারি
সেই টাকায় খাও মণ্ডা মিঠাই করে সবে কাড়াকাড়ি।
ভূত জিনিতে, ও ভাই ভূত জিনিতে
ভূত কিনিতে, ও ভাই কিনিতে
ভূত জিনিতে এয়েছি ভাই ভূত কিনিতে এয়েছি
ভূতের তেলে ওষুধ হবে স্বপ্ন আদেশ পেয়েছি।
দশ টাকা! দশ টাকা! দশ টাকা!
এক-এক ভূত দশ টাকা!
হাতে-হাতে গরমা গরম। দশ টাকা।

গান শেষ করার পরও নাচ থামতে চায় না। বিশেষত বেঁটে নিতাইয়ের। সে নাচতে ভালোবেসে। সুরেন্দ্র তার দিকে একটি বিড়ি এগিয়ে দিয়ে বলে, নে খা। তখন নিতাই থামে। সুরেন্দ্রর বুকখানা লোহার দরজার মতন। মাথায় ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল, হাতে একটা বর্শা। তার চোখে-মুখে বেশ একটা তৃপ্ত ভাব। গানখানি সেই বেঁধেছে, কিন্তু নিজে গাইতে পারে না। অন্যরা যখন গায়, তখন সে হাততালি দেয় চোখ বুজে।

আর-একটি বর্শা বিনোদের হাতে। সে বর্শাটিকে পতাকা-দণ্ডের মতন সামনে ঝুঁকিয়ে ধরে আছে। সেই বর্শার সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা একটি জন্তু। জন্তুটা একবার ছটফট করতেই বিনোদ বলে, আরে শালা, এখনও তেজ যায়নি।

বর্শাটা ঘুরিয়ে সে জন্তুটাকে একবার মাটিতে আছড়ায়। ঝনঝন করে শব্দ ওঠে।

সকলে বিড়ি ধরিয়ে একটু বিশ্রাম নেয়। এর পরের গান হবে মালোপাড়ায় বটগাছের নীচে।

সুরেন্দ্র রাস্তা ধরে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে হাঁক মারে, ও পবন ঠাউদ্দা জেগে আছো নাকি?

যে-বাড়ির দাওয়া থেকে তামাক টানার মটমট শব্দ আসছে, সেখান থেকে উত্তর আসে, আছি রে! আয়, আয় ইদিকে!

পবনের বয়েস চারকুড়ি, না পাঁচকুড়ি তা সে নিজেই জানে না। শরীরটা বেঁকে গেছে। সব ক'খানা হাড় পরিষ্কার গোনা যায়। তার পাঁচ ছেলের মধ্যে তিনজন মারা গেছে, দুটি নাতিও গত হয়েছে কিন্তু পবনের আর যাওয়ার কোনও লক্ষণ নেই।

সবাই এসে ওই দাওয়ায় বসে। লণ্ঠন দুটো নামিয়ে রাখে পাশে। যে-যে নেচেছিল, এই শীতের মধ্যেও তাদের গায়ে চকচক করে ঘাম।

নিতাই জিগ্যেস করে, জলের কলসিটা কোথায়, ঠাকুদ্দা? বাইরে আছে নাকি?

পবনের ছোট ছেলে নিবারণও উঠে এসেছে চোখ মুছতে-মুছতে। সে এক ঘটি জল নিয়ে আসে। নিতাই আলগোছে টাগরা ভিজিয়ে প্রায় অর্ধেকটা জল শেষ করে দেয়। নিবারণের ছেলেমেয়ে দুটো দরজার পাশ থেকে কুতকুত করে চেয়ে দেখে।

পবন একবার হুঁকোটা পাশে নামিয়ে রাখতেই বিনোদ সেটা তুলে নিয়ে টান মারে। তারপরই মুখবিকৃতি করে বলে, এ রাম-রাম। এটা কি ঠাউদ্দা? এ কি তামাক?

পবন ফোকলা দাঁতে ফ্যাক-ফ্যাক করে হাসে। খুব মজা পেয়েছে সে।

নিতাইয়ের পাশে বসা ঘনাই বলল, কেন, কি হয়েছে? দেখি তো?

ঘনাইও হুঁকোতে টান মারে, সঙ্গে-সঙ্গে ওয়াক থুথু করে ওঠে।

পবন হাসতে-হাসতে বলে, তোরা পারবি না! একেলে ছেলে তো। আমার সহ্য হয়।

—এ তো তামাক নয়, এটা কী খাচ্ছ তুমি?

—তামাক পাব কোথায়? তামাকের দাম কত জানিস? আমার ছেলে আমারে তামাক কিনে দেবে? একটা পয়সা ঠেকায় না।

—তবে কল্কেতে তুমি কী ভরেছ?

—অনেক কালের তামাক টানা অভ্যেস, না মলে যাবে না। তামাক পাই না, তাই শুকনো আমপাতা আর একটুখানি গোবর দিয়ে মশলা তৈরি করেছি। আমার তো বেশ লাগে।

—অ্যাঁ! থুঃ! অভক্তি!

তামাকের বদলে দুজনকে গোবর খাইয়ে খুব হাসতে থাকে পবন।

নিবারণ তার বাপের উদ্দেশ্যে বলে, মরণকালে বুদ্ধিশুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে একেবারে।

নিতাই আর ঘনাই কয়েকটা চোখাচোখা গালাগাল দেয়। নিবারণের ছেলেমেয়ে দুটি দরজার পাশ থেকে হি-হি করে হাসে।

পবন অন্যদের মন্তব্য অগ্রাহ্য করে। কিন্তু ছেলের উদ্দেশে বলে, মরার খোঁটা দিচ্ছিস কেন রে? আয়ু যখন ফুরোবে, তখন মরব। তার আগে কথা কী?

নিবারণ বলল, ফের যদি তোমাকে গোবর নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে দেখি—

সুরেন্দ্র মাঝখানে বাধা দিয়ে বলল, আহা থাক। এই নাও ঠাউদ্দা, একটা বিড়ি খাবে নাকি?

পবন বিড়িটা খপ করে তুলে নিয়ে বলল, বেঁচে থাক, বাবা। ধনেপুত্রে লক্ষ্মী লাভ হোক। আর-একটা বিড়ি দিবি? কাল সকালে খাব।

সুরেন্দ্র জিগ্যেস করল, ঠাউদ্দা, ভূত-টুতের সন্ধান পেলে না একটাও? তুমি তো জানতে অনেক?

পবন বলল, জানতাম তো। দেখিছিও কত। নিজের চোখে দেখিছি। বাড়ির কাছে এই পাঁচলা অশথতলায় পেত্নী দাঁড়িয়ে থাকতে দেখিছি। একবার পড়েছিলাম মেছোভূতের পাল্লায়। হিজলমারির বিল থেকে মাছ ধরে নে আসছি। অমনি সেই শালার ভূত আমার পেছু নেছে। দু-কদম যাই আর সে বলে, মাঁছ দেঁ নাঁ—ও পঁবন, মাঁছ দেঁ না—তারপর দেখি একটা না তিনডে ভূত, শেষমেষ আমি মাছ ফেলে-ফালে দে দৌড়—

—তা একটাও ভূত ধরে দিতে পারলে না?

—এখন তো আর দেখি না। তোদের দেখলি বোধহয় ভয় পায়। এই তো পরশুদিন সন্ধেবেলা আমি এই দাওয়ায় বসে-বসে হুঁকো টানছি, দেখি কি গোয়ালঘরের পাশ দিয়ে লাল বেনারসী শাড়ি পরা এক বউ পিদিম হাতে নিয়ে পুকুরঘাটের দিকে যাচ্ছে। পষ্ট দেখলাম। আমি ডাকলাম, ও মা, তুমি কে? কোথায় যাও? তা কোনও সাড়াও দেয় না।

—সে তুমি নিবারণকা'র বউকে দেখেছ।

—হা আমার পোড়া কপাল! আমার ছেলের বউ বেনারসী শাড়ি পাবে কোথায় রে ছোঁড়া! তার একখানাও জ্যান্ত শাড়ি আছে কিনা সন্দেহ। এ দেখলাম এক সোন্দর বউমানুষ, গা-ভরতি গয়না।

—দৌড়ে গিয়ে জাপটে ধরলে না কেন?

—আমার কি পায়ে সে জোর আছে? নেবারণও তখন বাড়িতে ছেলো না—আমি তারে দুবার ডাকতে-না-ডাকতেই চোখের সামনে অদ্‌দিরিশ্যি হয়ে গেল। হ্যাঁরে সুরেন, সত্যিই ভূত ধরলে তুই দশ টাকা দিবি?

—নিশ্চয়ই দেব। পকেটে টাকা নিয়ে ঘুরছি। নগদা-নগদি দাম পাবে।

পবন তার ঘোলাটে চোখ মেলে নিজের ছেলের দিকে তাকায়। লোভী-গলায় ঝামটা দিয়ে বলে, একটু বনবাদাড়ে ঘুরলেও তো পারিস। নগদা-নগদি দশ টাকা এই বাজারে কে দেয়? দশখানা তাগড়াই মানকচুরও দশ টাকা দাম ওঠে-না। হাত খালি, বসেই তো আছিস।

নিবারণ বললে, তুমি চুপ করো। ভূত আবার ধরা যায় নাকি? আমি কোনওদিন ভূত দ্যাখলামই না এখন পর্যন্ত!

পবন বিড়বিড় করে বলল, চোখ থাকলেই দেখা যায়। এ গেরামে মোট সতেরোডা সতেরো রকমের ভূত আছে, আমি নিজের চক্ষে দেখিছি। এক-একটা দশ টাকা, কম কথা?

বিনোদের বর্শারি সঙ্গে বাঁধা প্রাণীটা আবার লড়ে-চড়ে উঠল।

নিবারণ চমকে উঠে বলল, ওটা কি?

বিনোদ বলল, ওটা একটা স্যাজা। ওলাইচণ্ডীতলার সামনে রাস্তার ওপর দিয়ে দৌড়ে পালচ্ছিল, বর্শা দিয়ে গিথে ফেললাম। কড়া জান শালার, এখনও মরেনি।

নিবারণের ছেলেমেয়ে দুটি এবার দরজার কাছে দৌড়ে-দৌড়ে এল শজারুটাকে দেখতে। বড়-বড় কাঁটাগুলো ফুলিয়ে মাটির ওপরে থুবু হয়ে বসে আছে শজারুটা। মেয়েটার পরনে একটা ইজের। ছেলেটি একেবারে ন্যাংটা। নিবারণ ওদের তাড়া দেয়, যা ঘরে যা, যা। মেয়েটির বয়েস তেরো। সে দু-হাত আড়াআড়ি করে রেখেছে বুকের ওপরে। এক পলক শজারুটাকে দেখে নিয়ে সে ভেতরে চলে গেল। ছেলেটা নড়ল না।

নিবারণ জিগ্যেস করল, কী করবি এটাকে নিয়ে?

বিনোদ বলল, কেটে মাংস খাব।

—জ্যান্ত রাখতে পারলে বিককিরি করতে পারতি, ভালো দাম পেতি।

—জ্যান্ত স্যাজা ধরা কি সোজা কথা? কলাগাছের খোল থাকলে হত। তা তখন পাই কোথায়? শালা এখনও নড়া-চড়া করছে কিন্তু বেশিক্ষণ আর বাঁচবে না। পেটটা এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দিয়েছি।

—শালারা আমার ওঠোনের কচুগাছের তলা খুঁড়ে খেয়ে যায়। কখন আসে, টেরও পাই না! এক-একদিন শেষরাতে ঝমঝম শব্দ শুনি, উঠে এসে আর দেখি না।

—ভূত ধরার ঠেঙে স্যাজা ধরা সোজা। তাও পারিস না?

পবন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। শজারুর মাংসের ভারি চমৎকার স্বাদ। লাল-লাল মাংস, কত নরম, আর তেলে ভরা। ইস কতকাল সে মাংসই খায়নি। এখান থেকে বিনোদের বাড়ি প্রায় ক্রোশখানেক দূরে। কাল দুপুরবেলা যদি হেঁটে-হেঁটে যাওয়া যায়, গিয়ে বলবে, অ বিনোদ, একটু

মাংস চাখতে এলাম। তাহালে কি আর দেবে না একটু?

কথায় কথায় বেশ সময় গেল। সুরেন্দ্র উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চল এবার যাওয়া যাক। ঠাউদ্দা, তুমি কাছাকাছি বাড়ির সব লোকেদের ডেকে বলো, ভূত খুঁজে দেখুক, এক-এক ভূত দশ টাকা—ধরতেও হবে না, দেখিয়ে দিলে আমরাই ধরে নেব, কিন্তু একেবারে চোখের সামনে স্পষ্ট দেখিয়ে দিতে হবে।

ভূত কিনে তুই কী করবি রে? সত্যিই ভূতের তেল হয়?

সুরেন্দ্র মুচকি হেসে বলল, দ্যাখোই না কী হয়। কত লোকের কত রোগ সারিয়ে দেব।

—তোর জন্য আমার ভয় হয় রে!—শেষে তুই-ও ভূতের হাতে মারা যাবি। ওনাদের রাগ তো জানিস না, কোনওদিন বাগে পেলে তোর ঘাড়টা মটকে দেবে।

সুরেন্দ্র হা-হা করে হাসে। কিছুদিন আগে হলেও সে সদর্পে অনেক কথা বলত। বুক চাপড়ে জানিয়ে দিত, কোনও ভূতের বাপের সাধ্য নাই তার ধারে-কাছে আসে। কিন্তু এখন আর সে ওসব কিছু বলে না। ফাদার পেরেরা তাকে নিষেধ করে দিয়েছেন। কথায় শুধু কথা বাড়ে।

পবন আবার বলল, তোর বাপকেও ভূতে ঘাড় মটকেছিল। আমি নিজের চোখে দেখেছি, খালপাড়ে পড়েছিল মানুষটা, চোখ দুটো ওলটানো, ভয়ে কালশিটে পড়ে গিয়েছিল মুখে।

সে কতকাল আগেকার কথা। ও কথা শুনলে সুরেন্দ্রর আর দুঃখ হয় না। সে বলল, সেই জন্যেই তো ভূত ধরার ব্যাবসা খুলেছি। বিনোদের মা শাঁকচুন্নী দেখে পা পিছলে পড়ে গিয়েছিল জলে। নেতাইয়ের বাপকে তাড়া করেছিল আলেয়া ভূত। ঘনাইয়ের মামা ভিরমি খেয়েছিল তিনবার। চল-চল, উঠে পড় সবাই।

কিন্তু ওরা উঠতে গিয়ে দেখল, দুটো হারিকেনের মধ্যে একটা নেই।

নিতাই বলল, আরে, আর-একটা হারিকেন কোথায় গেল? এই তো রাখলাম এখানে।

পবন বলল, দুটো তো আনিসনি, একটাই তো ছিল।

বিনোদ জোর দিয়ে বলল, এঃ! দুটো হ্যারকেন এনে রেখেছি আমরা।

—তাহলে যাবে কোথায়? দ্যাখ না, অশথতলায় ফেলে এসেছিস কি না। ভুলও তো হতে পারে।

—মোটেই এত ভুল হয় না। নেতাই একটা হ্যারকেন এনেছে, আর সুখেন একটা।

নিবারণ মিনমিন করে বলল, তা হলে হ্যারকেন যাবে কোথায়? চোখের সামনে থেকে তো ভূতে নিয়ে যায়নি!

সুরেন্দ্র বলল, তোমার ছেলেমেয়ে স্যাজা দেখতে এয়েছিল। ওদেরই কেউ হাতে বাঝিয়ে নিয়ে গেছে।

নিবারণ ঘরের মধ্যটায় উঁকি দিয়ে বলল, কই, ওরা তো নেয়নি, ঘরের মধ্যে অন্ধকার।

নিতাই বলল, ওসব চালাকি কোরো না নিবারণকা। আমরা ঘরের মধ্যে খুঁজে দেখব। এ কি মামদোবাজি?

নিবারণ বলল, ঘরের মধ্যে তোর কাকি শুয়ে আছে, আর তুই ঘরে ঢুকবি? আমাদের চোর ভেবেচিস?

—তাহলে হ্যারকেন গেল কোথায়?

—আমরা হ্যারকেন নিয়ে কী করব রে গুয়োরব্যাটা? এক ফোঁটা ক্রাচিন কেনার মুরোদ আছে আমার? ঘরে একটা পয়সা নেই। দু-দিন চাল কিনিনি।

ছেলেকে সমর্থন করে পবন বলল, পয়সা থাকলে আমি গোবর পুড়িয়ে খাই?

সুরেন্দ্র বলল, তোমার ছেলেমেয়েদের ডাকো নিবারণকা। আমি ওদের জিগ্যেস করব।

গলার আওয়াজ পিতা-উচিত গম্ভীর করে নিবারণ ডাকল, পান্তি, গেনু, ইদিকে একবার

শুনে যা।

মেয়েটি বেরুল না, এল ছেলেটি।

সুরেন্দ্রর আগে নিবারণই জিগ্যেস করল, হ্যারকেন নিয়েছিস? ছেলে দু-দিকে মাথা নেড়ে শুকনো গলায় বলল, আমি নিইনি।

সুরেন্দ্র জিগ্যেস করল, এই গেনু তোর দিদি কোথায়?

গেনু বাড়ির পেছনের অন্ধকারের দিকে হাত দেখিয়ে উত্তর দিল, ওই সেথায় গেছে।

—কেন, ওইদিকে গেছে কেন?

—মা-র সঙ্গে গেছে।

নিতাই ঠাট্টার সুরে বলল, নিবারণকা, তোমার বউ-মেয়েতে মিলে ভূত খুঁজতে গেছে নাকি?

পবন ধমক দিয়ে বলল, অমন অনাছিষ্টি কথা কবিনে নেতাই। পোয়াতী বউ রাতবিরেতে যাবে ভূতের সন্ধানে? আটকুড়ি পেত্নীর নজর লাগলে পেটের ছেলে পেটেই মরে থাকবে। বাহ্যিখানার ওধারে আমি কতদিন পেত্নী দেখিছি!

নিতাই ঝংকার দিয়ে বলল, তাহলে তোমার পুতের বউ রাতবিরেতে ওদিকে যায় কেন?

নিবারণ বলল, তোর কাকির উদুরী অসুখ আছে।

—তা আমাদের হ্যারকেন নিয়ে গেছে, বলে গেলেই পারত।

—কে তোদের হ্যারকেন নেছে? নিলে আমরা দেখতে পেতাম না?

—আরে, এ তো মহাজ্বালা! আমাদের হ্যারকেন কি শূন্যে উড়ে গেল?

সুরেন্দ্র বলল, চল ওদিকে গিয়ে দেখে আসি।

পবন কিংবা নিবারণ নড়ল না। অন্যরা দল বেঁধে গেল বাড়ির পেছনের অন্ধকারের দিকে।

খানিক দূরেই একটা আমলকি গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে পান্তি। এই শীতের মধ্যেও তার কোমরে ইজের আর খালি গা। কিশোরী মেয়ের বুকে যে জিনিস শব্দ করে যৌবনের আগমন জানান দেয়, সে সেখানে তার দু-হাত চাপা দিয়ে আছে।

ওদের দেখেই সে তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, ইদিকে আসবেন নে, ইদিকে আসবেন নে।

কাছেই একটা ঝোপের আড়ালে হারিকেনের ক্ষীণ আলো। সেদিকে একপলক তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিয়ে সুরেন্দ্র বলল, হ্যারকেনটা জিগ্যেস করে আনিসনি কেন? আমরা পাঁচলা মোড়ে দাঁড়াচ্ছি, কাজ হয়ে গেলে দিয়ে যাবি।

নিতাই রসিকতা করে বলল, আর ওদিকে পেত্নী-টেত্নী দেখলে আমাদের চেঁচিয়ে ডাকিস, কপাৎ করে গিয়ে ধরে নে আসব। দশ টাকা পাবি।

ঘরের দাওয়ায় বসে পবন বলল, খালধারে চৌধুরীবাড়ির বাবু একবার একটা ভূত ধরিছিলেন, জীয়ন্ত কঙ্কাল। কত ঝটাপটি করিছিল, কিন্তু কর্তাবাবু দড়ি দিয়ে বেঁধে ফ্যাললেন। আহা, আমাদের ভাগ্যে ওরকম হয় না। নগদ দশটা টাকা, সাত সের চাল খরিদ করা যায়।

গেনু জিগ্যেস করল, দাদু, তুমি সত্যি ভূত দেখেছ?

পবন বলল, হ্যাঁরে দাদু, কতবার!

—আমাকে একবার দেখাবে? দুর থেকে একবারটি দেখব!

—দেখবি, ভাগ্যে থাকলে ঠিকই দেখবি। তবে না দেখাই ভালো।

দূরের দলটার দিকে তাকিয়ে নিবারণ বলল, শালাদের বড় টাকার গরমাই হয়েছে।

একটু পরে ঘুঙুরের রুনুরুনু শব্দ তুলে ওরা আবার চলে গেল দূরে। হারিকেনের আলোও মিলিয়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে অমাবস্যার রাত্রির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল বাড়িটা।

সুরেন্দ্রকে নিয়ে গ্রামের লোক খুব ধন্দে পড়েছে। বেশ কিছুদিন সবাই ভুলেই ছিল ওর কথা। ওর বাপ মারা যাওয়ার পর ওদের বংশটাই মরে হেজে যেতে বসেছিল। ওর যখন বারো-তেরো

বছর বয়েস, তখন চৌধুরীবাবুদের বাড়িতে রাখালি করত। একদিন মেজোবাবুর চটি জোড়া পড়েছিল বৈঠকখানার সিঁড়িতে, ও ছোঁড়াটা সেটা হাত দিয়ে না সরিয়ে পা দিয়ে সরাতে গিয়েছিল, অমনি চোখে পড়ে গেল মেজোবাবুর। প্রচণ্ড ঠ্যাঙানি খেয়ে ধুঁকতে লাগল উঠোনে পড়ে। ছোঁড়ার নাকি চুরিটুরির হাতটানও হয়েছিল। ঠ্যাঙানি খাবার দিন বিকেলবেলা ছোঁড়াটা গ্রাম ছেড়ে পালাল। তারপর শোনা গিয়েছিল ছোঁড়াটা শহরে গিয়ে সাইকেলের দোকানে পাম্প দেয়। তারপর কেউ ওর খোঁজ রাখেনি।

সে এখন আবার ফিরে এসেছে মস্ত জোয়ান মদ্দ হয়ে। কোন ফ্যাকটরিতে নাকি কাজ করে। গায়ে রঙিন-রঙিন জামা, হাতে ঘড়ি। বিড়ির বদলে সিগ্রেটই বেশি খায়। একদিন চৌধুরীবাবুদের বাড়ির সামনে গিয়ে থুক করে থতু ফেললে। একবার না, তিনবার। এমন কাণ্ড এ-গ্রামে কেউ কখনও করেনি।

ও-বাড়িতে অবশ্য কত্তাবাবুরা কেউ থাকেন না এখন। এক গোমস্তা শুধু টিমটিম করছে। গোমাস্তাবাবু বুড়োমানুষ, তিনি আর কী করবেন, ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে দেখলেন শুধু। পাইক বরকন্দাজ তো নেই আর-একটাও। এখন সংবৎসরের ধানই ওঠে না।

গ্রামে কতকগুলান চ্যালা-চামুণ্ডা জুটেছে সুরেন্দ্রর। ফি হপ্তায় শনি-রবিবার সে বাড়ি আসে। নিজেদের পোড়ো ভিটেয় আবার ঘর তুলেছে, সেখানে চ্যালাগুলোকে নিয়ে হুল্লোট করে। খাওয়া-দাওয়া ভালোই জোটে কি না ওখানে! গত মাসে ওরা পুবপাড়ার বহুকালের মজা দিঘিটা সাফ করতে গিয়েছিল। সাফ হয়েছে না ঘেঁচু হয়েছে, শুধু জলে নেমে দাপাদাপি। সবাই জানে, ওই দিঘিতে যখ্ আছে, প্রতি বছর একজন করে মানুষ টেনে নেয়। ওদের দলেরও একজন মরতে বসেছিল। মাঝপুকুরে ডুবিয়ে মাটি তুলতে গিয়ে আর দম পায়নি। হাঁকপাক করতে-করতে যখন উঠল তখন মুখখানা নীল হয়ে গেছে। তবু ওদের আক্কেল হয়নি, আবার সামনের হপ্তায় নামবে।

আর-এক ঢং হয়েছে, অমাবস্যার রাত্তিরে দল বেঁধে কেত্তন গাইতে-গাইতে ঘোরা। গাঁয়ের অকর্মা ছোঁড়াগুলো এই এক কাজ পেয়েছে। সুরেন্দ্র নিশ্চয় ওদের নেশাভাঙের খরচাপাতি দেয়। কয়েকজনকে নাকি শহরের ফ্যাকটরিতে চাকরিও জুটিয়ে দেবে বলেছে। সেটাই বড় টোপ।

ভূত কেনার অছিলায় সুরেন্দ্র কী বলতে চায়, তা অনেকেই বুঝেছে। সবাই তো আর ঘাসে মুখ দিয়ে থাকে না। কিন্তু এতকাল এত লোক যা নিজের চক্ষে দেখেছে, তা মিথ্যে হয়ে যাবে? আর ভূতগুলোও হয়েছে মহা ফেরেববাজ, সুরেন্দ্রর দল দেখলে কিছুতেই সামনে আসে না। ভূতেরাও ওকে ভয় পায়? যা যণ্ডামার্কা চেহারা, ভূতের বাবাও ওকে ভয় পাবে।

দিন-দিন তেজ বাড়ছে সুরেন্দ্রর। ক্রমাগতই রেট বাড়াচ্ছে সে। আগে ছিল দশ টাকা, তারপর বিশ, তারপর পঞ্চাশ, এখন একেবারে একশো টাকায় তুলেছে। এক ভূত ধরায়ে দিলে একশো টাকা। ধরাতেও হবে না, দূর থেকে দেখায়ে দিলেই হবে, আর দুজন সাক্ষী রেখে দেখালেই হবে। একশো টাকা শুনলেই মাথার রক্ত ছনছন করে। এ বাজারে একশো টাকা কে দেয়? মানুষের জীবনেরই দাম নাই, আর একখানা ভূতের দাম একশো টাকা। শালাকে ভূতে ঘাড় মটকায় না কেন? নাকি ভূতেরাই নিজেদের দাম চড়াচ্ছে আর আড়ালে বসে মিটিমিটি হাসছে।

সুরেন্দ্র নাকি প্রথম-প্রথম গাঁয়ে এসে নিতাইদের বলেছিল, মানুষের আত্মা বলে কিছু নাই। কথাটা শুনলেই গা-ছমছম করে। মানুষের আত্মা নাই? তাহলে কোথা থেকে আসা আর কোথায় যাওয়া? এ-জন্মে দুঃখকষ্ট সহ্য করলেও পরকালে সুখের আশা থাকে। আত্মাই যদি না থাকে, তাহলে আর পরকাল কী? হারামজাদা। এসব কথা যে বলে, মেরে তার মুখ ভেঙে দিতে হয়। প্রথমটা শুনেই মনে হয়েছিল, সুরেন্দ্র নিশ্চয়ই কেরেস্তান হয়েছে। তাহলে শালাকে একঘরে করার কোনও অসুবিধা ছিল না। কিন্তু কেরেস্তান তো নয়, গত বছর যে ও ধুমধাম করে দুর্গোপুজো করলে।

দুর্গোপুজো নিয়ে গত বছর একটা কাণ্ডই হয়েছিল। এ-গাঁয়ে একখানাই দুর্গোপুজো হয়,

চৌধুরীবাবুদের বার-বাড়িতে। চিরটাকাল যেমন হয়ে আসছে। গত পাঁচ-সাত বছর ধরে বাবুরা কেউ গাঁয়ে আসেন না। জমিদারি লাটে উঠেছে। আয়পত্তর কিছু নেই, তাহলে আর আসবেন কেন? শুধু আছে ওই এক পেল্লায় ভাঙা বাড়ি। বাবুরা আর পুজোর খরচাও দেন না। কিন্তু মায়ের পুজো তো আর বন্ধ হতে পারে না। তাই গাঁয়ের পাঁচজনা মিলে ভাগাভাগি করে খরচাপত্তর দিয়ে পুজোটা সারা হয় নমো-নমো করে।

গত বছর সুরেন্দ্র আর তার দলবল বললে, গাঁয়ের লোকের পয়সাতেই যদি পুজো হয়, তো সে পুজো হবে গাঁয়ের মাঝখানে চালা বেঁধে। জমিদারদের বাড়িতে হবে কেন? যে জমিদারদের কানাকড়ির মুরোদ নেই, সে কেন শুধু-শুধু পুণ্যি লুটবে? ব্যাটার এখনও রাগ আছে চৌধুরীদের ওপরে। যে বাড়িতে বরাবর দুর্গোৎসব হয়, হঠাৎ একবার বন্ধ হয়ে গেলে, সে বাড়ির ওপর মায়ের অভিশাপ নেমে আসে। সে কথা সুরেন্দ্র জানে। আরে ব্যাটা, জমিদারবাবুরা এখন তো মরমে মরেই আছে...তুই আর এখন কতটা মারবি। অমন দুর্দান্ত ছিলেন মেজোবাবু, তাঁর ছোট ছেলে এখন জেল খাটছে। কলেজে পড়ার সময় মারদাঙ্গা করতে গিয়েছিল। মেজোবাবুর আর-এক ছেলে রেলের গার্ড। হে-হে-হে-হে-।

শেষপর্যন্ত সুরেন্দ্র প্রাইমারি স্কুলের মাঠে দুর্গোপুজো করিয়ে ছাড়লে। শহর থেকে চাঁদার বই ছাপিয়ে এনে পয়সা তুললে সব ঘর থেকে। দুর্গোপুজোর ঠিক আগেই ধান ওঠে, লোকের হাতে দু-পাঁচটা পয়সা থাকে। গাঁয়ের যে পাঁচটা ভদ্দরলোক আগের বছর পুজোর সময় সদ্দারি করতেন, তেনারাও ওদের সঙ্গে কোনও তক্কো-ঝঞ্ঝাটে গেলেন না। যে বাবুরা আগের বছর চাঁদা দিতেন পঁচিশ টাকা তাঁরা দিলেন পাঁচ টাকা। সুরেন্দ্রর চেলারাই মাঠের মাঝখানে ছাউনি বেঁধে মা-কে নিয়ে এল।

অষ্টমী পুজোর দিন মাঝরাতে সুরেন্দ্রর সে কি নাচ। ক'বোতল মাল টেনেছিল কে জানে! চোখ দুটো জবাফুলের মতন লাল, মাথায় ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল, মোষের মতন চেহারা ব্যাটাকে দেখাচ্ছিল নন্দী-ভৃঙ্গীর মতন। দু-হাতে দুটো ধুনুচি নিয়ে নাচতে-নাচতে সে কি মা-মা বলে চেল্লানি। নেশার ঝোঁকে পায়ের ঠিক নেই, এক-একবার ঢলে পড়ছে, ধনুচিতে গনগনে আগুন, একবার তো সবসুদ্ধ হুমড়ি খেয়ে পড়ল। আগুন লেগে যে ওর চোখ দুটো কানা হয়নি। সে ওর সাত পুরুষের ভাগ্যি। পড়ল তো আর ওঠেই না। ওর শাগরেদরা ওর নাম ধরে ডাকাডাকি করে, হাত ধরে টানাটানি করে, তবু কোনও সাড়া নেই। অতবড় লাশকে টেনে তোলে কার সাধ্যি। শেষপর্যন্ত নেতাই যখন এক কলসি জল এনে ওর মাথায় ঢেলে দিতে যাবে, সেই সময় নিজেই লাফিয়ে উঠে হো-হো করে হাসতে লাগল। ঢং! এতক্ষণ ঢং করছিল। যত সব নেশাখোরের কাণ্ড।

মেজোবাবুর যে ছেলে এখন জেল খাটছে, গত বছর পুজোর ঠিক পরপরই সে এসেছিল একবার গাঁয়ে। সঙ্গে দুই বন্ধু। আগে বাবুরা আসতেন মোটরগাড়িতে, এ ছেলে এল মোটর সাইকেলে। তা ভালোই করেছে, মোটর সাইকেলের বেশ একখানা জমিদার-জমিদার শব্দ আছে। অতবড় চৌধুরীবাড়ির দু-তিনখানা ঘরও এখন আস্ত আছে কি না সন্দেহ। উঠল সেখানেই। বুড়ো গোমস্তাবাবু নিশ্চয় ছোটবাবুর কাছে সব লাগানি-ভাঙানি দিয়েছে। পরদিন পাঁচুমুদির দোকানে ছোটবাবু নিজে এসে জিগ্যেস করল, বলতে পারো, সুরেন কোথায় থাকে?

পাঁচুমুদি সাবধানে বলল, কোন সুরেন?

ছোটবাবু বলল, তার বাড়ি তো পাঁচলা মোড় ছড়িয়ে আরও এক মাইল, গাঁয়ের একেবারে কিনারে। কিন্তু রোজ তো সে গাঁয়ে থাকে না।

কিন্তু সেদিন রবিবার, সুরেন্দ্র ঠিকই থাকবে।

সবাই ভাবল, এবার সুরেন্দ্রর সঙ্গে লাগবে ছোটবাবু। অবস্থা পড়ে গেছে, তবু তো জমিদারি রক্ত শরীরে, ফুটফুটে সুন্দর চেহারা। এরকম চেহারার মানুষ আজকাল গাঁ-দেশে একদম দেখাই যায় না। যখন জমিদারি ছিল, তখন দু-চারজন অন্তত ছিল। এখন সব শহরে।

আগেকার দিন তো নেই যে ছোটবাবু পাইক পাঠিয়ে সুরেন্দ্রকে ধরে এনে জুতোপেটা করবে! বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে নিজেই মোটর সাইকেলে চলে গেল ফটফটিয়ে। তারপর সুরেন্দ্রর সঙ্গে তার যে কী কথা হল তা কেউ জানে না। তবে খানিক বাদে দেখা গেল, ছোটবাবু আর তার বন্ধুরা হাসতে-হাসতে বেরিয়ে আসছে সুরেন্দ্রর ঘর থেকে। কী একটা কথার পর ছোটবাবু সুরেন্দ্রর কাঁধ চাপড়ে দিতে চায়, কিন্তু সুরেন্দ্র অত্যধিক লম্বা বলে ছোটবাবুর হাত ঠিক মতন পৌঁছোয় না। বরং ছোটবাবু পকেট থেকে সিগ্রেটের প্যাকেট বার করতেই কিছু জিগ্যেস না করে সুরেন্দ্র তার থেকে একটা তুলে নিল। একেই বলে কলিকাল। দূর থেকে নিবারণ এটা নিজের চোখে দেখেছে।

কোনও কারণ না থাকলেও ছোটবাবুর প্যাকেট থেকে সুরেন্দ্রর ওই সিগ্রেট তুলে নেওয়া দেখে নিবারণের মনে পড়েছিল সুরেন্দ্রর সেই কথা, 'মানুষের আত্মা নাই।' ও ঃ ভাবলেই যাতনা হয়। অবশ্য সুরেন্দ্র পরে একথা স্বীকার করতে চায়নি। যোগেনমাস্টার জিগ্যেস করেছিল।

পাশাপাশি দু-গাঁয়ের মাঝখানে একটা ইস্কুল। সেই ইস্কুলে সরকারি নতুন মাস্টাররা আসে আর দু-এক বছর বাদেই চলে যায়। আবার অন্য মাস্টার আসে। শুধু থেকে গেল যোগেন মাস্টার। যোগেন মাস্টার বিকেলের দিকে নদীর ধারে একা-একা বসে থেকে সূর্য ডোবা দেখে। ভাবুক মানুষ।

সেই যোগেন মাস্টার হাটবারে একদঙ্গল লোকের মাঝখানে জিগ্যেস করেছিলেন, হ্যাঁ গো সুরেন, তুমি নাকি বলেছ, মানুষের আত্মা নেই?

সুরেন্দ্র কখনও পড়েনি যোগেন মাস্টারের কাছে। সে বিড়ি লুকোয় না। কিন্তু চ্যাটাং-চ্যাটাং কথাও বলল না। ঘাড় চুলকে জবাব দিল, সে তা আপনারাই ভালো জানেন। আমি মুখ্যসুখ্য মানুষ আমি কি অত বুঝি? আমি কখনও আত্মা দেখি নাই?

যোগেন মাস্টার গোঁফ-এটো-করা হাসিতে মুখ ভরিয়ে বললেন, আরে পাগল, এই যে বাতাসে আমরা নিশ্বাস নিই, সে বাতাস আমরা চোখে দেখতে পাই? তার মানে কি বাতাস নেই?

যারা শুনছিল, তারা মাথা নাড়ে। হ্যাঁ, জব্দ করেছে বটে যোগেন মাস্টার। এবার বল ব্যাটা, বাতাস নাই।

সুরেন্দ্র বলল, বাতাস চোখে দেখা যায় না, কিন্তু হাতে ধরা যায়।

যোগেনমাস্টার বলল বাতাস ধরা যায়? বলো কি হে? কেউ কখনও তা পেরেছে? বুকের মধ্যে একটু বাতাস ধরে রাখো, অমনি প্রাণ-পাখি ছটফট করে উঠবে। কী উঠবে না? তোমরা কী বলো?

সকলে মাথা নাড়ল।

কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল একটা বেলুনওয়ালা। সুরেন্দ্র একটা নেতানো বেলুন খপাৎ করে তুলে নিয়ে ফুঁ দিয়ে ফুলিয়ে সেটাকে লাউ করে ফেলল। তারপর সেটার ঠুঁটো চেপে ধরে হাত উঁচিয়ে বলল, এই দ্যাখেন মাস্টারমশাই, বাতাস ধরলাম। আপনি বুঝিয়ে দ্যান তো আত্মাকে ধরা যায় এইভাবে? আপনি বুঝিয়ে দিলেই আমি মেনে নেব।

মাস্টার বলল, আত্মাকে ধরবে? ও চিন্তাও কোরো না বাপ। উনি কখনও ধরা-ছোঁয়া দেন না। নৈনং ছিদ্রন্তি অং-বং-চং। তার মানে হল গে, আত্মাকে কখনও ছ্যাঁদা করা যায় না, তাঁকে আগুনে পোড়ানো যায় না, জলে ডোবানো যায় না। আত্মা অজর অমর।

সুরেন্দ্র বলল, মানুষ মরে গেলে যখন তাকে পোড়ানো হয়, তখন কি ফুস করে আত্মাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়? কোথায় যায়?

মাস্টার বলল, তখন তা পরমাত্মার সঙ্গে মিশে যায়। পরমাত্মা হলেন ঈশ্বর।

সুরেন্দ্র বলল, অ।

মাস্টার বলল, কি, কথাটা পছন্দ হল না। তুমি মানলে না?

সুরেন্দ্র বলল, মানব না কেন? আপনার মতন পড়ালেখা-জানা লোক যখন বলছেন, তখন

কি আর ভুল বলবেন?

যোগেন মাস্টারের জয়ে সবাই বেশ খুশি হয়ে অবাকও হয় খানিকটা। সকলেই ভেবেছিলে, সুরেন্দ্র ফাটাফাটি তক্কো করবে মাস্টারের সঙ্গে। বেলুনটা ফুলিয়ে সে বেশ একটা তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। তারপর সে এত-সহজে মেনে নিল লক্ষ্মী ছেলের মতন?

জোগেন মাস্টার বেশ পরিতৃপ্ত হয়ে সুরেন্দ্রর গা চাপড়ে দিলেন। যেন সে একটি বেশ ভালো ছাত্তর। তারপর আবার জিগ্যেস করলেন, তুই নাকি ভূত ধরার ব্যাবসা খুলেছিস?

সুরেন্দ্র সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর দিল, আজ্ঞে হ্যাঁ। শহরের এক বাবু আমাকে অর্ডার দেছেন। একটা ভূত যোগান দিলেই আড়াইশো টাকা পাব। আমি কিনব একশো টাকায়। আমার মোটা লাভ। এই দ্যাখেন না, এই হাট থেকে ব্যাপারীরা প্যাঁজ কিনে নে যাচ্ছে সাতাশ টাকা মণ দরে। শহরে পাইকারি রেটে ছাড়বে পঁয়তিরিশ টাকায়। আমিও তেম্নি চালানি ব্যাবসা ধরেছি।

যোগেন মাস্টার এ হেঃ-হেঃ-হেঃ-হেঃ করে হেসে উঠলেন।

সুরেন্দ্রও ঠিক সেই তালে তাল মিলিয়ে হাসতে লাগল। যেন সে সত্যিই বেশ একটা মজার কথা বলেছে।

—পেয়েছিস একটাও?

—না।

—হেঃ-হেঃ-হেঃ-হেঃ। এ কি ছেলেখেলা? ভূতের ব্যাবসার কথা বাপের জন্মে শুনিনি। এসব কথা মন থেকে বাদ দাও। এ বড় সাংঘাতিক জিনিস, কখন কী হয়ে যায়, বলা যায় না।

সুরেন্দ্র আবার একটা বিড়ি ধরিয়ে বলল, আপনার বাড়িতে একদিন যাব মাস্টারমশাই। হাটের মধ্যে দাঁড়িয়ে সবকথা হয় না। আপনি জানেন, আমার বাবাকে ভূতে গলা টিপে মেরেছিল।

মাস্টার বলল, হ্যাঁ শুনেছি।

সুরেন্দ্র বললে, আমার বাবার ট্যাঁকে সেদিন ধান-বেচা টাকা ছিল, তার এক-আধলাও পাওয়া যায়নি। কে নিল সেই টাকা, আত্মা না পরমাত্মা? কার বেশি টাকার দরকার? আপনার ঠেঙে জেনে আসবো। গাঁয়ের একটা লোকও সেদিন সাক্ষী দেয়নি।

পুরোনো খালটা মজে হেজে গেছে। সরকার থেকে সেই খালটা নতুন করে কাটাচ্ছে এবার। পাশের গাঁয়ের রহমান সাহেব সেই খাল কাটার ইজারা নিয়েছেন। এ-খাল দিয়ে আবার জল বইলে এ-তল্লাটে চাষের সুবিধে হবে। এই কথাটা ভেবে নিবারণ নিজেকে নিজে ভ্যাঙচায়।

আড়াই বিঘে জমি ছিল, গত ফাল্গুনে তা বন্ধক রাখতে হয়েছে। না রেখে উপায় ছিল না,। নিবারণ নিজেই বড় শক্ত অসুখে পড়েছিল। যদি তার ছেলে, মেয়ে-বউ বা বাপের অসুখ হত, সে জমি বন্ধক দিত না কিছুতেই, কিন্তু সে নিজে তাদের সংসারে একমাত্র রোজগেরে পুরুষ, সে মরে গেলে আর সকলকে বাঁচাত কে? তার বাপ তো [illegible]লে বুড়ো। কুটোটি নাড়বার পর্যন্ত ক্ষমতা নেই। তবু এখনও রাক্কুসে খিদে আছে। মরেও না কিছুতে। তার অন্য ভাইরা কেউ বাপকে নেয়নি নিজের সংসারে। শুধু নিবারণেরই যত জ্বালা।

মহাজনকে সে বলে রেখেছে, ভাগচাষের স্বত্ব তারই থাকবে। নিজের জমিতেই সে ভাগচাষী হবে। ধান উঠে গেলে ওই জমিতে সে ফুলকপি বসাবে।

সরকার বাহাদুর খাল কাটাচ্ছেন! আর দু-বছর আগে কাটাতে পারেননি, যখন জমিটুকুন নিবারণের নিজেরই ছিল? এখন ভাগচাষ করে সে সংসারের পেট ভরাবে, না বন্ধকী দেনা শুধবে?

দৈনিক পঞ্চাশজন লোক লাগে খাল কাটার জন্য। সারা গাঁয়ের লোক গিয়ে হামলে পড়েছিল। কারুর হাতে এখন কাজ নেই। নিবারণরা বংশ-পেশায় ঘরামি। এখন কাজ জোটে না। এক কাহন

খড়ের দাম চব্বিশ টাকা। যাদের হাতে দু-পয়সা আছে তারা টালি দিয়ে চাল ছাইছে, সেজন্য শহর থেকে মিস্তিরি আসে।

রহমান সাহেব নিজের গাঁ-সোনামুড়ি থেকেই মাটি কাটার মজুর নিয়েছিলেন পঞ্চাশজন। সেই নিয়ে পরশুদিন খুব হাল্লা হয়ে গেল। খালটা দু-গাঁয়ের মাঝখানে, তাহলে শুধু এক গাঁয়ের লোক কাজ পাবে কেন? এ-গাঁয়ে কাজের মানুষ নেই?

রহমান সাহেব ঠান্ডা মাথার মানুষ। সব শুনেটুনে উনি ঠিক করে দিয়েছেন, প্রতিদিন এ-গাঁ থেকে পঁচিশজন, ও-গাঁ থেকে পঁচিশজন কাজ পাবে। এক লোক পরপর দু-দিন কাজ পাবে না। সাড়েচার টাকা রোজ, আর একবেলা খোরাকি।

নিবারণ গতকাল কাজ পেয়েছিল। আজ পাবে না। ঘরামির ছেলে শেষপর্যন্ত মাটিকাটা কুলি। আজকাল অতকিছু ভাবলে চলে না। ভাত এমন চিজ, খোদার সঙ্গে উনিশ-বিশ।

আজ তার কাজ নেই, তবু নিবারণ খালধারের দিকে যাচ্ছে। অন্য কোনও কাজও তো নেই এখন, তবু ওসব দেখতে ভালো লাগে।

যেতে-যেতে তার বারবার মনে পড়ছে সুরেন্দ্রর কথা। সুরেন্দ্রকে সে কিছুতেই পছন্দ করতে পারছে না। সুরেন্দ্রর স্বাস্থ্য ভালো, পকেটে পয়সা ঝমঝমিয়ে বেড়ায়। এসব মানুষ একবার গ্রাম ছেড়ে শহরে গেলে আর ফেরে না। সুরেন্দ্র ফিরল কেন? আবার বিদায় হলেই তো পারে। পকেটে তার শয়ে-শয়ে টাকা কিন্তু এমনি তো সে কারুকে দেবে না। ভূত কেনার বায়না। নিবারণের গা জ্বালা করে। একশোটা টাকা পেলে তার এখন কতদিকে সুরাহা হত। সেই টাকা একজনের পকেটে আছে, অথচ সে পাবে না। এই পৃথিবীতে কারুর থাকে প্রয়োজনের চেয়েও অনেক বেশি, আর কেউ প্রয়োজনটুকুও মেটাতে পারে না। এটাই বুঝি ভাগ্যের নিয়ম! কতজন কত ভূত দেখে, তার ভাগ্যে জোটে না, একটাও! সন্ধের পর সে এদিক-ওদিক তাকিয়ে খোঁজে, চমকে ওঠে দু-একবার, তারপর ভালো করে চোখ কচলে দেখে। না, একটা কলাগাছ, কিংবা বেলগাছ। দূর, দূর! তখন আরও রাগ হয় সুরেন্দ্রর ওপর।

খালপাড়ের উঁচু বাঁধটার ওপরে এসে দাঁড়ায় নিবারণ। বুক চিতিয়ে নিশ্বাস নেয়। খালি পেটে বেশি হাওয়া খেলে পেট ঘুলিয়ে ওঠে। মন খারাপ লাগে। পঞ্চাশটা লোক একসঙ্গে মাটি কাটছে, ওরা যেন সবাই আলাদা, নিবারণ ওদের কেউ নয়। আর খানিক বাদেই ওরা নগদ সাড়েচারটা টাকা পাবে, নিবারণ পাবে না। ক'দিন ধরেই তার বউটা পেটব্যথায় কাতরাচ্ছে। রাত্তিরবেলা ঘুঙিয়ে ঘুঙিয়ে কাঁদে। এই সময় ওর একটু ভালোমন্দ খাওয়ার দরকার। একটু দুধ পেলে শরীরের পুষ্টি হত, পেটের বাচ্চাটা...কিন্তু দুধ, কতদিন আগে পয়সা দিয়ে দুধ কিনেছে। মনেই পড়ে না নিবারণের...পুকুরের ধারে কলমিশাক পাতা আপনি জন্মায়, ক'দিন ধরে সেই কলমিশাক সেদ্ধ আর ফ্যানভাত চলছে।

আকাশটাকে গাঢ় লাল রঙে ভাসিয়ে সূর্যদেব অস্ত যাচ্ছেন। এই সময় আকাশটাকে ভগবানের রাজবাড়ির মতন মনে হয়। সেদিকে হাত তুলে মনে-মনে নিবারণ বলল, এ-জন্মে অনেক দুঃখ-কষ্ট পেয়ে গেলাম, হে ভগবান, পরজন্মে একটুখানি সুখ দিয়ো, যেন দু-বেলা পেট পুরে দুটো ভাত খেতে পাই। আর ছেলেপুলেগুলোদের হাতে একটু নাড়ু-বাতাসা দিতে পারি।

ডানদিকে, খানিকটা দূরে, নিমগাছের তলায় একটা ছোটখাটো জটলা। বিনা পয়সায় দু-এক টান বিড়ি খাওয়ার লোভে নিবারণ সেইদিকে এগিয়ে গেল। এবং গিয়েই একটা চমকপ্রদ খবর শুনল। সঙ্গে-সঙ্গে একটা হিংস্র আনন্দে জ্বলে উঠল তার চোখ দুটো। সে যেন এবার তার সব পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবে।

উত্তেজিত আলোচনার মধ্যে জোর করে মাথা গলিয়ে নিবারণ জিগ্যেস করল, ওসব কথা ছাড়ো দিকিনি! কেউ নিজের চোখে দেখেছে?

সোনারং গ্রামের বাঙাল চারু বলল, নিজের চোখে দেখিনি কি চাটাম মারছি নাকি?

নিবারণ ব্যগ্রভাবে জিগ্যেস করল, এখনও আছে?

—এই তো ভানু দেখে এয়েছে একটু আগে। মাটিতে গইড়ে ছটফটাচ্ছে!

—সত্যি রে ভানু?

ভানু অতি সরল নির্বোধ লোক। কুড়ি-বাইশ বছর বয়েস থেকেই তার মাথায় টাক। সবাই জানে, মিথ্যে কথা বানিয়ে বলার ক্ষমতা পর্যন্ত নেই ভানুর।

ভানু বলল, হ্যাঁ, দেখিছি, কালো জাম গাছটার তলায়। মাটিতে পড়ে ছটফট করছে আর গ্যাঁজলা বেরুচ্ছে মুখ দিয়ে। ওঝা এয়েছে। এমন ধুনো জ্বেলেছে না, চোখজ্বালায় আমি আর তিষ্ঠুতে পারলাম না।

নিবারণ রাগ করে বলল, ওঝা? তোদের শালার কি ঘটে বুদ্ধি হবে না কোনওদিন? সুরেন্দ্রকে খবর দিসনি কেন? সে বাঞ্চোত যে বড় তড়পায়! সে হারামীর বাচ্চাটা আজ দেখাক তার কতখানি মুরোদ।

ভানু বলল, সুরেন্দ্র তো টাউনে।

—শালাকে টাউন থেকে ধরে নিয়ে আয়! ওর ইচ্ছেমতন তেনারা কি শুধু ছুটির দিনে দেখা দেবেন?

মাঝে-মাঝে রাত্তিরবেলা সুরেন্দ্র টাউন থেকে বাড়ি ফিরে আসে। কোন মাগীকে নাকি ওর মনে ধরেছে।

—তবে ডাক না শালাকে।

সকলে হইহই করে খালপাড়ের বাঁধ থেকে নেমে, গ্রামের দিকে ছুটে গেল।

সুরেন্দ্রর বাড়ি গ্রামের এক টেরেয়। বাড়ির লগ্নের ধানিজমি এককালে তাদেরই ছিল। তার বাপ ছিল খুব শক্ত হাতের চাষি। কথাবার্তায় কাউকে রেয়াত করত না। অল্প জমিতে গায়ে খেটে সে নিজের বউ-ছেলেকে দু-বেলা খাইয়ে পরিয়ে রেখেছিল।

সে জমি-জেরাত সব গেছে, কিন্তু বাড়িটি এখনও আছে। গ্রামের এই এক অদ্ভুত নিয়ম। সবসময় ফন্দি-ফিকির করে এ-ওর জমি কিংবা বাগান নিজের ভাগে নিয়ে নিতে চায়। মিথ্যে মোকদ্দমা লাগে। তা ছাড়া, গা-জুয়ারি দখল তো আছেই। কিন্তু অন্যের বসতবাড়ি কেউ চট করে দখল করতে চায় না। সব গ্রামেই একখানা দু-খানা বসতবাড়ি ফাঁকা পড়ে থাকে, মালিকের কোনও পাত্তা নেই, দিনেরবেলা ঘুঘু চরে সেখানে, তবু অন্য কেউ সে-বাড়িতে চট করে বাস করতে আসে না। তাতে বাস্তু-দেবতা অসন্তুষ্ট হন। অভিশাপ দেন। সেইজন্যেই, এমনকি পাশের বাড়ির লোকও আত্মীয়-কটুম হঠাৎ এসে পড়লে নিজেদের বাড়িতে জায়গা না থাকলেও তাদের সেই ফাঁকা বাড়িতে থাকতে পাঠায় না। বরং সেটা পড়ো বাড়ি হয়ে যাক, তাও ভালো। লোকে জানলা-দরজাগুলো খুলে নিয়ে জ্বালানি করে।

সুরেন্দ্র নিজেদের বাড়িটাতে জানলা কপাট বসিয়ে আবার বাসযোগ্য করে তুলেছে। শহরে তার ফ্যাকটরির পাশে নিজস্ব কোয়ার্টার আছে। সেখানে পাকা নর্দমা আর কলের জল। তবু সুরেন্দ্র আজকাল প্রায়ই গ্রামের বাড়িতে এসে থাকতে ভালোবাসে। এই মাটি তাকে টানে। এক-একদিন মাঝরাত্তিরে নিজের ঘরে একা শুয়ে থেকে সুরেন্দ্র আপনমনে কাঁদে। গলগল করে চোখের জল বেরোয়। অত বড় দশাসই লোকটা যে কাঁদতে পারে, তা কেউ বিশ্বাস করবে না। সুরেন্দ্র কাঁদে একা। তার খুব কষ্ট হয় তার মায়ের কথা ভেবে। একদিন নিষ্ঠুরের মতন সে তার মাকে ছেড়ে চলে যায়। চৌধুরীবাবুরা বিনা দোষে তাকে শুয়োর-পেটা করার ফলে রাগে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল সে। মায়ের কথাও তখন তার মনে পড়েনি। সে পালিয়েছিল। তার মা খেতে না পেয়ে কেঁদে-কেঁদে মরে গেছে। এই ঘরে। তার মায়ের নাকি ওলাওঠা হয়েছিল বলে গাঁয়ের কেউ

তাকে ছোঁয়নি, তিনদিন ধরে বাসি মড়া পড়েছিল এখানে। তারপর থেকে আর ভয়ে কেউ এ-বাড়ির পাশ মাড়াত না।

সুরেন্দ্র এতদিন বাদে ফিরে এসেছে এই গাঁয়ের ওপর প্রতিশোধ নিতে। এখন তার পকেটে টাকা আছে, শরীরে বল আছে, মনে জোর আছে—তবু সে আর তার মাকে ফিরে পাবে না।

নিঃশব্দে চোখের জল ফেলতে-ফেলতে সুরেন্দ্র এক-একবার ভাবে একদিন সে এ-গ্রামেরই কোনও মেয়েকে বিয়ে করবে। তাহলে, তখন হয়তো এ গ্রামের ওপর তার রাগ পড়ে যাবে। কিন্তু সেরকম মেয়ে কই? কারুকেই চোখে ধরে না। রূপের কথা ছেড়েই দাও, একটারও স্বাস্থ্য ভালো নয়। কারুর ভালো করে বুকটুকুও ওঠেনি।

বাইরে থেকে কে যেন মোটা গলায় ডাকে, সুরেন্দ্র! সুরেন্দ্র!

ঠিক যেন তার বাবার গলা।

সুরেন্দ্র শুয়ে-শুয়ে হাসে। গাঁয়ের উটকো ছেলেরা তাকে নানারকম ভাবে ভয় দেখাবার চেষ্টা করেছে অনেকবার। টিনের চালে ঢেলা ছুড়েছে, জলে ডোবানো বেড়াল ছেড়ে দিয়েছে ঘরের মধ্যে। একদিন তক্কে-তক্কে থেকে সুরেন্দ্র কয়েকটা ছোঁড়াকে ধরে ফেলে বেধড়ক ধোলাই দিয়েছিল। তারপর থেকে ওসব উৎপাত অনেকটা কমেছে, কিন্তু দু-চারজন এখনও তার পেছনে লেগে আছে। আবার ধরতে পারলে হয়।

আবার সুরেন্দ্র সুরেন্দ্র বলে ডাক উঠতেই সে বাইরে বেরিয়ে এল। কেউ নেই। আকাশে তৃতীয়ার ফালি চাঁদ। কয়েকটা চামচিকে উড়তে-উড়তে চাঁদের দিকে চলে যাচ্ছে। পরপর চারটে নারকোল গাছের সবক'টা পাতা এখন হাওয়ায় উত্তরমুখো!

কেউ নেই, তবু কে ডাকল?

সুরেন্দ্র চারদিকে ঘুরে-ঘুরে তাকায়। খানিক আগে সন্ধে হয়েছে। এর মধ্যেই গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে মোহনিদ্রা। সুরেন্দ্র নিজের কপাট-বুকে হাত বুলিয়ে মনে মনে বললো, ওরকম হয়। একলা থাকলে ওরকম শোনা যায়। আর বেশিদিন একলা থাকতে ইচ্ছে করে না।

অন্ধকারের মধ্যে দূর থেকে কারা যেন হেঁটে আসছে। সাত-আটজন মানুষ। তারা আসছে প্রায় দৌড়ে-দৌড়ে, এ-বাড়ির দিকেই। সুরেন্দ্র স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

দলের প্রথমেই আছে নিতাই। সে লাফাতে-লাফাতে এসে বলল, সুরেনদা, ও সুরেনদা, জবর খবর আছে। আমি তোমার কাছেই আসছিলাম, পথে এনাদের সঙ্গে দেখা হলো। জবর খবর।

সুরেন্দ্র বিনা উত্তেজনায় বলল, কী খবর?

—সোনারং গাঁয়ের সর্বানন্দ দাসের পুতের বউকে ভূতে ধরেছে।

সুরেন্দ্র ঠাট্টা করে বলল, বটে? কতখানি ভাং খেয়েছিস?

এবার অন্য চার-পাঁচজন এগিয়ে এসে বলল, সাচ্চা কথা! সর্বানন্দের ছেলে বিভূতির বউকে পেত্নীতে ধরেছে। সকাল থেকে মাটিতে পড়ে ছটফটাচ্ছে। তার মুখ দিয়ে কথা বলছে পেত্নীটা। কী সব কুচ্ছিত কথা!

ঠাট্টার সুরটা বজায় রেখেই সুরেন্দ্র বলল, বটে! কী কুচ্ছিত কথা বল তো শুনি?

—সে তুমি গেলেই নিজের কানে শুনতে পাবে।

—আপনারা কেউ শোনেননি? কেউ চোখে দেখেছেন?

নিবারণ উগ্র গলায় বলল, আলবত দেখেছে! এই তো চারু আর ভেনো—দুজনেই দেখেছে! ওঝা এসেও সে পেত্নীকে ভাগাতে পারছে না।

—সর্বানন্দের ছেলে বিভূতি কোথায়?

—সে তো দুর্গাপুরে কাজ করে।

—ওদের বাড়ির কেউ আছে এখানে? ওদের বাড়ির কেউ তো ডাকতে আসেনি আমাকে।

—কেন, আমরা বললে তুই যাবি না? আমাদের কথা, কথা নয়? আমরা কি ফ্যালনা?

—দ্যাখো, আমি সাফ কথা বলি। সর্বানন্দের বাড়ি দু-আড়াই মাইলের রাস্তা। অতখানি রাস্তা উড়ো কথা শুনে যদি শুধুমুধু যেতে হয়, তার চেয়ে ঘরে বসে কেত্তন গাওয়া অনেক ভালো!

—নাকি তুই ভয় পাচ্ছিস এখন?

সুরেন্দ্র এবার হাসল। এত বয়স্ক-বয়স্ক লোকদেরও তার খুব ছেলেমানুষ বলে মনে হয়। এদের মাথায় গোবর। সে বলল, আমার এমন লাভের কারবার, তাতে কি ভয় পেলে চলে? কিন্তু খাঁটি মাল পাচ্ছি কোথায়?

—এবার গিয়েই দ্যাখ না।

—যাচ্ছি তাহলে। কিন্তু গিয়ে যদি দেখি ভাঁওতা, তাহলে কিন্তু উত্তমমফুত্তম করে ছাড়ব আমি। আমার সঙ্গে মাজাকি কোরো না। আমি সরল কথার মানুষ।

সুরেন্দ্র ঘরের মধ্যে ফিরে গেল রেডি হয়ে নিতে। অন্যরা বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। শুধু নিতাইয়ের অধিকার আছে ঘরে ঢোকার।

সুরেন্দ্র একটা ঝোলার মধ্যে কয়েকটি জিনিস ভরে নিচ্ছে। একটা ছোট টিনের বাক্স, তার মধ্যে কী আছে, নিতাই জানে না। একটা টর্চ। এক বান্ডিল ব্যান্ডেজের কাপড়। আর-একটা বিলিতি মদের (দিশি-বিলিতি) খালি বোতল।

নিতাই জিগ্যেস করল, সুরেনদা খালি বোতলটা নিচ্ছ কেন?

একগাল হেসে সুরেন্দ্র বলল, জানিস না? এই বোতলের মধ্যেই পেত্নীটাকে ভরব। ভূত-পেত্নীরা বোতলকে বড় ডরায়। যেই বোতলটা তুলে ধরব, অমনি তার মধ্যে সুড়ুত করে এসে ঢুকে পড়বে। শালা! তুইও ওদের কথায় নেচেছিস!

ঝোলাটা কাঁধে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে সুরেন্দ্র বলল চল।

কয়েক পা এগিয়েই নিবারণ তাকে জিগ্যেস করল, টাকা এনেছিস তো সুরেন? একশো টাকা দিবি বলে কথা দিয়েছিস, আজ তোর টাকা খসবে।

সুরেন্দ্র নিষ্ঠুরের মতন উত্তর দিল, তা নিয়ে তোমার মাথাব্যাথা কেন নিবারণকা? ভালো মাল পেলে আমি দাম দেব। টাকা যদি পায় তো পাবে সর্বানন্দ দাস, তোমাকে কি তার থেকে একটা পয়সাও দেবে?

নিবারণ খানিকটা চুপসে গেল। তবু সে মনে-মনে বলল, তা আমি পেলাম আর না পেলাম, তবু তোর পকেট থেকে টাকা খসতে দেখলেই আমার আনন্দ হবে। হারামির বাচ্চা, তোর তেজ আজ ভাঙবে।

সর্বানন্দ দাসের অবস্থা এককালে বেশ সচ্ছল ছিল। এখন আর তেমন রমরমা নেই, জমি-জায়গা বেহাত হয়ে গেছে, তবু তার বড় ছেলে শহরে চাকরি করে বাড়িতে টাকা পাঠায়। বাড়িটি বেশ সুন্দর। মস্তবড় উঠোনের চারপাশে চারটি ঘর। আর সে-বাড়ি ঘিরে রয়েছে অনেকগুলো সুপুরিগাছ। রান্নাঘরের পাশ দিয়ে একটি সুপুরিগাছ-ঘেরা পথ চলে গেছে পুকুরপাড় পর্যন্ত। উঠোনের এককোণে একটি বড় কালোজাম গাছ।

বাড়িটি এখন ভিড়ে ভিড়াক্কার। সেই ভিড় সামলাবার চেষ্টাও কারুর নেই। যার যা খুশি করছে, লোকের চ্যাঁচামেচিতে কান পাতা যায় না। সেইসঙ্গে ধূপধুনোর ধোঁয়া। একটা হ্যাজাকের আলো ঘিরে উড়ছে অসংখ্য পোকা।

সর্বানন্দের পুত্রবধূ শান্তি শুয়ে আছে উঠোনে। তার সর্বাঙ্গের পোশাক ভেজা, মাথার চুল জলকাদায় মাখামাখি। চোখ দুটি বন্ধ, মুখ দিয়ে ফেনা বেরুচ্ছে অনবরত। শরীরটা কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ, মাঝে-মাঝে হঠাৎ বেঁকে দুমড়ে উঠছে, যেন অসহ্য যন্ত্রণায়।

বড় একটা মাটির মালসায় টিকের আগুন জ্বেলে তাতে একটু-একটু ধুনো দিচ্ছে সর্বানন্দ

নিজে আর শান্তির পাশে বসে ওঝা অনবরত মন্ত্র পড়ে যাচ্ছে চোখ বুজে, তার হাতে একটা ঝাঁটা।

ওঝাটি বেঁটে বাঁটকুল। এ-গ্রামের মহাদেব ওঝার ছিল দারুণ নামডাক। আশপাশের দশ-বিশখানা গাঁ থেকে তার বায়না হত। চেহারাও ছিল সাংঘাতিক, দেখলে ভয় ও ভক্তি—দুটোই জাগত! মেয়েমানুষের মতন কোমর পর্যন্ত লম্বা চুল, এদিকে গালভরতি চাপ দাড়ি, টকটকে লাল রঙের কাপড় পরা, চোখ দুটিও সেইরকম লাল, হাতে একটা ডান্ডা। এই মহাদেব ওঝা নাকি মন্ত্রের জোরে ভূত-প্রেতদের তিড়িংবিড়িং করে নাচাতে পারত। মাসছয়েক আগে সেই মহাদেব ওঝা মারা গেছে। সে নাকি নিজের শরীরের মধ্যে একসঙ্গে দুটো ভূত ঢুকিয়ে আটকে রাখতে গিয়েছিল।

পুরুতের ছেলে যেমন পুরুত হয়, তেমনি ওঝার ছেলেও ওঝা হয়েছে। কিন্তু বাপের চেহারা পায়নি ছেলে। বয়েস তার মাত্র কুড়ি-বাইশ, দেহটি নাদুস-নুদুস। তা হোক, বাপের কাছ থেকে মন্ত্রগুলো তো সব পেয়েছে। তার আর-একটি বড় গুণ আছে, সে জিভ দিয়ে নিজের নাক ছুঁতে পারে।

মহাদেবের ছেলের নাম সুবল। সে মাটিতে জোড়াসন করে বসে খুব ভাব দিয়ে মন্ত্র পড়ে যাচ্ছে, আর বউটি যেন মাঝে-মাঝে বেঁকে দুমড়ে উঠছে, অমনি সে হাতের ঝাঁটা দিয়ে সপাং-সপাং করে পিটোচ্ছে। মহাদেব ওঝা নাকি মারের চোটে রক্ত বার করে দিত। সুবল অত জোরে মারতে না পারলেও তার গালাগালির জোর আছে। শান্তি একবার বেশি করে হাত-পা ছুড়তেই সুবল ওঝা এক হাতে তার চুলের মুঠি চেপে ধরে মারতে-মারতে বলল, যা-যা আবাগীর বেটি, শতেক-ভাতারী দূর হ। দূর হ!

সুরেন্দ্র ভিড় ঠেলে এসে উঠোনের মাঝখানে দাঁড়াল। মিশমিশে কালো যমদূতের মতন তার চেহারা। রাগে চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে গেছে। প্রথমেই তার ইচ্ছে হল, সুবল হারামজাদাকে ক্যাঁৎ-ক্যাঁৎ করে দুটো লাথি কষায়। শুয়োরের বাচ্চাটা মেয়েছেলের গায়ে হাত তোলে। সুরেন্দ্র দু-পা এগিয়েও গেল তার দিকে, কিন্তু শেষপর্যন্ত মারল না। তার মনে পড়ল ফাদার পেরেরার কথা। নিতান্ত আত্মরক্ষার কারণে ছাড়া কারুকে মারতে নেই। যখন-তখন মারামারি করে জন্তুরা। তুমি তো মানুষ, সুরেন্দ্র।

সে ঝুঁকে সুবলকে বলল, দেখি কর্তা, ছাড়ো-ছাড়ো! আমি একটু দেখব।

আজ যদি মহাদেব ওঝা থাকত, তাহলে তুলকালাম কাণ্ড বেধে যেত একটা। মহাদেব ওঝার কাজে কেউ কখনও বাধা দিতে সাহস করেনি। সুরেন্দ্রর মতন সা-জোয়ানকেও গ্রাহ্য করত না সে, তার গায়েও শক্তি কম ছিল না। কিন্তু ছেলেটি হয়েছে অকালকুষ্মাণ্ড!

সুবল মিনমিন করে বলল, আমার কেস, তুমি দেখবার কে? বেটিকে এই তাড়ালুম বলে। আর একটুখানি।

সুরেন্দ্র তাকে পোকামাকড়ের মতন অগ্রাহ্য করে বলল, সরো, সরো।

তারপর সর্বানন্দকে জিগ্যেস করল, কী হয়েছিল?

সর্বানন্দ বিবর্ণ মুখে একটা হাত তুলে বলল, ওই জামগাছটা—

সুবলই এবার বাকিটা বলে দিল। আজ ভোরবেলা বাসি কাপড়ে এই বউটি ঘর থেকে বেরিয়েছে। তখনও ভালো করে সূর্য ওঠেনি। ঘর থেকে উঠোনে পা দিয়েই দেখল, তিনটে কইমাছ। একটা বড় মাটির হাঁড়িতে কাল রাত থেকে কইমাছ জিয়োনো ছিল। এ-বাড়িতে প্রায়ই এরকম জিওল মাছ রাখা থাকে। কোনওক্রমে হাঁড়িটা কাত হয়ে পড়েছিল, তার থেকে বেরিয়ে এসেছে কয়েকটা মাছ। বেড়ালে যে খেয়ে ফেলেনি, তাই ভাগ্যি। বেড়াল অবশ্য জ্যান্ত কইমাছকে ভয় পায়। বউ তাড়াতাড়ি মাছগুলোকে ধরে হাঁড়িতে ভরল। সেই আঁব হাত না ধুয়েই মুছে ফেলল কাপড়ে। তারপর ঘুমচোখে জল খালাস করে আবার ঘরে ফিরে শুতে যাবে, এমনসময়—

এই পর্যন্ত বলে সুবল থামল। উপস্থিত অন্যান্য লোকেরা এই ঘটনা ইতিমধ্যে প্রায় বার পঞ্চাশেক শুনেছে, তবু সুবল খানিকটা নাটকীয় করবার জন্য বলল, ওই জামগাছটা, ওই জামগাছে

ওত পেতে বসে ছিল দুটিতে দুই দুষ্ট আত্মা, ওরা তো এইসব সুযোগই খোঁজে! বাসি কাপড়ে আঁষ হাত মুছেচে তার ওপর পেচ্ছাপ করে এসে পায়ে জল দেয়নি, বউ যেই জামগাছতলা দিয়ে আসছে, অমনি গাছের একটা ডাল নীচু হয়ে নেমে এসে মারল মাথায় একটা ঝাপটা। ব্যস, সেই যে পড়ে গেল উঠোনে, আর উঠল না।

সুরেন্দ্র জিগ্যেস করল, অত ভোরে আর কেউ জেগেছিল? কেউ দেখেছে যে বউ কইমাছ ধরেছিল? কিংবা পায়ে জল দেয়নি?

সুবল বিজ্ঞের মতন বলল, দেখতে হবে কেন? আমি তো কেস দেখেই বুঝে নিয়েছি। ওই যে বারান্দায় জিওল মাছের হাঁড়িটা এখনও রয়েছে।

সুরেন্দ্র বলল, হুঁ!

সুবল বলল, প্রমাণ চাও? দেখবে?

হাতের ঝাঁটা দিয়ে শান্তিকে খুব জোর একটা বাড়ি মেরে বলল, হারামজাদী, ছোটলোকের নাঙী, বল-বল, বউ বাসি কাপড়ে মাছ ধরেনি?

শান্তির মুখ দিয়ে আওয়াজ বেরুল, উঁ-উঁ।

—ওই দ্যাখো, স্বীকার পেয়েছে। আরও শুনবে?

আবার সে শান্তিকে ঝাঁটা মেরে বলল, শুখাগী, বল, গাছের ডাল নীচু হয়ে এসে ওর মাথায় মারেনি? বল মারেনি?

এবার শান্তির মুখ দিয়ে স্পষ্ট আওয়াজ বেরুল—মেঁরেচে, মেঁরেচে।

সুবল সগর্বে মুখ ঘুরিয়ে তাকাল।

সুরেন্দ্র সুবলের হাত থেকে ঝাঁটাটা কেড়ে নিয়ে ফেলে দিল দূরে।

শান্তি এ-গ্রামের মেয়ে নয়। সর্বানন্দের মামার বাড়ি রসাপাগলা গ্রামে বেড়াতে গিয়ে সর্বানন্দ এই মেয়ে পছন্দ করে এসেছিল। মেয়েটি কিছু লেখাপড়া জানে। সর্বানন্দের ছেলে বিভূতি মহকুমা শহর থেকে বি-এ পাস দিয়ে এসেছে, তার সঙ্গে এ-মেয়েকে মানিয়েছিল ভালো। ঘরের বউ হয়েও শান্তি জোড়া বিনুনি করত অনেকদিন। শহরে খরচ বেশি বলে বিভূতি এই দু-বছর হল বউকে গ্রামের বাড়িতে রেখেছে। সে ন'মাসে ছ'মাসে একবার আসে। এখনও বাচ্চাকাচ্চা হয়নি। ইতিমধ্যেই সন্দেহ দেখা দিয়েছে যে বউ বাঁজা।

সুরেন্দ্র তাকিয়ে রইল শান্তির দিকে। একটু আগে উপুড় হয়েছিল এখন সে চিত হয়েছে, একটা হাত চাপা পড়েছে পিঠের তলায়, মুখটা মাটির দিকে ফেরানো। ভরা যৌবনের এক নারী এতগুলো লোকের চোখের সামনে পড়ে আছে মাটিতে, ভিজে কাপড় সেঁটে গেছে গায়ের সঙ্গে, আঁচলটা অজগর সাপের মতন গোল হয়ে কুণ্ডলি পাকিয়ে আছে পায়ের কাছে, কোমরের কষিও আলগা। চোখ দুটো খোলা, কিন্তু সে চোখে কোনও ছষ্টি নেই।

বাঁজা মেয়েদের স্বাস্থ্য ভালো হয়। সুরেন্দ্র এ-পর্যন্ত দু-গাঁয়ের মধ্যে শান্তির মতন সুন্দরী আর দেখেনি।

সুবল বলল, একসঙ্গে দু-দুটো দুষ্ট আত্মা এসে বসেছিল ওই জামগাছে। মদ্দটা এখনও বসে আছে ওখানে, আমি গাছটার চারপাশে গণ্ডি কেটে দিয়িছি, এদিকে আসতে পারবে না। পেত্নীটা সেঁধিয়েছে বউয়ের শরীরে। একসঙ্গে ছাড়া দুটোতে যাবে না।

সুরেন্দ্র এগিয়ে গেল জামগাছটার দিকে। সুবল চেঁচিয়ে বলল, ওদিকে যেওনি, গায়ে বাতাস লেগে যাবে, তোমার গায়ে বাতাস লেগে যাবে বলে দিচ্ছি। মদ্দটা এখনও বসে আছে। দ্যাখো না, হাওয়া-বাতাস নেই, তবু ডগার ডালটা আপনাআপনি নড়ছে।

ফ্যাকাসে জ্যোৎস্নায় সত্যিই মনে হয়, জামগাছের ডগার ডালটা দুলছে একটু-একটু।

ভিড়ের মধ্য থেকে কে একজন বলল, ও যেতে চায় যাক না।

সুরেন্দ্র নীচু হয়ে তার খাকি প্যান্ট গুটিয়ে ফেলল হাঁটু পর্যন্ত, তারপর তরতর করে উঠে গেল জামগাছে। সবচেয়ে মোটা ডালটার ওপর এক পায়ে দাঁড়িয়ে হেঁড়ে গলায় চেঁচিয়ে উঠল, কোথায় সে?

সুবল বলল, আরও ওপরে, একেবারে ডগায়। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, হাসছে ব্যাটা। আর-একটু ওপরে ওঠো, টেরটি পাবে।

সুরেন্দ্র বুঝল ওর চালাকিটা। জামগাছের ডাল তেমন মজবুত নয়। তাদের বাড়িতে একটা জামকাঠের পিঁড়ি ছিল, কথা নেই বার্তা নেই একদিন সেটা মাঝখান থেকে ফেটে দু-ভাগ হয়ে গেল। এখন সে তার এতবড় শরীরটা নিয়ে যদি আরও ওপর ওঠে, তাহলে হঠাৎ ভেঙে পড়ে যাবে। আর না উঠলে ওরা বলবে, সে হেরে গেল!

কোমরের বেল্টটা খুলে সে একটা গোল ফাঁস করল। তারপর পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে ডিঙি মেরে যতটা লম্বা হওয়া সম্ভব লম্বা হয়ে, সে বেল্টের ফাঁস দিয়ে ধরার চেষ্টা করল ডগার ডালটা। একবার ধরতে পেরেই সে মট্ করে ডালটা ভেঙে সেটা হাতে নিয়ে নেমে এল নীচে।

গাছের ডালটা সে সুবলের নাকের কাছে এগিয়ে দিয়ে বলল, এর মধ্যে তোমার মদ্দা ভূতটা বসে আছে।

সুবল ভয় পেয়ে মাথাটা পিছিয়ে নিল খানিকটা।

শান্তি এর মধ্যে উঠে বসেছে আর ফিকফিক করে হাসছে। সুরেন্দ্রর দিকে হাতছানি দিয়ে বলল, এই শোনো, শোনো।

সবাই চেঁচিয়ে উঠল, ডেকেছে, ডেকেছে, পেত্নীটা ওকে ডেকেছে।

সুরেন্দ্র খানিকটা হকচকিয়ে গেল। ঠিক যেন স্বাভাবিক মানুষের মতন গলা। তবে কি বউটা এতক্ষণ নকল যাত্রা করছিল? সুবলের হাতে এত মার খেয়েও?

পাকানো আঁচলটা তুলে নিয়ে শান্তি গায়ে জড়িয়ে ভদ্র হল। সেই রকমই ফিকফিকিয়ে হেসে হাতছানি দিয়ে সুরেন্দ্রকে বলতে লাগল, এই শোনো, শোনো, শোনো না—

সুরেন্দ্র এগিয়ে বলল, কী?

—শোনো। আরো কাছে এসো—

আর একটু এগিয়ে সুরেন্দ্র বলল, কী?

শান্তি মাটির ওপর চাপড় মেরে বলল, বসো, এখানে এসে বসো। লজ্জা কি? আমাকেও তোমার লজ্জা? তুমি যে আমার নাগর। বসো—

সুরেন্দ্র মাটিতে বসল।

শান্তি বলল, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। কানে-কানে বলব—

সুরেন্দ্র বলল, ওইখান থেকেই বলো—

পা ঘষটে-ঘষটে শান্তি নিজেই চলে এল সুরেন্দ্রর কোলের কাছে। তার মাথাটা ধরে টানল। সুরেন্দ্র খুবই অস্বস্তিতে পড়েছে। শান্তি তার কানে-কানে কী যেন বলতে চায়।

সুরেন্দ্রর কানের কাছে মুখ ঠেকিয়ে শান্তি ফিসফিস করে কী যেন বলতে লাগল। সুরেন্দ্র বুঝতে পারল না তার একটাও বর্ণ। এক সময় সে উঃ বলে চেঁচিয়ে উঠল। শান্তি তার কান কামড়ে ধরেছে। সুরেন্দ্র ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল শান্তিকে। তার কান দিয়ে দরদর করে রক্ত গড়াচ্ছে।

জনতা হেসে উঠল হো-হো করে। সুরেন্দ্রর দুর্দশা দেখে তারা দারুণ মজা পেয়েছে। সেইদিন থেকে তার নাম হয়ে গেল, কানকাটা সুরেন।

কিন্তু জনতার হাসিও থেমে গেল শান্তির অকস্মাৎ হাসিতে। শান্তি হি-হি-হি-হি করে হেসে উঠল, তার ঠোঁটের পাশে রক্ত। তারপর একটা অদ্ভুত বিকট গলা বার করে বলল, এই সুরেন্দ্র, আমাকে বিয়ে করবি? আয় না! বিয়ে করবি? তোতে আমাতে পাটখেতে লুকিয়ে থাকব। বিয়ে

করবি? এই সুরেন্দ্র! আয় না!

সবাই জানে, সর্বানন্দের ছেলের বউ শান্তি বড় লাজুক মেয়ে। পাঁচজনের সামনে সে কক্ষনো রা কাড়ে না। বিশেষত শ্বশুরের সামনে সে কোনওদিনও এরকমভাবে খারাপ কথা বলবে না। তা ছাড়া এ তো শান্তির গলা নয়, তার ভেতর থেকে অন্য কেউ কথা বলছে।

শান্তি আবার হাসতে লাগল হি-হি-হি-হি করে। মানুষে সেরকম হাসতে পারে না। ঠিক যেন দুটো ছুরিতে ঠোকাঠুকি হচ্ছে। শুনলেই গা-ছমছম করে। অনেকেই ভয় পেয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল।

সুরেন্দ্র রুমাল দিয়ে তার কানটা চেপে ধরে আছে। রক্তে ভিজে গেছে তার ঘাড়ের কাছের জামা।

শান্তি এবার সুরেন্দ্রর বুকের ওপর হিংস্রভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলল, খেলবি? আমার সঙ্গে খেলবি? এই সুরেন্দ্র, আয় না, খেলবি? হি-হি-হি-হি।

স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তোলা বিষয়ক বিধিনিষেধ ভুলে গেল সুরেন্দ্র। সে নিজেই এবার শান্তির চুলের মুঠি ধরে মাথাটা সরিয়ে নিয়ে দু-গালে সপাটে দুটো থাপ্পড় কষাল। সুরেন্দ্রর মাথায় রাগ চড়ে গেছে।

চড় খেয়ে শান্তি আবার নেতিয়ে পড়ল মাটিতে।

যারা ভয় পেয়ে পালিয়ে গিয়েছিল, তাদের মধ্যে আবার কয়েকজন ফিরে এসেছে। কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ। সুরেন্দ্র রক্ত মুছছে কান থেকে।

হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে থেকে নিবারণ বলল, এই সুরেন্দ্র, এবার টাকা বার কর, টাকা দে।

আর পাঁচজন বলল, হ্যাঁ, এবার টাকা দিতে হবে। সর্বানন্দদা, ওকে ছেড়ো না, ধরো।

সুরেন্দ্র জিগ্যেস করল, কীসের টাকা?

—তুই যে বলেছিলি, চোখের সামনে ভূত দেখলে একশো টাকা দিবি? দে শালা সেই টাকা। এইমাত্তর কী দেখলি?

সুরেন্দ্র বলল, কী দেখলাম?

—এখন ন্যাকা সাজছিস? সবাই সাক্ষী দেবে, তুই পঞ্চাশবার বলেছিস নিজের চোখে ভূত দেখলে একশো টাকা দিবি। এইমাত্তর দেখলি না?

সুরেন্দ্র বলল, না দেখিনি।

—মিথ্যে কথা। টাকা মারবার মতলব। দে টাকা। সর্বানন্দদা, ওকে ছেড়ো না, ধরো, আজ আর ছাড়ান-ছুড়িন নেই। বড় টাকার গরমাই দেখায়—

অনেকে মিলে গোল হয়ে এগিয়ে আসছে সুরেন্দ্রর দিকে। ওরা সুরেন্দ্রকে একসঙ্গে চেপে ধরবে। রোগা, খেতে-না-পাওয়া, ভিতু নিবারণের উৎসাহই যেন সবচেয়ে বেশি। সে ওই টাকার একটা আধলাও পাবে না, তবু তো সুরেন হারামজাদার দেমাক ঠান্ডা করা যাবে। সুরেন্দ্রর নিজের দলের ছেলে নিতাই পর্যন্ত এই কাণ্ড দেখে পেছনে লুকিয়েছে, সে আর মুখ খুলছে না। শান্তি বউদির ব্যাপার-স্যাপার দেখে তার বুক কাঁপছে।

সুরেন্দ্র সামনের দুজনকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে পা ফাঁক করে দাঁড়াল, তারপর জামার তলায় কোমর থেকে একটা মস্ত বড় ভোজালি টেনে বার করে বলল, খবরদার, আমার সঙ্গে এটেলবাজি করতে এসো না, তাহলে আমি রক্তগঙ্গা বইয়ে দেব।

এবার দৌড়ে পালাতে গিয়ে এ-ওর ঘাড়ের ওপর উলটে পড়ল। সুরেন্দ্রটা একটা খুনে, ঠিকই বোঝা গিয়েছিল আগে।

সুরেন্দ্র হাওয়ায় ভোজালি ঘুরিয়ে বলল, আমি এক কথার মানুষ। একশো টাকা দেব বলিছি, আসল মাল পেলে ঠিকই দেব। তা বলে আমাকে বাজে মাল, ভুষি মাল গছাবে? একটা মৃগী রুগি,

তাই দেখিয়ে টাকা চাইছ? অ্যাঁ।

ভাঙা জামগাছের ডালটা মাটিতে তিনবার আছড়ে বলল, এর মধ্যে মদ্দা ভূত আছে? কোথায় সে শালা? নাকি আমাকে দেখেই পালিয়েছে।

ঝোলা থেকে খালি বোতলটা বার করে সুবলের সামনে ঠকাস করে রেখে সে বলল, সাপুড়েরা যেমন সাপ ধরে, সেইরকম একটা ভূত ধরে দাও দিখি আমাকে। তুমি তো ভূত ধরে বেড়াও। এই বোতলটার ছিপি আটকে দেওয়ার পর যদি আপনা আপনি লাফায়, তবে আমি এক্ষুনি তোমাকে একশো টাকা দেব। এক্ষুনি! এই দেখো টাকা।

সুরেন্দ্র পকেট থেকে একগোছা এক টাকার নোট বার করে দেখাল।

কিছু না পেরে সুবল বলল, যা-যা।

মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে সুরেন্দ্র ভোজালিটা পাশে নামিয়ে রাখল। তারপর শান্তির নেতিয়ে পড়া একটা হাত তুলে নাড়ি দেখতে লাগল।

সর্বানন্দ এতক্ষণে খানিকটা সাহস সঞ্চয় করে বলল, এই তুমি আমার বউয়ের গায়ে হাত ছুঁইয়ো না।

সুরেন্দ্র তাকে এক ধমক দিয়ে বলল, চোপ। একটু আগে তোমার ছেলের বউ আমার কানে-কানে কী বলেছে জানো? যদি সবার সামনে বলে দিই, তোমার মুখে চুনকালি পড়বে।

সর্বানন্দ চুপসে গেল সঙ্গে-সঙ্গে।

ওঝার ছেলে ওঝা সুবল কিন্তু এত সহজে তার দাবি ছাড়তে চায় না। দর্শকদের মধ্যে যে ক-জন দূর থেকে তখনও উঁকি-ঝুঁকি মারছিল তাদের উদ্দেশে সে বলল, তোমরা দেখলে, তোমরা পাঁচজনা দেখলে, ও আমার কেস কেড়ে নিচ্ছে। এ-বাড়ি থেকে আগে আমার ডাক পড়েছিল—

সুরেন্দ্র বলল, এতক্ষণ ধরে তো ভ্যাজর-ভ্যাজর করলে, ধরতে পেরেছ পেত্নীটাকে?

সুবল বলল, তুমি সরো। এবার আমি ভূতডামরতন্ত্র শুরু করব। বেটি ধরা না পড়ে যাবে কোথায়?

সুরেন্দ্র বলল, রাখো তোমার ভূতডামরতন্ত্র! তুমি তোড়লতন্ত্রের নাম শুনছ? সে হল গে সব তন্ত্রের বাবা। এইবার দ্যাখো, আমি সেই তোড়লতন্ত্র শুরু করেছি!

সুরেন্দ্র তার ঝোলা থেকে টিনের বাক্সটা বার করে খুলল। তার মধ্যে ইঞ্জেকশানের সিরিঞ্জ আর টুকিটাকি ওষুধ। একটা অ্যাম্পিউল ভেঙে সবটা ওষুধ ভরে নিল সিরিঞ্জে। তারপর ডগাটা উঁচু করে হাওয়া বার করল।

সবাই শঙ্কিত বিস্ময়ে চুপ।

সুরেন্দ্র সর্বানন্দকে বলল, ভয় পেয়ো না, আমার সুঁই দেওয়ার অভ্যাস আছে। ফাদার পেরেরার নাম শুনেছো? মস্ত বড় ডাক্তার। আমাকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে নিয়ে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলেন। খাইয়ে পরিয়ে আমাকে মানুষ করেছেন। তেনার কাছ থেকে সুঁই দেওয়া শিখেছি।

প্যাট করে সিরিঞ্জের সুঁচটা সে ফুটিয়ে দিল শান্তির ডান বাহুতে। পাকা কম্পাউন্ডারের মতন তার ভঙ্গি। শান্তি একটুও শব্দ করল না। সবটুকু ঢেলে দিয়ে সুঁচ বার করে সুরেন্দ্র সর্বানন্দকে বলল, তোমার ছেলের বউয়ের হিস্টিরি অসুখ হয়েছে। এখন দশ-বারো ঘণ্টা ঘুমোবে। তারপর জেগে উঠলে ভালো করে খেতে দিও। সেরে যাবে। যাও এবার ঘরে নিয়ে শুইয়ে দাওগে। উঃ আমার কানটা একেবারে ফালা-ফালা করে দিয়েছে।

সর্বানন্দ বলল, বউয়ের গায়ে এখন এত শক্তি যে পাঁচজন মিলেও ওকে আগে ধরে রাখতে পারেনি। ঘরে নিয়ে যাব কী করে?

সুরেন্দ্র বলল, হুঁঃ?

তারপর দক্ষযজ্ঞের শিবের মতন সে শান্তিকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল মাটি থেকে।

সর্বানন্দকে বলল, কোন ঘরে শোয় দেখিয়ে দাও, বিছানায় রেখে আসছি।

বারান্দা পেরিয়ে দরজা দিয়ে ঢোকার মুখে সর্বানন্দর দিকে তীব্র ঘৃণার চোখে তাকাল। তারপর নীচু গলায় বলল, পোয়াতী বউটাকে বুঝি এইভাবে মেরে ফেলতে চাও! ছিঃ, তোমরা না ভদ্রলোক!

তিনদিন ধরে বৃষ্টি আর বৃষ্টি। বিশ্বাসই হয় না যে এটা শীতকাল। ঠিক যেন বর্ষার ধারা।

সারা গায়ে জল-কাদা মেখে সন্ধের সময় টলতে-টলতে বাড়ি ফিরছে নিবারণ। নেশাভাঙ কিছু করেনি, তবু তার পায়ে জোর নেই। শরীর যেন আর বয় না। যে-কোনও সময়, যে-কোনও জায়গায় পড়ে যাবে। তার বুকে সারা বিশ্বের হতাশা।

মহাজনের কাছ থেকে কর্জ নিয়ে নিবারণ তার বন্ধকী জমিতে ফুলকপির চারা লাগিয়েছিল মাত্র পাঁচ দিন আগে। বৃষ্টিতে নষ্ট হয়ে গেল। এই সময় এত বৃষ্টির কথা সে স্বপ্নেও ভাবেনি। এ যেন ঈশ্বরের অভিশাপ। আজ আবার পাশের জমির আল ভেঙে গিয়ে জল ঢুকে পড়ল। কপির চারাগুলো সব পচে যাবে। কিছু-কিছু চারা তুলে ফেলার চেষ্টা করেছিল নিবারণ, কিন্তু অর্ধেকের বেশিই বাঁচাতে পারেনি। মহাজনের সঙ্গে শর্ত ছিল পঞ্চাশ-পঞ্চাশ।

সে তো গেল ভবিষ্যতের কথা, কিন্তু আজ। কাল দুপুর থেকে মাটি কাটা বন্ধ হয়ে গেল। এই বৃষ্টির মধ্যে মাটি কেটে কোনও লাভ নেই। অথচ আজই ছিল নিবারণের পালা। আজ কাজ থাকলে সে নিজের খোরাকির ভাত আর নগদ সাড়ে চারটে টাকা পেত। এখন মনে হচ্ছে সাড়ে চার টাকায় কত কিছু কেনা যায়। মাত্র সাড়ে চার টাকায় এক পৃথিবী ভরতি সুখ।

রহমান সাহেব বলেছেন, আজ যারা কাজ পেল না, কাল যদি বৃষ্টি থামে, তবে তারাই কাজ পাবে আগে। আর কালও যদি বৃষ্টি থাকে? তাহলে পরশু! মোট কথা নিবারণের কাজ বাঁধা। এখন কাল বা পরশু পর্যন্ত নিবারণকে পেটে কিল মেরে বেঁচে থাকতে হবে।

নিবারণ ক্রুদ্ধ দু-চোখে আকাশের দিকে তাকাল। মেঘও মানুষের এত শত্রুতা করে? ছোট-ছোট ফুলকপির চারাগুলো দেখলেও চোখ জুড়িয়ে যায়, ঠিক যেন মায়ের কোলে মুখ লুকোনো শিশু, আকাশের দেবতাদেরও একটু মায়া হল না তাদের মেরে ফেলতে? ফুলকপির চারাগুলো কাঁদছিল ডুকরে, নিবারণ শুনেছে।

কাদার মধ্যে পা হড়কে যেতেই নিবারণের কোমরের কষি একটু আলগা হয়ে গেল, আর অমনি তার ট্যাঁক থেকে টুপুস করে খসে পড়ল একটা ছোট্ট কাচের শিশি। তার মধ্যে রয়েছে কালো-হলদে রঙের লম্বা-লম্বা ছখানা ওষুধ। অন্ধকারে কাদার মধ্যে শিশিটা আবার গেল কোথায়? নিবারণ রোগা-রোগা আঙুল দিয়ে সেটাকে খুঁজতে লাগল। বিরক্তিতে তার গা জ্বলে যাচ্ছে। তার কিছুই ভালো লাগছে না।

পাওয়া গেল শিশিটা। ভেতরে কাদা ঢোকেনি তো? না, ওপরে একটা রবারের ছিপি আছে, হাওয়াও ঢুকতে পারে না। শিশিটা খুঁজে পেয়ে আনন্দ হওয়ার বদলে নিবারণের ইচ্ছে হল সেটা ছুড়ে ফেলে দেয়।

সোনারং-এর হেলথ সেন্টারের ডাক্তারবাবুর খুব মাছ ধরার শখ। এক-এক রোববার এক-এক পুকুরে মাছ ধরতে যান। গত রোববার এসেছিলেন চৌধুরীবাবুদের বাড়ির পেছনের মজা দিঘিতে। পান্তি আর গেনু ঘুরঘুর করেছে সেখানে। মাছ ধরারই ঝোঁক ডাক্তারবাবুর, মাছ খাওয়ার লোভ নেই। একটার বেশি মাছ ধরা পড়লে বাকিগুলো অন্যদের বিলিয়ে দেন। সবাই জানে। সেদিন ডাক্তারবাবুর ছিপে একটাও মাছ ধরা পড়েনি অবশ্য, কিন্তু তিনি একবার এসেছিলেন নিবারণের বাড়িতে। অল্পবয়সি ডাক্তারবাবুটি ছোট ছেলেমেয়ের সঙ্গে গল্প করেন খুব। পান্তি আর গেনুই টেনে এনেছিল ডাক্তারবাবুকে। ওরা ওদের দাদুকে ভালোবাসে। ক'দিন ধরে পবন খুবই অসুস্থ, কথা বলার

ক্ষমতাও প্রায় নেই।

তা ডাক্তারবাবু পবনকে দেখে অনেক লম্বা-লম্বা কথা বলে গিয়েছিলেন। এটা খাওয়াতে হবে, সেটা খাওয়াতে হবে। নিবারণ সে সবকথা এক কান দিয়ে শুনে আর-এক কান দিয়ে বার করে দিয়েছে। তার বাপ বুড়ো হয়েছে, এবার মরবে। তা নিয়ে আর অ্যাদিখ্যেতা করার কি আছে? শীতের শেষটাতেই পুরোনো রুগিরা টপাটপ মরে। গতবারেও এই সময়ে পবন শয্যা নিয়েছিল। সেবার খুব আশা করেছিল নিবারণ যে বাবা এবারেই যাবে। শুধু-শুধু বেঁচে থেকে তো পৃথিবীর একরত্তি উপকারে আসে না। শুমা, বুড়ো ক'দিন বাদেই হাত পা ঝেড়ে আবার উঠে বসল। অবশ্য এবার আর পার পাবে না।

আজ বৃষ্টির মধ্যেও খালধারে ঝাড়া দু-ঘণ্টা নিবারণ বসেছিল গাছতলায়। যদি হঠাৎ বৃষ্টি থামে, যদি মাটিকাটা শুরু হয়। সে সময় ছাতা মাথায় দিয়ে, বাঁধের ওপর দিয়ে কলে যাচ্ছিলেন ডাক্তারবাবু। নিবারণকে দেখে থামলেন। ডাক্তারবাবুটি আবার সবার সঙ্গে আপনি-আজ্ঞে করে কথা বলেন। কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করে তিনি নিবারণকে জিগ্যেস করলেন, আপনার বাবা কেমন আছেন?

এসব জায়গায় শুধু-শুধু কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, তাই নিবারণ বলেছিল, ভালো।

—আমার ওখানে একবার আসবেন। আমি কয়েকটা ওষুধ লিখে দেবো, আপনার বাবাকে একটা টনিক খাওয়ানো দরকার।

নিবারণ চুপ করে ছিল।

ডাক্তারবাবু আবার বলেছিলেন, আজই আসতে পারেন। এই ধরুন ঘণ্টাখানেক বাদে। আমি তার মধ্যেই ফিরে আসবো।

সেই সময়, যেন নিবারণ নয়, তার ভেতর থেকে অন্য কেউ বলে উঠেছিল, ডাক্তারবাবু, আমরা গরিব, ভগবান আমাদের দু-বেলা পেটের ভাতও দেননি, আমরা কি ওইসব দামি ওষুধ খেতে পারি?

ডাক্তারবাবুটির জোড়া ভুরু। তিনি তার বড়-বড় কালো দুটি চোখ নিবারণের মুখের ওপর স্থিরভাবে রেখে কয়েক মুহূর্ত চুপ করেছিলেন। তারপর নিজের হাতের মস্তবড় ব্যাগটা খুলে এই ওষুধের শিশিটা নিবারণকে দিয়ে বললেন, এটা দিনে দুটো করে খাওয়াবেন। ভাত খাওয়ার পর। আজ না হোক, কাল-পরশু আমার ওখানে একবার আসুন, দেখি আমি কী ব্যবস্থা করতে পারি।

নিবারণ কোনও কথা বলছে না দেখে তিনি একটুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বললেন, কখনও আশা ছাড়তে নেই।

তখনও নিবারণের আনন্দ হয়নি। রাগই হয়েছিল। এক-এক সময় মানুষের দয়া দেখলেও রাগ হয়। ডাক্তারবাবু যদি আর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে বড়-বড় উপদেশের কথা বলতেন, তাহলে নিশ্চয়ই নিবারণ মনে মনে তাঁকে বাপ-মা তুলে গাল দিত। সহ্য হয় না, কিছুই সহ্য হয় না।

অন্ধকারে কাদার মধ্যে দাঁড়িয়ে ওষুধের শিশিটা হাতে নিয়ে নিবারণের মুখে একটা হাসি ফুটে উঠল, যা না ক্রোধ, না ঘৃণা, না উপহাস, না করুণার। সে হাসিটা অন্যরকম, বড় দুর্বোধ্য। ডাক্তারটি বললেন, ওষুধটা দু-বেলা ভাত খাওয়ার পর খাওয়াবে। ডাক্তারটা বোকা, কিছুই শেখেনি। এখন নিবারণ যদি ওষুধটা ছুড়ে ফেলে দেয়, তাহলে কি তার পাপ হবে?

ওষুধটা ফেলল না নিবারণ। যাই হোক দামি জিনিস তো। সে আবার হেঁটে চলল। মাঝারি ধারায় অবিরাম বৃষ্টি পড়ে যাচ্ছে। এই সময় পৃথিবীতে নিবারণ ছাড়া কেউ নেই। সে তার বাড়ির দিকে যাচ্ছে। এখন পৃথিবীতে তার সবচেয়ে ঘৃণার জায়গা তার নিজের বাড়ি, তবু সে সেখানেই যাবে।

আর বেশি দূর নেই। রাস্তার মাঝখানেই খানিকটা জল জমে আছে, সেইখানে নিবারণ তার

পায়ের কাদা ধুয়ে নিল। তারপর সামনে তাকাতেই আঁতকে উঠল সে।

তার বাড়ির সামনে বাতাবিলেবু গাছটায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কে? বৃষ্টির মধ্যে ভাঙা-ভাঙা অন্ধকারে দেখা যায় এক প্রেত। নিবারণের প্রাণটা যেন এসে আটকে গেল গলার কাছে। প্রথমেই তার মনে হল, পিছন ফিরে দৌড় দেয়। প্রেতের বুকের পাঁজরার সবক'টা হাড় স্পষ্ট, কঙ্কালসার একটা হাত সামনে বাড়ানো, নিবারণ মুখ দিয়ে একটা আওয়াজ করল, আঁ-আঁ।

প্রেতমূর্তি তখন নাকি ভাঙা গলায় বলল, কে নিবারণ এলি?

পেছন ফিরে পালাতে গিয়েও থেমে গিয়ে নিবারণ বলল, ধুর শালা।

সকালবেলাও নিবারণ যাকে দেখে গেছে বিছানার সঙ্গে একেবারে লাগা—ওঠার ক্ষমতা নেই, কথা বলার শক্তি নেই, সে যে এই বৃষ্টির মধ্যে রাত্তিরে উঠে এসে বাইরে এসে দাঁড়াবে—একথা তো নিবারণ কল্পনাই করেনি। এ যে কইমাছের মতন কড়া জান। হারামির বাচ্চা, শালা!

নিবারণ এক ধমক দিয়ে বলল, তুমি আবার বাইরে এয়েছ কেন?

পবন কথা বলতে গিয়ে হাঁপাচ্ছে। তার গলাও খোনা-খোনা মনে হয়। সে বলল, তুই এখনও ফিরিসনি। যা বৃষ্টিবাদলা, আমি চিন্তা করছিলাম।

নিবারণ দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এ যে স্পষ্ট কথা বলে। তাহলে কি এ যাত্রাতেও বেঁচে গেল? হা ভগবান, আরও কতদিন এ বোঝা বইতে হবে?

পবন জিগ্যেস করল, কিছু এনেছিস!

নিবারণ বলল, কী?

চাল আটা কিছু আনিসনি?

—কোতা থেকে আনব? তোমার বাপের কাছ ঠেঙে? আজ মাটি কাটার কাজ হয়নি। আজ আমার যেটুকু সব্বোনাশ বাকি ছিল, তাও হয়ে গেছে।

—কিছুই আনিসনি?

ট্যাঁক থেকে শিশিটা বার করে নিবারণ বলল, ওষুধ এনেছি। ডাক্তারবাবু বিনিপয়সায় ওষুধ দিলেন তোমার জন্য। নাতি-নাতনী দুটোকে খুব জ্বপিয়েছ তো, তারা ডাক্তারবাবুকে ধরেছিল।

পবন ওষুধের ব্যাপারটার কোনও গুরুত্বই না দিয়ে বলল, চাল-আটা কিছুই আনিসনি? আজ সারাদিন বাড়িতে আখা ধরেনি।

সেই মুহূর্তে নিবারণ তার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ঠিক করে ফেলল। সে দৃঢ় গলায় বলল, আমাদের আর এখানে কোনও আশা নেই। কাল চলে যাব। টাউনে গিয়ে রেল ইস্টেশনে ভিক্ষে করে খাব।

পবন খুব উৎসাহের সঙ্গে বলল, তাই চল।

—তুমি যেতে পারবে?

—কেন পারব না? একটু ধরে নিয়ে যাবি।

—যেতে পারো ভালো, না হলে তুমি বাড়ি পাহারা দেবে।

ছেলেমেয়ে দুটো ঘুমিয়ে পড়েছে, বউ শুয়ে-শুয়ে জেগে আছে। চোখ দুটি বিবর্ণ। সারা শরীরের মধ্যে শুধু পেট ছাড়া আর সব জায়গাতেই স্বাস্থ্যহীনতা প্রকট।

ঘরে ঢুকে নিবারণ গম্ভীরভাবে বলল, আজ কিছু আনতে পারিনি।

বউয়ের মুখে কিছু ভাবান্তর দেখা গেল না।

—ঘরে কিছু আছে?

বউ দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, না।

নিবারণ অসম্ভব জোরে চিৎকার করে বলল, নেই কেন? আমি এখন খাব কি? কাল রাত্তিরে যে খানিকটা আটা বেঁচেছিল।

বউ একটুও উত্তেজিত হল না। সেই রকমই মুখ ফিরিয়ে থেকে বলল, বিকেল পর্যন্ত বাঁচিয়ে রেখেছিলাম, তারপর পান্তি আর গেনু জল দিয়ে গুলে সেই আটা খেয়ে ফেলেছে।

ছেঁড়া কাঁথাটা গায়ে দিয়ে পবন শুয়ে পড়েছিল, সে হঠাৎ উঠে বসে ছেলের পক্ষ নিয়ে আলাদা একটা দল পাকাবার চেষ্টা করল। কুটিল চোখে সে একবার তার পুত্রবধূ, একবার তার ছেলের দিকে তাকিয়ে বলল, দ্যাখ না, আমাকে পর্যন্ত একটু দেয়নি। নিজেরাই সব খেল। আমি কতবার বললাম, ও বউ, আমাকে একটু দে। আজ আমার জ্বর ছেড়েচে, আজ আমার খিদে বেশি হবে, অন্তত আমাকে ছটাক্ খানেক দে। কিংবা আমাকে না দিস, ছেলেটার জন্য একটু রাখ, সারাদিন খেটেখুটে আসবে—সে-কথা গ্রাহ্যই করল না। নিজেরাই গাণ্ডেপিণ্ডে খেলে—

বউ এবার দেওয়াল থেকে চোখ ফেরাল। শ্বশুরের দিকে এমনভাবে তাকাল যেন সেই দৃষ্টিতেই তাকে ভস্ম করে দেবে। কনুইতে ভর দিয়ে আধা-বসা হয়ে কণ্ঠে বিষ ঝরিয়ে সে বলল, খালভরা, তোমার মরণ নেই? এ-কথা বলার আগে তোমার জিভ খসে গেল না? ছেলেমেয়ে দুটো খেয়েছে, আমি নিজে একটা দানাও ছুঁয়েছি? আমার পেটে একটা শত্তুর তবু আমি কিছু খাইনি। আর তোমার নোলাটাই বড় হল? ভারী যে ছেলের জন্য দরদ। নিজে তিনবার রান্নাঘরে গিয়ে ঘুটঘাট করে আসোনি? ছেলের জন্য তুমি রাখতে? সব জানা আছে আমার। অলপ্পেয়ে, তুমি মরতে পারো না? মরলে আমার হাড় জুড়োয়।

পবন ছেলের দিকে চেয়ে বলল, দেখলি? দেখলি?

নিবারণ কোনও পক্ষই নিল না। তার ইচ্ছে হল, ঘুমন্ত ছেলেমেয়ে দুটোকে জোরে-জোরে লাথি কষায়, বাপকে লাথি কষায়, বউকেও। খাবার দরকার ছিল তার একার। কাল যদি ভগবান করেন, বৃষ্টি বন্ধ হয়, তাহলে না খেয়ে ধুঁকতে-ধুঁকতে সে মাটি কাটাতে যাবে কী করে? সে নিজে না বাঁচলে আর কেউ বাঁচবে? সে-কথা এরা কেউ বোঝে না। সকলেই রাক্ষুসে খিদে নিয়ে হাঁ করে আছে।

কালও যদি বৃষ্টি না থামে, তাহলে যেতেই হবে টাউনে। রেল ইস্টিশানে মাথা গোঁজার জায়গা জুটে যাবে। টাউনে কেউ না খেয়ে মরে না। টাউনের লোকদের ওপর ভগবানের অশেষ দয়া।

বউ তখনও গজগজ করে যাচ্ছিল, নিবারণ প্রচণ্ড এক ধমক দিয়ে বলল, চোপ।

দরজার বাইরে থেকে জল গড়িয়ে আসে ভেতরে, তাই সেই জল আটকাবার জন্য দরজার কাছে একটা ন্যাতা পেতে রাখা আছে। সেই ভেজা ন্যাতাটা তুলে নিয়ে নিবারণ হাত পায়ের কাদা মুছল। এখন এই অন্ধকারের মধ্যে তার পুকুরে যাওয়ার ইচ্ছে নেই। ঢকঢক করে একঘটি জল খেয়ে সে শুয়ে পড়ল।

পাশাপাশি একখানা বড় ঘর আর ছোট ঘর। মাঝখানের দরজাটা আজকাল খোলাই থাকে। ছোট ঘরের জানালাটা নিশ্চয়ই খোলা রয়েছে, গুঁড়ো-গুঁড়ো বৃষ্টির ছাট আসছে এ-ঘর পর্যন্ত। নিবারণ ভাবল, তার বাপ ভিজছে। ভিজুক। আজও তো চলাফেরার ক্ষমতা রয়েছে, নিজে উঠে বন্ধ করতে পারে না? নিবারণের গায়ে যদি বেশি ছাট লাগে, সে পা দিয়ে ঠেলে মাঝের দরজাটা বন্ধ করে দেবে।

কোনও শব্দ নেই, শুধু টিনের চালে কাকের পায়ের আওয়াজের মতন বৃষ্টি। ছেলেমেয়ে দুটি অঘোরে ঘুমোচ্ছে, আর জাগেনি। তারপর ঘুমোয় গর্ভিণী, কিন্তু খালি পেট নিয়ে নিবারণের কিছুতেই ঘুম আসে না। আর এক অসুস্থ বৃদ্ধের তো সহজে ঘুম আসবার কথা নয়।

খানিকবাদে পবন কোঁ-কোঁ শব্দ করে ওঠে।

নিবারণ জিগ্যেস করল, কী হল আবার?

পবন শ্বাস টেনে বলে কিছু না! দু-দিন ভাত খাইনে, বড় খিদে পায়।

নিবারণ ওষুধের শিশিটা তার দিকে ছুড়ে দিয়ে বলে, এই নাও, খাও।

পবন হাতড়ে-হাতড়ে ওষুধের শিশিটা খুঁজে নেয়। তারপর সত্যি-সত্যি সবক'টা ক্যাপসুলই মুখে পুরে চিবোতে থাকে। খচরমচর শব্দ হয়।

একটু পরে সে আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, উফ! কতদিন তামাক খাই না! বউয়ের কাছে একটু আগুন চাইলাম, দিল না।

—তুমি চুপ করবে?

বুড়ো চুপ করে যায়, তবু মুখ থেকে চাপা কোঁ-কোঁ শব্দ বেরোয় নিশ্বাসের সঙ্গে।

তারপর আরও অনেকক্ষণ বাদে, তখনও নিবারণ ঘুমোয়নি, জানলা দিয়ে একফালি আলো ঢুকে দেওয়ালের গায়ে দু-এক পলক কাঁপে, আবার মিলিয়ে যায়। কিছু দূরে শোনা যায় ক্ষীণ রুনুঝুনু শব্দ।

নিবারণ কান খাড়া করে থাকে। ওরা আসছে। আশ্চর্য, এই বৃষ্টিবাদলার মধ্যেও বেরিয়েছে ওরা? আছে, তাই ওরা এইসব আমোদ-আহ্লাদ করতে পারে। ওরা নিবারণের মতন লোকদের আরও কষ্ট দেবার জন্য আসে। কানকাটা সুরেন্দ্রটা মরে না কেন? কত লোক বেঘোরে মরে, ওর মরণ হয় না?

ওরা পাঁচলার মোড়ের গাছতলায় এসে পৌঁছে গেছে মনে হয়। ঘুঙুরের শব্দের সঙ্গে ভেসে আসে টুকরো টুকরো গান।

ভূতের নাতি ভূতের পুতি...বুড়ো হাবড়া ছোঁড়াছুঁড়ি।

যেমন-তেমন ভূত পেলে ভাই...

ভূত কিনিতে, ও ভাই ভূত কিনিতে...

শ-টাকা শ-টাকা...

এক-এক ভূত এক-একশো টাকা...

পবন দুবার কেশে ওঠে। বোঝা যায় সে-ও জেগে আছে। নিবারণ জিগ্যেস করে, বাবা ও বাবা? তোমার কষ্ট হচ্ছে?

পবন বলে, না।

—বাবা, তুমি ভূত দেখেছ কখনও, সত্যি করে কও তো।

—হ্যাঁ, দেখিছি। অনেকবার দেখিছি।

—কারা মলে ভূত হয়? সকলেই মলে ভূত হয়?

—যারা অপঘাতে মরে, মরার পরেও যাদের আহিক্কে থেকে যায়।

নিবারণ হঠাৎ উঠে পড়ে দরজার কাছে দাঁড়ায়। অন্ধকারের মধ্যে আরও গাঢ়তর অন্ধকার হয়ে দেখা যায় তার শরীরটা।

পবন জিগ্যেস করে, উঠলি যে? বাইরে যাবি?

নিবারণ বলল, না। বাবা, তুমি মলে...

পবন বলে, হ্যাঁ আমি ভূত হব নিশ্চয়! সে কি আর তোকে বলতে হবে...নাতি-নাতনী দুটোর মুখ চেয়েও...সুরেন্দ্রকে ডেকে আনিস...আমি বোতলে ঢুকে যাব, তুই একশো টাকা...

তার পরেই চিৎকার ও কান্না মিশিয়ে সে বলে ওঠে ও বাবা নেবারণ, আমাকে মারিস না, আর দুটো দিন অন্তত বাঁচতে দে, আমি দুটো দিন...একটু গরম-গরম ভাত দিস...দুটো দিন একটু পেট ভরে খেয়ে যাই...এক ছিলিম তামাক...ও বাবা নেবারণ তোর পায়ে পড়ি...আর দুটো দিন...একটু গরম ভাত...তোর পায়ে পড়ি...ও বাবা নেবারণ, আর দুটো দিন...

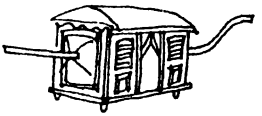

দেবদূত অথবা বারোহাটের কানাকড়ি

লাল মিঞা

কত বড় জবরদস্ত মানুষ যে লাল মিঞা, তার প্রমাণ, একবার তিনি হাসেমকে এমন একখানা কানচাপাটি ঝাঁপড় মেরেছিলেন যে সেই থেকে হাসেম আর বাঁ-কানে শুনতেই পায় না। তখন থেকে তার নাম এক-কেনো হাসেম। তার সে-নামের মধ্যে লাল মিঞার কীর্তি স্থায়ী হয়ে রইল। এক-কেনো হাসেম এখন লাইনের চায়ের দোকানে কাজ করে। ছোঁড়াটা এমন মজার যে যদি সে বাঁ-দিক ফিরে দাঁড়িয়ে থাকে, তখন যতই তাকে ডাকো, সে শুনতে পাবে না। তখন তাকে ধরে ঘুরিয়ে দিতে হয় ডান দিকে।

লাল মিঞার আর একখানা কীর্তির কথা লোকের মুখে-মুখে ঘোরে। এই গ্রামে প্রথম নাইলন সুতোর ছিপ এনেছিলেন লাল মিঞা। সেই ছিপ পেতে বসেছিলেন বারো শরিকের পুকুরে। এই পুকুরে যার খুশি ছিপ ফেলে মাছ ধরুক, কিন্তু কেউ চুপচাপে জাল ফেললেই কাজিয়া লেগে যাবে। বারো শরিকের কারুর বাড়ি বিয়ে-শাদি হলে তখনই দেওয়া হবে জাল ফেলার অধিকার।

বিরাট পুকুর, মাছ আর পদ্মপাতায় ভরা। দুপুরবেলা লাল মিঞার ছিপের নীল রঙের সুতোয় টান পড়ল। অমনি বোঁবোঁ করে ঘুরতে লাগল হুইল। মাছটা সারা দিঘি দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। টান দিতে গিয়ে লাল মিঞা ভাবলেন, ওরে বাপস্, এটা মাছ না জলদানব? লাল মিঞা নিজে সা-জোয়ান। গাজির নাম নিয়ে জোরে হ্যাঁচকা টান দিতেই টাল সামলাতে পারলেন না, পড়ে গেলেন জলে। লাল মিঞা জীবনে কখনও হারেননি। জলের মধ্যে লেগে গেল লড়াই। সে এক হুলুস্থুলু কাণ্ড। লাল মিঞার সারা গায়ে জড়িয়ে গেছে নাইলনের সুতো, সে আর কিছুতেই ছেঁড়ে না, তিনিও উঠে আসতে পারেন না, অন্যদিক থেকে জলদানব তাঁকে টানছে।

শেষপর্যন্ত লাল মিঞারই জয় হল। তিনি দু-হাতে বুকের মধ্যে তার শত্তুরকে সাপটে ধরে একসময় উঠে এলেন। এই অ্যাত্ত বড় কালো হাঁড়ির মতন মাথা, ড্যাবা-ড্যাবা চোখ, একটা বিরাট কাতলা মাছ। পরে ওজন নিয়ে দেখা হয়েছে, ঠিক আট কেজি। অত বড় একটা মাছের সঙ্গে জলের মধ্যে কুস্তি করে কেউ ধরে আনতে পেরেছে, এমন কথা ভূ-ভারতে কখনও শোনা যায়নি। আশেপাশের দশখানা গ্রামের মধ্যে এখনও কেউ বড় মাছ ধরলেই লোকে বলে, আরে যা যা, রেকর্ট করেছিল বটে লাল মিঞা, এখনও তাঁকে ছাড়িয়ে যাওয়ার হেম্মৎ কেউ দেখাতে পারেনি।

তবে, এ-সব লাল মিঞার যৌবনের কথা। এখন তাঁর আসল জোর মামলায়। জমি-জিরেত নিয়ে লাল মিঞার সঙ্গে একবার যে মামলায় জড়াবে, তার গুষ্টির তুষ্টি নাশ হয়ে যাবে।

রাত্তিরবেলা বাড়ি ফিরছেন লাল মিঞা। পরনে সিল্কের লুঙ্গি আর সাদা মলমলের পাঞ্জাবি। পায়ে রবারের পাম্পশু, হাতে তিন ব্যাটারির টর্চ। খানিক আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে, রাস্তায় হড়হড়ে কাদা। তার মধ্যে দিয়ে গভীর আত্মবিশ্বাস নিয়ে হাঁটছেন তিনি। অন্য যে-কেউ আছাড় খেয়ে পড়তে পারে, কিন্তু লাল মিঞা? সে তো একটা বাঘ।

গ্রামে এখন নিশুতি রাত। এর মধ্যে লাল মিঞার টর্চের আলো এদিক-ওদিক ঝিলিক দিচ্ছে।

পেয়ারাতলীর পাশে একটি একটেরে ঘর, সেখান থেকে হঠাৎ শোনা গেল একটি কচি শিশু গলার কান্না।

ঘৃণায় লাল মিঞা মুখ ব্যাঁকালেন।

সব জায়গায় হাসিনা

রহমান সাহেবের বাড়িতে অতিথি এসেছেন চারজন। রহমান সাহেব কলকাতায় সেটেলমেন্ট অফিসে চাকরি করেন। সপ্তাহে একবার বাড়ি ফেরেন, প্রায়ই তাঁর সঙ্গে মেহমান থাকে। আসার পথে আড়বেলের হাট থেকে গোস্ত কিংবা বড় মাছ কিনে আনেন। অনেক রাত পর্যন্ত তাঁর বাড়িতে গানবাজনা হয়। রহমান সাহেবের বাবা মাত্র ছ-মাস আগে এন্তেকাল করেছেন। তিনি ছিলেন ভারী কড়া লোক। তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তেন এবং দানধ্যান করতেন নিয়মিত। তাঁর আমলে পঁয়তিরিশ বছর বয়স্ক রহমান সাহেবও বাড়িতে থাকতেন মুখ বুজে। এখন তিনি যেভাবে চলছেন, তাতে লোকে বলে, বাপের বিষয়-সম্পত্তি তিনি দু-দিনেই উড়িয়ে দেবেন।

রহমান সাহেবের স্ত্রী নাজমা পোয়াতি। আম্মার যথেষ্ট বয়েস হয়েছে। এত লোকের রান্নাবান্না করবে কে? বাড়িতে যে ছোট মেয়েটি বাসন মাজতে আসে, তাকে নাজমা বলল, যা তো—হাসিনাকে ডেকে নিয়ে আয়।

পাঁচ মিনিটের রাস্তা। ডাক পেয়েই হাসিনা ছুটতে-ছুটতে চলে এল।

হাসিনা আল্লার এক অপূর্ব সৃষ্টি। সকলেই জানে, তার বয়েস ত্রিশ-একত্রিশের কম নয়। কিন্তু দেখায় ঠিক ষোলো-সতেরো। খুব বেশি মনে হয় তো কুড়ি। রংটি কালো, কিন্তু সেই কালোর ওপরেই যেন চাঁদের আলো ঠিকরে পড়ে। শরীরের গড়নপেটনও খুব মজবুত। সে কখনও হাঁটে না, সবসময় দৌড়ে-দৌড়ে চলে। আর এ মেয়ের কত গুণ। হাতখানা যেন মধু। যা রাঁধবে তাতেই এমন সোয়াদ আসবে যে সবাই চেয়ে-চেয়ে খাবে। হাসিনাকে পানি এনে দিতে বল, পুকুর থেকে দশ ঘড়া পানি তুলে দেবে, তারপরও মুখখানা তার হাসি-হাসি থাকে। সারা বাড়ি মুছে ঝকঝকে তকতকে করে দেবে সে, একবার বলতেও হবে না।

হাসিনা বড় মানুষের দুঃখী মেয়ে। পাড়ায় কারুর বাড়িতে বড় কাজকর্ম থাকলে হাসিনার ডাক পড়ে। সে দু-হাতে সতেরো হাতের কাজ করে দেয়। দোতলায় পুকুরের ধারের ঘরটিতে রহমান সাহেব তাঁর মেহমানদের নিয়ে বসেছেন, কখনও হেঁকে পানি চাইছেন, কখনও কাবাব, কখনও একটা দেশলাই, হাসিনা ছুটে-ছুটে গিয়ে দিয়ে আসছে সব কিছু। একতলার রান্নাঘরে বসে থাকলেও সে দোতলার হাঁক একবারেই ঠিক শুনতে পায়। কখনও সে দোতলায়, কখনও সে পুকুর ঘাটে, কখনও রান্না ঘরে, কখনও-বা সে রহমান সাহেবের মাকে পান ছেঁচে দিচ্ছে। মুখের হাসিটি লেগে আছে ঠিক।

দরজার আড়াল থেকে হাত বাড়িয়ে সে বলল, এই নিন রহমানভাই, আপনি দেশলাই চেয়েছিলেন।

রহমান সাহেব বললেন, ভেতরে আয় না, এত লজ্জা কী?

উঠে গিয়ে তিনি হাত ধরে হাসিনাকে টেনে নিয়ে এলেন ভেতরে। তাঁর চারজন দোস্তের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, এ আমায় এক দূর সম্পর্কের বোন হয়। আসলে এ আমার এক শত্রুর মেয়ে। ওর বাবার সঙ্গে আমার মামলা চলছে, ওর বাবা অতি ঘোড়েল লোক, কিন্তু এ মেয়েটা খুব ভালো। আচ্ছা, বলুন তো, এর বয়েস কত?

হাসিনাকে নিয়ে এই খেলাটা সবাই খেলে। বয়েস হলে মানুষের মুখে একটা ছাপ পড়বেই।

শুধু হাসিনা ব্যতিক্রম।

অতিথিদের মধ্যে কেউ বলল আঠারো, কেউ বলল কুড়ি। এদের মধ্যে যার নিজেরই বয়েস অনেক কম, সেই মীজানুর বলল, কত আর হবে, পনেরো, ষোলো।

রহমান সাহেব হোহো করে হেসে উঠলেন।

কালো রঙের মেয়ে, তার ওপর পরে আছে একটি কালো শাড়ি। হাসিনা যেন রাত্তিরের সঙ্গে মিশে আছে।

রহমান সাহেব মীজানুরকে বললেন, এর বড়ছেলেটারই বয়েস বোধহয় চোদ্দ-পনেরো। না রে হাসিনা? এর ছেলেমেয়ে ক'টি জানেন? তিনটে না চারটে রে?

হাসিনা আঙুলে নোখ খুঁটতে-খুঁটতে বলল, তিন।

সবাই খুব বিস্ময় প্রকাশ করল।

রহমান সাহেব বললেন, মীজানুর, তুমি তো বিয়ে শাদি করোনি এখনও? একে বিয়ে করবে? কীরে হাসিনা, তোর পছন্দ হয় আমার এই বন্ধুকে? মুখ তুলে দ্যাখ ভালো করে। একে নিকে করবি?

হাসিনা ঘাড় কাৎ করে বলল, হুঁ।

রহমান সাহেব বললেন, দেখছেন তো, স্বভাবটা ওর একদম বাচ্চার মতন। এরকম বিয়ে-পাগলা মেয়ে আর আমি দেখিনি। একেও অনেকে বিয়ে করতে চায়। তবে একটা বড় কঠিন শর্ত আছে। সেটা শুনলেই পিছিয়ে যায় সবাই।

লাইনে সন্ধ্যা

কলকাতা থেকে মাত্র সত্তর মাইল দূর হলেও এদিকে ট্রেন চলে না, এদিকে বিদ্যুৎ পৌঁছয়নি। তবে, দেড় মাইল হাঁটা পথের পর বড় রাস্তা, সেখান দিয়ে অনেক বাস চলে। এখানে বাস রাস্তাকেই বলে লাইন। যেখানে বাস থামে, তার নাম স্টেশন।

বিকেলের পর গাঁয়ের অনেকেই একবার লাইনের দিকে ঘুরে আসতে যায়। এখানে কিছু দোকানপাট আছে। এখানে এসে কিছুক্ষণ বসলে পাঁচ রকম কথা শোনা যায়। কেউ-কেউ শখ করে এখানে চা খেতে আসে। বসিরহাট কিংবা এদিকে আড়বেলের বাজারে মাছের দাম, পাটের দাম, আলুর দাম কত, তাও জানাজানি হয়ে যায় এখানে।

সবচেয়ে ঝলমলে দোকানটি বীরেন সাহার। সূচ সুতো থেকে শুরু করে ফুটবল পর্যন্ত পাওয়া যায়। সামনে সাজানো সারি-সারি কাচের বয়েমে নানারকম লজেন্স ও বিস্কুট। এক-একবার বাস এসে থামে আর বীরেন সাহা চেয়ে দেখে। শহরে কে-কে গিয়েছিল, কে কোন রকম জিনিসপত্র নিয়ে এল সঙ্গে করে।

দোকানের সামনে সাত থেকে তেরো বছর বয়সের তিনটি ছেলেমেয়ে অনেকক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে আছে হাঁ করে। দুটি ছেলে একটি মেয়ে, মেয়েটিই ছোট। তিনজনই পরে আছে ছোট ইজের, খালি গা ওরা। চোখ দিয়ে লজেন্স-বিস্কুটগুলো চাটছে।

বীরেন সাহা মাঝে-মাঝে ধমক দিয়ে ওঠে, এই যা-যা। কেন দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছিস?

ওরা নড়ে না। মেয়েটার নাক দিয়ে সিকনি গড়াচ্ছে, মেজো ছেলেটা ঘ্যাসর-ঘ্যাসর করে চুলকোচ্ছে উরু, সেখানে পাঁচড়া হয়েছে। বড় ছেলেটা ছটফটে ভাবে এদিক-ওদিক তাকায় সর্বক্ষণ। তার রোগা ক্যাংলা চেহারা, কিন্তু মুখচোখ দেখলেই বোঝা যায় বেশ বুদ্ধি আছে। তার নাম জাভেদ।

বীরেন সাহা আবার তাড়া দিয়ে উঠল, এই, যা-যা—সর দোকানের সামনে থেকে।

ওরা যা না। দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার ওপর। রাস্তাটা কারুর কেনা নয়।

দোকানে খদ্দের আসছে, যাচ্ছে। একটু ফাঁকা হলেই বীরেন সাহার চোখ পড়ে ওই দিকে। সর্বক্ষণ হ্যাংলার মতন চেয়ে থাকা ওই তিনটি বাচ্চাকে দেখতে কারুর ভালো লাগে? একাট নুলো ভিখিরি এসে ভিক্ষে চেয়ে পাঁচ নয়া নিয়ে গেল। ওরা ভিক্ষেও নেবে না।

শেষপর্যন্ত বীরেন সাহা কাচের বয়েম খুলে তিনটে সস্তা লজেন্স বার করে বলল, এই নে, এদিকে আয়, নে তারপর যা।

ছেলেমেয়ে তিনটে তবু এগোল না। পরস্পরের মুখের দিকে চাইল একবার, কিন্তু নড়ল না কেউ।

—এ যে দেখছি মহা জ্বালা।

একটু পরেই মোক্ষম অস্ত্র পেয়ে গেল বীরেন সাহা। বসিরহাটের দিক থেকে একটা বাস এসে থামল, তার থেকে নামতে দেখা গেল লাল মিঞাকে।

বীরেন সাহা বলল, ওই লাল মিঞা আসছে।

জাভেদ পেছন ফিরে তাকিয়ে সত্যিই রাস্তার ওপারে লাল মিঞাকে দেখতে পেয়ে কেঁপে উঠল। তাড়া খাওয়া জন্তুর মতন অমনি গ্রামের দিকে ছুটল পাঁই-পাঁই করে। তার ভাইবোনও তার পেছনে-পেছনে ছুটে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

গণি চৌধুরীরের মনোবেদনা

যারা শুধু চাষবাস নিয়ে আছে, তাদের ভাগ্যের বিশেষ উত্থানপতন নেই। কোনও-কোনও বছর খুব খারাপ যায়, কোনও-কোনও বছর খারাপ দিনগুলোও সয়ে যায়। হঠাৎ কোনও বছর যদি পাটের দাম একটু চড়ে, বাজারে আগেভাগে পাট পৌঁছোনো যায়, তাহলে হাতে কিছু উটকো টাকা আসে। সেই টাকায় ঘরের ছাউনি বদলানোটা হয় সেবার।

গণি খান চৌধুরী তাঁর ভাই রহিমের মতোনই আলাদা জমি চাষ করে আসছিলেন। এক বছর তিনি খেয়ালের বশে পাট-বেচা টাকায় জলকর ডেকে নিলেন। সেবার থেকেই তাঁর ভাগ্য ফিরল। আজকাল মাছের ভেড়িতেই সোনা ফলে।

এখন গণি চৌধুরীর দোতলা কোঠা বাড়ি। সে বাড়িতে রেডিও আর বন্দুক আছে। তাঁর হাতে সোনার ব্যান্ডের হাতঘড়ি। দেশলাই-এর বদলে লাইটার দিয়ে সিগারেট ধরান। তাঁর পাঁচ ছেলে, সবাই মোটামুটি দাঁড়িয়ে গেছে। দুই ছেলে দেখে চাষবাস, আর দুই ছেলে পড়ে থাকে ভেড়িতে। ছোট ছেলেটি ইস্কুলে যায়। গণি চৌধুরীর ইচ্ছে আছে সামনের বছর ফেরি ঘাটের নিলামের সময় ডাক দেবেন।

বয়েস হলেও গণি চৌধুরীর শরীরটা মজবুত আছে। দুই বিবিই গত হয়েছেন অকালে। ছেলেরা বড় হয়েছে, তিনি আর নতুন করে শাদির কথা ভাবেন না। ছেলেরা তাঁর যত্নআত্তির কোনও ত্রুটি রাখেনি, তাঁর কাজের বোঝাও হালকা করে দিয়েছে। তিনি এখন পরোপকার করে বেড়ান। মসজিদ সংস্কার, গ্রামে প্রাইমারি স্কুল গঠনের জন্য সরকারের কাছে আবেদন, মাদ্রাসার শিক্ষকদের বকেয়া বেতন, এ-সব ব্যাপারে গণি চৌধুরী সবসময়ে খুশি। তেঁতুল গাছের পীর সাহেবের মাজারের সামনে তিনি নিজ ব্যয়ে বসিয়ে দিয়েছেন টিউকল, কাজী কবির ইন্তেকালের পর যে ফাংশান হল তাতে তিনি প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। কেউ বলতে পারবে না নতুন টাকার গরমে তিনি ধরাকে সরা জ্ঞান করেন। তিনি দয়ালু মানুষ। গাঁয়ের রাস্তা দিয়ে যখন হেঁটে যান, সকলে সম্ভ্রমের সঙ্গে তাকিয়ে থাকে তাঁর দিকে।

সন্ধের দিকে গণি চৌধুরীর একটু জ্বর এসেছে। প্রায়ই এ-রকম ঘুষঘুষে জ্বর আসে। ডাক্তারকে

দেখাতে যাবেন-যাবেন করেও হচ্ছে না। চাষীর রক্ত আছে শরীরে, যখন-তখন ডাক্তারের কাছে যাওয়াটা এখনও রপ্ত করতে পারেননি। তাঁর দোস্ত গিয়াসুদ্দিন আহমদের জানাজায় যাওয়ার কথা ছিল, তিনি আর গেলেন না। দোতলায় নিজের ঘরে খাটে গিয়ে শুয়ে পড়লেন।

কিন্তু বেশিক্ষণ শুয়ে থাকতে পারলেন না। ছটফট করছেন। কেমন যেন শয্যাকণ্টকীর ভাব। একবার উঠছেন, একবার জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন, আবার ফিরে আসছেন বিছানায়। বাড়িটা নিঝুম, ছেলেরা কেউ নেই বাড়িতে। দুই ছেলের বউ নিশ্চয় গেছে পাড়া বেড়াতে।

একবার জানলার কাছে এসে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। এখান থেকে দেখা যায় তাঁর নিজের বাড়ির চৌহদ্দি, তারপর ফলবাগান, নিজস্ব পুকুর, অনেক দূর বিস্তৃত ধান জমি। সবই তাঁর নিজের জীবনে গড়া। পুকুরের ওপারে তাঁর ভাই রহিমের কাঁচা বাড়িটি যেমন আগে ছিল তেমনই আছে।

তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। এত করেও কী লাভ হল? সন্ধেবেলা এই যে তাঁর শরীর ছনছন করছে, এইসময় পাশে এসে দাঁড়াবার কেউ নেই। কেউ তাঁর মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিতে আসবে না। শরীরে এত তাগৎ অথচ শরীর থাকে অনাহারে।

তিনি হতাশভাবে আবার বিছানায় শুয়ে পড়লেন। যদি এই সময় কেউ এসে পাশে বসত, দুটো সোহাগের কথা কইতো! দুই প্রাক্তন বিবির মধ্যে একজনের কথাও গণি চৌধুরীর মনে পড়ল না, তিনি ভাবতে লাগলেন আর-একজনের কথা, বড়ো কোমল মুখখানা তার, তার হাতের আঙুলে যেন জাদু।

হাসিনার পূর্ব ইতিহাস

ষোলো বছর বয়সে হাসিনার চেহারা যখন ঠিক ষোলো বছরের মেয়ের মতোই ছিল, সেইসময় সে এক সন্ধেবেলা লাইনের ধার থেকে মেল বাসে উঠে পালায়। হাসিনা পাকতে শুরু করেছিল তেরো বছর বয়েস থেকে। তার বাড়বাড়ন্ত শরীরের জন্য পাড়ার চাচা আর দুলহাভাইরা একটু গোপন ফুরসৎ পেলেই তাকে জড়িয়ে ধরে আদর করতো। এইভাবে হাসিনার শরীর গরম হয়ে গেল। ষোলো বছর বয়েসে একটি লম্বা-চওড়া ছেলে তাকে হাতছানি দিতেই সে সরে পড়ল তার সঙ্গে।

দোর্দণ্ডপ্রতাপ লাল মিঞা মেয়ের খোঁজে চতুর্দিকে লোক লাগালেন। বেশি দূরে নয়, হাসিনাকে পাওয়া গেল ইটিন্ডা-ঘাটে। ছেলেটি সেখানে ফলের ব্যাবসা করে, তার নাম জামালুদ্দিন।

লাল মিঞা ছেলেটিকে টুঁটি ধরে নিয়ে এলেন। মেয়েকে দিলেন বিষম মার। শেষ পর্যন্ত মেয়ের বদ নসিবের জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলে সেই জামালুদ্দিনের সঙ্গে শাদি দিলেন মেয়ের।

কিন্তু জামাল ছেলেটি বড় তেরিয়া। লাল মিঞার ইচ্ছে ছিল ওকে তিনি ঘরজামাই করবেন। তাঁর নিজের পাঁচ মেয়ে আর-এক ছেলের মধ্যে ছেলেটাই সবচেয়ে কমজোরী। প্রায়ই সে কাশির অসুখে ভোগে। কিন্তু জামাল রাজি হল না, সে তার স্বাধীন ফলের ব্যাবসাতে ফিরে যেতে চায়। শেষকালে এমন হল, শ্বশুরে-জামাইতে মুখ-দেখাদেখি পর্যন্ত বন্ধ।

বিয়ের পাঁচ বছর পর জামালুদ্দিন বেশ ফুলে ফেঁপে উঠেছিল। ফলের দোকানের আড়ালে সে শুরু করেছিল বন্দুক-পিস্তলের চোরা চালানি কারবার। কাছেই বর্ডার, এখানে ওইসব কারবারের অনেক অসুবিধে আছে। বিপদও আছে এই কাজে, কিন্তু এক-একজন মানুষ বিপজ্জনক জীবন কাটাতেই চায়। জামালের চওড়া বুক, চোখে বুদ্ধির দীপ্তি, সে এই পৃথিবীতে হেরে যাওয়ার জন্য আসেনি, সে চায় যতটা সম্ভব ভোগ করে নিতে।

জয়বাংলা হওয়ার সময় তার কাজকারবারে খানিকটা অসুবিধে হল। বন্দুক-পিস্তলের তখন জলের দাম। একটা মাসকট একশো টাকায় সেধে-সেধে বিকোয়, তিনশো টাকায় এল.এম.জি.। কয়েক

বছর পরে অবস্থা একটু বদলাবার পর সে বেচাকেনা করতে লাগল পাইপগান। খুব সস্তার মাল হলেও এতে ঝুঁকি কম, এর বাজার সবসময় তেজী থাকে।

কিছুদিনের জন্য সে মাছের ব্যাবসাতেও নেমেছিল। কিন্তু এই নিয়ে তার শ্বশুরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ বাধে। গণি খান চৌধুরী লাল মিঞার বিশেষ দোস্ত। লাল মিঞাও কিছুদিন আগে জলকর নিয়েছেন। এখানকার ভেড়ি-ওয়ালারা নিজেদের স্বার্থেই বাংলাদেশ থেকে মাছের স্মাগলিং আটকাতে চায়। নইলে তাদের মাছের দর নেমে যায় যখন-তখন। এদের হাতে আছে থানা-পুলিশ। জামালুদ্দিন হেরে গেল।

মাঝে-মাঝে ছোটখাটো মারামারিতে জড়িয়ে পড়ত জামালুদ্দিন। তার অসীম সাহস। এইরকম কোনও দাঙ্গা-হাঙ্গামায় সে হঠাৎ প্রাণ হারাতে পারত, কিন্তু সে মারা গেল মাত্র সাত দিনের জ্বরে। মাথায় অসহ্য ব্যথা নিয়ে দেখা দিল কী এক নতুন রোগ, আর সেই রোগেই সুস্থ সবল মানুষটি মরে গেল দাপিয়ে-দাপিয়ে। এক শীতের রাত্রে। ঘরে তখন তার তিনটে বাচ্চা আর যুবতী স্ত্রী।

জামালুদ্দিনের জমা টাকাপয়সা বা বিষয়সম্পত্তি কিছুই ছিল না। ফলে ছেলেমেয়েদের নিয়ে পথে বসতে হল হাসিনাকে। তার সোমত্ত যৌবনের জন্যই বাড়িতে শুরু হল চিল-শকুনের উপদ্রব।

লাল মিঞা বাধ্য হয়েই মেয়েকে নিয়ে এলেন নিজের কাছে। মেয়েটার কথা মন থেকে তিনি বাদই দিয়েছিলেন, কিন্তু ওই মেয়ে যদি হাসনাবাদের বাজারে গিয়ে নাম লেখায়, তাহলে সবাই তো বলবে, দ্যাখো, লাল মিঞার মেয়ে রেণ্ডি হয়েছে।

লাল মিঞা মেয়ের ঘরে গিয়ে বললেন, বাক্স বিছানা গুছিয়ে নে। আজই যাবি আমার সঙ্গে।

ঘরের মধ্যে কিলবিল করছে তিনটি বাচ্চা। লাল মিঞা ঘৃণায় মুখ বেঁকিয়ে বললেন, ওই শয়তানের বাচ্চাগুলোকে কোথায় নিয়ে যাবি, ওদের এখানে রেখে যা।

হাসিনা বাপের পায়ের ওপর আছড়ে পড়ে হাপুস নয়নে কাঁদতে-কাঁদতে বলল, আব্বা, ওদের আমি কোথায় ফেলে যাব, ওদের আমি নিজের পেটে ধরিচি। ওদের আর কে আছে?

লাল মিঞা জিগ্যেস করলেন, কেন, গিয়াসের নিজের লোক কেউ নেই? তারাই ওদের দেখবে। ওরা আমার কেউ নয়।

হাসিনা বলল, সে মানুষটার তো আপনার জন আর কেউ ছিল না। আছে শুধু এক বুড়ি দাদী, সে চোখে দেখে না ভালো, তার নিজেরই খাবার জোটে না, সে কোথা থেকে ওদের খেতে দেবে?

লাল মিঞা বললেন, তাহলে ওদের রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে যা। অমন কত বাচ্চা রাস্তায় থাকে।

ঘরের এক কোণে বসে জুলজুল করে চেয়ে দেখছে তিনটে বাচ্চা। তিন জনেরই এ-সব কথা বুঝতে পারার বয়েস হয়ে গেছে।

লাল মিঞা রাগ করে মেয়েকে না নিয়েই ফিরে এলেন। যাক, ওরা জাহান্নামে যাক।

খিদের জ্বালা সইতে না পেরে একদিন হাসিনা নিজেই ছেলেমেয়েগুলোর হাত ধরে এসে উপস্থিত হল বাপের বাড়িতে। তার নিজের মা বেঁচে নেই, কেঁদে পড়ল ছোটো আম্মার পায়ের ওপর।

লাল মিঞা প্রথমে একচোট খুব হম্বিতম্বি করলেন। ও-মেয়ের মুখ দর্শনও করতে চাইলেন না। কিন্তু তাঁর ছোটবিবি নাজমা যখন বললেন, আহা এয়েছে যখন ফেলে তো দিতে পারবে না! বরং খাল পাড়ে যে পাট রাখার ঘরটা বানিয়েছিলে, সেটা তো এখন খালি, সেখানে গিয়ে থাকুক— অমনি লাল মিঞা চটে উঠে এক ধমক দিলেন ছোটবিবিকে। কী—তাঁর মেয়ে অত দূরে খালপাড়ে একা থাকবে? শেয়াল-কুকুরে ছিঁড়ে খাবে না?

পেয়ারা বাগানের এক কোণে একটা ঘর তুলে দিলেন লাল মিঞা। সে-ঘরের অর্ধেকটা

গিয়ে পড়ল রহমান সাহেবের জমিতে। রহমান আপত্তি জানাতেই মামলা ঠুকে দিলেন লাল মিঞা আর সেই মামলার ঝোঁকে বেশ কিছুদিন মশগুল হয়ে রইলেন তিনি।

হাসিনা বাপের বাড়িতে জায়গা পেল একটি শর্তে। তার নিজের ভরন-পোষণ পাবে বাপের কাছ থেকে। কিন্তু ছেলেপুলেদের কিছু দেবেন না লাল মিঞা। ওরা তাঁর কেউ নয়, ওরা তাঁর দুশমনের বাচ্চা।

হাসিনা মাঝে-মাঝে এবাড়ি-ওবাড়ি কাজ করতে যায়। তখন ছেলেমেয়েরা ঘুরে বেড়ায় আদাড়ে-আঁস্তাকুড়ে। তিনজন সবসময় থাকে একসঙ্গে। কী হ্যাংলা, কী হ্যাংলা! যেখানে যা কিছু কুড়িয়ে পায়, সঙ্গে-সঙ্গে খেয়ে নেয় চেটে-পুটে। হাসিনা যেসব বাড়িতে কাজ করতে যায়, সেখানে ওদের যাওয়া নিষেধ। কাজের বাড়িতে তিনটে বাচ্চা ঘুরঘুরে করবে, এটা কেউ পছন্দ করে না। তা ছাড়া চোর-ছ্যাঁচড়ের মতোন স্বভাব, কখন কোন জিনিসটা টুক করে সরিয়ে ফেলবে তার ঠিক নেই।

লাইনের ধারে ছেলেমেয়ে তিনটেকে একদিন ভিক্ষে করতে দেখে লাল মিঞা প্রবল হুংকার ছাড়লেন। এই বিচ্ছুগুলো তার সুনাম ধ্বংস করতে এসেছে। ওদের বাপ যে-ই হোক, লোকে তো বলবে লাল মিঞার নাতি-নাতনিরা পথে-পথে ভিখ মেঙে বেড়াচ্ছে!

লাল মিঞা তাঁর বিখ্যাত কানচাপাটি চড় মারার সুযোগ পেলেন না। তাঁর হুংকার শুনে বাচ্চা তিনটে ইঁদুরের মতন এদিক-ওদিক দৌড়ে পালাল। লাল মিঞা বাড়িতে এসে হাসিনার চুলের মুঠি চেপে ধরলেন।

সেই থেকে বাচ্চাগুলোর ভিক্ষে করা বন্ধ। তারা লুকিয়ে-লুকিয়ে লোকের বাড়ির আঁস্তাকুড় খুঁটে খায়। বড়ছেলেটা বেশ চতুর হয়ে উঠেছে। এক-একদিন সে বাসের পেছনে চেপে চলে যায় আড়বেলে। সেখান থেকে বেড়াচাঁপার দিকের রাস্তা ধরে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে টুকটাক ভিক্ষে করে আসে। এখানে লাল মিঞা দেখতে পাবে না।

তা-ও গাঁয়ের দু-চারজন লোকের নজরে পড়ে যায়। একদিন হাসিনা বাগানে শুকনো নারকোলের বালদো কুড়োচ্ছে, সেইসময় গিয়াস তাকে বলল, ও হাসিনা, তোর ছেলে জাভেদকে যে দেখলাম বেড়াচাঁপার রাস্তায় ভিক্ষে করছে? লাল মিঞার কানে গেলে যে একেবারে জবাই করে ফেলবে।

বাণবিদ্ধ পাখির মতন হাসিনা ছুটে গিয়ে পড়ল গিয়াসের পায়ের ওপর। ব্যাকুলভাবে বলল, গিয়াস ভাই, বলো না, তুমি আব্বাকে বলো না, আমি ওকে নিষেধ করে দেব। আর যাবে না।

গিয়াস সস্নেহে তাকে টেনে তুলে বললেন, আরে না-না, আমি বলব না। তুই কি আমার পর? তবে গাঁয়ে কতরকম লোক আছে, কে কখন কথাটা লাল মিঞার কানে তুলে দেবে—তাই তোকে সাবধান করে দিলাম।

সেই সুবাদে গিয়াস হাসিনার বুকে হাত বুলিয়ে নিল ভালো করে। এবং পরদিন কথায়-কথায় সেই কথাটা জানিয়ে দিল লাল মিঞাকে। সেবার জাভেদ পার পায়নি, বেধড়ক মার খেয়ে বিছানায় পড়েছিল দু-দিন।

লাল মিঞা একদিন মেয়েকে ডেকে বললেন, তুই আবার বিয়ে কর, আমার হাতে ভালো পাত্তর আছে।

হাসিনা সঙ্গে-সঙ্গে ঘাড় নাড়ল। অর্থাৎ সে রাজি।

লাল মিঞা বললেন, বাজিতপুরের রজব আলির ছেলে শামসের, খুব বুঝদার মানুষ, লরির ব্যাবসা করে, অবস্থা ভালো, তার সঙ্গে কথা বলি?

হাসিনা আবার ঘাড় নাড়ল।

—আণ্ডা-বাচ্চাগুলোর ব্যবস্থা আমি করব। ওদের আমি পাঠিয়ে দেব।

—ওরা কোথায় যাবে? ও আব্বা, ওরা তো আমায় ছেড়ে থাকতে পারবে নে!

—ওরা তোর সঙ্গে যাবে নাকি? তুই পাগল হয়েছিস?

—কেন, বাজিতপুরের সেই মানুষ ওদের নেবেন না?

—কেউ নেয়? তিনটে গেঁড়ি-গেঁড়ি বাচ্চা সমেত কেউ বউ ঘরে আনে?

—তাহলে ওদের কোথায় ফেলে যাব? ওরা যে আমার পেটের সন্তান!

লাল মিঞা এমনভাবে মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন যেন তিনি এরকম একটি অদ্ভুত নির্বোধ প্রাণী কখনও দেখেননি। বাড়িতে বেড়ালের বাচ্চা, কুকুরের বাচ্চা বেশি হলে লোকে দূরে পার করে দিয়ে আসে না? এই বাচ্চাগুলোকে একদিন শিয়ালদা স্টেশনে ছেড়ে দিয়ে এলে আর কোনওদিন ওরা এ জায়গা খুঁজে পাবে না। সেখানে ওরা ভিক্ষে করুক আর যাই করুক কেউ তো জানতে যাচ্ছে না।

এই মেয়েকে নিকে করার জন্য অনেকেই রাজি। মেয়ের যৌবন আছে, গুণ আছে। এখনও ও ইচ্ছে করলেই সাধ আহ্লাদ মিটোতে পারে। শুধু ওই এণ্ডিগেণ্ডিগুলোর জন্যে—

হাসিনা আবার কেঁদে ভাসাল। না, ওদের ছেড়ে সে কোথাও নিকে বসতে পারবে না। তারই পেটের নাড়ি কেটে যে ওদের এ পৃথিবীতে আনা হয়েছে।

উপকারী সামসুল

পাশাপাশি দু খানি গাঁয়ের জন্য একটা প্রাইমারি স্কুল। সেই স্কুল পেরিয়ে এ পর্যন্ত মাত্র বারোটি ছেলে বড় স্কুলে পড়তে গেছে। তার মধ্যে বদরুদ্দীন শেখের ছেলে সামসুল হক বিএ পাস দিয়েছে। ভারী ধীর-স্থির বুদ্ধিমান।

লাইনের ধারে চায়ের দোকানে বসেছিল সামসুল। এমনসময় ধর, ধর, গেল, গেল, রব উঠল একটা। সবাই ছুটে বাইরে এল। বিকট শব্দে একটা এক্সপ্রেস বাস ব্রেক কষেছে। তার সামনে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা বাচ্চা মেয়ে। এই বাসটা যদি ওকে চাপা দিয়ে যেত, তবু ড্রাইভারের কোনও দোষ দেওয়া যেত না। শেষমুহূর্তে ব্রেক কষায় ড্রাইভারের সমস্ত অনুভূতি বিশৃঙ্খল হয়ে যায়। সে বাস থেকে লাফিয়ে নেমে প্রথমে ওইটুকু মেয়েকেই এক চড় কষাল। পরক্ষণেই মেয়েটিকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করতে লাগল খুব।

সামসুল জিগ্যেস করল, কার মেয়ে?

পাশে দাঁড়ানো একজন জবাব দিল, লাল মিঞার নাতনি।

সামসুল বলল, এই সন্ধেবেলা ওইটুকু মেয়ে বড় রাস্তার ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে?

একজন বলল, ওরা তো এইখেনেই থাকে। ওই দ্যাখো না, ওর দুই ভাইও রয়েছে কাছে।

আর একজন বলল, কড়া জান বটে। অন্য কোনও বাচ্চা হলে ঠিকই চাপা পড়ত। কিন্তু হাসিনার ছেলেমেয়েদের কিছুই হয় না। মনে আছে, গত বছর জাভেদকে সাপে কামড়াল, কিন্তু ও-ছোঁড়া ঠিক বেঁচে গেল। অ্যাঁ, তোমার-আমার ঘরের ছেলেপুলে হলে বাঁচত? অ্যাঁ?

অন্য দু-জন অকারণে হেসে উঠল!

সামসুলের মুখে ছড়িয়ে পড়ল একটা পাতলা দুঃখের ছায়া। ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ। সেই মানুষের জীবনের দামও এত তুচ্ছ হয়! একটা বাচ্চা মেয়ে এইমাত্র মরতে-মরতে বেঁচে গেল, আর সেই উপলক্ষে এই লোকেরা হাসছে।

সামসুল একা এগিয়ে গিয়ে বাচ্চা মেয়েটির হাত ধরে সরিয়ে আনল ভিড় থেকে। তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, এরকম আর কক্ষনো করে না। বড় রাস্তা দিয়ে এরকম দৌড়োদৌড়ি

করতে নেই। তোমার নাম কী খুকি?

মেয়েটি ফোঁপাতে-ফোঁপাতে কী যে বলল কিছুই বোঝা গেল না।

সামসুল ঘাড় নীচু করে আবার জিগ্যেস করল, তোমার নাম কী?

এবার মেয়েটি মিনমিন করে বলল, নাহারুনেছা।

—চলো, তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।

ওর আর দু-ভাই কাছেই ঘুরঘুর করছিল। তারা খুব উৎসাহের সঙ্গে বলল, আসেন না, আমাদের বাড়ি, রাস্তা দেখিয়ে দিচ্ছি।

সন্ধের পর যে-কোনও সম্পন্ন লোকের হাতেই টর্চ থাকে। সামসুলের হাত থেকে টর্চটা কেড়ে নিয়ে জাভেদ আগে-আগে দৌড়োলো।

হাসিনার ঘরে টিমটিম করে জ্বলছে কেরোসিনের কুপি। তাতে আলোর চেয়ে ধোঁয়া বেশি। সেই আলোতেই বসে হাসিনা ব্লাউজ সেলাই করছিল, ব্লাউজটা তার গা থেকে এইমাত্র খুলেছে। পুরুষ মানুষ দেখে তাড়াতাড়ি শাড়িটা ভালো করে বুকে জড়াল।

গ্রাম সম্পর্কে পরস্পর মুখচেনা। সামসুল বলল, তোমার নাম হাসিনা না? তুমি ছেলেমেয়েদের এইভাবে রাস্তায় ছেড়ে দাও কেন?

জাভেদ সোৎসাহে শোনাল দুর্ঘটনা-নাটকটির বিবরণ। তাদের নিস্তরঙ্গ জীবনে তবু এটা একটা ঘটনা। হাসিনা মেয়েকে কোলে জড়িয়ে ধরল। তারপর সামসুলকে বলল, আপনাকে কোথায় বা বসতে দেব...আমার কপাল পোড়া...আমার ছেলেমেয়েগুলোকে কেউ ভালোবাসে না...

সামসুল মাটির দাওয়ায় বসে শুনল হাসিনার সংক্ষিপ্ত জীবনকাহিনি। পেয়ারা বাগানের মাথায় তারকা-খচিত আকাশ। পুকুরের জলে খুব জোরে টিপ করে শব্দ হল। বোধহয় তার পড়ল একটা।

সামসুল দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কবে যে এই সমাজের উন্নতি হবে। এত অবিচার, এত অন্যায়, এত কুসংস্কার। তবু কিছু তো চেষ্টা করতে হবে প্রত্যেককেই।

সে ছোটখাটো একটি বক্তৃতা শোনাল হাসিনাকে। এইভাবে চললে তো তার দুঃখ কোনওদিন ঘুচবে না। ছেলেমেয়েরা লেখাপড়াও শিখছে না। ওরা বড় হলে কি কাঙালি হবে? একবার সাপের কামড় বা একবার বাস চাপা থেকে বাঁচলেও কি আর বারবার বাঁচবে? বরং ওরা যদি মানুষ হয়, তবে ওরাই একদিন হাসিনার দুঃখ ঘুচাবে।

হাসিনা জাভেদকে দেখিয়ে বলল, ওটা দু-কেলাস পর্যন্ত পড়েছিল। এখন আর কোথায় বা পড়বে, কেই-বা পড়াবে!

সামসুল বলল, 'ওটা' বলতে নেই। নিজের ছেলে, বা যে-কোনও মানুষ সম্পর্কেই ও-রকমভাবে কথা বলতে হয় না। আর তুমিই বা এত কম আলোয় সেলাই নিয়ে বসেছিলে কেন? চোখটা যে যাবে। দিনের বেলায় সেলাই করতে পার না?

এরপর মাঝে-মাঝেই সামসুল আসতে লাগল হাসিনার কাছে। সারাদিন সে ব্যস্ত থাকে, সদ্য কাজ পেয়েছে পোস্ট অফিসে, তাই আসে সন্ধের পর। জাভেদের জন্য এনেছে বই-খাতা, ছোট মেয়েটির জন্য একটা ফ্রক।

দিন-পনেরোও কাটল না, এর মধ্যেই লাইনের ধারের চায়ের দোকান সরগরম হয়ে উঠল। একদিন সামসুল সেখানে ঢুকে পড়ে শুনল, সেদিনের প্রধান আলোচ্য বিষয় সে নিজে। একজন টিপ্পনী কেটে বলল, ও সামসুল মিঞা, কেমন জমেছে? হাসিনা বিবির চোখে জাদু আছে, তাই না? দেখ, যেন তোমার বিবির কানে কথাটা না যায়?

সামসুলের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তার নিজের শাদি হয়েছে মাত্র দেড় বছর আগে। কলেজে পড়া মেয়ে। সে কেন একটা গেঁয়ো বিধবার সঙ্গে অন্যায় কাজ করতে যাবে?

দু-তিনজন একসঙ্গে বলল, আহা-হা কী কথাই বললে? নিজের ঘরে বউ থাকলেও বুঝি

লোকে অন্য মাগি খোঁজে না? তাহলে তো দুনিয়াটাই বদলে যেত। দেখো, সাবধান, লাল মিঞা যদি টের পায়, তবে জোর করে নিকে দিয়ে দেবে কিন্তু। তখন ওই তিনটে বাচ্চা সমেত ঘরে তুলতে হবে হাসিনাকে।

সামসুল তর্ক করল ঝগড়া করল, রাগ করে বেরিয়ে গেল সেখান থেকে। কিন্তু পরদিন থেকে সে গুটিয়ে নিল নিজেকে। তাকে নিয়ে সাত নম্বর হল—যারা নানা কারণে হাসিনাকে সাহায্য করতে গিয়ে পিছিয়ে গেছে আবার।

আমবাগানে

হাসিনা একেবারে পড়ে গেল গণি চৌধুরীর মুখোমুখি। রোজ ভোরবেলা তিনি নিজের বাগান পরিদর্শনে আসেন।

হাসিনার হাতে এক থোকা কাঁচা আম। তাড়াতাড়ি সেটা আঁচলের তলায় লুকিয়ে ফেলে সে চৌধুরী সাহেবের পা ছুঁয়ে কদমবুসি করল।

গণি চৌধুরীর কিছুই চোখ এড়ায় না। হাসিনা উঠে দাঁড়াবার পর তিনি তার থুতনি ছুঁয়ে বললেন, আহা, ভালো হোক, মঙ্গল হোক। ক'টা আম নিলি রে?

হাসিনা ধড়ফড় করে উঠে বলল, ও চাচা, আমি গাছ থেকে নিইনি, মাটিতে পড়ে ছেলো, বিশ্বাস করেন, ও চাচা-

গণি চৌধুরী সস্নেহে বললেন, আহা তাতে কী হয়েছে, নিয়েছিস, নিয়েছিস। বেশ করেছিস।

হাসিনার থুতনিটা তুলে ধরবার সময় তিনি দেখেছেন ওর টলটলে দুটি চোখ। ঠিক যেন গহিন কালো দিঘির জল। তা দেখেই তাঁর মনটা নরম হয়ে গেছে।

তিনি আবার বললেন, দেখি, ক'টা নিয়েছিস? ভয় পাচ্ছিস কেন?

হাসিনা আঁচলের তলা থেকে হাত বার করবার সময় সেই ফাঁকে গণি চৌধুরী দেখতে পেলেন তার বুক। ছেঁড়া ব্লাউজের ফাঁক দিয়ে যেন পূর্ণিমার চাঁদ উঁকি মারছে। আরও নরম হল তাঁর মন।

তিনি বললেন, মোটে চারটে? এ আর এমন কী!

হাসিনা বলল, ছেলেমেয়েগুলোকে একটু টক রেঁধে দেব—ওরা বড্ড জ্বালায়, আমি বলে দিয়েছি খবরদার চুরি করবি নে। নিতে হয় আমি নিজে আনব, চাচার ঠেঙে চেয়ে নেব।

গণি চৌধুরী বললেন, ঠিকই তো, দরকার হলে আমার কাছে আসবি, তোর লজ্জা কী...আরও নিবি?

শখ করে তিনি গোলাপখাসের কলম লাগিয়েছিলেন, এই আম ঠিক কাঁচা অবস্থায় টক রেঁধে খাবার জন্য নয়। তবু তিনি নিজের হাতে সেই ছোট গাছের ডাল থেকে আট-দশটা আম ছিঁড়ে নিয়ে বললেন, নে, আঁচল পাত। হাসিনা গা মুচড়ে মাটির দিকে তাকিয়ে রইল। গণি চৌধুরী সুন্দর করে হেসে বললেন, আঁচল পাততে লজ্জা করছিস কেন?

হাসিনা আঁচল খুলতেই গণি চৌধুরী তার বুকের দিকে চেয়ে থেকে আমগুলো ঢেলে দিলেন। তারপর হাসিনা যখন পুঁটলি বাঁধতে ব্যস্ত সেইসময় তিনি ওর পিঠে হাত রেখে কাছে আকর্ষণ করে বললেন, কী খুশি তো?

হাসিনা উঁ-উঁ শব্দ করল।

গণি চৌধুরীর হাত স্বাধীন হয়ে গিয়ে নড়াচড়া করতে লাগল যেখানে-সেখানে। এরপর আর মাত্র দু-মিনিট লাগল মাটিতে শুয়ে পড়তে। এত ভোরে কাকপক্ষীও জাগেনি। জাগলেও কেউ আমবাগানের দিকে আসবে না। হাসিনার কোঁচড় থেকে আমগুলো গড়িয়ে গেল, সে অনবরত শব্দ

করতে লাগল উঁ-উঁ-উঁ।

ব্যাপারটা শেষ হওয়ার পর গণি চৌধুরীর একইসঙ্গে প্রবল উল্লাস এবং দারুণ ভয়ের অনুভূতি হল। উল্লাস এই কারণে যে এই বয়সেও তাঁর পৌরুষ অক্ষুণ্ণ আছে। মনে-মনে একটা চাপা ভয় ছিল হয়তো পারবেন না! কিন্তু তিনি পেরেছেন। আর ভয় এইজন্য যে, সমাজের একজন গণ্যমান্য লোক হয়ে তিনি এটা কী করে বসলেন? কথাটা যদি কোনওক্রমে লাল মিঞার কানে ওঠে! লাল মিঞা দোস্ত, হাসিনা তাঁর মেয়ের বয়েসি।

ভয়ের সঙ্গে-সঙ্গে এল অনুশোচনা। হঠাৎ কেন তাঁর মাথা ঘুরে গেল? বেওয়ারিস মেয়েমানুষ দেখলেই বুঝি মানুষের মনে এরকম দুষ্ট বুদ্ধি জাগে? প্রায়ই তিনি হাসিনার কথা চিন্তা করতেন। কিন্তু সে মনের কথা মনের মধ্যেই ছিল। হঠাৎ এই ভোরবেলা...ছি-ছি-ছি-ছি...যদি তাঁর ছেলেরা একবার শুনতে পায়, মাথাটা হেঁটে হয়ে যাবে সবার সামনে।

একবার তিনি ভাবলেন যা হওয়ার হয়েছে, কী আর করা যাবে? যদি জানাজানি হয়ই, তিনি নিকে করবেন হাসিনাকে। এরকম একটা বিবি পেলে তিনি এখনও বিশ বছর বাঁচতে পারবেন হেসে খেলে। কিন্তু হাসিনার যে ওই তিনটি ছেলেমেয়ে রয়েছে...না, না, সম্ভব না, তাঁর নিজের ছেলেরা কিছুতেই রাজি হবে না, বিষয়সম্পত্তি সব তছনছ হয়ে যাবে। ওরে বাবারে, না না...।

শাড়ি-টাড়ি সামলে হাসিনা উদাসীন সৃষ্টি মেলে বসে আছে। হাঁটুর ওপরে থুঁতনি। গণি চৌধুরী তার হাঁটু জড়িয়ে ধরে বললেন, ও হাসিনা, এ-কথা কারুকে বলিস না রে, তোর ছেলেমেয়েদের আমি দেখব, তোকে অনেক জিনিস দেব, কারুকে বলবি না। কিরে কেটে বল, ও হাসিনা, দেখিস, যদি কেউ শোনে, আমাকে দোজখে যেতে হবে।

গণি চৌধুরী এমন আকুলিবিকুলি করতে লাগলেন যে হাসিনা বলে উঠল—না, চাচা, কাকে কবো এ-কথা? আমার দোষ নেবেন না, আমি বড় হতভাগিনী...

—তোকে আমি দেখব, হাসিনা, তুই শুধু আমার মান রাখিস, কেউ যেন টের না পায়।

—না, চাচা, কেউ না।

—আমি যাই।

গণি চৌধুরী দ্রুতপদে পালিয়ে গেলেন সেখান থেকে।

হাসিনা আরও কিছুক্ষণ থম মেরে বসে রইল। কতরকম কথা মনে পড়ছে তার। মনে পড়ল জামালুদ্দিনের কথা। ছেলেমেয়ে তিনটের কথা। হাসিনার কি গুণাহ হল? গণি চাচা কত বড় একটা মানী লোক, তিনি যখন ইচ্ছে করলেন, হাসিনার মতন সামান্য একটা মেয়ে কি না বলতে পারে? সেটা একটা আস্পর্ধা হয়ে যায় না! আর এ-কথা সে কাকেই বা জানাবে, তার কসবী বলে নাম রটে যাবে না!

এইরকম আর-একটা ব্যাপার হয়েছিল মাসখানেক আগে। রহমান সাহেবের বন্ধু মীজানুর, যে শহর থেকে আসে। মীজানুর না—যেন মজনু। লায়লা-মজনু যাত্রার ঠিক মজনুর মতন চেহারা। সে একদিন দুপুরবেলা চুপে-চুপে বলেছিল, এতদিন আমি শাদি করিনি, হাসিনা, এবার তোমাকে দেখে আমার সেই ইচ্ছে জেগেছে। আমার মা-কে বলেছি। মা ওই বাচ্চাগুলোর জন্য রাজি হচ্ছেন না। কিন্তু আমি পছন্দ করি তোমার বাচ্চাদের, আমি ওদেরও নিয়ে যাব, লেখাপড়া শিখবে, মা-কে যদি রাজি করাতে পারি।

রহমান ভাই নিচতলায় তাঁর স্ত্রীর পাশে ঘুমিয়ে পড়েছেন। ওপরের ঘরে মীজানুর সাহেব একা। এক গেলাস পানি দিতে এসে হাসিনা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আড়ষ্ট হয়ে এই কথা শোনে।

—অত দূরে দাঁড়িয়ে আছ কেন হাসিনা। কাছে এসো, একটু গল্প করি তোমার সঙ্গে।

কী সুন্দর করে কথা বলেন মীজানুর সাহেব। মানুষটা সত্যিই ভালো। আজকাল প্রায় ফি-সপ্তাহেই ইনি আসেন রহমান ভাইয়ের সঙ্গে। আজ সকালে হাসিনা নিজে দেখেছে যে বারো শরিকের

দিঘি থেকে স্নান করে আসবার পথে মীজানুর সাহেব তার মেয়ে নাহারের গাল টিপে আদর করে দিলেন। আহা রে! এ গাঁয়ের কেউ তো হাসিনার ছেলেমেয়েদের ছুঁতেই চায় না, সবাই দূরছাই করে। মীজানুর সাহেব কোলে তুলে নিয়ে কত আদর করলেন নাহারকে।

যেভাবে সকালবেলা মেয়েকে আদর করেছিলেন, ঠিক সেইভাবেই দুপুরে মাকে আদর করতে শুরু করলেন মীজানুর সাহেব। হাসিনা লজ্জা পেয়ে সরে গিয়েছিল।

মীজানুর বলল, চলে যাচ্ছ কেন হাসিনা? এসো, কাছে এসে বসো! তুমি কী মিষ্টি!

এই কথাটা শুনে ফুড়ুক-ফুড়ুক করে হাসি উঠে এসেছিল হাসিনার বুক থেকে। পুরুষ মানুষের মুখে সে অনেকরকম কথা শুনেছে, সে সুন্দর, সে পটের বিবি, সে লক্ষ্মী সোনা, সে দিনকি মোহিনী রাতকি বাঘিনী—কিন্তু মিষ্টি? এ-কথা তো কেউ কখনও বলেনি! শহরের লোক এরকমভাবে কথা বলে। মীজানুর সাহেব কত লেখাপড়া জানেন।

মীজানুরের চুমুতে কী সাংঘাতিক উত্তাপ। বাহুতে প্রবল জোর। আনন্দে অবশ হয়ে যেতে-যেতেও হাসিনা বলে, আমায় ছেড়ে দিন, কেউ এসে পড়বে—আমায় বকবে, আমার আবার সর্বনাশ হবে।

—কেউ আসবে না।

সেদিনও হাসিনা খুব জোর করে বাধা দিতে পারেনি। মীজানুর সাহেব কত জ্ঞানীগুণী লোক, শহরে বড় চাকরি করেন। শহরে পয়সা ফেললেই কত সিনেমা-থিয়েটারের খুপসুরৎ মেয়েদের বগলদাবা করে নিয়ে ঘোরা যায়, সেইসব ফেলে সেই মানুষটা হাসিনার মতন সামান্য একটি মেয়েকে আদর করতে চাইছেন, সেই সময় বাধা দিতে যাওয়াটা ছোট মুখে বড় কথার মতন হয়ে যায় না? তাছাড়া মীজানুর সাহেব বারবার বলছিলেন, তুমি ভয় পাচ্ছ কেন হাসিনা, আমি তো তোমাকে বিয়ে করব, তোমার ছেলেমেয়েদের সুদ্ধু নিয়ে যাব, মাকে একটু রাজি করাতে পারলেই...

আমবাগানে বসে হাসিনা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সেটা সুখের না দুঃখের, তা অত বোঝে না হাসিনা।

সে উঠে দাঁড়িয়ে গোলাপখাস কলমের গাছ থেকে আরও কতগুলো কচি আম পেড়ে ফেলল। যেন এই আমবাগানটা তার নিজের।

পুকুরে চাঁদের ছায়া

ঘরের খুব কাছে শেয়াল ডাকলে হাসিনার ঘুম ভেঙে যায়। শেয়াল এমন জীব, ওরা চুপেচাপে কোথাও যাওয়া-আসা করতে পারে না। মুরগি চুরি করার লোভে শেয়ালগুলো গেরস্তবাড়ির আশেপাশে ঘুরঘুর করে, তার মধ্যে নিজেরাই ডেকে ওঠে একসময়। অমনি কুকুরগুলো তাড়া করে যায়। তারপর কুকুরের ঘেউঘেউ আর শেয়ালের হোক্কা-হো মিলে এক বিকট শব্দ-খিচুড়ি তৈরি হয়।

হাসিনা ঘুম ভেঙে উঠে জানলা দিয়ে বলে, হুস-হুস।

সেইসময় কোনও-কোনওদিন রাত্রে হাসিনা দেখতে পায় সামনের পুকুরটার জলে একটা চাঁদ ভাসছে। ছেলেবেলা থেকে যখনই এ-রকম দেখেছে হাসিনা অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকেছে। এই দৃশ্যটা তাকে চুম্বকের মতন টানে। চারপাশ একেবারে নিঝুম। পুকুরধারের নারকোল গাছগুলোর পাতায় একটুও সাড়া নেই। জোছনার আলোয় পদ্মপাতাগুলোও সাদা-সাদা দেখায়। পুকুরের পানি কিন্তু এখন আরও যেন মিশমিশে কালো। তার মধ্যে আপনমনে খেলা করছে একলা একটা চাঁদ।

খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর কেন যেন হাসিনার বুক মুচড়ে আসে। সে সেখানে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে কাঁদে কিছুক্ষণ।

আবার শুতে আসবার সময় সে ছেলেমেয়েগুলোকে একবার দেখে। মাটিতে কাঁথা পেতে পাশাপাশি শুয়ে আছে ওরা তিনজন। জাভেদ, সিরাজ আর নাহার। গভীর ঘুমের মধ্যেও ওরা চটাপট হাত চালিয়ে মশা মারছে মাঝে-মাঝে। ভীষণ মশা। আগের মশারিটা ছিঁড়ে গেছে সেই কবে। কে আর নতুন মশারি দেবে?

বাইরের আকাশের ক্ষীণ আলো এসে পড়েছে ওদের মুখে। এখন পৃথিবীর আর কোনও শিশুর মুখের সঙ্গে ওদের মুখের ঘুমের সারল্যের কোনও তফাৎ আছে? এখন কি কেউ দেখে বলবে, ওরা হতভাগ্য?

সারাদিন ছেলেমেয়েদের সঙ্গে হাসিনার বিশেষ দেখাই হয় না। হাসিনা কাঠ-কুটো কুড়োয়, ঘুঁটে-গুল দেয়, পরের বাড়িতে কাজ করতে যায়। ছেলেমেয়েরা কুকুর-ছাগলের মতন এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়ায়। লাল মিঞার মূল বাড়ির দিকে গেলেই ছোট বিবির কাছ থেকে লাথি ঝাঁটা খেতে হয় ওদের। এই তো গত শনিবার বাণপুরের হাটে সিরাজটা একটা ষাঁড়ের গুঁতো খেয়ে পড়ে গিয়েছিল। সেই পাঁচ-ছ মাইল দূরে বাণপুরে হাট, সেখানে ওরা হেঁটে-হেঁটে গেছে। হাসিনা এত বারণ করে তবু ওর কথা শোনে না। সন্ধের পর খিদে পেলে তখন ঠিক বাড়িতে ছুটে আসবে।

সামান্য যা খাবার থাকে, তাই ভাগ করে চেটেপুটে খেয়ে, তারপর প্রায় ঘণ্টাখানেক হাসিনা ঠিক একটি বিড়ালী-মাতার মতোন ছেলেমেয়েদের নিয়ে খেলে। সবাই হুটোপুটি করে ঘরের মধ্যে। এমনকী কী জাভেদটা এখন এত বড়ো হয়ে গেছে, সে-ও দস্যিপনা করে মায়ের সঙ্গে। তারপর একসময় ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে সবাই।

হাসিনা ঘুমন্ত ছেলেমেয়েদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিল আস্তে-আস্তে। তার ইচ্ছে হল, ছেলেমেয়েগুলোকে ডেকে তুলে আবার খেলা করে এখন। অমন আনন্দ হাসিনা আর কিছুতে পায় না।

হাসিনার শরীরে ভরা নদীর মতোন যৌবন, তবু এই ছেলেমেয়েদের ছেড়ে সে কক্ষনো কোনও নতুন সোয়ামীর বাড়িতে সুখভোগ করতে যাবে না।

হাসিনা আবার জানলার ধারে এসে দাঁড়াল, সম্মোহিতভাবে চেয়ে-চেয়ে দেখে পুকুরের পানিতে একলা চাঁদের খেলা। ও চাঁদ, তুমি কত সুখী, তোমাকে দু-বেলা পেট ভরে খাওয়ার চিন্তা করতে হয় না!

সুখেন্দুবাবু

নিম্ন আদালতে লাল মিঞার হার হল। জমির অধিকার তিনি পেলেন না। পেয়ারা বাগানের সবটা তাঁর নয়। অর্থাৎ হাসিনার ঘরটা ভেঙে দিতে হবে। অবশ্য এত সহজে ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নন লাল মিঞা। তিনি লড়বেন, তিনি বড় আদালতে যাবেন। ইতিমধ্যে তিনি দুটো পালটা মামলা রজু করেছেন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে।

কিন্তু এই উপলক্ষে তিনি মেয়ের ওপর চটে গেলেন আবার। মেয়েটা অপয়া, নইলে গত পনেরো বছরের মধ্যে লাল মিঞা কখনও কোনও মামলায় হারেননি, এই প্রথম তাঁকে হার স্বীকার করতে হল। এ যে কত বড় অপমান তা মেয়েছেলেরা বুঝবে না। এ তো শুধু দু-পাঁচশো টাকার ব্যাপার নয়!

লাল মিঞা হাসিনাকে ডেকে সাফ বলে দিলেন, সে যদি কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর পছন্দ করা পাত্রকে নিকে করতে রাজি না হয়, তা হলে তিনি ওর খোরাকি যোগাতে পারবেন না। কাঁনাখোড়া নয়, রোগাভোগা নয়, বয়েসকালের স্বাস্থ্যবতী মেয়ে, এমন মেয়ে কেন নিকে বসবে না? এমন মেয়েকে

কোন বাপ সারাজীবন বসে-বসে খাওয়ায়? এমন কথা কেউ কখনও শুনেছে? তাছাড়া দিনকাল এখন খারাপ।

দিনকাল সত্যিই খারাপ। পাটের দর এ বছর হুহু করে পড়ে গেছে। ভেড়িতে মাছের আকাল। মাজরা পোকা লেগে ধান একেবারে ছিবড়ে হয়ে গেছে। কারুর মুখে এবার হাসি নেই। গ্রামের চাষিদের মধ্যে যে মানুষটি সবচেয়ে হাসিখুশি সেই রহিম চাচার কপালেও এবার তিনটে ভাঁজ পড়েছে। মাঠের যে-কোনও ফসলই রহিম চাচার কাছে সন্তানের মতন, এবারের রুগণ-জীর্ণ ধানখেত দেখে তিনিও কপালে হাত দিয়ে বসেছেন—হা আল্লা!

যে-সব বাড়িতে একজন দু-জন চাকুরে লোক আছে, শুধু তারাই এবার তেমন ধাক্কা খায়নি। চাকরির বাঁধা মাইনেটা তো আছেই। রহমান সাহেবের বাড়িতে প্রতি শনি-রবিবার বন্ধুবান্ধব এলে হাসিনার ডাক পড়ত কাজের জন্যে। তখন হাসিনা চাট্টি বেশি করে রঙিন ভাত আর গোস্ত নিয়ে আসতো ছেলেমেয়েদের জন্য। তা রহমান সাহেবও কয়েকমাস বাড়ি আসছেন না। তাঁর বউয়ের বাচ্চা হয়েছে, সে আছে এখন জয়নগর-মজিলপুরে তাঁর বাপের বাড়িতে। রহমান সাহেব সপ্তাহান্তে সেখানেই যান। ফলে মীজানুরও আর আসে না।

এই শনিবার রহমান সাহেব আবার এসেছেন, সঙ্গে এনেছেন এক হিন্দু বন্ধু। আবার হাসিনার ডাক পড়ল।

বন্ধুটির নাম সুখেন্দু। ইনি এ অঞ্চলের একজন নামকরা কন্ট্রাক্টর। বহু বড়-বড় লোকের সঙ্গে চেনাশুনো। গণি খান চৌধুরীর সঙ্গে শেয়ারে এ বছর রহমান সাহেব সুন্দরবন ফেরি সার্ভিস ডেকে নিয়েছেন। অনেক টাকার ঝক্কি। চাষের জমি বেচে রহমান সাহেব ব্যাবসায় নেমেছেন, এ সময় সুখেন্দুবাবুর মতন লোকদের হাতে রাখা দরকার। হিন্দু বলে সুখেন্দুবাবুর কিছু-কিছু অতিরিক্ত সুবিধে আছে। তিনি এসডিপিও-র বউকে বউদি কিংবা পুলিশের এএসপি-র মাকে মাসিমা ডেকে টিপ করে প্রণাম করে ফেলতে পারেন। তাতেই অর্ধেক কাজ ফতে। টাকাপয়সা ঘুষের চেয়েও এটা অনেক শক্তিশালী কায়দা।

সুখেন্দুবাবুর লম্বা চওড়া চেহারা। বয়েস তিরিশের কাছাকাছি। দেখলে মনে হয় বেশ একটি ভালোমানুষ লম্পট। লোকটি ঠিক তাই। মদ আর মেয়েমানুষের দিকে অত্যধিক ঝোঁক। এদিকে খুব একটা কুচক্রীও নন। লোকের ক্ষতি করার জন্য দিনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করেন না। বরং মাতাল অবস্থায় অনেককেই বলে বসে, আরে, সব ব্যবস্থা আমি করে দেব। কোনও চিন্তা নেই। তোমার কী-কী চাই, আমাকে বলো না!

সুখেন্দুবাবু এসেছে বিরিয়ানি আর বড় গোস্তের কাবাব খাবার জন্য। রহমান সাহেবকে সে অনেকবার বলেছে, বুঝলে ভাই রহমান, এ-সব রান্না মুসলমানদের মতন আর কেউ পারে না। কলকাতায় গেলেই আমি একবার আমিনিয়ায় ঢুকে যাই। আমাদের বাড়িতে অবশ্য এ-সব চলে না, আমার ঠাকুমা বেঁচে, ওরে বাবা, মুরগি পর্যন্ত চুপি-চুপি খেতে হয়।

অবশ্য, বিরিয়ানি আর কাবাবই বড় কথা নয়, সেইসঙ্গে হুইস্কিও এসেছে। সুখেন্দু এত বেশি হুইস্কি সন্ধেবেলার মধ্যেই খেয়ে ফেলল যে, কাবাব-বিরিয়ানি খাওয়ার দিকে তার আর রুচি রইল না। জিভ এলিয়ে এসেছে, চোখ ঢুলুঢুলু, মুখে ফুরফুরে হাসি।

দু-বার হেঁচকি তুলে সুখেন্দুবাবু বলল, আরে, ইয়ে, পানি নেই যে, শুধু-শুধু মাল খাব, একটু পানি আনাও।

রহমান সাহেব বলল, ও জল খাবেন? হাসিনা, এই হাসিনা। এক জগ জল দিয়ে যা তো।

এ-গ্রামের বাড়িতে হিন্দু অতিথি বিশেষ আসে না। কখনও দু-একজন কেউ এলে সবাই সচেতন হয়ে যায়, যেন আদর-আপ্যায়নে কোনও খুঁত না থাকে। বাচ্চারা কৌতূহলী চোখে তাকায়। বয়স্করা এসে রামায়ণ-মহাভারত বিষয়ে তাঁদের জ্ঞানের কথা জানিয়ে যায় অতিথিদের।

হাসিনা এক জগ পানি নিয়ে এল। রহমান সাহেব একটু বেশি-বেশি জোর দিয়ে বললেন,

টিউবওয়েলের জল এনেছিস তো? পুকুরের জল আনিসনি তো?

সুখেনবাবু জড়ানো গলায় বলল, ও ঠিক আছে, দাও না।

রহমান সাহেব হাসিনার হাত ধরে ঘরের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলল, সুখেন্দুদা, এই মেয়েটিকে দেখুন, দেখছেন তো? বলুন তো এর বয়েস কত?

সেই পুরোনো খেলা।

সব শুনে সুখেন্দুবাবু হেসে উঠল হা-হা করে। বলল, তাই নাকি? সত্যি, একদম বোঝা যায় না?

দু-চোখ থেকে দুটি লকলকে জিভ বার করে সুখেন্দুবাবু হাসিনার যৌবনময় শরীরটাকে চাটতে লাগল। নেশার ঝোঁকে একবার ভাবল হ্যাঁ, একটা সরেশ মাল বটে! একে পাওয়া যায় না? কত টাকা লাগবে?

পরক্ষণেই একটা ঝাঁকুনি দিয়ে সোজা হয়ে বসল সে। একটা সিগারেট ধরিয়ে নেশা কাটাবার চেষ্টা করল। মনে-মনে বলল, ওরে বাবা, মোছলমানের ঘরের মেয়েছেলে, এদিকে নজর দিতে গিয়ে কি শেষ গর্দানটা খোয়াব? কোথায় কী গোলমাল হয়ে যাবে, তারপর যদি দাঙ্গা-ফাঙ্গা বেধে যায়? কাজ নেই বাবা! গণি চৌধুরী বলেছে এই শীতে লখনউ বেড়াতে নিয়ে যাবে। সেই ভালো, সেখানে গিয়ে যত খুশি বাইজি-ফাইজি, তারা একেবারে খানদান মোছলমান, এখানকার কোনও শালা টের পাবে না।

সুখেন্দুবাবুকে একটু অন্যমনস্ক হতে দেখে রহমান সাহেব হাসিনাকে খানিকটা রসিকতার ভঙ্গিতে বললেন, মীজানুরের সঙ্গে তোর বিয়েটা প্রায় ঠিক করে এনে ছিলুম, বুঝলি, কিন্তু ও-শালা ট্রান্সফার হয়ে গেল। ব্যাঙ্কের চাকরি তো। ওকে পাঠিয়ে দিয়েছে একেবারে দার্জিলিং, বুঝলি?

হাসিনা ভাবল, আহা মীজানুর নিকে করুক বা না-করুক, তবু তো সে মুখে অন্তত বলেছিল যে সে ছেলেমেয়েগুলোকেও নিয়ে যাবে—কাল থেকে নাহারের খুব জ্বর। হে খোদাতাল্লা, ওকে তুমি বাঁচিয়ে দিয়ো।

রহমান সাহেব বললেন, তোর জন্য আর একটা পাত্র খুঁজছি। মুশকিল তো ওই বাচ্চাদের নিয়ে?

সুখেন্দুবাবু চোখ তুলে বলল, কী হয়েছে? এর মধ্যে আবার বাচ্চা এল কোথা থেকে?

রহমান সাহেব খানিকটা ইতিহাস বিবৃত করলেন।

অমনি সুখেন্দুবাবুর মধ্যে সব করে দেব ভাবটা জেগে উঠল। সে একজন মাতালের পক্ষে যতখানি চিন্তিত হওয়া সম্ভব ততখানি চিন্তিত ভঙ্গি করে বলল, হ্যাঁ, এটা একটা প্রবলেম। তিন-তিনটে বাচ্চা সমেত কে আর শাদি করবে? তবে এক কাজ করা যায়? যদি তোমরা রাজি থাকো—

—কী?

—দ্যাখো, দুঃখকষ্টে থাকার চেয়ে, বাচ্চাগুলোকে যদি অনাথ আশ্রমে দিয়ে দেওয়া যায়—পুটিয়ার যে রাজবাড়িটা ছিল না, সেটা তো গতবারে গভর্নমেন্ট নিয়ে নিয়েছে, সেখানে একটা অনাথ আশ্রম খুলেছে।

—তাই নাকি?

—তাই নাকি মানে? সেখানকার ফার্নিচার সব আমি সাপ্লাই করেছি, আমি জানি না? আমি বলি কী, সেখানে ওদের ভরতি করে দাও, খাওয়াদাওয়া পাবে, লেখাপড়া শিখবে।

—সত্যি...টাকাপয়সা লাগবে না?

—কীসের টাকাপয়সা? সেসব তো গভর্নমেন্ট দিচ্ছে।

রহমান সাহেব হাসিনার দিকে তাকিয়ে বললেন, সত্যি হাসিনা, এটা কিন্তু খুব ভালো কথা। ভেবে দ্যাখ, ওরা খাওয়া-পরা পাবে, লেখাপড়া শিখবে

হাসিনা চুপ করে রইল।

রহমান সাহেব আবার বললেন, সুখেন্দুদা, ওদের নেবে সেখানে?

সুখেন্দুবাবু বলল, কেন নেবে না? আলবৎ নেবে।

রহমান সাহেব একটু ইতস্তত করে বললেন, মানে, সুখেন্দুদা, তোমাকে খোলাখুলি বলছি। সেখানে মুসলমানের ছেলেমেয়েদের নেয়?

সুখেন্দুবাবু একটা প্রচণ্ড মাতালের হাসি হেসে বলল, আরে অনাথের আবার হিন্দু মুসলমান কী? অনাথ মানে তো যার কেউ নেই। হে-হে-হে-হে-হে।

রহমান সাহেব কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন, না, মানে, বলছিলাম, ওরা তো বেশ বড় হয়ে গেছে, বড়ছেলেটা তো বেশ বড়।

সুখেন্দুবাবু দু-হাত তুলে অভয় দানের ভঙ্গিতে বলল, সে-সব আমি ম্যানেজ করে দেব। সব আমি করে দেব, তোমার কী-কী চাই, বলো না?

সে আর একবার ঘোলাটে চোখে দেখে নিল হাসিনার লোভনীয় যৌবন। বাচ্চাকাচ্চাগুলোকে কাটিয়ে দিলে যদি মেয়েটা কৃতজ্ঞতা জানাতে তার কাছে আসে...যদি একবার...যাকগে যাক, না এল না এল, লখনউ তো আছেই।

শুধু যাওয়া শুধু আসা

সুখেন্দুবাবু যথারীতি পরের দিনই এ-সব কথা একদম ভুলে গেল। কিন্তু যদিও এ-সব কথা হয়েছিল রহমান সাহেবের বাড়ির দোতলার ঘরে, তবু কী করে যেন কথাটা রটে গেল গ্রামের মধ্যে। হাসিনার ছেলেমেয়ে তিনটির ব্যবস্থা করার একটা উপায় আছে। পুটিয়ার প্রাক্তন রাজবাড়িতে যে একটা অনাথ আশ্রম হয়েছে, সেই খবরই তো অনেকে রাখত না। সুযোগ যখন একটা এসেছে, তখন তার সদ্ব্যবহার করা উচিত। বিশেষত খরচাপাতি যখন সব সরকারই দেবে।

কোনও এক রহস্যময় কারণে, এই ব্যাপারে গণি খান চৌধুরীর ছেলেদেরই বেশি উৎসাহ দেখা গেল। হাসিনার ছেলেমেয়ে তিনটে যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ায়, এটা ভালো দেখায় না। একটা কিছু ব্যবস্থা করা উচিত। তারা ঘুরে-ঘুরে জনমত সংগ্রহ করল। সবাই এ-ব্যাপারে একমত। এমন-কী, লাইনের চায়ের দোকানে সামসুল হক পর্যন্ত স্বীকার করল যে, হ্যাঁ, এই ব্যবস্থাটাই সবচেয়ে ভালো।

লাল মিঞা তো একেবারে খেপে উঠলেন। তিনি আজ প্লারলে আজই দিয়ে আসেন। এগিগেগিগুলো বিদায় হলে তিনি হাসিনার সুন্দর ভবিষ্যতের বন্দোবস্ত করে দেবেন। সবাই মিলে হাসিনাকে এমন বোঝাল যে হাসিনা আর না বলতে পারল না। বিশেষ করে পরোপকারী সামসুল হক পর্যন্ত এসে বলল, ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখবে। মানুষ হবে...। এত সব মাথাওয়ালা লোকেরা কি আর ভুল কথা বলে?

সুখেন্দুবাবুকে ধরাধরি করায় সে কিছু সাহায্য করল, বাকি ব্যবস্থা করে ফেলল গণি খান চৌধুরীর চৌকশ ছেলেরা। ফর্ম ফিলাপ করা-টরা শেষ।

একদিন সকালে হাসিনার তিন ছেলেমেয়েকে ভালো করে নাইয়ে, ভালো করে খাইয়ে নতুন জামাকাপড় পরিয়ে রওনা করে দেওয়া হল। সঙ্গে গেল গণি খান চৌধুরীর দুই ছেলে আর গিয়াস। অনাথ আশ্রমের অফিস ঘরে গিয়ে যখন কথাবার্তা বলছে, ছেলেমেয়ে তিনটে ভ্যাবাচ্যাকা মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে এক কোণে, সেই সময় হঠাৎ সেখানে আলুথালু চুলে, প্রায় পাগলিনীর বেশে হাজির হল হাসিনা।

সে চিৎকার চ্যাঁচামেচি করে বলতে লাগল, ওগো বাবু, ওদের ছেড়ে দাও। ওরা অনাথ নয়। আমি ওদের মা। যাদের মা থাকে, তারা কি অনাথ হয়? ওগো বাবু, তোমাদের পায়ে পড়ি।

ওরা আমাকে ছেড়ে কখনও থাকেনি, আমি ওদের পেটে ধরেছি।

ছেলেমেয়ে তিনটি ছুটে গিয়ে হাসিনাকে ঘিরে দাঁড়াল। অনাথ আশ্রমের কাউন্টারের একজন কেরানি বলল, দিস ইজ কলড্ ইউনিভার্সাল মাদারহুড! একটা যদি ক্যামেরা থাকত—

যাওয়ার সময় বাসে চেপে গিয়েছিল ছেলেমেয়েরা। ফেরার সময় এল হেঁটে। মাঠের মধ্যে দিয়ে ছুটতে-ছুটতে জাভেদ একটা ফড়িং ধরে ফেলল। হাসিনা বলল, ছেড়ে দে ছেড়ে দে হারামজাদা।

তার আগেই ফড়িংটা উড়ে পালিয়েছে। শুধু একটা ডানা ছিঁড়ে রয়ে গেছে ছেলেটার হাতে।

সিরাজ একটা ডোবায় নেমে তুলে আনল এক গোছা শাপলা। ওতে ভালো তরকারি হয়।

দেবদূত

আজ সবে বরাত। রাত্তিরবেলা বিছানায় শুয়ে খরখরে চোখ মেলে চেয়ে আছে হাসিনা। আজকের দিনটা তার খুব ভালো কেটেছে। অনেক, অনেকদিন পর এমন একটা চমৎকার দিন।

আজ হাসিনার ডাক পড়েছিল গিয়াসদের বাড়িতে। গিয়াসের দাদির মতন এমন সুন্দর একটা মানুষ দেখা যায় না। বয়েসের গাছপাথর নেই। চার কুড়ি তো হবেই, টুসটুসে একটা পাকা ফলের মতন চেহারা। এখনও দেখলে বোঝা যায় এক কালে ফরসা রং আর কী দারুণ রূপসি ছিলেন উনি। অতিশয় ধর্মপ্রাণ মহিলা। ওঁর বাপের বাড়ি হাজারিবাগ। এ গ্রামে একমাত্র উনিই পরিষ্কার উর্দু বলতে পারেন। সবে বরাতের উৎসব ওই বাড়িতেই সবচেয়ে বেশি জমজমাট।

কাজ কি কম! সকাল থেকে বাড়ির মেয়েরা বসে যায় চাল গুঁড়ো করতে। তারপর সেই চাল গুঁড়ো ছাঁকা হয়। তারও পর সেই চালের আটা মেখে তৈরি হয় রুটি। একখানা দু-খানা নয়, শয়ে-শয়ে। আজকের পুণ্য দিনটিতে বাড়িতে কোনও প্রার্থী এসে ফিরে যাবে না।

রান্নাঘরে রুটি গড়তে-গড়তে ফাঁকে-ফাঁকেই হাসিনা উঠে গেছে গিয়াসের দাদির ঘরে। উনি আজ সারাদিন পবিত্র কোরান পাঠ করলেন। তাঁর শোওয়ার ঘরে মেঝের ওপর ছোট জলচৌকি পেতে বসেছিলেন তার সামনে। এই বয়সেও কী সরল, উন্নত চেহারা। তিনি লেখাপড়া-জানা মহিলা, নিজের হাতে মুক্তোর মতন অক্ষরে কোরানের অনুলিপি প্রস্তুত করেছেন। পবিত্র এই গ্রন্থ পাঠের সময় তাঁর সুষমামণ্ডিত সুখখানিতে যেন একটা স্বর্গীয় আভা ফুটে ওঠে। হাসিনা সেদিকে মুগ্ধভাবে তাকিয়ে থাকে।

এক-একবার সে বলে, ও দাদিমা, একটু জোরে-জোরে পড়েন না, আমরাও একটু শুনি।

দাদিমা চোখ তুলে শান্ত স্বরে বলেন, শুনবি, আয় বোস।

তিনি পড়ে-পড়ে মানে বুঝিয়ে দেন, হাসিনা বিভোর হয়ে শোনে। এক অপূর্ব অনুভূতিতে তার মন ছেয়ে যায়। মনে হয় যেন এই পৃথিবীতে আর কোনও পাপ নেই, দুঃখ নেই, অশান্তি নেই, আছে শুধু আনন্দ।

রান্নাঘর থেকে ডাক পড়লেই সে ছুটে চলে যায়। কিন্তু তার মন পড়ে থাকে দাদিমার ঘরে। কখনও সে এত মন দিয়ে কোরান পাঠ শোনেনি। কম বয়েসে মন চঞ্চল ছিল, এখন তো তার বয়েসও তিরিশ পার হয়ে গেল।

গিয়াস মাঝে-মাঝে দু-একবার তরল চোখে তাকিয়েছিল তার দিকে। ইঙ্গিত করেছিল একটু গোপনে কাছে আসবার। কিন্তু হাসিনা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছিল সেই ডাক। আজ সে ঠিক করেই রেখেছিল, কোনও পুরুষমানুষের কাছে ঘেঁষবে না, মিথ্যে কথা বলবে না, আঁচলের তলায় চুরি করে খাবার আনবে না। সে শুদ্ধ ভক্তিমতী হয়ে দিনটা কাটিয়ে দেবে।

সেইরকমভাবেই দিনটা গেছে। সারা দিন ধরে গরিব-দুঃখীদের দান করা হয়েছে খাবার। সন্ধেবেলা কতরকম বাজি ফাটানো হল গিয়াসদের বাড়ির সামনে। পরবের দিনগুলোতে দাদিমা নিজের

তোরঙ্গ থেকে টাকা বার করে দেন। উঠোনের এক কোণে দাঁড়িয়ে হাসিনার ছেলেমেয়েরা জুলজুলে চোখে দেখছিল বাজি পোড়ানো, আজ আর ওরা কুকুরের মতো তাড়া খায়নি, শেষ অবধি ওরাও পেয়েছিল একটা করে তারাবাজি।

সন্ধের পর আজ আর হাসিনাকে আঁচলের তলায় লুকিয়ে খাবার আনতে হয়নি, তাকে দেওয়াই হয়েছে প্রায় চল্লিশখানা রুটি আর এক ভাঁড় মাংস। গিয়াসদের বাড়িতে কেউ বড় গোস্ত খায় না, ও বাড়িতে বরাবর খাসির মাংস আসে। সেই মাংসের মধ্যে চাকা-চাকা আলু। মাংসের চেয়েও মাংসের ঝোলে ডোবানো আলু খেতে এত ভালোবাসে জাভেদটা!

হাসিনার দু-হাত ভরতি খাবার, আর তার পেছনে-পেছনে লাফাতে-লাফাতে আসছিল ছেলেমেয়েরা। তাদের আর তর সইছে না, সুলুপ-সালুপ শব্দ করছে জিভ দিয়ে।

তখনও চলেছে কাঙালির দল। গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে ওরা আসে, লোকের বাড়ি-বাড়ি ভিখ মেঙে বেড়ায়। জানে আজ কোনও বাড়ি থেকে খালি হাতে ফিরবে না। সেরকম তিনজনের একটা ছোট দলকে থামিয়ে হাসিনা গুনে-গুনে ন'খানা রুটি দিয়ে দিল। গিয়াসের বাড়িতে সারাদিন দান চলেছে, হাসিনা নিজের হাতেও রুটি বিলিয়েছে। কিন্তু সে হল পরের বাড়িতে পরের জিনিস দেওয়া। তাতে তো হাসিনার নিজের দানের পুণ্য হয়নি! এখন হাসিনা তার নিজের রুটি দান করল। আহা, খাক, ওরাও খাক।

বড় আনন্দে গেল আজকের দিনটা, ছেলেমেয়েরা তৃপ্তি করে খেয়েছে, তারপর অনেক রাত পর্যন্ত গুটোপুটি করে এই তো খানিক আগে ঘুমোল। কিন্তু হাসিনা ঘুমোবে না, সে জেগে থাকবে।

আজকের রাতে আশমান থেকে আল্লার ফেরেস্তা নেমে এসে কপালে লিখন দিয়ে যাবেন। আজ দুনিয়ার কোনও মানুষকে খারাপ ভাবতে নেই, আজ কোনও পাপ চিন্তা করতে নেই। হাসিনা ঘুমোবে না, যদি স্বপ্নের মধ্যেও কোনও পাপ চিন্তা আসে। আর কত দিন এমন দুঃখে দিন কাটাবে? এবার যেন একটু সুদিন আসে।

হাসিনা জেগে আছে। সে কল্পনায় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ডানায় ভর দিয়ে বাতাস কেটে নেমে আসছেন দেবদূত। তীব্র জ্যোর্তিময় তাঁর রূপ। কখন তাঁর সময় হবে, কখন তিনি হাসিনার ঘরে আসবেন, শুধু সেই প্রতীক্ষা।

আজ আর পুকুরের পানিতে চাঁদের খেলা দেখতে পাওয়া যাবে না। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। প্রতি বছর সবে বরাতের রাতেই যেন ঠিক বৃষ্টি পড়ে। তখন পৃথিবী আরও বেশি নিঝুম হয়ে যায়। বাইরে বৃষ্টির শব্দ আর ঘরের মধ্যে ছেলেমেয়েদের নিঃশ্বাসের ভর্‌র-ভর্‌র শব্দ।

হঠাৎ একসময় ঘুলিয়ে উঠল হাসিনার শরীরটা। পেটের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল সাংঘাতিকভাবে। কয়েকবার এপাশ-ওপাশ ফিরেও হাসিনা সামলাতে পারল না নিজেকে। হুড়োতাড়া করে উঠে ছুটে গিয়ে বাইরের দাওয়ায় বসে বমি করল অনেকটা। বমির সঙ্গে-সঙ্গে হাসিনা কাঁদতে লাগল খুঁ-খুঁ করে।

কিছুদিন ধরেই হাসিনা সন্দেহ করেছিল অথচ কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায়নি, শেষপর্যন্ত সত্যি তাই হল। হাসিনা এ-বমির মর্ম বোঝে। এই জন্যই গত কয়েকদিন ঢিসঢাস করছিল শরীরটা। এর কারণ আর কিছুই না, হাসিনা আবার গর্ভবতী হয়েছে, আবার একটা শত্তুর এসেছে তার পেটে।

পরক্ষণেই সে জিভ কেটে বলল, ছিঃ, এ-কথা বলতে নেই। পেটের সন্তান কখনও শত্তুর হতে পারে? ও-কথা মনে করাও পাপ। যে আসছে, সে আসুক।

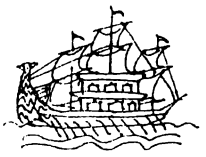

ওরা এই পৃথিবীর কেউ নয়

পঞ্চাশ টাকার নোটটা হাতে নিয়েই বসে রইলেন রশিদ খান। ছেলেমেয়ে দুটি এ-টাকা প্রত্যাখ্যান করেছে। ছেলেটি শুধু মাথা নেড়েছে হাত জোড় করে, মেয়েটি জিভ কেটে বলেছে, আমাদের প্রতিদিন মুদ্রা ছুঁতে নাই গো বাবু।

মাটির ভাঁড়ে চা খাচ্ছে সিলিপ্-সিলিপ্ শব্দ করে। একটু আগে আরদালি ওদের যথাযথ-ভাবে কাপ-প্লেটে চা দিতে এসেছিল। তখন মেয়েটি বলেছিল, মাপ করবেন গো, আমরা বাসন-কোসনে কিছু খাই না।

রশিদ খান ভাবলেন, টাকা নিতে চাইছে না কেন ওরা? পঞ্চাশ টাকা কি কম হয়েছে! একশো দিলে নেবে? মেয়েটি বলেছে, প্রতিদিন মুদ্রা ছুঁতে নাই। এর মধ্যে প্রতিদিন কথাটার মানে কী?

মেলার একটেরেয় পুলিশ সাহেবের রঙিন তাঁবু। এর নাম সুইস কটেজ। খানিক আগে একবার টহল দিতে বেরিয়ে রশিদ খান এই দুজনকে দেখতে পান। দুজনেরই বয়েস বেশি না। ছেলেটি বছর তেইশ-চব্বিশেক, মেয়েটি একুশ-বাইশ। দুজনেরই মুখে এখনও লেগে আছে কৈশোরের লাবণ্য। এলা মাটিতে ছোপানো একজনের ধুতি আর পিরান, অন্যজনের শাড়ি, দুজনেরই মাথার চুল চুড়ো করে বাঁধা।

সরকারিভাবে মেলা শেষ হয়ে গেছে গতকাল। এখন ভাঙা মেলা, ফেরার পালা। তবু মানুষজন আছে যথেষ্ট। ভিড়ের মধ্যে গান শোনা যায় না। নানা দিকে নানা অ্যামপ্লিফায়ারের ক্যাকোফোনি। তাই রশিদ খান ওদের ডেকে এনেছেন নিজের তাঁবুতে।

হাঁটতে হাঁটতেই তিনি জেনে নিয়েছিলেন, এরা কোনও প্রসিদ্ধ বাউলের চেলা নয়। এদের কোনও আখড়া নেই। দুজনে মিলে জুটি বেঁধেছে। এক জঙ্গলের মধ্যে নাকি ওদের দেখা হয়েছিল। কথা বলে বেশ টুসটুসে রস মিশিয়ে।

তোমাদের বাড়ি ছিল কোথায়? কোন গ্রামে? এই প্রশ্নের উত্তরে মেয়েটি বলেছিল, গ্রামে তো নয়, মরুভূমিতে। আর ছেলেটি বলেছিল, সাগরে, আমি ভাসতে-ভাসতে এসেছি।

আর গান শিখেছ কোথায়?

মেয়েটি বলেছিল, বাতাসের কাছ থেকে। কত শত গানই তো বাতাসে উড়ে-উড়ে এসে আমাদের কানে সেঁধিয়ে যায়। বাতাস না থাকলে তো কিছুই শোনা যায় না।

ছেলেটি বলেছিল মানুষ যখন কাঁদে, তখন তার মধ্যেও গান থেকে। তাই নয় কি বাবু?

রশিদ খান মাথা নেড়ে বলেছিলেন, ঠিক।

গানের অনেক মানুষই রূপক মিশিয়ে ভাবের কথা বলে। এসব শুনতে তাঁর মন্দ লাগে

টাকা বাউল তিনি বাউলরা তো আর যাযাবর
সংসার থাকে। টাকা-
য় কিছুটা ভোগবাদও
ি বাউল তার ছেলেকে বিদেশে

পড়তে পাঠাবে বলে পাসপোর্টের জন্য তাঁর কাছে সাহায্য চাইতে এসেছিল। যেখানেই বাউলরা গান শোনাতে যায়, সেখানে কি তারা কিছু টাকা-পয়সা আশা করে না? খুব বিনীত ভঙ্গিতে দরাদরিও করে। ট্রেনে যারা গান গায়—

রশিদ খান কখনও কারোকে ভিক্ষে দেন না। কেউ গলায় কাছা বেঁধে করুণ গলায় অভিনয় করে বাবার শ্রাদ্ধের জন্য সাহায্য চাইতে এলে তিনি বলেন, যে-ছেলে অন্যের সাহায্য নিয়ে বাবার শ্রাদ্ধ করে, তার বাবার আত্মার মুক্তি হয় না, ভূত হয়ে ফিরে আসে, তা জানো না?

কিন্তু ট্রেনে কেউ গান গেয়ে ভিক্ষে করলে রশিদ খান সবসময় কুড়ি-তিরিশ টাকা দেন তাকে। এটা ভিক্ষে নয়, একজন সংগীতশিল্পীর দক্ষিণা।

চা খাওয়া হয়ে গেছে। ছেলেমেয়ে দুটি এবার বিদায় নেবে। রশিদ খান ঝোঁকের মাথায় একটা কাণ্ড করে ফেললেন।

অনেকেই বলে, তাদের মধ্যে তাঁর কয়েকজন বন্ধুও, যে পুলিশ শুধু মানুষের কাছ থেকে নিতেই পারে, কোনও মানুষকে কিছু দেয় না। সেই কথাটা হঠাৎ মনে পড়ায় তিনি একটু হাসলেন। তারপর পকেট থেকে পার্সটা বার করে পঞ্চাশ টাকার নোটটা ঢুকিয়ে বার করলেন একটা পাঁচশো টাকার নোট।

সেটা বাড়িয়ে দিয়ে তিনি বললেন, এটা নাও, তোমাদের কাজে লাগবে।

এবারেও ছেলেটি হাত জোড় করে মাথা নাড়তে-নাড়তে পিছিয়ে গেল। মেয়েটি বলল, মাপ করেন গো বাবু, আজ আমাদের মুদ্রা ছুঁতে নাই।

ঈষৎ বিরক্ত হয়ে রশিদ খান বললেন, আজ ছুঁতে নাই মানে? আজ তোমাদের কোনো ব্রত আছে?

মেয়েটি হাসিতে মুখ ভরিয়ে বলল, না গো, ব্রত-ট্রত কিছু নাই। আজ আমাদের মন ভালো আছে।

বেশ, মন ভালো আছে। কিন্তু কিছু খেতে-টেতে তো হবে। খিদে-তেষ্টা তো থেমে থাকবে না।

মন ভালো থাকলে ক্ষুধা-তৃষ্ণা তেমন গায়ে লাগে না। কিছু খেলেও হয়, না খেলেও চলে।

তা-ও না হয় বুঝলাম। কিন্তু কাল যদি মন ভালো না থাকে, তখন যে হুহু করে ক্ষুধা-তৃষ্ণা বেড়ে যাবে।

আপনি আশীর্বাদ করেন গো বাবু, যেন কালও আমাদের এমনটিই মন ভালো থাকে।

এর পর আর কথা চলে না। রশিদ খান গুম হয়ে রইলেন।

নমস্কার জানিয়ে ছেলেমেয়ে দুটি তাঁবু থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

কয়েক মুহূর্ত পরেই রশিদ খান গা ঝাড়া দিয়ে উঠে হাঁক দিলেন, নিতাই, নিতাই! আরদালি, নিতাইকে ডাক।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিতাই এসে উপস্থিত। নীল রঙের হাফ হাতা জামা ও ধুতি পরা। তার সরু গোঁফের মতন চোখের দৃষ্টিও ছুঁচোল। সে একজন আধা-পুলিশ, ইনফরমার। পার্ট টাইম কাজ করে।

রশিদ খান বললেন, নিতাই, তোমাকে আমি একটা ডিউটি দিচ্ছি। এই যে ছেলেটা আর মেয়েটা বেরিয়ে গেল। তুমি ওদের খুব ডিসক্রিটল ফলো করবে। দেখবে ওরা কোথায় যায়, কী খায়, কাদের সঙ্গে মেশে, রাত্তিরে কোথায় থাকে। এখন ক'টা বাজে? পৌনে আটটা। রাত বারোটা পর্যন্ত তোমার এই ডিউটি, আমি সব ডিটেলস্ চাই।

নিতাই কুতকুতে ধরনের হাসি দিয়ে বলল, আপনি স্যার ঠিকই আন্দাজ করেছেন। এদাস্তি কিছু ছিনতাইবাজ আর ছিঁচকে চোর মাঝেসাঝে বাউলের ভেক ধরে থাকে। এমন অ্যাকটিং করে, যেন ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানে না। আপনার স্যার অভিজ্ঞ চোখ।

রশিদ খান বললেন, বটে! সেরকম কারোকে-কারোকে তুমি চেন নিশ্চয়ই!

নিতাই বলল, তা তো আলবত চিনি। কয়েক ব্যাটাকে ধরিয়েও দিয়েছি। আপনার নিশ্চয় মনে আছে স্যার, গত মাসে এক ডাকাতির আসামি আবার ধরা পড়ল, একবার পুলিশের ভ্যান থেকে লাফিয়ে পালিয়ে ছিল। সে ব্যাটাও তো আলখাল্লা পরে ঘাপটি মেরে ছিল এক বাউলদের ঠেকে। আমিই দূর থেকে আঙুল দেখিয়ে...

রশিদ খান জিগ্যেস করলেন, এই ছেলেমেয়ে দুটোও সেই দলের?

নিতাই বলল, তা এখনই ঠিক বলতে পারব না স্যার। এরা লাইনে নতুন এসেছে। আগে দেখিনি। তবে জানি, ছিনতাইবাজদের যে রিংটা আছে তারা এখন বেছে-বেছে অল্প বয়েসিদের রিক্রুট করছে।

রশিদ খান বললেন, যাও, আর দেরি কোরো না। যদি ওরা হারিয়ে যায়...

নিতাই চলে যাওয়ার পর রশিদ খান অধস্তন কর্মচারীদের সঙ্গে জরুরি কথাবার্তায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আজ ভাঙা মেলাতেও তিনটি ছিনতাইয়ের কেস ধরা পড়েছে। দুটো ধরা পড়েনি। একটা বাচ্চা মেয়ে হারিয়ে গেছে, একটা দোকানের ক্যাশ থেকে চুরি গেছে সাঁইতিরিশ হাজার টাকা...

এইসময় ওই ছেলেমেয়ে দুটির কথা তিনি ভুলে গেলেন, অথচ মনেও রাখলেন। অর্থাৎ মনের ওপরের স্তরে শুধু কাজের কথাবার্তা, আর ভেতরের স্তরে গাঁথা রইল ওদের মুখচ্ছবি।

সাড়ে ন'টার পর তিনি একলা থাকতে চান। এ সময় তাঁর কয়েক পাত্র হুইস্কি পান না করলে চলে না। ক্যাসেটে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বাজে। পুলিশের পরিচয়ের বাইরে তিনি একজন সংগীতপ্রিয় মানুষ এবং শখের কবি।

রশিদ খান তাঁর হেড কোয়ার্টারে বেশি থাকেন না, প্রায়ই ট্যুরে যান এদিক-সেদিক। পরিবারে তাঁর যে সেরকম কিছু অশান্তি আছে তা নয়। ঘুরে বেড়ানো তাঁর নেশা। বিভিন্ন ডাকবাংলোয় কিংবা তাঁবুতে থাকা তাঁর বেশ পছন্দ। অনেক সময় তাঁর কয়েকজন বন্ধুও সঙ্গে থাকে। এ বারেও দুজন কবি-বন্ধু ছিল। তারা ফিরে গেছে সন্ধের একটু আগে।

রাত্রি জাগরণেও তাঁর ক্লান্তি নেই। যথেষ্ট হুইস্কি পান করলেও তিনি সহজে বেএক্তার হন না বরং তার কান তখন অনেক বেশি স্পর্শকাতর হয়, গান বেশি করে মর্মে যায়।

রাত বারোটা পঞ্চাশে নিতাই তাঁবুর বাইরে থেকে সন্তর্পণে মৃদু গলায় ডাকল, স্যার, স্যার!

ভেতরে এসে নিতাই যে রিপোর্ট দিল তা বেশ সংক্ষিপ্ত এবং মামুলি। সত্যতার প্রমাণ দেওয়ার জন্য সে একটা ছোট খাতায় লিখে এনেছে। আটটা পঁচিশ, রথতলার টিউকলে জলপান, আবার হাঁটা, এক জায়গায় দুটো লরি অ্যাকসিডেন্ট করেছে, ওরা দাঁড়ায়নি। ন'টা দশ, একটা গাছতলায় বসল। পৌনে এগারোটায় আবার হাঁটা। সাইড রোড দিয়ে ব্যাক করেছে। বাঁকিপুরে যে পুরোনো শিবমন্দিরের চাতাল, বসল গিয়ে সেখানে। আরও কয়েকজন শুয়ে ছিল। ওরা খানিকটা দূরে। তার পর বারোটা পাঁচ পর্যন্ত নিতাই ওদের ওয়াচ করেছে।

না, গাঁজা খায়নি। অন্য কোনও লোকের সঙ্গে কথা বলেনি। কোনও খাবারও খায়নি, যত দূর মনে হয়, হয়তো একটা পুঁটুলিতে চিঁড়ে-মুড়ি থাকতেও পারে।

রশিদ খান জিগ্যেস করলেন, শিবমন্দিরের চাতালে গিয়ে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ল?

নিতাই বলল, না স্যার, আমি যতক্ষণ ছিলুম ওরা শোয়নি, মুখোমুখি বসেই ছিল, আর

গাইছিল গুনগুন করে।

কী গান গাইছিল, শুনেছিলে?

না স্যার, অত কাছে যাইনি, তবে একবার একটা পাখি ডেকে উঠল। ওই যে-পাখি রাত্তিরেও ডাকে—চোখ গেল, চোখ গেল বলে, হিন্দিতে বলে পিউ কাঁহা, সেই পাখিটা ডেকে উঠতেই এ মেয়েটা গলা মেলাল। পাখিটাও উত্তর দিল।

একটু থেমে নিতাই আবার বলল, একটা কথা বলব স্যার? আমার মনে হল, মেয়েটাই ছেলেটাকে পটকেছে। ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয়, ছেলেটা নরম-গরম, মেয়েটা ওস্তাদনি, ও-ই ছেলেটাকে বাপ-মায়ের কাছ থেকে টেনে এনেছে। এখন হিঁদু আর মোছলমান হলেই গণ্ডগোল হতে পারে। এই সব প্রেম তো পাবলিক পছন্দ করে না। একবার বক্রেশ্বরে এক গোয়ালাদের মেয়েকে নিয়ে একটা মোছলমান ছেলে পালিয়েছিল—

রশিদ খান হাত তুলে নিতাইকে থামতে বললেন।

নিতাই তবু বলল, স্যার, কাল আবার ওদের ফলো করব? যদি জাত-ফাতের গণ্ডগোল থাকে...

রশিদ খান বললেন, এ সব নিয়ে তুমি বিনোদ চ্যাটার্জির সঙ্গে কথা বলো। আমাকে আর কিছু রিপোর্ট করার দরকার নেই!

রশিদ খান ওই ছেলেমেয়ে দুটি সম্পর্কে আগ্রহ হারিয়ে ফেললেন। জাতফাতের ব্যাপার নিয়ে তিনি মাথা ঘামাতে রাজি নন। পাঁচশো টাকার নোট নিতে অস্বীকার করার জন্যেই তিনি ওদের সম্পর্কে কৌতূহলী হয়েছিলেন। হয়তো ভালো বংশের ছেলেমেয়ে, হয়তো জমানো টাকা আছে। ওরা যে গান গেয়েছিল, তা আহামরি কিছু নয়, মাঝারি গোছের বলা যেতে পারে। রশিদ খান তেমন কিছু বাউল গানের ভক্তও নন, দুতিনখানার বেশি শুনতে চান না, একঘেয়ে লাগে। তাঁর মন মজে আছে মার্গ সঙ্গীতে। সুতরাং ওই বাউল যুগলকে মনে রাখার কোনও কারণ রইল না।

দু-দিন পর তিনি ছেলে ও মেয়েটিকে আবার দেখতে পেলেন আমেদপুরের রাস্তায়। সারা সকাল আকাশ মেঘে কালো হয়েছিল। শোনা যাচ্ছিল গুরুগুরু শব্দ, সূর্যকে দেখা যায়নি। দুপুরের পর শুরু হয়েছে বর্ষণ, আকাশ যেন পুকুর ঢেলে দিচ্ছে।

গাড়ি নিয়ে বোলপুরের দিকে যেতে-যেতে তিনি ড্রাইভারকে বললেন, থামো থামো!

বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে ছেলেটি ও মেয়েটি। বৃষ্টির জন্য কোনও ভ্রূক্ষেপই নেই, জ্যোৎস্নার মধ্যে বসন্ত বাতাসেও মানুষ এভাবে হাঁটতে পারে।

জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে রশিদ খান বললেন, এই ভিজছ কেন? উঠে এসো, উঠে এসো।

দুজনেই হাসিমুখে তাকাল তাঁর দিকে। হাত তুলে নমস্কার করল।

রশিদ খান আবার বললেন, ওঠো, গাড়িতে উঠে এসো।

ছেলেটি বলল, কেন সাহেব, আমাদের হাঁটতেই ভালো লাগছে।

রশিদ বলল, তা বলে এভাবে ভিজবে? অসুখ করবে যে!

মেয়েটি বলল, এই যে গাছপালা ভিজছে? ওই যে মাঠে কয়েকটা গোরু, ওরা ভিজছে। ওদের তো কোনও অসুখ করে না!

গাড়িতে অন্য পুলিশরা হেসে উঠল।

রশিদ খান বললেন, ওদের সঙ্গে বুঝি মানুষের তফাত নেই? মানুষ তো জামাকাপড় গায়ে দেয়।

মেয়েটি বলল, আমরা বৃষ্টিকে ডাকছিলাম, কখন বৃষ্টি আসবে, কখন বৃষ্টি আসবে। এখন বৃষ্টি এসেছে, আমরা যদি পালিয়ে যাই বৃষ্টি রাগ করবে না?

রশিদ খান তাঁর এক সহকর্মীর দিকে তাকিয়ে বললেন, পাগল আর কাকে বলে। অবশ্য বয়েস কম, ভিজুক। ভিজুক যত ইচ্ছে।

গাড়িটা ওদের ফেলে বেরিয়ে গেল।

দিল্লি থেকে একজন বেশ বড় গোছের ভি আই পি আসছেন শান্তিনিকেতনে। তাঁর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিখুঁত করার জন্য রশিদ খানকে এখন প্রায়ই আসতে হচ্ছে এদিকে।

যাওয়া-আসার পথে আমেদপুরের রাস্তাতেই আবার দেখতে পেলেন ছেলেটিকে এক বিকেল-সায়াহ্নের আলো-আঁধারিতে। গুপিযন্ত্র বাজিয়ে গান গাইছে, এক গাছতলায় নির্জনে।

ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বললেন, খানিকটা এগিয়ে গিয়েও গাড়িটা আবার পিছিয়ে এল। ওরা কী খায়! কেমন করে খাওয়া জোটায়, এটাই তিনি জানতে চান।

ওদের দেখেও ছেলেটি গান বন্ধ করল না। রশিদ খান ধারে-কাছে কোথাও মেয়েটিকে দেখতে পেলেন না। অথচ তাঁর মনে হয়েছিল, ওরা অবিচ্ছেদ্য।

তিনি এখন ব্যস্ত, তাই গান শেষ হওয়ার অপেক্ষা না করেই তিনি জিগ্যেস করলেন, ওহে তোমার সঙ্গীনীটি কোথায় গেল? সেই যে মরুভূমির মেয়ে?

ছেলেটি গান থামিয়ে ভক্তিভরে নমস্কার জানিয়ে মৃদু গলায় বলল, সে তো এখানে নেই। তাকে মরুভূমির মানুষরাই নিয়ে গেছে।

রশিদ খান বুঝতে না পেরে বললেন, মরুভূমির মানুষরা মানে? ওদের বাড়ির লোকজনরা?

ছেলেটি বলল, না গো বাবু। মরুভূমির মানুষরা যাদের হৃদয়ে দয়া-মায়া কিছু নেই।

এ বারে অস্থির হয়ে খানিকটা ধমক দিয়ে বললেন, রহস্য ছাড়ো। সোজা কথায় বলো, কারা নিয়ে গেছে? জোর করে?

ছেলেটি বলল, চার-পাঁচজন জোয়ান-মদ্দ, মনে হয় যেন তারা পাতালের প্রাণী, হাতে লাঠি-সোঁটা, সবলে নিয়ে গেল।

রশিদ খান বললেন মেয়েটাকে কেড়ে নিয়ে গেল, তুমি কিছু করতে পারলে না?

ছেলেটি নিরুত্তাপ গলায় বলল, অত জনকে রুখব, সে-শক্তি তো ভগবান আমাকে দেননি। আপনি থাকলে পারতেন।

রশিদ খান বুঝলেন, এ প্রশ্নটা করা তাঁর উচিত হয়নি। এ ছেলেটাকেও যে খুন করে রেখে যায়নি, সেটাই আশ্চর্যের!

কখন এটা ঘটেছে?

আজকের দিনটা গেল। কালকের রাত, তার পরের দিন যখন শুরু, সবে মাত্র পাখি ডেকেছে।

তুমি এর মধ্যে আমাকে খবর দাওনি কেন?

আজ্ঞে, আমি এ-জায়গা ছেড়ে যাই কী করে? সে যখন ফিরে আসবে, তখন যে আর আমাকে খুঁজে পাবে না।

রশিদ খানের চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। ফিরে আসবে? ওরা আর ফিরে আসে না। নারীহরণের ঘটনা সম্প্রতি বেড়েছে। মেয়েটির তেমন কিছু রূপের জেল্লা না থাকুক, শরীরটা তো বাঁকাচোরা নয়, সুস্বাস্থ্যের একটা দীপ্তি আছে। ওইসব লোকদের চোখে সে শুধু লোভনীয় নারী-মাংস। আজকাল গাছতলার নীচে পথিকরাও ঘুমোয় না।

ধরে নিয়ে গিয়ে শুধু ধর্ষণ নয়, তার পর খুন করে ফেলাটাই এখনকার রেওয়াজ। ছ-সাত বছরের মেয়েকেও ধর্ষণ করে। তাতেও আনন্দ পায়? না, আনন্দ-টানন্দ কিছু নয়, সে-বোধ যাদের থাকে, তারা রক্ত দর্শন করে না। ধর্ষণের পর বিক্রিও করে দেয়, অনবরত জ্যান্ত মেয়ে-শরীর চালান

যাচ্ছে দেশ-বিদেশে।

প্রথমে ছেলেটার ওপরেই খানিকটা রাগ হল তাঁর। এ ছেলেটা এত অপদার্থ কেন? শুধু কাব্য করলে চলে? সঙ্গিনীর নিরাপত্তার কথা না ভেবে মন্দিরের চাতালে কিংবা গাছতলায় শুয়ে থাকছে? এ তো ওদের লোভ দেখানো।

তিনি কর্কশ গলায় বললেন, থানাতেও খবর দাওনি, শুধু এখানেই বসে থাকলে চলবে?

ছেলেটি বলল, আমার তো অন্য কোথাও যাবার উপায় নেই। সে এখানেই ফিরে আসবে যে! এখানেই আবার দেখা হবে।

যারা জোর করে তাকে ধরে নিয়ে গেছে, তাদের হাত ছাড়িয়ে সে ফিরবে কী করে?

ফিরতে তো তাকে হবেই। যদি বাঁধন ছিঁড়তে না পারে, তা হলে বাঁধনের মধ্যেই সে ডুব দেবে।

ধরো যদি সত্যিই সে ফিরে না আসে?

বললাম তো বাবু, কোনও বাঁধনই তাকে ধরে রাখতে পারবে না। শরীরটা পড়ে থাকবে, কিন্তু সে আর থাকবে না সেখানে। আর তাই-ই যদি হয়, তা হলে সে খবরও আমি ঠিক পেয়ে যাব। এখানে বসে বসেই পাব। বাতাস শুনিয়ে যাবে। তখন আমি আর এখানে বসে থেকে কী করব। এই খাঁচা থেকেও পাখিটাকে উড়িয়ে দেব।

রশিদ খান মনে-মনে বললেন, এ যে দেখছি এ যুগের রোমিও-জুলিয়েট। আদিখ্যেতা আর কাকে বলে! তার পরেই তিনি তাঁর সহকর্মীদের দিকে ফিরে তীব্র ঝাঁজের সঙ্গে বললেন, বিনোদবাবু, আপনারা কী করতে আছেন? প্রায় প্রত্যেক দিনই যে একটা-দুটো মেয়েকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে...

বিনোদবাবু বললেন, স্যার, এফ আই আর করা হয়নি।

আরও গলা তুলে রশিদ খান বললেন, জেনারেল সিচুয়েশন যে এত খারাপ হচ্ছে, সেটা আপনারা দেখবেন না। এফ আই আর-এর নিকুচি করেছে। ক্রাইম হওয়ার আগে প্রিভেনশনও বুঝি পুলিশের কাজ নয়? সেসব বুঝি ভুলে গেছেন। শুনুন, আমি আপনাদের ঠিক আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় দিচ্ছি, এর মধ্যে মেয়েটাকে খুঁজে বের করতেই হবে। আগে দেখুন, কাছাকাছি তার বডি পাওয়া যায় কি না! যদি না পাওয়া যায়, ওয়েল অ্যান্ড গুড, তাকে কোথাও আটকে রেখেছে পাচার করার জন্যে। সেই সব গ্যাং-এর যে-কোনও একটাকে ধরুন। আপনারা চেনেন, আমি জানি। ওরা একদমেই মেয়েগুলোকে অনেক দূর নিয়ে যায় না। থেমে-থেমে যায়। ওদের অনেক হাইড আউট থাকে। রেল পুলিশকে অ্যালার্ট করুন। বর্ধমান আর মুর্শিদাবাদের এস পি-দের মেসেজ পাঠান। আমি বেশি রাত্তিরে ওঁদের সঙ্গে কথা বলব।

পুলিশ অনেক কিছু পারে না। আবার অনেক কিছু পেরেও যায়। যা পারে না, তা বোধহয় পারতে চায়ও না। আর যা পারতে চায়, তা পেরে যেতে দেরি হয় না।

আটচল্লিশ ঘণ্টার একটু আগেই সেই বাউল সঙ্গিনীটিকে উদ্ধার করা হল হেতমপুরের এক পোড়ো বাড়ি থেকে। মৃত নয়, জ্যান্ত। সঙ্গে আরও সাতটি মেয়ে।

টেলিফোনে খবর দেওয়া হল রশিদ খানকে। অন্য মেয়েদের থানায় রেখে এই মেয়েটিকে নিয়ে আসা হল তাঁর কাছে। তিনি তখন বোলপুরের পি ডব্লিউ ডি বাংলোতে অবস্থান করছেন।

মেয়েটির দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন তিনি। এই কয়েকটা দিনেই তাকে অনেক শীর্ণ মনে হচ্ছে। চোখের নীচে যেন কেউ লেপে দিয়েছে ভুসো কালি। পোশাক ধূলিমলিন, কাঁধের কাছে একটু ছেঁড়া। কিন্তু শরীরে দৃশ্যমান আঁচড়-কামড়ের দাগ নেই। চুল খোলা বলে তার মুখটাও একটু অন্যরকম।

রশিদ খান একটু পরে কোমল গলায় জিগ্যেস করলেন, তোমার খুব কষ্ট হয়েছে, তাই না?

সে দু-দিকে আস্তে-আস্তে মাথা নেড়ে বলল, না—তেমন কিছু নয়।

রশিদ খান আবার বললেন, তোমার ওপর ওরা, ইয়ে মানে, অত্যাচার করেছে?

মেয়েটি বলল, শরীরটাকে যদি কখনও মনে করা যায়, এটা আমার নয়...মানে এ শরীর আর নিজের নয়, এই বোধ পাকা হলে তখন কে কী অত্যাচার করল না করল, তাও তো বোঝা যায় না। তখন শরীর হয়ে যায় দেহ। তার কোনও সাড়া শব্দ নেই।

বেশ চিন্তিত হয়ে রশিদ খান বললেন, এ তো উচ্চাঙ্গ জ্ঞানের কথা। তুমি এত কম বয়েসে এ সব শিখলে কী করে?

মেয়েটি বলল, আমি তো কিছু শিখিনি। আমি শুধু আমার মনটাকে বোঝবার চেষ্টা করি। মনই তো সব কথার উত্তর দেয়।

তোমাকে যখন ওরা জোর করে তুলে নিয়ে গেল, তখন তুমি ভয় পাওনি?

মরুভূমিতে তো কতরকম বিপদ-আপদই ঘটে। কত মানুষ অসময়ে হারিয়ে যায়। আবার এই সবের মধ্যেই তো কত সাধ-আহ্লাদ!

শেষ কথাটুকু না শুনেই রশিদ খান চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাঁর মনে পড়ে গেছে সেই ছেলেটির কথা। সে বলেছিল, গাছতলাতেই বসে থাকবে। আরও বলেছিল, বাতাস তাকে দুঃসংবাদ দিলে সেও এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে। বাতাসে তো কত রকম ভুল খবর, দুঃসংবাদ ছড়ায়। এর মধ্যে ছোকরাটি আবার আত্মহত্যা-টত্যা করে বসেনি তো? তখন এই মেয়েটি, আবার রোমিও-জুলিয়েট?

এই দু-দিন ভি আই পি-ব্যস্ততার জন্য তিনি ছেলেটির কোনও খবর নিতে পারেননি।

তিনি ব্যস্ত হয়ে বললেন, গাড়িতে স্টার্ট দাও, এক্ষুনি যেতে হবে।

গাড়িতে বসে মেয়েটির সঙ্গে আর কোনও কথা হল না। তাঁর মনে পড়ল রজনীকান্তের একটা গান, 'যবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাই...'। সংসারটাকে মরুভূমির সঙ্গে তুলনা দেওয়ার একটা ধারণা এদের মধ্যেও চালু আছে। আর ছেলেটি যে বলেছিল সাগরের কথা, ভব সমুদ্র তো বলেই। বই না পড়েও এরা এগুলো শিখে যায়।

তিনি ভাবতে চেষ্টা করলেন, এ বার দেখা হবার পর দুজন প্রথমে কী বলবে?

তিনি কল্পনায় দেখলেন, সেই গাছতলায় পৌঁছবার পর গাড়ি থেকে নেমেই মরুকন্যাটি ছুটতে ছুটতে গেল সেই সাগর-সন্তানের দিকে। কোনও কথা নয়, পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে শুধু কান্না।

কান্নার মধ্যে মিলনদৃশ্য যেমন মধুর, তেমনই দুর্লভ। ছেলেটা বলেছিল, মানুষের কান্নার মধ্যেও গান থাকে। ঠিকই বলেছিল।

আসলে কিন্তু তেমন ঘটল না। সেই গাছতলায় এসে গাড়িটা থামল রাস্তার উলটো দিকে। ছেলেটি বসে আছে গাছের গুঁড়িতে ঠেসান দিয়ে, যেন সে এই ক'দিন ওখান থেকে একবারও ওঠেনি। যেন সে গৌতম বুদ্ধের মতোন বসে আছে সাধনায়। আকাশ আজ পরিষ্কার, জ্যোৎস্নায় তাকে দেখা যাচ্ছে আবছাভাবে।

মেয়েটি আস্তে-আস্তে নামল গাড়ি থেকে। দৌড়ে গেল না। সে বলে উঠল, সেই ফুল কোথায় গেল গো, যে ফুলে ভ্রমর বসেনি...

ছেলেটি উঠে দাঁড়াল না, কোনও উত্তেজনা নেই। সে বলে উঠল, নদীতে নাই জলের ধারা, নদী আছে সেইখানে।

সুর দিয়ে বলছে ছেলেটি, মেয়েটির বাণীতেও একটু সুর ছিল।

মেয়েটি আবার সুর করে বলল, একাদশীর চাঁদ উঠেছে, বাজিছে মোহন বাঁশি
ছেলেটি গাইল, পিঁপড়ায় মধু খেয়েছে, পিঁপড়া এখন দিক জানে না
মেয়েটি গাইল, অচিন দেশের নাইয়া এখন নাওয়ের মধ্যে ঘুমায়
ছেলেটি গাইল, চক্ষু ভরে দেখছ রে মন, চক্ষু কিন্তু মন দেখেনি

বিস্ময়ে রশিদ খানের চোখ দুটি ঠিকরে পড়ার মতন অবস্থা। এ রকম বিপর্যয়ের পরও দেখা হতে ওরা গান গাইছে? এ কি হিন্দি সিনেমা? এটা ওদের দেখানেপনা!

তার পরেই তিনি বুঝলেন, এর মধ্যে একটুও কৃত্রিমতা নেই। এ গান ঠিক সংলাপও নয়, চরণের শেষে মিল নেই। যেন আলাদা-আলাদা গানের লাইন। পরস্পরের কুশল সংবাদের বদলে গানের বিনিময়। কিংবা, এ কি কোনও গুপ্ত সংকেতের ভাষা? এর মধ্যে রয়েছে এক তীব্র আকুতি, যেন দুটি পাখির সাড়া দেওয়া ডাক।

হঠাৎ এক তীব্র ভালোবাসার আবেগে রশিদ খানের বুক ভরে গেল। তিনি একবার কেঁপে উঠলেন।

তাঁর উপলব্ধি হল, আর কোনও মানুষের সঙ্গে তুলনা হয় না। নিশ্চিত ওরা এই পৃথিবীর কেউ নয়। ওরা এই পৃথিবীর কেউ নয়, একটু বেড়াতে এসেছে। ইচ্ছে করলেই ওরা এই মরুভূমি ছেড়ে চলে যেতে পারে যে-কোনও সময়ে।

ওরা কি সেই কথাই বলতে চাইছে গানের মধ্যে। তাহলে তো এখনি ওরা অদৃশ্য হয়ে যাবে। সে দৃশ্য দেখতে নেই।

এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে রশিদ খান চক্ষু বুজে ফেললেন। কতক্ষণ লাগবে অদৃশ্য হতে? বড় জোর দশ সেকেন্ড, তার মধ্যেই ওরা দুজনে দুজনকে ছুঁয়ে ফেলবে হাত বাড়িয়ে।

তিনি মনে-মনে গুনতে লাগলেন, এক দুই তিন চার...



বিষ্ণু জ্যাঠামশাইয়ের প্রত্যাবর্তন

রজনীগন্ধার ঝাড়ে আজ প্রথম ফুলের ছড়া এসেছে।

নতুন বাড়ি, নতুন বাগান। পাড়াটাও নতুন। ইস্টার্ন বাইপাসের ধারে গড়ে উঠছে নতুন বসতি। সবক'টা বাড়িই ঝকঝকে। বাড়ির সঙ্গে একটা বাগান থাকার বিলাসিতায় এখনও ঠিক ধাতস্থ হতে পারেনি সুকোমল। প্রত্যেক দিনই ফেরার পর একটুক্ষণ সে অবাক হয়ে দেখে। আগে সে ফুলটুল গ্রাহ্য করত না।

ঠিক সাদা নয়, একটু সোনালি আভা আছে এই রজনীগন্ধায়। সুকোমল ফুল ছিঁড়বে না, গন্ধ নেওয়ার জন্য নাকটা কাছে নিতেই কোথা থেকে একটা ভোমরা এসে পড়ল, প্রায় নাকের সঙ্গে ছোঁয়া লেগে যায় আর কী! ভয় পেয়ে সরে এল সুকোমল।

ওরা কী করে খবর পায়? আজই প্রথম ফুল ফুটেছে বাগানে, অমনি একটা ভোমরা চলে এসেছে। ভোমরা, না ভ্রমরা? কবিরা ভ্রমর ভালোবাসে, কালিদাস শকুন্তলা নাটকে মেয়েদের ঠোঁট আর ভ্রমর নিয়ে চমৎকার ইয়ার্কি করেছেন। অবশ্য বাংলা কবিতায় 'তোমরা'র সঙ্গে 'ভোমরা'র

মিল ভালো হয়। কিংবা, এটা কি ভিমরুল অথবা গুবরে পোকা? হতেও পারে। কিন্তু কবিতায় ওরা স্থান পায় না।

নতুন বাড়িতে কী করে যেন ঠিক টিকটিকিও চলে আসে। সুকোমল এর মধ্যেই রান্নাঘরে দুটো টিকটিকি দেখেছে। বাগানের কোনও গাছই বড় হয়নি। আম, লিচু ও সবেদা গাছ লাগান হয়েছে। কবে ফল ফলবে ঠিক নেই, তবু পাখি এসে বসে। বিনা মজুরিতে মিষ্টি আওয়াজ শুনিয়ে যায়।

একতলায় ঘরগুলো বন্ধ। সুকোমল সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল দোতলায়। বিকেল প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। অপসৃময়মান আলোয় সারা বাড়িটা আরও নিঝুম মনে হয়।

জয়া থাকলে অন্যরকম মনে হত।

একজন মাত্র মানুষের থাকা-না-থাকার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করে। যে-কোনও একজন নয়, গৃহকর্ত্রী কিংবা গৃহিণী। সে না থাকলে বাড়ি ঠিক গৃহ হয় না। সেই জন্যেই সংস্কৃতে বলে গৃহিনি গৃহমুচ্যতে। জয়া যদি দোকানপাটে যায় কিংবা কয়েক ঘণ্টার জন্য সল্টলেকে বাপের বাড়িতে, তখনও এরকম ফাঁকা লাগে না। রাত্তিরেও সে ফিরবে না, এই বোধটাই নির্জনতা এনে দেয়।

অথচ, জয়া কয়েকটা দিন থাকবে না বলেই সুকোলের মনটা বেশ হালকা হয়ে আছে। কিংবা উৎফুল্লও বলা যেতে পারে। জয়ার সঙ্গে তার ঝগড়াঝাঁটি কিছু হয়নি। ভালোবাসার সম্পর্কে মাঝে-মাঝে দু-একটা আঁচড় লাগলেও চিড় ধরেনি। এখনও বেশ ফষ্টিনষ্টি হয়। অর্থাৎ জয়া থাকলে যেমন ভালো লাগে, তেমন জয়া নেই বলেই যে মনের মধ্যে খানিকটা ফুরফুরে হাওয়া বইছে, তাও অস্বীকার করা যায় না।

জয়ার অনুপস্থিতিতে সে কোনওরকম অপকর্মের পরিকল্পনাও করেনি। শুধু সন্ধের পর নিঃসঙ্গতাকে আদর করবে।

দোতলায় চওড়া বারান্দা। বেতের চেয়ার। এখানে বসলে এমনও মনে হতে পারে যে এটা মধুপুর কিংবা শান্তিনিকেতন। এই দিকটা এখনও খোলা, চোখে পড়ে একটা পুকুর।

দুলালকে ডাকতে হল না, সে চা নিয়ে এল। দুলালের জন্য পেছন দিকে একটা ঘর করে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য টালির চাল। নির্মাণে ত্রুটি আছে, এরই মধ্যে বৃষ্টির সময় ভেতরে জল পড়ে। মিস্ত্রিরা কি ইচ্ছে করে কাজের লোকের ঘরটা খারাপ করে বানিয়েছে? ওরাও তো দুলালের মতনই গরিব।

দুলাল চায়ের সঙ্গে তিনখানা চিঠিও এনে রাখল টেবিলে। তারপর জিগ্যেস করল, রাত্তিরে কী খাবেন? মুরগির ঝোল করে দেব? মাছও আছে।

এ যেন হোটেল কিংবা ডাকবাংলো। অন্য সময় জয়াই এসব ঠিক করে। এখন সে ইচ্ছেমতন খাবারের অর্ডার দিতে পারে। নিজের বাড়িতে বসে হোটেল কিংবা ডাকবাংলোর স্বাদ।

নিজের বাড়িও ঠিক নয়।

ঠিক সাড়ে ছটার সময় সে বাথরুমের জানলার পাশে এসে দাঁড়াল। পরদার আড়ালে চোরের মতন নিজেকে লুকিয়ে। আলো জ্বালেনি।

সামনে রাস্তা, পেছন দিকেও এখনও বাড়ি ওঠেনি। কিন্তু ডানদিকে, বাঁ-দিকে পরপর বাড়ি। ডানদিকের কাঁচা হলুদ রঙের বাড়িটির দোতলার বাথরুমে প্রত্যেকদিন এইরকম কাছাকাছি সময়ে একটি কিশোরী মেয়ে গা ধোয়। অবশ্যই তার জানলা বন্ধ থাকে। ঘষা কাচ। আলো জ্বলা থাকে বলে দেখা যায় তার ছায়ামূর্তি।

নগ্ন হতেও পারে। বয়েস পনেরো বা ষোলো। ওই বয়সের মেয়েরা স্নানের সময় সব কিছু খুলে ফেলে কি না, তা সুকোমল জানবে কী করে? তবে ছায়ার মতন মেয়েটি গায়ে জল ঢালে, সাবান মাখে, নীচু হয়, এদিকে ফেরে, ওদিক ফেরে, ঠিক যেন ছায়ানৃত্য।

স্নান বা গা ধোওয়া শেষ করে মেয়েটি বাথরুম থেকে বেরিয়ে যখন অন্য ঘরে যায়, তখন

তার জাঙিয়া ও ব্রা-পরা শরীর দেখা যায় এক ঝলক বিদ্যুতের মতন, কোনও-কোনওদিন পুরো পোশাকেই থাকে। সেটা এমন কিছু নয়, ওই বাথরুমের ছায়ানৃত্য দেখতেই বেশি ভালো লাগে। প্রায় রোজই সে দেখতে আসে, নেশার মতন। জয়া থাকলেও, ঠিক এই সময় সুকোমল বাথরুমের দরজা বন্ধ করে দেয়।

এর বেশি কিছু নয়। সুকোমল কোনওদিনই মেয়েটিকে কোনও ইঙ্গিত করে না, আলাপও করতে চাইবে না, শুধু দেখা, যেমন সুন্দর কিছু দেখা, যেমন বাগানের ফুল সে এখনও ছেঁড়ে না, যেমন ঝরনার জলে সে কখনও হিসি করে না, যেমন সে কোনও ছবির মাঝখানে হাত রাখে না।

ফিরে এসে সে চিঠিগুলো পড়ল।

দুটো চিঠি এলেবেলে, তৃতীয় চিঠিটি পড়তে-পড়তে তার ভুরু কুঁচকে গেল। এক জ্যাঠামশাই চিঠি লিখেছে, শনিবার বিকেলে তিনি সুকোমলের সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। তাঁর একটা বিশেষ কথা আছে।

সুকোমল বিষ্ণু জ্যাঠামশাইয়ের মুখখানা দেখতে পেল।

সুকোমল শনিবার বিকেলে বাড়ি থাকবে কি না, কিংবা তার কোনও অসুবিধা আছে কি না, তা জ্যাঠামশাই জানতে চাননি, সরাসরি তাঁর আসার কথা ঘোষণা করেছেন।

জয়া নেই বলে সুকোমল কয়েকটা দিন চমৎকার একাকিত্বের স্বাধীনতা উপভোগ করছে, এর মধ্যে এক জ্যাঠার উপদ্রব। যাঁর প্রতি সুকোমলের বিন্দুমাত্র পারিবারিক দায়িত্ব নেই। কোনও টান নেই। বিষ্ণু জ্যাঠাকে অনেক বছর দেখেইনি সুকোমল, বেঁচে যে আছেন, তাও খেয়াল করেনি। ওর এক ছেলে পরিতোষের সঙ্গে মাঝে-মাঝে দেখা হয়েছে কোনও নেমন্তন্ন বাড়িতে। পরিতোষ কোনও হাসপাতালের ডাক্তার, বাড়ি করেছে কল্যাণীতে। সুকোমল যোগাযোগ রাখে না।

সুকোমল ইচ্ছে করলেই বিষ্ণু জ্যাঠাকে নিষেধ করে দিতে পারে। পরিতোষের নিশ্চিত টেলিফোন আছে, সুকোমল জানিয়ে দিতে পারে যে আগামী অন্তত তিন মাসের মধ্যে তার সময় হবে না। তিনমাস পরেও যদি বুড়োটা বেঁচে থাকে, তখন তৈরি করা হবে অন্য ছুতো।

তবু চিঠিখানা হাতে নিয়ে সুকোমল হাসতে লাগল আপনমনে।

॥ ২ ॥

যে-কোনও রাস্তায় কোনও গাড়ির অ্যাকসিডেন্ট হলেই সুকোমলের মনে হয়, নিশ্চয়ই তাতে তার চেনা কেউ আছে। সে উৎকণ্ঠামাখা মুখ নিয়ে উঁকি মারবেই, ভিড় ঠেলেঠুলে। দেখতে চায় আহত বা নিহত মানুষের মুখ। দেখেই চোখ ফিরিয়ে নেয়, আপনজন না হলে ওইসব মুখ সে মনে গেঁথে রাখতে চাইবে কেন?

একদিন অটোমোবাইল অ্যাসোসিয়েশনের বারে, অনেক রাতে, বেশ কয়েক পাত্র পান করবার পর সে বন্ধুদের হঠাৎ বলেছিল, জানিস, একদিন আমার চোখের সামনে...বাস চাপা পড়ে...আমি মরে গেলাম।

বন্ধুরা হেসে উঠল।

বাক্যটার অসঙ্গতি বুঝতে না পেরে সুকোমল বিরক্তভাবে বলে উঠল, হাসছিস কেন? এতে হাসির কী আছে।

বন্ধুরা তবু হাসছে। মাতালের অশালীন হাসি। তবু বুঝতে পারেনি সুকোমল, বিরক্তি

রূপান্তরিত হল রাগে, সে চিৎকার করে উঠল, এটা হাসির কথা? অ্যাঁ? আমি সত্যিই দেখেছি, বিজিত বাসের তলায়—

পাশের সঙ্গীটি বলল, তাই বল! বিজিতের কথা জানি। কিন্তু তুই একটু আগে কী বললি?

কী বলেছি?

তুই বললি, তুই নিজে মরে গেছিস, নিজের চোখে দেখেছিস।

মোটেই সে কথা বলিনি।

হ্যাঁ বলেছিস! আর খাস না।

সুকোমল অন্যদের মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেল। অন্যরা চলে গেল অন্য গল্পে।

নেশার সময় কথা জড়িয়ে যায়। বাক্য গঠন ঠিক থাকে না। এরকম হতেই পারে। তবু সুকোমল মাথার চুল খিমচে ধরে ভেবেছিল, nyctophobia, নিজের জমিতে, অন্যের বাড়িতে শুয়ে থাকার অনুভূতিকে কী বলে? এ যেন, নিজের দেশ আছে নাগরিকত্ব নেই।

সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে ঠেসে দিতে গিয়ে সুকোমলের হঠাৎ মনে পড়ে গেল, ষোলো বছর বয়সে, এই বিষ্ণু জ্যাঠারই বড় ছেলে বাঁটুলদা তাকে বিড়ি খাওয়াতে শিখিয়েছিল। গ্রামের বাড়ির ডানদিকে ছিল একটা লেবু বাগান, বড়-বড় গন্ধ লেবু হত, সেখানে বসে বিড়ি খাওয়ার পর বাঁটুলদা বলতো, কয়েকটা লেবুপাতা চিবিয়ে নে, তাহলে কেউ মুখে গন্ধ পাবে না। একদিন সে ঠিক ধরা পড়ে গিয়েছিল বিষ্ণু জ্যাঠার কাছে। কান ধরে টানতে-টানতে নিয়ে গিয়েছিলেন ভেতরের বাড়িতে। খুব জোরে চিমটি কেটেছিলেন ঘাড়ে। ঘাড়ে চিমটি কাটা ছিল ওঁর প্রিয় শাস্তি।

বিষ্ণু জ্যাঠার কি মনে আছে সে কথা?

আজ ওঁর সামনে সিগারেট ধরিয়ে সুকোমল কি তার প্রতিশোধ নিল?

সুকোমল নিজের মুখে লেবুগন্ধ পাচ্ছে।

বিষ্ণু জ্যাঠা জিগ্যেস করলেন, বউমা কোথায়? ছেলেমেয়েরা?

হাতঘড়ি দেখে চমকে উঠল সুকোমল। সাড়ে ছটা বেজে গেছে?

সে বলল, জ্যাঠামশাই, আপনি একটু বসুন, আমি আসছি।

সে দৌড়ে ঢুকে গেল বাথরুমে। হ্যাঁ দৌড়েই। অন্যদিন দৌড়োয় না। পাশের বাড়ির বাথরুমে আলো জ্বলছে, শুরু হয়ে গেল ছায়ানৃত্য। বুকটা ধকধক করছে, মুখে লেবু পাতার গাঢ় সবুজ গন্ধ, এখন তার বয়েস ষোলো, আজই প্রথম সে দৃঢ় নিশ্চিত হল যে, বাথরুমে কিশোরীটি একেবারে নগ্ন, সে আয়নার সামনে আপনমনে দুলে-দুলে নাচছে।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে আজই প্রথম কিশোরীটি দৌড়ে না গিয়ে, আস্তে-আস্তে তার ব্রা-পরা বুকের কাছে দুটি হাত রাখল, তার ঘাড়ের রং জ্বাল দেওয়া দুধের মতন, একবার যেন এদিকে তাকিয়ে ফুলের পাপড়ি মেলার মতন হাসল না?

ষোলো বছর বয়সটাকে ধরে রাখার চেষ্টা করল সুকোমল, কিন্তু তার মুখের লেবু পাতার গন্ধটা মিলিয়ে যাচ্ছে।

বয়েসটা বাড়াতে-বাড়াতে সে আবার ফিরে এল বারান্দায়।

জয়া গেছে হাজারিবাগে। তাদের ছেলে রণ সেখানকার স্কুলে পড়ে। জয়া মাঝে-মাঝে ছেলের জন্য উতলা হয়ে পড়ে, ছুটি পর্যন্ত ধৈর্য রাখতে পারে না, তিনমাস অন্তর ছেলেকে দেখার জন্য ছুটে যায়। ওর এক বোনকে সঙ্গে নিয়ে যায়, হাজারিবাগের একটা ছোট হোটেলে ওঠে।

এত সব কথা বিষ্ণু জ্যাঠাকে বলার কী দরকার?

সে কিছু না ভেবেই বলল, বাড়িতে তো আর কেউই নেই, আমার একটাই ছেলে, সে বিহারের

একটা স্কুলে পড়ে, আর আপনার বউমা...আপনাকে আর বলতে লজ্জা কী, আজকাল আমার সঙ্গে থাকে না, মানে আমাকে আর পছন্দ নয়, এখনও পাকাপাকি কিছু ঠিক হয়নি, দেখা যাক কী হয়!

বিষ্ণু জ্যাঠার চোখদুটো স্থির হয়ে গেল, মুখে কিছু বললেন না।

পঁচিশ বছর আগে সত্যিই এরকম কিছু ঘটলে তিনি সব দোষ সুকোমলের ঘাড়ে চাপিয়ে প্রচণ্ড দাবড়ানি দিতেন।

পঁচিশ বছর আগে, সুকোমলের বয়েস তখন সদ্য চব্বিশ পেরিয়েছে, তার জীবনের প্রথম নারী, কৃষ্ণকলি, বাঘ-আঁচড়া গ্রামে এক বিয়েবাড়িতে, বিশাল জমিদার বাড়ি, কত রকম মানুষ, বাসি বিয়ের দিন সাংঘাতিক ঝড়-বৃষ্টি, কে কোথায় শুচ্ছে তার ঠিক নেই, তখনই কৃষ্ণকলির সঙ্গে সে, দুজনে মিলে একা, ঝড়ের দাপটেই সম্ভবত অত কাছাকাছি এসেছিল। দুজনেরই সেই প্রথম শরীর চেনা, সম্পূর্ণভাবে। ভালোবাসা এবং যৌন টান এবং মধ্যবিত্ত নৈতিকতা। সুকোমল ঠিক করেছিল কৃষ্ণকলিকে সে বিয়ে করবেই। তখন সে সদ্য এম. এ. পাশ করে কলকাতায় চাকরি খুঁজছে, ইন্টারভিউ দিচ্ছে প্রত্যেক সপ্তাহে। এই জ্যাঠামশাই-ই প্রবল আপত্তি তুলেছিলেন, মাকে সুকোমল রাজি করিয়েছিল প্রায়, কিন্তু জ্যাঠামশাই জাত-ফাতের তফাতের কথা বলে চ্যাঁচামেচি করতে লাগলেন, বাবা চলে গেলেন সেই দলে। যদি কোনওরকমে একটা চাকরি জুটে যেত, সুকোমল কারোর তোয়াক্কা না করে কৃষ্ণকলিকে নিয়ে চলে যেত অন্য কোথাও। কিন্তু একটা পয়সা উপার্জন নেই—মনে পড়ল, প্রায় এক বছর ধরে পাগলের মতন ছুটোছুটি করেছে সুকোমল, এক-একটা চাকরি, মরীচিকার মতন হয়েও হচ্ছে না। সন্ধেবেলা নির্জন নদীর ধারে দাঁড়িয়ে শেক্সপিয়ারের নাটকের রাজা তৃতীয় রিচার্ডের মতন সুকোমল বিকটভাবে আর্তনাদ করেছে, আ হর্স, আ হর্স, মাই কিংডম ফর আ হর্স। একটা পুরো ভবিষ্যত, নতুন জীবন, একটা সাম্রাজ্য, একটা চাকরির বদলে, শুধু একটা ঘোড়ার বদলে...

কৃষ্ণকলি আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল, প্রাণ যায়নি অবশ্য, রক্ত বমি করতে-করতে জীর্ণ শীর্ণ হয়ে যায়, তারপর তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় কানপুরে। তার একটা বিয়েও হয় কারোর সঙ্গে, এরকমই শোনা গেছে। কৃষ্ণকলি নিশ্চয়ই সারা জীবন সুকোমলকে একটা কাপুরুষ বলে ঘেন্না করে যাচ্ছে। সে-কথা ভাবলেই এখনও সুকোমলের বুক কাঁপে।

কৃষ্ণকলি কবিতা ভালোবাসত, সব সময় থাকত যেন স্বপ্নের ঘোরে, তার কথায় থাকত গানের ভাষা। কৃষ্ণকলিকে পেলে সুকোমলের জীবন অন্যরকম হত, অন্য সন্তান, অন্য বাড়ি, সুকোমল কবিতা লেখা ছাড়ত না। ভাবতে-ভাবতে, চব্বিশ বছর বয়সে ফিরে গিয়ে তার সাংঘাতিক কষ্ট হতে লাগল। এখনই আবার চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে হল, আ হর্স, আ হর্স, মাই কিংডম ফর আ হর্স!

সেই সম্ভাব্য অন্য জীবন থেকে তাকে বঞ্চিত করেছে এই বুড়োটা। ওর টুঁটিটা চেপে ধরলে কেমন হয়? সুকোমল ইচ্ছে করলে ওঁকে দিয়ে এখন তার পা চাটাতে পারে। নিশ্চয়ই টাকাপয়সা চাইতে এসেছে।

চোখের সামনে কৃষ্ণকলির মুখটা দুলছে, সেই ঝড়-বাদলের রাত্রির মুখ, সুকোমলের এখন চব্বিশ বছর, আড়ালে গজরেছে, যা-তা গালাগালি দিয়েছে, কিন্তু বিষ্ণু জ্যাঠার সামনে একটা কথাও বলতে পারেনি। সে ছিল অসহায়, বেকার যুবক!

একটা বুড়ো হাড়গিলে পাখির মতন বসে আছেন বিষ্ণু জ্যাঠা। চোখে জ্যোতি নেই।

ওকে আঘাত দেওয়ার অন্য একটা পন্থা মনে পড়ল সুকোমলের। ঘর থেকে একটা মদের বোতল আর দুটি গেলাস নিয়ে এসে বলল, জ্যাঠামশাই আপনি খান এসব?

বিষ্ণু জ্যাঠা ঘাড় নাড়লেন, দু-দিকে, আস্তে-আস্তে।

একটা গেলাসে ঢালতে-ঢালতে সুকোমল বলল, আমার প্রত্যেক দিন খানিকটা না খেলে চলে না।

তাদের পরিবারে আর কেউ কোনওদিন মদ্যপান করেনি। গ্রামের এক ডাক্তারকে বাড়িতে ডাকা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কারণ বাবা-জ্যাঠারা ঘৃণার সঙ্গে উচ্চারণ করতেন, লোকটা ডাক্তারি জানে ভালো, কিন্তু মাতাল! যদিও মাতাল অবস্থায় ডাক্তারকে দেখা যায়নি কোনওদিন, এটা তাঁর গৃহভৃত্যের রটনা মাত্র। প্রতিদিন মদ্যপান করার কথাটাও সুকোমলের অতিশয়োক্তি, মাঝে-মাঝে বন্ধুদের সঙ্গে ...আমেরিকা থেকে কেউ এলে চম্পক তার হাত দিয়ে ভালো-ভালো বোতল পাঠায়। তখন ভক্তিভরে বন্ধুদের ডেকে তা পান করা হয়। আজ সে বিষ্ণু জ্যাঠার সামনে মাতলামি করবে। বড় একটা চুমুক দিয়ে, আর একটা সিগারেট ধরিয়ে সে বাচ্চা ছেলেকে ভোলাবার ভঙ্গিতে বলল, 'আপনি অন্য কিছু খাবেন? কোকাকোলা কিংবা দুলাল সরবৎ বানিয়ে দিতে পারে।

বিষ্ণু জ্যাঠা বললেন, না, থাক।

শীত করছে? একটা কম্বল এনে দেব?

নাঃ। তেমন শীত নেই। তুমি ব্যস্ত হয়ো না।

পরিতোষরা সব ভালো আছে?

আছে একপ্রকার। যার-যার মতন। সুকু, তুমি তো বই-টই লেখো শুনেছি। টাকা পয়সা ভালো পাও?

এইবার টাকার কথা আসছে!

বিষ্ণু জ্যাঠা দুনিয়াসুদ্ধু সবাইকে তুই বলতেন, এখন সুকোমলকে তুমি। প্রার্থী হয়ে এসেছেন তো।

আপনি আমাকে কিছু বলবেন বলে চিঠিতে লিখেছিলেন।

পরে বলব। কাল সকালে। এখন তুমি প্রকৃতিস্থ নাই।

সুকোমল হাহা করে হেসে উঠল। মাত্র ছ-চুমুক দিয়েছে, এর মধ্যেই অপ্রকৃতিস্থ? মদ সম্পর্কে এখনও সেই গ্রাম্য ধারণা নিয়ে ইনি বসে আছেন।

টেলিফোন বেজে উঠতেই সুকোমল উঠে গেল ঘরের মধ্যে।

একটা প্রুফের ব্যাপারে প্রকাশকের ফোন। দু-মিনিটে কথা শেষ। তবু সুকোমল সেখানে দাঁড়িয়ে রইল।

চব্বিশ বছর বয়েসটা আবছা হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। পাকা ধূমপায়ীর মতন সে কাশল দু-বার। কৃষ্ণকলিকে বিয়ে করলে সে-জীবন কি এর চেয়ে ভালো হত? দিনের পর দিন এক খাবার টেবিলে মুখোমুখি বসে, এক বিছানায় শুয়ে, কৃষ্ণকলি কি জয়ার চেয়ে কোনওভাবে অন্যরকম হত? না-পাওয়া কৃষ্ণকলি কি আরও আকর্ষণীয় নয়? তার মনের মধ্যে কৃষ্ণকলির একটুও বয়েস বাড়েনি। জয়ার সঙ্গে ইদানীং পুরো ব্যাপারটা খুবই মাঝে-মাঝে হয়। বিয়ের অষ্টম বছরে, একদিন সঙ্গমরত অবস্থায় সুকোমলের হঠাৎ মনে হয়েছিল, শেষ হচ্ছে না কেন, এতক্ষণ কী দরকার; তারপর হঠাৎ কৃষ্ণকলির মুখ ও শরীর মনে পড়তেই আবার উত্তেজনা ফিরে এল। কৃষ্ণকলিকে বিয়ে করলে, অষ্টম বছরে, সেরকমই কি কিছু হত না? অন্য কারোর মুখ!

শারীরিক টান কমে গেলেও যে ভালোবাসা থাকতে পারে, তা বুঝতে-বুঝতে অনেকগুলো বছর কেটে গেল। যেমন জয়ার সঙ্গে আছে। এই রকম বয়েসে জয়া আর কৃষ্ণকলি একই। শরীরের গুরুত্ব কমে গিয়ে নারী-পুরুষের বন্ধুত্ব। তাও অনেকের হয় না। জয়া তার বন্ধু, কৃষ্ণকলিও কি বন্ধু হতে পারত? শুধু পাশের বাড়ির বাথরুমে ছায়া-নর্তকীটি আলাদা। সে ধরা-ছোঁওয়ার অতীত।

বারান্দায় আবার ফিরে আসতে-আসতে সুকোমল ভাবল, বুড়োটা কিছু চাইতে এসেছে, সেটা জানার জন্য কতক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে? উনি রাত্তিরে এখানে থেকে যাবেন, ধরেই নিয়েছেন, তা থাকুন। কিন্তু রবিবার সকালে সুকোমলের অনেক কাজ থাকে। বন্ধুবান্ধব আসে, সেখানে জ্যাঠাশ্রেণির কারোকে বসতে দেওয়ার প্রশ্ন আসে না।

সুকোমল বলল, জ্যাঠামশাই, আপনি কী বলবেন, এখনই বলে ফেলুন। এরকম চার গেলাস খেলেও আমার নেশা হয় না।

বিষ্ণু জ্যাঠা বেশ কয়েক মুহূর্ত সুকোমলের মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললেন, আমি গত মাসে একবার খুলনা গেছিলাম।

প্রস্তাবটা ঠিক বুঝতে পারল না সুকোমল। হঠাৎ খুলনার কথা কেন?

বিষ্ণু জ্যাঠা বললেন, বিনা পাসপোর্টেও যাওয়া যায়, তিনশো টাকা লাগে, কোনও অসুবিধা নাই। আমাদের গ্রামের বাড়িটা তোমার মনে আছে সুকু?

মনে থাকবে না কেন? সে-বাড়িতে সুকোমলের বাল্য, কৈশোর, যৌবনেরও কয়েকটা বছর কেটেছে। প্রতিটি গাছপালা, পুকুরঘাটের ভাঙা সিঁড়িটার কথা পর্যন্ত মনে আছে।

বিষ্ণু জ্যাঠা বললেন, বাড়িটা প্রায় আছে একই রকম। শুধু উপরের তলায় একটা ঘর তোলা হয়েছে। খেজুর গাছ, বাতাবি লেবুর গাছ, উঠোনের জামরুল গাছটাও রয়ে গেছে।

সুকোমল জিগ্যেস করল, পাশের গন্ধলেবুর বাগান?

বিষ্ণু জ্যাঠা বললেন, না সেটা নেই। সেখানে বাড়ি উঠেছে। আমাদের বাড়িটায় এক মুসলমান ভদ্রলোক থাকেন, আমার পরিচয় জেনে খুব খাতিরযত্ন করলেন। কথায়-কথায় তিনি বললেন, ছেলেরা কেউ কাছে থাকে না, তিনিও এ বাড়ি বিক্রি করে শহরে চলে যেতে চান। শুনেই আমার মনটা বড় আনচান করে উঠল। আমাদের বাড়ি ছিল। ভদ্রলোক বিক্রি করে দিতে চান, আমরা আবার কিনে নিতে পারি না? সেইজন্যেই তোমার কাছে ছুটে এলাম। সুকু, তুমি বাড়িটা যদি কেনো, আমাদের পিতৃপুরুষের আত্মা সুখী হবে।

—আমি বাড়িটা কিনে নেব?

—বাপ-ঠাকুরদার ভিটা ধরে রাখতে পারলে পুণ্য হয়।

—আপনি কী বলছেন জ্যাঠামশাই? এটা সম্ভব নাকি!

—অসম্ভব কেন হবে? বর্তমান মালিক বেচে দিতেই তো চান। তোমার এখন টাকাপয়সা হয়েছে, যদি কিনে নিতে পার, আমি দেখাশোনা করব...আমার ছেলেরা কেউ রাজি নয়, আমার কথায় পাত্তাই দেয় না...

একটু থেমে, তিনি আলোয়ানে একবার মুখ চাপা দিলেন, চোখের জল মুছলেন নাকি? ধরা গলায়, অনেকটা আপনমনে আবার বলতে লাগলেন, এক ছেলে বাড়ি করেছে কল্যাণীতে। আর এক ছেলে টালিগঞ্জে। আমি বদলাবদলি করে থাকি, কোথাও আমার মন টেঁকে না। বড় কষ্ট হয়। মহাভারতে যুধিষ্ঠির বলেছেন, সুখী কে? যে অঋণী ও অপ্রবাসী হয়ে মরতে পারে, সেই সুখী। আমার কোনও ঋণ নাই, এই প্রবাসে আমি মরতে চাই না রে, আমার জন্মস্থানে গিয়ে যদি শেষ নিশ্বাস ফেলতে পারি, আমার হাড় জুড়োবে। সুকু, তোর কাছে বড় আশা নিয়ে এসেছি!

দেশ ভাগ হয়ে গেছে কত বছর আগে! তার পরেও অনেক দিন বিষ্ণু জ্যাঠা মাটি কামড়ে পড়েছিলেন। শেষপর্যন্ত চলে আসতে বাধ্য হন। সেও তো হয়ে গেল তেইশ-চব্বিশ বছর! এখনও এ দেশ বিষ্ণু জ্যাঠার কাছে প্রবাস। তিনি ফিরে যেতে চান।

এত বড় এই বাড়িটা দেখে মনে করেছেন সুকোমলের অনেক টাকা হয়েছে, বিষ্ণু জ্যাঠা জানেন না, এ বাড়িটা সুকোমলের নয়, আর বাজারে এখনও তার কত ধার! সে-ও ঋণী। অপ্রবাসী কি?

টাকা থাকলেই বা কী হত, বাংলাদেশে গিয়ে বাড়ি কেনা যায় নাকি? চম্পকের বন্ধু রফিক একবার শান্তিনিকেতনে বেড়াতে গিয়ে মুগ্ধ। সেখানে কত নতুন-নতুন বাড়ি উঠছে। রফিকের শখ হল সেও শান্তিনিকেতনে একটা বাড়ি বানাবে। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির কাছাকাছি একটা জমি পছন্দ হওয়ার পরে জানা গেল, রফিক আমেরিকায় থাকলেও তার বাংলাদেশি পাসপোর্ট। সে

আমেরিকা কিংবা ইংল্যান্ডে বাড়ি কিনতে পারলেও ভারতে তার জমি কেনার অধিকার নেই।

সুকোমল বললেন, তা হয় না জ্যাঠামশাই। বাংলাদেশে জমি-বাড়ি কেনা আমাদের পক্ষে আর সম্ভব নয়।

বিষ্ণু জ্যাঠা অবিশ্বাসের সুরে বললেন, টাকা দিয়ে যদি কিনি, ফেরৎ চাইছি না তো, সেটা আমাদের নিজেদের বাড়ি ছিল—

সুকোমল বলল, পৃথিবীতে মানুষের নিজের বাড়ি বলে কিছু নেই!

আমেরিকার আদিবাসীদের (যাদের ওরা বলে ইন্ডিয়ান, আমরা বলি রেড ইন্ডিয়ান) একটা গোষ্ঠীর অধিপতি শ্বেতাঙ্গদের বলেছিলেন, আকাশ, বাতাস, নদী, অরণ্য যেমন বিক্রি করা যায় না, তেমনি পৃথিবীর ভূমিও বিক্রয়ের অধিকার কারোর নেই, ভূমি কারোর ব্যক্তিগত সম্পত্তি হতে পারে না।

এই প্রথম সুকোমল স্নেহের দৃষ্টিতে বিষ্ণু জ্যাঠার দিকে তাকাল।

কী দাপট ছিল এক সময় এই মানুষটার। এখন ছেলেবউদের সংসারে থাকতে হয়। উপার্জনহীন অক্ষম বৃদ্ধকে দিনের-পর-দিন সহ্য করা তাদের পক্ষে সম্ভব না হতেই পারে। অযত্ন, অবহেলাই তাঁর নিয়তি। ফিরে যেতে চাইছেন নিজস্ব অধিকারের দিনগুলিতে। সেখানে ফেরা আর কোনওক্রমেই যায় না। কী করুণ, ভাঙাচোরা একটা মানুষ!

কাঁপা-কাঁপা গলায় তিনি বললেন, বাতাবি লেবু গাছ, জামরুল গাছ ওরা আমারে দেখে চিনতে পেরেছিল...বাবা সুকু, তুই আমার এই কথাটা রাখ। তুই চেষ্টা করলে পারবি, তোরা যাবি মাঝে-মাঝে, আমি পাহারা দেব, নাতি-নাতনিরা জানবে কোন মাটিতে বাপ-ঠাকুরদা জন্মেছিল, জন্মস্থান হল সবচেয়ে পুণ্যস্থান—

সুকোমল বলতে যাচ্ছিল, অনেক মানুষেরই জন্মস্থান আর দেশ এক হয় না—

কিন্তু বলতে হল না, এই সময় দুলাল এসে দাঁড়াল।

ওর আসার দরকার ছিল না, এটা যেন একটা ছবি, ছবিতে রং-এর সামঞ্জস্য লাগে, রেখা ও আয়তনের সামঞ্জস্য রাখতে হয়, ছবির একদিকে যদি খুব উজ্জ্বল লাল রং-এর কোনও কিছু থাকে, তাহলে আর একদিকে সেই রং-এর যেমন ব্যালান্স করতে হয়, সেইরকমই, এই ছবিতে, এই মুহূর্তে জ্যাঠামশাই ও তার মাঝখানে প্রয়োজন ছিল দণ্ডায়মান মূর্তি।

দুলাল উত্তেজিতভাবে বলল, দাদা, বাগানে একটা সাপ বেরিয়েছে, এই অ্যাত্ত বড়, ফণা তুলেছিল...

সাপের কথা শুনলে অস্থির হবে না, এমন মানুষ হয়?

জ্যাঠামশাইকে ভুলে গিয়ে সুকোমল দৌড়ল দুলালের সঙ্গে।

বাগানে এরই মধ্যে জড়ো হয়ে গেছে অনেক লোক, এত তাড়াতাড়ি সবাই কী করে খবর পায়? কাছাকাছি বাড়ির সব কাজের লোক, ড্রাইভার, মালি, পথচারী, কারোর-কারোর হাতে লাঠি, মহিলা বা স্ত্রীলোকও আছে, কোনও কিশোরী মেয়ে নেই।

সবাই নানা সুরে চিৎকার করছে, সাপটাকে কিন্তু দেখা যাচ্ছে না।

দুলাল নিজের চোখে সাপটিকে ফণা তোলা অবস্থায় দেখেছে, আরও কয়েকজন দেখেছে বলে দাবি করল। খুবই বিরক্ত সাপ, রজনীগন্ধার ঝাড়ের কাছে একটা গর্তে ঢুকে পড়েছে, এই মাত্র।

এই অঞ্চলটা কলকাতা শহরের অন্তর্গত হয়নি এখনও, সদ্য গড়ে ওঠা শহরতলি, এখানে সাপ থাকা বিচিত্র কিছু নয়। ছিল জলাভূমি, সাপ, ব্যাং, ইঁদুর, পোকামাকড়দের নিজস্ব এলাকা। মানুষ এসে যদি জলাভূমি ভরাট করে, ভিত গেঁথে বাড়ি বানায়, তাহলে ওরা যাবে কোথায়?

তা বলে বাগানে একটা বিষাক্ত সাপ ঘুরে বেড়াবে, এটাও তো মেনে নেওয়া যায় না। পাশেই ওপরে ওঠার সিঁড়ি। কয়েকজন রজনীগন্ধার ঝাড়ে লাঠির বাড়ি মারছে। প্রথম ফোটা ফুলটা

নষ্ট হয়ে গেছে এরই মধ্যে, এবারে গাছগুলোও যাবে। কিন্তু ও ভাবে গর্ত থেকে সাপটাকে বার করা যাবে না! সাপ আর সন্ন্যাসীদের নিজস্ব কোনও বাসস্থান থাকে না, সাপ যে-কোনও গর্ত দেখলেই ঢুকে পড়ে, সাপিনিরাও সন্তানের জন্ম দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট নিরাপদ স্থান খোঁজে না, তবু পৃথিবীতে এত সাপ এখনও টিকে আছে, সন্ন্যাসীও কম নয়। সুকোমলের পেছনে-পেছনে নেমে এসেছেন বিষ্ণু জ্যাঠামশাই। পেছনে দাঁড়িয়ে ঘটনাটা শুনে তিনি ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেলেন গর্তটার কাছে। মুখটা উঁচু করে বললেন, কোনও চিন্তা নাই, আমি সাপটাকে ধরে দিচ্ছি!

সঙ্গে-সঙ্গে সুকোমলের একটি দৃশ্য মনে পড়ে গেল।

তখন তার এগারো বছর বয়েস, বাড়ির দু-পাশে দুটো পুকুর, ডান দিকেরটাই বড়, তার বাঁধানো ঘাটের তলায় কয়েকদিন ফোঁস-ফোঁস শব্দ শোনা যাচ্ছিল। বিষ্ণু জ্যাঠা কোনও এক কায়দায় খালি হাতে সেই সাপটাকে ধরে টেনে বার করেছিলেন। প্রায় হাতচারেক লম্বা গোখরো সাপ, একেবারে কালান্তর যম। বিষ্ণু জ্যাঠা তার মুণ্ডুটা চেপে ধরে বনবন করে ঘোরাতে লাগলেন। ওরকম ভাবে ঘোরালে নাকি সাপের হাড়গোড় ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। তখন বিষ্ণু জ্যাঠা পূর্ণবয়স্ক পুরুষ, চওড়া কাঁধ, লোহার দরজার মতন বুক মাথায় ঝাঁকড়া চুল, ঘাটের একদঙ্গল নারী-পুরুষ বিষ্ণু জ্যাঠার সাহস আর তেজের তারিফ করছে। এগারো বছরের সুকোমলের সেদিন, মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে, বিষ্ণু জ্যাঠাকে মনে হচ্ছিল মহাদেবের মতন।

কয়েক মুহূর্ত এই দৃশ্যটা দেখল সুকোমল। কিন্তু এগারো বছর বয়েসটাকে বেশিক্ষণ ধরে রাখা যায় না। বড় পলকা সেই বয়েস। শ্লেটে আঁকা ছবির মতন সহজেই মুছে যায়। হুহু করে আবার বয়েস বাড়তে লাগল সুকোমলের। ঊনপঞ্চাশে পৌঁছে সে ভাবল, এই রে, বুড়োটা এবার সাপের কামড় খেয়ে মরবে। যৌবন বয়েসে যা পেরেছিলেন, এখনও কি তিনি প্রমাণ করতে চান যে তাঁর সে তেজ রয়ে গেছে?

গর্তটার কাছে, মাটিতে বসে পড়ে বিষ্ণু জ্যাঠা গম্ভীরভাবে বললেন, কেউ আমাকে একটা সাঁড়াশি এনে দাও তো!

সুকোমলের বয়েস বেড়েই চলেছে, থামছে না, উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে বর্তমান, বাস্তবতা। সে এখন আটাত্তর, শরীরের সব পেশি শিথিল, চোখে তেজ নেই, সে কোথাও দাঁড়িয়ে আছে, তার ছেলে তখন কোথায় থাকবে সে জানে না। জয়া কোথায় সে জানে না। বন্ধুরা চলে গেছে একে-একে। এই বাড়িটার কী হবে সে জানে না, কিন্তু অনেক মানুষ তাকে ঘিরে আছে, উৎসুকভাবে তাকিয়ে আছে, যেন সবার সামনে সুকোমলকে প্রমাণ দিতে হবে যে তার অস্তিত্বের, তার বেঁচে থাকার কোনও মূল্য আছে। এতখানি জীবন পার হয়ে এসে তাকে আবার পরীক্ষা দিতে হবে, সবাই দেখছে, সবাই জানতে চাইছে, সবাই বিচারক। সুকোমলের সারা শরীরটা কেঁপে উঠল, সে ব্যাকুলভাবে নিজেকেই জিগ্যেস করতে লাগল, পারব তো? এই যে জীবনযাপন করে গেলাম, তা যে একেবারে অকিঞ্চিৎকর নয়, পারব, পারব তার প্রমাণ দিতে?

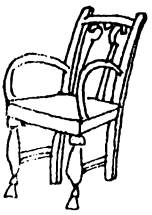

মাত্র আধখানা শতাব্দী

॥ ১ ॥

মাদুর পেতে বসে আছে তিন অকাল-বুড়ি।

পা ছড়িয়ে, সামনে পানের বাটা। একজনের মাথার চুল কদমছাঁট। এক ভাসুর-ঝি নিয়মিত এর চুল ছেঁটে দেয়। বিধবাদের চুল রাখতে নেই। এই প্রথা বন্ধ হওয়ার ঠিক পরের দশকটা ইনি দেখে যেতে পারেননি।

এই রমণীর চুল ছিল মেঘের মতন, নিতম্ব ছোঁয়া। স্বামীর মরদেহ যখন শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তখন এক দাই বড় কাঁচি দিয়ে কচ-কচ করে কেটে ফেলে দিল সেই চুলের রাশ।

ইনি বললেন, আমাগো টিয়াঠুঁটি গাছটার মতন অমন বড় আমগাছ আর দ্যাখলাম না এ-দেশে!

অন্য একজন বললেন, চটাস-চটাস কইরা কত পুঁটিমাছ ধরতাম, মনে আছে? পাছ পুকুরডা আছিল লক্ষ্মী। দুইখান গজাল মাছ, ঢেঁকির মতন বড়, একসাথে ভাইস্যা ওঠত।

আর একজন বললেন, এ দ্যাশের মাছে সোয়াদ নাই।

চুল-ছাঁটা মহিলাটি মাছ খাননি বহুদিন। এখন আর সেজন্য আপসোস করতেও ভুলে যান। মাছের চেয়ে গাছের গল্প তাঁর বেশি ভালো লাগে।

তিনি বললেন, টিয়াঠুঁটি গাছটারে কি কাইট্যা ফ্যালাইসে। কিছু শোনছেন? পুঁটি মাছের স্মৃতিকাতর মহিলাটি বললেন, আ লো বড়পিসি! দ্যাশটারেই কাইট্যা ফ্যালাইসে! আর তুমি কও গাছের কথা!

॥ ২ ॥

একটিমাত্র গোলাপ ফুল আঁকা ছোট টিনের সুটকেশ নিয়ে যুবকটি ছেড়ে যাচ্ছে নিজের বাড়ি।

জায়গাটার নাম বাদু। শহর থেকে বেশি দূর নয়, তবে শহরের লকলকে জিভ এখনও এ-পর্যন্ত পৌঁছায়নি। তাদের একান্নবর্তী পরিবার, নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ নিয়ে প্রায় আঠাশ জন। প্রায় কেন? মানুষ কি প্রায় হয়? একজন দুজন করে বাড়ে, দুজন-তিন জন কমে। অর্ধচন্দ্রাকারে সাত খানা ঘর, কয়েকটি পাকা, কয়েকটা কাঁচা। এদের বাজারে দু-খানা দোকান আছে। সংসারে অভাব নেই। দু বেলাই ভাত হয়, ফেনা ভাতে ঘি জোটে।

তবু সাদেক চলে যাচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানে।

এই বয়েসের সে-ই প্রথম বি.এ. পাশ। গ্র্যাজুয়েট ছেলে কি বাজারের দোকানে মশলা বিক্রি করতে বসবে? না তেলের ঘানি চালাবে। তা হলে আর এতটা লেখাপড়া শেখার দরকার কী ছিল?

সে ভদ্রলোকের মতন চাকরি করবে।

যুদ্ধের পর শুরু হয়েছিল ছাঁটাই। স্বাধীনতা মানে ছাঁটাই, চতুর্দিকে বেকারদের কলরব। সাদেক কি সেই কারণেই চাকরি পাচ্ছে না? নাকি সে প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে বারবার শুধু মুসলমান বলে?

সরকারি কাজে সন্দেহের অবকাশ থাকলেও, টিউশনি। অনেক বেকার ছেলেই টিউশনি করে, যেমন তার কলেজের কয়েকজন বন্ধু। কিন্তু সাদেককে কেউ রাখে না। এদিকের মুসলমানদের মধ্যে লেখাপড়ার তেমন চল নেই, বাড়িতে মাস্টার রাখবে? সাদেক মধ্যমগ্রাম, বারাসতে গিয়েও টিউশনি করতে রাজি আছে। কিন্তু হিন্দু বাড়িতে তার নাম শুনলেই নানান ছল-ছুতো দেখায়। কেউ বলে, আমরা মেয়ে-মাস্টার রাখব ভেবেছি। কেউ বলে, একজন এম.এ. পাশ এই টাকায় রাজি হয়ে গেছে।

দাঙ্গার আগুন লাগেনি এ-পল্লীতে, বাড়িতে অন্নবস্ত্রের অভাব নেই, তবু সাদেক মায়ের কান্না, বাবা-দাদার নিষেধ অগ্রাহ্য করে চলে যাচ্ছে দেশ ছেড়ে। মানুষ কি ভাগ্য পরীক্ষার জন্য দেশান্তরে যায় না? কিন্তু সাদেকের বুক-ভরা অভিমান, আর মুখে অপমানের ময়লা ছাপ।

॥ ৩ ॥

এইখানে গোবিন্দ গাঙ্গুলির স্বপ্ন লেগে ছিল। এইখানে এখনও ভেসে বেড়ায় গোবিন্দ গাঙ্গুলির দীর্ঘশ্বাস।

এইখানে পুকুরের জল ছিল কাকচক্ষু, স্নিগ্ধ। এখন পানায় ভরতি, জল দেখাই যায় না। এইখানে মন্দিরে ঘণ্টা বাজত সকাল ও সন্ধ্যায়, এখন একটা অশ্বত্থ গাছ দৃঢ় আলিঙ্গনে গুঁড়িয়ে দিয়েছে মন্দিরের চূড়ো।

এ-দেউলে আর দেবতার মূর্তি নেই, ঘুরে বেড়ায় দুটো সাপ।

॥ ৪ ॥

বেলেঘাটার সেই বস্তি এখন চেনাই যায় না।

এখানে প্রধানত থাকত ধুনুরিরা আর দরজির দল। সবই খাপরার চালের ঘর, সরু-সরু গলি। এ-বস্তির মালিক ছিল মল্লিকবাবুরা, আর অধিবাসীরা মুসলমান। এখন সেখানে একটা দোতলা বাজার আর পাশে একটা পাঁচতলা ফ্ল্যাটবাড়ি। পাড়ার ছেলেদের খেলার মাঠ।

সেই সে-বারে রাজাবাজার ও মানিকতলার প্রতিযোগিতা! খেলার নয়, খুনোখুনির। এদিকে নাড়ায়ে তকদির, আল্লা হো আকবর। ওদিকে বন্দেমাতরম! ভারতমাতা কি জয়! মাঝখানে রক্তের স্রোত। রাস্তায় পড়ে থাকা লাশের পচা গন্ধ। সে প্রতিযোগিতা গড়িয়ে এল বেলেঘাটার বস্তি পর্যন্ত। ছলাৎ-ছলাৎ করে কেরোসিন ছেটাবার শব্দ। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সব কিছু পুড়ে ছাই।

নারায়ণগঞ্জ থেকে কলকাতায় এসেছেন হেদায়েত হোসেন। বয়েস হয়েছে অনেক। কিন্তু কর্মদক্ষতা এখনও যথেষ্ট। হেদায়েত বেড়াতে আসেননি, এসেছেন ব্যাবসার কাজে। গেঞ্জির ব্যবসায় বেশ ফুলে-ফেঁপে উঠেছেন চেহারায় ও জামানো টাকায়। আগে ওদিকে গেঞ্জির ব্যবসায় হিন্দুদের ছিল আধিপত্য, তারা অনেকেই পালিয়ে এসেছে এদিকে, সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করতে হেদায়েতের দেরি হয়নি।

কলকাতা থেকে কিছু মেশিনপত্র নিয়ে যাওয়া দরকার। সরাসরি বর্ডার দিয়ে পার হওয়া যায় না, তবে রাত্রির অন্ধকারের আড়ালে নদীপথে পৌঁছান যায় সাতক্ষীরায়। সে ব্যবস্থা হয়ে গেছে। তারপর হেদায়েত একটু বেড়াতে এসেছেন বেলেঘাটায়। এখানেই কেটেছে তাঁর বাল্য ও কৈশোর।

বাজারের পাশ দিয়ে হেঁটে গিয়ে দাঁড়ালেন পাঁচতলা বাড়ির সামনে। দুটো ফুটফুটে বাচ্চা লোহার গেট দিয়ে উঠছে আর নামছে। হেদায়েতের স্পষ্ট মনে আছে, স্মৃতিতে দেখতে পাচ্ছেন ছবি। ওই পাঁচ তলা বাড়িটার জায়গাতেই ছিল তাঁর আব্বাজানের দরজির দোকান। সর্বস্বান্ত হয়ে সপরিবারে পালিয়েছিলেন ওপারে, শুধু ছোটছেলেটাকে নিয়ে যেতে পারেননি। হেদায়েতের কোলের ভাইটি ওই আগুনের বেড়াজাল থেকে বেরোতে পারেনি।

হেদায়েতের চোখ পানিতে ভিজে গেল। বুকে জ্বলছে আগুন। এই পাঁচতলা বাড়িটা কোনওক্রমে গুঁড়িয়ে দেওয়া যায় না?

॥ ৫ ॥

এটা কয়েকজন অফিসারের একটা নিজস্ব ক্লাব। প্রকাশ্যস্থানে নয়, একটা ফাঁকা ফ্ল্যাট, ধানমণ্ডিতে। করিমসাহেব থাকেন সরকারি কোয়ার্টারে। এই ফ্ল্যাটটা কিনে রেখে দিয়েছেন, এখন কোনও কাজে লাগছে না, পরে তো লাগবে। তাঁর আর-একটা বাড়ি আছে সাভারে।

ক্লাবের সদস্য ঠিক ন-জন, বাইরের লোকের আসার অধিকার নেই। মহিলাবর্জিত। এখানে দরজা বন্ধ করে মদ্যপান হয়, তাস খেলা চলে, অফিস পলিটিক্সের প্রসঙ্গ তো আসবেই। উচ্চশিক্ষিত অফিসাররা পানাহার ও গল্পগুজবের মাঝে-মাঝে হঠাৎ মুখস্থ বলেন শেকসপিয়ারের দু-চার লাইন। কেউ গান ধরেন। মীর তাকি মীরের রচনা। এখন দেশে খুব বাংলা-বাংলা হুজুগ চলছে, এরা নিজেদের উর্দু জ্ঞানের প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠেন এক-একসময়।

করিমসাহেব এ-ফ্ল্যাটে কাজের লোকও রাখেননি। সপ্তাহে দু-দিনই শুধু আসর বসে। তিনি কোনও সাক্ষী রাখতে চান না। কে কখন খবরের কাগজওয়ালাদের কাছে লাগিয়ে দেবে, তার কি ঠিক আছে?

এমনকি ড্রাইভারদেরও বিশ্বাস করা যায় না।

কিন্তু সোডা-পানি, চানাচুর-বাদাম-কাবাব এসবও তো লাগে। আগে থেকে কিছু আনলেও ফুরিয়ে যায়।

একমাত্র ফিনান্স সেক্রেটারি হায়দার আলি তাঁর ড্রাইভারকে এসব কাজে লাগান। তিনি অত কিছু পরোয়া করেননি। তা ছাড়া তাঁর ড্রাইভার কখনও মুখ খোলার সাহস করবে না। সে লোকটি অতি বিনয়ী। সাত চড়ে রা কাড়ে না।

ড্রাইভার সোডার বোতল নিয়ে এসেছে। হায়দার আলি বললেন, রাখেন, টেবিলের নীচে রাখেন। একটার ছিপি খুলে দ্যান।

প্রথম দিনই তাঁর সহকর্মী রফিকুল জিগ্যেস করেছিলেন, তুমি তোমার ড্রাইভারকে আপনি আজ্ঞে করো নাকি? দ্যাটস গুড হ্যাবিট।

হায়দার আলি বললেন, গুড না ব্যাড জানি না। হ্যাবিট ঠিকই। এ লোকটির বয়েস হয়েছে, আমাদের গ্রামেরই লোক, ওর নাম হরেন ভটচাইজ।

করিমসাহেব বললেন, ভটচাইজ মানে ভট্টচার্য? হিন্দু ভট্টচার্যরা ব্রাহ্মণ হয় না?

হায়দার আলি বললেন, রাইট। আপনি জানেন দেখছি। আমাদের গ্রামে তো বেশ কিছু ঘর হিন্দু ছিল, এই ভটচাইজরা ছিল পূজারী বামুনের ফ্যামিলি। ছোটবেলা থেকে দেখছি তো, আমরা ওদের সম্মান করতাম। তারপর ফিফটির রায়টে পুরো হিন্দু এলাকাটা সাফ হয়ে গেল। ভেরি আনফরচুনেট, ভেরি আনফরচুনেট। লোকগুলো ভালো ছিল। আমি ছোটবেলায় একে হরেনদা বলে ডাকতাম।

রফিকুল বললেন, এ লোকটা বেঁচে গেছে, তা ওপারে পালায়নি?

হায়দার আলি বললেন, কেন যায়নি কে জানে। মাটির মায়ায় বোধহয়। এখন তো আর এখানে পুরুতগিরিরও স্কোপ নেই। টাকাপয়সার টানাটানি।

করিমসাহেব বললেন, তুমি তা হলে পুজুরি বামুনকে ড্রাইভার রেখেছ? বেশ তো!

হায়দার আলি বললেন, আমাদের বাড়িতে রেখেছি বলেই ও এখনও বেঁচে আছে। আমার চাচা ওকে ড্রাইভিং শিখিয়েছিল। খুব কাজের লোক। আমার যখন কুক থাকে না, তখন এ-ড্রাইভার আমার জন্য রান্নাও করে দেয়।

করিমসাহেব বললেন, বামুন যখন, রান্না ভালো জানবেই!

হায়দার আলি বললেন, বিফের কারি এত ভালো বানায়, যে-কোনও হোটেলের চেয়ে...

করিম সাহেব আপন মনে হেসে উঠলেন।

॥ ৬ ॥

দাদা, কতদিন পর এ দেশে আসলেন?

এই ধরুন, ফর্টি এইটে লাস্ট এসেছি, তারপর এটা সেভেন্টি টু, উফ্ কতগুলি বছর কেটে গেছে!

এর মধ্যে আসতে ইচ্ছা করে নাই?

ইচ্ছে তো ছিলই মনের মধ্যে সবসময়, স্বপ্নও দেখতাম, কিন্তু ইচ্ছে থাকলেই কি আসা যায়? মাঝখানে যে অদৃশ্য দেওয়াল ছিল এতদিন, অদৃশ্য হলেও বার্লিনের দেওয়ালের চেয়েও কঠিন।

আপনি তো আমাদের দ্যাশের মানুষ?

আমাদের বাড়ি ছিল রাজশাহী। কিন্তু এটা তো আর আমাদের দেশ নয়।

রাজশাহীর বাড়িতে এখন কেউ নাই?

এই সিক্সটি ফাইভ পর্যন্ত ছিলেন আমার ছোটমামা। তারপর তার বাড়িতে পুলিশ এসে ডাকাতি করল।

পুলিশ ডাকাতি করল? বলেন কী দাদা?

হ্যাঁ, এমনি ডাকাত হলে বলার কিছু ছিল না। ডাকাত তো সব দেশেই আছে। কিন্তু পুলিশ যদি রাত্তিরবেলা দল বেঁধে এসে জিনিসপত্র জোর করে কেড়ে নিয়ে যায়। মেয়েদের ধরে টানাটানি করে—তারপর কি আর থাকা যায়?

রক্ষকই ভক্ষক, হা-হা-হা।

তখন বেশ মজার ব্যাপার হত। রাজশাহী ছেড়ে যাওয়ার আগে আমার কাকা কলকাতায় একটা টেলিফোন করতে চেয়েছিলেন। আগেকার বাংলা তখন ছিল এপার বাংলা ওপার বাংলা। দুটো আলাদা দেশ হলেও পাশাপাশি তো বটে। কিন্তু তখন কি ঢাকা থেকেও কলকাতায় টেলিফোন করা যেত?

জানি, জানি। সেই সময়টা কইলকাতায় ফোন করতে হইলে আগে কল করতে হইত লন্ডনে। লন্ডনে কোনও চেনা লোককে ধরতে পারলে, সে তখন কইলকাতায় কানেকশন কইরা খবরটা দিয়া দিত!

আমরা একে বলি, ঘুরিয়ে নাম দেখানো। ছেলেমানুষদের খেলা। বড়-বড় পলিটিশিয়ান, আর্মি জেনারেলরাও সেই খেলা খেলেছে।

দাদা, আপনে কিন্তু একদিন আমাগো বাসায় পায়ের ধুলো দেবেন।

আরে, কী যে বলেন! আমার পায়ে এখনও কলকাতার ধুলো। আমি এখানকার ধূলা মাথায় নিতে এসেছি। আমার দেশ না হোক, তবু তো জন্মভূমি!

॥ ৭ ॥

প্রখ্যাত গায়ক সমর মিত্র সফরে এসেছেন সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে।

তিনি শুধু গায়ক নন। একাত্তর সালের ন'মাস পূর্ব-পাকিস্তানে মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁর উদাত্ত দেশাত্মবোধক গানে মুসলমান-হিন্দু নির্বিশেষে সমস্ত বাঙালি শ্রোতাদের মাতিয়ে রেখেছিলেন। দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় আর সমর মিত্র—এই দুজনের কণ্ঠে সংবাদ ও সঙ্গীত শোনার জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকত সবাই।

সমর মিত্র এই প্রথম এসেছেন বাংলাদেশে। বহু জায়গায় দেওয়া হচ্ছে তাঁকে সংবর্ধনা, তাঁর গানের আসরে জনতা ভেঙে পড়ে। বিভিন্ন বাড়িতে তাঁকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা চলছে। এক দিনে তিন-চার বাড়িতে খেতে যেতে হচ্ছে তাঁকে।

এক পত্রিকা সম্পাদকের বাড়িতে সন্ধেবেলা খাবার টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি কিছুক্ষণ হতবাক হয়ে গেলেন। এতসব পদ কি মানুষ খেতে পারে? মস্ত বড় টেবিল, তাতে খাদ্যবস্তুগুলি ভারি সুন্দর করে সাজানো, দেখতেই ভালো লাগে, কিন্তু সব একটু-একটু করে চাখাও অসম্ভব।

কী কুক্ষণে তিনি একবার বলে ফেলেছিলেন, যে তিনি শুঁটকি মাছ ভালোবাসেন। তাই প্রত্যেক বাড়িতে কতরকম যে শুঁটকি হয়! শাকে শুঁটকি, ডালে শুঁটকি, আলুভর্তা-বেগুনভর্তায় শুঁটকি, চিংড়ি শুঁটকি, বম্বে ডাক (লইট্টা) শুঁটকি! আর মাছও যে কত রকম। সিরাজগঞ্জের রুই, পদ্মার ইলিশ, মেঘনার চিতলপেটি, অতি তেলাল পাঙাস, বিশাল-বিশাল গলদা, তারপর মাংসও পাঁচ রকম।

এ-বাড়ির গৃহকর্ত্রী সুরাইয়া ভাবীর হাতের রান্নার খুব সুনাম। এবং যেমন তাঁর রূপ, তেমনি সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর।

সমর মিত্র বললেন, এ কী করেছেন, খাইয়ে-দাইয়ে মেরে ফেলতে চান নাকি?

সুরাইয়া ভাবী বললেন, আপনার বেটা যতটুকু ইচ্ছা নেন। জোর করব না। তবে বিফ করি নাই, আপনার ভয় নাই।

সমর মিত্র বললেন, ভয়? ছাত্রবয়েসে বিফ কাবাব আর রুটি খেয়েই তো বেঁচে থেকেছি। সবচেয়ে সস্তা ছিল।

প্লেটে সাদা ফুলের মতন একটু ভাত আর দু-তিনটি পদ তুলে নিয়ে সমর মিত্র একটা চেয়ারে বসলেন।

এক গুণমুগ্ধ তরুণী তাঁকে জিগ্যেস করল, স্যার, এখানে এসে আপনার কেমন লাগছে?

সমর মিত্র বললেন, এমন আত্মীয়তা, এমন ভালোবাসা যেন জীবনে কখনও পাইনি। এখানকার বাতাসেও যেন নতুন গন্ধ। স্বাধীনতার গন্ধ। অল্পবয়েসি ছেলেমেয়েদের মধ্যে কী অপূর্ব উদ্দীপনা, এটা আমাদের ওদিকে দেখাই যায় না। তবে ভাই, তোমরা বড্ড বেশি খাওয়াও! আমাদের ওখানে কোনও কাগজের সম্পাদক বা মালিকের বাড়িতে এতরকম খাবারের ব্যবস্থা, চিন্তা করা যায় না। তারা এত বড়লোকও হয় না। এখানে যা এক-একটি বড়লোকের বাড়ি দেখছি, বাপ রে বাপ, মাথা ঘুরে যায়!

পাশ থেকে একটি যুবক বলল, কিন্তু আপনাদের কলকাতায় নিউজ পেপার তো অনেক বেশি বিক্রি হয়?

সমর মিত্র বললেন, হ্যাঁ, শুনলাম তো, এখানে অনেকগুলি ডেইলি নিউজ পেপার কোনওটারই বিক্রি আমাদের ওদিককার কাগজগুলোর সমান তো নয়ই, বরং অনেক কম। কিন্তু এদিককার সম্পাদকরা অনেক বেশি বড়লোক।

ছেলেটি বলল, শুনেছি আপনাদের আনন্দবাজার গোষ্ঠী...

প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে সমর মিত্র বললেন, তোমরা যেমন আন্তরিক আতিথেয়তা দিতে জানো, হিন্দুরা অতটা জানে না। হিন্দুর বাড়িতে গেলে তোমাকে মোটে তিন-চার পদ খাওয়াবে।

যুবকটি বললেন, এখানে কিছুটা শো অফ করারও ব্যাপার আছে। এতগুলো আইটেম কেউই খেতে পারে না, তবু কিছুটা দেখাবার জন্য...

আবার প্রসঙ্গ বদলে সমর মিত্র বললেন, আমার মাঝে-মাঝে কী ইচ্ছে হচ্ছে জানো? তোমরা যদি থাকতে দাও, তালে আমি এখানেই থেকে যাই। এখানে সবাই বাংলা ভাষাকে এত ভালোবাসে, বাংলা সংস্কৃতি আমাদের দেশের মতন পাঁচমিশেলি নয়। এখানেই তোমাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান গাইব।

অনেকে একসঙ্গে বলে উঠল, থাকুন, থাকুন।

জানলার ধারে একটি আলাদা হলে বসে সাংবাদিক মিজানুর রহমান। তিনি খাবার নেননি, হাতে হুইস্কির গ্লাস। সব শুনছিলেন, এবার বলে উঠলেন, ও-কম্মোও করবেন না সমরবাবু! এখানে থাকার ইচ্ছেটা মন থেকে মুছে ফেলুন! আপনি যাকে ভালোবাসা বলছেন, সেটা আসলে ইনফ্যাচুয়েশন। বেশি দিন থাকে না, উবে যায়। আপনি এখানে থাকলে কিছুদিন পরেই কী হবে জানেন? অন্য গায়কদের সঙ্গে কমপিটিশন হবে। তারা আপনার পেছনে লাগবে। অন্য অনেকে, যারা আপনার সামনে মিষ্টি ব্যবহার করবে, তারাই পেছন ফিরলে বলবে, এই শালা মালাউন, একে তাড়াও! আপনি যদি...

তাঁকে থামিয়ে দিয়ে সুরাইয়া ভাবী বললেন, মোটেই এগুলো ঠিক না। মিজান ভাই বড় উলটাপালটা কথা বলেন।

পত্রিকার সম্পাদকমশাই বললেন, আমাদের মিজান সাহেব এক নম্বরের সিনিক!

মিজানুর রহমান বললেন, যা সত্যি, তাই বলছি! ইতিহাস থেকেই এর শিক্ষা নিতে পারেন। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় ইন্ডিয়ান আর্মি, পশ্চিমবাংলার মানুষ অনেক সাহায্য করেছে। তখন এখানে কত উচ্ছ্বাস, গলা জড়াজড়ি, ইন্ডিয়ানরা আমাদের বন্ধু। বাঙালি-বাঙালি ভাই-ভাই, কিন্তু এসব কতদিন? নাৎসি-জার্মানদের হাত থেকে ফ্রান্সকে উদ্ধার করেছিল আমেরিকা, তার কয়েকমাস পরেই ফরাসিরা আমেরিকানদের দেখে ঘেন্নায় মুখ কুঁচকেছে না? আমাদের মুক্তিযুদ্ধে ইন্ডিয়ান আর্মির আঠারো হাজার সোলজার প্রাণ দিয়েছে, এই মাটিতে গোর রয়েছে তাদের। দেখবেন, একসময় সেকথা সবাই ভুলে যাবে, হিস্ট্রি বইতে তাদের প্রাণ দেওয়ার উল্লেখ থাকবে না। এমনকী ইন্ডিয়া যে কিছু সাহায্য করেছিল, সে-কথাও উচ্চারণ করতে চাইবে না কেউ। এই রকমই হয়।

দু-তিনজন একসঙ্গে প্রতিবাদ করলেন।

সমর মিত্র বললেন, আমারও মনে হয়, আপনি বেশি-বেশি পেসিমিস্টিক কথা বলছেন। ইন্ডিয়া আর বাংলাদেশের মধ্যে পলিটিক্যাল সম্পর্ক কী হবে জানি না, কিন্তু দু-দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে যে ভালোবাসার সম্পর্ক—

তাঁর ভক্ত মেয়েটি তেজের সঙ্গে বলল, রাজনীতি বাদ দ্যান! বাংলা ভাগ হয়েছে, কিন্তু বাংলা সংস্কৃতির একটা মিলন সেতু আমরা ফিরে পেয়েছি, পাকিস্তানিরা তা থেকে আমাদের বঞ্চিত করতে চেয়েছিল...

সুরাইয়া ভাবী বললেন, সমরদা, আপনি থেকে যান আমাদের এখানে। আপনাকে আমরা

ধরে রাখব। সবাইকে গান শেখাবেন। আমরাও যদি চান্স পাই, কলকাতায় একটা বাড়ি কেনার ইচ্ছা আছে। বছরের মধ্যে কয়েক মাস কলকাতায় গিয়ে থাকব।

মিজানুর রহমান গেলাসে আবার হুইস্কি ঢেলে হাসতে লাগলেন আপনমনে।

॥ ৮ ॥

এলগিন রোডের পাশের একটা রাস্তায় বহুকাল ধরে দেখা যায় একটা হানাবাড়ি। আশেপাশে পুরোনো বাড়ি ভেঙে গড়ে উঠছে নতুন রূপের প্রাসাদ, শুধু মাঝখানের এই দোতলা ভাঙা বাড়িটা ঘিরে প্রচুর আগাছা জন্মে গেছে, জানলা দরজা অদৃশ্য। কলকাতার এই অঞ্চলে জমির দাম সোনার মতন।

বাড়িটার সামনে দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে পেছন দিকটা দেখাই যায় না, এত গাছপালা। নিশ্চয়ই বড় বাগান ছিল। একসময় ওখানে ফুটফুটে শিশুরা খেলা করত। লাল চটি পরা ফরসা রমণীরা বিকেলে গোল ছাতার নীচে বসতেন চায়ের আসরে। বেলজিয়ামের টি-সেট, কাটগ্লাসের গেলাসে রু-আফজার সরবত। ব্যারিস্টার মনিরুজ্জামান দেশ ভাগ হওয়ার কয়েক বছর পর পাড়ি দিলেন পাকিস্তানে। পূর্বে নয়, পশ্চিমে। দলিলে কিছু গণ্ডগোল ছিল, তাড়াহুড়োতে বাড়িটা বিক্রি হতে পারেনি, ভেবেছিলেন পরে একসময় এসে ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই পাকিস্তান-ভারতে যাতায়াত বন্ধ হয়ে গেল।

ব্যারিস্টারিতে ভালোই পসার জমেছিল ইসলামাবাদে। তিনি সেখানকার একটি ছোটখাটো মন্ত্রীও হয়ে গেলেন। একাত্তরের গৃহযুদ্ধের সময় বাঙালি হিসেবে তিনি হলেন সরকারের চোখে সন্দেহভাজন, মুক্তিযোদ্ধারাও তাঁকে মনে করত বিশ্বাসঘাতক। একেবারে যাকে বলে না-ঘরকা না-ঘাটকা। বাংলাদেশে ফেরার উপায় নেই। ভারতেও না, পাকিস্তানেও টিকতে পারবেন না বেশিদিন, এর মধ্যে মুজাহিদিনদের সঙ্গে দাঙ্গার মধ্যে পড়ে গিয়ে পুলিশের গুলিতে নিহত হল তাঁর ছোট ছেলেটি। তার পরই তিনি সপরিবারে সাগর পাড়ি দিয়ে চলে গেলেন লন্ডনে। তাঁর দুটি মেয়ের বিয়ে হয়েছে পাকিস্তানিদের সঙ্গে, তারা কেউ বাংলা বলে না, বৃদ্ধ মনিরুজ্জামানও হারিয়ে গেলেন বাঙালি জীবন থেকে।

মনিরুজ্জামানের স্ত্রীর এক ভাই, অর্থাৎ শ্যালক হাবিবুল্লাহ, তাঁর সেজোছেলে কামাল। এদের বাড়ি চন্দননগরে। হাবিবুল্লাহ ছিলেন জজকোর্টের উকিল, কামাল চাকরি করে একটা বিজ্ঞাপন কোম্পানিতে। চন্দননগর থেকে যাতায়াতের খুব অসুবিধে, সদ্য বিয়ে করেছে তহমিনাকে, সেও পড়ায় একটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে। সুতরাং ওদের একটা ফ্ল্যাট দরকার কলকাতায়। তহমিনার স্কুলটি সার্দান অ্যাভিনিউতে, সুতরাং ফ্ল্যাটটি ওই অঞ্চলে পেলেই ভালো হয়।

কামাল তার পারিবারিক সূত্রে জানে, এলগিন রোডের কাছে ওই অনেকটা জমির ওপর পোড়োবাড়িটা তাদেরই এক আত্মীয়ের। সে যদি ওই বাড়িটার দখল পেত, তা হলে প্রোমোটারকে দিলে এগারো তলা মাল্টিস্টোরিড হয়ে যেত, তার গোটাকতক ফ্ল্যাট বিক্রি করলেই আর চাকরিবাকরি করতে হত না, সারাজীবন পায়ের ওপর না দিয়ে—। সরকার এ-বাড়ি অধিগ্রহণ করেনি, রিফিউজিরা এ-পাড়া পর্যন্ত পৌঁছায়নি, সেজন্য জবরদখলও হয়নি। এখন সেখানে আগাছার চাষ হচ্ছে।

কামালের কাছে দলিলপত্র কিছুই নেই। ও বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে-যেতে তার শুধু দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

কামালকে তার বন্ধু শামসের বলেছিল, পার্ক সার্কাসের দিকে বাড়ির খোঁজ কর মোছলমান পাড়ায়, অন্য পাড়ায় বাড়ি পাবি না। কামাল বিশ্বাস করেনি। চন্দননগরে তো তারা হিন্দু পাড়ার মধ্যেই থাকে, কলকাতা আজো কসমোপলিটান শহর, সেখানে আবার পাড়া-ফাড়া আছে নাকি?

কিন্তু সাদার্ন অ্যাভিনিউ, বালিগঞ্জ, যোধপুর পার্কে একটার পর একটা জায়গায় তাকে ব্যর্থ হতে হল। পুরো ভাড়া, এমনকি ডিপোজিট দিতে রাজি থাকলেও কেন সে প্রত্যাখ্যাত হয়, সে-কারণটাই দুর্বোধ্য।

শেষপর্যন্ত আশার আলো পাওয়া গেল তহমিনার এক ছাত্রী বিশাখার কাছ থেকে। বিশাখা জানাল যে তাদের যোধপুর পার্কের বাড়ির একতলায় ভাড়াটেরা উঠে গেছে, বাবাকে সে বললেই রাজি হয়ে যাবে।

তহমিনা আর কামাল দুজনেই এক রবিবার সকালে গেল বাড়ি দেখতে। নিরিবিলি, পরিচ্ছন্ন এলাকা, ফ্ল্যাটটাও আলো হাওয়া সমন্বিত, পছন্দ না হওয়ার কোনও কারণই নেই। ডিপোজিট লাগবে না, ভাড়াও যুক্তিসঙ্গত। বিশাখার বাবা রঙ্গনাথ বাজার করতে গেছেন, তিনি মৎস্যরসিক, গড়িয়াহাট-লেকমার্কেট ঘুরে-ঘুরে বাছাই করা মাছ নিয়ে আসেন, তাই দেরি হয়।

বিশাখা এর মধ্যে তহমিনা ও কামালকে কেক, পেস্ট্রি ও চা দিয়ে আপ্যায়ন করল।

রঙ্গনাথ ফিরতেই বিশাখা বলল, বাবা, এই আমার স্কুলের মিস।

কামাল উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে বলল, আর আমি এই মিসের মিস্টার!

পটে আরও চা আছে, রঙ্গনাথ চা খেলেন ওদের সঙ্গে। হাসি-ঠাট্টা গল্পগুজব করলেন খানিকক্ষণ।

তারপর বিনীতভাবে বললেন, আপনাদের দিতে পারলে ভালোই হত, কিন্তু মুশকিল কী হয়েছে জানেন, আমার তো চায়ের ব্যাবসা, অফিসটা খিদিরপুরে, সেখানে আর জায়গা হচ্ছে না। স্টাফও বেড়ে গেছে। তাই এ-ফ্ল্যাট আর আমি ভাড়া দেব না। আমার অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টটা এখানে সরিয়ে আনব। খুবই দুঃখিত। কিছু মনে করবেন না।

বিশাখা ওদের দুজনকে পৌঁছে দিতে গেল ট্যাক্সি-স্ট্যান্ড পর্যন্ত।

ফিরে এসে দেখল, রঙ্গনাথ তখনও দাঁড়িয়ে আছেন কামালের নামের কার্ডটা হাতে নিয়ে।

বিশাখা বলল, বাবা, তুমি সত্যিই এখানে অফিস করবে? আগে বলোনি তো?

রঙ্গনাথ বললেন, তা এখনও ঠিক নেই। তা বলে মুসলমানকে ভাড়া দেব নাকি! ওদের বিশ্বাস নেই।

বিশাখা বলল, না বাবা, আমার মিসের কথাবার্তা শুনে কিছুই বোঝা যায় না। খুব ভালো ব্যবহার। এত ভালো রবীন্দ্রসংগীত গাইতে পারেন।

রঙ্গনাথ বললেন, ভালো তো হোক না ভালো। নিজেদের মধ্যেই থাক না। ফিরে চলে যাক পাকিস্তানে, ওদের ঢাকায়, সেখানে আরও ভালো থাকবে।

বিশাখা বলল, বাবা, ঢাকা তো পাকিস্তানে নয়। এখন বাংলাদেশে। তুমি কী যে বলো!

রঙ্গনাথ কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, ওই একই হল। এর মধ্যেই তো আবার হাফ পাকিস্তান হয়ে গেছে শুনেছি!

॥ ৯ ॥

মাঝপথে অফিস ছুটি হয়ে গেল। দারুণ দুঃসংবাদ।

সরকারের হেল্‌থ ডিপার্টমেন্টে চাকরি করে হেনা। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরছে। এর মধ্যে ট্রাম-বাস বন্ধ হতে শুরু করেছে, প্রাইভেট গাড়িগুলো পালিয়ে যাচ্ছে দ্রুত। হেনা কোনওক্রমে একটা বাস পেয়েছিল, একদল লোক হল্লা করে থামিয়ে দিল বাস মাঝপথে।

এখান থেকে তার বাড়ি বেশি দূরে নয়, হেনা প্রায় দৌড়তে লাগল। একবার তার হাত

থেকে পড়ে গেল ছাতাটা। সেটা তুলতে গিয়ে তার ভয় হল, পেছন থেকে কেউ যদি তার ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

বাড়িতে ঢুকেই সদর দরজাটা চেপে বন্ধ করে কাজের লোক সইফুলকে বলল, খবরদার আর দরজা খুলবি না! যে-ই আসুক!

ওপরে এসে দেখল, তার স্বামী আলম একটা গল্পের বই পড়ছে! কয়েকদিন ধরে তার জ্বর। সে অফিস যাচ্ছে না।

হেনা হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, তুমি রেডিও শোননি? নিশ্চিন্তে শুয়ে আছ? জানো কী হয়েছে?

কী?

ইন্দিরা গান্ধি মারা গেছেন। মানে তাঁকে খুন করা হয়েছে।

আলম ধড়ফড় করে উঠে বসে বলল, 'অ্যাঁ? কী বলছ? কে মারল? কোনও মুসলমান!'

ঝনঝন করে টেলিফোন বেজে উঠল।

ওদিক থেকে একজন বলল, হেনা আপা, বাড়িতে ফিরে এসেছ! খবরদার, আর বাইরে বেরিয়ো না। জানো কী হয়েছে?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি! কে মেরেছে বল তো?

তা এখানে ডিটেইলসে জানায়নি, প্রথম খবর দিয়েছে বি.বি.সি.। আমাদের রেডিও স্পষ্ট করে কিছু বলছে না। বি.বি.সি. জানিয়েছে, ওরই কোনও বডি গার্ড।

ফোন রেখে দিয়ে হেনা আলমকে জিগ্যেস করল, ইন্দিরা গান্ধির বডি গার্ডদের মধ্যে মুসলমান আছে?

আলম বলল, নিশ্চয়ই আছে। মুসলমান, শিখ, আরও কত জাতের লোক রেখেছেন।

কিন্তু এক জন মুসলমান ইন্দিরা গান্ধিকে খুন করবে কেন?

করতেই পারে। হতে পারে পাকিস্তানের এজেন্ট। ইন্ডিয়ার অনেক মুসলমানেরও খুব রাগ আছে ইন্দিরা গান্ধির ওপর।

কেন, উনি তো কমিউনাল নন। বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় কত সাহায্য করেছেন—

সেইজন্যেই তো। উনি যে পাকিস্তানকে দু-টুকরো করে দিলেন, তা বেশিরভাগ মুসলমানই পছন্দ করেনি। বিশেষত নর্থ ইন্ডিয়ার মুসলমানরা। এমনকী আমাদের মধ্যেও...করিম চাচা সর্বক্ষণ বলে না, এটা হিন্দু ডিপ্লোম্যাসি!

খুনি যদি মুসলমান হয়?

তা হলে উন্মত্ত জনতা মুসলিম খুন করতে শুরু করবে। যাকে যেখানে পাবে। তারপর শুরু হয়ে যাবে দাঙ্গা।

আমার তো ইন্দিরা গান্ধিকে খুব পছন্দ ছিল। পাকিস্তান ভেঙেছেন বেশ করেছেন। পশ্চিম-পাকিস্তানিরা পূর্ব-পাকিস্তানে অকথ্য অত্যাচার চালাচ্ছিল না? শেখ মুজিবকে কিছুতেই প্রধানমন্ত্রী করল না। তা ছাড়া ওখানকার বাঙালিরাই তো আগে মুক্তিযুদ্ধ শুরু করেছিল।

তুমি পছন্দ করলেই তো হবে না। এর আগের ইলেকশানে ইন্দিরা গান্ধি হেরে গেলেন কেন? পুরো মুসলিম ভোট তাঁর বিরুদ্ধে গেছে। সেইজন্যেই যদি কোনও পাগল ধর্মান্ধ মুসলমান হঠাৎ গুলি চালিয়ে দেয়—

আবার দাঙ্গা হবে?

রাস্তায় কারা যেন বিকট চিৎকার করে ছুটে যাচ্ছে, ভয়ে কেঁপে উঠছে হেনা।

আলম বিমর্ষমুখে বসে আছে রেডিও খুলে।

বিকেলের দিকে জানা গেল, ইন্দিরা গান্ধির আততায়ী মুসলমান নয়, শিখ। তিনি শিখ উগ্রপন্থীদের ধরবার জন্য স্বর্ণমন্দিরে সৈন্য ঢুকিয়েছিলেন, তাঁর দেহরক্ষীদের মধ্যে থেকেই একজন

শিখ গুলি চালিয়ে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে তাঁর শরীর।

সারা ভারতে শুরু হয়ে গেছে শিখনিখন যজ্ঞ। দিল্লিতে শিখদের বাড়িঘর জ্বলছে। কলকাতায় এ-ব্যাপার অবশ্য বেশিদূর ছড়াতে পারল না, পুলিশ থামিয়ে দিল দৃঢ় হাতে। কিন্তু শিলিগুড়িতে ক্রোধান্ধ হিন্দুরা জ্বালিয়ে দিয়েছে পেট্রল পাম্প, সেই আগুনে ঠেলে দিয়েছে ওই পাম্পের মালিক বৃদ্ধ সর্দারজিকে।

মুসলমান নয়, শিখ এ-সংবাদ পাকাপাকি জানার পর একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে গিয়েও মুখখানা কালো করে রইল হেনা। এতক্ষণ ইন্দিরা গান্ধির মৃত্যুর জন্য দুঃখবোধ করার বদলে সে নিজেদের নিরাপত্তার কথাই শুধু ভাবছিল। কোথাও কোনও গণ্ডগোল হলে, মারামারি বাঁধলে, পুলিশ গুলি চালালেই কেন মনে হয়, এই বুঝি দাঙ্গা বেঁধে গেল। এই বুঝি আততায়ীরা তেড়ে আসবে তার দিকে। শুধু মুসলমান বলেই এই নিরাপত্তাহীনতা, এই সবসময় চাপা আতঙ্ক, কেন, কেন? এই নাকি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র।

॥ ১০ ॥

কলেজে ভরতির ফর্ম জমা দিতে গেছে রাবেয়া, কেরানিবাবুটি সেটা উলটে-পালটে দেখে বললেন, রিলিজিয়ানের জায়গায় কিছু লেখোনি কেন?

রাবেয়া বলল, আমার ধর্মটা আমার ব্যক্তিগত, তা সবাইকে জানাতে হবে কেন?

কেরানিবাবুটি বললেন, অত পাকামি করতে হবে না। লেখো!

রাবেয়া লিখল না। সেজন্য শেষপর্যন্ত তাকে যেতে হল প্রিন্সিপালের ঘরে।

প্রিন্সিপাল সব শুনে ঈষৎ বিদ্রুপ করে বললেন, ধর্মের কথা লিখতে চাও না? তা হলে লিখে দাও নাস্তিক।

রাবেয়া বলল, আমি তো নাস্তিক নই। আমার নিজস্ব ধর্মবিশ্বাস আছে। কিন্তু সেটা ফরমে লিখতে আমি বাধ্য হব কেন?

এটাই নিয়ম। আর এক জায়গায় তুমি লিখেছ, ম্যারেড। তোমার স্বামীর নাম কী?

স্বামীর নাম জানানও কি বাধ্যতামূলক? যাই হোক, বলছি, আমার স্বামীর নাম সত্যেন বসু চৌধুরী।

তা হলে তোমার পদবি পালটাওনি কেন? তোমার স্বামী হিন্দু?

তিনি হিন্দু কি না আমি জানি না। তিনিই বলতে পারবেন। বিয়ে করলেই মেয়েদের পদবি পালটাতে হবে এমন কোনও আইন আছে?

দ্যাখো, তুমি অযথা আমার সময় নষ্ট করছ। ফর্ম ঠিক করে নিয়ে এসো। না হলে ভরতি হওয়ার কোনও প্রশ্ন নেই।

স্যার। আমি ভরতি হবই!

গায়ের জোর? তোমাকে কি দারোয়ান ডেকে বার করে দিতে হবে?

তা দিতে পারেন। আমি আবার কোর্টের আদেশ নিয়ে এ-কলেজে ঢুকব। দরকার হলে আমি সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত যাব।

সত্যেন বসু চৌধুরী বিয়ের পর নিজেদের পারিবারিক বাড়ি ছেড়ে মধ্যমগ্রামে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছে। সরকারি ফ্ল্যাট, জাত-ধর্মের কোনও প্রশ্ন ওঠেনি।

রেশন কার্ডটা পালটাতে হবে। তার ইন্সপেক্টরবাবু বাড়িতে এসে বললেন, আপনারা স্বামী-স্ত্রী, আপনি মুসলমান মেয়ে বিয়ে করেছেন, দ্যাট্স্ অল রাইট, কিন্তু স্বামী আর স্ত্রীর তো এক পদবি

হতে হবে!

তাই নাকি! আমরা যদি না চাই?

সেটা তো চলবে না! এটাই নিয়ম।

কোথাকার নিয়ম? ব্রিটিশরা এই নিয়ম চালু করেছিল। এখনও সেটা মানতে হবে? জানেন কী, মুসলমানদের কোনও পদবিই হয় না। পুরোটাই শুধু নাম। আপনার দিদিমার নাম কি ছিল মনে আছে?

আমার দিদিমার নাম? তা দিয়ে আপনার...মানে সে-কোশ্চেন আসছে কী করে?

আমি বলতে চাইছি, আপানার দিদিমার নিশ্চয়ই কোনও পদবি ছিল না। রবীন্দ্রনাথের স্ত্রীর নাম কী ছিল জানেন? মৃণালিনী দেবী। কোথাও দেখেছেন মৃণালিনী ঠাকুর লেখা আছে? সব হিন্দু মহিলাই আগে ছিলেন দেবী কিংবা দাসী। তার বদলে শুধু নামটাই ভালো নয়?

বিকেলে সত্যেন আবার স্ত্রীকে নিয়ে বেড়াতে বেরোল। যাবে এক বন্ধুর বাড়িতে। মাঝপথে বৃষ্টি নামল। কাছাকাছি আশ্রয় নেওয়ার মতন জায়গা নেই, ওরা গিয়ে দাঁড়াল একটা গাছতলায়। গাছতলায় দাঁড়ালেও বৃষ্টিতে ভিজতে হয়। ওরা ভিজছে আর হাসছে। রাবেয়ার হাসি থামতেই চায় না।

মাঝে-মাঝে ওপরের দিকে তাকিয়ে গাছের ফাঁক দিয়ে দেখতে চাইছে আকাশ। সব সময় আকাশের কথা মনে থাকে না, আকাশের দিকে তাকানোই হয় না। শুধু এইরকম সময়ই মনে হয়, আমরা সবাই এক আকাশের নীচে মানুষ!



তাজমহলে এক কাপ চা

রাম রাম ওস্তাদজি! কুছ খুস খবর শুনাইয়ে!

ওস্তাদজির পরনে একটা আলখাল্লার মতন পোশাক, নানান জায়গায় তাপ্পি মারা, মাথায় একটা ফেট্টি বাঁধা। গালে পাঁচ-সাতদিনের রুখু দাড়ি। বয়েস হবে পঞ্চাশের ধারে কাছে। কোথায় তার বাড়ি ঘর কিংবা তার নিজের বউ-বাচ্চা আছে কি না তা কেউ জানে না। জিগ্যেস করলে মৃদু-মৃদু হাসে।

মাঝে-মাঝে সে এসে উদয় হয়। খাটিয়ায় বসে গ্রামের মানুষের সঙ্গে সুখ-দুঃখের গল্প করে। আপদ-বিপদে শলা-পরামর্শ দেয়। দু-একদিন এর তার বাড়িতে থাকে, ছাতু কিংবা রুটি আর ভেণ্ডির তরকারি যা দেওয়া হয় তাই-ই আরাম করে খায়, আবার উধাও হয়ে যায়।

গত বছর খরার সময় ও গাঁওয়ের ঠিকাদার বড় বে-শরম, কঠিন-হৃদয়ের মতন ব্যবহার করেছিল। ওই সময় বাঁধ বাঁধার কাজ কি বন্ধ রাখা ঠিক? জমিতে ধান নেই, হাতে পয়সা নেই, তখন সরকারি মজুরি না পেলে মানুষ বাঁচবে কী করে? সেই সময় ওস্তাদজি এসে ঠিকাদার ব্যাটাকে ভারী জব্দ করেছিল। সবাই এক কাট্টা হয়ে তাকে এক খেজুর গাছের নীচে ঘিরে রেখে চব্বিশ ঘণ্টা দানা পানি ছুঁতে দেয়নি।

ওস্তাদজি এসে যে দু-একদিন থাকে তখন নানারকম মজা হয়। সারাদিন খাটা খাটনি তো আছেই, একেবারে শেষবার চোখ বোজার আগে পর্যন্ত বাঁচার জন্য খেটে যেতে হবে, এটাই নিয়তি!

কিন্তু খাটতে-খাটতে আনন্দ ফূর্তির কথা মনে থাকে না। ওস্তাদজি সেটাই মনে করিয়ে দেয়। পিঠে চাপড় মেরে বলে, আরে কাজ-কাম তো আছেই লেকিন তা বলে হাসবি না! দ্যাখ না জঙ্গলের জানবার আর আকাশের পংখী, তারাও নাচা-গানা করে।

ওস্তাদজি এসে প্রতি সন্ধেবেলা সবাইকে জড়ো করে মজলিশ বসায়। সে নিজেই গান ধরে। গলায় বিশেষ সুর নেই কিন্তু চ্যাচামেচির জোর আছে, একটা হাত কানে দিয়ে আর একটা হাত বাড়িয়ে দেয় সামনের দিকে। ওই গানের জন্যই তার নাম ওস্তাদজি!

ওস্তাদজির আলখাল্লার পকেটে একটা খবরের কাগজ। ওস্তাদজি পড়েলিখে আদমি, এই গ্রামের বাইরে যে দেশ, যে পৃথিবী, তার খবর সে রাখে। এমনকী একদিন আকাশের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেছিল, ও আশমানে, অনেক-অনেক উঁচুতে, যেখানে দৃষ্টি পৌঁছয় না, সেখানেও নাকি মানুষ লড়াই-এর জন্য তৈয়ার হচ্ছে। কে জানে, ওস্তাদজি মজাক্ করার জন্য গপ্ বানায় কি না!

ওস্তাদজির গলা শুনে আরও দু-চারজন এসে জমায়েত হল সেখানে। বুড়ো রামখেলাওনের খাটিয়া ঘিরে তারা মাটিতে উবু হয়ে বসে। সবাই এক-এক করে রাম-রাম জানিয়ে অনুরোধ করে, বলো ওস্তাদজি, তোমার আখবরে কী খুশ খবর আছে?

ওস্তাদজি খাটিয়ার এক পাশে বসে বলে, আরে দূর। আখবরে তো তোর-আমার মতন গরিব মানুষের কথা লেখে না। শুধু বড়-বড় শেঠ আর মিনিস্টারদের কথা থাকে। তা শুনে কী করবি?

বুড়ো রামখেলাওন ফোকলা দাঁতে হেসে বলল, ওস্তাদজি, গরিবের জীবনে আছেটা কী যে আখবরে লিখবে? গরিবের খবর আমরাও শুনতে চাই না। তুমি শেঠ আর মিনিস্টারজিদের কিস্যাই শুনাও।

ফুলসরিয়া নামে একটি বউ বলল, গতবারে তুমি আফ্রিকা নামে একটা কোন গাঁওয়ের খুব মজাদার একটা কাহিনি শুনিয়েছিলে, সেরকম আর একটা বলো।

তার স্বামী ধনিয়া বলল, আচ্ছা ওস্তাদজি, ইন্দিরাজির লেড়কা রাজীবজি তো এখন গদিতে বসেছে, ঠিক কি না? তা রাজীবজির ক'টা লেড়কা আছে? কত বড়? ধরো যদি, ভগোয়ান না করে, রাজীবজি আচানাক খতম হয়ে যায়...

কয়েকজন হাসতে থাকে, কয়েকজন চোখ বড়-বড় করে উদ্বেগের সঙ্গে তাকায়। এটা মোটেই হাসির ব্যাপার নয়, ওস্তাদজির একটা মতামত এই বিষয়ে শুনতে চায় তারা।

আজ কোনও কাজ নেই। আকাশ খরখরে, তাই চাষের কাজ শুরু হয়নি, এখন শুধু বৃষ্টির প্রতীক্ষা। অলস সময় বয়ে যায়।

নানারকম গল্প করতে-করতে ওস্তাদজি হঠাৎ বলল, কেউ এক কাপ চা খাওয়াতে পার?

সবাই সবার মুখের দিকে তাকায়। নিঃশব্দে হায়-হায় করে ওঠে। ছি-ছি, কী লজ্জার কথা, মানুষটা নিজের মুখে কথাটা বললে, সামান্য এক কাপ চা, কিন্তু কী করে তা খাওয়ান যায়? এখানে তো কোনও বাড়িতে চায়ের চল নেই।

ওদের মুখের ভাব দেখেই ওস্তাদজি ব্যাপারটা বুঝল। শহরে গিয়ে-গিয়ে ওস্তাদজির চায়ের নেশা হয়েছে। সে হাত তুলে বলল, থাক, থাক। চায়ের দরকার নেই। এক গিলাস পানি দাও কেউ। তারপর আমি শুনাব এক শেঠজির কিস্যা।

এক নওজোয়ান উঠে দাঁড়িয়ে বলল, পাক্কীতে এক সর্দারজির হোটেল আছে, সেখান থেকে আমি নিয়ে আসছি চা। কেউ একটা বর্তন দাও!

পাক্কী মানে পাকা সড়কি, হাইওয়ে। এখান থেকে আড়াই মাইল দূরে। যুবকটি ছুটে যাবে আর আসবে।

ধনিয়া বলল, অতদূর থেকে চা আনবি, তাতে তোর ঘাম গরম হবে কিন্তু চা যে ঠান্ডা জল হয়ে যাবে। ঠান্ডা চা খেতে একেবারে বিল্লির প্রসাবের মতন।

যেন সে সত্যিই কখনও বিড়ালের পেচ্ছাপ পান করেছে, সেইরকম একটা বিকৃত মুখভঙ্গি করে, হেসে ওঠে সবাই।

ফুলসরিয়া মুখ ঝামটা দিয়ে বলে, কেন, আমরা চা গরম করে দিতে পারি না? যা, যা, ছুটে যা!

রামখেলাওন বলল, একটা বড় বর্তন নিয়ে যা। বেশি করে আনিস!

ওস্তাদজি নওজোয়ানের দিকে হাত তুলে বলে, দাঁড়া।

তারপর সে চুপ করে থাকে। কিছু বলে না। তার কপালে কী যেন একটা মতলবের রেখা ছোটাছুটি করছে।

একটু পরে খাটিয়া ছেড়ে সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তুই কেন একলা যাবি? চল, আমরা সবাই মিলে যাই। এখানে বসে থেকে কী হবে? পাক্কী দিয়ে কত গাড়ি যায়, কত ট্রাক এক হাজার, দু-হাজার মাইল যায়, ওসব দেখলেও ভালো লাগে। ঠিক কি না!

অনেকে একসঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে হইহই করে বলল, চলো, চলো, চলো!

তিরিশ-পঁয়তিরিশ জন জুটে গেল। খবর পেয়ে আরও দু-চারজন ছুটে আসে।

রামখেলাওন বলল, আরে-আরে, এত আদেখলার দল নিয়ে যাওয়া হবে কোথায়? এত চায়ের পয়সা দেবে কে?

ওস্তাদজি হাত তুলে বলল, চলুক, সবাই চলুক, ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

ফুলসরিয়া বলল, ওস্তাদজি যেতে বলেছে, তবু তুমি বখেড়া করছ? ওস্তাদজির কথার দাম নেই?

একটি অকারণের মিছিল। অলস জীবনে একটা আকস্মিক পিকনিক। পাক্কীতে গিয়ে দাঁড়ালেই টের পাওয়া যায় এদিকে একটা দূরের দেশ আছে, ওদিকে আর-একটা দূরের দেশ। এর মধ্যে একটা দিকে এদেশের রাজধানী। মাইলের হিসেবে পঁচিশ-তিরিশ মাইল হলেও আসলে অনেক দূর।

পাক্কীতে পৌঁছে আরও আধ মাইল ডান দিকে হেঁটে সর্দারজির দোকান পাওয়া গেল। কিন্তু সে দোকানের ঝাঁপ ফেলা। দেখলে মনে হয় সে দোকানে বেশ কিছুদিন কেনাবেচা বন্ধ আছে।

ধনিয়া কপাল চাপড়ে বলল, হায় রাম! এই কথাটা আমার মনে ছিল না? অমৃতসরে কী যেন গোলমাল হয়েছে, সর্দারজিরা খুব রেগে আছে, অনেক সর্দার ভাগলবা হয়েছে। ইন্দিরাজির দেহান্ত হওয়ার পর এই সর্দারজীকে আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না!

আর দু-একজন বলল, ঠিক, ঠিক। দোকানটা তো বেশ কিছুদিনের বন্ধ!

সবার মুখে শোকের ছায়া। পিকনিকটা ব্যর্থ হয়ে গেল! ওস্তাদজি আজ নিজে সবাইকে চা খাওয়াতে চাইলেন!

ওস্তাদজি বলল, কই ফিকর নেই। এ দোকান বন্ধ তাতে কী হয়েছে, আরও তো দোকান আছে। চল, সামনে চল!

রামখেলাওন বলল, আর কোথায় যাবে ওস্তাদজি? যত সামনে যাবে তত শহর এসে যাবে। সেখানের দোকানে দাম বেশি। তা ছাড়া আমরা কুর্তা পরে আসিনি, পায়ে জুতা নেই, আমাদের ঢুকতেই দেবে না!

আরও কয়েকজন থমকে দাঁড়িয়ে গেছে। তাদের মনেও এই চিন্তা এসেছে। রাস্তার ধারের দোকানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তবু চা খাওয়া হয়। ভালো দোকানে তাদের ঢুকতে দেবে কেন?

ওস্তাদজি বলল, আরে কুর্তা-জুতা কি চা খাবে, না মানুষ চা খাবে!

মুখে তার এক পলক হাসি ফুটে উঠল। যেন একটা নতুন দুষ্টু বুদ্ধি মাথায় এসেছে।

পকেট থেকে খবরের কাগজটা বার করে গোল করে মুখের সামনে এনে সে তাতে দুবার চুমু খেল। তারপর বলল, চল, তোদের আজ আমি তাজমহলে চা পিলাবো!

ওস্তাদজি মাঝে-মাঝে এমন কথা বলে যার মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝা যায় না! তাজমহলটা আবার কী জিনিস! এ ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

ধনিয়ার মধ্যে একটা সবজান্তা ভাব আছে। সে বলল, তাজমহল হচ্ছে বাদশাদের এক বহুৎ ভারী মোকান! আমি ফটো দেখেছি! ঠিকাদারবাবুর বাড়িতে ক্যালেন্ডারে ছিল।

ওস্তাদজি বলল, ঠিক বলেছিস। তোরা আকবর বাদশার নাম শুনেছিস? শুনিসনি! সেই আকবর বাদশার নাতি তার বেগমের জন্য একটা মস্ত বড় কুঠি বানিয়েছিল। এ-ই রোদ্দুরের মতন শফেদ। বহুৎ চমকদার!

একজন ফক্কুড়ি করে বলল, সেখানে আমরা যাব কেন? বাদশা কি আমাদের দাওয়াত দিয়েছে?

ধনিয়া বলল, আরে, বাদশা-বেগমের জমানা খতম। তারা আর নেই। তাও জানিস না?

একজন বলল, তাহলে নিশ্চয় সেখানে এখন মন্ত্রীজিরা তাদের বিবিদের নিয়ে থাকে?

ওস্তাদজি বলল, না রে, সে কুঠি এখন পাবলিকের জিনিস। তোর আমার মতন বেহুদা আদমিরাও সেখানে যেতে পারে!

তবু অনেকের সংশয় ঘোচে না। সে জায়গা কত দূর? সেখানে চা খেতে কত পয়সা লাগবে? ফেরা হবে কখন?

ওস্তাদজির মুখে মিটিমিটি হাসি। সে ফস করে একটা একশো টাকার নোট বার করে তার নাকের সামনে নাচাতে লাগল।

আরে, কেয়া তাজ্জব! ওস্তাদজির তাপ্পি মারা আলখাল্লার জেব থেকে বেরুলো একশো টাকার নোট? লোকটা ভানুমতীর খেল জানে নাকি?

—এটা কী দেখালে, ওস্তাদ? কোথায় পেলে?

—তোরা আমাকে কী ভাবিস? আমি একেবার ফালতু? এটা আমি গান গেয়ে ইনাম পেয়েছি।

আবহাওয়া আবার হালকা হ'য়ে যায়। অনেকেই হাসতে শুরু করে। ওস্তাদজির গান শুনে কেউ টাকা দিয়েছে, এটা সত্যি বলে বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু একশো টাকার নোটটা সত্যি। এখনও হাওয়ায় মিলিয়ে যায়নি!

ধনিয়া বলল, ওস্তাদজি, তুমি ওই টাকাটা আমাদের জন্য খরচ করবে!

—আমি টাকা জমাই না। আচানক পেয়েছি। একদিনেই ফুঁকে দিতে রাজি আছি!

—তা হলে এক কাজ করো না! এত টাকা, চা খেয়ে কী হবে? মন্দিরে পূজা দাও!

—দূর পাগলা! আমি শুধু পেট পূজার কথা জানি, আর অন্য কোনও পূজা মানি না।

—শোনোই না কথাটা! দেওতার কাছে একটা খাঁসি কিংবা একটা ভৈঁস মানত করো! তারপর আমরা সবাই মিলে সেই মাংস খাব!

—একশো টাকায় খাঁসি কিংবা ভৈঁস হয়? একটা-দুটো ছুছুন্দুর হতে পারে!

ফুলসরিয়া বলল, আমার মরদটা সবসময় ফালতু কথা বলে। ওসব মাংস-টাংসর কথা থাক। বেঁচে থাকলে একদিন দু-দিন মাংস ঠিকই খাওয়া যাবে। ওস্তাদজি ওই যে হাওয়া মহল না কোন মহলের কথা বলল, আমি সেখানেই গিয়ে চা খেতে চাই!

অনেকেরই সেই মত হল। বাড়ি ফেরার তাড়া তো নেই, তাই সামনের দিকে এগিয়ে চলল এই গ্রাম্য বাহিনী। রাজধানীর দিকে।

খানিকদূর যাওয়ার পর তারা দেখল রাস্তা দিয়ে একটা লোক ডুগডুগি বাজিয়ে চলেছে। তার সঙ্গে একটা লোম ওঠা, রোগাটে ভাল্লুক আর দুটো বাঁদর। ওস্তাদজি এগিয়ে গিয়ে লোকটার কাঁধে হাত দিয়ে বলল, কেয়া দোস্ত কোথায় যাচ্ছ?

লোকটি ওস্তাদজির মুখ চেনে বোঝা গেল। সে বলল, আমার কি দিকের ঠিক আছে। যখন যেদিকে খুশি যাই। তুমি এই দলবদল নিয়ে চললে কোথায়?

ওস্তাদজি বলল, আমরা এক জায়গায় চা খেতে যাচ্ছি। তুমিও চলো আমাদের সঙ্গে। তোমাকে পেয়ে খুব ভালো হয়েছে।

ভাল্লুকওয়ালা বলল, এত লোক যাচ্ছে শুধু চা খেতে?

—চলোই না। ভালো চা খাওয়াব। সেরকম চা বাপের জন্মে খাওনি!

একজন কেউ চেঁচিয়ে বলল, আমরা তাজমহলে চা খেতে যাচ্ছি।

লোকটি থমকে দাঁড়াল। কাঁধ থেকে ওস্তাদজির হাতটা নামিয়ে দিয়ে চেয়ে রইল তার চোখের দিকে। সে বহুদর্শী মানুষ। সে চট করে মানুষের মুখের কথায় ভুলে যায় না।

সে জিগ্যেস করল, ওই লোকটা তাজমহলের কথা কী বলল? কোথায় চা খেতে যাওয়া হচ্ছে?

ওস্তাদজি মুচকি হেসে বলল, তাজমহলে।

লোকটি বলল, আমাকে কি বুদ্ধু পেয়েছো? আমি তাজমহল চিনি না? আমি সব চিনি। তাজমহল তো অনেক দূরে? এদিকে তো রাজধানী!

ওস্তাদজি বলল, আরে দোস্ত, চলোই না। তুমিই তো বললে তোমার দিকের ঠিক নেই। না হয় রাজধানীতেই গেলে।

—কিন্তু রাজধানী পর্যন্ত তুমি পয়দলে যাবে নাকি! মানুষ তো ছার, আমার ভাল্লুক-বান্দররাও থকে যাবে।

—তা হলে একটা ব্যবস্থা করতে হয়।

উলটোদিক থেকে তিনটে ট্রাক আসছে। ওস্তাদজি দু-হাত ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে গেল রাস্তার মাঝখানে। তার দেখাদেখি আরও অনেকে।

এই সব রাস্তায় এক-আধজন মানুষ সামনে পড়লে ট্রাক থামে না, চাপা দিয়ে বেরিয়ে যায়। কিন্তু এখানে প্রায় চল্লিশ জন নারী-পুরুষ। বিকট শব্দে ব্রেক কষে থেমে গেল তিনটে ট্রাক।

তিনটিতেই ভরতি আছে ছাগল। ট্রাক ড্রাইভাররা নেমে দাঁড়িয়ে ভাবছে এটা আবার কোন পার্টির চাঁদার ব্যাপার!

ফুলসরিয়া জিগ্যেস করল, ওস্তাদজি এরা এত খাঁসি নিয়ে যাচ্ছে কোথায়?

ওস্তাদজি বলল, রাজধানীতে। সেখানকার মানুষের এই অ্যাত্ত বড় খিদে? গাঁও-গাঁও থেকে চুন-চুন করে সেইজন্য ওরা খাঁসি, মুরগি, গোরু, মাছ, দুধ সব নিয়ে যায়। মেয়েমানুষও নিয়ে যায়।

—তাদেরও খায় নাকি!

—হা-হা-হা-হা! তুমহার ডর নেই, ফুলসরিয়া, আমরা এতজন আছি, তুমহাকে কেউ খেতে পারবে না!

এগিয়ে গিয়ে ওস্তাদজি ট্রাক ড্রাইভারদের সামনে হাত জোড় করে বলল, ভাই সাহাব, মেরে দোস্ত, মেহেরবানি করে আমাদের একটু রাজধানী পৌঁছে দেবে।

এই উৎকট প্রস্তাব শুনে কিন্তু ট্রাক ড্রাইভাররা খুশিই হল। এই হারাম-জাদাগুলো রাস্তা আটকে বসে থাকলে যাওয়ার কোনও উপায় ছিল না। পুলিশ এসে রাস্তা পরিষ্কার করতে-করতে অন্তত চব্বিশ ঘণ্টা, তাতে অনেক খরচের ধাক্কা তা ছাড়া এরা চাঁদাও চায়নি।

প্রথমে জায়গা নেই বলে খানিকটা গাঁইগুঁই করল তারা। তারপর কিছু ভাড়া পাওয়া যাবে কি না তার ইঙ্গিত করল। ওস্তাদজি বলল, তার লোকজন ছাগল কোলে করে বসতে পারে, তাতে জায়গা হয়ে যাবে। ভাড়ার কোনও প্রশ্ন নেই, তবে রাজধানীতে পৌঁছে সে ট্রাক ড্রাইভারদের চা খাওয়াতে পারে।

শেষপর্যন্ত তারা রাজি হলেও আপত্তি হল ভাল্লুক আর বাঁদর দুটিকে নিয়ে। ওস্তাদজি বলল, বেচারা ভাল্লুকটার চেহারা দেখছো। তোমার এক একটা খাঁসি ওর চেয়ে বড়। ওকে দেখে কেউ

ভয় পাবে না। চলো, চলো. আর দেরি নয়।

ফুলসরিয়া আর কয়েকটি মেয়ে দারুণ খুশি। প্রতিদিনের একঘেয়ে জীবনে এ একটা দারুণ মজা। ওস্তাদজি না হলে এরকম বুদ্ধি আর কে দেবে। কোথায় যাওয়া হচ্ছে কে জানে। কুছ পরোয়া নেই।

দু-একজন চেঁচিয়ে গান গেয়ে ওঠে। অন্যরা সঙ্গে হাততালি দেয়। কত মজা, কত ফুর্তি? কী যে চা-খাওয়ার একটা ভেল্‌কি তুললে ওস্তাদজি, তাতেই আজকের দিনটা বদলে গেল।

দূর থেকে রাজধানীর হর্ম্যরেখা দেখে সবার যেন দম বন্ধ হয়ে আসে। যেন স্বর্গপুরী। এখানে আকাশও যেন নীচু।

এই দলের দু-দশ জন অবশ্য আগেও কয়েকবার রাজধানীতে এসেছে জনমজুরের কাজ করতে। কিন্তু সে অন্যরকম আসা। আজ যেন তারা রাজধানী জয় করতে যাচ্ছে।

ফুলসরিয়া জিগ্যেস করল, ওস্তাদজি, তাজমহল তো সবসে বড়া কোঠী। সেটা এখান থেকে দেখা যাবে না!

—দেখবে, দেখবে। ঠিক সময়ে দেখবে। তখন তুমহার আঁখ ঠিকরে যাবে, ফুলসরিয়া।

রাজধানীর উপকণ্ঠে ট্রাক ড্রাইভার তাদের নামিয়ে দিল। আর যেতে তাদের মানা আছে। ওস্তাদজির চা খাওয়ান প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল তারা।

সেই মায়াপুরীর মধ্য দিয়ে হেঁটে চলল ওস্তাদজির দলবল। বাপরে-বাপ কত কিসিমের হাওয়া গাড়ি আর কত পুলিশ! ইস্, ওস্তাদজি যদি আগে বলত তবে যার-যার ভালো পোশাক পরে আসতো। ফুলসরিয়ার একটা গোলাপ ফুল-ছাপা শাড়ি ছিল। তার বদলে সে পরে এসেছে একটা মামুলি হলদে শাড়ি। তাও আবার ছেঁড়া, কোনও মানে হয়?

ওস্তাদজি মাঝে-মাঝে রাস্তার লোকদের কী যেন জিগ্যেস করছে। তার খুব সাহস, সে পুলিশদের সঙ্গেও কথা বলতে দ্বিধা করে না। কত রাস্তায় যে ঘোরা হল তার ঠিক নেই। ঘুরতে-ঘুরতে একটা বড় মোকামের সামনে এসে ওস্তাদজি বলল, থামো! এহি হ্যায় তাজমহল!

অনেকেই হতাশ হল। তারা ভেবেছিল, বাদশা বেগমের ব্যাপার, নিশ্চয়ই সাঙ্ঘাতিক অন্যরকম কিছু হবে। কোথায় সেই রাজপ্রাসাদ? এই বাড়িটা বেশ বড় বটে কিন্তু এরকম বড় বাড়ি তো তারা আসতে-আসতে বেশ কয়েকটা দেখেছে। এর থেকেও বড় বাড়ি দেখেছে। রোদ্দুরের মতন শফেদও তো না এটা?

ধনিয়া বলল, এহি?

ভাল্লুকওয়ালা ওস্তাদজিকে বলল, কেন দিল্লাগী করছো, ওস্তাদ? এই তোমার তাজমহল? এ তো একটা হোটেল?

ওস্তাদজি বলল, হ্যাঁ, হোটেলই তো। হোটেল ছাড়া চা আর কোথায় পাওয়া যাবে?

—সে কথা আগে বলনি কেন?

—আগে বললে এইসব আমার সাথীরা ভয় পেয়ে যেত। কিন্তু আমি কিছু [illegible] এই হোটেলের নাম তাজমহল। বিশওয়াস না করো তো তুমি ওই দারোয়ানকে পুছকে

হোটেলের কথা শুনে অনেকেই ঘাবড়ে গেছে। এতবড় হোটেলে ঢোকার সাহস তাদে[illegible]ই। ওস্তাদজি একশো টাকার নোট দেখিয়েছে বটে, একশো টাকা কম কিছু নয়, আবার বেশিও এই টাকায় একটা ভৈঁস বা খাঁসিও পাওয়া যায় না। এতবড় সাহেবদের হোটেলে কি এই টাকায় চা পাওয়া যায়? পাওয়া গেলেও তাদের ঢুকতে দেবে?

হোটেলের হেড-দারোয়ানের চেহারা আগেকার কোনও নবাব-বাদশার মতনই। নাকের নীচে প্রকাণ্ড মোছ, মাথায় নিভাঁজ পাগড়ি, গায়ে মখমলের জামা। হাতে একটা ছোট লাঠি, তার মুণ্ডিটা পেতলের হলেও সোনার মতন চকচকে। এতগুলো নোংরা-ছেঁড়া পোশাক পরা, খালি-পা ভিখিরি

দেখে সে হুংকার দিয়ে উঠল, আরে রে-রে-রে-রে, ভাগ্ হিঁয়াসে।

সেই বজ্র গর্জন শুনে চুপসে গেল অনেকের মুখ। একজন অন্যের পেছনে লুকোবার চেষ্টা করল, সবাই পেছন চায়।

ওস্তাদজি কিন্তু এগিয়ে গেল সামনে, একেবারে হেড-দারোয়ানের মুখোমুখি। বিনা দ্বিধায় সেই মখমলের জামা পরা বুকে হাত রেখে মিষ্টি হেসে বলল, হামলোগ কাস্টোমার হ্যায়, কাস্টোমার! প্যায়সা দেব, খানাপিনা করব। তুমি ফিরিয়ে দিচ্ছ কী?

হেড-দারোয়ান তবু বলল ভাগো, ভাগো! গেট কিলিয়ার করো!

ওস্তাদজি বলল, আরে দাদা, তুমি কাস্টোমারকে ফিরিয়ে দিচ্ছ কী? ডাকো তোমার মালিককে। তার সঙ্গে বাৎচিৎ হবে!

হোটেলের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে ততক্ষণে। স্টুয়ার্ড, ছোট ম্যানেজার, বড় ম্যানেজার সব সন্ত্রস্ত মুখে শলা-পরামর্শ করছে, এ কীসের হামলা? কীভাবে এই উৎপাত রোখা যায়। হোটেলের নিজস্ব গার্ড আছে, তবু ফোন করা হল পুলিশকে। হোটেলে কত সাহেব-মেম আছে, কত শেঠ-আমির আছে, তাদের নিরাপত্তা চাই। এই হোটেল কী এমন দোষ করল যে গাঁ থেকে গুণ্ডা-বদমাশরা এল হোটেল ঘেরাও করতে?

হোটেলের ছোট ম্যানেজার দোতলার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে গার্ড ও পুলিশদের উদ্দেশে বলল, রিমুভ দেম! ক্লিয়ার দা গেট্স্!

ওস্তাদজি চেঁচিয়ে বলল, কী বলছেন ম্যানিজার সাব? ইংলিশমে খ্যাচ-ম্যাচ করছেন কেন? কোনও সাহেব কি আপনাকে পয়দা করেছে? আপনার গায়ের রংটি তো আমারই মতন!

ছোট ম্যানেজার বলল, টুম লোক ইধার সে চলে যাও! হল্লা মাট্ করো! নেহি তো পুলিশ তুম-লোগকো পুশ করে গা!

ওস্তাদজি বলল, ইয়ে ক্যা আজিব বাত বলছেন, ম্যানিজার সাব? আপনি কাস্টোমারদের ভাগিয়ে দিচ্ছেন? আমি কানস্টিটিউশান পড়ে নিয়েছি, তাতে কোথাও লিখা নেই হোটেলে ঘুষতে গেলে পায়ে জুতা পরে আসতে হবে। পয়সা দিব, খাব, ব্যাস!

—হোটেলে তুমলোগ খেতে পারবে না, দুসরা হোটেলে যাও!

—কেন খেতে পারব না? সব কাস্টোমারকে কি তোমরা বলো, আগে রূপিয়া দেখাও? কনস্টিটিউশানে এ কথাও লিখা নেই।

ছোট ম্যানেজার তাড়াতাড়ি সরে গেল আরও বড় থানায় ফোন করতে।

চোখের নিমেষে এসে গেল গাড়ি-গাড়ি পুলিশ। আর তাদের জাঁদরেল চেহারার কর্তারা।

এত পুলিশের সমারোহ দেখে গাঁও-এর লোকেরা একেবারে ঘাবড়ে-টাবড়ে অস্থির। তারা আর্ত চিৎকার করে বলছে, এ তুমি কী করলে ওস্তাদজি? তোমার কথায় বিশ্বাস করে আমরা এতদূর এলাম। চা পিলাবার নাম করে তুমি কি আমাদের মার খাওয়াবে? পুলিশ আমাদের ফাটকে ভরে দিলে খেতির কাজ কাম কী করে হবে? বালবাচ্চারা কী খাবে?

ভাল্লুকওয়ালার হাত থেকে ডুগডুগিটা নিয়ে ডুগা-ডুগ, ডুগা-ডুগ করে বাজিয়ে এক হাত তুলে ওস্তাদজি বলল, শুনো ভাইয়ো আর বহেনো, মরদকা বাৎ হাঁতিকা দাঁত! আমি তুমাদের জবান দিয়েছি কি তাজমেহেল হোটেলমে চা পিলাব। এমন বঢ়িয়া চা জীবনে খাওনি। যারা ডরপুক তারা পিছে হঠে যাও! যারা আমায় বিশওয়াস করো, তারা আমার সঙ্গে থাকো।

একটা গুঞ্জন উঠে আবার থেমে গেল। একজনও পিছিয়ে গেল না। ডরপুক বদনাম কে নিতে চায়? ওস্তাদজি তাদের ভালো দেখে, সে ইচ্ছে করে তাদের বিপদে ফেলবে না। এও যেন সেই ঠিকাদারকে ঘেরাও করার মতন একটা মজাদার ব্যাপার!

পুলিশের এক কর্তা এগিয়ে এসে ওস্তাদজিকে বলল, তুমি এদের লিডার? তুমি এ পাশে

এসো, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

ওস্তাদজি বলল, তোমার মতন ছোটামোটা দারোগার সঙ্গে কী কথা বলব? কমিশনার সাহেবকো বোলাও, নেহিতো প্রাইম মিনিস্টারজি কো বোলাও। যে-লোক কানস্টিটিউশান পড়েছে, তাদের সঙ্গে কথা হবে!

ছোট লোকের এই স্পর্ধা দেখে রাগে টকটকে হয়ে গেল পুলিশ কর্তার মুখ। একটু বাইরের দিকে হলে এদের পিটিয়ে শায়েস্তা করে দেওয়া যেত। দু-চারটে লাশ পড়লেও ক্ষতি ছিল না। কিন্তু এটা রাজধানী, এখানে শত-শত বিদেশি দূতাবাস, কত খবরের কাগজের লোক, কী থেকে কী হয়ে যায় তার ঠিক নেই। হোম মিনিস্টার খচাখচ সাসপেণ্ড করে দেবে!

পুলিশের কর্তার সঙ্গে হোটেলের ম্যানেজারদের আবার পরামর্শ হল। এই ঝঞ্ঝাট চুকিয়ে দেওয়ার একটাই উপায় আছে। ভিখিরিগুলো বাগানের শোভা নষ্ট করছে, যত তাড়াতাড়ি ওদের বিদায় করা যায়, ততই মঙ্গল।

বড় ম্যানেজার এবারে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে বলল, ঠিক হ্যায়, তুম লোগ চা খেতে এসেছো, এই হোটেল ম্যানেজমেন্ট অ্যাজ এ গুড উইল জেস্চার তোমাদের চা খাওয়াবে। ফ্রি অফ কস্ট। তোমরা গেটের বাইরে গিয়ে দাঁড়াও, চা পাঠানো হচ্ছে।

গাঁয়ের লোকেদের মুখে হাসি ফুটল। ওস্তাদজির জয় হয়েছে। সত্যিই তাদের চা খাওয়া হবে।

ওস্তাদজি হাত তুলে তাদের থামিয়ে দিয়ে বিদ্রুপের সুরে ম্যানেজারকে বলল, আরে ছোঃ! আমরা কি ভিখারি নাকি যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে চা খাব? স্বাধীন নাগরিক, পয়সা দিয়ে খেতে এসেছি, ভিতরে কুর্শিতে বসব, টেবিলে কনুই ঠেকিয়ে আরাম করব, তবে না!

দলবলের উদ্দেশে ডাক দিয়ে সে বলল, চল, চল, অন্দর চল!

সবাই হুড়মুড়িয়ে দৌড়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল ওস্তাদজির নেতৃত্বে।

ভেতরে টেবিলে-টেবিলে বসে ছিল দেশ বিদেশের ফরসা রং সাহেব মেমরা, আর পাকা সাহেবি পোশাক পরা কালো রঙের দিশি সাহেবরা। সবাই আঁতকে উঠল, হুড়োহুড়ি ঠ্যালাঠেলি পড়ে গেল। গাঁওয়ের মানুষ দখল করে নিল সব টেবিল চেয়ার।

ওস্তাদজি বলল, দে ধনিয়া, একটো বিড়ি ছাড়! দেখলি তো!

সবাই বলল, ওস্তাদজিকা জয়!

গলায় কালো বো বাঁধা একজন স্টুয়ার্ড ওস্তাদজির সামনে এসে ভদ্রকঠিন গলায় বলল, দেখুন, আপনারা চা খেতে চান, ঠিক আছে, চা দিচ্ছি। কিন্তু একটা ভাল্লুক আর বাঁদর নিয়ে হোটেলে ঢোকার তো নিয়ম নেই। ওদের বাইরে রেখে আসুন!

ওস্তাদজি আলখাল্লার পকেট থেকে ফস করে খবরের কাগজটা বার করে সেই কর্মচারীর চোখের সামনে প্রথম পৃষ্ঠাটা মেলে ধরে বলল, এটা কীসের তসবির আছে? দেখো, আচ্ছা সে দেখো! চিনতে পারো না!

কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় একটা ভাল্লুকের ছবি!

ওস্তাদজি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, শুনো, ভাইয়ো আর বহেনো, এই ভাল্কোর ছবি দেখছ, এটার মালিক এই হোটেল! হ্যাঁ, আমি ঠিক কথা বলছি। আখবরে সব লিখা আছে। এই হোটেল এই ভাল্কোটাকে পাঠিয়েছে ফরাসি সাহাবদের মুলুকে। সেখানে হোটেলে-হোটেলে এই ভাল্কো খেল্ দেখাবে! আমি ঝুট বলি না, সাচ বাৎ বলি, এখানে সব লিখা আছে। এই হোটেল যদি আন্যকুনো হোটেলে ভাল্কো পাঠায়, তবে আমরা কেন এখানে আমাদের ভালকো আনতে পারব না? আলবাৎ আনব?

সবাই হা-হা হো-হো করে হেসে সমর্থন জানাল ওস্তাদজিকে। সাহেবদের হোটেলে যদি ভাল্লুক যায়, তবে দিশি হোটেলে কেন আসবে না?

পুলিশ চেষ্টা করছে টেলিফোনে হোম মিনিস্টারকে ধরতে। কিন্তু তিনি বেপাত্তা। লাঠি, টিয়ার গ্যাস, না গুলি—কোনটা চালানো হবে, সে নির্দেশ কেউ দিতে পারছে না। তার থেকে এদের চা খাইয়ে দেওয়াই ভালো।

টেবিলে-টেবিলে দামি-দামি অ্যাস্ট্রে আর ফুলদানি। এ ব্যাটারা নির্ঘাৎ ওগুলো চুরি করবে। ম্যানেজারের নির্দেশে বেয়ারারা সেগুলো সরিয়ে নিতে এল।

ওস্তাদজি একজন বেয়ারার হাত চেপে ধরে বলল, আরে নোকর! তুই বড় লোকের নোকর হয়েছিস বলে কি তোর জাত পালটে গেছে? তোর বাপ-দাদা কোনদিন খেতি-মজুরি করেনি? তুই আমাদের পছানতে পারছিস না? কানস্টিটিউশানের কোথায় লিখা আছে যে হোটেলে এসে সিগ্রেটের ছাই ঝাড়া চলবে লেকিন বিড়ির ছাই ঝাড়া চলবে না? রাখ ওসব!

তারপর তুড়ি মেরে সে স্টুয়ার্ডকে ডেকে বলল, ওহি কাগজ লাও, যে কাগজে সব চিজের নাম আর দাম লিখা থাকে!

টেবিলে-টেবিলে মেনু কার্ড পড়ে আছে, তার একখানা তুলে দেওয়া হল ওস্তাদজির হাতে। সে মনোযোগ দিয়ে পড়ার ভান করে বিড়বিড় করে বলল, শালা ডাকু! একটা শুখা মুর্গা, তার কিম্মৎ দেড়শো রূপেয়া। এক পিলেট বাদাম, পচ্চিশ রূপেয়া! ডাকু! হারামখোর! নাঃ, আমরা শুধু চা খাব। চা আনো চাল্লিশ কাপ।

দু-তিনটি সাহেব সাহস করে ভেতরের দরজা দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারছে। তাদের হাতে ক্যামেরা। ওস্তাদজি তাদের ডেকে বলল, আও, আও, তসবির খিঁচো।

রোগা প্যাংলা দুখীরাম নামের একজনকে সামনে দাঁড় করিয়ে বলল, ইনকা তসবির লেও! রাজীবজি ফরাসি মুলুক আর আম্রিকায় গেছে ফাংকশান করনে কে লিয়ে। জাদুঘর থেকে সব পাথরের মূর্তি নিয়ে গিয়ে সাহেবদের ভারত দেখাচ্ছেন। উয়ো তো পুরানা জামানার ভারত হ্যায়! ইয়ে দুখীরামকো দেখো। ইয়ে হ্যায় নয়া জমানাকা ভারত!

পুলিশ এসে সাহেবদের সরিয়ে দিল। বিদেশিদের যখন-তখন ছবি তোলার নিয়ম নেই। তা ছাড়া কখন ভায়োলেন্স শুরু হয়ে যায়, তার ঠিক কী! ওই লোকগুলো টেবিল চাপড়ে হাসি মস্করা করছে। ওদের চা দিতে এত দেরি হচ্ছে কেন?

বড়-বড় পটে করে চা এল। বেয়ারা সেই চা কাপে-কাপে ঢালতে যেতেই ওস্তাদজি বলল, রোখো! তুম যাও!

তারপর সে ফুলসরিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, দেবী ফুলসরিয়া, আজ তুমিই এই তাজমহলের বেগম। তুমি নিজের হাতে সবাইকে চা বেঁটে দাও!

সকলেই এক একটা কাপ পাওয়ার পর সুরুৎ সারাৎ শব্দে চা টানতে লাগল। কেউ-কেউ বলল, আঃ! মজা আ গিয়া! কী সুন্দর বাস, এমন চা বাপের জন্মে খাইনি। ধন্য তুমি, ওস্তাদজি!

শুধু ফুলসরিয়ার চোখে জল।

ওস্তাদজি তাকে জিগ্যেস করল, এ কী ফুলসরিয়া, তুম রোতে কিঁউ? কীসের দুঃখ হয়েছে তুমহার?

ফুলসরিয়া ধরা গলায় বলল, বড় আনন্দ হচ্ছে, ওস্তাদজি! আমি একটা বেহুদা কামিন। আমায় এত সম্মান কেউ কখনও দেয়নি।

—তুমি নিজে হাতে দিলে তাই চায়ে এত বেশি সুবাস, আরও যেন মিঠা লাগল! ঠিক কি না!

সবাই বলল, ঠিক ঠিক?

ভাল্লুকওয়ালা বলল, আরে, তোমরা সব চা খেয়ে নিলে, আমার ভাল্লুক আর বান্দর দুটোকে একটু দিলে না?

তাই তো, তাই তো, বড় ভুল হয়ে গেছে। সবাই তাদের কাপ থেকে একটু-একটু ঢেলে দিল প্লেটে। সেই চা ভাল্লুক আর বাঁদর দুটোকে খাওয়ানো হল।

চা খেতে-খেতে চকচক করতে লাগল নির্জীব ভাল্লুকটার চোখ। এরকম ভালো জিনিস তো সে কখনও খায়নি! আবার যেন সে চাঙ্গা হয়ে উঠেছে।

ওস্তাদজি ভাল্লুকটার সামনে হাততালি দিয়ে বলে উঠল, নাচ ভাল্‌কো, নাচ! নাচ রে মুন্না নাচ!

সবাই মিলে হাততালি দিতে লাগল ভাল্লুকটাকে ঘিরে।

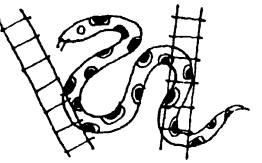

সাপলুডোর সিঁড়ি

এটা কি আগে এখানে ছিল, না ছিল না? একটা বেঁটে মতন গম্বুজ, তার সব দিকেই নানারকম পোস্টারে মোড়া, একটা বড় ফিল্মের পোস্টারে এক যুবতি দু-চোখ দিয়ে হাসছে।

এক পাশে ছিল ধানখেত, আর জলা, রাস্তার অন্যপাশে দোকানপাট। হ্যাঁ, স্পষ্ট মনে আছে অতনুর, ধানখেতের পাশে যে-অগভীর জলাভূমি, সেখানে গামছা দিয়ে মাছ ধরত কয়েকটি কিশোর, মাছ বিশেষ পাওয়া যেত না, ঝাঁপাঝাঁপি, কাদা মাখামাখিই সার, কখনও হয়তো পাওয়া যেত কিছু কুচো চিংড়ি, বেলে আর পুঁটি। একদিন অতনু দুটো খলসে মাছ পেয়েছিল। সব মিলিয়ে এতই কম যে, নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া যায় না, তাই এক-একদিন এক-একজন সবটা, কম হোক বা বেশি হোক যার ভাগ্যে যেমন আছে। খলসে মাছের কথা বিশেষভাবে মনে থাকার কারণ, কই মাছের গরিব আত্মীয় হলেও এই মাছের গায়ে রামধনু রঙের ঝিলিক থাকত। সেই মাছদুটো রান্না করার বদলে একটা কাচের বয়েমে জল ঢেলে তার মধ্যে রেখে দিয়েছিল অতনু। তিন দিনের বেশি বাঁচেনি। কই-মাগুর জাতীয় মাছ মরে গেলে খেতে নেই বলে মা ছোটো খলসে দুটো ফেলে দিয়েছিলেন। এই গল্প অতনু যাকেই বলতে গেছে, সবাই তাকে শুনিয়ে দিয়েছে যে, খলসে মাছ এখন আর পাওয়াই যায় না, খলসে এখন বিলুপ্ত প্রজাতি।

সেই ধান খেত আর জলাভূমিও অদৃশ্য। এখন সেখানে সার-সার এক ধরনের বাড়ি, চারতলা, মেটে রঙের, মনে হয় কোনও বড় সংস্থার কর্মচারীদের কোয়ার্টার্স। অদৃশ্য হওয়াই তো স্বাভাবিক, সীতারামপুর নামে পুর হলেও একসময় তো গ্রামই ছিল, এখন শহর হতে চলেছে, শহরের এত ধার ঘেঁষে কি ধানখেত থাকে নাকি? অতনুদের ছেলেবেলায় এখানে রেলস্টেশন ছিল, চার মাইল হেঁটে চকবাজারে যেতে হত। এখন স্টেশন হয়েছে বলেই ধাঁধাঁ করে বদলে যাচ্ছে গ্রাম।

পরিবর্তনগুলো ঠিক-ঠিক মিলিয়ে নিতে পারে না অতনু। অনেক দিনের ব্যবধান, সতেরো বছরে সে সীতারামপুর ছেড়েছিল, এখন তার বয়েস বেয়াল্লিশ। কিন্তু মাঝখানে কি সে আর কখনও আসেনি, তা তো নয়, বেশ কয়েকবার ঘুরে গেছে। কিন্তু স্মৃতির এমনই কারসাজি, কৈশোরের ছবিগুলি এখনও জ্বলজ্বল করে, মাঝখানে অনেক দিনের শূন্যতা। অবশ্য মাঝখানে এসে সে আগে দু-তিন দিনের বেশি থাকেনি, ভালো করে চারপাশটা তাকিয়ে দেখেনি।

শেষ এসেছিল সাত বছর আগে, মায়ের মৃত্যুর সময়। তখন আবার অতনুর ওদিকেও খুব ব্যস্ততা। একটা প্রমোশন নিয়ে দর কষাকষি চলছিল, তবু মা বলে কথা, আসতেই হয়, শেষ দেখাও

হয়নি, শুধু শ্রাদ্ধের জন্য তিনদিন। মাতৃশোকের চেয়ে মন বেশি অস্থির ছিল চাকরির জন্য, তখন এখান থেকে আফ্রিকায় টেলিফোন করারও সুবিধে ছিল না।

খালধারে একটা ছিল ভূতের বাড়ি। কৈশোরেরও আগে, বাল্যস্মৃতিতে একটা গা-ছমছমে ভাব। বেশ বড় তিনতলা বাড়ি, দেয়ালে-দেয়ালে বট-অশথ গাছ গজিয়ে গিয়েছিল, ভূত ছাড়াও সাপ-খোপেরও অভাব ছিল না! আসলে হয়তো কোনও শরিকি গণ্ডগোলে পরিত্যক্ত বাড়ি, কোনও সমৃদ্ধ মুসলমানের সম্পত্তিও হতে পারে, দেশভাগের পর চলে গিয়েছিল ওপারে, এখনও ওখানে কাছাকাছি মুসলমানদের একটি পল্লি আছে। এখন সেই ভূতের বাড়ির জায়গায় একটি ঝকঝকে রিসর্ট, প্রচুর আলো ঝলমল করে, শহরের লোকেরা এখানে ছুটি কাটাতে আসে। ওরকম ভূতের বাড়ি আরও নানা জায়গায় ছিল, সবই হয়ে গেছে নিশ্চিহ্ন, হবেই তো, এরই নাম উন্নতি।

তবে, এই রিসর্টের দিকে তাকিয়ে এখনও অতনু কল্পনায় সেই ভূতের বাড়িটা দেখতে পায়। তার মনে হয়, গ্রামে-ট্রামে ওরকম দু-একটা হানাবাড়ি থাকা বোধহয় উপকারীই ছিল, ওই সব বাড়িতে বাচ্চা ছেলেমেয়েদের ভয় ভাঙার ট্রেনিং হত আস্তে-আস্তে। অতনুরা প্রথম-প্রথম ওই বাড়ির আশেপাশে ঘুরে বেড়াত, একটা কিছু আওয়াজ শুনলেই দৌড়ে পালাত ভয়ে। একটু বয়েস বাড়লে সাহস করে পা দিয়েছিল বাগানে, বাড়িটার কাছ ঘেঁষত না, বাড়িটার মধ্যে সত্যি-সত্যি মাঝে-মাঝে উৎকট শব্দ হত, কেউ-কেউ নাকি আগাগোড়া কালো সিল্কের বোরখায় ঢাকা এক মহিলাকে ধীরপায়ে দোতলার বারান্দায় হাঁটতে দেখেছে, কয়েক মুহূর্ত মাত্র, তারপরই তিনি মিলিয়ে যেতেন হাওয়ায়। উনি রাবেয়া বেগম, মারা গেছেন সাতাশ বছর আগে।

কী করে যেন হঠাৎ একদিন ভয় ভেঙে গেল। মধ্য কৈশোরে চার-পাঁচজন বন্ধুর সঙ্গে অতনু উঠে গিয়েছিল দোতলায়। গাঢ় দুপুরে, যখন চারপাশে কোনও শব্দ থাকে না, সে-সময় ভূতেরা এসে পেছন থেকে ঠেলা মারে। কই কিছুই তো হল না, কোনও ঘরেই দরজা-জানলা নেই, চতুর্দিকে প্রচুর ভাঙা কাচ ছড়ানো, আর ধুলোতে কিছু-কিছু পায়ের ছাপ, ভূতেরা পায়ের ছাপ ফেলতে পারে কি না, তা ঠিক জানা ছিল না তখন। অনেক পায়রার বাসা ছিল।

সে দিনটার কথা খুব ভালোই মনে আছে অতনুর। কারণ সেদিন সে শুধু ভূতের বাড়ি জয় করেনি। সেইদিনই জীবনে প্রথম সে সিগারেট খায়, তার বন্ধু রতন শিখিয়েছিল। সিগারেট টানার মতো অমন নিরিবিলি জায়গা আর পাওয়া যাবে কোথায়? লেবুপাতা চিবিয়ে বাড়ি ফিরলেও কী করে যেন ধরা পড়ে গিয়েছিল মায়ের কাছে। মা কি কোনও শাস্তি দিয়েছিলেন? মায়ের দেওয়া শাস্তি কোনও মানুষই মনে রাখে না। বাবা চুলের মুঠি ধরে মাথাটা দেয়ালে ঠুকে দিতেন, সেটা মনে আছে।

সেই দিনটায় তাদের দলে একটা মেয়েই ছিল না? কী যেন নাম তার, চিনু, চিনু, সে একটা গেছো মেয়ে, তাকে নেওয়া হবে না, তবু এসেছিল জোর করে। রোগা-প্যাংলা চেহারা, সেই তেরো-চোদ্দো বছর বয়েসে তাকে মেয়ে বলেই মনে হত না, বুকেও বোধহয় ঢেউ খেলেনি, হাফ-প্যান্ট আর শার্ট পরে থাকত। সিগারেট টানার সময় সেও জেদ ধরেছিল, আমায় দাও, আমিও খাব, আমিও খাব, কিন্তু তাকে দেওয়া হয়নি, কে যেন একটা চড়ও মেরেছিল তাকে। কোথায় হারিয়ে গেছে সেই মেয়েটা!

এবারে তিন সপ্তাহের ছুটিতে এসেছে অতনু। সীতারামপুরে তার আর কোনও আকর্ষণ নেই, এখানে কয়েকটা দিন নষ্ট করার কোনও মানে হয় না, হঠাৎ মায়ের কথা খুব মনে পড়ছিল, এসেছে সেই নস্টালজিয়ায়। আসার পরই মনটা পালাই-পালাই করছে।

যৌথ পরিবার ছিল একসময়, তারপর অনেক ভাগ হয়েছে, মায়ের মৃত্যুর পর তার দাদা এসে নিজেদের অংশটা বিক্রি করে দিয়ে যায় এক কাকাকে। সেই কাকা অতনুর বাবার বৈমাত্রেয় ভাই, ছোটোবেলায় খুব ভালোবাসতেন অতনুকে। সেই স্মৃতিতে এখানে আসা, কাকার পরিবার বেশ

খাতির-যত্ন করছে তাকে, তবু অতনুর অস্বস্তি কাটছে না। কাকা বুড়ো হয়ে গেছেন, অসুখের কথা ছাড়া আর কোনও কথা জানেন না। দুই খুড়তুতো ভাইকেই অচেনা মনে হয়, দুই ভাইয়ের স্ত্রী খুব ঝগড়া করে। কিছু চাষের জমি আছে, তার থেকে উপার্জন অনিশ্চিত, বাজারে একটা জামা-কাপড়ের দোকানের সিকি ভাগ মালিকানা, সে আয়ও যথেষ্ট নয়।

মা যে-ঘরটায় থাকতেন, সে ঘরটা এখন বৈঠকখানা। কয়েকটা ছেঁড়া-ছেঁড়া বেতের চেয়ার, একটা তক্তাপোশ আর একটা টিভি। মায়ের কোনও চিহ্নই নেই। খুড়তুতো ভাইয়ের দুই স্ত্রীর মধ্যে একজন নিঃসন্তান, অন্যজনের তিনটি ছেলেমেয়ে। নিঃসন্তান মহিলারই দাপট বেশি। ছেলেমেয়ে তিনটির বয়েস নয়, বারো, চোদ্দো, মেয়েটিই বড়। অতনুর আর বিয়ে-থা করা হয়নি। ছোট ছেলেমেয়েদের সে ভালোবাসে। ওদের সঙ্গেই তার বেশি সময় কাটে। মাঝে-মাঝে অতনু মনে-মনে ওদের সঙ্গে তুলনা করে তার বাল্য-কৈশোর বয়েসের। তখন এখানে প্রচুর ফাঁকা জায়গা ছিল, কিছু-কিছু বাগান আর পুকুর ছিল, অতনু তার বন্ধুদের সঙ্গে হুটোপুটি করে বেড়াত, বাঁদরের মতন লাফালাফি করত অন্যদের বাগানের গাছে, ফল-পাকুড় খেয়েছে, লাঠির বাড়িও খেয়েছে। সন্ধের পরেও দেরি করে বাড়ি ফিরলে বকুনি খেয়েছে বাবার কাছে। এখন তার খুড়তুতো ভাইয়ের ছেলেমেয়েরা স্কুলে যায়, বাড়িতে কিছুক্ষণ পড়তে বসে, আর বাকি সব সময়টা টিভি দেখে। বাড়ির বাইরে কোথাও যায় না, খেলতেও যায় না, তাই তারা লক্ষ্মী ছেলেমেয়ে। অতনু বুঝতে পারে, এরা হয়তো সারাজীবন এই গ্রামেই থাকবে, আর কোথাও যাবে না।

অতনুকেও ওদের সঙ্গে টিভি দেখতে হয়। অতনু খানিকটা কৌতূহল নিয়েই টিভি'র অনুষ্ঠানগুলো, বিশেষত বিজ্ঞাপন দেখে। কোনও দেশের অনেকখানি সমাজের ছবি বিজ্ঞাপন দেখলেই বোঝা যায়। এখানকার বিজ্ঞাপন দেখে সে প্রায় হতবাক। মনে হয় যেন ইন্ডিয়া নামের দেশটা পুরোপুরি ওয়েস্টার্নাইজড হয়ে গেছে। ছেলে-মেয়েদের কী সব চোখ-ঝলসানো পোশাক, কতরকম গাড়ি, কমপিউটারের দারুণ কেরামতি, আর কত টাকা খরচ হয় এক একটা বিজ্ঞাপনে! এসব দেখে হাসে অতনু! দূরে থাকলেও সে তো মোটামুটি খবর রাখে দেশের ইন্টারনেটেও পড়া যায় কলকাতার খবরের কাগজ।

টিভি-তে অনেকগুলো বাংলা চ্যানেল, তাতে সিনেমা দেখায়, আরও হরেক সিরিয়াল-কাহিনি, বিদেশের মতন। এসব একটা সিনেমারও সে নাম শোনেনি, এখনকার অভিনেতা-অভিনেত্রীদেরও সে চেনে না। উত্তমকুমার চলে গেছেন, সে জানে, কিন্তু বসন্ত চৌধুরী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, রবি ঘোষ, অরুন্ধতী, অনুপ, এঁরা কেউ নেই! পুরোনোদের মধ্যে রয়েছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, আর একালের একজন নায়িকাকে কেন যেন তার চেনা-চেনা মনে হয়, যদিও তার একটা ফিল্মও সে আগে দেখেনি, অথচ কোথায় তাকে দেখেছে, তা মনে করতে পারছে না।

এই সীতারামপুরেও অতনুর পুরোনো কালের চেনা অনেকেই নেই। তার স্কুলের বন্ধুদের মধ্যে চার-পাঁচজন এখানকার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে চলে গেছে কলকাতায় বা বিদেশে। আর যারা রয়ে গেছে, তারা রাজনীতির কচকচি বেশ ভালোই বোঝে। কিন্তু অন্য কোনও বিষয়ে তারা প্রায় কিছুই খবর রাখে না। আফ্রিকা সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ। যাদের সঙ্গে তুই-তুই সম্পর্ক ছিল, তারা এখন তাকে তুমি বলে। এদের সবারই বিশ্বাস, বিদেশে যারাই থাকে, তারা সবাই খুব বড়লোক। এনআরআই-রা অনেক টাকা পকেটে নিয়ে দেশে বেড়াতে আসে।

অবশ্য এনআরআই বলতে ইউরোপ-আমেরিকার অনাবাসীদের কথাই সবাই ভাবে। তারা ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার বা বিজ্ঞানী বা বড়-বড় বিদ্বান। অতনু এর কোনওটাই নয়। ছোটোবেলায় সে ভেবেছিল, ডাক্তার হবে। এখানে ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়ার পর সে গিয়েছিল চকবাজারের হাইস্কুলে। রেজাল্ট মোটামুটি ভালোই ছিল, কলকাতায় গিয়ে ডাক্তারি পড়া যেত অনায়াসেই, থাকতে হবে হস্টেলে। সব যখন প্রায় ঠিকঠাক, তখন একদিন রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়ার পর তার বাবা একটা

সিগারেট ধরিয়ে টানছেন বারান্দায় বসে, হঠাৎ প্রবল ভাবে কাঁপতে-কাঁপতে পড়ে গেলেন মেঝেতে, বুকে ছুরি বিদ্ধ মানুষের মতন গড়াতে-গড়াতে আর্তনাদ করতে লাগলেন। একজন ডাক্তারকে ধরে আনা হয়েছিল দু-ঘণ্টা বাদে, ততক্ষণে বাবার সব শ্বাসপ্রশ্বাস খরচ হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে শেষ হয়ে গেল অতনুর ডাক্তারি পড়ার স্বপ্ন।

দাদা তখন রেশনিং অফিসে কেরানির চাকরি পেয়ে বর্ধমানে পোস্টেড, ছোট বোনের বিয়ে হয়নি। অতনু পড়াশোনা বন্ধ করে এক বছর পড়ে রইল এখানে। তার পরেও থেকে যেতে পারত গ্রামের অন্য ছেলেদের মতন, সেই ষোলো বছর বয়েসেই সংসারের অনটন দেখে চেষ্টা করছিল টুকটাক উপার্জনের। বাবা অনেক ধার রেখে গেছেন। কিছুদিন সে আরও প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে হাঁস-মুরগির ডিম কিনে এনে সাপ্লাই দিত বাজারের কাছের দুটো ভাতের হোটেলে। শুধু মা দুঃখ করে বলতেন, তোর আর পড়াশোনা হবে না রে তনু! আমার গয়না বিক্রি করে দেব, তুই তবু পড়। ক'খানাই বা গয়না মায়ের, তা বিক্রি করে শহরে গিয়ে বেশিদিন পড়াশোনা চালানো যায় না। তা ছাড়া ছোট বোনের বিয়ের সময় গয়নাগুলো লাগবে না?

মায়ের বড় ভাই থাকতেন পুনায়। তিনি সেখানে স্কুলশিক্ষিক। তিনি প্রস্তাব দিলেন, অতনুকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলে তিনি ওর পড়াশোনার দায়িত্ব নেবেন। অতনু চলে গেল পুনায়। এ সবই যেন সাপলুডোর ওঠা-নামা।

সংসারে আর একটি খাওয়ার পেট বৃদ্ধি পাওয়ায় বড় মামিমা প্রথম থেকেই অতনুকে পছন্দ করেননি। তাঁকে খুব দোষ দেওয়া যায় না, তাঁদেরও অভাবের সংসার আর বড়মামাও খানিকটা আলাভোলা মানুষ। তিনি অতনুকে ডাক্তারি পড়াতে পারেননি, তবে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন হোটেল ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং ইন্সটিটিউটে। সেখান থেকে পাস করার পরই খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে সে চাকরি পেয়ে যায় আফ্রিকার কিনিয়ায়। সীতারামপুর গ্রামের একটি ছেলে চাকরি করতে যাবে কিনিয়ার হোটেলে! নিয়তির নির্বন্ধ।

আফ্রিকা থেকে মাকে নিয়মিত টাকা পাঠিয়েছে অতনু। তখনই ছোট বোনের বিয়ে হয়। দাদা বাড়ির সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক রাখেনি। আফ্রিকায় অতনুর চাকরি নিয়ে অনেক ঝঞ্ঝাট হয়েছে বেশ কয়েক বছর। ওখানে হোটেল ম্যানেজমেন্টে ইন্ডিয়ান ট্রেনিং-এর চেয়ে সুইজারল্যান্ডের ট্রেনিং সার্টিফিকেটের কদর অনেক বেশি। কিনিয়ার ট্যুরিজম ও হোটেল ম্যানেজমেন্টে অনেক সুইস কাজ করে। তাদের সঙ্গে রেষারেষিতে অতনুর পদোন্নতি আটকে যায় বারবার। একবার তার কর্মস্থান-হোটেলটা বিক্রি হয়ে যায়, নতুন মালিকরা প্রথমে তাকে রাখতেই চায়নি, রাখলেও অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারের পদ তাকে দিতে চায়নি, সেই সময়েই মা মারা যান।

মাকে নিজের কাছে নিয়ে রাখতে চেয়েছিল অতনু। মা রাজি হননি। শুধু বলতেন, আফ্রিকা, ওরে বাবা! না না, ওখানে গিয়ে থাকতে পারব না। মা ভাবতেন, শুধু নেংটি পরা, বর্শা হাতে দুর্ধর্ষ ধরনের মানুষরাই সেখানে ঘুরে বেড়ায়। মাকে কিছুতেই বোঝাতে পারেনি অতনু যে নাইরোবি খুবই আধুনিক শহর, সেখানকার মেথররাও প্যান্ট-শার্ট ও জুতো পরে।

মা না হয় স্বল্পশিক্ষিত মহিলা, ওরকম ধারণা থাকতেই পারে, কিন্তু এখানকার অনেক শিক্ষিত ভদ্রলোকেরও তো আধুনিক আফ্রিকা সম্পর্কে ধারণা পরিষ্কার নয়। যতবার সে দেশে এসেছে, প্রতিবারই কেউ-না-কেউ বলেছে, তুমি আফ্রিকায় পড়ে আছ কেন, বিলেত-আমেরিকায় চলে যেতে পারলে না? ওসব দেশে তো হোটেল অনেক বেশি। এবারেও একজন বলেছে। কলকাতাতেও অনেক নতুন-নতুন হোটেল খুলছে, তুমি এখানে কাজ পাও কি না দেখো না! গত পাঁচ বছর ধরে অতনু নাইরোবির যে-হোটেলে কাজ করছে, সেটাই কলকাতার গ্র্যান্ড বা তাজ-এর চেয়ে অনেক বড়। সেখানকার কাজে সে বেশ খুশি। একটি বেলজিয়ান মেয়ের সঙ্গে সহবাস করে।

কলকাতা শহরটা অনেকটা বদলেছে ঠিকই। এয়ারপোর্ট থেকে আসবার যে-নতুন রাস্তাটা

হয়েছে, সে রাস্তার পাশে-পাশে নতুন-নতুন প্রাসাদ দেখে সে মুগ্ধ হয়ে গেছে। তার মনে হয়, কলকাতার চেয়ে সে নাইরোবি শহর অনেক বেশি চেনে। কলকাতায় তো সে কখনও থাকেনি।

এবারে অবশ্য সে একটা ভালো জায়গা পেয়েছে।

রাজেশ আগরওয়াল নামে মাড়োয়ারি ভদ্রলোকের ব্যাবসা আছে কিনিয়া আর তানজানিয়ায়। তিনি নাইরোবিতে প্রায়ই যান এবং প্রতিবারই রয়াল ক্রাউন হোটেলে ওঠেন। ভদ্রলোক বাংলা বলেন মাতৃভাষার মতন। মেন্টেন্যান্স ম্যানেজারের নাম অতনু ঘোষ দেখেই তিনি তার সঙ্গে আলাপ করেছেন। মাঝে-মাঝে সন্ধেবেলা গল্প হয়েছে অনেকক্ষণ। অতনু নিজের কোয়ার্টার্সে তাঁকে নেমন্তন্ন করেও খাইয়েছে, তিনিও অতনুকে আমন্ত্রণ জানিয়ে রেখেছিলেন কলকাতায়। তাঁর নিজের বাড়িতে নয়, আগরওয়ালদের একটি ননফেরাস মেটালের কারখানা আছে টালিগঞ্জ অঞ্চলে, সেই কারখানা-সংলগ্ন চমৎকার গেস্ট হাউসে অতনুর থাকার ব্যবস্থা করেছেন তিনি। পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, দেয়াল-ঘেরা এলাকাটি, রয়েছে সুসজ্জিত বাগান, একটি গাড়িও বরাদ্দ করা আছে তার জন্য।

অতনু অবশ্য মেট্রো ট্রেনে যাতায়াত করে বেশ নতুনত্ব বোধ করে। কলকাতা শহরের মাটির তলা দিয়ে ট্রেন চলে, এ খবর তার না জানার কথা নয়, যদিও আগে কখনও স্বচক্ষে দেখেনি, তাই প্রথম দিনে সেই ট্রেনে ওঠা, যেন মনে হয়েছিল আবিষ্কারের মতন।

রাত আটটা-ন'টায় ট্রেন থেকে নামলে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কিছু মেয়েকে দেখা যায়। তাদের স্বাস্থ্য এত খারাপ কেন? ভালো করে সাজতেও জানে না। যে শহরের বার-নারীদের অবস্থা করুণ, সে শহরের নৈতিক স্বাস্থ্যও খারাপ হয়, অর্থাৎ অনেক সুখী সংসারের মধ্যেই নৈতিকতার পতন হয়েছে। সত্যি কি তাই? জাগতিক উন্নতি আর নৈতিকতার পতন পাশাপাশি চলে! এই শহর থেকেই সবচেয়ে বেশি কিশোরি ও যুবতি পাচার হয়ে যায় বাইরে, খবরের কাগজেই ছাপা হয়। সে সব মেয়েদের জায়গা হয় না এই উন্নতির মধ্যে!

ভালো পেনের ব্যবহার তো উঠেই গেছে। এখন সবাই সস্তার পেন দিয়ে লেখালেখি করে। অতনুর বাবার পকেট থেকে একটা শেফার্স পেন চুরি গিয়েছিল লোকাল ট্রেনে। সে জন্য বাবা দুঃখ করেছিলেন অনেকদিন। এখন সেই সব পেন-পকেটমাররা বেকার, সাত-আট টাকার ডট পেন মেরে কোনও লাভ হয় না। মেট্রো সিনেমার সামনে একজন সিড়িঙ্গে চেহারার প্রৌঢ় সেই পেন বিক্রি করতে এসেছিল অতনুকে। হোটেলে যারা কাজ করে, তাদের কাছে এই পেন যে কত গণ্ডা থাকে, তার ঠিক নেই। সীতারামপুরে বিলি করার জন্য অতনু তার হোটেলের নাম লেখা এই ধরনের পেন এনেছিল পাঁচ ডজন।

লোকটিকে দেখে অতনু চমকে উঠে কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল।

সে চিনতে পেরেছে। কিন্তু সেটা জানানো ঠিক নয়। এই লোকটি তাদের সীতারামপুরের স্কুলের ইন্দুভূষণ স্যারের ছেলে বিশ্বনাথ, অতনুর সহপাঠী। অথচ এর মধ্যেই এত বুড়োটে চেহারা হয়ে গেছে। দারিদ্র্য আয়ু হরণ করে নেয়, স্বাস্থ্য, শরীরের জ্যোতি, সবই খেয়ে নেয়। অতনুর এখনও অটুট চেহারা, গায়ের রং কালো হলেও অনেকে তাকে সুপুরুষই বলে। বিশ্বনাথ ইস্কুল মাস্টারের ছেলে, অথচ তার এই পরিণতি! জুয়া খেলে, না নেশা করে? উন্নতির দৌড়ে সে পা মেলাতে পারেনি!

মস্ত বড় হোর্ডিং-এ বাংলা ফিল্মের এক নায়িকার মুখ দেখে তার খটকা লাগে। কোথায় একে দেখেছে? কোনও ফিল্মে নয়।

কলকাতার সংস্কৃতি জগতের সঙ্গে রাজেশ আগরওয়ালের বেশ যোগাযোগ আছে। তাঁর অনেক ব্যাবসা, তা ছাড়াও ফিল্ম প্রোডিউস করে। এতগুলো ব্যাবসার কথা মাথায় রাখেন কী করে? এত টাকা নিয়েই বা কী পরমার্থ হবে!

মাঝে-মাঝেই তিনি পাঁচতারা হোটেলে পার্টি দেন। একটা শহরের, যাঁদের বলে গ্লটারেট্টি,

তাঁরা অনেকেই আসেন, কিছু-কিছু রাজনীতির লোকও। সার্থকভাবে ব্যাবসা চালাতে গেলে টেবিলের তলা দিয়েও কিছু-কিছু আদান-প্রদান করতে হয়। সবাই জানে। তবু, এ জিনিসটা চাপা দেওয়ার জন্য মাঝে-মাঝে সংস্কৃতির অনুষ্ঠানের আয়োজন করা বেশ সুবিধেজনক। বাঙালিদের ধারণা, যারা সংস্কৃতি ভালোবাসে, তারা উচ্চ মার্গের মানুষ। তারা কখনও কোনও নোংরা ব্যাপারে জড়াতে পারে না।

রাজেশ আগরওয়াল অতি সজ্জন ও বিনয়ী ব্যক্তি। হয়তো সত্যিই তিনি সংস্কৃতি-প্রেমিক। পার্টিতে ঢোকার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থেকে হাতজোড় করে তিনি নিজে অতিথিদের অভ্যর্থনা জানান, অনেককেই তিনি ব্যক্তিগতভাবে নাম ধরে চেনেন। ভদ্রতাবশত তিনি অতনুকেও আজকের পার্টিতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

হোটেল সংলগ্ন বিস্তৃত লনে পার্টি। সবুজ ঘাস ঘিরে চেয়ার, অতিথি অন্তত পঞ্চাশজন তো হবেই। মাঝখানে একটা অস্থায়ী মঞ্চে একটি মেয়ে গান গাইছে। আজকাল গায়িকাদের খুব স্বল্প পোশাক পরাই রীতি। সারা গা ঢেকে গান আজকাল পুজোর অনুষ্ঠানেও চলে না। গরম দেশ, তবু এর মধ্যে অনেক পুরুষেরই অঙ্গে কোট আর টাই। আর মেয়েদের শরীরের অনেকটাই খোলামেলা। এত লোক হলে, ছোট-ছোট দলে ভাগ হয়ে আড্ডা হয়। দু-চারজন মদের গেলাস হাতে ঘুরে-ঘুরে অনেকের সঙ্গে আলাপ করে। আর বেশির ভাগ অতিথি বসে থাকে একই চেয়ারে।

অতনু এখানে একজনকেও চেনে না। সে গ্রামের ছেলে, কলকাতায় কখনও থাকা পায়নি। তারপর পুনা থেকে চলে গেছে ধাদ্ধারা গোবিন্দপুরের চেয়েও অনেক দূরে কালো মানুষদের দেশে। এই ধরনের পার্টিতে এলে সে জানে একা-একা বেশি মদ খেয়ে নিতে হয়। আর দেখতে হয় অন্যদের। হোটেল ম্যানেজমেন্টের ট্রেনিং থেকে সে জানে। মদ খেয়ে কখনও বেচাল হতে নেই, একটা সময়ে মদের গেলাস শুধু হাতে ধরে রাখলেও চুমুক দেওয়ার বদলে মাঝে-মাঝে ফেলে দিতে হয় মাটিতে।

অতনু নিজে থেকে কারও সঙ্গে আলাপ করে না, তবে অচেনা কেউ কথা বলতে এলে সে গুটিয়ে থাকে না। একটা কিছু হাসি-ঠাট্টার প্রসঙ্গ খুঁজে নেয়।

পার্শ্ববর্তী পাঁচ-ছ'জনের দলের একজন সুবেশা তরুণী তার দিকে ঝুঁকে বলল, আপনার সঙ্গে আমাদের আলাপ নেই। আমার নাম সুদর্শনা রায় গুপ্ত, আমি একজন সাংবাদিক।

অতনু নিজের নাম জানিয়ে বলল, গ্ল্যাড টু মিট ইউ, আপনি কোন কাগজের?

সুদর্শনা নিজের কাগজের একটা কার্ড দিয়ে বলল, আপনি কোথায়?

অতনু বলল, আমি থাকি আফ্রিকায়। কয়েকদিনের জন্য এসেছি।

আফ্রিকা শুনেই একজন পুরুষ গলা বাড়িয়ে বলল, আপনি আফ্রিকায় থাকেন? কোথায়?

এই ধরনের বাঙালি আড্ডায় কথা জমাবার জন্য অতনুর একটা বাঁধা রসিকতা আছে।

সে বলল, আমি থাকি কিনিয়ার নাইরোবি শহরে। রবীন্দ্রনাথ-এই শহর নিয়ে গান লিখেছেন, আপনারা জানেন?

এবার অনেকগুলি কৌতূহলী মুখ কাছে ঝুঁকে আসে। একজন বলল, রবীন্দ্রনাথ আফ্রিকা নিয়ে একটা বড় কবিতা লিখেছেন জানি। কিন্তু নাইরোবি নিয়ে—

অতনু বলল, রবীন্দ্রনাথ নিজের নাম নিয়ে অনেক কবিতা ও গান লিখেছেন। তাই রবি'র সঙ্গে কবি, ছবি, হবি এই সব মিল দিয়েছেন, মিল খুঁজতে-খুঁজতে একবার নাইরোবিও পৌঁছে গেছেন একটা গানে। সেই গানটা হল, সকালবেলার আলোয় বাজে, বিদায় ব্যথার ভৈরবী/আন বাঁশি তোর, আর কবি...এরপর একটা লাইন হল, নাই যদি রোস নাই রবি, সেদিন নাইরবি

সবাই কলহাস্যমুখর হয়।

আর কিছু বলার আগেই একটা গুঞ্জন ও কিছু লোকের ব্যস্ততা দেখা যায় প্রবেশ মুখে। বিশিষ্ট কোনও অতিথি এসেছেন।

রাজেশ আগরওয়াল হাতজোড় করে ও কোমর ঝুঁকিয়ে সেই অতিথিকে নিয়ে আসছেন, অতিথি একজন মহিলা। সাদা সিল্কের শাড়ি পরা, তা থেকে ঝিলিক মারছে অনেক জরির চুমকি, মাথার চুল চুড়ো করে বাঁধা, পালিশ করা মুখ, খুব গ্ল্যামারের ছড়াছড়ি।

অতনু সাংবাদিকটিকে জিগ্যেস করল, ইনি কে?

সে বলল, সে কী! আমাকে বলেছেন, বলেছেন, আর কাউকে বলবেন না। লোকে আপনাকে গেঁয়ো ভূত ভাববে। সুরশ্রী মিত্র, বাংলা ফিল্মের সবচেয়ে নামি নায়িকা, মুম্বই থেকেও ডাক এসেছে, চলে গেল বলে।

আর একবার তাকিয়ে দেখে বুঝল। কয়েক দিন আগেই টিভি-র কোনও ফিল্মে সে এই নায়িকাটিকে দেখেছে, গ্রাম্য মেয়ের ভূমিকায় সাজপোশাক ছিল অন্য রকম? কেন ওকে একটু চেনা-চেনা লাগছিল তার কারণটাও বোঝা গেল, সীতারামপুরের গোল গম্বুজটার গায়ে ফিল্মের পোস্টারে এরই মুখের ছবি ছিল, যাতায়াতের পথে সে অনেকবার দেখেছে।

একটু বাদে রাজেশ আগরওয়াল তাঁর এই প্রাইজ্‌ড পজেশানটি সকলকে ভালো করে দেখাবার জন্য নিয়ে এলেন প্রতিটি চেয়ারের সামনে। জনে-জনে হাত তুলে নমস্কার করছে। উত্তরে মিষ্টি হাসি বিলোচ্ছেন নায়িকাটি।

অতনুর কাছে এসে সে একটু থমকে দাঁড়িয়ে চেয়ে রইল নির্নিমেষে! তার পর অস্ফুট গলায় বলল, তনুদা?

অতনুরও আর চিনতে দেরি হল না, সেও সঙ্গে-সঙ্গে বলল, চিনু! তাই না?

নায়িকা জিগ্যেস করল, তুমি এখানে কোথা থেকে এলে? তুমি তো হারিয়ে গিয়েছিলে।

অতনু বলল, এসেছি এক জঙ্গলের দেশ থেকে।

দৃশ্যটি একটু বেশি নাটকীয়। তাই বেশিক্ষণ টানা যায় না। অভ্যেসমতন অতনুকেও একটু হাসি উপহার দিয়ে এগিয়ে গেল নায়িকা অন্যদের দিকে।

এই সেই দস্যি মেয়ে চিনু, বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। সেই যে রূপকথার গল্পে আছে, একটা ব্যাং একদিন হঠাৎ রাজপুত্র হয়ে গেল। এ যেন ঠিক তার উলটো। সেদিনের সেই রোগা প্যাংলা মেয়েটা আজকের এই রূপসি!

মহিলা সাংবাদিকটি জিগ্যেস করল, আপনি একে পার্সোনালি চেনেন বুঝি?

অতনু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, সে অনেক ছেলেবেলায়।

সে বুঝিয়ে দিল যে, এই বিষয়ে সে আলোচনা চালাতে উৎসাহী নয়। সে চুমুক দিল গেলাসে।

একটু পরেই এক যুবক এসে অতনুকে বলল, আপনাকে একবার ওদিকে ডাকছে।

আলোর বৃত্ত থেকে একটু বাইরে। আধো-অন্ধকারে একটা চেয়ারে বসে আছে নায়িকা। তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন।

অতনুকে দেখে সে অন্যদের বলল, এই, এখানে একটা চেয়ার দাও। আর তোমরা একটু যাও, ওঁর সঙ্গে আমার কথা আছে।

অতনু বসবাস পর একটু ঝুঁকে এসে তার একটা হাত ধরে নায়িকা সম্পূর্ণ অভিনয়হীন গলায় বলল, তনুদা, তোমাকে কতদিন পর দেখলাম। আগরওয়ালজি বললেন, তুমি এখন আফ্রিকায় থাকো।

অতনু বলল, হ্যাঁ। চিনু, তুই কবে সিনেমার নায়িকা হয়েছিস? শুনলাম তোর খুব নাম, এসব আমি কিছুই জানি না। তোর ভালো নাম তো আমি জানতাম না।

চিনু বলল, কেন, তোমাদের [illegible] বাংলা ফিল্ম যায় না?

অতনু বলল, কী জানি। হিন্দি ফিল্ম কখনও-সখনও প্রাইভেটলি দেখানো হয় শুনেছি। তাও আমার দেখা হয় না। তুই হিন্দিতেও করেছিস।

করেছি দু-একটা। সব বাঙালিই আমাকে চেনে, একমাত্র তুমি ছাড়া।

তারপর একটু দুষ্টুমির হাসি দিয়ে সে আবার বলল, কিংবা, একমাত্র তুমি আমাকে যেভাবে চেন, সেভাবে এখন আর কেউ চেনে না।

তুই কী করে নায়িকা হয়ে গেলি রে? চেহারাটাও বদলে গেছে।

ওসব কথা ছাড়ো। হয়ে গেছি কোনওরকমে। তুমি কেমন আছ, বলো। বিয়ে করেছ?

ভালোই আছি রে। না বিয়ে করিনি। তবে একজন বিদেশিনি মেয়ের সঙ্গে ভাব আছে। তুই?

আমার একটা বিয়ে ভেঙে গেছে। আর একটা, নাঃ, এখনও কিছু ঠিক নেই।

তুই আমাকে দেখে চিনলি কী করে? আমি তো তোকে চিনতে পারিনি, শুধু একটু-একটু মনে হচ্ছিল, তোর নাকটা শুধু...

হ্যাঁ, আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা আমাকে বলে নাকেশ্বরী। তোমার চেহারা তো প্রায় একই রকম আছে। পুরুষরা বিশেষ বদলায় না। আমাদের তো মেক-আপ টেক-আপ দিয়ে...

অতনু একটা সিগারেট ধরাল।

চিনু বলল, তুমি এখনও সিগারেট খাও? অনেকেই তো...আমিও ফিল্ম লাইনে এসে প্রথম-প্রথম খুব খেতাম, এখন একদম ছেড়ে দিয়েছি, অন্তত সাত বছর, দাও, তোমার থেকে একটা টান দিই।

সিগারেটটা হাতে নিয়ে একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল চিনু।

অতনু জিগ্যেস করল, তুই আর সীতারামপুরে যাস?

চিনু বলল, নাঃ, ওখানে তো ছিল আমার মামাবাড়ি। প্রায়ই যেতাম একসময়, আমাদের বাড়ি ছিল ব্যারাকপুরে। তারপর বাবা বদলি হয়ে গেলেন নর্থ বেঙ্গলের মালবাজারে।

অতনু বলল, ও হ্যাঁ, মামাবাড়ি। ওঁরা আর কেউ নেই শুনেছি। তোর একটা ফিল্ম কয়েকদিন আগে দেখলাম টি ভি-তে। নামটা বোধহয় 'আশালতা', তাই না?

হ্যাঁ।

তাতে তুই একটা গ্রামের মেয়ে, ডুরে শাড়ি পরা, একটা সিনে আছে, তুই একটা পুকুর থেকে ডুব দিয়ে উঠে এলি...হ্যাঁরে চিনু, তুই ওরকম কোমর দুলিয়ে হাঁটা কোথায় শিখলি রে? গ্রামের মেয়েরা কি ওইভাবে হাঁটে?

তুমি কী যে বল তনুদা? সিনেমা করতে গেলে কত কী শিখতে হয়। গ্রামের মেয়েরা ওইভাবে হাঁটে না, ওসব মেক বিলিভ, অধিকাংশ সিনেমাই তো রূপকথা, তাই না?

তুই নাচ জানিস?

মাঝে-মাঝে নাচতে হয়, কিন্তু তাকে নাচ বলে না।

একজন যুবক হন্তদন্ত হয়ে এসে বলল, মিস, আপনাকে ওদিকে আসতে বলছেন আগরওয়ালজি। সবাই আপনাকে চাইছে।

চিনু রুক্ষ গলায় বলল, একটু পরে যাচ্ছি, এখন ডিস্টার্ব কোরো না।

ছেলেটি ফিরে যাওয়ার পর চিনু বলল, [illegible]রিলিতে যে তোমার সঙ্গে গল্প করব, তার উপায় নেই। তুমি কতদিন আছ?

অতনু বলল, পরশু ফিরে যাব।

চিনু বলল, এই রে, এই দু'দিন আমার টানা শুটিং। আউটডোর। তুমি আসবে, ডায়মন্ডহারবারে? না থাক, শুটিং-এর সময় আমি তোমার সঙ্গে ভালো করে কথা বলতে পারব না। তোমারও বোরিং লাগবে।

অতনু বলল, শুটিং দেখা আমার পোষাবে না।

আবার একজন যুবক দৌড়ে এসে বলল, মিস, আপনার নাম অ্যানাউন্স করা হয়ে গেছে,

আপনাকে একবার সেন্টার স্টেজে দাঁড়াতে হবে।

চিনু বলল, ঠিক আছে। যাচ্ছি।

উঠে দাঁড়িয়ে সে অনেকটা আপন মনে বলল, নায়িকা-টায়িকা হতে গেলে অনেক কিছু মূল্য দিতে হয়, সে তুমি বুঝবে না।

অতনু মনে-মনে ভাবল, না বোঝার কী আছে? সব দেশেই তো এক।

চিনু আবার বলল, যে-কোনও লাইনেই ওপরে উঠতে গেলে কিছু-না-কিছু মূল্য দিতে হয়ই, তাই না? আমাদের ফিল্ম লাইনেও...কোনও ইনহিবিশন রাখলে চলে না। যাই। তোমার সঙ্গে আবার কখনও দেখা হবে কি না জানি না। তবু একটা কথা বলতে খুব ইচ্ছে করছে। বলব?

বল!

তনুদা, তোমার সেই দিনটার কথা মনে আছে? সেই ভুতুড়ে বাড়িটায়...

মনে থাকবে না কেন? তোর যে মনে আছে, সেটাই আশ্চর্যের।

তনুদা, জীবনে আমি অনেক অভিজ্ঞতা পার হয়ে যাচ্ছি। কিন্তু সেদিন, আমি যে-তীব্র আনন্দ পেয়েছিলাম, তার কোনও তুলনা হয় না। তোমাকে দেখে...সে রকম আর কখনও...চলি, ওরা আর থাকতে দেবে না।

হঠাৎ কি চিনুর গলায় কান্না এসে গেল? মুখ নীচু করে সে দ্রুত পায়ে চলে গেল আলোর বৃত্তের দিকে।

অতনু আরও কিছুক্ষণ বসে রইল সেখানেই।

সেই বট অশথের ফাটল ধরানো পোড়ো বাড়ি। গা-ছমছমে দুপুর। সিগারেট খেতে চেয়েছিল চিনু, একদিন অতনুকে ধরে ঝুলোঝুলি, তাই বন্ধুদের বাদ দিয়ে শুধু চিনুকে নিয়ে এক দুপুরে চুপি-চুপি সেই বাড়িতে গিয়েছিল অতনু।

সিগারেটে প্রথম টান দিয়েই কাশতে শুরু করেছিল চিনু, তার পিঠে ছোট-ছোট চাপড় মেরে দিচ্ছিল অতনু, তারপর কী যেন হল, পর-পর পাঁচটা চুমু খেয়েছিল সে। চিনু অবাক হয়নি, প্রথমবারের পর, পাখির বাচ্চা যেমন পাখি-মায়ের সামনে ঠোঁট ফাঁক করে থাকে, সেইভাবে চিনু এগিয়ে দিয়েছিল ঠোঁট।

তাদের দুজনেরই সেই প্রথম অভিজ্ঞতা।

তারপর নদী দিয়ে কত জল গড়িয়ে গেছে, সেই বাড়িটা আর নেই, চিনু কত বদলে গেছে। অনেক কিছুই বদলে গেছে, তবু চিনু যে আজ বলল, সেরকম তীব্রতা সে আর জীবনে পায়নি, তার চোখে জল এসে গেল...এই স্মৃতি নিয়েই ফিরে যাবে অতনু।



ভীষ্মের দীর্ঘশ্বাস

তৃষ্ণার্ত রাজা এসে থামলেন এক স্বচ্ছ সরোবরের সামনে।

নিজের সৈন্যবাহিনী থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। কী যেন মোহ ভর করেছিল তাঁর ওপর, তিনি মানুষের কথা ভুলে গিয়ে অরণ্যের শোভায় মুগ্ধ হয়ে ক্রমশ একাকী চলে এসেছেন গভীর থেকে গহনে।

রাজা ঘোড়া থেকে নেমে সেই জলাশয়ের ধারে বসে আঁজলা ভরে পান করতে যাবেন, এমনসময় কয়েকটি নারীকণ্ঠ এক সঙ্গে বলে উঠল হে রাজন! এই জল ছুঁয়ো না। এই জল পান কোরো না। তুমি অন্য সরোবরে যাঁও!

রাজা মুখ তুলে দেখেছিলেন তিনটি যুবতী সেই সরোবরে হংসের মতো ভাসছে। হলুদ রেশমের মতো তাদের মুখ, পদ্ম-পলাশ চক্ষু, উড়ন্ত পাখির মতো ওষ্ঠাধর।

রাজা কয়েক মুহূর্ত অপলকভাবে চেয়ে রইলেন।

রমণী বিলাসে তিনি কাটিয়েছেন বহু বছর, দেশ-বিদেশের বহু নারী তাঁর অঙ্কশায়িনী হয়েছে, কিন্তু তাঁর মনে হল এই যুবতীত্রয়ী প্রত্যেকেই যেন তিলোত্তমা।

একটি মেয়ে একটু এগিয়ে এসে মধুর হেসে বলল, রাজা, আমরা নিরালায় এখানে কেলি করছি, এখানে অবস্থান করা তোমার উচিত নয়। এই জল তোমার পেয় নয়, তুমি শীঘ্র অন্যত্র যাও!

রাজা বললেন। আমি, বরবর্ণিনী, তোমাদের দেখে আমার তৃষ্ণা শতগুণ বৃদ্ধি পেল। চোখের সামনে স্বাদু পানীয় দেখলে কি কোনও তৃষ্ণার্ত দূরে চলে যেতে পারে? কেন আমাকে নিবারণ করছ? কেন আমাকে চলে যেতে বলছ?

সেই মেয়েটি বলল, রাজা, সব ফুলের ঘ্রাণ নিতে নেই, সব পানীয় পান করা যায় না, সব ফল ভক্ষণ করা ঠিক নয়। এই সরোবর তোমার জন্য নয়, তুমি অন্য কোথাও যাও!

রাজা এবারে হেসে বললেন, তোমরা আমার পরিচয় জানো না। আমি রাজা, কোনও প্রকার নিষেধ শুনানোই আমাদের বাসনা বেশি বলবান হয়। যে-কোনও নিষিদ্ধ বস্তুই আমরা জয়সাধ্য মনে করি। আমি অচিরেই তৃষ্ণা মেটাব।

তিন নারী আবার একত্রে কলকণ্ঠে বলে উঠল, রাজা অমত করো না, এমন করো না! নিবৃত্ত হও!

রাজা শুনলেন না। তিনি গণ্ডূষ জল পান করলেন। তারপর তাঁর বস্ত্র খুলে রেখে নেমে পড়লেন সরোবরে।

রাজা সন্তরণ-পটু। জলাশয়টিও তেমন বড় নয়। রাজা ভাবলেন, মেয়ে তিনটি পালাবার চেষ্টা করলেও তিনি অন্তত একজনকে বাহুবন্ধনে আনতে পারবেন ঠিকই। এরা অপ্সরা হলেও নিষ্কৃতি নেই।

যুবতী তিনটি কিন্তু দূরে গেল না। বক্ষ জলে দাঁড়িয়ে হাসতে লাগল।

রাজা কাছে আসতেই তারা বলে উঠল, নিয়তি, নিয়তি!

রাজা এদের মুখপাত্রীটির হাত ধরলেন। তারপর বললেন, কবিতা এবং বনিতা স্বয়পসত্তা হলেও সুখদা হয়। হে সুন্দরী, আমি বলপ্রয়োগ করতে চাই না। আমি তোমার রূপ প্রার্থনা করি, তুমি আমার হও।

মেয়েটি তবু হাসতে লাগল।

রাজা মেয়েটিকে বক্ষে জড়িয়ে ধরে মুখ চুম্বন করতে গেলেন।

কিন্তু পারলেন না। তাঁর বিচিত্র এক অনুভূতি হল। তাঁর শরীরে বিদ্যুৎ নেই, শিহরন নেই। এমন এক দুর্লভ রূপসীকে তিনি স্পর্শ করেছেন, তবু তাঁর কামনা যথোচিত জাগ্রত হচ্ছে না কেন?

মেয়েটি বলল, নিয়তি, নিয়তি!

রাজা জিগ্যেস করলেন, কী বলছ, তুমি? কার নিয়তি?

মেয়েটি বলল, তোমার! হায়, ভূতপূর্ব রাজা, তুমি আর ইহজীবনে কোনও রমণী-রমণ সুখ পাবে না।

—কেন?

—নিজের দিকে তাকিয়ে দেখ!

রাজা আপন শরীরের দিকে তাকিয়ে আমূল চমকে উঠলেন।

তিনি আর রাজা নেই। তিনি এক নারীতে পরিণত হয়েছেন। আর তিনটি নারীরই মতো।

সেই তিন রমণীর মধ্যে একজন বলল, তোমাকে এখন কী বলব, রাজা না রানী! শুধু রমণীই বলি। ওহে রমণী, আমরা দিব্যাঙ্গনা। পৃথিবীর কোনও পুরুষ আমাদের স্পর্শ করতে পারে না। এটা একটা মায়াসরোবর। সাধারণ মানুষ এটা দেখতেও পায় না। তোমার নিয়তি তোমাকে এখানে টেনে এনেছে।

পর মুহূর্তেই তারা অদৃশ্য হয়ে গেল। চিনিয়ে গেল সেই মায়াসরসী। সবটাই যেন স্বপ্ন।

কিন্তু ভূতপূর্ব রাজার শরীরটা স্বপ্ন নয়। তিনি রমণী হয়েই রইলেন। কিন্তু নগ্ন বলে তাঁর ব্রীড়া এলো তিনি প্রথমে স্তনদ্বয় ঢাকলেন দু হাত দিয়ে। তারপর এক হাত বুকে রেখে, অন্য হাতে চাপা দিলেন নিম্ননাভি, তাঁর ভঙ্গিটি হলো চিরকালীন প্রথাসিদ্ধ নিরাবরণ নারীর মতোই।

রাজার অশ্ব আর রাজাকে দেখতে না পেয়ে ফিরে গেল।

রাজা আস্তে-আস্তে তাঁর রাজ্য, তাঁর মহিষীবৃন্দ, তাঁর সন্তানাদির কথা ভুলতে লাগলেন। অরণ্যের মধ্যে একাকিনী অবস্থায় তাঁর ভয় করতে লাগল।

অসহায় ভাবে এদিক ওদিক ঘুরতে-ঘুরতে কিছুক্ষণ পরে তিনি এক নবীন যুবার সাক্ষাৎ পেলেন।

যুবকটি ঋষি-কুমার, অঙ্গে গেরুয়া, মাথায় জটবাঁধা চুল।

যুবকটি এই নবোদ্ভিন্নযৌবনা রমণীকে দেখে হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর যেন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে জিগ্যেস করল, হে, অচেনা, তুমি কে?

রাজার তখনও স্মরণে আছে যে তিনি পুরুষ ছিলেন, কিন্তু তাঁর শরীরটি নারীর। তিনি বললেন, আমি কেউ না!

যুবকটি বলল, তোমাকে দেখে আমার মনে তপোবন বিরুদ্ধ এক অনুভূতি জাগছে। তুমি কি স্বপ্ন না মায়া? মতিভ্রম না তাবৎ জীবনের গুণফল?

নারীরূপিনী রাজা আবার বললেন, আমি কেউ না।

তখন সেই মুনিকুমার এগিয়ে এসে তাঁর অঙ্গ স্পর্শ করলেন। জীবনে তিনি বহু নারীকে স্পর্শ করেছেন, কিন্তু আজ তাঁর শরীরে এই পুরুষের স্পর্শে যে তরঙ্গ খেলে গেল, তেমনটি তো আগে কখনও হয়নি! তাঁর তীব্র ইচ্ছা হল এই যুবা তাকে বক্ষে টেনে নিক। কিন্তু মুখে তা প্রকাশ না করে একটু দূরে সরে গেলেন।

তরুণ ঋষি আবার কাছে এসে তাঁর বক্ষে হাত রাখতে যেতেই তিনি মুখ ফিরিয়ে বললেন, না!

তখন সেই কামার্ত যুবা মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে বললেন, হে, রূপসিশ্রেষ্ঠা, তোমার নয়ন কামে আহত। তোমার অধর সুধায় আমায় সঞ্জীবিত করো। আমার যাগ-যজ্ঞ সব জলাঞ্জলি যাক। আমি তোমাকে পেয়ে ধন্য হতে চাই।

আরও কিছুক্ষণ স্তব-স্তুতি শোনার পর নারীরাজা সম্মত হলেন।

তারপর তিনি পেলেন তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ। রমণে এত সুখ তা তিনি জানতেন না। আগে মনে করতেন রতিসুখ মানে জয়ের আনন্দ। এতকাল তিনি ওপরে থাকতেন, আজ নীচে। পিঠের তলায় যে মাটি কাঁপে, ওপরে আকাশও যে কাঁপে তা বোধহয় কোনও পুরুষই জানে না।

চরম উল্লাসে তিনি আঃ-আঃ শব্দ করতে লাগলেন।

মুনিকুমার তাঁর ক্রীড়া সাঙ্গ করা মাত্রই রমণী-রাজার ইচ্ছে হল, আবার হোক, আবার হোক। এই যুবা তাকে পীড়ন করুক, দংশন করুক, তাকে স্বর্গ সুখ দিক।

সেই যুবা ঋষিকেই বিয়ে করে রমণী-রাজা বনের মধ্যে পর্ণকুটিরে ঘরসংসার করতে লাগলেন।

বেশ কয়েক বছর পর সেই রাজার প্রাক্তন রাজ্যের মন্ত্রী ও পাত্রমিত্রের দলবল সেখানে এসে উপস্থিত হয়ে ঋষিপত্নীর সামনে সসম্মানে অভিবাদন করলেন।

মন্ত্রী বললেন, হে আত্মবিস্মৃত রাজা ভঙ্গস্বন, আমরা অতি কষ্টে আপনাকে খুঁজে পেয়েছি। ইন্দ্রের সঙ্গে আপনি একবার কলহ করেছিলেন, সেই জন্য ইন্দ্র আপনার মনে মোহ এনে দিয়ে আপনাকে নারীতে পরিণত করেছেন। আমরা যাগযজ্ঞে ইন্দ্রকে তুষ্ট করেছি। ইন্দ্র আবার আপনাকে পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে দিতে রাজি হয়েছেন।

ঋষিপত্নীর সব কথা মনে পড়ে গেল। তিনি ফিক করে হাসলেন।

মন্ত্রী হাত জোড় করে বললেন, রথ প্রস্তুত, আপনি চলুন!

ঋষিপত্নী বললেন, পাগল নাকি! কোনও রমণী কখনও পুরুষ হতে চায়? হে মন্ত্রী, পৃথিবীর কোনও পুরুষ এতকাল ধরে যে গুপ্ত কথা জানতে পারেনি, আমি তা জেনেছি। পুরুষরা তো চতুর্দিক দাপিয়ে বেড়ায় কিন্তু প্রতি মুহূর্তে নারীদের কাছে এসে পরাভূত হয়। শরীরের যে কী আনন্দ তা পুরুষরা সঠিকভাবে কোনওদিন টেরই পেল না! আমি যেমন আছি, চমৎকার আছি। এই আনন্দের তুলনায় রাজপদ অতি তুচ্ছ। আপনারা ফিরে যান। আমার আগের ছেলেদের সিংহাসন দিন। আমার এই পক্ষের সন্তানদের প্রতি স্নেহ বেশি। তাদের ছেড়েও কোথায় যেতে পারব না!

বহুকাল পর! কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষে ভীষ্ম যখন শরশয্যায় শুয়ে দক্ষিণায়নের প্রতীক্ষা করছিলেন, তখন যুধিষ্ঠির তাঁর কাছ থেকে অনেক জ্ঞানের কথা জেনে নিতে-নিতে একবার প্রশ্ন করেছিলেন, আচ্ছা, পিতামহ, নারী ও পুরুষের মধ্যে যৌনসুখ কে বেশি পায়?

ভীষ্ম বললেন, তোমাকে আমি ভঙ্গস্বন রাজার উপাখ্যান শোনাচ্ছি!

কাহিনিটি শুরু করার আগে ভীষ্ম প্রথমে মৃদু হাস্য করলেন। মনে-মনে ভাবলেন, তাঁর এই ধার্মিক নাতিটি সত্যিই বড় গোবেচারা। কামগন্ধ বলে কিছুই নেই। এই প্রশ্ন কি কেউ কোনও মৃত্যুপথযাত্রী জিতেন্দ্রিয় পুরুষকে করে?

তারপরই ভীষ্মের একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল। যেন এক বায়ুময় হাহাকার! জিতেন্দ্রিয়? সাধারণ মানুষের চারগুণ লম্বা একটা জীবনে কাটিয়ে গেলেন, তবু নারীর রহস্য কিছুই জানলেন না। ব্যর্থ, ব্যর্থ, সব ব্যর্থ!



ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী

এ কাহিনি অভিজিৎ সেনের। কিছুটা কিছুটা জেনেছি তাঁর ডায়েরি থেকে। আমি তাঁর মুখেই শুনেছি। অনেক নাম এবং জায়গাগুলিও বদলাতে হবে। সংশ্লিষ্ট পাত্র-পাত্রীরা অনেকেই বেঁচে আছেন এখনও। অভিজিৎ সেন গোপনীয়তার তোয়াক্কা করতেন না। কিন্তু আমি কেন খামোকা ফ্যাসাদে পড়তে যাব।

অভিজিৎ সেন নিজেই আমাকে বলেছিলেন, যদি পারিস আমার জীবনের এই ঘটনাটা লিখিস। তাতে লোকশিক্ষা হবে।

কাহিনির শুরু বম্বে মেলের ফার্স্ট ক্লাসের কামরায়।

তার আগে বলে নিই, বিখ্যাত অভিজিৎ সেন আমাদের কাছে অভিদা। আমার চেয়ে বয়েসে অন্তত পনেরো বছরের বড়। বেশ সুঠাম, তেজি চেহারা। অনেকদিন পর্যন্ত যৌবন ধরে রেখেছিলেন।

আমার সঙ্গে পরিচয় পাড়ার ছেলে হওয়ার সুবাদে। তখন উত্তর কলকাতার রাজবল্লভ পাড়ায় থাকি। কিছু-কিছু বাড়ির সামনের রকে আড্ডার আসর বসাবার রেওয়াজ ছিল। এখন সেইসব আড্ডা রক ছেড়ে বৈঠকখানায় স্থানান্তরিত হয়েছে, রকগুলো ভেঙে হয়েছে দোকানঘর। কিন্তু রকের আড্ডা আর বৈঠকখানার আড্ডার চরিত্রের তফাত আছে। রকের আড্ডায় রাস্তা দিয়ে যেতে-যেতে যে-কোনও লোক ভিড়ে যেতে পারে। যার যখন ইচ্ছে উঠে গেল, আবার নতুন কেউ এসে বসল।

বিভিন্ন রকে বিভিন্ন বয়সিদের আড্ডা। কোনওটা বুড়োদের কোনওটা মাঝবয়েসিদের, আর কোনওটা ছেলে-ছোকরাদের।

কোনওটাতেই মেয়েদের যোগ দেওয়ার অধিকার ছিল না। ইংল্যান্ডে বা আমেরিকাতেও অনেক ক্লাবে মেয়েদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। আমাদের কলকাতাতেও এখনও অনেক ক্লাবে মেয়েরা মেম্বার হতে পারে না।

পাড়ার রকে গোঁফ গজাবার আগে কোনও ছেলে বসতে চাইলে তাকে ধমকে বিদায় করে দেওয়া হত। আমার তখন সদ্য গোঁফ গজিয়েছে।

প্রত্যেক পাড়াতেই গর্ব করার মতন কয়েকজন লোক থাকে। আমাদের ওই পাড়ায় যেমন নুটুদা আর অভিদা। নুটুদা ক্রিকেট খেলোয়াড়, রঞ্জি ট্রফিতে দুবার চান্স পেয়েছিল। ওয়ান ডে ক্রিকেট চালু হওয়ার আগে ক্রিকেট খেলোয়াড়দের এত রমরমা ছিল না, শীতকাল ছাড়া অন্যসময় তাদের নাম শোনা যেত না। কিন্তু অভিদার নাম প্রায় সারা বছরই দেখা যেত খবরের কাগজে। গায়ক হিসেবে নাম ছাড়াবার পর ততদিনে মুম্বই থেকে তাঁকে ডাকাডাকি করছে। নমিতা সিংহ নামে একজন ফিল্মের অভিনেত্রীকেও এ-পাড়ার মেয়ে বলে গণ্য করা হত। যদিও নমিতা সিংহ মাত্র সাড়ে চার মাস একটা ভাড়া বাড়িতে ছিল, তারপর চলে যায় নিউ আলিপুরে। তবু রাজবল্লভ পাড়া তার ওপর দাবি ছাড়বে না।

এ-পাড়ায় অভিদাদের তিন পুরুষের পুরোনো বাড়ি। যৌথ পরিবার, অনেক নারী-পুরুষে জমজমাট। বাড়ির মধ্যে একটা ছোট মন্দির, তার মধ্যে রাধাকৃষ্ণের যুগল বিগ্রহ, সকাল-সন্ধে আরতি হত, সেই ঘণ্টাধ্বনি শুনে আমরা সময় বুঝে নিতাম। সন্ধ্যারতির সময়ই আমাদের আড্ডা ভেঙে বাড়িতে ফিরে পড়তে বসতে হত।

মুম্বই বাড়ি দেওয়ার পরেও অভিদা মাঝে-মাঝেই কলকাতায় আসতেন। তখন তিনি টালিগঞ্জে নিজস্ব একটা ফ্ল্যাট নিয়েছেন বটে, কিন্তু দু-চারদিন এ-পাড়ায় পৈতৃক বাড়িতে কাটিয়ে যেতেন। অন্তত যতদিন তাঁর মা বেঁচেছিলেন।

অত বিখ্যাত মানুষ, খবরের কাগজে ছবি বেরোয়, অথচ অহঙ্কার ছিল না একেবারে। ক্রিকেট খেলোয়াড় নুটুদা বরং কলার উচিয়ে গম্ভীরভাবে হেঁটে যেতেন রাস্তা দিয়ে, বিশেষ কাউকে পাত্তা দিতেন না। কিন্তু অভিদা মিশতেন সব বয়েসিদের সঙ্গে।

আমাদের রকের আড্ডায় সাহিত্য-শিল্প-সিনেমা-পরনিন্দা-পরচর্চা সবই চলে। কথায়-কথায় রাজা-উজির মারি। অল্প বয়েসে সব কিছুতেই আঘাত করার একটা প্রবণতা থাকে। আধুনিক গায়ক-গায়িকাদের আমরা নস্যাৎ করে দিতাম, অভিদাকেও বড় গায়ক মনে করতাম না। তবে গলার আওয়াজ জোরালো, আধুনিক গান না গেয়ে তাঁর ক্লাসিকাল গানে টিকে থাকা উচিত ছিল। আমরা মুগ্ধ ছিলাম অভিদার ব্যক্তিত্বে।

বয়েসের অনেক তফাত থাকলেও আমাদের মতন অর্বাচীনদের আড্ডায় তিনি এসে বসতেন মাঝে-মাঝে। অমন বিখ্যাত হয়েও পোশাকের কোনও আড়ম্বর ছিল না, পাজামা আর গেঞ্জি পরে

রাস্তার ধারে বসতে দ্বিধা করতেন না। চওড়া বুক, ফরসা রং, তখনও পর্যন্ত একটাও চুল পাকেনি, চোখে পড়ার মতন চেহারা।

হাতে সবসময় সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার। অকৃপণ সিগারেট বিলোতেন। আমরা প্রথম-প্রথম সঙ্কোচ বোধ করতাম, তিনি হাসি মুখে বলতেন, নে, নে অত লজ্জা কীসের। আমি ষোলো বছর বয়েস থেকেই বিড়ি টানতে শিখেছি।

উলটোদিকে নিবারণদার চায়ের দোকান। অভিদা হাঁক দিয়ে বলতেন, নেবাদা, এখানে এক রাউন্ড চা দিয়ে যাও! ঠিক আধঘণ্টা অন্তর চা দিয়ে যাবে।

তারপর আমাদের জিগ্যেস করতেন, এ পাড়ার লেটেস্ট খবর কী বল! কেউ কারুর বউকে নিয়ে ভাগেনি? ওই কোণের বাড়িটায় নতুন ভাড়াটে এসেছে, দুটো ডবগা-ডবগা ছুঁড়িকে দেখলুম, তোরা কেউ প্রেম করিসনি?

উত্তর কলকাতায় সেসময়ে মুখের ভাষায়, শালা, মাগি বেজন্মা এইসব শব্দ অনায়াসে মিশে থাকত। কেউ খুব আদর করে তার বন্ধুকে ডাকত। এই শুয়োরের বাচ্চা এদিকে আয়।

একদিনের কথা মনে আছে। আমার বন্ধু মানস বরাবরই পেটরোগা। কথা বলতে-বলতে হঠাৎ বাথরুমের দিকে ছুটত। তার মা তারকেশ্বরে পুজো দিয়ে মন্ত্র পড়া ফুলপাতা মুড়ে একটা বড় রুপোর মাদুলি বানিয়ে দিয়েছিলেন। সেটা সবসময় তাকে গলায় পরে থাকতে হত। সেদিন রুপোর মাদুলিটা তার জামার বাইরে বেরিয়ে পড়েছে, সেটা দেখে অভিদা জিগ্যেস করলেন, এটা কী রে?

মানস তারকেশ্বর, মা, পেট খারাপ এইসব বলতেই অভিদা ঝুঁকে এসে হ্যাঁচকা টানে সেটা ছিঁড়ে নিলেন।

তারপর ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে-দেখতে বললেন, এতে সত্যি কাজ হয়?

মানস বলল, অনেকটা কমেছে।

অভিদা বললেন, ভালো কথা, আমাদের বাড়িতে নেপু নামে একটা বাচ্চা চাকর আছে, সেটা যখন-তখন পেটব্যথায় ছটপট করে। তাকে পরিয়ে দেব, যদি তার সারে...তোর মাকে বলিস তোর জন্য আর-একটা গড়িয়ে দিতে।

মানস কাঁচুমাচু হয়ে গেল। তাদের বাড়ির অবস্থা সচ্ছল, ওইটুকু রুপোর জন্য কিছু যায় আসে না, কিন্তু মন্ত্রঃপূত মাদুলি কি অন্যকে দেওয়া যায়? বাড়িতে খুব বকাবকি করবে।

অভিদা কিন্তু মাদুলিটা ফেরত দিলেন না। তাঁর এই ব্যবহারটা খুব অদ্ভুত লেগেছিল।

যাই হোক, এবার আসল গপ্পে আসা যাক।

সেদিন আমার বম্বে মেল ধরার কথা। হাওড়া ব্রিজে দারুণ জ্যাম, ট্যাক্সি আর নড়েচড়ে না। আমার কাছে শুধু একটা বড় ব্যাগ ছিল, একসময়ে ট্যাক্সি থেকে নেমে ব্যাগ কাঁধে নিয়ে দৌড়তে-দৌড়তে প্ল্যাটফর্মে যখন পৌঁছলাম, তখন ট্রেন নড়াচড়া শুরু করেছে।

হুড়মুড় করে উঠে পড়ে, আমার কিউবিক্‌ল খুঁজে ভেতরে ঢুকে দেখলাম, তলার একদিকের বাঙ্কে বসে আছে দুজন যাত্রী, অন্য বাঙ্কে পাতলা চাদর গায়ে দিয়ে শুয়ে আছে আর-একজন।

সবে কলির সন্ধে, এসময় কারও শুয়ে থাকার কথা নয়। হয়তো লোকটি অসুস্থ, তাই ভালো করে লক্ষ করিনি। ব্যাগটা সিটের তলায় রেখে, অন্য দুজনের পাশে বসার পর দেখি, সেই শুয়ে থাকা ব্যক্তিটি আমার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, মাথায় সামান্য টাক, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা।

সিগারেট দেশলাই পকেটে নেই, ব্যাগে ভরা আছে। আবার ব্যাগটা টেনে বার করে, সিগারেট দেশলাই নিয়ে একটা জ্বালাবার পর দেখি, তখনও শুয়ে থাকা যাত্রীটি চোখ ফেরায়নি। অন্য দুজন দক্ষিণ ভারতীয়, তারা গল্প করছে নিজেদের ভাষায়।

কয়েক মুহূর্ত পরে সেই লোকটি বলল, তুই সুনীল না?

সঙ্গে-সঙ্গে গলার আওয়াজে চেনা গেল। অভিদা।

আশ্চর্য, আমি অভিদাকে চিনতে পারিনি, আর উনি আমাকে মনে রেখেছেন?

এর মধ্যে কেটে গেছে প্রায় বছরদশেক। আমি রাজবল্লভ পাড়া ছেড়ে চলে গেছি দমদম। অভিদার ছবি নিয়মিত পত্রপত্রিকায় দেখি, অনেক খবর থাকে তাঁর সম্পর্কে। এখন তিনি আর শুধু গায়ক নন, অনেক হিন্দি ফিল্মের সার্থক সুরকার।

আগে চশমা পরতেন না। মাথা ভরতি চুল ছিল। অভিজিৎ সেনের মতন একজন বিখ্যাত ব্যক্তি এরকম খোঁচা-খোঁচা দাড়ি নিয়ে ট্রেনে যাচ্ছেন, এটাও কি ভাবা যায়? সবাই খানিকটা সাজগোজ করে। আর ফিল্ম সংক্রান্ত লোকজনদের কিছুটা ঝলমলে উৎকট পোশাক পরাই রেওয়াজ।

অভিদা জনপ্রিয়তার শিখরে, তাঁর কথা তো আমি জানবই। কিন্তু আমার নামটা তিনি দশ বছর পরেও মনে রেখেছেন, স্মৃতিশক্তি খুব প্রখর, তা মানতেই হবে।

প্রাথমিক উচ্ছ্বাসের পর অভিদা জিগ্যেস করলেন, তুই এখন কী করছিস রে সুনীল? সাকসেসফুল হয়েছিস তো বোঝাই যাচ্ছে, ট্রেনে ফার্স্টক্লাসে ট্রাভল করছিস। চাকরি, না বিজনেস?

না, নিজের পয়সায় টিকিট কেটে ফার্স্টক্লাসে যাওয়ার মতন অবস্থা আমার হয়নি। তখন পর্যন্ত আমি শুধু কবিতাই লিখি। কবিতা লিখে কিছু নামটাম হলে টাকা পয়সার দিক থেকে কোনও সুবিধে হয় না বটে, তবে বিভিন্ন জায়গা থেকে কবি সম্মেলন বা সাহিত্যবাসরে আমন্ত্রণ পাওয়া যায়, গল্প উপন্যাস লেখকরা বরং এদিক থেকে খানিকটা বঞ্চিত। আমি ভ্রমণ-ক্ষ্যাপা, দূরের কোনও জায়গা থেকে ডাক পেলেই ছুটে যাই।

আমার গন্তব্য মুম্বই নয়, আমেদাবাদ। একটি গুজরাতি প্রতিষ্ঠান আমন্ত্রণ পাঠিয়েছে। তারাই ফার্স্টক্লাসের টিকিট কেটে দিয়েছে। মুম্বইতে এক রাত্রি বাস করে পরদিন আমেদাবাদের ট্রেন ধরতে হবে।

একটু পরে জিগ্যেস করলাম, অভিদা, তোমার শরীর খারাপ নাকি? এখন থেকেই শুয়ে পড়েছ?

অভিদা বললেন, দুদিন ধরে গা-টা ম্যাজ-ম্যাজ করছে। তা ছাড়া পায়ের যা অবস্থা বসতে গেলে পা-টা একেবারে সোজা সামনে মেলে থাকতে হয়। সেটা ভালো দেখায় না।

তলার দিকে চাদরটা একটু সরালেন অভিদা। তাঁর একটা পায়ের অনেকখানি প্লাস্টার করা। খুব নতুন নয়, তার ওপরে কিছু মানুষের সই রয়েছে।

কোনও মানুষের পা ভাঙা দেখলেই কৌতূহল হয়, কী করে ভাঙল?

অভিদা হাসতে-হাসতে বললেন, ভগবান ভেঙে দিয়েছে।

সবসময় ঠাট্টা-মস্করা করা অভিদার স্বভাব। এটা কী ধরনের মস্করা? আমি বললাম, ভগবান নিজে এসে ভেঙে দিলেন? তুমি তাঁকে দেখতে পেয়েছিলে?

অভিদা বললেন, নারে, দেখতে পাইনি। পেছন দিকে ছিল। ওই যে কথা আছে না, 'ঠিক দুক্কুর বেলা, ভূতে মারে ঠেলা,' সেই রকমই। ভূতের বদলে ভগবান আমায় পেছন থেকে ধাক্কা দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ফেলে দিল।

আমার চোখে তখনও কৌতূহল দেখে অভিদা বললেন, তোকে ব্যাপারটা পরে বলব। এখন একটা কাজ কর তো, তোকে যখন পাওয়াই গেছে, একটু খাটিয়ে নিই। এই বাস্কটার তলায় দ্যাখ আমার বড় ব্যাগটার পাশে একটা শান্তিনিকেতনি ঝোলা আছে, সেটা ওপরে নিয়ে আয়।

সেই ঝোলাটার মধ্যে একটা স্কচ হুইস্কির বোতল। লুকোবার কোনও চেষ্টাই নেই, ওপরের দিকটা বেরিয়ে আছে। একটা জলের ফ্লাস্ক, আর একটি কাচের গেলাস।

অভিজিৎ সেনের জীবনযাত্রার কাহিনিও সুবিদিত।

ইচ্ছে করলে হয়তো ফিলমের নায়কও হতে পারতেন। কিন্তু অত আলো ও ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে বারবার এককথা বলা তাঁর পছন্দ নয় বলে, কয়েকজন পরিচালক আগ্রহ দেখালেও অভিদা রাজি হননি। কিন্তু তাঁর অনেক কীর্তি-কাহিনি অনেক নায়ক-নায়িকাকেও হার মানিয়ে দেয়।

মুম্বইতে পাকাপাকি যাওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে এক উঠতি অভিনেত্রীর বিয়ে হয়। সে বিয়ে ভেঙেও যায় দেড় বছরের মধ্যে। তারপর আর বিয়ে করেননি, গুজব ছড়িয়েছে নানা রকম। কিছুদিন স্মিতা পাটিলের সঙ্গে তাঁর নাম জড়িয়েছিল। কোনও একটা পার্টিতে মদ খেয়ে নাকি মারামারি করেছিলেন, রাজ বব্বরের সঙ্গে। এক গায়িকাকে নিয়ে চলে গিয়েছিলেন ইউরোপ। এই তো কিছুদিন আগে মদ খেয়ে গাড়ি চালাতে গিয়ে পুণে শহরে এক ট্রাফিক পুলিশের সঙ্গে তাঁর ঝগড়া হয়, অভিদা মাথা গরম করে সেই পুলিশকে চড় মেরে বসেছিলেন। সেজন্য আদালতে গিয়ে তাঁকে জরিমানাও দিতে হয়েছে।

এসবই আমার কাগজে পড়া বা লোকমুখে শোনা। হয়তো এর বাইরেও আরও অনেক কিছু ঘটেছে। হিন্দি ফিল্‌ম আমি প্রায় দেখিই না। অভিদার গাওয়া বা সুর দেওয়া অনেক গানই আমার শোনা হয়নি। তবে পুজো প্যান্ডেলের অনেক গান বাধ্য হয়ে শুনতে হয়, হঠাৎ অভিদার গলায় আওয়াজ চিনতে পারলে মন দিই। মানুষটিকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি বলেই। অভিদা বাংলা গানও কিছু-কিছু রেকর্ড করেছে, সেগুলো বিশেষ সুবিধের না, অন্তত আমার রুচির সঙ্গে মেলে না। তবে, এরই মধ্যে একটা ভাটিয়ালি খুবই ভালো লেগেছিল। স্বীকার করতেই হবে, এরকম দরাজ গলা এখন আর কারও নেই।

অভিদা জিগ্যেস করলেন, তোর কাছে গেলাস আছে?

আমি বললাম, না তো।

—এই তো মুশকিলে ফেললি। মোটে একটা গেলাস এনেছি। ঠিক আছে, ফ্লাস্কের ঢাকনাটা ব্যবহার করা যাবে। এসব খাস-টাস তো?

—যদি একটু প্রসাদ দাও।

—প্রসাদ কণিকা মাত্র। একটুই পাবি, বেশি না। আগে আমারটা ঢাল। মুম্বইতে কোথায় রাত কাটাবি?

—দাদারে একটা ছোটখাটো হোটেল চিনি।

—মুম্বইতে যাচ্ছিস, আমার সঙ্গে যোগাযোগ করিসনি কেন?

—তুমি বিখ্যাত লোক, আমাদের ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে। তা ছাড়া অনেকদিন যোগাযোগ নেই।

অভিদা অন্য সহযাত্রীদের দিকে গেলাস তুলে জিগ্যেস করলেন, ডু ইউ মাইন্ড?

দুজনেই ভদ্রতা করে বললেন, নো, নো নো।

অভিদা আবার বললেন, উড ইউ লাইক টু জয়েন আস?

দেখা গেল, দক্ষিণ ভারতীয় দুজনই সাত্ত্বিক প্রকৃতির। মদ স্পর্শ করে না। তবে আমাদের ব্যাপারে আপত্তি নেই।

অভিদা আমাকে বাংলায় বললেন, এত লম্বা জার্নি, মদ না খেয়ে লোকে কী করে যায়, আমি বুঝতেই পারি না। তোর কাছে বোতল আছে?

—না।

—সঙ্গে রাখিস না? তার মানে এখনও নেশা ধরেনি।

—আমি শুধু অন্য কেউ খাওয়ালে খাই।

—ওইভাবেই শুরু হয়। নেশাখোর হবি কি না এখন থেকে ঠিক কর। যদি না হতে চাস, এখন থেকেই আর ছুঁবি না। আর নয় তো আমার মতন অবস্থা হবে।

—তুমি রোজ খাও?

—রোজ খাদ্য খেতে হয় না? আমার খাদ্যের সঙ্গে পানীয়ও লাগে। আগে মা-র কাছে গেলে খেতাম না। এবার মা-র কাছেও পারমিশান নিয়ে নিয়েছি। মুম্বইতে খুব কাজ ছিল, মাকে দেখতেই কলকাতায় এসেছিলাম তিন দিনের জন্য।

—তোমার মা...এখন ভালো আছেন?

—আমাকে দেখেই তো ভালো হয়ে গেলেন। প্লেনে এসেছিলাম, কিন্তু এই পা নিয়ে বেশিক্ষণ বসে থাকতে বেশ ব্যথা লাগে। তাই ফেরার সময় মনে হল, ট্রেনই ভালো।

—টিকিট পেলে কী করে? অনেকদিন আগে তো কাটতে হয়।

—কত দালাল আছে। আমার ভক্তও তো আছে রে। তারা জোগাড় করে দেয়। তুই আমার গান শুনিস?

—তেমন শোনা হয়নি। একটি ভাটিয়ালি খুব ভালো লেগেছিল। এইরকম গান আরও বেশি গাও না কেন?

—ওতে কি আর পয়সা আসে? এখন ফিল্মে ঝিং চ্যাক ঝিং চ্যাক ছাড়া চলে না। ফাস্ট বিট। লাউড। সারা পৃথিবীতে প্রায় একরকম। আমার টাকার দরকার, তাই ওই সব চ্যাংড়া গান গাই। আমরা নাকি রাজা রাজবল্লভের বংশ, তুই জানিস?

—ও-পাড়ায় থাকতে শুনেছি।

—সত্যি কি না কে জানে। বাবা-টাবাদের কাছে শুনেছি। হয়তো লতায়-পাতায় কিছু একটা একটা সম্পর্ক ছিল। সে যাই হোক, সাহেবদের পা চেটে আমাদের কোনও পূর্বপুরুষ টাকা করেছিল অনেক। কলসির জল গড়াতে-গড়াতে শেষ হয়ে গেছে। এখন আর কিছু নেই। ওই যে অত বড় বাড়ি, তার চোদ্দোজন শরিক। তবু বনেদিয়ানাটা রয়ে গেছে। দেখিসনি, আমার বাবা-কাকারা কুচোনো ধুতি আর গিলে করা পাঞ্জাবি ছাড়া পরত না। সব ফোতো কাপ্তেন। পেটে ভাত নেই, মুখে পান। অল্প বয়েস থেকেই আমি বুঝেছিলুম, ওসব নকলিবাজি আমার দ্বারা পোষাবে না। আমার টাকা চাই, আমি ভোগী লোক, আমার অনেক টাকা দরকার। চাকরি-বাকরি করা আমার দ্বারা পোষাত না। নেহাত গলাটা আছে, তাই গান গেয়ে টাকা পাই।

—তুমি কারও কাছে গান শেখোনি?

—কার কাছে শিখব? ধৈর্য ছিল না। মহম্মদ রফি-কে নকল করতাম। রফি সাহেব আমার গুরু। দূর থেকে, মানে আমি একলব্য শিষ্য। দু-একটা পাড়ার জলসায় গান গেয়ে বেশ হাততালি পেতাম। ব্যস, বুঝে গেলুম, এই লাইনটাই ধরতে হবে। প্রথম দিকে স্রেফ বড়-বড় গায়কদের নকল করে পপুলার হয়েছি। মুম্বইতে আসার পর হেমন্তবাবু আমায় খুব সাহায্য করেছিলেন। উনিই প্রথম বলেছিলেন, যথেষ্ট হয়েছে, এবার নিজের গলাটা খোলো!

—তোমার গলাটা সত্যিই ভালো।

—তুই প্রশংসা করছিস? গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না। মুম্বইতে নাম করেছি বটে, কলকাতার লোক এখন আর আমায় তেমন পছন্দ করে না জানি! তুই কবিতা-টবিতা লিখিস বললি, আমি কিছুই পড়িনি। একসময় খুব পড়ার নেশা ছিল, এখন আর বিশেষ সময় পাই না। তুই গান লিখিস না? দে, দু-চারখানা গান লিখে দে। হিন্দিতে ট্রানস্লেট করে কোনও ফিলমে লাগিয়ে দেব। তুই কিছু পয়সা পাবি।

—না, অভিদা, গান লেখার ক্ষমতা আমার নেই। আমি দুর্বোধ্য আধুনিক কবিতা লিখি, যা অনেক লোকই বোঝে না।

—কেন, ওরকম লিখিস কেন?

—কেউ-কেউ তো খেয়াল তারানাও গায়, অনেকে বোঝে না।

—হুঁ!

এর মধ্যে আমাদের রাত্তিরের খাবার এসে গেল। আমি ঢাকনা খুলে হাত দেওয়ার আগেই অভিদা ধমক দিয়ে বললেন, রেখে দে। আগে মালের নেশা না জমলে কেউ খায় নাকি?

ফ্লাস্কের ঢাকনায় আমি একটুখানি নিয়ে বসে আছি, অভিদা প্রায় আধবোতল উড়িয়ে দিলেন। তাতেও কথা একটু জড়ায়নি, মাথা ঠিক আছে।

পায়ের ওপর থেকে চাদরটা সরে গেছে। ডান পায়ের গোড়ালি থেকে উরু পর্যন্ত মোটা প্লাস্টার। আমি ঝুঁকে পড়ে তার ওপর নাম সইগুলো পড়বার চেষ্টা করলাম। মাত্র তিন চারটে নামই চেনা দিলীপকুমার, নাসিরুদ্দিন শাহ, শাবানা আজমি, আশা ভোঁসলে আরও অনেক নাম আছে।

অভিদা বললেন, তুই বুঝি ভাবছিস, আমি ফাঁট দেখাবার জন্য ওই সব হিরো-হিরোইনদের নাম সই করিয়েছি? ক'দিন হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল, তখন অনেকে দেখতে এসেছে, নিজেরাই সই করেছে। গুড উইশ করার মতন। সুরকারদের সবাই খাতির করে, গান হিট হওয়ার ওপর ছবি হিট হওয়া নির্ভর করে অনেকখানি। তবে এগুলো আমি মুছিনি ইচ্ছে করে, কলকাতায় আমার ভাইপো-ভাগ্নিরা দেখে মজা পাবে বলে। এখন মুছে ফেললেই হয়

অভিদা হাতের গেলাস দিয়ে সেই নামগুলোর ওপর ঘষতে লাগলেন।

আমি আবার জিগ্যেস করলাম, তুমি সিঁড়ি দিয়ে পড়ে গিয়েছিলে?

অভিদা বললেন, হ্যাঁ, তবে মদ খেয়ে গড়াইনি। দিনের বেলা, সুস্থ অবস্থায়। তখন বললুম না, ভগবান আমায় ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে। ভগবান সবসময় আমার পেছন-পেছন ঘোরে। হয়তো, এই কামরাতেও অদৃশ্য হয়ে ঘাপটি মেরে বসে আছে।

এটাকে মাতালের প্রলাপ মনে করে মুখ ফেরাতেই অভিদা হা-হা করে হেসে উঠলেন।

তারপর আমার একটা হাত ধরে টেনে বললেন, বিশ্বাস করলি না তো? আমি পাগল না, মাতালও হইনি। তবে শোন, তোকে গোড়া থেকে ঘটনাটা বলি। তবে, যতদিন না আমি অনুমতি দেব, তুই আর কারওকে বলতে পারবি না। তাতে রাজি আছিস?

আমি মাথা ঝোঁকালাম।

অভিদা এক বিচিত্র কাহিনি বলতে শুরু করলেন।

সেটা অভিদার জবানিতেই শোনা যাক।

অভিদার কথা

আমি জানি, আমার চরিত্রে একটা বৈপরীত্য আছে। ডুয়াল পার্সোনালিটি। তবে ডক্টর জেকিল অ্যান্ড মিস্টার হাইডের মতন অতটা নয়। তবে কোনও খুনটুন করিনি। আমি ভালো লোক, আবার এই আমিই ঝোঁকের মাথায় এমন এক-একটা কাণ্ড করে ফেলি, যাতে আমার নিজেরই চরম ক্ষতি হবে, শেষ মুহূর্তে সেটা আমি বুঝি তবু জেদের বশে থামি না। কেন যে এরকম করি, তার যুক্তি খুঁজে পাই না। এক-একসময় স্বেচ্ছায় বিপদ ডেকে আনি, যেন এটা আমার খেলা। আমার এক বন্ধু ডাক্তার। সে বলে, আমার মধ্যে নাকি আত্মহত্যা করার প্রবণতা আছে। হঠাৎ এত নামডাক, আর টাকাপয়সা পাওয়া আমার সহ্য হচ্ছে না। কথাটা ঠিক বলে মনে হয় না। আমি কক্ষনও আত্মহত্যার চেষ্টা করিনি, সে চিন্তাও মাথায় আসে না। যা কিছু পেয়েছি, তা নিজের চেষ্টায় নিজের ক্ষমতার জোরে পেয়েছি, এ ব্যাপারে আমার কোনও হীনম্মন্যতাও নেই।

আমি হইচই ভালোবাসি, আবার নির্জনতাও ভালোবাসি। মুম্বইয়ের জীবন সবসময় উদ্দাম, বিশেষত আমাদের লাইনে। সবসময় সবাই ছুটছে, থামবার উপায় নেই। রাত দুটো-তিনটে পর্যন্ত

জাগা, মদ্যপান, মেয়েদের নিয়ে হুল্লোড়, এসব তো লেগেই আছে। আমি খুব পছন্দ করি এইসব, লোকে জানে, আমি এক নম্বর হুল্লোড়বাজ।

আবার এক-একসময় এইসবে দারুণ বিতৃষ্ণা জন্মে যায়। টানা দশ-পনেরো দিন চেনা কোনও লোকের সঙ্গে কথা বলতেই ইচ্ছে করে না। টেলিফোনের আওয়াজে গায়ে যেন হুল ফোটে। ফিলম লাইনের সবাই জানে, আমি মাঝে-মাঝে রহস্যময়ভাবে উধাও হয়ে যাই কয়েকদিনের জন্য। কোথায় যাই, কেউ টের পায় না।

সেসব সময়ে আমি কোনও হোটেলেও উঠি না। আলাদা একটা বাড়ি ভাড়া করে থাকি। রান্নাবান্না, আর সব কিছুই নিজেরটা নিজে করে নিই। দাড়িও কামাই না সেই ক'দিন।

সে রকমই একবার গিয়েছিলুম এক জায়গায়, নাম বলছি না, ধরা যাক সে জায়গাটার নাম দুরানিগঞ্জ, মহারাষ্ট্রের মধ্যেই, নদীর ধারে ছোট শহর, চারপাশে ছোট-ছোট পাহাড়ঘেরা। শহর থেকে অনেকটা বাইরে, একটা পাহাড়ের গায়ে অনেকগুলো কটেজ বানিয়ে রাখা আছে, ভাড়া দেওয়ার জন্য। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে আমি বুক করেছিলাম সেরকম একটা কটেজ।

দুরানিগঞ্জের একমাত্র সিনেমা হলে তখন যে ছবিটা চলছে, সেটা আমরাই সুর দেওয়া। সুরকারদের ছবি তো পোস্টারে থাকে না, তাই আমাকে দেখে কেউ চিনবে না। শহরে আমি যেতামই না, একসঙ্গে অনেক খাবারদাবার কিনে এনে বাড়িতে বসে থাকতাম চুপচাপ।

পরিবেশটা ভারী সুন্দর। আমার কটেজটা পাহাড়ের মাঝামাঝি জায়গায়, বারান্দায় দাঁড়ালেই অনেক নীচে দেখা যায় নদীটাকে। প্রচুর গাছপালা। অনেক পাখি এসে বসে। কোনটা কোন পাখি তা চিনি না। এক-একটা পাখি দেখে মনে হয়, এরকম পাখি আগে কখনও দেখিনি। আমি শহরের মানুষ, পাখি আর দেখলাম কবে?

প্রথম দু-তিনদিন কানের মধ্যে যেন ঝনঝন শব্দ হত। মুম্বইয়ের জীবন, পার্টি, পঁয়ষট্টিটা ইনস্ট্রুমেন্ট নিয়ে মিউজিক, রেকর্ডিং, অনবরত গাড়ির আওয়াজ এসবের রেশ হয়ে গিয়েছিল। আস্তে-আস্তে সেগুলো কমে গেল, উপভোগ করতে লাগলুম নির্জনতার ঝঙ্কার।

এরকমভাবে চাঁদও তো দেখিনি কতদিন। পাহাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে আস্ত একখানা চাঁদ, দুধের মতন তার জ্যোৎস্না। এক-একসময় আবার মনে হত, একটা সাদা সিল্কের চাদরের মতন জ্যোৎস্না দুলছে। আমি কবিটবি নই, অন্যের লেখা কবিতায় সুর দিয়ে গান গাই। তবে মনে এমন-এমন সব ভাবনা আসত যে নিজেই অবাক হয়ে যেতুম। ধোঁওয়া নেই, ধুলো নেই, পরিষ্কার ঝকঝকে আকাশ। সত্যি কথা বলছি, সেই আকাশের তলায় বসে থাকতে আমার মদ খাওয়ার ইচ্ছেটাই যেন চলে গিয়েছিল। অভ্যেসবশত একটু-একটু খেতাম ঠিকই, আবার ভরতি গেলাস পড়েই থাকত, ছুঁতাম না।

এরকম চমৎকার জায়গায় একটাই শুধু অসুবিধে ছিল।

আমাদের দেশের অনেক পাহাড়ের চূড়াতেই একটা করে মন্দির থাকে। এ-পাহাড়টাতেও ছিল, ঠিক মন্দির নয়, একটা আখড়া। বিশেষ এক ধরনের বৈষ্ণব কাল্টের আখড়া, সর্বেশানন্দ নামে এক সাধু এর প্রতিষ্ঠাতা, তিনি বেঁচে নেই, তাঁর প্রধান শিষ্য প্রেমঘনানন্দ এই সম্প্রদায়ের গুরু, তাঁর বয়েস পঁচাশি। তিনি থাকেন ওই পাহাড়চূড়ায়।

আশ্রম বা আখড়া থাকে থাক, তাতে আমার কী! প্রত্যেকদিন সন্ধেবেলা ওখানে খোল-করতাল বাজিয়ে প্রায় ঘণ্টাদেড়েক ধরে কীর্তন বা প্রার্থনা-ট্রার্থনা হয়, অনেক লোক একসঙ্গে গান গায়। সেই আওয়াজ আমার বাড়ি পর্যন্ত আসে। সেই গানে আমার শান্তি ভঙ্গ হয়। বিরক্ত লাগে। সুরেলা গান হলেও তবু কথা ছিল, কিন্তু তা তো নয়, মাঝে-মাঝেই বেসুরো হয়ে যায়। আফটার অল আমি তো গানবাজনার লাইনের লোক, বেসুরো গান একেবারে সহ্য করতে পারি না।

কিন্তু কী আর করা যাবে! কারও বাড়িতে খুব বেশি চেঁচামেচি হলে অন্য কেউ নালিশ

জানাতে পারে। কিন্তু ধর্মস্থানে যতই হল্লা হোক, কোনও আপত্তি করা চলবে না। সন্ধের সময় ওই দেড়ঘণ্টা আমি দরজা-জানলা বন্ধ করে ঘরে বসে থাকতাম।

একদিন বিপদ যেন পায়ে হেঁটে উপস্থিত হল আমার কাছে। সে বিপদ এর নারীর বেশে।

আমার বাড়ির পাশ দিয়ে পাহাড়ের চূড়া থেকে নীচে নামবার পায়ে-হাঁটা রাস্তা, এ-আখড়ার লোকজনদের সেই রাস্তা দিয়ে ওঠা-নামা করতে দেখি। কারও সঙ্গে ডেকে কথা বলার প্রশ্নই ওঠে না।

তখন বেলা এগারোটা, আমি দাঁড়িয়ে আছি বারান্দায়। নীচে নদীটায় স্নান করতে যাব কি না ভাবছি। দুটি মেয়ে পাকদণ্ডী ছেড়ে আমার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। একজন গেরুয়া পরা, একজন সাদা শাড়ি, বোঝা গেল, ওই আখড়ার।

প্রথমে কয়েক মিনিট মনে হল, তারা আমার বাড়িটাই দেখছে। যদিও এমন কিছু দর্শনীয় নয়, ওখানকার সব বাড়িই এক রকম। কিছু বাড়ি ফাঁকাও পড়ে আছে।

আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতে একজন বলল, আমরা একটু ভেতরে আসতে পারি?

এখানে একটা কথা জানিয়ে রাখা দরকার। আমি বেশি বেশি নারী-চর্চা করি। এরকম একটা সুনাম বা দুর্নাম আমার আছে। কিন্তু আমি যখন এই ধরনের অজ্ঞাতবাসে যাই, তখন নারী-সঙ্গের কোনও অভাব বোধ আমার থাকে না। ইচ্ছে করলেই তো আমি মুম্বই থেকে যে-কোনও একটা মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে আসতে পারি। কিন্তু এই ধরনের লালসা পেছন ফেলে রেখে আসি আমি। একাকিত্বের অনুভবটাই আমাকে সবচেয়ে আনন্দ দেয়।

মেয়ে দুটিকে কোনও উত্তর না দিয়ে আমি ভেতরে চলে গেলেই ল্যাঠা চুকে যেত। ওরা আর ঢুকত না ভেতরে। অভদ্রতার মতন দেখালেও সেটাই আমার চরিত্রে মানায়। কিন্তু কোনও কারণে আমার মনটা তখন নরম ছিল। মনে হল, ওরা নিশ্চয়ই চাঁদা চাইতে এসেছে। কিছু দিয়ে দিলেই তো হয়।

বললুম, আসুন!

বাড়িটা দোতলা। বসবার ঘর একতলায়, খুব কাছেই সে পায়ে-চলা রাস্তা। দরকার হয়নি বলে, এ-ঘরটা আগে ব্যবহার করিনি। যদিও সোফাটোফা দিয়ে সাজানো আছে।

খুলে দিলাম সবক'টা জানলা। মেয়ে দুটি চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। যে গেরুয়া শাড়ি পরা, তার বয়েস বছর তিরিশেক হবে। অন্যজন একটু ছোট মনে হয়।

আমি বললুম, ভেতরে এসে বসুন।

ওরা তবু দাঁড়িয়েই রইল। গেরুয়া পরা মেয়েটি বলল, কাল পূর্ণিমা, আমাদের আশ্রমে একটা উৎসব আছে। আপনাকে আমন্ত্রণ জানাতে এসেছি। আপনি একবার চরণধূলি দিলে আমরা ধন্য হব। গুরুদেব বলে দিয়েছেন, আপনি অনুগ্রহ করে ওখানেই প্রসাদ গ্রহণ করবেন।

বৈষ্ণব বিনয়! চাঁদা চাইতে আসেনি, বরং নেমন্তন্ন করে খাওয়াতে চায়। দু-চারজন শাঁসালো ভক্ত টাকা জোগায় বোধহয়।

আমি জিগ্যেস করলুম, আপনাদের ওখানে কীসের উৎসব?

সাদা-শাড়ি চঞ্চল চোখে নীরব, গেরুয়া মেয়েটি কথা বলছে। সে দু-হাত কপালে ঠেকিয়ে চক্ষু বুজে প্রণাম করে বলল, পরমগুরু সর্বেশানন্দজির কাল আবির্ভাব দিবস। দয়া করে আসবেন। বেশিক্ষণ লাগে না ওপরে উঠতে, বড়জোর দশ মিনিট। নামগান হবে, শুনেই চলে আসবেন।

জন্মদিনকে এরা বলে আবির্ভাব দিবস!

আমি ঠোঁট কাটা মানুষ, ফস করে বলে ফেললুম, নামগান হবে? কিছু মনে করবেন না। রোজ সন্ধেবেলা আপনাদের ওখানে কীর্তন-টির্তন হয়, এখান থেকেও শুনতে পাই। মাঝে-মাঝে বড্ড বেসুরো শোনায়!

মেয়েটির ওষ্ঠে এবার একটা পাতলা হাসির রেখা ফুটেই মিলিয়ে গেল। সে বলল, বেসুরো হয় বুঝি? তা হলে আপনিই সুর শিখিয়ে দিন না।

একটু হকচকিয়ে গিয়ে বললুম, আমি শেখাব? তার মানে আমি কে, তা কি আপনি জানেন?

মেয়েটি আবার একটু হাসি দিয়ে বলল, এখানে অনেকেই জেনে গেছে, আপনি গায়ক অভিজিৎ সেন।

কী করে যে খবর ছড়ায়! এখানে এসে কারও সঙ্গে কোনও কথা হয়নি, দেখা হয়নি, তবু...। যে কেয়ারটেকারটি প্রথম দিন চাবি এনে দরজা খুলে দিয়েছে, সে-ই বোধহয় নামটা বলে দিয়েছে অন্যদের।

এই গেরুয়া-নারী কি বাঙালি?

অবশ্যই। প্রথম থেকেই সে বাংলায় কথা বলছে আমার সঙ্গে। হয়তো মহারাষ্ট্রে জন্ম, কিন্তু বাংলা উচ্চারণ পরিষ্কার। কণ্ঠস্বর বেশ নরম, তার সঙ্গে বৈষ্ণব-বিনয় মিশে মধুর হয়েছে।

এরকম একটা অখ্যাত জায়গার আশ্রমে একটি বাঙালি তরুণী মেয়ে এল কী করে? কৌতূহল হবেই।

অন্য মেয়েটি বাঙালি নয়। সে এবার মারাঠি ভাষায় বলল, তাই, চল। এরপর ঘিয়ের দোকান বন্ধ হয়ে যাবে।

গেরুয়া মেয়েটি তাকে মারাঠি ভাষায় উত্তর দিল দাঁড়া, ইনি এখনও কথা দেননি!

আমি বললুম, আপনারা দাঁড়িয়ে কেন, বসুন না।

গেরুয়া মেয়েটি একটি সোফায় বসল। অন্য মেয়েটির অস্থির ভাব।

আমি জিগ্যেস করলুম, আপনাদের এই আশ্রমটি কত দিনের?

সে বলল, সত্তর বছর। তখন এখানে আর কোনও বাড়ি-ঘর ছিল না।

—আপনি কতদিন ধরে আছেন?

—সাড়ে চার বছর।

—এর মধ্যেই আপনাকে গেরুয়া দিয়েছে? আমি যতদূর জানি, এত তাড়াতাড়ি তো গেরুয়া দেওয়া হয় না।

—আমাদের এখানে অন্য নিয়ম।

অন্য মেয়েটি এবার বলল, ভাই, তুমি কথা বলো, আমি ততক্ষণে দৌড়ে ঘি কিনে আনি? না পেলে মুশকিল হবে। ফেরার সময় তোমাকে এখান থেকে ডেকে নেব?

গেরুয়া মেয়েটি বলল, না, চল, আমিও যাই তোর সঙ্গে।

তার পরই মত বদলে ফেলে বলল, আমি কি এখানে একটু বসতে পারি? আপনার অসুবিধে হবে? অনেকদিন বাংলা কথা বলিনি। এতদূরে তো বাঙালি বড় একটা আসে না।

—বসুন না। কোনও অসুবিধে নেই।

বোঝা গেল, সন্ন্যাসিনী হলেও মাতৃভাষার ওপর টান থাকে। বোঝা গেল, সন্ন্যাসিনী হলেও বিখ্যাত লোকদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলার বাসনা থাকে।

আমি এবার আরাম করে পা ছড়িয়ে বসে একটা সিগারেট ধরালুম। মেয়েটি তেমন কিছু সুন্দরী নয়, কিন্তু সুশ্রী বলা যায়। ফিল্‌ম দুনিয়ায় অনেক ডাকসাইটে সুন্দরীদের সঙ্গে মেলামেশা করেছি। তারা সবসময় লিপস্টিক মেখে থাকে, ভুরু কামিয়ে আঁকে, আরও নানারকম প্রসাধন করে। শুধু ফিল্‌মের মেয়ে কেন, সমাজের মাঝারি স্তরের মেয়েরাও এরকমভাবে আছে। ভুরু আঁকা, লিপস্টিক ছাড়া মেয়েদের অনেক বছর দেখিইনি বলা যায়। সেই তুলনায় এ যেন একটি মাটির মেয়ে। গায়ের রং মাজা-মাজা, কপালে আর নাকে চন্দনের রেখা, মুখের চামড়াও চোখের দৃষ্টিতে একটুও উগ্রতা নেই। বরং যেন একটা স্নিগ্ধতার আলো রয়েছে।

তিন-চারদিন আমি কারও সঙ্গে কথা বলিনি। কেয়ারটেকারটি দিনে একবার এসে আমার খোঁজ নিয়ে যায়। তাঁর সঙ্গে হুঁ- হা বললেই কাজ চলে যায়, কথা বলার প্রয়োজন হয় না।

লেখাপড়া শিখলে মানুষের মুখে একটা ছাপ পড়ে, এ-মেয়েটির মুখে সেই ছাপ আছে।

জিগ্যেস করলুম, আপনার নাম কী?

সে বলল, অনসূয়া। আমাকে সবাই অনু বলে ডাকে।

পদবি বলল না। বিবাহিতা কি না বোঝবার উপায় নেই। বৈষ্ণবীদের কণ্ঠী বদল করে বিয়ে হতে পারে কারও সঙ্গে, কিন্তু তার বোধহয় বাইরের কোনও চিহ্ন থাকে না।

আবার জিগ্যেস করলুম, আপনার এত কম বয়েস। এই জায়গাটার কথাও বেশি লোক জানে না, আপনি এখানে যোগ দিলেন কী করে?

অনুসূয়া মুখ নীচু করে বলল, মন টেনেছিল। আমাদের আর-একটি আশ্রম আছে কোলাপুরে, সেখানে একদিন গুরুজির ভাষণ শুনেছিলাম। তখনই মনে হয়েছিল, এটাই আমার পথ।

—আপনার বাড়ির লোক বাধা দেয়নি? বাবা-মা আছেন নিশ্চয়ই?

—পূর্বাশ্রমের কথা আমাদের বলতে নেই।

—আপনি সিনেমা দেখেন?

—না।

—লোকের মুখে শুনেছেন, আমি একজন গায়ক? নাকি, আপনি নিজে কখনও আমার গান শুনেছেন?

—এখানে আসবার আগে শুনেছি।

—দেখুন, হয়তো আমার বেশি কৌতূহল দেখানো হয়ে যাচ্ছে। ইচ্ছে না করলে উত্তর দেবেন না। আপনার বয়েসি একটি মেয়ে, এখানে সারাজীবন থেকে যাবেন? কী পাবেন? কীসের আশায়...

—কিছু তো পেতে চাই না। এখানে আমি স্বামী-সেবা করি।

—স্বামী? ঠিক বুঝলাম না। আপনি বিবাহিতা?

—হ্যাঁ।

—স্বামী সেবার জন্য আশ্রমে থাকতে হবে কেন?

—আমার স্বামী বংশীধারী, ব্রজবিহারী প্রভু শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর বিগ্রহের সঙ্গে মালা বদল করে আমার বিবাহ হয়েছে। আমাদের আশ্রমে যে-কজন মেয়ে আছে, সকলের জন্যই এই নিয়ম।

—মীরাবাই? মীরাবাইয়ের তবু একজন জলজ্যান্ত স্বামী ছিল, শ্বশুর-শাশুড়ি-ননদিনী ছিল, সংসার ছিল। সেই সংসারজীবন অসহ্য বোধ হওয়ায় মীরাবাই কৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। আপনার কি সেরকম কোনও অভিজ্ঞতা আছে?

—আমাদের এ সম্পর্ক জন্ম-জন্মান্তরের।

—তার মানে কি দেবদাসী?

—দাসী নই, আমি প্রভুর জীবনসঙ্গিনী।

একবার ইচ্ছে হল বাঁকা ভাবে জিগ্যেস করি, ওই প্রভুটি কে? শ্রীকৃষ্ণের বকলমে গুরুজিটি নাকি? অনেক সাধুরই এরকম লীলাসঙ্গিনী থাকে।

তার পরই মনে হল, প্রথম দিন কেয়ারটেকারটি এ-জায়গাটা সম্পর্কে হড়বড় করে অনেক কিছু শুনিয়েছিল। তখনই জেনেছি, পাহাড়ের ওপরের আখড়ায় গুরুজিটির বয়েস পঁচাশি। তবে আরও কমবয়েসি কয়েকজন চ্যালাট্যালাও থাকতে পারে। কিন্তু অনসূয়ার মুখের সারল্য দেখে ওই ধরনের কোনও সম্পর্কের কথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করল না।

খানিকটা সহানুভূতির সঙ্গেই বললুম, আপনার কথা শুনেই বোঝা যায়, আপনি কিছুটা লেখাপড়া শিখেছেন। আপনি কি সত্যিই বিশ্বাস করেন, একটা পাথরের বিগ্রহ কোনও জীবন্ত রমণীর

স্বামী হতে পারে?

—প্রভু তো শুধু পাথরের বিগ্রহ নন। তিনি জীবন্ত।

—জীবন্ত? যে কথা বলে না, সাড়া দেয় না, যার চোখের পলকও পড়ে না, সে জীবন্ত হয় কী করে?

—আমার প্রভু আমার সঙ্গে কথা বলেন।

—কথা বলেন? দেখুন, আমি এটা জানতে চাই, সত্যিই কি তা সম্ভব? পাথরের মূর্তি...

প্রভু আমার সঙ্গে কথা বলেন স্বপ্নে। প্রত্যেক দিন। তিনি হাসেন, গল্প করেন...

এবার আমার হাসি পেয়ে গেল। বায়ুরোগ না থাকলে এরকম স্বপ্ন কেউ দেখে না। আর প্রত্যেকদিন একই স্বপ্ন দেখা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। অন্ধ বিশ্বাস ছাড়া এটা আর কিছুই নয়।

কেষ্টঠাকুরটিরও তো আহ্লাদ কম নয়। দ্বাপর যুগে যে তিনটি বউ, শ্রীরাধার মতন পরকীয়া এবং আরও ষোলো হাজার গোপিনীর সঙ্গে লীলাখেলা করে গেছে। কলি যুগেও তার এমন দাপট? তার এমনই সেক্স অ্যাপিল যে অনসূয়ার মতন একটি সরল কমনীয় মেয়ে এই আশ্রমেরই আরও কয়েকটি মেয়ের সঙ্গে স্বামী হিসেবে তাকে ভাগ করে নিতেও রাজি?

এর পরেই আমি যে কাণ্ডটি করলুম, যার আপাত কোনও যুক্তি নেই। এটা আমার স্বভাবের সেই দিক, যা আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে।

অনসূয়া বসেছিল দরজার ঠিক কাছের সোফায়। আমি খানিকটা দূরে। হঠাৎ আমি বাঘের মতন এক লাফ দিয়ে উঠে গিয়ে অনসূয়ার পিঠে একটা হাত জড়িয়ে, অন্য হাতে তার থুতনিটা উঁচু করে চুমু খেলুম। নিছক এক ঠোক্করের চুমু নয়, গভীর, গাঢ় চুমু। প্রথমে সে ঠোঁট খুলতে চায়নি, খানিকটা জোর করেই ঠোঁট ফাঁক করতে হল।

চুমু শেষ করে আমি দ্রুত ফিরে গেলুম নিজের জায়গায়।

ব্যাপারটা এমনই আকস্মিক এবং অচিন্ত্যনীয় যে অনুসূয়া আমাকে ঠিক মতন বাধা দিতেও পারেনি। তা ছাড়া আমার সঙ্গে গায়ের জোরে পারবে কেন? আমি ছেড়ে দিতেই সে প্রথমেই ত্রস্তে জানলার দিকে তাকাল। এটা মেয়েদের সাধারণ ইনস্টিংক্ট। জানলার পাশেই রাস্তা, মাঝে-মাঝে লোক চলাচল করে, কেউ-না-কেউ না দেখে ফেলতে পারত, দরজাও খোলা, ওর সঙ্গিনীও ফিরে আসতে পারে যে-কোনও মুহূর্তে।

আমার কৈশোর বয়েসে মাসতুতো বোনকে ছাদের সিঁড়িতে জোর করে জাপটে ধরে চুমু খেয়েছিলাম। সে মুখে না-না, এ কী-এ কী বললেও সেটাকে খুব একটা জোর জবরদস্তি বলা যায় না, তার ব্যবহারে যথেষ্ট ইঙ্গিত ছিল। এ ছাড়া আমার বাকি জীবনে আমি কখনও কোনও মেয়ের ওপর জোর করিনি। 'কবিতা বনিতা চৈব সুখদা স্বয়মাগতা।' কবিতা যেমন জোর করে লেখানো যায় না, সেরকম কোনও বনিতাও স্বয়মাগতা হলেই সুখপ্রদা হয়। সহবাস সম্মতি আইনে আমি একেবারে নির্দোষ।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে, অনসূয়ার প্রতি আমার এ ব্যবহার প্রায় বলাৎকারের পর্যায়েই পড়ে। আমি আগের মুহূর্তেও তাকে সিডিউস করার চেষ্টা করিনি। আমি যে পুরোপুরি দোষী, তা আমি স্বীকার করতে বাধ্য।

অনসূয়ার চোখ দিয়ে দর-দর করে জল বেরিয়ে আসতে লাগল। নিদারুণ আহত গলায় বলল, এ আপনি কী করলেন? এ আপনি কী করলেন?

সে থরথর করে কাঁপছে। তাকে দেখে আমার মায়া হল, খানিকটা অনুতাপও হয়েছিল কি? না, তা বোধহয় হয়নি। অনুতাপ করলে তো কবেই আমি শুদ্ধ সাত্ত্বিক লোক হয়ে যেতুম।

আমি আবেগহীন গলায় বললুম, তোমাকে হঠাৎ আমার আদর করতে ইচ্ছে হল। হয়তো এটা অন্যায়। অনেকেই তাই মনে করবে। আমি এরকমই।

দুদিকে মাথা নেড়ে সে বলল, না, না, ছি-ছি। কী করলেন? আপনার যদি বিপদ হয়?

আমি বললুম, তুমি চেঁচিয়ে লোক ডাকতে পার। সবকথা বলে দিতে পারো। তোমার কথা সবাই বিশ্বাস করবে।

সে আরও জোরে-জোরে মাথা নাড়তে লাগল আর ফোঁপাতে লাগল।

আমি বললুম, লোকজন এসে যদি শাস্তি দেয়, তা আমি মাথা পেতে নিতে রাজি আছি।

অনসূয়া বলল, আপনার জন্য আমি প্রার্থনা করব।

আমি বুঝতে না পেরে জিগ্যেস করলুম, আমার জন্য প্রার্থনা করবে? কেন? কী প্রার্থনা করবে? আমি যাতে আজ রাত্তিরেই মরে যাই? যাতে কেউ কিছু জানতে না পারে?

অনসূয়ার সারা শরীরটাও আরও জোরে কেঁপে উঠল। সে বলল, না, না, প্রভু যদি রাগ করেন, আপনাকে শাস্তি দিতে চান, আমি ক্ষমা চাইব।

—প্রভু? মানে পাথরের বিগ্রহ?

আবার আমার মাথায় রক্ত চড়ে গেল। একটা পাথরের মূর্তি আমার ওপর প্রতিশোধ নেবে? এটা আমাকে বিশ্বাস করতে হবে? দেখি তো তার কত ক্ষমতা! চ্যালেঞ্জ রইল।

পাপ যদি করে থাকি, তাহলে আর-একটু বেশিই করা যাক।

একইভাবে লাফিয়ে গিয়ে ফের জড়িয়ে ধরলুম অনসূয়াকে। পাগলের মতো আদর করতে-করতে বলতে লাগলুম, এত সুন্দর একটা মেয়ে, সে সারাজীবন শুধু একটা পাথরের সঙ্গে...সে আমার কিচ্ছু করতে পারবে না।

অনসূয়া ছটফট করলেও নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারেনি। এবারে শুধু চুমু নয়, আরও আদর দিলুম তার বুকে। তার নীচে আর নামিনি। একটু পরে ফিরে এলুম নিজের জায়গায়।

দরজা-জানলা সব খোলা। কোনও লোক দেখা যায়নি অবশ্য। অনসূয়া কোনও কথা বলছে না। মুখ ঢেকে কেঁদেই চলেছে।

এবারে আমার অপরাধবোধ অনেক কম। অনসূয়া বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছে ঠিকই। কিন্তু তার শরীর যে উষ্ণ হয়ে উঠছিল তাও আমি টের পেয়েছি। শুধু উষ্ণতা নয়, তার বুকে যেন আগুনের হলকা। সাধারণ জৈবিক নিয়মেই তার শরীর সাড়া দিয়েছে। কোনও পাথর কি এই উষ্ণতা জাগাতে পারবে?

বাগানের লোহার গেটে ক্যাঁচ করে একটা শব্দ হল। অন্য মেয়েটি ফিরে আসছে। অনসূয়াও শুনতে পেয়েছে। সে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। চোখ-মুখ মুছে নিল ভালো করে। অন্য মেয়েটি বাগান পেরুবার আগেই অনসূয়া ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে গিয়ে একবার আমার দিকে সরাসরি চাইল। চক্ষু দুটি লাল, কান্নার ফলে মুখখানি ভাসাভাসা, ঠোঁট ফোলা। ধরা গলায় বলল, আপনার জন্য আমি প্রার্থনা করব প্রত্যেকদিন।

বলাই বাহুল্য, এরপর পাহাড় চূড়ায় সেই আখড়ার উৎসবে আমি যাইনি। ওখানে থেকে আর কেউ আসেনি আমার কাছে। অনসূয়াকে ওই রাস্তা দিয়ে যেতেই দেখিনি। দিনতিনেক পরে ফিরে এলুম কাজের জায়গায়।

শুধু কাজ তো নয়, আবার পার্টি, হইহল্লা, জাগরণ। প্রত্যেকটি দিনই উত্তেজনা ও অস্থিরতাময়। এর মধ্যে ওই নির্জন প্রবাসের স্মৃতি আস্তে-আস্তে ফিকে হয়ে আসে। মাঝে-মাঝে এক-এক ঝলক চোখে পড়ে, তারপর হারিয়ে যায়।

হারিয়ে গেল না অন্য একটি কারণে।

মুম্বই ফেরার ঠিক সাড়ে চার মাস পর আমার জন্ডিস হল। এমনই গুরুতর ধরনের যে ভরতি হতে হল নার্সিংহোমে।

আমাদের হাঁচি-কাশি হলেও কাগজে খবর বেরোয়। রেডিওতে বলে। অনেক ভক্তর চিঠি

আসে। দেখতেও আসে অনেকে। আমার একজন সেক্রেটারি আছে বটে, চিঠি সব আমি নিজেই পড়ি। নার্সিংহোমে শুয়ে-শুয়েই অন্য অনেক চিঠির মধ্যে একখানা চিঠি দেখে চমকে উঠতে হল।

নাম সই নেই। গোটা-গোটা বাংলা অক্ষরে লেখা ঃ আমি তিনদিন উপবাসে থেকে আপনার জন্য প্রার্থনা করছি। আপনি ভালো হয়ে উঠবেন। আপনি ক্ষমা পাবেন।

এ-চিঠি নিশ্চিত অনসূয়ার। যাচ্চলে! ওর ধারণা, ওর ভগবান রাগ করে আমাকে এই জন্ডিস রোগের শাস্তি দিয়েছে!

ভগবানগুলো খুব হিংসুটে হয় বটে। ওল্ড টেস্টামেন্টের ঈশ্বর তো নিজের মুখেই বলেছেন, আই অ্যাম অ জেলাস গড। গীতায় শ্রীকৃষ্ণও বলেছেন, মামেকং শরণং ব্রজ। একমাত্র আমাকেই শরণ করো। অন্যান্য ধর্মেরও ঈশ্বর বা অবতাররা বলেছেন, শুধু আমাকেই আশ্রয় করো, অন্য কোনও দিকে তাকাবে না! আরে বাপু, ভগবান হিসেবে যদি তোমার অতই গুণপনা ও আকর্ষণ থাকে, তা তোমাকে নিজের মুখে বলতে হবে কেন?

মুম্বইতে সেবার জন্ডিস প্রায় এপিডেমিকের আকার নিয়েছিল। আমার ওই নার্সিংহোমে প্রায় সব বেডেই জন্ডিসের রোগী। পটাপট করে কয়েকজন মরেও গেছে। তাহলে কি একা আমার অপরাধে অতগুলো লোককে ভগবান শাস্তি দিয়েছে? কিংবা ওই সবক'টা লোকই ভগবানের বউদের ধরে টানাটানি করেছে?

একমাত্র এই অপরাধ ছাড়া আর তো কোনও ব্যাপারে ভগবানের রাগারাগির চিহ্ন দেখি না। চতুর্দিকে জাল-জোচ্চুরি, কালোবাজার, নারীহরণ, নারী ধর্ষণ, নারী কেনা-বেচা, মাফিয়ারা থাকছে বুক ফুলিয়ে, রাজনৈতিক নেতাগুলো বদের ধাড়ি, দুকান কাটা, চুরি করছে কোটি-কোটি টাকা, কারুর কোনও শাস্তি হয়?

আমার পাশের বেডে রোগীটির বয়েস তেরো বছর, তার অবস্থা আমার চেয়েও সাংঘাতিক। সে কি অপরাধ বা পাপ করতে পারে?

অনুসূয়া বৈষ্ণব, ক্ষমাই তার ধর্ম। আমার ওই গা-জুয়ারি অপরাধ সে ক্ষমা করে দিয়েছে। কিন্তু তার যে আরাধ্য দেবতা, সে রাগে বা হিংসেয় আমার ওপর প্রতিশোধ নিতে পারে, এই তার বিশ্বাস।

নার্সিংহোম থেকে ছাড়া পেয়ে আরও কিছুদিন আমায় শয্যাশায়ী থাকতে হয়। জন্ডিসের পর নিয়ম-কানুন মানতে হয় অনেক, ভাজাভুজি খাওয়া বারণ, মদ একেবারে নিষিদ্ধ। এ-রোগের ওষুধ বিশেষ নেই, সংযম আর বিশ্রামই আসল। মুম্বইয়ের দিকে যেসব মাছ পাওয়া যায়, সেগুলো ঝোলের বদলে ভাজা খেতেই ভালো লাগে। মাছ ছাড়া আমি ভাত খেতে পারি না। মাঝে-মাঝে মাছ ভাজা খেয়েছি, মদও দু-এক ঢোক খেয়েছি লুকিয়ে। তবু সেরে তো উঠলুম!

আবার গান রেকর্ডিং শুরু করার পর অনসূয়ার কাছ থেকে আর-একটা চিঠি এল। এবারও অস্বাক্ষরিত। 'আপনি সুস্থ হয়ে ওঠায় আমরা সবাই পুলকিত। আপনার নামে পূজা দিয়েছি। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।'

আমি নয়, আমরা? এটাই বৈষ্ণবদেবের ভাষা!

তাহলে আমার অসুখ সারল অনসূয়ার পূজা ও প্রার্থনার জন্য, না আমার মনের জোরে?

এর পরের বছরও আমার নির্জন বাসের দরকার হয়েছিল। দুরানিগঞ্জ যাইনি, গিয়েছিলুম মধ্যপ্রদেশের বস্তারে। সেখান থেকে ফেরার পর একদিন স্টুডিয়োতে একটি নতুন মেয়ের গান রেকর্ডিং করাবার সময় আমার রক্তবমি হল। বেশ অনেকখানি। প্রথমে ধারণা হয়েছিল, জন্ডিস ভালো করে সারেনি বলেই এই বিপত্তি। ডাক্তাররা জোর করে নার্সিংহোম শুইয়ে দিল। পরে ধরা পড়ল আলসার।

আমার খাওয়া-দাওয়ার কোনও ঠিক নেই, এক-একদিন সারাদিন কিছু খাওয়ার সময়ই পাই না, তারপর সন্ধের সময় প্রচুর ভাজাভুজি, চানাচুর, প্রচুর মদ্যপান, এত সিগারেট, ঘুম কম, আমার

আলসার হবে না তো কার হবে?

এর মধ্যেই অনসূয়ার আর-একটা চিঠি চলে এল। ওই একই রকম বয়ান। সে আমার জন্য প্রার্থনা করছে। এই আলসারও ভগবানের রাগের প্রকাশ? এবারে মেরেই ফেলবে নাকি?

এমন কড়া জান, অত সহজে কি যায়? অপারেশন না করিয়েই সেরে উঠলুম। একেবারে ফিট। আবার অনসূয়ার চিঠি। যেন তার প্রার্থনাতেই আমি সেরে উঠেছি!

কি করে ও খবর পায়, কে জানে! মুম্বইয়ের বাঙালিদের মধ্যে-মধ্যে আভাসে-ইঙ্গিতে খোঁজ খবর নিয়েছি, তাদের পরিবারের কোনও মেয়ে বৈষ্ণবী হয়ে আখড়ায় যোগ দিয়েছে কি না। মুম্বইতে এত বাঙালি, ক'জনেই বা চিনি। কোনও সন্ধান পাইনি। অনসূয়া একবার কোলাপুরের নাম বলেছিল, হয়তো ও সেখানকারই মেয়ে। কিন্তু কোলাপুরে আর কে খোঁজ নিতে যায়? আমার অত সময়ই বা কোথায়?

মানুষের জীবনে মাঝে-মাঝে কিছু অসুখ-বিসুখ, কিছু দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে যেতেই হয়। বিশেষত আমাদের মতন যাদের বল্‌গা ছাড়া জীবন, সবসময় অনিয়ম, আমাদের ঝুঁকি বেশি।

যখনই এরকম কিছু ঘটে, তখনই অনসূয়ার চিঠি আসে। সাধারণ জ্বর হলেও। যেন তার ভগবান কিছুতেই প্রতিশোধ নেওয়ার কথা ভুলতে পারছে না। আরে বাবা, তোমার শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শন চক্র পাঠিয়ে আমার গলাটা কুচুৎ করে কেটে দিলেই তো পারে। সে চক্রখানা কি হারিয়ে গেছে?

একবার একটা দুর্ঘটনা হল ইউরোপে। রাইন নদীর একটা ফেরি পার হচ্ছিলাম। অতি সুদৃশ্য স্টিমার, দু-পাশের দৃশ্যও চমৎকার। বেশ শীত, আমার গায়ে ওভারকোট, দাঁড়িয়েছিলুম বাইরে রেলিং ধরে। হঠাৎ একটা বার্জ এসে স্টিমারটার উলটো দিকে ধাক্কা মারল। খুব জোর ধাক্কা। সেই ইমপ্যাক্ট সামলাতে না পেরে আমি, আরও দুজন ছিটকে পড়ে গেলুম নদীতে।

এটাকে বাংলায় যাকে বলে মস্ত বড় ফাঁড়া। একে তো জল একেবারে বরফের মতন ঠান্ডা, আমি সাঁতার জানলেও ওভারকোট সমেত অত জবরজং পোশাক নিয়ে সাঁতার কাটাও যায় না। আর স্টিমারের চাকার নীচে পড়ে যাওয়ার খুবই সম্ভবনা। আমি ছাড়া অন্য দুজন সাহেব, তাদের মধ্যে একজনকে গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল, পরে সে বেঁচেছে কি না জানি না। আমি উদ্ধার পেয়ে গেলুম অক্ষতভাবে।

কাগজে এই খবর ছাপা হয়েছিল। দেশে ফেরার পর দেখি, অনসূয়ার চিঠি আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে।

তার ভগবানের ক্রোধ আমাকে ইউরোপ পর্যন্ত তাড়া করে গেছে? কথায় বলে, রাখে কৃষ্ণ মারে কে? আর আমার বেলায় কৃষ্ণই বারবার আমাকে মারতে চেষ্টা করছে? আমি এটা ভাবতে চাই না। অনসূয়ার চিঠিই আমাকে মনে করিয়ে দেয়।

প্রত্যেকবার এরকম কিছু ঘটার পর আমি মনে-মনে তেজের সঙ্গে বলি, কই হে, ভগবান, আমার কিছু করতে পারলে? তোমার মুরোদ তো বোঝা যাচ্ছে। চালিয়ে যাও, চেষ্টা চালিয়ে যাও।

আমার ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই। তবু এরকম মনে হওয়াটাই তো এক হিসেবে আমার পরাজয়। ভূতে বিশ্বাস না করে ভূতে ভয় পাওয়ার মতন।

অনসূয়ার এবারের চিঠিটা একটু অন্যরকম। যেন তার ঈশ্বর, তার জীবন স্বামীর প্রতি এতদিনে খানিকটা অভিমান হয়েছে। কেন তিনি আমাকে ক্ষমা করতে পারছেন না? কেন তিনি প্রতিশোধস্পৃহা ভুলতে পারছেন না। সেইজন্য, সে নিজের কাঁধে সব দোষ নিয়েছে। শাস্তি হিসাবে মাথা ন্যাড়া করে ফেলেছে।

ইস, বড় সুন্দর চুল ছিল মেয়েটার! কিন্তু আমি কী করতে পারি? সে-ই তার ঈশ্বরকে বারবার দায়ী করছে, আমি তো করছি না? মানুষ কি জীবনে একবার দুবার আছাড় খায় না? মানুষ তে অনেক সময় শুকনো জায়গাতেও আছাড় খায়। মদ্যপান করার পর আমি সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময়

খুব সাবধানে নামি। কখনও দুর্ঘটনা হয়নি। একবার পোর্টে একটা জাহাজে নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলুম। প্রচণ্ড খাওয়ার পর দড়ির সিঁড়ি দিয়ে নামতে হয়েছিল। ঠিক পেরে গেছি!

ক'দিন আগে নিজের বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে দিনদুপুরে পা পিছলে পড়ে গেছি। কলার খোসা ছিল না, কিচ্ছু ছিল না। তবু এরকম হতেই পারে। হয়তো অন্যমনস্ক ছিলাম। একটা গানের সুর কিছুতেই মনের মতন হচ্ছিল না। পড়ে গিয়ে পা ভেঙেছি, ক'দিন বাদে সেরে তো যাবেই। তবু এরমধ্যে আবার অনসূয়ার সেই কাতর চিঠি। যেন এটাও তার ভগবানের কীর্তি।

ভগবানের কি খেয়েদেয়ে আর কাজ নেই? বিশ্ব সংসার সামলাবার কথাও সে ভুলে গেছে? এ দেশে কত গরিব-দুঃখী, অনাথ-আতুর রয়েছে, তাদের জন্যও মাথাব্যথা নেই, শুধু ঘুরছে আমার পেছন-পেছন? মাত্র দু-খানা চুমুর জন্য এত?

ট্রেন প্রচুর লেট, ভিক্টোরিয়া টারমিনাসে পৌঁছল সন্ধেবেলা। অভিদা আগেই বলে রেখেছিলেন, আমার হোটেলে ওঠা চলবে না। ওঁর দুজন সহকারী গাড়ি নিয়ে স্টেশনে হাজির ছিল, অভিদার পায়ের অবস্থা বেশ খারাপ, ধরাধরি করে নিয়ে যেতে হল। মালাবার হিলসে একটা সতেরোতলা বাড়ি, তার সবচেয়ে উঁচু তলায় অভিদার ফ্ল্যাট। ঠিক সমুদ্রের দিকেই একটা চওড়া বারান্দা, সেখানে দাঁড়ালে চোখ জুড়িয়ে যায়। মুম্বইতে এলেই আমার মনে হয়, ইস কলকাতা শহরটা কেন যে সমুদ্রের ধারে হল না। তিন শয়নকক্ষের প্রশস্ত অ্যাপার্টমেন্ট, মস্ত বড় বসবার ঘর, একদিকে খাওয়ার জায়গা, দু-হাজার স্কোয়ারফুট তো হবেই। এখানে অভিদা একা থাকেন, একজন বাবুর্চি তাঁর রান্নাবান্না করে দেয়, রীতিমতন উর্দিপরা বাবুর্চি, মাথায় টুপি, ইংরিজিও বোঝে।

গায়ক ও সুরকারের বাড়িতে নানারকম গান-বাজনার যন্ত্র তো থাকবেই। অত্যাধুনিক মিউজিক সিস্টেম। কিন্তু বেশি চোখে পড়ে বই। একটা ঘরের তিনদিকের দেওয়াল জোড়া, বড়-বড় র‍্যাক ভরতি বই, যত্ন করে রাখা। বহুরকমের বই, সাহিত্য, ইতিহাস, ভ্রমণকাহিনি, ছাড়াও বিজ্ঞান, দর্শন ও অনেক রকমের ধর্মগ্রন্থ! ইস, এরকম একটা জায়গায় যদি আমি টানা একবছর থাকার সুযোগ পেতাম!

এইসব বাড়িতে সবাই লিফটে ওঠানামা করে। অভিদা তাহলে সিঁড়ি দিয়ে পড়ে গেলেন কী করে?

সেকথা জিগ্যেস করতেই তিনি বললেন, লিফটে উঠি ঠিকই, নামবার সময় হেঁটে নামি ইচ্ছে করে। এমনিতে তো ব্যায়াম-ট্যায়াম কিছু করি না, তবু নামবার সময় শরীরে কিছু নাড়াচাড়া হয়। এরকম দশবছর নামছি, হঠাৎ একদিন পা হড়কে গেছে। সেটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

—অভিদা, তোমাকে কি প্রত্যেকদিনই পার্টিতে যেতে হয়?

—নিজের কাজের জন্য যেতে হয় না, তবে, একটা-না-একটা ছবির মহরত তো লেগেই আছে, তারা ডাকে। কোনও ছবি দশসপ্তাহ চললেই শুরু হয়ে যায় সেলিব্রেশন। তা ছাড়া আজ এর জন্মদিন, কার ওর বিবাহ বার্ষিকী। তুই বিশ্বাস করবি না, এখানে কারও ডির্ভোস হলেও পার্টি হয়।

—তাহলে তুমি নিজের জন্য সময় পাও কখন?

—এরই মধ্যে সময় বার করে নিতে হয়। জীবনটা এরকমই চলছে, আর ফেরানো যাবে না। অনেক মানুষের জীবন মাটিতে আঁকা আলপনা, আর আমাদের মতন মানুষের জীবন হাউই কিংবা রকেট। আমাদের আয়ু কম হয়। কিন্তু আমাদের ছটা বেশি। যে যেটা বেছে নেয়! তবে যত রাতই হোক, আমি প্রত্যেকদিন ভোরবেলা উঠি। পরে দুপুরে খানিকটা ঘুমিয়ে-টুমিয়ে নিই, ভোরে ওঠা অভ্যেস হয়ে গেছে। তখন কিছুক্ষণ ধ্যান করি।

—ধ্যান করো? কীসের ধ্যান?

—যারা ধর্ম-টর্ম মানে, যাদের খুব ভক্তিভাব থাকে, তারা প্রত্যেকদিন পুজো-প্রার্থনা করে। নামাজ পড়ে। আমাদের ওসব ঝামেলা নেই। তবু আমাদেরও কিছু-না-কিছুর সাধনা করতে হয়। এটা আমি আমার এক জ্যাঠামশাইয়ের কাছে শিখেছি।

—চোখ বুজে ধ্যান করো? তখন কীসের কথা ভাবো? কী দ্যাখো?

—রবীন্দ্রনাথ, রামমোহন, গান্ধীজি, ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ, আবদুল করিম খাঁ, এঁদের ছবি মনের চোখে ভেসে ওঠে। এঁরাই তো এ-যুগের দেবতা। ছেলেবেলায় গান শিখিনি তেমন, এখন গলা সাধি, কঠিন-কঠিন রাগ গলায় তোলার চেষ্টা করি। তাতেই সকালবেলা মনটা ভালো হয়ে যায়। আর হ্যাঁ, লিভার ভালো রাখার জন্য নিমপাতার রস খাই। রবীন্দ্রনাথ মদ খেতেন না, তবু নিমপাতার রস খেতেন।

আটটা বাজতে-না-বাজতেই অভিদা বললেন, অনেকক্ষণ সন্ধে হয়ে গেছে, এখন আহ্নিক শুরু করতে হবে যে! গেলাস, সোডা আর বরফ দিতে বল। ওই কাবার্ডে বোতল আছে অনেক রকম, তোর যেটা ইচ্ছে নিয়ে আয়। সুনীল, তুই আমেদাবাদ গিয়ে কী করবি? এখানেই থাক না ক'দিন।

আমি বললাম, ওদের কথা দেওয়া আছে যে! স্টেশনে অপেক্ষা করবে।

—কথা দিয়ে সব কথা রাখিস বুঝি? বেশ-বেশ, অভ্যেসটা ভালো। আমার অবশ্য ধাতে নেই। তুই কবিতা-টবিতা তো লিখিস বুঝলাম, আর কিছু করিস?

—একটা খবরের কাগজে...

—সেই টিপিক্যাল ব্যাপার। সাহিত্য করতে গেলেই হয় খবরের কাগজে, আর নয় তো ইস্কুল-কলেজে মাস্টারি। সব জায়গায় এরকমই দেখি। অথচ যারা সাহিত্য রচনা করবে, তাদের সারা দেশ, এমনকি সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ানো দরকার, মানুষকে চেনা দরকার। ছোট একটা গণ্ডির মধ্যে থেকে...

—ওসবের জন্য অনেক টাকা লাগে, অভিদা।

—টাকা রোজগার করলেই পারিস। বড়-বড় উর্দু কবিরা এখানকার সিনেমার জন্য গান লিখে অনেক টাকা রোজগার করে। আবার নিজস্ব কবিতাও লেখে। তোরা বাঙালিরা পারিস না কেন?

—বাংলা সিনেমায় তো স্কোপ নেই।

—এখানে চলে আয়! তোর বয়েস এখনও কম, জীবনটা নিয়ে কী করবি ঠিক করেছিস? একটা কিছু জীবনদর্শন তো থাকা দরকার।

—সত্যি কথা বলছি, অভিদা সেরকম কিছু ঠিক করিনি। খানিকটা কনফিউজড অবস্থা বলতে পারো।

—তোকে আমার গল্পটা শোনাবার আগে জিগ্যেস করা হয়নি, তুই ধর্ম-টর্ম মানিস?

—তেমনভাবে মানি না, আবার উড়িয়েও দিতে পারি না। মন্দিরে-টন্দিরে মাথা ঠুকি না। কিন্তু সরস্বতী মূর্তি দেখতে ভালো লাগে।

—সেটা অন্য ব্যাপার। লিবিডোর ব্যাপার।

—আচ্ছা অভিদা, উত্তর কলকাতায় তোমাদের বাড়িতে নিত্য তিরিশ দিন রাধাগোবিন্দর পুজো হতে দেখেছি। ছেলেবেলায় আমরা প্রসাদও খেয়েছি। সেই বাড়ির ছেলে হয়ে তুমি নাস্তিক হলে কী করে?

—ওই মন্দিরটাই আসল কারণ। তুই জগদীশ্বর সেন-এর নাম শুনেছিস?

—জগদীশ্বর সেন...মানে যিনি ইতিহাসের বই লিখেছেন?

—হ্যাঁ।

—বেশ কয়েকটা বই লিখেছেন, তার মধ্যে একটা আমার দারুণ লেগেছে, 'টোটেম অ্যান্ড রিচুয়ালস,' এ-বইটার বাংলা অনুবাদ হওয়া উচিত।

—ওই জগদীশ সেন আমার জ্যাঠামশাই। কলকাতা ইউনিভার্সিটির কারমাইকেল অধ্যাপক ছিলেন। আমার বাবারা সাত ভাই, চার বোন। জ্যাঠামশাই সবচেয়ে বড়। বাড়ির তিনি একজন প্রধান শরিক। অন্য ভাইদের সঙ্গে তাঁর গণ্ডগোল লেগেছিল ওই রাধাগোবিন্দ মন্দিরের নিত্যপূজা নিয়ে। পড়ন্ত অবস্থায় বেশিরভাগ শরিকের কোনও রোজগার নেই। মন্দিরে প্রতিদিন দু-বেলা পুজো চালাতে তো খরচ আছে, কে দেবে। এ ওকে ঠেলাঠেলি করে। একদিন বড় জ্যাঠামশাই সবার সঙ্গে এক সঙ্গে খেতে বসেছেন, হঠাৎ প্রস্তাব দিলেন, 'মন্দিরের পুজো বন্ধ করে দাও। পঞ্চ ধাতুর বিগ্রহটা পুরোনো, ওটা দান করে দেওয়া হোক মিউজিয়ামে। মন্দিরটা অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে। এখন আমাদেরই ঘরে কুলোচ্ছে না, মন্দিরটা ভেঙে ওখানে অনায়াসে একটা তিনতলা বাড়ি উঠতে পারে। কিছু ভাড়া দিলে রোজগারও হবে।'

খাবার টেবিলে যেন একটা বাজ পড়ল। কতদিনের পারিবারিক ঐতিহ্য, সেই পুজো বন্ধ করার কেউ প্রস্তাব দিতে পারে? তার ওপর মন্দির ভাঙার কথা? এ যেন কানে শোনাও পাপ।

শুরু হয়ে গেল চিৎকার-চেঁচামেচি, বড় জ্যাঠামশাই আবার দৃঢ় গলায় বললেন, 'আগে যখন জমিদারি ছিল, তখনই এসব মন্দির গড়া হত। সব জমিদারই মন্দির বানিয়েছে, মন্দিরের খরচ চলত প্রজাদের শোষণ করা টাকায়। এখন জমিদারি উচ্ছন্নে গেছে, এখন আর নিজেদের মন্দির রেখে লাভ কী? বাইরে তো কত বারোয়ারি মন্দির আছেই।'

আমার ঠাকুমা তখন বেঁচেছিলেন। ঠাকুমা দারুণ ইন্টারেস্টিং ক্যারাকটার। তাঁর কথা তোকে পরে একদিন বলব। বড় জ্যাঠামশাইয়ের ওই কথা শুনে ঠাকুমা বললেন, 'জগু, তুই যদি আর-একবার ওইরকম কথা উচ্চারণ করিস, তাহলে আমি গলায় কাটারি দেব। আমি যতদিন বেঁচে আছি...'

বড় জ্যাঠামশাই বললেন, 'সে তুমি যাই বলো মা, এটাই আমার কথা। তোমরা যদি না মানো, আমি আমার বাড়ির অংশ বেচে দিয়ে চলে যাব।'

আমার তখন সতেরো-আঠরো বছর বয়েস। ওই যে তুই বললি না, কনফিউজড অবস্থা, আমারও সেই রকম। বড় জ্যাঠামশাইকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করতাম, কিন্তু তিনি এটা কী বললেন? অন্যরা যে বলছে, মন্দির ভাঙলে বংশনাশ হবে?

বড় জ্যাঠামশাই থাকতেন বাড়ির ডান দিকের তিনতলার অংশে। বড় জ্যাঠাইমা মারা গেছেন দু-বছর আগে, ওঁদের একটিমাত্র মেয়ে, আমাদের যমুনাদি, বিয়ের পর থাকে আলজিরিয়ায়। জ্যাঠামশাই একা হয়ে গেছেন। আমি দেখা করতে গেলাম তাঁর সঙ্গে।

বাড়ির ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বড় জ্যাঠামশাইয়ের বিশেষ ভাব ছিল না। এতগুলো ছেলেমেয়ে, সবার নামও জানতেন না বোধহয়। আমার মুখ চিনলেন অবশ্য। প্রথমে আমার দু-একটা প্রশ্ন শুনে উনি ঠিক পাত্তা দিলেন না, গম্ভীরভাবে বললেন, 'আমি যা বলব, তা তোমাকে মানতে হবে, এমন কোনও কথা নেই। তুমি যুক্তি দিয়ে বুঝতে শেখো।'

আমি খুব আন্তরিকভাবে জিগ্যেস করলুম, 'বড় জ্যাঠামশাই একটা ব্যাপার কিছুতেই বুঝতে পারি না। যুক্তি গুলিয়ে যায়। আপনি একটু বুঝিয়ে বলুন তো। ঈশ্বর বলে সত্যিই কি কেউ আছে না নেই?'

জ্যাঠামশাই আমার চোখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। মানুষটা বেশ লম্বা। ধারালো নাক, বয়েস হলেও মাথায় চুল কমেনি, চুল কপালের ওপর এসে পড়ে, তিনি কথা বলতে-বলতে চুল সরান। তীব্রভাবে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'হ্যাঁ আছেন। কোটি-কোটি মানুষ যাঁকে

বিশ্বাস করে, তাঁকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।'

উনি আবার বললেন, 'তবে ঈশ্বর মোটেই একজন নয়, কয়েকজন। এক-এক ধর্মের এক-এক ঈশ্বর। প্রত্যেক ধর্মের লোকই মনে করে, তাদের ঈশ্বর শক্তিমান। তিনিই বিশ্ব জগতের স্রষ্টা। চার-পাঁচজন সর্বশক্তিমান আর স্রষ্টা হয় কী করে। সুতরাং এই ঈশ্বরের কোনও বাস্তব অস্তিত্ব নেই। বিশ্বাসের ওপর যুক্তি চলে না।'

—হয়তো, একজনই আছে। বিভিন্ন ধর্মে তাঁকে আলাদা করে দেখা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলেছেন, যত মত তত পথ।

—ওটা কথার কথা। শ্রীরামকৃষ্ণ একজন সাধক, সমস্ত হিন্দুর ধর্মগুরু নন। অধিকাংশ হিন্দুই তাঁর এই কথা মানে না। তাঁকে অন্য ধর্মের লোকরা তো একেবারেই মানে না। তারা মনে করে, মতটাই ঠিক পথ ও একমাত্র পথ। অন্য ধর্মের লোকরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন। সারা পৃথিবীতে এখনও এরকম ধর্মীয় ভেদাভেদই চলছে।

—কিন্তু সব ধর্মেই তো কিছু মানুষ ঈশ্বর উপলব্ধির কথা বলেন। তাঁরা কি মিথ্যে কথা বলেছেন?

—তাদের সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই না। বলবে মনস্তাত্ত্বিক বা ডাক্তাররা। ধরে নেওয়া যাক, সত্যিই একজন ঈশ্বর আছেন। থাকলেই বা কী? মানুষের ভালো বা মন্দ, কিছু করার ক্ষমতাই তাঁর নেই। কলাগাছে মুলো ফলাবার ক্ষমতা তাঁর নেই। এইসব গাছপালা, জীবজগৎ তিনি সৃষ্টি করেননি, এর বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আছে।

—বিজ্ঞান কি একেবারে শেষ কথা বলে দিতে পারে? বড় জ্যাঠামশাই, অনেক বৈজ্ঞানিকেরও ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে, আমরা পড়েছি।

—বিজ্ঞান কখনও শেষ কথা বলতে পারে না। অনন্ত জিজ্ঞাসার নামই বিজ্ঞান। এখনও অনেক কিছু অজানা রয়ে গেছে মানুষের। হয়তো এরপর এমন কিছু আবিষ্কার হবে, যাতে এখনকার সব ধারণা আবার বদলে যাবে। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হতেও পারে। হোক না! একটা ব্যাপার এর মধ্যে অবধারিতভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে। একজন মানুষ যদি সারাজীবনেও কোনও ধর্মের আওতায় না থাকে, কোনও রকম আচার-অনুষ্ঠান না মানে, ঈশ্বর আছেন কি নেই, তা নিয়ে মাথাও না ঘামায়, তা হলেও সে সুস্থ, স্বাভাবিকক জীবনযাপন করতে পারে। অর্থাৎ ঈশ্বরকে তার জীবনে প্রয়োজন নেই, ঈশ্বরও তাকে ঘাঁটায় না। পৃথিবীতে এই ধরনের মানুষের সংখ্যা অনেক বাড়ছে। লোকে এদের বলে নাস্তিক। কথাটা ঠিক নয়। ঈশ্বর নিয়ে যে মাথাই ঘামায় না, তার চিন্তা নেগেটিভ হবে কেন, সেটা পজিটিভ।

আর বৈজ্ঞানিকদের কথা বলছিস? বিজ্ঞান নিয়ে যারা চর্চা করে, বিজ্ঞান যাদের পেশা, তারা সবাই বৈজ্ঞানিক নয়। অনেকের অনেক সংস্কার যায় না। কেউ-কেউ প্রকাশ্যে অস্বীকার করতে এখনও ভয় পায়। জিয়োর্দানো ব্রুনো, কোপারনিকাস, গ্যালিলিও এঁদের কী অবস্থা হয়েছিল মনে নেই? আইনস্টাইন খুব চালাক। তাঁকে একবার জিগ্যেস করা হয়েছিল, আপনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন কি না বলুন। আইনস্টাইন কায়দা করে বলেছিলেন, আমি স্পিনোজার ঈশ্বরকে মানি (স্পিনোজা না স্পিনোৎসা, কী উচ্চারণ হবে কে জানে?)। দার্শনিক স্পিনোজা বলেছিলেন, এই যে প্রকৃতির এত বিচিত্র সৃষ্টি, এই সৃষ্টির এমন নিয়মশৃঙ্খলা, এটাই ঈশ্বর, এর বাইরে আকাশে ঈশ্বর খোঁজার দরকার কী?

অভিদা একটুখানি থামলেন। মাছ ভাজা খেতে-খেতে আমরা অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলাম। আমার মাথায় অনসূয়ার কাহিনিটা ঘুরছে। ওই কাহিনির মধ্যে এখনও যেন অনেক না বলা কথা রয়ে গেছে।

একসময় আমি জিগ্যেস করলাম, অভিদা, অনসূয়া তোমাকে যে চিঠিগুলো লিখেছে, তা

আমাকে দেখাতে পারো? যদি তোমার আপত্তি না থাকে।

অভিদা বললেন, 'আপত্তির কী আছে? প্রথম দুটো চিঠি আমি রাখিনি, মুড়ে ফেলে দিয়েছিলাম। পরেরগুলো রেখে দিয়েছি। কেন ফেলিনি কে জানে? তুই পাশের লাইব্রেরি ঘরে গিয়ে দ্যাখ, টেবিলের ডান দিকের দেরাজে, একটা হলদে খামের মধ্যে।'

একটা টেলিফোন এল, অভিদা কথা বলতে লাগলেন, আমি পড়তে লাগলাম চিঠিগুলো। পরিষ্কার সাদা কাগজে লেখা। চিঠিগুলো ক্রমশ বড় হয়েছে, তাও বেশি বড় নয়, প্রথমটা তিন লাইন, শেষতমটি দশ লাইন। শেষের দিকে ব্যাকুলতা যেন বেড়েছে, অভিদার বিপদের চিন্তায় মেয়েটি খুব কাতর।

টেলিফোন করা শেষ হলে অমি জিগ্যেস করলাম, অভিদা, তুমি এই চিঠির কখনও উত্তর দিয়েছ?

অভিদা বললেন, উত্তর দেওয়ার তো কোনও প্রশ্নই ওঠে না। চিঠিতে নাম নেই। তা ছাড়া আশ্রমে চিঠি পাওয়ার কোনও নিয়ম আছে কি না, তাই বা কে জানে!'

—এগুলো পড়লে মনে হয়, মেয়েটি তোমাকে আসলে ভালোবেসে ফেলেছে। তুমি তা বোঝোনি?

—সেটা বুঝব না, আমি কি এতই গবেট? তুই কবিতা লিখিস বলে সব বুঝে ফেলবি? প্রেম বা এক ধরনের আকর্ষণ ওর হয়েছে তা ঠিকই। কিন্তু ও নিজে কি তা বোঝে? বোঝে না। ওর ধারণা, ও ক্ষমার আদর্শ প্রচারের জন্য প্রাণপাত করে যাচ্ছে।

তুমি কী করে জানলে যে ও বোঝে না? ওর সঙ্গে তোমার আর দেখা হয়েছে?

—হ্যাঁ, হয়েছে আর-একবার।

—আরে সেই কথাটাই বলোনি এতক্ষণ? কবে দেখা হল, কোথায়?

—দাঁড়া, কেন দেখা হল, সেটা আগে বুঝিয়ে বলা দরকার।

গেলাস শেষ করে অভিদা আবার ঢাললেন। সিগারেট ধরিয়ে ছড়িয়ে দিলেন ভাঙা পা-টা তারপর বলতে শুরু করলেন।

আমার যে মাঝে-মাঝে অসুখ হয়েছে কিংবা একটা-দুটো দুর্ঘটনায় পড়েছি, এগুলো একেবারে স্বাভাবিক ব্যাপার, আমি জানি। মানুষের জীবন বদলাবার কোনও ক্ষমতা যে ঈশ্বরের নেই, তার আমি মর্মে মর্মে প্রমাণ পেয়েছি অনেক ঘটনায়। সেসব আমি ডায়েরিতে লিখে এক সময় পড়তে দেব। ধর, গরিব বিধবার একমাত্র ছেলেটি যদি বিনা দোষে পুলিশের গুলিতে মারা যায়, তখন মনে হয় না, ঈশ্বরকে ঈশ্বরত্ব থেকে বরখাস্ত করা উচিত? কর্তব্যে চরম অবহেলা? অনেক ধর্মভীরু এই ঘটনার পরেও বলে কি জানিস, ওই বিধবার নিশ্চয়ই পূর্বজন্মে পাপ ছিল, তাই এ-জন্মে শাস্তি পাচ্ছে। প্রথমত পূর্ব জন্মটাই একটা ভুল ধারণা, আর সেই পাপে এ-জন্মে শাস্তি? যত্তসব গাঁজাখুরি ব্যাপার।

আমি ভুলে থাকতে চাইলেও আমার কিছু একটা ঘটলেই যে অনসূয়ার চিঠি আসে, সেটাও এক হিসেবে বিরক্তিকর। কেন আমি ওর জীবনবল্লভকে নিয়ে মাথা ঘামাতে যাব?

সে যাই হোক, গত বছর অন্যরকম একটা ব্যাপার হল। আমি বাচ্চাদের খুব ভালোবাসি। আমি আর বিয়ে করব না, আমার ছেলেপুলে হবে না, কোথাও আমার অবৈধ সন্তানও নেই, এটা বিশ্বাস করতে পারিস। কিন্তু বাচ্চাদের সঙ্গে সময় কাটাতে আমার খুব ভালো লাগে।

আমার মিউজিক হ্যান্ডসদের মধ্যে একজনের নাম রামরতন ঝাঁ। সে হারমোনিয়াম বাজায়। এখনকার অনেক গানেই তো আর হারমোনিয়াম লাগে না। সিন্থেসাইজারে কাজ চলে যায়। সেইজন্য বেচারির অবস্থা ভালো নয়। অনেক দিনের পরিচয়, এদের বাড়িতে মাঝে-মাঝেই যাই। রামরতনের মেয়ে সবিতা, তাকেও ছোট অবস্থায় দেখেছি, বড় হয়ে গেল, বিয়ে করল। বিয়ের ঠিক সাড়ে তিন

বছরের মাথায় তার স্বামী মারা যায় রাস্তায় ট্রাক চাপা পড়ে। সাইকেলে সে বাড়ি ফিরছিল, মাথাটা এমনভাবে পিষে যায় যে চিনতেও কষ্ট হয়েছে। সবিতা দু-বছরের একটা ছেলেকে নিয়ে ফিরে এল বাবার কাছে। ছেলেটার নাম পিন্টো, কী সুন্দর, লাভলি বাচ্চা, একদম কাঁদে না। সবসময় হাসে, চেনা-অচেনা নেই। আমার সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেল, গেলেই আংকেল-আংকেল বলে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে। আমারও এমন মায়া পড়ে গেল যে প্রত্যেকদিন ওকে দেখার জন্য মনটা কেমন করে। যতই কাজ থাক, দিনে একবার ওর কাছে গিয়ে কিছুক্ষণ খেলা করে আসি। সেই পিন্টোর হল টাইফয়েড, প্রচণ্ড জ্বর। অমন হাসিখুশি বাচ্চাটা বিছানায় শুয়ে কষ্টে ছটফট করে, সে দৃশ্য সহ্য করা যায় না। এখন টাইফয়েড এমন কিছু শক্ত অসুখ নয়। ঠিক করলুম, যেমনভাবে হোক, ওকে বাঁচাতেই হবে, রামরতন যেন টাকার জন্য চিন্তা না করে।

আমি গিয়ে ওর শিয়রের কাছে বসে থাকতুম। তবু পিন্টোর অবস্থা ক্রমশ খারাপ হতে লাগল। হঠাৎ একসময় আমার কী মনে হল জানিস। মানুষের সংস্কার কী সাংঘাতিক প্রবল। আমার মনে হল, আমাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য অনসূয়ার হিংসুটে ভগবান এই বাচ্চাটাকে মারতে চাইছে না তো? ঈশ্বরের অস্তিত্বে বদ্ধমূল অবিশ্বাস। তবু এরকম চিন্তা মাথায় আসে?

এমনকি, এ কথাও মনে হল, আমার অসুখের সময় অনসূয়া প্রার্থনা করে। অনসূয়া তো পিন্টোর অসুখের কথা জানে না। অনসূয়া প্রার্থনা করলে পিন্টোও সেরে উঠতে পারে? একবার অনসূয়াকে গিয়ে বলব?

আমারই যদি সব যুক্তি চলে যায়, তাহলে আমার চেয়ে যারা দুর্বল, তারা তো বারবার হার মানবেই। তোকে সত্যি কথা বলছি সুনীল, ওই সময়টায় আমার বারবার মনে পড়ত অনসূয়ার কথা। খুব ইচ্ছে করত, তার কাছে ছুটে যাই।

যাওয়া হয়নি। বলতে গেলে, আমার কোলে মাথা রেখেই পেন্টা মারা গেল। এমন ফুটফুটে সুন্দর মুখটা কী শুকনো, বিবর্ণ হয়ে গেল আমার চোখের সামনে। আমি কাঁদিনি, আমার রাগে ফেটে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। ডাক্তারদের ওপর ভরসা না রেখে শেষপর্যন্ত সবিতা কোন মন্দিরে যেন মাথা ঠুকতে গিয়েছিল। আমার ইচ্ছে করছিল, কালাপাহাড়ের মতন সবক'টা মন্দির ভেঙে দিই। পরের দিন সবটা রাগ পড়ল অনসূয়ার ওপর। তার ভগবান আমাকে মারতে না পেরে ওইটুকু শিশুকে মেরে প্রতিশোধ নিল, সে এত কাপুরুষ? অনসূয়া জানুক, বৈষ্ণবদের আরাধ্য ঈশ্বরও কত হৃদয়হীন হতে পারে।

অভিদাকে বাধা দিয়ে আমি বললাম, কিন্তু পৃথিবীতে অনেক শিশুই যে এভাবে মরে। আমাদের ব্যক্তিগত শোক হয় ঠিকই। কিন্তু চিকিৎসা সত্ত্বেও কে বাঁচবে আর কে বাঁচবে না, তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। তুমিই তো বলেছ, ভগবান বলে কেউ থাকলেও মানুষের মঙ্গল বা অমঙ্গলের ব্যাপারে তার কোনও ভূমিকা নেই।

অভিদা বললেন, তা ঠিকই কিন্তু ওই যে বললুম, পিন্টোর অসুখের সময় আমি এমনই কাতর হয়ে পড়েছিলুম যে যুক্তি-টুক্তি সব চলে গিয়েছিল। আমার ভেতরটা দাউদাউ করে জ্বলছিল। আমি আবার ছুটে গেলাম দুরানিগঞ্জে। কিছু-কিছু বাড়ি ওখানে খালিই থাকে। আগের বাড়িটা পাওয়া গেল না, অন্য একটা বাড়িতে উঠলুম, সেটা পাহাড়ের একটু নীচে দিকে। নদীটা স্পষ্ট দেখা যায়।

অনসূয়াদের আশ্রমে গিয়ে যে লণ্ডভণ্ড করা চলে না, এমনকি সেখানে অনসূয়ার সঙ্গে কথা বলাটাও ঠিক নয়, সেটুকু কাণ্ডজ্ঞান আমার ছিল। কিন্তু অনসূয়ার সঙ্গে দেখা করতেই হবে। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকি, দ্বিতীয় দিনে অনসূয়াকে দেখাও গেল, সঙ্গে আরও তিনটি মেয়ে, গান গাইতে-গাইতে যাচ্ছে। অনসূয়া এক পলক আমার দিকে তাকাল, যেন আমাকে চেনেই না।

তুই বললি, অনসূয়া আমার প্রেমে পড়েছে, এটা কী ধরনের প্রেম? একটা পাথরের মূর্তি গলায় মালা পরাবে, আমাকে দেখলে না-চেনার ভান করবে, আর দূর থেকে প্রেমপত্র লিখবে?

সে রাত্রে আমার ঘুমই এল না, বিছানায় ছটফট করলাম সারারাত।

পরদিন দুপুরবেলা রাস্তায় ওদের দলটাকে দেখতে পেয়েই আমি বাড়ি থেকে ছুটতে-ছুটতে চলে এলুম। হাঁটতে লাগলুম ওদের পাশে-পাশে। রাস্তা দিয়ে তো যে-কোনও লোক যেতেই পারে। কথা বলায়ও দোষ নেই। আমি আগে অন্য দু-একটি মেয়েকে নিরীহ কৌতূহলের সুরে জিগ্যেস করলুম, আপনারা কোন আশ্রমে থাকেন? আপনাদের উদ্দেশ্য কী? আপনারা কি গরবি-দুঃখীদের সেবা করেন? এইসব। ওরা উত্তরও দিয়েছিল। তারপর একসময় অনসূয়ার পেছন-পেছন গিয়ে, চাপা গলায় বাংলায় বললুম, অনসূয়া তোমার সঙ্গে আমার দেখা করার বিশেষ দরকার। তুমি যদি আমার বাড়িতে আসতে না চাও, নদীর ধারে বড় বটগাছটার তলায় এসো, বিকেল বা সন্ধের সময়...

বিকেল হতে-না-হতেই আমি গিয়ে বসে রইলুম নদীর ধারে। এই নদীতে সকালের দিকে অনেকে স্নান করতে আসে। বিকেলের দিকে মানুষজন বেশি থাকে না, তা ছাড়া একটু-একটু শীত পড়েছে। সেদিনটা আবার আকাশ মেঘলা হয়ে গেল। শীতকালেও তো মাঝে-মাঝে বৃষ্টি হয়। কী মুশকিল, বৃষ্টি হলে অনসূয়া আসবে কী করে?

ওই দিকটায় ওপর থেকে নামবার জন্য আর একটা সরু পাকদণ্ডি পথ আছে। আমি হাঁ করে সেই দিকে চেয়ে বসে রইলুম। একটার-পর-একটা সিগারেট পোড়াচ্ছি, কারুর জন্য এরকমভাবে অপেক্ষা করে থেকেছিস কখনও? থিয়োরি অব রিলেটিভিটির স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। পাঁচ মিনিটকে মনে হয় এক ঘণ্টা। ঘনঘন ঘড়ি দেখছি। আমি জীবনে কক্ষনও কোনও মেয়ের জন্য ওরকমভাবে প্রতীক্ষা করিনি। আমার একটা অহমিকা আছে, আমি মেয়েদের কাছে যাই না, তারা আমার কাছে আসে। অথচ সেই আমিই...

তা ছাড়াও, মনে হচ্ছিল, অনসূয়া আসবে তো? সে তো হ্যাঁ কিংবা না কিছু বলেনি। আশ্রম থেকে একা আসার অসুবিধে থাকতে পারে। যে-কোনও মুহূর্তে বৃষ্টি নামবে। এর মধ্যে কী অজুহাতে সে বেরুবে আশ্রম থেকে? কিংবা সে হয়তো আমার সঙ্গে আর দেখা করতেই চায় না। তাহলে আমি কী করব?

কতক্ষণ কেটে গেছে জানি না। আকাশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। তারই মধ্যে হঠাৎ এক সময় দেখি, ওপর দিকের রাস্তায় কী যেন একটা উড়ছে। অনেকক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি তো, দৃষ্টি বিভ্রম হতে পারে। সত্যিই মনে হল, একটা পাখি যেন নেমে আসছে। পাখি নয়, সে অনসূয়া নামছে দৌড়ে-দৌড়ে। আমার অত কবিত্ব নেই। তবু অনসূয়াকে পাখি বলেই মনে হতে লাগল। শীতের জন্য সে একটা চাদর জড়িয়েছে, সেই চাদরটা উড়ছে ডানার মতন। আমার মনে হল, এমন সুন্দর দৃশ্য আমি আগে কখনও দেখিনি!

আমার শরীর থেকে সমস্ত রাগ চলে গেল। আমি একদৃষ্টে দেখছি সেই মেয়েটিকে।

অনসূয়া কাছে এসে ঝপ করে বসে পড়ে ব্যাকুলভাবে বলল, আপনার কী হয়েছে? কী হয়েছে বলুন? আমি প্রার্থনা করব, আমি আমার আয়ু দিয়েও...

অনসূয়া ভেবেছে, আমার শক্ত কোনও অসুখ হয়েছে, তাই আমি জীবন বাঁচাবার জন্য ওর কাছে প্রাণভিক্ষা করতে এসেছি।

আবার আমার রাগে জ্বলে ওঠা উচিত ছিল। তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গবিদ্রূপে ওকে বিঁধতে পারতুম। প্রাণভিক্ষে করব আমি? অভিজিৎ সেন? ওর ভগবানের কাছে? তার আগে আমি থুতু ফেলে ডুবে মরব!

কিন্তু রাগ হল না, ওরকম কথাও এল না। একটি মেয়ে আমাকে তার আয়ু দিতে চায়। আমি ফস করে বলে ফেললুম, 'আমার সে সব কিছু হয়নি অনসূয়া, আমি এসেছি তোমাকে একটা বিশেষ কথা বলতে। তোমার মতন একটা নিষ্পাপ সরল মেয়ে, তাকে আমি জোর করে ছুঁয়েছি, এটা আমার অন্যায় হয়েছে। তুমি কী জন্য ঘর-বাড়ি ছেড়ে আশ্রমে যোগ দিয়েছ জানি না, তোমার

আগের জীবনে কী ছিল জানি না। আমি বলতে এসেছি, আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই!'

বিশ্বাস করো সুনীল, এটা বলে ফেলার আগের মুহূর্তেও আমি এটা ভাবিনি। জীবনে আর কখনও বিয়ে করব না, এরকম আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিল। কিন্তু অনসূয়াকে দেখে কী যেন হয়ে গেল, আমি বদলে গেলুম, আমি ওর হাত চেপে ধরে বললুম, অনসূয়া, আমি তোমাকে চাই। আমি তোমাকে যথাসাধ্য সুখী করার চেষ্টা করব। অন্যরকম জীবনযাপন করব, তুমি যদি মুম্বই শহরে না থাকতে চাও...

অনসূয়ার মুখখানা রক্তশূন্য বিবর্ণ হয়ে গেল। আস্তে-আস্তে বলল, 'এ কী বলছেন আপনি? আমার তো বিয়ে হয়ে গেছে।'

আমি বললুম, 'পাথরের মূর্তির সঙ্গে সত্যি কারুর বিয়ে হতে পারে? ওর কোনও মূল্য নেই! অনেক সন্ন্যাসীও তো সংসার জীবনে ফিরে আসে। তুমি ফিরে এসো!'

অনসূয়া বলল, 'তা কখনও হয়? তাতে আপনার বিপদ বাড়বে। না, না এমন কথা উচ্চারণও করবেন না। ছিছি-ছিছি। আমি যাই, চলে যাই!'

অনসূয়ার হাতটা শক্ত করে চেপে ধরে বললুম, 'তুমি আমার বিপদের কথা ভাবছ? অনসূয়া তোমার ঠাকুর আমাদের কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। তুমি আমার ওপর বিশ্বাস রাখো। এভাবে তোমার জীবনটা নষ্ট করার কোনও মানে হয় না। তোমাকে পেলে আমার জীবনটাও সুন্দর হবে।'

অনসূয়া কোনও কথাই শুনতে চায় না, সে আবার কান্না শুরু করল। চলে যেতে চায়, আমার হাত ছাড়িয়ে যেতে পারছে না। একসময় আমাকে হাল ছেড়ে দিতে হল, কিন্তু তখনও ওকে পাওয়ার ইচ্ছে আমার মধ্যে তীব্র। আমি ইচ্ছে করলে, সেইখানে ওকে জড়িয়ে ধরে ওকে ভোগ করতে পারতুম। আমি জানি, অনসূয়ার ইচ্ছে থাক বা না থাক, ও চিৎকার করে লোক জড়ো করত না। আমাকে শাস্তি দেওয়ার চেষ্টা করত না।

ওকে জোর করে বুকে টেনে আনতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে সংযত হয়েছি। সেটুকু বিবেক আমার এখনও অবশিষ্ট আছে। শরীর সম্ভোগকে আমি পাপ মনে করি না, কিন্তু ও করে। কেন ওকে কষ্ট দেব? ও আমাকে ওর আয়ু দিতে চায়, কিন্তু জীবনসঙ্গিনী হতে চায় না। এ কী ধরনের ভালোবাসা?

সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যে আমি সেদিন ওকে ভোগ করিনি, সেজন্য কেউ কি আমাকে প্রশংসা করবে? আমি একটা অন্যায় করলে আমাকে ছিছি করার লোক অনেক আছে। কিন্তু সেই নির্জন নদীর ধারে আমি যে অন্যায় ইচ্ছেটা দমন করতে পেরেছিলাম, সেজন্য কেউ আমাকে সাধুবাদ দেবে না।"

শেষের কথা

অভিদার সঙ্গে এর পর থেকে মাঝে-মাঝে আমার যোগাযোগ হত। কলকাতায় এলে আমাকে খবর দিতেন। অনসূয়ার সম্পর্কে আমার কৌতূহল যায়নি, কিন্তু ও প্রসঙ্গ তুললেই বলতেন, দূর-দূর ওর কথা আমি মন থেকে মুছে ফেলেছি।

অভিদার ক্যানসার। একজন গায়কের পক্ষে এর চেয়ে মর্মান্তিক আর কী হতে পারে?

খবরটা পড়েই আমি কেঁপে উঠেছিলাম। এই কি তবে অনসূয়ার ভগবানের চরম প্রতিশোধ? এবারে আর নিষ্কৃতি নেই!

পরক্ষণেই মনে হয়েছিল, আমারও সংস্কার যায়নি? ক্যানসার তো কত লোকেরই হয়। সেটাকে আমি ভগবানের অভিশাপ ভাবছি কেন? শ্রীরামকৃষ্ণেরও গলায় ক্যানসার হয়েছিল, তাঁকে কে

অভিশাপ দেবে? জন্ম-মৃত্যুরই মতন রোগভোগ প্রাকৃতিক ব্যাপার।

সেবার অভিদা যখন কলকাতায় এলেন, তাঁকে দেখে খুবই কষ্ট হল। এর মধ্যেই রোগা হতে শুরু করেছেন, গলার আওয়াজ ফ্যাসফেসে। কিন্তু তেজ যায়নি। হাসতে-হাসতে বলেছিলেন, 'সে মেয়েটা আবার চিঠি লিখেছে জানিস তো? না খেয়ে-দেয়ে প্রার্থনা করছে। এবার আর ওসবে কিছু হবে না। কাকতালীয়ও হবে না। সিগারেট, বুঝলি, সিগারেটই দায়ী।'

তারপর বললেন, 'জেনিভা যাচ্ছি, বুঝলি। অপারেশন করাব। টাকাপয়সা অনেক খরচ হবে, আমি আর টাকা নিয়ে কী করব? গলাটা না থাকলে বাঁচারই কোনও মানে হয় না। ডাক্তাররা বলছে ফিফটি-ফিফটি চান্স। হয় বাঁচব, গলা ঠিক হয়ে যাবে, নয়তো অপারেশন টেবিলেই ফুটে যাব! তোকে আমার ডায়েরিগুলো আর চিঠিপত্র পাঠিয়ে দেব। যদি কখনও সুযোগ হয়, লিখবে আমার কথা। আমি জীবন কাটিয়েছি নিজের ইচ্ছেমতন, ভগবান-টগবানের তোয়াক্কা করিনি। জীবনের প্রতি আমার বিশ্বাস পজিটিভ। আমি মরতেও যাচ্ছি স্বেচ্ছায়!'

বলতে গেলে একটা মিরাকলই ঘটিয়ে দিলেন অভিদা। জেনিভা থেকে সুস্থ হয়ে ফিরে এলেন। অপারেশন সাকসেসফুল। ছ'মাস বাদে আবার রেকর্ড করালেন নতুন গান। গলা নষ্ট হয়নি।

এত বড় জয়ের পরও কিন্তু বেশিদিন বাঁচেননি অভিদা।

নতুন জীবন ফিরে পাওয়ার আনন্দে আবার শুরু করেছিলেন উদ্দাম উৎসব। আবার আগের মতন মদ্যপান ও পার্টি। একটা পার্টিতে কোনও একটি অভিনেত্রীকে অপমান করার খবরও কাগজে ছাপা হয়েছিল। আমার ধারণা, জীবনে অনেক কিছু পেয়েছেন অভিদা, কিন্তু অনসূয়া-প্রত্যাখ্যান তিনি সহ্য করতে পারেননি। পাথরের বিগ্রহের প্রতি চ্যালেঞ্জ জানিয়ে জিতেছেন বারবার, তবু তার কাছ থেকে ছিনিয়ে আনতে পারেননি অনসূয়াকে।

মুম্বই শহর থেকে খানিকটা দূরে পানবেল নামে একটা জায়গায় একজন প্রোডিউসারের বাগানবাড়িতে মস্ত বড় পার্টি ছিল। সেখানেই আকণ্ঠ মদ্যপান করে মধ্যরাত্রের পর একা গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। গৃহস্বামী অনেক অনুরোধ করেছিল সেখানেই থেকে যেতে। কিন্তু ওই যে অভিদার জেদ? তাকে কে আটকাতে পারে!

এক জায়গায় রাস্তা সারাবার জন্য খানিকটা ঘেরা ছিল। সেখানেই দাঁড়িয়ে ছিল একটা রোড রোলার। অভিদা অন্ধকারে দেখতে না পেয়ে সোজাসুজি ধাক্কা মারেন। গাড়ি বেশ স্পিডে ছিল, হেড অন কলিশন যাকে বলে। বেশি যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়নি, সঙ্গে-সঙ্গে মৃত্যু।

অভিদা বলেছিলেন, মাটিতে আঁকা আলপনার মতো নয়, তাঁর জীবন উল্কার মতন। সেরকম জীবনের এরকম পরিণতিই তো স্বাভাবিক!

এটাও কি প্রতিশোধ? অনসূয়ার বিশ্বাসের ভগবান কখনও-কখনও বামন অবতার, কখনও নৃসিংহ অবতার হয়ে দুষ্টের দমন করেছেন। তিনি রোড রোলারের রূপও ধারণ করতে পারেন কি না জানি না!

অনসূয়ার সঙ্গে একবার দেখা করার খুব ইচ্ছে হয়েছিল। অভিদা যে-বারে জার্মানিতে স্টিমার থেকে বরফগলা নদীতে পড়ে গিয়েছিলেন, সে-বার তার মাথার চুল সব কেটে ফেলেছিল। এবারে অভিদার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে সে কী করেছে?

যাইনি। গিয়ে কী হবে? সে তো আমার প্রেমিকা নয়। আমাকে সে চিনতেই পারবে না।

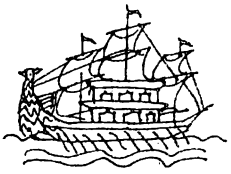

জেটিঘাট

তিনখানা খড়ের নৌকো লিজ নিয়েছে দানসা, আর ফেরিঘাটের টিকিট কাটে ওমর। দুজনে এক ছাউনির নীচে বসে।

দানসার খাটুনি বেশি, কারণ কারবারটা তার নিজের। এক সিজনের জন্য নৌকোগুলো সে লিজ নিয়েছে, এবার থেকে ওপারে খড় বোঝাই করে চালান দেয়। কখনও ইট কিংবা আলুর বস্তাও যায়। পাঁচজন মজুর খাটাতে হয়। নৌকোগুলোতে খড় কিংবা অন্য মাল বোঝাই করার সময় সে নিজেও হাত লাগায়, জোয়ারের সময় কোমরজলে নামতে হয়। নৌকোগুলো ছেড়ে গেলে সে ছাউনিতে বসে একটু জিরোয়।

ওমরের কাজ খুবই হালকা। নদী শান্ত থাকলে দিনে বড়জোর দুবার করে ফেরি যায়। তাও প্যাসেঞ্জার লঞ্চ নয়, বার্জ। গাড়ি, লরি, টেম্পো পারাপার করে। সরকারি ব্যবস্থা। কাছেই সমুদ্র, জোরে বাতাস বইলে এখানকার জলেও সমুদ্রের মতন ঢেউ ওঠে, তখন জেটির কাছে বার্জ ভিড়তে পারে না। সেই সময় পারাপার বন্ধ। ওমরের কাজ চুপচাপ বসে বিড়ি টানা। সেই ঢেউয়ের মধ্যেও দানসার নৌকোগুলো ঠিক চলে যায়, কাজ বন্ধ হলে তার ক্ষতি।

যখন বাতাস থাকে না, মেঘ থাকে না, তখন ঠাটা-পোড়া রোদ। সেইজন্য দানসা একটা ছাউনি বানিয়ে নিয়েছে। আলগা ইটের দেয়াল, ওপরে একটা তেরপল বেছানো, মেঝেতে খড় পাতা। রাত্তিরে এখানে শুয়ে থাকাও যায়।

একবার বার্জ ছেড়ে গেলে ফিরতে-ফিরতে দু-আড়াই ঘণ্টা লেগে যায়। তখন ওমর পা ছড়িয়ে নদীর দিকে চেয়ে বসে থাকে। মোহনার কাছাকাছি নদী, তাই সারা বছরই অতি জীবন্ত। ভাটার সময় নেমে যায় অনেকখানি, আর জোয়ারের সময় ছলাৎ-ছলাৎ করে ঢেউ একটু-একটু এগিয়ে আসে। কাদার ওপর গেঁথে যাওয়া নৌকোগুলোকে জিভ দিয়ে চাটে। জেটির ওপর জল লাফিয়ে উঠে আসে অনেকখানি।

নদী ছাড়া কিছু মানুষজনও দেখা যায়। কাছাকাছি দশ-বারোজন সকাল থেকে জাল পাতা আর জাল তোলার কাজে ব্যস্ত থাকে। আজকাল বাগদা চিংড়ির পোনার খুব চাহিদা। দামও ভালো পাওয়া যায়। প্রায় আলপিনের মতো সাইজ, তাও স্বচ্ছ, খালি চোখে বলতে গেলে দেখাই যায় না, সেই চারা-চিংড়িও এরা আজকাল ধরতে শিখেছে। অন্য মাছ ধরার আগ্রহ নেই কারুর।

নতুন জেটি হয়েছে। তাই নতুন বসতি, অন্য জায়গা থেকে জেলেরা এসে ঝুপড়ি বেঁধেছে এখানে। জলে নেমে যারা-যারা জাল পাতে, তাদের মধ্যে জনা-পাঁচেক স্ত্রীলোকও আছে। নামেই স্ত্রীলোক, বুক নেই, পাছা নেই, যেন শিল-নোড়ায় বাটা চেহারা, চাবুক খাওয়া মুখ। ওদের মধ্যে একমাত্র আমিনাই খানিকটা চলনসই, তাও আহামরি কিছু নয়। চোখ দুটো কুতকুতে, তবু মুখে একটা তেলতেলে ভাব আছে, আর উরুর গোছটা ভালো। সকালবেলা যখন কাদার মধ্যে নেমে নাইলনের লম্বা, বেড়াজালের খুঁটিগুলো বাঁধে আমিনা, তখন সে তার কস্তা ডুরে শাড়িটা গাছ-কোমর করে পরে থাকে। জোয়ার আসার পর জল একটু-একটু করে বাড়তে থাকে, আমিনাও তার শাড়িটা একটু-একটু উঁচুতে গুটিয়ে নেয়। পায়ের ডিম ছাড়ায়, হাঁটু ছাড়ায়, উরুর মাঝামাঝি পর্যন্ত উঠে যায়।

তারপর সে শাড়িটা আবার নামায়, একসময় তার বুক-জল হয়ে যায়। শাড়ি তার ভিজবেই, নদীতে নেমে জাল পাতবে অথচ পরনের কাপড় ভিজবে না, এ কখনও হয়? তা বলে প্রথম থেকেই সে শাড়ি না ভিজিয়ে উরু পর্যন্ত তোলে কেন? ওমর এ রহস্যটা বুঝতে পারে না।

প্যাসেঞ্জার লঞ্চের জেটি আলাদা, সেখানে লোকজন বেশি, কিছু দোকান পাটও আছে। লঞ্চ চালায় প্রাইভেট কোম্পানি, তারা যাত্রীবোঝাই করে লঞ্চ ছাড়ে, বেশি প্যাসেঞ্জার হয়ে গেলে এক্সট্রা ট্রিপ দেয়। আর এই বার্জের জেটিতে আসে শুধু কিছু লরি আর টেম্পো, কদাচিৎ দু-একখানা প্রাইভেট লরি। দশ-বারোজন জেলে-জেলেনী ছাড়া অন্য মানুষজন প্রায় দেখাই যায় না।

একখানা মারুতি ভ্যান গাড়ি জোরে চালিয়ে এসে সোজা চলে গেল জেটির শেষ প্রান্তে। গাড়ি থেকে নামল লাল গেঞ্জিপরা এক ছোকরা। জেটির গায়ে যাতে বার্জ বা লঞ্চের সরাসরি ধাক্কা না লাগে সেই জন্য কয়েকটা টায়ার বাঁধা আছে। সেইরকম একটা টায়ার ধরে লাফিয়ে বার্জটায় উঠে গেল ছোকরাটি। দূরের ছাউনিতে পা ছড়িয়ে বসে ওমর দেখছে। দানসা একটু আগে একটা খড়ের নৌকো বোঝাই করে ছেড়েছে, পরিশ্রম হয়েছে খুব, সে একপাশে এলিয়ে শুয়ে আছে খড়ের গাদায়।

লাল গেঞ্জিপরা ছোকরাটি আবার লাফিয়ে জেটিতে নেমে জোরকদমে এদিকে ফিরে এল। টিকিটঘর বলে কিছু লেখা নেই, ওদিককার প্যাসেঞ্জার ফেরির মতন এদিকে টিকিটঘরও নেই, সরকারি ব্যবস্থায় ওমরের শুধু একটা টুল পেতে বসে থাকার কথা, সেটাই অফিস।

ছোকরাটি এসে একশো টাকার একটা নোট বার করে বলল, গাড়ির জন্য কত লাগে, ষাট না আশি?

ওমর টাকার প্রতি কোনও আগ্রহ না দেখিয়ে গম্ভীরভাবে বলল, আজ আর যাবে না।

ছোকরাটি রীতিমতন চমকে গিয়ে বলল, যাবে না? কেন?

ওমর বলল, যাবে না, যাবে না!

ছোকরাটি এবার গর্জন করে উঠে বলল, ভালো করে মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলো! বার্জ জেটিতে লেগে আছে, অথচ তুমি বলছ যাবে না, তার মানে?

গর্জন শুনে একটুও বিচলিত হল না ওমর। অবজ্ঞার সঙ্গে গাল চুলকোতে-চুলকোতে বলল, জাহাজ থাকলেই যেতে হবে? সাড়ে বারোটায় বান আসবে। তখন ওপারের জেটি পুরো ডুবে যাবে। আপনার গাড়ি ওপারে গিয়ে নামাবেন কোথায়? মাঝ গঙ্গায়?

ছোকরাটির ক্রোধের সঙ্গে এবার মিশল বিস্ময়। হাতঘড়ি দেখে বলল, এখন এগারোটা দশ। ওপারে যেতে কতক্ষণ লাগে আমি জানি না? বড়জোর পঁয়তিরিশ মিনিট। বান আসার সঙ্গে কী সম্পর্ক আছে? আমায় টিকিট দাও!

—হবে না!

—তার মানে? টিকিট দেবে না?

—একখানা গাড়ি পার হয় না। পেছনে গিয়ে অপেক্ষা করুন, আরও অন্তত দুখানা গাড়ি না এলে জাহাজ ছাড়বে না।

—যদি আর গাড়ি না আসে?

—তাহলে যাবে না!

—অন্য গাড়ি আসতে-আসতে যদি বান এসে যায়?

—বলেছি তো যাবে না!

ছোকরাটি এবার অসহায়ভাবে এদিক-ওদিক তাকাল। তার অদম্য ইচ্ছে হচ্ছে এই শুকনো, ঢ্যাঙা লোকটার মুখে দুখানা ঘুসি কষাতে। কিন্তু তাতে তার সমস্যার সমাধান হবে না। সারেং-এর সঙ্গে সে কথা বলে এসেছে। সারেং-এর যেতে আপত্তি নেই, কিন্তু টিকিটবাবু টিকিট না দিলে

সে বার্জ ছাড়তে পারবে না।

ছোকরাটি এবার মেজাজ সামলে বলল, অন্য গাড়ি যদি না আসে...আমার খুব বিপদ হয়ে যাবে। আমাকে আজ ওপারে যেতেই হবে। ওমর পিচ করে একপাশে থুতু ফেলে বলল, একখানা গাড়ি নিয়ে জাহাজ ছাড়ার নিয়ম নেই, বললাম তো!

ছোকরাটি আরও অনুনয় করে বলল, একটু ব্যবস্থা করো। আমার বিশেষ দরকার। একজনের অসুখ। তুমি না হয় পুরো একশো টাকাই রাখো!

ওমর এবার খেঁকিয়ে উঠে বলল, কেন জ্বালাতন করছেন? অন্তত তিনখানা গাড়ি না হলে আমি টিকিট দেব না, ব্যাস!

ওমর পেছন ফিরে বসে বিড়ির বান্ডিল খুঁজতে লাগল।

ছোকরাটি সরে গেল এবার। অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগল জেটিতে। মাঝেমাঝেই রাস্তার দিকে তাকাচ্ছে। আর কোনও গাড়ির চিহ্ন নেই।

ওমর বিড়ি ধরিয়ে মিটিমিটি হাসছে।

দানসা সব শুনছিল। এবার সে জিগ্যেস করল, ভদ্রলোককে টিকিট দিলি না কেন রে?

ওমর বলল, একখানা গাড়ির জন্য জাহাজ ছাড়বে? মোটে আশি টাকা এক গাড়ি, আর কত টাকার ডিজেল পুড়বে তা জানিস?

দানসা বলল, ডিজেল পুড়বে তো গভর্নমেন্টের।

—আমি জেনেশুনে গভর্নমেন্টের ক্ষতি করব? কোম্পানিকা মাল দরিয়ামে ডাল?

—আরে, গভর্নমেন্ট কি লাভের জন্য ফেরি চালাচ্ছে? চালাচ্ছে মানুষের উপকারের জন্য। রেল নেই, বাস নেই, ব্রিজ নেই, মানুষ ওপারে যাবে কী করে? মালপত্তর নিয়ে গাড়ি যাবে কী করে? তাই গভর্নমেন্ট বিনালাভে এই ব্যবস্থা করেছে। পাঁচখানা গাড়িও যদি যায়, পাঁচ আশি হল গে চারশো, তাতেও কি এক ট্রিপের খরচ ওঠে? ডিজেল খরচ, সারেং, সাতজন হেল্পার...

—তবু গভর্নমেন্টের আইন আছে, মোটে একখানা গাড়ি হলে জাহাজ যাবে না।

—পরশুদিন তুই ব্রজেন সাহার লরি পার করালি। সেও তো মোটে একখানাই ছিল। ব্রজেনের সঙ্গে তোর খাতির আছে।

—বেশ করেছি। আমার ইচ্ছে। গভর্নমেন্ট আমাকে এখানে রেখেছে, আমি অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করব।

—সে তো ঠিক। এই বাবুটা বলল, ওর বড় বিপদ। দ্যাখ না কেমন ছটফট করছে।

—আরে রাখ! ঠেলায় পড়লে অমন বিপদের কথা সবাই বলে।

—শেষকালে তোর কাছে কাকুতি-মিনতি করল, দিয়ে দে না টিকিট। মানুষের উপকার হবে।

—দ্যাখ দানসা, এই লোকটার সঙ্গে যদি হাটে-বাজারে আমার দেখা হত, ভালো করে কথা বলত আমার সঙ্গে, আমাকে মানুষ বলে গ্রাহ্য করত; ভাবভঙ্গি দেখে বুঝলি না? প্রথমেই কেমন চ্যাটাং-চ্যাটাং কথা বলছিল!

এবার দানসা হেসে ফেলল।

সত্যি কথাই তো, এই জেটিঘাট থেকে উঠে গেলে, রাস্তায়, হাটে-বাজারে ওমর একজন অতিসাধারণ নিরীহ মানুষ। লম্বা, সিড়িঙ্গে চেহারা, একজন এলেবেলে গরিব। শুধু এই জেটিঘাটে বসে টিকিট দেওয়ার সময়েই তার যত তেজ। গাড়িওয়ালা বাবুদেরও সে ফিরিয়ে দিতে পারে। ওমর এই ক্ষমতাটা উপভোগ করে। ওই লাল গেঞ্জি গরা ছোকরা ওকে কুড়ি টাকা ঘুষ দিতে চেয়েছিল, অমর তাও নিল না, ওকে নিরাশ অবস্থায় ফিরিয়ে দিয়ে ওমর কুড়ি টাকার চেয়ে বেশি আনন্দ পেয়েছে।

দানসা তবু আবার বলল, আজ হাট বন্ধ। আজ আর গাড়ি আসবে না। বান ডাকার আগে

লোকটাকে পার করে দে না, ওমর। মানুষের উপকার করলে নিজেরও উপকার হয়। মনটা ঠান্ডা হয়।

ওমর বলল, আছে। এই শালারা নিমকহারাম হয়। আজ উপকার করব, কাল দেখবি এসে আবার চোখ রাঙাবে।

দানসা বলল, আহারে, দ্যাখ দ্যাখ, লোকটা বোধহয় এবার ভিরমি খেয়ে পড়বে। খুব দরকার না হলে...দে দে, একটা টিকিট দে।

ওমর এবার হাতছানি দিয়ে ছোকরাটিকে ডাকল। সে আগে থেকেই একটা কুড়ি টাকার নোট বার করে রেখেছিল, ঘুষের জন্য নয়, বিনা কারণে লোকটির উপকার করছে, এটা বুঝিয়ে দিয়ে টিকিটটা বাড়িয়ে বলল, এ্যান যান, দৌড়ে চলে যান।

লোকটা যে এতক্ষণ অনিশ্চয়তায় কষ্ট পেয়েছে, তাতেও ওমরের কম আনন্দ হয়নি। ছাউনির মধ্যে রান্নার কোনও ব্যবস্থা নেই, দুপুরের দিকে ওরা অন্য জেটিঘাটের হোটেলে খেতে যায়। একটা মুসলমানের হোটেল, অন্য হোটেলটায় সেরকম কিছু লেখা নেই। রাত্তিরের দিকে নিরিবিলি থাকে, তখন ওমর আর দানসা অন্য হোটেলটায় খায়, ওখানে রান্না ভালো, ম্যানেজারটা মজলিসি ধরনের। দিনেরবেলা যাত্রীদের খুব ভিড় থাকে, তাই ওখানে না গিয়ে ওরা মুসলমান হোটেলেই ঢোকে। এখানে খাবার একটু সস্তা, কিন্তু মালিকটা তিরিক্ষি মেজাজের, কোনও রান্না নিয়ে অভিযোগ করলেই সে দাঁত খিঁচিয়ে বলে ওঠে, না পোষায়, এসো না! কাছাকাছি আর কোনও মুসলমানের হোটেল নেই। ব্যাটা সেই সুযোগটা নেয়।

আটখানা করে রুটি, এক প্লেট শুকনো গোস্ত আর পেঁয়াজ দিয়ে ওরা খাওয়া সেরে নিল। ওমর দই নিল, দানসা দই খায় না।

দাম দিয়ে বেরিয়ে আসার পর পাশের দোকানের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে দানসা বলল, তোর আর আমার কাছ থেকে সমান পয়সা নিল কেন রে? তুই দই খেলি।

ওমর একগাল হেসে বলল, চেপে যা। ও শালা মালিকটা ভুলে গেছে। আমার আজ একটা টাকা লাভ।

দানসা বলল, ভুল করে দাম নেয়নি। এঃ হে, ওর ক্ষতি হয়ে গেল। দই তো ও বাজার থেকে কিনেছে। যা, ওমর, টাকাটা দিয়ে আয়।

ওমর চোখ কপালে তুলে বলল, ফেরত দিতে যাব? তোর মাথা খারাপ?

—দিবি না? দই খেয়েছিস, তার দাম দিবি না?

—ও নেয়নি কেন? সেটা আমার দোষ নয়। একদিন আমি সাতখানা রুটি খেয়েছিলুম, ও হিসেবে ধরেছিল ন-খানা। তোর মনে নেই? কিছুতেই আমার কথা বিশ্বাস করল না? চল্লিশ পয়সা বেশি নিয়ে নিল!

—ও ভুল করেছিল। তা বলে তুই জেনেশুনে ওকে ঠকাবি? একটা টাকার জন্য পাপ করবি?

—দ্যাখ দানসা, তুই শালা আমার বিবেক নাকি? সবসময় আমার পেছনে টিকটিক করিস কেন বল তো?

—তুই যদি নিজের থেকে টাকা ফেরত দিতে যাস, দেখবি ও যেমন অবাক হবে, তেমনি খুশি হবে। মানুষকে খুশি করার মতন পুণ্যি কি আর কিছুতে হয়? যা, যা। একটা টাকার তো মোটে মামলা।

ওমর আরও কিছুক্ষণ তর্ক করে। বিরক্তিতে তার কপাল কুঁচকে যায়। তবু সে একসময় দানসার কাছে হার মানে, হোটেলের কাউন্টারে গিয়ে একটা টাকা ছুড়ে দিয়ে আসে।

পান খেয়ে গল্প করতে-করতে হাঁটে দুজন। সরকারি জায়গায় অনেক ঝুপড়ি উঠে গেছে। আরও নিত্যনতুন গজাচ্ছে। কিছুদিন আগেও জায়গাটা ছিল ফাঁকা। শিগগিরই এটা একটা গঞ্জ হয়ে যাবে। দূর-দূর গ্রাম থেকে যে যেমন পারে জায়গা দখল করে নিচ্ছে। ওমর আর দানসারও দুটো জায়গা নেওয়া আছে, কিন্তু ঘর তোলেনি। এখানে সংসার পাতার কথা এখনও ভাবেনি। ওমরের নতুন চাকরি, আর দানসা তার কারবারে এখনও বিশেষ লাভের মুখ দেখেনি।

একটা ঝুপড়ির বাইরে আমিনা এঁটো-কাঁটা খাওয়াচ্ছে কুকুরকে। এখন একটা শুকনো শাড়ি পরেছে, চুল আঁচড়াচ্ছে। সকালবেলা যখন জলে-জলে থাকে, তখন একে অন্যরকম দেখায়। ডিজেল হাঁড়ির মতন গায়ের রং, নাকটা বোঁজা, তবু মেয়েটার একটা কিছু চটক আছে।

সবাই এখানে নতুন এসেছে, কেউ কারুকে ভালো করে চেনে না। আমিনাদের ঝুপড়িতে থাকে এক বুড়ো আর একটা ষোলো-সতেরো বছরের ছেলে। ছেলেটা ওর ভাই আর বুড়োটা ওর স্বামী। একটা পিঠ-ব্যাঁকা বুড়োর সঙ্গে কেন ওর বিয়ে হল কে জানে! বুড়োটা মাঝেমাঝেই খকখক করে কাশে। তবু তার তেজ আছে, আমিনাকে বকে প্রায়ই, ভাইটাকেও বকে।

ওমর ভাবল, এই আমিনাকে সুযোগ বুঝে একদিন অন্য কেউ খাবে। বিয়ে হয়ে গেলেই যে সে স্ত্রীলোককে অন্য কেউ খাবে না, তার কোনও মানে নেই। অন্তত এখানে ওসব নিয়ম খাটে না। বুড়োর যুবতী স্ত্রী, তার ওপর কেউ না কেউ ভাগ বসাতে চাইবেই। এখন কথা হচ্ছে, কে আগে খাবে!

ওমরের শরীরটা চনমন করে ওঠে।

দানসা তার কাঁধে হাত রেখে বলল, ওই আমিনার দিকে নজর দিস না যেন!

ওমর দারুণ চমকে গিয়ে বন্ধুর দিকে তাকাল।

দানসা আবার বলল, ওর ভাইটাকে দেখেছিস তো, খুব গোঁয়ার। বয়েস কম হলে যা হয়, শরীরে তাগদ আছে। আর বুড়োটার নজরও খুব সরু। দেখিস না, আমিনাকে কারুর সঙ্গে কথা বলতে দেয় না!

ওমর বলল, আমার নজর দিতে ভারী বয়ে গেছে।

দানসা বলল, গভর্নমেন্টের চাকরি পেয়েছিস, তোর আর চিন্তা কী? এবার বিয়ে-শাদী কর।

ওমর ঠোঁট ওলটাল। মাইনে তিনশো চল্লিশ টাকা। ওই টাকায় সংসার হয়? আগে কিছু জমুক।

দানসা বলল, ডাগর ডোগর দেখে বউ আনবি, তাকে দিয়ে কাজ করাবি। পানিতে নেমে মাছ ধরতে শিখলেই টাকা আসবে। মেয়েছেলেরা এই কাজ ভালো পারে। তারপর কাচ্চা-বাচ্চা হবে। আল্লা দোয়া করবেন। নিজের ছেলেপুলে না হলে পুরুষমানুষের মন শান্ত হয় না।

ওমর বলল, রাখ, ও কথা রাখ!

আমিনা মেয়েটি সত্যিই কম কথা বলে। কারুর সঙ্গে মেশে না। সামনাসামনি চোখাচুখি হলে মুখ ফিরিয়ে নেয়। কিন্তু শাড়ি ভেজাতেই হবে, তবু কেন সে অল্প জলে উরু পর্যন্ত শাড়ি গুটিয়ে রাখে, এটাই ওমর বুঝতে পারে না।

কয়েকটা দিন একঘেয়ে যাওয়ার পর ওমর ছটফটিয়ে উঠল। কারুর ওপর সে ব্যক্তিত্ব ফলাতে পারছে না, কারুর কাকুতি-মিনতি অগ্রাহ্য করার আনন্দ পাচ্ছে না। আজ আবার বন্‌ধ। ডায়মন্ডহারবারে কী যেন গণ্ডগোল হয়েছিল কাল, তার জন্য সারা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা বন্‌ধ। এই ফেরিঘাটের সঙ্গে ডায়মন্ডহারবারের ঝঞ্ঝাটের কোনও সম্পর্ক নেই। তবু ভয়েই আজকাল সবাই দোকানপাট বন্ধ করে দেয়। প্রাইভেট কোম্পানির প্যাসেঞ্জার লঞ্চ চলবে না, হোটেলেও ঝাঁপ ফেলা।

শুধু বার্জ সার্ভিস চালু রাখার কথা, কারণ সেটা সরকারি। যদি গাড়ি আসে পারাপারের জন্য। সে সম্ভাবনা খুবই কম।

জেলেরা বন্‌ধ-হরতাল মানে না। তারা সবাই জলে নেমেছে। ওমর জেটিঘাটের মাঝখান পযন্ত হেঁটে গেল। আমিনা আর অন্য দুটি স্ত্রীলোক সেখানে জাল ছড়াচ্ছে। সবাই জালের একটা দিক জেটির সঙ্গে বাঁধে।

ওমর গম্ভীরভাবে বলল, এই এখানে থেকে জাল সরাও! জাল সরাও!

মেয়েরা অবাক হয়ে তাকাল। প্রতিদিন জাল বাঁধা হচ্ছে, এরকম কথা কখনও শোনেনি। ওমর বলল, জাল সরাও! হাঁ করে দেখছ কী?

একটি স্ত্রীলোক বলল, কেন? জাল খাটাব না কেন?

ওমর বলল, এটা সরকারের সম্পত্তি। এখানে জাল বাঁধার কে হুকুম দিয়েছে?

স্ত্রীলোকটি ঠিক বুঝতে না পেরে বলল, নদীর পানি সরকারের সম্পত্তি? মাছ ধরা যাবে না?

ওমর ধমক দিয়ে বলল, কোথাকার উজবুক হে! নদীর পানি সরকারের, তা কি আমি বলেছি? এত বড় নদী যেখানে ইচ্ছে মাছ ধরো গে, কে বারণ করেছে? এই জেটির সঙ্গে বাঁধা চলবে না। আমার জাহাজ যাওয়া-আসার অসুবিধে হয়। খোলো, খোলো!

সবাই জেটির সঙ্গে জালের একটা দিক বাঁধে। তারপর পরপর খুঁটি চলে যায় অনেকদূর পর্যন্ত। জেটির মতন একটা মজবুত খুঁটি তো আর হয় না। এখন সব খুলে আবার বাঁধতে হবে? স্ত্রীলোকেরা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে এ ওর চোখের দিকে তাকায়। আমিনা শুধু জলের দিকে চেয়ে থাকে।

অন্য জেলেরা কাছাকাছি চলে আসে। আমিনার স্বামী আর ভাইও আসে। কেউ-কেউ তর্ক জুড়ে দেয়। কিন্তু ওমর অনড়। সে সরকারের প্রতিনিধি, সরকারের সম্পত্তি সে অন্যদের ব্যবহার করতে দেবে না।

খানিকক্ষণ তর্কের পর বেশ মেজাজ দেখিয়ে ওমর বলল, অত কথা কীসের? নিজেরা খুলবে, না আমি খুলে দেব?

সত্যিই সে একটা জালের দড়ি খোলার জন্য টান মারে।

দানসা একটা নৌকোয় খড় বোঝাই করছিল। সেও বন্‌ধ মানেনি। একটা নৌকো তো ওপারে যাক। ওদিকের বাবুরা যদি আটকায়, তাহলে সে আর অন্য নৌকো ছাড়বে না আজ।

গোলমাল শুনে কোমরজল ঠেলে-ঠেলে জেটির কাছে এসে সে জিগ্যেস করল, কী হয়েছে?

আমিনার স্বামী বলল, জেটিতে জাল বাঁধা যাবে না বলছে।

দানসা ওমরের দিকে তাকাল।

ওমর যুক্তি দেখিয়ে বলল, এরা সব জাল বেঁধে রাখে। আমার জাহাজ যাওয়া-আসার অসুবিধে হয়।

একজন জেলে বলল, জাহাজ লাগার সময় তো আমরা জাল খুলে দিই। জাহাজের চাকা লাগলে জাল ছিঁড়ে যাবে।

ওমর বলল, হ্যাঁ, জাল খুলে নাও, কিন্তু কখন খোলো? জাহাজ কাছে এসে ভেঁপু মারে। তার আগে তোমাদের হুঁশ হয় না। ভেঁপু শুনে তারপর তোমরা জাল খুলতে শুরু করো। তাতে আমাদের টাইম নষ্ট হয়। গভর্নমেন্টের টাইমের বুঝি দাম নেই? অ্যাঁ?

দানসা বলল, হ্যাঁ, সেটা ঠিক কথা। সরকারের টাইমের দাম আছে। কিন্তু জেলেদের যাতে সুবিধে হয়, সেটাও তো দরকার দেখবে। জাহাজ তো দুবার মাত্তর আসে যায়। সারাদিন জেটি খালি পড়ে থাকে। জেটিতে জাল বাঁধলে জেলেদের সুবিধে হয়, ঠিক কিনা? সরকার তো সেটাও দেখবে?

—তবে ওরা জাহাজ আসবার আগে-আগে জাল খুলে নেয় না কেন?

—সেটাও ঠিক। ওগো, জাহাজ যখন ওপার থেকে মাঝ নদী পেরুবে, তখন জাল খুলতে শুরু করবে। হিসেব করে। পারবে না?

অনেকেরই এই সমাধান মনোমতন হল।

ওমর এবার সবার মুখের দিকে তাকাল। মুখের ভঙ্গিটা উদার হয়ে গেল। বিচারের রায় দেওয়ার সুরে সে বলল, ঠিক আছে, তাহলে আমি পারমিশান দিতে পারি। কিন্তু মনে থাকে যেন, ঠিক সময়ে...।

এই খুদে সাম্রাজ্যের সম্রাটের মতন ধীর পা ফেলে ওমর ফিরে যায় নিজের ছাউনিতে। পরম তৃপ্তির সঙ্গে বিড়ি ধরায়।

দুপুরবেলা একটা কাণ্ড ঘটল।

চতুর্দিক নিস্তব্ধ, নদীর ওপর হা-হা করছে বাতাস, একটাও নৌকো চলছে না। খড়ের ওপর চিত হয়ে শুয়ে আছে দানসা আর ওমর। একজনের ঘুমঘুম ভাব, অন্যজন বিড়ি টেনে যাচ্ছে। এমন সময় দরজার কাছে এসে দাঁড়াল আমিনা। কলাপাতা চাপা দেওয়া একটা ডেকচি নামিয়ে রাখল মেঝেতে।

ওমর তড়াক করে উঠে বসে বলল, ওটা কী? কলাপাতাটা উঠিয়ে দিল আমিনা। এক ডেকচি ভরতি ভাত, তার ওপরেই একপাশে লট্‌কা মাছের চচ্চড়ি।

মৃদুস্বরে আমিনা বলল, আজ তো হোটেল বন্ধ।

দানসার গ্রামের বাড়ি সতেরো মাইল দূরে, আর ওমরের বাড়ি বসিরহাট। একদিনের ছুটিতে ওমরের বাড়ি যাওয়ার চাড় অনুভব করে না। আর ওমরের তো ঠিক ছুটিও নয়। কিন্তু তারা হোটেলে খায়, বন্দের দিনে তাদের আহার জুটবে কী করে? সে কথা কেউ ভাবে না। দানসা একছড়া কলা কিনে রেখেছে, তাই খেয়ে খিদে মেটাবে। ওমর কিছু ভাবেইনি।

দানসা বলল, হোটেল বন্ধ বলে তুমি আমাদের জন্য ভাত নিয়ে এসেছ? তোমায় কে পাঠাল?

আমিনা কোনও উত্তর দিল না।

দানসা আবার বলল, তুমি কী ভালো মেয়ে গো! আমরা দুটো মদ্দ এখানে না খেড়ে পড়ে আছি, তুমি ঠিক নজর করেছ?

ওমর ভাবল, কার কথা বেশি ভেবে খাবার এনেছে আমিনা? দানসাটা কি মনে করছে ওর জন্য? দানসা আজ ওদের হয়ে ওকালতি করছিল, সেইজন্য? গাধা আর কাকে বলে! উকিল বড়, না হাকিম বড়? আমিনারা বুঝেছে যে ওমরকে খাতির না করলে এই জেটির ধারে মাছ ধরা যাবে না।

আমিনা বলল, আমি পরে এসে বাসনটা নিয়ে যাব।

দানসা বলল, আমি ধুয়ে পৌঁছে দেব। তোমাকে আসতে হবে না।

ওমর ফস্ করে বলল, তোমরা তো রোজ রান্না করো, আমরা চাল কিনে দিলে দুটো ভাত ফুটিয়ে দেবে?

দানসা অবাক হয়ে ওমরের দিকে তাকাল। ওমর বলল, ওরা রেঁধে দিলে আমাদের আর রোজ-রোজ হোটেলে খেতে হয় না। আমরা পয়সা দেব। চাল-ডাল কিনে দেব।

দুজনেই তাকাল আমিনার দিকে। আমিনা মাথা হেলিয়ে বলল, হ্যাঁ, দেব না কেন?

এরপর থেকে ভালো ব্যবস্থা হয়ে গেল। দানসা আর ওমরকে হোটেলে যেতে হয় না। আমিনা কিংবা তার ছোটভাই এসে খাবার দিয়ে যায়। ওমর আর দানসা পালা করে বাজার করে আনে। আমিনার স্বামীও খুশি, কারণ ওমর ওদের দই খাওয়ায়। বুড়ো দই খেতে খুব ভালোবাসে।

আমিনা এখনও বেশি কথা বলে না বটে, কিন্তু মাঝে-মাঝে স্থির দৃষ্টিতে মুখের দিকে তাকায়। সেই দৃষ্টির সঠিক ভাষা ওমর বোঝে না, কিন্তু তার শরীর ঝনঝন করে। তার তুলনায় দানসা ওদের

পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা পাতিয়েছে বেশি। দানসা মাঝে-মাঝে আমিনাকে রান্নাবান্নায় সাহায্য করে। মজার কথা বলে। আমিনার ভাইটা তার বেশ ন্যাওটা।

এক-একদিন আমিনা বিকেলের দিকে কোথায় যেন যায়। একটু সেজেগুজে। ওমরের পছন্দ হয় না। এখান থেকে বাজার সাত মাইল দূরে। ওমর আর দানসার একটা ভাগাভাগির সাইকেল আছে। আমিনা কি বাজারে যায়? ভাইটাকে পাঠালেই তো পারে। ওমরের সন্দেহ হয়, আমিনা যেন অন্য কারুর মুখগহ্বরের দিকে এগোচ্ছে! তাহলে ওমর নয় কেন?

দানসা অবশ্য প্রশংসা করে খুব আমিনার। মেয়েটার স্বভাব-চরিত্র ভালো, এদিক-ওদিক চায় না। যাত্রী ফেরিঘাটের লোকজনের সঙ্গে ফচকেমি করে না। মাছের পাইকারদের সঙ্গে দরাদরিতে সে ওস্তাদ, কিন্তু ওরা অন্য কোনওরকম সুবিধে নিতে পারে না।

সকালবেলা পুরো জোয়ার আসার আগে আমিনা প্রতিদিন উরু দেখায়। ওমর এক-একদিন জেটির মাথায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, আমিনা তবু লজ্জা পায় না। ওমরের মাথায় আগুন জ্বলে। দানসার কথা মতন যদি ভালো মেয়েই হয়, তাহলে উরু ঢেকে রাখে না কেন?

একদিন বিকেলবেলা আমিনার স্বামী হঠাৎ খুব বমি করতে লাগল। প্রথম কয়েকবার কেউ তেমন খেয়াল করেনি। একসময় জেটির ওপর উঠে এসে নেতিয়ে পড়ল একেবারে। মনে হল চোখ উলটে যাচ্ছে। নির্ঘাত কলেরা। প্যাসেঞ্জার লঞ্চ চলে গেল এইমাত্র। ফিরতে-ফিরতে অন্তত আরও দেড় ঘণ্টা। ওদের একটা লঞ্চ আজ খারাপ। নদীর জলে খুব টান আছে। নৌকোয় যেতে অনেক সময় লেগে যাবে। অথচ বুড়োকে এক্ষুনি ওপারে নিয়ে যাওয়া দরকার। সাগরদ্বীপে চালু হেল্‌থ সেন্টার আছে। সেখানে ওর চিকিৎসা হতে পারবে।

বার্জে দুটো লরি আর তিনটে ভ্যান চেপেছে। ছাড়বে এক্ষুনি। আমিনার ভাই সারেংকে অনুরোধ করেছিল তার দুলাভাইকে নিয়ে যাওয়ার জন্য, কিন্তু সারেং কলেরা-রোগী তুলতে রাজি নয়।

এগিয়ে এল ওমর। সারেংকে ডাকল। গম্ভীরভাবে বলল, মনে করো, আমার বাপের কলেরা হয়েছে, তুমি তাকে নিতে না?

সারেং তো-তো করতে লাগল।

ওমর একজন খালাসিকে ডেকে বলল, গণেশ, ওপারে নিয়ে গেলেই শুধু চলবে না, ওরা হেল্‌থ সেন্টার চেনে না। ওখানে পৌঁছে দিবি।

গণেশ জিজ্ঞেসা করল, ওনার সঙ্গে আর কে যাবে?

আমিনাই যেতে চায়। সে বুড়োর মাথা কোলে নিয়ে বসে আছে। কিন্তু ওমর বলল, তোমার যাওয়া ঠিক হবে না। তোমার ভাই যাক। একজন পুরুষমানুষ সঙ্গে থাকলে সুবিধে হয়।

ভাই-বোন দুজনেই চলে গেলে আমিনাদের ঘর কে দেখবে? এখানে চোরের খুব উৎপাত। বুড়োর সঙ্গে আমিনার ভাইটাকে পাঠানো ঠিক হল। বার্জে উঠে ওমর নিজে বুড়োকে শুইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করল।

বার্জ এবার ছাড়বে। সারেং ওমরকে চুপিচুপি জিগ্যেস করল, আজ কি আবার ফিরতে হবে? একেবারে কাল সকালে ওদিককার গাড়ি নিয়ে চলে আসতাম? রাত্রে ওখানে আমার একটা কাজ ছিল।

ওমর কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করল। ভোরবেলা এখান থেকেই প্রথম গাড়ির ফেরি ছাড়ার কথা। কিন্তু একদিন দেরি হলে ক্ষতি কী? সন্ধের পর প্যাসেঞ্জার লঞ্চ বন্ধ। বুড়োকে হেল্‌থ সেন্টারে ভরতি করে আমিনার ভাইটা যদি ফিরতে চায়, কিসে ফিরবে? ফেরার কী দরকার? ওপারে এই জাহাজেই রাত্রে শুয়ে থাকতে পারবে। খালাসিরা ওকে বাইয়ে দেবে।

ওমর সারেংকে বলল, ঠিক আছে, ফিরতে হবে না।

তার মানে, আজ রাতে আমিনা একা থাকবে। আজ সেই রাত। আজই বুঝতে হবে আমিনার

উরু খুলে রাখার রহস্য।

এর মধ্যেই অন্ধকার হয়ে গেছে। জেটি পার হয়ে এসে একটা দৃশ্য দেখে ওমর থমকে গেল। আমিনার কাঁধে হাত দিয়ে, প্রায় তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে নিয়ে যাচ্ছে দানসা। ঢুকে গেল আমিনাদের ঝুপড়ির মধ্যে।

দাঁতে দাঁত ঘষে ওমর বলল, শালা হারামি। কিন্তু এখন ওমর ওখানে যেতে পারে না। সে নিজেদের ছাউনিতে বসে গরজাতে লাগল। ধ্বংস করতে লাগল বিড়ির-পর-বিড়ি। হারামজাদা দানসাটার সঙ্গে আজ থেকে সম্পর্ক শেষ। কাল থেকেই ওমর নিজের জায়গাটায় একটা ঘর তুলতে শুরু করবে।

এক-একটা মিনিট যেন এক-এক ঘণ্টা। ওমর মাঝে-মাঝে বাইরে এসে উঁকি মারছে। চাঁদ ওঠেনি। আকাশ অন্ধকার। কোথাও মানুষজন নেই। আমিনাদের ঝুপড়িতেও কোনও সাড়াশব্দ নেই। ওখানে কী করছে দানসা?

কতক্ষণ কাটল, এখন কত রাত?

এক সময় আমিনাদের ঝুপড়ির ঝাঁপ ঠেলে দানসা বেরুতেই ওমর সেদিকে ছুটে গেল। দানসার হাতে হাত চেপে ধরে টানতে-টানতে নিয়ে এল নিজেদের ছাউনির দিকে।

দানসা বলল, ব্যবস্থা করে এলুম, ফতি এসে রাত্তিরে আমিনার ঘরে শোবে।

রাগের চোটে তোতলাতে লাগল ওমর। সে বলল, শালা...আমি ওদের পাঠিয়ে দিলাম, তুই, তুই আমার আগে, তুই আমিনাকে, তুই ওকে...

দানসা একগাল হেসে বলল, আমি যে তোর বিবেক!

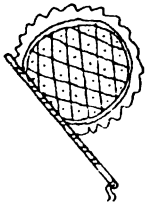

অলীক নগরী

শেষরাত্রি, ভোর আর সকালের মধ্যে ঠিক কতটা যে পার্থক্য তা অনুভব করেছি জীবনে ক'দিন? ভোর খুব সুন্দর, তার স্মৃতি আছে, কবিতায় বর্ণনা করতে পারি, কিন্তু অধিকাংশ দিনই ঘুম ভাঙে কটকটে রোদ ওঠার পর।

খবরের কাগজ আসে সাতটা দশে, সেটা সকাল। তার একঘণ্টা আগে ভোর। তা বলে পৌনে পাঁচটা নিশ্চয়ই শেষরাত্রি; এইরকম ধারণা ছিল। হঠাৎ মধ্য-সেপ্টেম্বরে একদিন অসময়ে জেগে উঠলুম। সাধারণ চোখ মেলে পাশ ফেরা নয়। চোখ একেবারে ঘুমশূন্য, কে যেন আমাকে ডেকে বলল, বাইরে এসো!

পাজামা ছেড়ে দ্রুত জাঙ্গিয়া, প্যান্ট, শার্ট পরে, রবারের চপ্পল পায়ে গলিয়ে ব্যস্তভাবে নেমে এলুম সিঁড়ি দিয়ে। যেন আমার কোনও জরুরি অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।

পুবের আকাশে সূর্য নেই, কিন্তু লেবু-রঙের আলো ফুটে উঠেছে। তা হলে এটা শেষ রাত্রি, না ভোর? ব্রাহ্ম-মুহূর্ত বলে একটা গাল-ভরা শব্দ ছেলেবেলায় শুনেছি।

এরই মধ্যে রাস্তায় বিভিন্ন বয়েসি পুরুষ বেরিয়েছে, স্ত্রীলোকেরা আছে, টাটকা সবজিভরতি ঠেলাগাড়ি ছুটছে প্রাণপণে। আমি না জাগলেও প্রত্যেক দিন এই সময়ের মধ্যেই শহর জেগে ওঠে? এত মানুষ! মন্দিরের মতন কাঁসর বাজিয়ে একটা ট্রাম ঠিক আমার সামনে এসে দাঁড়াল। আমারই

জন্য এই ট্রামটা এইমাত্র এখানে এল, তাতে সন্দেহ কী? উঠে পড়লুম।

আমার পকেটে গত দিনের দু-খানা দু-টাকার লাল নোট। নতুন টাকা পয়সা নেওয়ার কথা মনে পড়েনি। কন্ডাক্টর আসতেই তার দিকে বাড়িয়ে দিলুম একটি নোট, সে জিগ্যেস করল, পার্ক স্ট্রিট?

কেন নিজের থেকে বলল ওই কথা? আমাকে অন্য কোনও মানুষ বলে ভুল করেছে? তা হলে আমাকে পার্ক স্ট্রিটেই যেতে হবে। কন্ডাক্টরটির গালে মেহেদি লাগানো কমলা রঙের দাড়ি।

এত সকালে কে পার্ক স্ট্রিট যায়?

ট্রামটা এত জোর ছুটছে যেন মাঝখানে অন্য কোথাও থামবে না। এই সময়ে ফুটপাতে অনেক ফুল পড়ে থাকে।

পার্কসার্কাসের মোড়ে নেমে আমি হাঁটতে লাগলুম পুরোনো কবরখানার পাশ দিয়ে। আমি ছাড়া আর কোনও যাত্রী এখানে নামল না কেন? ফুটপাথে লাগানো হয়েছে নতুন কয়েকটা ফুলের গাছ। একটি ভিখিরি পরিবার এরই মধ্যে কাঠের আগুনে রান্না চাপিয়েছে। খিচুড়ির গন্ধ। এত ভোরে ওরা খায়? একটি কিশোরী এক গোছা জ্যাকোরান্ডা ফুল ছিঁড়ে এনে দিয়ে দিল সেই ফুটন্ত খিচুড়ির মধ্যে। তার মা খলখল করে হেসে উঠল।

কেমন স্বাদ হয় ওই খিচুড়ির? ওর মধ্যে আরও কী কী দেয়? ভোরবেলা কবরখানার পাশের জীবন্ত মানুষরা যে এমন আনন্দে থাকে, তা তো জানতুম না!

এ পাশের ফুটপাথ দিয়ে একজন দীর্ঘকায় কালো রঙের লোক একটা সাদা রঙের লোমশ কুকুর নিয়ে যাচ্ছে চেন বেঁধে, জার্মান স্পিৎস। অন্যদিকে একজন গাউন পরা মহিলা টান-টান করে ধরে রেখেছে একটা চকচকে কালো রঙের কুকুর, ল্যাব্রাডর না, ককার স্প্যানিয়েল? দু-জাতের কুকুর পরস্পরকে সহ্য করতে পারে না। তারা ফুঁসে-ফুঁসে ডেকে উঠছে, মহিলা ও পুরুষটিও রাস্তার দু-পাশ থেকে চোখাচোখি করছে এক এক বার। এই স্নিগ্ধ ভোরেও তাদের চোখে ঝলসে উঠছে ক্রোধ।

আমার পাশ দিয়ে চারজন সাপুড়ে গেরুয়া কাপড় দিয়ে বাঁধা বেতের ঝুড়ি ঝুলিয়ে চলে গেল। পেছন দিকে তাকিয়ে দেখি আরও চারজন, তাদের মধ্যে দু-জন কিশোর প্রায়। এত সাপুড়ে একসঙ্গে? সত্যিই এরা সাপুড়ে? ভোরবেলা সাপুড়েদের মিছিল? সারারাত এরা কোথায় থাকে?

কিছু-কিছু মানুষ সটান ঘুমিয়ে আছে ফুটপাথের ওপর। তারা সবাই ভবঘুরে বলে মনে হয় না। একটি দোকানের সিঁড়িতে পেছন ফিরে শুয়ে আছে একজন, তার জুতোজোড়া বেশ দামি মনে হয়।

শুধু কিছু কাক ডাকছে, আর কোনও পাখির স্বর শুনতে পাচ্ছি না।

একটি গাছতলায় ন্যাকড়া পেতে, তার ওপর একটা ছোট বাক্স রেখে বেশ পরিপাটিভাবে বসেছে একজন নাপিত। আমাকে দেখে সে মুচকি হেসে হাতছানি দিয়ে ডাকল।

আমি নিজে দাড়ি কামাই। রাস্তার নাপিতের কাছে উবু হয়ে বসে গালটা বাড়িয়ে দেওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। এই লোকটা পার্ক স্ট্রিটেও খদ্দের পায়?

লোকটিকে অগ্রাহ্য করে চলে যাচ্ছিলুম আবার ডাকল। যেন সে আমাকে কোনও গোপন কথা বলতে চায়।

সে আঙুল তুলে গাছের ওপরটা দেখিয়ে বলল, একটা হনুমান!

এটা অশত্থ গাছ। ডগার দিকে সত্যিই একটা হনুমান বসে আছে, তার গলায় একটা হলুদ রঙের কলার। সে একটা ডাল দোলাচ্ছে।

আমিও নাপিতটির সঙ্গে হাসি বদল করলুম। এটা একটা দেখার মতন দৃশ্যই বটে।

হঠাৎ হনুমানটি তরতর করে নেমে এল গাছ থেকে। আমি একটু ভয় পেয়ে দেয়াল সেঁটে দাঁড়ালুম। হনুমানটি ধীরে-সুস্থে রাস্তা পার হতে গিয়ে মাঝখানে ট্রাফিক পুলিশের জায়গায় একবার

দাঁড়াল। এদিক-ওদিক চেয়ে খুব জোরে ছুট লাগাল, এখন কী তীব্র তার গতি, লাফাতে-লাফাতে ঢুকে গেল একটা গলির মধ্যে।

নাপিতটি পকেট থেকে একটা বিড়ি বার করে বলল, দেশলাই আছে, স্যার?

আমি লাইটারটি তার হাতে না দিয়ে মুখের সামনে জ্বেলে দিলুম কৃতজ্ঞ ভঙ্গিতে। সেই ধোঁয়ার গন্ধে আমার গলাটা আনচান করলেও চা খাওয়ার আগে আমি ধূমপান করি না।

অবিকল যেন আমার মনের কথাটি বুঝতে পেরেই সে বলল, আর একটু এগিয়ে দেখুন, চা পাবেন।

তার কথার সুর শুনে মনে হয়, যেন সে আমার বাবা-ঠাকুরদাকেও চেনে!

কালো কুকুর সমেত গাউন পরা মহিলাটি তাড়াতাড়িতে ব্রা না পরেই বেরিয়েছে। এরকম তো হতেই পারে। ভোরবেলা কে আর সাজগোজ করে। কিন্তু মহিলাটির ঠোঁটে চড়া লিপস্টিক। একটু ঝুঁকলেই তার বর্তুল স্তনদ্বয় দোলে। এখন রাঙা আলোয় তার মুখখানা রক্তিম। কালো, লম্বা লোকটিও দাঁড়িয়ে পড়ছে উলটোদিকের ফুটপাথে, হিরের মতন তার চোখ দুটো জ্বলছে।

একটু দূরে, ফুলছাপ শাড়ি-পরা একটি আদিবাসী রমণী চাপাকলে পোড়া কয়লা ধুচ্ছে। উরু পর্যন্ত ভিজে গেছে তার শাড়ি। সে আপন মনে কয়লা ধুয়েই চলেছে। ওই কয়লায় সে ক'পয়সা পাবে? লোকে বলে, পার্ক স্ট্রিটে নাকি কোটি-কোটি টাকা রোজ ওড়ে?

এখন এখানে টাকা পয়সার কোনও গন্ধ নেই।

মধ্যশিক্ষা পর্ষদের মোড়টার কাছে গোল হয়ে বসেছে সেই সাপুড়েরা। গেরুয়া কাপড়ে জড়ানো তাদের বাঁশিগুলো খুলছে। এই ভোরে এখানে এত সাপুড়ে বসেছে কেন?

আমার মতন আরও তিনজন লোক দাঁড়িয়ে পড়ে শুনছে তাদের বাঁশি। একজন পাঠান, তার গায়ের জামাটা হাঁটু পর্যন্ত ঝোলা। অবশ্য সে সত্যিই পাঠান কি না তা আমার জানার কথা নয়। তবে ওই রকমই মনে হয়। একজন প্রৌঢ় সাহেব, সম্ভবত অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, একজন লুঙ্গি পরা মুসলমান, তার মাথায় একটা ডিম ভরতি ঝুড়ি।

অ্যাংলো ইন্ডিয়ানটি বিড়বিড় করে বলল, ওয়েইট আ মিনিট। দে' ল ক্যাচ আ স্নেক।

এই সাহেবটি প্রত্যেক ভোরবেলা এখানে সাপ ধরা দেখতে আসে নাকি?

উলটোদিকে একটা বাচ্চাদের পার্ক। বাগানটিকে ঝোপ জঙ্গলও বলা যায়। ওই বাগানে সাপ আছে নাকি? খুব খারাপ কথা! সকালবেলা আমার সাপ দেখার একটুও ইচ্ছে নেই।

সাপুড়েদের বাঁশির শব্দ ও হাতের ভঙ্গিতে আমারও মাথা দুলছিল। সাপধরা দেখার জন্য আমি আর অপেক্ষা করতে চাইলুম না।

পেট্রল পাম্পের ভেতর থেকে একটি শিশুর কান্নার আওয়াজ। শিশুটিকে দেখা যাচ্ছে না। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের পাশ দিয়ে ধীর মন্থর পায়ে এগিয়ে আসছে একটি মোষ, চকচক করছে তার কালো গা। তার শিং দুটো সাদা রং করা। ওই রংটুকু না থাকলে মনে হত, সে এইমাত্র কোনও জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসেছে।

একটি দুটি গাড়ি যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে।

ছোট একটা মরিস মাইনর গাড়ি এসে থামল ফুটপাথ ঘেঁষে। ধুতি পাঞ্জাবি পরা এক সম্ভ্রান্ত প্রৌঢ় নামলেন সেই গাড়ি থেকে, তার মুখ নাক অনেকটা অহীন্দ্র চৌধুরীর মতন। ধুতির কোঁচটা হাতে নিয়ে তিনি সাপুড়েদের বললেন, বাজাও, ভালো করে বাজাও!

যেন তিনি বিলায়েত খাঁ-র সেতার বাজনা উপভোগ করতে এসেছেন।

পাঠানটি অকস্মাৎ মোষটির দিকে তাকিয়েই দৌড়তে শুরু করল। কিন্তু সে মোষটিকে ধরতে গেল না, সে মিলিয়ে গেল উলটোদিকে।

ডিমওয়ালাটি আমার কাছে এসে বলল, বাবু, দেশলাই আছে?

এক সকালে পরপর নাপিত ও ডিমওয়ালা একই সুরে আমার কাছে আগুন চাইছে কেন?

আমি বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়ে থামলুম নিলামের দোকানটার সামনে। লোহার গেট টানা, গেটের ওপাশে সিঁড়ির ওপরে একটা ব্রোঞ্জের বুদ্ধের মুণ্ডু। ভেতরে না রেখে এই মূর্তিটা সিঁড়ির ওপরে বসানোর মানে কী? প্রতিদিন দোকান খোলার সময় এটাকে সরাতে হয়। দোকানদাররা কি বুদ্ধকে পাহারাদার হিসেবে রেখে যায়?

একটা নীল রঙের বেলুন উড়তে-উড়তে আসছে। নিঃসঙ্গ, দূরের যাত্রীর মতন। আজকের আকাশ মেঘলা। কেন যেন আমার ধারণা ছিল, প্রত্যেকদিনই ভোরের সময় আকাশ নীল থাকে। ওই বেলুনটা ছাড়া আর কোনও নীলের চিহ্নমাত্র নেই। কিছু মেঘ এখন সোনালি, কিছু বেশ ধূপের গন্ধ দেওয়া, নর্তকীর চুলের মতন। ঈশান কোণ কোন দিকে?

লম্বা, কালো লোকটি এবং গাউন পরা মহিলাটি এখন দুই কুকুর নিয়ে এক ফুটপাথে। দুটো কুকুরই গজরাচ্ছে। কুকুরে কুকুরের মাংস খায় না, আলাদা জাতের কুকুর সচরাচর প্রেমও করে না, তবু ওরা দেখা হলেই তেড়ে ঝগড়া করতে যায় কেন?

কুকুর নিয়ে যারা বেড়াতে বেরোয়, সাধারণত তাদের হাতে একটা ছোট লাঠি থাকে। এদের দু-জনেরই হাত শূন্য। কালো লোকটির বুকের বোতাম সব খোলা, গোরিলার মতন লোমশ বুক। কিন্তু তার ঝকমকে দুই চোখের মাঝখানে টিকোলো নাক। সে অলিমপিকের খেলোয়াড়দের মতন সুপুরুষ।

মহিলাটি তার কুকুরের চেনটা ছেড়ে দিল।

সঙ্গে সঙ্গে সেই কালো রঙের কুকুর ঝাঁপিয়ে পড়ল সাদা কুকুরের ওপর। প্রবল ঘেউ-ঘেউয়ের সঙ্গে উলটে-পালটে যাচ্ছে দুটিতে। লম্বা লোকটি কোনও বাধা দিল না। সে হাসছে। সে শিস দিয়ে বলল, মেক লাভ, নট ওয়ার!

সঙ্গে-সঙ্গে ঝনঝন করে খসে পড়ল একটা দোকানের সাইনবোর্ড।

লম্বা, ঢোলা জামা পরা পাঠানটি দৌড়োতে-দৌড়োতে ফিরে এসে থমকে গেল। সাইনবোর্ডটি তুলে নিল যত্ন করে। তাতে আইসক্রিম হাতে একটি বালিকার ছবি আঁকা। পাঠানটি লম্বা, লাল জিভ বার করে সেই বালিকার গালটা চেটে দিল, তারপর সাইনবোর্ডটা দেওয়ালে দাঁড় করিয়ে সে ছুটল আবার।

কুকুরদুটি ঝগড়া থামিয়ে পরস্পরের নাক শুঁকছে।

লম্বা লোকটি মহিলাকে জিগ্যেস করল, হোয়াটস ইয়োর ফোন নাম্বার?

সাপুড়েদের বাঁশি এখান থেকেও শোনা যাচ্ছে। ওরা কি এখনও সাপ ধরতে পারেনি?

নীল বেলুনটা মাঝ রাস্তায় দুলছে।

ডোরাকাটা জাঙ্গিয়া পরা একজন চীনেম্যান বেরিয়ে এল একটা বন্ধ রেস্তোরাঁ থেকে। অনেকখানি হাঁ করে সে মুখের মধ্যে আঙুল চালিয়ে কী যেন খুঁজতে লাগল। তারপর বার করে আনল একটা সোনার দাঁত। সেটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে হাতেই রেখে দিল।

এবার সে একটা গান শুরু করল। মুখে সোনার দাঁত থাকলে যে গান গাওয়া যায় না, এই সহজ ব্যাপারটা এতদিন বুঝিনি।

পাশের গাড়ি বারান্দাটায় পাশাপাশি সাতজন লোক কলাগাছের মতন উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। যদিও কলাগাছের উপুড় বা চিৎ কিছু হয় না, তবু এরকমটা মনে হয়। একটু দূরে লাঠিতে জড়ানো পতাকার মতন একজন স্ত্রীলোক। তার পাশ-ফেরা মুখখানিতে ঘাম মাখা, তাঁর ঠোঁটের হাসিতে একটু-একটু স্বপ্ন লেগে আছে।

সাইলেন্সার পাইপ ছাড়াই একটা গাড়ি প্রবল শব্দ করে চলে গেল। কিন্তু সেদিকে কেউ ভ্রূক্ষেপও করল না।

স্ত্রীলোকটির পাশে একজন রুখু দাড়িওয়ালা লোক উঠে বসে খড়ি দিয়ে মাটিতে অঙ্ক কষছে। আমি উঁকি দিয়ে দেখলুম, অঙ্ক নয়, ছক কাটা, সে জ্যোতিষের চর্চা করছে মন দিয়ে! তার হোমওয়ার্ক। একটা ছক শেষ করে সে আর একা ছক আঁকল। তার কাছেই দুটো ক্রাচ রাখা। লোকটির ডান পা, না বাঁ-পা, কোনটা জখম? ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

যে চীনেম্যানটি সোনার দাঁত হাতে নিয়ে গান গাইতে শুরু করল, তার কি একটা চোখ পাথরের?

একটা তালাবন্ধ ঘরের মধ্যে কারা যেন কথা বলছে।

একটা নয়, দুটো তালা, পেতলের।

মোষটা এই পর্যন্ত এসে গেছে। রাস্তার মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে সে গাঁ-গাঁ করে ডেকে উঠল দু-বার। ওকি রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে? কেউ কি ওর শিং-এর সাদা রং ধুয়ে-মুছে দিতে পারে না; তা হলে ও জঙ্গলে ফিরে যেতে পারত।

সাদা ও কালো কুকুর দুটো পাশাপাশি যাচ্ছে। ওদের মালিকেরা কোথায় গেল? অন্যদিকে আর-একজন গোলগাল লোকের সঙ্গে দুটি অ্যালসেশিয়ান, তারা এদের গ্রাহ্যই করছে না। গোলগাল লোকটির পাজামার ওপর ফতুয়া পরা। মাথায় একটাও চুল নেই। লোকটি মোষটাকে দেখে খুবই বিরক্ত হয়ে লুঃ-লুঃ করে উঠল। কিন্তু তার পোষা কুকুর তার প্ররোচনা উপেক্ষা করে সামনের দিকেই এগিয়ে যেতে লাগল আপন মনে।

বেলুনটা কি উড়ে গেল একেবারে, আর দেখতে পাচ্ছি না!

রঙিন পাউডারের মতন মিহি বৃষ্টি শুরু হয়েছে। এই বৃষ্টিতে গা ভেজে না। বাতাসের সঙ্গে খেলা করে।

দুটি বামন অনেক দূর থেকে হেঁটে আসছে। আগে তাদের বালক মনে হয়েছিল। কিন্তু বেশ হৃষ্টপুষ্ট, বেশ খর্ব মানুষ, তারা হেসে গড়াগড়ি যাচ্ছে এ-ওর গায়ে। তাদের কোনও কথা শুনতে পাচ্ছি না। একজনের হাসির উত্তরে অন্য জন হেসে উঠছে আরও জোরে। ওদের হাসির একটা ভাষা আছে। সে ভাষা আমি বুঝি না। কিন্তু ওরা যেন একটা গোপন খুশির বন্যা তুলে দিয়েছে। এত আনন্দ কী থেকে পাচ্ছে ওরা!

সাপুড়েদের বাঁশির সুর ক্রমশই তীব্র হয়ে উঠছে। সাপ কোনওরকম সুর, গান, শব্দই নাকি শুনতে পায় না! ওদের এই বাঁশি বাজানো তাহলে সাপ ধরার জন্য নয়? ওরা এখানকার মানুষদের ওই বাঁশির সুর শুনিয়ে রোজ জাগায়!

আমি এক জায়গায় চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়লুম। হঠাৎ কেন এসেছি এই রাস্তায়? শহরের শ্রেষ্ঠ অংশে। অথচ কিছুই চিনতে পারছি না। দিনের বেলা এই রাস্তাটা একেবারে অন্যরকম হয়ে যায়, সেটাই কি এর সত্য রূপ? অথবা দিনের বেলাতেই খুব অবাস্তব, অদ্ভুত সেজে থাকে নাকি?

গাউন পরা মহিলাটি ও কালো পুরুষটি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল? কুকুর দুটো খেলা করছে, কালো ও সাদা, সাদা আর কালো। ঠিক যেন দুটো ঢেউ।

মাথায় কী যেন একটা লাগতেই চমকে উঠলুম।

সেই নীল বেলুনটা। কখন নেমে এসেছে, আমার গালে আর চুলে আদর করছে। তা হলে এই বেলুনটার সঙ্গেই আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল!

বেলুনটার গায়ে লেখা, ওয়েল কাম!



দশ বছর আগে পরে

প্রথমে মনে হয়েছিল পুরো ব্যাপারটাই হাস্যকর। একটা লঘু ভুল। কিংবা কারও রসিকতা। সকাল ন'টা। প্রতিদিন এই সময় ইন্দ্রনাথ বসু তানপুরা নিয়ে রেওয়াজ করেন ঘণ্টা দু-এক। তিনি রাতচরা পাখির মতন ঘুমোতে যান তৃতীয় প্রহরে, তাই ভোরবেলা ওঠা হয় না। ভোরবেলা গলা সাধার পক্ষে প্রশস্ত, এটাই প্রথাসিদ্ধ।

এই সময় ইন্দ্রনাথ কোনও বহিরাগতের সঙ্গে দেখা করেন না। তাঁর স্ত্রী কৃষ্ণা ছাড়া বাড়ির অন্য কেউ আসতে সাহস করে না তাঁর ঘরে। চা-ও খান না, শুধু এক গেলাস কাঁচা বেলের সরবত।

কৃষ্ণা দু-বার কিছু বলতে চেয়েছিল, ইন্দ্রনাথ হাত তুলে থামিয়ে দিয়েছেন। তিনি আলাহিয়া বিলাবল রাগে তান ধরেছেন, এ-সময় মনঃসংযোগ নষ্ট করলে চলে না।

একবার সরবতের গেলাসে একটু চুমুক দেওয়ার জন্য থামতেই কৃষ্ণা মুখ বাড়িয়ে বলল,—লোকটাকে পাগল মনে হচ্ছে।

ইন্দ্রনাথের ভুরু কুঁচকে গেল। সকালবেলা পাগল-সমাচার।

কৃষ্ণা আবার বলল,—যতবার বলছি দেখা হবে না, ততবারই বলছে, তোমার সঙ্গে দেখা না করে যাবে না। ভেতরে ঢুকতে দিইনি, ঠায় দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে। আমাকে কিছু বলতে রাজি নয়।

ইন্দ্রনাথ বললেন,—আমি সাড়ে ন-টার আগে উঠছি না। ততক্ষণ যদি দাঁড়িয়ে থাকতে চায় থাক।

এইটুকু কথা বলার জন্যই তাঁর মনটা খানিকটা চঞ্চল হয়ে গেল।

মিনিটকুড়ি পরেই তিনি উঠে পড়লেন।

দরজার বাইরে নয়, লোকটিকে এখন বসানো হয়েছে ভেতরে। প্যান্ট-শার্ট পরা সাধারণ চেহারার যুবক। নিশ্চয়ই জল খেতে চেয়েছিল। গৃহস্থবাড়িতে কেউ খাবার জল চাইলে তাকে দরজার বাইরে জল দেওয়াটা খুবই অশোভন।

যুবকটির দিকে একঝলক তাকিয়েই ইন্দ্রনাথ বুঝে গেলেন, এ তাঁকে কোনও ফাংশানে আমন্ত্রণ জানাবার জন্য আসেনি। তিনি উচ্চাঙ্গ সংগীতের গায়ক, সাধারণ জলসায় তাঁর ডাক পড়ে না। যারা তাঁকে ডাকে তাদের চেহারা অন্যরকম হয়।

এখন বাথরুমের কমোডে বসে ইন্দ্রনাথের কাগজ পড়ার সময়।

তিনি লম্বা-চওড়া পুরুষ, ইদানীং পঞ্চাশ বছর বয়েস হয়ে যাওয়ার পর শরীরটা একটু ভারীর দিকে ঝুঁকছে।

ছেলেটির সামনে দাঁড়িয়ে তিনি জিগ্যেস করলেন,—কী বলবে, বলো। অনেকক্ষণ এসেছ শুনলাম।

ছেলেটিকে দেখে পাগল বলে মনে করার কোনও আপাত কারণ নেই। কৃষ্ণা কেন সেরকম ভেবেছে কে জানে। মুখ নীচু করে সে লাজুকভাবে নখ খুঁটছে। কোনও উত্তর দিল না।

ইন্দ্রনাথ আবার জিগ্যেস করলেন,—মানে, ঠিক বুঝতে পারছি না, মানে, স্যার আপন...

ছেলেটি বাক্যের মাঝখানে থেমে যেতেই ইন্দ্রনাথ ভাবলেন, নিশ্চয়ই কিছু সাহায্য চাইতে এসেছে। এরকম আসে মাঝে-মাঝে। কোনও গ্রাম্য গায়ক কোথাও একটা সুযোগ করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানায়।

ছেলেটি এবার মুখ তুলে বলল,—স্যার, আপনি আমার জামাইবাবু।

ঠিক শুনতে না পেয়ে কিংবা বুঝতে না পেরে তিনি বললেন,—কী?

ছেলেটি আবার বলল,—আপনি আমার জামাইবাবু।

ইন্দ্রনাথ সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে বললেন,—তাই নাকি? তুমি আমার শালা? সে-কথা আগে বলোনি কেন?

তিনি হাঁক দিলেন—কৃষ্ণা, কৃষ্ণা, একবার শোনো তো!

কৃষ্ণা আসতেই তিনি কৌতুক করে বললেন,—এ তোমার ভাই, তুমি চিনতে পারোনি? এই শালাবাবুটিকে তো আমি আগে দেখিনি।

কৃষ্ণা ইন্দ্রনাথের চেয়ে তেরো বছরের ছোটো। এখনও তন্বী ও রূপসি। একসময় ইন্দ্রনাথের গানের ছাত্রী ছিল, এখন গান ছেড়ে দিয়ে দুই ছেলেমেয়ে নিয়েই নিমগ্ন।

কৃষ্ণা কিছু বলার আগেই ছেলেটি আবার বলল,—ইনি নন, আপনি আমার নিজের দিদিকে বিয়ে করেছেন।

এবার অট্টহাসি করে উঠে ইন্দ্রনাথ বললেন,—আর একটা বিয়ে? এই এক বউকেই সামলাতে পারি না। তোমার দিদিকে আমি কবে বিয়ে করলাম ভাই?

গত মাসে!

গত মাসে? তা কোথায় বিয়েটা হল? তোমাদের বাড়ি কোথায়?

আমাদের বাড়ি কামালগাজি। বিয়েটা হয়েছে পুরীতে।

এবারে একটা সোফায় বসে পড়ে গলা তুলে বললেন,—রতন, আমার চা-টা এখানে দিয়ে যা।

ছেলেটিকে তিনি বললেন,—আমার ইচ্ছে থাকলেও, একজন বউ বেঁচে থাকতে তো আর একটা বিয়ে করা যায় না। আর আমি দশ বছর পুরী যাইনি। তুমি ভাই ভুল জায়গায় এসেছ।

কৃষ্ণা দুষ্টুমি করে বলল,—কেন দুটো বিয়ে করা যাবে না? কেউ-কেউ তো লুকিয়ে দিব্যি বিয়ে করে। হিন্দি ফিল্মের কোন নায়ক যেন...। কাগজেও তো মাঝে-মাঝেই পড়ি।

ইন্দ্রনাথ বললেন,—তারা কি আমার মতন আসল বউকে এত ভয় পায়?

কৃষ্ণা বললেন,—আহা-হা!

ইন্দ্রনাথ ছেলেটিকে জিগ্যেস করলেন,—তোমার এই জামাইবাবুটির নাম কী?

ছেলেটি বলল,—ইন্দ্রনাথ বসু।

—তিনি কি করেন?

—গান করেন স্যার।

—বটে! জানতাম না, আমার নামে আর-একজন গায়ক আছে। তুমি বিয়ের সময় সেখানে ছিলে? তুমি তাকে দেখেছ?

—বিয়ের সময় ছিলাম না, কিন্তু ফটো দেখেছি। দিদির সঙ্গে পুরীর মন্দিরের পাশে।

—সেটা কার ছবি? আমার?

—হ্যাঁ, স্যার।

—দশ বছর। মানে এই টুয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরিতেই আমি পুরী যাইনি, অথচ গতমাসে সেখানকার মন্দিরের পাশে আমার ছবি উঠে গেল? এ কি ম্যাজিক নাকি?

কৃষ্ণা চোখ পাকিয়ে বলল,—তুমি যে গতমাসে পুরী যাওনি, তা আমরা কী করে বিশ্বাস

করব? তুমি এলাহাবাদ মিউজিক কনফারেন্সে গেলে। সত্যিই এলাহাবাদ গিয়েছিলে, না তার বদলে টুক করে পুরী ঘুরে এলে, তা আমরা জানব কী করে?

ইন্দ্রনাথ কৃত্রিম দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন,—স্বামীর প্রতি এমন অবিশ্বাস! সতী-সাধ্বী নারীর এ কী ব্যবহার! তাহলে কি আমি কাগজওয়ালাদেরও হাত করে ফেলেছি? ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসে এলাহাবাদ ফাংশনে আমার গানের প্রশংসা বেরুল কী করে?

কৃষ্ণাও ঝগড়ার ভঙ্গি করে বলল,—খবরের কাগজের কথা আর বোলো না। শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল!

—তোমার দাদা অতবড় কাগজের নিউজ এডিটর, তুমি তাকেও মাতাল বললে?

—আমার দাদা যে বিখ্যাত মাতাল, তা সবাই জানে! একবার জ্যোতি বসুর একটা মিটিং-এ যাওয়ার কথা ভুলে গিয়ে বসে ছিল পার্ক স্ট্রিটের একটা বারে। তারপর অন্যদের কাছ থেকে শুনে নিয়ে সেই মিটিং-এর রিপোর্ট লিখে দিল, মনে নেই? জ্যোতিবাবু নিজেই ফোন করে জানিয়েছিলেন, 'সোমেনকে তো আমি দেখিনি। সে আমাকে ওই প্রশ্নটা জিগ্যেস করল কখন?'

—এদেরই বলে ধুরন্ধর সাংবাদিক! যাই হোক, ওহে শালাবাবু, ধরা যাক আমি তোমার দিদিকে গোপনে বিয়ে করেছি। তুমি আজ এসেছ ঠিক কী জন্য? কাছাকাছি তো জামাইষষ্ঠী নেই।

যুবকটি বলল,—পুরী থেকে ফেরার পর আপনি দিদির কোনও খোঁজখবর করেননি। আপনি বলেছিলেন, আপনাকে একবার এর মধ্যে বহরমপুর যেতে হবে, তারপর...দিদির খুব জ্বর হয়েছে, আপনাকে একবার দেখতে চাইছে। আপনি কি আজ বা কাল একবার আসবেন আমাদের বাড়িতে? আমি সঙ্গে নিয়ে যাব—

হালকা ভাবটা ছেড়ে ইন্দ্রনাথ এবার নীরস গলায় বললেন,—আমার পক্ষে তো যাওয়া সম্ভব নয়। তোমার দিদির জ্বর কমলে...তার নাম কী?

—বিশাখা।

—বিশাখার জ্বর কমলে তাকেই বরং একদিন নিয়ে এসো, সকাল সাড়ে ন-টার পর।

—স্যার, আর-একটি বিশেষ দরকারে...

ইন্দ্রনাথের পেটটা মুচড়ে উঠল। আর তো অপেক্ষা করা যাবে না। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—আমার তো ভাই এখন আর কিছু শোনার সময় নেই।

কৃষ্ণাকে বললেন,—আমার এই নতুন শালাবাবুটিকে কিছু খেতে-টেতে দাও।

খবরের কাগজটা তুলে নিয়ে তিনি রতনকে বললেন,—আমার চা-টা বাথরুমে দে।

ঠিক চল্লিশ মিনিট পরে তিনি বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে দেখলেন, ছেলেটি চলে গেছে। তাঁর ভুরু একটু কুঁচকে রইল।

কেউ তাঁকে ব্ল্যাকমেইল করতে চাইছে? এ ছেলেটি নয়, এর অত সাহস হবে না। এর আড়ালে অন্য কেউ? এত সহজ! ইন্দ্রনাথ বসু শক্ত মানুষ। পুরী যাওয়া, বিয়ে করা, এসব তিনি এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিতে পারেন। কারণ, এর মধ্যে বিন্দুবিসর্গ সত্যি নেই।

কিন্তু বহরমপুরের কথাটা কী করে জানল?

গত সপ্তাহে তাঁর বহরমপুরের একটা অনুষ্ঠানে যাওয়ার কথা ছিল ঠিকই, শেষপর্যন্ত যাওয়া হয়নি। কিন্তু তা বাইরের লোক কী করে জানবে? ওরা কি কাগজে কোনও বিজ্ঞাপন দিয়েছিল? হয়তো লোকাল কাগজে। উদ্যোক্তা সংস্থার প্রেসিডেন্টের স্ত্রী মারা গেছেন হঠাৎ, তাই অনুষ্ঠানটি পিছিয়ে গেছে অনির্দিষ্টকালের জন্য।

তাহলে বহরমপুর কিংবা ওই অঞ্চলের কোনও লোক? নাঃ, গুরুত্ব দেওয়ার কোনও দরকার নেই।

কৃষ্ণা কারও সঙ্গে টেলিফোনে লম্বা কথোপকথনে রত।

ইন্দ্রনাথ এবার বসলেন কমপিউটারের সামনে। গান ছাড়া তাঁর অন্য শখ ইন্টারনেট সার্ফিং। ওখানে বসেই ব্রেকফাস্ট খাওয়া।

দুপুরবেলা তিনি আবার খাবার টেবিলে কৃষ্ণার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেলেন।

ইন্দ্রনাথ জিগ্যেস করলেন,—আমি বাথরুমে যাওয়ার পর ছেলেটি আর কিছু বলল?

অন্যমনস্কভাবে কৃষ্ণা উত্তর দিল,—কোন ছেলেটি?

—ওর নাম তো জিগ্যেস করা হয়নি। যার দিদির নাম বিশাখা।

—ও হ্যাঁ। কী ব্যাপার বলো তো। সব কিছু বেশ রহস্যময় লাগছে।

—তুমি কি সত্যিই ভাবছ, আমি গোপনে পুরীতে গিয়ে আর-একটা মেয়েকে বিয়ে করে ফেলেছি?

—ওরকম উদ্ভট কথা ভাবব, আমি পাগল নাকি? তুমি লুকিয়ে-লুকিয়ে অ্যাফেয়ার করতে পারো, কিন্তু বিয়ের মতন কাঁচা কাজ করবে না, তা আমি ভালোই জানি। সে-কথা হচ্ছে না। কিন্তু ছেলেটা এল কেন? তুমি বাথরুমে যাওয়ার পর ওকে টোস্ট আর ওমলেট খেতে দেওয়া হল। তখন ও কী করল জানো? হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলল, 'দিদি আমায় ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন।' তারপর কিছু না খেয়ে দৌড়ে বেরিয়ে চলে গেল।

—স্ট্রেঞ্জ!

—স্ট্রেঞ্জ না স্ট্রেঞ্জার! কান্না-ফান্না দেখলে আমার খুব খারাপ লাগে! কেনই বা এল। কিছু তো চাইলও না!

—হয়তো বুঝতে পেরেছে যে ভুল জায়গায় এসেছে!

এইসময় কৃষ্ণার একটা ফোন এলে, এ-প্রসঙ্গ চাপা পড়ে গেল!

সন্ধের সময় আর-একটি খুবই বিভ্রান্তিকর ফোন এল।

ইন্দ্রনাথ ফোন তুলতেই একজন বলল,—স্যার, আমি রফিক বলছি, আপনি আজ ক'টার সময় আসছেন?

রফিক নামে কাউকে চেনেন না ইন্দ্রনাথ। আজ কোথাও তাঁর যাওয়ারও কথা নেই।

তিনি জিগ্যেস করলেন,—তুমি কে বলছ ভাই?

সে বলল,—আমি রফিক, চিনতে পারছেন না? কালই তো আলাপ হল।

ইন্দ্রনাথ বললেন,—কাল আলাপ হয়েছে? কোথায়?

—অলিম্পিয়ায়। আমার সঙ্গে ইকবাল আর এতেশামও ছিল। আমরা বাংলাদেশ থিকা আসতাছি। আপনার সঙ্গে আলাপ হল, কত গল্প হল, আমাগো খুব ভালো লাগছে। আপনি আজ ফের আসতে বললেন।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন ইন্দ্রনাথ। অলিম্পিয়া বারে তিনি, পুরীর মতনই, গত দশ বছরে একবারও যাননি। বারে-টারে যাওয়া তিনি ছেড়েই দিয়েছেন।

তারপর তিনি বললেন,—আমি তো ভাই কাল এক বন্ধুর বাড়িতে সন্ধের পর ছিলাম তিন ঘণ্টা। অন্য কোথাও যাইনি। তুমি এ ফোন নাম্বার পেলে কোথায়?

—আপনিই দিয়েছেন।

—আমি দিয়েছি? আমার নাম কী?

—ইন্দ্রনাথ বসু। ফেমাস গায়ক। আমিও একটু-আধটু গানের চর্চা করি। আপনি অটোগ্রাফ দিলেন, একখানা গানও শোনালেন।

—তাই নাকি? কী গান শোনালাম?

—একখানা উচ্চাঙ্গের গান। ঠুংরি মনে হয়। ওয়ান্ডারফুল স্যার, ওয়ান্ডারফুল!

—ঠুংরি! কোন ঠুংরি?

—আগে শুনি নাই, আপনি বললেন, 'উস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খান-এর বাজুবন্ধ্ খুলু খুলু যায়।'

ইন্দ্রনাথ স্তম্ভিত বোধ করলেন। তিনি প্রধানত খেয়াল গান করেন। কোনও-কোনও ফাংশনে শ্রোতাদের অনুরোধে দু-একখানা ঠুংরিও শোনাতে হয়। তার মধ্যে বড়ে গোলাম আলির ওই গানটি তাঁর খুব প্রিয়।

এবার তিনি গম্ভীর গলায় বললেন,—যিনি তোমাদের গান শুনিয়েছেন, তিনি আজ আবার যাবেন কি না আমি জানি না। মোট কথা, সেই তিনি আমি না, আমার যাওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই।

ফোন রেখে দেওয়ার একটু পরেই আবার বাজল।

এবার একজন বলল,—ভালো আছেন তো স্যার? আমার নাম এতেশাম, আপনি কাল...

কথা শেষ না করতে গিয়ে ইন্দ্রনাথ বললেন,—রং নাম্বার।

ব্যাপারটা কী? একজন কেউ তাঁর নাম ভাঁড়িয়ে এইসব কাণ্ড করে বেড়াচ্ছে। তার চেহারা আমার মতন। সে আবার গানও গায়। এমনকি বড়ে গুলাম আলির ওই ঠুংরি? এখন ওই ঠুংরি আর বিশেষ কেউ গায় না!

আধঘণ্টা পর আবার ফোন বাজতেই ইন্দ্রনাথের মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। বাংলাদেশের ছেলেরা সাধারণত নাছোড়বান্দা হয়। গতকাল নকল লোকটাকে ওরা গাইয়েছে? অনেক পয়সা খরচ করেছে?

তিনি রাগ করে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই শুনলেন, 'আমি কড়েয়া থানা থেকে বলছি, আপনি কি মিস্টার বসু?'

ইন্দ্রনাথ বললেন,—ইয়েস!

লোকটি বলল,—আপনি আজ একবার এই থানায় আসতে পারবেন? বড়বাবু আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চান।

—আমাকে থানায় যেতে হবে? কেন? আপনার বড়বাবু যদি কথা বলতে চান, ফোনে বলতে বলুন!

—ফোনে হবে না, আপনার একটা লিখিত স্টেটমেন্ট চাই!

—কীসের স্টেটমেন্ট?

সেটা জানলে তো আমি আগেই বলতাম। বড়বাবু জানেন। আপনার নামে একটা কেস আছে। আপনি চলে আসুন না।

—কেস আছে মানে? আমি বিবাহিত লোক হয়েও পুরীতে গিয়ে ভুলিয়ে-ভালিয়ে অন্য একটা মেয়েকে বিয়ে করেছি, এই তো? রাবিশ!

—নো, নো, স্যার। ওরকম কিছু না। আমি যতটা জানি, আপনি অ্যাডভান্স টাকা নিয়েও গতকাল একটা ফাংশানে যাননি।

—বাজে কথা! গতকাল আমার কোনও ফাংশান ছিল না। কারও কাছ থেকে টাকাও নিইনি! শুনুন, আমার একটা সামাজিক সম্মান আছে। হুট করে ডাকলেই আমি থানায় যাব? যদি বেশি গরজ থাকে, থানাকেই আমার কাছে আসতে হবে!

তিনি শব্দ করে ফোন রেখে দিলেন।

একই দিনে এসব কী কাণ্ড ঘটছে। তাঁর নামে আর-একজন গায়ক আছে, সেও বিভিন্ন ফাংশানে গান গায়? কোনওদিন ঘুণাক্ষরেও তো তিনি এমন কথা শোনেননি। একই নামের দু-জন গায়ক থাকলে কি তা জানাজানি হত না?

টাকা নিয়ে গান না গাওয়ার ঘটনা ইন্দ্রনাথের জীবনে একবারই ঘটেছে। অনেকদিন আগে,

তখন তাঁর রেট ছিল হাজার টাকা। পার্ক সার্কাস ময়দানে একটা বড় জলসায় তাঁর প্রোগ্রাম ছিল রাত সাড়ে আটটায়। তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন ঠিক সময়।

কিন্তু উদ্যোক্তারা কিছুতেই তাঁকে মঞ্চে ডাকে না। একটার-পর-একটা অন্য আর্টিস্ট ঢুকিয়ে দিচ্ছে। ক্রমশ তাঁর বিরক্তি বেড়ে যাচ্ছিল। উদ্যোক্তাদের বারবার সেই একই কথা, 'আর স্যার মাত্র দশ মিনিট, এই বম্বের আর্টিস্টের পরেই!'

রাত সাড়ে বারোটা বেজে যাওয়ার পর ইন্দ্রনাথ গান না গেয়ে রাগ করে চলে এসেছিলেন। পরে তিনি অ্যাডভান্সের টাকা ফেরত দিতে চাননি। তিনি তো কোনও দোষ করেননি, তাঁর অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। উদ্যোক্তারা মামলা করার ভয় দেখিয়েছিল, তোয়াক্কা করেননি তিনি। আর কিছু হয়নি অবশ্য।

কতদিন আগে? বছরদশেক তো হবেই। দশ বছর?

দশ বছর আগে তিনি পুরীতে গিয়েছিলেন। কৃষ্ণা তখন প্রথম সন্তানের জন্ম দিয়ে বাপের বাড়িতে। সেখানে দুটি মেয়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল।

সিনেমা স্টারদের মতন অতটা না হলেও গায়কদের কাছাকাছিও অনেক যুবতি মেয়ে ঘুরঘুর করে। এই দুটি মেয়ের মধ্যে একজনের খুবই গদগদ ভাব, হাত ধরত, অন্যমনস্কতার ভান করে বুকের ছোঁয়া লাগাত। কিন্তু ইন্দ্রনাথ বেশিদূর প্রশ্রয় দেননি। তাঁর ভালো লাগছিল ঠিকই, কিন্তু সীমারেখা সম্পর্কে তিনি সজাগ।

মেয়েটি কি তাঁকে বিয়ে করতে চেয়েছিল? অতটা মনে নেই। অন্তত মুখে কিছু বলেনি।

দশ বছর আগে তিনি সন্ধেগুলো কোনও-না-কোনও বারেই কাটাতেন বন্ধুদের সঙ্গে। হ্যাঁ, অলিম্পিয়াতেও যেতেন। একবার কি একটি বাংলাদেশি দলের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল সেখানে? যতদূর মনে পড়ে, কয়েকটি খুব উৎসাহী ছেলে...

দশ বছর আগেকার কিছু ঘটনা আজ আবার ঘটছে। অন্য কেউ ঘটাচ্ছে।

অথচ সবই কাকতালীয়। দশ বছর আগের কোনওদিন কি ফিরে আসতে পারে নাকি? ধ্যাত!

কৃষ্ণা গেছে তার দিদির কাছে। ফিরল রাত পৌনে দশটায়। এর মধ্যে ইন্দ্রনাথ হুইস্কি নিয়ে বসলেন। বাড়িতে থাকলে সাধারণত তিনি তিন পেগ খান, এবং সেইসঙ্গে সিডিতে গান শোনেন। কত সহজে, কতরকম গান এখন পাওয়া যায়।

আজ আর মদ্যপান থামাতে ইচ্ছে করছে না। একসময় খুব বেশিই পান করতেন, প্রায়ই ছ-সাত পেগ। বছরদশেক ধরে কমিয়ে দিয়েছেন।

কৃষ্ণা এগারোটার পর শুতে চলে যায়।

ইন্দ্রনাথ জেগে থাকেন আরও দু-তিন ঘণ্টা। গান শোনেন, বই পড়েন। আজ কিছুতেই নেশা হচ্ছে না। ছ'পেগ হয়ে গেল। অনেকদিন পর। সারাদিনের ঘটনাগুলো মনে পড়ছে বারবার। যুক্তিতে মিলছে না কিছুতেই।

একসময় উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি করলেন ফ্ল্যাটের মধ্যে। ছেলে-মেয়ে দুটি প্রতি শনিবার মামাবাড়িতে যায়, ওখানেই রাত্রে থাকে। কৃষ্ণা ঘুমন্ত, সমস্ত ফ্ল্যাট নিস্তব্ধ।

শরীরে যেন ফিরে এসেছে যৌবন। তিনি ফিরে গেছেন দশ বছর আগের বয়েসে।

তারপর তিনি আপনমনে হাসলেন। তা আবার হয় নাকি!

ঘুমোতে যাওয়ার আগে একটুক্ষণ টিভি দেখা তার অভ্যেস। কয়েকটা চ্যানেলে সারা দিনরাত্রি খবর দেখায়। বেশিরাতে খবর ছাড়া অন্য কিছু দেখারও থাকে না।

খবর দেখছেন ইন্দ্রনাথ। কোনও গুরুত্বপূর্ণ খবরই নেই। তিনি যখন টিভিটা বন্ধ করে যাচ্ছেন, তখন দেখলেন, ব্রেকিং নিউজ ঃ গাড়ি ও ট্রাকের সংঘর্ষ, বিখ্যাত গায়ক সাংঘাতিক আহত, জীবন-মৃত্যুর লড়াই।

গায়কটি কে? উচ্চাঙ্গসংগীত শিল্পী ইন্দ্রনাথ বসু। গাড়িতে খড়্গপুর যাচ্ছিলেন, মুখোমুখি এক ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। গাড়ির সামনের সিটেই বসেছিলেন ইন্দ্রনাথ বসু। তিনি ও ড্রাইভার দু-জনেই কোমায় রয়েছেন।

ইনসেটে ইন্দ্রনাথের ছবি। তারই ছবি। ফাইল পিকচার, বোঝাই যায়।

আবার ইন্দ্রনাথ হাসলেন। দশ বছর আগে এরকম একটা সাংঘাতিক দুর্ঘটনায় পড়েছিলেন ঠিকই। খড়্গপুরে নয়, তিনি যাচ্ছিলেন দুর্গাপুর, একটা ট্রাক এসে এমন ধাক্কা মারে যে গাড়িটা উলটে পড়ে যায় পাশের খাদে। সাতদিন ধরে যম তার প্রাণ নিয়ে টানাটানি করেছিল। পারেনি শেষপর্যন্ত। ইন্দ্রনাথের ঘাড়ে ও বুকে সেই দাগ রয়ে গেছে।

কিন্তু এখনকার টিভি চ্যানেল তো দশ বছর আগেকার ঘটনা দেখাবে না। আজই এই দুর্ঘটনা। ইন্দ্রনাথের নামে যে আর-একজন লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে, সে-ই আহত হয়েছে নিশ্চিত।

ইন্দ্রনাথ যেমন শেষপর্যন্ত বেঁচে গিয়েছিলেন, তার অনুকরণে এ-লোকটিও বেঁচে যাবে নিশ্চিত। আহা, বাঁচুক, বাঁচুক। নকল হোক আর যাই-ই হোক বাঁচুক।

নিজের মুমূর্ষু অবস্থার দৃশ্য দেখতে-দেখতে ইন্দ্রনাথ আবার হাসলেন।



রহস্য কাহিনি নয়

বাথরুম থেকে একটা মগ চুরি গেছে। চুরি ছাড়া আর কী বলা যায়? একটা নতুন মগ তো ডানা মেলে উধাও হয়ে যেতে পারে না?

এ চুরির কথা শুনলে লোকে হাসবে। বাড়ি থেকে আর কিছু খোওয়া যায়নি, হ্যাঁ, সব মিলিয়ে দেখা হয়েছে, আর সব কিছুই ঠিকঠাক আছে, শুধু দু-দিন আগে কিনে আনা নীল মগটি পাওয়া যাচ্ছে না। একটা বালতি আর মগ একসঙ্গে কেনা হয়েছে, বালতিটা আছে, মগটা নেই।

কতই বা দাম, যৎসামান্য, একটা মগের জন্য মাথা না ঘামালেও চলে। কিন্তু প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় সবসময় একটা হিসেব মেলাবার ব্যাপার থাকে। কোনও কিছুতে, তা সে যত সামান্যই হোক, হিসেব না মিললে মনটা খচখচ করে।

যেমন, একদিন বাবার টেবিলের নীচে দেখা গেল একটা কমলালেবুর আধখানা খোসা। এটা কোথা থেকে এল? এ-বাড়িতে তো বেশ কিছুদিনের মধ্যে কমলালেবু খাওয়া হয়নি। বর্ষাকাল, এ-সময় কমলালেবু খাওয়ার রেওয়াজও নেই, কমলালেবু সস্তা হয় শীতকালে। তবু, ছেলে-মেয়েরা কেউ শখ করে কিনে এনেছে? তিন ছেলে-মেয়েই বলল, তারা কেউ কিছু জানে না। ওদের কেউ যদি এনেই থাকে, কমলালেবু তো কোনও নিষিদ্ধ বস্তু নয়, অস্বীকার করবে কেন?

তাহলে খোসাটা এল কোথা থেকে? মগটাই বা গেল কোথায়?

পরিবারের সদস্যরা ছাড়া শুধু দুজন মানুষ ওই বাথরুমে ঢোকে। কাজের মেয়ে শেফালি, বাসন মাজা, কাপড় কাচার জন্য বাথরুমটা অনেকক্ষণ তার দখলে থাকে। বাড়িতে গয়না-গাঁটি কিছু হারালে প্রথম সন্দেহই গিয়ে পড়ে কাজের মেয়ে কিংবা কাজের লোকের ওপরে। এ-বাড়িতে সেরকম কোনও ঘটনা ঘটেনি। অর্থাৎ, কানের দুল-টুল মাঝে-মাঝে তো হারাবেই, হারিয়েছে, আবার খুঁজেও পাওয়া গেছে। শেফালিই দু-একবার খুঁজে দিয়েছে। শেফালি এমন কিছু হতদরিদ্রও নয়। তার বড়

ছেলে এবার হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা দিয়েছে। ওর স্বামীও জুটমিলে কাজ করে, সেটা অনেকদিন বন্ধ থাকার পর গতমাসে খুলেছে আবার। পুরোনো মাইনে-টাইনেও পেয়েছে অনেকটা। এই তো কয়েকদিন আগে, এ-বাড়ির ভুলোমনা ছেলে যিশুর জামা কাচতে গিয়ে পকেটে পঁয়ষট্টি টাকা পেয়ে ফিরিয়ে দিয়েছে নিজে থেকে। সে চুরি করবে সামান্য একটা পনেরো টাকার মগ?

দ্বিতীয় যে বাইরের মানুষ রোজ এই বাথরুমে ঢোকে, সে একজন মেথর। আজকাল আর মেথর বলা হয় না, খবরের কাগজে লেখে ধাঙড়, আর গৃহস্থরা বলে জমাদার। কী তার নাম? জমাদারদের আবার নাম থাকে নাকি, সবাই তো জমাদার বলেই ডাকে। সে মগটা সরাল? কিন্তু সে তো চুপিচুপি আসে না। তাকে দরজা খুলে দিতে হয়, শেফালি তাকে জল ঢেলে দেয়। স্নানের মগ তো তত ছোট জিনিস নয়, যে টপ করে জামার পকেটে পুরে নেবে! আহা, তা ছাড়া জমাদাররা আবার গায়ে জামা পরল কবে? শীতকালেও তারা শুধু গেঞ্জি পরে আসে।

খাবার টেবিলে এই রহস্য নিয়ে আলোচনা হয়। যে ঘটনার কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না, সেটাকে অনেকে ভূতুড়ে ব্যাপার বলে ভাবতে ভালোবাসে। কিন্তু এ-বাড়ির কেউই ওসব শিশু সাহিত্যে বিশ্বাস করে না।

পরিবারের প্রধান রণদেব বারাসত কলেজে অর্থনীতির অধ্যাপক। মা সম্পূর্ণা রানি হর্ষমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে ইংরিজি পড়ান। তিনটি সন্তানের মধ্যে বড় ছেলে যিশু যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে শেষ পরীক্ষা দিয়েছে গত মাসে, আর ছোট ছেলে পথিকৃৎ মায়ের ইস্কুলে পড়ে ক্লাস নাইনে। মাঝখানে মেয়ে, নীলাঞ্জনা, বাবা-মায়ের খানিকটা অনিচ্ছাতেই ভরতি হয়েছিল গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজে। বাচ্চা বয়েস থেকেই তার আঁকার হাত বেশ ভালো। আবার তার অঙ্কের রেজাল্টও খুব ভালো হত। তাই রণদেব চেয়েছিলেন, মেয়েও ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুক, আঁকা-টাকার চর্চ তো বাড়িতে বসেও হয়। কিন্তু নীলাঞ্জনা গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজে চান্স পেয়ে গেলে তিনি আর আপত্তি করেননি। সম্পূর্ণা খুঁত-খুঁত করেছিলেন। এই নতুন বাড়ি বানানো হয়েছে হাবড়া অশোকনগরে, এখান থেকে নীলাঞ্জনাকে প্রতিদিন লোকাল ট্রেনে, তারপর বাসে চেপে যেতে হবে ক্লাস করতে, সে কি এই ধকল সইতে পারবে?

যিশু আর নীলাঞ্জনা প্রায় পিঠোপিঠি ভাইবোন। দুজনের স্বভাব একেবারে বিপরীত। যিশু দুর্দান্ত প্রাণবন্ত, জোরে কথা বলে, খেলাধুলোতেও চৌকশ। অচেনা মানুষের সঙ্গে সহজে ভাব জমিয়ে নিতে পারে। আর নীলাঞ্জনা খুবই মৃদুভাষী আর লাজুক, ভিড়ের ট্রেনে কিংবা বাসে কেউ তাকে ধাক্কা দিলে কিংবা পা মাড়িয়ে দিলেও সে প্রতিবাদ করতে পারে না। কখনও সে তর্ক করে না কারুর সঙ্গে, মনে-মনে যা-ই ভাবুক সে, অন্যদের কথা মাথা নীচু করে মেনে নেয়। যে মেয়ে সাত চড়েও রা করে না, আমাদের দেশে তাদেরই তো ভালো মেয়ে বলে, আত্মীয়-স্বজনরা সবাই সব সময় বলে, আহা নীলাঞ্জনা কী ভালো মেয়ে, লক্ষ্মী মেয়ে! ছোট ছেলে পথিকৃৎ, ডাক নাম বাবলুও শান্ত স্বভাবের, গল্পের বইয়ের পোকা, বাবা-মায়ের কথা শোনে।

প্রথম-প্রথম যিশু আর নীলাঞ্জনা এক ট্রেনে যেত কলকাতায়। ভিড়ের মধ্যে বোনকে সামলাত যিশু। শিয়ালদায় নেমে নীলাঞ্জনাকে বাসে তুলে [illegible]স অন্য বাস ধরত। কিন্তু প্রত্যেকদিন তো দুজনের একসঙ্গে ক্লাস থাকে না। যিশু ক্রিকেট ম্যাচ খেলার জন্য প্রায়ই দুর্গাপুর কিংবা আসানসোল যায়, সুতরাং দু-একমাস পর থেকে নীলাঞ্জনাকে একাই যেতে হয় আর্ট কলেজে। যাওয়া-আসার পথে কোন দিন সে কোনও বিপদে পড়বে, এই চিন্তা থাকেই সম্পূর্ণার। সন্ধের আগেই মেয়ে বাড়ি ফিরলে তিনি নিশ্চিন্ত।

আগে থাকতেন ভাড়া বাড়িতে, এই বাড়িটি বানানো হয়েছে আড়াই বছর আগে। এতকলায় চারখানা ঘর, দোতলাতেও একটা ছোট ঘর হয়েছে কয়েক মাস আগে, সেখানে যিশু পড়াশোনা করে। [illegible] দিকে একটা পুকুর, এ দিকটা এখনও কিছুটা ফাঁকা [illegible]কা, যদিও প্রায় প্রতি মাসেই

একটা করে নতুন বাড়ি গজাচ্ছে। তা হলেও পল্লিটি বেশ নিরিবিলি, প্রতিবেশীরা ভদ্র।

আর্ট কলেজে বেশিদিন পড়া হল না নীলাঞ্জনার। মা যা আশঙ্কা করেছিলেন, একদিন তাই-ই ঘটল।

মাঝে-মাঝেই সে মন খারাপ করে বাড়িতে ফেরে। তারপর সারা সন্ধেটা সে মুখ ভার করে থাকে। কিংবা অসময়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে মুখ গুঁজে। কী হয়েছে, আসা-যাওয়ার পথে কেউ তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে কি না, তা জানবার উপায় নেই। নীলাঞ্জনা তো মুখ ফুটে কিছুই বলবে না। মায়ের শত প্রশ্নেও সে শুধু বলছে, কই, কিছু হয়নি তো! কিছু যে হয়েছে, তা স্পষ্টই বোঝা যায়।

মেয়ে কি কারুর প্রেমে পড়েছে? এই বয়েসে প্রেমের সঙ্গে মনখারাপের একটা নিবিড় সম্পর্ক থাকে। প্রেম ব্যাপারটাকে ভয় পান না সম্পূর্ণা, এই বয়েসের মেয়ে তো এক-আধবার প্রেমে পড়তেই পারে। তিনি নিজেও তো বিয়ের আগে অন্য একজনের সঙ্গে টানা দু-বছর প্রেম করেছেন, সেই মানুষটিকে বিয়ে করা সম্ভব ছিল না, শেষপর্যন্ত প্রচুর কান্নাকাটি করেছিলেন, এখন সেসব দিনের কথা মনে পড়লে মুখে মৃদু হাসি ফুটে ওঠে।

বন্ধুর মতন মেয়ের পাশে বসে সম্পূর্ণা মাঝে-মাঝে জিগ্যেস করেন, হ্যাঁরে, ছেলেটা কে রে? তাকে একদিন বাড়িতে নিয়ে আয় না!

নীলাঞ্জনা মায়ের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। সেই নীরব ভাষার অর্থ বোঝা দুষ্কর।

এ কথাও ঠিক, সম্পূর্ণা ভাবেন, এ-মেয়ের পক্ষে কি কোনও ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক পাতানো সম্ভব? ও তো কারুর সঙ্গে কথাই বলতে চায় না। সুশ্রী চেহারা, ওর দিকে কোনও-কোনও ছেলে আকৃষ্ট হতেই পারে, কিন্তু মেয়ে যদি সাড়া না দেয়, তাহলে প্রেম হবে কী করে?

সুতরাং প্রেমই যে নীলাঞ্জনার মনখারাপের কারণ, সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় না।

এক সন্ধেবেলা তিনজন ভদ্রলোক ও এক মহিলা ধরাধরি করে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেল নীলাঞ্জনাকে। তার হাঁটার ক্ষমতা নেই।

স্টেশনে ট্রেন থামলেই একদল লোক এমন হুড়োহুড়ি করে নামার চেষ্টা করে, যেন এক মিনিট দেরি হলেও পৃথিবী রসাতলে যাবে। আবার সব লোক নেমে যাওয়ার আগেই কিছু মানুষ ঠেলাঠেলি করে ওপরে উঠতে চায়। কেউ কারুকে জায়গা ছেড়ে দেওয়ার মতন সৌজন্যের তোয়াক্কা করে না। প্রতিদিনই এটা সহ্য করতে হয়।

একদিন ফেরার সময় স্টেশনে ট্রেন থেকে নামতে গিয়ে বেশ জোরে আছাড় খেয়ে পড়ে গেল নীলাঞ্জনা মানুষের ধাক্কায়। হয়তো কেউ ইচ্ছে করে ধাক্কা দেয়নি, আবার মেয়েদের পিঠে হাত রাখার লালসাও হয় কারুর-কারুর। এমনই আঘাত লাগল নীলাঞ্জনার যে তার হাতের বই-খাতা ছিটকে পড়ে গেল, সে আর উঠে দাঁড়াতে পারল না।

সাধারণত কার কী আঘাত লাগল না লাগল, তা নিয়ে অধিকাংশ মানুষই ভ্রুক্ষেপ করে না। সকলেরই বাড়ি ফেরার কিংবা ট্রেনে উঠে জায়গা দখল করার তাড়া। আবার ব্যতিক্রমও তো থাকে। কয়েকজন সহৃদয় ব্যক্তি নীলাঞ্জনার অবস্থা দেখে তাকে টেনে তুললেন। কিন্তু নীলাঞ্জনা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারছে না। ব্যথায় তার চোখে জল আসছে, তবু মুখে বলছে না কিছুই।

এক মহিলা তাকে অস্পষ্টভাবে চিনতে পেরে জিগ্যেস করলেন, তুমি পুকুরধারে ছাই-রঙা বাড়িটাতে থাকো না? তোমার বাবা কলেজে পড়ান।

নীলাঞ্জনা ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি জানাল।

তখন নিজেদের কাজ ফেলে সেই মহিলা ও কতিপয় ভদ্রলোক দু-তিনখানা রিকশা নিয়ে নীলাঞ্জনাকে পৌঁছে দিয়ে গেলেন বাড়িতে।

সত্যিই খুব প্রশংসনীয় ব্যাপার।

বাঁ-পায়ে ফ্র্যাকচার হয়েছে নীলাঞ্জনার। এখন তার সেই পা-মোড়া প্লাস্টার। দিনপনেরো হয়ে গেছে। বাড়ির মধ্যে একটু-একটু হাঁটতেও পারে।

দেড়-দু-মাসের মধ্যে তার পা আবার ঠিক হয়ে যাবে। এই বয়েসের ছেলেমেয়েদের হাড় ঠিকঠাক জুড়ে যায়। কিন্তু এর মধ্যে আর-একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে। এই ভাবে ট্রেন জার্নি করে নীলাঞ্জনার আর আর্ট কলেজে যাওয়া চলবে না। সবাই সব কিছু পারে না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কি কোনও আর্ট কলেজে গিয়ে ছবি আঁকা শিখেছেন? নীলাঞ্জনা যদি চায়, তাহলে বাড়িতেই একজন আর্ট টিচার ঠিক করে দেওয়া যেতে পারে। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের এখন আর ভরতি হওয়ার উপায় নেই। সে বরং স্থানীয় কলেজে বিজ্ঞান নিয়ে পড়ুক। ইচ্ছে করলে ইংরিজি কিংবা বাংলাও পড়তে পারে। একটা বছর নষ্ট হবে, কী আর করা যাবে।

নীলাঞ্জনা জোরালো আপত্তি জানাতে পারেনি। শুধু মিনমিন করে দু-একবার বলেছিল, আমি পারব, এবার থেকে পারব।

বাবা-মা কেউ তাতে কর্ণপাত করেননি।

যিশুই বরং জোরের সঙ্গে বলেছিল, বারবার আছাড় না খেলে মানুষ দৌড়োতে শেখে না। একবার আছাড় খেয়েছে বলে খুকি আর্ট কলেজ ছেড়ে দেবে? এ আবার কীরকম কথা! না, না, যাবে!

বাবা-মা যিশুর কথা উড়িয়ে দেয়েছেন।

নীলাঞ্জনার ঘনিষ্ঠ কোনও বন্ধু নেই, কেউ এ-বাড়িতে আসে না। কিন্তু যিশুর বন্ধুরা প্রায়ই আসে। তারা আড্ডা দেয় ছাদের ঘরে। সেইসব বন্ধুদের কেউ নীলাঞ্জনার সঙ্গে ভাব জমাতে চায় কি না, আড়াল থেকে সেদিকে নজর রাখেন মা। দু-একটা ছেলের সঙ্গে ভাব হোক না, ভালোই তো। প্রেম কিংবা বিয়ের প্রশ্ন না থাক, এমনিই ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা করা মেয়েদের পক্ষে স্বাস্থ্যকর।

বন্ধুদের মধ্যে তূনীর নামে একজনের দাদা খবরের কাগজে গল্প-টল্প লেখে ও ছবি আঁকে। তার নিজেরও আগ্রহ আছে ছবি সম্পর্কে। ছবি দেখার জন্য সে বারদু-এক গেছে নীলাঞ্জনার ঘরে। কিন্তু যে মেয়ে একটা-দুটোর বেশি কথাই বলে না, তার সঙ্গে ভাব জমবে কী করে?

তূণীর ছেলেটি অত্যন্ত ভদ্র, সে কখনও নীলাঞ্জনার গা ঘেঁষে দাঁড়ায় না। সম্পূর্ণা একালের ছেলেমেয়েদের কিছুটা বুঝতে পারেন। এরা অনেকটা পূর্ব সংস্কার মুক্ত। ইচ্ছে করলে বিয়ের আগেও একসঙ্গে শুয়ে পড়তে পারে, আবার এরা, একটি ছেলে ও মেয়ে, দিনের-পর-দিন একসঙ্গে সময় কাটালেও পরস্পরের সম্মতি ছাড়া কেউ কারুকে ছোঁয় না।

এখন দুপুরবেলা আর সবাই চলে যায়, নীলাঞ্জনাকে হয় একলা থাকতে। ছবি আঁকার অঢেল সময়, কিন্তু রংতুলিতে হাত দেওয়ার ইচ্ছেটা চলে গেছে তার। সে জানলা দিয়ে চেয়ে থাকে বাইরের দিকে। পুকুরের জলে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ার দৃশ্যটা তার খুব প্রিয়।

মগ উধাও রহস্যের মীমাংসা হতে-না-হতেই অদৃশ্য একটি ঘড়ি। এটা বেশ গুরুতর ব্যাপার। টেব্‌ল ক্লক, কিন্তু মোটেই সাধারণ নয়। আজকালকার ঘড়িতে টনটন শব্দ হয় না। কিন্তু এটাতে হয়, আর ঠিক এক ঘণ্টা পরপর টুংটাং করে একটা বাজনা বেজে ওঠে। বাবাকে তাঁর এক ছাত্র সুইজারল্যান্ড থেকে এনে দিয়েছে এই ঘড়ি। নীলাঞ্জনার পা ভাঙার পর বাবা বলেছিলেন, এটা তোর পড়ার টেবিলে রাখবি, এটা তোর।

ঘড়িটা বেশ দামি তো হবেই। এটা নিশ্চিত চুরির ব্যাপার। এবারে শেফালির কথা প্রথমেই মনে হবে। কিন্তু শেফালিকে কারুরই সন্দেহ করার ইচ্ছে হয় না।

অনেকদিন ধরে একজন মানুষকে দেখলে বোঝা যাবে না তার স্বভাব? বাসন মাজার কাজ করলেও তার আত্মমর্যাদাবোধ আছে।

যিশু দারুণ হইচই শুরু করে দিল। বাড়িতে চোরের উপদ্রব শুরু হল? চোর আসছে কোথা থেকে? ঘড়ি চুরি করেছে, এরপর আরও কোনও দামি জিনিস চুরি করতে পারে। এবার থানায় খবর দিতে হবে।

ছেলেকে ঘরের মধ্যে ডেকে নিয়ে সম্পূর্ণা বললেন, চুপ কর। এসব কথা এত চেঁচিয়ে বলতে নেই। পুলিশ এসে প্রথমেই তো শেফালিকে ধরবে। পুলিশের যা স্বভাব, থানায় নিয়ে গিয়ে ওকে নিশ্চয়ই মারধোর করবে। কিন্তু ও যদি সত্যিই দোষী না হয়! বরং দু-চারদিন সব দিক লক্ষ রেখে দেখা যাক। ছাদের দরজা তুই রাত্রিবেলা মনে করে বন্ধ রাখিস তো?

নীলাঞ্জনা তো মুখ ফুটে কিছু বলবে না, কাঁদবেও না। কিন্তু অমন শখের ঘড়িটা চলে যাওয়ায় সে যে খুব কষ্ট পেয়েছে, তা তার মুখ দেখলেই বোঝা যায়। সে নিজের আঁচল দিয়ে ঘড়িটা রোজ যত্ন করে মুছত।

শেফালিকে কেউ সরাসরি দোষ না দিলেও শেফালি ঠিক বুঝতে পারে, ঘড়িটার ব্যাপারে তাকে কিছুটা সন্দেহ করা হচ্ছে। সে নিজেও বুঝতে পারছে না, কী করে চোর ঢুকবে এ-বাড়িতে। মাঝে-মাঝে এঁদের কিছু আত্মীয়-স্বজন আসে। তাদের মধ্যেই কেউ সরিয়েছে ঘড়িটা? ভদ্দরলোকদের মধ্যেও কারুর-কারুর এরকম হাত-টান থাকে। কিন্তু মগটাই বা গেল কোথায়? দাম যাইই হোক, একটা মগ তো বাথরুম থেকে ডানা মেলে উড়ে যেতে পারে না?

শেষপর্যন্ত শেফালির নিজস্ব তদন্তেই কাজ হল। পুকুরপাড়ে একটা ঝোপের মধ্যে সে পেয়ে গেল ঘড়িটা। এখানকার একটা সরু রাস্তা দিয়ে অনেকেই যাতায়াত করে, এর মধ্যে কারুর চোখে পড়েনি, সেটাই আশ্চর্যের। ঘড়িটা পেয়ে আনন্দে চিৎকার করতে-করতে বাড়ির মধ্যে চলে এল শেফালি।

কিন্তু ঘড়িটা ফিরে পাওয়ার রহস্য মিটল না, বরং আরও ঘনীভূত হল। ঘড়িটা সম্পূর্ণ ভাঙা এবং অকেজো। কেউ যেন আছড়ে-আছড়ে সেটাকে ভেঙেছে। কেউ চুরি করলে এমন সুন্দর ও মূল্যবান বস্তুটিকে ভাঙবে কেন? যে-কোনও চোরই এর মূল্য বুঝবে। তবে কি বাঁদরের মতন কোনও প্রাণীর কীর্তি! এ অঞ্চলে বাঁদর কোথায়ও কেউ কোনওদিন দেখেনি। কোনও একটা বাঁদর কিংবা হনুমান হঠাৎ অন্য কোথাও থেকে ছিটকে চলে এসেছে? এ-পাড়ায় দু-চারজনের বাড়িতে কলাগাছ আছে। এই নতুন বাড়িতেও পেয়ারা ও সবেদা গাছ লাগানো হয়েছিল, সবেদা গাছে ফল এসেছে, সেসব গাছে কোনওদিন বাঁদর-হনুমানের উৎপাত হল না, তাদের কেউ এসে শুধু একটা ঘড়ি নিয়ে ভাঙল? অবিশ্বাস্য।

পরবর্তী ঘটনাটি সোজাসুজি অঙ্গুলি নির্দেশ করে অলৌকিকত্বের দিকে। এতে চুরিরও প্রশ্ন নেই। যখন কোনও ঘটনার কোনওরকমেই কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না, তখন তার দায় চাপানো হয় বেচারি ভূতদের ঘাড়ে।

একালে অনেক সভ্য-শিক্ষিত মানুষই ভূতে বিশ্বাস করে না। তবে যারা ঘোর অবিশ্বাসী, তাদেরও কখনও-সখনও গা ছমছম করে। বহুকালের সংস্কার, যা জিনের মধ্যে দিয়েও প্রবাহিত হয়।

যিশুর ছাদের ঘরের একদিকের দেওয়াল জোড়া একটা ম্যাপ টাঙানো। সামনের মাসে পুজোর ছুটিতে আর তিনজন বন্ধুর সঙ্গে তার সানডাক-ফু-তে ট্রেকিং করতে যাওয়ার কথা। অনেকদিন ধরে পরিকল্পনা হচ্ছে, ওই বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলে এখন শুধু সেই আলোচনা। জিওলজিক্যাল সার্ভে অফিস থেকে সেই অঞ্চলটার একটা ম্যাপ জোগাড় করেছে যিশু, ম্যাপটা ব্লো আপ করে টাঙিয়ে রেখেছে দেওয়ালে। সব পাহাড়ি রাস্তা ও তাঁবু ফেলার জায়গাগুলো লাল পেন্সিলের দাগ দেওয়া। একদিন সকালে দেখা গেল, সেই ম্যাপটা প্রায় ছিন্নভিন্ন। হাওয়ায় কিংবা ঝড়ের ঝাপটায় ছেঁড়া নয়, ছুরির মতন কোনও ধারালো অস্ত্র দিয়ে সেটা ফালা-ফালা করা হয়েছে, তা স্পষ্ট বোঝা যায়।

আগের দিন দুপুরবেলাতেও বাড়ি থেকে বেরুবার আগে যিশু ম্যাপটা অক্ষত দেখেছে। রাত্তিরে

ঘর বন্ধ থাকে, ছাদের দরজাতেও এখন প্রতিদিন মনে করে তালা লাগানো হয়। সকালে যিশু নিজে সেই তালা খুলেছে, দরজা যেমন বন্ধ ছিল, তেমন বন্ধ আছে, তাহলে ম্যাপটার ওই অবস্থা হল কী করে?

যিশুর চ্যাঁচামেচি শুনে বাড়ির সবাই উঠে এল ওপরে। ঘটনাটি দেখে কারুর মুখে কোনও কথা নেই। এটা এমনই ব্যাপার যে, কেউ কোনও মন্তব্য কিংবা নিজস্ব থিয়োরিও দিতে পারছে না। সকলেরই মনে-মনে একটা প্রশ্ন, তবে কী, তবে কী, তবে কী কোনও অশরীরী...।

কঙ্কাল খটখটিয়ে যেসব ভূতপেতনি ঘুরে বেড়ায়, তাদের গল্প একেবারেই বাচ্চাদের ভয় দেখাবার জন্য। হিন্দুদের মৃতদেহ পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হয়। সেই ছাই থেকে আবার শরীর ধারণ করা যে একেবারেই অসম্ভব, তা বিজ্ঞানের সাধারণ ছাত্রও জানে। তবু একটা ব্যাপারে অনেক জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরও খটকা আছে। আত্মার অস্তিত্ব সম্পর্কে। মৃত্যুর পরেও মানুষের আত্মা ভেসে বেড়ায়, অতৃপ্ত আত্মা জীবিতদের মধ্যে ফিরে আসতে চায়?

প্রমাণিত সত্য নয় বলে বিজ্ঞান এখনও আত্মার অস্তিত্ব মানে না। কিন্তু অনেকের বিশ্বাস তা মানে। বিশ্বাসীদের মতে, অতৃপ্ত আত্মাকেই সাধারণ মানুষ মনে করে ভূত।

ছুটির দিন বলে, একটু বেলার দিকে বেড়াতে এলেন তুতুল মাসি। তাঁর দুই ছেলেমেয়ে ও স্বামীকে নিয়ে। আগে থেকেই এ দিকে আসার ঠিক ছিল। তুতুল মাসির স্বামী নীরজ হালদার নির্বিরোধী, শান্ত প্রকৃতির মানুষ, সবসময় স্ত্রীর বাধ্য। সে বাধ্যতার পুরস্কার হিসেবে প্রায়ই তিনি স্ত্রীর কাছ থেকে ক্যাবলা, হ্যাবলা, বুদ্ধি কম, এইসব বিশেষণ পান। ছেলেমেয়ে দুটিও ভয় পায় মাকে।

তুতুল মাসি তো সব ঘটনা শুনলেন। সঙ্গে-সঙ্গে তিনি রায় দিলেন জোর গলায়। ফেং শুই! ফেং শুই না মেনে বাড়ি বানানো হয়েছে, তাই এইসব অঘটন ঘটছে। তোমাকে তখনই বলেছিলুম সেজদি, উত্তর দিকে সদর দরজা কোরো না। তুমি শুনলে না। পুব কিংবা দক্ষিণ দিকে অনেক জায়গা ছিল। জানলাগুলোও যেন কেমন ধারা।

যিশু কৌতুক করে বলল, ফেং শুই না মানলে বুঝি বাড়ি থেকে জিনিসপত্র উধাও হয়ে যায়?

গভীর বিশ্বাসী চোখে তুতুল মাসি বললেন, মাসছয়েক আগে দিদির স্কুলের আগেকার হেড মিসট্রেস জয়ন্তীদি মারা গেলেন না? কী হিংসেই করতেন দিদিকে। কতবার ল্যাং মারার চেষ্টা করেছেন। ওইসব হিংসুটি মানুষদের মরে গেলেও মুক্তি হয় না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তারই আত্মা এইসব উপদ্রব করছে। ফেং শুই মেনে বাড়ি বানালে সে বাড়িতে কোনও দুষ্টু আত্মা নাক গলাতে

যিশু বলল, দুষ্টু আত্মার বুঝি চান করার জন্য মগ লাগে?

তুতুল মাসি বললেন, তুই চুপ কর তো। ইয়ার্কি হচ্ছে আমার সঙ্গে?

যিশু বলল, না, ইয়ার্কি না, সিরিয়াসলি বলছি, আত্মা তো অশরীরী। তাই না? কোনও অশরীরী পেত্র টাচ করবে কী করে?

তুতুল মাসি বললেন, আত্মারা সব পারে তখন ওদের অসাধারণ শক্তি হয়।

যিশু ওদের ক্ষতি করার একটা দামি ঘড়ি ভাঙবে। কিন্তু আমার ঘরের ম্যাপ কাটবে কেন? মেনিই সাপ। আত্মারা কি পাহাড়কে ভয় পায়?

স তুই থাম করতে চাই না। ভারি দু পাতা ইংরিজি

যিশু হাল ছাড়ল না বলল, আমি হ আমি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ি টাচ, এনার্জি, ফিউশন এই বিজ্ঞানে যা প্রমাণিত হয়নি নিয়ে

কোনও ম্যাটারকে—

তুতুল মাসি বললেন, তোদের বিজ্ঞান অনেক কিছুই পারে না। ওইটুকু যে ছোট্ট একটা প্রাণী, মশা, বিজ্ঞান তাদের এই পৃথিবী থেকে শেষ করে দিতে পেরেছে?

যিশু বলল, তুমি ভূতের সঙ্গে মশার তুলনা দিলে? ভূতরা রেগে যাবে না?

যিশুর গায়ে একটা চাপড় মেরে মাসি বললেন, তুই থাম তো!

তারপর নীলাঞ্জনার দিকে তাকিয়ে বললেন, দ্যাখ তো এই মেয়েটাকে। কী শান্ত, কখনও তর্ক করে না মুখে-মুখে। কেমন আছিস রে খুকি? পায়ের ব্যথাটা কমেছে?

মাথা হেলিয়ে নীলাঞ্জনা বলল, হ্যাঁ।

কিছুক্ষণের জন্য ভূতের প্রসঙ্গ এড়িয়ে তুতুল মাসি নীলাঞ্জনার প্রশংসায় মেতে উঠলেন। সত্যিই তিনি খুব ভালোবাসেন নীলাঞ্জনাকে। তার গুণের বর্ণনা করতে-করতে উচ্ছ্বসিত হয়ে যান। অরুণবর্ণ হয়ে যায় নীলাঞ্জনার মুখ।

তুতুল মাসি নীলাঞ্জনার পিঠে হাত বুলোতে-বুলোত বললেন, জানো দিদি। এক-একজন মানুষকে দেখলেই বোঝা যায়, তারা ভগবানের খুব প্রিয়। ভগবান সবসময় নজর রাখেন তাদের ওপর। আমাদের খুকি সেরকম একজন, যে-কোনও বিপদ থেকে ভগবান সবসময় ওকে রক্ষা করবেন।

যিশু আবার ফস করে বলে উঠল, তাহলে খুকির পা ভাঙল কী করে? ভগবান কি তখন অন্যমনস্ক ছিলেন, না খেতে বসেছিলেন!

ছোট ভাইটাও এবার হেসে উঠল এই কথা শুনে।

তুতুল মাসি বললেন, ভগবানকে নিয়ে ঠাট্টা-ইয়ার্কি করতে নেই। বাবলু, ওরকম ভাবে হাসবি না কক্ষনো। ভগবান যা করেন, তা মঙ্গলের জন্য। খুকির পা ভেঙেছে, তার মানে ওর একটা কোনও বড় ফাঁড়া কেটে গেল। ও তো আছাড় খেয়েছে প্ল্যাটফর্মে, যদি ভিড়ের ধাক্কায় চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে যেত, তা হলে কী হত? ভাবলেও ভয় করে। কলকাতায় কলেজে আর ওকে পড়তে যেতে হবে না!

তার পরেই নিজের দিদির দিকে তাকিয়ে বললেন, সদর দরজাটায় দেওয়াল তুলে বন্ধ করে দাও। দক্ষিণের দিকে গেট বসাও, না হয় একটু ঘুরে এসে বাড়িতে ঢোকা হবে। আর একটা যজ্ঞ করতে হবে। জাস্টিস অনিন্দ্য চৌধুরীর বাড়িতেই তো এরকম একটা যজ্ঞ হল। সে বাড়ির কোনও জানলায় ছিটকিনি লাগত না।

সম্পূর্ণা খুবই অবাক হয়ে বললেন, জানলায় ছিটকিনি লাগত না বলে যজ্ঞ?

তুতুল মাসি বললেন, হ্যাঁ গো, কতবার মিস্তিরি ডেকে ঠিক করা হয়েছে, তবু ঠিক হয় না, যখন-তখন জানলা খুলে যায়। অনিন্দ্য চৌধুরীর স্ত্রী তো মাতৃসেবা সংঘের প্রেসিডেন্ট, তাই আমাদেরও নেমন্তন্ন করেছিলেন। জানো দিদি, ওঁদের ছেলে টংকার, অনেকদিন বিলেতে ছিল, সে হঠাৎ ফিরে এসেছে। ও দেশ তার আর ভালো লাগে না। এখন এখানেই বিজনেস করবে। কী ভালো ছেলে! যেমন চেহারা সুন্দর, তেমনি ভালো স্বভাব। স্মার্ট। আমাদের খুকির সঙ্গে চমৎকার মানাবে। আমাদের খুব ইচ্ছে, তুমি যদি মত দাও তো আমি ওঁদের সঙ্গে কথা বলতে পারি। ওরকম নামকরা ফ্যামিলি, কিন্তু টাকাপয়সার কোনও গুমোর নেই। খুকিকে একবার দেখলেই ওঁদের পছন্দ হয়ে যাবে।

এরপর আর এ-ঘরে থাকা যায় না। মুখ নীচু করে বেরিয়ে গেল নীলাঞ্জনা।

যিশুও সিগারেট টানার জন্য চলে গেল ছাদের ঘরে।

নিজের ঘরে এসে নীলাঞ্জনা জানলার শিক ধরে দাঁড়িয়ে রইল পুকুরের দিকে চেয়ে। রাগে তার শরীর জ্বলছে খুব রাগ হলে চোখে জল এসে যায়। যখনই কেউ তার একটানা প্রশংসা করে, তখনই তার অসহ্য বোধ হয়। সেইসব প্রশংসার ভাষা কী, সে খুব শান্ত, সে লাজুক, সে মুখে-

মুখে তর্ক করে না। এর প্রত্যেকটাই তো তার অযোগ্যতা। সে সত্যি কথা বলতে পারে না, সে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারে না, সে জোর দিয়ে কিছু চাইতে পারে না।

প্ল্যাটফর্মে আছাড় খেয়ে তার পা মটকে গেছে। এরকম ছোটখাটো অ্যাকসিডেন্ট তো অনেকেরই হয়। তা বলে তার আর্ট কলেজে যাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে? সে এতই দুর্বল যে জোরালো প্রতিবাদও করতে পারেনি। প্রতিবাদ করেনি বলেই সে ভালো? সে মা-বাবার অন্যায় মেনে নিয়েছে।

তুতুল মাসির বর ভদ্র, শান্ত ধরনের মানুষ। কিন্তু পুরুষ মানুষ বলেই এগুলো তাঁর অযোগ্যতা। ক্যাবলা, হাঁদারাম। আর মেয়েদের এইগুলোই গুণ। যিশু বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে এক-একদিন কত দেরি করে ফেরে, কালই তো ফিরেছে রাত সাড়ে দশটায়, একটু নেশাও করেছিল, তাকে বাবা-মা কিছুই বলে না, আর নীলাঞ্জনার কোনওদিনই সন্ধের পর বাড়ির বাইরে থাকার উপায় নেই! সে যে ভালো মেয়ে।-সে মা-বাবাকে দুশ্চিন্তায় ফেলে না। কীসের দুশ্চিন্তা? যাতে সে অবাধ্য বা মন্দ হয়ে না যায়!

নীলাঞ্জনা যে আসলে কী ভাবে, তা কেউ জানে না। সে এরকম ভালো হয়ে থাকতে চায় না। ভালো হওয়া মানে দুর্বলতা। সে আসলে দুর্বল। সে চিৎকার করে বলতে চায়, না, না আমি ভালো হতে চাই না। চাই না। চাই না। মুখে বলে না, ভেতরে-ভেতরে ফুঁসতে থাকে। যেন তার শরীরে প্রবাহিত সব রক্তস্রোতের সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে রাগ। তখন কিছু একটা নষ্ট করতে কিংবা ভাঙতে ইচ্ছে করে।

সেই রাগেই সে ভেঙেছিল তার প্রিয় টেবিল ঘড়িটা। সেই ঘড়ি সবসময় টিক-টিক করে সময় জানায়। এক ঘণ্টা পরপর একটা সুর বেজে ওঠে, সেই সুর জানিয়ে দেয়, জীবন থেকে একটা ঘণ্টা খরচ হয়ে গেল। নীলাঞ্জনার জীবনে তো সময়ের কোনও মূল্যই নেই। সে চিরবন্দিনি, ভদ্রতার কাছে, ভালোমানুষির কাছে। সেটা মনে হতেই সে ঘড়িটা ঠুকে-ঠুকে ভেঙেছিল। সেটার সব কলকব্জা নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল পুকুরের ধারে।

বাথরুমের নতুন মগটাও সে ওইভাবেই ফেলে দিয়েছিল পুকুরের জলে। সেটা জল ভরা ছিল, তাই সঙ্গে-সঙ্গে ডুবে গেছে।

যিশুর ঘরের ম্যাপটা ফালা-ফালা করাও তো তারই কীর্তি। কেন তার ভাই দেওয়ালে পাহাড়ের অতবড় একটা ম্যাপ টাঙিয়ে রাখবে? বন্ধুদের নিয়ে সে যাবে ট্রেকিং-এ, মাথার ওপর বরফ রঙের শরৎকালের আকাশ, মাঝে-মাঝে নীল হ্রদ, কোমরে দড়ি বেঁধে পাথরের খাঁজে-খাঁজে পা দিয়ে উঠছে চারটে ছেলে, নীলাঞ্জনা কল্পনায় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল, সন্ধেবেলা ওরা তাঁবুতে বসে আড্ডা মারতে-মারতে ব্র্যান্ডির বোতলে চুমুক দেবে, হঠাৎ শোনা যাবে বাতাসের শোঁ-শোঁ আওয়াজ, কাছেই একটা ঝরনা...। নীলাঞ্জনা কোনওদিন যেতে পারবে ওখানে? সাড়া দিতে পারবে সুদূরের হাতছানিতে? আজকাল কিছু-কিছু মেয়েও এ-ভাবে যায়, নিজের দল বেঁধে, কিংবা পুরুষদের সঙ্গে। একটি মেয়ে তো এভারেস্টের চূড়াতেও উঠেছিল। নীলাঞ্জনা পারবে না, তার সে সাহস নেই, বাবা-মাকে এমন প্রস্তাব দিলে তাঁরা আঁৎকে উঠবেন, সে জোর করতে পারবে না। তার নিজেরই এই অক্ষমতা তার ব্যর্থতার জন্য, অন্য কারুর ওপরে নয়, তার নিজের ওপরেই খুব রাগ হয়। সেই রাগে সে ফুঁসতে থাকে। যিশুর ঘরে সে গিয়েছিল একটা জেমস ক্লিপের খোঁজে। দেওয়ালের পাহাড় উপত্যকার মানচিত্র হঠাৎ তার অসহ্য বোধ হল। কেন ওই পাহাড়ে তার যাওয়া হবে না? তাহলে পাহাড়টাই মুছে যাক।

যিশুর দাড়ি কামানোর ব্লেড দিয়ে সে ম্যাপটাকে...

আজও তুতুল মাসির কথা শুনে তার সেরকম রাগ হচ্ছে। ভালো মেয়ের নিকুচি করেছে! জোরে-জোরে নিশ্বাস ফেলতে-ফেলতে তার একবার ইচ্ছে হল জানলার গ্রিলের খানিকটা ভেঙে ফেলতে। তারপর সে পাখি হয়ে উড়ে যাবে।

কিন্তু শিক ভাঙার ক্ষমতা তার নেই। তাহলে কি গলায় দড়ির ফাঁস বেঁধে সে এই ভালোমানুষি থেকে মুক্তি নেবে? কিন্তু মরতে তো তার ইচ্ছে করে না! সে ছবি আঁকার একগুচ্ছ তুলি নিয়ে ছুড়ে ফেলে দিল বাইরে। একটা হলুদ রঙের টিউব থেকে খানিকটা রং সে মাখল সারা মুখে। এখন তাকে দেখাচ্ছে অন্যরকম। তার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে।

ফিসফিস করে সে বলতে লাগল, মরব কেন, মরব না! আমি আর ভালো মেয়ে থাকব না। এবার থেকে আমি ইচ্ছে মতন যা খুশি করব। যা খুশি, যা খুশি!

তবে বাবার টেবিলের তলায় কমলালেবুর খোসাটা সে ফেলেনি। কে ফেলেছে, কিংবা কোথা থেকে সেটা এল তা নীলাঞ্জনা জানে না। সেটা রহস্যই রয়ে গেল!

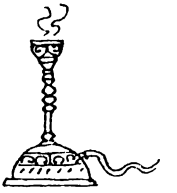

দুই বন্ধু

মাসে ছ'মাসে সত্যচরণ একবার করে আসেন বন্ধু সদাশিবের সঙ্গে দেখা করতে। দুজনেরই বয়েস এখন আশি ছুঁই-ছুঁই। সদাশিবের তুলনায় সত্যচরণ এখনও বেশ শক্তসমর্থ আছেন, দিব্যি একাই হেঁটে চলে আসেন নারকেলডাঙা থেকে ভবানীপুর। ভিড়ের ট্রামে বাসে চড়তে-নামতেই বরং তার অসুবিধে হয়। হাঁটার অভ্যেসটা তাঁর বরাবরের।

সদাশিব নিজস্ব গাড়ি চালিয়েছেন যৌবন বয়েসে থেকেই। একসময় তাঁর স্টুডি-বেকার গাড়ি ছিল। হাঁটা দূরের কথা, তিনি ট্রাম-বাসেও চেপেছেন জীবনে খুবই কম। হয়তো সেই কারণেই তাঁর দুটো হাঁটুই গেছে, এখন সিঁড়ি দিয়ে একটুখানি উঠতেই প্রবল কষ্ট হয়। সেইজন্য তিনি তিনতলাতেই বসে থাকেন প্রায় সর্বক্ষণ।

সত্যচরণের রোগা, লম্বা চেহারা। হাতে সবসময় একটা ছাতা থাকে, সেই ছাতাটাই লাঠির কাজ করে। তিনি অবশ্য ধুতির বদলে প্যান্ট-শার্ট পছন্দ করেন, বরাবর একটা বিদেশি কোম্পানিতে চাকরি করেছেন বলেই। এখন অবশ্য তাঁর বড় ছেলেরই প্রায় রিটায়ার করার বয়স হয়ে গেল!

সন্ধের সময় তিনি ভবানীপুরে এসে বন্ধুর বাড়ির সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাঁক দেন, সদাশিব! সদাশিব!

এ বাড়ির গেটে কলিং বেল আছে, কিন্তু সেকথা মনে থাকে না সত্যচরণের। বরাবর এই রকম চেঁচিয়ে ডাকাই অভ্যেস।

সদাশিবের বাড়িটা বেশ বড়। নাতি-নাতনি, ভাগ্নে-ভাগ্নি নিয়ে প্রায় কুড়ি-বাইশজনের সংসার। প্রেসের ব্যাবসা করে সদাশিব প্রচুর সম্পত্তি করেছেন। সে ব্যাবসা এখনও ভালোই চলছে। দুই ছেলে সেই ব্যাবসা দেখে, কিন্তু এই বয়েসেও সদাশিব সব কিছুর কর্তৃত্ব ছেড়ে দেননি। নিজে আর প্রেসে যেতে পারেন না, তবু ঘরে বসেই টেলিফোনে সব খবর নেন, নির্দেশ পাঠান। এখনও পাঁচ হাজার টাকার বেশি অঙ্কের সই করার অধিকার শুধু তাঁর একার।

সত্যচরণকে এ-বাড়ির সবাই চেনে, সবাই খাতির করে। তিনি এ-বাড়ির কর্তাবাবুর বন্ধু। একমাত্র প্রাণের বন্ধু বলা যেতে পারে। সদাশিবের সঙ্গে সত্যচরণের কোনও স্বার্থের সম্পর্ক নেই। ব্যাবসার সম্পর্ক নেই। কোনওদিন তিনি সদাশিবের প্রেস থেকে বিনা পয়সায় নিজের নামে একটা প্যাডও ছাপাননি। বরং যেদিনই তিনি এ-বাড়িতে আসেন, কুড়ি-পঁচিশ টাকার একটা মিষ্টির হাঁড়ি

আনেন বাড়ির ছেলেমেয়েদের জন্য।

সন্ধের পর সদাশিব বেশ কিছুক্ষণ পুজো-আচ্চায় কাটান। তিনতলাতেই ঠাকুরের ঘর। উদাত্ত কণ্ঠে স্তোত্রপাঠ করেন সদাশিব। এক-এক সময় তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়ায়। তাঁদের পরিবার আগে ছিল শাক্ত, কিন্তু সদাশিব বৈষ্ণব হয়েছেন অনেকটা। তিনি মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁর শোওয়ার ঘরে মস্ত বড় একটা কৃষ্ণের ছবি।

এই বয়েসেও অবশ্য সত্যচরণের ধর্মে মতি হয়নি! তাঁর পুজো আচ্চার বালাই নেই। বাড়ি থেকে না বেরোলে তিনি সন্ধের সময় থেকে একমনে টি ভি দেখেন, একেবারে শেষ পর্যন্ত!

দুই বন্ধুর স্বভাবে কিংবা জীবনযাত্রায় প্রায় কোনও মিলই নেই। তাঁদের আর্থিক অবস্থাও একরকম নয়। তবু, প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে দুজনের বন্ধুত্ব টিকে আছে, কখনও বড় রকমের মনোমালিন্য হয়নি। বেশ কিছুদিন পরস্পরকে না দেখলে দুজনেই ছটফট করেন।

তিনতলার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতেও সত্যচরণ ডাকেন, সদাশিব! সদাশিব!

বন্ধুর ডাক শুনলেই সদাশিব পুজোর ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। পুজো শেষ হোক বা না হোক। খুশিতে ঝলমল করে তাঁর মুখ। তিনি হাত বাড়িয়ে বলে ওঠেন, এসো সতু, এসো! এবার অনেকদিন পর এলে!

তারপর তিনি বন্ধুকে নিয়ে শোওয়ার ঘরের দরজা বন্ধ করে দেন!

দুই বৃদ্ধের এমন কী গোপন কথা থাকতে পারে, যা দরজা বন্ধ করে বলতে হবে? সদাশিবের ছেলেমেয়েদের ধারণা, ওঁরা দুজনেই ওইসময় মদ খান!

তা এই বয়েসে এত ঢাক-ঢাক গুড়গুড়েরই বা দরকার কী? সদাশিব এ-বাড়ির বড় কত্তা, তিনি মদ খেলেই বা কে আপত্তি করবে? তাঁর স্ত্রীও বেঁচে নেই। দুই ছেলেই নিয়মিত মদ্যপান করে। আজকাল বড়-বড় কোম্পানির অর্ডার আদায় করতে গেলে পার্টি দিতে হয়। আর পার্টিতে কি মদ ছাড়া চলে?

সদাশিবের ঘরের আলমারিতে সত্যিই থাকে রকমারি মদের বোতল। কিন্তু তিনি মাসের-পর-মাস মদ ছুঁয়েও দেখেন না। একমাত্র সত্যচরণ এলেই দুটি গেলাস নিয়ে বসেন। সে সময় তাঁর ঘরে অন্য কারুর ঢোকা নিষেধ।

সত্যচরণ জীবনে কখনও দু-পেগের বেশি মদ্যপান করেননি এক বৈঠকে। নেশা করার প্রশ্নই ওঠে না। তিনি আবার তো হেঁটেই ফেরেন নারকেলডাঙায়। কোনওদিন তাঁকে কেউ বেচাল হতে দেখেনি।

এতদূর থেকে আসেন তিনি, সদাশিবও তাঁকে দেখলে যথার্থ খুশি হন, তবু দুই বন্ধুর গল্প করার ধরনটা অদ্ভুত!

প্রথমে পারিবারিক কুশল প্রশ্ন, তারপর দুজনের শারীরিক খবরাখবর তো বিনিময় হবেই। তাও বেশ সংক্ষেপে ও মৃদু গলায় তারপর দুজনেই চুপ।

এই বয়েসে বোধহয় সামনাসামনি বসলেই অনেক কিছু বোঝাবুঝি হয়ে যায়, মুখে আর কিছু বলার দরকার হয় না।

অনেকক্ষণ পর, দ্বিতীয় পেগ প্রায় অর্ধেক শেষ করার পর সদাশিব হঠাৎ বলে ওঠেন, তা হলে ওটা কুকুরই ছিল, কী বলো, সতু?

সত্যচরণ মাথা দোলাতে-দোলাতে উত্তর দিলেন, না হে, অত ছোট প্রাণী তো নয়! কুকুর হবে কী করে?

সদাশিব আরও জোর দিয়ে বলেন, অনেক বড় সাইজের কুকুরও হয়। মনে করো, ওটা অ্যালসেশিয়ান!

সত্যচরণ বলেন, ওই ধাদ্ধারা গোবিন্দপুরে কে অ্যালসেশিয়ান পুষবে? অত রাতে লোকের

পোষা দামি কুকুর রাস্তায় ছাড়া থাকবেই বা কেন?

সদাশিব ব্যগ্রভাবে বললেন, তবে কি গাধা? হ্যাঁ, গাধাই হবে নিশ্চয়। ওদিকে ধোপাটোপারা থাকে।

সত্যচরণ আর কিছু না বলে মুকচি-মুচকি হাসেন। এবার তাঁর ওঠবার সময় হয়েছে। বছরের-পর-বছর ধরে দুই বন্ধুর প্রায় এই একই ধরনের আড্ডা চলে আসছে। শেষের দিকে উত্তেজিতভাবে সদাশিব বন্ধুর হাত চেপে ধরে বলতে থাকেন, আমি বলছি, ওটা গরু ছিল না। গাধা কিংবা কুকুর? এমনকী ছাগলও হতে পারে...

সদাশিব ব্যাকুলভাবে বলেন, বিশ্বাস করো, সতু, আমি গোহত্যা করিনি! আমি নিজের চোখে দেখেছি...

প্রায় পঁচিশ বছর আগেকার একটা ঘটনা। তখন সদাশিবের একটা বাগানবাড়ি ছিল মধ্যমগ্রামে। সেই বাড়িটা এখনও তাঁর আছে, তবে বাগান আর নেই, ভাড়া দেওয়া হয়ে গেছে।

মাঝে-মাঝে শনিবার সন্ধেতে সদাশিব বন্ধুবান্ধব নিয়ে সেই বাগান বাড়িতে যেতেন ফুর্তি করতে। মেয়েঘটিত দোষ তাঁর ছিল না, গান-বাজনার খুব শখ ছিল। ওইখানে মদ্যপানের সঙ্গে গান-বাজনারই চর্চা হত।

একবার বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল। তা প্রায় সাড়ে এগারোটা হবে। সত্যচরণকে পাশে বসিয়ে নিজে গাড়ি চালিয়ে ফিরছিলেন সদাশিব। ঈষৎ নেশা হলেও তাঁর হাতে স্টিয়ারিং ঠিক ছিল। কথা বলছিলেন একটু বেশি, সিগারেট টানছিলেন ঘনঘন। গঙ্গানগরের মোড়টার কাছে গাড়ি ঘোরাতে যাবেন, এমনসময় আচম্বিতে সাদা-সাদা মতন কী যেন একটা দৌড়ে এল রাস্তার মাঝখানে। সদাশিব ব্রেক কষতে একটু দেরি করে ফেললেন, অত ভারী গাড়িতে মড়মড় করে হাড় ভাঙার শব্দ হল।

সদাশিব হতবুদ্ধি হয়ে গিয়ে বলেছিলেন, কী হল, সতু, কী হল, কী চাপা দিলাম?

একটু দূরেই মাঠের মধ্যে যাত্রাপালা হচ্ছে। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে মঞ্চটা, নাকি-নাকি গলায় পুরুষেরা ফিমেল পার্ট করছে, তখনও যাত্রায় আসল মেয়েদের নেওয়াটা চল হয়নি। কয়েক হাজার লোক মুগ্ধ হয়ে শুনছে সেই যাত্রা, তারা ব্রেক কষার কর্কশ শব্দটা শুনতে পেয়েছে।

এই বুঝি তেড়ে-তেড়ে আসবে দলে-দলে মানুষ!

সামান্য একটা ছাগল চাপা দিলেও এখন লোকে একশো-দুশো টাকা দাবি করে। পাড়ার কুকুর মরলেও তাদের শোক উথলে ওঠে।

সত্যচরণ বন্ধুকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলেছিলেন, থেমে রইলি কেন? লোকের হাতে মার খেয়ে মরবি যে! শিগগির স্টার্ট দে!

সদাশিব তবু ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে বলেছিলেন, কী চাপা দিলাম?

সত্যচরণ ব্যস্ত হয়ে বললেন, ওটা একটু গরু! শিগগির চল!

যাত্রার শ্রোতারা রাস্তায় এসে পৌঁছবার আগেই সদাশিব গাড়ি স্টার্ট দিলেন আবার, হুশ করে বেরিয়ে গেলেন। কয়েকজন লোক ইট ছুঁড়ে মেরেছিল, তাও গাড়িতে লাগেনি।

বিপদ হল না আর কিছু। কেউ কিছু জানতেও পারল না।

তারপর থেকেই সদাশিব নিজে গাড়ি চালানো ছেড়ে দিয়েছেন। বাড়িতে এখন দুজন ড্রাইভার। মধ্যমগ্রামের সেই বাড়িতেও আর কখনও ফুর্তি করতে যাওয়া হয়নি। সদাশিব বিশ্বাস করেছিলেন যে তিনি একটা গরুকে চাপা দিয়েছিলেন। এমন কিছু নয়।

বছরকয়েক পরে তাঁর মনে খট্‌কা লাগল। গো-হত্যা তো মহাপাপ। তাঁর প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত। কিন্তু সত্যই কি সেটা গরু ছিল। সত্যচরণের মুখের কথা ছাড়া আর কী প্রমাণ আছে? গরু চাপা দিলেও পাবলিক রেগে যায়, গাড়িতে তাড়া করে। সেইজন্যই কি সত্যচরণ বলেছিলেন গরুর কথা? কিন্তু একটা ধোপার গাধাকে যদি চাপা দেওয়া হয়, সে রাগ করে তেড়ে আসবে না? কিংবা

যদি কারও বাড়ির পোষা কুকুর হয়? অনেক সময় পাড়ার একটা নেড়ি কুত্তাও কিছু মানুষের বড় ন্যাওটা হয়ে যায়, সেই কুকুরটা অপঘাতে মরলেও তারা দুঃখ পায়!

সেই দুর্ঘটনার কথা সদাশিব এ পর্যন্ত আর কারুকে ঘুণাক্ষরেও বলেননি। শুধু সত্যচরণ ছাড়া আর কেউ জানে না। সত্যচরণও নিজে থেকে কখনও তোলেন না সেই প্রসঙ্গ।

গরু চাপা দেওয়ার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করলে তো স্বীকার করা হয়েই গেল যে তিনি গো-হত্যা করেছেন। সারাজীবন সেজন্য কি একটা অনুশোচনা থেকে যাবে না?

কিন্তু কুকুর কিংবা গাধা হলে প্রায়শ্চিত্তও করার প্রশ্ন নেই, অনুশোচনাও হবে না। একমাত্র সত্যাচরণই পারে সেইটা ঠিক করে দিতে!

কিন্তু সত্যচরণ সেই যে একবার গরু বলেছে, আর কিছুতেই ফেরাবে না সেকথা!

সত্যচরণের ছেলের বিয়ের সময় সদাশিব তাঁর বরানগরের একটা ছোট বাড়ি তাঁকে উপহার দিতে চেয়েছিলেন। সত্যচরণ হেসে বলেছিলেন, পাগল নাকি! তোর বাড়ি নিতে যাব কেন, সদু? ছেলের যদি যোগ্যতা থাকে, সে নিজেই একদিন বাড়ি করবে!

সত্যচরণ চাকুরিজীবী ছিলেন, চিরকাল ভাড়া বাড়িতে কাটিয়ে গেলেন! তাঁর ছেলেও আজও বাড়ি করতে পারেনি।

সত্যচরণের ছোটমেয়ের সঙ্গে সদাশিব নিজের মেজোছেলের বিয়ে দেওয়ার জন্য খুব উঠে পড়ে লেগেছিলেন। দুই পরিবারে জাতেরও অমিল নেই, থাকলেও সদাশিব বোধহয় গ্রাহ্য করতেন না। বন্ধুর চেয়ে বড় জাত আর হতে পারে নাকি? সে বিয়ের ব্যাপারে সত্যচরণ উৎসাহও দেখাননি, আপত্তিও করেননি। পরে জানা গেল, সেই মেয়ে তার বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বন্ধুকে পছন্দ করে বসে আছে। সত্যচরণ মেয়েকে শাসন করে, সেই সম্পর্ক ভেঙে, বন্ধুর ঘরে কন্যা দেওয়ার জন্য কোনও উদ্যোগ নিলেন না, মেয়ে সেই সহপাঠীকে বিয়ে করেই দিল্লি চলে গেল। সত্যচরণের মতিগতি বোঝা বড় শক্ত।

মাঝে-মাঝে সদাশিবের সন্দেহ হয়, তিনি গোহত্যাকারী এই ভেবেই কি সত্যচরণ তাঁর মেয়ের বিয়ে দিতে চাইল না এ-বাড়িতে? তাঁর বন্ধু কি তাঁকে মনে-মনে ঘৃণা করে? কিন্তু সত্যচরণ নিজে থেকেই তো আসেন এই বাড়িতে বন্ধুর খোঁজ নিতে।

এক শীতকালে সন্ধেবেলা সত্যচরণ আবার নারকেলডাঙা থেকে হাঁটতে-হাঁটতে এলেন ভবানীপুরে। এসে দেখলেন সদাশিবের বাড়িতে যেন কীসের হুলুস্থুল। বাড়ির সামনে দু-খানা অন্য লোকের গাড়ি। কিছু লোক ব্যস্ত হয়ে বাড়ির মধ্যে আসছে-যাচ্ছে। বৈঠকখানায় বসে আছে একদঙ্গল লোক।

সত্যচরণ রাস্তা থেকে বন্ধুর নাম ধরে ডাকবার আগেই সদাশিবের মেজো ছেলে আদিত্য হন্তদন্ত হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে বলল, এই যে সত্যকাকা, আপনি এসে গেছেন? আপনার বাড়িতে টেলিফোন করেও লাইন পাইনি, একজন লোক পাঠাচ্ছিলুম।

সত্যচরণ বিপদের গন্ধ পেলেন। তবে কি এরই মধ্যে সব শেষ?

আদিত্য বলল, আজ বেলা এগারোটায় বাবার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। কলকাতার সবচেয়ে বড় দুজন স্পেশালিস্টকে ডেকে এনেছি, কিন্তু কী মুশকিল বলুন তো, একজন বলছেন, এই অবস্থায় রিম্যুভ করাটা খুব রিস্কি। আর-একজন বলছেন, নার্সিং হোমে নিয়ে না গেলে ঠিক চিকিৎসা হবে না। এখন কী করি বলুন তো! এদিকে বাড়ির সবাই আর আত্মীয়জনরাও দু-রকম বলছেন। বড়দা এখানে নেই, সব দায়িত্ব আমার। এখন যাচ্ছি, একজন থার্ড ডাক্তারের ওপিনিয়ান নিতে।

সত্যচরণ জোর করে নিজের মতামত জাহির করেন না। তা ছাড়া, এইসব ব্যাপারে ডাক্তারই ভালো বুঝবে। তিনি একটুক্ষণ চুপ করে থেকে জিগ্যেস করলেন, তোমার বাবার সঙ্গে কি দেখা করা যাবে? দেখা করা ঠিক হবে?

আদিত্য বলল, এখন ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আপনি চলে যাবেন না। বুকে ব্যথার সময় বাবা বারবার আপনার কথা বলছিলেন। আপনি বরং বাবার কাছে গিয়ে একটু বসুন।

সত্যচরণ সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলেন ধীরে-ধীরে। তিনি ভাবলেন, যথেষ্ট বয়েস হয়েছে সদাশিবের, নার্সিংহোমে হাসপাতালে যাওয়ার আর কী দরকার। বাড়িতে আপনজনদের মুখ দেখতে-দেখতে শান্তিতে চলে যাওয়াই তো ভালো!

তাঁর মনে হল, এবার বোধহয় তাঁরও দিন ঘনিয়ে এসেছে!

গরম নেই আর তেমন, একটু বরং ঠান্ডা-ঠান্ডা ভাবই পড়েছে, তবু সদাশিবের শিয়রের কাছে বসে পুরোনো আমলের ঝালর দেওয়া পাখা দিয়ে বাতাস করছে তাঁর এক পুত্রবধূ। অন্য এক পুত্রবধূ সদাশিবের পায়ের পাতায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। এর কোনওটাই দরকার নেই, তবু এসব সেবার চিহ্ন। সদাশিব উইল করে রেখেছেন কি না, তাই-ই বা কে জানে!

সত্যচরণ একটা চেয়ার টেনে বসলেন, সদাশিবের দুই পুত্রবধূ তাঁকে দেখে মাথায় ঘোমটা টানার একটা ভঙ্গি করল। এ-বাড়িতে এখনও এসব প্রথার চল আছে। সদাশিব চলে গেলে আর থাকবে না।

চিত হয়ে চোখ বুজে শুয়ে আছেন সদাশিব। মুখে স্পষ্ট আসন্ন মৃত্যুর রং। তবে আজকালকার কড়া ওষুধে এই অবস্থা থেকেও অনেকে বেঁচে উঠে আরও দু-চার বছর হেসে-কেঁদে কাটিয়ে যায়।

প্রায় আধঘণ্টার মধ্যেই সদাশিবের জ্ঞান ফিরে এল কিংবা ঘুম ভাঙল। চোখ মেলেই সত্যচরণকে দেখে তিনি স্পষ্টত খুশি হয়ে উঠলেন। দুই পুত্রবধূকে তিনি বললেন ঘরের বাইরে যেতে। তারা কিছুটা আপত্তি জানিয়েও চলে যেতে বাধ্য হল। সত্যচরণকে আরও কাছে আসার ইঙ্গিত করে সদাশিব ফিসফিস করে বললেন, তোকে কেউ খবর দিয়েছে?

সত্যচরণ চেয়ারটা টেনে এনে বললেন, না, আমি আগে খবর পাইনি। এমনিই চলে এলাম।

সদাশিব বললেন, আমি আজ সারাদিন তোকে মনে-মনে ডেকেছি, তাই তুই আসতে বাধ্য হয়েছিল, সতু! তুই না এলে মরেও শান্তি হত না। দরজাটা বন্ধ করে দে। ওই আলমারিতে দ্যাখ হুইস্কি আছে, গেলাস আছে।

বন্ধু এতখানি অসুস্থ, সেই অবস্থায় তাঁর পাশে বসে সত্যচরণ মদ্যপান করবেন, এ কী অদ্ভুত প্রস্তাব!

সত্যচরণ মাথা নেড়ে বললেন, না, আজ আর ওসবের দরকার নেই।

সদাশিব কাতরভাবে বললেন, তুই একটু খা, সতু! তাতে আমার তৃপ্তি হবে। এতকাল আমরা একসঙ্গে...আজ তুই শুধু-শুধু বসে থাকবি তা কি হয়?

সত্যচরণ দৃঢ়ভাবে বললেন, সে প্রশ্নই ওঠে না। তুই ভালো হয়ে ওঠ, তারপর আবার আমরা একসঙ্গে বসে খাব।

সদাশিব বললেন, ভালো হয়ে উঠব! হ্যাঁ, কিন্তু যদি এ-যাত্রা না উঠি? মাথায় একটা পাপের বোঝা নিয়ে চলে যাব? সতু, এখন অন্তত সত্যি করে বল ওটা কি গরুই ছিল, না অন্য কোনও জানোয়ার?

সত্যচরণ চুপ করে রইলেন।

সদাশিব মাথাটা একটু উঁচু করে বললেন, সতু, একবার সেদিনের ঘটনাটা ভালো করে ভেবে বল।

সত্যচরণ তবু চুপ করে রইলেন। মধ্যমগ্রাম থেকে সেই রাতে ফেরার ঘটনাটা তিনি চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন।

সদাশিব দুর্বল হাতখানি তুলে বন্ধুর গায়ে রেখে বললেন, আর কেউ না জানুক, তুই তো জানবি, আমি গো-হত্যার পাপ মাথায় নিয়ে পৃথিবীর থেকে চলে যাচ্ছি! কিন্তু তোর তো ভুল হতেও

পারে, সেদিন অন্ধকার রাত ছিল, অমাবস্যার ঠিক পরের দিন...

সত্যচরণ এক দৃষ্টিতে বন্ধুর মুখের দিতে চাইলেন। মৃত্যুপথযাত্রীকে যে-কোনও কথা বলে সান্ত্বনা দিতে দোষ নেই। তিনি মৃদু হেসে বললেন, তোর সঙ্গে আমি এতকাল ঠাট্টা করতুম রে। সেটা ছিল আসলে একটা গাধা! কুকুর-টুকুর না, গাধা! স্পষ্ট দেখেছি! তুই গো-হত্যা করিসনি! গাধারা তো এরকম মরেই!

একটি তৃপ্তির নিশ্বাস ফেললেন সদাশিব। দু-চোখ দিয়ে গড়িয়ে এল জল। একটুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে তিনি তোশকের তলা থেকে টেনে বের করলেন একটা খাম। তার মধ্যে অনেককালের পুরোনো একটি মলিন খবরের কাগজের কাটিং। সেটা সদাশিব ছিঁড়ে ফেললেন টুকরো-টুকরো করে। তিনি যে গো-হত্যা করেননি, তার অকাট্য প্রমাণ এতদিন তাঁর কাছে জমা ছিল।

ওই কাগজের কাটিংটা সত্যচরণের চেনা। তাঁর কাছেও একটা আছে। ওই কাগজে ছাপা হয়েছিল গঙ্গানগরের মোড়ে সেই নিহত যুবকটির ছবি।



নিম্নগামী

স্নেহের বাবাজীবন অমিয়,

আমায় তুমি চিনিবা না। তোমার পিতাঠাকুর অকালে স্বর্গগত হইয়াছেন জানিয়া মর্মাহত হইলাম। এতদিন তোমাদের কোনও সন্ধানাদি জানিতাম না। সংবাদপত্রে তোমার পিতা শ্রীমান ভক্তিপদ'র মৃত্যুসংবাদ দেখিয়া তোমাদের ঠিকানা জানিলাম। তোমাদের আদি নিবাস ফরিদপুর জেলার পুব মাইজপাড়া গ্রামে, এমনই আমি মনে করিতেছি, আশা করি ইহাতে কোনও ভুল নাই। ভক্তিপদ ও শক্তিপদকে আমি অতি বাল্যকাল হইতেই স্নেহ করি। যাহা হউক, এখন কাজের কথা বলি। পুব মাইজপাড়া গ্রামে আমার দশকর্ম ভাণ্ডার দোকান ছিল, নিশ্চয় তোমার বাবা-কাকার নিকট সে দোকানের কথা শুনিয়াছ। তোমাদের পরিবার আমার খাতক ছিল। হিসাবপত্রে দেখিতেছি তাং তেরো শত ছাপ্পান্ন, তেইশে আষাঢ় পর্যন্ত আমার দোকান হইতে দুই শত বত্রিশ টাকার তৈজস ও একখানি লেপ বাবদ আরও একান্ন টাকা তোমরা ধারে লইয়াছ। আজও তাহা পরিশোধ করা হয় নাই। তুমি কৃতী হইয়াছ, আশা করি বংশের এই ঋণ তুমি জানিবা মাত্র শোধ করিয়া দিবে। আমি এই শনিবার অর্থাৎ ৪ঠা শ্রাবণ সকাল নয়টায় তোমার গৃহে যাইব। টাকার জোগাড় রাখিও।

ইতি

আং তোমার জ্যেঠা হরিনাথ পাইন

চিঠিখানা পড়ে দলা-মোচা করে ফেলে দিতে গিয়েও অমিয় থেমে গেল। তার মনটা বিস্বাদ হয়ে গেছে। এইরকম সময় কারুর সঙ্গে কথা বলতে হয়, নইলে শুধু নিজের ভেতরে-ভেতরে গজরে

গেলে একটা বিষবাষ্প মনকে আরও দুর্বল করে দেয়।

সে জোরে ডাকল, বুলা, বুলা।

সাড়া পাওয়া গেল না। দুটি ঘরের ছোট ফ্ল্যাট। অর্থাৎ বুলা এখন বাথরুমে। সন্ধে থেকেই অন্ধকার। অফিস থেকে ফিরে খাবার টেবিলেই চুপ করে বসেছিল অমিয়, সামনে একটা কেরোসিন ল্যাম্প জ্বলছে। বুলা চা তৈরি করে দিয়ে এই একটু আগেও তো এখানে বসে কথা বলছিল। গরম লাগলেই বুলা বাথরুমে গিয়ে শাওয়ার খুলে তার নীচে দাঁড়ায়। অথচ বেরিয়ে এলেই তো আবার ঘাম হবে।

অমিয়র মনের মধ্যে রাগ জমছে। সে টেবিলের ওপর থেকে খবরের কাগজটা টেনে নিল। এটা বাংলা কত সাল? বাড়িতে একটি মোটে ইংরেজি কাগজ রাখা হয়, তাতে বাংলা তারিখ নেই। ক্যালেন্ডারও একটি মাত্র, বিদেশি কোম্পানির। তখন অমিয় মনে-মনে হিসেব করতে লাগল। বাংলা সালের সঙ্গে পাঁচশো তিরানব্বই যোগ করলে ইংরেজি বছর। তাহলে...তাহলে...উনিশ শো উনপঞ্চাশ।

অমিয় দাঁতে দাঁত চেপে কিছু চেপে কিছু একটা অস্ফুট খারাপ কথা বলল।

আধঘণ্টা বাদে বুলা যখন বাথরুম থেকে বেরুল, তখন অমিয় বারান্দায় দাঁড়িয়ে আকাশ দেখছে। সামনে রাস্তা ঘাট মিশমিশে অন্ধকার, দেখবার কিছু নেই।

বুলা পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলল, আজ যদি রান্না না করি...বাইরে কোথাও গিয়ে খেয়ে নিলে হয় না? সস্তা কোনও জায়গায়...

মাসের তিন তারিখ মাত্র, এখন দু-একদিন এরকম বিলাসিতা করা যায়। অমিয় বলল, চলো, ক'টার সময় যাবে, সাড়ে আটটা? এখন তুমি মিনিটদশেক সময় দিতে পারবে, তোমার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।

বুলা একটু আড়ষ্ট হয়ে বলল, কী ব্যাপার, হঠাৎ গলার আওয়াজ এমন গম্ভীর হয়ে গেল যে!

—শোনো একটা ব্যাপারে আমার মেজাজটা খিঁচড়ে গেছে। তোমার সঙ্গে আলোচনা করলে আমার মনটা একটু হালকা হতে পারে। কিন্তু সেটা এক হিসেবে স্বার্থপরতাও হবে। আমার খারাপ-লাগাটা তোমার মনের মধ্যেও ছড়িয়ে যাবে খানিকটা।

—কী হয়েছে বলো তো?

—এই চিঠিটা পড়ো।

বুলাকে খাবারের টেবিলের আলোর কাছে গিয়ে পড়তে হল। ফিরে এসে বলল, এটা কি অদ্ভুত চিঠি?

—মনে হচ্ছে, এই শনিবার এক দ্বিতীয় শাইলক আসতে চাইছে আমাদের বাড়িতে।

—টাকা চাইছে তোমার কাছে। কী ব্যাপার কিছু বুঝতে পারলুম না। তোমার জ্যাঠামশাই হন?

—আমার কোনও জ্যাঠামশাই নেই। এই লোকটা কীরকম পাজি ভেবে দ্যাখো, বাবা মারা যাওয়ার খবর কাগজে দেখে লোকটা আমাকে লিখেছে, আসল উদ্দেশ্য টাকা চাওয়া।

—কীসের টাকা? তৈজস, লেপ এসব তোমার বাবা কিনেছিলেন ওই ভদ্রলোকের কাছ থেকে?

—কী করে আমি জানব? কবেকার কথা বলছে জানো? নাইনটিন ফর্টি নাইন, তখন আমি জন্মাইনি। আমার জন্মের আগে বাবা কারুর কাছ থেকে কিছু ধার করেছিলেন কি করেননি, সেই টাকা ওই লোকটা আমার চাইছে হাইট অব অডাসিটি!

—এতদিন চায়নি কেন?

...তার মানে বাবা ধার করেননি ওর কাছ থেকে। এসব মিথ্যে কথা। কাকা আগেই মারা

গেছেন, বাবাও গেলেন, তাই ও এখন আমার সেন্টিমেন্টে সুড়সুড়ি দিয়ে টাকাটা বাগিয়ে নিতে চাইছে। ওঁরা বেঁচে থাকলে জোচ্চুরিটা ধরে ফেলতেন।

—এরকমভাবে টাকা চায়, আমি আগে কখনও শুনিনি।

—লোকটা অতি নীচ। মানুষের এমন নীচতা আমি সহ্য করতে পারি না। যারা অন্যকে ঠকিয়ে নিজের সুখ চায়, তারা নরকের কীট।

—তুমি বেশ রেগে যাচ্ছ।

—রাগব না? ও আমাকে এমন বোকা ভেবেছে!

—তোমার মাকে জিগ্যেস করো ব্যাপারটা।

—কাগজে খবরটা দেখেই লোকটা মনে-মনে এই মতলব ভেঁজেছে। কিন্তু আমার ঠিকানা পেল কী করে?

—কাগজের রিপোর্টেই তো ছিল।

—কাগজে আমাদের বাড়ির ঠিকানা ছিল? না তো।

—ছিল না?

অমিয়র বাবা বিখ্যাত লোক ছিলেন না। তবু তাঁর মৃত্যু সংবাদ ও ছবি ছাপা হয়েছিল প্রায় সব খবরের কাগজের প্রথম পাতায়। স্কুল মাস্টারি থেকে রিটায়ার করেছিলেন, সাতষট্টি বছর বয়েসে, তাঁর স্বভাব ছিল রাস্তায়-রাস্তায় টো-টো করে ঘুরে বেড়ানো। কেন যে তিনি ভোরবেলা রাজভবনের সামনে গিয়েছিলেন তা কেউ জানে না। ওই সময় রাস্তা ফাঁকা থাকে তবু তিনি গাড়ি চাপা পড়লেন। কলকাতায় প্রত্যেক দিনই দু-তিনজন গাড়ি চাপা পড়ে মরে, খবরের কাগজে তারা এক লাইন দু-লাইন স্থান পায়, কিন্তু ভক্তিপদবাবু চাপা পড়েছিলেন, স্বয়ং রাজ্যপালের গাড়ির নীচে! সে গাড়িতে রাজ্যপাল তখন ছিলেন, না ছিলেন না, সে সম্পর্কে মতভেদ আছে, কিন্তু মুমূর্ষু ভক্তিপদবাবুকে রাজভবনের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানেই তিনি শেষ নিশ্বাস ফেলেন। সেইজন্যই রিপোর্টারদের হুড়োহুড়ি। কয়েকজন রিপোর্টার এসেছিল অমিয়র কাছে। তার রি-অ্যাকশান জানতে।

ভক্তিপদ মৃত্যুর আগে বড় ছেলের নাম উচ্চারণ করেছিলেন, কিন্তু এ-বাড়িতে তিনি থাকতেন না। অমিয়র ছোট ভাই থাকে বেহালায়, মা-বাবা সেখানেই থাকতেন। বুলার সঙ্গে বিয়েটা মা ঠিক মেনে নিতে পারেননি।

বাবা নিজেই অমিয়কে বলেছিলেন, বেহালার বাড়িতে জায়গা এত কম, এখানে তুই নতুন বউকে নিয়ে কী করে থাকবি। একটা ফ্ল্যাট দেখে নে—যাওয়া আসা তো থাকবেই।

মৃত্যুর আগে ছ-মাস বাবার সঙ্গে দেখাই হয়নি অমিয়র। শ্রাদ্ধের পর একুশ দিন কেটে গেছে, আজ সেজন্য একটু অনুতপ্ত বোধ করল অমিয়।

বুলা বলল, শনিবার লোকটা আসবে, তুমি কী বলবে?

অমিয় রুক্ষ গলায় বলল, দরজা থেকে ভাগিয়ে দেব। কিংবা আমি দেখা করব না, তুমি মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিয়ো। এইরকম লোভী লোকদের দেখলেই আমার মাথা গরম হয়ে যায়, হয়তো একটা থাপ্পড়ই মেরে বসব।

একটু বাদে, বাইরে বেরুবার জন্য যখন তৈরি হচ্ছে বুলা, অমিয় আবার উত্তেজিতভাবে বলল, আর একটা কথা মনে পড়েছে। আমার বাবা আমাদের দেশের বাড়িতে লাস্ট গিয়েছিলেন, নাইনটিন ফর্টি এইটে, তাহলে ফর্টি নাইনে কী করে বাবা ধার করে লেপ কিনবেন? লোকটা তাহলে কীরকম জোচ্চোর বুঝে দ্যাখো!

বুলা স্থিরভাবে তাকিয়ে রইল অমিয়র দিকে। তারপর বলল, তুমি বরং একটা চিঠি লিখে লোকটিকে আসতে বারণ করে দাও। তোমার যা মেজাজ দেখছি।

—শোনো, আমার বাবার জন্য আমি দু-তিনশো টাকা নিশ্চয়ই খরচ করতে পারি, কিন্তু

কেউ একজন ঠেকিয়ে নেবে...

—চিঠি লেখ!

—অন্ধকারের মধ্যে কী করে চিঠি লিখব? সন্ধের পর কি বাড়িতে ফিরে কোনও কাজ করার উপায় আছে?

—আমাকে এমন ধমকাচ্ছ কেন, অন্ধকারের জন্য কি আমি দায়ী?

রাত্তিরবেলা বাইরে থেকে ওরা যখন ফিরল, তখন রাত সোওয়া এগারোটা, বিদ্যুৎও তখনই এসেছে।

জুতো-টুতো না খুলেই চিঠি লিখতে বসে গেল অমিয়।

সবিনয় নিবেদন,

আমার বাবার কোনও বড় ভাই ছিল না। অচেনা কোনও লোক আমার কাছে নিজেকে যদি জ্যাঠা বলে জাহির করে, তাও আমি মোটেই পছন্দ করি না। পূর্ববঙ্গের একটি গ্রামে আমাদের একটি পৈতৃক বাড়ি ছিল বটে কিন্তু সে বাড়ি বা সে গ্রাম আমি চোখে দেখিনি। সেই গ্রাম সম্পর্কে আমার কোনও দুর্বলতা থাকার কারণ নেই। আমার বাবা শেষবার দেশে গিয়েছিলেন, উনিশশো আটচল্লিশ সালে, তার পরের বছরেও তিনি আপনাদের দোকান থেকে কীভাবে ধারে জিনিসপত্র কিনলেন তা আমার বুদ্ধির অতীত। আমার জন্মের আগেকার সময়ের ধার শোধ করতে আপনি আমায় কেন বলছেন, তাও বুঝতে পারলুম না। আমার বাড়িতে আপনার আসবার কোনও প্রয়োজন নেই।

নমস্কারান্তে
অমিয় মজুমদার

শেষ করার পর চিঠিটা দুবার পড়ল অমিয়। যথেষ্ট কড়া হল না। কিন্তু মুখের কথায় যত রাগ আসে, লিখতে গেলে তা অন্যরকম হয়ে যায়। দুটো ভাষা যে আলাদা।

আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ার পর বুলা বলল, এবারে কয়েকদিন তোমার মাকে নিয়ে এসে এখানে রাখো। বেহালার বাড়িতে সবসময় ওই স্মৃতির মধ্যে...

—মাকে তো অনেকবার বলেছি। মা আসতে চায় না। বেহালার বাড়িতে কতগুলো গাছ পুঁতেছে তো, যদি অন্য কেউ জল না দেয়...মা এখন মানুষের চেয়ে গাছপালাদের বেশি পছন্দ করে—

—ক'দিন না হয় আমি বাপের বাড়ি গিয়ে থাকতে পারি।

অমিয় কনুইতে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে উঠে বলল, তার মানে?

বুলা স্বাভাবিক গলাতেই উত্তর দিল, আমি না থাকলে তখন উনি আসতে পারেন। তুমি তো বেহালায় যাওয়ার সময় পাও না, উনি এখানে এসে থাকলে তবু তোমার সঙ্গে কথা-টথা বলতে পারবেন। সেটা এ সময়ে খুব দরকার।

—তুমি থাকলে আসবেন না, তুমি না থাকলে আসবেন, এর মানে কী?

—আমি না থাকলে তোমার দেখাশোনার জন্যও তো উনি আসতে পারেন।

—আমার মা তোমার সঙ্গে কোনওদিন খারাপ ব্যবহার করেছেন?

—না, খারাপ ব্যবহার কখনও করেননি। বরং দু-একসময় এত বেশি ভালো ব্যবহার করেন যে আমার লজ্জা করে।

—তাহলে, তুমি কী বলতে চাও?

—উনি আমাকে পছন্দ করেননি, এখনও করেন না। সে তো হতেই পারে। সবার সবাইকে ভালো লাগবে তার কোনও মানে নেই। আমি তোমার মাকে খুব একটা পছন্দ করি না, কিন্তু কোনওদিন কি খারাপ ব্যবহার করেছি?

অমিয় হঠাৎ চুপ করে গেল। তার মনে পড়ল বাবার মুখ। বাবা বুদ্ধিমান ছিলেন, মা আর বুলার মাঝখানের এই ফাটলটা বাবা বুঝতেন, কিন্তু তিনি নিরপেক্ষ থাকতেন। এখন প্রায়ই ছেলেবেলার কথা মনে পড়ছে। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, এর মধ্যে একদিনও অমিয় বাবাকে স্বপ্নে দেখেনি।

কয়েকদিন পরেই চিঠিটার উত্তর এল।

স্নেহের বাবাজীবন অমিয়,

এই শনিবার আমি তোমার বাটিতে যাইতে পারি নাই তাহার কারণ পূর্বরাত্রে, অর্থাৎ শুক্রবারে আমার জ্বর আসিল। টেম্পারেচার তেমন বেশি নহে, এক শতের মধ্যেই, কিন্তু সর্বাঙ্গে বেদনা। তবু যাইতে পারিতাম কিন্তু বড় ঝড় বৃষ্টি হইল। সোদপুরের এ বাটি হইতে সাইকেলরিক্সা যোগে স্টেশনে যাইতে হয়। রাস্তা ভালো নহে, ঝড় বৃষ্টিতে খুবই অসুবিধা। ট্রেনেরও কী যেন গোলযোগ ছিল। এইসব কারণে যাওয়া হইল না।

তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি আমার পত্রের মর্ম ভুল বুঝিয়াছ। পিতৃঋণ কখনও রাখিতে নাই। পিতার যাবতীয় ঋণ যে পুত্র শোধ করিয়া দিয়া যায়, সে পুত্র মহাপুণ্যবান হয়। আমার দোকান হইলে তোমার বাবা-কাকারা ধারে যাহা খরিদ করিয়াছিলেন, তা তোমারই বংশের ঋণ। সংবাদপত্রে দেখিলাম তুমি চাকুরি ভালোই করিতেছ। সুতরাং পিতার এই সামান্য ঋণের বোঝা তুমি সানন্দে মস্তকে পাতিয়া নিবে, তাহাই তোমাকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছি। লক্ষ্য করিয়াছ নিশ্চয়, তিরিশ বৎসরের অধিক সময় পার হইলেও আমি সেই অর্থের কোনও সুদ চাহি নাই। চক্রবৃদ্ধি হারে ধরিলে কত টাকা হইতে পারিত, তারা তুমি ভালোই বুঝিবে। কিন্তু সেরূপ আমি চাহিতে পারি না, তোমরা আমার স্নেহের ধন। যাহা হউক, আমি আগামী রবিবার, ইং ১৪ তারিখে অবশ্যই তোমার বাসায় যাইব। তুমি টাকার জোগাড় রাখিও। দুই শত বত্রিশ ও একান্ন, একুনে দুইশত তিরাশি দিলেই তুমি দায়মুক্ত হইবে।

তোমার পিতা আমাকে দাদা বলিয়া ডাকিত, সেই সূত্রে আমি তোমার জ্যেঠা। বউমা ও নাতি-নাতনীদের আমার স্নেহাশীর্বাদ দিও।

ইতি

হরিনাথ পাইন

আজও অফিস থেকে ফি[illegible] অন্ধকারের [illegible] লণ্ঠনের আলোয় অমিয় পড়ল চিঠিটা, সঙ্গে-সঙ্গে তিরিক্ষি হয়ে গেল তার মেজাজ।

বুলা চিঠিটা আগেই পড়েছে। আজ কোনও কারণে তার মনটা বেশ ফুরফুরে আছে। অফি[illegible] থেকে ফিরেই [illegible] ধরনের কিছু একটা রান্না [illegible] জোগাড় যন্তর করছে

[illegible] বুড়ো কিন্তু মহা ধূর্ত [illegible] কায়দায় চিঠিটা লিখেছে দেখেছ?

অমিয় [illegible] সোয়াইন। শনিবার আসতে পারেনি বলে লম্বা ফিরিস্তি দিয়েছে।

আমি ওকে [illegible] করেছি

[illegible] তোমাকে কখনো [illegible] দেখিয়েছে তুমি এ[illegible] একটা পুণ্য করার সুযোগ পাচ্ছ, উনি

তো তোমার উপকারই করছেন!

—কত বড় শয়তান! যারা এইরকম ধর্মের দোহাই দেয়, তারা নিজেরা যে কত পাপ করে।

—যাই বলো, ভদ্রলোকের হাতের লেখাটি সুন্দর, আগেকার দিনের মতন টানা-টানা, বেশ গুছিয়ে লিখতে পারেন। একটা কথা ঠিকই লিখেছে, গ্রাম সম্পর্কে সবাই সবাইকে কাকা-জ্যাঠা বলে। তোমার বাবা ওঁকে দাদা বলে ডাকতেন সেই সূত্রে উনি তো আমার জ্যাঠা হতেই পারেন।

—তুমি কী করে জানলে? তুমি তো কখনও গ্রামে থাকনি!

—এটা সবাই জানে।

—ব্যাটা মুদি আবার আমাকে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদের ভয় দেখিয়েছে! আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি, পুরো ব্যাপারটাই ভাঁওতা। কোনও রকমে ব্যাটা আমাদের গ্রামের নাম আর বাবা-কাকার নাম জেনেছে।

—তোমার মাকে জিগ্যেস করো, উনি নিশ্চয়ই বলতে পারবেন।

—হ্যাঁ, মায়ের সঙ্গে দেখা করতে হবে। আজ অফিসে খোকন এসেছিল, ওকে বলতে ভুলে গেলুম।

—খোকন এসেছিল? কী বলল?

—এমনিই...বিশেষ কিছু না...না এখন কান্নাকাটি কম করছে, অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে গেছে।

—খোকনকে বলোনি, মাকে কিছুদিনের জন্য এ-বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে?

—না বলিনি।

অমিয় উঠে চলে গেল জামাকাপড় ছাড়তে। রান্নাঘরের গ্যাস স্টোভের সামনে গিয়ে দাঁড়াল বুলা। তার মুখে মৃদু মৃদু হাসি। স্বামী-স্ত্রী দুজনের সংসার। দু-জনেই চাকরি করে। বাসন মাজা, কাপড় কাচার একজন ঠিকে লোক আছে শুধু, সর্বক্ষণের লোক পাওয়া যায়নি। অফিস থেকে ফিরে এক-একদিন বুলার রান্না করতে ইচ্ছে করে না। আবার এক-একদিন বেশ রান্না নিয়ে মেতে থাকে। অমিয় তাকে পেঁয়াজ কুঁচিয়ে আলু কেটে সাহায্য করে।

অমিয় আবার রান্নাঘরে এসে বলল, আর একখানা কড়া চিঠি লিখে দিই, কী বলো? রবিবার যদি সত্যিই লোকটা আসে, মেজাজ সামলাতে পারব না।

বুলা বলল, আসুক না, লোকটাকে আমার দেখতে ইচ্ছে করছে।

—কুটিল, নীচ টাইপের লোকদের কাছাকাছি দাঁড়ালেই আমার গা ঘিনঘিন করে।

—আমার কিন্তু বুদ্ধিমান বদমাসদের দেখতে বেশ লাগে। আসুক না লোকটা। সেদিন আমাদের দরজার কাছটায় সাবান জল ছড়িয়ে রাখব, যাতে এসেই ও আছাড় খেয়ে পড়ে।

বুলা বেশ শব্দ করে হেসে উঠল। অমিয় বলল, তুমি হাসছ, কিন্তু আমি ব্যাপারটা একেবারে সহ্য করতে পারছি না!

বুলা আরও জোরে হেসে বলল, নাতি-নাতনীদের আশীর্বাদ...হো-হো-হো। বিয়ের আগেই ওরা ঠিক করেছিল, প্রথমে তিন বছর ওরা কোনও বাচ্চা-কাচ্চা চায় না। তারপর একটু গুছিয়ে নিলে সে সম্পর্কে ভাবা যাবে। দু-মাস আগে ওদের তৃতীয় বিবাহ-বার্ষিকী উদযাপিত হয়ে গেছে

অমিয় বুলার পিঠে হাত রা

বুলা মুখ ফিরিয়ে বলল, আজ তোমা একটা ভালো খবর

বুকটা কেঁপে উঠল অমিয়...। অনেক উপন্যাসে এইরকম সিচুয়েশনে এইরকম সংলাপ সিনেমাতে দেখেছে। এই একটাই অর্থ হতে পারে

গল্পের চরিত্রের কষ্টদা

দিকে টেনে এনে বলল, সত্যি

বুলা হাসতে হাসতে বলল, কী বলো না

—তবে? কী ভালো খবর

—আজ একটা ইনভার্টারের অর্ডার দিয়েছি। ব্যাটারি সমেত সবসুদ্ধু পড়বে চব্বিশ শো টাকা। বেশ সস্তা নয়? তাও ইনস্টলমেন্টে দেওয়া যাবে। আমাদের অফিসের এক কলিগ এজেন্সি নিয়েছে। অনেক কমিশন পাওয়া গেল। দু-দিনের মধ্যেই এসে যাবে।

কোথায় যেন বিরাট শব্দে একটা বজ্রপাত হল। কেউ যেন সজোরে এক থাপ্পড় কষিয়েছে অমিয়র মুখে।

বুলাকে ছেড়ে দিয়ে সে নিষ্প্রাণ, বিবর্ণ গলায় বলল, তুমি অর্ডার দিয়েছ? ও!

—হ্যাঁ, দেখেছ তো অবস্থা। প্রত্যেকদিন দশ-বারো ঘণ্টা লোডশেডিং। সারাদিন খাটাখাটনির পর বাড়িতে এসে...অন্ধকার...পাখা নেই, কোনও কাজ করা যায় না। তোমার মেজাজ খারাপ হয়ে থাকে...তাই দেখলুম যখন অনেকটা কনসেশানে পাওয়া যাচ্ছে।

—দ্যাখো, চায়ের জল ফুটে গেছে।

—এতে তিনটে আলো-পাখা চলবে। বুঝলে আমাদের তো তার বেশি দরকার নেই...পাখা ছাড়া আমি একদম ঘুমোতে পারি না, ক'দিন ধরে এমন গুমোট চলছে...কালকে জানো তো, ভোর চারটেয় কারেন্ট চলে গেল, অমনি আমার ঘুম ভেঙে গেল, তুমি তো কিছু টেরও পাওনি!

—তাই বুঝি?

—তুমিও অফিস থেকে ফিরে লেখাপড়ার কাজ করতে পারবে।

হঠাৎ থেমে গিয়ে বুলা তার স্বামীর দিকে তীক্ষ্ণভাবে চেয়ে রইল। অমিয় তখন রান্নাঘর ছেড়ে যেতে উদ্যত।

বুলা বলল, শোনো! কী ব্যাপার বলোতো? তুমি হঠাৎ এমন ঠান্ডা হয়ে গেলে? খবরটা শুনে তুমি খুশি হওনি মনে হচ্ছে? বউয়ের টাকায় ইনভার্টার কেনা হচ্ছে তোমার মনে লেগেছে নাকি।

—আরে না, না।

—আমার টাকা আর তোমার টাকা আলাদা?

—কি ছেলেমানুষি কথা বলছ! ওরকম বোকা-বোকা চিন্তা আমার মাথায় কখনও আসে না। সত্যি বেশ সস্তায় পেয়েছ। আমার ধারণা ছিল তিন হাজার টাকার কমে হয় না। সেইজন্যই তো আমি কিনতে ভয় পাচ্ছিলাম, তা ছাড়া শ্রাদ্ধের জন্য বেশ কিছু টাকা খরচ হয়ে গেল।

—এটা ইনস্টলমেন্টে পাচ্ছি, এটুকু বিলাসিতা আমরা করতে পারি।

—মোটেই বিলাসিতা নয়...সন্ধে হলেই অন্ধকার—এইভাবে আধুনিককালের সভ্য মানুষ বাঁচতে পারে?

কথা বলতে-বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল অমিয়। তারপর খাটে গিয়ে চিত হয়ে শুয়ে রইল। তার মনের মধ্যে একটা প্রবল যাতনা হচ্ছে। এখন বুলার সঙ্গে গল্প করলেও এই কষ্টটা দূর করা যাবে না। অথচ একলা শুয়ে থাকলে কষ্টটা বাড়বে। ট্রানজিসটার নিয়ে সে কাঁটা ঘোরাতে লাগল।

এক সময় তার ইচ্ছে হল আছাড় মেরে রেডিওটা ভেঙে ফেলতে। সে ইচ্ছে দমন করে সে নিজেই শিস দিয়ে একটা গান ধরতে লাগল।

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের একটা সূক্ষ্ম বোঝাপড়া থাকে। আবার এমন কিছু কথাও থাকে, যা এত কাছের দুজন মানুষও পরস্পরকে বলতে পারে না।

পরদিন সকালবেলা বাথরুম থেকে বেরিয়েই বুলা বলল, তোমাকে একটা কথা জিগ্যেস করতে চাই। কাল ইনভার্টারের কথা শুনেই তুমি কীরকম যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেলে। কী হয়েছে বলো তো? ব্যাপারটা তোমার পছন্দ হয়নি? এখনও অর্ডারটা ক্যানসেল করে দিতে পারি।

—আরে না, না পছন্দ হবে না রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে গরমে ঘামছিলুম, একটা ইনভার্টার

তো আমাদের সত্যি এক্ষুনি দরকার, এত সস্তায় পাওয়া যাচ্ছে যখন।

—বাজে কথা বোলো না। তোমার কী হয়েছে সত্যি করে বলো তো।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে অমিয় বলল, একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল, তাই একটু খারাপ লাগছিস।

—কী কথা আমাকে বলা যায় না?

—হ্যাঁ, বলা যাবে না কেন?

—তবে কেন কালকে বললে না তক্ষুনি।

—তুমি তখন খুব খুশি মুডে ছিলে।

—এখন জানতে পারি?

ব্যাপারটা হয়েছে কী, বছরখানেক আগে খোকনের ছেলের মুখে ভাতে বেহালার বাড়িতে গিয়েছিলুম মনে আছে?

—আমার অফিসে অডিট ছিল বলে আমি সকালবেলা ঘুরে এসেছিলুম। তুমি দুপুরে খেতে গিয়েছিলে।

—হ্যাঁ, তাই হবে। অসহ্য গরম ছিল সেদিন। আমাদের বেহালার বাড়িটা জানো তো, একতলা, তিনদিক চাপা, একদম হাওয়া ঢুকতে চায় না। যেদিন গুমোট থাকে, সেদিন আর ঘরের মধ্যে বসে থাকা যায় না। বাবার একটু হাঁপানির টান ছিল। সেই গরমে একেবারে দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতন অবস্থা...সেদিন একটা ইনভার্টার কেনার কথা উঠেছিল...তা হলে বাবা-মা রাত্তিরে অন্তত একটু ঘুমোতে পারতেন।

—কিনে দাওনি কেন?

—খোকন বলেছিল ইনভার্টার মেশিনটা জোগাড় করবে, আমি ব্যাটারিটা পাঠিয়ে দেব...তারপর খোকন আর আমায় মনে করিয়ে দেয়নি।

—একথা তো তুমি আমাকে বলোনি। তাহলে আমি মনে করিয়ে দিতুম।

—বলিনি, তাই না? ভুলেই গিয়েছিলুম...সেদিন মা বলেছিলেন, তোব বাবা গরমের চোটে মাঝরাত্রে উঠে বসে থাকে। ভোর হতে-না-হতেই উঠে বাইরে যায়। হাঁপানি রুগির গরমে বড় কষ্ট...আমার কি মনে হয় জানো বুলা, ওই যে সেদিন বাবা অত ভোরবেলা হাঁটতে বেরিয়েছিলেন, তাও ওই গরমের জন্য বোধহয়।

—শুধু ব্যাটারি কেন, পুরো ইনভার্টারটাই তোমার কিনে দেওয়া উচিত ছিল। আমরা ধার করেও কিনে দিতে পারতুম।

—উচিত তো অনেক কিছুই থাকে, আবার অনেক কিছুই করা হয়ে ওঠে না। এইসব ভুলের জন্য আমাদের আত্মগ্লানি হয়, কিন্তু স্ত্রীর কাছ থেকে কোনটা উচিত কোনটা উচিত নয়, তা শুনতে ভালো লাগে না।

—এই ব্যাপারটা যদি তুমি সেই এক বছর আগেই আমায় বলতে তাহলে একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যেত নিশ্চয়ই।

—তা ঠিক। তুমি আমার চেয়ে অনেক বেশি এফিসিয়েন্ট।

—তাহলে কি আমাদেরটা এখন কেনা উচিত নয়?

—না, না, না, এসব ন্যাকামির কোনও মানে হয় না। যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে। মানুষ বর্তমান নিয়ে বাঁচে।

—তোমার মা-কে কিছুদিন এখানে এনে রাখো। এই গরমে উনি তবু একটু আরাম করতে পারবেন।

হঠাৎ বুলার ওপর চটে গেল অমিয়। বুলা কেন যে এই কথাটা বারবার বলে!

*

রবিবার সকালে চা খাওয়ার পর বুলা বলল, আজ কিন্তু সেই ঘোড়েল বুড়োটি আসবে। তোমার মা'র কাছে গিয়ে একদিন জিগ্যেস করে এলে না?

অমিয় চমকে উঠল। এই ক'দিন নানান কাজে সে ওই চিঠির প্রসঙ্গ ভুলেই গিয়েছিল, মায়ের সঙ্গেও করা হয়ে ওঠেনি। বেহালায় যাতায়াত করাও কম ঝামেলা নয়।

অমিয় বলল, আমি এক্ষুনি কেটে পড়ছি বাড়ি থেকে। তুমি ম্যানেজ করো।

বুলা বলল, আমি কী কথা বলব? আমি তোমাদের গ্রামের কথা কিছুই জানি না।

—আমিই বা কী জানি। কোনওদিন দেখিনি, শুধু গল্প শুনেছি। তবে আই অ্যাম শিওর, ও লোকটা মিথ্যেবাদী। বাবা তো কোনওদিন আমায় কোনও পুরোনো ধারের কথা বলেননি। এইরকম একটা স্বার্থপর লোককে দেখলে আমি যদি বেশি মেজাজ খারাপ করে ফেলি, সেটা কী ভালো হবে?

—কিন্তু আমি ওকে কী করে ট্যাকল করব বলো তো?

—তুমি বলে দিও, সামনের রবিবার আসতে, এর মধ্যে আমি সব খবর নিয়ে নিচ্ছি।

কিন্তু অমিয় বেরুবার আগেই দরজায় বেল বাজল। দরজা খুলল বুলা। এবং সে কিছু বোঝবার আগেই এক বৃদ্ধ এই যে বউমা, নাও বলেই তার হাতে তুলে দিলেন একটা মিষ্টির হাঁড়ি।

ফর্সা, ছোটখাটো চেহারা বৃদ্ধটির। বয়েস অন্তত আশি তো হবেই। পরিষ্কার সাদা পাঞ্জাবি ও ধুতি পরা, হাতে একটি রুপো বাঁধানো লাঠি। দেখলে গ্রাম্য মুদি বলে মনে হওয়ার কোনও উপায় নেই। সঙ্গে একটা তেরো-চোদ্দো বছরের কিশোরী মেয়ে। তার হাতে একটি পাকা কাঁঠাল।

ভেতরে ঢুকেই বৃদ্ধ বললেন, এইটি আমার নাতনী, সঙ্গে আনলাম, আইজ কাল তো একা-একা চলাফিরা করতে পারি না। ওরে পুষ্প, কাঁঠালটা নামাইয়া রাখ, প্রণাম কর, প্রণাম কর, কই বাবাজীবন কোথায়?

অমিয় শোওয়ার ঘরে পালাবার উদ্যোগ করছিল, কিন্তু তার আগেই বৃদ্ধ ঘরে ঢুকে পড়ায় সে ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লাঠি ঠুকতে-ঠুকতে সেদিকে এগিয়ে এসে বৃদ্ধ বললেন, আমার দ্বিতীয় চিঠিখান পাইছিলা নিশ্চয়? দ্যাখো, ঠিক আইলাম।

বুলা ভুরু কুঁচকে বলল, এসব এনেছেন কেন?

বৃদ্ধ একগাল হেসে বললেন, গ্রামের মানুষের বাড়িতে আইলাম, মিষ্টি হাতে ছাড়া কি আসা যায়? আর কাঁঠালটা আমাগো বাড়িতে হইছে। সোদপুরে বাড়ি করছি। তেরো কাঠা জমি, দুইখান আম গাছ, দুইখান কাঁঠাল গাছ, একখান জম্বুরা গাছও আছে—। তোমাগো দ্যাশের বাড়িতে খুব ভালো বাগান ছিল...

কিশোরী মেয়েটি এসে অমিয়কে প্রণাম করল। বৃদ্ধটি দু-পা জোড়া করে অমিয়র দিকে এমনভাবে তাকিয়ে রইলেন, যেন তিনিও প্রণাম প্রত্যাশী। কিন্তু বুলা কিংবা অমিয় ওসবের ধার ধারে না।

বুলা মেয়েটিকে জিগ্যেস করল, তোমার নাম কী? তুমি কোন ক্লাসে পড়ো?

বৃদ্ধ এগিয়ে এসে অমিয়র কাঁধে হাত দিয়ে গাঢ় গলায় বললেন, তোমার বাবার মৃত্যু সংবাদ দেইখ্যা দুঃখ পাইছি ঠিকই, আবার আনন্দও হইছে। মরতে তো হবেই সকলেরে, তবু এমন মৃত্যু কয়জনের হয়? কোথা থিকা যাত্রা আর কোথায় শেষ। পূর্ব বাংলার গ্রামের মাটির উঠোনে জন্ম আর মৃত্যু হইল কইলকাতার লাটসাহেবের বাড়িতে! কাগজে-কাগজে ছবি!

এইধরনের কথায় নাক কুঁচকে যায় অমিয়র। লাটসাহেব? এরা কোন যুগে আছে—

কিন্তু অমিয় একজন ভদ্রলোক। একজন বুড়ো লোক বাড়িতে মিষ্টি-ফিষ্টি নিয়ে এসেছে, সঙ্গে আবার একটা বাচ্চা মেয়ে, এখন কড়া কথায় অপমান করা যায় না। সে গম্ভীরভাবে বলল, আপনি

বসুন, আগে কাজের কথাটা সেরে নেওয়া যাক।

বৃদ্ধ উদারভাবে বললেন, না, না, কাজের কথা কিছু নাই। অ্যামনই দেখা করতে আইছি। আমার মেজো ছেলে তোমার চিঠিখান পড়ছে। সে আমারে কইল, বাবা, আপনে...

মাঝপথে বাধা দিয়ে অমিয় বলল, খাতাপত্র কিছু এনেছেন?

—কীসের খাতাপত্তর?

—আপনাদের দোকানের হিসেবের খাতা? আমার বাবার কোনও সই আছে। উপযুক্ত প্রমাণ না পেলে আমি আপনাকে বিশ্বাস করব কী করে? যে-কেউ এসেই তো টাকা চাইতে পারে।

বৃদ্ধ চোখ বুজে, মুখে চুক-চুক করে বললেন, আমি কি তোমারে মিথ্যা কমু? আমাগো সে সম্পর্ক না।

—দেখুন আপনাকে আমি চিনি না। আমাদের গ্রাম আমি কখনও চোখে দেখিনি। বাবার কাছে কোনও ঋণের কথাও আমি শুনিনি। আমার মা হয়তো কিছু জানতে পারেন, তাঁর কাছে খোঁজ-খবর নেওয়া হয়নি এখনও—

—তোমার মায় কোথায়? কেমন আছেন তিনি?

—মা অন্য জায়গায় থাকেন, ভালো আছেন। কিন্তু কোনও নির্দিষ্ট প্রমাণ না পেলে আমি আপনার দাবি মেনে নিতে পারব না।

—শোনো, তাহলে তোমারে বুঝাইয়া কই।

এরপর বৃদ্ধ অনেকখানি কথা বলে গেলেন। তার মর্ম হচ্ছে এই যে, শুধু এক গ্রামে নয়, প্রায় কাছাকাছি বাড়ি ছিল অমিয়র পূর্বপুরুষদের এবং এই বৃদ্ধদের। এদের বেশ বড় মুদিখানা ছিল, তিন-চারখানা গ্রামের মধ্যে একমাত্র দোকান। অমিয়র বাবা কলকাতায় চাকরি করতে আসেন, সেইসময় দেশে তাঁদের পরিবারের অবস্থা বেশ খারাপ হয়ে পড়ে। যুদ্ধের সময় জিনিসপত্রের দামও খুব বেড়ে যায়, দেশের বাড়িতে সেই সময় অমিয়র ঠাকুরদা, ঠাকুমা আর বিধবা পিসিমা থাকতেন। ধারে জিনিসপত্র না কিনে তাঁদের বেঁচে থাকার কোনও উপায় ছিল না। তারপর তো দেশ ভাগ হয়ে গেল, অনেক ডামাডোল শুরু হল।

অমিয় বলল, আমার বাবা সেই ধার এতদিন শোধ করেননি!

—শোনো, বাবা, আমার দুই পরিবার ছিলাম অনেকখানি আপনা-আপনির মইধ্যে। সেই বাজারে আড়াইশো তিনশো টাকা মানে অনেক টাকা। এখনকার দুই তিন হাজার তো হবেই। অত টাকার মাল কেউ কি বাকিতে দেয়? আমি পনেরো-কুড়ি টাকার বেশি হাওলাৎ দিতাম না কারুরে। তোমার বাবারে আমি ছুট ভাইয়ের মতন দ্যাখতাম। যুদ্ধের শ্যাষ দিকে সে বেতন পায় নাই, বড় কষ্টের মধ্যে আছিল, তবু আমি জানতাম, সে সৎ মানুষ, ভগবানে বিশ্বাস করে, সে আমাকে কোনওদিন ঠকাইতে পারবে না। তার সাথে আর দেখা হইল না, সবই তো দূরাদৃষ্ট! ওই ল্যাপের কথা আমি লেখছি, তুমি সেই ল্যাপর কথা জানো?

বুলা কিশোরী মেয়েটিকে জলখাবার দিয়ে আর-একটা প্লেট নিয়ে ওদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। সে জিগ্যেস করল, ল্যাপ মানে?

অমিয় বলল, লেপ। শীতকালে গায়ে দেবার।

বৃদ্ধ বললেন, তোমার ঠাকুর্দারে আমরা সকলডিই বড় খুড়া কইতাম! তুমি দ্যাখছো তোমার ঠাকুর্দারে? ও, না, তোমার জন্মের আগেই তো তিনি গত হইছেন। খুব উঁচা দরের মানুষ আছিলেন বড় খুড়া। যেমন সইত্যবাদী আর তেমন রাগী। তেনার কথা কইতে গেলে অনেক কইতে হয়। যাহা হউক, তোমার বাবা যখন শ্যাষবার দ্যাশে গ্যালেন...

—নাইনটিন ফট্টি এইট।

—সেই সময়ে তোমার ঠাকুর্দার একেবারে যায়-যায় অবস্থা। নিউমোনিয়া হইছিল। খবর পাইয়া

তোমার বাবায় তারে দ্যাখতে গেল। কবিরাজ জবাব দিয়া দিছে, চিকিৎসার কিছু নাই, তোমার বাপে তবু চেষ্টার তুরুটি করে নাই। তার নিজেরও তখন চাকরি নাই, অনেক কষ্ট কইরা দ্যাশে আইছে। মরার দুইদিন আগে তোমার ঠাকুরদার সে সকি কাঁপুনি! থরথর কইর‍্যা কাঁপে আর চিখরায়, শীত, মলাম রে, বড় শীত। উঃ-উঃ বড় শীত! বাড়িতে কাঁথা-কম্বল যত ছিল সব চাপা দিল, তবু শীত যায় না। একসময় বড় খুড়ো কইল, ভক্তি আমারে নতুন ল্যাপ আইন্যা দে। লাল রঙের ল্যাপ। আমার শীত করে, আমারে বাঁচা, আমারে লাল ল্যাপ দে। তখন ভক্তিপদ দৌড়াইয়া আইল আমার দোকানে, কইল কি, হরিদাদা, য্যামন কইরা পারো আমারে একটা লাল ল্যাপ দাও। আমার বাবার শেষ সাধ, এ না মিটাইলে আমি নরকে যামু। আমার কাছে টাকা নাই, হরিদাদা, তুমি একখান লাল ল্যাপ দাও। আমি যেমন কইর‍্যা পারি তোমারে এই টাকা শোধ দিমু। আমি কইলাম, ওরে ভক্তি, তোর বাপে শীতে কষ্ট পায়, তিনি আমাগো বড় খুড়া, তার জন্য ল্যাপ দিমু না, নিশ্চয় দিমু। লাল ল্যাপ তো এস্টকে ছিল না, তয় লাল কাপড় আছিল, এক ঘণ্টায় ল্যাপ বানাইয়া দিলাম। সে ল্যাপ তোমার ঠাকুরদা গায় দিছে, গায় দিয়া কইছে, আঃ বড় আরাম, তারপর মরছে।

একটুক্ষণ সবাই চুপ করে রইল। এমনিই নিস্তব্ধতা যে পাখা ঘোরার আওয়াজ পর্যন্ত শোনা যায়।

গলা পরিষ্কার করে অমিয় বলল, বহুদিন আগেকার কথা, এর মধ্যে বাবা সেই ধার শোধ করার চেষ্টা করেননি? আপনাদের তো আর যোগাযোগ হয়নি?

বৃদ্ধ বললেন, তার দোষ নাই, এর পরের সনেই পাকিস্তানে বড় রকম গোলমাল শুরু হইল, আমার দোকানে আগুন লাগাইয়া দিল, আমার বড় ছেলে মারা গেল, আমরা দ্যাশ ছাইড়া পালাইলাম। কে কোথায় গেল তার ঠিক নাই। আমরা গিয়া ঠ্যাকলাম ফুলিয়ায়। তোমার বাবা কোথায় থাকেন তাও জানি না, সে-ও জানে না আমরা কোথায়।

বুলা চোখ দিয়ে ইঙ্গিত করল অমিয়কে। অমিয় উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি আপনাকে ক্যাশ দিতে পারছি না, চেক দিয়ে দিচ্ছি।

খপ করে অমিয়র হাত ধরে বৃদ্ধ বললেন, আরে না, না, সেই কথাই তো কইতে আইছি। আমার মেজো ছেলে এখন পাটের কম্পানিতে ভালো চাকরি করে, ছোট ছেলেটিও ব্যবসায় নামছে। সোদপুরে বাড়ি করছি। ভগবানের আশীর্বাদে এখন আর আমাগো অভাব নাই! তোমার চিঠিখানা আমার মেজো ছেলে দ্যাখছে। সে আমারে খুব বকল। কইল কি, বাবা, আপনে এতদিন পরেও ওই সামান্য টাকার জন্য মানুষরে বিরক্ত করতে আছেন? ছি, ছি! আপনি ক্ষমা চাইয়া চিঠি লেখেন। আমি যত কই যে আমি শুধু টাকার জন্যই চিঠি লিখি নাই, তা সে শোনে না। পুতের বউ সেই কথাই কয়। তাই তোমার কাছে আজ আইছি।

অমিয় বলল, না, না, আপনি তো ঠিক কাজই করেছেন, টাকা নেবেন না কেন? বিপদের সময় আমাদের পরিবারকে সাহায্য করেছেন, এখন সেই ধার শোধ করা তো আমাদের কর্তব্য নিশ্চয়ই।

বৃদ্ধ বলল, না, না, না, সে টাকা আমি কিছুতেই নিতে পারব না। তাইলে আমার পোলারা আমার মুখ দ্যাখবে না। তুমি ও টাকা আমারে নিতে কইয়ো না।

—আপনি আমাদের ঋণী করে রাখবেন?

—আমি দুইদিন পরে মইরা যামু, আমার কাছে আর ঋণ কি! ও টাকা আমি দাদুভাই আর দিদিভাইদের আশীর্বাদ হিসাবে দিয়া গ্যালাম। কই, নাতি-নাতনীরা কোথায়, তাদের দেখছি না যে?



বহুলাড়া

জায়গাটির নাম ওন্দা। রিনির মতে, খুব মিষ্টি নাম। যে-সব শব্দের কোনও মানে বোঝা যায় না, সেইসব শব্দ রিনির খুব পছন্দ।

কোথায় ওই ওন্দা? যদি জানা যায় যে বাঁকুড়া জেলার মধ্যেই, তাহলে খুঁজে পাওয়া মোটেই শক্ত নয়। বাঁকুড়া শহর আর বিষ্ণুপুরের মধ্যে কোনও এক জায়গায়। বাস যায়, রেল স্টেশন আছে।

রিনি আর প্রতুল ভিড়ের বাসে চেপেই পৌঁছোল সেখানে।

বাঁকুড়া শহরে প্রতুলের অফিসের কাজ ছিল। সে ওষুধের ফেরিওয়ালা, তাকে অনেক জায়গায় ঘুরতে হয়। কলকাতা থেকে ট্রেনে দুর্গাপুর, তারপর শেয়ারের ট্যাক্সিতে বাঁকুড়া। সেইভাবেই ফেরার কথা ছিল, কিন্তু এবারে রিনি তার সঙ্গে এসেছে।

অফিসের কাজে স্ত্রী-কে সঙ্গে নিয়ে বেরুলে দু-একদিনের ছুটি করিয়ে নেওয়া যায়। মুকুটমণিপুর বাংলোতে দু-এক রাত কাটাতেও প্রতুল রাজি ছিল। কিন্তু রিনির শখ অন্যরকম, সে প্রাচীন মন্দির দেখবে। বেশ তো, বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত মন্দিরগুলো দেখে আসা যাক, রিনি তাতেও রাজি নয়। ছাত্রী বয়েসে সে একটা বড় দলের সঙ্গে এদিককার সব বিখ্যাত জায়গাগুলো দেখে গেছে। সে সব জায়গায় সে আর যেতে চায় না। সে একটা নিজস্ব তালিকা টুকে এনেছে।

তার প্রথম নাম বহুলাড়া। আর একটি দুর্বোধ্য শব্দ। কাজের জন্য অন্তত দশ-বারোবার প্রতুলকে আসতে হয়েছে বাঁকুড়ায়, কক্ষনো সে ওই নাম শোনেনি। এবারে এসে বাঁকুড়ায় কয়েকজনকে জিগ্যেস করা হল বহুলাড়ার কথা, তারা মুখ শোঁকাশুঁকি করে।

—কী আছে বহুলাড়ায়?

—জৈন আমলের বিখ্যাত প্রাচীন মন্দির। প্রায় হাজার-হাজার পুরোনো। পশ্চিম বাংলায় এত পুরোনো মন্দির আর কটা আছে?

—এত বিখ্যাত মন্দির অথচ কেউ নাম শুনলে চিনতে পারে না?

রিনি মাথা ঝাঁকিয়ে বলেছিল, লোকাল লোকেরা বেশির ভাগ সময়েই এইসব জিনিসের কোনও খবর রাখে না। কোনও ইন্টারেস্ট নেই তো! দূর থেকেই মানুষ এইসব দেখতে আসে। চলো, ওন্দায় গেলে ঠিক খুঁজে পাওয়া যাবে।

বাস থেকে নামা হল বাজারের সামনে। খুব ছোট বাজার নয়, লোকজনের ব্যস্ততা আছে বেশ, বাঁধাকপি, লাউ, বেগুনগুলো যথেষ্ট স্বাস্থ্যবান। একজন সাইকেল-আরোহীকে মন্দিরটির কথা জিগ্যেস করতেই সে বলল, চলে যান এই সামনের রাস্তা ধরে, একেবারে সোজা—।

রাস্তাটি কিন্তু একেবারে সোজা নয়। বাজার পেরিয়ে, জনপদের মধ্যে দিয়ে গেছে ঘুরে-ঘুরে। খানিক পরেই অবশ্য গ্রাম ছাড়িয়ে রাঙা মাটির পথ। সামনে লেভেল ক্রসিং।

রিনির তথ্য অনুযায়ী বড় রাস্তা থেকে মন্দিরের দূরত্ব মাত্র চার মাইল। মাত্র? গ্রামের দিকে চার মাইল যে কতখানি লম্বা সে সম্পর্কে রিনির কোনও ধারণা আছে? যাই হোক, শীতের মনোরম দুপুর, প্রতুলের হাঁটতে আপত্তি নেই।

লেভেল ক্রসিং-এর সামনে একটু দাঁড়াতে হয়। প্রতুলের সন্দেহ বাতিক, সে একটি তেল

চুকচুকে চুলওয়ালা, পা-জামার ওপর সবুজ গেঞ্জিপরা কিশোরকে মিষ্টি করে জিগ্যেস করল, হ্যাঁ ভাই, বহুলাড়া মন্দিরটা এই দিকেই তো?

ছেলেটি চোখ কুঁচকে জিগ্যেস করে, কী?

যদিও কথা বলছে প্রতুলের সঙ্গে কিন্তু ছেলেটি তাকিয়ে আছে রিনির দিকে। সে প্রতুলের কথা বুঝতে পারে না, সে জানে না। ইতিমধ্যে ট্রেন এসে যায়।

লাইন পেরিয়ে ওপারে আসার পর রিনি বলল, ও বাচ্চা ছেলে, ওরা পুরোনো মন্দিরের কথা জানবে কী করে?

প্রতুল বলল, খুব বাচ্চা নয়, বয়ঃসন্ধি হয়ে গেছে, তোমার দিকে যেভাবে তাকাচ্ছিল...

এবারে দেখা গেল একটি সাইকেল রিকশা। একজন মাত্র যাত্রী। রিকশাওয়ালাকে জিগ্যেস করতেই সে বলল, মন্দির তো? এই টানা রাস্তা, সামনে একখানা গাঁ পাবেন।

—কত দূর?

—তা একটুখানি দূর আছে!

রিকশাওয়ালাকে অনায়াসে বলা যেতে পারে যে তোমার সওয়ারি নামিয়ে ফিরে এসো। তারপর যাত্রা সুখকর হবে, রিকশাওয়ালাই হবে গাইড।

কিন্তু রিনির সে রকম কোনও অভিপ্রায় আছে কি না বোঝা গেল না। সে প্রতুলকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেছে।

বাঁ-কাঁধ থেকে ক্যামেরাটা ডান কাঁধে ঝোলাল প্রতুল। বাঁ-পকেটে সিগারেট। ধরিয়ে সে জিগ্যেস করল, মন্দিরটা কত উঁচু, দূর থেকে দেখা যাবে?

রিনি বলল, বেশ উঁচুই তো হওয়ার কথা। পশ্চিম বাংলায় এত বড় প্রাচীন মন্দির খুব বেশি নেই।

সামনের মাঠ চিরে চলে গেছে রাস্তা। অনেক দূরে গাছপালা-ঘেরা গ্রাম, তার মাথা ছাড়িয়ে কোনও কিছুই আকাশের দিকে ওঠেনি। এই শীতেও আকাশ মেঘলা, এদিককার পৃথিবী এখন ছায়াময়।

প্রতুল বলল, এই মাঠের মধ্যে কেন অত বড় মন্দির বানাবে? মন্দির তো মানুষের জন্য, তাই না?

—এক সময় নিশ্চয়ই এখানটা সমৃদ্ধ জায়গা ছিল, হয়তো কোনও রাজধানী ছিল!

—সেসব লোপাট হয়ে গেল, শুধু মন্দিরটা বেঁচে রইল? ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না, হয়তো গিয়ে দেখব একখানা মাত্র ভাঙা দেয়াল।

—মোটেই না, আমি পুরো মন্দিরের ডেসক্রিপশান পড়েছি।

—কিন্তু, আমিও যেন কোথায় পড়েছি যে একসময় এই পুরো জায়গাটাই ছিল গভীর জঙ্গল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দুটো ব্যাটেলিয়ান একশো কুড়ি মাইল হেঁটেও তাদের তাঁবু খাটাবার জন্য ফাঁকা জায়গা খুঁজে পায়নি।

রিনির চটিতে কাঁকর ঢুকেছে। সে নীচু হয়ে তার ফর্সা পা থেকে লাল রঙের চটিটা খুলল। সে ইতিহাসের ছাত্রী ছিল, ইতিহাস তার সম্পত্তি।

রিনি মুখ তুলে চোখে কৌতুক ঝলসে বলল, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, সে তো মাত্র শ দুয়েক বছর আগেকার কথা। দেড়-দু'হাজার বছর আগেও এখানে সভ্যতার বিস্তার ঘটেছিল, এখানে ছোটখাটো স্বাধীন রাজ্য ছিল...রাজা সিংহবর্মা আর চন্দ্রবর্মার নাম শুনেছ? শশাঙ্করও আগে এঁরা ছিলেন বাঙালি রাজা। চন্দ্রবর্মাকে হারিয়েই সমুদ্রগুপ্ত রাঢ় বঙ্গের দিকে এগিয়েছিলেন।

ইতিহাস যেন একটা ফুটবল, কাছাকাছি পেলে সবাই একবার লাথি কষাতে চায়।

প্রতুল অবজ্ঞার সুরে বলল, বাঙালি রাজাই হোক আর বিদেশি রাজাই হোক সবই তো ছিল ডেসপট। আর মন্দির মানেই কলোসাল ওয়েস্টেজ অফ মানি! আগেকার দিনের রাজারা গরিব

লোকদের শোষণ করা টাকায় বড়-বড় মন্দির বানিয়ে নিজেদের নামে ঢাক পেটাত! এই ধাধ্ধাড়া গোবিন্দপুরে মন্দির না বানিয়ে একটা ভালো রাস্তা বানাতে পারেনি?

রিনি বলল, এককালে এখানে বিখ্যাত রাস্তা ছিল, তাম্রলিপ্ত থেকে পাটলিপুত্র, সেই রাস্তা গিয়েছিল বহুলাড়ার ওপর দিয়ে...

—তা রাজাদের যুগ শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে রাস্তাটাও কি হাপিস হয়ে গেল? রাজারা নিজেদের বানানো রাস্তা কি স্বর্গে নিয়ে গেছে?

রাস্তাটা সত্যি বেশ খারাপ। বড়-বড় খানাখন্দের ওপর সদ্য কিছু খোয়া ফেলা হয়েছে। কয়েকদিন বৃষ্টি নেই, তবু কোনও-কোনও জায়গায় জমে আছে কাদা। রিনি শাড়ি উঁচু করে তুলে পা ফেলছে খঞ্জনা পাখির মতন।

মনে হচ্ছে যে ঘণ্টাখানেক হাঁটা হয়ে গেছে, তবু পথের শেষ নেই। তবে এখন মাঠ ছাড়িয়ে চোখে পড়ে জনবসতি। দূরে একটা লম্বাটে, সাদা রঙের একতলা বাড়ি, সম্ভবত স্কুল। কিন্তু মন্দির কোথায়?

আকাশের অবস্থা দেখলে মনে হয় বিকেল শেষ হওয়ার আগেই অন্ধকার নেমে আসবে।

প্রতুল বলল, কালাপাহাড় নামে একটা লোক এদিককার সব হিন্দু মন্দির ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল না? তোমার ওই মন্দিরেরও নিশ্চয়ই সেই দশাই হয়েছিল।

রিনি বলল, তোমাকে অনেকবার বলেছি, বহুলাড়ার মন্দিরটা হিন্দুদের নয়, জৈনদের।

প্রতুল একটু থতোমতো খেয়ে গেল। কালাপাহাড় শুধু হিন্দু মন্দির ভেঙে জৈন্য-বৌদ্ধদের মন্দিরগুলো রেয়াত করেছিল কি না সে সম্পর্কে তার স্পষ্ট ধারণা নেই। কিন্তু অন্য একটা কথা তার মনে পড়ে যায়। সে জিগ্যেস করল, তুমি বোধগয়ার মন্দিরে গেছ?

রিনি মুখ ফিরিয়ে কিছুটা অবাক হয়ে বলল, না, কেন?

—বোধগয়ার বিখ্যাত মন্দির, বৌদ্ধদের মন্দির, যেখানে গৌতম বুদ্ধ একসময় গাছতলায় বসে তপস্যা করেছিলেন, সেই মন্দিরের সামনের দিকে শিবঠাকুরের পুজো হয়।

—হ্যাঁ, তাকে কী?

—অনেক বৌদ্ধ আর জৈন মন্দির হিন্দুরা পরে দখল করে নিয়েছে। তোমরা হিন্দুরাও অন্য ধর্মের ওপর কম অত্যাচার করোনি!

'তোমরা হিন্দুরা' এটা জোর দিয়ে বলার কারণ হল প্রতুল কনফার্মড নাস্তিক এবং সেকথা সে প্রায়ই জোরে জানান দিতে চায়।

এর উত্তরে রিনি শুধু বলল, আমরা সামনের বছর ওই দিকটায় বেড়াতে যাব, অ্যাঁ?

কাছাকাছি দুটি লোককে দেখে প্রতুল জিগ্যেস করল, এদিকে একটি মন্দির আছে?

সে 'না' শুনবে আশা করেছিল, কিন্তু লোকদুটি আগ্রহের সঙ্গে বলল, হ্যাঁ আছে, ওই তো ইস্কুলটা ছাড়িয়ে ডান পাশে...।

পাঁচ মিনিট হেঁটে সেই মন্দিরের সামনে পৌঁছে রিনির মুখে একই সঙ্গে রাগ, দুঃখ, বিরক্তি, ক্ষোভ, অবিশ্বাস ইত্যাদি অনেক কিছুর ছায়া মিশে গেল। না, না, না, এ মন্দির নয়, এটা হতেই পারে না! এটার জন্য কেউ কষ্ট করে এতদূর হেঁটে আসে না।

প্রতুল মিটিমিটি হাসছে।

একটা অতি সাধারণ শিবমন্দির, পনেরো-কুড়ি বছরের বেশি পুরোনো নয়, বাইরের দেয়ালটা সদ্য গেরুয়া রং করা, ভেতরের দেয়ালে অনেকগুলি ক্যালেন্ডারের ছবি। শিবলিঙ্গটি মনে হয় স্লেট পাথরের তৈরি, নাকে আসে পচা দই-এর গন্ধ।

একজন বলল, এই শিবঠাকুর নাকি খুব জাগ্রত!

রিনি জোর দিয়ে কান্না-কান্না গলায় বলতে লাগল, এটা নয়! বহুলাড়ার প্রাচীন মন্দির। জৈনদের

মন্দির!

দু-তিনজন জিগ্যেস করল, কোন জায়গা বলছেন?

—বহুলাড়া! বহুলাড়া!

ওরা কেউ রিনির কথা বুঝতে পারছে না। এ ওর দিকে চোখ নাচাচ্ছে।

প্রতুল এবার এগিয়ে এল রিনিকে সাহায্য করবার জন্য। সে সবিস্তারে বোঝাল, তারা দেখতে এসেছে এমন একটা মন্দির যার কথা ইতিহাস বইতে লেখা থাকে। সেটা ভাঙাচুরো হলেও ক্ষতি নেই—।

ওরা নিজেদের মধ্যে কিছুক্ষণ পরামর্শ করে তারপর জানাল যে সেরকম একটা মন্দির আছে বটে। প্রতুলদের রাস্তা ভুল হয়েছে। একটু আগের ডান দিকের রাস্তা ধরে যেতে হবে, একটা গ্রাম পেরিয়ে খানিকটা দূরে!

একজন বলল, কিন্তু সে মন্দিরে তো এখন পুজো হয় না!

রিনি ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, না হোকগে, আমরা কি পুজো দিতে এসেছি নাকি?

খানিকটা ফেরাপথে গিয়ে ওরা ডানদিকের রাস্তা ধরল। সামনেই একটা গ্রাম।

রিনি জিগ্যেস করল, এত কাছে থাকে, তবু ওরা বহুলাড়া মন্দিরের নাম শোনেনি?

—ওরা তোমার কথা বুঝতে পারেনি। তুমি বইতে নাম পড়েছ বহুলাড়া, আর ওরা বলছিল বেউল্যাড়া না কী যেন! আমাদের উচ্চারণ আলাদা।

একটু থেমে প্রতুল বলল, আমাদের অনেক কিছুই তো ওদের চেয়ে আলাদা!

রিনি বলল, কী বিচ্ছিরি একটা মন্দির বানিয়েছে, দেখলেই গা কিট-কিট করে। আগেকার দিনের মানুষদের রুচি ছিল, সৌন্দর্যবোধ ছিল, তাই কত সুন্দর-সুন্দর মন্দির বানাত!

সামনেই একটা গরুর গাড়ি গাড্ডায় পড়েছে। একজন বুড়ো গাড়োয়ান আর তার খুদে অ্যাসিস্টেন্ট প্রাণপণ ঠেলাঠেলি করেও তুলতে পারছে না।

প্রতুল ক্যামেরাটা খুলল। তারপর মনোযোগ দিয়ে দেখে বলল, এই রে, দুটো মোটে ফিল্ম আছে। আর একটা রোল ফেলে এসেছি!

রিনি বলল, তুমি কী যে কর! এত কষ্ট করে যাচ্ছি, তুমি মন্দিরের ছবি তুলবে না?

প্রতুল শাটারে হাত দিয়ে বলল, তুমি পুরোনো মন্দির দেখতে যাচ্ছ তো, ওই গরুর গাড়িটাও অন্তত দু-তিন হাজার বছরের পুরোনো তো হবেই। গৌতম বুদ্ধের সময়ও এই রকমই গরুর গাড়ি চলত! এই রকমই কাদায় পড়ত।

ছবিটা তোলার পর সে এগিয়ে গেল গরুর গাড়িটা ঠেলে তোলার জন্য হাত লাগাতে। কিন্তু ঠিক তখনই চাকাটা উঠে এল ওপরে। টাল সামলাতে না পেরে প্রতুল একটা হোঁচট খেল এবং বাঁ পা-টা একটু মুচকে গেল। পরোপকারের তো অভ্যেস নেই।

মেয়েরা অদ্ভুত-অদ্ভুত সময়ে হাসতে পারে। এই দৃশ্যে রিনির এতখানি হাসি পাওয়ার কোনও মানে হয়!

কিছুই হয়নি এরকম একটা ভাব করে প্রতুল আর একটা সিগারেট ধরাল।

বৃদ্ধ গাড়োয়ানটি জিগ্যেস করল, আপনারা কোথা থেকে আসছেন?

প্রতুল বলল, কলকাতা থেকে। ভাঙা, পুরোনো মন্দিরটা আর কত দূরে?

বৃদ্ধ ওদের দু-জনের দিকে আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে জিগ্যেস করল, বেশি দূরে নয়, রাতে থাকবেন কোথায়?

—কেন, এখানেই কোথাও থাকার জায়গা পাওয়া যাবে না? আপনার বড়িতে?

বৃদ্ধটি রহস্যময় ভাবে হাসল।

—আপনার বাড়ি কোথায়? এই গ্রামে?

—নাঃ!

গরুর গাড়িটিতে কিছু থালাবাসন, হাঁড়ি-কুড়ি, একটা টিনের বাক্স, দু-একটা বস্তা, একটা ভাঙা সাইকেল, একটা কানভাঙা মাটির কলসি রয়েছে, যেন কাদের গোটা সংসার। কেউ যেন এক জায়গার বাড়ি ভেঙে অন্য কোথাও চলে যাচ্ছে।

বৃদ্ধটির হাসির ধরন-ধারণ দেখে প্রতুল আর কোনও প্রশ্ন করতে সাহস পেল না।

কয়েকটি বাচ্চা ছেলেমেয়ে ওদের পেছন-পেছন আসছে। রাস্তার ধারে পুকুরে গা ধুতে-ধুতে স্ত্রীলোকরা অবাকভাবে চাইছে ওদের দিকে। দুটো কুকুর ঘেউ-ঘেউ করে উঠল।

রিনি এখন হাঁটছে প্রতুলের খুব কাছ ঘেঁষে। বাচ্চাদের সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছে, রীতিমতন পনেরো-কুড়িজনের একটা দল। সব খালি গা, কারু বা শুধু ইজের পরা। যে-বয়েসে বালিকাদের বুক ঢাকতে হয় সেই বয়েসি বালিকারা বুকের ওপর আড়াআড়ি রেখেছে দু-হাত।

প্রতুলের পায়ে যন্ত্রণা হচ্ছে, তবু যথাসাধ্য স্বাভাবিকভাবে চলবার চেষ্টা করছে সে। রাস্তা কি ফুরোবে না?

বাচ্চারা কিছু বলছে না, শুধু হাঁ করে দেখছে ওদের। রাস্তার ধারের বাড়িগুলো থেকে বয়স্ক লোকেরা উঁকি মারছে। শিশুরা এসে যোগ দিচ্ছে মিছিলে।

এতগুলো চোখের দৃষ্টিতে অস্বস্তি লাগেই। তাছাড়া, এরা সবাই মিলে পয়সা চাইবে না তো?

একটা কালো কুচকুচে সাত-আট বছরের সম্পূর্ণ উলঙ্গ ছেলে একেবারে ছুটে এল ওদের কাছাকাছি।

প্রতুল জিগ্যেস করল, এই তোর নাম কী রে?

ছেলেটি কোনও উত্তর না দিয়ে নাকের সিক্নি খুঁটে নিয়ে টপ করে মুখে পুরে দিল।

রিনি দুঃখিতভাবে মুখ ফিরিয়ে নিলে বলল, এঃ!

প্রতুল বলল, এখানে স্বাধীন রাজ্য ছিল, এত বড় মন্দির, কাছাকাছি নিশ্চয়ই মন্ত্রী-সেনাপতিদের বাড়ি ছিল। এই ছেলেটা হয়তো সেই রকমই কারু বংশধর।

কাছাকাছি একটা বাড়ি থেকে একঘেয়ে একটা কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছে। একটু আগে ছাড়িয়ে আসা একটি কিশোরী মেয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠল, ধর্মরাজের ঘোড়া, বাঁ-পাটি লটর পটর ডান পাটি খোঁড়া!

প্রতুল হেসে বলল, আমাকেই বলছে নাকি?

রিনি উত্তর দিল না। সে তার মনটাকে এই পরিবেশ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়েছে।

মস্ত বড় একটা কাঠের বোঝা নিয়ে আস্তে-আস্তে হেঁটে যাচ্ছে এক বুড়ি। কত বয়েস হবে এই বুড়ির, মুখের চামড়া দেখলে মনে হয় শ-খানেক বছরের কম নয়। কাছাকাছি জঙ্গল থেকে শুকনো কাঠ কুড়িয়ে এনেছে মনে হয়, অত বড় একটা বোঝা প্রতুল নিজেই বইতে পারবে কি না সন্দেহ।

এইরকম এক বৃদ্ধাকেও যখন এত পরিশ্রম করতে হয় তখন ওর সংসারের অবস্থাটা কীরকম তা অনুমান করতে বেশি কল্পনাশক্তির দরকার হয় না।

বুড়িটি মাঝে-মাঝে থেমে আকাশের দিকে চাইছে। মেঘলা আকাশে ওর কীসের কৌতূহল? রিনি আর প্রতুল ওর পাশ দিয়ে এগিয়ে গেল, বুড়িটি একবার ভ্রূক্ষেপও করল না!

এক-একটা কুকুর যেমন অচেনা মানুষের সঙ্গ নেয়, ন্যাংটো বাচ্চাটা সেই রকম ওদের কাছ

ছাড়ছে না। ছেলেটার পেটটা তার মাথার চেয়েও অনেক বড়। রিনি এমনিতে বাচ্চাদের ভালোবাসে কিন্তু ছেলেটার দিকে একবারও তাকাচ্ছে না।

এবার একটা বাঁক ঘুরেই চোখে পড়ল মন্দির। বড় একটা আমগাছে ঢাকা পড়ে ছিল। সত্যিই বেশ বড় মন্দির, তার গায়ে প্রাচীনত্বের গাম্ভীর্য ও কারুকাজ। বেশ একটা ইতিহাস-ইতিহাস ছাপ আছে। সামনে প্রশস্ত চত্বর। পুরাতত্ত্ব বিভাগের একটি নোটিশও টাঙানো আছে। কে জানে, ওই নোটিশটি টাঙিয়ে যাওয়ার পর পুরাতত্ত্ব বিভাগের এই মন্দিরটার কথা মনে আছে কি না!

রিনির চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সে উচ্ছ্বসিতভাবে বলে উঠল, দ্যাখো বলেছিলুম না! কী ম্যাজেস্টিক!

প্রতুল উলটো দিকে ফিরে দেখল একটা নিরানন্দ নিঝুম গ্রাম, আর কতগুলো মলিন ছেলেমেয়ে। ইতিহাস এই মন্দিরটাকে টিকিয়ে রেখেছে আর কাছাকাছি মানুষগুলোকে ক্রমশই ঠেলে দিচ্ছে ধ্বংসের দিকে।

আজকের বর্তমানও তো একদিন ইতিহাস হবে, তখন এখানে এসে মানুষ কী দেখবে?

ন্যাংটো বাচ্চাটা চোখ গোল-গোল করে তাকিয়ে আছে রিনির দিকে।

প্রতুল জিগ্যেস করল, এই, কী দেখছিস রে? এখানে আর আমাদের মতন কেউ আসে না?

ছেলেটি বলল—হ্যাঁ—। আগের বছর এসেছিল একজন সাহেব আর মেম।

প্রতুল ক্যামেরা তুলে বলল, তুই এই মেমসাহেবের পাশে দাঁড়া, তোর ছবি তুলি।

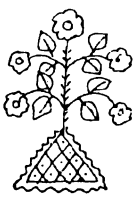

বিরলে নিরালায়

দাড়ি কামাতে-কামাতে ব্যথাটা শুরু হল। শূন্য থেকে হঠাৎ উঠে আসা উল্কার মতন। খড়ের ঘরে দপ করে আগুন জ্বলে ওঠার মতন। এ ব্যথা চিনতে কখনও ভুল হয় না।

এক্ষুনি শুয়ে পড়া নিয়ম। এক পা-ও না হেঁটে, এই বাথরুমের মেঝেতেই। কিন্তু কতকগুলো জিনিস করা যায় না। কিছুতেই যায় না। যতক্ষণ জ্ঞান থাকে। মুখের আধখানায় সাবান মাখানো, হাতে রেজার স্টিক, এই অবস্থায় প্রতুল সেনগুপ্ত বাথরুমের মেঝেতে শুয়ে পড়তে পারে না।

প্রতুল আয়নায় দেখল, তার কপালে, এই শীতের সকালেও বিন্দু-বিন্দু ঘাম। বাঁ-হাতটা অবশ হয়ে আসছে। ব্যথাটা তরঙ্গের মতন এক-একবার প্রবল ঝাপটা মেরে তার চেতনা কেড়ে নিতে চাইছে, আবার একটু ফিকে হয়ে যাচ্ছে যেন।

ব্যথার চেয়েও প্রবল একটা রাগ ছড়িয়ে পড়ল তার মাথায়। দাঁতে দাঁত চেপে সে বলল, গডড্যম ইট! আমায় ভয় দেখাতে চাইছে!

আস্তে আস্তে বাথরুমের দরজার ছিটকিনিটা খুলে দিল সে। তারপর দরজাটা ফাঁক করে রাখল একটু। অনেক সময় দরজা ভেঙে বার করতে হয়, সে জানে। বন্ধ বাথরুমের মধ্যে এই রকম ব্যথা এর আগে অনেককে হানা দিয়েছে।

তারপর দাড়ি কামানো শেষ করল। মাথা নীচু করে মুখটা আর ধোওয়া হল না, ব্যথাটা এবারে তার টুঁটি চেপে ধরেছে। বুকের তোয়ালেটা মুখে বুলিয়ে সে এক-পা এক-পা করে হেঁটে এল নিজের শোওয়ার ঘরে। বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে সে সাদা ছাদ দেখল। সদ্য কালি ফেরানো

হয়েছে, ঘরের দেওয়াল ও ছাদ ধপধপে, এই প্রথম প্রতুলের মনে হল, ঠিক হাসপাতালের মতন।

বাইরে একটা চমৎকার সকাল। এত ভোরে প্রতুল সচরাচর জাগে না, তাই এরকম সকাল দেখা যায় না। জানলার গায়ে যে রোদ পড়েছে, তা ঠিক এক থোকা আঙুর ফলের মতন, হ্যাঁ, সেইরকমই মনে হয়। বাইরে পাখিটাখিও ডাকছে। ওই পাড়ায় পাখিদের অস্তিত্ব সম্পর্কে কোনও ধারণাই ছিল না প্রতুলের।

রাস্তায়, এমন কি বাড়ির মধ্যেও যেসব শব্দ, তার মধ্যে ফুটে উঠছে একটা চাপা উল্লাস। আজ একটি বিশেষ দিন।

দ্রুত হাতে চুলে চিরুনি চালাতে-চালাতে ঘরে ঢুকে রানী বলল, এ কী, তুমি শুয়ে পড়লে যে?

প্রতুল মুখে খানিকটা হাসি আঁকল। একটু হালকা গলায় বলল, তোমরা তৈরি হও না, আমি ততক্ষণ কাগজটা পড়ে নিই।

খররের কাগজটা পাশেই, সেটা তুলে ধরতে হল মুখের সামনে। এতে মুখ আড়াল করা যায়। ব্যথাটা যেন তার বুক ফাটিয়ে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

সেই রাগের ভাবটা এখনও ধিকিধিকি করে জ্বলছে মাথায়, তার সঙ্গে একটু-একটু করে মিশছে নৈরাশ্য। আজই, এখনই এটা আসার দরকার ছিল? কাল রাত্তিরে, কিংবা ঘুমের মধ্যে এরকম হলে কী ক্ষতি ছিল। আজ যে একটা অন্যরকম দিন।

মামুন আর টোটো অনেকক্ষণ থেকেই নতুন পোশাকে তৈরি। ওরা ছুটোছুটি করছে সারা বাড়ি কাঁপিয়ে। এক একবার দুদ্দাড় করে নেমে যাচ্ছে সিঁড়ি দিয়ে।

দমাস করে দরজা ঠেলে ঢুকে টোটো ঘোষণা করল, মাসীমণিরা এসে গেছে!

ঘরে এক ঝলক সোনালি আলো নিয়ে এল রানীর ছোট বোন বনানী। তার বড়-বড় চোখ, তার হাসিমাখা ওষ্ঠে আসে এই রকম আলো। তার অস্তিত্বেই আছে সুস্বাস্থ্যের আভা।

সামান্য ব্যাপারেই বনানীর মুখে বেশি বিস্ময় ফোটে। সে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলল, এ কী, প্রতুলদা, তুমি এখনও শুয়ে? কী ব্যাপার?

উচ্ছল, হালকা গলায় প্রতুল বলল, জানো না, আমার তৈরি হতে ঠিক দু মিনিট লাগে? তোমার দিদিকে তাড়া দাও!

—চান করবে না?

—আমি নদীতে গিয়ে সাঁতার কাটব!

প্রিয় শ্যালিকার জন্য কত কষ্ট করে যে প্রতুল তার কণ্ঠে এই লঘু সুর এনেছে, তা আর কেউ জানবে না। তার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। কারডিয়াক অ্যারেস্ট বুঝি বলে একেই!

বনানী মুহূর্তে মুখ ফিরিয়ে বলল, এই দিদি, আমার ছেলের জন্য জল ফুটিয়ে নিতে হবে রে, আমি ফ্লাস্ক আনতে ভুলে গেছি।

একটা সুবিধে এই যে প্রতুল আগে থেকেই এরকম একটা রেকর্ড করে রেখেছে যে সে জিনিসপত্র গুছোবার ব্যাপারে কোনও সাহায্য করতে পারে না। সুতরাং সারা বাড়িতে যে প্রস্তুতি পর্ব চলছে, তাতে আপাতত আর কোনও ভূমিকা নেই।

ড্রাইভার এসে বলল, দাদাবাবু, একটা ফ্যান বেল্ট নিতে হবে। আর একটা অ্যাকসিলারেটারের তার—

রাস্তা থেকে—শুধু এইটুকু বলে প্রতুল পাশ ফিরল। রানী খুব মনোযোগ দিয়ে রাস্তায় কী যেন দেখছে, এদিকে একবার মুখ ফেরাতেই প্রতুলের সঙ্গে চোখাচোখি হল, প্রতুল বলল, রানী—।

সে বলতে যাচ্ছিল, রানী, সব বন্ধ করে দাও, শিগগির ডাক্তার ডাকো, আমি মরে যাচ্ছি!

কিন্তু সে কথা সে বলল না। থেমে গিয়ে, একটু সময় নিয়ে সে বলল, আমার পার্সটা

তোমার সঙ্গে নিও। আর হুইস্কির বোতলটা—।

এখন সবকিছু থামিয়ে দেওয়া যায় না। এমন চমৎকার শীতের সকালে স্ত্রী, ছেলেমেয়েরা, শ্যালিকা, এক জোড়া বন্ধু ও বন্ধুপত্নী বেড়াতে যাওয়ার জন্য উৎফুল্ল হয়ে আছে। এর মধ্যে প্রতুল একবার তার ব্যথার কথা বললেই সব থেমে যাবে। বদলে যাবে রানী আর বনানীর মুখ। বাচ্চারা ঠিক বুঝতেই পারবে না। বন্ধু আর বন্ধুপত্নী মোটেই বিরক্ত বা দুঃখিত হবে না, বরং তারা দারুণ উদ্বিগ্ন হয়ে প্রতুলের খাটের পাশে এসে দাঁড়াবে।

এরকম স্বার্থপরের মতন কাজ প্রতুল কখনও করেছে আগে? তার নিজের কোনও কারণে অন্যদের সুখ নষ্ট করে দেওয়া?

যদি এমন হয়, ডাক্তার আসে, এত সকালে তাঁকে আনতে বেশ ঝামেলা করতে হবে, সঙ্গে ই সি জি যন্ত্র, বেড়াতে যাওয়ার প্রোগ্রাম ক্যানসেলড, সারা বাড়ি থমথমে। সব পরীক্ষা করে দেখা হল। কিছুই হয়নি। ডাক্তার বললেন, গ্যাসের চাপ দিয়েছিল, তাতে অনেক সময় মনে হয় বটে...।

প্রতুল এত ভীতু? তার এই দর্শনটা সে এতকাল সগর্বে বলে এসেছে, আমি আগামীকালের কথা কখনও চিন্তা করি না, আমার আজকের জীবনটাই আসল জীবন!

প্রতুল উঠে বসল।

বনানী অর্থাৎ টিংকু এসে বলল, প্রতুলদা, একটা সিগারেট খাব!

কাল রাত্তিরেই দশ প্যাকেট সিগারেট এনে রেখেছে প্রতুল। বাইরে গেলে তার নিজস্ব ব্র্যান্ড যদি পাওয়া না যায়, সেইজন্য সেসব সময় স্টক রাখে। টিংকু চাইলে সে বরাবর দুটা সিগারেট একসঙ্গে ঠোঁটে চেপে ধরিয়েছে।

এই অবস্থায় সিগারেট? তার চেয়ে আর্সেনিক খেলেই বা ক্ষতি কী?

টিংকুর ঝলমলে মুখখানার দিকে তাকিয়ে প্রতুল বলল, নিশ্চয়ই! লাইটারটা ওই যে, এনে দাও তো!

দুটি সিগারেটই ধরাল প্রতুল। নিজেরটা ইনহেল না করলেই হল। ফুকফুক করে টানবে।

জামাইবাবুর কাঁধে হাত রেখে টিংকু বলল, এবারে উঠুন, আমরা সব রেডি।

টিংকু এত কাছে দাঁড়িয়ে বলেই বোধহয় ব্যথাটা এখন একটু কম লাগছে। তবে শ্বাসকষ্টের ভাবটা এখনও রয়েছে। বুকের ওপরে যেন একটা পাথর চাপানো।

প্যান্ট শার্ট পরতে গেলে, এ ঘর থেকে বেরিয়ে, বারান্দা দিয়ে হেঁটে অন্য ঘরে যেতে হবে। অন্তত কুড়িটা স্টেপ। প্রতুল কতবার ডাক্তার বন্ধুদের কাছে শুনেছে, চেষ্ট পেইন হলে এক পাও হাঁটা উচিত নয়। প্রথম চিকিৎসাই হল সাবধানে শুয়ে থাকা।

খাট থেকে নেমে প্রতুল ধীর পায়ে হেঁটে গেল পোশাকের ঘরে। এ ঘরের সংলগ্ন বাথরুমের দরজাটা হাট করে খোলা, সিগারেটটা ছুড়ে কমোডের মধ্যে ফেলে দিল প্রতুল। রানীর চোখে এটা একটা অমার্জনীয় অপরাধ। কিন্তু ফেরা হবে তিনদিন পর। কিংবা, এটার জন্য আর কোনওদিনই রানী তাকে বকুনি দিতে পারবে না।

শার্ট গায়ে গলাবার পর, প্যান্টটা পরবার জন্য একটা পা তুলতেই ঠিক যেন একটা বন্দুকের গুলি লাগল প্রতুলের বাঁ-বুকে। অসহ্য ব্যথায় বসে পড়ল সে। সারা শরীর ঘামে ভিজে যাচ্ছে। সে আর পারছে না। শার্টের নীচে শুধু জাঙ্গিয়া পরা, প্যান্টের এক চোঙার মধ্যে একটা পা ঢোকানো, এরকম অসহায় অবস্থায় বসে আছে প্রতুল, দরজা খোলা, যে-কোনও সময় বাচ্চারা, কিংবা রানী কিংবা টিংকু এসে পড়তে পারে।

সাদা দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে ক্রুদ্ধ হিসহিসে গলায় প্রতুল বলল—ইফ ইউ ওয়ান্ট টু কিল মি, কিল মি হোয়েন আই অ্যাম অ্যালোন।

কথাটা বলেই, ব্যথার চেয়েও বেশি বিস্ময়ে অবসন্ন হল প্রতুল। এরকম কথাটা সে বলল

কাকে! এরকম অদ্ভুত ইংরিজিতে? ইউ? সে, প্রতুল সেনগুপ্ত, যার কাছে অনির্দেশ্য কিছুই নেই, সে কাকে সম্বোধন করছে? দেওয়ালকে?

হু দা হেল ইজ দ্যাট ইউ? ড্যাম ইট!

তক্ষুনি বেশ দাপটের সঙ্গে উঠে দাঁড়াল প্রতুল। দ্রুত প্যান্ট পরে নিয়ে কোমরে বেল্ট বাঁধল; বেরিয়ে এসে বলল, টিংকু, চিরুনিটা দাও!

পাঁচ মিনিটের মধ্যে সে নীচে নেমে এসে গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে অসহিষ্ণু গলায় বলছে, ওঠো, ওঠো, আর দেরি নয়! রোদ চড়ে যাচ্ছে!

তাকে ভয় দেখানো হচ্ছে? মৃত্যু ভয়? একটা থাপ্পড় কষাবে সে মৃত্যুর গালে। উনপঞ্চাশ বছর বয়েস, তার জীবনে কোনও অনুতাপ নেই। কোনও উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই। হ্যাঁ, বেঁচে থাকা খুব সুন্দর, খুবই উপভোগ্য, কিন্তু মরতে হলেও সে টুসকি দিয়ে মরে যেতে পারে।

জেদ করে সে একটা সিগারেট ধরাল। ইউ? তার বেঁচে থাকার মধ্যে কোনও ইউ নেই। মৃত্যু তো জাস্ট একটা হ্যাপনিং, জন্মানোর মতনই।

সবাই পেছনে বসল, প্রতুল সামনে। লম্বা রাস্তা, ড্রাইভারকে মাঝে-মাঝে বিশ্রাম দিয়ে, তার গাড়ি চালাবার কথা। পথ থেকে প্রকাশ আর শ্রাবণীকে তুলে নিতে হবে।

যথারীতি প্রকাশ এখনও তৈরি হতে পারেনি। ওপরের বারান্দা থেকে পা-জামা পাঞ্জাবি পরা অবস্থায় ঝুঁকে প্রকাশ বলল, এই ওপরে এসো তোমরা! চা খেয়ে যাবে!

টিংকু ছটফটে। বাইরে বেড়াতে যাওয়ার নামেই তার শরীরে একটা গতি এসে গেছে, সে বলল, না, না, আমরা আর চা খাব না। আপনারা চলে আসুন!

প্রকাশ বলল, আরে, ট্রেন ধরার তাড়া তো নেই। এসো এসো, লুচি ভাজা হচ্ছে।

—লুচি খাব না!

শ্রাবণীর স্নান হয়নি এখনও। আরও দশ পনেরো মিনিট তো লাগবেই!

স্নান না করে মেয়েরা বাড়ি থেকে বেরুতে পারে না, এটা যেন একটা ধর্মীয় নির্দেশ। রানী স্নান করেছে, টিংকু স্নান করেছে, শ্রাবণীও তো স্নান করবেই। প্রতুল স্নান করেনি। প্রকাশও করবে না নিশ্চয়ই।

রানী বলল, চল, তাহলে ওপরে গিয়ে বসি!

ওপর মানে তিনতলার সিঁড়ি। প্রতুল গ্যাসের ব্যথা চেনে। জল খেলে কমে যায়। একবার দার্জিলিং-এ এই অন্যরকম ব্যথা হয়েছিল। ডাক্তার পরে বলেছিল, ইস্‌কিমিয়া। সিগারেট বন্ধ, রাত-জাগা একেবারেই চলবে না, মদ তিন পেগ। প্রতুল কোনওটাই মানেনি।

এবারে ব্যথা অনেক বেশি, একেবারে অমোঘ। আর যাই হোক, এখন তিনতলার সিঁড়ি দিয়ে ওঠার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। আর কিছু না, যদি সিঁড়িতেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে, তারপর ডাক্তার ডাকবার আগেই...। একটা বিশ্রী, নাটকীয় ব্যাপার। প্রতুল এইরকম নাটকই তো অপছন্দ করছে। কেন আজ সবাই মিলে আনন্দ করে বেড়াতে যাওয়ার দিনেই এই উৎপাত!

ইংরিজি বাক্য কিংবা ইউ সম্বোধনটার কোনও মানে হয় না, কিন্তু প্রতুল তখন বলতে চেয়েছিল—নিরালায়, নিরিবিলিতে আসুক মৃত্যু, তখন সে দেখবে, প্রতুল কত সহজভাবে তাকে গ্রহণ করতে পারে।

প্রতুল বলল, তোমরা ওপরে গিয়ে বসো, আমি ততক্ষণে সামনের পাম্প থেকে গাড়িতে তেল ভরে আনছি।

পাম্পে গিয়ে তেল ভরবার পর প্রতুলের মনে পড়ল তার কাছে টাকা নেই। মানি ব্যাগটা দিয়েছে রানীর কাছে। কেন সে তখন রানীর কাছে টাকা রাখার কথা বলল? কোনওদিন তো এমন হয় না। সে পুরুষ, সক্ষম দলপতি, বাইরে যাওয়ার পথে তাকে অনেক খরচ করতে হবে, তার

কাছেই তো টাকা রাখবার কথা।

ড্রাইভারকে পাঠিয়ে দিল প্রকাশের বাড়িতে মানি ব্যাগ আনবার জন্য।

সাদা দেওয়ালকে সেই কথাটা শোনাবার পর কিন্তু ব্যথাটা যেন অনেকটা কমে গেছে। একেবারে থামেনি। ঢেউয়ের মতন ঝাপটা মারছে মাঝে-মাঝে। দমবন্ধ ভাবটাও একটু কেটেছে। এরকমই হয়, একটুখানি স্বস্তি ফিরে আসে, তখন অসাবধান হয়ে একটু পরিশ্রম করলেই আবার ক্যাঁক করে ধরে। তখন এক ঝাপটায় একেবারে ফেলে দেয়। যেমন দিয়েছিল বিমলকে। আসানসোলে হোটেলের ঘরে। দরজা ভাঙার পর দেখা গিয়েছিল, সে বাইরে যাওয়ার পোশাক পরে প্রস্তুত হয়ে দরজার কাছেই মাটিতে লুটিয়ে আছে। হাতে দেশলাই।

প্রকাশ আর শ্রাবণী নেমে এসেছে, এবারে সামনে পেছনে করে বসতে হবে। ড্রাইভার বাদ দিয়ে তিনটি নারী, দুটি পুরুষ, চারটি বাচ্চা।

এর মধ্যে দুটি বাচ্চাকে সামনেই দিল, টিংকু বলল, আমি প্রতুলদার পাশে গিয়ে বসব। আমি কিন্তু জানলার ধারে, প্রতুলদা!

টিংকুর বর অমিতাভ অফিসের ট্রেনিং নিতে চেকোশ্লোভাকিয়া গেছে, প্রোষিতভর্তৃকা টিংকু এখন তো জামাইবাবুর একটু আদর কাড়তেই পারে।

যদিও কপালে ঘাম, তবু মাঝে-মাঝে শীতে, কাঁপুনি দিচ্ছে প্রতুলের শরীরে। টিংকুর পাখির মতন শরীরের উত্তাপ বুকের কাছে পেয়ে তার ভালো লাগে। টিংকুর কাঁধে হাত রেখে সে তাকে বুকের সঙ্গে ছুঁইয়ে রাখে।

শহর ছাড়িয়ে বাইরে পড়তেই শ্রাবণী গান ধরে। শ্রাবণী চমৎকার গান করে, রানীরও গানের স্টক অনেক, সে-ও গলা মেলায়। টিংকু সব গান দু-এক লাইন করে জানে, তারও খুব উৎসাহ। রাস্তার ধারের গাছপালায় এই রিনরিনে কণ্ঠস্বরগুলির ঝাপটা লাগে।

একটু পরেই টিংকু তার অতি বিস্মিত চোখ দুটি ফিরিয়ে জিগ্যেস করে, এ কি, প্রতুলদা, তুমি গাইছ না?

প্রতুলের গলায় সুর নেই, কিন্তু কণ্ঠস্বর জোরালো। কোরাস গানে তার কণ্ঠস্বর থামের কাজ করে। প্রত্যেকবার বাইরে বেরুলেই এরকম হয়।

যেতে হবে বহরমপুরে, পাঁচ-ছ'ঘণ্টার পথ, সঙ্গে বাচ্চারা আছে। দু-তিনবার থামতেই হবে। পৌঁছতে-পৌঁছতে সেই সন্ধে। সেখানে সিদ্ধার্থের বিরাট বাড়ি, অনেক রকম ব্যবস্থা সমেত সিদ্ধার্থ ব্যগ্র হয়ে বসে আছে সেখানে।

সুতরাং অনেকখানি পথ, অনেক গান হবে। এর মধ্যে প্রতুল চুপ করে বসে থাকলে সবাই ভাববে, প্রতুলের মুড নেই।

প্রতুল গান ধরতেই টিংকু বলল, এই, এই প্রতুলদা, তোমার স্কেল ঠিক হচ্ছে না!

শুধু স্কেল কেন, গলার আওয়াজও একেবারে অন্যরকম। প্রতুল নিজেই যেন চিনতে পারছে না। এ কার গলা? হ্যাঁ, এটা একটা স্পষ্ট লক্ষণ, গলার আওয়াজ বদলে যায়। মুখটাও যেন একটু বেঁকে যাচ্ছে প্রতুল চোয়ালে হাত বুলিয়ে দেখল, ঠিক, চোয়ালে অন্যরকম চাপ।

গান গাইবার জন্য চেঁচিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ব্যথাটা আবার তীব্র হয়ে ফিরে এসেছে। মৃত্যুর আগে সিন্ধু সারসেরা শেষবারের মতন মধুরতম সুরে ডেকে ওঠে, মানুষ তা পারে না। ট্রেন যাত্রার মধ্যপথে এক অচেনা স্টেশনে নেমে পড়ে, দ্বিতীয় তানসেনপ্রতিম আবদুল করীম খাঁ, তানপুরাটা পাশে নিয়ে শুধু ঝংকার তুলেছিলেন, গান গাইতে পারেননি, ঠোঁট ফাঁক করলেও স্বর ফোটেনি।

যদি এই সময়টাতেই চরম মুহূর্ত আসে? প্রতুল গাড়ি থামাতে বলবে। আস্তে-আস্তে নেমে গিয়ে একটা বড় গাছতলায় ঘাসের ওপর শুয়ে পড়বে। ডাক্তার ডাকার দরকার নেই। আকাশ দেখতে দেখতে চোখ জুড়িয়ে যাবে।

কিন্তু সেটাও কি নাটকীয় হয়ে যাবে না? মেয়েরা কাঁদবে। বাচ্চারা হতভম্ব, প্রকাশ বেচারা এমনই বিমূঢ় হয়ে পড়বে যে—না, না, তার দরকার নেই।

আমাকে এমনভাবে মেরো না। এমন নাটক করে সবাইকে বিব্রত করতে চাই না। তুমি আমাকে বিরলে, নিরালায় মৃত্যুর দ্বার দেখিয়ো। তখন দেখো প্রতুল সেনগুপ্তের জীবন দর্শন, হাসতে হাসতে টুপী তুলে মৃত্যুর দরজা ঠাস করে খুলে সে চলে যাবে। নো রিগ্রেটস নো অ্যাম্বিশানস!

তুমি? গড ড্যাম ইট!

কে তাকে মারবে? তার নিজের হৃৎপিণ্ড থেমে যাবে, সে মরবে, এতে কার কী বলার আছে? বেশি মদ, বেশি সিগারেট, বেশি পরিশ্রম, বেশি রাত-জাগা, এসবই তো তার নিজের সিদ্ধান্ত! তার স্বেচ্ছা-জীবন, স্বেচ্ছা-মৃত্যু!

ওষুধ, একটা কিছু ওষুধ দিয়ে এই সংকটটা কাটিয়ে ওঠা যায় না?

মধ্য বয়সের অন্য কোনও ব্যাধি স্পর্শ করেনি প্রতুলকে। একমাত্র অ্যান্টাসিড ছাড়া অন্য কোনও ওষুধ থাকে না তার কাছে। দুটো জেলুসিল সকালেই খাওয়া হয়ে গেছে। এটা জেলুসিলের কেস নয়।

দম আটকে আসছে, দম আটকে আসছে। একটা কিছু চাই। হঠাৎ প্রতুলের ইচ্ছে হল, টিংকুর প্রস্ফুটিত মুখখানি ফিরিয়ে একটা পরিপূর্ণ চুম্বন দিতে। জলে-ডোবা মানুষকে যেমন কৃত্রিম শ্বাস দেওয়া হয়, সেইরকম, টিংকু, তোমার অফুরন্ত জীবনী শক্তি থেকে একটুখানি আমায় দেবে? আমার নিশ্বাস বড় কম, আর খরচ করতে পারছি না, তোমার অর্বুদ সংখ্যক নিশ্বাস থেকে কয়েক লক্ষ অন্তত।

টিংকু যদি অবাক হয়, তা হলে প্রতুল মুখ ফিরিয়ে রানীকে আর প্রকাশদের বলবে, ওগো, আমার সময় ফুরিয়ে আসছে, এখন টিংকু যদি একটা উষ্ণ চুম্বন দিয়ে আমায় বাঁচাতে পারে, তোমরা অনুমতি দেবে?

না, না, এটাও বড্ড বেশি নাটক! প্রতুল এর কিছুই করতে পারবে না।

বিদ্যুৎ চমকের মতন মনে পড়ল, আর একটা ওষুধ আছে।

মুখ নীচু করে ফিসফিসিয়ে প্রতুল বলল, টিংকু, পায়ের কাছের ব্যাগ থেকে হুইস্কির বোতলটা বার করো তো।

আঁতকে উঠে টিংকু বলল, হুইস্কি? এখন?

দৃঢ় গলায় প্রতুল বলল, বার করো!

পেছন থেকে রানী আর শ্রাবণী এক যোগে বলল, এই সকালবেলা হুইস্কি? তুমি/আপনি পাগল হলে/হলেন?

প্রকাশ বলল, আর একটু বেলা হোক, বিয়ার খাব। আমি বিয়ার নিয়েছি সঙ্গে।

প্রতুল ততক্ষণে নিজেই ব্যাগটা তুলে নিয়েছে নীচু হয়ে। অত্যন্ত দ্রুত আঙুলে বোতলটা খুলেই সে কাঁচা একটা বড় চুমুক দিল। রক্তের গতিবেগ বাড়িয়ে দেয় অ্যালকোহল। এখন হৃৎপিণ্ডের মাস্‌লগুলোতে রক্ত পাম্প করা দরকার। হায়দ্রাবাদ থেকে এক কর্নেল ফিরছিলেন জিপে, এমন সময় কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়, সঙ্গে ছিল একটা ব্র্যান্ডির বোতল, একটু-একটু করে চুমুক দিতে লাগলেন তাতে। সতেরো মাইল দূরে হাসপাতালে পৌঁছবার পর ডাক্তার বললেন, ওই যে আপনি ব্র্যান্ডি খেয়েছিলেন, সেইজন্যই বেঁচে গেলেন। কে যেন বলেছিল গল্পটা?

পেছনের সিটে সকালে হুইস্কি বিষয়ে প্রবল সমালোচনা হচ্ছে। আর একটা বড় চুমুক দেওয়ার পর মুখ ফিরিয়ে হাসিমুখে প্রতুল বলল, আমার যখন যা ইচ্ছে হয় তা-ই করি, জানো তো, শুধু শুধু আমায় বারণ করে কী লাভ?

সারা রাস্তায় যখনই ব্যথাটা বাড়ে, প্রতুল একটা করে চুমুক দেয়। ফলে তার ঠিক নেশা

না হলেও শরীরটা হালকা হয়ে যায় আস্তে-আস্তে। মাথাটা টলটলে। ঠোঁটে হুইস্কির স্বাদ থাকলে সিগারেট টানতেই হয়। ইনহেল না করলে সুখ নেই। যা চলছে চলুক।

রানী বেশ রাগ করেছে, গান বন্ধ। প্রতুল যদি মুখ ফিরিয়ে বলে, কেন হুইস্কি খাচ্ছি, জানো? আমার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে! তা হলে বিরাট শব্দে একটা বজ্রপাত হবে না? ওর কথা সবাই বিশ্বাস করবে, কারণ প্রতুল সচরাচর মিথ্যে কথা বলে না। নিজের সম্পর্কে এরকম মিথ্যে তো বলবেই না। এরকম হঠকারি দুঃসাহস ওর পক্ষেই সম্ভব।

এরকম নাটকও পছন্দ করে না প্রতুল। এমনকী, রানাঘাট বা কৃষ্ণনগর পেরিয়ে যাওয়ার সময়। হায়দ্রাবাদের সেই কর্নেলের মতন সে কোনও হাসপাতালেও গেল না। কৃষ্ণনগরে তার এক বন্ধু থাকে, তার খোঁজ করলে, কোনও ভালো ডাক্তারকে দিয়ে চেক আপের ব্যবস্থাও তো করা যেত অনায়াসে। কিন্তু এরকম একটা কিছু উচ্চারণ করলেই রানীর সমস্ত ভ্রমণের আনন্দ নষ্ট হয়ে যাবে। সবাই তাকে ভালোবাসে কেউ আর সুস্থির থাকবে না।

বহরমপুরে পৌঁছে গেল সন্ধের একটু আগেই। সিদ্ধার্থ আর অরুণা দাঁড়িয়ে ছিল বারান্দায়, নেমে এল তরতর করে।

ব্যবস্থা সব দোতলায়, কিন্তু সেখানে তখুনি না উঠে প্রতুল মাতালের ভান করে গা গলিয়ে দিল বসবার ঘরে। উপুড় হয়ে কৃত্রিম নাক ডাকতে লাগল। টিংকু তার পিঠে একটা কিল মেরে বলল, ভালো লাগে না!

গঙ্গায় বেড়াবার জন্য নৌকোর ব্যবস্থা করে রেখেছে সিদ্ধার্থ। সেখানে মাছ ভাজা আর হুইস্কি, সঙ্গে সোডা, আইস বক্সে বরফ। কতরকম আহ্লাদের স্বপ্ন। কিন্তু প্রতুল যেতে পারবে না। জড়িত গলায় সে বারবার বলতে লাগল, তোমরা ঘুরে এসো। আমি ঘুমোব! আমি কাল যাব!

সবাই জানে, প্রতুল গোঁয়ার, একবার না বললে তাকে দিয়ে হ্যাঁ করানো মুশকিল।

সবচেয়ে বেশি রেগে আছে রানী। তার স্বামী এরকম অসময়ে মাতলামি করছে বলে খুবই অপমানিত হয়েছে সে। সিদ্ধার্থ আর অরুণা কী ভাবছে? প্রতুলের সঙ্গে একটা কথাও বলল না সে। প্রতুল ইচ্ছে করে নাক ডাকার শব্দ করছে। টিংকুও তুলতে পারল না তাকে। সবাই পোশাক বদলে, আকাশে পঞ্চমীর চাঁদ ওঠার পর চলে গেল নদীতে।

সারা বাড়ি নিস্তব্ধ হওয়ার পর উঠে বসল প্রতুল। বুকে সেই ব্যথার বোধটা আর নেই। অনেকটা ভালো লাগছে। তবে বুকে একটা কিছু দাগ ধরিয়ে দিয়েছে নিশ্চয়ই, বেশ দুর্বল লাগছে শরীরটা।

এখন ভেবেচিন্তে একটা কিছু করতে হবে। সিদ্ধার্থ ছাড়াও আরও বন্ধু আছে এখানে প্রতুলের। তার সহপাঠী সুকুমার এখানকার কলেজে পড়ায়। নিশ্চয়ই তার চেনা কোনও ডাক্তার আছে। সুকুমারকে গোপনীয়তার শপথ নেওয়াতে হবে আগে। তার চেনা ডাক্তারকে দিয়ে পরীক্ষা করাবে। সাময়িক ওষুধ। খুব গুরুতর কিছু না হলে কারুকে জানাবার দরকার নেই। এখন যদি কিছু হয়ও, সবাই কি বলবে না যে সে ওদের আনন্দে বাধা সৃষ্টি না করার জন্য সবরকম চেষ্টা করেছিল। এখানে সিদ্ধার্থ আছে, তাঁর তাঁবে আর কোনও চিন্তা নেই।

এখন একটা রিকশা নিয়ে সুকুমারের বাড়ি খুঁজে যাওয়া। কিন্তু সুকুমারকে ডেকে পাঠালে হয় না? মফঃস্বলের রাস্তায় রিকশার ঝাঁকুনি...সেটা এড়াতে পারলেই ভালো।

সিদ্ধার্থের একটি খুব বিশ্বাসী লোক আছে। প্রতুল আগেও তো এসেছে, সে জানে। সেই লোকটিও কি গঙ্গায় গেছে?

বসবার ঘর থেকে বাড়ির ভেতর দিয়ে চলে এল প্রতুল। উঠোনের বদলে চমৎকার একটি সবুজ লন। তার এক প্রান্তে একটি ছোট ঘর, সেখানে সেই বিশ্বাসী লোকটি থাকে। দশটি টাকা বকশিশ দিলে সে আরও বিশ্বাসী হবে। সে গোপনে সুকুমারের কাছে তার চিঠি নিয়ে যাবে।

সারা বাড়ি এত অন্ধকার কেন, লোডশেডিং? কোথাও আলো নেই। বাগানের প্রান্তে ঘরটিও অন্ধকার। তবু সে দিকে কয়েক পা বাড়াতেই আবার সাঁ করে উঠে এল সেই ব্যথাটা, নিশ্বাস যন্ত্রে যেন একটা মোটা ছাঁকনি বসে গেল।

অমনি তার সামনে ঝলকে উঠল একটা চকচকে খড়্গ। একটি গভীর কণ্ঠস্বর তাকে বলল, এবার? এখন তুমি প্রস্তুত? এখন তো তুমি বিরলে, নিরালায়...

কাঁপতে-কাঁপতে মাটিতে বসে পড়ল প্রতুল। পরাজিত সৈনিকের আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে হাঁটু গেড়ে। তার সারা শরীর কাঁপছে।

এখন? এখানে? কেউ জানতে পারবে না? ওরা সবাই গঙ্গায়, নৌকোর ওপরে, গান গাইছে, জলের ছলচ্ছল শব্দ...শেষবারের মতন সে রানীকে দেখতে পাবে না, ছেলেমেয়েদের না, টিংকুকে না, বন্ধুবান্ধবদের না, রেল লাইনের ধারে পলায়নপর স্মাগলারের গুলি খাওয়া দেহের মতন সে পড়ে থাকবে এই উঠোনে?

সে ভয়ংকর কাতরভাবে বলতে লাগল, না, না, বাঁচিয়ে দাও, এবারকার মতন অন্তত, প্লিজ, সিগারেট ছেড়ে দেব, প্লিজ, হে মৃত্যু, আমি তোমার পায়ে ধরছি, আমি তোমার সামনে নাকে খত দিতে পারি, তোমার নোংরা পা ধোওয়া জল খেতে পারি, বাঁচিয়ে দাও, বাঁচিয়ে দাও, অন্তত এবারকার মতন...

এখানে তার কাপুরুষতার কোনও সাক্ষী নেই বলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতেও শুরু করল প্রতুল। কম্পিত গলায় বলতে লাগল, আর একবার সুযোগ দাও, অন্তত আর একবার...।



অপ্রেম পত্র

পার্টি জমে উঠেছে দুপুরবেলাতেই। ছোট অ্যাপার্টমেন্টে প্রায় বারো চোদ্দোজন মানুষ, রান্নাঘরের ভার নিয়েছে পুরুষরাই। বিদেশে এসে সব পুরুষই বেশ রান্না শিখে যায়। মন্টু দারুণ বিরিয়ানি রান্না করে। বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে যে-কোনও বাড়িতে খাওয়া দাওয়ার ব্যাপার হলেই মন্টুর ডাক পড়ে। এমনই রান্নার নেশা মন্টুর যে সে সময় সে তার স্ত্রী নীলাকে রান্নাঘরে ঢুকতেই দেয় না। আজিজ, নিপুরা মাছ কুটছে, তরকারি কাটছে, প্রত্যেকেরই হাতে বিয়ারের টিন কিংবা সিগারেট। মেয়েরা সেজেগুজে বসবার ঘরে বসে প্রাণখুলে শাড়ি, গয়না, কে নতুন গাড়ি কিনল, কে ছুটিতে দেশে যাবে, এই আলোচনা চালাচ্ছে। আজ রান্নায় হাত লাগাতে হবে না বলে তারা খুশি।

এই পার্টির মধ্যমণি একটি ছ'মাসের শিশু, সে শুয়ে আছে একটা লাল মখমল বিছানো দোলনায়। খুব সুন্দর করে সাজানো হয়েছে তাকে, মাথায় একটা পালকের মুকুট, কেউ আদর করতে এলেই সে ফোকলা দাঁতে খটখট করে হাসছে। ভালো নাম এখনও রাখা হয়নি, ওর ডাকনাম বাবু।

মালা আর ফিরোজ কারুকে উপহার আনতে বারণ করেছিল, আজ তাদের ছেলের জন্মদিন নয়, কোনও উপলক্ষই নেই, এমনি ছুটির দিনে হইচই। মালা সদ্য তার বাচ্চাকে নিয়ে ঢাকা এসেছে, বন্ধুবান্ধবরা এই প্রথম ফিরোজের সন্তানের মুখে দেখবে, উপহার আনবে না? অনেক রকম বেলুন আর খেলনায় ঘরের একটা কোণ ভরে আছে। ফিরোজ একটা বার কাউন্টার খুলে ফেলেছে

কারুকে বিয়ার, কারুকে ভদকা দিচ্ছে গেলাসে-গেলাসে। মেয়েরা এসব খেতে চায় না, ফিরোজ খুব চেষ্টা করছে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ফারুখের স্ত্রী পাখিকে ওয়াইন খাওয়াতে। মুখের সামনে গেলাস নিয়ে বললে, অন্তত একটা চুমুক দাও, আমি তোমাকে আগে ওয়াইন খেতে দেখেছি প্রফেসার লোথারের বাসায়।

এইসময় টেলিফোন বেজে উঠল।

ফারুখ দাঁড়িয়ে আছে টেলিফোনের কাছে। সে তুলে বলল, হ্যালো, গুটেন মরগান—

কথা বলতে বলতে ফারুখের ভুরু কুঁচকে গেল। ও পাশের কথা শোনা যাচ্ছে না, সবাই একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

ফারুখ মাউথ পিস চাপা দিয়ে ফিসফিস করে বলল, রোজা—

কয়েক মুহূর্তের জন্য অস্বস্তিকর নীরবতা।

বাচ্চার দোলনার কাছ থেকে মালা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, কী চায় সে?

ফারুখ বলল, ফিরোজের সঙ্গে কথা বলতে চায়।

স্ত্রীর অনুমতির অপেক্ষা না করেই ফিরোজ এগিয়ে গিয়ে ফোনটা ধরল। প্রথমে একটুক্ষণ জার্মান ভাষায় কথা বলে তারপর শুরু করল বাংলায়।—হ্যাঁ, আসতে পারো, অবশ্যই, এখনই চলে এসো, তোমার স্বামী সঙ্গে আছে, তাকেও নিয়ে এসো, কোনও অসুবিধা নেই, হি ইজ মোস্ট ওয়েলকাম—আমার এই নতুন বাসার ডিরেকশান বলে দিচ্ছি, হপবানহপে নামবা, সেখান থিকা কাইজার স্ট্রাসের কর্নারে এগারো নম্বর ট্রাম—ও গাড়িতে আসবে? তা হলে—

ফোন রেখে দিয়ে ফিরোজ বলল, রোজা আর তার হাজব্যান্ড আমাদের ছেলেকে দেখতে আসছে। আমাদের অফিসে কাজ করে লুডউইগ, তার কাছ থেকে শুনেছে।

মালা বলল, তুমি তাকে আসতে বললে? কেন আসবে?

ফিরোজ মালার কাঁধ ছুঁয়ে বলল, ওটা এ দেশের ভদ্রতা। উতলা হোয়ো না। আমরাও ভদ্রতা করব। দেখো, ওরা বেশিক্ষণ থাকবে না।

মালা তবু ভুরু কুঁচকে রইল। বাচ্চার দিকে মুখ ঝুঁকিয়ে বলল, নজর দিতে আসছে।

ফিরোজ হো-হো করে হেসে উঠল।

বারান্দার কাছে দাঁড়িয়ে আছে আহবাব আর ডালিম। ডালিম সদ্য এসেছে দেশ থেকে, সে ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরটাই এখনও ভালো চেনে না। সে ফিসফিস করে জিগ্যেস করল, ওই রোজা কে?

আহবাব বলল, রোজা আগে ফিরোজের স্ত্রী আছিল। আট বছর পর ডিভোর্স হইয়া গেছে। মালার সঙ্গে ফিরোজের বিয়ে হয়েছে মাত্তর দুই বচ্ছর আগে।

ডালিমও অবাক হয়ে বলল, আগের বউ? সে আসতে চায় কেন? তার এখনকার স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে আসবে?

আহবাব বলল, এ দেশে এটা কিছু অস্বাভাবিক নয়। রোজার সঙ্গে তো ফিরোজের ঝগড়া-মারামারি হয় নাই। মিউচুয়াল ডিভোর্স। তারপরেও সামাজিক সম্পর্ক রাখতে তো অসুবিধা নাই

আবার আড্ডা শুরু হলেও ঠিক জমল না। এদের মধ্যে অনেকেই রোজাকে চেনে। চার-পাঁচ বছর আগে এই ফিরোজের বাড়িতেই কোনও পার্টি হলে রোজা হইচই করে জমিয়ে রাখত। দারুণ প্রাণবন্ত মেয়ে রোজা। তার সঙ্গে ফিরোজের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়ায় বন্ধুরা অনেকেই দুঃখিত হয়েছিল। জার্মান মেয়েরা এমনিতেই বউ হিসেবে খুব ভালো হয়, তাদের মধ্যে রোজা আরও বেশি ভালো। তবু ঠিক কী কারণে দুজন নারী-পুরুষের বিচ্ছেদ হয়ে যায়, তা অন্যদের পক্ষে বোঝা সম্ভব

পাখি একবার অন্য কথার মধ্যে বলে উঠল, রোজা আসতে চায় আসুক, সে আবার স্বামীটাকে

নিয়ে আসছে কেন? ওর স্বামী তো জার্মান, তার সামনে বাংলায় কথা বলা যাবে না।

আট বছরের বিবাহিত জীবনে রোজা বেশ ভালো বাংলা শিখে নিয়েছিল। উচ্চারণে গণ্ডগোল থাকলেও সাবলীলভাবে কথা বলে যেত বাংলায়। রোজার সেই বাংলা জ্ঞান আর কোনও কাজে লাগবে না।

একটু বাদে বেল বাজতেই সবাই সচকিত হয়ে উঠল। এরমধ্যেই চলে এল? দরজা খোলার পর দেখা গেল অন্য অতিথি, অনিল আর বাদল। ওরা কলকাতা থেকে বুক ফেয়ারে যোগ দিতে এসেছে। এখানে ফারুখের আমন্ত্রিত।

দু-জনের হাতে তুলে দেওয়া হল ভদকার গেলাস। বাদল বলল, চমৎকার বিরিয়ানি রান্নার গন্ধ বেরিয়েছে।

পাশের ঘর থেকে মন্টু চেঁচিয়ে বলল, আর বিশ মিনিটের মধ্যে সব রেডি হয়ে যাবে। তারপর লাঞ্চ সার্ভ করা হবে।

অনিলকে দেখে মালা কিছুক্ষণের জন্য রোজার কথা ভুলে গেল। ঢাকায় থাকতে এই লেখকের অনেক বই সে পড়েছে, এর কবিতা আবৃত্তি করেছে, সেই লেখক জলজ্যান্তভাবে তার ঘরে উপস্থিত! দেখলে মনে হয় সাধারণ একটা মানুষ, লেখক বলে বোঝাই যায় না।

রোজা আর স্বামী এসে উপস্থিত হল আরও পনেরো মিনিট পরে।

সাধারণ মেয়েদের তুলনায় রোজা বেশ লম্বা, তার শরীরের গড়ন, মুখশ্রী ভারি আকর্ষণীয়। একটা হলুদ স্কার্ট পরে আছে। তার তুলনায় তার স্বামীটি একটু বেঁটেই হবে, তবে মুখে বেশ বুদ্ধির ছাপ আছে, ওষ্ঠে হাসি মাখানো। ফিরোজ বেশ লম্বা-চওড়া, তার পাশে রোজাকে ভালো মানাত। মালা ছোট্টখাট্ট সুন্দরী বাঙালি মেয়ে।

রোজা পরিচয় করিয়ে দিল, তার স্বামীর নাম ক্লাউস। ক'দিন ধরে ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরে খুব গরম পড়েছে, তবু ক্লাউস পুরোদস্তুর স্যুট পরে এসেছে। এতগুলি অচেনা বিদেশির মধ্যে তার কোনও ভূমিকা নেই সে জানে, তাই মুখখানা হাসি-হাসি করে রেখেছে।

ঘরের মধ্যে উপস্থিত যারা আগে থেকে রোজাকে চিনত, তারা এখনকার রোজার মধ্যে উচ্ছলতার কোনও চিহ্ন খুঁজে পেল না। শান্ত, সংযত ভঙ্গি। মাথা ঝুঁকিয়ে অভিনন্দন জানাল মালাকে, তারপর একটি ছোট্ট রূপোর বাক্স তুলে দিল তার হাতে। তারমধ্যে রয়েছে ক্ষুদে-ক্ষুদে দুটি রূপোর চামচ।

বাচ্চাটির দিকে তাকিয়ে বলল, কী সুন্দর! টানা টানা চোখ, টিকালো নাক, মায়ের সঙ্গে খুব মিল। দেখো দেখো ক্লাউস।

ক্লাউস কাছে এসে নিখুঁত ভদ্রতার সঙ্গে বলল, ভেরি হ্যান্ডসাম!

ফিরোজের সঙ্গে কথা বলছে না রোজা, মালাকেই জিগ্যেস করল, ওর কী নাম রাখা হয়েছে?

মালা আড়ষ্টভাবে বলল, এখনও ভালো নাম দেওয়া হয়নি, বাবু বাবু বলে ডাকি।

রোজা বলল, বাবু, বাবুও খুব সুন্দর নাম। আমি কি একবার ওকে কোলে নিতে পারি?

স্পষ্ট আপত্তি আছে মালার, তবু ঘাড় নাড়ল।

দোলনা থেকে বাবুকে কোলে তুলে নিল রোজা, তারপর ঘুরে তাকালো ফিরোজের দিকে।

ফিরোজের সন্তান তার গর্ভেও আসতে পারত, এ বাড়িতে রোজা নিজের সন্তানকে বুকে নিয়ে এরকম একটা পার্টির মধ্যে ঘুরে বেড়াতে পারত। কিন্তু আট বছরের বিবাহিত জীবনে তার কোনও বাচ্চা হয়নি।

ফিরোজ এবং রোজা যেন কয়েক পলক বেশি সোজাসুজি তাকিয়ে রইল পরস্পরের দিকে। সেই দৃষ্টির ভাষা অন্য কেউ বুঝবে না।

সবাই নিঃশব্দ হয়ে রোজাকে দেখছে। এখন রোজাই কেন্দ্রবিন্দু।

বাচ্চাটাকে নামিয়ে রাখতে-রাখতে মালাকে রোজা বলল, তুমি খুব ভাগ্যবতী।

রান্নাঘর থেকে অ্যাপ্রন পরা মন্টু এসে বলল, এই রোজা, আমি বিরিয়ানি রান্না করছি, খেয়ে যেতে হবে কিন্তু!

রোজা স্বামীর দিকে ফিরে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, আবিদ হোসেন মন্টু, ফিরোজের চাচাতো ভাই, খুব ভালো রান্না করে।

তারপর মন্টুকে বলল, আমরা লাঞ্চ খেয়ে এসেছি। এখন তো আর কিছু খেতে পারব না!

ফিরোজ এবার ভদ্রতা করে ক্লাউসকে বলল, না না আপনাদের খেয়ে যেতেই হবে। প্লিজ বসুন! একটা ড্রিংক দেব। বিয়ার?

ক্লাউস জানাল, সে কোনওরকম মদ্যপান করে না!

বাঙালিরা হঠাৎ কারুর বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলে গৃহস্বামিনীর অনুরোধে খেতে বসে যায়। জার্মানরা সেরকম খাবে না। তা ছাড়া, এদের সঙ্গে তাদের সেরকম সম্পর্ক নয়।

ক্লাউস আর রোজা কিছুতেই খেতে রাজি নয়। মালা বলল, অন্তত একটা মিষ্টি খেয়ে যান!

রোজা বলল, ঠিক আছে, একটা মিষ্টি আর এক গেলাস পানি!

এবার ওরা বিদায় নেবে, সব মিলিয়ে দশ বারো মিনিট। ফিরোজ এদের পৌঁছে দিল সিঁড়ি পর্যন্ত। নামবার আগে রোজা বলল, ঘরে বাচ্চাটা রয়েছে, সবাই সিগারেট খাচ্ছে। বন্ধুদের পাশের ঘরে গিয়েই সিগারেট খেতে বলো!

আবার শুরু হয়ে গেল গুঞ্জন।

বারান্দার ধারে দাঁড়ানো ডালিম আর আহবাবের পাশে এসেছে অনিল আর বাদল।

বাদল বলল, জার্মান ছেলে অথচ বিয়ার খায় না। এ যে দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ।

অনিল বলল, হয়তো খায়, এখানে খেতে চাইল না।

ডালিম ফিসফিস করে জিগ্যেস করল, মেয়েটিকে তো বেশ ভালোই মনে হল। ডিভোর্স হল কেন?

আহবাব বলল, মেয়েটা বোধহয় বাঁজা। ফিরোজের খুব ছেলেমেয়ের শখ। বারান্দা দিয়ে দেখা গেল রাস্তায় নেমে গেছে রোজা আর ক্লাউস। ক্লাউস চাবি দিয়ে গাড়ি খুলছে, এপাশে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল রোজা। ব্যাগ থেকে রুমাল বার করে চোখ মুছল, তারপর দুটি কাগজ বার করল।

দু-খানা মেডিক্যাল রিপোর্ট। রোজা আর ফিরোজ দু-জায়গায় পরীক্ষা করিয়েছিল। দু-জায়গা থেকেই রিপোর্ট দিয়েছে, ফিরোজের সন্তানের জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা নেই। তবু ফিরোজ দ্বিতীয়বার বিয়ে করে সন্তানের গর্বিত পিতা হয়েছে। অলৌকিক ব্যাপার আজও ঘটে।

কাগজ দুটো টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল রোজা।

ক্লাউস জিগ্যেস করল, ও কী করছ? কী ছিঁড়ছ?

রোজা বলল, ফিরোজকে ফিরিয়ে দেব ভেবেছিলাম। তারপর মনে হল, ওর আর দরকার নেই।

ক্লাউস মুচকি হেসে বলল, প্রেমপত্র নাকি?

রোজা হাহাকারের সুরে বলল, হ্যাঁ!

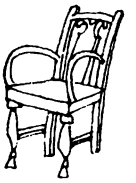

চেতন মিস্তিরির গল্প

চেতন মিস্তিরির বাড়ি ছিল সিউরির অদূরে লাখেরাজপুর গ্রামে। মাটির দেওয়াল ঘেরা বাড়ি, ভেতরে দু খানি ঘর ও একটি রান্নাঘর। একটা গোয়ালঘরও ছিল এক কালে, একবার ঝড়ে তার চালা উড়ে যায়, নতুন করে আর ছাউনি দেওয়া হয়নি, কারণ গোয়ালে আর গরু নেই।

চেতন মিস্তিরির বুড়ি মা এখনও বেঁচে আছে, চোখে দেখতে পায় না। কানে শুনতে পায় না। সংসারে একটা বোঝা ছাড়া সে আর কিছুই না। চেতনেরই বয়েস হল ষাটের কাছাকাছি। চেতনের বউ মারা গেছে অনেককাল আগে। চেতনের ছেলে মাত্র একটি। চেতনও ছিল তার বাবার একটি ছেলে।

চেতন মিস্তিরির কাঠের কাজের জন্য এককালে বেশ নামডাক ছিল। শুধু দরজা-জানলা বানানোই না, শৌখিন খাট আলমারি বানাতেও তার দক্ষতা ছিল খুব। কিন্তু গত দু-বছর ধরে তার হাতে পায়ে বাত র‍্যাঁদা চালাতে-চালাতে হঠাৎ হাতে খিঁচ ধরে যায়, তখন যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকে।

যন্ত্রপাতি সামনে নিয়ে বাড়ির সামনের মাটির দাওয়ায় বসে থাকে চেতন মিস্তিরি। সে নিজে আর কোথাও কাজ খুঁজতে যায় না, বড় অভিমানী মানুষ সে, কোথাও কাজ চাইতে গিয়ে যদি প্রত্যাখ্যাত হয় তার বুকে লাগবে। প্রতীক্ষা করে থাকে যদি নিজে থেকে কেউ এসে ডাকে। একসময় এরকম আসত, অনেক সাধ্য-সাধনাও করত। এখন আর প্রায় কেউই আসে না, দৈবাৎ কেউ হয়তো ভাঙা জানলা সারাতে বা কাটারির হাতল বানাতে ডাকে—এসব কুঁচোকাচা কাজে আর মন ওঠে না। এই সময়েই কিনা মনে হয়, দুনিয়াটা বড় সুন্দর জায়গা। মাঠের ওধারে শ্রেণিবদ্ধ তালগাছগুলোর দিকে তাকিয়ে মনে হয়, এমন জীবন্ত কাঠের কাজ কে গড়েছে!

যন্ত্রপাতি রেখে চেতন মিস্তিরি গুটিগুটি হাঁটতে শুরু করে। হরঠাকুরের কাছে অনেক দিনের ক'টা টাকা পাওনা আছে, টাকাগুলো পেলে সে একবার কালীঘাটে তীর্থ করে আসবে। সংসারের অভাব তো কোনওদিন মেটাবার নয়।

রেল লাইনের ধারে অনেকগুলি কামিন কাজ করছিল, হঠাৎ তারা হইহই করে উঠল। কে একজন রেলে কাটা পড়েছে। এসময় তো ট্রেন আসার কথা নয়, উটকো একটা ইঞ্জিন এসে পড়েছিল। কাছে গিয়ে দেখা গেল, কুলিদের কেউ নয়, বুড়ো মতন একজন লোক।

কুলিদের মধ্যে ছিল চেতন মিস্তিরির ছেলে বংশী, সে ছুটতে-ছুটতে এসে উঁকি দিয়েই চিৎকার করে উঠল। তার বাবাকে সে দেখছে, রক্তাক্ত, ছিন্নভিন্ন। সবাই ধরাধরি করে হাসপাতালে নিয়ে যেতে চায়।

চেতন মিস্তিরির তখনও একটু-একটু জ্ঞান ছিল। সে বলল, আমাকে বাড়িতে নিয়ে চলো, ও বংশী আমাকে নিয়ে চল।

সবাই ওকে বাড়িতেই নিয়ে গেল। বংশীর চেহারা অসুরের মতন, কিন্তু তার শরীরে এখন একটুও শক্তি নেই। সে তার বাবাকে ধরতে পারল না। চেতন মিস্তিরির ডান হাতটা লগবগ করে ঝুলছে। ওই হাতে সে একসময় কত কারুকার্য বানাত!

বাড়ির সদর দরজায় পৌঁছনো মাত্র মারা গেল চেতন মিস্তিরি। তারপর কান্নাকাটি। চেতনের

মা কানে শোনে না, চোখে দেখে না। সে শুধু অনেক লোকজনের উপস্থিতি টের পেয়ে বলল, ও চেতন, কী হয়েছে রে! এত লোকজন কেন? ও চেতন!

কেউ কিছু তাকে বোঝাতে পারল না। বুড়ি জানল না তার ছেলে মারা গেছে।

দু-চারদিন পর সবাই ভুলে গেল চেতন মিস্তিরির কথা। বংশীর বউ লক্ষ্মীর একটিমাত্র ছেলে, সে ছেলে-শাশুড়িকে নিয়ে ঘর সংসার করে আর বংশী গেল চালকলে কাজ করতে। রেল লাইনের কন্ট্রাক্টররা তাকে ছাঁটাই করে দিয়েছে।

কিন্তু চেতন মিস্তিরির বংশে যেন একটা অভিশাপ লেগেছে। কথা নেই বার্তা নেই বংশীর তিন বছরের ছেলেটা ক'দিন আগে কলেরায় মারা গেল। বংশী থাকে অনেক দূরে, সপ্তাহে একবার বাড়ি আসে, মহা বিপদে পড়ে গেল বউটি, হাপুস নয়নে কাঁদতে লাগল। প্রতিবেশীরা এল সহানুভূতি জানাতে, একজন গেল বংশীকে খবর দিতে।

সেদিনও চেতনের বুড়ি মা চেঁচাতে লাগল, ও চেতন, কী হয়েছে রে! ও চেতন, বাড়িতে এত লোক কেন, নেমন্তন্ন খাওয়াচ্ছিস নাকি? চেতনের মা জানল না, তার পুতি মারা গেছে।

বংশী এসে একেবারে উঠোনে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে লাগল। বাবার মৃত্যুতে সে কাঁদেনি, ছেলের মৃত্যুতে সে না কেঁদে পারে না। ক'দিন বাড়িতে বসে-বসে গুমরে মরল স্বামী-স্ত্রী। কিন্তু অন্ন সংস্থান করতে হবে তো, বংশী আবার চলে গেল চালকলে কাজ করতে।

চালকলের চাল শহর-বাজারে চলে যায়, যারা ওখানে কাজ করে তাদের কোনওদিন পেট ভরে না। বংশীর চেহারা অসুরের মতন। এক কিলো চালের ভাত একা পেলে তার ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়। কিন্তু অতখানি সে পাচ্ছে কোথায়? সেইজন্য সব সময়েই তার পেটে খিদে থাকে আর তাই রাগ থেকে যায়। বংশী লোকজনের সঙ্গে দাঁত মুখ খিচিয়ে কথা বলে। লোকে তাকে বলে পাগল বংশী।

কী একটা তুচ্ছ কারণে একদিন চালকলে ধর্মঘট হয়ে গেল। তারপরই লক আউট। সবারই চাকরি যাওয়ার অবস্থা। আধপেটা খাওয়া জুটবে না দেখে অসম্ভব রেগে গেল বংশী। সে লোকজন ডেকে হাঙ্গামা বাড়াবার চেষ্টা করল। মস্ত বড় একটা লোহার রড নিয়ে বংশী দমাদম মারতে লাগল চালকলের গেটের তালায়। সে তালা ভেঙে ভেতরে ঢুকবে। কিন্তু দেশে কি আইন-শৃঙ্খলা নেই নাকি' অবিলম্বে এসে গেল পুলিশ। দারোগা চোখ রাঙিয়ে বলল, এই হঠো, হঠো...

ভয়ঙ্কর চেহারা নিয়ে বংশী বলল, না, যাব না। ওরে তোরা সবাই আয় রে...

একটা বিরাট শোক মিছিল এসে থামল চেতন মিস্তিরির বাড়ির সামনে। খাটিয়ায় চাপানো গুলিতে ঝাঁঝরা বংশীর দেহটা, তারা বয়ে এনেছে তার স্ত্রীকে দেখাতে। দেখবে কে? খবর শুনেই তো লক্ষ্মী অজ্ঞান। আর বংশীর ঠাকুমা বলতে লাগল, ও চেতন, এত লোকজন কেন, ও চেতন, এদিকে শুনে যা...

মিছিলটা আবার বংশীর দেহটা নিয়ে চলে গেল। এবং দু-দিন বাদেই সেই সব লোক ভুলে গেল বংশীকে। বংশীর বিধবা কী খেয়ে বাঁচবে, সে কথা আর কে মনে রাখে!

বংশীর বউ লক্ষ্মী দু-একমাস ঘটিবাটি বিক্রি করে চালাল। তারপর গেল লোকের বাড়িতে কাজ করতে। স্বাস্থ্যটি তার ভালো। খাটতে পারে আর মুখ বুজে কাজ করে। বাড়িতে একটা কালা, কানা, বুড়ি আছে, সে বাচ্চা পাখির মতে হাঁ করে বসে থাকে। তাকে খাবার যোগাতে হয়।

কিন্তু গরিব ঘরের যুবতী বিধবার স্বাস্থ্যটি থাকা উচিত নয়, তাতে বিপদ আসে। এলও একদিন। অন্য বাড়ির কাজ সেরে একটু রাত করে বাড়ি ফিরছিল লক্ষ্মী। কোঁচড়ে খানিকটা চাল আর ঝিঙে। বাবুদের বাড়ির দান। খালপাড়ে তিনজন লোক তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। শব্দ করারও সময় ছিল না, মুখ বেঁধে নিয়ে গেল তাকে। কোনওদিন আর লক্ষ্মীর কোনও খোঁজ পাওয়া গেল না। পাঞ্জাবে কিংবা আরবে এই সব মেয়ে চড়া দামে বিক্রি হয়। বিশেষত যাদের সম্পর্কে খোঁজখবর কেউ রাখে না।

চেতনের বুড়ি মা শুধু খিদের জ্বালায় চেঁচায়, ও চেতন, সব গেল কোথায়! দুটি খেতে দিবি না আমায়! ও নাতবউ!

সব জানাজানি হওয়ার পর, পাশের বাড়ির একটি মেয়ে দয়াপরবশ হয়ে খানিকটা ভাত এনে বলল, ও দিদি, নাও। খাইয়ে দিতে হবে, না নিজেই পারবে?

মেয়েটির সত্যিই খুব দয়া। প্রত্যেক দিনই সে বুড়ির জন্য একবেলা খাবার দিয়ে যায়। মাঝে-মাঝে খোঁজখবর নিতেও আসে। একদিন সকালে দেখল, বুড়ি উঠোনের মাঝখানে পড়ে আছে, মুখের ওপর উড়ছে কয়েকটা মাছি।

চেতন মিস্তিরির বংশ নাশ হয়ে গেল। ও বাড়িতে আর জনপ্রাণী রইল না। বাড়িটাকে কেউ জবরদখল করে নিল না বটে, তবে চোর-ছ্যাঁচড়ারা এসে দরজা-জানলাগুলো অবধি খুলে নিয়ে যায়। দুপুরবেলায় বাড়িটা খাঁ-খাঁ করে।

অনেকদিন বাদে দূর গাঁয়ের একজন লোক এল চেতনকে খুঁজতে। এ-লোকটা কোনও খবরই জানে না। সরাসরি চেতন মিস্তিরির বাড়িতে চলে গেল। সদরে পা দিয়ে ডাকল, ও চেতন, আছ নাকি! কোনও সাড়া না পেয়ে লোকটা ঢুকে এল উঠোনে। লোকটা ভালো মানুষ গোছের। তখনও কিছু বুঝতে পারেনি, গলা চড়িয়ে ডাকল, চেতন! ও চেতন! বংশী!

কোনও সাড়া নেই।

লোকটি বিড়বিড় করে বলল, কী আশ্চর্য! এরা কেউ নেই নাকি!

চতুর্দিক নির্জন। মাঠে প্রান্তরে শুরু করছে হাওয়া। বাড়িটার কোনও একটা ভাঙা পাল্লা বুঝি নড়ে উঠল হাওয়ায়। লোকটি কান পাতল। তার মনে হল, সেই শব্দ যেন শোনা যাচ্ছে। আছে, আছে।

লোকটি আবার ডাকল, চেতন.

আবার সেই পাল্লার শব্দ। এবার স্পষ্টই মনে হয় কিছুই হারায়নি। সবই আছে, আছে, আছে।

উন্মোচনের মুহূর্তে

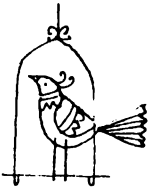

কাল ইন্দ্রজিৎ নতুন কলেজে ভরতি হবে, থাকতে হবে কলকাতার বাইরে। আজ থেকেই তার শরীরে একটা অদ্ভুত উত্তেজনা। সে সর্বক্ষণ ছটফট করছে, খালি মনে হচ্ছে, কিছু যেন ভুল হয়ে গেছে।

তার বাক্স গুছোনো হয়ে গেছে এরই মধ্যে। দু-জোড়া নতুন শার্ট-প্যান্ট তৈরি করতে দেওয়া হয়েছিল, দর্জির কাছ থেকে ঠিক সময়ে পাওয়া গেছে পোস্ট অফিস থেকে নিজের জমানো সামান্য কিছু টাকাও তুলে এনেছে সে। দরকারি কাগজপত্র সব রেডি। তবু ইন্দ্রজিতের মনে হচ্ছে, শেষ মুহূর্তে বোধহয় একটা টেলিগ্রাম আসবে তোমাকে যেতে হবে না!

ইন্দ্রজিতের ছটফটানি দেখে তার দাদা বলল ইস, তুই এমন করছিস যেন মনে হচ্ছে বিলেত যাচ্ছিস! এই তো এইখান থেকে...ট্রেনে মাত্র তিন ঘণ্টার রাস্তা...

ইন্দ্রজিৎ বলল, সে জন্য না কি! হোস্টেলে থাকার জায়গা আছে কি না সে সম্পর্কে এখনও কোনও চিঠি দেয়নি...

দূর বোকা ছেলে! এর আবার আলাদা চিঠি দেওয়ার কী আছে? রেসিডেন্সিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ...এখানে সবাই তো হস্টেলে থাকে।

ইন্দ্রজিতের দাদা আর্টসের ছাত্র, কিন্তু ভাব দেখাচ্ছে এমন, যেন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ সম্পর্কে ও সব কিছু জানে।

বিকেলে ইন্দ্রজিতের বন্ধুরা কয়েকজন দেখা করতে এসেছে। এদের মধ্যে দুজন ভরতি হওয়ার সুযোগ পেয়েছে শিবপুরে আর যাদবপুরে, তিনজন ডাক্তারিতে ঢুকেছে, আর কোথাও সুযোগ পায়নি এবার। তারা বাধ্য হয়ে এমএসসি পড়বে। তাই মুখ বিরস। অলক ভরতি হয়েছে শিবপুরে, সে ইন্দ্রজিৎকে, বলল, তুই শিবপুরে চান্স নিলি না কেন? শুধু-শুধু অতদূরে যাচ্ছিস!

ইন্দ্রজিৎ বলল, আমি দূরেই যেতে চেয়েছি ইচ্ছে করে।

কেন রে?

ইন্দ্রজিৎ দেখল, তার বোন রূপা বসবার ঘরের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল রাস্তায়। সেই জন্য ইন্দ্রজিৎ একটু থেমে গিলে সময় নিল। তারপর গলা নামিয়ে বলল, আমার বহুকালের শখ স্বাধীনভাবে হোস্টেলে থাকা।

যাচ্ছেতাই খাবার দেয়।

দিক গে! তবু তো সবসময় সেখানে বাবা দাদার শাসন নেই। নিজে ঘরে ইচ্ছে মতন থাকব, যখন যা খুশি বই পড়ব...

তোদের হোস্টেলে তো গেস্ট হাউস আছে। আমরা মাঝে-মাঝে বেড়াতে যাব, বুঝলি?

ঠিক আসবি তো?

বন্ধুদের সবার ইচ্ছে সেদিন সন্ধেবেলা একটা সিনেমা দেখার। ইন্দ্রজিৎকেই দেখাতে হবে।

ইন্দ্রজিৎ বলল, আজ বেরুনো অসম্ভব রে! আমার বড়মামার বাড়িতে নেমন্তন্ন। একবার যেতেই হবে।

একটু বেশি রাত করে যাবি!

ইমপসিবল! মাকে নিয়ে যেতে হবে, অনেক ঝামেলা আছে। আমি তো আড়াই মাস বাদেই পুজোর ছুটিতে আবার আসছি। তখন সিনেমা দেখাব, কথা দিলাম...

আড়াই মাস বাদে? এর মাঝখানে আসবি না? উইক-এন্ডেই চলে আসতে পারিস!

দেখি!

বন্ধুদের রাস্তার মোড় পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ইন্দ্রজিৎ আবার ফিরে এলো বাড়িতে। বারবার হাতের ঘড়ি দেখছে।

ইন্দ্রজিতের ঘড়ি ছিল না। তার দাদা উদারতা দেখিয়ে নিজের ঘড়িটা আজ সকালেই দিয়ে দিয়েছে ইন্দ্রজিৎকে। দাদার বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছে। তখন তো একটা ঘড়ি পাবেই। হাতে নতুন ঘড়ি পরলে বারবার সময় দেখতে ইচ্ছে করে। বাড়ি ফিরে আসার পর মা বললেন, এখন আর কোথাও বেরুসনি যেন। তোর বড়মামার বাড়িতে আজ নেমন্তন্ন, মনে আছে তো?

ইন্দ্রজিৎ বলল, আমার না গেলে হয় না?

মা বললেন, দূর পাগল! তোর জন্যেই তো বিশেষ করে...

কিন্তু আমাকে যে একজায়গায় যেতেই হবে একবার?

কোথায়?

দিব্যর ভীষণ অসুখ। ওর সঙ্গে একবার দেখা না করে গেলে খুব খারাপ দেখাবে। সেই ছোটবেলা থেকে ওর সঙ্গে পড়েছি।

ঠিক আছে, এখন তার সঙ্গে চট করে দেখা করে আয়। তারপর যাবি।

ওরা টালিগঞ্জে থাকে যাতায়াতেই অনেকটা সময় লেগে যাবে। আমি ওখান থেকে

সোজা বড়মামার বাড়িতে যাব। তুমি দাদার সঙ্গে চলে যেও।

ইন্দ্রজিৎ ওপরে নিজের ঘরে গেল জামাকাপড় বদলাতে। ঘরটা কীরকম খালি খালি দেখাচ্ছে। তার নিজস্ব অনেক জিনিসপত্রই সে দিয়ে দিয়েছে তার ছোটভাই রুনু আর বোন রূপাকে। যেন সে চিরকালের মতন চলে যাচ্ছে এখান থেকে। সেই রকমই অনেকটা মনে হয়। ইন্দ্রজিৎ তো এর আগে কখন বাড়ির বাইরে থাকেনি।

সাদা প্যান্ট আর সাটা শার্ট পরল ইন্দ্রজিৎ। তার অনেক রঙিন জামা আছে, তবু এক-একদিন সাদা পরতেই তার ভালো লাগে। জুতো জোড়া সকালেই পালিশ করেছে, তবু আর একবার বুরুশ বুলিয়ে নিল। তার জল তেষ্টা পেয়েছিল, চুল আঁচড়াতে-আঁচড়াতে সে অভ্যেসবশত চেঁচিয়ে বলতে যাচ্ছিল, মা, একগ্লাস জল দিয়ে যাও তো! কিন্তু, বলল না। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল, হোস্টেলে গিয়ে তো নিজের সব কাজ নিজেকেই করতে হবে, আজ থেকেই অভ্যাস করা ভালো। নিজেই জল গড়িয়ে খাবে সে।

চুল আঁচড়াবার পরও আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে রইল ইন্দ্রজিৎ। সে নিজেকে দেখছে। এবং অন্য কার উদ্দেশে যেন বলল, আমাকে মনে থাকবে তো।

আয়নার কাছ থেকে সরে এসে সে স্যুটকেস খুলে বেশ কয়েকখানা দশ টাকার নোট পকেটে ভরল। তারপর তরতর করে নেমে এলো সিঁড়ি দিয়ে।

মা বললেন, বেশি দেরি করিস না যেন!

ইন্দ্রজিৎ যখন বলল, আচ্ছা, ততক্ষণে সে সদর দরজা পেরিয়ে এসেছে। জল খাবার কথা আর মনে পড়ল না তার।

খানিকটা দূর গিয়ে দেখল তার বোন রূপা বাড়ির দিকে ফিরে আসছে। ইন্দ্রজিৎ একটা নিশ্চিন্ত নিশ্বাস ফেলল।

রূপাকে জিগ্যেস করল, কোথায় গিয়েছিলি?

নমিতাদের বাড়িতে।

তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নে। বড়মামার বাড়িতে যেতে হবে না!

রূপা একটু অবাক হয়ে জিগ্যেস করল, তুমি এত আগে-আগে কোথায় যাচ্ছ?

ইন্দ্রজিৎ বলল, এই একটু ঘুরে আসছি। তোর এত কথায় দরকার কী?

রূপা মুচকি হাসল। তারপর ধীর পায়ে হাঁটতে শুরু করল বাড়ির দিকে।

বাসের্ জন্য পাঁচ মিনিটের বেশি অপেক্ষা করার ধৈর্য হল না ইন্দ্রজিতের। প্রথম বাসটায় ভিড় দেখেই সে মেজাজের মাথায় একট ট্যাক্সি নিয়ে ফেলল। ট্যাক্সি ময়দান ঘুরে রেড রোড দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ মাঝপথে ইন্দ্রজিৎ বলল, রোককে, রোককে।

ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে সে ময়দানের পাশ দিয়ে খুব মন্থরভাবে হাঁটতে লাগল। ঘনঘন ঘড়ি দেখছে। সওয়া ছ'টা বাজে। মাথার উপর ঝুঁকে আছে সন্ধেবেলা, এখনও নীচে নামেনি। বিকেলের আলো সদ্য ম্লান হতে শুরু করেছে। দূরে চৌরঙ্গির বিজ্ঞাপনের আলোগুলোও সৃষ্টি করছে লাল-নীল আভা। রেড রোড দিয়ে মোটর গাড়ি ছুটে যাচ্ছে সটসট করে।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল থেকে বেশ খানিকটা দূরে একটা গাছে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল ইন্দ্রজিৎ। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে একটা ধরাল কায়দা করে। তাকে দেখলেই বোঝা যায় সে সদ্য সিগারেট টানতে শিখেছে। তার একুশ বছরের তাজা মুখে এখন উত্তেজনার আভাস।

ভিক্টোরিয়ার সামনে প্রচুর নারী, পুরুষ ও শিশুর ভিড়। অনেক রকম খাবারওয়ালা। কয়েকজন আবার ট্রানজিস্টার বাজাচ্ছে। ইন্দ্রজিৎ একবার তাকাচ্ছে সেই ভিড়ের দিকে, আবার দেখল ঘড়ি।

এত ব্যগ্রভাবে সে প্রতীক্ষা করছিল, এ তো তীক্ষ্ণ নজর রেখেছিল, তবু চন্দনা কখন তার পাশে এসে দাঁড়াল সে লক্ষই করেনি।

চন্দনা বলল, এই।

ইন্দ্রজিৎ চমকে উঠল একেবারে।

দুজনে পরস্পরের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল, ঠিক যেন চুম্বকে আকৃষ্ট। চুম্বকটা কার শরীরে রয়েছে, তা বোঝা যায় না।

তারপর চন্দনা বলল, তুমি কতক্ষণ এসেছ?

অনেকক্ষণ।

আমি তো দেরি করিনি।

তবু আমার মনে হচ্ছিল, কত ঘণ্টা ধরে যেন দাঁড়িয়ে আছি এখানে। ভাবছিলাম, তুমি বোধহয় আসবে না। একবার তো রূপাকে বাড়ি থেকে বেরুতে দেখে ভয় পেয়েছিলাম। রূপা যদি তোমাদের বাড়িতে যেত...তা হলে তুমি বেরুতে পারতে না।

চন্দনা একটু হেসে বলল, তাও তো অনেক কষ্ট করে বেরুতে হল। কত মিথ্যে কথা যে বলতে হয় তোমার জন্য।

ইন্দ্রজিৎ বলল, আর বলতে হবে না। কাল থেকে তো আমি আর থাকবই না।

মাসে একবার আসবে তো?

তার কী কোনও ঠিক আছে? হোস্টেলের নিয়মকানুন কিছুই জানি না।

ওসব জানি না। তোমাকে আসতেই হবে।

কথা বলতে-বলতে দুজনে এগিয়ে গেল মাঠের মধ্যে। পুলিশ পোস্টের পাশ দিয়ে এগিয়ে গেল আর-একটু দূরে। একটা কালভার্ট খালি ছিল, সেখানে চন্দনা বসতে যাচ্ছে, ইন্দ্রজিৎ বলল, একটু দাঁড়াও! পকেট থেকে রুমাল বার করে জায়গাটা ঝেড়ে দিয়ে তারপর রুমালটা পেতে দিয়ে চন্দনাকে বলল, বসো!

চন্দনা বলল, রুমালটা পাতার দরকার নেই। কেন ময়লা করছ শুধু-শুধু।

ইন্দ্রজিৎ বলল, কিছু হবে না। আমার ইচ্ছে করছে। তুমি বসো!

চন্দনা বলল, বেশিক্ষণ থাকতে পারব না কিন্তু!

তুমি তো এসেই খালি যাওয়ার কথা বলো। আজ আমি সহজে ছাড়ছি না।

না, লক্ষ্মীটি। এক ঘণ্টা থাকব, তার বেশি নয় বাস থেকে নামছি, অমনি সুব্রতদার সঙ্গে দেখা। দুজন বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছিলেন। আমাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, এদিকে কোথায় যাচ্ছ! আমি তাড়াতাড়ি বানিয়ে বললাম, ব্রিটিশ কাউন্সিল থেকে বই নিতে এসেছি। সেইজন্যই তো ওইদিকে দিয়ে আমাকে ঘুরে আসতে হল।

চন্দনাদের বাড়ির একতলার ফ্ল্যাট থাকে সুব্রত। ইন্দ্রজিতের চেয়ে বছরচারেকের বড়, খুব ভালো ক্রিকেট খেলে, পঙ্কজ রায়ের প্রিয় শিষ্য।

ইন্দ্রজিৎ রেগে গিয়ে বলল, সুব্রতদা কি তোমার গার্জেন না কি?

চন্দনা বলল, না-না, তা নয়। সুব্রতদা কিছু বলেন না। বেশি দেরি করে ফিরলে...ওদের ঘর থেকে দেখা যায় তো...ব্রিটিশ কাউন্সিল আটটায় বন্ধ হয়ে যায়।

সে জন্য সুব্রতদাকে কৈফিয়ত দিতে হবে?

একটু থেমে ইন্দ্রজিৎ আবার বলল, সুব্রতদার বেশ মজা। একই বাড়িতে থাকে, তোমাকে সারাদিন দেখতে পারে, যখন খুশি গল্প করতে পারে, তুমি সুব্রতদার ফ্ল্যাটে দিনে ক'বার যাও?

চন্দনা আরক্ত হয়ে বলল, এই ওরকম করে বলো না। খুব ভালো লোক। কক্ষনো খারাপ কিছু বলেন না।

ওরকম ভালো লোক আমার দেখা আছে।

তুমি কাল চলে যাচ্ছ, আর আজ আমার সঙ্গে এইরকম বকে-বকে কথা বলবে?

এদিক ওদিক তাকিয়ে চন্দনা আস্তে-আস্তে তার হাতটা ইন্দ্রজিতের হাতের ওপর রাখল। তাতেই বুক জুড়িয়ে গেল ইন্দ্রজিতের। সামান্য একটু সরে এলো চন্দনার দিকে।

আমি কাল চলে যাব বলে তোমার মন খারাপ হচ্ছে?

ভীষণ।

পাঁচটা বছর তো মোটে। দেখতে-দেখতে কেটে যাবে।

তুমি মাসে একবার করে আসবে, কথা দাও।

তা বলতে পারছি না। তবে পুজোর সময় তো আসবই।

পুজোর সময় আবার আমি থাকব না। আমাদের বাড়িশুদ্ধ সকলের পুরী যাওয়ার কথা হচ্ছে। ভালো লাগে না।

সুব্রতদাও সঙ্গে না কি!

আবার এ কথা? আমি এক্ষুনি চলে যাব তা হলে।

সুব্রতর ব্যাপারে ইন্দ্রজিতের হৃদয় অত্যন্ত স্পর্শকাতর। বস্তুত, অন্য কোনও ছেলে যদি চন্দনার সঙ্গে একটা কথা বলে, তাও ইন্দ্রজিৎ সহ্য করতে পারে না। তার ধারণা, চন্দনা তাব একার নিজস্ব।

সে চন্দনার হাতে একটা চাপ দিল। তারপরেই জিজ্ঞাসা করল, আমাকে চিঠি লিখবে তো? প্রত্যেক সপ্তাহে?

আর তুমি?

তোমাদের বাড়িতে চিঠি লিখলে যাবে?

তুমি চিঠির তলায় একটা কোনও মেয়ের নাম দিও।

আর হাতের লেখা?

অত কেউ লক্ষ করবে না।

কোন মেয়ের নাম দেব?

যে কোনও একটা। তোমার তো এত মেয়ে বন্ধু, তাদের যে কারুর নাম বসিয়ে দিয়ো।

ইন্দ্রজিৎ এবার হেসে ফেলল। হাসতে-হাসতে বলল, আমার অনেক মেয়ে বন্ধু বুঝি?

চন্দনা সূক্ষ্ম ঠাট্টার সুরে বলল, নেই? সেদিন রবীন্দ্রসদনে যে দেখলাম, তুমি ডান পাশে সিঁথি কাটা একটা মেয়ের সঙ্গে খুব হেসে-হেসে কথা বলছ?

কবে? ও, সে তো তপনের বোন ঝুমা। বিয়ে হয়ে গেছে। বাবা একজনের সঙ্গে একটু কথা বলেছি, তাতেই...

তুমি যে সুব্রতদার নামে এইরকম করে বলো?

ইন্দ্রজিৎ হোহো করে হেসে উঠল। মনে আর গ্লানি নেই। এখন সুব্রতদার ব্যাপারে কাটাকাটি হয়ে গেছে।

ইন্দ্রজিৎ বলল, শোনো, আমি চিঠির তলায় নাম দেব কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। আমি তো কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গানের দারুণ ভক্ত।

আমার ভালো লাগে সুচিত্রা মিত্রের।

যাই বলো, কতগুলো গান আছে, যা কণিকার গলায়...এরপর কিছুক্ষণ ওরা দুজনে রবীন্দ্রসঙ্গীত বিষয়ে তর্কাতর্কি করল। সেই তর্ক শেষ হল চন্দনার গানে। চন্দনা গুনগুন করে গাইল, সকরুণ বেণু বাজায়ে যে যায় বিদেশি নায়ে...

একসময় ইন্দ্রজিৎও আস্তে-আস্তে গলা মেলাল। তার গানের গলা মন্দ নয়। দু-তিনটে ছেলে কাছ দিয়ে কয়েকবার ঘোরাঘুরি করছিল। তাদের দৃষ্টি ভালো নয়। তাঁরা চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে খারাপ কথা বলছে, নিজেদের মধ্যেই অবশ্য।

ইন্দ্রজিৎ উঠে পড়ে বলল, চলো।

চন্দনা উঠে পড়ে বলল, চলো।

চন্দনা উঠে এল। বেশ খানিকটা চলে আসার পর খেয়াল হল রুমালটা নিয়ে আসা হয়নি। সেখানেই পড়ে আছে।

চন্দনা বলল, আমি এখানে দাঁড়াচ্ছি। যাও নিয়ে এসো।

ইন্দ্রজিৎ দৌড়ে চলে গেল। ফিরে এল খালি হাতে। এসে বলল, ওটা গেছে! হাওয়ায় উড়ে নীচের ময়লা জলে পড়েছে দেখলাম।

তোমার বড্ড ভুলো মন। রুমালটা নতুন ছিল না?

যাক গে। ভারি তো একটা রুমাল।

তুমি এরকম জিনিসপত্তর হারাও হোস্টেলে গিয়ে কী কী করবে? একা-একা থাকতে হবে।

একা কোথায়? এবার তিনশো আটাত্তর জন সিলেকটেড হয়েছে।

তা হলেও, তোমার চেনা তো কেউ নেই। তোমার বন্ধুরা তো কেউ এখানে ভরতি হয়নি।

দু-দিনেই অনেক বন্ধু হয়ে যাবে!

অনেক বন্ধু পেয়ে তারপর আমাকে ভুলে যাবে তো?

ইন্দ্রজিৎ আবার সেই চুম্বক আকৃষ্ট চোখে তাকাল চন্দনার দিকে। তার হাসিমাখা ঠোঁটে বলল, হ্যাঁ, ভুলে যাব। তোমাকে একদম ভুলে যাব। আর কোনওদিন মনে পড়বে না। তুমি খুশি হবে তো?

এবার চন্দনার পালা। সেও একইরকম আকৃষ্ট চোখে তাকিয়ে বলল, যেদিন তুমি আমাকে ভুলে যাবে, সেই দিনই আমি মরে যাব। দেখো, ঠিক সেই দিনই মরে যাব!

আর যদি কোনওদিন না ভুলি, তা হলে তুমি চিরকাল বেঁচে থাকবে? বলো?

ওরা সদ্য কৈশোর পেরিয়েছে। তাই অনায়াসেই এইরকম কথা বলতে পারে। ওদের চোখে পৃথিবীটা কত সুন্দর। ভবিষ্যৎ জীবনের কত সম্ভাবনা। সামান্য কথাতেই ওরা দুঃখ কিংবা আনন্দ পায়। ওদের অভিমানও খুব তীব্র।

চন্দনার হলুদ সিল্কের শাড়িটা মাঝে-মাঝে বেসামাল হয়ে যাচ্ছে হাওয়ায়। কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে ভরতি হওয়ার পর থেকে চন্দনা নিয়মিত শাড়ি পরতে শুরু করেছে, এর আগে শুধু বিয়ে বাড়িতে শাড়ি পড়ে যেত। এখনও ভালো করে শাড়ি সামলাতে শেখেনি। আঁচলটা গা থেকে পরে গেলেই সে লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে। ইন্দ্রজিৎ তার দিকে তাকিয়ে হাসে। এক-একবার চোখ ফিরিয়ে নেয়, আবার তাকায়।

চন্দনা বলল, আমরা এদিকে কোথায় যাচ্ছি?

ইন্দ্রজিৎ বলল, বাঃ, মনে নেই? আজ তোমাকে খাওয়াব বলেছিলাম না!

চন্দনা ব্যস্ত হয়ে বলল, না, না, আজ থাক।

কেন?

অনেক দেরি হয়ে যাবে।

কিচ্ছু দেরি হবে না।

কেউ দেখে-টেখে ফেলবে।

কেউ দেখবে না। আমি ওয়াটগঞ্জে একটা খুব নিরিবিলি চিনে রেস্তোরাঁ দেখে এসেছি। সেখানে কেউ যাবে না।

আজ থাক না বাবা।

ইন্দ্রজিৎ দাঁড়িয়ে পড়ে কড়া গলায় বলল, ঠিক আছে, আজ সারারাত ফিরব না, রাজি?

তুমি পারবে?

তুমি পারবে কি না বলো?

আচ্ছা, দেখা যাক। আজ সারারাত রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরব।

হাঁটতে হাঁটতেই ওরা চলে এল একটা নিরিবিলি রেস্তোরাঁর কাছে। ওদের সৌভাগ্যবশত একটা কেবিন খালি ছিল।

সেখানে ঢুকে ইন্দ্রজিৎ এক গাদা খাবারের অর্ডার দিল। চন্দনার কোনও আপত্তিও শুনল না

বেয়ারা অর্ডার নিয়ে চলে যাওয়ার পর ইন্দ্রজিৎ টেবিলের ওপর থেকে চন্দনার কোমল দক্ষিণ হাত তুলে নিল নিজের হাতে। তারপর বলল, তোমার হাতের পাঞ্জা ঠিক করমচার মতো লাল।

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চন্দনা বলল, এই, আমাকে ত্রিশটা টাকা দাও তো!

অবাক হয়ে ইন্দ্রজিৎ বলল, ত্রিশ টাকা, কী হবে?

দাও না, দরকার আছে।

এখন?

হ্যাঁ।

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ইন্দ্রজিৎ পয়সাটা বার করে দিল। চন্দনা নিজের হাতে ব্যাগ খুলে বার করল একটা রুমালের প্যাকেট।

সেটা ইন্দ্রজিতের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, এতে ছ'খানা রুমাল আছে, আমি তোমায় ত্রিশ টাকায় বিক্রি করলাম।

তার মানে?

রুমাল কারুকে এমনি এমনি দিতে নেই। জানো না?

যত সব কুসংস্কার।

চন্দনা এক ধমক দিয়ে বলল, রুমালগুলো হাতে নিয়ে একবার দেখলেও না পর্যন্ত? পছন্দ কি না বলো?

প্যাকেটটা হাতে নিয়ে ইন্দ্রজিৎ বলল, তুমি কেন শুধু-শুধু এগুলো কিনতে গেলে? আমার তো রুমাল আছে অনেক...

যেরকমভাবে হারাচ্ছ, দেখলাম তো।

খুব চমৎকার। যাক বাবা, খুব সস্তায় রুমাল পাওয়া গেল। মাঝে-মাঝে এরকম দিও আমাকে, কেমন?

আ-হা-হা।

এই শোনো, সেই জিনিসটা এনেছ তো?

এবার লজ্জায় একেবারে রক্তিম হয়ে গেল চন্দনার মুখ। সে মুখ নীচু করে বলল, না, আনিনি।

কেন?

লজ্জা করে।

ইন্দ্রজিৎ চটে উঠে বলল, তোমাকে এত করে বললাম...তবু তুমি আনলে না? দেখি তোমার ব্যাগ দেখি!

চন্দনা ব্যাগটা লুকোতে চায় ইন্দ্রজিৎ উঠে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে সেটা জোর করে কেড়ে নিল। ব্যাগটা খুলতেই দেখতে পেল চন্দনা

ছাদের ওপর কতগুলো ফুল গাছের টবের পাশে চন্দনা দাঁড়িয়ে আছে। চিবুক উঁচু করে দেখছে আকাশ। আঁচলটা উড়ছে হাওয়ায়

গাঢ় চোখে ছবিখানার দিকে তাকিয়ে ইন্দ্রজিৎ বলল, কে তুলেছিল ছবিটা?

সুব্রত আরও অনেকে তুলেছিল

এবার সুব্রতদার নাম শুনেও রাগ করল না ইন্দ্রজিৎ। খানিকটা উদার ভাবেই বলল, বেশ ভালো ছবি তোলেন না। অবশ্য, ছবির সাবজেক্ট যদি ভালো হয়...

টপ করে ছবিতে একটু চুমু খেয়ে ফেলল ইন্দ্রজিৎ। চন্দনা বলল, খুব অসভ্য হয়েছ, না?

তখন চন্দনার বাস্তব ঠোঁটে একটু ঠোঁট ছোঁয়াবার জন্য ইন্দ্রজিৎ ব্যাকুলতা বোধ করে। কেবিনের পরদার ফাঁক দিয়ে সে বাইরের দিকে তাকায়। আর কেউ তাদের লক্ষ করছে না তো?

ইন্দ্রজিৎ বসেছিল টেবলের বিপরীত দিকে। চন্দনার পাশে আর একটা চেয়ার খালি পড়ে আছে।

ইন্দ্রজিৎ মিনতি করে বলল, চন্দনা, আমি তোমার পাশে ওইখানটায় গিয়ে বসব?

চন্দনা চোখ পাকিয়ে বলল, না!

তবু ইন্দ্রজিৎ উঠতে যাচ্ছিল, এই সময় বেরসিকের মতন বেয়ারা ঢুকল খাবার নিয়ে। তখন ইন্দ্রজিৎ এমন একটা ভাব দেখাল যেন প্যান্টের পকেট থেকে সিগারেট দেশলাই বার করার জন্যই তাকে উঠে দাঁড়াতে হচ্ছে। আবার বসে পড়ল ধপ করে।

চন্দনা বলল, সুপ ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে, খাও তো!

একটু বাদে চন্দনা দেখল, ইন্দ্রজিৎ বিশেষ কিছু খাচ্ছে না। খাবার নিয়ে নাড়াচাড়া করছে শুধু।

চন্দনা আরও খাবার ইন্দ্রজিতের প্লেটে তুলে দিয়ে বলল, এই তুমি খাচ্ছ না যে?

আর কত খাব?

বাঃ, এত খাবার নষ্ট হবে না কি?

ইন্দ্রজিৎ হাসতে-হাসতে বলল, এরপর আমাকে কোথায় যেতে হবে জানো? বড়মামার বাড়িতে নেমন্তন্ন, সেখানে গিয়ে আবার খেতে হবে।

চন্দনা শিউরে উঠে বলল, এরপর তুমি আবার খাবে?

কী করব? সেখানে গিয়ে তো বলতে পারব না যে খেয়ে এসেছি!

তা হলে এখানে আজ এলে কেন? আমি বারণ করেছিলুম কত...

বেশ করেছি। আমার ইচ্ছে।

খাওয়া দাওয়া শেষ হওয়ার পর ইন্দ্রজিৎ দাম মিটিয়ে দিয়েছে। বেয়ারাকে উদার হাতে দিয়েছে বখশিস। চন্দনা আর দেরি করতে পারবে না, তক্ষুনি উঠবে। ব্যাগটা তুলে নিয়ে সে সবেমাত্র মুখ তুলেছে, ইন্দ্রজিৎ দ্রুত তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে গেল। কিন্তু ঠোঁটে ঠোঁট লাগার আগেই চন্দনা সরিয়ে নিলে মুখ।

ইন্দ্রজিৎ তার পরেই দ্রুত সরে গিয়ে পরদা তুলে বলল, এসো।

দোকান থেকে বেরুবার পর বেশ কিছুক্ষণ পর্যন্ত কেউ একটাও কথা বলল না। ইন্দ্রজিৎ ভয়ে-ভয়ে তাকাচ্ছে চন্দনার দিকে। চন্দনা একবারও ইন্দ্রজিতের দিকে তাকায়নি।

ইন্দ্রজিৎ চন্দনার বাহু আলতোভাবে ছুঁয়ে বলল, তুমি রাগ করেছ।

চন্দনা মুখ না তুলেই বলল, আমার কান্না পাচ্ছে।

কেন?

তুমি কেন এরকম করলে?

ইন্দ্রজিৎ এবার চন্দনার হাত শক্ত করে চেপে ধরে বলল, তুমি তো সম্পূর্ণ আমার। তুমি আমার না?

চন্দনা চুপ।

বলো, তুমি আমার না?

হ্যাঁ।

তাহলে? আমি তোমাকে একটু ইচ্ছে মতন আদর করতেও পারব না? সেটা কি দোষ?

একটুক্ষণ থেমে থেকে চন্দনা বলল, এরকমভাবে নয়! আমার ভীষণ লজ্জা করে।

চন্দনার গলায় এমন একটা ব্যাকুলতা ছিল যা ইন্দ্রজিৎকে তৎক্ষণাৎ স্পর্শ করল। সে অনুতপ্তভাবে বলল, আচ্ছা কথা দিচ্ছি, এরকম আর কক্ষণও করব না। লোকজনের সামনে তোমাকে লজ্জায় ফেলব না!

॥ ২ ॥

ইন্দ্রজিতের বাবা ওকে নিজে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসবেন, ইন্দ্রজিতের এটা একেবারেই পছন্দ নয়। সে বড় হয়েছে, সে কি একা যেতে পারে না? অ্যাডমিশান টেস্টের সময় তো দাদা গিয়েছিলই সঙ্গে। এখন তো আর কারুর যাওয়ার দরকার নেই। ইন্দ্রজিৎ একথা মাকে কতবার বলেছে। কিন্তু বাবা যাবেনই।

বাবার মুখের ওপর কোনও কথা বলার সাহস ইন্দ্রজিতের নেই। বাধ্য হয়ে তাকে যেতে হল।

দুপুরে বাড়ি থেকে সকাল-সকাল খেয়েই বেরিয়েছিল ওরা। ওখানকার স্টেশনে পৌঁছল বিকেল চারটের সময়। বাবা স্টেশন থেকে একগাদা ফল ও কেক কিনে নিলেন। প্রথম দিন হোস্টেলে কী খেতে দেয়-না-দেয়, তার ঠিক কী!

তারপর একটা সাইকেল রিকশা নিলেন। স্টেশন থেকে কলেজ বেশ দূরের রাস্তা। সুটকেশ বেডিং সমেত দুজন সেই একই রিকশা চাপায় বেশ জবরজং অবস্থা। ইন্দ্রজিৎকে পা গুটিয়ে বসতে হয়েছে।

খানিকটা যাওয়ার পর বাবা বললেন, খোকা তোকে একটা কথা বলব শুনবি?

ইন্দ্রজিৎ বাবার মুখের দিকে তাকাল।

বাবা বললেন, সব সময় মনে রাখবি, তোকে ভালো রেজাল্ট করতে হবে। তোকে বড় ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে। অনেক কষ্ট করে তোকে লেখাপড়া শেখাচ্ছি!

ইন্দ্রজিৎরা ধনী নয়, সাধারণ সংক্ষিপ্ত সংসার। তার বাবা অফিসে মোটামুটি উঁচু পদে চাকরি করেন। রিটায়ার করার দিন এগিয়ে আসছে। ইন্দ্রজিৎকে হোস্টেলে রেখে পড়াবার খরচ...ইন্দ্রজিৎ তা বোঝে।

সে চুপ করে রইল।

বাবা আবার বললেন, ছোটবেলা আমারও খুব ইচ্ছে ছিল ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার। আমার বাবা আমাকে পারেননি, সাধ্যে কুলোয়নি। তাই খুব দুঃখ পেয়েছিলাম। ছোট ছিলাম তো, অত বুঝিনি। তারপর ভেবেছিলাম, আমার কোনও ছেলে হলে, তাকে আমি ইঞ্জিনিয়ার করবই। তোর দাদা নিজে ইচ্ছে করেই আর্টস পড়ল...সায়েন্সে মাথা নেই। এখন তোর ওপর ভরসা।

ইন্দ্রজিৎ মুখে কিছু বলল না। মনে-মনে বলল, বাবা, আমি আপনার কথা রাখব। আপনি দেখবেন, আমি একদিন খুব বড় হব।

হোস্টেলে অনেক ছেলে ফাঁকি-টাঁকি দেয়। তাদের সঙ্গে মিশবি না। আবার ভালো ছেলেও আছে। যার ইচ্ছে থাকে, সে ঠিক পড়াশুনো করতে পারে। আর সব সময় শরীরের যত্ন নিবি!

আর-একটা রিকশা ঠিক এদের পেছনে আসছিল। তাতেও একজন প্রৌঢ় লোকের সঙ্গে ইন্দ্রজিতের বয়েসি একটি ছেলে। পায়ের কাছে বাক্স বিছানা। একই কলেজের ছেলে বলে মনে হল।

কলেজের কম্পাউন্ডের কাছে পৌঁছে রিকশা থেকে নামার পর সেই ছেলে নিজে থেকেই আলাপ করতে এল ইন্দ্রজিতের সঙ্গে। সে জিগ্যেস করল, আপনার কি সিভিল না ইলেকট্রিকাল?

ইন্দ্রজিৎ বলল, সিভিল।

ছেলেটি বলল, আমারও তাই ভালোই হল, একইসঙ্গে থাকা যাবে। আমার নাম অরূপ বসু। ইন্দ্রজিৎ নিজের নাম জানাল।

অরূপ ছেলেটি রোগ পাতলা, গায়ের রং অসম্ভব ফরসা। মুখখানা দেখলে বেশ বুদ্ধিমান বলে মনে হয়। সে এসেছে বোলপুর থেকে। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাদের ভাব হয়ে গেল।

এদিকে অরূপের বাবার সঙ্গেও আলাপ জমে উঠল ইন্দ্রজিতের বাবার। এক ঘণ্টা পরে ট্রেন, ওরা একই সঙ্গে ফিরবেন।

একটু বাদেই জানা গেল যে অরূপ আর ইন্দ্রজিতের একই জায়গায় থাকবার জায়গা হয়নি। অরূপের ঘর আবুল কালাম আজাদ ওয়ার্ডে আর ইন্দ্রজিতের সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ওয়ার্ডে। সুপারিটেন্ডেন্টের কাছে দুই পিতাই অনেক করে অনুরোধ করলেন, যাতে ওদের এক ঘরে না হোক এক বাড়িতে থাকতে দেওয়া হয়

তিনি মাথা নেড়ে বললেন, না, সব নতুন ছেলেদের এক সঙ্গে থাকতে দেওয়ার নিয়ম নেই। নতুন পুরোনোদের মিলেমিশে থাকাই নিয়ম।

ইন্দ্রজিতের বাবা ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে এলেন তার ঘর দেখতে। ঘর বেশ ভালোই, তিনতলার ওপরে, যথেষ্ট আলো হাওয়া, দক্ষিণ দিকে বিরাট জানালা।

কলেজ এখন ছুটি। দু-দিন পরে ক্লাস আরম্ভ হবে। তাই বাইরের ছেলেরা অনেকে আসেনি। হোস্টেলটা নিস্তব্ধ মনে হচ্ছিল।

সিঁড়ির কাছে দুটি ছেলেকে দেখে বাবা বললেন, বাবা, আমার ছেলেটাকে রেখে গেলাম, তোমরা একটু দেখো। একথা শুনে এমন লজ্জা করল ইন্দ্রজিতের। সে কি বাচ্চা ছেলে না কি! বাবাদের নিয়ে আর পারা যায় না।

ছেলে দুটি খুবই সম্ভ্রমের সঙ্গে বলল, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আপনি কিছু চিন্তা করবেন না। ওর কোনও অসুবিধে হবে না।

বাবা বললেন, তোমরা সব রয়েছ, বড়ভাইয়ের মতন।

ইন্দ্রজিৎ বাবাকে পৌঁছে দিয়ে এল গেট পর্যন্ত। তিনি অরূপের বাবার সঙ্গে এক রিক্সায় চলে গেলেন। ইন্দ্রজিৎ ফিরে এল নিজের ঘরে। সন্ধে হয়ে এসেছে। বিকেলে আর কিছু খেতে দেবে না বোধহয়। সঙ্গে কিনে আনা কমলালেবু খেতে লাগল খোসা ছাড়িয়ে।

ঘরটা তার খুব পছন্দ হয়েছে। বারান্দার এক কোণে, ছোট, নিরিবিলি। ইন্দ্রজিৎ এর আগে কখনও একা ঘরে শোয়নি। তার বহুদিনের শখ একা থাকার। বাবার কথা রাখবে সে, এই ক'টা বছর খুব মন দিয়ে পড়াশুনো করবে।

এইসব জায়গায় হঠাৎ যেন ঝুপ ঝুপ করে অন্ধকার নেমে আসে। দরজার পাশে সুইচ, সে আগেই দেখে রেখেছিল। আলো জ্বালতে এসে দারুণ জোরে একটা ধাক্কা খেল। যেন ভূতে ঠ্যালা মারল তাকে।

ইন্দ্রজিৎ চমকে গিয়ে ছিটকে পড়ে যাচ্ছিল, কোনওক্রমে সামলে নিল নিজেকে। ব্যাপারটা সে বুঝতে ইলেকট্রিক শক। পকেট থেকে দেশলাই বার করে জ্বেলে দেখল, সুইচের ওপরের ঢাকনাগুলো নিয়ে গেছে। একটু আগে সে দেখেছিল না? কিংবা ভুল দেখেছে?

এরকম খোলা সুইচ রাখা খুব বিপজ্জনক হোস্টেলের সুপার এ সব দেখেন না? প্রথম দিন এসেই কি ইন্দ্রজিৎ কমপ্লেন করবে?

কাঠের চেয়ারটা টেনে এনে ইন্দ্রজিৎ তার ওপর দাঁড়িয়ে সুইচ টিপে আলো জ্বালল। তারপর

দরজা বন্ধ করে পোশাক বদলাতে লাগল সে।

তক্ষুনি দরজায় টকটক আওয়াজ। তাড়াতাড়ি প্যান্টের বোতাম আটকে ইন্দ্রজিৎ দরজা খুলল। বাইরে সাত আটজন ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। এর মধ্যে একটু আগে সিঁড়িতে দেখা সেই দুজনও রয়েছে।

সেই দুজনের মধ্যে একজন বলল, এই যে ভাই, তোমার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম।

ইন্দ্রজিৎ বিনীতভাবে বলল, আসুন, আসুন!

ইন্দ্রজিৎ দেখল, সেই ছেলেদের অনেকের হাতে একটি করে টর্চ, দু-একজনের হাতে টেনিস স্টিক।

বোধহয়, এখানে প্রায়ই আলো নিভে যায়।

লম্বামতন একটি ছেলে বলল, তোমার বাবা বলে গেছেন, শুনেছ তো, আমরা তোমার দাদা হই? আমাদের নামগুলো বলছি, শুনে নাও! আমার নাম সত্যেন, এ ধনঞ্জয়, এ নায়ার, ওই যে পৃথীপাল, ওর নাম সুলেমান, ও ফিরদৌস, আর ওই সুব্রত। এবার বলে যাও তো তুমি কার কি নাম...দেখি কীরকম মনে রাখতে পার?

একবার মাত্র শুনেই এতগুলো নাম মনে রাখা শক্ত। তবু ইন্দ্রজিৎ খুব চেষ্টা করে বলবার চেষ্টা করল।

একটা ভুল হল তার।

সত্যেন নামের ছেলেটি বলল, এক পয়েন্ট লস। পৃথীপাল, যার নাম ইন্দ্রজিৎ ঠিক বলতে পারেনি, সে বলল, আই হ্যাভ গেইনড ওয়ান পয়েন্ট।

ইন্দ্রজিৎ ব্যাপারটা বুঝতে পারল না।

সত্যেন বলল, শোনো, এখানে নতুন এসেছ, কয়েকটা নিয়মকানুন জানতে হবে। সকলের সঙ্গে মিশতে হবে, সকলের কথা শুনতে হবে। এখানে সারা ভারত থেকে ছাত্র আসে, এখানে কেউ একা-একা থাকে না। আর-একটা কথা, ভেতো বাঙালি হয়ে থাকলে কোনওদিন ইঞ্জিনিয়ার হতে পারবে না। অ্যাডমিশন টেস্টে পাশ করলেও আরও কয়েকটা পরীক্ষা দিতে হবে।

ইন্দ্রজিৎ বলল, নিশ্চয়ই। আপনারা যা বলবেন, আমি তাই শুনব।

ঠিক আছে। বসো, ওই চেয়ারটায়।

ইন্দ্রজিৎ চেয়ারে বসা মাত্র একজন হকি স্টিকের খোঁচা দিয়ে নিভিয়ে দিল আলো। সঙ্গে-সঙ্গে সাত আটটা টর্চের আলো তার চোখে।

ইন্দ্রজিৎ দু-হাতে চোখ ঢেকে ফেলল।

একজন বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে হুকুম দিল, চোখ খোলো!

ইন্দ্রজিৎ হাত সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেও পারল না। চোখ একেবারে ঝলসে যাচ্ছে যেন। বলল, পারছি না!

একজন বলল, এ কি শুরুতেই কাত? চোখ খোল শালা।

ইন্দ্রজিৎ হাত সরিয়ে চোখ পিটপিট করতে লাগল।

নাম কী?

ইন্দ্রজিৎ সরকার।

বাবার নাম?

নিকুঞ্জলাল সরকার।

ঠাকুরদার নাম?

গোকুলবিহারী সরকার।

ঠাকুরদার বাবার নাম?

ইয়ে মানে...

এক পয়েন্ট। শালা, বাপের ঠাকুরদার নাম আমরাও কেউ জানি না। তুই বানিয়ে বলতে পারলি না? আচ্ছা, এবার বল, এ টু দা পাওয়ার এন ইনটু এ টু দা পাওয়ার এন কত হয়?

জানি না।

কিছুই হয় না। সেটুকুও জানিস না। আর এক পয়েন্ট। আচ্ছা বল, ইনফ্রাস্ট্রাকচার কাকে বলে?

কোনও কিছু প্রোডাকশনের সঙ্গে যা যা দরকারি, যেমন ট্রান্সপোর্ট, ইলেকট্রিসিটি, রাস্তা।

ঠিক আছে, ঠিক আছে। এবার বল, আমার বাবা একটা বাঞ্চোত!

কী?

কানে শুনতে পাস না?

ও কথা আমি বলব কেন?

আমরা হুকুম করছি, তাই বলবি!

না!

সবাই এক সঙ্গে হোহো করে হেসে উঠল। টর্চ হাতে নিয়ে সবাই এগিয়ে আসতে লাগল আরও কাছে।

ইন্দ্রজিৎ ভয় পেয়ে চোখ ঢাকল। মনে-মনে তবু বলল, আমি ভয় পাব না! আমি ভয় পাব না কিছুতেই।

সত্যেন জোর করে ইন্দ্রজিতের চোখ থেকে হাত সরিয়ে দিয়ে বলল, তুই প্যাঁচা নাকি রে, যে এইটুকু আলো সইতে পারিস না! এবার পৃথীপাল যা বলবে তোকে শুনতে হবে।

পৃথীপাল তার হাঁটুর পেছন দিকে একটা লাথি মেরে বলল, আরে ইয়ার, এই সা, এই সা...

ইন্দ্রজিতকে একটা অদৃশ্য চেয়ারের ওপর বসার ভঙ্গি করতে হল। কিন্তু এইভাবে বসে থাকা কী অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক, হাঁটু হুমড়ে সে একবার পড়ে যাচ্ছে আর দুপাশ থেকে পৃথীপাল আর সুলেমান তার কান ধরে টেনে তুলছে।

ইন্দ্রজিৎ একসময় চেঁচিয়ে বলল, আমি আর পারছি না।

চোপ! পারিব না এ কথাটি বলিও না আর!

একটু বাদে নায়ার এসে বলল, এবার আমার টার্ন। ছেড়ে দাও!

নায়ার দক্ষিণ ভারতীয় হলেও বাংলা জানে ভালো। সে ইন্দ্রজিতের নাকটা ধরে মুচড়ে দিয়ে বলল, বেশ লম্বা আছে তো! দেখি কীরকম নাক খৎ দিতে পারো! যাও, দরজার কাছে যাও। ওইখান থেকে আমার পা পর্যন্ত।

ইন্দ্রজিৎ বলল, কেন? নাক খৎ দেব কেন? ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার সঙ্গে নাক খৎ দেওয়ার সম্পর্ক কী?

সত্যেন বলল, এখানে কোনও প্রশ্ন চলবে না। যে যা বলবে, করতে হবে।

কে একজন যেন জোরে এক লাথি কষাল ইন্দ্রজিতের পেছনে। চেঁচিয়ে বলল, শালা, দেরি করিস কেন?

ফের অন্যদিক থেকে এক লাথি।

ইন্দ্রজিতের মাথার মধ্যে আগুন ধরে গেল। তার ইচ্ছে হল, সেও এলোপাথাড়ি হাত-পা ছোঁড়ে। কিন্তু এতগুলো বড়-বড় ছেলের সঙ্গে সে একা পারবে কী করে?

বাধ্য হয়ে ইন্দ্রজিতকে নাকে খৎ দিতেই হল। একবার না পাঁচবার। দরজার কাছ থেকে নায়ারের পায়ের কাছ পর্যন্ত আসতে হবে। এর মধ্যে একবার মাথা তুলে ফেললেই আবার গোড়া থেকে।

এইরকম আরও কতক্ষণ চলত, তার ঠিক নেই। একসময় খাবারের ঘণ্টা বেজে উঠল।

নিষ্কৃতি পেয়ে গেল ইন্দ্রজিৎ।

সবারই খিদে পেয়েছে। খাবারের ঘণ্টা বাজলে কেউ আর এক মিনিটও দেরি করতে চায় না।

সত্যেন জিগ্যেস করল, এই, তুমি খাবারের ঘর চেনো?

ইন্দ্রজিৎ চেনে না।

সত্যেন বলল, চলো, আমাদের সঙ্গে চলো।

খাবারের ঘরে বিরাট লম্বা টেবিল। সবগুলো চেয়ার ভর্তি হয়নি। অনেক ছেলে এখনও বাড়ি থেকে ফেরেনি। নতুন ছেলেরাও আর কেউ আসেনি এই হলে। নতুনের মধ্যে ইন্দ্রজিৎ একা।

ইন্দ্রজিৎ চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে চাইছে, একজন মোটা মতন ছেলে তার কাঁধ ধরে বলল, এই দাঁড়াও। তারপর সে অন্যদের জিগ্যেস করল, এ কি আই টি মিক্সচার খেয়েছে?

সত্যেন, নায়ার, পৃথীপাল এরা এক সঙ্গে বলে উঠল, না, এখনও খায়নি!

মোটা ছেলেটি বলল, বাঃ, মিক্সচার খায়নি, তার আগেই খেতে বসল যে। এই দাঁড়াও তুমি, আমি মিক্সচার বানিয়ে আনছি।

সে একটা গেলাস নিয়ে চলে গেল। একটু বাদেই ফিরে এল ভরতি গেলাস নিয়ে। কী দিয়ে মিক্সচার বানিয়েছে কে জানে, অদ্ভুত তার রং।

আর একজন তার হাত থেকে গেলাসটাকে নিয়ে খানিকটা নুন আর মরিচ মিশিয়ে দিল। আর একজন নিজের চটি জুতোটা তুলে গেলাসের ধারে ঘষে মিশিয়ে দিল খানিকটা ধুলো।

এবার সেটা ইন্দ্রজিতকে খাওয়ানো হবে। আর একটি ছেলে লাফিয়ে উঠে বলল, দাঁড়া, আর একটু বাকি আছে।

গেলাসটা হাতে নিয়ে সে সকলের চোখের সামনে প্যান্টের বোতাম খুলে খানিকটা হিসি করে দিল গেলাসের মধ্যে সত্যিই। তারপর হাসতে-হাসতে গেলাসটা ইন্দ্রজিতের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, নে শালা, খা!

সব দেখেশুনে ঘেন্নায় ইন্দ্রজিতের বমি আসছিল। সে কঠিন মুখ করে বলল, না, আপনারা কি ভদ্রলোকের ছেলে?

সবাই একসঙ্গে হোহো করে হেসে উঠল। যেন একটা দারুণ মজার কথা!

মোটা মতন ছেলেটা বলল, ওরে বাবা! কত ভদ্দর লোক এসেছে রে! এত বড় ভদ্দরলোক তো এখানে চলবে না! নাও ভাই, এটা খেয়ে জাতে ওঠো।

ইন্দ্রজিৎ মুখ ফিরিয়ে নিল।

তখন তিন চারজন মিলে চেপে ধরল তাকে। জোর করে খাওয়াবে। ইন্দ্রজিৎ ঠোঁটে তালা দিয়ে রেখেছে। ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে গেল। ইন্দ্রজিতের গায়ে জোর আছে, কিন্তু অত জনের সঙ্গে পারবে কেন? ওরা তার ঠোঁটের কাছে গেলাসটা চেপে ধরে আছে।

ঝটকা দিয়ে নিজেকে ছাড়াতে গিয়ে ইন্দ্রজিৎ পড়ে গেল মাটিতে। আত্মরক্ষার জন্য তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়ল টেবিলের নীচে।

তার ফলে আরও বিপদে পড়ল, টেবিলের তলা থেকে সে আর বেরুতেই পারল না, অন্য ছেলেরা যে যার চেয়ারে বসে পড়েছে, ইন্দ্রজিৎ যে দিক দিয়ে বেরোতে যায়, অমনি সেদিকে একজন তাকে লাথি মারে। খেলাচ্ছলে মারা নয়, রীতিমতো জোরে, তার চোখে মুখে যেখানে সেখানে লাগতে পারে।

ইন্দ্রজিৎ একটা কুকুরের মতন টেবিলের তলায় এদিক ওদিক ঘুরতে লাগল আর লাথি খেতে লাগল। তার কান্না এসে যাচ্ছে। কিন্তু সে জানে, কেঁদে ফেললে এরা আরও পেয়ে বসবে।

একবার সে বলল, আমি ক্ষমা চাইছি। আমাকে এবার ছেড়ে দিন!

দু-তিনটি ছেলে বলল, যথেষ্ট হয়েছে। এই, এবার ছেড়ে দে। একদিনে বেশি হয়ে যাচ্ছে।

মোটা ছেলেটি বলল, আচ্ছা, ছেড়ে দিচ্ছি। এদিক দিয়ে বেরিয়ে এসো।

ইন্দ্রজিৎ একটু মুখ বের করতেই সে জিগ্যেস করল, এবার মিক্সচার খাবে তো?

আমি পারব না, কিছুতেই পারব না।

তবে খা শালা, লাথি খা।

মোটা ছেলেটি দারুণ জোরে লাথি মারল ইন্দ্রজিতের মুখে। তার নাক দিয়ে ঝরে পড়ল কয়েক ফোঁটা রক্ত।

তার ইচ্ছে হল, ওই মোটা ছেলেটির পা কামড়ে দেয়।

সেরকম কিছু করল না। সে টেবিলের নীচে শুয়ে রইল চিত হয়ে। সে আর এখান থেকে বেরুবে না। হঠাৎ ছেলেদের মধ্যে কী যেন একটা পরিবর্তন এসে গেল। সত্যেন নীচু হয়ে টেবিলের তলায় মুখ ঝুঁকিয়ে বলল, কী হল? এসো।

না, আমি এখানেই থাকব।

সত্যেন হাত ধরে টেনে বের করল ইন্দ্রজিতকে। নরম গলায় বলল, ছিঃ এতে রাগ করতে আছে? এমনি একটু ইয়ার্কি ঠাট্টা হচ্ছে।

সত্যেন নিজের পকেট থেকে রুমাল বের করে মুছে দিল ইন্দ্রজিতের মুখ। তাকে চেয়ারে বসানো হল।

অন্য ছেলেরা আগ্রহ করে তার প্লেটে তুলে দিল খাবার।

সত্যেন বলল, ভালো করে পেট ভরে খাও। যা লাগবে, চেয়ে নেবে, লজ্জা করবে না। এখানে তো আর মা নেই যে সেধে-সেধে খাওয়াবে! লজ্জা করলেই মরবে।

তারপর একটু নীচু গলায় মিষ্টি করে সত্যেন বলল, এক্ষুনি সুপারিটেন্ডেন্ট আসছে। তাকে যদি কোনও নালিশ করো, তাহলে তোমার সারা গা ব্লেড দিয়ে চিরে সেখানে নুন ছিটিয়ে দেওয়া হবে, বুঝলে?

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হোস্টেলের সুপার এসে ঢুকলেন। বেশ হৃষ্টপুষ্ট সদাশয় চেহারা। নাকের নীচে মোটা গোঁফ।

সুপার জিগ্যেস করলেন, নতুন ছেলেটি কোথায়?

কয়েকজন বলল, ওই যে স্যার, ওই যে!

সুপার ইন্দ্রজিৎকে জিগ্যেস করলেন, তোমার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো?

ইন্দ্রজিৎ একটুক্ষণ চুপ করে রইল। সে বুঝতে পারল, অন্যরা সকলেই তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে নিশ্বাস দমন করে বলল, না।

সুপার বললেন, তোমার সব দাদারা রয়েছেন। কিছু অসুবিধা হলে সিনিয়ার ছেলেদের বলবে, তারাই সব ব্যবস্থা করে দেবে।

সত্যেন এবং আরও কয়েকজন ছেলে বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, স্যার, আমরা তো আছি। আমরাই সব দেখাশুনো করব। আপনি চিন্তা করবেন না।

সুপার যেটুকু সময় রইলেন, সেসময় সকলেই খাওয়ায় খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কোনও কথা নেই, শুধু খাওয়ার শব্দ।

সুপার চলে যাওয়ার পর মোটা ছেলেটি উঠে গিয়ে দরজার কাছে এসে দেখে এল। বলল, এ ছেলেটা স্যারকে কিচ্ছু বলেনি, সেইজন্য একে একটা প্রাইজ দেওয়া উচিত।

তারপর ইন্দ্রজিতকে সাবধান হওয়ার সুযোগ না দিয়ে সেই গেলাসের মিক্সচার ঢেলে দিল তার মাথায়। সেই নোংরা জল গড়িয়ে পড়ল ইন্দ্রজিতের খাওয়ার প্লেটে। তার খাওয়া তখন অর্ধেকও শেষ হয়নি।

সকলে হেসে এ ওর গায়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল। দু-একজন শুধু বলল, যাঃ! ছেলেটাকে খেতে পর্যন্ত দিলি না! কিন্তু তাদের কথা চাপা পড়ে গেল অন্যদের কথায়।

ইন্দ্রজিতের মনে হল, সে একটা শত্রুপুরীতে বসে আছে। এরকম নিষ্ঠুর ছেলের দল সে আগে কখনও দেখেনি। সে অপমান আর অভিমান মেশানো গলায় বলল, আপনারা এতে কী আনন্দ পান? ঠিক আছে, আরও যা খুশি করুন! আমাকে মারুন!

মোটা ছেলেটি বলল, পরের বছর তুমিও নতুন ছেলেদের নিয়ে আনন্দ করবে। চিন্তা কী?

একে আনন্দ বলে? আপনাদের লজ্জা হয় না?

না, ভাই, আমাদের লজ্জা হয় না। ন্যাংটো হলেও আমাদের লজ্জা হয় না! তুমি ন্যাংটো হও, তাও আমরা লজ্জা পাব না।

আপনাদের দিকে তাকাতেই ঘেন্না হচ্ছে আমার। আপনারা পড়াশুনা করতে এসেছেন, না...

ইন্দ্রজিতের কথা শেষ হল না। একজন বলিষ্ঠ ছেলে এসে বাঁ-হাতে তার কলার চেপে রুক্ষ গলায় বলল, এই খোকা, এখনও ম্যানার্স শেখোনি? জানো না, সিনিয়ারদের মুখে-মুখে কথা বলতে নেই!

অন্য একটি ছেলে বলল, এখনও যে ব্রেন ওয়াশিং হয়নি। চল, ব্রেন ওয়াশিং করিয়ে দিই।

তিন-চারজন ইন্দ্রজিতকে ঠেলতে-ঠেলতে নিয়ে এল বাথরুমে। ইন্দ্রজিতের মাথাটা ঠুসে ধরল কমোডের মধ্যে। ইন্দ্রজিৎ অনেক লড়াই করেও ছাড়া পেল না। একজন চেন টেনে দিতেই কমোডের নোংরা জলে ইন্দ্রজিতের মাথা ভিজে গেল।

সেই রাতে সাবান মেখে চান করেও ইন্দ্রজিতের ঘেন্না যায় না। সঙ্গে এক কৌটো পাউডার এনেছিল, সেই পাউডার শুধু গায়ে নয়, চুলের মধ্যেও ঢেলেছে। সাদা চুলে তাকে দেখাচ্ছে বুড়ো মানুষের মতন।

বিছানায় কাঠ হয়ে শুয়ে আছে ইন্দ্রজিৎ। ঘুম আসছে না। হোস্টেলে নতুন ছেলেদের ওপর র‍্যাগিংয়ের কথা সে শুনেছিল। রাগে তার গা জ্বলছে। ইচ্ছে করছে, কাল ভোরবেলাই এখান থেকে চলে যেতে। কিন্তু না, যাওয়া চলবে না। তাকে ইঞ্জিনিয়ার হতেই হবে। যত কষ্টই হোক। তার ওপর অনেকে আশা করে আছে। ফিরে গিয়ে সে চন্দনাকে কী বলবে? চন্দনার কথা ভাবতে-ভাবতেই একটু বাদে তার ঘুম এসে গেল।

পরদিন সকালে উঠে ইন্দ্রজিৎ স্যুটকেশ খুলে তার সব বইপত্র বের করেছে। এমনসময় চার-পাঁচজন ছেলে এসে ঢুকল তার ঘরে।

ওদের দেখেই ইন্দ্রজিৎ শঙ্কিত হয়ে উঠল। আবার কী শুরু হবে কে জানে!

ওদের মধ্যে সত্যেন আর সেই মোটা মতন ছেলেটিও আছে।

সত্যেন জিগ্যেস করল, কী, কাল রাত্রে ঘুম হয়েছিল তো?

ইন্দ্রজিৎ মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ।

এর মধ্যে একটা রাত না ঘুমিয়ে কাটাতে হবে। রেডি থেকো!

অন্য একজন বলল, সেটা যে-কোনও রাত হতে পারে!

মোটা ছেলেটি বলল, দেখি কী-কী জিনিসপত্র এনেছ?

তারা ইন্দ্রজিতের কাছ থেকে স্যুটকেসটা কেড়ে নিয়ে গোল হয়ে বসল মাটিতে। জামাকাপড়গুলি টেনে-টেনে বের করতে লাগল।

স্যুটকেসের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের 'সঞ্চয়িতা' ছিল এক খণ্ড, সেটা তুলে নিয়ে একজন বলল, এ কী, কবিতা?

আরেকজন বলল, খুব আঁতেল মনে হচ্ছে?

সত্যেন বলল, তুমি কি শান্তিনিকেতনের বদলে ভুল করে এখানে চলে এসেছ?

ইন্দ্রজিতের মনে হল, ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্রের পক্ষে কবিতা পড়া বুঝি সত্যিই অন্যায়। সে লজ্জায় পড়ে গিয়ে দুম করে একটা মিথ্যে কথা বলে দিল, ওটা আমার দাদার বই, ভুল করে চলে এসেছে!

কিন্তু ইন্দ্রজিতের লজ্জা পাওয়ার এখনও অনেক বাকি ছিল।

ওরা ঘাঁটাঘাঁটি করে ইন্দ্রজিতের সব জিনিসপত্র বার করে ফেলল। ইন্দ্রজিৎ কক্ষণও অন্যের জিনিসে এভাবে হাত দিত না। কিন্তু ওরা এসব মানে না। স্যুটকেসের পকেট থেকে অন্য কাগজপত্রের সঙ্গে বেরিয়ে গেল চন্দনার ছবিটা।

একজন সেটা ছোঁ মেরে তুলে নিল। সঙ্গে-সঙ্গে শিস দিয়ে বলল, আরে মাইরি, দারুণ জিনিস!

ইন্দ্রজিৎ লাফিয়ে উঠে বলল, দিন, ওটা শিগগির আমাকে দিন।

কিন্তু যে ছেলেটা ছবিটা নিয়েছে, সে ইন্দ্রজিতের চেয়ে অনেক লম্বা। সে হাতটা উঁচু করে বলল, দাঁড়াও, দাঁড়াও! এটা কি তোমার দাদার জিনিস না কি! ভুল করে চলে এসেছে।

আপনারা পরের জিনিসে হাত দেন কেন?

ইন্দ্রজিতের কথা কেউ গ্রাহ্যই করল না। লম্বা ছেলেটি বলল, দারুণ রে! অনেকটা তনুজার মতন দেখতে না?

মোটা ছেলেটি বলল, না, বরং মীনা কুমারীর টাইপ।

সত্যেন ইন্দ্রজিতকে জিগ্যেস করল, মেয়েটার কী নাম ভাই। তোমার বন্ধুর বোন না বোনের বন্ধু?

ইন্দ্রজিৎ আরক্ত মুখে দাঁড়িয়ে রইল, কোনও উত্তর দিল না।

লম্বা ছেলেটি সশব্দে ছবিটায় একটু চুমু খেয়ে বলল, আঃ।

মোটা ছেলেটি বলল, এই আমায় দে! আমায় দে একবার।

ইন্দ্রজিতের চোখ দিয়ে আগুন বেরুচ্ছে যেন। ওরা চন্দনাকে অপমান করছে! সে গোঁয়ারের মতন ছুটে গিয়ে এক ঘুষি মারল লম্বা ছেলেটির নাকে। ঘুষিটা বেশ জোরেই হয়েছিল। ছেলেটা উঃ করে নাক চেপে ধরল।

তারপর সে এক ল্যাং দিয়ে ইন্দ্রজিতকে ফেলে দিল মাটিতে। ইন্দ্রজিতের পিঠের ওপর চেপে বসল। মোটা ছেলেটিও বসল আর-এক দিকে। তারপর বলল, দ্যাখ শালা, তোর মালকে নিয়ে আমরা এখন কী করি। একলা-একলা মালবাজি করবি!

সেই লম্বা ছেলেটি, যার নাম অনুপম, সে ছবিটার ঠোঁটে, গলায় এবং আরও নীচে এমনভাবে ঠোঁট ঘষতে লাগল, যেন চন্দনাকে কামড়াচ্ছে। চন্দনার ব্লাউজে লেগে গেল তার লালা। সেইসঙ্গে যেসব কথা উচ্চারণ করতে লাগল, তা বলা যায় না।

ইন্দ্রজিৎ প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগল উঠে দাঁড়াবার। কিন্তু সে অসহায়। খানিক বাদে কে যেন সত্যেনের নাম ধরে ডাকতেই ওরা সবাই একসঙ্গে চলে গেল ঘর ছেড়ে।

ইন্দ্রজিৎ আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়াল। চন্দনার ছবিখানা মোচড়ানো অবস্থায় পড়ে আছে। সেটা তুলে নিয়ে ইন্দ্রজিৎ ছবিটাকে সমান করার চেষ্টা করতে লাগল। তারপর অনেকক্ষণ সেটার দিকে তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে।

ইন্দ্রজিৎ মনে-মনে বলছে, তুমি আমার ওপর রাগ করেছ? কতগুলো নোংরা হাত তোমাকে ছুঁয়েছে। ওরা তোমার সম্পর্কে নোংরা কথা বলেছে। আমি বাধা দিতে পারিনি। তুমি রাগ করেছ আমার ওপরে? তুমি সব বুঝতে পারবে না?

ইন্দ্রজিৎ দেখল, ছবির মধ্যে চন্দনার হাসিটা একইরকম আছে। ছবিখানা হাতে নিয়ে সে জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। যেন এখান থেকেই কলকাতা পর্যন্ত দেখতে পাবে। ইন্দ্রজিৎ আবার মনে-মনে বলল, তুমি কোনওদিন আমাকে ভুল বুঝো না।

যাতে ওরা আবার এই ছবিখানা নিয়ে কোনওরকম নোংরামি না করতে পারে, সেইজন্য সে ছবিখানা কুচি-কুচি করে ছিঁড়ে ফেলে দিল বাইরের মাঠে। ছবির দরকার কী! চোখ বুজলেই তো সে চন্দনাকে দেখতে পায়।

এরপর আরও চার-পাঁচদিন ধরে ইন্দ্রজিতের ওপর এইরকম অত্যাচার হতে লাগল। অত্যাচার কিংবা খেলা, একদিন সারারাত ধরে ওদের অনেক হুকুম পালন করতে হল। উচ্চারণ করতে হল ওদের শেখানো অসভ্য কথা। ইন্দ্রজিৎ আর কিছুরই প্রতিবাদ করে না। কলের পুতুলের মতন সব কিছু করে যায়।

দু-দিন বাদে সে শুনল, এইরকম অত্যাচারের জন্য চারটি ছেলেকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে। কিন্তু আরও অত্যাচারের ভয়ে কেউ অভিযোগ করে না কর্তৃপক্ষের কাছে। প্রথম দিন এসেই যে ছেলেটির সঙ্গে ইন্দ্রজিতের আলাপ হয়েছিল, তার হিস্টিরিয়ার মতন অসুখ দেখা দিল, সে পড়াশুনো ছেড়ে চলে গেল নিজের বাড়িতে।

ইন্দ্রজিৎ মনে-মনে সব সময় বলে, আমি যাব না। আমি কিছুতেই হেরে যাব না। বাবা-মা কিংবা চন্দনার কাছে আমি কোনওদিন এসব কথা বলতে পারব না। আমাকে ভালো রেজাল্ট করতেই হবে।

ইন্দ্রজিৎ বাড়িতে চিঠি লিখল, মা, আমি খুব ভালো আছি। আমার জন্য কোনও চিন্তা কোরো না। এখানকার পরিবেশ যেমন চমৎকার, তেমনই এখানকার অন্য ছাত্ররাও আমাকে সব ব্যাপারে সাহায্য করে। খাওয়া দাওয়া এত চমৎকার যে কী বলব তোমাকে...

দিন সাতেক বাদে ইন্দ্রজিতের মনে হল, হঠাৎ যেন একটা ঝড় থেমে গেল। সকাল থেকে একজনও তাকে বিরক্ত করতে আসেনি। গতকালও সত্যেনের সাইকেলটা তাকে কাঁধে করে নিয়ে যেতে হয়েছিল। আজ সত্যেন নিজে থেকেই তাকে ডেকে বলল, এই, আয়, আমার পেছনে বোস। রোদ্দুরের মধ্যে হাঁটবি কেন! একথা শুনেও ইন্দ্রজিৎ দাঁড়িয়ে ছিল, সত্যেন তার হাত ধরে টানল। সহাস্যে বলল, মুখ গোমড়া করে আছিস কেন? মেয়েটির ছবি নিয়ে একটু বাড়াবাড়ি হয়েছিল, ওসব মনে রাখতে নেই। ওরকম হয়েই থাকে।

কয়েকদিনের মধ্যে সত্যেন আর সেই মোটা ছেলেটা, যার নাম সুকুমার, এরাই ইন্দ্রজিতের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে গেল।

এসব তো একুশ বছর আগেকার কথা। মাঝখানে নদী দিয়ে কত জল বয়ে গেছে। সেকেন্ড ইয়ারে ওঠার পর ইন্দ্রজিতের জীবনে হঠাৎ এক প্রবল ঝড়ের ঝাপটা লাগে। একবার না দুবার। বাবা তাঁর স্বপ্ন পূরণের ছবিটি দেখে যেতে পারেননি। এক রাত্রে ঘুমের মধ্যেই তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

পারিবারিক বিপর্যয়ে ইন্দ্রজিতের পড়াশুনাই বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। টাকার অভাবে সে হোস্টেল ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল প্রায়। তখন এই সত্যেন, অনুপম, আর কয়েকজনই তাকে যেতে দেয়নি। জোর করে আটকে রেখেছিল। ওরা যে কতভাবে ইন্দ্রজিতকে সাহায্য করেছে, তা কি সে জীবনে কখনও ভুলতে পারে? অনুপমের কাকা আমেরিকান কনস্যুলেটে বড় অফিসার। তাঁর সূত্রে অনুপম কয়েকখানা ইংরিজি বই অনুবাদের কাজ জুটিয়ে দিয়েছিল ইন্দ্রজিতকে। সেই টাকাতে সে পড়াশুনো চালিয়ে যেতে পারে শেষ পর্যন্ত।

আরেকটি ঝড়ে উড়ে চলে গেল চন্দনা। এক অচিন দেশের রাজকুমার এসে হরণ করে নিয়ে গেল তাকে।

আজকাল এইসব রাজকুমাররা আসে, বিলেত-আমেরিকা থেকে। এই রাজকুমারটি এল জার্মানি থেকে। সে যেমনই রূপবান, তেমনই তার পার্থিব যোগ্যতা। চন্দনার সঙ্গে আলাপের পরেই পঞ্চশরের কারসাজিতে দুজনের মধ্যে গভীর প্রেম হয়ে গেল। প্রেম তো আর যুক্তি কিংবা পূর্বপ্রতিশ্রুতি মানে

না। কলকাতায় ইন্দ্রজিতের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর চন্দনা কাঁদতে-কাঁদতে অনুনয় করেছিল, সে ইন্দ্রজিতের কাছে মুক্তিভিক্ষা চায়। জার্মানি প্রবাসী যুবকটিই হবে তার জীবনসঙ্গী। প্রায় নিঃশব্দে অনুমতি দিয়ে ইন্দ্রজিৎ উঠে চলে গিয়েছিল। এরপরেও চন্দনা দুটো চিঠি লিখেছিল তাকে। ইন্দ্রজিৎ উত্তর দেয়নি। ইন্দ্রজিৎ নিজেও চাকরি জীবনে কয়েকবার গেছে জার্মানিতে। কখনও চন্দনার খোঁজ করার প্রবৃত্তিও তার হয়নি।

প্রথম চাকরির সময় সত্যেন ছিল তার বস। ঠিক ছোটভাইয়ের মতন সাহায্য করেছে সে। বিভিন্ন সময়ে সুকুমার আর অনুপমের সঙ্গেও তার দেখা হয়েছে। প্রবল আড্ডা, তাস খেলা ও পানাহারে কেটেছে অনেক সময়। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভরতির প্রথম কয়েকটি দিনের সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার বিন্দুমাত্র গ্লানিও তার মনে স্থান পায়নি।

শুধু অনুপমের দিকে সে মাঝে-মাঝে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেছে। এই অনুপম সম্পর্কে একটা প্রবল ঈর্ষাবোধ রয়ে গেছে তার মনে। এই অনুপম কত নিবিড়ভাবে চুমু খেয়েছিল চন্দনার ছবিতে। আর ইন্দ্রজিৎ কোনওদিন আর চন্দনাকে আলিঙ্গন বা চুম্বনের সুযোগ পায়নি। এমনকী চন্দনার ছবিতেও না। এই অতৃপ্তি তাকে দগ্ধ করে চলেছে এখনও।



শাস্তি

এয়ারপোর্ট থেকে মাত্র তিন কিলোমিটার দূরে। এমন নয় যে, ফাঁকা মাঠের মধ্যে বাড়ি। এখন কোথাও আর ফাঁকা জায়গা পড়ে থাকে না। চতুর্দিকে আগাছার মতন বাড়ি গজিয়ে উঠছে। তবে, এ-বাড়িটার সামনে একটা বেশ বড়, ছড়ানো তিনতলা বাড়ি। তাই ছোট দোতলা বাড়িটা আড়াল পড়ে গেছে, বড় রাস্তা থেকে দেখা যায় না। ডানপাশে কীসের যেন একটা কারখানা।

শিশির একটু দূরে দাঁড়িয়ে বাড়িটাকে ভালো করে দেখল। মফস্বলের একটা অতি সাধারণ বাড়ি। দেওয়ালের রং চটা। সামনে বাগান-টাগান কিছু নেই। ওপর থেকে অনেকগুলো বাচ্চার গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে, মনে হয় যেন একটা ইস্কুল। এ পাড়ার লোকজন বোধহয় সেরকমই কিছু ভাবে।

বিলু নামের লোকটি চঞ্চল হয়ে বলল, স্যার, এবার আমি যাই। আমাকে দেখলে ওরা মারার চেষ্টা করবে।

শিশির গম্ভীরভাবে বলল, না, তুমি জিপে গিয়ে বসো। তুমি এখন যাবে না।

বিলু তবু বলল, ওরা আমায় চিনে ফেলবে। পরে আমাকে...

শিশির ধমক দিল, চুপ করে বসে থাকো!

জিপ গাড়ি থেকে নেমে এল পাঁচজন কনস্টেবল আর এস আই মহীতোষ। এখনও ভালো করে ভোর হয়নি, সবেমাত্র আকাশের অন্ধকার ভাঙছে। ডাকাডাকি শুরু করেছে কিছু পাখি। অধিকাংশ মানুষই এইসময় ঘুমোয়। দোতলায় কয়েকটা বাচ্চা কাঁদছে, কয়েকটা এমনিই চ্যাঁচাচ্ছে।

বেল্টের খাপ থেকে রিভলভারটা খুলে হাতলের দিকটা দিয়ে সদর দরজায় খুব জোরে ঠকঠক করল শিশির। মহীতোষ কনস্টেবলদের বাড়িটা ঘিরে রাখতে নির্দেশ দিচ্ছে। বেশ কয়েকবার ঠকঠক করলেও দরজা খুলল না। শিশির তখন চেঁচিয়ে ডাকল, ইসমাইল! ইসমাইল!

এবার একজন দরজা খুলল। ঘুম-ঘুম চোখ। শিশিরকে ভালো করে না দেখেই বিরক্তভাবে বলল, ইসমাইলকে কী দরকার? সে এখন উঠবে না।

শিশির খপ করে লোকটির চুল মুঠোয় ধরে জিগ্যেস করল, তুই কে?

লোকটি এবার স্তম্ভিত হয়ে গেল। তার ঘুমের মধ্যে কোনও বিপদের স্বপ্ন ছিল না। সাধারণ মানুষের মতন সে জেগে উঠেছিল।

রিভলভারের নলটা তার গালে চেপে ধরে শিশির আবার বলল, বল, তুই কে?

লোকটি এবার কাঁপতে-কাঁপতে বলল, স্যার, আমার নাম লালু। আমি কিছু জানি না। আমি এ বাড়ির চাকর।

একটা চেক লুঙ্গি পরা, খালি গা, রোগা চেহারা, মাথায় খোঁচা-খোঁচা চুল। মুদিখানার কর্মচারী হলেই যেন তাকে মানায়।

মাথার চুল ছেড়ে দিয়ে শিশির অকারণেই ঠাস করে তাকে বেশ জোরে একটা চড় কষাল। তারপর বলল, লালু, মানে লালমনি দাস। তুই আগে ছিলি পকেটমার, এখন ভালো কাজ পেয়েছিস, তাই না?

মহীতোষ তার কোমর চাপড়ে দেখল, কোনও অস্ত্র লুকোনো আছে কি না। কিছু নেই।

শিশিরি বলল, এবার দেখিয়ে দে, ইসমাইল কোথায়।

একতলার একটা ঘরেই পাওয়া গেল আর দুজনকে। ইসমাইল আর জিয়াউদ্দিন। ওদের অবস্থা দেখেই বোঝা গেল, কেন চ্যাঁচামেচি শুনেও ওরা জাগেনি। ঘরের মধ্যে গড়াচ্ছে তিনটে বাংলা মদের বোতল। ছড়িয়ে আছে প্রচুর শালপাতা, তাতে মাংসের ঝোল, শুকনো ভাত আর মাংসের চিবুনো হাড়। অনেক রাত পর্যন্ত খানাপিনা হয়েছে। পিঠে বুকে অনেকগুলো লাথি খেয়েও ইসমাইল আর জিয়াউদ্দিন লাল-লাল চোখে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। ওদের এখনও এমন নেশা যে, ঠিক কী যে ঘটছে তা বোধগম্য হচ্ছে না।

ইনফরমার বিলু ঠিক খবরই দিয়েছিল। এ সময় তিনজনের বেশি পুরুষ মানুষ থাকবে না। এরা বন্দুক-পিস্তলের কারবার করে না। কোনও প্রতিরোধের চেষ্টাও করল না।

ইসমাইলের নাকে আর একটা লাথি কষিয়ে শিশির বলল, ওঠ, হারামজাদা, পাসপোর্ট দেখা।

এবার ইসমাইল উঠে বসল, আলনার ওপর রাখা একটা স্যুটকেস খুলে পাসপোর্ট বার করে যন্ত্রচালিতের মতন এগিয়ে দিলো শিশিরের দিকে।

শিশির বলল, হুঁ, ইন্ডিয়ান পাসপোর্ট। সবসময় সঙ্গে রাখিস দেখছি।

ইসমাইল জড়ানো গলায় জিগ্যেস করল, কেয়া হুয়া? তুম লোগ কৌন?

শিশির বলল, আমি তোদের যম!

বুঝতে না পেরে হেসে উঠতেই একটা থাপ্পড় খেল জিয়াউদ্দিন।

লালমনিকেও সে-ঘরে রেখে, বাইরে থেকে হুড়কো দিয়ে দিল মহীতোষ। জানলা দিয়ে পালাতে পারবে না। এদের ব্যবস্থা পরে হবে।

দোতলাতে দুখানা ঘর। একটি ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে একজন মাঝবয়েসি স্ত্রীলোক। বেশ আঁটসাঁট চেহারা, গোলাপি রঙের ছাপা শাড়ি পরা। চুল খোলা, চুলের বেশ গোছগাছ। এই স্ত্রীলোকটি আগেই জেগে উঠেছে। নীচের তলায় কী ঘটে গেছে এর মধ্যে, তা জানে। মুখে আশঙ্কার ছায়া।

শিশির এই স্ত্রীলোকটির দিকে এক পলক তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল। কোনও কথা বলল না। যে ঘরটি থেকে বাচ্চাদের চ্যাঁচামেচি শোনা যাচ্ছে, সেই ঘরের দরজাটা ঠেলে খুলে ফেলল শিশির। ঘরটাকে দেখলে মনে হয়, ঠিক যেন পাখির খাঁচা। লম্বাটে ঘর, তাতে শুধু শতরঞ্চি পাতা। চাদর, বালিশ কিছু নেই। সেখানে শুয়ে, বসে, দাঁড়িয়ে আছে অনেকগুলো বাচ্চা ছেলে। শিশির গুনে

দেখল, তেইশটি। তিন-চার-পাঁচ বছরের মধ্যে বয়েস। শুধু ইজের পরে, খালি গা। ঘরটার সব জানলা বন্ধ। শুধু ওপরে একটা স্কাইলাইট দিয়ে যেটুকু আলো ও হাওয়া আসে।

মহীতোষের মতো একজন পোড় খাওয়া পুলিশও কাতরভাবে বলে উঠল, ইস! চোখে দেখা যায় না।

শিশির পাথরের মতন স্থির।

ওদের দেখে সাত আটটা বাচ্চা একসঙ্গে কেঁদে উঠল।

জঙ্গলে ছুটবার মতন বাচ্চাগুলোর মধ্য দিয়ে কোনওক্রমে পা ফেলে-ফেলে দৌড়ে গিয়ে মহীতোষ দুটো জানলা খুলে দিল।

একটা ঝাঁকুনি খেয়ে ঘোর ভাঙল শিশিরের। তারপর বলল, তুমি এক কাজ করো। নীচের তিনটে হারামজাদাকে বেঁধে থানায় নিয়ে যাও। দুজন কনস্টেবল এখানে থাক। তুমি একটা বড় ভ্যান জোগাড় করে আনো। বাচ্চাগুলোকে নিয়ে যেতে হবে তো। আমি এখানে থাকছি।

মহীতোষ বলল, আমাদের ভ্যানটা তো খারাপ। লালবাজারে ফোন করব?

শিশির বলল, যা হোক একটা কিছু করো। লালবাজার ধরতে না পারলে একটা ভ্যান ভাড়া করে আনো।

মহীতোষ নেমে যেতেই শিশির সিঁড়ির কাছে সরে এসে স্ত্রীলোকটিকে জিগ্যেস করল, তুমিই তো মক্ষীরাণী! তোমার নাম কী?

স্ত্রীলোকটির তেজ আছে। ভয়ের ভাব না দেখিয়ে বলল, আমার নাম দিয়ে কী হবে? আমি মাইনে করা লোক। বাচ্চাগুলোর দেখাশুনো করার জন্য আমাকে এনেছে। সাতদিনের কড়ারে। আমি আর কিছু জানি না।

তুমি আর কিছু জানো না?

না।

আর কখনও পুলিশের হাতে ধরা পড়েছ? রেকর্ড আছে?

না, পুলিশ আমায় ধরবে কেন! আমি কোনও দোষ করেছি নাকি? এরা মাইনে দেবে, আমি কাজ করছি।

সাতদিনের জন্য কত মাইনে দেবে?

সাতশো টাকা।

হুঁ। সাতদিন পরে তুমি আবার কী কাজ করবে?

বাড়ি ফিরে যাব।

তোমার বাড়ি কোথায়?

আজ্ঞে সে কথা জেনে তো আপনার কোনও কাজ নেই বাবু। আমি আর কিছু জানি না।

হুঁ, ঠিক আছে। এই বাচ্চাগুলোকে খাবার দাও কখন?

এখনই দিতে পারি।

নিয়ে এসো।

স্ত্রীলোকটি নিজের ঘরে ঢুকে একটা ঝুড়ি নিয়ে এল। তাতে অনেকগুলো কোয়ার্টার পাউন্ড পাউরুটি। আগের দিনের, শুকনো।

জন্তুজানোয়াদের খাবার দেওয়ার মতনই বাচ্চাগুলোর মাঝখানে ঝুড়িটা সে বসিয়ে দিলো। সঙ্গে-সঙ্গে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল অনেকগুলো বাচ্চা।

স্ত্রীলোকটি দরজাটা টেনে দিল বাইরে থেকে। শিশির এর মধ্যে একটা সিগারেট ধরিয়েছে। সে জিগ্যেস করল, শুধু পাউরুটি? আর কিছু নয়?

বেলা হলে দুধ গুলে দিই। দুপুরে ভাত খায়।

তেইশটা বাচ্চাই এসেছিল, না দু-একটা মরেছে এর মধ্যে?

না-না, মরবে কেন?

হুঁ, ওদের বাঁচিয়ে রাখা দরকার। প্রত্যেকটার দাম আছে তো? তোমার নিজের ছেলেপুলে আছে?

সেসব জেনে আপনার কী দরকার বাবু? হ্যাঁ, আছে।

ক'টা?

তিনজন।

কত বয়েস?

তিন, সাত আর দশ।

তুমি যখন থাকো না, তখন তাদের কে দেখাশুনো করে?

আছে, লোক আছে।

নিজের ছেলেমেয়েদের রেখে তুমি বাইরে কাজ করতে আস...

কী করব বাবু পেট চালাতে হবে তো। আমার কত্তার রোজগার নেই...

ঠিক আছে। তোমার ঘরে চলো।

ঘরে যাবে কেন? যা বলবার এখানেই বলুন না।

হঠাৎ অসম্ভব হিংস্র মুখ করে শিশির বলল, হারামজাদী, তোকে এক্ষুনি আমি গুলিতে ঝাঁঝরা করে দিতে পারি। রিপোর্ট দেব যে, তুই দা দিয়ে আমাকে মারতে এসেছিলি। তুই একটা ডাইনি, রাক্ষুসী। সব্বাই বিশ্বাস করবে।

সেই দাপটের চোটে একবার কেঁপে উঠল স্ত্রীলোকটি। তবু শান্ত গলায় বলল, আপনি পুলিশ, হাতে অস্তর আছে, মারতে যদি চান তাহলে আমি মেয়ে মানুষ হয়ে আর কী করব! মারতে হয় মারুন!

একবার সে অন্য ঘরটিতে ঢুকে গেল। সে ঘরে কোনও চেয়ার-টেবিল নেই। শুধু একটা খাট। একটা দেওয়াল আলমারি। এক কোণে তিনটে স্যুটকেস। শিশির দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিল ঘরটায়। সবকিছুই সিজ করতে হবে। খাটের একটা পায়ার কাছে একটা দলা পাকানো লুঙ্গি। এ ঘরে পুরুষরা আসে। নিজে খাটে বসে শিশির রিভলভারটা দিয়ে স্ত্রীলোকটিকে ইঙ্গিত করল মেঝেতে বসতে। অ্যাশট্রে নেই, শিশির ছাই ঝাড়ল মাটিতে, তাতে কিছু যায় আসে না, এ বাড়ি এখন বন্ধ থাকবে অনেকদিন। বাড়ির মালিককেও চালান করতে হবে।

শিশির বলল, তুমি মাইনে নিয়ে কাজ করো বললে। এই বাচ্চাগুলোকে কোথা থেকে আনা হয়েছে, কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে, তা তুমি জানো না?

না, জানি না।

জানতে ইচ্ছেও করে না? এতগুলো বাচ্চাকে কেন একসঙ্গে আটকে রাখা হয়েছে, তাও জানতে ইচ্ছে করে না?

আমাকে টাকা দিয়ে বলেছে, বাচ্চাগুলোকে খাওয়াবে, ঘুম পাড়াবে। অন্য কথায় আমার কী কাজ?

তোমাকে কেউ টাকা দিয়ে যদি বলে, একটা বাচ্চার গলা টিপে মারো, তুমি তাই করবে?

ওমা, সে কী কথা! অমন কাজ মানুষে করে?

মোট চব্বিশটা বাচ্চা ছিল। গুনে দেখলাম তেইশটা। একটা এখানেই মরেছে। সে তো খুন করারই সমান।

আমি বাপু সে কথা জানি না।

তুমি জানো না? এই বাচ্চাগুলো সবকটাকে যে মরতে পাঠানো হচ্ছে, তা তুমি জানো না?

সত্যি বলছি, আমি কিছু জানি না। আমি তো তেইশটাই দেখেছি। মা কালীর দিব্যি।

তুমি মা কালীর পুজো দাও?

দিই তো। আমাদের বাড়ির কাছেই লরোড কেলাইবের আমলের কালীমন্দির আছে।

কার আমলের?

লরোড কেলাইব।

লর্ড ক্লাইভ! পুজো দাও, আর মায়ের দিব্যি করে মিথ্যে কথাও বলো!

আমি মিথ্যে বলিনি তো!

বাচ্চাগুলোকে বাংলাদেশ থেকে আনা হয়েছে এখানে। তোমাদের হেফাজতে কয়েকদিন রেখে তারপর পাঠানো হবে বোম্বাই। সেখান থেকে পাচার হবে আরব দেশে। আবুধাবি। সেখানকার শেখরা উটের দৌড় দেখতে খুব ভালোবাসে। উটের দৌড়। অনেক টাকার খেলা। এক-একটা বাচ্চাকে বেঁধে দেওয়া হবে উটের পিঠে। বাচ্চাগুলো ভয়ে কাঁদবে আর চ্যাঁচাবে। সেই চ্যাঁচানি শুনে উটগুলোও তড়বড়-তড়বড় করে ছুটবে। সেখানে প্রচণ্ড গরম। প্রায় সবকটা বাচ্চাই দৌড়ের শেষে মারা যায়। এসব তুমি জানো না?

আজ্ঞে না। কিছু জানি না।

হুঁ। তাহলে আমি কী-কী জানি শোনো। তোমার নাম শেফালি। শেফালি মণ্ডল। এই ব্যবসায় তোমার বখরা আছে। আগের বছরও তোমরা অনেকগুলো বাচ্চাকে চালান করেছ। সেবার একটুর জন্যে তোমাকে ধরা যায়নি। এবার তোমায় জেলের ভাত খেতেই হবে।

শেফালি এবারও বিশেষ ভয়ের চিহ্ন দেখাল না।

শিশির বুঝতে পারল, শেফালির জোর কোথায়। ঝানু মেয়ে। ও জানে, বড়জোর জেল খাটতে হবে দু-তিন বছর। তাও কোনও দুঁদে উকিল লাগালে আরও শাস্তি কমে যেতে পারে, এমনকী খালাসও হয়ে যেতে পারে। বাচ্চা ছেলে মারার ব্যাবসা যারা করে, তাদের জন্যেও উকিল পাওয়া যায়। বিচারকও সূক্ষ্ম আইনের মারপ্যাঁচে এদের ফাঁসি দিতে পারে না। মাত্র কয়েক বছর কারাদণ্ড। কিছুই না। বেরিয়ে এসে আবার এইরকম কিছু ব্যাবসা ফাঁদবে।

তাও শেফালি কিংবা ইসমাইলরা চুনোপুঁটি। আসল লোকরা বসে আছে বোম্বেতে। তারাই টাকা ইনভেস্ট করে, বেশি লাভ করে তারাই। এক-একটা বাচ্চার দাম পঁচিশ হাজার টাকা, শেফালিরা তার থেকে পায় যৎসামান্য, এই বাচ্চাদের মা-বাবারা পায় আরও কম।

সবই টাকার জন্য। উটের দৌড় প্রতিযোগিতায় টাকা। বম্বের ব্যবসায়ীরা ছেলে চালান দেয় টাকার জন্যে।

বাংলাদেশ আর কলকাতার কিছু নীচু ধরনের মানুষ সেইসব ছেলের জোগান দেয় টাকার জন্যে। অতিদরিদ্ররা ছেলে বিক্রি করে দেয় কয়েকটা টাকার জন্যে। আরব শেখদের বাচ্চাই চাই। শিশুদের আর্ত কান্না না শুনলে তাদের খেলা জমে না। খুব গরিব দেশ ছাড়া এরকম বাচ্চাই বা পাওয়া যাবে কোথায়? এসব দেশের সরকারও গরিবদের শিশু নিয়ে মাথা ঘামায় না।

শিশিরের প্রবল ইচ্ছে থাকলেও তো শেফালি ইসমাইলদের গুলি করে মেরে ফেলতে পারবে না। সে ক্ষমতা তার নেই। এখানে তবু এদের দু-তিন বছর জেল খাটানো যেতে পারে। বম্বেতে তাও যাবে না। বম্বের আসল চাঁইরা ধরে পড়ে না।

সিগারেটে শেষ টান দিয়ে শিশির জিগ্যেস করল, আমায় কত দিবি?

শেফালি চোখ গোল-গোল করে তাকাল।

শিশির আবার বলল, আমাকে কত দিবি বল। ছেড়ে দেব তোকে।

শেফালি এবার উঠে দাঁড়াল। এখন সমানে-সমানে কথা হবে। শেফালি বলল, পাঁচ।

উহুঁ, অত কমে হবে না।

তাহলে সাত হাজার। তার বেশি দিতে পারব না।

আমার পনেরো চাই।

অত দেব কোথা থেকে? আমাদের অত বেশি হয় না।

তাহলে জেলে যা।

ইসমাইলদেরও ছাড়বে?

না, ওরা কেউ ছাড়া পাবে না। ওই তিনজন তো গেছেই। তুই একা ছাড়া পেতে পারিস। এখান থেকেই সোজা বাড়ি চলে যাবি। কিন্তু আমায় পনেরো দিতে হবে।

আচ্ছা, বারো দেব। এবারের মতন এই নাও।

ঠিক আছে। বারোই পাক্কা।

কিন্তু সব টাকা তো এক্ষুনি দিতে পারব না। এখানে নেই।

এখন আমি টাকা ছোঁবোই না। তুই পালিয়েছিস শুনলে যদি আমায় সার্চ করে? আমার পকেটে টাকা রাখব না। টাকা নেব তোর বাড়ি থেকে। রাত্তিরবেলা। তখন আমার ডিউটি থাকবে না। কিন্তু সাবধান, যদি বেইমানি করিস...

ও কথা বোলো না। আমাদের কথার দাম আছে। বারো দেব বলে যখন স্বীকার পেয়েছি, তখন ঠিক বারোই দেব। শুনে নিও।

আর কেউ যেন সেখানে না থাকে। তোর দলের লোকজনদেরও দেখতে চাই না।

না গো, কেউ থাকবে না। শুধু তুমি আর আমি।

ঠিক আছে। আজ রাত্তিরে। তোর বাড়ির ঠিকানা দে।

শেফালির বাড়ি মধ্যমগ্রামে। কলোনির মধ্যে। একতলা বাড়ি, সঙ্গে অনেকটা জমি আছে। সামনে একটা দর্জির দোকান। সেটার মালিক শেফালি। লোকে ভাবে ওই দর্জির দোকান থেকেই অনেক উপার্জন।

শেফালির স্বামী নেই। এক দেওর আছে। সেই দেওরের সঙ্গে তার সম্বন্ধটা খুব পরিষ্কার নয়। তিনটি ছেলেমেয়ে, আর এক বুড়ি পিসিমা আছে, সে-ই সংসারের সব কাজকর্ম করে। শেফালির তৃতীয় বাচ্চাটির বয়েস সাড়ে তিন বছর, তার স্বামী মারা গেছে পাঁচ বছর আগে।

লালমনি দাস থাকে এই কলোনিতেই। ওই লালমনিই শেফালিকে চোরাচালানের কারবারে ভিড়িয়েছে। কখনও বাংলাদেশ থেকে আসে মানুষের বাচ্চা, কখনও এদিক থেকে যায় বুড়ো গরু।

রান্নাঘরের সামনের বারান্দায় খেতে বসেছে বাচ্চারা, এইসময় সেখানে এসে উপস্থিত হল শিশির। পুরোদস্তুর ইউনিফর্ম পরা, কোমরের বেল্টে রিভলভার। ডিউটির পরেও সে ইউনিফর্ম পরে এখানে এসেছে, তার সাহস কম নয়।

শেফালি একটা মোড়া এগিয়ে দিয়ে বলল, এসো গো, বোসো। চা খাবে?

শিশির বসল না। সে চা-ও খাবে না। তার সর্বাঙ্গে অস্থিরতা। যেন তার সময় নেই। সে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখছে।

শেফালি বেশ অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে বলল, চা খাবে না। তবে কি মাল খাবে? ভালো মাল আছে। এস্কচ।

নাঃ! বলেই শেফালির ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে রইল শিশির। তারপর হঠাৎই সবচেয়ে ছোট ছেলেটাকে কোল তুলে নিল। বাচ্চাটার খাওয়া শেষ হয়নি, দুধ-ভাতের সঙ্গে সন্দেশ মেখে দেওয়া হয়েছে তাকে, সে হাত চাটছিল। এমন সময় এই উপদ্রবে সে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল পুলিশ দেখে ভয়ও পেয়েছে

স্নেহশীল পিতার মতন শিশির তাকে নাচাতে-নাচাতে বলতে লাগল, না, না, কাঁদে না, কাঁদে না, ভয় নেই, পুলিশ দেখে ভয় পেতে নেই, পুলিশকে কেউ মানে না।

বাচ্চাটার নাক দিয়ে সিকনি গড়াচ্ছে, শিশিরের কোনও ঘেন্না নেই, সে নিজের রুমাল দিয়ে মুছে দিল। অনেকরকম সুর-করা কথায় ভোলাতে লাগল বাচ্চাটাকে। একসময় তাকে ভুলিয়েও ফেলল। লজেন্স দিল তাকে। তারপর শেফালির দিকে ফিরে বলল, ভারী সুন্দর বাচ্চাটা। এই দ্যাখো, আমাকে পছন্দ হয়েছে। কী রে, খেলবি আমার সঙ্গে?

শেফালি বলল, এবার ওকে নামিয়ে দাও। টাকাটা আমি গুনে পুঁটলি বেঁধে রেখেছি। বেশ বড় পুঁটুলি হয়েছে, কীসে নেবে?

শিশির বলল, থাক, টাকাটা আর লাগবে না। আমি তোমার এই ছেলেটাকে নিয়ে যাচ্ছি। কী রে, ঘোড়ায় চড়বি? আমি নিয়ে গেলে ঘোড়ায় চড়তে পারবি।

শেফালি বলল, এ আবার কী অলুক্ষুণে কথা!

শিশির বলল, ধরে নাও, এর দাম বারো হাজার। ওখানে সবসুদ্ধ চব্বিশটা বাচ্চার থাকার কথা। ছিল তেইশ জন। গুনতিতে মেলাতে হবে তো!

শেফালি তীব্র কণ্ঠে বলল, আমার ছেলেকে এক্ষুনি নামিয়ে দাও। ওসব ঠাট্টা শুনতে আমার ভালো লাগে না।

শিশির ঠোঁট বেঁকিয়ে হেসে বলল, তোর সঙ্গে কি আমার ঠাট্টার সম্পর্ক? পুলিশের কাজ করলে হাসি-ঠাট্টার সময়ই পাওয়া যায় না।

শেফালি বলল, আমার ছেলেকে অন্য কারুর কোলে নেওয়া আমি পছন্দ করি না। ওকে দাও, নইলে ভালো হবে না বলছি!

শিশির বলল খারাপ আর কী হবে? অ্যাঁ?

শেফালি হাত বাড়াতেই শিশির তাকে জোরে ঠেলে দিল।

শেফালির দেওর আর পিসিমা এসব শুনে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। তাদের দিকে তাকাল শিশির। তারপর রিভলভারটা খুলে ধমক দিয়ে বলল, তোমাদের এখানে কী চাই যাও, কাজে যাও...

দেওরটা মাস্তানের মতন ভঙ্গি করে বলল, ও মোশাই, এসব কী হচ্ছে? পুলিশ বলে কি মাথা কিনেছেন নাকি? আমাদেরও বড় পুলিশের সঙ্গে চেনা আছে।

শিশির বলল, আমি ছোট পুলিশ। একটা কথা শুনে রাখ। বদমেজাজি বলে আমার বদনাম আছে। যখন তখন গুলি চালাই। একটাও টিপ ফস্কায় না। তুই আর-একটা কথা বললে তোর খোপরি উড়িয়ে দেব। বড় পুলিশের কাছে যাওয়ার আগেই তুই খতম হবি!

শেফালি হাতজোড় করে বলল, দয়া করে আমার ছেলেকে ছেড়ে দাও। তোমার পায়ে পড়ি...

শিশির দরজার দিকে এগিয়ে বলল, পায়ে পড়ার কী আছে। কাল অনাথ আশ্রমে গিয়ে দেখিস আর তেইশটা বাচ্চার মধ্যে নিজেরটা চিনতে পারিস কি না। তারপর যদি প্রমাণ দিতে পারিস...

তবু শেফালি ঝাঁপিয়ে পড়ল শিশিরের পায়ে। পাগলের মতন কাঁদতে-কাঁদতে কী বলতে লাগল বোঝাই গেল না।

এক ঝটকায় নিজের পা ছাড়িয়ে নিয়ে শিশির বলল, খবরদার, আমাকে ছুঁবি না...

বাচ্চাটা কিন্তু এখন আর কাঁদছে না। কী সরল, নিষ্পাপ মুখ। এই বয়েসের সব শিশুরই মুখ যেন একইরকম। শিশির আর একবার দেখল ও পড়ে থাকা শেফালিকে। জেল খাটতে হলেও শেফালি বোধহয় কাঁদত না। আর তেইশটা বাচ্চার মা যদি কাঁদতে পারে, শেফালিই বা একটু কাঁদবে না কেন? কাঁদুক!

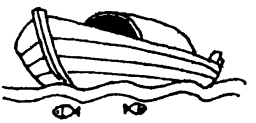

কয়েকটি দৃশ্য

চার-পাঁচজন বন্ধুর সঙ্গে গল্প করতে-করতে যাচ্ছিল তপন। বন্ধুদের মধ্যে সুকুমার বেশ কৃপণ, মহা কিপ্পুস যাকে বলে। আজ সবাই মিলে ঠাট্টা করে সুকুমারকে নাজেহাল করে তাকে দিয়ে এক প্যাকেট সিগারেট কেনানো গেছে। অনেকদিন বাদে জক দেওয়া গেছে তাকে, ওরা সবাই সদ্য সিগারেট ধরিয়েছে।

দক্ষিণ কলকাতার জলবহুল রাস্তা। অনেকরকম মানুষ। শীত শেষ হয়ে এসেছে অথচ গরম পড়েনি এখনও। বেশ ফুরফুরে মোলায়েম হাওয়া দিচ্ছে, এককালে একে বসন্তের হাওয়া বলত। এখন বসন্তের হাওয়া, ফুলের গন্ধ, জ্যোৎস্নার কথা কেউ উচ্চারণ করে না।

তন্ময় হয়ে তুমুল আড্ডা দিতে-দিতে যাচ্ছিল ওরা। হঠাৎ তপন তার বন্ধুদের বলল, তোরা এগো, আমি আসছি। চট করে তপন পাশের একটা দোকানের মধ্যে ঢুকে গেল।

একটু বাদে তপন দোকান থেকে বেরিয়ে এসে দেখল বন্ধুরা খানিকটা দূরে মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে আছে, অপেক্ষা করছে তার জন্য, চকিতে একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে তপন ফিরে এল বন্ধুদের কাছে। একজন জিজ্ঞাসা করল, কীরে, কোথায় গিয়েছিলি? তপন হালকাভাবে বলল, একটা ইলেকট্রিক হিটারের দাম জিগ্যেস করে এলাম, অনেক দিন ধরেই কেনা হচ্ছে না। অথচ দরকার।

—গুল মারিস না! দোকানে একটা মেয়েকে দেখলাম, তোর চেনা বুঝি?

—না, সত্যি বলছি—

তপন আসলে মিথ্যে কথা বলছে, দোকানের মেয়েটি অবশ্য তপনের চেনা নয়। মেয়েটির জন্যও সে যায়নি। তবে ইলেকট্রিক হিটার কেনারও কোনও দরকার নেই তার। একটু দূরে তপন একজন মাস্টারমশায়কে দেখতে পেয়েছিল। তপন এখন কলেজে পড়ে, মাস্টারমশাইটি তার পুরোনো স্কুলের। সদ্য ধরানো সিগারেটটা সে ফেলতে পারছিল না। কিন্তু মাস্টারমশাইদের মুখোমুখি পড়ে গেলে এখনও সে সিগারেট টানতে পারে না। এবং মাস্টারমশাইকে দেখে সিগারেট ফেলে দেওয়া বন্ধুদের সামনে ঠিক ফ্যাশানাবেল কি না বুঝতে না পেরেই সে পাশের দোকানে ঢুকে পড়েছিল।

তপন চেঁচিয়ে বলল, যা-যা বাজে কথা বলিস না, গোর্কি কক্ষনো এরকম কথা বলেননি।

সুকুমার বলল আলবৎ বলেছেন। তুই গোর্কির জীবনী পড়ে দ্যাখ—

—আমার ভালোভাবেই পড়া আছে, তোকে শেখাতে হবে না।

—পড়েছিস তুই? গোর্কির 'মাই ইউনিভার্সিটিজ' পড়েছিস?

—নিশ্চয়ই পড়েছি। গোর্কি তাতে বলেছেন...

তপন মিনিটপাঁচেক ধরে গোর্কির মাই ইউনিভার্সিটিজ-এর সারাংশ বলে গেল, সুকুমার স্বীকার করতে বাধ্য হল যে তপন বইটা পড়েছে। তপন অবশ্য গোর্কির এ বইটা পড়েনি, মিথ্যা কথা বলছিল। গোর্কির সম্পর্কে এর-তার কাছে যা শুনেছে, সেই ভাসা-ভাসা জ্ঞান দিয়ে কাজ চালিয়ে গেল। সুকুমারও বইটা পড়েনি। তাই তপনের কথা তাকে মেনে নিতেই হল।

*

অনেক রাত হয়ে গেছে, তপনের ঘরে আলো জ্বলছে, ঘুম আসছে না, তপনের। তার মুখখানা বিষণ্ণ। খাট থেকে উঠে এসে সে তার টেবিলে বসল। একটা কবিতার বইয়ের পাতা উলটাল কিছুক্ষণ, মন বসছে না। একটা সাপ্তাহিক পত্রিকার ধারাবাহিক উপন্যাস পড়তে আরম্ভ করেও ভালো লাগল না। সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছে! কিন্তু তার কাছে সিগারেট থাকলেও দেশলাই নেই; তপন নিজের বাড়িতে খুব সন্তর্পনে দরজা বন্ধ করে সিগারেট খায়। এখন এই রাত্রিতে সে দেশলাই খুঁজবে কোথায়?

একটা প্যাডে ডট পেন দিয়ে হিজিবিজি কাটল কিছুক্ষণ। তারপর লিখল, বনানী, তুমি আমাকে ভুল বুঝবে আমি জানতুম,...এইটুকু লিখেই ছিঁড়ে ফেলল কাগজটা। পরের পাতায় পরিষ্কার করে লিখল, বনানী, ঠিক দুঃখ আমি পাইনি, তবে মনটা খুব অসাড় হয়ে আছে। জানি আমাকে সবাই ভুল বুঝবে। তুমি নিরঞ্জনের সঙ্গে অতক্ষণ কথা বললে, ওর সঙ্গে এক বাসে উঠলে—তাতে আমার আপত্তির কিছু নেই, আমার মন অত ছোট নয়। কিন্তু আমি কাছেই দাড়িয়ে ছিলাম, তুমি যদি একবার আমার সঙ্গে এসে কথা বলতে, সেটা কি খুব দোষের হত? তুমি আমাকে যেন চিনতেই পারলে না—খ্যাঁচ করে সেই পাতাটাও ছিঁড়ে ফেলল তপন, ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেলে দিল বাইরে তারপর আলো নিভিয়ে শুয়ে রইল। জেগে রইল আরও কিছুক্ষণ।

ফুটপাথে পুরোনো দোকানে গোর্কির 'মাই ইউনিভার্সিজি' বইটা খুঁজছে তপন, তিন-চারটে দোকান ঘুরে পেয়ে গেল। বারো আনার কমে কিছুতেই দেবে না। তপনের কাছে ঠিক বারো আনা পয়সাই আছে। তপন কিনে ফেলল। বাস ভাড়া রইল না, অনেকখানি রাস্তা তাকে হেঁটে যেতে হবে।

তপনদের পাড়া থেকে বত্রিশ জন ছেলেকে পুলিশ সন্দেহ করে থানায় নিয়ে এসে জেরা করছে। টেবিলের ওপর একটা ছোট্ট লাঠি ঠুকতে-ঠুকতে ও.সি. তাকে বলল, তুমি সুবিমল দাসগুপ্ত কে চেনো না?

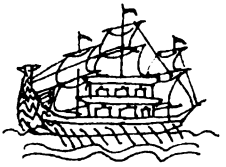

সমান্তরাল

পান্নালাল যখন ব্যাপারীগঞ্জে নামল তখনও ভোর হয়নি। ছোট স্টিমার স্টেশন। নির্জন অন্ধকার। স্টিমার যতক্ষণ রইল, সামান্য কোলাহল, তারপর স্টিমার ছেড়ে দিতেই শীতের রাতের ভারী স্তব্ধতা। সবুজ র‍্যাপারটা গায়ে ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে বিছানার বাণ্ডিল আর রংচটা টিনের সুটকেসটা তুলে নিয়ে এগুলো পান্নালাল। একটু দূরেই তার পদদা-র 'হাতে গরম কেবিন'। দিবারাত্র খোলা থাকে ঢুকল সেখানে। ছোকরা চাকরটা এক কোণে বসে দুলছে। তাকে একটা খোঁচা মারল পান্নালাল—এই, ওঠ, তারাদা কোথায় রে? ধড়মড় করে উঠে বসল চাকরটা। বিরক্তির সঙ্গে বলল, বাবু বাড়ি গেছে।

কিছু খাওয়া পাওয়া যাবে?

আজ্ঞে হ্যাঁ, রুটি, মাখন, কেক, ঘুগনি, মেটের কারি—

থাক, এক কাপ চা দে, আদা দিয়ে দিস।

ছেলেটা গিয়ে উনুনের চাকাটা খুলে ফেলল। গনগনে আগুনের লাল আভা এসে পড়ল তার মুখে। ঘরের মাঝখানে একটা হ্যারিকেন দড়িবাঁধা ঝুলছে। হাওয়ায় দুলছে সেটা। তার দীর্ঘ বিলম্বিত ছায়া এসে পান্নালালের মুখে পড়তে লাগল। বাইরে ঝিঁঝির একটানা ডাক, নদীর অস্পষ্ট শব্দ। মাঝে-মাঝে পাড় ভাঙার আওয়াজ। দূরে স্টিমারের ভোঁ-টা কেমন যেন উদাস-উদাস লাগল।

ছেলেটা চা-টা বেশ ভালোই বানিয়েছে। একটা বিড়ি ধরালে ভালো হত, কিন্তু দেশলাই নেই, উঠে গিয়ে উনুন থেকে ধরাতে ইচ্ছে করল না। এখান থেকে মাইলপাঁচেক হেঁটে যেতে হবে তার গ্রামে। রাত্তিরবেলা যাওয়াটা ঠিক নয়, রাস্তাঘাটের বদনাম আছে। ভোরের দিকেই যাব, কোমরে একবার হাত বুলিয়ে সে তার সযত্ন রক্ষিত জিনিসটা অনুভব করল। তারপর শুয়ে পড়ল অয়েলক্লথ পাতা টেবিলের ওপর মাথা রেখে। তন্দ্রার ঘোরটা বড় মধুর। পান্নালাল এসেছে বিয়ে করতে। সেই আসন্ন বিবাহের মধুর কল্পনা অন্ধকারের মধ্যে চিত্রিত হতে লাগল।

দাদা, বিড়ি খাবেন? দাদা—

চমকে উঠে বসল পান্নালাল। পাশে আর একটি লোক কখন বসেছে।

ও আপনার ঘুম এসেছিল? আমি ভাবলুম বুঝি জেগে আছেন। নেন, বিড়ি খান। এই যে দিয়াশালাই আমার সঙ্গেই আছে। দাদার বুঝি এই জাহাজেই আসা হল? আমিও একসঙ্গেই এলাম।

পান্নালাল বিড়িটা ধরিয়ে লোকটার দিকে ভালো করে তাকাল। রোগা চেহারা, দুটি শীর্ণ চক্ষু কোটরের মধ্যে জ্বলজ্বল করছে। মুখটা কেমন যেন ছুচোলো। একটা নস্যি রঙের ছেড়খোঁড়া র‍্যাপার জড়িয়েছে গায়ে।—তা, আপনাকে তো ইস্টিমারে দেখলাম না—! পান্নালাল প্রশ্ন করল।

হেঁ-হেঁ, একটু আড়ালে আড়ালেই ছিলাম। মানে ইয়েতে এলাম কিনা! লোকটা ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা তুলে দেখাল। তা, দাদার যাওয়া হবে কোথায়?

পুব কুশুলেশ্বরী।

আমার ধূলগাঁও। তবে তো আমাদের পাশাপাশি গেরাম। আর দেরি করা কীসের, চলেন যাই।

পান্নালাল একটু গাইগুঁই করল। ভোর ভোরই যাব। রাস্তাঘাট তো তেমন ইয়ে না। লোকটা আবার হেসে উঠল। আমরা জোয়ান মানুষ যাব—আমাদের ভয় কী? আর সঙ্গেও কী বা হাতি ঘোড়া আছে? এবার পান্নালালকেও একটু শুকনো হাসি হাসতে হল।—হ্যাঁ, সঙ্গে আবার কী আছে! চলুন যাই, পান্নালাল অলক্ষে একবার কোমরে হাত দিয়ে দেখে নিল ঠিক আছে কি না!

দুপাশে অন্ধকার সমুদ্রের মতো মাঠ। মাঝ দিয়ে উঁচু রাস্তা। মাঝে-মাঝে দু-একটা নিঃসঙ্গ গাছ গুরুমশাই-এর কাছে শাস্তি-পাওয়া ছাত্রের মতো এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাথার ওপর অস্পষ্ট নীল শীতের আকাশ। মায়ের স্পর্শের মতো মিষ্টি প্রথম শীতের হাওয়া। দূর থেকে একটা রাত জাগা পাখির ডাক ভেসে এল। আর নদীর শব্দ।

পথ চলতে-চলতে পান্নালাল সঙ্গের লোকটার কাছে অনেক কিছু বলে ফেলল। বছরপাঁচেক একেবারে দেশে আসেনি পান্নালাল। কলকাতায় প্লাস্টিকের কারখানায় কাজ করে। এবারে এসেছে গাঁয়ে, মা-বাবা খুব ধরেছেন, বিয়ে করতে হবে। পাত্রী তাদেরই পাশের বাড়ির মেয়ে—হ্যাঁ, সুন্দরী বটে, যেমন রং, তেমন...

লোকটা এতক্ষণ মনোযোগ দিয়ে শুনছিল, হঠাৎ বলল, আপনি একটু দাঁড়ান, আমি একটু পেচ্ছাপ সেরে আসি। বাক্স-বিছানা হাতে ভূতের মতো দাঁড়িয়ে রইল একা। গা-টা একটু ছমছম করতে লাগল। লোকটা এত দেরি করে কেন?

কোথায় হে, হল তোমার?

এই যে রে, এই যে! আয়। ভীষণ গলায় লোকটা পিছন থেকে চেঁচিয়ে উঠল। ঘুরে তাকে দেখেই পান্নালালের বুক কেঁপে উঠল। র‍্যাপারখানা খুলে সে কোমরে বেঁধেছে, চোখদুটো জ্বলছে, ডান হাতে মস্তবড় একখানা হাঁসুয়া। সে হাঁসুয়াখানা তুলতেই পান্নালাল বাঁ-হাত দিয়ে তাকে ঠেকাল, সঙ্গে চিৎকার করে উঠল প্রাণপণে।

-চিল্লা শালা, যত পারিস চিল্লা, এই মাঠে শুনবেই বা কে, আর বউ-বিছানা ফেলে উঠে আসবেই বা কে? লোকটা আরও কয়েকবার হাঁসুয়া চালাল, পান্নালাল আর দাঁড়াতে পারল না। মাটিতে পড়ে গেল, কিন্তু তখনও চিৎকার করতে লাগল। লোকটা ধীরে-সুস্থে পান্নালালের বাক্স-বিছানা নিয়ে চলে গেল।

ক্রমে ভোর হল। সমুদ্রের মধ্য থেকে রক্তবর্ণ সূর্য লাফিয়ে উঠে আকাশপথে যেতে-যেতে এই মাঠের মাঝখানে এসে থমকে গেল। চাপ-চাপ রক্তের মধ্যে পান্নালাল দুমড়ে বেঁকে শুয়ে আছে! ক্ষীণস্বরে শুধু বলছে, জল, জল!

আস্তে-আস্তে লোক জমল। কাছেই মুসলমানপাড়া। সবাই এসে দূরে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ সামনে আসছে না ভরসা করে। কিছুদিন আগে এখানে দাঙ্গা হয়ে গেছে। যে আগে গিয়ে লোকটাকে ছোঁবে তাকেই যদি পুলিশ আসামি বলে ধরে? পান্নালাল শুধু ঘড়ঘড় করে বলতে লাগল, জল, জল।

এমনসময় ভিড় ঠেলে এসে দাঁড়াল আকবর আলি। দড়ির মতন পাকানো চেহারা, বয়েস বছর পঞ্চান্ন, মুখভরতি চাপ-চাপ দাড়ি, বাঁ-হাতখানা কনুই থেকে কাটা। একসময়ে এ তল্লাটে বিখ্যাত ডাকাত ছিল। দশ বছরের মেয়াদ খেটে মাসতিনেক আগে মাত্র ছাড়া পেয়েছে। এখন আর ডাকাতি করার সামর্থ্য নেই। ব্যাপার দেখে সে ভয়ানক রেগে গেল। এক চোট গালাগালি দিল ভিড় করে দাঁড়ানো লোকগুলোকে।—কী শরমের কথা, একটা লোক পানি চাইছে, তোরা দিতে পারলি না। শালা, মুরগিগুলোকে জবাই করার আগেও তো একটু পানি দিস। ঠিক আছে, আমি আছি জেলখাটা ডাকু, আমার ডর নেই কিছু। পান্নালালের র‍্যাপারটার একটা পাশ সামনের ডোবা থেকে ভিজিয়ে এনে একটু-একটু করে জল নিঙরে দিতে লাগল ওর মুখে। পান্নালালের বাঁ-হাতখানা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পাশে পড়ে আছে, ডান হাতখানাও ঝুলছে, মুখে-বুকে কোপ লেগেছে। তবুও জান বটে পান্নালালের। ফিসফিস করে বললে, আমার বাড়িতে খবর দাও, পুব কুণ্ডুলেশ্বরীর নেত্য সরকার আমার বাপ।

খানিক বাদে পুলিশ এসে পড়ল। পান্নালালের তখনও জ্ঞান আছে, সে বলল, যে মেরেছে তাকে আমি একবার দেখলেই চিনতে পারব। হাসপাতালে পান্নালালের সামনে সারবন্দি হয়ে দাঁড়াল জন চোদ্দো দাগি আসামি। প্রথমেই একেবারে আকবর আলি। কিন্তু পান্নালাল ওর দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, না, না, ও নয়। ও তো আমায় জল দিয়েছে। যে মেরেছে, তার দুটো হাতই ছিল। একে-একে অন্য আর সবকটাকেও দেখানো হল, কেউ নয়। যে মেরেছে, সে তাহলে নতুন মানুষ, ঝোপ বুঝে কোপ মেরেছে। পান্নালাল বিড়বিড় করতে লাগল, বাড়িতে খবর দাও, বাড়িতে খবর দাও।

দাগি আসামিরা সব চলে গেল, শুধু আকবর আলি একা এককোণে দাঁড়িয়ে রইল। তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখছে পান্নালালের দিকে, চোখটা কেন যেন ঝাপসা হয়ে আসছে। এই এক রোগ হয়েছে আজকাল। অন্য মানুষের দুঃখু দেখলে আজকাল চোখে জল আসে। কোথায় কে মরল-গেল, তাতে আমার কী রে শালা! আর আমি তো মারিনি! নাঃ জেলের ভাত খেয়ে-খেয়ে তার আর শরীর মনের কিছুই অবশিষ্ট নেই। না হলে সেই বাঘের বাচ্চা আকবর আলি, যার নামে একসময় মায়েরা ছেলেদের ভয় দেখিয়ে ঘুম পাড়াত, তার আজ রক্ত দেখে চোখে জল আসে। মনে পড়ল, নলডাঙার

চৌধুরীদের বড়ছেলের মুন্ডুটা কী করে তার হাতের খাঁড়ার এক ঘায়ে ছিটকে পড়েছিল। আর পটুয়াখালির মুখুজ্যেদের নতুন জামাইয়ের। মানুষ মারা ছিল তখন ছেলেখেলা। মহকুমা সদরের ট্রেজারি লুট করতে গিয়ে ধরা পড়ল শেষবার। বাঁ-হাতখানায় গুলি লেগেছিল, পচতে-পচতে শেষপর্যন্ত কনুই থেকে বাদ দিতে হল। তারপর জেলের মধ্যে হল টাইফয়েড, শরীর থেকে সমস্ত রস নিঙরে বার করে নিল, পড়ে রইল আখের ছোবড়ার মতো শুকনো দেহটা। টাইফয়েডের পর অন্য মানুষ হয়ে গেছে আকবর আলি, মাথারও গোলমাল হয়ে যায় মাঝে-মাঝে। সাধারণ সংসারী মানুষের মতো সামান্য দুঃখ-কষ্টও আজকাল সইতে পারে না।

এমনসময় পান্নালালের বাপ-মা, আরও সব এসে ঢুকল। সকলে মিলে কথা বলে চিৎকার করে একটা কান্নার হট্টগোল বাধিয়ে দিল। হাহা করে জনদুয়েক নার্স ছুটে এল, বেশি কথা বলা একেবারে বারণ, তাহলে রোগীকে বাঁচানো যাবে না। পান্নালাল শুধু মাকে ফিসফিস করে বলল, আমি তো বাঁচবই না মা, তুমি কাল বরং পাখিকে একবার পাঠিয়ে দিও, শেষ দেখাটা করে যাই। শুনে মা আরও কেঁদে উঠল।

ততক্ষণে আকবর আলি ঘরের এককোণে বসে পড়েছে। বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে আজকাল তার পা টনটন করে। খানিক বাদে হাসপাতালের সুপারিন্টেন্ডেন্ট এসে ধমকে উঠল, 'এই নুলো, তুই এখানে কেন, ওঠ। নুলো! মনে-মনে হাসল আকবর আলি। সেই পুরোনো আকবর আলিকে বোধহয় দেখেনি এই ছোকরাবাবু। জানে না, তার দু-হাতেই সমানভাবে লাঠি-তলোয়ার ঘুরত। তবু অনুনয়ের হাসি হেসে বললে, বাবু, আমাকে এখানেই থাকতে দিন—আমি একটু দাদাঠাকুরের সেবা করি, শেষ বয়েসে একটু পুণ্যি করি।

কী ভেবে সুপারিন্টেন্ডেন্ট ওকে আর কিছু বললেন না। পরদিন বেলা এগারোটার সময় ঝড়ের মতো একটি মেয়ে এসে ঢুকল পান্নালালের ঘরে। এই মেয়েটিই পাখি অর্থাৎ শ্রীমতী পটেশ্বরী দাসী। পান্নালালের সঙ্গে বিয়ের কথা ছিল পাখির—পাশাপাশি বাড়ি দুজনের, ছেলেবেলার সাথী। পাখি এসে কোনওদিকে না চেয়ে পান্নালালের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগল ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে। পান্নালাল একটু সময় চুপ করে রইল, তারপর ক্ষীণকণ্ঠে বলল, ওঠ, পাখি লাগে। বুকে লাগে।

উঠে বসল পাখি। শ্যামল রং-এর মেয়ে। দুই গাল দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে, টানাটানা দুটো চোখ কেঁদে লাল হয়ে গেছে, বোধহয় কাল সারারাত কেঁদেছে। আঁট-সাঁট গড়ন, কাপড়-চোপড়ের দিকে দৃষ্টি নেই, যেন সমস্ত লজ্জা-ভয় পিছনে ফেলে রেখে এসেছে। পান্নালাল বললে, আমার বুকে একটু হাত বুলিয়ে দে। সর্বাঙ্গে বিষের মতো ব্যথা। সারা বুক জুড়ে ব্যান্ডেজ, কোথায় হাত বুলোবে পাখি? আলতো করে হাত ছুঁইয়ে কোমরের কাছে এনে হাতটা রাখল। হাতে কী যেন শক্ত মতো ঠেকল। পান্নালাল একবার একদৃষ্টে তাকাল কোণে বসা আকবর আলির দিকে। আকবরের চোখে সে কী দেখল কে জানে, মুখ ফিরিয়ে পাখিকে বলল, আমার কোমরে একটা মোজা বাঁধা আছে, খোল! ওর মধ্যে চারশো সাতান্ন টাকা আছে। তোর নাম করে জমিয়ে ছিলাম। তোকে না দিয়ে পারি না, তুই নে। খুনেটা এ টাকার খোঁজ পায়নি।

পাখি এবার শব্দ করে কেঁদে উঠল। বলল, কী হবে তোর টাকায়? তুই মরলে আমি বাঁচব না। পান্নালাল একটু চুপ করে থেকে বলল, না, তুই মরবি কেন, তুই বাঁচবি, তোর আবার বিয়ে হবে। কথা শেষ করে একটু হাসতে গেল পান্নালাল, পারল না, চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল।

ওদিকে আকবর আলির চোখ দিয়ে জল পড়ে-পড়ে ছেঁড়া ফতুয়াটা একেবারে ভিজে গেছে। এত জল তার চোখে এল কোথা থেকে। যৌবনে সে কখনও এক ফোঁটা চোখের জল ফেলেছে বলে মনে পড়ে না, তখন শুধু আগুন বেরুত। বোধহয় সেইসব জমানো কান্না এখন বের হচ্ছে সত্যি টাইফয়েডের পর সে একেবারে খাঁটি সংসারী মানুষদের মতো হয়ে গেছে। অতগুলো টাকা দেখেও লোভ হল না। কিন্তু সারা জীবনে এমন দৃশ্য কখনও দেখেনি আকবর আলি। প্রেমিক-

প্রেমিকার এমন বিচিত্র মিলনের দৃশ্য!

পাখিকে জোর করে নিয়ে যাওয়ার পরই পান্নালালের শ্বাসকষ্ট উঠল। তার পরদিন ভোরবেলা সে মারা গেল। মরবার আগে সে শুধু অস্ফুটস্বরে পাখি, পাখি বলেছে। কোনও ঠাকুর দেবতার নাম মুখে আসেনি।

আকবর আলির চোখে আর জল নেই। অমানুষিক চেষ্টা করেও বাঁচানো গেল না পান্নালালকে। হাসপাতাল থেকে যখন বেরুল, তখন তার মূর্তি দেখে যেসব ছোট-ছেলেরা তাকে 'নুলো আকবর' বলে ডাকত তারা চুপ করে রইল। কাটা হাতখানা শক্ত করে বুকের ওপর রাখা, শরীরের সমস্ত শিরাগুলো ফুলে উঠেছে। রুক্ষ চুল-দাড়ি—দু-দিন রাত্রি জাগরণে দু-চোখ লাল। আবার একবার তাকে ফিরে যেতে হবে পুরোনো দিনে। শেষবার।

অনেকদিন বাদে। সে গেল পুরোনো চোর-ডাকাতদের আড্ডায়।

জেল থেকে বেরিয়ে এসে এসব সংস্রব সে একেবারে ত্যাগ করেছিল। দলের লোকদের সে লোহার মতো ঠান্ডা গলায় বলল, কলকাতার ছোকরাবাবুকে কে মেরেছে রে? সরেস হাত তার। সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল! কে মেরেছে কে জানে!

একজন শুধু বলল, বোধহয় খালপাড়ের ইউসুফ। তার ঘরে দেখলাম নতুন স্যুটকেস, বিছানা। খালের জলে দেখলাম পরশু রাতে হাঁসুয়া ধুচ্ছে!

সেখান থেকে বেরিয়ে এল আকবর। এল তার নিজের বাড়িতে। বাড়ি আর কী...শুধু ঝোপ-জঙ্গলে ভরা ভিটেটুকু। জেল থেকে ফিরে এসে দেখে শরিফনকে কারা নিয়ে পালিয়েছে। কেউ বলতে পারে না তার খবর। ঘরের দরজা-জানলা-চাল সব গেছে পাড়াপড়শীর উনুনে। তবুও তার মধ্যেই ঝোঁপজঙ্গল একটু পরিষ্কার করে থাকার জায়গা করেছিল আকবর।

ঘরে এসে মুখের পেশি শক্ত হয়ে উঠল আকবরের। এখনও তার দেহে একটু শক্তি আছে। এখনও সে পারবে পান্নালালের মৃত্যুর শোধ নিতে। সে তার ঘরের ভিতের মাঝখানটা খুঁড়তে লাগল। হাতখানেক গর্ত করে তার মধ্যে থেকে টেনে তুলল এক হাত লম্বা একটা ভোজালি। তার কতকালের জিনিস! কত প্রিয় হাতিয়ার! এই অস্ত্রে সে সবজায়গায় জিতেছে। অস্ত্রখানা কোমরে গুঁজে সে তখুনি বেরিয়ে পড়লো। কাজ আগে সেরে রাখা ভালো। খালপাড়ের ইউসুফের বাড়িতে এসে ডাকল তাকে।

ঘর থেকে বেরিয়ে এলো ইউসুফ। সেদিনকার রাত্রির সেই লোকটা! আকবরকে দেখে বলল, সালাম আলেকুম, সর্দার, বার্তাটা কী কন!

আলেকুম সালাম, প্রত্যুত্তর দিল আকবর আলি, তোমার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে।

কীসের কথা? ইউসুফের চোখে কুটিল সন্দেহ।

কেন, ভাইবেরাদরের সঙ্গে একটু বাতচিতও কি করতে পারব না?

ঘর থেকে বেরিয়ে এলো ইউসুফ, কোচড়ভরতি তার মুড়ি। চলতে-চলতে আকবর তাকে জিগ্যেস করল, কাজকারবার কেমন?

কোথায় আর কাজকর্ম! পরপর দু-বার বানের জলে সমস্ত ফসল ভেসে গেল। জোয়ান মানুষ, পেটের ভাত তো চাই! কোথা থেকে পাব তা...

আকবর তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল তার দিকে। এই সেই লোক, চিনতে ভুল হয়নি।

ইউসুফ বাড়ির পাশের লঙ্কা আর ঢ্যাড়শ গাছে জল দিল। তারপর বলল, সর্দারের কথাটা কী, তা তো শোনা হল না।

হবে-হবে, চলো একটু নিরিবিলিতে...তিনযুগী বটতলায়।

ইউসুফের বাড়ির পিছনে পুকুর। সামনে খাল। পুকুরে ঘাটে নেমে ইউসুফ হাত দিয়ে জলের ওপর একটা অদ্ভুত শব্দ করতে লাগল। সেকালের বিরাট মজা পুকুর। খানিকটা বাদেই দুটো বিরাট শ্যাওলা পড়া শোল মাছ এল ঘাটের কাছে। ইউসুফ মুড়িগুলো ছড়িয়ে দিল জলে। তারপর আর

একমুঠো মুড়ি হাতে নিয়ে, আ-তু বলে ডাকতে লাগল। কোথা থেকে একটা কালো রোগা কুকুর ছুটে এল। তার সামনে মুড়িগুলো দিয়ে বলল ইউসুফ, আজ সাতদিন পর প্রাণীগুলোকে খেতে দিলাম। তা আমরাই বলে খেতে পাইনি, তা জীবজন্তু।

আকবর আলি দেখছে আর মনে-মনে হাসছে। একটু পরেই তো তোর সব সম্পর্ক ঘুচে যাবে এদের সঙ্গে...যেমনভাবে তুই পান্নালালের সঙ্গে পাখির সম্পর্ক ঘুচিয়েছিস।

জারুল গাছের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে দেখতে পেল একটি মেয়ে নীচু হয়ে শুকনো পাতা কুড়োচ্ছে। দশ-এগারো বছর বয়েস...দেখতে অনেকটা শরিফনেরই মতো, আকবর আলি ভাবল। মেয়েটি মুখ তুলে ইউসুফকে দেখে বলল, বাজান, এখন আবার যাস কোথায়। আজ অনেকদিন বাদে ভাত খাব...গরম গরম...খাল থেকে আমি চাঁদা মাছ ধরেছি।

একটু সবুর করিস...আমি আসব এখনই।

খালপারে গিয়ে তিনযুগী বটতলায় দাঁড়াল দুজন। ইউসুফের দিকে একবার তাকাল আবকর আলি। এখন যেন নিজেকে আবার ভয়ানক দুর্বল লাগছে। ইউসুফের কোটরাগত চক্ষুদুটোতে যেন ভাত খাওয়ার আনন্দ চকচক করছে। সব শেষ করে দেবো! কুকুরটা কোথা থেকে এসে আবার লেজ নাড়ছে। যা...যা...বলে ওকে তাড়াবার চেষ্টা করল, ওর সামনে যেন কেমন লজ্জা লাগছে আকবরের। আর ইউসুফের দুধের মেয়েটা...বাপ মরলে ওর কী হবে? শেষে কি ও-ও শরিফনের মতো...

আকবর মনস্থির করে কোমর থেকে ভোজালিটা বের করল। সেটা দেখেই ইউসুফ 'ইয়া আল্লা' বলে চমকে দৌড়বার চেষ্টা করল।

আরে পালাস কোথা, ভয় নেই দাঁড়া, কথা আছে...

ইউসুফ একটু দূরে ভয়ে-ভয়ে দাঁড়াল। আকবর একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল অস্ত্রটার দিকে। আবেগে তার হাত কাঁপছে। সেটা ইউসুফের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, ইউসুফ ভাই, এটা ঘরে থাকলে আমার বড় যন্ত্রনা, হাত নিশপিশ করে, মাঝে-মাঝে মানুষ মারবার জন্য। তাই এটাকে এবার বিদায় দেব, কিন্তু নিজের হাতে তো ফেলতে পারিনা, মায়া লাগে, পুরোনো বান্ধব, তুই এটাকে হাতে করে ফেলে দে!

ইউসুফ অস্ত্রটা হাতে নিয়ে নির্বোধের মতো তাকিয়ে রইল।

দে, প্রাণপণে মাঝদরিয়ায় ছুড়ে ফেলে দে!

একটু ইতস্তত করে ইউসুফ সেটাকে ছুড়ে দিল খালের মাঝখানে। ঝুপ করে একটা আওয়াজ হল। কয়েকটা তরঙ্গ উঠে পারের কাছে আসবার আগেই ভেঙে গেল। চারদিকে আর কোনও চাঞ্চল্য নেই, পরিবর্তন নেই। পাশের বাঁশবন থেকে হাওয়ার শব্দ ভেসে আসতে লাগল, একটা গাঙশালিক ডেকে উঠল, তিনযুগের সাক্ষী বিশাল বটগাছটা নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, কেউ জানল না, কত শোক, অশ্রু, হিংসার ইতিহাস শেষ হল। এইমাত্র পৃথিবীতে কী নিদারুণ একটি ঘটনা হতে-হতে নিবৃত্ত হল। কেউ জানল না।

আকবর আলি একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলল। তারপর বলল, চল ইউসুফ, তোর মেয়ের রাঁধা ভাত দুজনে মিলে ভাগ করে খাব আজ...



প্রবাসী

ট্যাক্সিতে হেলান দিয়ে বসে সুরঞ্জন একটা বই পড়ছিল। বইটা এতই আকর্ষণীয় যে সারাদিন সে সেটাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরছে, একটু সময় পেলেই পড়ে নিচ্ছে কয়েক পাতা। এবং পড়তে শুরু করলেই গভীর মনোযোগ এসে যায়।

এখনও সে বেশ মনোযোগ দিয়েই পড়ছিল, তবু যে কেন হঠাৎ চোখ তুলে জানলার বাইরে তাকাল—সে নিজেই জানে না। সম্ভবত পুলিশের হাতের সামনে ট্যাক্সিটা অনেকক্ষণ থেমে থাকায় একটু অস্বস্তি বোধ করছিল, কিংবা এমনিই মানুষের চোখ মাঝে-মাঝে রাস্তার দিকে যায়।

কাছেই বাস-স্টপে যে মেয়েটি পাশ ফিরে দাঁড়িয়ে আছে, তাকে দেখে মনে হয় টুলটুলের সঙ্গে বেশ মিল আছে, সেই রকমই লম্বা, মুখের পাশটাও একরকম।

এমনসময় পুলিশের হাত নামল, ট্যাক্সিটা এগিয়ে গেল সামনের দিকে।

সুরঞ্জন যে-বইটা পড়ছিল, সেটার কথা মাথার মধ্যে ঘুরছে, টুলটুলের মতন চেহারার মেয়েটিকে দেখে টুলটুলের কথাও মনে পড়ল—এই দুরকম ব্যাপার একসঙ্গে জট পাকিয়ে যাওয়ায় তার চিন্তা স্বচ্ছ হতে একটু দেরি লাগল।

ট্যাক্সিটা একটু দূরে এগিয়ে যাওয়ার পর বিদ্যুৎচমকের মতন তার মনে হল, যে মেয়েটিকে টুলটুলের মতো দেখতে—সে যদি সত্যিই আসলে টুলটুল হয়?

সঙ্গে-সঙ্গে সে ড্রাইভারকে বলল ট্যাক্সি ঘোরাতে। কিন্তু এসপ্ল্যানেডে অত সহজে ট্যাক্সি ঘোরানো যায় না। ড্রাইভার সেই মর্মে বিরক্তিসূচক কোনও মন্তব্য করায় সুরঞ্জন সেইখানেই ভাড়া মিটিয়ে নেমে পড়ল। তারপর দ্রুত হেঁটে ফিরে এল পেছন দিকে।

মেয়েটি এর মধ্যে বাসে উঠে চলে যেতে পারত, কিন্তু যায়নি। একটি লম্বা চুলওয়ালা খুব বুদ্ধিমান চেহারার যুবকের সঙ্গে কথা বলছে। যুবকটির ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয়, সে যখন-তখন এই গোটা পৃথিবীটাকে কিনে আবার বিক্রি করে দিতে পারে।

কাছাকাছি এগিয়ে সুরঞ্জন বুঝতে পারল, মেয়েটি সত্যিই টুলটুল নয়, তার ছোটবোন তাতা।

এমনিতেই টুলটুল আর তাতার চেহারার কোনও মিল নেই। পাশাপাশি দাঁড়ালে মনে হবে দুটি আলাদা চেহারা ও চরিত্রের মেয়ে। টুলটুলের মুখখানা গোল ধাঁচের, তাতার মুখখানা লম্বাটে। কিন্তু এক মায়ের পেটের ভাইবোনদের চেহারার মধ্যে কোথায় যেন একটা সূক্ষ্ম মিল থেকে যায়—কোনও একটা বিশেষ অ্যাঙ্গেল থেকে হঠাৎ একরকম মনে হয়। ট্যাক্সির জানালা থেকে সুরঞ্জন যে মিলটা খুঁজে পেয়েছিল, এখন আর সেটা পাচ্ছে না।

এগিয়ে গিয়ে তাতার সঙ্গে কথা বলতে তার লজ্জা করে। তাতার সঙ্গে একজন বন্ধু রয়েছে। তাতার বন্ধুটি হাত-পা নেড়ে এমন ভাবে কথা বলছে যেন দুনিয়ার কারুকেই সে গ্রাহ্য করে না। ছেলেটি নিশ্চয়ই বেকার—তাই ওর চোখের সামনে এখনও অনেক স্বপ্ন আছে।

সুরঞ্জন তাতার কাছ থেকে টুলটুলের খবরটা জেনে যেতে চায়। টুলটুল তার স্বামীর বাড়ি থেকে রাগ করে কোথায় যেন চলে গিয়েছিল, ফিরেছে কি? অবশ্য টুলটুলের ফেরা-না-ফেরায় সুরঞ্জনের কিছু যায় আসে না। টুলটুল এখন অন্য জগতের মানুষ। তবু পুরো ঘটনাটা জানার জন্য

সবারই কৌতূহল থাকে।

সুরঞ্জনের তো হাতে কোনও কাজ নেই, সে তার হোটেলেই ফিরছিল—এখানে একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে ক্ষতি কী?

সুরঞ্জনকে অবাক করে দিয়ে তাতার ছেলে-বন্ধুটি হঠাৎ দৌড়ে একটা বাসে উঠে পড়ল। ভিড়ের বাসের পা-দানিতে একলাফে উঠে হ্যান্ডেল ধরে আর-একটা হাত নেড়ে দিল তাতার দিকে। সুরঞ্জন ভেবেছিল, ওই ছেলেটিই তাতাকে আগে বাসে তুলে দেবে, কিংবা একসঙ্গেই দুজনে যাবে। তাদের বাল্যকালে কোনও ছেলে কোনও মেয়েকে একলা ফেলে রেখে নিজে আগে বাসে ওঠার নিয়ম ছিল না। এখন নিয়ম-কানুন অনেক বদলে গেছে।

সুরঞ্জন কাছে এগিয়ে এসে বলল, তাতা, তুমি এখানে?

তাতা সুরঞ্জনকে দেখে চমকাল না, খুশি হল না, বিব্রতও বোধ করল না। এত কম বয়সেই তাতা এমন একটা রহস্যময় ব্যক্তিত্ব অর্জন করে ফেলেছে যে সুরঞ্জনের কাছে ওকে খুব অপরিচিত মনে হয়। শেষবার কলকাতায় সুরঞ্জন তাতাকে দেখে গিয়েছিল একটি বারো বছরের ছটফটে মেয়ে—যেমন সরল, তেমনি দুরন্ত। সে এখন অনেক বদলে গেছে।

তাতা বলল, ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরছি বাসে উঠব।

এদিক থেকে?

এদিকে আমার এক বন্ধুকে হাওড়ার বাসে তুলে দেওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে ছিলাম। এবার ওদিকে যাব।

টুলটুলের খবর কী?

জানি না তো! এ ক'দিন আর অমিতদাদের বাড়িতে যাইনি।

ফিরে এসেছে কি না তাও জানো না?

হ্যাঁ, তা জানি। ফেরেনি।

কী নিশ্চিন্তভাবে কথা বলে তাতা। তার নিজের দিদি সম্পর্কেও একটুও চিন্তা নেই—এইটাই কি আজকালকার নিয়ম? বাবার অমতে বিয়ে করেছিল বলে টুলটুল আর বাপের বাড়িতে আসে না। এদিকে স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে সে কোথায় চলে গেছে। দু-বাড়ির মধ্যে যোগসূত্র শুধু তাতা—কিন্তু এ ব্যাপারে সে যেন মাথাই ঘামাতে চায় না। তার দিদি নিরুদ্দেশ—অথচ সে এখানে তার ছেলে-বন্ধুর সঙ্গে হেসে-হেসে গল্প করছিল।

আগের দিন যখন তাতার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তখন তাতা বলেছিল, ছোড়দি নিশ্চয়ই যা ভালো বুঝেছে, তাই করেছে! ছোড়দি তো আর ছেলেমানুষ নয়।

কিন্তু মেয়েদের যা-খুশি করার স্বাধীনতার সঙ্গে-সঙ্গে যে একটা বিপদের আশঙ্কাও থাকে, তা কি ও বোঝে না?

সুরঞ্জন বলল, তাতা, তোমাকে কি এক্ষুণি বাড়ি ফিরতে হবে? কোথাও বসে একটু চা খেতাম।

তাতা একটুক্ষণ দ্বিধা করে। তারপর বলে, আচ্ছা চলুন।

স্পষ্টই বোঝা যায়, তাতার ইচ্ছে নেই। নিছক ভদ্রতার জন্যই সে প্রত্যাখান করল না। এ-ব্যাপারটা বুঝেও সুরঞ্জন তাতাকে ছাড়তে চাইল না। সন্ধ্যাবেলাটায় সে একেবারেই একা—কথা বলারও কেউ নেই।

কোন দোকানে যাওয়া যায় বলো তো? পার্ক স্ট্রিটে যাবে?

কেন, এই তো সামনেই দোকান আছে একটা।

অর্থাৎ তাতা ব্যাপারটা সংক্ষেপে সেরে ফেলতে চায়। পার্ক স্ট্রিটে যেতেও তো সময় লাগবে। আর, পার্ক স্ট্রিটের কোনও দোকানেই শুধু এক কাপ চা পাওয়া যায় না।

রাস্তা পেরিয়ে এসে ওরা একটা চায়ের দোকানে ঢুকল, বাইরে কিছু টেবিল রয়েছে, কয়েকটা

পরদা-ঢাকা ক্যাবিন। সুরঞ্জনের সঙ্গে একটি মেয়ে রয়েছে বলেই বেয়ারারা একটা খালি ক্যাবিনের পর্দা তুলে ধরে বলল, আসুন, এখানে আসুন।

সুরঞ্জন একটু ইতস্তত করে তাতার মুখের দিকে তাকাল। তাতা বেশ সহজভাবেই বলল, বাইরেই বসি, ভেতরে বড্ড গরম।

সুরঞ্জন সঙ্গে-সঙ্গে বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাইরেই ভালো।

কোণের একটা ফাঁকা টেবিলে বসল দুজনে। তাতা রুমাল দিয়ে মুখ মুছল। তাতার বাইশ বছরের সুশ্রী মুখখানি ঝকঝক করছে। সব সময়েই সে সপ্রতিভ। রেস্টুরেন্টে কোনও মেয়ে এসে বসলেই অন্যরা তার দিকে চোরা চোখে তাকায়। তাতা সে ব্যাপারে ভ্রূক্ষেপও করে না।

মেনু কার্ডটা হাতে নিয়ে সুরঞ্জন জিগ্যেস করল, তুমি চা খাবে, না ঠান্ডা কিছু নেবে? এখানে আইসক্রিমও পাওয়া যায়।

শুধু চা।

সঙ্গে আর কিছু?

না।

সুরঞ্জনের মনে পড়ল, বাচ্চা বয়েসে তাতা আইসক্রিম খেতে দারুণ ভালোবাসতো। এখন কি সে-কথা ওকে মনে করিয়ে দেওয়া যায়? আরও অনেক কিছুই মনে করিয়ে দেওয়া যায় না—যেমন, তাতার হাত দিয়ে টুলটুলকে একটা বই পাঠানোর সময় সুরঞ্জন তার মধ্যে একটা চিঠি ভরে দিয়েছিল।

হঠাৎ বইটা খুলে চিঠিটা দেখেই বলেছিল, এটা কার চিঠি। সুরঞ্জন তো দারুণ লজ্জা পেয়েছিলই—ভয়ও পেয়েছিল পাছে অন্য কেউ শুনতে পায়। টুলটুলের সঙ্গে রোজ দেখা হলেও সুরঞ্জন তাকে মাঝে-মাঝে এরকম ভাবে চিঠি পাঠাত, এর একটা আলাদা রোমাঞ্চ আছে।

সুরঞ্জনকে ভয় পেতে দেখেই তাতা আরও মজা পেয়ে গিয়েছিল। ছেলেমানুষি করে বলেছিল, কার চিঠি? কার চিঠি?

সুরঞ্জন যতই কাকুতি মিনতি করেছে, তাতা তত বেশি জোরে-জোরে বলেছে।

দশ বছরে অনেক কিছুই বদলে যায়। তাতার কি মনে আছে সে কথা? এখন তার নির্লিপ্ত গম্ভীর মুখ দেখে কিছুই বোঝা যায় না। এখন টুলটুলও এক আর্টিস্টকে বিয়ে করে অন্যরকম হয়ে গেছে।

সুরঞ্জন নিজেও যে অনেক বদলে গেছে—সেটা তার মনে নেই। সে তাতাকে দেখছে কখনও ছেলেমানুষি চোখ দিয়ে—তাতার যে-কোনও ব্যবহার দেখেই তার তুলনা করতে ইচ্ছে করছে আগেকার দিনগুলোর সঙ্গে। কিন্তু তাতার জীবন এখন অন্যরকম—তার সঙ্গে আগেকার জীবনের কোনও যোগ নেই।

সুরঞ্জন কীভাবে কথা শুরু করবে বুঝতে পারছে না। তাতা নিজেই জিগ্যেস করল, আপনি কি আরও কিছুদিন এখানে থাকবেন?

সুরঞ্জন বহুদিন কলকাতা-ছাড়া। অফিসের কাজে এখানে এসেছে।

তাতার প্রশ্ন শুনে তার মনে হল, সে তাড়াতাড়ি চলে গেলেই কি তাতা খুশি হয়? হঠাৎ একথা জিগ্যেস করছে কেন?

অবশ্য এরকম মনে করার কারণ নেই। তার থাকা-না-থাকায় তাতার কী আসে যায়? তবু যারা এরকম বড় শহরে একলা হোটেলে থাকে—তাদের মনের মধ্যে এরকম অভিমান জন্মাতেই পারে। বিশেষত, এককালে এই শহরে সুরঞ্জনের মা-বাবা আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব অনেক ছিল, প্রেম ভালোবাসাও ছিল। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে সব ছিন্ন হয়ে গেছে। সে বলল, আমার কালকেই চলে যাওয়ার কথা ছিল, অফিসের আর-একটা কাজের জন্য আর দু-দিন থেকে যেতে হচ্ছে। শনিবার

ঠিক চলে যাব—টিকিট কাটা হয়ে গেছে প্লেনের।

তাতা চুপ করে রইল।

সুরঞ্জন আবার বলল, যাওয়ার আগে টুলটুলের খবরটা জেনে যেতে পারলে ভালো লাগত।

তাতা চায়ের কাপ হাতে তুলে নিয়ে বলল, আপনি ছোড়দির জন্য চিন্তা করবেন না।

চিন্তা করা আমার উচিত নয়। তবু মন মানে না। টুলটুল কি আগেও এরকম বাড়ি ছেড়ে গেছে?

না।

তবে? তোমাদের দুশ্চিন্তা হয় না?

ছোড়দি খুব শক্ত মেয়ে। ও নিজের ভালো-মন্দ বোঝে। টুলটুলের সঙ্গে সুরঞ্জন প্রায় শৈশব থেকে প্রথম যৌবন পর্যন্ত একসঙ্গে কাটিয়েছে। কত বই ওরা একসঙ্গে পড়েছে, কত স্বপ্ন-বিনিময় হয়েছে—সেই টুলটুল কীরকম মেয়ে, তা কি সুরঞ্জন জানবে না? তাতার কাছ থেকে শুনতে হবে? বোধহয় সুরঞ্জন সত্যিই তেমন ভাবে চেনে না টুলটুলকে। টুলটুল কারুকে কিছু না বলে বাড়ি থেকে চলে যাবে—এ কি সে ভাবতে পেরেছিল?

সুরঞ্জন তাতার চোখের দিকে চোখ চেয়ে জিগ্যেস করল, টুলটুল কোথায় আছে, তুমি সত্যি জানো না?

জানলে বলব না কেন? অমিতদা সব জায়গায় খুঁজে দেখেছেন!

আশ্চর্য! কী যে হল! সেরকম কিছু ঝগড়াও তো হয়নি শুনেছি।

তাতা হঠাৎ পালটা প্রশ্ন করল, ছোড়দি কোথায় থাকতে পারে, তা আপনিও সত্যি জানেন না?

সুরঞ্জন অবাক হয়ে বলল, আমি? আমি কী করে জানব?

তাহলে আপনি এতবার ছোড়দির কথা জিগ্যেস করছেন কেন? সুরঞ্জন একটু আহত বোধ করল। তাতার কথার মধ্যে একটা ঝাঁজ ফুটে বেরুচ্ছে। এরকম ভাবে সে কথা বলবে কেন? যাই হোক। তাতা ছেলেমানুষ, তার ওপর রাগ করা চলে না।

সুরঞ্জন পুরোনো চোখ দিয়ে তাতাকে এখনও ছেলেমানুষ ভাবছে। কিন্তু তাতা যে এখন একজন যুবতী, তার অন্যরকম জীবন আছে, আলাদা অহঙ্কার আছে—সেটা খেয়াল করছে না। সুরঞ্জন শান্ত গলায় বলল, তোমার ছোড়দির খোঁজখবর নেওয়া কি আমার পক্ষে অপরাধ?

আপনি বুঝতে পারছেন না, এটা আপনার পক্ষে অপমানজনক?

কেন?

ছোড়দির সঙ্গে আপনার আগে খুব ভাব ছিল। এতদিন পর আবার আপনাদের দেখা হয়েছে। এখন ছোড়দি হঠাৎ তার স্বামীর কাছ থেকে চলে গেলে সবাই ভাবতে পারে যে সে আপনার সঙ্গেই চলে গেছে কোথাও।

তুমি বিশ্বাস কর, সে আমাকে কিছুই বলেনি।

সেই কথাই তো বলছি। ছোড়দি আপনার সঙ্গে যায়নি, আপনাকেও কিছু বলেনি—তার মানে আপনার আর কোনও মূল্যই নেই ছোড়দির কাছে।

সুরঞ্জনের মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেল। তাতা একটা জিনিস চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চায়। সুরঞ্জন ওদের আর কেউ না। টুলটুলও সুরঞ্জনকে কোনও গোপন কথা বলারও যোগ্য বলে মনে করে না।

সুরঞ্জন টেবিলে দাগ কাটতে-কাটতে বলল, তোমার ছোড়দি আমার সঙ্গে কোথাও যেতে চাইলেও আমি তাকে ফিরিয়ে দিয়ে আসতাম অমিতবাবুর কাছে। আমি তো তার জীবনের কোনও ক্ষতি করতে আসিনি।

ছোড়দির জীবনটাই আজ অন্যরকম। আপনি তো অনেকদিন কলকাতায় ছিলেন না।

সেই জন্যই আমি কিছু বুঝতে পারি না! কলকাতা শহর বাইরের লোককে কিছুতেই আর ভেতরে ঢুকতে দেয় না। চেনা মানুষরাও অচেনা হয়ে যায়। এইসময় অন্য টেবিল থেকে একটি ছেলে উঠে এসে তাতাকে বলল, এই প্রতীতি, তুমি কখন এসেছ? অরিন্দমের খবর শুনেছ তো? অরিন্দম দিল্লিতে।

ছেলেটি যে টেবিল থেকে উঠে এসেছে, সেই টেবিলে অনেক ছেলেমেয়ে বসে আছে। ছেলেটি এখানে এসে একটা চেয়ার টেনে অবলীলাক্রমে বসে পড়ল এবং সুরঞ্জনকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে তাতার সঙ্গে কথা বলতে লাগল অনর্গল।

তাতার ভালো নাম যে প্রতীতি, তা মনেই ছিল না সুরঞ্জনের।

ছেলেটি ঝড়ের বেগে কথা বলা একটু থামাতেই তাতা বলল, আলাপ করিয়ে দিই, এর নাম সঞ্জয় মজুমদার—আমরা বি.এ. ক্লাসে একসঙ্গে পড়তাম। আর সঞ্জয়, ইনি হচ্ছেন—

তাতা একটু থামল, দু-এক মুহূর্তে ইতস্তত করে বলল, ইনি হচ্ছেন সুরঞ্জনদা, আমেদাবাদে থাকেন—

তাতা ঠিক কি পরিচয় দেবে বুঝতে পারছিল না। চায়ের দোকানে এক টেবিলে একটি পুরুষ আর নারী বসে থাকলে সকলেই প্রথমে ধরে নেয় ওরা প্রেমিক-প্রেমিকা। সেই ভুল ভাঙাবার জন্য তাতা কী বলবে? একথা তো বলতে পারে না যে ইনি এক সময় আমার ছোড়দিকে ভালোবাসতেন—এখন অবশ্য ছোড়দির বিয়ে হয়ে গেছে, এর সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই—

সব ব্যাপারটাই অস্বাভাবিক। এটা বুঝতে পেরে সুরঞ্জনের সঙ্গে-সঙ্গে হাসি পেল।

সঞ্জয় বলল, আপনারা আমাদের টেবিলে আসুন না। আমরা অনেকে আছি।

কলেজের ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে আড্ডা দিতে বসে। ওদের একটা আলাদা জগৎ, আলাদা ধরনের কথাবার্তা, সেখানে সুরঞ্জন নিজেকে মানিয়ে নেবে কী করে? শুধু-শুধু তাতাকে অস্বস্তিতে ফেলা হবে।

সে তক্ষুনি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তাতা, তুমি ওদের সঙ্গে বসো। আমাকে তো এখন চলে যেতে হবে—জরুরি কাজ আছে।

ওদের কোনও বাধা দেওয়ার সুযোগ না দিয়ে সুরঞ্জন বিল মিটিয়ে বেরিয়ে পড়ল দোকান থেকে।

তারপর অনেকক্ষণ একা-একা হেঁটে বেড়ালো রাস্তায়-রাস্তায়। অন্ধকার ময়দানে। তার কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। এত বড় শহরে এত মানুষ—তবু এর মধ্যেও সে নিঃসঙ্গ। তার পকেটে টাকা আছে—এত ঝলমলে দোকানপাট—সে অনায়াসেই যে-কোনও একটাতে ঢুকে বসে থাকতে পারে কিন্তু কোথাও একজনও আপনজন পাবে না। পুরোনো সম্পর্ক ধরে যাদের সে খুঁজতে গিয়েছিল—দেখা গেল, সম্পর্কের সূত্রগুলো এতদিনে ছিঁড়ে গেছে।

মনে হয়, সবাই যেন বদলে গেছে এর মধ্যে। তার নিজের বদলটাও সে মেনে নিতে পারে না। ছেলেবেলার চোখ দিয়ে সে যে কলকাতাকে খুঁজতে এসেছে—সেই কলকাতা আর কোথাও নেই। তার নিজের ছেলেবেলাটাও তো সে আর ফিরে পাবে না।

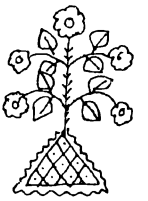

রেলের কামরার গল্প

প্রত্যেক ট্রেনের কামরাতেই একটা গল্প আছে। বিশেষত রাত্রির যাত্রায়। একটা ছোট্ট ঘেরাটোপের মধ্যে, ওপর-নীচের চারটি শয্যায় সম্পূর্ণ অচেনা চারজন মানুষ একটা রাত কাটিয়ে যায়, এর মধ্যে গল্প থাকবে না?

সম্প্রতি আমাকে পুরুলিয়া জেলায় যেতে হয়েছিল, চক্রধরপুর প্যাসেঞ্জার, রাতের জার্নি। রাত দশটার পর ছাড়বে, সুতরাং খাওয়াদাওয়ার পাট চুকিয়ে ট্রেনে ওঠা। আমি নির্দিষ্ট ঘেরাটোপে পৌঁছে দেখি, আর দুজন যাত্রী আগেই এসে গেছেন, একটি বার্থ খালি। একজন বেশ সপ্রতিভ অবাঙালি যুবক, আর একজন মহিলা, তাঁর সঙ্গে একটি ছোট মেয়ে। ট্রেন না ছাড়লে শুয়ে পড়ার প্রশ্ন নেই, প্রথম পাঁচ মিনিট কেউ কোনও কথা বলে না, আমার মতো অনেকেই একটা বই খুলে বসে।

প্রথমে কথা বললেন মহিলাটি। কী করে যেন তিনি চিনতে পেরে গেলেন আমাকে। নমস্কার বিনিময়ের পর জানা গেল, তাঁর ছেলে পড়ে পুরুলিয়ার সৈনিক স্কুলে, তিনি ছেলেকে দেখতে যাচ্ছেন। শুনতে-শুনতে আমি কল্পনায় দেখতে পেলুম এক ব্যাকুল কিশোরের মুখ, আগেই চিঠি পেয়ে যেন সে ছটফট করছে মায়ের প্রতীক্ষায়। স্কুল-কলেজে পড়ার সময় আমি কখনও হস্টেলে থাকিনি। এখন মনে হল, ইস, কেন থাকিনি।

যুবকটিও আমাদের সঙ্গে আলোচনায় যোগ দিল। সে আসছে দিল্লি থেকে, যাবে বোকারাতে, মাঝখানে একবার বদল করতে হবে। অনেক বিষয়ে সে আগ্রহী, বাংলা সম্পর্কে খুব কৌতূহল। এই তিনজনের কথাবার্তা গল্প সহজ স্বাভাবিক, বেসুরো কিছু নেই। এরপর চতুর্থ যাত্রীর আগমন।

তিনি এলেন সদলবলে, অন্তত চার-পাঁচজন লোক তাঁকে তুলে দিতে এসেছে। মনে হয়, বেশ হোমরাচোমরা ব্যক্তি। তাঁর লটবহরেরও শেষ নেই, কুলিরা বাক্স-প্যাঁটরা আনছে-তো-আনছেই, জায়গাটা প্রায় ভরে গেল। একবার তিনি এক কুলিকে ধমক দিয়ে বললেন, এই হারামজাদা, ঠিক করে রাখ!

কুলিদের সঙ্গে যারা এরকম ব্যবহার করে, তাদের সম্পর্কে প্রথম থেকেই আমার মনে একটা বিরূপতা গড়ে ওঠে। গালাগালি দেওয়া তো অন্যায় বটেই। ওদের সঙ্গে তুই-তুকারি করাটাও আমি ঘোরতর অপছন্দ করি। এই ব্যক্তিটির এমনই প্রতাপ যে কুলিটিও আপত্তি জানাল না।

ট্রেন চলতে শুরু করতেই সেই প্রতাপশালী ব্যক্তিটি একটি নীচের বার্থে বিছানা পাততে শুরু করে দিলেন। আমাদের সঙ্গে একটিও কথা বললেন না। হয়তো কথা বলার যোগ্যও মনে করলেন না। কিন্তু আমার একটু খোঁচা মারার ইচ্ছে হল। আমার টিকিটে লেখা আছে লোয়ার বার্থ, ভদ্রমহিলাটি মেয়েকে নিয়ে নীচেই শোবেন নিশ্চয়ই, তাহলে ওই লোকটি একটি নীচের বার্থ আগেভাগেই দখল করে নিলেন কী করে? সে কথা জিগ্যেস করতেই তিনি গম্ভীরভাবে বললেন, হ্যাঁ, আমি নীচেই শোবো! আমি তখনই ঠিক করলুম, টিকিট চেকারকে ডেকে ওই লোকটিকে স্থানচ্যুত করতেই হবে। ডাকতে হল না, চেকার তখনই উঁকি দিলেন। এবং জানালেন, ওই প্রতাপশালী ব্যক্তিটি নীচের বার্থেরই অধিকারী। আমি তৎক্ষণাৎ মহিলাটির দিকে ফিরে জানালুম, আপনি নীচেই থাকবেন, আমার ওপরে যেতে কোনও অসুবিধা নেই।

ব্যাপারটি তা ঘটল না। মহিলাটির পুরো কনফারমেশন ছিল না, তাঁর জন্য ব্যবস্থা হল, কিন্তু পাশের কিউবিকলে যেতে হল। তাঁর জায়গায় এলেন একজন মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি, ইনিও বেশ আলাপী। জানা গেল, ইনি রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে জড়িত। আমরা তিনজন আরও কিছুক্ষণ আড্ডা চালালুম, সেই প্রতাপশালী ব্যক্তিটি আমাদের অগ্রাহ্য করে, একটিও বাক্য বিনিময় না করে নাকডাকিয়ে ঘুমোতে লাগলেন। চারটি চরিত্র। তার মধ্যে তিনজন একদিকে। আর একজন মূর্তিমান ব্যতিক্রম। সবাই একরকম হলে, গল্প জমবে কী করে।

একটু পরে সবাইকেই শুয়ে পড়তে হল। বেশ শীতের রাত। আমাকে নামতে হবে আদ্রা স্টেশনে, ভোর সাড়ে পাঁচটায়। শীতের ভয়ে সব জানলা বন্ধ, আর চোর-ডাকাতের ভয়ে দরজাও বন্ধ। অন্ধকারের মধ্যে কখন সাড়ে পাঁচটা বাজবে, বুঝব কী করে? কন্ডাক্টর গার্ডকে যদিও ডেকে দিতে বলা হয়েছে, কিন্তু তিনিও যদি ঘুমিয়ে থাকেন? ঠিক করলুম, ঘুমবই না, মাঝে-মাঝে উঠে ঘড়ি দেখতে হবে। মাঝে-মাঝে তন্দ্রা আসছে, তবু জোর করে ঘুম তাড়াচ্ছি। এইরকম অবস্থায় যা হয়, শেষ রাত্রে হঠাৎ গাঢ় ঘুম এসে যায়।

হঠাৎ একসময় মনে হল, চতুর্দিকে দুমদাম শব্দ হচ্ছে। কারা যেন চ্যাঁচামেচি করছে বাইরে। প্রথমেই মনে হয়, ডাকাত? ইদানীং ট্রেন ডাকাতি খুব সহজ পেশা হয়ে গেছে। আমার কখনও ডাকাত দেখার অভিজ্ঞতা হয়নি, মনে-মনে শখ আছে, একবার ডাকাতের পাল্লায় পড়লে মন্দ হয় না। ন্যাংটার নেই বাটপাড়ের ভয়। ডাকাতরা আমার কাছ থেকে আর কী নেবে? আমি তো আর বীরপুরুষ সেজে তাদের প্রতিরোধ করতে যাব না যে তারা আমাকে ছুরি মারবে? বিদ্যাসাগরমশাই একবার ডাকাতের ভয়ে পালিয়েছিলেন বাড়ি ছেড়ে, আমি বিদ্যাসাগরের চ্যালা।

না, ডাকাত নয়, কয়েকজন বাইরে থেকে আমাদের ঘুম ভাঙাতে চাইছে, আদ্রা স্টেশনে থেমে আছে ট্রেন। ঘুম চোখে হুড়োতাড়া করে কম্বল চাদর গুছিয়ে নিতে হল। বইটা পড়ে গেছে মেঝেতে... প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে, এই বুঝি ট্রেন ছেড়ে দিল' কোনক্রমে নেমে পড়লুম প্ল্যাটফর্মে, কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছে আমার জন্য, এগিয়ে গেলুম তাদের দিকে। হঠাৎ দেখি, সেই প্রতাপশালী ভদ্রলোকটি ছুটে আসছেন, কাছে এসে বললেন, আপনার চশমা। আপনি চশমা ফেলে যাচ্ছেন!

আমি স্তম্ভিত! চশমা ছাড়া আমি প্রায় কানা, একটা অক্ষরও পড়তে পারি না। ভদ্রলোক আমার এই দারুণ উপকার করলেন কেন? তিনি নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছিলেন, তাঁর গন্তব্য আরও অনেক দূরে। লোকের চ্যাঁচামেচিতে তাঁর ঘুম ভেঙে যেতে পারে। কিন্তু পাশ ফিরে শোওয়াই স্বাভাবিক ছিল। তবু আমার চশমাটা ফেরত দিতে শীতের মধ্যে তিনি গেঞ্জি পরে ছুটে এলেন...মানুষকে কীভাবে বিচার করব? মানুষ বড় রহস্যময়!

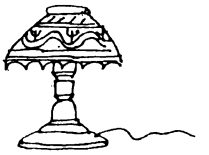

দুটি চরিত্র

গড়িয়াহাট বাজারে একটি গেটের এক পাশে এক বৃদ্ধ দোকানী বসেন। পাকা মাথা, ছোটখাটো চেহারা। তিনি বিক্রি করেন শুধু নানারকম বড়ি, আর মাঝে-মাঝে বকফুল। তাঁর কথায় একটা টান আছে, যা নিশ্চিত পূর্ববঙ্গের, ঠিক কোন জেলার তা আমি ধরতে পারি না, তবে ফরিদপুর হওয়াই সম্ভব। উচ্চারণভঙ্গি বেশ চেনা লাগে। চেনা লাগে চেহারাটিও। মনে হয় যেন আমাদের মাইঝপাড়ার বাজারে খুব ছেলেবেলায় আমি এই দোকানীকেই দেখেছিলুম। সেখানে তিনি শুধু বড়ি বিক্রি করতেন না। তিনি ছিলেন মুদি। ঠিক যেন একই মুখ।

রোজ বাজারে গিয়ে আমার বড়ি কেনার দরকার হয় না, বাড়িতে কোন রান্নায় কবে বড়ি লাগে তা আমি খেয়ালও করি না, তা হলেও আমি ওই বাড়িওয়ালার সামনে একবার করে দাঁড়াই, এক টাকা চল্লিশ পয়সা দিয়ে একশো বড়ি কিনি, দু-চারটে কথা বলি। কথাগুলি শুনতে ভালো লাগে, যেন ওই সময়টুকুর জন্য ছেলেবেলায় ফিরে যাই।

বকফুল ভাজা অতি উপাদেয়, যেদিন বকফুল থাকে সেদিন আগ্রহ নিয়েই কিনি। আমার আগ্রহ দেখে উনি দু-তিন কুড়ি বকফুল আমাকে দিতে চান। আমাদের পরিবারে লোকসংখ্যা খুবই কম, অত বকফুল লাগে না, রেখে দিলে নষ্ট হয়, তবু আমি আপত্তি করতে পারি না। সামান্য ফুলের দামে যদি ছেলেবেলায় ফিরে যাওয়া যায়, তার মূল্য কে বুঝবে! আমাদের গ্রামে অনেক বকফুল ফুটত!

॥ ২ ॥

গিয়েছিলাম বস্তার জেলার আদিবাসীদের গ্রামে। মধ্য প্রদেশের এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে। জঙ্গলের মধ্যেও হঠাৎ-হঠাৎ বাংলা ভাষা শুনতে পাওয়া যায়। দেখতে পাওয়া যায় দণ্ডকারণ্য থেকে ছিটকে যাওয়া দু-চার জনকে। কেউ রিকশা চালায়, কেউ ছোটখাটো ব্যাবসা করে।

গ্রামের হাটে ঘুরতে-ঘুরতে একপাশে, চোখে পড়ল একটা ভাতের হোটেল। খুবই ছোটখাটো ব্যাপার। নড়বড়ে টেবিল ও বেঞ্চি পাতা, মাটির সামনে উনুনে ভাত ফুটছে, এ ছাড়া পাওয়া যায় কলাইয়ের ডাল ও ঝিঙের তরকারি। আর কিছু না!

আমার সঙ্গের একজন বাঙালি চাকুরিজীবী বললেন, ফরিদপুরের একজন লোক এই ভাতের হোটেলটা খুলেছে কিছুদিন হলো। ভালো চলে না। কারণ, সপ্তাহে একদিন হাটবার ছাড়া অন্যদিন খদ্দের জোটে না।

ডাক বাংলোতে আমাদের জন্য রান্না তৈরি ছিল, মুরগির মাংস-টাংস অনেক কিছু, তবু আমি বললুম, গরম-গরম ভাতের গন্ধ পেয়ে লোভ লেগে যাচ্ছে, এখানেই বসে পড়ি!

ফরিদপুরের মানুষের দোকান শুনেই কি আমার এরকম ইচ্ছে হল? তা তো খানিকটা বটেই। তা ছাড়া, লোকটির চেহারার সঙ্গে আমাদের মামাবাড়ির রান্নার ঠাকুরের চেহারার খুব মিল। মাথার

চুল একেবারে ছোট ঘাসের মতন, নাকটা বোঁচা, মুখ দেখলেই মনে হয়, এইসব লোক সারাদিনে খুব কম কথা বলে।

সেই নড়বড়ে টেবিলে বসেও মনে হল অবিকল যেন সেই আমার ছোটবেলার মামাবাড়ির ঠাকুর ভাত বেড়ে দিচ্ছে! শুধু ডাল-ভাতের কী অপূর্ব স্বাদ!

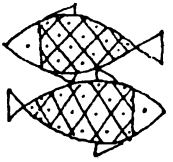

ট্রেন কাহিনি

পশ্চিমবাংলায় প্রতি মাসে গড়ে অন্তত পাঁচটি ট্রেন ডাকাতি হয়। ব্যাঙ্ক ডাকাতি হয় টি। ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবাংলা অনেক এগিয়ে আছে। আমাদের এইসব ডাকাতদের নিয়ে আমরা রীতিমতন গর্ব করতে পারি। তারা কাজে ফাঁকি দেয় না, কোনওরকম ভুল চুক করে না, সেই জন্য ধরা পড়ার কোনও প্রশ্নই নেই। দু-একটি ব্যাঙ্ক ডাকাত দৈবাৎ ধরা পড়লেও ট্রেন ডাকাতরা কক্ষনো ধরা পড়ে না। সেই জন্যই নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য ও লাভজনক পেশা হিসেবে ট্রেন-ডাকাতি দিন-দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

দুর্ভাগ্যের বিষয় আমার আজও একটাও ট্রেন-ডাকাতি বা ব্যাঙ্ক ডাকাতির দৃশ্য নিজে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পাইনি। আমার কোনও-কোনও বন্ধুর এই অভিজ্ঞা হয়েছে এবং তারা যখন সবিস্তারে সেই দৃশ্যের বর্ণনা করে, তখন আমি তাদের রীতিমতন হিংসে করি। ওরা এমন একটা অভিজ্ঞতা লাভে সৌভাগ্যবান, অথচ আমার কেন হল না? ব্যাঙ্কে যাওয়ার সুযোগ আমার বেশি ঘটে না বটে, কিন্তু ট্রেনে তো আমাকে প্রায়ই যাতায়াত করতে হয়। যে-কোনও দিন এরকম একটা ঘটনার মধ্যে আমার পড়ে যাওয়া উচিত ছিল। ট্রেন ডাকাতরা যে আমাকে এ ভাবে এড়িয়ে চলছে, এটা তাদের ঘোরতর অন্যায়। যাই হোক, একদিন-না-একদিন আমার খপ্‌পরে তাদের পড়তেই হবে।

ট্রেন বিষয়ে আমার অন্য একটা অভিজ্ঞতার কথা এখানে বলি।

বছর দু-এক আগে আমি কুচবিহার থেকে কলকাতা ফিরছিলুম। কুচবিহার থেকে বাসে এসেছিলুম নিউ জলপাইগুড়ি রেল স্টেশনে। দার্জিলিং মেইল ছাড়বে সন্ধেবেলা। আমার কাছে সেকেন্ড ক্লাস থ্রি-টায়ার কম্পার্টমেন্টের বার্থ রিজার্ভেশান স্লিপ এবং টিকিট আছে। অর্থাৎ রাত্তিরে নিশ্চিন্তে এক ঘুম দিয়ে সকালবেলা কলকাতায় পৌঁছে যাব। চমৎকার ব্যবস্থা। ট্রেনের খাবার আমার পছন্দ হয় না বলে আমি স্টেশানের বাইরের এক রেস্তোরাঁয় আমার মনোমতন ডিনার সেরে নিলুম। হাতে খানিকটা সময় আছে বলে বইয়ের দোকান থেকে কিনলুম দুটি পেপার ব্যাক থ্রিলার। এর পরেও আমার কাছে যে টাকা বাকি রইল তা দিয়ে হাওড়া স্টেশান থেকে আমার বাড়ি পর্যন্ত ট্যাক্সি ভাড়া কুলিয়ে যাবে, সিগারেটের খরচও কুলিয়ে যাবে। আর আমার চিন্তা কী?

যথা সময়ে প্ল্যাটফর্মে গিয়ে একটা উত্তেজনা দেখতে পেলুম। লোকজন সব উদ্বিগ্ন মুখে ছোটছুটি করছে, যাকেই জিগ্যেস করি কী হয়েছে, সে-ই বলে ট্রেন নেই! তারপর মাইক্রোফোনে ঘোষণা শুনতে পেলুম যে দার্জিলিং মেল ক্যানসেলড হয়ে গেছে! যাত্রীদের ভাড়ার টাকা ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে, সবাই যেন সুশৃঙ্খলভাবে লাইনে গিয়ে দাঁড়ায় ইত্যাদি।

আমি প্রথমে হতভম্ব হয়ে গেলুম! এই স্টেশান থেকেই দার্জিলিং মেল ছাড়ে, ট্রেনটি জলজ্যান্ত প্ল্যাটফর্মেই দাঁড়িয়ে আছে, আমি নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছি, তাহলে যাবে না কেন? শীতকালে

কোথাও বন্যা হয়নি দাঙ্গা-হাঙ্গামারও কোনও খবর নেই, তবু ট্রেন বাতিল করবার কারণ কী? রেলের কর্মচারীরা সব প্ল্যাটফর্ম থেকে উধাও, স্টেশন মাস্টারের ঘরের সামনে দারুণ ভিড়। আরও আধঘণ্টা অপেক্ষা করবার পর বুঝতে পারলুম, সত্যিই ট্রেনটি যাবে না। অন্যদের দেখাদেখি আমিও টিকিটের টাকা ফেরত নেওয়ার জন্য লাইনে দাঁড়ালুম। কাউন্টারের ব্যক্তিটি যে কোনও প্রশ্নের উত্তরেই বিরক্ত-ভাবে বলছেন, আমি জানি না, আমি কিছু জানি না!

তার একটু পরে আমি বুঝতে পারলুম আমার বিপদের গুরুত্বটা। এরপর আর কোনও ট্রেন নেই। দার্জিলিং মেল বন্ধ থাকলে সন্ধ্যের পর উত্তর বাংলা থেকে কলকাতায় আসার কোনও উপায় নেই। সন্ধের পর কোনও ট্রেন নেই। রকেট বাস নামে একটি সরকারি বাস চলে, তার টিকিট তিন চারদিন আগেই শেষ হয়ে যায়। কয়েকটি বে-সরকারি বাসও চলে শুনেছিলুম, সেগুলোরও কোনও চিহ্ন দেখতে পেলুম না। রেল কর্তৃপক্ষ কোনওরকম কৈফিয়ৎ না দিয়ে দার্জিলিং মেল বন্ধ করে দিলেন, একবার চিন্তাও করলেন না হাজার-হাজার যাত্রীর কী অবস্থা হবে! উত্তর বাংলার দূর-দূরান্ত থেকে যাত্রীরা নিউ জলপাইগুলি স্টেশনে আসে দার্জিলিং মেল ধরবার জন্য। তারা এখন কী করবে? সকলের পক্ষে বাড়ি ফিরে যাওয়াও সম্ভব নয়। বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে অনেক মহিলাদের অসহায়ভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখলুম।

অনেকেই এসে ভিড় করলেন জলপাইগুলিতে সরকারি বাস ডিপোর সামনে। জনতা দাবি তুলেছে আরও অন্তত দুটি স্পেশাল বাসের ব্যবস্থা করা হোক। বাস ডিপোর কর্মীরা বলছেন, আর বাস নেই। শুরু হয়ে গেল উত্তপ্ত তর্ক যুদ্ধ। আমি হিসেব করে দেখলুম, সেখানে যত লোক দাঁড়িয়ে আছে, পাঁচখানা বাস দিলেও সব মানুষ কুলোবে না। একটা দুটো অতিরিক্ত বাস দিয়েই বা কী লাভ? মারামারি লেগে যাবে।

ক্রমেই রাত বাড়ছে। আমি চঞ্চল ও অধীর হয়ে পড়ছি, অথচ কী করব বুঝতে পারছি না। এরপর অতিরিক্ত বাস দিলেও তাতে মারামারি করে ওঠা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এদিকে শুনতে পাচ্ছি, জলপাইগুড়ির সব হোটেল ভরতি হয়ে যাচ্ছে। এরপর আর রাত্রে থাকবারও জায়গা পাব না। রাত্রে আমি থাকতে চাইও না, কারণ পরের দিন দুপুরে কলকাতায় আমার খুবই জরুরি একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। অথচ আমার যাওয়ার কোনও উপায়ই নেই?

উপায় একটা জুটে গেল। কয়েকজন মাড়োয়ারি যুবক একটা ট্যাক্সি ঠিক করল, সেই ট্যাক্সিতেই সোজা কলকাতায় যাবে। ওরা ছিল পাঁচজন, আমিও ওদের দলে জুটে গিয়ে কাতরভাবে অনুরোধ জানালুম, আমাকেও নিয়ে চল ভাই!

ট্যাক্সি ভাড়া ঠিক হল ন'শো টাকা। অর্থাৎ প্রত্যেকের দেড়শো টাকা শেয়ার। মাড়োয়ারি যুবকেরা চা-বাগানের মালিক, তারা তক্ষুণি টাকা বার করে দিল, কিন্তু আমার কাছে অত টাকা নেই। আমি ড্রাইভারকে বললুম, কলকাতায় আমার বাড়িতে পৌঁছে টাকাটা দিয়ে দেব আপনাকে, কেমন? ড্রাইভার ত্যারছাভাবে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, তারপর কলকাতায় পৌঁছে যদি আপনি টাকা দিতে না চান? যদি বলেন আমি বেশ ভাড়া চার্জ করেছি? তখন আমি কী করব?

আমি বললুম, ভাই, দেখুন আমার এই গোল চাঁদপানা মুখখানা। এই মুখ দেখলে কি আমায় ঠক বা জোচ্চোর বলে মনে হয়?

ড্রাইভারটি রাজি হয়ে গেল। কিন্তু যেহেতু আমি পুরো টাকা দিইনি, তাই ইচ্ছে মতন বসার জায়গা বেছে নেওয়ার অধিকারও আমার নেই। আমাকে বসতে হল সামনের সীটে ড্রাইভার ও অন্য একজন যাত্রীর মাঝখানে অস্বস্তিকর অবস্থায়।

ট্যাক্সিটা ছাড়ল রাত এগারোটায়। এবং একটু পরেই অন্য যাত্রীরা ঘুমিয়ে পড়ল। ড্রাইভার আমায় বলল, আমিও যদি হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ি, তবে কিন্তু গাড়ির অ্যাকসিডেন্ট হতে পারে। সে দায়িত্ব আমার নয়। সুতরাং আপনি জেগে থাকুন, আর আমার সঙ্গে গল্প করুন।

আমার যে গল্পের স্টক এত কম তা আমি বুঝেছিলুম সেই রাতে। আধ ঘণ্টার পর আর আমি কথা খুঁজে পাই না। তাছাড়া ট্যাক্সি ড্রাইভারদের খুশি করার মতন গল্প কোথায় পাওয়া যায়, তাও আমি জানি না। আমি এক-একটা গল্প বানাতে আরম্ভ করলে সে বলে, না, ওটা ভালো নয়! অন্য একটা বলুন!

সারারাত জেগে আমি একটার পর একটা সিগারেট টেনে এবং অনর্গল অর্থহীন কথা বলে কাটালুম। আমার বাড়ি পৌঁছোলুম বেলা বারোটায়। মনে-মনে একটা আশঙ্কা ছিল, সেটাই সত্যি ফলে গেল। আমার বাড়িতে কেউ নেই, দরজায় তালা বন্ধ। এখন টাকা কোথায় পাব? ট্যাক্সি ড্রাইভার এমনভাবে আমার দিকে তাকাল যেন সে বলতে চায়, খুব তো গোল মুখের গর্ব করছিলে! আসলে তুমি একটি জোচ্চোরই! যাই হোক, পাড়ার চায়ের দোকান থেকে ধার করে ড্রাইভারকে মিটিয়ে দিলুম তার প্রাপ্য।

সেদিন আমি চারখানা খবরের কাগজে তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেছিলুম। দার্জিলিং মেইল ক্যান্সেল হওয়ার কোনও খবর কোথাও নেই। রেল কর্তৃপক্ষ নিঃশব্দে ট্রেন বাতিল করে প্রতিদিন সারা ভারতবর্ষে কত লোককে যে নিয়ে এইরকম মজা করছেন, তার হিসেব কেউ রাখে না।



মোমচোর

মালবিকার একটুও ভয় নেই। বাজি পোড়ানোর নেশায় সে খুশিতে ঝলমলে হয়ে উঠেছে। কালি পটকাগুলো সে অনায়াসে হাতে ধরে ধরেই ফাটায়। পলতেয় আগুন লাগিয়ে পটকাটা ছুড়ে দেয় না, হাতখানা যতদূর সম্ভব লম্বা করে রাখে, মুখখানা তার হাসি ও উত্তেজনায় অপরূপ হয়ে ওঠে, শেষ মুহূর্তে সেটা শূন্যে ছুড়ে দেয়, মাটিতে পড়ার আগেই দুম করে ফাটে। অভিজিৎ আর রণদেব চেঁচিয়ে ওঠে, এই কী হচ্ছে কী? হাত পুড়ে যাবে! হাতে ফাটবে! মালবিকা খিলখিল করে হেসে দু-একটা পটকা ওদের দিকে ছুড়ে দেয়, একেবারে রণদেবের মুখের সামনে দুম করে শব্দ হয়।

রণদেব একগাদা বাজি কিনে এনেছে। অন্তত কুড়ি-পঁচিশ টাকার তো হবেই। পটকা, তুবড়ি, হাউই, রংমশাল। রণদেবের মনে আছে ছেলেবেলায় মুঙ্গেরে দেখেছিল, দেওয়ালির দিনে মালবিকাকে বাজি নিয়ে হইহই করতে। রণদেব নিজেও অবশ্য তখন বাজি নিয়ে খুব মেতে উঠত, নিজের হাতে সে উড়ন-তুবড়ি বানিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিত। কিন্তু এখন আর তার ওই শখ নেই, গত চার-পাঁচ বছর দেওয়ালিতে রণদেব একটা বাজিও চোখে দেখেনি।

ছেলেবেলায় চেনা সেই মালবিকার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে তারই বন্ধু অভিজিতের, একথা রণদেব যখন শুনল, বেশ খুশিই হল। অভিজিতের বিয়ের সময় সে এখানে ছিল না। দিনদশেক আগে অভিজিতের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়ার পর সে রণদেবকে জোর করে নিয়ে এল বাড়িতে। তখন বন্ধুর স্ত্রীর সঙ্গে ভাব জমাবার জন্য রণদেবের একটুও সময় লাগল না। মালবিকাও তাকে দেখেই চিনতে পেরেছে।

আজ তাই রণদেব একগাদা বাজি কিনে এনে হাজির হয়েছে। আজ তার অন্য কোথাও যাওয়ার ছিল না, আর এত দুমদাম আওয়াজের মধ্যে ঘরের মধ্যেও চুপ করে বসে থাকা যায় না। আওয়াজের

হাত থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় নিজেরও আওয়াজ করা।

মালবিকা ঠিক আগের মতনই ছেলেমানুষ আছে, একবার অবশ্য বলল, ইস, এত টাকার বাজি কিনেছ? খুব বড়লোক হয়েছ বুঝি? কিন্তু পরমুহূর্তেই বাজিগুলো ধ্বংস করার কাজে লেগে গেল।

বাড়ির সামনে ছোট্ট একটুখানি চত্বর, সামনে লোহার গেট। সেই চত্বরে দাঁড়িয়ে বাজি পোড়াল ওরা, দেওয়ালে-জানলায় মোমবাতির মালা, রাস্তায় ছোট ছেলেমেয়েদের ছোটাছুটি অভিজিৎ শব্দ করা বিপজ্জনক বাজির তেমন উৎসাহী নয়, সে স্মিতমুখে রংমশাল জ্বালছে মাঝে-মাঝে। মালবিকার ঝোঁক পটকা বোমা ফাটানোর দিকে।

দু-একটা পটকা শেষপর্যন্ত ফাটে না। মাটিতে পড়ে পলতেটা জ্বলতে থাকে, সবাই চেয়ে থাকে উদ্‌গ্রীবভাবে, কিন্তু শব্দ আর হয় না। মালবিকা রণদেবের দিকে চেয়ে ঠাট্টা করে বলে, কী যা-তা বাজি এনেছ? একদম ফাটে না!

অভিজিৎ তাড়াতাড়ি বলে, বাঃ, রণদেবের দোষ কী! ও তো আর বাজিগুলো বানায়নি। পয়সা দিয়ে কিনে এনেছে। আজকাল সব ব্যাপারেই ফাঁকি—

গেটের ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে একটা দশ-এগারো বছরের ছেলে। যে পটকাগুলো ফাটে না, সে দৌড়ে এসে কুড়িয়ে নেয়। আবার ছুটে চলে যায় গেটের ওপারে। রণদেব তাকে লক্ষ করে জিগ্যেস করে, ওই ছেলেটা ওই খারাপ বাজিগুলো কুড়িয়ে নিলে কেন? কী করবে ও দিয়ে?

মালবিকা বলল, তাও জানো না! বিলেতে গিয়ে সব ভুলে গেছ! ওই কালিপটকাগুলোর মাথাখানটা ভেঙে আগুন ধরালে ফুলঝুরির মতন একটু জ্বলে—

তাই নাকি?

—হ্যাঁ। মোমবাতিটা নিভে গেছে, জ্বালিয়ে দাও তো!

—ওই ছেলেটাকে কয়েকটা ভালো বাজিই দিয়ে দাও না! অনেক তো আছে!

—দাও না। ওদেরই তো বেশি আনন্দ। ছেলেবেলায় আমরা মুঙ্গেরে কীরকম মজা করতাম, মনে আছে?

—হ্যাঁ, সব মনে আছে। তুমি তখন বড্ড ঝগড়া করতে।

—মোটেই না!

—এই খোকা, এদিকে এসো। বাজি নেবে?

ছেলেটা এক-পা দু-পা করে গেটের ভেতরে এল, তারপর আবার কী ভেবে পেছন ফিরে ছুটে পালিয়ে গেল।

অভিজিৎ বাড়ির ভেতরে গিয়েছিল হাউই ওড়াবার জন্য একটা বোতল আনতে। সে একটা অ্যালমুনিয়ামের ডেকচিও নিয়ে এল। একপাতা কালিপটকায় একসঙ্গে আগুন দিয়ে ডেকচি চাপা দিলে মজা হয়, তখন ডেকচিটা লাফাতে থাকে। কিন্তু সবক'টা পটকা অবশ্য ফাটে না, দু-একটা থেকে যায়। সেই ছেলেটা আবার দৌড়ে এল পড়ে-থাকা পটকাগুলো কুড়িয়ে নেওয়ার জন্য।

রণদেব বলল, ছেলেটা ভারী অদ্ভুত তো! ওকে ভালো বাজি দেওয়ার জন্য ডাকলুম, তখন এল না, কিন্তু কুড়িয়ে নিতে আবার এসেছে।

অভিজিৎ বলল, কোন ছেলেটা?

তারপর ছেলেটাকে দেখতে পেয়ে অভিজিৎ প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বলল, তুই আবার এসেছিস? দাঁড়া, এবার তোকে পুলিশে দেব।

মালবিকা জিগ্যেস করল, ও চোর বুঝি?

—তুমি জানো না, প্রত্যেকবারে সব মোমবাতি চুরি করে নিয়ে যায়।

মালবিকার বিয়ে হয়েছে আট মাস আগে, আগে দেওয়ালিতে সে এ পাড়ায় ছিল না

হাসতে-হাসতে বলল, তা ছেলেমানুষরা তো একটা আধটা মোমবাতি নেবেই। আমরাও অন্যদের বাড়ির পাঁচিল থেকে নিয়ে যেতুম, না রণদেবদা?

অভিজিৎ বলল, একটা আধটা নয়, পাড়ার সব বাড়ির মোমবাতি ও সাফ করে দেয়। সারা বছর ধরে বোধহয় সেইগুলো জ্বালে।

মালবিকা এগিয়ে গিয়ে জিগ্যেস করল, এই খোকা, তোমার নাম কী?

ছেলেটা উত্তর দিল না, মালবিকাকে এগুতে দেখেই একছুটে পালিয়ে গেল।

অভিজিৎ বলল, ওর নাম মানিক। পাশের বস্তিটায় থাকে।

রণদেব বলল, এখনও তো অনেক বাজি পড়ে রইল, নাও ফাটাও, কখন শেষ করবে?

মালবিকা বলল, এত বাজি এনেছ, এ কি আর ফুরনো সহজ!

অভিজিৎদের বাড়িতে বাচ্চা ছেলেমেয়ে কেউ নেই, বাচ্চারা ছাড়া বাজি পোড়ানো বেশিক্ষণ জমে না। তা ছাড়া আর-একটা কাণ্ড হয়ে গেল। মালবিকা পরে আছে সিল্কের শাড়ি। একবার নীচু হয়ে রংমশাল জ্বালতে গিয়ে তার আঁচলে আগুনের ছোঁয়া লাগল। সঙ্গে-সঙ্গে দপ করে জ্বলে উঠল সেই জায়গা। মালবিকা দারুণ ভয় পেয়ে ও মাগো-ও মাগো বলে চেঁচিয়ে উঠল।

রণদেব জানে এ সময় মাথা ঠান্ডা রাখতে হয়। ব্যস্ত হয়ে হুড়োহুড়ি কিংবা চেঁচামেচি করলে কোনও লাভ নেই। আঁচলটা খুলে, সম্ভব হলে শাড়িটা খুলে ফেলে মাটিতে চাপড়ালেই সহজে আগুন নিভে যায়। সেটা করার জন্য রণদেব আর একটু হলে ছুটে যাচ্ছিল, হঠাৎ তার মনে পড়ল, মালবিকা এখন শুধু আর তার ছেলেবেলার বান্ধবী নয়, এখন সে অভিজিতের স্ত্রী। সুতরাং ওই সুযোগটা অভিজিৎকেই দেওয়া উচিত।

রণদেব চিৎকার করে অভিজিৎকে বলল, তুমি দাঁড়িয়ে রয়েছ কী? যাও, আঁচলটা খুলে ফেলে মাটিতে---

মালবিকা নিজেই শাড়ির অর্ধেকটা খুলে ফেলে তখন লাফাচ্ছে, অভিজিৎ ঠিক মতো আগুন নেভাতে পারছে না—তখন রণদেব গিয়ে বুটশুদ্ধ পা দিয়ে আগুনের ওপর চপড়াতে লাগল।

সাংঘাতিক কিছু ব্যাপার নয়, একটুতেই আগুন নিভে গেল। মালবিকার শাড়িও বেশি পোড়েনি, ইঞ্চিখানেক জায়গা ঝলসে গেছে।

রণদেব বলল, বাবাঃ, কী চেঁচামেচিই শুরু করেছিলে! বাজি ফাটাবার সময় এত সাহস, আর সামান্য একটু আগুন দেখেই এত ভয়?

মালবিকা বলল, মোটেই আমি আগুন দেখে ভয় পাইনি।

—ভয় পাওনি? এত জোর চিৎকার শুরু করেছিলে—

—বাঃ, আমার শাড়িটা নষ্ট হয়ে গেল। এমন ভালো শাড়িটা।

—একটা শাড়ির জন্য এত মায়া?

অভিজিৎ হাসতে-হাসতে বলল, মেয়েদের শাড়ির জন্য কীরকম মায়া থাকে তুমি জানো না। মালবিকার তো হাত কেটে রক্ত পড়লে ততটা কষ্ট হয় না, যতটা কষ্ট গায় ওর কোনও শাড়িতে একটু খোঁচা লেগে ফেঁসে গেলে।

মালবিকা বলল, সব শাড়ির জন্য হয় না। কিন্তু এটা আমার পুজোর শাড়ি—রণদেব বলল, মালবিকার শাড়ি-টাড়ির ওপর মায়া হবে, আমি আশাই করিনি। অবশ্য ওকে শাড়ি-পরা অবস্থায় আগে দেখিনি মুঙ্গেরে ওকে শেষ যখন দেখেছি, তখন মালবিকা ফ্রক পরত।

অভিজিৎ বলল, শুধু মালবিকা নয়, সব মেয়েরই শাড়ির জন্য এরকম অদ্ভুত টান। বিয়ে করো, তখন বুঝবে।

মালবিকা বলল, বিয়ে না হলেও বুঝত। নেহাত এতগুলো বছর বিলেতে কাটিয়ে এসেছে, সেখানে তো আর শাড়ি-পরা মেয়ে দেখেনি বেশি।

বাজি পোড়ানোর আর উৎসাহ নেই। মালবিকা বলল, এগুলো আর কী হবে! পাড়ার ছেলেমেয়েদের দিয়ে দাও বরং।

রণদেব বলল, কেন, হাউইগুলো এবার ছাড়ো না।

—নাঃ, আর ভালো লাগছে না। এই খোকা, এসো, বাজি নেবে?

সেই ছেলেটা, মানিক যার নাম, আবার এসে গেটের পাশে দাঁড়িয়েছে। মালবিকা তাকে ডাকছে, এসো, বাজি নেবে এসো। ছেলেটা এক-পা দু-পা করে এগোচ্ছে, মুখে একটা লাজুক-লাজুক ভাব, খানিকটা বিশ্বাস, খানিকটা অবিশ্বাস। কোনওদিন কেউ তাকে ডেকে বাজি দেয়নি।

অভিজিৎ বলল, কাকে দিচ্ছ? সেই চোরটা আবার এসেছে? না, না, ওকে দিতে হবে না।

মালবিকা বলল, দিই না! কী হবে রেখে

—না, না, ও একটা মহাচোর। কিছুতেই দেবে না। রেখে দাও বরং, কাল দিদির ছেলেমেয়ের' আসবে।

—কাল পর্যন্ত রাখলে মিইয়ে যাবে।

—তবু রেখে দাও, ওকে দিও না। অ্যাই, তুই আবার এসেছিস? যা, পালা—

ছেলেটা মালবিকার কাছে অনেকটা এগিয়ে এসেছিল। অভিজিতের কাছে তাড়া খেয়েই সে আবার ছুটে পালাল। যাওয়ার আগে সে ছোঁ মেরে দুটো মোমবাতি তুলে নিল।

অভিজিৎ বলল, দেখলে, দেখলে, আবার মোম নিয়ে গেল। এমন বিচ্ছু ছেলে—

রণদেব হাসতে-হাসতে বলল, ছেলেটার বেশ সাহস আছে কিন্তু। আমাদের চোখের সামনে মোম দুটো তুলে নিল!

মালবিকা বলল, কী হবে আর মোম দিয়ে। আমাদের তো আরও এক প্যাকেট মোম আছে একে দিয়ে দিলেই হত!

মালবিকা চলে গেল শাড়ি পালটাতে। অভিজিৎ আর রণদেব ঘরে এসে বসল। অবিলম্বেই এল খাবার, মালবিকা ফিরে এল আরও একটা জমকালো শাড়ি পরে। মেরুন রঙের মুর্শিদাবাদি সিল্কের শাড়িটায় তাকে মানিয়েছে খুব। রণদেব মুগ্ধভাবে তাকাল তার দিকে একবার। কিন্তু বেশিক্ষণ চোখ রাখল না সেদিকে। বলল, বাঃ, এ-শাড়িটা বেশ সুন্দর!

রণদেব এটা বলেছে নেহাত কথার কথা হিসেবে। কিন্তু ওতেই মালবিকা একেবারে হাসিতে ভেঙে পড়ল। বলল, রণদেবদা, তুমি এখনও মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে শেখোনি! শাড়িটা সুন্দর না বলে, শাড়িটা যে পরেছে তাকে খুব মানিয়েছে, এই কথা বলতে হয়।

অভিজিৎ বলল, শিখে নাও রণদেব, শিখে নাও।

রণদেব বলল, ইস, তোমাকে খুশি করা কথা বলতে যাব কেন? মুঙ্গেরে যখন তোমায় চিনতাম, তখন কি ওরকম কথা বলতাম? এখন বন্ধুর বউ হয়েছ বলে—

অভিজিৎ বলল, মুঙ্গেরে থাকার সময় ওকে কীরকম দেখতে ছিল? তোমার মনে আছে রণদেব?

—হ্যাঁ। সব মনে আছে। মালবিকা তখন ছিল রোগা আর লম্বা, রংটাও এত ফরসা ছিল না, নাক দিয়ে সর্দি গড়াত, আর কী দুরন্তই ছিল—

—এই, মোটেই আমি ওরকম ছিলাম না। কী মিথ্যুক!

—মোটেই মিথ্যে কথা নয়।

—দাঁড়াও, তোমাকে আর এ বাড়িতে ঢুকতেই দেব না। বিলেতে গিয়েও তুমি একটুও শিভাল্‌রি শেখোনি! তোমাকে দেখাবার জন্য আমি আমার সবচেয়ে ভালো শাড়িটা পরে এলাম—

অভিজিৎ আর রণদেব প্রাণ খুলে হাসতে লাগল। মালবিকারও সেই হাসিতে যোগ দিতে দেরি হল না।

একটু বাদে মালবিকা জিগ্যেস করল, আচ্ছা, রণদেবদা, সত্যি কি আমি অনেক বদলে গেছি? তুমি আমাকে অনেকদিন বাদে দেখছ, ঠিক বলতে পারবে।

—হ্যাঁ, অনেক-অনেক বদলে গেছ।

—সবাই বদলায়। তুমি বুঝি বদলাওনি?

—তোমার একটা ব্যাপার কিন্তু তেমন বদলায়নি। তুমি এখনও ছেলে মানুষের মতন বাজি পোড়াতে ভালোবাসো। মনে আছে, সেই মুঙ্গেরে। সেই দশেরার দিন থেকে আমরা বাজি ফাটাতে শুরু করতাম। তোমার একটা টকটকে লাল রংয়ের কোট ছিল, তুমি আমদের সঙ্গে ছুটোছুটি করতে বাজি পোড়াবার সময়...একবার একটা ছুঁচোবাজি তোমার কোটটা পুড়িয়ে দিল, তুমি একটুও দুঃখ পাওনি—তোমার দাদা হেমেন বরং খুব রেগে গিয়েছিল।

অভিজিৎ মিটমিট করে হাসছে। বলল, ইস, তোমাদের সেই ছেলেবেলায় আমি সেখানে ছিলাম না! আমার ছেলেবেলাটাও কেটেছে এই বিশ্রী কলকাতায়—

রণদেব বলল, বিলেতে থাকলেও আমার মধ্যে-মধ্যে সেই মুঙ্গেরের দিনগুলির কথা মনে পড়ত, বিশেষ করে পুজোর সময়

মালবিকা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল, আমার কিন্তু আজ বাজি পোড়াতে একটুও আনন্দ হয়নি।

—বাঃ, তুমি যে অত হইহই করছিলে?

—সে প্রথম দিকে। কিন্তু এত বাজি পুড়িয়ে আমরা নষ্ট করছি, আর এখানে কত বাচ্চা ছেলেমেয়ে একটাও পায় না। ওই ছেলেটাকে বাজিগুলো দিয়ে দিলেই হত, ও আরও বেশি আনন্দ করত।

অভিজিৎ বলল, তোমার দেখছি বেশি-বেশি! ও তো একটা চোর—

—শুধু তো মোম নেয়। আর কিছু চুরি করে?

—ওই করেই হাত পাকাচ্ছে।

—কিন্তু ছেলেটা আমার সামনে হাত বাড়িয়ে ছিল!

রণদেব বলল, ওসব কথা বাদ দাও। চলো, একটু বেড়িয়ে আসবে নাকি?

মালবিকা উৎসাহিত হয়ে বলল, চলো!

অভিজিৎ বলল, পাগল, আজ রাত্রে কেউ বেরোয়! কখন মাথায় এসে উড়ন-তুবড়ির খোল পড়বে!

—বাঃ, গাড়ি আছে তো!

—গাড়ি থেকে নামতে হবে তো একবার-না-একবার!

—তোমার এত ভয়?

রণদেব বলল, ঠিক আছে নামতে হবে না। চলো, চৌরঙ্গিপাড়ায় কোথাও আজ খেয়ে আসি সবাই মিলে। ওখানে তো বাজির ভয় নেই। তোমাদের বিয়ে উপলক্ষে আমার তো এমনিতেই একদিন খাওয়ানো উচিত।

মালবিকা বলল, আজ নয়। আজ আমাদের বাড়িতেই ভালো রান্না হচ্ছে।

রণদেবদা, তুমি আজ এখানে খেয়ে যাবে।

—কোনও আপত্তি নেই।

কথায়-কথায় বারবার এসে পড়তে লাগল ছেলেবেলার গল্প। রণদেব মাঝে-মাঝে বিশ্বাসই করতে পারছে না, এই সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী, সুসজ্জিতা মহিলাটিই সেদিনের সেই ছটফটে কিশোরী মালবিকা। মুঙ্গেরে মালবিকাদের বাড়ির অবস্থা তেমন ভালো ছিল না কিন্তু এখন সে বেশ বড়লোকের বউ, এবং বেশ মানিয়ে গেছে। মালবিকা একবার চারটে তুবড়ি চুরি করেছিল তাদের বাড়ি থেকে—সে ঘটনা রণদেবের মনে আছে, কিন্তু ইচ্ছে করে উল্লেখ করেনি। মালবিকার স্বভাব মোটেই

খারাপ ছিল না, ভারী সরল আর দুরন্ত মেয়ে ছিল, সে যে ও ভাবে আঁচলের আড়ালে তুবড়ি নিয়ে যাবে, কেউ ভাবতেই পারেনি। মালবিকার দাদা হেমেনই সেটা দেখে ফেলে। মালবিকার তখন কী কান্না! সেরকম কান্না আর কোনও মেয়েকে এ পর্যন্ত কাঁদতে দেখেনি রণদেব।

অভিজিৎ রেকর্ড-প্লেয়ারে একটার পর একটা রেকর্ড চাপিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বাইরের গোলমালে গান শোনার উপযুক্ত আবহাওয়া তৈরি হতে পারছে না। খানিকটা বাদেই সে শুরু করল চাকরির গল্প। দুজন পুরুষের দেখা হলে বেশিক্ষণ এ প্রসঙ্গ চেপে রাখতে পারে না

খাওয়ার ডাক পড়েছে, ওরা সবেমাত্র খেতে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছে, এমনসময় বাইরে একটা প্রচণ্ড গোলমাল শোনা গেল। কীসের গোলমাল, তা আর কারুকে বলে দিতে হল না, ওরা নিজেরাই বুঝতে পারল। পাশের বস্তিতে আগুন লেগেছে, ধোঁয়ার কুণ্ডলী আর লকলকে আগুনের শিখা ওরা জানলা দিয়েই দেখতে পেল। ওরা তক্ষুণি এসে দাঁড়াল বাইরে। লোকজনের ছুটোছুটি আর প্রচণ্ড চিৎকার, দুটো ছাগল একটা গরু ছাড়া পেয়ে দিশেহারার মতন ছুটছে। দমকল ডাকতে গেছে দু-একজন, এখনও আসেনি।

অভিজিৎ বলল, ইস, অনেকগুলো ঘরে আগুন লেগে গেছে! ভেতরের লোকজন সব বেরিয়েছে কি না—

রণদেব নির্লিপ্তের মতন বলল, নিশ্চয়ই বেরুতে পারেনি—চেঁচামেচি শুনে বুঝতে পারছ না? এরা শুধু চেঁচামেচি করতেই জানে, বাঁচাবার চেষ্টা করবে না!

—ওই ছেলেটাও এই বস্তিতে থাকে।

মালবিকা একদৃষ্টিতে আগুন দেখছিল, একবার মন্তব্য করেছিল, কালীপুজোর দিন কী বিরাট বাড়ি পুড়ছে! এবার অভিজিতের কথা শুনে বলল, কোন ছেলেটা? সেই মানিক, যে মোম চুরি করে?

—হ্যাঁ।

হঠাৎ কী হল মালবিকার, সে দৌড়তে লাগল, ওই আগুন-জ্বলা বস্তির দিকে।

অভিজিৎ আর রণদেব ছুটে এসে ওকে আটকাবার চেষ্টা করল, কিন্তু ধরে রাখতে পারে না কিছুতেই। মালবিকা তেতো গলায় বলল, তোমাদের লজ্জা করে না! মানুষ পুড়ছে, আর তোমরা দাঁড়িয়ে আছ?

অভিজিৎ ধমক দিয়ে বলল, কী পাগলামি করছ! আমরা কী করব? দমকলের লোক এসে যা করার করবে।

—তুমি আমাকে ছেড়ে দাও। তুমি না পারো, তুমি দাঁড়িয়ে থাক—আমি ওই ছেলেটাকে—

মালবিকা যখন সত্যি-সত্যি আগুনের মধ্যে ঢুকতে যাচ্ছে, তখন রণদেব ছুটে এসে শক্ত করে হাত চেপে ধরল তারপর বলল, তুমি দাঁড়াও, আমি দেখছি। শাড়ি পরে তুমি এই আগুনের মধ্যে ঢুকে কারুকে বাঁচাতে পারবে নাকি? তুমি নিজেই মরবে! সরে যাও, সরে যাও, একটা বাঁশ ভেঙে পড়ছে—

মালবিকা বলল, রণদেবদা, আমি জানি, চেষ্টা করলে তুমি ঠিক পারবে!

রণদেব গায়ের কোটটা খুলে রেখে ঠাণ্ডা মাথায় এগিয়ে গেল, যেদিকে তখনও আগুন লাগেনি, সেদিক দিয়ে ঢুকতে গেল। তার মধ্যেই এসে গেল দমকল।

আগুন নিভল প্রায় এক ঘণ্টা বাদে। ততক্ষণ ওরা ঠায় দাঁড়িয়ে। রাস্তা লোকে লোকারণ্য। দমকলের লোকদের সাহায্য করার বদলে সবাই বাধার সৃষ্টি করছে।

অভিজিৎ বলল, একি মালবিকা, তোমার এই শাড়িটাও পুড়ে গেল!

মালবিকা একটুও চমকে উঠল না, নিরুত্তাপ গলায় বলল, কোথায়?

—এই যে!

কখন যেন কয়েকটা ফুলকি পড়ে মালবিকার আঁচলে গোল-গোল গর্ত হয়েছে। মালবিকার সবচেয়ে ভালো শাড়ি। মালবিকা কিন্তু একটুও বিচলিত হল না। উদাসীন ভাবে বলল, যাক গে! আবার তাকিয়ে রইল সেই বস্তির দিকে।

অ্যাম্বুলেন্সও এসে গেছে। সবশুদ্ধ পাঁচটা ঝলসানো দেহ বার করে আনা হল, তার মধ্যে একটা আর কার, সেই মানিকের! ছেলেটা তো এ-বাড়ি ও-বাড়ি থেকে মোম চুরি করে বেড়াচ্ছিল, কখন ও ফিরে গেল বস্তির মধ্যে? ও কি একসঙ্গে সব ক'টা মোমবাতি জ্বেলে উৎসব করছিল?

এই অপ্রীতিকর দৃশ্য অভিজিৎ তার স্ত্রীকে দেখাতে চায় না। সে বলল, চলো, এবার ভেতরে যাই!

মালবিকা যেন সে কথা শুনতেই পেল না, রণদেবকে বলল, তুমি গিয়ে একবার দেখে আসবে, ছেলেটা এখনও বেঁচে আছে কি না?

ভিড় ঠেলে রণদেব গেল অ্যাম্বুলেন্সের কাছে, আবার ফিরে এল। তাকে কিছু বলতে হল না, তার মুখ দেখেই বুঝতে পারল মালবিকা। রিক্ত গলায় বলল, বেঁচে নেই!

তারপর ফিসফিস করে শুধু নিজেকে শোনাবার জন্যই বলল, ও আমার সামনে হাত বাড়িয়ে ছিল, আমি ওকে দিইনি।

রণদেব বুঝতে পারল, মালবিকা আজ রাত্রে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদবে। ছেলেবেলায় ধরা-পড়ে একদিন যেরকম কেঁদেছিল



সুখস্বপ্ন

আমার বন্ধু অমল দুপুরবেলা হঠাৎ ফোন করে জিগ্যেস করল, তুমি কি আজ বিকেলটা ফ্রি আছ? তাহলে তোমার সঙ্গে কিছুক্ষণ সময় কাটাতে পারি। নইলে তোমার সঙ্গে আর তিন-চার বছর দেখা হবে না।

আমি অবাক। পালটা প্রশ্ন করলুম। কেন, আমি কী অপরাধ করেছি, যে জন্য তুমি আমার সঙ্গে আর তিন-চার বছর দেখা করবে না?

অমল বলল, আমি আজ রাত্রের প্লেনেই নাইজিরিয়ায় চলে যাচ্ছি। মাঝখানে কয়েক ঘণ্টা মাত্র সময় আছে। এখন একটু ব্যস্ত আছি, তাহলে বিকেল পাঁচটায় দেখা করছি।

আমি খুবই কৌতূহলের সঙ্গে অমলের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলুম। মাত্র তিন মাস আগে অমল দেশে ফিরে এসেছে বহুকাল বাদে। বিদেশে ও নানান জায়গায় চাকরি করেছে। ইওরোপ-আমেরিকা ঘুরে ও শেষ চাকরি করছিল আফ্রিকার নাইরোবিতে। গত বছর নাইরোবিতে একটা ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থান হয়েছিল, সেই উপলক্ষে ভারতীয়দের অনেক দোকানপাট লুঠ হয়। মিলিটারি এসে বাড়ি-বাড়ি সার্চ করার নামে সব জিনিসপত্র কেড়ে নিয়ে যায়। সে-সময় অমলের অবশ্য ব্যক্তিগত কোনও ক্ষতি হয়নি। ওর বাড়ি সার্চ হয়নি কিংবা মিলিটারি ওকে হয়রানি করেনি। কিন্তু অমলের আর মন টিকলো না। স্ত্রী-পুত্র সমেত গোটা সংসার তুলে নিয়ে চলে এল কলকাতায়। আমাদের বলল, অনেকদিন দেশের বাইরে কাটিয়েছি, এখন দেশে থাকতেই ইচ্ছে করছে।

অমলের চাকরি পাওয়ার সমস্যা নেই। বিশেষ ধরনের কাগজ উৎপাদনের ব্যাপারে ও একজন

বিশেষজ্ঞ। তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশে ও নতুন কাগজের কারখানা স্থাপনের কাজ করেছে। কাগজের চাহিদা এইসব দেশে দিন-দিন বাড়ছে, সুতরাং অমলের মতন বিশেষজ্ঞদেরও কদর বাড়ছে।

দু-মাস বিশ্রাম নেওয়ার পর অমল সদ্য চাকরি খুঁজতে শুরু করেছিল। সঙ্গে-সঙ্গে নানান জায়গা থেকে ওর ডাক পড়ে। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে অমল অনবরত বোম্বাই-দিল্লি-মাদ্রাজ যাতায়াত করছিল। এমনকী শুনেছিলুম একজন ব্যবসায়ী অমলকে সপরিবারে দশদিনের জন্য কাঠমাণ্ডুতে পাঠিয়ে দিয়েছে। সেখানে বসে-বসে অমল চাকরির শর্ত নিয়ে চিন্তা করবে। চাকরির বাজারে অমলের এত খাতির দেখে অনেকেরই ঈর্ষা হবার কথা। সেই অমল আবার আফ্রিকায় ফিরে যাচ্ছে কেন?

বিকেলবেলা অমল এসে যা বলল, তার সারমর্ম এই ঃ

প্রথম কথা, কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গে তার চাকরি করার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। কারণ পশ্চিমবঙ্গে চালু ইণ্ডাস্ট্রিগুলোই এক-এক করে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, নতুন কারখানা খোলার কথা এখানে কোনও ব্যবসায়ী চিন্তা করে না। অমলের অবশ্য ভারতবর্ষের যে-কোনও জায়গাতেই চাকরি করতে আপত্তি নেই। বিভিন্ন জায়গায় ইন্টারভিউ দিয়ে মোটামুটি দুটি কোম্পানি ওর পছন্দ হয়েছিল। প্রথমটি বোম্বাইতে, সেখানে যোগ দেওয়ার সব ব্যবস্থা ঠিকঠাক, হঠাৎ মালিকদের দুই ভাইয়ের ঝগড়ার জন্য হাইকোর্টের ইনজাংকশানে কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। অমল বলল, তুমি ভাবতে পারো, দুই ভাইয়ের ঝগড়ার জন্য কারখানার প্রোডাকশন বন্ধ? প্রোডাকশন বন্ধ হলে তো সেটা দেশের ক্ষতি। তা ছাড়া মালিকদেরও তো লাভের অংশ কমে যাচ্ছে, সেটাও ওরা বোঝে না?

দ্বিতীয় চাকরিটি বাঙ্গালোরে। এটা সব দিক থেকেই ঠিক ছিল। নতুন কারখানা খোলা হবে, তার দায়িত্ব নিতে হবে অমলকে। এই মাসের এক তারিখ থেকে অমলের অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাবার কথা। কিন্তু মালিক জানাল যে তাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হবে তিন তারিখে। এক তারিখের বদলে তিন তারিখ কেন? মালিক প্রথমে কারণটা বলতে চায়নি। কিন্তু অমল জেদ ধরায় জানতে পারলে যে মালিক সব সময় পঞ্জিকা দেখে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেন। পঞ্জিকার মতে তিন তারিখটা শুভ দিন।

আমার চোখে অবিশ্বাস ফুটে উঠতেই অমল হেসে উঠে বলল, আরও শুনবে? ওই কোম্পানির কর্মচারীরা, যাদের মধ্যে বড়-বড় ইঞ্জিনিয়ার এবং টেকনোক্রাট আছে, তারাও মালিকের ঘরে ঢুকবার সময় জুতো বাইরে খুলে রেখে যায়, মালিকের সামনে কেউ চেয়ারে বসে না, মালিকের সামনে সিগারেট খাওয়ার কথা তারা কেউ কল্পনাই করতে পারে না। মালিক নিজে নিরামিষভোজী বলে ওই কোম্পানির অফিসের ক্যান্টিনে শুধু নিরামিষ খাবার দেওয়া হয়। আমাকে ওই কোম্পানি থেকে বাড়ি, ড্রাইভার সমেত গাড়ি, অন্যান্য আরও সুযোগ-সুবিধে আর ইনকাম ট্যাক্স বাদ দিয়ে ক্যাশ চার হাজার টাকা মাইনে দেবার লোভনীয় প্রস্তাব দিয়েছিল, আমি রাজি হলুম না। যে মালিকের সামনে সিগারেট খাওয়া নিষেধ, তার সঙ্গে আমি কাজ করতে পারব না। আমি অবশ্য যে ক'দিন দেখা করেছি, জুতো খুলিনি, চেয়ারে বসেছি এবং পরপর সিগারেট টেনেছি। মালিকও আমার সঙ্গে বন্ধুর মতন ব্যবহার করেছে। কিন্তু আমি জানি, দেড়-দু-বছর বাদে যখন কারখানাটা চালু হয়ে যাবে, আমারও বিদেশের চাকরির কানেকশানগুলো একটু ঢিলে হয়ে যাবে, তখন ওই মালিক আমার সঙ্গে ওর বাড়ির চাকরের মতন ব্যবহার করতে শুরু করবে।

উঠে দাঁড়িয়ে বিদায় নেওয়ার সময় অমল বলল, দেশ ছেড়ে কেন চলে যাচ্ছি জানো? ভারতবর্ষের চেয়ে আফ্রিকা অনেক সভ্য জায়গা।

আমার আর-একজন বন্ধু তপনের অভিজ্ঞতা একটু অন্যরকম। আমেরিকায় বেশ ভালো চাকরি করত তপন, কিন্তু দেশের জন্য বরাবর তার টান ছিল। একবার প্লেনে জাপান যাওয়ার সময় একজন ভারতীয় ভদ্রলোকের সঙ্গে তার আলাপ হয়। ভদ্রলোক নানা কথার পর তপনকে একসময় বললেন, আপনার মতন গুণী ছেলেরা বাইরে পড়ে থাকবেন? দেশে সুযোগ পেলে আসবেন

না? তপন বলেছিল, দেশে আমাদের কে চাকরি দেবে বলুন? দেশে তো এমনিতেই বেকারের সংখ্যা অনেক! ভদ্রলোক বললেন, আমি যদি আপনাকে চাকরি দিই?

সেই ভদ্রলোক ভারতবর্ষের একটি নামকরা ওষুধ কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেকটর। তিনি তপনকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় ফিরলেন এবং তাঁর অফিসে একটা গুরুত্বপূর্ণ পদে তপনকে চাকরির প্রস্তাব দিলেন। আমেরিকার চাকরির মাইনে এবং সুযোগসুবিধের সঙ্গে ভারতীয় চাকরির মাইনে ইত্যাদির তুলনাই হয় না। তবু তপন রাজি হয়ে গেল। আমেরিকায় তার বারো বছরের পুরোনো চাকরি ছেড়ে দিয়ে এল এক কথায়। আসবার আগে আমেরিকায় তার বন্ধুবান্ধবরা খুব ঠাট্টা করেছিল। তারা বলেছিল, সেই তো আবার ফিরে আসতেই হবে, কেন শুধু-শুধু যাওয়া? ইন্ডিয়াতে অত গরম, রাস্তাঘাট খারাপ, লোডশেডিং, যখন-তখন মারামারি, জল পাওয়া যায় না—এর মধ্যে কোনও সভ্য মানুষ থাকতে পারে তপন তেজ দেখিয়ে বলেছিল, আমি কক্ষনো আর ফিরে আসব না। গ্রিন কার্ড ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে যাব।

দেশে ফিরে নতুন চাকরিতে তপন খুব খুশি হয়েছিল। দেখা হলেই বলত, দারুণ লাগছে, আমি প্রত্যেকটা মিনিট উপভোগ করছি। লোডশেডিং সম্পর্কে তার বিরক্তি নেই, ভাঙা রাস্তা দিয়ে খুব সহজে গাড়ি চালিয়ে যায়, এখানকার সমস্ত খাবারদাবার তার খুব পছন্দ।

অন্তত ছ'মাস আমি তপনকে এই রকম মুডে দেখেছিলুম। তারপর একদিন দুপুরবেলা তপন এসে বলল, চলো, আজ কোনও বড় হোটেলে খেতে যাব। আজ একটা ব্যাপার সেলিব্রেট করতে হবে।

আমি জিগ্যেস করলুম, কী ব্যাপার? তোমার কি এরই মধ্যে চাকরিতে প্রমোশান হলো নাকি?

তপন একগাল হেসে বলল, না, আজ থেকে চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছি।

তখনও আমি ভেবেছিলাম যে তপন নিশ্চয়ই প্রথম চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছে আরও কোনও ভালো চাকরির সন্ধান পেয়েছে বলে। কিন্তু ঘটনাটা তাও নয়। তপন বলল, এই চাকরিটাই যথেষ্ট ভালো ছিল, এর চেয়ে ভালো চাকরি সে আশা করে না। তবু কেন তপনকে চাকরি ছাড়তে হল?

তপন অত্যন্ত ভদ্র ছেলে। সে কারুর নামে অভিযোগ জানাতে চায় না। সে শুধু হতাশভাবে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, এখানে কাজ করার কোনও পরিবেশ নেই। কেউ কাজ করতে চায় না। দু-একজন কাজ করতে চাইলেও অন্যরা তাদের বাধা দেয়। আমেরিকায় এতদিন থেকে আমার একটা বাজে অভ্যেস হয়ে গেছে। কাজ না করে মাইনে নিতে লজ্জা করে।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে তপন আবার বলল, এমনকী মালিকরাও চায়, যা চলছে তা-ই চলুক, বেশি প্রোডাকশান বাড়াবার দরকার নেই। কোম্পানি এক্সপ্যাণ্ড করলে আরও অনেক লোক নিতে হবে, তাতে আবার লেবার-ট্রাবল দেখা দিতে পারে ইত্যাদি। এইরকম মনোভাব নিয়ে আমার পক্ষে কাজ করা অসম্ভব!

আমি জিগ্যেস করলুম, তা হলে কী করবে? আমেরিকাতেই ফিরে যাবে আবার?

তপন বলল, কী করি বলো তো? আমেরিকায় যখন মাঝে-মাঝে খুব মন খারাপ হয়ে যেত, তখন ভাবতুম কবে যে দেশে ফিরে যাব! দেশ ছিল আমার কাছে একটা সুখস্বপ্ন। সেই স্বপ্নটাই নষ্ট হয়ে গেল।



জ্বর

প্রথমটা অসিত বুঝতে পারেনি, শুধু সমস্ত শরীরে কীরকম একটা অস্বস্তি লাগছিল। কন্ডাক্টরকে পয়সা দিতে গিয়ে বুঝতে পারল, তার জ্বর এসেছে। একটা পাঁচ টাকা তুলে বলল 'ভবানীপুর!'

দু-চারটে কৌতূহলী চোখ তার দিকে তাকাল। কন্ডাক্টর দার্শনিকের মতো নির্লিপ্ত গলায় বললে, 'ভবানীপুর যাবে না, এ-ট্রাম আলিপুর যাচ্ছে!'

আশ্চর্য! অসিত জানলা দিয়ে তাকাল। ময়দানের মধ্য দিয়ে ট্রাম মেল-ট্রেনের মতো স্পিডে ছুটছে, চারদিক অন্ধকার শীতের বাতাস। এতক্ষণ তার চোখে পড়েনি, অথচ জানলা দিয়ে বাইরেই তো সে তাকিয়ে ছিল। কিছু ভাবছিল কি? কী ভাবছিল মনে নেই!

'আচ্ছা আলিপুরই দিন একটা!' লজ্জায় বলে ফেলল।

হ্যাঁ, জ্বর আসছে, অসিত বুঝতে পারল। কিন্তু আমি আলিপুর যাচ্ছি কেন এত রাত্রে, কী করে বাড়ি ফিরব? কিছু ভাবতে ভালো লাগে না, সমস্ত শরীরে যেন লক্ষ-লক্ষ সূঁচ ফুটেছে, পাথরে শব্দ করে ছুরি ঘষলে যেরকম হয়, বাতাসের ছোঁয়ায় সেইরকম লাগছে।

বেশ বসে ছিল, হঠাৎ অসিতের মাথাটা ঠক করে জানলার কাঠে ঠুকে গেল। কপালের একটা ধার কেটে গিয়েছে। ইস, রক্ত পড়ছে। যাক, ভাগ্যিস কেউ দেখেনি। রক্ত ঝরঝর করে জামায় পড়ছে, ফর্সা জামা-কাপড় সব নষ্ট হয়ে গেল। রক্ত যে থামেই না, অসিত তাড়াতাড়ি কপালে হাত দিল। না, রক্ত নেই তো। কপালের একটা কোণ কেটেছে ঠিকই, সামান্য, রক্ত ঝরঝর করে পড়ছে না। আমি তা হলে এতক্ষণ ভুল ভাবছিলাম। জ্বর হলে মানুষ ভুল বকে, ভুল ভাবেও বুঝি, না, আমি কিছু ভুল ভাবব না, আমি—।

ট্রামের একটি লোক হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে কী হল ভদ্রলোকের!' ঘটাং করে ট্রামটা মাঠের মাঝখানে থেমে গেল। অসিত কখন দুমড়ে বেঞ্চির নীচে পড়ে গিয়েছে। জনকয়েক উৎসাহী ব্যক্তি হই-হই করে উঠলেন।

'আ-হা-হা, জ্বরে একেবারে গা পুড়ে যাচ্ছে। এই নিয়ে কেউ ট্রামে-বাসে ওঠে।'

নেশা-টেশা করেছে কি না, কয়েকজন জিগ্যেস করলেন। তার মধ্যে দু-একজন নিজেরাই নেশাচ্ছন্ন।

ট্যাক্সি, ট্যাক্সি! ধরাধরি করে অসিতকে ট্রাম থেকে নামান হল। হাঁক পড়ল ট্যাক্সির জন্য। ততক্ষণে অসিতের চৈতন্য এসেছে। 'আমি ঠিক আছি, এবার আমি নিজেই যেতে পারব, হঠাৎ একটু মাথাটা—'

'না না, ট্যাক্সি করে চলে যান। এই অবস্থায়—'

রাত্রি দশটা বেজে গিয়েছে, নির্জন ময়দান, তবু হঠাৎ একটা ট্যাক্সি পাওয়া গেল। ট্যাক্সিতে দুজন যুবক-যুবতী ছিলেন, ব্যাপার শুনে তাঁরা সৌজন্য করে ট্যাক্সি ছেড়ে দিলেন।

'ঠিকানা বলতে পারবেন তো মশাই?'

'হ্যাঁ, ভবানীপুর, ফকির সেন স্ট্রিট।'

অসিতকে সবাই ট্যাক্সিতে তুলে দিলেন। ঝাঁকুনি দিয়ে ট্যাক্সি ছেড়ে দিতেই অসিতের যেন

স্বাভাবিক জ্ঞান ফিরে এল। আমি কোথায় যাচ্ছি, আমার তো কিছু হয়নি। ট্যাক্সি করে যাব, আমার এমন পয়সা কোথায়। ট্যাক্সির মিটারে যেন আট-আনাটা লাফাচ্ছে, এক্ষুনি বদলাবে।

'রোককে, গাড়ি থামাও ড্রাইভার।' পকেট থেকে একটা আধুলি বার করে দিল অসিত, 'আমি হেঁটেই যাব।'

পা টলে যাচ্ছে, মাথাটা ভয়ানক ভারী—শরীরের পক্ষে দুর্বিষহ বলে মনে হচ্ছে। তা হোক, আমার ফুসফুসে পোকা নেই, আমার কখনও কোনও কঠিন অসুখ করেনি। জ্বর যতই বাড়ুক—তা আবার সেরে যাবেই, আমি হেঁটেই যাব। তা ছাড়া, আজ আমাকে প্রমাণ করতে হবে, আমি অন্যদিনের মতোই সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ।

কিছুক্ষণ সিধে হাঁটল অসিত। দেখল সামনে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল। অন্ধকারের মধ্যেই সেই বিশাল, শ্বেত অট্টালিকা কীরকম রহস্যময় দেখাচ্ছে। লোকজন নেই, অনেক দূরে বীটের পুলিশের জুতোর খটখট শব্দ শোনা যাচ্ছে।

ওঃ, পথ ভুল করেছি। অসিত বাঁ-দিকে ফিরে আবার হাঁটতে আরম্ভ করল। এত রাতে মেসের দরজা না বন্ধ হয়ে যায়। কাল মেসের চার্জ মিটিয়ে দিয়ে অন্য একটা ভালো মেসে চলে যাবে। কাল কত কাজ। কিছুক্ষণ হেঁটে সামনে চোখ তুলল। সামনে আবার সেই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, সেই বীটের পুলিশের জুতোর শব্দ। দূর ছাই, অসিত একেবারে পিছনে ফিরে হাঁটতে আরম্ভ করল। অনেকক্ষণ। তারপর সামনে আবার সেই শ্বেত অট্টালিকা। আবার ডানদিকে ফিরল, পিছন ফিরল, বাঁ-দিকে গেল, সামনে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল। পরিশ্রান্ত হয়ে অসিত রাস্তার ওপর সোজা হয়ে দাঁড়াল। কালো চকচকে ঝকঝকে রাস্তা—সামনে পিছনে যতদূর দেখা যায়। নিজের হাতটা একবার কপালে ছোঁয়ালে; হাত আর কপাল দুটো যেন উষ্ণতায় পাল্লা দিচ্ছে। আজকে আবার সে সঙ্গে কোনও গরম কাপড় আনেনি। কীই-বা আনত। সেই নীল র‍্যাপারটা তো আর ওখানে গায়ে দিয়ে যাওয়া যেত না। হঠাৎ সে তার পায়ে কোনও জোর পেল না। কিছু ভাববার আগেই ঘুরে পড়ে গেল পথের ওপর।

ঘনঘন নিঃশ্বাস বইছে। সমস্ত শরীরে যেন চাপ-চাপ বাতাস। দু-একবার ওঠবার চেষ্টা করল অসিত। কিন্তু শরীর থেকে মনটা যেন আলাদা হয়ে গিয়েছে। শরীরের ওপর তার আর কোনও কর্তৃত্ব নেই। সেই অবস্থাতেও বাঁচার ইচ্ছেটা প্রবল হয়ে উঠল। টেবিলের ওপর আলপিন দিয়ে গেঁথে রাখা ছারপোকাটা পর্যন্ত বাঁচার জন্য কী তীব্র চেষ্টা করে। খোলা রাস্তার ওপর দিয়ে প্রমোদবিলাসী কোনও মোটরকার হয়ত প্রচন্ডবেগে এসে তাকে থেঁতলে দিয়ে যাবে। অসিত উঠতে পারল না, কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টায় গড়াতে-গড়াতে রাস্তার একপাশে গিয়ে পড়ে রইল।

মাথার উপরে ঝকঝকে নীল শীতের আকাশ। কয়েকটা পরিচ্ছন্ন, ছিমছাম তারা উঠেছে। শিরশিরে বাতাস, গাছের পাতার শব্দ। দূরে মিষ্টি আওয়াজে গির্জার ঘণ্টা বাজল। এগারটা। চার পাশে শান্ত প্রকৃতি, কোথাও কোনও অসামঞ্জস্য নেই। শুধু অসিত জ্বরে বেহুঁশ হয়ে রাস্তার একপাশে পড়ে রইল। প্রায় মিশে রইল ঘাসের সঙ্গে।

বেশ কিছুক্ষণ পর একটি মেয়ে এইদিকে হেঁটে আসতে লাগল, একা। মেয়েটি হচ্ছে সেই জাতের মেয়ে, যারা পুলিশকে দু-চার আনা ঘুষ দিয়ে সাজগোজ করে ময়দানে একা ঘুরে বেড়ায়। কোনও রসিক ভদ্রলোকের সন্ধান পেলে তার কাছ থেকে আগামী দিনের খাওয়ার খরচটা জোগাড় করে নেয়। মেয়েটি গুনগুন করে কী-যেন একটা গান করছে, একঘেয়ে কান্নার মতো শোনাচ্ছে আওয়াজটা, জুতোয় একটা হিল বোধহয় ভেঙে গিয়েছে—একটা পা টেনে-টেনে আসছে, খস-খস-খুট করে শব্দ হচ্ছে রাস্তায়। হঠাৎ মেয়েটির চোখ পড়ল অসিতের দিকে। দেখেই মেয়েটি ভয়ে কেঁপে উঠল। তারপর খুব জোরে-জোরে পা চালিয়ে সোজা চলে গেল অনেকদূর পর্যন্ত, একবারও পিছনে তাকাল না। মিনিটপনেরো পর মেয়েটি আবার ফিরে এল। গান বন্ধ হয়ে গিয়েছে। জুতোর

শব্দ না করে পা টিপে-টিপে আসছে একেবারে অসিতের কাছে এসে দাঁড়াল। কুকুর যেমন গন্ধ শুঁকে সব বোঝে, মেয়েটি প্রায় সেইরকমভাবে ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করল। তারপর এদিক-ওদিক তাকিয়ে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল অসিতের পাশে, কপালে হাত দিয়ে দেখল, না, মরেনি। নেশা-টেশা করেছে বোধ হয়।

মেয়েটি বিনা দ্বিধায় অসিতের বুক-পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল। একটা টাকা আর দু-এক আনা খুচরো পয়সা, একটা কমদামি ফাউন্টেন পেন। মেয়েটা বিরক্তিতে মুখে একটা ভঙ্গি করল, আর ঠিক এইসময় অসিত কী যেন বলে উঠল। গলার আওয়াজ স্পষ্ট নয়। অনেকটা বিড়-বিড় করে অসিত বলল, 'আমার কোনও দোষ নেই, রানী। আপনি তুমি আমাকে ভুল বুঝো না।'

'আ মরণ,' মেয়েটি ধমকে উঠল, 'নালা-নর্দমায় শুয়েও রাজা-রানীর স্বপ্ন।'

অসিত আবার বলে উঠল, 'অসম্ভব, ছিঃ, এ-কাজ কি আমার পক্ষে—না, না।'

মেয়েটা উঠল। কী ভেবে একটা দু-আনি ফেরত রেখে গেল অসিতের বুকপকেটে। তারপর চলে যেতে-যেতে শুনল, 'আমি এদের মতো ধনী নই। তা বলে কি আমার—'

আবার একা দুমড়ে শুয়ে রইল অসিত। আরও কী যেন বলতে লাগল বিড়বিড় করে জ্ঞান নেই। সে কথা বলছে না, যেন তার বুকের মধ্যে থেকে অন্য কেউ।

আরও কিছুক্ষণ পর মাঠের মধ্য দিয়ে একটা জীপ গাড়ি আসতে লাগল। পুলিশের গাড়ি—সার্চলাইট ফেলে দেখছে, মাঠের মধ্যে সন্দেহজনক কিছু আছে কি না। আলোয় ধুয়ে গেল মাঠটা। ঘুরতে-ঘুরতে আলোটা অসিতের শরীরের ওপর এসে থেমে গেল। আলোটা স্থির রেখে শব্দ করতে-করতে গাড়িটা সোজা এগিয়ে আসতে লাগল সেদিকে, থামল হাতদশেক দূরে। জনচারেক লোক লাফিয়ে নেমে ছুটে এল সেদিকে। কাছে এসে দাঁড়াল, একজন বলে উঠল, 'আগে ভালো করে দেখে নিন, ছুঁয়ে-টুয়ে ফেলবেন না।'

একজন খাকি পোশাক-পরা ঘাড়ছাঁটা খোঁচা-খোঁচা চুল, খুব কাছে এসে টর্চ ফেলে দেখল ভালো করে, পায়ের খোঁচা দিয়ে দেহটা একবার উলটে দেখল, কোথাও কিছু নেই।

একজন খস করে শব্দ করে বিড়ি ধরিয়ে বলল, বিষ-টিষ খাওয়াবার ব্যাপার না!

খাকি-পোশাক হাঁটু মুড়ে বসে অসিতের নাকের কাছে হাত রাখল। ভয়ানক গরম এবং দ্রুত নিঃশ্বাস রইছে।

হঠাৎ অসিত আবার বলে উঠল, 'আমি কেন এলাম, এখানে আমার আসা উচিত হয়নি, এদের মধ্যে আমাকে, আমি—'

খাকি-পোশাক বলল, 'ভয়ানক জ্বর হয়েছে দেখছি, ভুল বকছে।'

'আমার নাম অসিত মজুমদার, আমার চাকরি নেই; টাকার অভাবে আমি...কিন্তু এরকম কাজ...আমাকে—'

'ও মশাই, এ যেন জীবনী শোনাচ্ছে!' হাতের বিড়িটা আরেকজন অন্ধকারে ছুড়ে দিয়ে বলল, 'চলুন, ছেড়ে দিন, এসব হাসপাতালের কেস। আমাদের এখনও সাউথের দিকটা দেখা বাকি আছে!' আওয়াজ করে জিপটা চলে গেল।

'আমি না খেয়ে মরতে পারি, কিন্তু আমি ভদ্রলোক...।'

অসিতের জ্ঞান হল খুব ভোরে চোখ মেলে চারদিক দেখে তাড়াতাড়ি উঠে বসল। এখন সে হাঁটতে পারছে, কিন্তু জ্বর একটুও ছাড়েনি। চোখ-মুখ যেন ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছে। সমস্ত শরীরে ভয়ানক উষ্ণ রক্তস্রোত। পকেটে হাত দিয়ে একবার পয়সাগুলোর উদ্দেশ পেল না, বিরক্ত লাগল। তাড়াতাড়ি কোমরে হাত দিল, 'না, ঠিক আছে।' হঠাৎ মনে পড়ল, কালকের সন্ধ্যেবেলাটা

স্বপ্ন নয়। হাঁটতে হাঁটতে হাজরা রোডের মোড়ে এসে দাঁড়াল অসিত, ভোর থেকে সকাল হচ্ছে। একটা পানওয়ালা ঘড়িতে চাবি দিচ্ছে, ছ'টা বাজে। খুব অস্বস্তি লাগল অসিতের। মনে হচ্ছে আশপাশের সমস্ত লোক তাকে দেখছে। নিজেকে এত রুগণ, এমন পরাজিত আর কোনওদিন মনে হয়নি তার।

একটু পরে বেঁটে ছাতা হাতে নিয়ে খুব মন্থর পায়ে একটি মেয়ে এগিয়ে আসতে লাগল সেদিকে, বাস স্ট্যান্ডে এসে দাঁড়াল। সুন্দরী, বাইশ-তেইশ, সকালের মেয়ে-স্কুলের টিচার। তবে চেহারা দেখলে অনুমান করা খুব শক্ত নয় যে, বড়লোকের মেয়ে, পড়াশুনো শেষ করে বিয়ে হওয়ার আগের সময়টুকু শখ করে স্কুলে পড়ায়। মেয়েটির সমস্ত মুখের মধ্যে ভ্রু দুটোই সবচেয়ে সুন্দর, হঠাৎ দেখলে কাজল দিয়ে আঁকা মনে হয়।

অসিত কাছে এগিয়ে এসে বলল, 'রানী, আপনাকে একটা কথা বলতে এলাম।'

রানী চমকে ফিরে তাকাল, ভুরু দুটি বিস্ময়ে বক্র করে বলল, 'একী, কী চেহারা হয়েছে আপনার! ব্যাপার কী?'

'না, এসব কিছু না, একটা কথা বলতে এলাম।'

'জামা-কাপড়ের কী অবস্থা, রাত্রে কী হয়েছিল? কাল অত তাড়াতাড়ি আপনি চলে গেলেন কেন না বলে? আমি শঙ্করকে বললুম, তোমার মাস্টার মশাই কোথায়? ও কিছুই জানে না।'

'ওসব কথা থাক, অন্য সময়। এখন আমি যা বলব, তাই শুনে আপনি চিৎকার করে উঠবেন না, বা দয়া করে বিসদৃশ কিছু করবেন না। পরে আপনি পুলিশে খবর দিতে পারেন! আমি এইটা' অসিত জামার নীচ থেকে বার করল, 'এই সোনার হারটা কাল আপনাদের বাড়ি থেকে চুরি করেছি।'

রানী একটু ফ্যাকাশে ধরনের হাসল। 'কী খোঁজাই খুঁজেছি কাল রাত্রে, বাড়ির কাউকে বলিনি। আপনি এমন ঠাট্টা করতেও পারেন।'

'না, ঠাট্টা নয়', অসিত রানীর চোখ থেকে একবারও চোখ সরাল না, 'এর জন্য অনেকটা আপনিই দায়ী। আপনার জন্মদিনের উৎসবে আপনি আমাকে নেমন্তন্ন করেছিলেন কেন? আমি আপনার ছোট ভাই-এর মাস্টার; তাকে নেমন্তন্ন করা চলে না।'

'ছিঃ, আপনি এসব কী বলছেন! আপনার চোখ-মুখ ভীষণ লাল দেখাচ্ছে, আপনি খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন, এখন বাড়ি যান।'

'না, শুনুন। আপনার জন্মদিনের পার্টিতে নানা উপহার এনেছে সকলে, এসেছে আপনার দাদার বন্ধু দু-তিনটি হবু আই সি এস, হবু ডাক্তার। আমি কী উপহার দেব! মাসের সাতাশ তারিখ! মনে-মনে ভাবলুম, আপনাকে একদিন ব্রাউনিঙ-এর কবিতা বুঝিয়ে ছিলাম, গ্যেটের জীবনী শুনিয়েছিলাম একদিন। তাকে কি উপহার বলা যায় না? না, যায় না। ঘরের সকলে হাসছে, গল্প করছে, আমি এক কোণে চুপ করে বসে আছি, আমি এদের মধ্যে কেউ নই, আমি শুধুই শঙ্করের মাস্টার। হঠাৎ আমি জানি না, কীসের ওপর বা কার ওপর যেন আমি ভয়ঙ্কর রেগে গেলুম।

হারটা আপনার গলা থেকে খুলে আমার জুতোর তলায় চাপা পড়ে যায়। অত্যন্ত ভারী হার, কাল গলায় পড়েছিলেন, অস্বস্তিতে নাড়াচাড়া করছিলেন দু-একবার। একবার নীচু হয়ে চায়ে চিনি মেশাতে গিয়ে খুলে পড়ে যায়। জুতোর তলায় চেপে আমি ভাবলুম, আমি যে কিছু উপহার আনিনি -- সেই অপমানের একমাত্র প্রতিকার হচ্ছে হারটা চুরি করা। আপনাদের প্রচুর আছে, একটা হার-এর জন্য আপনাদের গায়ে সামান্যও আঁচড় লাগবে না, অথচ আমার মেসের তিন মাসের চার্জ মেটানো যাবে, ইউনিভার্সিটির মাইনে দেব, পরীক্ষার ফী দেব...। আপনার মামাত ভাই যখন মুভি ক্যামেরায় তোলা ছবি দেখাবার জন্য সকলকে পাশের ঘরে ডাকল, তখন আমি হারটা পকেটে তুলে নিলাম।'

অসিত চুপ করল। কিছুক্ষণ দুজনেই স্তব্ধ। মিহি ফোঁটায় বৃষ্টি পড়ছে, অসিতের তপ্ত শরীরে

ভয়ঙ্কর অস্বস্তি লাগছে। একটু সরে এসে দুজনে বাস-স্ট্যান্ডের শেডে এসে দাঁড়াল। অসিত হারটা রানীর হ্যান্ডব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল।

রানী এতক্ষণ বাদে বলল, 'আপনি এত ভেবে ওটা নিয়েছিলেন, তবে আবার ফেরত দিতে এলেন কেন?'

'সেইখানেই আমার হেরে যাওয়া। আমার যুক্তি ঠিক ছিল, মনের মধ্যে কোনও অন্যায়-বোধ ছিল না, নিজেকে চোর কিংবা অপরাধী মনে হয়নি। তবু হঠাৎ কাল অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়লাম। আজ সকালে হঠাৎ এখানে চলে এসেছি। দয়া করে এখন আমার ওপর আর করুণা দেখাবার চেষ্টা করবেন না। আপনি একথা সকলকে জানিয়ে দিতে পারেন, পুলিশেও খবর দিতে পারেন।'

'আপনাকে আমি একটি কথা বলতে চাই।' রানী বলল, 'যদি—

'না, এখন আর কিছু বলবেন না আমাকে। আপনার বাস আসছে, স্কুলের দেরি হয়ে যাবে।'

'হোক দেরি শুনুন...

অসিত ততক্ষণে পিছন ফিরে হাঁটতে শুরু করেছে। যতদূর পর্যন্ত রানী তাকে দেখতে পাবে, ততক্ষণ সে একবারও পিছন ফিরল না, তারপর বাঁ-দিকে মোড় ঘুরে গেল। তার মনে পড়ল, কাল রাত্রে সে কীরকম পড়ে গিয়েছিল ময়দানের মধ্যে! ভিজে ঘাস, শিরশিরে বাতাস, মাথার ওপর চকচকে নীল আকাশ। হঠাৎ অসিত অনুভব করল, তার গা কেমন ভিজে-ভিজে, কুল-কুল করে ঘাম বয়ে যাচ্ছে সারা দেহে। জ্বর ছেড়ে যাচ্ছে।

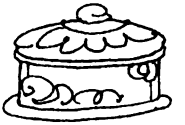

ভালোবাসা

তপনের আজকাল প্রায়ই মন খারাপ থাকে। প্রায়ই সে একা-একা দাঁড়িয়ে থাকে জানলায়, অথবা ছাদে উঠে ঘুরে বেড়ায়, আর মনে হয়, পৃথিবীতে আমাকে কেউ ভালোবাসে না।

তা যদিও সত্যি নয়, বাবা-মা তাকে খুব ভালোবাসেন, আর ছোটমাসি তো এলেই তাকে কত আদর করেন। দাদা তাকে মাঝে-মাঝে খুব বকুনি দেয় বটে—দাদার বইপত্তরে হাত দিলে খুব চটে যায়—কিন্তু দাদাও তো তাকে চকলেট কিনে দেয়, মুড়ি কেনার পয়সা দেয়। আর তাদের বুড়ো কাজের লোক বেচারাম তো তপনের সবকথা শোনে। তবুও যে তপনের কেন মনে হয়, আমাকে কেউ ভালোবাসে না।

গত মাসে তপন তেরো থেকে চোদ্দো বছরে পা দিয়েছে। হঠাৎ কীরকম তাড়াতাড়ি সে লম্বা হয়ে যাচ্ছে, এখন সে মায়ের চেয়েও লম্বা! গত বছর পুজোর সময় কেনা জামা এখন তার ছোট হয়। গলায় আওয়াজটাও কীরকম ভাঙা-ভাঙা আর মোটা হয়ে গেছে, নিজের গলা বলে চেনাই যায় না।

এখন আর সে মা-বাবার সঙ্গে এক বিছানায় শোয় না, মা তাকে বলেছিলেন দাদার সঙ্গে শুতে, কিন্তু তপন রাজি হয়নি। দাদা ঘুমের মধ্যে যা লাথি মারে! এখন তপনের আলাদা খাট। এক একদিন মাঝ রাত্রিতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে তপনের কীরকম ভয় ভয় করে। না তপন ভূতের ভয় পায় না। সায়েন্স বইতে সে পড়েছে, ভূত বলে কিছু নেই। কিন্তু ঘুম ভাঙার পর মনে হয়, সমস্ত পৃথিবীটা কী অসম্ভব চুপচাপ, একটা কুকুর শুধু দূরে কান্নার মতন ডাকছে আর কোথাও

কেউ নেই যেন। তখন তপনের মনে হয়, আমি কী ভীষণ একা, আমাকে কেউ ভালবাসে না।

দুপুর থেকেই বৃষ্টি হচ্ছে, তপন স্কুল থেকে ভিজতে ভিজতে বাড়ি ফিরলো। আজ আর বিবেকানন্দ পার্কে খেলতে যাওয়া হবে না। ঘুড়ি ওড়ানোরও উপায় নেই। তপন এখন কী করে? গল্পের বইও কিছু নেই। সব পড়া বই—আর দাদার বইতে হাত দিলেই তো দাদা বলবে, বড়দের বই পড়তে নেই! কী হয় বড়দের বই পড়লে? তপন তো লুকিয়ে-লুকিয়ে দাদার আলমারির তিন চারখানা বই পড়েছে, কিছু তো হয়নি! তবে বইগুলো বড্ড একঘেয়ে, খালি কথা আর কথা!

মা পাশের বাড়ির শান্তিপিসির সঙ্গে কথা বলছিলেন, সেখানে গিয়ে তপন দাড়াতেই ওঁরা চুপ করে গেলেন। তপন এখন বুঝতে পারে, চুপ করে যাওয়া মানে তার সামনে ওঁরা এখন কথা বলতে চান না। তপন সেখান থেকে চলে এল। দাদার ঘরে দাদা বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছে আর লুকিয়ে-লুকিয়ে সিগারেট খাচ্ছে। সেখান যেতেই দাদা বকুনি দিয়ে উঠল, তুই এখন যা এখান থেকে।

তপন কোথায় যাবে? পাশের বাড়ির টুলটুলের সঙ্গে সে আগে ক্যারাম খেলত। কিন্তু টুলটুলটা শাড়ি পরতে শিখে কেমন যেন বদলে গেছে! এখন সব সময় সে মেয়েদের সঙ্গে মেশে, আর মাঝে-মাঝে ফিসফিস করে নিজেদের মধ্যে কী বলেই অমনি হাসিতে গড়িয়ে পড়ে! মেয়েদের সব সময়েই হাসি! ওদের এইজন্য ভালো লাগে না তপনের। টুলটুল এখন আর তার বন্ধু নয়। তবু তপন জানলা দিয়ে ডাকল, এই টুলটুল আয় ক্যারাম খেলবি? টুলটুল আয়নার সামনে চুল আঁচড়াতে ব্যস্ত। তপনকে রীতিমত অবজ্ঞা করে উত্তর দিল, না, আমি জামাইবাবুর সঙ্গে সিনেমায় যাব।

তপন একা-একা ছাদের সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল। বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে রইল এক দৃষ্টে। তার খুব মন খারাপ। তাকে কেউ ভালোবাসে না।

এর দুদিন পর তপন রাস্তা দিয়ে তন্ময় হয়ে হেঁটে আসছিল, চোখ আকাশের দিকে, সে ঘুড়ির প্যাচ খেলা দেখছে। কোন ঘুড়িটা কাটবে, এটা না দেখা পর্যন্ত সে চোখ ফেরাতে পারে না। কালো চাঁদিয়ালটা দুলতে-দুলতে আসছে। কতকগুলো রাস্তার ছেলে ছুটছে সেটাকে ধরার জন্য। ঘুড়িটা বকুল গাছেই আটকাত, হঠাৎ গোঁৎ খেয়ে চলে গেল মাঝ রাস্তার দিকে, আর একটা বাচ্চা ছেলে তীরের মতো ছুটে গেল সেদিকে।

তপন চেঁচিয়ে উঠলো, এই! এই! গাড়ি—একটা গাড়ি খুব কাছেই ছেলেটা দেখেনি। তপন আর থাকতে পারলো না, সে একা দৌড়ে গিয়ে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল ছেলেটাকে। তারপরই কী হল, তপনের আর জানা নেই।

কাছেই তপনের বাড়ি। পাড়ার লোক চিনেত পারল। মোটর গাড়িটার সঙ্গে ধাক্কা লেগেছে তপনের। বিশেষ কিছু নয় অবশ্য। সেই গাড়ির ড্রাইভার এবং অন্যান্য লোকেরা ধরাধরি করে তপনকে নিয়ে এল বাড়িতে।

—এই তপু! এই তপু!

যেন খুব দূর থেকে একটা ডাক শোনা যাচ্ছে। তপন আস্তে-আস্তে চোখ মেলল। চোখের সামনেই তার মায়ের মুখ। কান্নায় ভেসে যাচ্ছে। বাবার মুখে কী দারুণ উৎকণ্ঠা। দাদা কোনওদিন এই সময় বাড়িতে থাকে না—দাদাও ব্যগ্রভাবে ডাকছে, এই তপু! বেচারামেরও মুখ শুকনো। টুলটুলও এসেছে, তার মুখ দেখেও মনে হয় এক্ষুনি সে কাঁদবে।

তপনের আর ব্যথা নেই। তার খুব আরাম লাগছে। ঘরে সবার মুখ দেখে মনে হচ্ছে সবাই কী দারুণ উৎকণ্ঠিত তার জন্য। তপন বুঝতে পারল এরা সবাই তাকে ভালোবাসে। খুব ভালোবাসে!



দেখা না দেখা

কোথাও বেড়াতে গেলে অনেক কিছুই দেখা হয়, কিন্তু একটা কিছু বাকি থেকে যায়। সেই না-দেখা একটা কিছুর জন্য মন কেমন করে।

শেষরাত্রে নেমেছিলাম জলগাঁও স্টেশনে। ভোর পর্যন্ত বাসে সেখানেই কাটিয়ে তারপর চলে এলাম ঔরঙ্গাবাদ। আগে থেকে হোটেল ঠিক করা ছিল না, বাসেই কয়েকজনের সঙ্গে আলোচনা করে সস্তা গোছের হোটেলের নাম জেনে নিয়েছিলাম। দু-জায়গা ঘুরে শেষপর্যন্ত একটা গুজরাটি হোটেলে জায়গা পাওয়া গেল। আর সবই ভালো, শুধু নিরামিষ খেতে হবে। যাক গে, মোটে তো তিনটে দিন।

তার বেশি আর সময় হাতে নেই। আগামী সোমবার আমাকে বম্বে পৌঁছোতেই হবে। একটা চাকরির ইন্টারভিউয়ের ব্যাপার। মাঝখানে এই ফাঁকে অজন্তা-ইলোরা ঘুরে যাওয়া।

চা খেয়েই গেলাম বাঁস-ডিপোয়। অজন্তা-ইলোরা দুটো দু-দিকে, বেশ দূরে-দূরে। ট্যাক্সি নিয়ে যাওয়ার অনেক খরচ। ট্যুরিস্ট বাসেও সেদিন কোনও জায়গা নেই। এর মধ্যেই সব ভরতি। তবে পরের দু-দিনের টিকিট আছে।

সেই টিকিটই কেটে নিয়ে যেই আবার রাস্তায় এসেছি, অমনি রাহুলদার সঙ্গে দেখা।

দুজনেই অবাক।

রাহুলদা বললেন, তুই?

আমি বললাম, আপনি?

রাহুলদা আমার কাঁধে একটা প্রকাণ্ড চাপড় মেরে বললেন, কবে এসেছিস এখানে? আমাকে খবর দিসনি কেন?

—আমি কী করে জানব যে আপনি এখানে থাকেন?

—তোকে দেবু কিছু বলেনি?

দেবু আমার ছোটকাকা। রাহুলদা তাঁর বন্ধু। কাকার বন্ধুকে কাকাই বলা উচিত। কিন্তু রাহুলদাই আমাদের বারণ করে দিয়েছিলেন। উনি কাকা, জ্যাঠা, পিসেমশাই হওয়া একদম পছন্দ করেন না। বলে দিয়েছিলেন দাদা বলে ডাকতে। ওর বয়েস এখন পঞ্চাশের কাছাকাছি।

রাহুলদা ইনকাম ট্যাক্স বিভাগে কাজ করেন। কিছুদিন আগে এখানে ট্রান্সফার হয়ে এসেছেন।

—কোথায় উঠেছিস? চল, আমার ওখানে চল!

আমি বললাম, আমি যে হোটেলে বুক করে ফেলেছি?

—কোন হোটেল? চল, আমি দেখছি।

রাহুলদা হোটেলে গিয়ে ম্যানেজারের সঙ্গে কীসব কথা বললেন, অমনি সব ব্যবস্থা হয়ে গেল, আমাকে আর টাকা দিতে হল না। একটা গাড়ি ডাকিয়ে সুটকেসটা তুলে রাহুলদা বললেন, আয় আমার সঙ্গে।

রাহুলদা কোয়ার্টার পেয়েছেন চমৎকার। একতলা একটি বাংলো ধরনের বাড়ি। সামনে-পেছনে বাগান। বড়-বড় চারখানা ঘর। রাহুলদার বদলির চাকরি বলে ছেলেমেয়েরা বরাবর হোস্টেলে থাকে।

ছেলে শিবপুরে, মেয়ে শান্তিনিকেতনে। বাড়িতে শুধু স্বামী স্ত্রী থাকবার কথা, কিন্তু আর-একজন আছে। রাহুলদার স্ত্রীর ছোটবোন যশোধারা। মাসদেড়েক হল, সে এখানে এসে আছে। রাহুলদার স্ত্রীর হাঁপানি আছে, মাঝে-মাঝে একদম শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। এখন সেইরকম অবস্থা।

যশোধারার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েই রাহুলদা বললেন, শোন সুনীল, এর সঙ্গে কিন্তু প্রেম-ট্রেম করার চেষ্টা করিস না। এর বিয়ে ঠিক হয়ে আছে। আর একুশ দিন পরেই ওর বিয়ে।

যশোধারা ভুরু কুঁচকে রাহুলদাকে ছোট্ট বকুনি দিল

রাহুলদার এইরকম আলগা রসিকতা করার অভ্যেস বরাবরই। আমি বললাম, তোমার সাবধান করে দেওয়ার দরকার ছিল না। তোমার সুন্দরী শ্যালিকা, তার সঙ্গে কি আমি প্রেম করার সাহস দেখাতে পারি? তুমি থাকতে!

রাহুলদা হা-হা করে হেসে উঠলেন, বউদি উঠে এসে একটা বেতের চেয়ারে বসেছেন বারান্দায় তাঁর সামনেই বললেন, সত্যি, নিজের বউ অসুস্থ, শয্যাশায়ী, এই সময় সুন্দরী শ্যালিকার সঙ্গে প্রেম করাই উচিত ছিল আমার ঠিক গল্পে এরকম হয়। রবীন্দ্রনাথের কী একটা উপন্যাস আছে না এরকম?

বউদি ক্ষীণভাবে হেসে বললেন, তা একটু করে নিলেই পারতে। খুকু আপত্তি করত না

রাহুলদা বললেন, করতাম। কিন্তু মুশকিল হল কী জানো? ওই যে বিয়ে ঠিক করে ফেলল! কুমারী মেয়ের সঙ্গেও প্রেম করা যায়, বিবাহিতা মেয়েদের সঙ্গেও প্রেম করা যায়। কিন্তু যে মেয়ের আর মাত্র মাসখানেকের মধ্যেই বিয়ে হবে, নিজেই সে-বিয়ে ঠিক করেছে, সে-মেয়ের সঙ্গে প্রেম করতে নেই। সেটা আন-এথিক্যাল।

যশোধারা বলল, রাহুলদা, আপনারা বুঝি কোনও মেয়ে দেখলেই প্রেমে পড়ে যাওয়ার কথা ভাবেন? সেই মেয়েটি রাজি হবে কি না, সেকথা ভাবেন না? প্রেমে পড়া ছাড়া আর বুঝি কোনও কাজ নেই মেয়েদের?

রাহুলদা বললেন, যতই কাজ থাক, তা বলে কি প্রেমটা বাদ দিলে চলে? এই যে সুনীলদাকে দেখছ, এ যে কত মেয়ের সঙ্গে--

আমি বললাম, রাহুলদা, তুমি ভুলে যাচ্ছ আমি বেকার। বেকারকে কোনও মেয়েই পাত্তা দেয় না।

বেশ কিছুক্ষণ আড্ডা জমানো গেল। আমি মাত্র তিনদিন থাকব জেনে ওরা সবাই বেশ আপশোশ করতে লাগলেন। রাহুলদা বললেন, তুই যদি আর কয়েকদিন আগে আসতিস! আমার অফিসের গাড়িতে আমি যশোধারাকে অজন্তা আর ইলোরা সব ঘুরিয়ে দেখালাম। তখন এলে একসঙ্গে হয়ে যেত।

আমি বললাম, তাতে কোনও ক্ষতি নেই। আমি ট্যুরিস্ট বাসের টিকিট কেটে এনেছি।

রাহুলদা বললেন, অবশ্য ওরা ভালোই দেখায়। অনেকটা সময় দেয়। দু-জায়গা ঘুরতে তোর দু-দিন পুরো লেগে যাবে।

যশোধারা জিগ্যেস করল, আপনি ঔরঙ্গাবাদ কেভস দেখতে যাবেন না?

আমি অবাক হয়ে বললাম, এখানেও কেভস আছে নাকি? জানতাম না তো! রাহুলদা বললেন, এখান থেকে খুব কাছেই পাঁচ সাতমাইল দূরে পাহাড়ের ওপর কেভস আছে, অজন্তার মতনই, তার দেওয়ালে ছবি আঁকা। অনেকেই এর খবর রাখে না।

যশোধারা বলল, খুব সুন্দর কিন্তু কয়েকটা ছবি আমার খুব ভালো লেগেছে, বিশেষ করে সেই নর্তকী...

রাহুলদা বললেন ঔরঙ্গাবাদের কেভস আমরা আজ বিকেলেই সুনীলকে দেখিয়ে আনতে পারি। ঘণ্টাদুয়েক লাগবে। আমি অফিস থেকে একটু তাড়াতাড়ি চলে আসব।

সেই রকমই ঠিক হয়ে রইল রাহুলদা অফিসে চলে গেলেন। আমি খেয়েদেয়ে একটা

ঘুম দিলাম।

চারটের সময় রাহুলদার অফিস থেকে গাড়ি এল। কিন্তু রাহুলদা এলেন না। ড্রাইভারের হাতে দু-খানা চিঠি। একটা আমার জন্য, একটা যশোধারার। আমার চিঠিতে রাহুলদা লিখেছেন, উনি অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ফিরতে পারছেন না, বম্বে থেকে কয়েকজন অফিসার এসেছেন, তাই একটু বেশিক্ষণ থাকতে হবে, ফিরতে-ফিরতে ছ'টা হয়ে যাবে। অন্ধকার হয়ে গেলে আর ওই গুহাচিত্র দেখতে গিয়ে লাভ নেই। সুতরাং আমি যেন তখুনি ওই গাড়িতে বেরিয়ে পড়ি।

যশোধারা তার নিজের চিঠিটা পড়ে বলল, একলা-একলা আপনার যেতে ভালো লাগবে না। রাহুলদা লিখেছেন আমাকে আপনার সঙ্গে যেতে।

আমি ভদ্রতা দেখিয়ে বললাম, আপনি তো ক'দিন আগেই ঘুরে এসেছেন, আবার যাবেন কেন? আমি একলাই দেখতে পারব।

যশোধারা বললেন, ওসব জিনিস বারবার দেখা যায়। আমি এক্ষুনি তৈরি হয়ে নিচ্ছি।

বেরুতে-বেরুতে আরও আধঘণ্টা সময় লেগে গেল। তারই মধ্যে আকাশে ঘনিয়ে এল মেঘ। একটুবাদেই আলো কমে আসবে।

যশোধারা নিজের ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে বলল, ইস, দেরি করে ফেললাম। চলুন-চলুন এরপর আর ভালো করে দেখা যাবে না।

ড্রাইভার লম্বা সেলাম করে আমাদের দরজা খুলে দিল। আমরা উঠে বসলাম। গাড়ি ছাড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই ঝির ঝির করে বৃষ্টি নামল।

প্রথম পাঁচ মিনিট আমরা কোনও কথা বললাম না। তাতে আমার নিজেরই খুব অস্বস্তি লাগল। যশোধারা নিজের ইচ্ছেতেই যাচ্ছে আমার সঙ্গে।

আমি বললাম, আপনি এখানে আর কদিন থাকবেন?

যশোধারা বলল, আর দিনসাতেক। দিদির শরীরটা একটু ভালো হলে দিদিকে একেবারে সঙ্গে নিয়ে যাব।

আমি হেসে বললাম, বিয়ের জন্য কেনা-কাটা তো করতে হবে। তারজন্য মাত্র এই ক'টা দিন সময়?

আজকালকার মেয়েরা বিয়ের কথায় লজ্জা পায় না। যশোধারা অম্লান মুখে বলল সে সব হয়ে গেছে।

—আপনার বিয়ে হবে কোথায়? কলকাতায়?

আমাকে চমকে দিয়ে যশোধরা বলল, না, বিলেতে।

—বিলেতে?

—হ্যাঁ। ও, মানে কৌশিক, যার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে তার আসবার কথা ছিল, কিন্তু এই মাসেই ও চাকরি বদলাচ্ছে। নতুন চাকরিতে এখন বেশ কিছুদিন ছুটি পাওয়া যাবে না, তাই আমিই চলে যাব ওখানে।

দারুণ রোমাঞ্চকর ব্যাপার। বিয়ের কনে যাবে বরের কাছে। একা-একা?

জিগ্যেস করলাম, আপনার সঙ্গে কেউ যাবে?

—না।

—আপনার বাবা-মায়ের কষ্ট হবে না? আপনার বিয়ের সময় কেউ উপস্থিত থাকবেন না।

—আমার বাবা থাকেন স্বর্গে। তিনি এমনিতেই উপস্থিত থাকতে পারবেন না।

—ও!

গাড়িটা যাচ্ছে খুব জোরে। সামনে দেখা যাচ্ছে পাহাড়। হঠাৎ বেশ জোরে একটা শব্দ হল গাড়ির নীচ থেকে তার পরই সেটা টালমাটাল হয়ে গড়াতে লাগল বিপজ্জনকভাবে। মনে হল, গাড়িটা

যে-কোনও সময় রাস্তার ধার দিয়ে গড়িয়ে পড়ে যাবে।

আমার নিজের জন্য কোনও চিন্তা হল না। কিন্তু ভাবলাম যদি যশোধারার কিছু হয়? যদি কোনও আঘাত লাগে? আর কদিন পরই তার বিয়ে, তার জন্য বিলেতে একজন প্রতীক্ষা করে আছে। দরকার হলে আমার জীবন দিয়েও ওকে বাঁচাব।

গাড়িটা থেমে গেল রাস্তার এক পাশে।

—কী হল?

ড্রাইভারের কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম। সে কোনও উত্তর না দিয়ে নেমে গেল। আমিও নেমে পড়লাম। ড্রাইভার উঁকি মারল গাড়ির নীচে। একটু বাদে সে উঠে দাঁড়িয়ে বিবর্ণ মুখ করে বলল, আমরা খুব জোর বেঁচে গেছি। গাড়ির অ্যাক্সেল ভেঙে গেছে।

এই রে!

যশোধারা মুখ বাড়িয়ে জিগ্যেস করল, কী হয়েছে?

আমি বললাম, আমাদের লাক খারাপ। অ্যাক্সেল ভেঙে গেছে।

গাড়িটার চেহারা বেশ চকচকে। নতুনের মতন। কিন্তু এইসব দিশি গাড়ি কখন যে খারাপ হবে, তার কোনও ঠিক নেই।

যশোধারা নেমে এসে বলল, গাড়িটা ঠিক করতে কতক্ষণ লাগবে?

ড্রাইভারের বদলে আমিই উত্তর দিলাম, লোক ডেকে আনতে হবে। আজ তো হবেই না—

যশোধারা কিন্তু একটুও ঘাবড়াল না। সে বলল, আর বেশি দূর নয়, ওই তো সামনেই দেখা যাচ্ছে, বড়জোর এক মাইল হবে, চলুন হেঁটেই যাই।

হেঁটে যাব? তারপর ফিরব কী করে?

সে একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে কিছু। ওখানে নিশ্চয়ই অন্য লোকদের গাড়ি কিংবা ট্যাক্সি থাকবে। কারুর কাছে লিফট চাইলেই হবে।

যশোধারা নিজে দেখেছে ওই গুহাচিত্র। তবু আমাকে দেখাবার জন্য ও হেঁটে যেতে চাইছে। মনে-মনে আমি ওর কাছে কৃতজ্ঞ বোধ করলাম।

কিন্তু বেশিক্ষণ হাঁটা গেল না। বৃষ্টিটা একটু থেমেছিল, আবার হঠাৎ এসে পড়ল হুড়মুড় করে। এমন জোরালো বৃষ্টি যে কিছু চিন্তা করারও সময় দিল না।

কাছাকাছি আশ্রয় নেওয়ার মতন কোনও জায়গা নেই। এদিকে বাড়ি-ঘর নেই একটাও। খানিকটা দুরে একটা একলা গুলমোর গাছ রয়েছে।

যশোধারাকে বললাম, চলুন, ওই গাছটার নীচে দাঁড়াই।

আমি বলতে-না-বলতেই যশোধারা ছুটতে শুরু করেছে। শাড়ি পরেও ও বেশ ভালো দৌড়োতে পারে।

কিন্তু গাছতলায় পৌঁছবার আগেই আমরা দুজনে বেশ ভিজে গেলাম। গাছতলায় দাঁড়িয়ে যশোধারা আঁচল দিয়ে মুখ মুছল।

আমি বললাম, ইস, শুধু-শুধু আমার জন্য আপনি এলেন, আর এইরকম ভিজতে হল!

যশোধারা হেসে বলল, একটু ভিজলে কী হয়েছে? বেশ একটা অ্যাডভেঞ্চার হল আজ। বৃষ্টির সঙ্গে-সঙ্গে প্রবল ঝড়ো বাতাস। শুকনো পাতা আর ফুল ঝরে পড়ছে গাছটা থেকে। একটু বাদেই গাছটা আর আমাদের আশ্রয় দিতে পারল না। গাছের পাতা চুঁইয়ে বৃষ্টির চেয়েও জোরে জল পড়তে লাগল আমাদের ওপরে।

দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভেজা ছাড়া উপায় নেই। আমরা আমাদের গাড়িতে ফিরে গিয়ে আশ্রয় নিতে পারতাম। কিন্তু গাড়িটা থেকে প্রায় আধমাইল দূরে চলে এসেছি। ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে এতখানি রাস্তা হেঁটে যাওয়া সহজ নয়।

আধঘন্টার মধ্যেও বৃষ্টি থামল না একটুও। দুজনেই ভিজে চুপচুপে। যশোধারা একটুও ঘাবড়ায়নি। সে বেশ হাসিমুখেই বলল, আপনার আর ঔরঙ্গাবাদ কেভস দেখা হল না। এরপর একদম অন্ধকার হয়ে যাবে।

ভিজে শাড়িতে যশোধারার সুন্দর শরীরের প্রতিটি রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাকে দেখাচ্ছে কোনও শিল্পীর গড়া মূর্তির মতন কিংবা হেমেন মজুমদারের আঁকা ছবি। আমি দু-একবার গোপনে ওর দিকে তাকাতে লাগলাম।

ঠিক গল্পের মতন রোমান্টিক পরিবেশ। ফাঁকা রাস্তায় একটি মাত্র গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছি আমরা দুজনে। বৃষ্টিতে ভিজছি। একটু একটু শীত করছে। এই সময় যশোধারার গলা জড়িয়ে ধরে...

না, না, একুশ দিন পরে যে-মেয়ের বিয়ে হবে, তার সঙ্গে প্রেম করতে নেই। শাস্ত্রে নিষেধ আছে। কিন্তু তার দিকে মাঝে-মাঝে তাকানোও কি অপরাধ? সুন্দর কোনও দৃশ্য দেখায় তো পাপ নেই। তাই যশোধারাকে আমি চোখ ভরে দেখতে লাগলাম।

খানিকটা পরে উলটো দিকের রাস্তা দিয়ে পরপর দুটো গাড়ি এল। আমরা রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে ওদের থামতে বললাম। যশোধারা একটা গাড়ির একেবারে সামনে এগিয়ে গেল।

দুটো গাড়িতেই লোক ভরতি ছিল। তবু কোনরকমে জায়গা হয়ে গেল। আমরা গাড়িতে ওঠবার পর একজন লোক ইংরেজিতে বলল, আপনার স্ত্রী গাড়িটার দিকে অমন বিপজ্জনক ভাবে ছুটে আসছিলেন...বৃষ্টির সময়...একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়ে যেতে পারত...

যশোধারাও শুনেছে কথাটা। সে মুচকি হাসল। আমি আর প্রতিবাদ করবার প্রয়োজন বোধ করলাম না।

এর পরের দুদিন আর একটুও সময় পেলাম না আমি। অজন্তা ইলোরা দেখায় কেটে গেল। তারপর রাত্তিরের বাসে চেপে বম্বে। ঔরঙ্গাবাদ কেভস আর দেখা হয়নি।

কিছুদিন আগে একটি ইতিহাসের বইতে ছবি দেখছিলাম সেই কেভসের সেই বিখ্যাত নর্তকী। আমার দীর্ঘশ্বাস পড়ল। অত কাছে গিয়েও দেখা হয়নি। আর কি কোনওদিন দেখা হবে?

ঔরঙ্গাবাদ কেভসের নর্তকীকে আমি দেখিনি। তার বদলে দেখেছিলাম এক জীবন্ত ছবি। সেই গুলমোর গাছের নীচে, বৃষ্টির মধ্যে, যশোধারা সুঠাম শরীর, হাসিতে উজ্জ্বল মুখ। যশোধারা এখন বিলেতে, তার সঙ্গে হয়তো জীবনে আর কখনও দেখা হবে না। কিন্তু তার বৃষ্টি-ভেজা ছবিটা বহুদিন বাঁধানো থাকবে আমার বুকের মধ্যে।



জঙ্গলের মধ্যে মন্দির

টর্চ, টর্চ কোথায়?

অতীশদা, টর্চ কোথায়? অতীশদা—

এক্ষুনি ড্রপ উঠবে। প্রথম দৃশ্য শুরু হবে। সভাপতির ভাষণ-টাসন শেষ। প্রথম দৃশ্যেই পোড়ো বাগানবাড়ি। জেল-ফেরত নায়ক এক গাল দাড়ি নিয়ে ছেঁড়া কোট পরে টর্চ হাতে ঢুকবে সেখানে তার অতীত দেখতে। সকলেই রেডি, নায়ক দাড়ি চুলকোনো সেরে নিয়েছে, কনসার্ট শেষ, কিন্তু টর্চ? চার-পাঁচজন মিলে একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলেন, অতীশবাবু, অতীশদা—

অতীশ এক কোণে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল, এগিয়ে এসে নিঃশব্দে হাত বাড়িয়ে দিলেন। চকচকে পাঁচ ব্যাটারির বিশাল লম্বা টর্চ। নায়ক সেটা হাতে নিয়ে প্রথম উইংসের পাশ দিয়ে ঝড়ের বেগে ঢুকে পড়তে যাচ্ছিল, এমনসময় পরিচালক তার কলার চেপে ধরলেন, জ্বেলে দেখুন মশায়, জ্বলে কি না। নাকি শেষটায়—

আশ্চর্য, সত্যিই টর্চটা জ্বলল না। পরিচালক চটাস করে কপালে একটা থাপ্পড় মেরে (নিজের) বললেন আপনাদের অফিস-টফিসের প্লে-তে এই এক ঝঞ্ঝাট! একটা জিনিস যদি ঠিক পাওয়া যায়! সেক্রেটারি মশাই কোথায়, দেখুন এখন কী করবেন?...ওরে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক দে, মিউজিক দে, মাঝরাতের মিউজিক...লোকে চ্যাঁচাবে এক্ষুনি! —তিনি নিজেই গলা ফুলিয়ে প্যাঁচার ডাক দিতে লাগলেন।

সামনেই দোকান আছে দেখুন ঝটপট হয় কি না—যান না—

অতীশ চটি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। খালি পায়েই গ্রিনরুম থেকে বেরিয়ে ট্রামলাইন পেরিয়ে দোকানে উপস্থিত হলেন। যে-করে হোক টর্চটা এক্ষুনি সারিয়ে দিন! দয়া করে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

দোকানদার টর্চটা হাতে নিয়ে বলল, বাঃ বেশ দামি জিনিস দেখছি! বিলিতি। আজকাল আর এসব পাওয়াই যায় না!

দেরি করবেন না। দয়া করে, প্লিজ। অ, প্লে বুঝি? কার বই?

কিন্তু দেরি হল না। বালবটা কেটে গিয়েছিল শুধু। অতীশ দোকান থেকে বেরিয়েই দেখলেন দুদিকে দুটো ট্রাম আর ডবল ডেকার। তার মধ্যে দিয়েই ছুটে এলেন। তখন পরিচালক শেয়ালের ডাক ডাকছেন কনসার্টে ঘোরতর ঝিঁঝির শব্দ। ফোকাস পড়তেই নায়ক ঢুকে গেল।

আপনাদের না বলেছি ঠিক সময় গুছিয়ে রাখতে সবকিছু।

কী করব, একটু আগেও জ্বলছিল! অতীশ লজ্জিতভাবে জানালেন।

দেখুন, পরেরগুলো ঠিক আছে কি না। এরপর লাগবে মদের গ্লাস, কম্বল, বালিশ রিভলভার, হুকো, কল্কে, বড় হাতপাখা, আতরদান...মিলিয়ে নিন গে যান!

অতীশ চলে গেলেন।

পরিচালক সেক্রেটারিকে একপাশে টেনে নিয়ে বললেন, প্লে জমবে! এই বই আমি পাঁচ জায়গায় করিয়েছি। কিন্তু মশায় ওই লেধরুসকে করছেন স্টেজ ম্যানেজার? কত বড় দায়িত্ব!

সেক্রেটারি একটু মুচকি হেসে বললেন, আস্তে, শুনতে পাবে। কী করব, ওকে যে অন্য

কিছু আর দেওয়া গেল না। অথচ বিষম উৎসাহ। রোজ রিহারসালে এসে বসে থাকত। কিন্তু চাকরের পার্টও ওকে দেওয়া যায় না, এমন লাজুক মিনমিনে গলা।

বড় মিনমিনে গলা ঠিকই। বড় চাকরি করেন বুঝি?

মাঝামাঝি। অফিসারও না, কেরানিও না। আমাদের সুপারিন্টেন্ডেন্ট এবার নতুন এসেছেন। ভদ্রলোক শিক্ষিত খুব—কিন্তু ওই যে মেনিমুখো।

তবু, চালু লোক না হলে কি স্টেজ ম্যানেজ করা যায়। রামের জিনিস না শেষপর্যন্ত রাবণের ঘাড়ে চাপায়।

না, আপনি একটু চোখ রাখবেন। বলে দিলে ঠিক পারবে। বোকা তো নয়। যে-সব লোক সবসময় মুখ বুজে থাকে আমি তাদের দুচক্ষে দেখতে পারি না। পৃথিবীতে জন্মেছিস, কথা বলবি না?...এই অতসী, শোন-শোন! ঠোঁটে অত টকটকে লাল মেখেছিস কেন? এটা তোর দুঃখের পার্ট...খানিকটা মুছে ফ্যাল!

এমন ছাই বই যে, অতসী আঁচলটা আঙুলে জড়িয়ে ঠোঁটে ঘষতে-ঘষতে বলল, আগাগোড়াই যে কান্না! আমার আবার অত কান্না আসে না। ও মশাই একটু সরুন তো, সরে দাঁড়ান।

অতীশ আয়নার সামনে ছিলেন, শশব্যস্তে সরে দাঁড়ালেন। অতসী আয়নার সামনে নিজের মুখটা ভালো করে দেখল। রুক্ষ চুল, কাজল লেপা ভুরু, ক্ষীণ সুর্মা, অল্প লাল ঠোঁট। কৃত্রিমতায় তার মুখখানি সত্যিই ঢলোঢলো দেখাচ্ছে। অতসী পরপর দেবতা ও মহাপুরুষদের ছবিগুলিকে অনেকক্ষণ প্রণাম করল। গিরিশবাবুর ছবির মালা থেকে একটা গাঁদা ফুল ছিড়ে ব্লাউজের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে বুকের মধ্যে ফেলে দিল। ওর ব্লাউজটা এত ছোট যে আধবাটি বুক দেখা যাচ্ছে, আবার পেটেরও খানিকটা। অথচ ফুলটা কোথায় আটকে গেল কে জানে!

তারপর মুখ তুলে বলল, মনুদা, (অর্থাৎ পরিচালক) পারব তো?

পরিচালক তার কাঁধে হাত রেখে বললেন, তোর ভয় নেই রে বুলবুলি, পাঁচ-ছ জায়গায় তোর ক্ল্যাপ বাঁধা।

সিন ঘুরে গেছে। জমিদারের নায়েব ছুটতে-ছুটতে এসে বলল, চাবুকটা কোথায়? এর পরেই চাবুক মারার ব্যাপার আছে। স্টেজে চাবুক রাখা নেই! অতীশদা—

অতীশদা ঠিক উইংসের পাশেই ছিলেন চাবুক হাতে দাঁড়িয়ে। থতমত খেয়ে বললেন, এই যে—

পরিচালক সত্যিকারের ধমক দিয়ে বললেন, এই যে কী মশাই! আপনার হাতে থাকলেই চলবে? তাহলে আপনিই ঢুকে পড়ুন না!

অতীশ লজ্জিত হলেন। তাঁর দোষ নেই। উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি প্রত্যেকটি পার্ট মনে-মনে প্রতিধ্বনি করছিলেন। ছুটে আসা নায়েবের হাতে চাবুকটা তুলে দেওয়ার কথা তাঁর মনেই ছিল না।

এর পরের সিনের জন্যে মদের গ্লাস রেডি রাখুন। চাকরের হাতে থাকবে।

অতীশ যত্ন করে পাতলা কাচের গ্লাসে কোকাকোলা ঢাললেন, তারপর চাকর যেমনভাবে সেটা নিয়ে যাবে, অবিকল সেই ভঙ্গি করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর মুড এখন চাকরের মতোই হয়ে গেছে। দর্শকদের মধ্যে চাপা হাসির গুঞ্জন। নাটকে হাসির কথা শুনে তারা সত্যিই হেসেছে। এটা কম কথা নয়। গ্রিনরুমে গর্বের হাওয়া খেলে গেল।

অতসী (ডাকনাম বুলবুলি) গ্রিনরুমের মধ্যে আলতোভাবে পায়চারি করছে মুখ নীচু করে। কারুর সঙ্গে কথা বলছে না। মুখটা থমথমে। কান্নার আগের মুহূর্তের মতো। অথচ ওই মেয়েটাই রিহার্সালের সময় প্রত্যেক দিন কী হাসিঠাট্টা করেছে। ওর মুখ বড় আলগা, বড় অসভ্য কথা বলে। মেয়েদের মুখে অসভ্য কথা শুনলে অতীশের গা শিরশির করে। তবু মেয়েটার দিক থেকে চোখ

ফেরানো যায় না। তা ছাড়া ওর দাপট আছে। অ্যামেচারদের মধ্যে খুবই নাম। দু-একখানা ফিল্মে চানস পেয়েছে বলে ওর অহঙ্কার থাকারই কথা। কিন্তু এখন মেয়েটাকে মনে হচ্ছে সত্যিকারের কোনও নির্যাতিত রমণী।

পরের দৃশ্য শেষ হতেই প্রথম অঙ্কের ড্রপ পড়ল। ঘোরানো মঞ্চ বলে একেবারে সময় পাওয়া যায় না। সব রেডি রাখতে হয়। তৃতীয় দৃশ্যে তাঁর কাজ নিখুঁত, প্রত্যেকটি জিনিস ঠিক সময়ে লোকের হাতে তুলে দিয়েছেন ঠিকঠাক। সেজন্যে অবশ্য ধন্যবাদ মেলেনি।

অতসী কিন্তু বিরতির সময়েও হাসছে না। চুপ করে বড় আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে। সে নির্যাতিতা নায়িকা, তাই কারুর সঙ্গে একটাও কথা বলছে না। অপর তিনটি মেয়ে-চরিত্র কলকল করছে ঠিকই, রেখা, পূর্ণিমা আর এই নাটকের বাঈজি অনুরাধা। অনুরাধা নামের মেয়েটি পারচেজ সেকশনের দীনেন বসুকে (নায়ক) বলল, এই আমার ব্লাউজের সেফটিপনটা একটু আটকে দিন তো। ও মা, ওকি হাত কাঁপছে কেন?...হি-হি-হি-হি।

সেক্রেটারি ঘুরে এসে বললেন, চমৎকার হচ্ছে, মৎস্যমন্ত্রী শেষপর্যন্ত থাকবেন বলেছেন। একটু আস্তে কথা বলো, বাইরে থেকে শোনা যাচ্ছে গ্রিনরুমের আওয়াজ। ভাড়াটে পরিচালক চায়ের ভাঁড়টা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, এই এই ওদিকে না, ওদিকে না, পাশেরটায়, ওটা মেয়েদের বাথরুম, ডোবাবেন দেখছি! —তারপর অতীশের দিকে ফিরে—এই যে অতীশবাবু, এবার আপনাকে আর উইংসের পাশে দাঁড়ালে চলবে না। স্টেজের মাঝখানের দরজার আড়ালে দাঁড়াতে হবে। আহম্মদজান একবার ঢুকবে মদ নিতে. বুলবুলি একটা কম্বল।

অতীশ জায়গায়ট' দেখতে গেলেন। আগে কখনও কোনও মঞ্চের এই গোপন জায়গাগুলো তিনি দেখেনি। ঘোরানো মঞ্চের তিনটে দৃশ্যের সেট পরপর সাজানো। ওদিকে দর্শকদের সামনে ভাঙা বাড়িতে নায়ক-নায়িকা, আর পিছনে জমিদারের বৈঠকখানায় সোফা-সেটটিতে পা তুলে বসে শিফটার-ফিটাররা বিড়ি টানছে। অতীশকে দেখে তারা পা নামিয়েও বসল না, বিড়ি লুকোনো দূরের কথা। তৃতীয় সেট একটা জঙ্গলের দৃশ্য। এখানে কেউ নেই, আলো নেভানো। বিশাল-বিশাল গাছ আঁকা, দূরে মন্দিরের চূড়া। হঠাৎ অন্ধকারে একসময় মনে হয় সত্যিকারের জঙ্গল। অতীশের মনে হল, কোনও একদিন ওইরকম একটা জঙ্গলে হারিয়ে যেতে পারলে মন্দ হত না। এখানে কী তার কোনওদিন আসার কথা ছিল? অতীশ হাল্কা পায়ে সেই জঙ্গলের মধ্যে, পিঁপড়ে যেমন অনেক সময় নিজেরই চারপাশে ঘোরে, সেইরকম নিজের অস্তিত্বের চারপাশে ঘুরতে লাগলেন। ঘুরতে-ঘুরতে বদলে গেলেন। হাত-দুটো তাঁর উঠে এল মাথার ওপর মুষ্টিবদ্ধ, দুচোখে রাজ্যের শূন্যতা, ঠোঁট কুঞ্চিত, গলা দিয়ে ঠিক স্বর বেরুচ্ছে না। কিন্তু তিনি আপন মনে বলছেন, আমি ঈশ্বর মানি না, আমি নিজের পায়ে ভর দিয়ে ভবিষ্যতের দিকে হেঁটে চলে যাব। আমি একা, মায়ের পেটের অন্ধকারে যেমন একা ছিলাম! মন্দিরের দেবতা, তুমি শুনে রাখো, আমি...। এর পরের দৃশ্যের নায়কের সংলাপ। চমকে অতীশ আপন মনে খুব লজ্জা পেলেন। চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন, কেউ তাঁকে দেখেনি তো? ইস, কী ছেলেমানুষি করছিলেন তিনি।

ফু-র-র করে বাঁশি বাজতেই মঞ্চ ঘুরতে লাগল। অতীশ চমকে প্রায় পড়ে যাচ্ছিলেন, তাড়াতাড়ি সামলে নিলেন। বিড়ি ফোঁকা শিফটার-ফিটার দুজন ঠিক সময়ে সরে গেছে। নইলে, দর্শকদের সামনে যদি দেখা যেত জমিদার-ঘরের সোফায় বসে লুঙ্গি পরা দুজন লোক পা তুলে বিড়ি ফুঁকছে, দৃশ্যটা তাহলে কেমন হত ভেবে অতীশের হাসি পেল।

এই দৃশ্যে অতীশের কিছু কাজ নেই। মঞ্চের ওপরই বসে আছেন বলা যায়। সামনেই দেওয়াল। এইরকম একা মঞ্চের ওপর বসে থাকলে অনেক কিছু মনে পড়ছে না। 'এসো অনুপমা, জঙ্গলের কাঠ কুড়িয়ে আমরা এখানে, এই ভাঙা মন্দিরের সামনে আগুন জ্বেলে নিই, আমরা দেবতাকে সাক্ষী রেখে বলি, আমাদের মিলন হোক, জন্মান্তরেও আমাদের বিচ্ছেদ হবে না।' পরের দৃশ্যের নায়ক

এই কথাগুলো বলবে নায়িকাকে, পুরোটা শেষ করতেও পারবে না, তার আগেই এসে যাবে জমিদারের লাঠিয়ালের দল। এক দঙ্গল ক্রাউড সিনে যাঁরা নামতে চেয়েছে, তাঁরা সবাই। নায়কের এই কথাটা অতীশের মনে পড়ছে, কিন্তু এখনও তিনি অতীশ রায়চৌধুরী। কেমব্রিকের পাঞ্জাবি পরনে, পায়ে কানপুরের চটি, অসুন্দর নন কিন্তু খুব মাঝারি ধরনের চেহারা, একটু পুরু চশমা, সুপারিন্টেন্ডেন্টের চাকরি। অর্থাৎ কেরানিও নন, অফিসারও নন, কেরানিও তাঁকে আপনজন মনে করে না, অফিসাররাও নিজেদের সমান দেখে না। জীবনের উনচল্লিশ বছর কেটে গেল, একজন মানুষের সঙ্গেও যোগাযোগ করা গেল না। আজ এই একা মঞ্চের ওপরে বসেও তাঁর নিজের কোনও কথাই মনে পড়ল না। কিছুই মনে পড়ে না, অথচ যেন অনেক কিছু বলার ছিল, কোনও একজনের যেন খুব কাছাকাছি বসে না বললে জীবনটা ব্যর্থ হয়ে যাবে। কিন্তু কী কথা? অনবরত তাঁর কানে আসছে প্রম্পটারের একঘেয়ে ফিসফিসানি। অতীশ অল্প হেসে ভাবলেন, আমারও বোধহয় ওরকম একজন প্রম্পটারের প্রয়োজন ছিল জীবনে। সব পার্ট মুখস্থ হয়ে যায়, তবু আজ পর্যন্ত মুখ ফুটে কিছু বলতে পারিনি তো।

দরজার ফাঁকে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে অতীশ খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছেন। এখনও দর্শকদের দেখা যায়। কিন্তু তিনি আর দর্শকদের দিকে তাকাচ্ছেন না। দেখছেন অতসীকে। কী করে অমন কাঁদছে মেয়েটা, গ্লিসারিন দেয়নি চোখে, তবু? ভেতরে, এদিকটায় জঙ্গলের ও মন্দিরের সেট। অতসীর এখানে কম্বলটা নিতে আসার কথা। বোধহয় দেখতে পায়নি এই ভেবে অতীশ ওর হাতে কম্বলটা এগিয়ে দিলেন। বললেন, এই যে—। কম্বলটা নিয়ে অতসী আবার কেঁদে ফেলল। অতীশ ভাবলেন, মাথা খারাপ হয়ে যায়নি তো মেয়েটার? তিনি চরম দুঃসাহসের সঙ্গে অতসীর একটা হাত ধরে মৃদু টান দিয়ে বললেন, চলুন! অতসী বলল, না! তারপর অতীশের বুকের ওপর মাথা রেখে বলল, আমি আর পারছি না। অতীশের মাথা ঝিমঝিম করে উঠল। কিছুই বুঝতে পারছেন না। তাঁকে না জানিয়েই অন্য একটা ভূমিকায় নামিয়ে দেওয়া হয়নি তো? মেয়েরা যে কোথা থেকে এত দুর্বোধ্যতা নিজেদের মধ্যে জমিয়ে রাখে। একটু পরে অতসী স্টেজে ঢুকে গেল। হাজার চোখের সমানে।

বুলবুলি,—আজ যা করেছিল, জবাব নেই। পরিচালক অতসীর পিঠ চাপড়ে দিলেন। সেক্রেটারি খাবারের প্যাকেট বিতরণ করছিলেন। মৎস্যমন্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তুলছেন সবাই। অতসী মেক আপ তোলেনি। একটা রসকদম্ব খেয়ে আঙুলের রসটা চাটতে-চাটতে বলল, মনুদা কীরকম টাইমিংটা দিয়ে দিলুম বলো না!

মনুদা বললেন, দারুণ। তুই এবার পরিচালনা করতেও শুরু করে দে।

অতসী বলল, ওই টাইমিংটা দিয়েই তো কান্নাটা তৈরি করে নিলুম।

অতীশ এসে অতসীর পাশে দাঁড়ালেন।

আলতো কাঁধ-ছুঁয়ে বললেন, অতসী।

অতসী অনুরাধার সঙ্গে কথা বলছিল, চমকে অশ্লীল একটা শব্দ করে বলল, গায়ে হাত দিয়ে কথা বললেন যে? অতীশ শান্তভাবে বললেন, না, কিছু না। আপনার অভিনয় খুব ভালো হয়েছে। এ তো একটা সামান্য কথা অতসী বলল।

অতীশ কী ভেবে পকেটে হাত ঢোকালেন। চাবিটা নেই। দ্বিতীয় অঙ্কের মাঝখান থেকে সারাক্ষণ চাবিটা হাতেই রেখেছিলেন, তবু কখন হারিয়ে গেল? ইস! এখন আর সব সেটে খোঁজা চলে না। বাড়িতে গিয়ে এই রাত্রে আবার নিজের ঘরের তালা ভাঙতে হবে!



তালভঙ্গ

একদল ভক্ত পৌঁছে দিল হোটেলের দরজা পর্যন্ত। রাত প্রায় একটা, তবু তারা যেতে চায় না, এখনও তারা গল্প করতে চায়। হোটেলের দারোয়ানটি লবির একটি সোফায় শুয়েছিল, সে ধড়মড় করে উঠে অবাক ভাবে চেয়ে রইল।

সবার সঙ্গে হেসে-হেসে কথা বলতে-বলতে প্রায় চোয়াল ব্যথা হয়ে যাচ্ছে দিবাকরের। পাশে মণিকা, তারও ঠোঁটে হাসি আঁকা। মণিকা কোনও কথা বলে না। সবাই ধরে নিয়েছে সে খুব লাজুক। একজন কেউ বলল, বউদি রাগ করছেন না তো? দাদাকে এতক্ষণ ধরে রেখেছি।

এরও কিছু উত্তর না দিয়ে মণিকা হাসিমুখে চেয়ে রইল।

দিবাকর জনপ্রিয়তা রক্ষা করতে জানে। সে যে শুধু নাম করা গায়ক তাই-ই নয়, তার ব্যবহারও অতি মিষ্টি! সকলের প্রতি সে সমান মনোযোগ দেয়। তার লম্বা চেহারা ভিড়ের মধ্যে অন্যদের মাথা ছাড়িয়ে থাকে। তার গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি, গলায় একগাদা ফুলের মালা।

বেঙ্গলি ক্লাবের সেক্রেটারি বলল, ঠিক আছে, এবারে দাদাকে বিশ্রাম নিতে দাও। কাল সকালে তো দেখা হচ্ছেই।

একজন বলল, আহা, কাল সকালেই তো ওঁরা চলে যাচ্ছেন!

সেক্রেটারি বললেন, ন'টা চল্লিশে ট্রেন, তার আগে অন্তত দু-তিন ঘণ্টা সময় পাওয়া যাবে। কাল ছুটির দিন আছে—

একজন সুন্দরী মহিলা আদুরে গলায় বললেন, আমি কাল টেপ রেকর্ডার নিয়ে আসব। আমার জন্য কিন্তু কয়েকখানা গান তুলে দিতে হবে। কোনও কথা শুনছি না—।

দিবাকর কারুকেই প্রত্যাখ্যান করে না। সে এক দৃষ্টে মহিলাটির দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই! যে-ক'টা খুশি—।

সেক্রেটারিই উদ্যোগ নিয়ে খানিক বাদে সবাইকে বিদায় করলেন। দিবাকর হোটেলের গেট পর্যন্ত এসে আর-এক প্রস্ত অমায়িক হাসি উপহার দিল সবাইকে। মণিকা একই জায়গায় স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে।

একটু বাদে দিবাকর যখন ওপরে ওঠার সিঁড়িতে পা দিয়েছে, সেই সময় সেক্রেটারি আবার ফিরে এলেন প্রাইভেট কথা বলতে। কাছাকাছি আর কেউ নেই, তবু গলা ফিসফিস করে বললেন, আর-একটা দিন থেকে যেতে পারবেন না? কানপুরের মিলনী ক্লাব আপনাকে খুব চাইছে। অবশ্য ওদের রেটটা একটু কম করতে হবে। ওদের বাজেট কম। আমি মান্না দে-কে বলে দিয়েছিলুম, তিনিও ওদের কাছ থেকে কম নিয়েছিলেন। মান্নাদাকে আমি যা বলি—।

দিবাকর তাকাল মণিকার দিকে। মণিকা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে আছে।

দিবাকর জিগ্যেস করলেন, কী, আর একটা দিন থাকা যাবে?

সেক্রেটারি বললেন, বউদি, আর ক'টা দিন থেকে যান না, অনেক সাইট সীয়িং করিয়ে আনব—।

মণিকা স্বামীর দিকে চোখ তুলে বলল, তোমার যা খুশি!

দিবাকর বলল, ঠিক আছে, রাত্তিরটা ভেবে দেখি। তারপর কাল সকালে যা হয় করা যাবে। আমাদের আবার সামনের শনিবার একটা প্রোগ্রাম আছে দুর্গাপুরে।

—দিবাকরদা, আপনি লন্ডন যাচ্ছেন?

—কথা চলছে!

মণিকা সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল ওপরে।

চারতলায় ওপরে সবচেয়ে ভালো ঘরটি দেওয়া হয়েছে ওদের। সারা হোটেল নিস্তব্ধ, শহরের রাস্তাতেও এত রাতে কোনও শব্দ নেই।

মণিকার কাছেই চাবি। দরজা খুলে ভেতরের আলো জেলে সে একটুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। ঘরটা যেন বড় বেশি ফাঁকা লাগছে। এরকম অনেক হোটেলেই রাত কাটাতে হয়েছে, কিন্তু আগে কখনও কোনও ঘর এত ফাঁকা লাগেনি।

মণিকা জানলার কাছে এসে দাঁড়ল। রাস্তার ওপরেই একটা মসজিদ। তার ওপরে জ্যোৎস্নার আলো পড়েছে, মনে হয় যেন অন্য কোনও দেশের দৃশ্য।

দিবাকর এই সময় ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে আরামের নিশ্বাস ছাড়ল, আঃ!

গলা থেকে একটার-পর-একটা মালা খুলে ফেলতে লাগল বেডসাইড টেবিলের ওপরে। তারপর সিল্কের পাঞ্জাবিটা খুলল। পাঞ্জাবির পকেট থেকে মোটা সাদা খামটা নিয়ে বিছানার ওপরে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, টাকাগুলো তুলে রাখো।

মণিকা ফিরে তাকাল না।

দিবাকর একটা সিগারেট ধরিয়ে বাথরুমে গেল। তার মন আজ বেশ প্রফুল্ল। ফাংশান বেশ ভালো হয়েছে। একেবারে প্যাক্‌ড হল। চারখানা গান গাইবার কথা ছিল। শেষপর্যন্ত দর্শকদের অনুরোধে গাইতে হল এগারোটা।

বাথরুমে পাজামা ঝোলান ছিল। ধুতি খুলে পাজামা পরে দড়ি বাঁধতে-বাঁধতে বেরিয়ে এল দিবাকর। মণিকা তখনও বাইরে চেয়ে আছে জানলা দিয়ে।

দিবাকর তার পাশে এসে বলল, একটু হুইশকি খাই? নইলে রাত্রে ঘুম আসবে না।

দিবাকরের ইংরিজি উচ্চারণে কিছুটা বৈশিষ্ট্য আছে। স-এর জায়গায় প্রায়ই সে শ ব্যবহার করে।

বেডসাইড টেবিলের ড্রয়ার খুলে ছোট হুইশকির বোতল বের করে সে খানিকটা কাঁচাই গলায় ঢালল। তারপর বলল, এখানকার অডিয়েন্স বেশ ভালো ছিল। কি বলো মণি?

মণিকা এবারেও কোনও জবাব দিল না।

এতক্ষণ বাদে মণিকার ওদাসীন্য লক্ষ্য করল দিবাকর। সে ঘরে ঢোকার পর মণিকা একটাও কথা বলেনি!

—কী ব্যাপার, তোমার কী হয়েছে?

—কিছু না তো!

—আমি হুইশ্‌কি খাচ্ছি বলে রাগ করছ? আজ যা একশাইটমেন্ট গেল।

—তবু এত রাত্রে ওসব না খেলেও পারতে! তোমার প্রেসার বেড়েছে!

—বেশি না। এই দু-ঢোক খাব। তুমি শাড়ি-টাড়ি ছাড়বে না?

—হুঁ।

কথা বলার সময় মণিকা একবারও মুখ ফেরায়নি। এখন তাকাল। চাঁদের ওপর দিয়ে দিব্যাঙ্গ নাদের ওড়নার মতন পাতলা-পাতলা মেঘ ভেসে যাচ্ছে। দিবাকর চঞ্চল হয়ে আছে। যে মণিকার মুখ দেখছে না।

—মণি, তুমি আর-ক'টা দিন এখানে থেকে যেতে চাও?

—তোমার যা ইচ্ছে?

—এখানে অনেক কিছু দেখবার আছে? কানপুরে আর-একটা ফাংশান যদি হয়...তবে আমি রেট কমাব না। এই ব্যাটাদের সঙ্গে একটু হেসে কথা বললেই পয়সা কমাতে চাইবে। আমি ওদের কি বলব জানো? বলব, রেট-এর ব্যাপারে আমি কিছু জানি না ভাই, বউদির সঙ্গে কথা বলো। তুমি ম্যানেজ করতে পারবে না?

—আমার সঙ্গে কথা বলার দরকার নেই।

এবারে দিবাকর সত্যিই অবাক হল। মণিকার এরকম ব্যবহার তো সে কখনও দেখেনি। টাকাপয়সা সম্পর্কেও আগ্রহ দেখালে না? সাদা খামটা এখনও খাটের ওপরে পড়ে আছে।

কাছে গিয়ে মণিকার পিঠে হাত রেখে দিবাকর রীতিমতো ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞাসা করল, তোমার কী হয়েছে বলো তো মণি।

মণিকা এবারে মুখ ঘোরালো। তার দু-চোখে জল।

—কী হয়েছে, মণি? কী হয়েছে?

—আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।

—কষ্ট হচ্ছে? কোথায়! পেট ব্যথা করছে? কখন থেকে শুরু হয়েছে? আগে বলোনি কেন?

মণিকা স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল স্বামীর দিকে। চোখের জল গড়িয়ে আসছে তার গাল বেয়ে!

—খুব বেশি কষ্ট হচ্ছে? ওই লোকগুলো থাকতে-থাকতে বললে না কেন? ওরা কোনও ডাক্তারের ব্যবস্থা করতে পারত। কোনও ট্যাবলেট নেই?

মণিকা বলল, আমার কষ্ট হচ্ছে তোমার জন্য!

—আমার জন্য?

—তোমাকে আজ কত লোক খাতির করছিল। কত সম্মান, হোটেল পর্যন্ত এগিয়ে দিল...

কথা শেষ করতে পারল না মণিকা, যেন আবার কান্না সামলাবার জন্যই সে ঘুরিয়ে নিল মুখ।

—সেইজন্য...তোমার কষ্ট?

এবারে স্বামীর চোখের ওপর সোজা চোখ রাখল মণিকা। আস্তে আস্তে বলল, আজ দু-জায়গায় তোমার সুর ভুল হয়েছে। চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে গানটার সময় যখন চড়ায় উঠলে একদম বেসুরো হয়ে গেল—

যেন কেউ সজোরে একটা থাপ্পড় কষিয়েছে দিবাকরকে। তার মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেল। সে অস্ফুট গলায় বলল, বেসুরো!

—তুমি বুঝতে পারোনি?

—আমি...মানে...তুমি বলছ কি মণি? আমি বেসুরো গাইব? এত লোকের সামনে?

—তুমি সত্যি বুঝতে পারোনি? 'নদীর জলে আলতা ছড়ানো'-তে তোমার তাল কেটে গেল দুবার। তুমি সত্যি বুঝতে পারোনি?

—হ্যাঁ, ও জায়গাটায় একটু...এখানকার তবলচি অতি বাজে।

—ওই গানটাতে পাখোয়াজ ছিল। কীর্তনের সুর, তুমি আগে কতবার গেয়েছ।

—আমার তাল কেটে গেছে? তুমি বললেই হল? তাহলে শুধু-শুধু অডিয়েন্স এতবার গান গাইবার জন্য রিকোয়েস্ট জানাল—।

—দু-তিনজন লোক ইস্ বলেছিল। আমি শুনেছি। কয়েকজন লোক উঠে চলে গেল।

— কয়েকজন লোক? অন্তত দু-হাজার লোক ছিল আজ, কিংবা তারও বেশি। তার মধ্যে কজন উঠে গেছে।

—সবাই তো গান বোঝে না। এমনিই শুনতে আসে। কয়েকজন মাত্র বোঝে।

—মফস্বলে ওরকম সব সময়ই কিছু লোক মাঝে-মাঝে উঠে যায়। বাড়ি ফেরার তাড়া থাকে। ট্রেন ধরতে হবে, কিংবা কারখানার ডিউটি।

—তা হতে পারে।

—নিশ্চয়ই তাই।

—কিন্তু তুমি বোঝোনি? তোমার কানে তোমার গলা বেসুরো লাগেনি? তাল যখন কেটে গেল, অন্তরার সময় ধরতে পারছিলে না।

দিবাকর বড় এক চুমুক হুইস্কি টেনে নিল বোতল থেকে। তার চোখ দুটি সঙ্গে-সঙ্গে লাল হয়ে গেল। মাথার চুলের মধ্যে হাত দিয়ে সে কর্কশ গলায় বলল, আজ সবাই আমার এত প্রশংসা করে গেল, আর তুমি আমায় খোঁটা দিচ্ছ? তুমি আমার গানের ভুল ধরছ?

মণিকা প্রায় ছুটে এসে দিবাকরকে বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। বিবাহিত জীবনের ছাব্বিশ বছর পার হয়ে গেছে। ইদানীং আর স্বামীর বুকে মাথা রেখে এরকম কান্নার মতন কোনও ঘটনা ঘটে না।

দিবাকর রীতিমতো হকচকিয়ে গেছে। আজকাল বাইরে এসে প্রায়ই ঝগড়া হয়। এরকম নিঃশর্ত কান্না দেখতে সে অভ্যস্ত নয়।

রাগটা কমে গেল তার। স্ত্রীর পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে-দিতে সে শান্ত গলায় বলল, এরকম ছেলেমানুষী করছ কেন? কী হয়েছে সত্যি করে বলো তো।

একটু বাদে মণিকা মুখ তুলল। আঁচল দিয়ে মুখ মুছে শান্ত গলায় বলল, না, কিছু হয়নি। আমিই বেশি বেশি চিন্তা করছি। শুয়ে পড়ো। আমি মশারি গুঁজে দিচ্ছি।

—আর-একটু বাদে।

—না, আর মদ খেয়ো না, লক্ষ্মীটি। শরীর খারাপ হবে। আজকাল মদ তোমার সহ্য হয় না।

শান্ত ছেলের মতন দিবাকর মদের বোতলটা রেখে দিল ড্রয়ারে। তারপর শুয়ে পড়ল বিছানায়। মশারি গুঁজে দিয়ে মণিকা বাথরুমে গেল।

ফিরে এসে দেখল দিবাকর তখনও জেগে আছে। চোখ দুটি ওপরের দিকে স্থির।

মণিকা বলল, ঘুমিয়ে পড়ো এবার। কাল সকাল থেকেই তো আবার লোকজন আসবে। পাঁচ-ছ'ঘণ্টা না ঘুমোলে শরীর টিকবে কেন?

দিবাকর আস্তে-আস্তে বলল, আজ আমার গলাটা ভালো ছিল না। দু-এক জায়গায় সুর লাগেনি। আমি বুঝতে পারছিলুম।

—আজ না গাইলেই পারতে!

—এদের প্রোগ্রাম সব ফিক্‌শড। গলা খারাপ বললে এরা শুনত? মফস্বলের পাবলিক কীরকম হয় তুমি জানো না?

—গত সপ্তাহে যাদবপুরের জলসাতেও...দুটো গানের পর আর কেউ কিছু গাইতে বলল না।

—ওখানে আরও অনেক আর্টিস্ট ছিল।

—এক বছর আগেও তোমার জন্যই টিকিট বিক্রি হত, অন্য আর্টিস্টদের বসিয়ে রেখে তোমায় দিয়ে দশটা-বারোটা গান গাওয়াত!

—কলকাতার অডিয়েন্স আজকাল খুব খারাপ হয়ে গেছে। ভালো গান-বাজনা কেউ শুনতেই চায় না। সবাই তো হিন্দি...তবে এখানে লোকজন খুব ভালো ছিল।

—তোমার তাল কেটে গেল...আগে কোনওদিন তো এরকম হয়নি।

—একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলুম বোধহয়।

—তুমি বুঝতে পেরেছিলে তাহলে?

—হ্যাঁ। একটা তাল মিশ্ করতেই কীরকম নার্ভাস হয়ে গেলুম। এত দিন ধরে গাইছি, কক্ষনো এরকম হয়নি!

—সেই তখন থেকেই আমার কষ্ট হচ্ছিল! ওগো, আমার ভীষণ ভয় করছে!

—আরে যাঃ। এবারে ফিরে কয়েক দিন গলা সাধব। দেখো সব ঠিক হয়ে যাবে! ভয় কীসের! আমার কি অসুখ করেছে নাকি? এমন কিছু বুড়োও হয়নি!

—যখন তুমি খুব ভালো গাইতে, তখন তোমার তেমন নাম হয়নি। তোমার গলা যেন জলের মতন ছিল, আর তাল...তুমি যখন-তখন ছাড়তে আর ধরতে।

—বীরেশদা বলেছিল, আমার কাছে তাল আর লয় শিখতে হয়।

—এখন সবাই তোমার খাতির করছে কত, অথচ তুমি এখন ভুল গাইছো। তাহলে খাতির করছে কাকে? তোমাকে, না তোমার ভুল গানকে।

—তুমি বড় বাড়াবাড়ি করছ।

—কানপুরের ফাংশনের জন্য ওরা তোমায় রেট কমাতে বলল!

—সে ওরা লাই পেলেই ওরকম করে।

—সেক্রেটারি বুঝতে পেরেছে।

—যাঃ! ওই সেক্রেটারিটা একটা গোলা লোক। ও আবার সুর তাল বুঝবে কি? ওরা ফাংশান করে পয়সা পেটে!

—ওই সেক্রেটারি তবলা বাজায়। কে যেন বলছিল!

—সত্যি?

—হ্যাঁ। আমি শুনেছি। ও নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে।

দিবাকর আর কোনও কথা বলল না। সে অভিমানের নিশ্বাস ফেলল একটা। তার বুকটা খালি-খালি লাগছে। তেতো। ইচ্ছে করছে উঠে আর-একবার হুইস্কিতে চুমুক দিতে। কিন্তু উঠল না।

সে ভেবেছিল কেউ বুঝতে পারবে না। কিন্তু মণিকা বুঝেছে। মণিকাকে সে নিজে গান শিখিয়েছে একসময়। আর কজন সত্যি—সত্যি ধরতে পেরেছে তার ভুল? সেক্রেটারি কানপুরে ফাংশনের রেট কমাতে বলল এই জন্যই?

সারারাত আর ঠিক মতন ঘুম এল না। মাঝে-মাঝে চোখ বুজে আসে তারপর একটা কান্নার শব্দে ঘুম ভেঙে যায়। কে কাঁদছে? দিবাকর উঁকি দিয়ে দেখে, না, মণিকা তো আর কাঁদছে না। সে ঘুমিয়ে আছে।

তবু বারবার কান্নার শব্দে দিবাকরের তন্দ্রা ভেঙে যেতে লাগল।

ভোরের আলো ফুটতে-না-ফুটতেই দিবাকর মণিকাকে ধাক্কা দিয়ে ব্যস্তভাবে বলল, মণি, এই মণি, শিগগির তৈরি হয়ে নাও? আমাদের এক্ষুনি বেরিয়ে পড়তে হবে।

মণিকা চোখ মুছতে-মুছতে বলল, বেরিয়ে পড়বে? কোথায় যাবে?

—কলকাতায়। পৌনে সাতটায় একটা ট্রেন আছে।

—সেই ট্রেনে...কিন্তু সবাই তো দেখা করতে আসবে বলেছে...

দিবাকর জানলার ধারে দাঁড়িয়ে গম্ভীর ভাবে বলল, যা বলছি তাই শোনো। আমি এক্ষুনি চলে যেতে চাই। বাজে লোকের ভিড় আমার সহ্য হয় না!

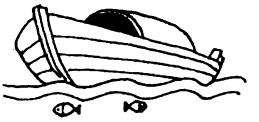

তিন সঙ্গী

'বনমালা' লঞ্চ থেকে নামল পনেরো-ষোলোজন যাত্রী। প্রত্যেকেই বিরক্ত। এতক্ষণ সবাই চুপ করে ছিল, এখন সবাই বিড়বিড় করতে-করতে নামছে জেটিতে। কেউ কারুর বিরুদ্ধে নালিশ করছে না, যেন নিজেকেই শোনাচ্ছে নিজের অসুবিধের কথা।

রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা। পৌনে সাতটায় এখানে পৌঁছবার কথা। মাঝখানে চরে আটকে রইল 'বনবালা'! একসময় তো মনে হয়েছিল, রাতটাই কাটাতে হবে মাঝ নদীতে। সারেং নতুন, তাই নদীর রাস্তা চেনে না, ভাঁটার সময় কি চোখ বুজে লঞ্চ চালালে চলে? তবে ভাঁটা কেন, আজকাল জোয়ারের সময়ও পুরো নদী ভরে না।

মিশমিশ করছে অন্ধকার চারিদিকে। শুধু লঞ্চের জোরালো আলোয় চকচক করছে নদীর জল। জেটিখানার দুটো দোকানই বন্ধ হয়ে গেছে। 'বনবালা' যে আজ আর আসবে, কেউ আশা করেনি।

চুনীলাল হাতের থলি দুটো ঝুলিয়ে বাঁধের রাস্তায় এসে দাঁড়াল। অন্ধকারটা চোখে সইয়ে নিচ্ছে। ভ্যান পাওয়ার কোনও আশা নেই। এই সাড়ে তিন মাইল রাস্তা হেঁটে যেতে হবে তাকে।

টর্চ আছে চুনীলালের কাছে। কিন্তু টর্চ জ্বালবে কোন হাতে। দু-হাতে দুটো ভারী বোঝা। একটা ভ্যান পেলে কত আরামে যাওয়া যেত।

—কোথায় যাবেন?

চুনীলাল চমকে কেঁপে উঠল। একটা ঢ্যাঙা লোক, ঠোঁটে বিড়ির আগুন। নিঃশব্দে কখন এসে দাঁড়িয়েছে একেবারে পাশ ঘেঁষে। নিশ্চয়ই ওর খালি পা।

—আমি যাব নাজনেখালি। আপনি?

—গাববেড়ে। কী করবেন, হাঁটবেন?

—উপায় কী?

—চলুন তবে এক সঙ্গে গল্প করতে-করতে চলে যাই।

চুনীলাল বোঝা দুটো নামিয়ে রেখে টর্চ জ্বালাল। নির্লজ্জভাবে লোকটির সারা গায়ে আলো বুলিয়ে দেখে নিল। রোগা, লম্বা, চিবুকে অযত্নের দাড়ি। ধুতির ওপর একটা নীল সার্ট। এর এক হাতে একটা পোঁটলা।

চুনীলাল জিগ্যেস করল, গাববেড়ে কত দূর? নাজনেখালি ছাড়িয়ে?

লোকটি একটু শুকনো হেসে বলল, না, আগে। আপনার আধাআধি রাস্তা। দাদা নতুন লোক বুঝি?

—নাজনেখালি আমার শ্বশুরবাড়ি। তবে নতুন নই, পুরোনো জামাই।

চুনীলাল টর্চ নিভিয়ে দিল। লোকটিকে সে লঞ্চে দেখেছে কি না ঠিক মনে করতে পারছে না। অবশ্য চুনীলাল ছিল ছাদে, ঠান্ডা হাওয়ার জন্য অনেকেই নীচে নেমে গিয়েছিল।

—চলুন আর দেরি করে লাভ কী? হাঁটা দি।

চুনীলাল থলি দুটো তুলে নিল। টর্চটা সে লোকটির হাতে দিতে পারত কিন্তু লোকটা চায়নি।

স্থানীয় লোক, ও নিশ্চয়ই রাস্তা চেনে।

দু'পা গিয়েই লোকটা জিগ্যেস করল, নাজনেখালিতে কার বাড়ি যাবেন?

—বসন্তলাল বেরা, আমার শ্বশুরমশাই।

—বসন্তলাল বেরা? চিনলাম না তো।

—নাজনেখালির সবাইকে আপনি চেনেন?

—প্রতি হাটবারে যাই। না চেনার তো কথা নয়।

—হাটে ওনার তামাকের দোকান।

—ও বাসুদা! তাই বলেন! ওর বড় ছেলেটি গত সনে মারা গেছে জঙ্গলে?

—হ্যাঁ? আপনার নামটা কী?

—নিরাপদ দাস। আপনি তো তাহলে আমার কুটুম্ব হলেন। বাসুদার পিসি হলেন তো আমার দিদিমার দিদি। বাসুদাকে বলবেন গাববেড়ের নিরা, তা হলেই বুঝবেন।

চুনীলাল চুপ করে গেল। এ সম্পর্কের কথা তার মনে দাগ কাটেনি। দিনকাল খারাপ। আজকাল কারুকে বিশ্বাস নেই। লোকটার গায়ে-পড়া স্বভাবটা বেশ সন্দেহজনক। তার বড় শালা জঙ্গলে বাঘের পেটে গেছে, সে খবর এ-তল্লাটে কে না জানে?

এত রাতে একজন অচেনা লোকের সঙ্গে যে এইরকম অন্ধকার রাস্তায় হাঁটতে নেই তা চুনীলাল জানে। কিন্তু একটা লোকে যদি নিজে থেকে চায় তাহলে চুনীলাল কি না বলবে? অত ভীতু সে নয়। তার কোমরে একটা ছুরি আছে। সেই জন্যই তো লোকটাকে আগে-আগে রেখেছে চুনীলাল, যাতে ও হঠাৎ পেছন থেকে না কিছু করতে পারে।

লোকটিকে আর একটু পরীক্ষা করার জন্য চুনীলাল বলল, কুটুমই যখনই হলেন, তখন একটা উপকার করবেন? আমার দু-হাত আটকা, একটা থলে একটু ধরবেন? তাহলে একটা সিগ্রেট খেতে পারি। বেশ ঠান্ডাই বাতাস দিচ্ছে তো।

নিরাপদ নামের লোকটি থমকে দাঁড়িয়ে আমতা-আমতা করে বলল, দাদা নিতাম তো, কিন্তু বাঁ-হাতটা কম জোরি। একটা বড় চোট লেগে ছিল, এখনও ব্যথাটা মরেনি। আচ্ছা দেখি পারি কি না!

চুনীলালের একটা থলে ধরার চেষ্টা করে সে বলল, ওরে বাবা, এ যে বেদম ভারী। কী আছে এতে দাদা?

উত্তর আগে থেকেই তৈরি ছিল। চুনীলাল বলল, কয়েকখানা লোহার চাটু আর কড়াই! ও বাড়িতে চেয়েছে! আগে তো ভাবিনি যে বয়ে নিয়ে যেতে হবে। ভেবেছিলুম ভ্যান পাব—।

—বড় লজ্জা দিলেন দাদা। হাতটা এমন দুর্বল হয়ে আছে। ও জিনিস বইতে পারব না। একটু দাঁড়াই বরং, আপনি সিগ্রেট খেয়ে, জিরিয়ে নিন।

সন্দেহজনকভাবে লোকটির দিকে তাকিয়ে চুনীলাল পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করল। নিজে একটি ধবাল, নিরাপদকে দিল না। যদি চায় তো দেখা যাবে। লোকটা একটা হাত খালি রাখতে চায়, অ্যাঁ?

নিরাপদ রাস্তার পাশে গিয়ে উবু হয়ে বসল জল ছাড়তে।

আর তখনই দেখা গেল তাদের পেছন থেকে এসে পড়েছে একটা টর্চ লাইটের আলো।

লোকটা সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে চুনীলালের মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, কে আসছে?

চুনীলালও অবিকল এই প্রশ্নই করতে চাইছিল। এইবার কি আসছে ওর সঙ্গীরা? কাছাকাছি কোনও বাড়ি ঘর নেই। একদিকে নদী, অন্য দিকে ফাঁকা মাঠ!

চুনীলাল টর্চটা বার করে জ্বালাল। তার টর্চটা বড়, আলো বেশি। কে আসছে ওদিক থেকে,

একটা মেয়ে? অবশ্য ৩. টু ঠান্ডা পড়লে এদেশে পুরুষরাও গায়ের চাদর দিয়ে মাথায় ঘোমটা দেয়।

আর-একটু কাছে আসতে বোঝা গেল একজন স্ত্রীলোকই বটে। বছরচল্লিশেক বয়স হবে, বেশ লম্বা সমর্থ চেহারা। সে জিগ্যেস করল, ওগো, তোমরা কোথায় যাছ?

চুনীলাল বা নিরাপদ কেউই উত্তর দিল না। স্ত্রীলোকটিকে একেবারে সামনে আসতে দিল।

প্রথমে চুনীলালকে ভালো করে দেখার পর নিরাপদর মুখের দিকে চোখ রেখে চেনা মানুষের মতন গলায় বলল, এত রাতে কোথায় যাচ্ছ? এ-রাস্তা খুব খারাপ, জানো না? গত সপ্তাহেই একটা ডাকাতি হয়ে গেছে!

নিরাপদ জিগ্যেস করল, তুমি কে গো? তুমিই বা এত রাতে রাস্তায় বেরিয়েছ কেন?

স্ত্রীলোকটি বলল, আহা রে! চেনে না যেন! আমার নাম চাঁদমণি, গোসাবা বাজারে থাকি, আমায় সবাই চেনে।

—গোসাবা বাজারে? দেখিনি তো?

—দ্যাখোনি? দেখেও এখন না দেখার ভাব কচ্ছ?

এসব ব্যাপার-স্যাপার চুনীলালের একদম ভালো লাগছে না। সে কোমরের ছুরিটায় হাত দিয়েছে। বারুইপুর রেল ইয়ার্ডে অনেকেই চুনীলালকে ভয় পায়। কিন্তু এদের এদিককার কায়দা বোধহয় অন্যরকম। এত রাতে মেয়েছেলে বার করেছে। ওরা ভাবছে, মেয়েছেলের মুখ দেখে চুনীলাল অন্যমনস্ক হয়ে যাবে!

নিরাপদ বলল, না হয় বুঝলুম, তুমি গোসাবা বাজারে থাকো। এত রাতে তুমি এখানে এসেছ কেন?

চাঁদমণি বলল, আমি তো তোমাদের দেখেই এলুম। তা তোমরা আবার ডাকাত-টাকাত নও তো!

চুনীলাল আর নিরাপদ তাকাল পরস্পরের মুখের দিকে। এই অন্ধকারে তারা কী দেখল, কী বুঝল কে জানে?

চাঁদমণি বলল, ডাকাত হলেই বা কী! আমি বেওয়া মেয়েমানুষ, আমার কাছে তো কিছু পাবে না। কানের এই দুল দুটো পেতলের।

চুনীলাল এবার কড়া গলায় জিগ্যেস করল, ইয়ে, আপনি কোথায় যাবেন?

চাঁদমণি বলল, গাংড়াদহ।

নিরাপদ বলল, সে তো নাজনেখালি ছাড়িয়ে। সেখানে যাবে, এত রাতে?

চাঁদমণি বলল, শুধু-শুধু রাত আরও বাড়িয়ে লাভ আছে? চলো, যেতে-যেতে কথা বলি।

চুনীলাল থলে দুটো তুলে নিল। এবারেও সে চলল সবার পেছনে। স্ত্রীলোকটি আগে-আগে টর্চ জ্বেলে চলল।

নিরাপদ জিগ্যেস করল, গাংড়াদই কোন বাড়ি যাবে?

চাঁদমণি বলল, সে তুমি চিনবে না।

—কেন চিনব না, ওখানে আমার আপন কাকা থাকে।

—থাকুক গে! তোমায় নাম বলি আর অমনি তুমি একদিন সে-বাড়িতে গিয়ে হাজির হও? তোমায় আমার খুব চেনা আছে!

—তুমি ভুল করছ গো। অন্য কারুর সঙ্গে আমায় গুলিয়ে ফেলছ। আমায় তুমি কবে চিনলে?

—তুমি ঢ্যাঙা ফকির দলের কেষ্ট নও?

—এই দ্যাখো! বললুম ভুল হয়েছে। আমি তো নিরাপদ গো!

—হুঁ, নিরাপদ! এই সোঁদরবনে যতগুলো আপদ দেখি, সবগুলোরই নাম নিরাপদ!

চুনীলাল মনে-মনে একটু হাসল। নিশ্চয়ই এই লোকটা কেষ্ট, তার কাছে নাম ভাঁড়িয়েছে!

কী মতলব? শালীর বিয়ের জন্য একগাদা কাঁসার বাসনপত্র এনেছে চুনীলাল, তার দাম অনেক।

চাঁদমণি বলল, কেন আমি গাংড়াদহে যাচ্ছি শুনলে তোমরা হাসবে। কিন্তু আমার মন ঠিকই বুঝেছে।

নিরাপদ বলল, তাহলে শুনি একটা হাসির কথা!

চাঁদমণি বলল, একবার সাতদলের হাট থেকে ফিরতে আমার রাত হয়েছিল। তার ক'দিন আগেই চুয়ান্ন নম্বর দাগে একটা বাঘ ধরা পড়েছে। গা-ছমছম করছিল, তখন একটা লোক হাঁটতে লাগল আমার পাশে-পাশে। তারপর একসময় সেটা আমায় চেপে ধরল। তখন বুঝিনি। পরে বুঝিছি, সেটা মানুষ নয় গো, সে ছিল একটা অপদেবতা। সেই থেকে রাত-বিরেতে পথে-ঘাটে একলা মানুষ দেখলে আমি ভয় পাই।

চুনীলাল বলল, এই হাসির কথা?

চাঁদমণি বলল, না, এটা নয়! শোনোই না। সেই অপদেবতা তো আমার বে-ইজ্জতি করল। তাতে আমি পোয়াতি হলুম। তা আমি পেট নষ্ট করিনি। সবাই আমায় বলতো বাঁজা মেয়েমানুষ। আমার স্বামী সেই জন্যই তো আমায় দূর করে দিয়েছিল। তারপর বলব কি দাদা, আমার একটা ফুটফুটে চাঁদের মতন মেয়ে হল, যে দেখেছে, সেই বলেছে, আহা! এমনটি আর দেখিনি!

চুনীলালের মতন ঝানু লোকও এসব কাহিনি শুনে চমকে যায়। বলে কী? অপদেবতা এসে ধরল, তার ফলে পোয়াতি হল?

চুনীলাল হেসে উঠে বলল, হুঁ! অপদেবতাই বটে। এ-রাস্তায় প্রায়ই সেরকম উপদ্রব হয় বুঝি?

চাঁদমণি বলল, প্রায়ই হয় কি না জানি না, আমি সেই একবারই দেখেছিলুম।

হঠাৎ গল্প থামিয়ে পেছন ফিরে চাঁদমণি বলল, তুমি দুহাতে বোঝা বইছ কেন? একটা আমায় দাও না। আমি কি নিয়ে পালাব নাকি?

চুনীলাল বলল, আপনি নিতে পারবেন না, বড্ড ভারী।

—থাক আমায় আর আপনি আজ্ঞে করতে হবে না। আমার গায়ে কত জোর তো জানে না! গতর খাটিয়ে খাই!

চুনীলালের হাত থেকে প্রায় জোর করেই একটা থলি নিয়ে নিল সে। অস্ফুটভাবে বলল, হুঁ, ভারী একটু বটে। বাসনপত্তর আছে বুঝি? বাড়িতে কারুর বিয়ে আছে?

মেয়েরা বোঝে। কী করে যেন ঠিক বুঝে যায়।

নিরাপদ বলল, তারপর, তোমার সেই মেয়ে এখন কোথায়?

চাঁদমণি বলল, সেই অপদেবতা আমায় কোথায় ধরেছিল জানো? ঠিক এইখানে—। হিহি-হিহি!

নিরাপদ আর চুনীলাল একটু থমকে গেল। দুজনে একই কথা ভাবল।

চাঁদমণি বলল যা ভাবছ তা নয়। আমি পাগল নই গো, পাগল নই। খুব সেয়ানা! আহা, আজ চাঁদ উঠলে বেশ হত, না গো? বেশ সক্কলের মুখ দেখতে পেতুম। দেখতুম তোমাদের মধ্যে কেউ অপদেবতা নাকি! হিহি-হিহি...

হাসির মাঝখানেই হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল চাঁদমণি। নিরাপদ তার হাত ধরে টেনে তুলে জিগ্যেস করল, লেগেছে?

ক্লিষ্ট গলায় চাঁদমণি বলল, হ্যাঁ। লেগেছে। মচকেছে মনে হয়! এখনও অনেকটা রাস্তা যেতে হবে।

নিরাপদ বলল, আমাদের বাড়িতে তাহলে রাতটা থেকে যাও। আর-একটু বাদেই আমাদের গাঁ।

—কেন, তোমার বাড়িতে থাকব কেন, তুমি আমার কে?

—পায়ে লেগেছে বলে বললুম।

—তোমার বাড়িতে কে আছে?

—মা আছে, ভাই, বোন আছে, একটা পিসি আছে। আমার ছোট ছেলে আছে।

—বউ নেই?

—না। মরে গেছে।

—বউ নেই, সেইজন্য এত রস! আমি কারুর বাড়ি যাই না।—ও গো, তুমিই বলো না। আমি কেন ওর বাড়ি যাব? তুমি তাহলে রাগ করবে না?

চুনীলাল বলল, আমার থলেটা দাও আমি এগোচ্ছি। শুধু-শুধু দেরি করছ তোমরা—

চাঁদমণি চোখ ঘুরিয়ে বলল, বললুম না রেগে যাবে! দুজন চলনদার সঙ্গে থাকলে এই সুবিধে। একজন তেড়িবেড়ি করলে অন্যজন সামলে দেয়।

নিরাপদ রাগ করে বলল, আচ্ছা থাকতে হবে না আমাদের বাড়ি, হাঁটতে পারো তো চলো।

চাঁদমণি বলল, তোমাদের তো আসল কথাটাই বলা হয়নি। যেজন্য আমি যাচ্ছি। আমার সেই মেয়ে তো ফোটা ফুলের মতন নধরপানা হয়ে উঠল। দেখতে-দেখতে পনেরো বছর কেটে গেল! আর অমনি গাংড়াদর এক ছোকরা তাকে বিয়ের জন্য কী ঝোলাঝুলি? মেয়েও বেশ রাজি। আমি ভাবলুম অপদেবতার জিনিস, কদ্দিন আটকে রাখতে পারব কে জানে, তার চেয়ে বাবা পার করে দেওয়াই ভালো। তাই দিয়ে দিলুম বিয়ে।

এখন সেই মেয়ের কাছে যাচ্ছ?

হ্যাঁ। কিন্তু কেন যাচ্ছি। তা শুনলেই তো হাসবে। বছর ঘুরতে-না-ঘুরতেই তো মেয়ে পোয়াতি। আজ সন্ধেবেলা সাতটার লঞ্চ ছেড়ে চলে গেল। আমি খেয়েদেয়ে লম্ফ নিভিয়ে শুয়ে পড়লুম। তারপর একটা স্বপ্ন দেখলুম। দেখলুম কী আমার কুসুমের ব্যথা উঠেছে। যন্ত্রণায় সে ছটফট করছে। জামাই আমার বাড়িতে নেই। মাছ ধরতে সে সাগরে চলে যায়। সাত-আট দিন পরে ফেরে। আহা, মেয়েটা কত কষ্ট না পাচ্ছে। তাই তো ছুটে চলে এলুম।

নিরাপদ বলল, স্বপ্ন দেখলে আর ছুটে চলে এলে? হে-হে-হে! স্বপ্ন কখনও সত্যি হয়?

—বলেছিলুম না হাসবে? কেন, স্বপ্ন সত্যি হয় না?

—যাঃ!

—যাঃ কি গো। এ মিনসেটার ধরন ধারণই আলাদা! জিগ্যেস করছি, তোমার কোনও স্বপ্ন কখনও সত্যি হয়নি?

নিরাপদ চুপ করে গেল।

চাঁদমণি চুনীলালকে জিগ্যেস করল, তুমি চুপ করে কেন? তুমি বলো না। স্বপ্ন যদি সত্যি না হবে, তবে অমন স্বপ্ন দেখলুম কেন? তোমার কোনও স্বপ্ন সত্যি হয়নি?

চুনীলাল বলল, আমার পেট গরম হয় না। স্বপ্নফপ্নও দেখি না।

—কোনওদিন দ্যাখোনি!

—না।

—তুমিও অপদেবতা নাকি! দেখি তো ভালো করে মুখখানা।

চুনীলালের মুখের ওপর টর্চ ফেলল চাঁদমণি। তার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। একটা হাত তুলে আড়াল করে বলল, আঃ, কী হচ্ছে।

—বলো, বলো, আমি কি মিছিমিছি যাচ্ছি এত কষ্ট করে। আমার মেয়ের কিছু যদি...

—আমি তার কী জানি!

—কী হৃদয়হীন মনিষ্যি গো তোমরা। আমি অসহায় মেয়েমানুষ একটা কথা জিগ্যেস করছি। তাতে অমন মুখ ঝামটা দিতে হয়? মনে করো আমি স্বপ্ন বলে উড়িয়ে দিলুম। আর আমার মেয়েটা

যদি সত্যিই কষ্ট পেয়ে মরে যায়?

খুন্‌খুন্ করে কাঁদতে শুরু করল চাঁদমণি। চুনীলাল সিগারেট ধরাল। এখনও তার চোখ ধাঁধিয়ে আছে। সে যেন সব ভুল দেখছে। একজন স্ত্রীলোক এত রাত্রে মাঝ রাস্তায় একবার হাসছে একবার কাঁদছে। এসব কি সত্যি, না মনের ভুল!

চাঁদমণি কান্না থামিয়ে নিরাপদকে বলল, আমি আর পরের জিনিস বইতে পারছি না। এই, এটা ধরো না!

—ধরতুম গো দিদি। কিন্তু আমার হাতেও যে একটা আছে। আর আমার বাঁ-হাতটা যে কমজোরী। গতমাসে চোট লেগেছিল।

—কীসে চোট লেগেছিল। কার বাড়িতে সিঁধ কাটতে গিয়েছিলে?

—সিঁধ কাটতে যাইনি। আমিই ডাকাতের হাতে পড়েছিলুম। এই তো এই রাস্তায়। জিনিসপত্র সব কেড়ে নিলে, প্রাণে যে একেবারে মারেনি, সেই যথেষ্ট।

—কাদের দল!

—তা কে জানে। ওসব ব্যাপারে আর মুখ খুলতে নেই। আজও ভয়-ভয় করছিল। কী করব, ক্যানিং থেকে আমার মাল আনতে যেতেই হয়। তা আজ দাদাকে দেখলুম, সঙ্গে তারও জিনিসপত্তর আছে, তাই ভরসা পেলুম।

নিরাপদ চুনীলালের দিকে তাকাতেই সে কোমরে হাত দিল। চাঁদমণি চুনীলালের কাছে সরে এসে নিরাপদকে বলল, আমার বাপু তোমাকে একটু সন্দো হয়েছিল প্রথমটায়। এ লোকটা ভালো, নতুন লোক বটে কিন্তু অপদেবতার মতন নয়কো!

নিরাপদ তার বাঁ-হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে দেখাল। তাতে একটা বীভৎস ক্ষত। সে ফিসফিস করে বলল, আমি বড় গরিব মানুষ গো।

এতক্ষণ বাদে চুনীলাল বেশ উদার হয়ে গিয়ে নিরাপদকে বলল, এই নাও একটা সিগ্রেট নেবে নাকি?

চাঁদমণিকে সে বলল, চলো গো, পা চালিয়ে চলো। তোমার মেয়ে যদি সত্যি কষ্ট পায় তবে আর দেরি করা ঠিক নয়! আমরা সবাই মিলে দেখে আসি।



ছাব্বিশটি কান ও বধির বিচারক

আমি হরি ঘোষ স্ট্রিট পেরিয়ে সদ্য বিডন স্ট্রিটে এসে দাঁড়িয়েছি। একটা লাল ডবল ডেকার—আমাকে আগে রাস্তা পার হতে দেবে অথবা নিজেই আগে পার হবে, এইরকম দ্বিধাময় গতিতে আসছে। আমিও রাস্তা পার হওয়ার আগে একটা সিগারেট ধরানো মনস্থ করে ফেলেছি, কিন্তু তখনও বিকেল, সন্ধে নামার কোনও লক্ষণই নেই—অথচ ডবল ডেকারের হেড লাইট দুটো জ্বলছে—এতেই আমি খুব বিরক্তি বোধ করি এবং ডবল ডেকারটিকে অপমান করার জন্যই প্রায় তার নাকের সামনে দিয়ে হেঁটে রাস্তার ওপারে চলে যাই।

ঠিক সেই সময়, এইমাত্র পরিত্যক্ত রাস্তার ওপার থেকেই একটা লোক আমাকে চেঁচিয়ে

ডাকল, সুনীলবাবু, সুনীলবাবু, আপনার টেলিফোন।

খুব ছেলেবেলার সংস্কার, পথে ঘাটে কেউ আমার নাম ধরে অন্তত তিনবার না ডাকলে সাড়া দিই না। কারণ, আমার নামটা খুব সাধারণ, কলকাতা শহরের প্রতি পঁচিশজন যুবকের মধ্যেই একজন সুনীল—একবার একটা ইন্টারভিউ বোর্ডের চেয়ারম্যানের নাম ছিল সুনীল; সুনীল দে মজুমদার—আমার নাম শুনেই তিন অসীম বিরক্তি ও ঘৃণায় চোখ তুলে তাকিয়েছিলেন—বলাই বাহুল্য সেখানে আমার চাকরি হয়নি, পরিবর্তে আমিও, ছোটমামার বাড়িতে নতুন চাকরের নাম যেই শুনলাম সুনীল, বেশ শক্ত সমর্থ—প্রায় নীলবর্ণের এক ছোঁড়া, আমিও ছোটমামাকে বলেছিলাম, একটু হাসতে-হাসতেই, ও-নামের চাকর তোমাদের বাড়িতে থাকলে আমি আর আসছি না এখানে, হয় ওকে ছাড়িয়ে দাও, নইলে নাম বদলাও।

যাই হোক, মুখ ফিরিয়ে আমি অপেক্ষায় রইলাম। অন্য লোককে ডাকছে, আমি সাড়া দিয়ে বহুবার ভুল করেছি জীবনে। ওপারের লোকটি আমার অচেনা, ধুতির ওপর শার্ট পরে আছে, সোজাসুজি আমারই দিকে পুনশ্চ ব্যস্তভাবে বলল, সুনীলবাবু, আপনাকে টেলিফোনে ডাকছে। লোকটি ডানহাত মুঠো করে কানের কাছে নিয়ে টেলিফোন ধরার একটা ভঙ্গিও করল।

টেবিলের ওপর শোওয়ানো টেলিফোনের মধ্যে সবসময় ব্যস্ততা, প্রতিটি মুহূর্ত প্রতীক্ষায় দীর্ঘ—সুতরাং আমি বিচলিত দ্রুততায়—তখন রাস্তা ফাঁকা, এপারে এসে লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায়? লোকটি বলল, এই যে, এই চায়ের দোকানে!

এ দোকানে আমি কোনওদিন চা খাইনি। বস্তুত গত পাঁচ-ছ'বছরের মধ্যে কোনও দোকানেই চা খেতে ঢুকিনি। কিন্তু দোকানটায় পা দিতেই যে-কোনও ছোট চায়ের দোকানের পরিচিত আঁশটে ডিম-ডিম গন্ধ নাকে এল। এই গন্ধটা ভুলিনি। রেলিং ঘেরা উঁচু কাউন্টারে মালিক বসে আছে। মালিকের মুখটি অপরিচিত নয়, কিন্তু কোথায় দেখেছি, কি নাম—কিছুই মনে নেই। কাঠের বাক্সের মধ্যে সযত্নে টেলিফোনটা রাখা, ডায়ালের সঙ্গে ছোট্ট একটা তালা লাগানো—অর্থাৎ বাইরে থেকে ডাক আসতে পারে—কিন্তু এখান থেকে কারুকে ডাকতে হলে—মালিকের পৈতের সঙ্গে বাঁধা চাবি ছাড়া গতি নেই। রিসিভারটা আপাতত কাউন্টারে শোওয়ানো—মালিক আমার দিকে স্মিত হেসে বললেন, নিন স্যার, আপনার—

সেই মুহূর্তে আমার অতি স্বাভাবিক ব্যাপারটা খেয়াল হল। আমার টেলিফোন ডাক হতেই পারে না। এই চায়ের দোকানে আমি কোনওদিন পা দিইনি, এখানে এসময় আমার থাকার কোনও প্রশ্নই ওঠে না, সুতরাং এখানে আমাকে কে ডাকবে? তা ছাড়া বিকেল ঠিক পাঁচটা বেজে পাঁচ মিনিটে আমি এই চায়ের দোকানের সামনে দিয়ে বিডন স্ট্রিট পার হব—একথা তো কারুর জানার কথা নয়। আমি নিজেও তো জানতাম না—আমি হরি ঘোষ স্ট্রিট দিয়ে এসে নয়নচাঁদ দত্ত স্ট্রিটেও বেঁকতে পারতুম, বিডন স্ট্রিটে না এলে আমার কোনও ক্ষতি ছিল না—তাহলে?

আমি মালিককে বিস্মিত অবিশ্বাসের সঙ্গে বললাম, আমার? না, না, আমার কী করে হবে?

মালিক সেই যে প্রথম আমাকে দেখে স্মিত হেসেছিলেন, সেই হাসি এখনও ঠোঁট থেকে মোছেনি, নতুন করে তাঁকে হাসতে হল না—এমনকি হাসির বদলে অন্য কোনও অভিব্যক্তি ফোটাবার পরিশ্রমটুকুও না করে তিনি বললেন, হ্যাঁ, মশাই, আপনার নাম করেই তো ডাকতে বলল। আপনি দমদমেই আছেন? আচ্ছা, আপনি আগে টেলিফোনটা সেরে নিন, তারপর কথা হবে।

লোকটা আমাকে চেনে ঠিকই, আমি ওর নাম মনে করতে পারছি না যদিও। যদিও অবিশ্বাস আমার কাটেনি, তবু পড়ে থাকা টেলিফোনের মধ্যে সেই যে এক ব্যস্ততা, প্রতিটি মুহূর্ত প্রতীক্ষায় দীর্ঘ—আমি খপ করে রিসিভারটা তুলে নিলাম।

—হ্যালো?

—আমার একটুও সময় নেই। তুমি এক্ষুনি চলে এসো।

ইয়ার্কি কিংবা মস্করা ভাবা যেতে পারত। কেন না, একটি বাক্যের পরই কড়-ড়-ড় শব্দ, লাইন ছেড়ে দিয়েছে। বহুদূর থেকে, খুব আলতো গলা, কেউ একজন আমাকে ওই কথাটা শুধু বলে রেখে দিয়েছে টেলিফোন। রিসিভার হাতে রেখে আমি সামান্য ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালাম। পাঁচটা টেবিলের মধ্যে দুটো টেবিল ফাঁকা, একটাতে চার-পাঁচজন ছোকরা ধোঁয়া ওড়াচ্ছে, আর একটাতে সেই একই রকম চেহারার আরও তিনজন যুবা, আর একটায়, আমার সবচেয়ে কাছের টেবিলে দুজন বয়স্ক পুরুষ মুখোমুখি স্থির হয়ে বসে আছে, একটিও কথা বলছে না, তাদের টেবিলের ওপরেও কিছুই নেই। ক'টা কান? এগারো দু-গুণে বাইশ, মালিকের দুই, চব্বিশ—কয়েকটিকে অন্যমনস্ক বলে বাদ দিলেও—পনেরো ষোলোটা অনায়াসেই ধরা যায়।

বিনা প্রস্তুতিতে আমার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। অদ্ভুত ধরনের একটা দুঃখ বোধ করলুম। কার সময় নেই? কোথায় আমি এক্ষুণি চলে আসব? কিংবা আমিই কি? আমাকেই কি ডেকেছে? শুধু 'হ্যালো' শুনেই আমার কণ্ঠস্বর চিনেছে? আমি চিনতে পারিনি। বহুদূর থেকে ভেসে আসা আলতো গলার স্বর, একটু ব্যাকুল ঠিকই, কিন্তু আর একটা কথাও কি বলা যেত না? কে? কোথায়?

চব্বিশটা উৎকর্ণ কান ও কয়েকটা ফোলানো নাকের আঁচ আমি আমার পিঠে টের পেলুম। দুঃখের বদলে রাগের সময়ই আমার বুদ্ধি খোলে। কিন্তু ঠিক রাগ করতে পারছি না। উদাসীনভাবে আমি হেঁটে যাচ্ছিলুম, তবু কে আমাকে হঠাৎ ডেকে এমন দুঃখ দিল! কে? কে? কে? কে? বারবার এই প্রশ্ন করে আমার রাগ ক্রমশ সঞ্চারিত হতে লাগল, তখন, বেশি সময় না—মাত্র কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করেই আমি খুব একটা বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে ফেললুম। এমন হতে পারে, এই রাস্তারই কোনও বাড়ি থেকে কেউ আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে, তাই চিৎকার করে না ডেকে টেলিফোনের সাহায্যে ডেকেছে। কিন্তু কে? বিডন স্ট্রিটের একজনকেও আমি চিনি না—না, কোনওদিন এ-রাস্তায় কোনও বাড়িতে আমি ঢুকিনি, আমার স্পষ্ট মনে আছে। তবু কে আমাকে ডাকল? যদি ডাকলই, কেন তার সময় নেই?

রিসিভারটা হাতে ধরাই ছিল, সেটার সামনে মুখ নিয়ে বললুম, দাঁড়াও, একটু ধরো, এক সেকেন্ড।—সেটায় হাত চাপা দিয়ে আমি মালিকের দিকে ফিরে বললুম, আশ্চর্য তো, আপনি মশাই কী করে বুঝতে পারলেন, আমারই ফোন। আমি এসময়...

এর মধ্যে আর একজনও খদ্দের ঢোকেনি বা বেরোয়নি, মালিক তবু বাক্সের পয়সা গুনছিলেন। মুখ তুলে বললেন, আশ্চর্যই বটে! আপনি এ-দোকানে কোনওদিন আসেন না—তবু আপনাকেই ডাকল যখন—

—কে ডাকল?

—প্রথমে একজন জিগ্যেস করল, বোধহয় অপারেটর, এটা কি থ্রি ফাইভ টু জিরো সেভেন? আমি যেই হুঁ বললুম, তারপর একজন মেয়েছেলে বলল, আপনার ওখানে সুনীল গাঙ্গুলী বলে একজন বসে আছেন, তাকে ডেকে দিন দয়া করে! আমি বললুম, সেরকম তো কেউ নেই—তখন মেয়েছেলেটি বলল, তাহলে কি এসে চলে গেছে? লম্বা রোগা মতন, জুলপিতে ক'টা পাকা চুল, কপালে কাটা দাগ—হাঁপাচ্ছিল মশাই মেয়েছেলেটি—আমি তো তখন আপনাকে দেখতে পেয়েছি ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আছেন—ভাবলুম বুঝি আপনার এখানে আসবার কথা ছিল আজ—আপনার কাকার সঙ্গে সেই সেবার দেওঘরে...

—খুব উপকার করেছেন। খুব জরুরি কল—আমি এখানেই...রিসিভারের কাছে আবার মুখ নিয়ে এলাম। কানে তখনও অনবরত কড় কড়-ড়-ড় বাজছে, ক্রমাগত সেই একঘেঁয়ে সেই অর্থহীন শব্দ, ক্রমশ আরও দুর্বোধ্যতার দিকে নিয়ে যায় আমাকে। ক্রোধ থেকে ফের দুঃখে ফিরে আসি আমি। তোমার সময় নেই? আমার অফুরন্ত সময়।

প্রভূত আবেগের সঙ্গে আমি টেলিফোনকে বলি, তুমি এখন কেমন আছ? তুমি ভালো আছ?

—কড়-ড়-ড়-ড়..

—আমি? আমি খুবই ভালো আছি। না, সেসব কিছুই আমার সেরে গেছে। না, না, ব্যস্ত নই, অ্যাঁ? কী বলছ? জোরে বলো!

—কড়-ড়-ড়-ড়...

—হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছ। আমি থানায় ধরা পড়েছিলুম। দোষ আমার নয়, না, আমি কোনও দোষ করিনি, আমি সেই লোকটাকে মেরেছিলুম, আমি তার চোখ অন্ধ করে দিতে চেয়েছিলুম, কিন্তু অন্যায় করিনি। বিচারক আমাকে নির্দোষ বলে মুক্তি দিয়েছিলেন। না, না, আমি কোনও মুরুব্বিকে ধরে সুপারিশ করাইনি, সত্যি বিশ্বাস করো।

—কড়-ড়-ড়-ড়...

—মাতাল ছিলাম? হ্যাঁ, অস্বীকার করব না, পেঁচি মাতালদের মতন সামান্য একটু খেয়েই আমার পা টলছিল, কিন্তু মাথা পরিষ্কার ছিল—ছেলেটি ট্যাক্সির জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আমাকে বলেছিল 'বাস্টার্ড'—কিন্তু সেজন্য আমি তাকে মারিনি—গালাগালি আমার গায়ে লাগে না—কিন্তু যে চোখে আমার দিকে তাকিয়েছিল, হিংস্র, ঘৃণিত চোখ—আমি বুঝতে পেরেছিলাম ওই চোখ পৃথিবীকে দেখার যোগ্য নয়—আমি ওকে...

—কড়-ড়-ড়-ড়...

—ওর সঙ্গে কী করে দেখা হল?

আমি ট্যাক্সি খুঁজছিলাম, একটাও ট্যাক্সি ছিল না—বৃষ্টি পড়ছিল, আমি ট্যাক্সি থামিয়ে হাত জোড় করে বলেছিলাম—আমি একটা লিফট চেয়েছিলাম—এমনকি পুরো ভাড়া দিতেও রাজি ছিলাম, কিন্তু সে আমায় চিনতে পারে—সে বলে, আপনি? বরানগরে মনীষাদের বাড়িতে—

—কড়-ড়-ড়-ড়

—না, মনীষাদের বাড়িতে আমি ওকে কখনও দেখিনি। মনীষাদের বাড়িতে আমি মনীষা ছাড়া আর কারুকেই কোনওদিন তাকিয়ে দেখিনি—কী বলছ? আমি মনীষাকে অপমান করেছি? তাকে আমি খুন করিনি—এই তার পরম সৌভাগ্য, আমার সঙ্গে মনীষা একদিন ট্যাক্সি করে যাচ্ছিল, ভিক্টোরিয়ার সামনে গাড়ি থামিয়ে আমরা কোকোকোলা খাচ্ছিলাম, একটা ভিখিরি মেয়ে ভেতরে হাত বাড়িয়ে ছিল, দরজা বন্ধ করার সময় তার হাত চিপটে যায়, না, না, মনীষা নয়, আমিই। দরজাটা বন্ধ করেছিলাম মেয়েটার পুরো হাতটাই ছেঁচে গিয়েছিল—গোলমাল হতেই ট্যাক্সি ছেড়ে দেয়, লোকজন চেঁচায়, আমাদের ট্যাক্সি পালিয়ে গিয়েছিল, একটু দূরে যেতেই আমি ভুল বুঝতে পারি, আমি ফিরে যাওয়ার কথা বলতে মনীষা বলেছিল, বেশি-বেশি ন্যাকামি করো না। হঠাৎ মনে হয়েছিল, আমি ন্যাকামিই করছি হাতটা ছেঁচে গেছে, নুলো হয়ে গেলে—মেয়েটা ভিক্ষে আরও বেশি পাবে।

—কড়-ড়-ড়-ড়...

—অ্যাঁ?

—কড়-ড়-ড়-ড়...

—হ্যাঁ বলেছিলাম। মনীষাকে বলেছিলাম, তোমাকে খুন করলেও তোমার কঙ্কালটা মেডিক্যাল কলেজের ছেলেরা দুশো টাকায় কিনে নেবে। তুমি এতই দামি!...কিন্তু ট্যাক্সির সেই ছেলেটাকে আমি কিছুই বলিনি, তার কাছে হাত জোর করে অনুরোধ করেছিলাম—মানুষের কাছে মানুষ যেভাবে দয়া চায়, কিন্তু সে আমাকে ধাক্কা মেরে বলেছিল, বাস্টার্ড, তাও কিছু না, কিন্তু চোখ—ওই চোখ পৃথিবীকে দেখার যোগ্য নয়—ওইসব দৃষ্টির জন্যই তো পৃথিবী প্রতিদিন অপবিত্র হচ্ছে—বৃষ্টিতে ভিজতে-ভিজতে কুঁকড়ে আমি তাকে বলেছিলাম, দয়া করে একটু জায়গা দিন—আমরা তো একই দিকে যাচ্ছি—তবু শোনেনি, আমি তখন তার চোখ উপড়ে নেওয়ার জন্য আঙুল

বাড়িয়েছিলাম।

—কড়-ড়-ড়-ড়...

—না, আমি অনুতাপ করব না। আমি যা করেছি, আবার ওইরকম করব! থানায় নিয়ে যাওয়ার পর আমি হেড কনস্টেবলের গায় বমি করেছিলাম, আমাকে ওরা মাটিতে ফেলে বুটজুতোসুদ্ধ পায়ে লাথি মারে—একজন পাশে দাঁড়িয়ে হাসছিল, এক গেলাস অর্ধেকটা খেয়ে সেই এঁটো জলের বাকি অর্ধেকটা ছুড়ে দিয়েছিল আমার মুখে, আমি চিৎকার করেছিলাম, বেশ করেছি, আমি আবার ওকে মারব, আবার মদ খাব, আবার আমি ট্রাম-বাস জ্বালাব, আবার আমি পুলিশের গাড়িতে বোমা ফেলব, বেশ করব, বেশ করব!

—কড়-ড়-ড়-ড়...

—জানি, তুমি আমার জন্য চিন্তা করবে না। তোমার সময় নেই। তুমি খুব ব্যস্ত। ঠিক আছে—তোমার কথামতন আর এ-রাস্তা দিয়ে হাঁটব না, কিন্তু দিনের বেলা যদি ডবল ডেকার তার হেড লাইট জ্বালে—আমি আগে রাস্তা পার হবই—হ্যাঁ, ফের আমি বৃষ্টির দিনে জোর করে ট্যাক্সি থামাব, অপবিত্র চোখ দেখলে...দূর ছাই কেটে গেল? হ্যালো, হ্যালো—

দোকানের মালিকের সামনে দাঁড়িয়ে আমি জিগ্যেস করলুম, পয়সা লাগবে? লোকটি কথা না বলে নঞর্থক ঘাড় নাড়ল। আমি বললুম, আপনাকে আমারও চেনা-চেনা লাগছে, কিন্তু আমার কোনও কাকা নেই। দেওঘরে আমরা কোনওদিন যাইনি। আপনি আমাকে কী করে চিনলেন বলুন তো!

লোকটির উত্তর না শুনেই আমি বেরিয়ে এলুম। এ-রাস্তায় অনেক বাড়ির দরজা বন্ধ, জানলা খোলা, জানলা বন্ধ, দরজা খোলা। কোথাও কোনও চোখ আমাকে লক্ষ্য করল না। আমি যতক্ষণ টেলিফোনে কথা বলছিলুম, ততক্ষণ রেস্তোরাঁর সবক'টি লোক চুপ করেছিল, চব্বিশটি কান উৎকর্ণ! এবারে, আমি চলে আসার পর সবাই আবার এক সঙ্গে কথা বলবে, সবাই মতামত জানাবে। আসলে ওর বিশ্রী চায়ের স্বাদ নিতে-নিতে, একটা গোলোক ধাঁধায় ঘুরপাক খাবে। ঘুরুক! কে আমায় টেলিফোনে ডেকেছিল তা আমি জানতে চাই না, আমার কিচ্ছু আসে যায় না! আমি কোথায় যাচ্ছিলাম ভুলে গেছি, এবার কোনদিকে যাব—তাই ভাবতে লাগলুম। যে কোনও দিকেই যাওয়া যায়, বিডন স্ট্রিট ধরে সোজা অথবা ডানদিকে। দিক ও মন স্থির করার জন্য আমি পকেট থেকে একটা আধুলি বার করে টস করতে চাইলাম। অশোকস্তম্ভ সোজা, গমের শীষ—ডানদিকে।

আধুলিটায় টুসকি দিয়ে শূন্যে ছুড়ে কিন্তু সেটাকে ফের হাতের তালুতে ফিরিয়ে আনতে পারলুম না। হাত ফসকে সেটা পড়ে গড়িয়ে নর্দমার দিকে যেতেই আমি অতি ব্যস্ত হয়ে সেটাকে ধরার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়লাম।

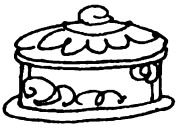

গন্ধ

চলন্ত ট্রাম থেকে নেমে ছুটতে-ছুটতে সাধনদা আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। বেশ ব্যস্তভাবে বললেন, সুনীল, তুই আমার কাছ থেকে দশটা টাকা পাবি, মনে ছিল না। আজ তোকে শোধ দেব।

সাধনদার দিকে মনোযোগ দিয়ে তাকালুম। আমি যে সাধনদাকে চিনতুম, সেই সাধনদা ইনি নন। সাধনদার মুখে দু-তিন দিনের খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, প্যান্টের ওপরে ঝুলছে শার্ট, পায়ে রবারের চটি। আমার চেনা সাধনদা ছিলেন পাক্কা সাহেব, এমনকি অশৌচের সময়ও তাঁর এইরকম পোশাক কল্পনা করতে পারতুম না। সাধনদার সঙ্গে আমার দশ টাকা ফেরত দেওয়ার সম্পর্ক নয়। সাধনদা ট্রাম-যাত্রীও ছিলেন না কখনও।

ভুরু কুঁচকে বললুম, কী ব্যাপার?

সাধনদা পকেট থেকে পার্সটা বার করে টাকা খুঁজছে। পার্সে পঞ্চাশ টাকা, একশো টাকার নোট বেশ কয়েকটা, কিন্তু দশ টাকার নোট নেই।

সাধনদা বললেন, কারুর কাছে আর ধার করতে চাই না, বুঝলি? মনে করে-করে সবাইকে পুরোনো ধার শোধ দিয়ে বেড়াচ্ছি। একটা জিনিস লক্ষ্য করলুম, বুঝলি, আমরা কেউ পুরোপুরি নিজের রোজগারে বাঁচি না। একেক রকম ধার থেকেই যায়।

তুমি আমাকে দশ টাকা ফেরত দিচ্ছ? তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? সেরকম হিসেব করলে তোমার কাছেও তো আমার ধার হবে অন্তত কয়েক হাজার টাকা!

—তুই আমার কাছ থেকে কোনওদিন ক্যাশ টাকা নিয়েছিস? নিস নি তো! ক্যাশ টাকাকেই ধার বলে। বাকিটা হচ্ছে আদর যত্ন, যার বিনিময়ে দিতে হয় কৃতজ্ঞতা কিংবা ভালোবাসা। তোর কাছে পঞ্চাশ টাকার চেঞ্জ আছে?

সাধনদার গাড়িতে একবার ডায়মন্ডহারবার যাচ্ছিলুম, মাসছয়েক আগের কথা। পেট্রল পাম্পে তেল নেওয়ার সময় কী একটা খুচরোর গোলমালে আমি দশটা টাকা দিয়েছিলুম। একে ধার দেওয়া বলে?

—তোমার কী হয়েছে আগে বলো তো?

—আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে রে, আমাকে এবার যেতে হবে। টাকাটা তোকে কী করে দিই? চল, কোনও দোকান থেকে ভাঙাই!

কিছুদিন সাধনদার সঙ্গে দেখা হয়নি। একটা উড়ো খবর শুনেছিলুম যে সাধনদা চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। মাথারও নাকি একটু গোলমাল হয়েছে। কিংবা, কারু-কারুর সন্দেহ, উনি ক্যানসারে ভুগছেন!

ফুটপাতের দোকান থেকে দু-টাকার একটা কলম কিনে সাধনদা টাকাটা ভাঙালেন। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, ওই কলমটার সাধনদার কোনও দরকার নেই। বিজ্ঞাপন কোম্পানির বেশ বড় কর্তা ছিলেন। ওঁর বাড়িতে কলম-পেন্সিলের ছড়াছড়ি।

দশটা টাকা আমার হাতে দিয়ে বললেন, জীবনটা বেশ ভালোই কাটল রে!

—তোমার কী হয়েছে, তা কিন্তু বললে না এখনও।

—আমার ক্যানসার হয়নি। সবরকম টেস্ট করিয়েছি। তোকে কী রত্না বলেছে যে আমার মাথা খারাপ হয়েছে?

—বউদির সঙ্গে আমার দেখা হয়নি।

—মাথা খারাপ হলেও হতে পারে, বুঝলি? সেটা তো আমি নিজে বুঝতে পারব না। তবে, আমার দিন ঘনিয়ে এসেছে, এটা ঠিক। মৃত্যু আমায় তাড়া করছে।

—এটা কী করে বুঝলে?

—একটা গন্ধ পাই। প্রথম দিন সেই গন্ধটা পেয়ে ঘুম পেয়ে যায়। কীরকম গন্ধ জানিস; চেতলা ব্রিজের ওপর দিয়ে পাস করার সময় ওই গন্ধটা পাওয়া যায়। মানুষ পোড়া গন্ধ, কেওড়াতলা শ্মশান থেকে আসে। ঘুম ভাঙার পর সারা বাড়ি খুঁজে দেখলুম, কোথাও কিছু নেই, অথচ গন্ধটা পাচ্ছি। বুঝলুম, এটা একটা ওয়ার্নিং। এখন গন্ধটা যখন-তখন পাই। ঘনঘন পাই।

—সাধনদা, তুমি কী যা-তা বলছ।

—জানি, বলবি তো, এটা আমার মনের ভুল? কিংবা বাতিক? সবাই শুনে তাই ভাবে। তুই কি আমার গা থেকে সেরকম কোনও গন্ধ পাচ্ছিস?

—না।

—রত্নাও পায় না। কিন্তু অন্য কেউ-কেউ পায়। হিপনোটিজমের মতন মৃত্যুরও মিডিয়াম আছে। অন্য কে-কে গন্ধ পেয়েছে শুনবি? গত শনিবার আমি বেশ্যাবাড়িতে গিয়েছিলুম। চমকে যাওয়ার কিছু নেই, মজা মারতে যাইনি, গিয়েছিলুম পরীক্ষা করতে। ওদের কাছে এমন কিছু কথা বলা যায়, যা অন্য আর কোনও মেয়েকে বলা যায় না। ওরা যেমন সহজে জামাকাপড় খোলে, সেইরকম ভাবে মনটাকেও খুলতে পারে। বাহান্ন টাকা দিয়ে একটা মেয়ে এক ঘণ্টার জন্য ভাড়া করলুম। তাকে কিছু বলিনি, অন্য লোকে যেমন যায়, সেইভাবেই গেছি। জামাকাপড় খুললুম, মেয়েটি আমাকে জড়িয়ে ধরে খুব সরলভাবে বলল, হ্যাঁ গো, তোমার গায়ে কীসের গন্ধ? আমি খুব নিরীহভাবে বললুম, গন্ধ? সে কী। রোজ বিলিতি সাবান দিয়ে চান করি। কীসের গন্ধ বলো তো! মেয়েটি তবু বলল, হ্যাঁ গো, কীরকম পোড়া-পোড়া গন্ধ! তুমি গঙ্গায় ভালো করে চান করো, সব ঠিক হয়ে যাবে! তবেই দ্যাখ মেয়েটিকে তো কেউ শিখিয়ে দেয়নি! মিছিমিছি সে আমার মনে আঘাত দিতে চাইবে কেন বল? একবালপুরে একটা বাচ্চা ছেলেও ঠিক ওই কথা বলেছিল। ওরা মিডিয়াম। ওরা ঠিক টের পায়।

—সাধনদা, তুমি সত্যি করে বলো তো, তুমি এর মধ্যে কোনও জ্যোতিষীর কাছে গিয়েছিলে?

—পাগল হয়েছিস তুই? আমি যাব জ্যোতিষীর কাছে? ওসব আমি বিশ্বাস করি না। আমি পারতপক্ষে ডাক্তারদের কাছেও যাই না। কিন্তু আমি গন্ধ পেয়েছি।

মৃত্যু বিষয়ক আলোচনা আমার পছন্দ হয় না। মৃত্যু সম্পর্কে আমার ধারণা, অনেকটা রণক্ষেত্রে সৈনিকের মতন। কোথা থেকে কামানের গোলা আসবে, ব্যস, শেষ হয়ে যাব। আগে থেকে এত ভাববার কী আছে!

সাধনদাকে বললুম, তুমি চলন্ত ট্রাম থেকে অমন ঝুঁকি নিয়ে নামলে কেন? তুমি কি ইচ্ছে করে মরতে চাও!

সাধনদা হেসে ফেলে বলল, না রে, অত সহজে কী হয়? মরতে কেউ চায় না। আমিই বা চাইব কেন? তবে সময় এসে গেলে তৈরি থাকাই উচিত নয়? মৃত্যুকে দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাওয়ার কোনও মানে হয় না। এখন কথা হচ্ছে, মৃত্যু কোথায় এসে আমায় ধরবে? এই অনিশ্চয়তাটাই বড় সাংঘাতিক। ঐতিহাসিক প্লিনি একটা ঘটনা লিখে গিয়েছিলেন জানিস তো? প্লিনি লিখেছেন একজন কবির কথা। সেই কবি দৈববাণী শুনেছিল যে কিছুদিনের মধ্যেই হঠাৎ তার মৃত্যু হবে।

ওপর থেকে একটা কিছু ভারি জিনিস তার মাথায় পড়বে। বাঁচবার জন্য সেই কবি বাড়ি-ঘর ছেড়ে চলে গেল। এমনকী কোনও জঙ্গলেও গেল না, যদি গাছের ওপর থেকে কিছু পড়ে। কবি এক ফাঁকা মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল। তবু মরতে হল তাকে। কী করে জানিস, ওপর থেকে একটা প্রকাণ্ড কচ্ছপ এসে পড়ল সেই কবির মাথার ওপরে।

—আকাশ থেকে কচ্ছপ? এ যে গাঁজাখুরি গল্প, সাধনদা!

মোটেই গাঁজাখুরি গল্প নয়। মিডল ইস্টে এখনও অনেক বড়-বড় শকুন আছে। সেই শকুনগুলো এক-একটা কচ্ছপকে ছোঁ মেরে ওপরে তুলে নিয়ে যায়। কচ্ছপের শক্ত খোলা ভেঙে তো তাকে মারতে পারে না। তাই ওপর থেকে কোনও পাথরের ওপরে আছড়ে-আছড়ে ফেলে। সেই রকমই কোনও কচ্ছপ খসে পড়েছিল কবির মাথায়। তবেই বুঝলি? মৃত্যুর ভয়ে ঘর ছেড়ে পালাতে নেই। চলি রে। এখনও অনেকের কাছে ধার শোধ করতে যেতে হবে।

এরপর অনেকক্ষণ সাধনদার কথা ভাবলুম।

চেনাশুনো মানুষের পরিমণ্ডল থেকে এক-একটা মানুষ হঠাৎ অন্য রকম হয়ে যায়। সাধনদা ছিলেন সবদিক থেকেই একজন সুসংহত মানুষ। বুদ্ধিমান, দায়িত্ববান, জীবনের তথাকথিত উন্নতির সিঁড়ি ধরে বেশ ধাপে-ধাপে উঠে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ কেন সব গোলমাল হয়ে গেল? গুরুতর অসুস্থও হননি, মাথার গোলমাল যদি হয়েও থাকে, তাও অতি সূক্ষ্ম, ওই মৃত্যু ব্যাপারটা ছাড়া আর সব বিষয়েই তো স্বাভাবিক।

সচরাচর মানুষ এইরকম পরিস্থিতি এড়িয়েই চলতে চায়। কিন্তু সাধনদা রত্নাদির কাছে আমার অনেক ঋণ। দুদিন বাদে গেলুম ওঁদের যোধপুর পার্কের ফ্ল্যাটে।

বাড়ির ভেতরটা অদ্ভুত শান্ত। সাধনদার দুই ছেলেই দার্জিলিং-এ পড়ে। যতবার এ-বাড়িতে এসেছি, দেখেছি অনেক রকম মানুষের ভিড়। আজ কেউ নেই। বসবার ঘরটা খালি-খালি। ওঁদের কাজের ছেলেটি আমায় দরজা খুলে দিয়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

একটু এদিক-সেদিক উঁকি মেরে দেখলুম, শোওয়ার ঘরের দরজার সামনে মেঝেতে উপুড় হয়ে বসে আছেন রত্না বউদি। পাশে অনেক ফটোগ্রাফ ছড়ানো। আর দুটি অ্যালবাম। রত্না বউদি ছবিগুলো বেছে অ্যালবামে সাজাচ্ছেন।

অতি সাধারণ দৃশ্য, তবু যেন আমার বুক কেঁপে উঠল। কী আছে এর মধ্যে? রত্না বউদি একবারও মুখ তুলে দেখলেন না।

সাধনদার নিজস্ব ঘরটি বারান্দার পাশে। ওটা ওঁর স্টাডি রুম, বইপত্র প্রচুর।

সেই ঘরের কাছে এসে দেখলুম, দেওয়ালে কোনও বুক সেলফ নেই। ঘরে একটাও বই নেই। একটা রঙিন টিন আর ব্রাশ নিয়ে সাধনদা এক মনে সাদা রং করে যাচ্ছেন। এই দৃশ্যটাও কেমন যেন বুক কাঁপার মতন। এসব কী চলছে এ-বাড়িতে।

দু-তিন মিনিট দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইলুম। তবু সাধনদা দেখতে পেলেন না আমাকে। আমি ভিতরে এসে সাধনদার একেবারে পাশে দাঁড়িয়ে জিগ্যেস করলুম, এ কী হচ্ছে সাধনদা?

সাধনদা মুখ তুলে খুব শান্তভাবে তাকালেন আমার দিকে। যেন আমাকে চেনেনই না। মাত্র দু-মাস আগেও সাধনদা আমায় দেখলেই উল্লসিত হয়ে উঠতেন। মানুষ এরকম বদলে যায় কেন?

আমি আবার ডাকলুম, সাধনদা।

সাধনদা দেওয়ালের দিকে তাকিয়েই বললেন, সাদা রং তোর ভালো লাগে না? একটু-একটু নীলচে আভা? আগে আমার ঘরের রং ছিল নীল। ওটা জীবনের রং। বেঁচে থাকার রং। মৃত্যুর আগে ঘরটা সাদা করে যেতে হয়।

এত স্বাভাবিক ভাবে মৃত্যুর কথাটা উচ্চারণ করলেন সাধনদা, যেন এর কোনও প্রতিবাদই চলে না। যেন মৃত্যু দাঁড়িয়ে আছে ঠিক সাধনদার পাশে।

আমি একটুখানি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম, সাধনদা একমনে কাজ করে যেতে লাগলেন।

—আমি তোমাকে সাহায্য করব?

—না, তোর এখনও সময় হয়নি। নতুন রঙের গন্ধ তোর কেমন লাগে।

—সবারই তো ভালো লাগে।

—আমার আরও বেশি ভালো লাগছে। এই গন্ধে সেই পোড়া গন্ধটা ঢেকে যায়। দেওয়ালটা কেন রং করছি জানিস তো? আমার পরবর্তী মানুষের জন্য। আমি সাদা করে দিচ্ছি, তারা এসে আবার যে-কোনও রং করবে। স্লেট মুছে দেওয়ার মতন।

কোনওদিন আমি সাধনদার মুখ থেকে এরকম শুনিনি। তিনি ছিলেন আমুদে আর প্র্যাকটিক্যাল ধরনের মানুষ। মৃত্যুর সান্নিধ্য তাকে এত জ্ঞানী করে তুলেছে?

সাধনদা বললেন, দেওয়ালগুলো রং করতে বেশি ঝামেলা নেই। একটা-একটা করে ঘষে ফেলেছি। তারপর ব্রাশ বুলোচ্ছি। কিন্তু ওই যে ছাদ। ওইটা ঘষা, তারপর রং করাই শক্ত হবে। এটা শেষ করে যেতে পারব? বলত, শেষ করে যেতে পারব? ততটা সময় পাব? সবাই পায় না!

আমার দিকে তাকিয়ে অদ্ভুতভাবে হাসলেন সাধনদা।



সুনেত্রার কথা

পিন্টু আর আমি যমজ ভাইবোন। আমার জন্মের ঠিক সাত মিনিট পরে পিন্টু হয়েছিল, সেই হিসেবে আমি পিন্টুর বড়, কিন্তু ও কখনও আমাকে দিদি বলে না।

যমজ হলেও কিন্তু আমরা একরকম দেখতে নই। বাবার বন্ধু রতনকাকার দুই ছেলে যমজ, ওরা কিন্তু হুবহু একরকম, কে যে অজয় আর কে যে সুজয় তা আমরা বুঝতে পারি না। আমাদের দুজনের চেহারা দুরকম। মা অবশ্য বলেন, আমাদের ভাইবোনের মধ্যে চেহারার একটা মিল আছে ঠিকই, কিন্তু সেটা আর কেউ বুঝতে পারে না। পিন্টুর গায়ের রং ছেলে-ছেলে মতন, ফরসা নয়, আবার কালোও নয়, মুখখানাও চোখা ধরনের। সেই তুলনায় আমাকে সবাই ফরসাই বলে। আমাদের নামেও মিল নেই। ও পিন্টু, আমি বাবলি, ওর ভালো নাম জয়দীপ, আমার সুনেত্রা।

আমার স্পষ্ট মনে আছে, আমার ঠিক তেরো বছর এক মাস বয়েস পর্যন্ত আমি আর পিন্টু ছিলুম সবদিক থেকে সমান। বরং খেলাধুলোতে আমি একটু বেশি ভালো ছিলুম, পিন্টুর চেয়ে আমার স্বাস্থ্য ভালো, আমার গায়ের জোর বেশি ছিল। আর-একটু ছোট বয়েসে যখন আমরা মারামারি করতুম, পিন্টু কোনওদিন আমার সঙ্গে পারেনি। দুজনের আলাদা ইস্কুল হলেও আমরা একই ক্লাসে পড়ি, রেজাল্টও দুজনেরই ভালো হয়।

মনে পড়ে, সেবারে সেই দেওঘরে বেড়াতে যাওয়ার কথা। আমরা যে-বাড়িটা ভাড়া নিয়েছিলুম, সেই বাড়ির উঠোনে একটা মস্ত বড় পেয়ারা গাছ ছিল, তাতে অনেক পেয়ারা ফলেছিল। চমৎকার মিষ্টি পেয়ারা, ভেতরটা লালচে রঙের। পিন্টু তো তরতরিয়ে উঠে গেল গাছে। সাতটা পেয়ারা পেড়ে নেমে এসে আমাকে আর দিদিকে মাত্র একটা করে দিয়ে পিন্টুটা কিপ্টের মতন নিজে রেখে দিল বাকিগুলো। তখন আমিও চড়লুম গাছে। মা বারণ করলে বলেছিলুম, বাঃ, পিন্টু গাছে উঠতে পারে তো আমি উঠব না কেন? আমিও সাত-আটটা পেয়ারা পেড়েছিলুম।

দেওঘরে বাবা একটা গাড়ি ভাড়া করেছিলেন, সেটাতে চড়ে আমরা জসিডি, ত্রিকুট, রিখিয়া বেড়াতে যেতুম। নন্দন পাহাড়টা খুব ছোট, সেটার একদম ওপর পর্যন্ত গাড়ি করে যাওয়া যায়। বাবা-মায়েরা গাড়িতে করেই যাচ্ছিলেন, পিন্টু বলল, ও নীচ থেকে দৌড়ে উঠবে। আমিও নেমে পড়লুম গাড়ি থেকে। তারপর দুজনে ছুটে-ছুটে প্রায় একইসঙ্গে পৌঁছে গেলুম ওপরের মন্দিরের কাছটায়। সেবার ছোট মাসি ছিলেন আমাদের সঙ্গে, তিনি বলেছিলেন, ওরা যমজ তো, তাই সব ব্যাপারেই সমান।

কিন্তু তেরো বছর এক মাস বয়েসে আমি পিন্টুর থেকে অনেক আলাদা হয়ে যাই।

তারিখটা আমার মনে আছে, কারণ তার এক মাস আগেই আমাদের দুজনের জন্মদিন ছিল। তারপর, এক মাস বাদেই আমার শরীরে একটা পরিবর্তন এল! আমি ভয় পেয়েছিলুম খুব, কিন্তু মা বললেন, ভয়ের কিছু নেই, মেয়েদের ওরকম হয়। এখন থেকে খুব সাবধানে থাকতে হবে, বুঝলি? এই পৃথিবীতে মেয়েদের অনেক বিপদ।

সেইদিন বুঝলুম, পিন্টু ছেলে আর আমি মেয়ে। আমাদের জীবন একরকম নয়।

আমার শরীরে আরও কতগুলো পরিবর্তন এল। আমার বুকে ঢেউ খেলে গেল। পিন্টু হাফ-প্যান্ট পরে আমি ফ্রক পরি। আমি লক্ষ্য করলুম, পিন্টুর তুলনায় আমার উরু কেমন যেন গোল-গোল হয়ে আসছে। আমার খুব বিচ্ছিরি লাগত, আমার এই পরিবর্তন আমার একটুও পছন্দ হচ্ছিল না।

আমি আরও লক্ষ্য করলুম, মা আর দিদির সবসময় আমার দিকে নজর। অথচ পিন্টু ক্রমশ আরও বেশি স্বাধীন হতে লাগল। পিন্টু এখন একা বাড়ি থেকে বেরিয়ে বিকেলবেলা বিবেকানন্দ পার্কে বল খেলতে যায়। আর ইস্কুল থেকে ফেরার পর বিকেলবেলা বাড়িতেই থাকতে হয় আমাকে। সপ্তাহে দুদিন আমি গানের ইস্কুলে যাই, আমাদের কাজের লোক রঘু আমার সঙ্গে, আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসে। অথচ পিন্টুও কোনও পাহারা লাগে না।

পিন্টুও আজকাল আর ভালো করে মেশে না আমার সঙ্গে। আগে দুজনে কত গল্প হত। এখন বাড়িতে থাকলেই ও মুখের সামনে গল্পের বই নিয়ে বসে থাকে আর একটু ফাঁক পেলেই বন্ধুদের কাছে ছুটে যায়।

ছোট মাসি, আমার এক পিসতুতো দাদা-বউদি প্রায়ই আমাদের বাড়িতে বেড়াতে আসেন। তাঁরা জিগ্যেস করেন, পিন্টু কোথায়? পিন্টুকে তো আজকাল দেখতেই পাই না। তারপর নিজেরাই উত্তর দেন, ওই বয়েসের ছেলে, ওকে কি আর এখন বাড়িতে ধরে রাখা যায়?

কিন্তু আমারও তো ওই একই বয়েস, তবে আমায় কেন ওঁদের সামনে বসে থাকতে হবে?

চোদ্দো বছরে পা দিয়ে ক্লাস নাইনের পরীক্ষায় পিন্টু আমার চেয়ে অনেক ভালো রেজাল্ট করল। পিন্টু সেকেন্ড হয়েছে, আর আমাদের ক্লাসে আমার পজিশন হল সেভেনটিনথ। খুব কেঁদেছিলাম সেদিন। আমি কি পিন্টুর চেয়ে পড়াশুনোয় খারাপ? সব দোষ ওই মাস্টারমশাই আর চন্দনদার!

মাস্টারমশাই বেশ বয়স্ক লোক, প্রায় চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর বয়েস। আমাকে আর পিন্টুকে ক্লাস ফোর থেকে পড়াচ্ছেন। সেই মাস্টারমশাই হঠাৎ কীরকম বদলে গেলেন এবছর। হয়তো আমাকে আর পিন্টুকে কিছু লিখতে দিয়েছেন, একসময় আমি হঠাৎ মুখ তুলে দেখি, মাস্টারমশাই একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন আমার বুকের দিকে। একেবারে আমার ফ্রকের ভেতর দিকে তাঁর চোখ। আগে কোনওদিন মাস্টারমশাইয়ের এরকম দৃষ্টি তো দেখিনি। ক্রমশ মাস্টারমশাইয়ের স্বভাব আরও বদলাতে লাগল। পিন্টু একটু উঠে গেলেই উনি আমার উরুর ওপর হাত রাখেন। প্রথম-প্রথম ভাবতুম, এমনিই বুঝি অন্যমনস্কভাবে উনি হাতটা রেখেছেন, খেয়াল করেননি। কিন্তু ক'দিন বাদেই বুঝলাম, পিন্টু উঠে গেলেই উনি ওইরকম হাত রাখেন, একটু-একটু চাপ দেন। একদিন আমার হাত থেকে কলমটা নেওয়ার সময় উনি একেবারে স্পষ্ট ইচ্ছে করে আমার বুক ছুঁয়ে দিলেন।

কত কষ্ট যে পেয়েছি মাস্টারমশাইয়ের এই ব্যবহারে, তা একমাত্র ভগবান ছাড়া আর কেউ জানে না। রাত্তিরে একা-একা কেঁদে-কেঁদে বালিশ ভিজিয়েছি। যেদিন মাস্টারমশাই আসেন, সেদিন বিকেল থেকেই আমার মনে আতঙ্ক জাগে। এইরকম মনের অবস্থায় পড়াশোনা হয়? অথচ এ কথা কাকে বলব? বাবা-মাকে জানালে মাস্টারমশাইয়ের অপমান হবে না? অথচ মাস্টারমশাই এমনিতে কত ভালো লোক। পিন্টুকে তো উনি বিরক্ত করেন না, শুধু আমি মেয়ে বলেই—

দিদি একদিন ধরে ফেলেছিল। সেদিন মাস্টারমশাই খুব অসভ্যতা করেছিলেন। রাত্তিরে আমি শুয়ে-শুয়ে কাঁদছিলুম। দিদি হঠাৎ জেগে উঠে বসেছিল, এই বাবলি, তোর কী হয়েছে রে? তুই কাঁদছিস কেন?

আমি কোনও উত্তর দিইনি, আমার কান্না আরও বেড়ে গিয়েছিল।

দিদি আমার পিঠে হাত বুলিয়ে বলেছিল, কাঁদিস না। এ-বয়েসে এরকম হয়, আমি জানি তো! এমনি এমনি মন খারাপ হয়, এমনি-এমনি কান্না পায়। আমারও এরকম হত। দেখিস, আর কয়েক বছর বাদেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

বাড়িতে যেসব পুরুষ মানুষ আসে, যাদের কারুকে দাদা বা কাকা বা মামা বলি, তাদের অনেকেরই একটা নতুন রোগ হয়েছে। আমাকে দেখলে তাঁরা আমার কাঁধে হাত দিয়ে কথা বলার চেষ্টা করেন। কেউ-কেউ বুকের কাছে টেনে নিয়ে যেতে চান। এরা তো আগে এরকম ছিলেন না। কেউ তো পিন্টুর কাঁধে হাত দিয়ে কথা বলে না। পুরুষদের কথা বাদ দিলুম, অত যেসব মহিলারা আসেন, তাঁরা তো কেউ পিন্টুকে বুকের কাছে টেনে নেওয়ার চেষ্টা করেন না।

পিন্টুও মেয়েদের এড়িয়ে চলে। আজকাল যেন ও মেয়েদের কথা বলার যোগ্যই মনে করে না।

পরীক্ষার রেজাল্ট ওরকম হওয়ার পর আমি বাধ্য হয়ে বাবা-মাকে বললুম, ওই মাস্টারমশাই আর পড়াতে পারছেন না দুজনকে। আমি আর ওঁর কাছে পড়ব না।

পিন্টুও বলল, পুরোনো মাস্টারমশাইয়ের কাছে পড়ে কোনও লাভ হচ্ছে না।

পিন্টু কি কিছু বুঝতে পেরেছিল? তাহলে আমাকে কিছু বলেনি কেন? এখন আর পিন্টুর মনের কথা আমি বুঝতে পারি না।

মাস্টারমশাইকে ছাড়িয়ে দেওয়ার পর কিন্তু ওঁর জন্য আমার কষ্ট হতে লাগল খুব। নিশ্চয়ই উনি মনে খুব আঘাত পেয়েছেন। শেষদিন যাওয়ার সময় ওঁর মুখখানা কীরকম শুকনো বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। মাস্টারমশাই আর আসবেন না ভেবে বেশ কয়েকদিন ওঁর জন্য কেঁদেছি।

চন্দনদাটার জন্য অবশ্য আমার একটুও কষ্ট হয় না, বরং রাগ হয়। চন্দনদাকে দেখলেই আমার গা জ্বালা করে!

আমাদের বাড়ির ঠিক উলটো দিকেই থাকে মৌটুসি। আমার সাত-আট বছর বয়েস থেকেই ও আমার বন্ধু। মৌটুসি আমার থেকে বয়েসে একটু বড়, বোধহয় দু-বছরের। একবার ওর টাইফয়েড হয়েছিল বলে ও পরীক্ষা দিতে পারেনি। আর-একবার কী যেন গণ্ডগোল হয়েছিল, তাই ও এখন আমার সঙ্গে এক ক্লাসে পড়ে। মৌটুসি খুব ভালো মেয়ে, বেশ ঠান্ডা মতন স্বভাব, তবে বেচারি পড়াশোনার জিনিস ঠিক মনে রাখতে পারে না। মাসিমা তাই বলেছিলেন, বাবলি, তুই এসে মাঝে মাঝে মৌটুসির সঙ্গে বসে পড়লেও তো পারিস! ওকে একটু দেখিয়ে দিতে আমার বেশ ভালোই লাগে। পিন্টু আগে ইতিহাস-ভূগোলে কাঁচা ছিল, তখন আমিই তো পিন্টুকে ইতিহাস-ভূগোলের অনেক কোয়েশ্চন-আনসার বলে দিয়েছি। আমি তো ঠিকই করেছি বড় হয়ে আমি কোনও কলেজে পড়াব।

মৌটুসিদের বাড়িতে গিয়ে পড়াশুনো করলে আমার মা-ও কোনও আপত্তি করেন না। কখনও দরকার হলে মা রঘুকে পাঠিয়ে আমায় ডেকে আনতে পারেন।

বেশ চলছিল, কিন্তু সব গণ্ডগোল করে দিল ওই চন্দনদা। আচ্ছা, চন্দনদা, আমায় কত বাচ্চা

বয়েস থেকে দেখছে, মৌটুসি যেমন ওর বোন, তেমন আমিও তো ওর বোনেরই মতন। তবু চন্দনদা কেন আমার সঙ্গে ওরকম অসভ্যতা করবে?

আমি আর মৌটুসি ওদের তেতলার ঘরে বসে নিরিবিলিতে পড়ি, মাঝে-মাঝে চন্দনদা সেই ঘুরে ঢুকে পড়ে। কোনও কথা বলে না, দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকে কিংবা একটা বই নিয়ে নাড়াচাড়া করে। তারপর একটু বাদে আবার বেরিয়ে যায়। আমি মাঝে-মাঝে অবাক হয়ে তাকাই। চন্দনদা কোনও কথা বলে না কেন? এমনকী আমি নিজে থেকে কোনও কথা বললেও দায়সারা উত্তর দিয়ে চলে যায় ঘর থেকে! এর মানে আমি বুঝতে পারি না। কোনও কথাই যদি বলার না থাকে, তাহলে চন্দনদা কী দেখতে আসে?

এইরকম ভাবেই চলছিল।

একদিন চন্দনদার আসল চেহারাটা টের পেলুম। মৌটুসি বাথরুমে গেছে, আমি মন দিয়ে একটা অঙ্ক কষছি, সেই সময় চোরের মতন সট করে ঘরে ঢুকল চন্দনদা। চোরের মতন বলছি, কারণ চন্দনদার মুখচোখ একদম অন্য রকম হয়ে গিয়েছিল। দরজার পাশে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে চন্দনদা ফিসফিস করে বলল, এই বাবলি, শোন! চট করে এদিকে আয়।

আমি অবাক হয়ে বললুম, কী?

—এদিকে আয় না।

—কেন? কী বলবে, বলো।

—তুই আমার কাছে আসবি না?

—না।

চন্দনদা ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল। প্রথমেই হাত দেওয়ার চেষ্টা করল আমার বুকে। আমি দুহাত দিয়ে নিজেকে আড়াল করে মুখ নীচু করলুম, তবু চন্দনদা জোর করে আমাকে চেয়ার থেকে টেনে তোলার চেষ্টা করল।

ঘরের পাশেই বাথরুম। আমি চিৎকার করলেই মৌটুসি শুনতে পাবে। কিন্তু লজ্জায় ভয়ে আমি চিৎকার করতে পারিনি। চন্দনদা জোর করে আমাকে বুকে চেপে ধরে, হাত দিয়ে আমার থুতনি তুলে ধরে আমার ঠোঁট কামড়ে দিল। তার পরই হঠাৎ আমায় ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে গেল ছুটে।

আমার এত বিচ্ছিরি লেগেছিল, এত ঘেন্না করছিল যে ইচ্ছে করছিল তক্ষুনি মরে যাই। চন্দনদার গায়ে বিকট ঘামের গন্ধ। মনে হয়েছিল, সেই মুহূর্তে চন্দনদা মানুষ নয়, একটা জানোয়ার, আমার গা থেকে মাংস খেতে এসেছিল।

অনেকক্ষণ আমি স্বাভাবিক হতে পারিনি। আমার সারা শরীর থরথর করে কাঁপছিল। মৌটুসী এসে বোধহয় কিছু বুঝতে পেরেছিল, ও জিগ্যেস করল, তোর কী হয়েছে রে, বাবলি?

মৌটুসিকে আমি বলতে পারিনি। বলেছিলাম, কিছু না।

আমি ভাবতে চেষ্টা করেছি, চন্দনদা বা অন্য পুরুষরা যে এইরকম করে, এতে ওরা কী আনন্দ পায়? এই যে হঠাৎ একটু উরুতে হাত রাখা, কিংবা বুক ছোঁওয়া, কিংবা ঠোঁট কামড়ানো, এর মধ্যে কী সুখ আছে? আমার তো এসবে একটুও আনন্দ হয় না। বরং অসভ্য, নোংরা, ঘিনঘিনে মতন লাগে।

আমি যে কিছুই জানি না, তা তো নয়। আমি বায়োলজি পড়েছি। আমি জানি, নারী ও পুরুষের পরস্পরের প্রতি একটা জৈব আকর্ষণ থাকে। এটা প্রকৃতির বিধান। কিন্তু মানুষ তো পশু নয়। বহু শতাব্দী ধরে মানুষ একটু-একটু করে সভ্য হয়েছে। শারীরিক মিলন একটা পবিত্র, সুন্দর ব্যাপার। এতে পরস্পরের সম্মতি থাকা দরকার। এ কি জোর করে কেড়ে নেওয়ার জিনিস?

ডায়েরি, তুমি বলো তো, চন্দনদার মতন গাধা ধরনের পুরুষরা কেন এটা বোঝে না?

আমার সবচেয়ে বেশি রাগ হয় একটা কথা ভাবলে। আমি মেয়ে বলেই কেন ওরা আমার ওপর জোর করবে? মেয়েরা তো পুরুষদের ওপর জোর করে না! পিন্টু আর আমি সমান বয়েসি, অথচ পিন্টু কত স্বাধীন। সে যে-কোনও জায়গায় যেতে পারে, যার সঙ্গে খুশি মিশতে পারে, যেমন ইচ্ছে খেলাধুলো করতে পারে। আর আমায় কেন শাড়ি পড়লেই সবসময় বুকের আঁচল টানতে হবে, আমি ইচ্ছে মতন অন্যদের সামনে পা ছড়িয়ে বসতে পারব না, কোনও পুরুষের চোখের দিকে বেশিক্ষণ তাকাতে পারব না, আর একা ঘরে কোনও পুরুষ মানুষের সঙ্গে থাকার তো প্রশ্নই ওঠে না। প্রকৃতির চোখে মেয়েরা আর ছেলেরা কী আলাদা? তবে কেন শুধু মেয়েদের ওপরেই এত বাধা-নিষেধ?

এইসব ভাবলে এমন গা জ্বালা করে যে ইচ্ছে হয় বাড়ি ছেড়ে চলে যাই। চলে যাই সেই সব দেশে, যেখানে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার আছে।

চন্দনদা আরও তিন চারবার ওইরকম অসভ্যতা করেছিল। আমি একদিন বলেছি, তুমি যদি আর-একবার আমার ওপরে জোর করো, তাহলে আমি আত্মহত্যা করে চিঠি লিখে যাব যে তুমিই আমার মৃত্যুর জন্য দায়ী।

তারপর অবশ্য মৌটুসির বিকোলাই হল। পড়াশোনা বন্ধ। আমি আর ও-বাড়ি তেই যাই না।

এর মধ্যে একটা নতুন অভিজ্ঞতা হল।

গ্রীষ্মের ছুটিতে পিন্টু ওর বন্ধুদের সঙ্গে গেল কালিম্পং। আমি যদি আমাদের ক্লাসের কয়েকটি মেয়ের সঙ্গে এরকম বাইরে কোথাও বেড়াতে যেতে চাইতাম, আমাদের বাবা-মা রাজি হতেন না। চতুর্দিকে বাঘেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমাদের একা পেলেই খেয়ে ফেলবে। পিন্টুর যা পারে, আমরা তা পারি না।

যাই হোক, পিন্টু চলে যাওয়ায় আমার এক বিপদ হল। সন্ধেবেলায় বাবা-মায়ের প্রায়ই কোথাও-না-কোথাও নেমন্তন্ন থাকে। বাবার অফিসের পার্টি, কিংবা কোনও বন্ধুর বাড়িতে আড্ডা! সেসব জায়গায় আমাকেও যেতে হবে, কারণ, আমার বয়েসি মেয়েকে নাকি বাড়িতে একলা রেখে যাওয়া যায় না! আমার পড়াশোনায় ক্ষতি হোক, তাতেও কিছু যায় আসে না, আমাকে যেতেই হবে। অথচ ওসব জায়গায় যেতে আমার একটুও ভালো লাগে না। অনেক বাড়িতেই আমার বয়েসি কোনও ছেলেমেয়ে থাকে না। বড়রা মদ খেয়ে হ্যা-হ্যা করে। আমার বিচ্ছিরি লাগে। আর জানি তো, বাবার বন্ধুরা একটু সুযোগ পেলেই আমাকে স্নেহ দেখাবার অছিলায় আমার কাঁধে হাত দিয়ে বুকে টানবার চেষ্টা করবে!

এবার আমি বেঁকে বসলুম। মাকে স্রেফ জানিয়ে দিলুম, আমি আর কিছুতেই যাব না। নিজের বাড়িতে দরজা বন্ধ করে বসে থাকলে, তাতেও তোমাদের ভয়?

মা আমার রাগ দেখে আমার কথা মেনে নিতে বাধ্য হলেন। তবে বারবার বলে দিলেন, অচেনা কেউ এলে যেন আমি কিছুতেই দরজা না খুলি।

একদিন এল একজন।

ঠিক অজানা নয়, অনেকদিন আগে আসানসোলে দেখেছিলুম একবার! আমার এক পিসতুতো বউদির ভাই। ওর নাম রণজয়। আসানসোল থেকে বি. এস. সি. পাস করে যাদবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে এসেছে। এসেছিল বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা করতে!

দরজা খুলে আমি ভেতরে বসালুম। বেশ লম্বা হয়েছে ঝন্টুদা। চমৎকার স্বাস্থ্য। সাদা প্যান্ট আর সাদা শার্ট পরা। আমায় বলল, তোমার নাম কী যেন, তোমায় খুব ছোট্ট দেখেছিলাম।

আমি বললুম, আমার নাম সুনেত্রা। আপনার নাম কিন্তু আমার মনে আছে। ভালো নাম রণজয়, ডাকনাম ঝন্টু। আপনিও তখন বেশ ছোট ছিলেন।

বাড়িতে রঘুও নেই। শুধু আমি একা। ঝন্টুদা আমার পড়ার টেবিলের বইগুলো উলটে-পালটে দেখতে-দেখতে বলল, তুমি চা বানাতে পারো? খুব চা খেতে ইচ্ছে করছে! দোকানের চা আমার মোটেই ভালো লাগে না।

আমি চা মোটামুটি তৈরি করতে জানি। যদিও আমি নিজে চা খেতে ভালোবাসি না। আমার তৈরি চায়ে চুমুক দিয়ে ঝন্টুদা বলল, বাঃ! তারপর ফস করে একটা সিগারেট ধরাল।

এরপর ঝন্টুদা রইল প্রায় দু-ঘণ্টা। কতরকম গল্প করল। ঝন্টুদার বাবা একটা বড় কয়লা খনির ম্যানেজার, সেই কয়লা খনির কত রোমাঞ্চকর কাহিনি।

এই দু-ঘণ্টা একলা ঘরে থেকেও ঝন্টুদা কোনওরকম অসভ্যতা করল না। একবার আমার গায়ে হাত ছোঁয়াল না, এমনকি আমার বুকের দিকেও স্থিরদৃষ্টিতে তাকায়নি। যেন দুজনেই সমান-সমান মানুষ।

আমি অভিভূত হয়ে গেলুম ঝন্টুদার ব্যবহারে। তাহলে তো সব পুরুষ মানুষ একরকম নয়। কেউ-কেউ তো মেয়েদের সম্মান দিতেও জানে। ঝন্টুদার ব্যবহার একেবারে সাবলীল।

বিদায় নেওয়ার সময় দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ঝন্টুদা হঠাৎ বলল, ও একটা কথা বলা হয়নি। তোমার নাম সুনেত্রা কে রেখেছে?

আমি খুবই অবাক হয়ে জিগ্যেস করলুম, কেন?

—নামটা তোমায় খুব মানিয়েছে। তোমার চোখ দুটি খুব সুন্দর!

আমার শরীর যেন ঝনঝন করে উঠল, পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটা বিদ্যুৎ তরঙ্গ খেলে গেল।

কথাটা বলেই ঝন্টুদা সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল তরতরিয়ে। আমি দরজার কাছে একা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম। আমাকে অনেকেই দেখতে ভালো বলে। কিন্তু কোনওদিন এত আনন্দ পাইনি।

তারপর থেকে ঝন্টুদা আমাদের বাড়িতে মাঝে-মাঝেই এসেছে। যাদবপুরের হোস্টেলে জায়গা পায়নি, ঝন্টুদা তার এক বন্ধুর সঙ্গে ঘর ভাড়া করে আছে। নিজেরাই রান্না করে। ঝন্টুদা সেইজন্য প্রায়ই আমার মায়ের হাতের রান্না খেতে আসে। লজ্জা-টজ্জা কিছু নেই, দুপুরের দিকে এসে বলে, মাসিমা, আমি নিজেই নিজেকে নেমন্তন্ন করলুম। আজ এখানে খাব।

আমার আর পিন্টুর সঙ্গে ঝন্টুদার খুব ভাব হয়ে গেছে। ঝন্টুদা এলেই বেশ ভালো লাগে। বাড়িতে যেন বেশ একটা উৎসবের হাওয়া ঢুকে পড়ে।

আমার গানের ইস্কুল হাজরা পার্কের কাছে। একদিন সেখান থেকে ফেরার সময় যদি বসুশ্রী সিনেমার কাছে ঝন্টুদা দাঁড়িয়ে আছে তার এক বন্ধুর সঙ্গে। আমাকে দেখতে পেয়ে বলল, এই তো বাবলিকে পাওয়া গেছে। তাহলে আর চিন্তা নেই!

আমি বললুম, কী ব্যাপার?

ঝন্টুদা বলল, আমি আর সুমিত এক্ষুনি টস করব ভাবছিলুম যে কে এখন বাড়িতে গিয়ে চা বানাবে। তোমায় পাওয়া গেল, তুমি বানিয়ে দেবে। চলো, আমাদের ওখানে চলো।

আমার সঙ্গে রঘু ছিল। ঝন্টুদা তাকে বলল, তুমি যাও। বাড়িতে গিয়ে বলে দিও, আমি একটু বাদে ওকে পৌঁছে দেব।

ঝন্টুদারা অদ্ভুত জায়গায় থাকে। জগুবাবুর বাজারের ওপর একটা ঘর। বাজারের ওপর যেন মানুষ থাকে, তা আমি জানতুম না আগে। কতরকম দোকান, কত হইচই। অবশ্য ঘরের সামনে একটা চওড়া বারান্দা আছে।

পাশাপাশি দুটো খাট। ওই ঘরের মধ্যেই স্টোভে রান্নার ব্যবস্থা। শুনলুম ওরা দিনের-পর-দিন শুধু ভাত, ডাল, আলু সেদ্ধ আর ডিম সেদ্ধ খায়। খুব যেদিন মাছ বা মাংস খাওয়ার ইচ্ছে হয়, সেদিন ওরা বাজারেরই কোনও হোটেলে খেতে যায়।

আমার বেশ মজা লাগল। দিব্যি ছন্নছাড়া জীবন। অবশ্য এই ধরনের ছন্নছাড়া জীবনের স্বাদ শুধু ছেলেরাই পেতে পারে। এই বয়েসি দুটি মেয়ে কি এরকম বাজারের ওপর ঘরভাড়া করে থাকতে পারবে? তাহলে অমনি বাঘ-ভাল্লুকের উৎপাত শুরু হয়ে যাবে।

আমি ওদের চা তৈরি করে খাওয়ালুম। চা খেতে-খেতে অনেক গল্প হল। ঝন্টুদার বন্ধু সুমিতও বেশ খোলামেলা ধরনের ছেলে।

একসময় সুমিত বলল, এই রে, ঘরে তো ডাল নেই, রাত্তিরে কী রান্না হবে?

ঝন্টুদা বলল, ডাল দরকার নেই। আলু সেদ্ধ ডিম সেদ্ধ দিয়ে চালিয়ে দেব।

শুকনো-শুকনো ভাত আমি খেতে পারি না। তোরা বোস, আমি একটু ডাল কিনে নিয়ে আসি।

ঝট করে সে বেরিয়ে গেল। যাওয়ার সময় বাইরে থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে গেল টেনে।

তারপর বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ। ঝন্টুদা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। ঝন্টুদা তো আগে কখনও কথা না বলে এরকমভাবে তাকিয়ে থাকেনি। আমার খুব অস্বস্তি লাগছে। শরীরটা শিরশির করছে।

একটু বাদে আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, আমি এবার যাই। ঝন্টুদা বলল, আর একটু বোসো, আমি তোমায় পৌঁছে দেব।

—পৌঁছে দিতে হবে না। আমি নিজেই যেতে পারব।

—শোনো বাবলি।

—কী?

ঝন্টুদা উঠে দাঁড়িয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসতে-আসতে বলল, তোমাকে একটা কথা বলব?

এ কি, ঝন্টুদার গলার আওয়াজটা চন্দনদার মতন হয়ে গেল কী করে? অবিকল সেইরকম শোনাচ্ছে। আমি ভয় পেয়ে গেলুম। তবু জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে বললুম, কী কথা?

ঝন্টুদা আমার দুই কাঁধে হাত রাখল। তারপর নির্নিমেষ চেয়ে রইল আমার চোখের দিকে।

আমি নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে বললুম, কী কথা, বললেন না তো?

—সেকথা তোমাকে পরে বলব। তার আগে তোমায় একটু আদর করি।

বলেই এক ঝটকায় আমায় বুকে টেনে নিয়ে ঝন্টুদা পাগলের মতন আমার ঠোঁট খুঁজতে লাগল।

আমার সমস্ত হৃদয় যেন আর্তনাদ করে উঠল। ছি, ছি ঝন্টুদা, শেষপর্যন্ত তুমিও? তোমাকে আমি কত সম্মানের আসনে বসিয়েছিলুম, তুমিও অন্যদের মতন হয়ে গেলে? তুমি আমার স্বপ্ন ভেঙে দিলে!

মুখে বললুম, প্লিজ, প্লিজ, আমায় ছেড়ে দাও, আমি আর কোনওদিন তোমাদের এখানে আসব না, প্লিজ,ওরকম কোরো না, ছেড়ে দাও।

কোনওরকমে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আমি দৌড়ে বেরিয়ে গেলুম ঘর থেকে।

তার পরেও ঝন্টুদা আমাদের বাড়িতে এসেছে। ব্যবহারের কোনও তফাত হয়নি। সেই রকমই হাসি আর গল্প। শুধু আমি আর ওর চোখের দিকে তাকাই না, দুটো-একটার বেশি কথাও বলি না।

তারপর সেই ঘটনা ঘটল।

ডায়েরি, তোমার কাছে তো আমি মিথ্যে কথা বলব না। তোমার কাছে সব সত্যি কথা বলতেই হবে।

সেদিন আমাদের কলেজ এক পিরিয়ড হওয়ার পরই ছুটি হয়ে গেল। কী একটা কারণে অন্য সব কলেজে সেদিন স্ট্রাইক ছিল, আমাদের ক্লাস শুরু হয়ে যাওয়ার পর অন্য জায়গার ছেলেমেয়েরা এসে গেটের সামনে হইচই লাগিয়ে দিল।

কলেজ থেকে বেরিয়ে আমি হাঁটতে লাগলুম একা একা। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। আপন মনে হাঁটছি, কোথায় যাচ্ছি, তা জানি না। হঠাৎ মনটা খুব খারাপ হয়ে গেছে। সেই যে দিদি বলেছিল, এমনি কষ্ট হয়, এমনি-এমনি মন খারাপ লাগে! আমার মনে হচ্ছে, আমার কোনও বন্ধু নেই, পৃথিবীতে আমার কোনও যাওয়ার জায়গা নেই, আমি যদি মরে যাই, তা হলেও কারুর কোনও ক্ষতি হবে না।

হাঁটতে-হাঁটতে একসময় দেখলুম, আমি জগুবাবুর বাজারের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি।

এ কী, আমি এখানে এলুম কেন? এদিকে তো আমাদের বাড়ির রাস্তা নয়। কে আমাকে এখানে আসতে বলল?

ঝন্টুদার সঙ্গে যদি দেখা হয়, নিশ্চয়ই আগের দিনের সেই ব্যবহারের জন্য লজ্জা পেয়ে ক্ষমা চাইবে। সেদিনের আগে পর্যন্ত ঝন্টুদা আমার বন্ধু ছিল। অবশ্য এখন তো ঝন্টুদার দেখা পাওয়া যাবে না, ওরা তো কলেজে গেছে।

পায়ে-পায়ে উঠে গেলুম সিঁড়ি দিয়ে। ওদের দরজার বাইরে তালা নেই, একটু ঠেলতেই খুলে গেল। দুটো খাটের ওপর শুয়ে-শুয়ে মন দিয়ে পড়াশোনা করছে দুজনে। শুধু পাজামা পরা, খালি গা।

আমাকে দেখেই ঝন্টুদার মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি একটা গেঞ্জি গায়ে দিয়ে বলল, এসো, এসো, কলেজ স্ট্রাইক তো?

ওর বন্ধু বলল, ভালোই হল, ও আমাদের আজ ভাত রান্না করে দেবে।

ঝন্টুদা বলল, যাঃ, কেন ভয় দেখাচ্ছিস। না গো বাবলি, আমাদের আগেই ভাত রান্না হয়ে গেছে।

তাহলে ও আমাদের চা তৈরি করে দিক।

আমি স্টোভ জেলে গরম জল চাপালুম। একটু আগেকার মন খারাপটা হাওয়া উড়ে গেছে এরই মধ্যে, বেশ একটা ফুরফুরে ভাব লাগছে।

চা খেতে-খেতে খানিকক্ষণ এটা সেটা গল্পের পর ঝন্টুদার বন্ধু বলল, এই রে, নুন নেই তো। ভাত খাব কী করে?

ঝন্টুদা বলল, ওই যা আছে তাতেই চলে যাবে।

যাঃ, কাল রাত্তিরেই সব নুন ফুরিয়ে গেল, মনে নেই? নুন ছাড়া কি ভাত খাওয়া যায়। দাঁড়া, এক্ষুণি আমি নুন কিনে আনছি।

ঝট করে গায়ে একটা জামা গলিয়ে সে বেরিয়ে গেল, দরজাটা টেনে দিয়ে।

কথাগুলো আমার চেনা-চেনা লাগল, আগের দিনও ডাল ফুরিয়ে গিয়েছিল। এদের ঘরে কোনও মেয়ে এলেই এদের একজন কোনও একটা জিনিস আনবার ছুতো করে বেরিয়ে যায়। আমি এত ছেলেমানুষ নই যে এটা বুঝব না।

ঝন্টুদা সেইরকম দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

ভালোই হয়েছে, ওর বন্ধু চলে গেছে। ঝন্টুদার সঙ্গে আমি একা কথা বলতেই চাই।

আমি তির্যক ভাবে জিগ্যেস করলুম, তোমাদের ঘরে এখনও অনেকটা নুন আছে, তাই না?

উত্তর না দিয়ে ঝন্টুদা অদ্ভুতভাবে হাসল।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে কড়া গলায় বললুম, ঝন্টুদা, তুমি সেদিন আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছিলে—

আমাকে থামিয়ে দিয়ে ঝন্টুদা বলল, বাবলি, তোমাকে দেখলেই আমার কষ্ট হয়।

আমি অবাক হয়ে বললুম, কষ্ট?

—হ্যাঁ বাবলি। ভীষণ কষ্ট হয়। তুমি এত সুন্দর, তোমাকে আমার এত ভালো লাগে যে তোমাকেই দেখলেই—

ঝন্টুদা উঠে এসে জড়িয়ে ধরল আমাকে।

—ছাড়ো, ছাড়ো, প্লিজ, ওরকম করো না, আগে আমার একটা কথা শোনো।

—এখন কোনও কথা নয়, সব কথা পরে শুনব।

ঝন্টুদার আলিঙ্গনের মধ্যে আমি ছটফট করতে লাগলুম। আমি নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারছি না, আমার মুখে, বুকে, হাতে যেন আগুনের আঁচ। নিজেকে বারবার ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করল আমার। আমি নিজেই তো এসেছি এখানে। কেন এসেছি? আমি কি জানতুম না যে এরকম আবার হতে পারে? কেন আমি ঝন্টুদার কাছ থেকে জোর করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারছি না?

সেই মুহূর্তে আমি প্রতিজ্ঞা করলুম, আমি আর কোনওদিন কোনও পুরুষের বন্ধুত্ব চাইব না। ওরা যদি এসে আমায় পায়ে পড়ে, কাতর গলায় ভালোবাসার কথা জানায়, তাহলে ওদের কখনও-কখনও একটু দয়া করতে পারি। বেশি না, একটুখানি। কোনও পুরুষ কোনওদিনই আমার মনের সঠিক সন্ধান জানতে পারবে না। এই ওদের শাস্তি।

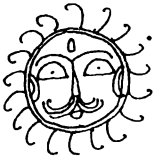

বুড়োর দোকান

দিনেরবেলা কেউ কোনওদিন এ-দোকান খোলা দ্যাখেনি। অন্য দোকান যখন বন্ধ হয় তখন এই দোকান খোলে। কোনও অচেনা খদ্দের এ-দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালে ধমক খায়।

দশ-বারোটা সোডার বোতল আর অনেকগুলো সিগারেটের প্যাকেট সাজানো রয়েছে, তার মধ্যে অবশ্য বেশির ভাগই খালি। ইলেকট্রিক কানেকশান নেই, একটা পেট্রোম্যাক্স জ্বলে শাঁ-শাঁ শব্দ করে। দোকানের মালিকের নাম বুড়ো হলেও সে কিন্তু যথেষ্ট বুড়ো নয়। তার মাথার চুল এখনও অনেক কাঁচা আছে। তার মুখের চামড়ায় কুঞ্চন শুরু হয়নি, চোখ দুটোই বেশ পরিষ্কার। বয়েস হবে পঞ্চান্ন-ছাপান্ন, বেশ মজবুত চেহারা, কালো কুচকুচে রং, বেশ লম্বা বলেই একটু ঝুঁকে পড়া। একটা ধুতি পাট করে লুঙ্গির মতন পরা, গায়ে হাফ হাতা গেঞ্জি। এই তার প্রতিদিনের পোশাক, শীতকালে এর ওপর নস্যিরঙা আলোয়ান জড়িয়ে নেয়। ডান বাহুতে একটা বড় রুপোর তাবিজ।

লোকটির ডাক নাম বুড়ো, ছেলেবেলা থেকেই সবাই তাকে বুড়ো বলত, এখন অনেকে বলে বুড়োদা।

সন্ধে সাড়ে সাতটা নাগাদ এসে বুড়োদা রোজ তার দোকানের ঝাঁপ খোলে। তারপর ধূপ ধুনো দেয়। বহুদিন আগেকার একটা ক্যালেন্ডারের লক্ষ্মীর ছবি বাঁধানো আছে, সে ছবি এখন চেনাই বেশ শক্ত। পেট্রোম্যাক্স জ্বালার সময়েই দু-চারজন পুরোনো খদ্দের কাছাকাছি ঘুরঘুর করতে থাকে। বুড়োদা তাদের পাত্তাই দেয় না। ওপরের পাটাতনে বসবার আগে তার আরও কাজ বাকি থাকে। দোকানের নীচের খুপরিতে দুটো বালতি রাখা থাকে, কাছেই টিউবওয়েল, সেই বালতি দুটোতে জল

ভরতে হবে। তারপর কাচের গেলাস ধুতে হবে গোটাদশেক।

ওপরে ওঠবার সময় একটা গামছায় পায়ের তলা ভালো করে মুছে নেয় বুড়োদা। তারপর লক্ষ্মীর ছবির দিকে চোখ বুজে, হাত জোড় করে প্রণাম শেষ করে মুখ ঘুরিয়ে জিগ্যেস করে, কত?

আগে থেকে অপেক্ষমান দুই খদ্দের কাছে এসে বলে, পাঁচ আউন্স করে লাগাও, বুড়োদা। এত দেরি করলে, যে হাই উঠে গেল মাইরি।

দোকানের ভেতরের দিকে দেওয়ালের গায়েই একটা খুব ছোট জানলা আছে। সেটা ঢাকা থাকে সোডার বোতলে। তার মধ্য দিয়ে হাত গলিয়ে একটা বোতল বের করে আনে বুড়োদা। বোতলটার গায়ে কোনও লেবেল নেই, মুখে একটা শোলার ছিপি আঁটা।

একজন খদ্দের জিগ্যেস করলে, মালটা ভালো তো?

বুড়োদা বলল, কাল তো এই মালই খেলি, খারাপ ছেল? নাকি কালকের কথা সব ভুলে মেরে দিয়েছিস?

প্রথমে একটি গেলাসে সামান্য কয়েক ফোঁটা ঢেলে এক চুমুক মেরে দিল বুড়োদা নিজেই। তারপর গরম স্রোতটি যখন তার বুকের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, সেই অবস্থায় অনুভব করে সে হৃষ্ট স্বরে বলল, মাল ঠিক আছে!

এবারে খদ্দেরদের দুটি গেলাসে বোতলের বাংলা ঢেলে দিয়ে বুড়োদা জিগ্যেস করলে, সোডা?

সোডা নিলে বুড়োদা নিজেই সোডার বোতল খুলে দেবে। আর কোনও খদ্দের যদি শুধু জল মেশাতে চায় তাহলে তাকেই বালতি থেকে জল নিয়ে নিতে হবে। দু-চারজন স্পেশাল খদ্দেরের জন্য অবশ্য আলাদা খাতির আছে।

-এক প্যাকেট সিগারেট দাও, বুড়োদা। তুমি ঠিক ধরেছ, কাল রাত্তিরের অনেক কথা ভুলে মেরে দিয়েছি। কিছু ঝনঝাট হয়েছিল?

সিগারেট প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিয়ে বুড়োদা বলল, ন'টাকা পঁচিশ দে। তুই আজকাল বড় ঝনঝোটিয়া হচ্ছিস নিতাই। কাল তুই ভদ্দরলোকের পেছনে লেগেছিলি কেন র‍্যা?

—কোন ভদ্দরলোক, বুড়োদা?

নিতাই এর সঙ্গী বলল, ওই যে রে, প্যান্ট-কোট পরে আসে!

নিতাই বললে, দাঁড়া বাবা, আর-একটু খাই। নেশাটা জমুক, তারপর যদি মনে পড়ে।

সামনেই মস্ত বড় রাস্তা, সেখান দিয়ে অনবরত দোতলা বাস, একতলা বাস, মিনি বাস, ট্যাক্সিতে হাজার-হাজার লোক যাচ্ছে, এ ছাড়া আছে রিকশা। এইসব যাত্রীরা অনেকেই এখান দিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তার একটা দিকে কৌতূহলী চোখে তাকায়। কিন্তু কিছুই দেখা যায় না। এখানে যে রোমাঞ্চকর পল্লিটি আছে তার প্রায় সব বাড়ির জানলাই সন্ধের পর থেকে বন্ধ থাকে। অথচ ভেতরে আলো জ্বলে।

পরশু এ-পাড়ায় একটা মার্ডার হয়েছে। হ্যাঁ, মার্ডারই, কেন না এ-পাড়ায় কেউ খুন বলে না সচরাচর। সন্ধ্যারানির ফ্ল্যাট, যে বাড়িতে সন্ধ্যারানি নামে কেউ থাকে না, কেন যে বাড়িটির ওই নাম তা এখন অনেকেই জানে না—সেই বাড়িতে ছবিরানির ঘরে দুই ফ্রেন্ড এসেছিল। এদের মধ্যে একজন বাঁধা, আর-একজন নতুন, দুজনেই আগে থেকে টেনে এসেছিল অনেকটা, আবার সঙ্গে রামের বোতলও এনেছিল। ওরা দুজনেই হোল নাইট থাকতে চায়, ছবিরানি কিছুতেই রাজি নয়, এ-বাড়িতে সেরকম রেওয়াজ নেই। হোলনাইটের বাবু শুধু একজনই হতে পারে। দুজনের মধ্যে কে থাকবে তা ওরা বুঝে নিক। তাই নিয়ে গোলমাল, ঝগড়া, হঠাৎ একসময় নতুন বাবুটি বাঁধা বাবুর পেটে ছুরি বসিয়ে দিল, তারপর সেই সেই রক্তাক্ত ছুরি নাচাতে-নাচাতেই ছুটে গেল বাড়ির বাইরে।

তাই নিয়ে বেশ সরগরম হয়েছিল পরশু রাতে। চার-পাঁচজন দালাল আর নোকর অনেকখানি

তাড়া করে গিয়েছিল সেই ছুরিওয়ালাকে। সে নাকি তার ফ্রেন্ডকে শুধু মার্ডার করেনি, তার পকেটের টাকাপয়সাও সব হাতিয়ে নিয়ে গেছে। ছুরিওয়ালা শেষপর্যন্ত ধরা পড়েনি অবশ্য, কিন্তু একটু বাদে পুলিশের গাড়ি এসে ছবিরানি আর সেই দালাল-নোকর কয়েকজনকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল থানায়। ভোরের আগেই তারা ফিরে এসেছে।

আজ সন্ধেবেলা সেই ঘটনার সামান্য রেশও নেই এখানে। স্বাভাবিকভাবে লোকজন যাচ্ছে, আসছে, ট্যাক্সি এসে থামছে ঘনঘন। এখানে কেউ পুরোনো কথা মনে রাখে না। মাসে একটা দুটো খুন তো হবেই। কলকাতার কোন পাড়াতে সেরকম খুন না হয়?

নিতাইয়ের মতন আর দু-চারজন যারা সন্ধে হতে-না-হতেই বুড়োদার দোকানের সামনে এসে ভিড় জমায় ওরা এ-পাড়ার বাবুও নয়, দালালও নয়, এমনিই এখানে ঘুরঘুর করে। একটা কিছু জীবিকা আছে নিশ্চয়ই, নইলে প্রত্যেক সন্ধেবেলা মাল খাওয়ার পয়সা পায় কোথায়? বুড়োর কাছে ধারে কারবার নেই।

নিতাই-এর সঙ্গে আরও চার-পাঁচজন জুটেছিল, এর মধ্যে চারবার পাঁচ আউন্স করে খাওয়া হয়ে গেছে। এই সময় কথাবার্তাগুলো জোরে-জোরে হয়, হাসি শুরু হলে আর থামতেই চায় না। বাল্লু আর তার দলটা এসে দাঁড়াতেই ওরা চুপ করে গেল।

বাল্লু ছ'ফুটের বেশি লম্বা, কিন্তু তার সঙ্গী দুজন বেঁটে। ওরা সব সময় বাল্লুর দুপাশে দাঁড়ায় বলেই বাল্লুকে আরও ঢ্যাঙা দেখায়। বাল্লু পরে পায়ের সঙ্গে সাঁটা কালো রঙের প্যান্ট আর একটা কালো টি-শার্ট। তার কপাল অনেকখানি চওড়া, অর্থাৎ সামনের দিকে টাক। বাল্লুর মুখখানা অবিকল বুল ডগের মতন। অনেকেই জানে বাল্লু এ-পর্যন্ত তিনটে মার্ডার করেছে, অথচ জেল খেটেছে মাত্র দুবছর। বাল্লুকে সবাই সমীহ করে এখানে।

বাল্লুর কায়দাই আলাদা। দোকানের কাউন্টারে দু-হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে ইচ্ছাকৃত কর্কশ স্বরে বলে, একটা বোতল লাগাও বুড়োদা।

তিনটে গেলাস নিয়ে সে তার সঙ্গীদের জন্যে অল্প-অল্প ঢালে, নিজের গেলাসটা একেবারে ভরতি করে নেয়। সে জল বা সোডা মেশাবার ধার ধারে না। নিজের গেলাসটা তুলে সে প্রথমে কপ্‌ল ঠেকায়, তারপর বলে, লে!

এক চুমুকে সে তার গেলাস সাবাড় করে দেয়।

বুড়োদা তার দিকে তাকিয়ে মুচকি-মুচকি হাসে। বাল্লু গেলাস নামাবার পর জিগ্যেস করে, কীরকম টেস পেলি, মালটার জোর আছে না?

গলা খাকারি দিয়ে বাল্লু বলল, চলবে। আর-একটা লাগাও!

দশ মিনিটে দুবোতল শেষ করে বাল্লু তার দুই সঙ্গীর কাঁধে চাপড় মেরে বলে, চল।

পকেট থেকে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট বার করে ছুঁড়ে দিয়ে বলে, বাকিটা জমা রেখে দিও!

তারপর সদলবলে সে চলে যায় ভেতরের দিকে।

শুধু যে নিতাই বা বাল্লুর মতন খদ্দেররাই আসে এখানে তা নয়। ছুটকো ছাটকা নেশাড়ুরা আসে। যেসব বাবুরা এ-পাড়ায় 'বসতে' আসে, তারা সাধারণত মেয়েদের ঘরে বসে 'বিলিতি' খায়। বাইরে বেরুবার সময় তারা এদিক-ওদিক চেয়ে সুট করে কেটে পড়ে, বুড়োর দোকানের সামনে দাঁড়ায় না।

বাবু শ্রেণির লোকও দু-চারজন আসে। যারা ধরমতলা অঞ্চলের বারগুলোতে মাল খায়, তারা কেউ-কেউ বাড়ি ফেরার পথে এখানে একবার থামে। তারা আধা মাতাল হয়েই আসে, তবু আর একটু না খেলে চলে না। কারুর-কারুর আবার 'বিলিতি' খাবার পরও খানিকটা 'বাংলা' না প্যাঁদালে মনে ফূর্তি আসে না ঠিক।

নিতাইয়ের সঙ্গী নিতাইয়ের পাঁজরে একটা কনুইয়ের খোঁচা মেরে বলল, ওই দ্যাখ, আজ আবার এয়েছে।

ট্যাক্সি থেকে নামল তিনটি বাবু শ্রেণির ছোকরা। একজনের শরীরে পুরোপুরি স্যুট-টাই, অন্য দুজনেরও ফিটফাট পোশাক। তিনজনেই অল্প-অল্প টলছে।

স্যুট-টাই কাউন্টারের ওপর তার পোর্ট ফোলিওটা রেখে বলল, কেমন আছ, বুড়োদা? একটু বিষ দেবে?

বুড়োদা হেসে বলল, আবনাদের জন্যে তো রেডি করে রেখিছি। স্যাম্পেলের মাল আছে।

সব বোতলগুলোতেই চোলাই, তবু কেন যেন স্যাম্পেলের বোতল শুনলেই সবাই মনে করে সে জিনিসটা উৎকৃষ্ট।

স্যুট-টাই-এর দুই সঙ্গীর মধ্যে একজনের ঝাঁকড়া চুল, অন্যজনের সরু দাড়ি। তিনজনেরই বয়েস তিরিশের এদিক-ওদিক। বেশ ফূর্তিবাজ ধরনের। টাইবাবুটি কোনও অফিসে বড় কাজ করে, অন্য দুজনও এলেবেলে নয়। সার্থকতার পথ তাদের চরিত্রে এক ধরনের ব্যক্তিত্ব এনে দিয়েছে। তবু সার্থকতার প্রতি খানিকটা বিদ্রোহ দেখাতেই বোধহয় এরা এই বে-তাইনি, অতি সস্তার মদের দোকানটাতে আসে।

টাইবাবু কাউন্টারের ওপরে উঠে পা ঝুলিয়ে বসে। একটা বোতল কিনে তিন বন্ধু ভাগ করে নেওয়ার পর ঝাঁকড়া চুল বলে, বুড়োদা, তুমি একটু খাও। কই, তোমার গেলাস কোথায়?

প্রত্যেকটি নতুন বোতল ভাঙবার সময় বুড়োদা নিজে আগে কয়েক ফোঁটা চেখে দেখে জিনিসটা ঠিক আছে কি না। এই করতে-করতেই শেষের দিকে তার নেশা হয়ে যায়। নেশাটি টইটুম্বুর হলেই বুড়োদা তখন দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে দেয়।

বুড়োদা বলল, নিচ্ছি, নিচ্ছি, আবনারা আগে খান।

টাইবাবু বলল, না, ও-কথা শুনছি না, তুমি গেলাসে না ঢাললে আমরা চিয়ার্স করতে পারছি না!

সরু-দাড়ি অবশ্য আগেই নিজের গেলাসটা এক চুমুকে শেষ করে ফেলেছে। তার ধৈর্য কম! গেলাসটা ঠক করে নামিয়ে রেখে সরু দাড়ি বলল, এসে গেছে!

একটা ব্ল্যাক মারিয়া এসে থেমেছে রাস্তার ওপাশে। পুলিশ এলে একটু সম্ভ্রমের ভান দেখাতেই হয়। সবাই গেলাস নামিয়ে রাখে, ফুটপাথে দাঁড়িয়ে যারা খাচ্ছিল, তারা এদিক ওদিক ছড়িয়ে যায়। পাশেই একটা শাল রিপেয়ারিং শপ, সেটা এসময় বন্ধ থাকে অবশ্য। তার সামনের রকটা অন্ধকার, সেখানে কেউ-কেউ উঠে দাঁড়ায়।

পুলিশের গাড়িটা চুপচাপ দাঁড়িয়েই আছে, তার থেকে নামছে না কেউ। বুড়োদা এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে সেদিকে।

টাইবাবু বলল, কী ব্যাপার, বুড়োদা, ব্যাটারা ঘাপটি মেরে রইল কেন? তুমি কি এ-মাসের পার্বনী দাওনি নাকি?

বুড়োদা বলল, হ্যাঁ, দিইচি। মাস পালাতেই পাওনাদারের মতন এসে-এসে হাত পাতে যে!

—তবু ওদের মাঝে-মাঝে কোটা ফুলফিল করতে হয়। কয়েক জনকে এ-পাড়া থেকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে গিয়ে রেকর্ড ঠিক রাখে। আজ বোধহয় কয়েকটাকে ধরবে।

—আপনারা চুম মেরে বসে থাকুন তো! পয়সা দিইচি, অমনি যখন-তখন এসে ধরলেই হল! বাপের জম্মো থেকে দেখচি শালাদের!

—তুমি চিন্তা কোরো না, বুড়োদা, আমার এই যে দুই বন্ধুকে দেখছ, এরা খুব ভালো পুলিশ ট্যাকল করতে পারে!

বুড়োদা কী বুঝল কে জানে, বলল, সে আমি জানি! এক শালা লতুন ইনসপেকটর এয়েছে,

ভারি টেঁটিয়া। লতুন তো, এখনও বিষ দাঁত ভাঙেনি!

পুলিশের গাড়িটা ইউ-টার্ন নিয়ে চলে এল এদিকের ফুটপাথে। নিতাই আর অন্য যারা ছিল সবাই পোঁ-পোঁ দৌড় দিল তাই দেখে। শুধু এই তিন বন্ধু জায়গা ছেড়ে নড়ল না।

গাড়ি থেকে নেমে এল একজন তরুণ ইনসপেকটর। বুড়োদার দোকানের থেকে হাতপাঁচেক দূরে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল।

সরু দাড়ি গান শুরু করল গুণগুণ করে। ঝাঁকড়া-চুল বেপরোয়া ভঙ্গিতে আর অর্ধ সমাপ্ত গেলাসটা চুমুক দিল পুলিশটির সামনেই। টাইবাবু হাঁটু দোলাতে লাগল।

ইনসপেকটরটি অত্যন্ত মিহি সুরে অ-পুলিশ গলায় ঝাঁকড়া চুলকে জিগ্যেস করল, আপনি তো অমুক বাবু, না?

ঝাঁকড়া চুল গম্ভীর গলায় বলল, নাঃ। আপনার ভুল হয়েছে, অনেকেই ভুল করে। বোধহয় চেহারাটা একরকম!

সরু-দাড়ির দিকে তাকিয়ে ইনসপেকটরটি বলল, উনি তো পোয়েট্রি লেখেন, ওঁকে আমি দেখেছি আগে।

সরু-দাড়ি বলল, আমি বাপের জন্মে এক লাইন পোয়েট্রি লিখিনি! পোয়েট্রি, হেঃ।

টাইবাবু আপন মনে বলল, আমরা নিরিবিলিতে বসে একটু মাল খাচ্ছি, কারুর তো কোনও ক্ষতি করিনি। কেন যে লোকে তবু এখানে ঝুট-ঝামেলা করতে আসে।

ইনসপেকটরটি এবারে আর-একটু এগিয়ে এসে বলল, দেখি এক প্যাকেট ক্যাপস্টেন।

বুড়োদা বলল, ক্যাপোস্টান নেই!

—নেই। রেড অ্যান্ড হোয়াইট দিন তাহলে?

—তাও নেই।

—তাও নেই? ওই যে সব প্যাকেট রয়েছে দেখছি?

—ওগুলো সব খালি। শুধু চার্মিনার আছে।

ইনসপেকটর এবারে ফিরে গিয়ে গাড়িতে উঠে পড়ল।

টাইবাবু বলল, আহারে, বেচারার বোধহয় গল্প করার ইচ্ছে করছিল একটুখানি! সারা সন্ধে রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়।

সরু-দাড়ি বলল, বোধহয় মাল খেতে চাইছিল।

টাইবাবু চেঁচিয়ে ডাকল, ও দাদা, শুনুন, শুনুন!

পুলিশের গাড়িটা ততক্ষণে আবার চলতে শুরু করেছে. টাই-বাবু খুব মজা পেয়ে বলতে লাগল, পুলিশের গাড়ি থামিয়ে এখান থেকে সিগারেট কিনতে এসেছিল, হে—হে—হে।

অন্য দুই বন্ধুও হাসতে লাগল খুব।

বুড়োদা বলল, না। পরশুদিন একটা মার্ডার হয়ে গ্যাচে তো, সেইজন্য একটু লোক-দ্যাখানো ঘনঘন আসছে।

ঝাঁকড়া চুল অতিরিক্ত কৌতূহলের সঙ্গে বলল, খুন! কে কাকে করল?

বুড়োদা এমন একটা ভঙ্গিতে কে জানে! বলল, যেন এসব পোকামাকড় আরশোলার ব্যাপার!

টাইবাবু বুড়োদার কাঁধে একটা চাপড় মেরে বলল, বুড়োদা, তোমার কাছ থেকে কোনও গল্প আদায় করার উপায় নেই। তুমি সব এককথায় উড়িয়ে দাও!

বুড়োদা বলল, আমি ওসব কী জানি। রুজি-রোজগারের ধাক্কাতেই সারাটা জীবন কেটে গেল!

—মাসে তোমার কত হয় বুড়োদা?

—তিনশো, সাড়ে তিনশো বড়জোর। শীতকালে একটু কমে যায়।

—মোটে?

—আর কত হবে? পুলিশ শালাদেরই তো দিতে হয় অনেক।

—এত রকম ঝকমারি। পুলিশকে সামলানো, তারপর দু-একজন পয়সা না দিয়ে পালায়, কালকেই তো দেখলুম একজনকে তাড়া করে গেলে...এত করেও মোটে তিনশো সাড়ে তিনশো?

—কী করব দাদা! আর তো কোনও কারবার শিখিনি! আমার বাপেরও এই কারবার ছেল, আমিও সেটাই চালাচ্ছি।

তোমরা তাহলে এ পাড়ায় অনেক দিনের—দু-পুরুষ।

—কোনওদিন পাড়ার ভেতরে যাইনি, মাগিগুলোর একটাকেও চিনি না। এই যে ডান দিকের রাস্তাটা দেখছেন, এটা হল এ-পাড়ায় ঢোকবার গেট। আমি বসে থাকি গেটের বাইরে!

ঝাঁকড়া-চুল জিগ্যেস করল, বুড়োদা, তুমি মল্লিকাকেও চিনতে না!

বুড়োদা বলল, নাম শুনিচি। নাম তো অনেকেরই শুনি, লোকে এখানে ডাঁড়িয়ে কত রকম কথাই বলে, সব শুনি। মল্লিকা নামের মাগিটা তো হাওয়া হয়ে গ্যাচে।

এ আলোচনা আর বেশি দুর এগোতে পারল না, খদ্দেররা আবার ফিরে এসেছে। এখন রাত সাড়ে ন'টা। এই সময়টাতেই খদ্দেরের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি হয়। এরকম চলতে থাকে এগারোটা পর্যন্ত। বালতির জল ফুরিয়ে গেছে, এখন খদ্দেররা নিজেরাই টিউবওয়েল থেকে জল নিতে শুরু করেছে।

দুজন বেঁটে সঙ্গীকে নিয়ে বাল্লু ফিরে এসেছে আবার। এটাই বাল্লুর স্বভাব। সে এখানে বেশিক্ষণ দাঁড়ায় না, ঘুরে-ঘুরে আসে। পাড়ার মধ্যে টহল দিয়ে সে কোনও-কোনও মেয়ের ঘর থেকে তোলা তুলে আনে। বাল্লু কারুর কারুর কাছে খুনি বলে পরিচিত হলেও সে আসলে এ-পাড়ার শান্তি রক্ষক। পুলিশের চেয়ে সে এই কাজে অনেক বেশি দক্ষ। এ-পাড়ায় ছিনতাই কিংবা গুণ্ডামি হলে পাড়ার বদনাম হয়ে যাবে, খদ্দের কম আসবে, সকলেরই রোজগার কমে যাবে, সেইজন্য এ পাড়ায় নিরাপত্তার সুনাম রক্ষা করায় সকলেরই স্বার্থ আছে।

বাল্লু এসে বলল, শুনলুম মামার গাড়ি এসেছিল, বুড়োদা? কিছু চায়?

বুড়োদা বলল, কী আবার চাইবে, সিগ্রেট চাইল। আমিও তেমনি বলে দিলুম, নেই! হ্যারে বাল্লু, কেষ্ট যে কাল আমার একটা পাইটের দাম না দিয়ে পালাল, সেজন্য তুই কিছু করবিনি। আমার পয়সাটা মারা যাবে?

বাল্লু বলল, যাবে কোথায়? এই ঠেকে তাকে আসতেই হবে। আমি তখন ওকে নাকখদ দেওয়াব!

টাইবাবু বাল্লুকে আগে কখনও দেখেনি। সে তারিফ করা চোখে বলল, বাঃ, দাদার চেহারাখানা তো দারুণ! দাদা সিনেমায় নামেন নাকি?

এসব অবান্তর প্রশ্নের উত্তর দেওয়ারও প্রয়োজন মনে করে না বাল্লু। সে গেলাসে মাল ঢালে।

এরপর নিছক মজার ঝোঁকেই টাই-বাবু একটা অপ্রত্যাশিত কাণ্ড করে ফেলল। সে দু-হাতে বাল্লুর ডান হাতের মাস্‌ল পরীক্ষা করাবার জন্য চেপে ধরে বলল, বাপরে! দাদার ডানাখানা দেখছি আমার পায়ের দাবনার চেয়েও মোটা!

বাল্লু সঙ্গে-সঙ্গে এমন জোরে ধাক্‌কা দিল সে টাই-বাবু অনেকগুলে গেলাস, সোডার বোতলের ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। ঝাঁকড়া-চুল আর সুরু-দাড়ির দিকে ফিরে দাঁড়িয়েছে তার সঙ্গী দুজন, একজনের হাতে ছুরি।

এসব লাইনে কারুর গায়ে কেউ অযথা হাত ছোঁয়ায় না। কার কী মতলব তা তো বলা

যায় না। ওই টাইবাবু বাল্লুর এক হাত চেপে ধরেছিল, সেই সুযোগে যদি অন্য কেউ পেছন থেকে তার ওপর চাকু চালিয়ে দিত?

বুড়োদা বলে উঠল, আরে কি করছিস, বাল্লু! আমার গেলাস-টেলাস সব ভাঙবি? এনারা ভদ্দরলোক, একটু ইয়ার্কি মারতে গেছে তাও বুঝিস না?

বাল্লুর বেঁটে সঙ্গীর মাথায় এক চাপড় মেরে বুড়োদা আবার বলল, এই গুলু, ওসব ছোরা-ছুরির কারবার আমার এখানে চালাবি না। ইচ্ছে হয়তো গলির ভেতরে যা!

টাইবাবু আবার উঠে বসে হতভম্ব হয়ে বলল, কী ব্যাপার, দাদা হঠাৎ এত খেপচুরিয়াস হয়ে গেলেন কেন, অ্যাঁ?

বাল্লু এর মধ্যে অন্য দুই বন্ধুকে ভালো করে দেখে নিয়েছে। সে মানুষ চেনে। এরা নিরীহ, উড়তে শেখা ভদ্দরলোকের ছেলে। সে টাই-বাবুকে বলল, ঠিক আছে, ঠিক আছে।

ঝাঁকড়া-চুল আর সরু-দাড়ি ছাড়বে না। তারা ঘন হয়ে এসে বলল, আপনি ওকে ঠেলা মারলেন কেন?

বাল্লু বলল, বলছি তো ঠিক আছে। যখুন-তখুন কারও গায়ে হাত দিতে নেই। মাল খেতে এসেছেন, মাল খান, বাড়ি যান।

টাইবাবু বলল, মাল তো খাবই, তা বলে মারও খেতে হবে নাকি? আপনার হাতে মার খেলে যে ছাতু হয়ে যাব! ছিঃ, অত জোরে ধাক্কা দেয়? যদি মাথা ফেটে রক্ত বেরুত, তাহলে বাড়িতে মা কী বলত?

টাইবাবুর কথা শুনে সবাই না হেসে পারে না। মা কথাটা এখানে সবার কানে নতুন লাগে। টাই-বাবু রাগ করে না কক্ষনো, এমনকি বাল্লুর হাতে ধাক্কা খেয়েও রাগেনি।

অনতি বিলম্বে বাল্লুর দলটার সঙ্গে তাদের ভাব হয়ে যায়।

বুড়োদা টাই-বাবুকে বলল, ওই যে আবনি মল্লিকার কথা জিগ্যেস কচ্ছিলেন, এই বাল্লুকে বলুন, ও জানে!

বাল্লু একটি ভুরু তুলে বলল, কোন মল্লিকা?

—ওই যে রে, পাঁজ নম্বর বাড়ির। কে যেন বলছেলো, সে নাকি হাওয়া হয়ে গ্যাচে।

টাই-বাবু বলল, মল্লিকা মেয়েটি বেশ ভালো ছিল। বেঁটে খাটো, ফরসা রং, অল্প একটু গোঁফ আছে। আমরা ওর ঘরে মাঝে-মাঝে মাল খেতে যেতুম, বুঝলেন! গত হপ্তায় একদিন গিয়ে দেখি, ওর ঘরের, দরজা খোলা, বিছানা পত্তর, আলমারি-টারি যেখানে যেমনটি ছিল, সবই আছে কিন্তু মল্লিকা নেই। ওর পাশের ঘরের মেয়েটি বলল, কী যেন তার নাম?

ঝাঁকড়া-চুল বলল, উষা!

—হ্যাঁ, ঊষা। সেই ঊষা বলল, মল্লিকা নাকি তিনদিন ধরে ফেরেনি। কোথায় গেছে, কেউ জানে না। পরের দিন আবার গিয়ে দেখলুম, সেই একই কেস, মল্লিকার পাত্তা নেই! কী ব্যাপার, কোথায় গেল মেয়েটা?

বাল্লু বলল, হ্যাঁ, মেয়েটাকে পাওয়া যাচ্ছে না।

ঝাঁকড়া-চুল বলল, এ-পাড়ার কোনও-কোনও মেয়ে তো ইচ্ছে করলে লাইন ছেড়ে চলে যেতেও পারে, নাকি পারে না?

বাল্লুর এক বেঁটে সঙ্গী বলল, চলে যায় কেউ-কেউ! কোনও বাঁধা বাবুর সঙ্গে অন্য পাড়ায় ঘর নেয়। সিঁদুর পরে।

—যাওয়ার সময় নিজের জিনিসপত্তর নিয়ে যাবে না?

—তা যায়। তবে খাট-আলমারি ওসব ওদের নিজেদের তো নয়, সব ভাড়া!

—মল্লিকার ঘরে যে রেডিও, ঘড়ি রয়েছে? সে সবও ওর নিজের নয়?

বাল্লু বলল, ও-মেয়েটা সেরকম ভাবে যায়নি। একজন নাকি ওকে সিনেমা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল, তারপর থেকেই হাপিস!

টাইবাবু অভিযোগের সুরে বলল, অমন একটা চমৎকার মেয়ে এমনি-এমনি হাওয়া হয়ে গেল? তোমরা কেউ কিছু করতে পারলে না? তুমি দাদা তাহলে কীসের মাস্তান? সিনেমার হিরোর মতো চেহারা করে রেখেছ!

বাল্লু বলল, লাশটা কোথায় গায়েব করল, তাই ভাবছি। লাশটা পাওয়া গেলে কাদের কাজ তা বুঝতে পারা যেত!

টাইবাবু বলল, খবরদার, লাশের কথা বলবে না! মল্লিকা বেঁচে আছে। নিশ্চয়ই বেঁচে আছে। এমন হাসিখুশি মেয়ে, সে কখনও মরতে পারে? কে তাকে শুধু-শুধু মারবে? দুনিয়াটা কি এত খারাপ হয়ে গেছে?

টাইবাবু কাউন্টার থেকে নামল। তার হিসি পেয়েছে। সে কাজটা সারতে হয় পাশের সরু গলিতে। তিন বন্ধুই গেল সেখানে, কিন্তু টাই-বাবু সোজা হয়ে দাঁড়াতে না পেরে অতি কষ্টে দেওয়াল ধরে সামলাল নিজেকে।

ঝাঁকড়া-চুল বলল, এবারে বাড়ি যেতে হবে!

সরু-দাড়ি বলল, আর একটু খাব না?

টাইবাবু একবার এলিয়ে গেলে আর দাঁড়াবার ক্ষমতা থাকে না, ঝাঁকড়া-চুল তার কাঁধ ধরে থেকে ট্যাক্সির দিকে হাতছানি দিতে লাগল। সরু-দাড়ি এরই মধ্যে টুক করে খেয়ে এল আরও পাঁচ আউন্স।

বুড়োর দোকানের খদ্দেরের ভিড় রইল আরও ঘন্টাখানেক। এর মধ্যে একটা ছোট মারামারিও হয়ে গেল কিছু নতুন ও পুরোনো খদ্দেরদের মধ্যে। নতুনদের এই জায়গাটায় খাপ খাওয়াতে বেশ কয়েকদিন সময় লাগে। একেবারে নতুন কেউ একলা এলে বুড়োদা তাকে মাল দেয় না। সঙ্গে পুরোনো কেউ থাকা চাই। কারণ বুড়োদা জানে, নতুন কোনও কাঁচা মাথা পেলে নিতাইয়ের মতন পুরোনো ঝানু কেউ-কেউ তাকে ইচ্ছে করে বেশি খাইয়ে আউট করে দেবে, তারপর তাকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার নাম করে সাফ করে দেবে পকেটের সবকিছু। ঘড়ি আংটি তো যাবেই। বুড়ো এসব পছন্দ করে না।

এখানে ঝগড়া হলে বুড়োই থামায়। বুড়ো কাউন্টার থেকে নামে না, ওখানে বসেই চেঁচিয়ে বলে, এই, এক থাবড়া মারব! আমি নাবলে ভালো হবে না কিন্তু বলে দিচ্ছি! আমি ঝোন্‌ঝাট পছন্দ করি না। শান্তিতে মাল খাবি তো খা, নইলে ভাগ্।

বারোটার সময় ভিড় একেবারে পাতলা। বাল্লু আবার এসেছে শেষবারের মতো। এবার সে একা, তার বেঁটে সঙ্গীরা নেই। নিতাইও ঘুরে এসেছে। নিতাইয়েরই চোখে পড়ল জিনিসটা!

—বুড়োদা, ওই চামড়ার মোটা ব্যাগটা! আরিঃ শাবাশ!

কাউন্টারের ঠিক নীচে, ফুটপাথে পড়ে আছে সেই চৌকো ব্যাগটা, বড়-বড় অফিসাররা যেরকম ব্যাগ নিয়ে অফিসে যায়। এটা টাই-বাবুর, ভুল করে ফেলে গেছে।

বুড়োদা বলল, এইরে। দে, দে!

নিতাই সেটা তুলল, বাল্লু তার হাত থেকে নিয়ে সেটা বুড়োদার হাতে দিল।

চাবি দেওয়া নেই, বোতাম টিপতেই খুলে গেল ব্যাগটা। তার মধ্যে অনেক কাগজপত্তর, এক তাড়া টাকা আর এক গোছা চাবি!

বেশ জোরে শিস দিয়ে উঠল বাল্লু। লোভে চোখ চকচক করছে নিতাইয়ের। বুড়োদা বলল, এ যে দেখছি অনেক টাকা।

বুড়োদা গুনল। সবই একশো টাকার নোট, চার হাজার সাতশো!

বাল্লু গম্ভীরভাবে বলল, তিন ভাগ হবে!

ঘৃণার দৃষ্টিতে বাল্লুর দিকে তাকিয়ে বলল, ব্যাগটা কিন্তু আমি আগে দেখিচি!

বুড়োদা ব্যাগটা নিজের কোলের কাছে তুলে নিয়ে বলল, শালা, শেয়ালের মতন অমনি ভাগাভাগি শুরু করে দিইচিস! এ তো টাই-বাবুর ব্যাগ, তাকে ফেরত দিতে হবে।

নিতাই যেন আকাশ থেকে পড়ল। চোখ কপালে তুলে বলল, ফেরত দিতে হবে? তুমি কী বলচ বুড়োদা?

—বাঃ, ফেরত দিতে হবে না? ভদ্দরলোক ভুল করে ফেলে গ্যাচে। অফিসের চাবি-টাবি রয়েচে, অফিসের ট্যাকা। একদিন এখেনে বসে বলছেল, ওকে রোজ আগে গিয়ে অফিস খুলতে হয়!

বাল্লু বলল, তোমার কাচে ব্যাগটা জমা রেখেছেল?

—না, তা রাখেনি। আমি তো দেখিইনি অ্যাতক্ষণ!

—তবে? তোমার আর কোনও দায়িত্ব নেই। মনে করো, যদি লোকটা ট্যাক্সিতে ব্যাগটা ফেলে যেত, তাহলে আর কোনওদিন পেত?

—তুই কি বলছিস রে বাল্লু? মনে কর, তোর পকেট থেকে একটা একশো টাকার পাত্তি এমনি পড়ে গেল, তুই টের পেলিনি, অমনি আমি সেটা মেরে দোব? অ্যাঁ? আমরা কি শ্যাল-কুকুর?

বাল্লু আর নিতাই দুজনেই চেয়ে রইল বুড়োর মুখের দিকে। ওরা বুড়োর এই ভালোমানুষি রোগের কথা জানে। কেউ খুচরো পয়সা ফেরত নিতে ভুলে গেলে বুড়ো পরের দিন সে পয়সা ঠিক দিয়ে দেয়!

নিতাই তবু তেড়িয়ার মতন বলল, আমি ফাস্টে দেখিছি, ও ব্যাগ আমার। তুমি কেন চোপা চালাচ্ছ, বুড়োদা?

বাল্লু কটকট করে তাকাতেই নিতাই আবার বলল, আমি তো বলিচি তিন ভাগ হবে, সমান-সমান!

বাল্লু বলল, দাও, বুড়োদা আমি ভাগ করে দিচ্ছি।

বুড়োদা হেসে বলল, কী বলচিস পাগলের মতো কতা। পরের জিনিস এভাবে নেওয়া যায়? এ কি লটারির মাল? ভদ্রলোকের কত বিপদ হবে, অফিসের চাবি-টাবি রয়েছে।

—সে চাবি তুমি ফেরত দাও গে, টাকাটা আমাদের চাই।

—তোরা আমার কাছ থেকে কেড়ে নিবি? নে দিখিনি?

বাল্লু ইচ্ছে হলে শুধু বাঁ-হাত দিয়েই বুড়োর গলাটা মুচড়ে দিতে পারে। কিন্তু বুড়োর সততার কাছে সে অসহায়। হাত বাড়াতে সাহস করছে না।

নিতাই কাকুতিমিনতি করে বলল, বড্ড টানাটানি যাচ্ছে, বুড়োদা! ওরা বড়লোক, ওই টাকা গেলে ওদের কিছু যাবে আসবে না। ওদের ঠিক জোগাড় হয়ে যাবে!

বুড়োদা বলল, হাত খালি থাকে তো মাগির দালালি করগে যা! নেয্য ভাবে রোজগার কর। অন্যের টাকা চুরি করবি কেন হারামজাদা!

—চুরি কোথায়? একজন ভুল করে রাস্তায় ফেলে গেছে। তার গুনাগার দিতে হবে না?

—চোপ!

বাল্লু বলল, কাজটা তুমি ঠিক করেচ না, বুড়োদা।

বুড়ো বলল, তোর মুরোদ থাকে তুই কেড়ে নে না আমার ঠেঙে! দেখব, তারপর তুই কী করে এ-পাড়ায় টিকিস!

ধ্যাৎ তেরিকা, বলে বিরক্ত হয়ে বাল্লু হনহন করে হেঁটে চলে গেল। তার মুখে একটা অসহায় ভাব। চোখের সামনে অতগুলো ফালতু টাকা, তবু সে কিছুই করতে পারবে না। কীসের যে বাধা, সেটাই সে বুঝতে পারে না।

বুড়ো কাউন্টার থেকে নেমে ঝাঁপ বন্ধ করতে লাগল। নিতাই তার পা জড়িয়ে ধরে বলল, বুড়োদা, তোমার পায়ে ধরচি, তুমি অত সাধুপুরুষ হয়ো না। একটু নীচে নামো। এ টাকাটা নিলে কোনও দোষ নেই! সবটা না নিয়ে, অন্তত কিছুটা দাও।

—দ্যাখ নেতাই, এবার মারব তোর মুখে লাথ। যা ভাগ? ব্যাগটা আজ রাত্তিরেই ফেরত দেওয়ার দরকার। কাল সকালে ঘুম ভেঙে যখন মনে পড়বে ব্যাগ নেই, তখন লোকটার মনটা কীরকম হবে? এতসব দরকারি কাগজ পত্তর, চাবি...আমার দোকান তো সকালে খোলা থাকে না, খোঁজ করতে এলেও পাবে না।

—ভদ্দরলোক কোথায় থাকে তুমি জানবে কী করে।

—সে আমি বার করব! ওদের কথাবার্তা সব শুনি তো! শ্যামবাজার মোড় থেকে রোজ রিকশা নেয়। তারপর দেশবন্ধু পার্কের দিকে যায়। শ্যামবাজার মোড়ে রিকশাওয়ালাদের জিগ্যেস করলেই বলে দেবে। ওরা বেশি রাতের খদ্দেরদের চেনে!

—এত রাতে গিয়ে তুমি তাকে ডাকবে? তুমি তো তার নামও জানো না!

—জানি! ওর বন্ধুরা ওকে ধুজ্জোটি বলে ডাকে।

নিতাই অসহায়ের মতন দাঁড়িয়ে রইল। এক-একবার তাই ইচ্ছে করছিল, বুড়োদার হাত থেকে ব্যাগটা কেড়ে নিয়ে ছুট দিতে। কিন্তু সে মনে-মনে জানে, তাহলে আর জীবনে কখনও এ-পাড়ায় ফিরে আসতে পারবে না। বাল্লু কিংবা তার সাঙ্গোপাঙ্গোরা অন্য কোথাও তাকে দেখতে পেলেই ঠ্যাঙাবে। বুড়োদা ভালোমানুষ বলেই তার গায়ে এ-পাড়ায় কেউ হাত তোলে না। এটাই এখানকার অলিখিত নিয়ম। বুড়োদা যদি একদিনও কোনও লোককে একটু ঠকাত, অমনি হয়তো তার পরের দিনই তার দোকান লুঠ হয়ে যেত!

হঠাৎ বুড়োদার পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে-কাঁদতে বলে উঠল, তুমি এরকম কেন গো, বুড়োদা! তুমি আমাদের মতন হও না গো, তাহলে কত সুবিধে হত আমাদের!

বুড়ো বলল, তুই আমার হাত থেকে এটা কেড়ে নিতে পারবি? নে দিকি!

নিতাই অমনি কুঁকড়ে সরে গেল।

বুড়োদা প্রথমে একটা রিকশা নিয়ে এল শ্যামবাজার। সে ঠিকই ধারণা করেছিল, সেখানকার রিকশাওয়ালাদের কাছ থেকে খোঁজ পাওয়া গেল, এক সুট-টাই পরা মাতালবাবু বেশি রাত্রে আর দুজন বন্ধুকে নিয়ে আসে। অনেকেই সে বাবুর বাড়ি চেনে।

রিকশা বদলে দেশবন্ধু পার্কের দিকে চলল বুড়োদা। পার্কের ঠিক গায়েই একটা বাড়ির সামনে এসে থামল রিকশাটা। দরজা বন্ধ, সারা বাড়ি অন্ধকার। নেমে এসে সে বাড়ির বেল বাজাতে গিয়েও হাত সরিয়ে নিল। একবার ওপর দিকে তাকাল, একবার ব্যাগটার দিকে। সমস্ত পাড়াটা সুনসান। বুড়ো দ্বিধা করল দু-এক মুহূর্ত। তারপর ফিরে এসে রিকশায় উঠে বলল, চলরে, দর্জিপাড়ায় যাব!

দোকানের সামনে রাস্তায় তখনও ঝিম মেরে বসে আছে নিতাই। ব্যাগ শুদ্ধু বুড়োদাকে ফিরতে দেখে সে লাফিয়ে উঠল। আনন্দে চকচক করে উঠল চোখ। কাছে এসে ফিসফিস করে বলল, বাড়ি খুঁজে পাওনি তো! কেল্লা মার দিস। আমি বাল্লুকে কিছু বলব না বুড়োদা। দুজনে ভাগ করেনি।

বুড়োদা রাগে গনগনে গলায় বলল, তোর চোখ গেলে দেব। শালা শকুনি। যা, বাড়ি যা।

*

পরদিন সকালে, টাই-পরা বাবু তখন টাই-পরা নয়। সে তখন পাজামা ও গেঞ্জি পরা ধূর্জটিবাবু! দরজা খুলে বাইরে থেকে খবরের কাগজ নিতে এসেছে, তখন দেখল, তার অফিস ব্যাগটা বুকে করে বুড়োদা দাঁড়িয়ে আছে।

ধূর্জটিবাবুর চোখে এখনও ঘোর, ব্যাগের কথা তখনও মনে পড়েনি। বুড়োদাকে দেখে যেন ভূত দেখেছে। দিনের আলোয় এইসব লোকদের দেখলে বুক শিরশির করে।

বুড়োদা কাঁচুমাচু হয়ে বলল, বুঝলেন দাদা, কাল রাত্তিরেই এসছিলুম। কিন্তু অত রাতে বাড়ির সব্বাইকে ঘুম থেকে তোলা, কে কী ভাববে, সেইজন্য তখন আর ডাকিনি, কিছু মনে করবেন না...।

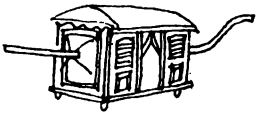

রূপকথা নয়

নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে বসে আছি দার্জিলিং মেল ধরব বলে। ট্রেনটা প্রায় দু-ঘণ্টা লেট, তার ওপর আবার শোনা যাচ্ছে যে কোথায় যেন লাইনের গণ্ডগোল হয়েছে, আজ আর ট্রেন যাবে কি না সন্দেহ। সেজন্য মেজাজটা খিঁচড়ে আছে। দার্জিলিং মেল না গেলে আজ রাতে আর কলকাতায় ফেরার কোনও উপায় নেই।

একজন ফেরিওয়ালা অনেকক্ষণ থেকেই বিরক্ত করছিল আমাকে। তার গলায় একটা ট্রে ঝোলানো, তাতে অনেকগুলো কলম, লাইটার, সরু টর্চ, চাবির রিং ইত্যাদি সব টুকিটাকি জিনিস। এর কোনওটাই আমার দরকার নেই। সময় কাটাবার জন্য যারা পাশের লোকের সঙ্গে আলাপ জমায় কিংবা হকারদের ডেকে এমনিই জিনিসপত্র দরদাম করে, আমি সেই দলে পড়ি না। আমার একা চুপ করে বসে থেকেই বেশ ভালো সময় কেটে যায়।

হকারটি চতুর্থবার এসে আমার সামনে দাঁড়াতেই আমি তাকে এবার ধমক দিতে গেলুম। তার আগেই সে গলার স্বর পালটে বলল, যদি কিছু মনে না করেন, একটা কথা জিগ্যেস করব? আপনার নাম কী সুনীল?

আমি রুক্ষভাবে বললাম, আমি সুনীল কিংবা অমল বা কমল বা বিমল, যা-ই হই না কেন, তাতে কী আসে যায়? আমি তোমার কোনও কিছু কিনব না। এ কথা আমি তোমায়—

বলতে-বলতে আমি হঠাৎ থেমে গেলুম। আমার মাথার মধ্যে যেন একটা বিদ্যুৎ ঝলক খেলে গেল। আগে ভালো করে তাকিয়ে দেখিনি, এর মুখ তো আমার চেনা লাগছে। আগে কোথায় দেখেছি!

সে এবার বলল, আমায় চিনতে পারছ না তো? চেনবার কথাও নয়, অনেক দিনের ব্যাপার—

আমি সবিস্ময়ে বললুম, কান্তি?

সে এবারে খানিকটা ম্লান হাসি দিয়ে বলল, চিনতে পেরেছ তাহলে? আমিও তোমায় প্রথমে চিনতে পারিনি, কিন্তু তোমার ওই যে একটু পাশের দিকে মুখটা ফিরিয়ে তাকানোর ভঙ্গি, সেটাতেই বুঝলুম।

আমি লাফিয়ে উঠে ওর হাত ধরে এনে বেঞ্চিতে বসিয়ে দিয়ে বললুম, কী রে, কান্তি, তুই এখানে কী করছিস? রেল স্টেশনে কলম বিক্রি করছিস কেন, ছদ্মবেশ ধরেছিস নাকি?

কান্তি বলল, কী যে বলো! এটাই তো আমার জীবিকা।

পকেট থেকে একটা টিনের কৌটো বার করে খুলল কান্তি। তার মধ্যে কয়েকটা বিড়ি রয়েছে। কৌটোটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে জিগ্যেস করল, তুমি কি বিড়ি-সিগারেট খাও নাকি?

আমি সিগারেট টানি, বিড়ি খাওয়ার সুযোগ হয় না। আমার পকেটে সিগারেটের প্যাকেট আছে, একবার ভাবলুম, সেটা বার করে কান্তিকে সিগারেট দিই। পরক্ষণেই মত বদলে তার কৌটো থেকে একটা বিড়ি তুলেম নিলাম।

কান্তির দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখলুম। প্রায় তিরিশ বছর বাদে দেখা। আমরা দুজনেই অনেক বদলে গেছি। কিন্তু স্কুলের বন্ধুদের কখনও ভোলা যায় না। তাহলে কি কিশোর বয়েসের মুখের আদল সারা জীবনেই থেকে যায় মানুষের?

প্ল্যাটফর্মে হকারের বেশে বাল্যবন্ধুকে দেখলে চমকে উঠতেই হয়। আমার কাছে রয়েছে ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট। যদিও নিজের পয়সায় কাটিনি, কোম্পানির পয়সা। ফার্স্ট ক্লাসের যাত্রীদের সঙ্গে কোনও হকারের বন্ধুত্ব থাকার কথা নয়, এটাই আমাদের এই সমাজের ব্যবস্থা। কিন্তু স্কুলে পড়বার সময় কান্তি আর আমি ছিলুম অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু!

কান্তিকে দেখে আমার একটা পুরোনো অভিমান মনে পড়ে গেল। তিরিশ বছর আগেকার সেই অভিমান, তাও বুকের মধ্যে যে এখনও রয়ে গেছে, তা আমি নিজেই জানতুম না।

আমি জিগ্যেস করলুম, তুই আমার চিঠি লিখিসনি কেন?

কান্তি বলল, চিঠি? তোমাকে আমি কোথায় চিঠি লিখব? তুমি এখন কোথায় থাকো, তাও তো জানি না—তুমি কি এখন নর্থবেঙ্গলে চাকরি করছ নাকি?

আমার মনে আছে, কান্তির মনে নেই। চিঠি লেখার কথা ছিল সেই তিরিশ বছর আগে।

না, নর্থবেঙ্গলে চাকরি করি না। শিলিগুড়িতে এসেছিলুম একটা কাজে। এখানে কতদিন আছিস।

এইতো মোটে দু-বছর। আগে কুচবিহারে ছিলাম!

তুই...মানে, সেই যে চলে গেলি, তারপর আর লেখাপড়া করিসনি?

কান্তি অদ্ভুতভাবে হেসে বলল, আর হল না ভাই। অনেক ইচ্ছে ছিল, কিছুতেই হল না।

আমি একটুক্ষণ চুপ করে রইলাম।

ক্লাস টু থেকে ক্লাস নাইন পর্যন্ত আমি কান্তির সঙ্গে এক স্কুলে পড়েছি। তারপর হঠাৎ কান্তির জীবনে এমন একটা ঘটনা ঘটল, যা অনেকটা রূপকথার মতন।

এই যে আমি এখন নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে বসে আছি, আমার পরনে কর্ডের প্যান্ট ও হাওয়াই শার্ট, পকেটে তিন চারশো টাকা, আমার সুটকেসটাও বেশ দামি। আর কান্তি পরে আছে একটা আধময়লা ধুতি আর নীল রঙের শার্ট, পায়ে রবারের চটি, মুখে একটা তেলতেলে দৈন্যের ছাপ। যেন আমাদের দুজনের ভূমিকাটাই উলটে গেছে।

কান্তিদের বাড়ি ছিল মোহনবাগান লেনে। দোতলা বেশ ছড়ানোছিটানো বাড়ি। সামনে একটা ছোট বাগান। দোতলায় মস্ত বড় ঢাকা বারান্দায় ছিল টেবিল টেনিস বোর্ড। কান্তির বাবা ছিলেন একটা ছোটখাটো কারখানার মালিক। আজকালকার বিচারে খুব বড়লোক বলা যায় না। মোটামুটি সচ্ছল পরিবার। কিন্তু আমার মনে হত, কান্তিদের বাড়িটা যেন রাজবাড়ির মতন!

আমি ইস্কুল মাস্টারের ছেলে, থাকতুম একটা ভাড়া বাড়ির একতলায় দুখানা স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার ঘরে, সারা বছরে দু-তিনটে মাত্র জামা পেতুম। আমাদের জলখাবার ছিল রুটি আর গুড়, কোনওদিন হাতে একটা পয়সা পাইনি।

কিন্তু কান্তিদের বাড়িতে গেলেই ওরা খাওয়াতো লুচি, ফুলকপির তরকারি আর রসগোল্লা। কান্তির যে কতরকম জামা ছিল তার ঠিক নেই! ঘুড়ি ওড়াবার সিজনে কান্তি যখন তখন পকেট থেকে পাঁচটাকা বার করে ওদের বাড়ির চাকরকে হুকুম দিত, যা, এক ডজন দেড়ে চাঁদিয়াল নিয়ে আয়!

ক্লাস সিক্স থেকে কান্তি ছিল আমাদের ক্লাসের ফার্স্ট বয়। আর সেকেন্ড নয় দিলীপ। আমি অবশ্য পড়াশুনোয় তেমন ভালো ছাত্র ছিলুম না। আমি মোটামুটি পাশ করে যেতুম। একবার হাফ ইয়ার্লি পরীক্ষায় দিলীপ ফার্স্ট হয়ে যায়। সেই থেকে কান্তির সঙ্গে দিলীপের একটা রেষারেষি শুরু হল। ক্লাসের ছাত্ররাও দুটো দলে ভাগ হয়ে গেল। আমি কেন যে কান্তির দলে চলে গিয়েছিলুম, তা আর আজ মনে নেই।

আমার মা আমায় বলতেন, তুই যে কান্তির সঙ্গে এত মিসিস, তোর লজ্জা করে না? দ্যাখ তো কান্তি কত ভালো রেজাল্ট করে, আর তুই পারিস না?

কান্তিকে অবশ্য বাড়িতে দুজন মাস্টারমশাই এসে পড়িয়ে যেতেন। আমি পড়তুম নিজেই। মাঝে-মাঝে ছুটির দিনে বাবা আমাকে পড়াবার নাম করে খুব বকুনি দিতেন।

বিকেলবেলা আমার খেলার কোনও জায়গা ছিল না। সামনের গলিতেই ডাংগুলি কিংবা দাড়িয়াবান্দা খেলতুম মাঝে-মাঝে। কান্তির সঙ্গে বেশি ভাব হওয়ার পর ওদের বাড়িতে গিয়ে টেবিল টেনিস খেলা শিখতুম।

দু-তিনদিন বিকেলে কান্তিদের বাড়িতে না গেলেই কান্তি ওদের বাড়ির দারোয়ানকে পাঠিয়ে আমায় ডেকে নিয়ে যেত। সেই বয়সেই আমার লজ্জা করত মাঝে-মাঝে। কান্তিদের বাড়িতে গেলেই কত কিছু খাবার দেয় আমাকে। অথচ কান্তি কোনওদিন আমাদের বাড়িতে আসে না। এলেও সদর দরজার কাছে দাড়িয়ে থাকে। আমাদের যে কোনও বসবার ঘর নেই।

কান্তির ছিল পাঁচ ভাই-বোন। সবচেয়ে বড় কান্তি, তারপর তিন বোন, সব শেষে আবার এক ভাই। সেই ভাইটার বয়েস ছিল তখন মোটে দু-তিন বছর। কান্তির পরের বোন শান্তার সঙ্গে আমার বেশ ভাব ছিল।

কান্তিরা বাবা কারখানা নিয়ে এমন ব্যস্ত থাকতেন যে তাঁকে দেখেছি খুব কম। একটু গম্ভীর মতন লোক ছিলেন তিনি, ছোঁটদের সঙ্গে বিশেষ কথা বলতেন না। পরে আমার আপশোশ হয়েছিল, কেন আমি কান্তির বাবাকে ভালো করে লক্ষ্য করিনি। সেই বয়েস থেকেই মানুষের চরিত্র স্টাডি করার দিকে আমার দিকে ঝোঁক ছিল।

কান্তির মা প্রায়ই অসুখে ভুগতেন। যখন ভালো থাকতেন, তখন তাকে বেশ হাসিখুশি মনে হত। কোনওদিন আমি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারিনি যে উনি কান্তির নিজের মা নন, দ্বিতীয় মা। কান্তির এক মামাকে ওদের বাড়িতে দেখতুম প্রায়ই, তিনি এসে সব ব্যাপারে খুব সর্দারি করতেন।

এক রবিবার দুপুরে কান্তির বাবা ভাত খাওয়ার পর জলের গেলাসটা তাঁর হাত থেকে পড়ে গেল মাটিতে। তারপর তিনি ঢলে পড়লেন টেবিলের ওপর। তাঁর আর জল খাওয়া হল না, সেই মুহূর্তে তার প্রাণ বেরিয়ে গেছে শরীর থেকে।

সেই বয়েসে মৃত্যু ব্যাপারটা আমাদের মনে তেমন দাগ কাটে না। কান্তির বাবা মারা যাওয়ার পর আমি আর কয়েকদিন ওদের বাড়িতে যাইনি। ন্যাড়ামাথায় কান্তি যেদিন স্কুলে এল, ওকে দেখে কীরকম অদ্ভুত লেগেছিল। আগে ওর মুখখানা মনে হত গোল, চুল কেটে ফেলার পর সেই মুখটাই যেন হয়ে গেছে লম্বাটে।

ন্যাড়া অবস্থায় মাত্র ছ-সাতদিন স্কুলে এসেছিল কান্তি। তারপর হঠাৎ ডুব। এর একমাস বাদেই আমাদের পরীক্ষা। আমরা ব্যস্ত ছিলুম, তবু আমি একদিন গেলুম কান্তির খোঁজ নিতে।

গিয়ে দারুণ অবাক হতে হল। বাড়ির সামনে অনেক লোকের ভিড়। ভেতরে ভীষণ চ্যাঁচামেচি হচ্ছে। বাগানের গেট বন্ধ। কান্তির মামার গলাই শুনতে পাচ্ছি বেশি।

ভিড়ের লোকজনেরা বলল, ও-বাড়িতে নাকি কয়েকদিন ধরেই খুব মারামারি হচ্ছে, আজ কার যেন মাথা ফেটে গেছে। আমি ভিড় ঠেলে গেটের কাছে পৌঁছে গেলুম। দারোয়ান আমায় চেনে কিন্তু সে আমায় ভেতরে ঢুকতে দিল না! রুক্ষভাবে বলল, এখন যাও, এখন যাও! ঝঞ্ঝাট কোরো না!

তক্ষুনি সেখানে হাজির হল দুজন পুলিশ। আমরা সেই সময় পুলিশ দেখলেই দূরে সরে থাকতুম। তাই বাড়ি চলে এলুম।

মোহনবাগান লেনেই থাকত আমাদের ক্লাসের আর একটি ছেলে অসীম। সে একদিন বলল, কান্তিরা বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে। ওদের আর ওখানে থাকতে দেবে না।

আমি ভাবলুম, বাড়িটা তো কান্তিদেরই। সেখানে ওদের কে থাকতে দেবে না? কান্তিরা তো আমাদের মতন ভাড়া বাড়িতে থাকে না!

কান্তির সঙ্গে বেশ কয়েকদিন দেখা না হওয়ায় আমার মন কেমন করছিল। সেদিনই বুঝতে পারলুম কান্তির সঙ্গে আমার কতখানি বন্ধুত্ব। কান্তির কয়েকখানা গল্পের বই রয়ে গেছে আমার কাছে, সেগুলোও ফেরত দেওয়া হয়নি।

সেদিনই স্কুলের ছুটির পর অসীমের সঙ্গে গেলুম মোহনবাগান লেনে। কান্তিদের বাড়ির সামনে দুটো ঠেলাগাড়ি দাঁড়িয়ে, তাতে মালপত্র তোলা হচ্ছে।

অসীম বলল, আমি ঠিক বলেছি কি না! কান্তিরা আজই চলে যাচ্ছে।

একটু বাদেই দেখতে পেলুম কান্তিকে। তার ন্যাড়া মাথায় একটা ব্যান্ডেজ বাঁধা।

আমাদের দেখে কান্তি কেমন শুকনো ভাবে চেয়ে রইল, কোনও কথা বলল না। আমি আর অসীম এগিয়ে গিয়ে বললুম, তোর কী হয়েছে রে কান্তি?.

কান্তি বলল, আমরা এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি। রানাঘাটে আমাদের মামা-বাড়ি, সেখানে থাকব।

তোর মাথা ফাটল কী করে রে, কান্তি?

বড় মামা আমাকে একটা ধাক্কা দিয়েছিল, আমি সিঁড়ি থেকে পড়ে গেছি। বেশি লাগেনি। আমার নন্তু মামাকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে।

কেন রে?

নন্তু মামা বড় মামাকে মেরেছে। ছুরি দিয়ে ঘাড়ে মেরেছে। বড় মামা একটুর জন্য বেঁচে গেছে।

বেশি কথা বলার সুযোগ পাওয়া গেল না। দুজন অচেনা লোক ভেতর থেকে বিছানাপত্র এনে ছুড়ে-ছুড়ে ফেলে যেতে লাগল ঠেলাগাড়ির ওপরে। একটু বাদেই তারা বলল, আর কিছু নেই, এবারে যাও!

কান্তির তিন বোনকে নিয়ে বাগানের এক পাশে দাঁড়িয়েছিলেন একজন বুড়োমতন লোক। ইনি কান্তির রতন মামা। ইনিই কান্তিদের নিয়ে যাচ্ছেন রানাঘাটে। শান্তা ফুলে-ফুলে কাঁদছে। একবারও তাকাচ্ছে না আমার দিকে।

শান্তার ওই কান্না দেখে আমারও কান্না পেয়ে গেল।

এই ক'দিনের মধ্যেই কান্তি যেন আমাদের চেয়ে অনেক বড় হয়ে গেছে। কান্তি কিন্তু একটুও কাঁদছে না। সে তার বোনদের ডেকে এনে ঠেলাগাড়ির ওপর বসাল। তারপর নিজেও আর-একটা ঠেলায় মালপত্রের ওপর চেপে বসল।

কান্তির বাবার মোটরগাড়িটা গ্যারেজে রয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি। ওই গাড়িতে দু-একবার

চেপেছি। কান্তি সেই গাড়িতে না গিয়ে ঠেলাগাড়ি চেপে কেন মামা বাড়ি যাচ্ছে, তা বুঝতে পারলুম না।

ঠেলাগাড়ি চলতে শুরু করার পর কান্তি আমার দিকে চেয়ে বলল, সুনীল, তোকে চিঠি লিখব আমি। উত্তর দিস কিন্তু!

শান্তা একবার জল ভরা চোখে তাকাল আমার দিকে, তারপরই মুখ নামিয়ে নিল।

আমি আর অসীম ঠেলাগাড়ি দুটোর পেছনে পেছনে দৌড়ে গেলুম খানিকটা। তারপরেই সেটা বড় রাস্তায় বেঁকে গেল।

তারপর থেকে আমি দিনের পর দিন অপেক্ষা করছি কান্তির চিঠির জন্য। পিওন পাড়ায় এলেই ছুটে যেতুম। বিকেলবেলা স্কুল থেকে ফিরেই খুলে দেখতুম ডাক বাক্স! কিন্তু প্রত্যেকদিন আমায় নিরাশ হতে হত।

স্কুলে পড়ার সময় আমার পেন ফ্রেন্ডশিপের অভ্যেস ছিল। আমি জাপান, নাইজিরিয়া, ইজিপ্ট এইসব জায়গায় ছেলেমেয়েদের ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে চিঠি লিখতুম, তারাও আমাকে উত্তর দিত। কিন্তু আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু দূরে চলে গিয়ে আমার চিঠি লিখল না? কান্তি ওর মামা বাড়ির ঠিকানা জানিয়ে যায়নি, তাই আমিও নিজে থেকে চিঠি লিখতে পারিনি।

সেবার অ্যানুয়াল পরীক্ষায় দিলীপ খুব অনায়াসে ফার্স্ট হয়ে গেল। আমাদের ক্লাস টিচার বলেছিলেন, কান্তি পরীক্ষা দেয়নি বটে, কিন্তু ও যদি ফিরে আসে, ওকে ক্লাস টেনে প্রমোশান দিয়ে দেওয়া হবে।

কিন্তু কান্তি আর এল না।

একটু-একটু করে কান্তিদের বাড়ির ব্যাপারটা নানা লোকের মুখে শুনেছিলুম। তখন সবটা ভালো বুঝতে পারিনি, পরে বুঝেছি।

কান্তির মা মারা গিয়েছিলেন অনেকদিন আগে। কান্তির দ্বিতীয় মায়ের নিজের ছেলে একটিই, সে হল কান্তির ছোট ভাই বাবলু। কান্তির বাবা তাঁর সব সম্পত্তি গোপনে উইল করে দিয়েছিলেন শুধু বাবলুর নামে। এ যেন ঠিক রামায়ণের মতন গল্প। কৈকেয়ীর কথা শুনে রাজা দশরথ ভরতকে দিলেন রাজ্য আর রামকে বনে পাঠালেন।

কান্তি যাঁকে বড় মামা বলত, তিনি কান্তির ওই দ্বিতীয় মায়ের ভাই। কান্তির নিজের মামাদের সঙ্গে অনেকদিন যোগাযোগ ছিল না। তাঁদের অবস্থাও ভালো নয়। কান্তির বাবার মৃত্যুর খবর পেয়ে তারা এসে উপস্থিত। তারপর তাঁরা যখন শুনলেন যে তাঁদের ভাগ্নে-ভাগ্নীরা বিষয়-সম্পত্তি থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত হয়েছে তখন তাঁরা রেগে আগুন। লেগে গেল দুই পক্ষের মামাদের ঝগড়া। দ্বিতীয় মায়ের ভাই যে বড়মামা, তিনিই সব দায়িত্ব নিয়েছিলেন, ও-বাড়ির সিন্দুকের চাবিও তাঁর কাছে। কান্তির ছোট মামাটি আবার রগচটা ধরনের, রানাঘাটের দিকে তাকে অনেকে গুণ্ডা হিসেবে ভয় পায়। সে রেগে গিয়ে বড়মামাকে ছুরি মারতে গেল, সেই অপরাধে তার তিন বছর কারাদণ্ড হয়ে গেল। আর এইসব কারণে বড়মামা কান্তি আর তার বোনদের একেবারে বিদায় করে দিলেন বাড়ি থেকে।

কান্তির নিজের মামারা সম্পত্তির ভাগ নেওয়ার জন্য মামলা লড়েছিল। কিন্তু এইসব মামলা চলাতে গেলে টাকার জোর লাগে। কান্তির নিজের মামাদের অবস্থা ভালো নয়, দু-বছর কেস চালাবার পর তাঁরা হাল ছেড়ে দিলেন। কেন কান্তি আমাকে চিঠি লিখল না? কলকাতা ছেড়ে গিয়ে ওর কি আর কখনও মন পড়েনি আমাদের কথা? কান্তিরা গরিব হয়ে গিয়ছিল ঠিকই, তা বলে কি একটা চিঠি লেখার পয়সাও ছিল না?

ছেলেবেলায় ভাবতুম, রানাঘাট বুঝি কত দূরে! কিন্তু পরে তো বুঝেছি! কান্তি কি রানাঘাট থেকে আর কখনও কলকাতায় আসেনি, তবু আমাদের সঙ্গে দেখা করেনি কেন?

নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে এতকাল পরে কান্তিকে এই অবস্থায় দেখে যেন সেই কারণটা খানিকটা অনুমান করতে পারলুম। আমরা যেরকম স্কুল থেকে পাশ করে কলেজে এসেছি, সেইরকম মনে মনে আমি ধরেছিলুম, কান্তিও নিশ্চয়ই রানাঘাটে আবার স্কুলে ভরতি হয়েছে, সেখান থেকে পাশ করে মফস্বলেরই কোনও কলেজে পড়েছে। কিন্তু তা হয়নি। আমরা এগিয়ে গেছি, কান্তি সেই ক্লাস নাইনেই রয়ে গেছে।

আজ যে কান্তি আমার সামনে বসে আছে, তার চেহারায় বেশ একটা প্রৌঢ়ত্বের ছাপ পড়ে গেছে। অথচ তাকে দেখে আমার শুধু মনে পড়ছে সেই ক্লাস নাইনের ছেলেটির কথা। মাঝখানের অংশটা জোড়া না লাগলে আমি এখনকার কান্তিকে চিনতে পারব না।

কৌতূহল দমন করতে না পেরে আমি জিগ্যেস করলুম, সেই যে তোরা রানাঘাটে চলে গেলি, তারপর কী হল রে? তুই আর পড়াশুনো করিসনি?

কান্তি সংক্ষিপ্ত ভাবে বলল ঃ নাঃ! লেখাপড়া আর হল না।

আমার বেশ রাগ হয়ে গেল। কান্তির মতন একটা ব্রিলিয়ান্ট ছেলের জীবনটা এইভাবে নষ্ট হয়ে গেল? হঠাৎ গরিব হয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু গরিবরাও কি এদেশে লেখাপড়া করে না? কান্তি নিজেই বা এটা বোঝেনি কেন?

আমি বললুম, তোর রানাঘাটের মামারা কী রে? তোকে একটা স্কুলে ভরতি করে দিতে পারেনি?

কান্তি বলল, ভরতি হয়েছিলুম একটা স্কুলে, নিজেরই চেষ্টায়। কিন্তু তিন-চার মাসের বেশি পড়তে পারিনি সেখানে। বেঁচে থাকাটাই একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমরা চার ভাইবোন রানাঘাটে মামারবাড়িতে গিয়ে ওদের গলগ্রহ হয়ে পড়লুম। পাঁচুমামার অবস্থা ভালো ছিল না। রানাঘাটে একটা ছোট দোকান ছিল মোটে। আমার বাবার সঙ্গে আমার এই মামাদের সম্পর্ক ভালো ছিল না। আমার মা মারা যাওয়ার পর বাবা আর পাঁচুমামাদের সঙ্গে কোনও সম্পর্কও রাখেননি। বাবা মারা যাওয়ার পর পাঁচুমামারা ভাবল, এবার তো আমিই সব সম্পত্তি পাব, তাতে ওঁদেরও সুবিধে হবে। কিন্তু হয়ে গেল তার উলটো। আমার মামি সবচেয়ে বেশি রেগে গিয়েছিল। কথায় কথায় আমাদের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিত। একসময় এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছিল যে রানাঘাটে আমাদের ভাই-বোনদের সবাইকে ভিক্ষে করার উপক্রম হয়েছিল।

কুচবিহারে আমার এক পিসিমা থাকতেন। রানাঘাটে অসহ্য হওয়ার পর চলে এলাম কুচবিহারে পিসিমার কাছে। সেখানেও প্রায় সেই একই অবস্থা। চারটে উঠতি বয়েসের ছেলেমেয়ের ভার কে নিতে চায় বল। পিসিমা মানুষ ভালো ছিল, কিন্তু পিসেমশাই ছিলেন যেমন কৃপণ, তেমনি লোভী। তিনি কিছুদিন চেষ্টা করলেন আমাদের সম্পত্তি উদ্ধার করবার জন্য, কিন্তু বড়মামার সঙ্গে পেরে উঠলেন না। তখন পিসেমশাই বললেন, তোমাদের দায়িত্ব আমি নিতে পারব না। তোমাকে আমি একটা কাজ জুটিয়ে দিচ্ছি, তোমরা আলাদা সংসার করো। পিসিমাও মারা গেলেন এর মধ্যে, সুতরাং বলার কিছু রইল না। ষোলো বছর বয়েসে আমি চাকরিতে ঢুকলাম, আর ভাড়া নিলাম একখানা খোলার ঘর।

কী চাকরি নিলি?

একটা মুদির দোকান জিনিস বিক্রি করা। মাইনে একশো টাকা। সেই টাকায় কখনও চলে? ঘাড়ের ওপর তিন-তিনটে বোন, তাদের লজ্জা নিবারণের একটা ব্যবস্থা করতে হবে। আমার বোনদের তোর মনে আছে? শান্তা, মণিকা, বীথিকা?

শান্তাকে আমার স্পষ্ট মনে আছে, ফরসা, পাতলা চেহারা। শান্তার সঙ্গে আমার বিশেষ একটা সম্পর্ক ছিল। ঠিক প্রেম নয়, সেই বয়েসে প্রেমের জন্মও হয় এক ধরনের ভালো লাগা। শান্তাকে

দেখলেই ভালো লাগত। মণিকা আর বীথিকা বেশ ছোট ছিল, ওদের কথা ভালো করে মনে পড়ে না।

কান্তি বলল, বোনদেরও লেখাপড়া শেখাতে পারলুম না। শান্তা বাড়িতে বসে ঠোঙা তৈরি করত, মণি আর বীথি সাহায্য করত তাকে।

আমি দৃশ্যটা কল্পনা করেও শিউরে উঠলুম। বড়লোকের বাড়ির শৌখিন মেয়ে ছিল শান্তা আর বোনেরা, কত রকম রঙিন পোশাক পরত, ওরা রাস্তার সাধারণ আইসক্রিমওয়ালার কাছ থেকে আইসক্রিম খেত না, ওদের জন্য পার্ক স্ট্রিট থেকে আইসক্রিম আনানো হত। সেই ফুটফুটে সুন্দর তিনটি মেয়ে একটা বস্তির ঘরে বসে ঠোঙা বানাচ্ছে!

তারপর কুচবিহার ছাড়লি কেন?

বছরচারেক ওখানে কষ্টেসৃষ্টে চালিয়ে দিলুম। দু-বেলা খেতে পেতুম না। তবু সেইভাবেই চলে যাচ্ছিল। যে মুদির দোকানে আমি কাজ করতুম, তার মালিক ভালোই বাসত আমাকে। তুমি তো জানো সুনীল, আমি অঙ্কে বেশ ভালোই ছিলুম, তাই হিসেব-টিসেব করে দিতে পারতুম তাড়াতাড়ি। সেই দোকানে আরও দুজন কর্মচারী ছিল। আমি একটু মালিকের নেক নজরে পড়ায় তারা আমার ওপরে চটে গেল। তা ছাড়া, আমি ঠিকঠাক হিসেব করতুম বলে ওদের অসুবিধে হচ্ছিল বেশ। তখন ওরা একদিন আমার নামে চুরির অপবাদ চাপিয়ে দিল।

চুরি?

হ্যাঁ, চুরি। মারতে-মারতে আমায় তাড়িয়ে দিল সেই দোকান থেকে। তবে ভাই সত্যি কথা বলতে, আমি চুরি করতাম ঠিকই। মাঝে-মাঝেই চাল, ডাল, চিনি সরাতুম একটু আধটু। কী করব, খিদের জ্বালা বড় জ্বালা। তখন ধর্ম মাথায় ওঠে। সেই দোকানের অন্য কর্মচারীরাও চুরি করত, কিন্তু তারা গায়ের জ্বালায় একদিন আমায় হাতে-নাতে ধরিয়ে দিল। দোকানের মালিক মারতে-মারতে আমার মুখ দিয়ে রক্ত বার করে দিয়েছিল।

তারপর?

একবার চোর অপবাদ চেপে গেলে আর কোথাও চাকরি পাওয়া যায় না। পিসেমশাই তখনও বেঁচে ছিলেন, তাঁর কাছে গিয়ে ধর্না দিলুম। তিনি বললে, হারামজাদা, তোকে জুতোপেটা করব। চুরি করে আবার আমার কাছে মুখ দেখাতে এসেছিস? শহরে আমার পর্যন্ত বদনাম হয়ে গেল! ফের যদি কোথাও গিয়ে আমার পরিচয় দিয়েছিস—

আমি কান্তির মুখের দিকে আবার ভালো করে তাকালুম। সত্যিই আমার ছেলেবেলার বন্ধু কান্তি আমার পাশে বসে আছে, সে এইসব কথা বলে যাচ্ছে। ঠিক যেন গল্পের মতন। আগেকার দিনে এরকম অনেক গল্প লেখা হত, বিষয় সম্পত্তির গণ্ডগোলে একজন হঠাৎ গরিব হয়ে গেল, তারপর কত কষ্ট, কত অত্যাচার সহ্য করা ইত্যাদি। আমাদের জীবনে এসব কখনও ঘটে না, এইসব লোকজনদের যে আমি কখনও দেখব তা ভাবিনি। কিন্তু এই তো একটা জলজ্যান্ত সত্য ঘটনা একজন আমার পাশে বসেই বলে যাচ্ছে।

গল্পের একটা টান আছে। সেই জন্যেই এর পরের অংশটুকু আমার জানা দরকার।

আমি জিগ্যেস করলুম, এর পর তোরা কুচবিহার ছেড়ে চলে এলি?

কুচবিহার ছেড়ে যাব কোথায়? রেল স্টেশনে এসে কুলিগিরি করতে লাগলুম। মোটে একটাকা দু-টাকা পাই। কোনও মতেই তাতে চলে না। চোর বদনাম রটে গেছে বলে কেউ চাকরিও দেবে না। সেই সময় মরীয়া হয়ে একদিন মাকে একটা চিঠি লিখলুম।

মানে বাবলুর মাকে?

হ্যাঁ। তাকে তো আমরা নিজের মায়ের মতনই দেখেছি। মার কাছে অনুনয়-বিনয় করে লিখলুম,

মা, আমরা বিষয়-সম্পত্তির ভাগ চাই না, কিচ্ছু চাই না। শুধু আমাদের কলকাতার বাড়িতে ভাই বোনেদের একটু থাকতে দাও, দুটো খেতে পরতে দাও! আমি কলকাতায় একটা কিছু কাজ জোটাতে পারলেই বাড়ি ছেড়ে আবার চলে যাব।

সে চিঠির কোনও উত্তর আসেনি নিশ্চয়ই?

না!

খুব স্বাভাবিক। সম্পত্তি নিয়ে মামলা চলার পর কি কেউ বিরুদ্ধ পক্ষকে বাড়িতে আশ্রয় দেয়? আসলে ওই বাড়ি ছেড়ে চলে আসাই তোদের ভুল হয়েছিল। রাইট অব পজেশান বলে একটা কথা আছে না? তোর রানাঘাটের মামারা ছিল গাধা, এই জিনিসটা বোঝেনি?

অত ছোট বয়েসে তো আমি এসব কিছু বুঝতাম না ভাই! তা ছাড়া ওই যে রানাঘাটের সেই গুণ্ডা মামাটা বাবলুর বড়মামাকে ছুরি মারল, তাতেই সব বরবাদ হয়ে গেল। তবু, আমি যখন বাবলুর মাকে চিঠি লিখেছিলুম, তখন অনেক আশা করেছিলুম যে আমাদের খাওয়া-পরার এত কষ্ট হচ্ছে শুনলে তিনি নিশ্চয়ই কিছু সাহায্য করবেন। হয়তো সে চিঠি বড়মামার হাতে পড়েছিল, মাকে দেখায়নি।

আমি যতদূর শুনেছিলুম, তোরা চলে আসার বছরচারেক পরেই বাবলুর মা মারা যান। উনি তো প্রায়ই অসুখে ভুগতেন!

সেই জন্যই! নইলে মা জানতে পারলে কিছু-না-কিছু সাহায্য করতেনই।

তারপর কী হল?

শান্তা তো এর মধ্যে বেশ বড় হয়ে উঠেছে, সতেরো বছর বয়েস, চেহারাও তো ভালোই। শান্তাকে একজন লোকের পছন্দ হয়ে গেল, সে শান্তাকে বিয়ে করতে চাইল। এক হিসেবে সেটা খুব সৌভাগ্যের ব্যাপার। উঠতি বয়েসের মেয়েদের নিয়ে অনেক বিপদ। আমাদের কোনও সহায়সম্বল নেই, একটা খোলার ঘরের মধ্যে তিন-তিনটে মেয়েকে নিয়ে আমি থাকি, কখন কী হয় বলা যায় না। এই লোকটা তো বিয়ের প্রস্তাব দিচ্ছে। শুধু দোষের মধ্যে এই, লোকটা একটা কশাই।

কশাই মানে?

মাদারিহাটে ওর একটা মাংসের দোকান আছে। নিজের হাতে মাংস কাটে না বটে, কিন্তু দোকানে সে-ই ক্যাশবাক্স নিয়ে বসে। একজন কশাই-এর সঙ্গে বোনের বিয়ে দেওয়া যায় কি না, সে পরামর্শ নিতে আবার গিয়েছিলুম পিসেমশাই-এর কাছে। তিনি বললেন, যা ইচ্ছে করো, কিন্তু কুচবিহারে থাকতে পারবে না। চলে এলাম মাদারিহাটে।

সেই কশাই-এর সঙ্গে শান্তার বিয়ে হল? শান্তা রাজি হল?

রাজি-অরাজির কী আছে? তখন আমরা খেতে পাই না, এমন অবস্থা। সেই লোকটির বউ মারা গেছে কিছুদিন আগে, দুটো বাচ্চা ছেলেমেয়ে আছে, বিয়ে করা তাড়াতাড়ি দরকার। আমরা আর বেশি চিন্তা করার সুযোগ পেলাম না, তার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলাম শান্তার!

তুই আর তোর বাকি দুবোন ওদের বাড়িতেই রয়ে গেলি?

প্রথম একবছর ছিলাম। এতদিনের মধ্যে সেই একটা বছরই বেশ ভালো ছিলাম বলতে পারো। শান্তার স্বামীর নাম দুলাল নস্কর। মানুষটা এমনিতে খারাপ না, শুধু একটাই যা দোষ। দুলাল প্রথম-প্রথম আমাকে বেশ খাতির করত। আমাকে সে পাঁচশো টাকা দিয়ে বলল, তুমি নিজে ব্যাবসা করো। চা-বাগানে মুরগি চালান দেওয়ার কাজ নিতে পারো। আমি কাজটা বেশ শিখে যাচ্ছিলুম, মনে হয়েছিল, কিছুদিনের মধ্যেই দাঁড়িয়ে যেতে পারব। দুলালের পাঁচশো টাকা শোধ দিয়ে আমার হাতেও কিছু জমেছিল, কিন্তু এত সুখ আমার কপালে সইল না। আমার ভাগ্যটাই যে খারাপ। এরপর যা হল, সেটা ভাই তোমাকে বলতে আমার লজ্জা করছে।

তাহলে থাক।

স্টেশনে লোকজন ছুটোছুটি করছে, মাইকে কী যেন ঘোষণা করল। আমি একটু অস্বস্তি বোধ করলুম। ট্রেনের কী হল খবর নিতে হয়। ট্রেন যদি নাই যায়, রাত্তিরের জন্য একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

কান্তি বলল, দার্জিলিং মেল আজ আর যাবে না মনে হচ্ছে। লোকেরা টিকিটের টাকা রিফান্ড নিতে যাচ্ছে। এমন এখানে মাঝে-মাঝে হয়।

আমি তাহলে কী করব? আমাকেও টিকিটের টাকা রিফান্ড নিতে হবে? কালকের রিজার্ভেশান পাব কী করে?

সে তুমি চিন্তা কোরো না। আমি ব্যবস্থা করে দেব। এটুকু আমি পারি। কেরানিবাবুরা আমায় চেনেন। তুমি বসো, এখন ভিড় হবে, একটু ফাঁকা হলে যাওয়া যাবে এখন।

এবারে আমি একটা সিগারেট দিলুম কান্তিকে। সেটা জ্বালিয়ে নিয়ে বলল, তোমাকে সব কথা বলতে ইচ্ছে করছে। এসব কথা আর কাকেই বা বলব। তোমাকে যে-কথা বলতে লজ্জা পাচ্ছিলুম, এখন ভেবে দেখলুম, তাতেই বা লজ্জার কী আছে। ঘটনা যখন ঘটেই গেছে, তখন আর জানাতে লজ্জা কী! শান্তার স্বামী ওই যে দুলাল নস্কর, সে এমনিতে খারাপ লোক নয়, কিন্তু তার একটা দোষই বড় মারাত্মক। মাদারিহাটে সে তার বাড়িতেই আমাদের খাওয়া-থাকা দিচ্ছিল, ভালো মনেই দিত, কিন্তু তার আসল মতলবটা বুঝিনি প্রথমে। মণি আর বীথিও তো বড় হচ্ছে। দুলাল শান্তাকে বিয়ে করল তো বটেই, সেইসঙ্গে সে মণি আর বীথিকেও নিজের ভোগে লাগাতে চাইত। মণিকেই সে বিরক্ত করত বেশি। প্রথম-প্রথম ভাবতুম, এমনিই বুঝি ঠাট্টা ইয়ার্কি। তারপর মণি একসময় পোয়াতি হয়ে গেল, তার তখন মোটে সতেরো বছর বয়েস।

তোর তখন বয়েস কত রে, কান্তি?

কত আর হবে, কুড়ি-একুশ। দুলাল একটা হোমরাচোমরা লোক, মাদারিহাটে তার অনেক ক্ষমতা, আমি কী করে পারব তার সঙ্গে? শান্তা কান্নাকাটি করে, মণি কান্নাকাটি করে, তাই দেখে আমিও কাঁদি। দুই বোনেই একসঙ্গে পোয়াতি।

সেই ছিপছিপে ফরসা কিশোরী মেয়ে শান্তা, সে একজন কশাইয়ের বউ। এই দৃশ্য আমি কল্পনাই করতে পারলুম না। শান্তার সেই অল্পবয়েসি সরল মুখখানাই আমার মনে পড়ে।

কান্তি বলল, এর মধ্যে মণি আবার একটা কাণ্ড করল। হঠাৎ সে এক রাত্তিরে বাড়ি থেকে উধাও হয়ে গেল। সেই যে গেল তো গেলই, আর কোথাও তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। সে আত্মহত্যা করেছে না নিরুদ্দেশে গেছে তা আজও আমি জানি না! তবে এইটুকু বুঝেছি, মণি আমাদের নিষ্কৃতি দিয়ে গেছে। ওর জন্য যাতে আমাদের বিপদ না বেড়ে যায়, তাই সে নিজেই আত্মত্যাগ করল। অতটুকু মেয়ে, সে যে কতখানি দুঃখ নিয়ে চলে গেছে—

বলতে-বলতে গলা ধরে গেল কান্তির। তারপর একটু সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চল, তোমার টিকিটটার ব্যবস্থা করা যাক।

কিন্তু তখনও গল্পটার কিছুটা বাকি আছে। মণি চলে যাওয়ার পর ওরা কি মাদারিহাটে শান্তার স্বামীর বাড়িতে থেকে গেল?

কান্তি বলল, না, তা কি আর থাকা সম্ভব? হাতে তখন আমার মুরগি বেচা শ'তিনেক টাকা ছিল। একদিন রাত্তিরে আমি শান্তাকে চুপি চুপি বললুম, দ্যাখ শান্তা, আমাদের যা হওয়ার তা তো হবেই আমাদের জন্য কোনও চিন্তা করিসনি। তোর পেটে সন্তান এসেছে, তুই তোর স্বামীর সঙ্গে কোনওরকমে মানিয়ে চলিস। আমি পুরুষমানুষ, আমার কোনও রকমে চলে যাবে, আর আমি যতদিন বাঁচব, ততদিন বীথিকে দেখব। শান্তা একথা শুনেও মানতে চায়নি। কেঁদে-কেঁদে আমার পায়ের কাছে

গড়িয়ে পড়েছিল, তবু বীথি আর আমি জোর করেই চলে এলুম।

ওখান থেকে কোথায় গেলি?

গেলুম দিনহাটা। নর্থ বেঙ্গলটা মোটামুটি চিনে গেছি তো। দিনহাটায় এসে মুরগির ব্যাবসাই শুরু করেছিলুম। তাও বেশিদিন চালাতে পারলুম না। কী যেন একটা অসুখে একবার পটাপট আমার মুরগিগুলো সবক'টা মরে গেল দু-দিনের মধ্যে। দিনহাটা জায়গাটাই ছিল অপয়া, সেখানে আমি আর বীথি দুজনেই অসুখে পড়েছিলুম। তারপর থেকে এই এখানেই আছি। বীথি আর বিয়ে করল না, আমার সঙ্গেই থেকে গেল। একবার পক্স হয়ে বীথির সারা মুখে দাগ হয়ে গেছে, তাতে ভালোই হয়েছে, লোভী লোকেরা আর ওকে বিরক্ত করে না। আমি ভাই বিয়ে করেছি এর মধ্যে। দুটি ছেলেমেয়েও হয়েছে। বাড়িতে দুটো সেলাই মেশিন আছে, বীথি আর আমার বউ কন্ট্রাক্টে জামাকাপড় সেলাই করে, আর আমি এই করি, মোটামুটি এখন চলে যায়। বলতে পারো, ভালোই আছি।

শান্তার খবর রাখো না?

নাঃ! ওদিকে আর ঘেঁষিইনি। একদিন এই স্টেশনে দুলাল নস্করকে দেখেছিলুম দূর থেকে, কিন্তু সামনে গিয়ে কথা বলিনি। ওকে দেখেই আমার মণির কথা মনে পড়ে গিয়েছিল, আর তাতেই লোকটার ওপর এত ঘৃণা হল যে কথা বলতে ইচ্ছে করল না! দুলাল নস্কর এখন বেশ বুড়ো হয়ে গেছে, গায়ে আর সেরকম জোর নেই। সঙ্গে দেখলুম একটা বাচ্চা ছেলে, মুখের আদল দেখে শান্তার ছেলে বলে মনে হল। চল, চল, আর দেরি করা যায় না!

এরপর কান্তি আমার টিকিটটা নিয়ে ঢুকে গেল একটা ঘরের মধ্যে, খানিক বাদে বেরিয়ে এসে বলল, নাও, তোমার কালকের রিজার্ভেশান হয়ে গেছে। সহজে কি দিতে চায়।

স্টেশনের বাইরে একটা মাত্র ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। নিউ জলপাইগুড়িতে সেরকম হোটেল-ফোটেল নেই রাত কাটাবার জন্য আমাকে যেতে হবে শিলিগুড়ি। ট্যাক্সিটা চলে গেলে মুশকিল।

সেদিকে এগোতে-এগোতে কান্তি বলল, এতক্ষণ শুধু নিজের কথাই বললুম, তোমার কথা কিছু জিগ্যেস করা হয়নি। তুমি এখন বড় চাকরি করছ নিশ্চয়ই। ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট। কোথায় আছ তুমি?

আমি একটু হেসে বললুম, একটা খবরের কাগজে চাকরি করি। এমন কিছু বড় চাকরি নয়। দেখছ না ট্রেনে করে যাচ্ছি। যারা বড় চাকরি করে, তারা প্লেনে যাতায়াত করে।

তোমার বাবা, আমাদের কালীবাবু স্যার কেমন আছেন?

বাবা বেঁচে নেই।

তোমার বাবার কোনও সম্পত্তি ছিল না, তাই তুমি সুখে আছ!

ট্যাক্সিটায় দরদাম হয়ে যাওয়ার পর কান্তি বলল, ভাই সুনীল, তোমাকে একটা রাত অযথা এখানে থেকে যেতে হচ্ছে, শুধু-শুধু হোটেল ভাড়া দেবে। আমার উচিত ছিল তোমাকে আমার বাড়িতে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু ভাই বিশ্বাস করো, তোমাকে রাখার মতন জায়গা আমাদের বাড়িতে নেই। অতি ছোট-ছোট দু-খানি ঘর, তার মধ্যে আবার শেলাই-এর মেশিন, আমার দুটো ছেলেমেয়ে—

আমি বললুম, হোটেলের খরচ আমাদের কোম্পানি দেবে। সেজন্য ভেব না। কাল বরং একটু তাড়াতাড়ি এসে তোমার বাড়িটা একবার দেখে আসব। তোমার বউ দেখাবে না?

ট্যাক্সিটা ছেড়ে দেওয়ার পর আমি জানলা দিয়ে হাতছানি দিয়ে কান্তিকে বিদায় জানালুম। গাড়িটা একটু দূরে যাওয়ার পর আমার মনে হল, এইভাবে রেলের প্ল্যাটফর্মে হকার-বেশি কান্তির সঙ্গে দেখা না হলেই ভালো হত। ক্লাস নাইনের কান্তিই আমার প্রিয়। তখন কান্তি আর আমি পরস্পরকে তুই-তুই করতুম। এখন আমি কান্তিকে তুই বললেও ও আমাকে আগাগোড়া তুমি বলে গেল।

আমি যে বই-টই লিখি, কাগজপত্তরে প্রায়ই আমার নাম বেরোয়, কান্তি তার কিছুই খবর রাখে না। তবুও কান্তি আমাকে সমীহ করছিল কেন?

॥ দুই ॥

এর দু-বছর পরের এক রবিবার সকালে আমি বাড়ি থেকে বেরুতে যাচ্ছি, এমনসময় একটা নতুন ঝকঝকে গাড়ি আমাদের বাড়ির দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। সিল্কের সাফারি সুট পরা একজন ভদ্রলোক গাড়ি থেকে নেমে বলল, সুনীল, কোথায় চললি? তোর কাছেই এসেছি—

আবার একটা দারুণ চমক। কান্তি!

নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে সেই যে মলিন বয়াটে চেহারা দেখেছিলুম, সে কান্তি তো এ নয়। এ যে আর-একজন মানুষ। চেহারা সুন্দর হয়ে গেছে, মুখে একটা আত্মতৃপ্তির ভাব।

নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে দেখে যতটা অবাক হয়েছিলুম এবারে অবাক হলুম তার চেয়ে আরও বেশি। এও যে দেখছি রূপকথার মতন।

কান্তি এক মুখ হেসে বলল, বিশ্বাস হচ্ছে না তো? ওঠ রে গাড়িতে ওঠ, তোকে এক জায়গায় যেতে হবে। পথে সব বলছি।

গাড়িতে উঠে পড়লুম, ঘোর-লাগা মানুষের মতন। কান্তি বিলিতি সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে দিয়ে বলল, এই নে! সেই যে তোর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তার ঠিক দশ মাসের মধ্যেই ব্যাপারটা ঘটে গেল। আমার কপালে একটা পাথর চাপা ছিল বুঝলি, সেই পাথরটা সরে যেতেই সুখের মুখ দেখলুম।

তুই কি গুপ্তধন পেয়েছিস নাকি রে কান্তি?

ঠিক তাই। এ-যুগের গুপ্তধন। সরকারের কাছ থেকে পাওয়া যায়। এবারে বুঝেছিস?

লটারি? কোথাকার?

রাজস্থানের!

অ্যাঁ? ফার্স্ট প্রাইজ? সে তো অনেক টাকা।

ছত্রিশ লাখ। ইনকাম ট্যাক্স কেটে-কুটে তেইশ লাখ দিয়েছে। তাই বা মন্দ কী, বল? হাঃ-হাঃ-হ'

কান্তি যেমন উদারভাবে হাসল, সেরকম ভাবে হাসবার ক্ষমতা নেই আমার। তেইশ লাখ টাকা যারা হঠাৎ পায়, তারাই শুধু ওরকম ভাবে হাসতে পারে।

তুই বিশ্বাস কর, সুনীল, আমি আগে কোনওদিন লটারির টিকিট কাটিনি। দুটো টাকা দিয়ে টিকিট কাটার ক্ষমতাই আমার ছিল না। এবারে হল কি, আমাদের নিউ জলপাইগুড়িতে যে টিকিটের এজেন্ট ছিল, তার অসুখ হয়ে গেল। তার কাছে জমে আছে অনেক টিকিট। আমাকে সে বলল, তুই তো ট্রেনে কলম বেচিস, তার সঙ্গে ক'খানা টিকিটিও বিক্রি কর না। তাই শুরু করলুম। রাজস্থানের লটারির টিকিট নিয়েছিলুম কুড়িখানা, তার মধ্যে উনিশখানা বিক্রি হয়েছিল, একখানা বাকি ছিল। সেই টিকিটটাতেই ফার্স্ট প্রাইজ উঠল!

আমার চোখ দুটো বিস্ফারিত হতে দেখে কান্তি আমার কাঁধে চাপড় মেরে বলল, তুই যদি কোনও গল্পে এইরকম কথা লিখিস, তাহলে, পাঠকরা ভাববে গাঁজাখুরি। ভাববে না তাই? কিন্তু জীবনে এরকম কিছু অসম্ভব ব্যাপারও সম্ভব হয়।

সত্যি খুব খুশি হয়েছি রে, কান্তি! তুই জীবনে অকারণে অযথা অনেক কষ্ট পেয়েছিস! টাকাটা নিয়ে কী করবি? ব্যাবসা-ট্যাবসা?

মাথা খারাপ! পনেরো লাখ টাকা ব্যাঙ্কে ফিক্সড ডিপোজিট করে দিয়েছি। তার থেকে যা সুদ পাব, তাতেই রাজার হালে আমার বাকি জীবনটা চলে যাবে। বাকি টাকাটা দিয়ে কয়েকটা কাজ করব। সেই জন্যই তো তোকে নিয়ে যাচ্ছি।

তুই এখন কোথায় থাকছিস? কলকাতায়?

তোকে আসল কথাটাই এখনও বলা হয়নি।

কী রে?

আগে বলব না। চল, দেখে একেবারে চমকে যাবি।

তুই আমার ঠিকানা জানলি কোথা থেকে?

তোর এক প্রকাশককে ফোন করলুম। কলকাতায় এসেছি এক মাস আগেই, নানান কাজে তোর সঙ্গে আগে যোগাযোগ করতে পারিনি। কান্তির ড্রাইভার গাড়ি চালাচ্ছে নর্থ ক্যালকাটার দিকে। কান্তি কোনও নির্দেশ দিচ্ছে না। কোথায় যেতে হবে, ড্রাইভার তা জানে। কান্তির বুক পকেটে তিনটে কলম। হাতের ঘড়িটাও খুব নতুন ধরনের।

আমি কান্তির মুখের দিকে তাকাতেই কান্তি হেসে ফেলে বলল, আমি আর চেপে রাখতে পারছি না রে! নাঃ, বলেই ফেলি! কোথায় যাচ্ছি জানিস? মোহনবাগান লেনে। আমি আমার বাবার বাড়িটা কিনে নিয়েছি।

তাই নাকি?

টাকাটা পেয়েই প্রথমে আমার এই ইচ্ছেটাই মনে এসেছিল। বাড়িটা কিনতে খুব একটা অসুবিধে হল না। বড়মামা বুড়ো হয়ে গেছেন, সেই তেজ নেই। বাবলুটাও বেশি লেখাপড়া শেখেনি। জীবনে বিশেষ কিছু করতে পারেনি। কারখানাটা অনেক আগেই নষ্ট হয়ে গেছে। আমি গিয়ে বললুম, আমি আবার মামলা-মোকদ্দমা করে তোমাদের নাস্তানাবুদ করে দিতে পারি। এখন আমার টাকার জোর আছে। সেসব দিকে আমি যেতে চাই না। এই বাড়ির এখন যা বাজারদর, তার চেয়ে আমি দশ হাজার টাকা বেশি দেব, আমাকে বিক্রি করে দাও। এক কথায় রাজি হয়ে গেল। দলিল রেজিস্ট্রি হয়ে গেছে, আজ এখানে গৃহপ্রবেশ।

কত বছর বাদে রে, কান্তি? কত বছর বাদে তুই আবার নিজেদের বাড়িতে গিয়ে থাকবি?

ঠিক বত্রিশ বছর। তবে শুধু গৃহপ্রবেশই হবে। ও বাড়িতে আমি থাকব না। আমি প্ল্যান করে ফেলেছি, ও-বাড়িতে আমি একটা অনাথ আশ্রম বানাব। চিফ মিনিস্টার এসে উদ্বোধন করবেন। যে বাড়ি থেকে আমরা ভাই-বোনেরা একদিন কাঁদতে-কাঁদতে বেরিয়ে গেছিলুম, এখন থেকে সে বাড়িতে থাকবে নিরাশ্রয় ছেলেমেয়েরা। বাবলুকেও আমি তাড়িয়ে দিইনি। আমি বলেছি, সে ইচ্ছে করলে দু-খানা ঘর নিয়ে থাকতে পারে। ইচ্ছে করলে সে এই অনাথ আশ্রমের দেখাশুনোর ভার নিতে পারে। ঠিক করিনি রে সুনীল?

এর থেকে আর ভালো কিছু হতে পারে না।

শুধু দুটো দুঃখ রয়ে গেল! লেখাপড়া শিখতে পারিনি, তোদের চেয়ে কত মুখ্যু হয়ে রইলুম। এ বয়েসে কি আর নতুন করে শুরু করতে পারব?

কেন পারবি না? যে-কোনও বয়েসেই লেখাপড়া শুরু করা যায়। তোর তো ডিগ্রি দরকার নেই, নিজে-নিজে পড়বি!

কী জানি পারব কি না! আর-একটা দুঃখ এই যে, শান্তাকে আনিয়েছি, বীথি আর আমার বউ ছেলেমেয়েও এসেছে, শুধু মণিকাকেই পেলুম না। সে কোথায় হারিয়ে গেল!

গাড়িটা এসে থামল কান্তিদের সেই পুরোনো বাড়ির সামনে। আমি বহুদিন এ পাড়ায় আসিনি। পাড়াটা প্রায় একইরকম আছে। কান্তিদের বাড়িটা নতুন রং করা হয়েছে বোঝা যাচ্ছে। গেটের সামনে দুটো কলা গাছ আর ফুলের মালা। মাইকে শানাই বাজছে। দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছে কয়েকটি

কিশোরকিশোরী। ঠিক যেন বত্রিশ বছর আগের মতন। কান্তি আর তার বোনদের বদলে এখন ওখানে দাঁড়িয়ে আছে ওদের ছেলেমেয়েরা!

গেট পেরিয়ে আমরা বাগানটার মধ্যে দিয়ে হাঁটতে লাগলুম।

কান্তি বলল, বাগানটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। আবার গাছ পুঁততে হবে। আশ্রমের ছেলেমেয়েরা সেই গাছের যত্ন করবে। বীথি বলেছে, সে-ও এই আশ্রমেই থাকবে। ওই দ্যাখ ওপরের বারান্দায় বীথি দাঁড়িয়ে আছে, চিনতে পারিস?

ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখলুম, মুখে বসন্তের দাগওয়ালা এক মহিলা চেয়ে আছে আমাদের দিকে। বেশ বয়স্কা মনে হয়। বীথিকে যখন আমি দেখি, তখন তার বয়স ছিল সাত-আট বছর, তাকে আমি চিনব কী করে এত বছর বাদে।

বীথি লাজুকভাবে হেসে বলল, কেমন আছ, সুনীলদা! এই দিদি, দ্যাখ-দ্যাখ, সুনীলদা এসেছে—

এবারে বীথি পাশে এসে দাঁড়াল শান্তা। বয়েসের দাগ পড়লেও শান্তার মুখখানা প্রায় আগের মতনই আছে। তার স্বামী একজন নষ্ট চরিত্র কশাই হলেও সে শান্তার মুখের সারল্যটা নষ্ট করতে পারেনি।

শান্তা আমার মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। কোনও কথা বলল না। তারপর মুখটা ওপরে তুলতেই তার মুখে এক অদ্ভুত হাসি-কান্না ফুটে উঠল। সে চেঁচিয়ে বলে উঠল, দাদা, গেটের কাছে...কে এসেছে দেখো।

আমি আর কান্তি দুজনেই পেছন ফিরে তাকালুম।

গেটের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে একটি মেয়ে। খুব রোগা, ময়লা শাড়ি-পরা, অনেকটা পাগলিনীর মতন চেহারা। গেটের লোহায় সে আদর করে হাত বুলোচ্ছে।

কান্তি অস্ফুট স্বরে বলে উঠল, মণিকা!

তারপরই সে দৌড়ল!

এই পর্যন্তই থাক। পাঠক-পাঠিকারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে এই কাহিনির দ্বিতীয় অংশটা রূপকথাও নয়, বাস্তবও নয়। এটা একটা স্বপ্ন। দার্জিলিং মেলে ফেরার সময় আমি এই স্বপ্নটা দেখেছিলাম।

নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে কান্তি এখনও কলম-টর্চ লাইট ইত্যাদি বিক্রি করে কি না জানি না। অনেকদিন ওদিকে যাইনি। আশা করি, ওর জীবনে আর কোনও বিপদ ঘটেনি।

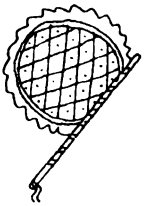

মর্মবেদনার ছবি

লেক মার্কেটে নাকি অন্য বাজারের চেয়ে ভালো মাছ পাওয়া যায়। যত সব বাজে কথা! এক-একজন আছে, নিজের পাড়াটাকে সব ব্যাপারে বড় করে দেখাতে চায়। মর্নিং ওয়াকের সময় রোজ-রোজ ধরণীধরের কাছে লেক মার্কেটের নানান গুণপনার কথা শুনে কিশোর আজ গিয়েছিলেন সেখানে। গিয়ে দেখেন কীসের কী। মাছের বদলে মাছির দৌরাত্মই বেশি। পড়ে আছে কিছু আড় মাছ আর বড়-বড় নোনাজলের ভেটকি, যার কোনও স্বাদ নেই। আর সব আধ পচা চুনো।

মনঃক্ষুন্নভাবে বাজার সারলেন কিশোর। এর মধ্যে অনেকবার ধরণীধরের মুণ্ডুপাত করা হয়ে গেছে। জগুবাবুর বাজার এর চেয়ে অনেক ভালো, সেখানে দোকানিরা সবাই চেনা, কেউ খারাপ জিনিস দেয় না। কিশোর ঠিক করে ফেলেছেন, আর কোনওদিন পরের কথায় নাচবেন না। জীবনের আর যে ক'টা দিন বাকি আছে, নতুন করে আর অচেনা লোকের সঙ্গে সম্পর্ক পাতাবার দরকার নেই। মানুষের জীবনের একটা সময়ে গণ্ডিটা ছোট হয়ে আসে, তখন অল্প কয়েকজনকে নিয়েই খুশি থাকতে হয়। যাক, এই একটা শিক্ষা হল আজ।

ফলের দোকানগুলোর পাশ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ একটা ঝুড়ির দিকে চোখ পড়ল। দোকানের বাইরে রাখা আছে ঝুড়িটা, তাতে ভরতি কামরাঙা ফল।

কিশোর থমকে দাঁড়ালেন। মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগলেন কামরাঙাগুলোকে। তারপর নীচু হয়ে একটা তুলে নিলেন হাতে। ঠান্ডা সবুজ রঙের কামরাঙা ছুঁয়ে তাঁর হাতের অদ্ভুত আরাম হল। সেই মুহূর্তে তিনি অনুভব করলেন যে ঠিক পঁয়ত্রিশ কিংবা তারও বেশি, বোধহয় চল্লিশ বছর বাদে তিনি কামরাঙা ফল হাতে ছুঁচ্ছেন। একটা চেনা জিনিস জীবনে এতদিন বাদ ছিল?

কোনওদিনই কিশোর কামরাঙা কেনেননি তাই দাম সম্পর্কে তাঁর কোনও ধারণা নেই। এ-দেশে কামরাঙা দুর্লভ জিনিস নিশ্চয়ই, নইলে এতদিন চোখে পড়েনি কেন?

—এগুলো কত করে?

দোকানদারটিও বেশ বয়স্ক। গোঁফটি পুরো পাকা। বেশ ভরাট মুখ। দৃষ্টিতে গাম্ভীর্য আছে।

—আশি পয়সা জোড়া। তিনটে এক টাকা।

কিশোর খুশি হলেন! বেশ সস্তাই বলতে হবে। পাঁচ টাকা জোড়া শুনলেও তিনি আশ্চর্য হতেন না। মনে-মনে হিসেব করে তিনি বললেন, আচ্ছা, তাহলে ন'টা দিন।

ন'টা শুনে দোকানদারটি বিস্মিতভাবে তাকালেন কিশোরের দিকে। তারপর কিছু যেন বুঝতে পেরে হাসলেন। কিশোরের সঙ্গে তার একটা সমমর্মিতা স্থাপিত হল। তিনি বললেন, ন্যান আপনে দশটাই ন্যান, তিন টাকা দেবেন।

বেশ মন দিয়ে বেছে-বেছে একটা-একটা তুলতে লাগলেন কিশোর। কয়েকটা আছে আধপাকা, কিন্তু সেই রং কিশোরের পছন্দ নয়। স্বচ্ছ সবুজ রংটাই চোখকে স্নিগ্ধ করে। পাকা কামরাঙা কিশোর কখনও দেখেছেন কি না ঠিক মনে করতে পারলেন না। এগুলো বেশ ভালো জাতের, পাঁচটা শিরাই বেশ উন্নত।

মায়ের ব্যাপারের দুঃখটা ভুলে গিয়ে তাঁর মন প্রফুল্ল হয়ে গেল। একটা নতুন জিনিস, বাড়ির সবাই অবাক হবে। ট্রাম ধরে তিনি চলে এলেন ভবানীপুরে।

ওপরের বারান্দা থেকে সুনন্দা তাঁকে দেখতে পেয়ে বললেন, দাঁড়াও কানাইকে পাঠাচ্ছি।

কিছুদিন আগে হৃৎপিণ্ডে একটা ছোট্ট খোঁচা লেগেছিল বলে ডাক্তার তাঁকে ভারি জিনিস বইতে বারণ করেছেন। কিন্তু কিশোর সবসময় সে নির্দেশ মানেন না। বাজার করা তাঁর বরাবরের অভ্যেস, এটা তিনি কিছুতেই ছাড়তে পারবেন না!

সুনন্দা কানাইকে সঙ্গে নিতে চান, তাও কিশোরের পছন্দ নয়। বাজারে তিনি নানারকম রঙ্গ রসিকতা করেন, চাকর সঙ্গে থাকলে কি তা চলে?

কানাই আসবার আগেই তিনি দুটো থলে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলেন।

রিটায়ার করার পর শরীরটা একটু ভাঙলেও মনের জোর আছে যথেষ্ট। তিনতলায় উঠতে একটু হাঁপ ধরে গেলেও সুনন্দার সামনে সেটা গোপন করে গেলেন।

সুনন্দার হাতে তোয়ালে, এক্ষুনি বাথরুমে ঢুকবেন। এটা কিশোরের পছন্দ নয়। কানাই রান্না করে, সেইসব জিনিস গুছিয়ে রাখে, তবু বাজার এলে বাড়ির গিন্নি একবার তা দেখবে না? সুনন্দার এসব ব্যাপারে আগ্রহই নেই। কিশোর যে কত খুঁজে-খুঁজে অসময়ের এঁচোড় কিংবা কাঁচা আম নিয়ে আসেন, সুনন্দা তা খেয়ালও করেন না। বাড়িতে কোনও গুণগ্রাহী না থাকলে বাজার করার আনন্দ নেই। কিশোরের মনে আছে, বাবা বাজার করে ফিরলেই মা সবকিছু ঢেলে ফেলতেন রান্নাঘরের সামনে, প্রত্যেকটি জিনিস সম্পর্কে মন্তব্য করতেন। বাবার ভুল ধরতেন। যেমন, পুঁইশাক আনলে কুমড়োও আনতে হয়, কই মাছের দিনে ফুলকপি না আনলে চলে না, শোল মাছের সঙ্গে মুলো চাই আর পাবদা মাছের সঙ্গে বড়ি।

বাথরুমের দিকে যেতে-যেতে একটা উড়ো দৃষ্টি দিয়ে সুনন্দা জিগ্যেস করলেন, ওগুলো কী?

কৃতার্থ হয়ে গিয়ে কিশোর এক গাল হেসে বললেন, কামরাঙা। তুমি চেনো না?

সুনন্দা বললেন, চিনব না কেন? কিন্তু অতগুলো...কী হবে ওগুলো দিয়ে?

—খাবে! সবাই মিলে খাবে। রেয়ার জিনিস। আচ্ছা তুমি মনে করে দ্যাখো, এই যে আমরা কতলোকের বাড়িতে যাই, কোনও দিন, কারুর বাড়িতে তুমি কামরাঙা খেতে দেখেছ? কেউ তোমায় অফার করেছে? তা হলেই বুঝতে পারছ, এরকম একটা ভালো জিনিস চট করে পাওয়া যায় না।

সুনন্দা প্রশ্রয়ের হাসি হাসলেন।

মা-বাবা শখ করে এঁর নাম দিয়েছিলেন কিশোর। তখন খেয়াল করেননি, তাঁদের ছেলে একদিন প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ হবে, তখন এই নামটা কত বেমানান হবে। অবশ্য এই প্রসঙ্গ উঠলেই কিশোর বলেন, কেন, বোম্বাই ফিল্মে এই নামে আমার চেয়েও অনেক বুড়ো-বুড়ো লোক আছে।

বয়েস প্রায় বাষট্টি হলেও কিশোরের মনের মধ্যে একটা ছেলেমানুষির ভাব রয়ে গেছে এখনও। নানান ছোটখাটো জিনিস থেকে আনন্দ পান। এক-একদিন এক-একটা অদ্ভুত জিনিস এনে মহা উৎসাহ দেখান, যেমন একদিন নিয়ে এলেন ঢেঁকির শাক, খুবই নাকি অপূর্ব ব্যাপার। কিন্তু কিশোর ছাড়া সেই শাক আর কেউ খেতে চায়নি।

কামরাঙার ব্যাপারেও প্রায় তাই হল।

দুই মেয়ে মিলি আর জুলি, একজনের বয়েস তেইশ, অন্যজনের বয়েস একুশ। ওরা কেউ বাড়িতে শাড়ি পরে না, অন্তত সকালের দিকটা ঢোলা হাউস কোট পরেই কাটিয়ে দেয়।

পড়ার ঘর থেকে দুই মেয়েকে ডেকে আনলেন কিশোর। বেছে-বেছে সব চেয়ে বড় দুটি কামরাঙা তাদের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, দ্যাখ, খেয়ে দ্যাখ, কোনওদিন তো খাসনি।

দুজনেই গভীর সন্দেহের চোখে ফল দুটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল।

জুলি বলল, এটা কী?

কিশোর রহস্য করে বললেন, কী বল তো? কখনও দেখিসনি তো?

মিলি বলল, আমি দেখেছি। একবার শান্তিনিকেতনে একটা বাড়িতে ছিল। কামরাঙা না কী যেন নাম?

কিশোর একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়ে বললেন, শান্তিনিকেতন? সেখানে পাওয়া যায়? আশ্চর্য! এসব আমাদের পূর্ববঙ্গের ফল, আমরা ছেলেবেলায় কত—

—এখন খেতে ইচ্ছে করছে না, বাবা।

—খেয়ে দ্যাখ না! খেয়ে দ্যাখ না! একটা ফল খাবি...

—একটু আগে চা খেয়েছি!

—তাতে কী হয়েছে? চা খাওয়ার পর অন্য কিছু খেতে নেই?

—পরে খাব। বিকেলে খাব।

দুই বোনের মধ্যে ছোট বোনের ব্যক্তিত্ব বেশি। সে কাঙরাঙাটা রেখে দিল ফ্রিজের মাথায় বেতের ঝুড়িতে। মিলি এখনও সেটা হাতে ধরে আছে।

কিশোর ভাবলেন, শহরে মানুষ হওয়ার এই দোষ। কোনও নতুন জিনিস খেতে চায় না, খাবার নিয়ে পরীক্ষা করতেও চায় না। ধরা-বাঁধা কয়েকটা জিনিস খেয়ে গেলেই হল। গ্রামে যারা মানুষ হয়, তারা নিত্য নতুন কত কিছু আবিষ্কার করে। কতরকম ফল তিনি খেয়েছেন ছেলেবেলায়। ডউয়া বলে একটা ফলের কথা তিনি কারুকে বোঝাতেই পারেননি! কেউ-কেউ ডউয়া দেখেনি, নামও শোনেনি। এখানকার বাজারে ওঠেই না। অথচ কী চমৎকার স্বাদ ডউয়ার। শহরের ছেলে-মেয়েরা আপেল খায়, আর আপেল জিনিসটা কিশোরের অখাদ্য লাগে। ঠিক মনে হয় রুগির পথ্য।

তিনি ক্ষীণ অভিমানের সুরে বললেন, খাবি না?

মিলি তার বাবার এই অভিমানটুকুর মূল্য দেয়। সে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, আচ্ছা, আমি খাচ্ছি। একটা কামড় দিয়েই সে বলল, ও মা গো! ভীষণ টক।

কিশোর বললেন, টক তো হবেই। কামরাঙা টক হবে না? তবে কীরকম অন্যরকম টক সেটা বল? কাঁচা আম কিংবা তেঁতুল কিংবা পাতিলেবু কিংবা চালতা—কোনও কিছুর সঙ্গেই মিল নেই। কামরাঙার টক স্বাদটা একেবারে নিজস্ব। সেইটাই তো এর মজা। এই দ্যাখ, আমি খাচ্ছি।

কিশোর একটা কামরাঙাকে ঠিক মাউথ অর্গানের মতন মুখের সামনে ধরে সযত্নে একটি কামড় বসালেন।

মিলি বলল, না, বাবা, তুমি খাবে না। তোমার না অ্যাসিডিটি। এত টক খেলে—

কিশোর বললেন, কিচ্ছু হবে না। ফেভারিট জিনিস খেলে কখনও শরীর খারাপ হয় না।

—কামরাঙা তোমার ফেভারিট। আগে কোনওদিন খেতে দেখিনি তো।

—তোদের জন্মের আগে...

ছোট ছেলে বাবুসোনা ছাদে খেলছিল। এই সময় নীচে এল সে জল খেতে। কিশোর খুব আগ্রহের সঙ্গে বললেন, এই, তুই খাবি। এই দ্যাখ কামরাঙা, কোনওদিন খাসনি, খেয়ে দ্যাখ—

বাবা ও দিদিদের পারিবারিক দৃশ্যটি বাবুসোনা এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল, কারণ, তার হাতে এখন একটুও সময় নেই।

তবু বাবার কথা শুনে সে সবুজ রঙের পাঁচ কোনা জিনিসটা হাতে নিয়ে কিছুই না দেখে ঘ্যাঁক করে এক কামড় দিল। সঙ্গে-সঙ্গে মুখটা কুঁচকে বলল, এঃ, বাজে!

কামরাঙাটা সে ছুড়ে ফেলে দিতে যাচ্ছিল, কিশোর দুহাত তুলে বললেন, ফেলবি না, ফেলবি না, আমাকে দে। একটি বিস্মিত দৃষ্টি সমেত এঁটো ফলটি বাবার দিকে ছুড়ে দিয়ে আবার দৌড়ে চলে গেল বাবুসোনা।

মিলি বলল, বাবা তোমার এ জিনিস চলবে না।

এরই মধ্যে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসেছেন সুনন্দা। তিনি স্বামীর প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে মেয়েদের বললেন, তোরা ওগুলো নষ্ট করিস না, রেখে দে। কানাইকে বলব চাটনি করে দিতে। কিশোর প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন, চাটনি। কক্ষনো না।

সুনন্দা বললেন, কেন?

—কামরাঙা কক্ষনো রান্না করতে নেই।

—রান্না করতে নেই, তার মানে?

—অনেক ফল আছে, যা রান্না করা চলে না। যেমন আমলকি, পেয়ারা, বেল, কামরাঙা...

সুনন্দা বললেন, কেন, বেলের মোরব্বা হয় না?

মিলি বলল, পেয়ারার জেলি হয়।

কিশোর বিরক্তভাবে বললেন, ওসব এদেশে হয়—

সুনন্দা বললেন, তোমার বাঙাল দেশের কথা ছাড়ো তো। টক জিনিস দিয়ে ভালো চাটনি হবে।

কিশোর দুঃখ পেলেন। তিনি কোনওদিন কামরাঙার চাটনি খাননি। আর খেতেও চান না। নিজের হাতের কামরাঙাটা তিনি খেতে-খেতে, আর একটিও কথা না বলে বারান্দার দিকে চলে গেলেন।

এত টক জিনিস তিনি আর খেতে পারেন না, লেবুর রস খেলেও পেট জ্বালা করে, তবু তিনি কামরাঙাটা ফেলবেন না, যেমন করেই হোক শেষ করবেনই।

এখন বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে তাঁর প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে কাগজ পড়ার সময়।

তিনখানা কাগজ তন্নতন্ন করে পড়া চাই। যত রোদ বাড়বে, তত চেয়ারটা টেনে-টেনে সরিয়ে নিতে হবে ছায়ায়!

একটু নুন পেলে ভালো হত, কিন্তু নুন চাওয়া মানেই পরাজয়। আশ্চর্য, আজকাল অল্পবয়সি ছেলেমেয়েরা টক খেতে ভালোবাসে না। অথচ তাঁদের ছেলেবেলায় টক জিনিসগুলোই ছিল ছোটদের সবচেয়ে প্রিয়। নুন দিয়ে কাঁচা আম মেখে খাওয়া, তারপর চালতা, করমচা, দিশি আমড়া, কাঁচা তেঁতুল...

টুসটুসে কামরাঙার রস গড়িয়ে পড়ল তাঁর জামায়। পাঁচটা দিক খাওয়া হয়ে যাওয়ার পর মাঝখানটা চুষলেন খানিকক্ষণ, তারপর ভেজা হাতটাও তিনি পরম সন্তোষে তাঁর ধুতিতে মুছলেন।

তারপর চোখের সামনে লম্বা করে মেলে ধরলেন ইংরিজি কাগজটা। হেড লাইন কয়েকটা দেখতে-না-দেখতেই তাঁর মন উধাও হয়ে গেল। তিনি আর অক্ষর দেখছেন না। তিনি সবুজ রঙের ছবি দেখছেন।

দুটো গাছ ছিল। বেশি বড় নয়, তবে অনেক ডালপালা, পাতাগুলো মিহিন। কামরাঙা ফুল কীরকম যেন হয়? মনে পড়ছে না! আশ্চর্য, কেন মনে পড়ছে না। সাদা নয়? করমচার ফুল শাদা, আমড়ার সাদা—।

একটা গাছ ছিল দত্ত বাড়ির পেছনে, আর-একটা ওদেরই পুকুরে যাওয়ার পথে। কিশোর দ্বিতীয় গাছটির পাশে এসে দাঁড়ালেন। স্পষ্ট মনে আছে তিনি এই গাছটার ওপরের ডালগুলোর নাগাল পেতেন না। লাফিয়ে-লাফিয়ে ফল পাড়তে হত। কিন্তু এখন তিনি নাগাল পাচ্ছেন, তাঁর বাষট্টি বছরের শরীরটি ওই গাছটার প্রায় সমান।

কিন্তু এরকম হচ্ছে কেন? তাঁর সেই ছেলেবেলার চেহারাটা কোথায়? সতেরো-আঠারো বছর বয়েস, কীরকম দেখতে ছিলেন তিনি তখন? কই মনে পড়ছে না তো।

পুকুর ধার থেকে হেঁটে আসছেন বেণুদি। বাইশ-তেইশ বছর বয়েস, ঠিক সেদিনকার চেহারা। বেণুদির এক মাথা চুল, দুর্গা ঠাকুরের মতন মুখ-চোখ দুটিতে সবসময় অবাক-অবাক ভাব। কামরাঙা

গাছটার পাশে একজন বৃদ্ধকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বেণুদি মুখটা নীচু করে চলে গেলেন। তাঁর দু-হাতে এক গাদা ভিজে কাপড়।

প্রায় হাহাকার গলায় কিশোর বললেন, বেণুদি, বেণুদি, আমায় চিনতে পারছেন না? আমি কিশোর? আমি চ্যাটার্জিদের বাড়ির কিশোর!

বেণুদি শুনলেন না, মুখও ফেরালেন না।

একটা শব্দ পেয়ে কিশোর মুখের সামনে থেকে খবরের কাগজটা সরালেন। তাঁর বড় মেয়ে মিলি।

কিশোর মনে-মনে হিসেব করে দেখলেন, সেই সময়ে, প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর আগে, বেণুদিও তো মিলির বয়েসিই ছিল। অথচ, মিলি তো একটা বাচ্চা মেয়ে, হাবভাবে কত ছেলেমানুষ, কিন্তু বেণুদিকে কত বড় মনে হত। চেহারায়, ব্যবহারে পরিপূর্ণ এক নারী। তিনি মিলির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন।

মিলি এসব লক্ষ্য করল না, সে রেলিং দিয়ে উঁকি মেরে কী যেন দেখতে লাগল।

কাগজের দিকে চোখ ফিরিয়েও কিশোর আর সেই কামরাঙা গাছটার ছবি ফিরিয়ে আনতে পারলেন না। মিলির উপস্থিতির জন্যই এরকম হচ্ছে? নিজের ছেলেমেয়ের কাছে নিজেকে সবসময় বয়স্ক বাবা মনে হয়। যদিও একথা স্বীকার করতে নিজের কাছে অন্তত বাধ্য যে, মিলির বয়সি অন্য কোনও মেয়ে দেখলে তিনি বেশ একটা সুখের উত্তেজনা বোধ করেন।

বেণুদি তাঁর চেয়ে বয়েসে চার পাঁচ বছরের বড় ছিলেন। গ্রামে ওই বয়সি সব মেয়েরই বিয়ে হয়ে যায়, বেণুদির হয়নি। কেউ-কেউ যেন বলত, অল্প বয়েসেই বেণুদির এক জায়গায় বিয়ের সব ঠিকঠাক হওয়ার পর ভেঙে গিয়েছিল। বেণুদির ছোট বোন রেণু, কিশোরের চেয়ে এক বছরের ছোট, কিন্তু সেই রেণুর কথা মনে নেই। বেণুদিকে দেখলেই কিশোর যখন সত্যিকারের কিশোর ছিলেন, তখন বুক কাঁপত।

—কী দেখছিস রে মিলি?

—সুরঞ্জন আসবে বলেছিল ন'টার সময়। এখনও এল না। মহা ক্যাবলা ছেলে। কিছুতেই কথার ঠিক রাখতে পারে না।

—সুরঞ্জন কি তোর বন্ধু? আমি তো ভেবেছিলুম জুলির।

—জুলিরও বন্ধু না, আমারও বন্ধু না। সুরঞ্জন হল আমাদের জিপ গাড়ি! যখন ইচ্ছে ওকে নিয়ে যেখানে খুশি যাওয়া যায়।

—কী অদ্ভুত কথা তোদের।

—তোমরা এসব বুঝবে না।

—কেন বুঝব না রে?

—তোমাদের আমলে তো ছেলেমেয়েদের মেলামেশাই ছিল না। ওই যে, সুরঞ্জন এসে গেছে—

কিশোরকে প্রতিবাদ করার সুযোগ না দিয়েই মিলি ছুটে চলে গেল।

কিশোর মনে মনে বললেন, তোরা কি আমাদের গত শতাব্দীর মানুষ ভাবিস। কে বললে মেলামেশা ছিল না? আমাদের পূর্ব বাংলার গ্রামে...কই পথে দাঁড়িয়েও মেয়েদের সঙ্গে কথা বলার বাধা ছিল না তো? মেয়েরাও বন্দি থাকত না ঘরের মধ্যে। এ-বাড়ি ও-বাড়ি যাতায়াত করত। ওরে মিলি, তোরা কি বুঝবি, তখন অনেক ভালো ব্যাপার ছিল, গ্রামের প্রত্যেকটি সুন্দরী মেয়েরই একজন-দুজন প্রেমিক থাকত, জাতের মিল না হলে বিয়ে হতে পারত না বটে, কিন্তু প্রেম কি কেউ আটকাতে পারত? প্রেমের পর বিরহ আর সারাজীবন তার মধুর স্মৃতি।

হ্যাঁ, আমারও ছিল একজন প্রেমিকা, চৌধুরীদের বাড়ির মাধুরী। এখন সে লক্ষ্ণৌতে থাকে। তোরা দেখিসনি তো তাকে, তোদের মায়ের চেয়েও অনেক সুন্দরী।

কিশোর এবারে দেখতে পেলেন চৌধুরী বাড়িটি। পাকা বাড়ি, দোতলা। তাদের গ্রামের সবচেয়ে ঝকঝকে বাড়ি। ডান পাশের দিঘিটি পদ্মপাতায় ভরা! সেই দিঘির ঘাটলায় পা ঝুলিয়ে বসে আছে তিনটি ছেয়েমেয়ে। তার মধ্যে গোলাপি রিবন বাঁধাটিই মাধুরী না? কত বয়েস, বড় জোর ন'দশ? এর থেকে অনেক বড় বয়েসেও তো মাধুরীকে দেখেছেন কিশোর। মাধুরীর সেই চেহারা কোথায়?

চৌধুরীদের বাড়ির প্রতিটি ঘর মনে আছে কিশোরের। কিন্তু কোনও ঘরেই তিনি বড় বয়েসের মাধুরীকে খুঁজে পাচ্ছেন না। এ যেন ফ্রেমটি রয়েছে অটুট, ভেতরে ছবিটি নেই। এ তো বড় অস্বস্তি।

সিনেমার দৃশ্যান্তরের মতন আবার কামরাঙা গাছটির ছবি ফিরে এল। পুকুর ঘাট থেকে আসছেন বেণুদি। একেবারে পরিষ্কার, জীবন্ত। ভিজে কাপড়ে তাঁর শরীরের প্রত্যেকটি রেখা স্পষ্ট, ঠিক যেন কুমোরের তৈরি নিখুঁত কোনও মূর্তি, দেখলে এখনও মাথা ঘুরে যায়।

—বেণুদি, বেণুদি, চিনতে পারছেন না, আমি কিশোর?

পাশেই একটা সুপুরি গাছ, তার আড়ালে নিজেকে ঢাকা দিয়ে বেণুদি থমকে দাঁড়ালেন, তারপর কিশোরের দিকে পূর্ণ দৃষ্টি মেলে দেখে নিয়ে বললেন, কে, ধীরেনকাকা? আপনি এখানে?

ছবিটা আবার খবরের কাগজ হয়ে গেল। কিশোরের বুকে কেউ যেন আঘাত করেছে। বেণুদি চিনতে পারলেন না। বেণুদি তাঁকে ধীরেনকাকা ভাবলেন? ধীরেন তো ছিলেন কিশোরের জ্যাঠামশাই, কত বছর আগে মারা গেছেন। কিশোরকে কি ধীরেন জ্যাঠামশাইয়ের মতন দেখতে হয়েছে এখন? আগে কেউ বলেনি তো এরকম কথা।

ধীরেন জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে বেণুদির বাবার কী যেন একটা ঝগড়া ছিল। তাই তিনি ও বাড়িতে যেতেন না। সেইজন্য বেণুদি অবাক হয়েছেন।

কাগজটা হাত থেকে পড়ে গেল কিশোরের। তিনি অন্য একটা কাগজ তুলে নিলেন। নিজের সতেরো-আঠারো বছরের চেহারাটা দেখতে পাচ্ছেন না বলে মন খারাপ লাগছে। পুরোনো স্মৃতিতে ঘুরে বেড়ানোর মধ্যে একটা মাদকতা আছে, কিন্তু সেখানে তাঁর এই বুড়ো বয়েসের শরীরটা নিয়ে উপস্থিত হচ্ছে কেন?

মিলি এসে জিগ্যেস করল, বাবা, তুমি চা খাবে?

কিশোর মুখ না ফিরিয়েই বলল, হঠাৎ এত দয়া?

—সুরঞ্জন চা খেতে চাইছে। মায়ের এখন ইস্কুলে যাওয়ার তাড়া, চা করতে বললেই কানাই চ্যাঁচাবে। তবু তোমার নাম করলে যদি দেয়।

—বেশ, তাহলে বলো আমার নাম করে।

—থ্যাঙ্ক ইউ। থ্যাঙ্ক ইউ, বাবা।

—শোন মিলি, সুরঞ্জন যদি তোদের জিপ গাড়ি হয়, তাহলে আমি তোদের কী হলুম রে।

—তুমি হচ্ছো তোমাদের গুড ওল্ড ম্যান, তোমার সঙ্গে কার তুলনা।

—সবসময় বুড়ো-বুড়ো করিস, জানিস বাষট্টি বছর বয়েসে অনেকে নতুন করে...

—ওল্ড ম্যান মানে বুড়ো নাকি? ওল্ড ম্যান মানে বাবা। কে তোমায় বুড়ো বলেছে? দেবানন্দ আর তুমি সমান বয়েসি।

কিশোর আবার ঝিম মেরে বসে রইলেন, কিন্তু কোনও ছবি ফিরে এল না।

একটু পরেই সুনন্দা সেজেগুজে এসে বললেন, আমি চললুম। তুমি দুপুরে কোথাও বেরুবে না তো।

কিশোর দুদিকে মাথা নাড়ালেন। এই সময় সুনন্দাকে বেশ কম বয়সী দেখায়। কিশোর রিটায়ার করে গেলেও সুনন্দার এখনও পাঁচ বছরের চাকরি আছে স্কুলে। খুব যে একটা দরকার আছে তা নয়। তবু সুনন্দা চাকরি করতে ভালোবাসে। সুনন্দাকে খানিকটা হিংসে করেন তিনি এজন্য।

পূর্ব বাংলার সেই গ্রাম থেকে কিশোর কত দূরে চলে এসেছেন। যেন অন্যগ্রহে। মাস্টারের বাড়ির ছেলে, তাই অভাব অনটন কম দেখেননি। শৈশবের কত সাধ অতৃপ্ত থেকে গেছে। মা কত পুড়িয়ে-পুড়িয়ে কথা শুনিয়েছেন বাবাকে।

শেষ বয়েসে বাবা-মাকে খানিকটা সুখের মুখ দেখিয়েছেন কিশোর। প্রথমে বেহালায় বাড়ি, তারপর সেটা বিক্রি করে ভবানীপুরে বড় রাস্তার ওপর এই বাড়িটা কিনেছেন। তা ছাড়া ঘাটশিলায় একটা বাড়ি আছে, বিবেকানন্দ রোডে একটা ওষুধের দোকান। এজন্য অবশ্য কিশোরকে খাটতে হয়েছে অনেক। যৌবনের মাঝামাঝি থেকে হঠাৎ হুস করে এতগুলো বছর কী করে যে কেটে গেল। বড্ড তাড়াতাড়ি চলে গেছে, কিশোরের খেয়ালই হয়নি এতদিন...

কামরাঙা খেলেই জ্বর হত। একটা তো নয়। এর সঙ্গে তিনটে, চারটে, পাঁচটা। কচু পাতায় খানিকটা নুন আর কয়েকটা কাঁচালঙ্কা নিয়ে এসে পুকুর ধারে বসে-বসে খাওয়া। পরদিনই জ্বর। সত্যি কি কামরাঙা খাওয়ার সঙ্গে ওই জ্বরের কোনও সম্পর্ক ছিল? মা বারণ করতেন, জ্বর হলেই বলতেন, আবার দত্তদের বাড়ি থেকে চুরি করে কামরাঙা খেয়েছিস?

কামরাঙা, কী সুন্দর না। অবশ্য কেন ওই নাম তা কে জানে। এ ফল তো কোনওদিন লাল হয় না। অবশ্য রাঙা মানে লালই হবে কেন, যে-কোনও রং। কামরাঙার পাতলা সবুজ রংটা কিশোরকে বারবরই মুগ্ধ করেছে। পাতার আড়ালে লুকিয়ে থাকে ফলগুলো, হঠাৎ একটা পেয়ে গেলে...যেগুলো উঁচু ডালের সেগুলো লাফিয়ে-লাফিয়ে...

বেণুদি একটা আঁকশি নিয়ে এসে বলেছিলেন, ওরে, গাছটা ভেঙে ফেলবি নাকি? ক'টা চাস বল, আমি পেড়ে দিচ্ছি।

শুধু বেণুদিকেই দেখা যাচ্ছে, কিশোরকে নয়। গাছ কোমর বাঁধা শাড়ির আঁচল। পিঠের ওপর খোলা চুল, বেণুদি আঁকশি দিয়ে কামরাঙা পাড়ছেন। সেই বয়েসটায় পুরুষের চোখ অসম্ভব মাংস লোভী হয়, তাই বেণুদির শরীরের বিশেষ-বিশেষ অংশই শুধু ঝলসে উঠছে, গাছ থেকে ফল-পাড়া নয়, যেন একটা নাচ, কিশোর দেখছে, চারদিকের নানা রকমের সবুজের মধ্যে এক গৌরবর্ণ মাংস প্রতিমা, আকাশটা নীচু হয়ে এসেছে চাঁদোয়ার মতন, একটু কুবো পাখি ডাকছে অবিশ্রাম সুরে, বেণুদির পায়ের ছন্দের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে এই ডাক। হীরের গয়নার মতন এত উজ্জ্বল হয় স্মৃতির ছবি?

আজ কামরাঙা কিনে এনেছেন বলেই যে কিশোরের মনে পড়ছে বেণুদির কথা, তা নয়। বেণুদির মুখ তাঁর জীবনে বরাবরই ফিরে-ফিরে এসেছে। যেন বেণুদিকে ঘিরে তাঁর মধ্যে রয়েছে এক গভীর মর্মবেদনা। অথচ, বেণুদির সঙ্গে সেরকম তো সম্পর্ক কিছু ছিল না। পাড়ার আর পাঁচটা কমবয়েসি ছেলের চেয়ে কিশোরকে তিনি কখনও আলাদাভাবে দেখেননি। সেরকম মনোযোগই দেননি।

একদিন, কিংবা হয়তো কয়েকদিন হবে, বেণুদির সঙ্গে প্রতাপদাকে দেখেছিলেন কিশোর। ধুতির ওপর ঢোলা পাঞ্জাবি পরা, তার বুকের বাঁ-দিকে বোতাম, সবাই বলত প্রতাপকে প্রমথেশ বড়ুয়ার মতন দেখতে। সেই প্রতাপদা বেণুদির কাছ থেকে আঁকশিটা নিয়ে বলেছিলেন, দাও, আমি পেড়ে দিচ্ছি। একটা মাত্র ফল পেড়ে, সেটা কিশোরের দিকে ছুড়ে দিয়ে প্রতাপদা বলেছিলেন, এই নে। এখন যা পালা।

কী সাংঘাতিক অপমান লেগেছিল সেই কথাটায়। এখনও যেন কানে ঝনঝন করে বাজে। কামরাঙা, ফল পেকে-পেকে গাছের নীচে পড়ে যায়। পাড়ার ছেলেরা যার যখন ইচ্ছে পেড়ে নিয়ে যায়, কেউ আপত্তি করে না সেই ফল একটা মাত্র দিয়ে একটি সতেরো বছরের ছেলেকে অবহেলার সঙ্গে বিদায় করে দেওয়া! আশ্চর্য, বেণুদিও কোনও প্রতিবাদ করেননি তখন। বরং, খানিকবাদে, পুকুর ধারে মুখ গোঁজ করে বসে থাকার সময় কিশোর শুনতে পেয়েছিলেন বেণুদি আর প্রতাপদার

সম্মিলিত হাসি।

বাষট্টি বছর বয়েসেও এই কথা মনে পড়ায় কিশোরের শরীরের প্রতিটি রোমকূপ যেন সচকিত হয়ে উঠল। প্রতাপদাকে হাতের কাছে পেলে যেন তিনি এই মুহূর্তে তাঁর গলা চেপে ধরতে পারেন।

তার পরেই তিনি অবাক হলেন। প্রতাপদার ওপরে এখনও এত রাগ রয়ে গেছে কেন? প্রতাপদাকে তিনি আর বেশি দেখেননি, দিল্লি না কানপুর কোথায় যেন চলে গিয়েছিলেন তিনি। বেণুদিকে তিনি বিয়ে করেননি। কিশোরও তার পরের বছরই গ্রাম ছেড়ে চলে আসেন।

মিলি চা দিয়ে বলল, বাবা, আমি আর জুলি একটু বেরুব সুরঞ্জনের সঙ্গে।

—নিশ্চয়ই ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে যাবি!

—কী করে বুঝলে?

—ওই জায়গাটার নাম বলাই তো সবচেয়ে সুবিধে, তাই না?

—মোটেই না। আমরা যাচ্ছি অনাময়দার বাড়ি।

—সে আবার কে?

—ও একটা স্কাউন্ড্রেল। ওকে তোমার না চিনলেও চলবে।

—তা একটা স্কাউন্ড্রেলের বাড়িতে যাওয়া হচ্ছে কেন দল বেঁধে?

—অনাময়দা আমার বন্ধু ভাস্বতীর সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছে। ভাস্বতী বেচারা আর লজ্জায় বাড়ি থেকে বেরুতেই পারে না।

—তা সেখানে গিয়ে কি মারামারি হবে নাকি?

—দরকার হলে মারতেই পারি। সেই জন্যই তো সুরঞ্জনটাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি।

—থানা পুলিশ পর্যন্ত গড়াবে না তো? দেখিস।

—না, না, সেসব কিছু নয়। স্রেফ ভয় দেখাব। ওর নামে বিজ্ঞাপন দেব। তুমি আবার বসে-বসে চিন্তা করতে যেও না যেন আমাদের জন্য।

কিশোর প্রসন্নভাবে হাসলেন। ছেলেমেয়েদের কোনও গতিবিধিতেই বাধার সৃষ্টি করেন না তিনি। ওদের সঙ্গে ইয়ার্কি ঠাট্টা হয়। তার সুফল এই যে ওরা কখনও মিথ্যে কথা বলে না তাঁর কাছে। সত্যি কথার সৌরভই আলাদা। শুনলেই মন ভালো হয়ে যায়।

সুরঞ্জন ছেলেটা লেখাপড়ায় ভালো, অথচ জুলি মিলি তাকে মনে করে জিপ গাড়ি। এরা দল মিলে যাচ্ছে এদের একজন বান্ধবীর পক্ষ নিয়ে অন্য একজনের সঙ্গে ঝাগড়া করতে। এদের ধরন-ধারনই আলাদা।

হঠাৎ কিশোর ভাবলেন, এই যে মিলি, জুলি, সুরঞ্জন, ভাস্বতী আর অনাময়, এরা কি কেউ কারুকে ঈর্ষা করে? দেখলে তো বোঝা যায় না। একালের ছেলেমেয়েরা বুঝি ঈর্ষা ভুলে গেছে।

নারীদের ব্যাপারে কিশোরের মনে সেরকম কোনও গুপ্ত অতৃপ্তি নেই। কাজের খাতিরে তাকে বহু জায়গায় ঘুরতে হয়েছে। নিজের স্ত্রী ছাড়াও অন্যান্য কয়েক নারীদের সঙ্গে তাঁর কিছুটা সম্পর্ক হয়েছে কোনও-কোনও সময়ে। সুনন্দার সঙ্গে বিয়ের আগে অন্তত আরও দুজনকে চেয়েছিলেন। আর তাঁর প্রথম প্রেমিকা, সেই চৌধুরীদের বাড়ির মাধুরী, বেশ একটা মধুর বাল্যপ্রেম জমেছিল তার সঙ্গে।

কিন্তু সেই মাধুরীর মুখখানাও ঠিক মনে পড়ে না। অন্য মেয়েদেরও তেমন করে মনে রাখেননি কারুকে। প্রথম যৌবনের সঙ্গীদের অনেকের নাম বা চেহারা অনেক কষ্ট করে স্মৃতিতে আনতে নিজের চেহারাটাই মনে নেই।

কিন্তু বেণুদি প্রতাপদা বেণুদির হাত থেকে প্রতাপদা সেই আঁকশি নিয়ে নেওয়ার ছবি তার স্মৃতিতে যেন আগুনে ঝলসানো উল্কির মতন দগদগ করে সেই প্রথম অপমান, সেই

প্রথম তীব্র ঈর্ষা, তা কিছুতে ভোলা যায় না।

পুকুরধারের পায়ে চলা রাস্তাটাতে কাঁচা-পাকা চুলের প্রৌঢ় মানুষটি দাঁড়িয়ে কাকুতি-মিনতি ভরা গলায় বলতে লাগলেন, বেণুদি, একবার আমার দিকে তাকাও, একবার আঁকশি-ধরা হাতখানি উঁচু করো, কুবো পাখিটার ডাকের ছন্দে তোমার পা উঠুক নামুক, শুধু আমার জন্য। এখন তো প্রতাপদা কাছে নেই!



মিট্টাগড়ের রহস্যময়ী

ঘটনাটা আমাদের শুনিয়েছিলেন পূর্ণিয়ার ভাট্টাবাজারে একটা হোটেলের কামরায় বসে বনবিহারীলাল পাণ্ডেজি। আমি আর আমার বন্ধু দেবরাজ তখন পুরোনো, দুষ্প্রাপ্য বইয়ের সন্ধানে বিভিন্ন মফস্‌সল শহরে ঘুরে বেড়াতুম। জমিদার-তন্ত্রের তখন শেষ দশা। অনেক অভিজাত, বনেদি জমিদারবাড়ি ভেঙে পড়েছে। তা পড়ুক, তা নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা ছিল না।

কিন্তু ওইসব বাড়ির লাইব্রেরিতে অনেক দামি-দামি দুর্লভ বই অবহেলায় পড়ে নষ্ট হচ্ছিল। সেইসব বইয়ের পড়ুয়া তো কেউ ছিলই না, শরিকদের মধ্যে মামলা-মোকদ্দমার কারণে বইগুলি বিক্রি করার অধিকারও কারুর ছিল না। বইগুলি নষ্ট হতে দেওয়ারও কোনও মানে হয় না। আমরা ছলে-বলে-কৌশলে যে-কোনও ভাবেই হোক সেইসব বই সংগ্রহ করে আনতুম।

পূর্ণিয়া গিয়েছিলুম সেই উদ্দেশ্যেই।

এই কাজে বেশ ধৈর্য লাগে। নতুন জায়গায় গিয়ে প্রথম দু-তিনদিন চুপচাপ বসে থেকে পরিবেশটা বুঝে নিতে হয়। স্থানীয় লোকজনদের কাছ থেকে জমিদার বাড়ির বর্তমান উত্তরাধিকারীদের সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে হয় যতদূর সম্ভব। এই ব্যাপারে কয়েক জায়গায় আমাদের বেশ মজার অভিজ্ঞতাও হয়েছে। জমিদারদের অনেককেই রাজা বলা হত। এমনও হয়েছে, আমরা কোনও জমিদারি এস্টেটে গিয়ে দেখছি যে, বর্তমান বংশধররা এমনই গরিব হয়ে গেছে যে রাজামশাই সাইকেলে চেপে সদর কোর্টে মামলা লড়তে যান।

পূর্ণিয়াতে এসে আমরা একটা হোটেলে উঠেছিলুম। এই অঞ্চলে একটি জমিদারবাড়িতে যে অনেকগুলি ভালো-ভালো বই আছে সে ব্যাপারে পাকা খবর আমরা নিতে এসেছি। বর্তমান জমিদার-বংশের অনেক শাখাপ্রশাখা। ঠিক কোন পথ ধরে আমরা অন্দরমহলে ঢুকব সেই ব্যাপারে জল্পনা-কল্পনা করছিলুম।

আমাদের হোটেলের পাশের ঘরেই ছিলেন বনবিহারীলাল।

পূর্ণিয়া শহরে আমাদের কেউ চেনে না। সারাদিন এদিক-সেদিক ঘোরাঘুরি করলেও সন্ধের পর আর কিছু করার নেই। দেবরাজ হোটেলের ম্যানেজারের সঙ্গে গল্প করছিল। এদিকের অনেকেই খানিকটা বাংলা বোঝে। অথবা আমাদের ভাঙা-ভাঙা হিন্দিতে কাজ চলে যায়। দেবরাজ নতুন লোকের সঙ্গে আলাপ জমাতে পারে চট করে, আমি আবার ওটা পারি না। আমি একটা পুরোনো খবরের কাগজ পড়ছিলুম।

এই সময় হঠাৎ একজন পেছন থেকে দেবরাজের কাঁধে চাপড় মেরে বলল, আরে মজুমদার-দাদা, আপনি এখানে?

এইসব অভিযানে বেরিয়ে আমরা চেনাশুনো লোকদের এড়িয়ে চলি। আমাদের পরিকল্পনাটা আগে থেকে জানাজানি হয়ে গেলে কাজের অসুবিধে হয়। কিন্তু চেনা কেউ হঠাৎ মুখোমুখি পড়ে গেলে তো কথা বলতেই হয়।

লোকটির নাম শহীদুল হক। এর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল মুর্শিদাবাদে। বেশ আমুদে ধরনের মানুষ। এদের পুরুষানুক্রমে কাঠের কারবার। বেশ সঙ্গতিসম্পন্ন পরিবার, বাড়িতে ডেকে নিয়ে আমাদের খুব একচোট খাইয়েও ছিল একদিন। শহীদুল হকের বয়েস বেশি নয়, তিরিশের নীচেই হবে, বেশ সুশ্রী চেহারা, মাজা-মাজা গায়ের রং, ছিপছিপে লম্বা।

শহীদুল হক আমার দিকে ফিরে বলল, গাঙ্গুলি সাহেব, আপনিও রয়েছেন? এদিকে কী করতে এসেছেন?

আমি অল্প হেসে বললুম, এমনিই বেড়াতে।

দেবরাজ কৃত্রিম উৎসাহ দেখিয়ে বলল, হক সাহেবের এদিকেও কাঠের কারবার আছে নাকি? তাহলে আমাদের একটা জঙ্গল দেখাবার ব্যবস্থা করুন!

আমরা আগেই ঠিক করে নিয়েছিলুম যে, এখানে কেউ আমাদের আগমনের উদ্দেশ্যের কথা জিগ্যেস করলে আমরা জঙ্গল-ভ্রমণের কথা বলব। দুর্লভ বই সংগ্রহের ব্যাপারটা অনেকেই বুঝতে পারে না। কেউ-কেউ সন্দেহ করে, আমরা বুঝি বই চুরি করতে এসেছি। আসলে অবহেলিত বা অমনোযোগে ফেলে রাখা রত্ন উদ্ধার করাই যে আমাদের ব্রত সেকথা অন্যদের সহজে বোঝানো যায় না!

বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' উপন্যাসের পটভূমি তো এই পূর্ণিয়াতেই। সুতরাং লবটুলিয়া বৈহারের জঙ্গল সম্পর্কে একটা রোমান্টিক আকর্ষণও ছিল আমাদের। এখানে এসে তাই জঙ্গল দেখবার সাধ প্রকাশ করা অতি স্বাভাবিক। পরে অবশ্য জানতে পেরেছিলুম, 'আরণ্যকে'র সেই গহন জঙ্গলের অস্তিত্ব আর নেই এদিকে। হয়তো বিভূতিভূষণ পুরো জঙ্গলটাই কল্পনা করেছিলেন।

শহীদুল হক হা-হা করে হেসে বললে, আরে দাদা, জঙ্গল তো দেখবেনই। এদিকে আর কী-কী দেখবেন বলুন? এই খরার দেশে আপনারা বেড়াতে এসেছেন? এই হোটেলেই উঠেছেন নাকি?

দেবরাজ বলল, হ্যাঁ। এই হোটেলের খাওয়াদাওয়া বেশ ভালো। ম্যানেজারবাবু আমাদের খুব যত্ন করছেন।

শহীদুল হক বলল, আমি তো প্রত্যেক মাসে একবার এখানে আসি। চলুন, আমার ঘরে বসবেন চলুন!

দেবরাজ আমার দিকে চোখাচোখি করল। আমি বললুম, আমাদের যে একবার ভাদুড়িজিদের বাড়িতে যাওয়ার কথা আছে!

শহীদুল হক বলল, যাবেন-যাবেন, সে পরে যাবেন। আপনাদের দেখা পেয়েছি, একটু আড্ডা মারা যাক। পাণ্ডেজির সঙ্গে আপনাদের আলাপ হয়েছে?

—না তো! কে পাণ্ডেজি?

—এই হোটেলে আছেন আর পাণ্ডেজিকে চেনেন না? পাণ্ডেজি যখন এই হোটেলে ওঠেন, তখন অন্য সব বোর্ডাররা কমপ্লেন করে যে-কোনও বেয়ারাকে ডাকলে পাওয়া যায় না। সব বেয়ারাগুলো হরদম পাণ্ডেজির ফাই-ফরমাস খাটতে ছোটে। কী ম্যানেজার সাহেব, ঠিক বলিনি?

হোটেলের ম্যানেজার বলল, এ-মাস থেকে দুজন এক্সট্রা ছোকরাকে কাজে লাগিয়েছি। এখন আর অন্য বোর্ডারদের অসুবিধে হবে না।

পাণ্ডেজির পরিচয় পেলেও তাঁর সঙ্গে আলাপ করার কোনও উৎসাহ হল না। কোনও-কোনও হোটেলে এরকম দু-একজন লোককে দেখা যায়। যারা প্রচুর টাকা ছড়িয়ে নিজেদের আরাম ও প্রয়োজনের ব্যাপারটাই বড় করে দেখে। দোতলার কোণের ঘরটায় গতকাল অনেক রাত পর্যন্ত

হইহল্লা আর ফুর্তির আওয়াজ শুনেছি। সেটাই সম্ভবত পাণ্ডেজির ঘর।

শহীদুল হক বলল, চলুন, আলাপ করলে ভালো লাগবে, খুব মজাদার লোক। এদিকে যে কুঁয়ারীপুর এস্টেট আছে, পাণ্ডেজি সেই জমিদারের ভাগ্নে। শহরে ওদের অনেক বড় বাড়ি আছে। কিন্তু পাণ্ডেজি শহরে এলে এই হোটেলেই উঠবে। ম্যানেজারবাবু এখানে এমন চুম্বক রেখে দিয়েছেন—

শিকারি বেড়ালের মতন আমার আর দেবরাজের গোঁফ খাড়া হয়ে উঠল। আমরা আবার চোখাচোখি করলুম।

দেবরাজ জিগ্যেস করল, কোন এস্টেট?

শহীদুল হক বলল, কুঁয়ারীপুর। নাম শুনেছেন?

যাতে বেশি উৎসাহ না প্রকাশ পায়, সেইজন্য দেবরাজ সিগারেট ধরাবার জন্য মুখ নীচু করে নিল। হ্যাঁ, নাম শুনেছি। বেশ বড় রাজবাড়ি।

আমরা ওই কুঁয়ারীপুর (আসল নামটা বদলে দিতে হল) রাজবাড়ির লাইব্রেরিতে হানা দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছি। সুতরাং পাণ্ডেজির এই পরিচয়টা শুনে আমরা আর দ্বিরুক্তি করলুম না।

দেবরাজ বলল, চলুন তাহলে আলাপ করেই আসি।

দোতলার কোণের ঘরে এসে ঢুকলুম আমরা। খাটের ওপর শুয়েছিল একজন পাজামা আর একটা আধময়লা পাঞ্জাবি পরা। লোকটিকে দেখে প্রথমেই আমি নিরাশ হয়ে পড়লুম। কোনও রাজবাড়ির ভাগনে বলে মনেই হয় না। অতি সাধারণ চেহারা, মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। ঘরটাও বেশ অপরিষ্কার, এখানে-সেখানে জামাকাপড় ছড়ানো। টেবিলের ওপর দুটো প্লেটে মাংসের হাড়, ছেঁড়া রুটি আর একটা মদের গেলাস।

শহীদুল হককে দেখে লোকটি বলল, আরে হক, তুম ইতনা লেট কিয়া, তুমহার জন্যে আমি বসে-বসে থকে গেলাম!

শহীদুল হক বলল, পাণ্ডেজি, আমার দুজন দাদাকে নিয়ে এসেছি আপনার সঙ্গে আলাপ করবার জন্য। এনারা এদিকে নতুন এসেছেন—

পাণ্ডেজি উঠে বসে যেন আন্তরিক ভাবেই বলল, বৈঠিয়ে-বৈঠিয়ে। আপনাদের তো দেখেই মালুম হচ্ছে কি পড়ে-লিখে আদমি। হামি তো ইংলিশ-মিংলিশ কুছ জানি না। আপনাদের সঙ্গে হামি কি আলাপ করব!

দেবরাজ হেসে বলল, আমরা কি মশাই ইংরেজিতে কথা বলার জন্য পুর্ণিয়া এসেছি? তা ছাড়া, আমরাও ভালো ইংরেজি জানি না। ইংরেজির চেয়ে হিন্দি বেশি জানি।

পাণ্ডেজি বলল, হামি বাংলা জানি। তবে দেখেছি কি, বাঙালি লোক বাংলা বাতচিত করবার সময়েও বহুত ইংলিশ বলে। হে-হে-হে!

দেবরাজ বললে, তা ঠিক বলেছেন। যারা ইংরিজি ভালো জানে না, তারাই বেশি ইংরিজি শব্দ ব্যবহার করে।

পাণ্ডেজি বলল, আরে হক, দো-তিনটে নোকরকো বোলাও। ঘর সাফ করুক। কুছু খানা আনুক। সোডা আর গিলাস মাঙাও। আউর এক কিলো চানাচুর। বাঙালি বাবুরা চানাচুর ভালোবাসে!

তারপর আমাদের দিকে ফিরে জিগ্যেস করল, আপনারা কী খাবেন? বেরাণ্ডি, রম, হুইস্কি! যা পোসোন্দ হয় বলুন, সব মিলবে এখানে।

সেই আধময়লা পাঞ্জাবির পকেট থেকে পাণ্ডেজি একতাড়া একশো টাকার নোট বার করল।

একটুক্ষণের মধ্যেই বেশ ভাব জমে গেল পাণ্ডেজির সঙ্গে। শহীদুল হকের সঙ্গে মেজাজের মিল আছে, এই লোকটিও খুব দিলদরিয়া। লোকজনদের খাওয়াতে ভালোবাসে। কথায়-কথায় জানতে পারলুম যে পাণ্ডেজিরও কাঠের কারবার। পাণ্ডেজি জঙ্গল কাটার ইজারা নেয় আর শহীদুল হক আসে ওয়াগন বোঝাই করে মাল ডেলিভারি নিতে। এইসব লোকদের কাছে প্রচুর কাঁচা পয়সা থাকে।

আমাদের ভাগ্য ভালো, প্রায় জায়গাতেই এইরকম দু-একজন পৃষ্ঠপোষক জুটে যায়।

যারা সবসময় কাজকর্মে আর টাকাপয়সা রোজগারের ধান্দায় মত্ত থাকে তারা যদি দ্যাখে কোনও লেখাপড়া জানা শক্তসমর্থ চেহারার মানুষ বিনা উদ্দেশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, জঙ্গল বা পাহাড় দেখার জন্য সময় কাটাচ্ছে, তখন তারা খানিকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। একেবারে বিপরীত চরিত্রের মানুষদের তারা বেশ খাতির করে।

পাণ্ডেজি আমাদের জন্য প্রচুর খাবার আনল এবং দু-তিনটে মদের বোতল। আমাদের কোনও আপত্তিই সে শুনবে না, জোর করে খাওয়াবেই। খানিক বাদেই বোঝা গেল যে, পাণ্ডেজিদের নিজেদের বাড়িতে এখনও মাছ-মাংস ঢোকে না, মদও নিষিদ্ধ। তাই শহরে কাজের জন্য এলে সে হোটেলেই ওঠে।

তিন-চার গেলাস মদ ওড়াবার পর আমাদের সকলের মধ্যে বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেল। আপনি থেকে তুমি-তে নেমে এলুম।

দেবরাজ তখনও আসল উদ্দেশ্য ভোলে না। কথাবার্তা অন্যদিকে চলে গেলেও সে আবার কৌশলে নিজের দিকে টেনে আনে। পাণ্ডেজিকে যখন পাওয়া গেছে তখন এর সূত্র ধরেই আমাদের কুঁয়ারীপুর রাজবাড়িতে ঢুকতে হবে।

একসময় দেবরাজ বলল, পাণ্ডেজি, তোমার মামাবাড়িতে তো একটা খুব প্রাচীন বিষ্ণুমন্দির আছে, না? একদিন আমাদের সেই মন্দিরটা দেখার ব্যবস্থা করে দাও না।

পাণ্ডেজি বলল যে, সে মন্দির কী দেখবে? এখন তো কিছুই নেই। সব ভেঙেচুড়ে গেছে, মন্দিরের মধ্যে জঙ্গল হয়ে গেছে—।

দেবরাজ আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, আমার এই বন্ধুটি ওইসব পুরোনো মন্দির দেখতে ভালোবাসে। খবরের কাগজে ও এইসব মন্দির নিয়ে প্রবন্ধ লেখে।

পাণ্ডেজি বলল, তুমাদের যো দিন মর্জি চলে যাও, হামার গাড়ি দিয়ে দেব। পুরা দিনভর ঘুরে এসো।

তারপর আমার দিকে ফিরে জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে বলল, তুমি দাদা আখবরে লেখ? তব্ উয়ো পুরানা মন্দিরকা বাৎ ছোড়ো! যেখানে আমাদের জঙ্গল সাফ হচ্ছে, সেখানে একঠো-দোঠো মন্দির আছে, সেই মন্দির দেখবে চলো। আপনা আঁখসে দেখ কর তুমি সব কথা লেখো। সারা দুনিয়া তাজ্জব বনে যাবে।

শহীদুল হক বলল, সত্যি দাদা, নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস হবে না তোমাদের। ভাবলেও আমার গায়ে কাঁটা দেয়!

পাণ্ডেজি বলল, কখনও শুনেছ কি, মন্দিরের মধ্যে পাথরের মূরত ইংলিশে কথা বলে? একটা চৌদা বরষের লেড়কি, যে পড়া-লিখা কুচ্ছু জানে না, সে-ও ওই মন্দিরের কাছে গেলে ইংলিশে ঠাকুরের সঙ্গে বাতচিত করে।

দেবরাজ হাহা করে হেসে উঠল।

পাণ্ডেজি বলল, হাঁসছ? বিশওয়াস হচ্চে না? আমি আপনা আঁখসে দেখেছি!

শহীদুল হক বলল, আমিও নিজের কানে শুনেছি।

দেবরাজ বলল, ধুৎ, ওসব ভূতের গল্প বাদ দাও! কুঁয়ারীপুর রাজবাড়িতে কবে যাব—বলো পাণ্ডে

দেবরাজের ভূতের গল্প সম্পর্কে আগ্রহ না থাকলেও আমি উৎসাহ দেখিয়ে বললুম, না-না, শুনি গল্পটা! বলো তো পাণ্ডেজি!

পাণ্ডেজি উত্তেজিতভাবে বলল, গোল্লো? হামি গোল্লো বানাতে পারি না। পড়া-লিখা শিখিনি, হামার জঙ্গলের ডেরাতে নিজের আঁখসে দেখেছি!

পাণ্ডেজি এরপর যে কাহিনি বিবৃত করল তা হল এই ঃ

এখানে থেকে পঁচিশ মাইল দূরে মিট্টিগড় নামে একটা জায়গা আছে। সেখানে একসময় বোধহয় কোনও দুর্গ ছিল, এখন তার অস্তিত্ব নেই। জলাজংলা অঞ্চল। যে জঙ্গল আছে তাও খুব গভীর নয়। পাণ্ডেজি সেই জঙ্গল সাফ করার ইজারা নিয়েছে।

গাছ কাটার সময় ইজারাদার তাঁবু ফেলে। আশেপাশে কোনও জনবসতি নেই। মজুররা আর কন্ট্রাকটর-বাবুরা তাঁবুতেই থাকে। প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে ওই মিট্টিগড়ে গাছ কাটার কাজ চলছে।

ওই জঙ্গলের মধ্যে একটা ছোট্টখাট্টো মন্দির আছে। মন্দিরটা অতি সাধারণ, ভেতরে একটা পাথরের মূর্তি আছে, কিন্তু কীসের মূর্তি তা চেনা যায় না। কুলিকামিনরা বলে বগলা মন্দির। জনশ্রুতি এই যে, একসময় এক ভিন-দেশি তান্ত্রিক এসে ওই মন্দির বানিয়েছিল, তারপর সেই তান্ত্রিক মারা যাওয়ার পর আর কেউ ওখানে পুজো করে না। মন্দিরটার দেওয়ালে গাছপালা জন্মে গেছে। একটা অশ্বত্থ গাছে এর মধ্যেই শিকড় চালিয়ে মন্দিরটা খানিকটা ফাটিয়ে ফেলেছে।

কুলিকামিনদের ধারণা, জঙ্গলের মধ্যে কোনও মন্দির থাকলে সেখানে পুজো না দিয়ে গাছ কাটতে নেই। তাহলে দেওতা রাগ করেন। পাণ্ডেজি পুজোর জন্য কিছু টাকা বরাদ্দ করে দিয়েছে।

গাছ কাটা শুরু হওয়ার দিনসাতেক বাদে এক সন্ধেবেলা পাণ্ডেজি নিজের তাঁবুতে বসে দুজন সঙ্গীকে নিয়ে টাকাপয়সার হিসেব করতে করতে সুরা সেবন করছিল, এমনসময় একদল কুলিকামিন হইহই করে ছুটে এল সেখানে, তারা একটা অত্যাশ্চর্য কথা জানাল। তারা কাজ শেষ করে বগলা মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিল, এমনসময় মন্দিরের দেওতা হঠাৎ ইংরেজিতে কথা বলে উঠেছে।

ইংরিজি ভাষার ওপর পাণ্ডেজির খুব রাগ। নিজে ইংরিজি জানে না বলেই অন্য কেউ তার সঙ্গে ইংরিজিতে কথা বললে সে বিরক্ত হয়। ফরেস্টারবাবু, রেলের বাবু, সরকারি লোকজন হিন্দি জানা সত্ত্বেও যখন পাণ্ডেজির সঙ্গে ইংরিজি মিশিয়ে কথা বলতে যায়, তখন পাণ্ডেজি তাদের পাঁচকথা শুনিয়ে দেয়। তোমরা মায়ের দুধ খাওনি? মা তোমাদের হিন্দি বোলি শিখায়নি? যারা পাণ্ডেজির সঙ্গে এইরকম ইংরিজি বলে, তাদের সে ঘুষ দেয় না কক্ষনো।

কুলিকামিনদের কথা শুনে পাণ্ডেজি তেলেবেগুনে জ্বলে উঠেছিল। এই জঙ্গলের মধ্যে পাথরের মূর্তির মুখে ইংরিজি? রোজ যে পুজোর জন্য বিশ টাকা করে সে দিচ্ছে, তা ঘুষ ছাড়া আর কী!

হুংকার দিয়ে সে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে বলেছিল, আমার সঙ্গে বুজরুকি? চল, আমি এখনি যাচ্ছি।

কুলিরা কেউ ভয়ে যেতে চায় না। সন্ধে হয়ে গেছে। মন্দিরের দেবী জাগ্রত, তারা বিপদের আশঙ্কা করছে।

পাণ্ডেজি তখন বলেছিল, যদি কেউ এখনই তার সঙ্গে গিয়ে পাথরের মূরতের মুখ দিয়ে শুধু একটা ইংরেজি বোলি শুনাতে পারে, তাকে সে একশো টাকা দেবে।

যে সময়কার কথা হচ্ছে, তখন একশো টাকা মানে যথেষ্ট টাকা। একজন কুলির সারা মাসেও এত রোজগার হয় না। তখন ভয় কাটিয়ে অনেকেই পাণ্ডেজির সঙ্গে যেতে রাজি হল।

পাণ্ডেজির এমনিতেই ঠাকুর-দেবতার ওপর খুব একটা ভয়-ভক্তি নেই। তার ওপর সেদিন চোখে খানিকটা নেশা ছিল। তাই সে বগলা মন্দিরের সামনে গিয়ে হইহল্লা শুরু করে দিল। হিন্দুর ঠাকুর ইংলিশে কথা বলে! তাহলে আর কলিকালের বাকি রইল কী? কোথায়—ঠাকুরের সাহস থাকে বলুক তো পাণ্ডের সামনে ইংলিশ?

বলাই বাহুল্য, পাথরের ঠাকুর চুপ করে রইল। ইংরেজি দূরের কথা, হিন্দি-বাংলা-সংস্কৃত কোনও ভাষাতেই পাথরের ঠাকুর কথা বলল না। কুলিরা তবু কয়েকজন বলতে লাগল যে, খানিক আগে তারা নিজেদের কানে শুনেছে, তখন পাণ্ডেজি তাদের বলল, দূর হয়ে যা তোরা আমার সামনে

থেকে! তোরা সব ক'টা হচ্ছিস 'বগলা ভকত' (বক 'ধার্মিক)।

সেদিনকার মতন ব্যাপারটা চুকে গেলেও কিন্তু ঘটনা সেখানে থামল না।

ব্যাবসার কাজে পাণ্ডেজিকে কয়েকদিনের জন্য যেতে হয়েছিল পাটনা। সেখান থেকে ফিরে দ্যাখে কুলিদের মধ্যে দারুণ হইহই চলছে। কাজকর্ম প্রায় বন্ধ, সবাই সারাক্ষণ বসে থাকে বগলা মন্দিরের সামনে। বগলা মন্দিরের জাগ্রত 'আংরেজি মাই'-কে দেখবার জন্য কাছাকাছি গ্রাম থেকেও লোক আসছে।

কাঠ কাটা মজুরদের মধ্যে সর্দারশ্রেণীর দু-তিনজনকে ডেকে পাণ্ডেজি কড়া গলায় জিগ্যেস করল, এসব কী ব্যাপার চলছে? মজুরি বাড়াবার ধান্দা? চাবকে সে ওদের পিঠের ছাল তুলে দেবে!

সর্দারেরা হাতজোড় করে জানাল যে, তাদের সেরকম কোনও মতলোব নেই। লোকজনদের বাগ মানানো যাচ্ছে না কিছুতেই। বগলা মন্দিরের ঠাকুর সত্যিই আংরেজিতে কথা বলেন। তবে সবসময় বলেন না। গুড়িয়া নামে একটি মেয়ে উপস্থিত থাকলেই এরকম হয়। বহু লোক নিজের কানে শুনেছে।

পাণ্ডেজি বলল, এক্ষুনি ডেকে আনো গুড়িয়া নামের মেয়েটিকে। নিয়ে চলো তাকে আমার সঙ্গে। আমিও নিজের কানে শুনব।

আবার একটা বড় দল এসে হাজির হল বগলা মন্দিরের সামনে। সেদিনও সন্ধে হয়ে এসেছে। কারা যেন একটা মশাল জ্বালিয়ে রেখেছে সেখানে। এত লোক এসেছে, কিন্তু কারুর মুখে কোনও কথা নেই। জঙ্গল একেবারে স্তব্ধ। শুধু শোনা যাচ্ছে একটা রাতপাখির ডাক।

একজন সর্দারের বউ হাত ধরে একটি মেয়েকে নিয়ে এসে বসল মন্দিরের দরজার কাছে। মেয়েটির বয়েস তেরো-চোদ্দো হবে। একটা লাল রঙের ফুল-ফুল ছাপাশাড়ি পরা, মাথার চুল খোলা। মেয়েটি একটুক্ষণ বসে থাকার পর হাউহাউ করে কেঁদে উঠল। সেখান থেকে সে উঠে পালাতে চাইল, কিন্তু কোনও অদৃশ্য শক্তি যেন তাকে বেঁধে রেখেছে। কাঁদতে-কাঁদতে মেয়েটি চিৎকার করে কীসব বলতে লাগল, সবই ইংরিজিতে! মাঝে-মাঝে সে থামছে, যেন কারুর প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে।

সব কুলিকামিনরা এই সময় 'জয় বগলা মাঈ' বলে ধ্বনি দিতে লাগল। পাণ্ডেজি এগিয়ে এসে গুড়িয়া বলে মেয়েটিকে ধরার চেষ্টা করতেই দেখল সে অজ্ঞান হয়ে গেছে।

কাহিনি মাঝপথে থামিয়ে পাণ্ডেজি আমার দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি তো দাদা আখবরে লেখো। একঠো ক্যামেরা দিয়ে তুমি ওই গুড়িয়া নামের মেয়েটির ফটো নিয়ে নাও, তারপর দুনিয়ার মানুষকে দেখাও। গুড়িয়াকে না দেখলে তুমি ব্যাপারটা বুঝতে পারবে না।

শহীদুল হক মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বলল, সত্যি, ঠিক যেন কয়লাখনির মধ্যে একখানা হীরে! না দেখলে আমিও বিশ্বাস করতুম না।

ওই গুড়িয়াও ওখানে পাতা বাছাইয়ের কাজ করে। তার বাবা আর মা-ও রয়েছে সেখানে। কিন্তু আর পাঁচটা কুলিকামিনের মেয়ের তুলনায় গুড়িয়ার চেহারা একেবারে আলাদা। তার রং ধপধপে ফর্সা, তার চুলের রং সোনালি, তার চোখের মণি নীল। পাণ্ডেজি আগে দু-একবার যাওয়া-আসার পথে গুড়িয়াকে কাজ করতে দেখেছে, কিন্তু বিশেষ মনোযোগ দেয়নি। সে ভেবেছিল, ও মেয়েটার বুঝি শ্বেতি রোগ আছে। বাঁকুড়া পূর্ণিয়া অঞ্চলে এরকম দু-একটা শিশু দেখা যায়, জন্ম থেকেই যাদের গায়ের রং সাদা—চুলও সাদা।

কিন্তু গুড়িয়ার দিকে ভালোভাবে নজর দিয়ে তাকিয়ো, তার চেহারা একেবারে মেমসাহেবদের মতন। বালো করে স্নান করে না, গায়ে-মুখে পুরো একপোঁচ ধুলোর আস্তরণ, কিন্তু ঠিক যেন ছাইচাপা আগুন! তার চোখের মণিদুটো বেড়ালের মতন ঘন নীল।

গুড়িয়ার বাবা আর মাকে তাঁবুতে ডেকে এনে পাণ্ডেজি জিগ্যেস করল, কী রে, আসল কথাটা এবার বল! নিশ্চয়ই কোনও আংরেজি সাহেব এ-মেয়ের জন্ম দিয়েছে।

গুড়িয়ার মা প্রায় ষাট বছরের বুড়ি। সে পাণ্ডেজির পায়ে পড়ে কাঁদতে-কাঁদতে বলল, হুজুর, অনেকেই আগে একথা বলেছে। কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন, আমার আর সাত ছেলেমেয়ের বাপও যে, গুড়িয়ার বাপও সে।

গুড়িয়ার বাবা বুড়ো রামধারী সিং মিটি-মিটি হাসছিল। যেন দারুণ একটা মজার ব্যাপার পেয়েছে সে। একটা বেশ চমৎকার খেলা, যাতে বাবুভাইয়াদের ঠকানো যায়।

রামধারী সিং যা বলল, তাও অবিশ্বাস করা যায় না। তাদের মোট আটটি ছেলেমেয়ে। আর সব ক'টি ছেলেমেয়েই যেরকম গ্রামের অন্য ছেলেমেয়ে হয় সেইরকম। গুড়িয়া সব চেয়ে ছোট। গুড়িয়া যখন জন্মায় তখনই তার মা বুড়ি হয়ে গেছে, তাছাড়া একটা অসুখে ভুগে সেসময় তার চেহারা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সেইরকম একটা অসুস্থ বুড়ির সঙ্গে কোনও আংরেজি সাহেব শোবে কেন? তা ছাড়া, তাদের গ্রামের আশেপাশে দশ-বিশখানা গ্রামের চৌহদ্দির মধ্যে আংরেজি সাহেব কোথায়?

গ্রামের অন্য ছেলেমেয়েদের মতো গুড়িয়াও অল্পবয়েস থেকে ক্ষেতির কাজ আর বর্ষার আগে জঙ্গলের কাজ করেছে। কোনওদিন ইস্কুল পাঠশালার মুখ দেখেনি। ইংরেজি জানবে কী করে?

দেবরাজ জিগ্যেস করল, জব্বর ভূতের গপ্পো জমিয়েছ পাণ্ডেজি! এবারে সাফসুফ বলো তো, তুমি নিজের কানে পাথরের মূর্তিকে কথা বলতে শুনেছ? ভাঁওতা মারার আর জায়গা পাওনি? আমাকে কেটে ফেললেও আমি এই গাঁজাখুরি গল্প বিশ্বাস করব না।

পাণ্ডেজি খানিকটা রেগে গিয়ে বলল, শোনো দাদা, তোমাকে ভাঁওতা মেরে কি আমার দশ-বিশ টাকা রোজগার হবে? আগেই তো বলেছি, আমি কহানি বনাতে জানি না। আমার কথা বিশ্বাস না হয় তুমি তোমাদের এই বাঙালি হক ভাইয়াকে জিগ্যেস করো। না, আমি পাথরের মূরতের মুখে আংরেজি বোলি কেন কোনও বোলিই শুনিনি। সেকথা তো আগেই বলেছি। কিন্তু আমি তিন-চার দিন গিয়ে দেখেছি, ওই মন্দিরের সামনে বসলেই গুড়িয়া নামের মেয়েটি ভয় পেয়ে কাঁদতে শুরু করে আর আংরেজি বোলি শুরু করে দেয়। তার কথা শুনলেই মনে হয়, ভেতর থেকে কে যেন তাকে ধমকাচ্ছে আর সে উত্তর দিচ্ছে। তাতেই লোকে ভাবে যে ভেতর থেকে পাথরের ঠাকুরও কথা বলছে। আমি মন্দিরের মধ্যে ঢুকে দেখেছি ভেতরে কেউ লুকিয়ে নেই। কিন্তু গুড়িয়া যে আংরেজি বলে, তা একদম আংরেজি মেমসাহেবকি তারিফা! গ্যাট, ম্যাট, ফ্যাট, গুড মানিং!

দেবরাজ শহীদুল হককে জিগ্যেস করল, তুমি শুনেছ মেয়েটার কথা? কী বলে সে?

শহীদুল হক বলল, ঠিক বোঝা যায় না। মেয়েটার গলা সে সময় স্বাভাবিক থাকে না, সে মৃগী রুগির মতন ছটফট করে আর তার গলার স্বর পাখির মতন হয়ে যায়। আমি যেটুকু বুঝতে পেরেছি, তা হল প্লিজ ফরগিভ মি! আই অ্যাম অ্যাফরেড! নো, আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু গো উইথ ইউ!

দেবরাজ হকের জামা খামচে ধরে জিগ্যেস করল, শালা, তুমি নিজের কানে শুনেছ?

হক দৃঢ় গলায় বলল, আমার মায়ের দিব্যি! সত্যি আমি নিজের কানে শুনেছি। একেবারে অশিক্ষিত মেয়ে, কিন্তু গোটা একটা ইংরেজি সেন্টেন্স সে বলতে পারে!

দেবরাজ বলল, চলো, কালকেই যাব তোমাদের জঙ্গলে। আমি নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করব না।

পাণ্ডেজি বলল, আলবাত কাল যাবে। নিজে দেখবে, ফটো খিঁচবে, তারপর আখবরে লিখবে! তার আগে আর একটু শুনে নাও। আমি গুড়িয়া সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে লাগলুম, তারপর হঠাৎ জানতে পারলাম, গুড়িয়া আমার বোন হচ্ছে।

আমি আর দেবরাজ একসঙ্গে চমকে উঠে বললুম, অ্যাঁ?

পাণ্ডেজি বলল, আগে একটা পুরোন কিসসা শোনা। কুঁয়ারীপুর রাজবাড়ি তোমরা দেখতে

চেয়েছিলে। ওই কুঁয়ারীপুর যখন আসল জমিদারি ছিল তখন সেখানকার জবরদস্ত জমিদার ছিল রায়বাহাদুর রঘুবীর সিং।

দেবরাজ বলল, জানি। রঘুবীর সিং শুধু জবরদস্ত জমিদার ছিলেন না, লেখাপড়াও জানতেন। পড়াশুনো করতে বিলেত গিয়েছিলেন। তাঁর আমলেই কুঁয়ারীপুর রাজবাড়িতে লাইব্রেরি হয়, সেখানে অনেক বই কেনা হয়।

পাণ্ডেজি বলল, এত জানো, তবে এটা জানো কি যে ওই রঘুবীর সিং লন্ডন থেকে দুটো আসলি মেমসাহেব এনেছিলেন রক্ষিতা করার জন্য? প্রথমে একটা মেমসাবে আনলেন, সেটা একমাসের মধ্যে মরে গেল। তারপর আর-একটা মেমসাহেব আনালেন। রঘুবীর সিং-এর দশ-বারো খানা রক্ষিতা ছিল, তার মধ্যে একটা বাঙালিন্‌ও ছিল। হে-হে-হে! বড় ভালো সময় ছিল তখন। দ্যাখো না, এখন আমার একটাও রক্ষিতা নেই!

দেবরাজ বলল, মেম রক্ষিতা? ও বুঝেছি...

পাণ্ডেজি ধমক দিয়ে বলল, কিছুই বোঝোনি! জমিদার হলেও রঘুবীর সিং-এর গায়ের রং ছিল ছাতার কাপড়ের মতন কালো। কুঁয়ারী পুরের রাজবাড়ির সবাই কালো। সে কালো রঙের এমনই তেজ যে মেমসাহেবের পেটে তিনখানা বাচ্চা জন্মালো—তারাও সব ঝিরকুটে কালো। কালো জাম দেখেছ তো, ঠিকই সেইরকম কালো-কালো মেয়ে। সেই তিনটে বাচ্চাকে ফেলে পাখি উড়ে গেল একদিন। সেই মেমসাহেব আর-এক সাহেবের সঙ্গে ভিড়ে লন্ডন পালিয়ে গেল একদিন।

দেবরাজ জিগ্যেস করল, তোমার মা-ও তো ওই জমিদারবাড়ির মেয়ে! তুমি ও-বাড়ির ভাগ্নে যখন—

পাণ্ডেজি বলল, হ্যাঁ, কিন্তু সব শোনাব। জমিদার রঘুবীর সিং-এর দু-খানা ধরমপত্নী ছিল। তাদের একজনের এক ছেলে, আর-একজনের এক মেয়ে, ব্যস। আর রক্ষিতাদের ছেলেমেয়ে পাঁচ গণ্ডা। রঘুবীর সিং যেই মারা গেল, অমনি তার ধরমপুত্র রক্ষিতাদের সব ক'টাকে, ছেলে-মেয়েশুদ্ধ ভাগিয়ে দিল একেবারে। দু-চারটাকে মেরে ফেলেছিল একেবারে। আর ওই পালিয়ে যাওয়া মেমসাহেবের যে কালো জামের মতন তিনটে বাচ্চা, তাদের নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল গাঁওবস্তিতে। চাষারা তাদের পেয়ে ক্ষেতির কাজে লাগিয়ে দিল, বড় হয়ে উঠলে শাদি করল।

দেবরাজ জিগ্যেস করল, তাহলে ওই গুড়িয়ার মা যে বুড়িটা, সে মেমের মেয়ে?

পাণ্ডেজি বলল, নেই, নেই। ওই বুড়িটার যে মা ছিল, সে ছিল মেমসাহেবের লেড়কি! এবারে বুঝলে, আমার মা-ও রঘুবীর সিং-এর বংশধর, আর ওই গুড়িয়ার মা-ও তো তাই। তাহলে গুড়িয়া আমার সম্পর্কে বহিন হল না? ভগবানের কী আশ্চর্য লীলা! অ্যাত্তদিন পর সেই মেমসাহেবের গায়ের রং ফিরে এসেছে গুড়িয়ার মধ্যে।

আমি বললুম, ভগবানের লীলা তো বুঝলুম, কিন্তু গুড়িয়া ইংরিজি বলতে শিখল কী করে? আর বগলা দেবীর মূর্তিই বা তার সঙ্গে ইংরিজিতে কথা বলবে কেন?

পাণ্ডেজি বলল, সে আপনারা লেখাপড়া জানেন, আপনারা বুঝবেন। লণ্ডন থেকে মেমসাহেবের প্রেত এই ফরসা মেয়েটিকে তার নিজের দেশে নিয়ে যেতে এসেছে।

গল্পে-গল্পে অনেক রাত হয়ে এসেছিল। বোতলও প্রায় শেষ, বাইরে প্রবল বেগে বৃষ্টি পড়ছে। আমরা শুতে চলে গেলুম। ঠিক হল তার পরের দিনই আমরা মিট্টিগড় জঙ্গলে যাব।

কিন্তু এ-কাহিনি এখানেই শেষ। মিট্টিগড় জঙ্গলে আমাদের যাওয়া হয়নি। পরের দু-দিন সাংঘাতিক ঝড়বাদল চলল। তার মধ্যে জিপ চালানোর কোনও প্রশ্নই ওঠে না। তারই মধ্যে খবর পাওয়া গেল যে, একটা ব্রিজ ভেঙে রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে।

তৃতীয় দিনে মিট্টিগড় থেকে পায়ে হেঁটে পাণ্ডেজির ম্যানেজার এসে উপস্থিত হল আমাদের হোটেলে। মজুরদের সপ্তাহের টাকা দিতে হবে, নইলে তারা কাজ করবে না। বৃষ্টির জন্য দু-তিনটে

তাঁবুও নষ্ট হয়ে গেছে।

ম্যানেজার সাহেব আরও জানাল যে, পুরুলিয়া থেকে এক পাদ্রি সাহেব এসেছিলেন গুড়িয়াকে দেখতে। গুড়িয়ার মুখে ইংরেজি কথা শুনে তিনি তাকে নিয়ে গেছেন। গুড়িয়ার বাবা-মা আপত্তি করেনি। তাদের ধারণা, গুড়িয়াকে জিনে ধরেছে। পাদ্রিসাহেবের চিকিৎসায় ভালো হয়ে যাবে।

গুড়িয়াকে দেখা যাবে না জেনে আমাদের আর মিট্টিগড়ে যাওয়ার উৎসাহ রইল না। তবে পাণ্ডেজির সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় আমাদের বিশেষ লাভ হয়েছিল। তার সূত্রেই আমরা কুঁয়ারীপুর রাজবাড়িতে প্রবেশ করে আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছিলুম।

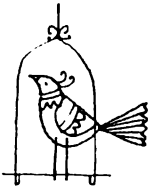

প্রথম নারী

বেশি দূরে নয়, হয়তো গড়িয়া বা টালিগঞ্জ বা দমদমে কারুর বাড়িতে গেছি। সেখানে এখনও কিছু ফাঁকা জায়গা আছে, গাছপালা আছে, একটা দুটো পুকুর আছে। সেরকম জায়গায় যদি হঠাৎ খুব জোর বৃষ্টি নামে, আমি জানলার কাছে কিংবা ঢাকা বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াই, চোখ ভরে দেখি হাওয়ার ধাক্কায় গাছগুলোর এলোমেলো নাচ, আর ঘাসভরা মাঠের ওপর অবিশ্রান্ত বৃষ্টির ঝুমঝুম শব্দ শুনতে-শুনতে আমার মন খারাপ হয়ে যায়।

আমার দীর্ঘশ্বাস পড়ে, মনে পড়ে যায় অনেক দিন আগেকার এইরকম একটা বর্ষার দিনের কথা।

প্রকৃতির নিয়মে প্রত্যেক বছরই তো বর্ষা আসে। জীবনের যতগুলি বছর আমরা কাটিয়ে যাচ্ছি, ততগুলি বর্ষা ঋতু দেখে যাচ্ছি। বৃষ্টির মধ্যে কতরকম মনে রাখবার মতন ঘটনাই তো ঘটে, কিন্তু আমার শুধু বিশেষ একটা বর্ষার কথাই মনে গেঁথে আছে।

কত বয়েস হবে তখন আমার, আঠেরো কিংবা উনিশ। ভানুকাকাদের একটা বাড়ি ছিল গালুডিতে। প্রত্যেক বছরই পুজোর সময় ভানুকাকা আমাদের নিয়ে যেতে চাইতেন সেখানে। কী কারণে যেন আমাদের যাওয়া হত না। ভানুকাকার সঙ্গে আমরা কোনওদিনই গালুডি যাইনি। একবারই মাত্র গেছি গালুডিতে, তাও পুজোর সময় নয়। কেন যে গ্রীষ্মকালে ওই গরমের জায়গায় যাওয়া ঠিক হয়েছিল তা এখন মনে নেই।

ভানুকাকা আমাদের চাবি দিয়েছিলেন আর মালির নামে একটা চিঠি। কিন্তু শেষ মুহূর্তে বাবা যেতে পারলেন না। বাবার অফিসের গোডাউনে আগুন লেগে গিয়েছিল হঠাৎ, তখন তাঁর কলকাতা ছেড়ে যাওয়া চলে না। আমাদের টিকিট কাটা পর্যন্ত হয়ে গিয়েছিল। তাই ঠিক হল, মাকে নিয়ে আমরা ভাইবোনেরা চলে যাব, বাবা কয়েকদিন পরে আসবেন।

ট্রেন ছাড়ার মুহূর্তে থেকেই আমি হয়ে গিয়েছিলাম হেড অফ দা ফ্যামিলি। মা ও ছোট ভাইবোনদের দায়িত্ব আমার ওপর।

গালুডিতে ভানুকাকাদের বাড়িটা ছিল বেশ ফাঁকা জায়গায়, স্টেশন থেকে অনেকটা দূরে। ছোট দোতলা বাড়ি, সামনে-পেছনে বাগান, পাঁচিলের ওপাশে ঢেউখেলানো প্রান্তর। ওইসব জায়গায় গ্রীষ্মকালে কেউ বেড়াতে যায় না। অনেক বাড়িই তালাবন্ধ ছিল।

সারাদিন কাজ তো কিছু নেই, বাগানে খানিকটা খেলাধুলো আর নানারকম খাওয়ার চিন্তা।

দুপুরে অসহ্য গরম বাতাস, বাইরে বেরুবার উপায় নেই। শত গরমে ঘুমও আসে না। রাস্তায় পোস্টম্যানের সাইকেলের ক্রিং-ক্রিং শুনলেই মনে হত, আজ কি চিঠি আসবে? কিন্তু প্রত্যেকদিন কে চিঠি লিখবে আমাদের? বাবার কাছ থেকে একখানা চিঠি এসেছিল, তাঁর আসতে আরও কয়েকদিন দেরি হবে।

বালক থেকে সাবালক পদে উত্তীর্ণ হয়েছিলুম বলে আমার সবসময় নতুন কিছু একটা করতে ইচ্ছে করত। কিন্তু গালুডির মতন নির্জন জায়গায় কী-ই বা করার থাকতে পারে। মাঝে-মাঝে ট্রেনে চেপে চলে যেতুম ঝাড়গ্রাম কিংবা ঘাটশিলা, কিছু কেনাকাটি করবার জন্য। কেনাকাটি আসল উদ্দেশ্য নয়, গালুডিতেও মোটামুটি সব জিনিস পাওয়া যায়, কিন্তু এই যে আমি যখন ইচ্ছে একা-একা ট্রেনে ভ্রমণ করতে পারি সেটাই ছিল একটা উত্তেজনা ব্যাপার।

ওইরকম বয়সে বেশির ভাগ ছেলেই লাজুক হয়। আমি অচেনা লোকজনের সঙ্গে ভাব জমাতে পারতুম না কিছুতেই। গালুডির তুলনায় ঝাড়গ্রামে লোকজন অনেক বেশি, সেখানে গিয়ে ঘুরে বেড়াতাম রাস্তায়-রাস্তায়, কিন্তু কারুর সঙ্গে আলাপ হয়নি। ঘাটশিলাতেও একদিন গিয়ে দেখি সুবর্ণরেখার ধারে এক দল ছেলেমেয়ে পিকনিক করতে এসেছে ওই গরমের মধ্যে। তারা অনেকেই আমার বয়েসি। একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আমি অনেকক্ষণ দেখছিলুম ওদের। ওরা খেলছে, হাসাহাসি করছে, নিজেরাই রান্না করছে উনুন ধরিয়ে। বারবার ইচ্ছে করছিল, ওদের দলে মিশে যাই। কিন্তু ওরা আমায় ডাকেনি, ডাকলেও বোধহয় আমি লজ্জায় ওদের সঙ্গে যোগ দিতে পারতুম না। নিজেকে দারুণ একা মনে হত।

গালুডিতে আমাদের বাড়ির কাছাকাছি দু-তিনখানা বাড়িই একেবারে ফাঁকা। সেইজন্য আমাদের খুব ডাকাতের ভয় ছিল। সন্ধ্যের পর দরজা জানলা বন্ধ করে বসে থাকতুম ভেতরে। সেইজন্যই সন্ধেগুলো আরও অসহ্য বোধ হত। আমাদের বাড়ির কেয়ারটেকারটি যেমন বুড়ো তেমন রোগা, আমরা ওর নাম দিয়েছিলুম লটপট সিং। ডাকাত কেন, সামান্য একটা চোর এলেও বোধহয় ওর কাছ থেকে কোনও সাহায্য পাওয়া যেত না।

একদিন বিকেলবেলা আমরা বাইরের বাগানে বসে চা খাচ্ছি, এমনসময় দেখলুম আমাদের গেটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে দুজন মহিলা আর একটি বাচ্চা ছেলে।

মা জিগ্যেস করলেন, ওরা কারা?

আমি ওদের চিনি না, আগে কখনও দেখিনি। ওরা গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আমাদের দেখতে লাগল কিছুক্ষণ। তারপর গেট ঠেলে ভেতরে ঢুকল।

আমরা চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে তাকিয়ে রইলুম। এ পর্যন্ত গালুডিতে আর কেউ আমাদের বাড়ির গেট দিয়ে ঢোকেনি।

আজও আমি সেই দৃশ্যটি স্পষ্ট দেখতে পাই। একেবারে সামনে রয়েছে রত্নাদি, নীল শাড়ি পরা, বেশ লম্বা চেহারা, পিঠের ওপর চুল খোলা, তাঁর পাশে লাফাতে-লাফাতে আসছে পিকলু, তার বয়েস সাত বছর, কালো হাফ প্যান্ট আর হলদে গেঞ্জি পরেছে সে। তাদের পেছনে, একটু ব্যবধান রেখে আস্তে-আস্তে হেঁটে আসছে এলা, যেন তার ভেতরে আসবার ইচ্ছে ছিল না। এলা পরে আছে একটা হরিণ-রঙা শাড়ি। সমস্ত দৃশ্যটা আমার স্মৃতিতে যেন একটা বাঁধানো ছবি, যদিও তখন আমি তাদের নাম জানতুম না।

প্রথম মহিলাটি একেবারে কাছে এসে হাসিমুখে মাকে বললেন, মাসিমা, আমায় চিনতে পারছেন? আমি রত্না।

মা তখনও চিনতে পারেননি, কৌতূহলের সঙ্গে একটু-একটু হাসি মিশিয়ে চেয়ে রইলেন।

মহিলাটি মাকে প্রণাম করে বললেন, সেই যে গড়পারে আমরা—

মা সঙ্গে-সঙ্গে বললেন ও, তুমি রত্না! সত্যি চিনতে পারিনি প্রথমটায়, এসো, এসো!

একটুক্ষণ কথাবার্তাতেই সব বোঝা গেল।

আমরা একসময় গড়পারে একটা বাড়িতে ভাড়া থাকতুম। সে প্রায় দশ-বারো বছর আগেকার কথা। আমারই সে-বাড়িটার কথা ভালো করে মনে নেই, আমার ছোট বোন তখন জন্মায়নি। রত্নাদিরা থাকতেন পাশের ফ্ল্যাটে। আমাদের থাকার সময়েই রত্নাদি নতুন বউ হয়ে এসেছিলেন সেখানে। সেইটুকুই আমার মনে আছে যে, বিয়ের কোনও উৎসব হয়নি, খাওয়া-দাওয়াও হয়নি, তবু সে-বাড়িতে একজন নতুন বউ এসেছিল। বাড়িতে এবং পাড়াতে সেটা ছিল একটা আলোচ্য বিষয়। আমারও শিশুমনে একটা খটকা লেগেছিল।

শৈলেনদা আর রত্নাদি এক অফিসে চাকরি করতেন। একদিন সন্ধেবেলা রেজিস্ট্রি বিয়ে সেরে ওঁরা একসঙ্গে গড়পারের বাড়িতে চলে আসেন।

আমার মায়ের সঙ্গে রত্নাদির বেশ ভাব হয়ে গিয়েছিল। রত্নাদিদের নতুন সংসার সাজিয়ে দিতে মা সাহায্য করেছিলেন কিছু-কিছু। রত্নাদি সেইসব কথাই বলতে লাগলে উচ্ছ্বসিতভাবে।

রত্নাদির বিয়ের পর আমরা ওই গড়পারের বাড়িতে ছিলুম মাত্র একবছর। তারপর উঠে যাই ভবানীপুরে। রত্নাদিরাও এখন ওই বাড়িতে থাকেন না।

রত্নাদি এলার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, মাসিমা, এ আমার ছোট বোন, আপনি দু-একবার দেখেছেন ওকে, অবশ্য ও তখন খুবই ছোট ছিল...

মা বললেন, হ্যাঁ, একটু-একটু মনে পড়ছে, খুব দুরন্ত ছিল তখন, এখন দেখছি খুব শান্ত!

এলা শুধু শান্ত নয়, প্রায় নির্বাক বলা যায়। একবার শুধু সে মায়ের কোনও একটা প্রশ্নের উত্তরে হ্যাঁ বলেছিল, সেটা না শুনলে ওকে বোবা মনে হতেও পারত।

একটু লম্বাটে মতন মুখ এলার, শ্যামলা রং, চোখ দুটি খুব টানা-টানা। কালো আর গভীর। চোখ তুলে সে মাঝে-মাঝে মুখের দিকে তাকায়, চেয়েই থাকে, কোনও কথা বলে না।

মা রত্নাদিকে জিগ্যেস করলেন, তোমরাও এই গরমে এখানে বেড়াতে এসেছ? আমাদের তো পুজোর সময় আসার কথা ছিল, তখন হয়ে উঠল না, সেইজন্যই তো...তাও তো উনি আসতে পারলেন না...

রত্নাদি একটুক্ষণ মাটির দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর মুখ তুলে বললেন, মাসিমা, শৈলেন খুব অসুস্থ। আর কতদিন বাঁচিয়ে রাখতে পারব তা জানি না।

আমি বিষম চমকে উঠেছিলুম। কী শান্তভাবে কথাটা বলেছিলেন রত্নাদি। গলার আওয়াজে কোনওরকম দুঃখ বা উচ্ছ্বাস নেই, যেন জীবনের অনেক ঘটনার মতন এটাও একটা সাধারণ ঘটনা। এটা নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করার কোনও মানে নেই।

আমরা যে পরিবেশে মানুষ, সেখানে কোনও স্ত্রীকে প্রকাশ্যে তার স্বামীর নাম উচ্চারণ করতে শুনতুম না সেই সময়ে। কিন্তু রত্নাদি এমনভাবে শৈলেন কথাটা উচ্চারণ করলেন, যেন সেটা তাঁর কোনও ঘনিষ্ঠ বন্ধুর নাম।

রত্নাদির ওই কথা শুনে এলা এক দৃষ্টিতে তার দিদির দিকে তাকিয়েছিল, কোনও কথা বলেনি। পিকলু তখন একটু দূরে আমার ছোট বোনের সঙ্গে খেলা শুরু করেছে।

শৈলেনদার যে ঠিক কী অসুখ তা বুঝলুম না। তবে শুনলুম যে উনি শুকনো জায়গায় এলে ভালো থাকেন। রত্নাদি অফিস থেকে ছুটি নিয়ে এখানে একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে আছেন। পুরো গ্রীষ্মের তিন মাস এখানে কাটিয়ে যাবেন। ওঁরা এসেছেন দেড়মাস আগে।

মা রত্নাদিদের চা খাওয়ালেন। তারপর ওঁরা যখন বিদায় নেওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন, তখন মা আমাকে বললেন, ওদের একটু এগিয়ে দিয়ে আয় তো, নীলু!

রত্নাদি হেসে বললেন, আমাদের এগিয়ে দিতে হবে না, এতদিনে আমাদের সব চেনা হয়ে গেছে।

তার পরই মন বদলে আবার বললেন, আচ্ছা এসো নীলু, আমাদের বাড়িটা চিনে যাবে। মাসিমাকে নিয়ে আসবে একদিন—

বিকেল শেষ হয়ে এসেছে, পশ্চিম দিগন্তে যেখানে আকাশ মিশেছে সেদিকটা লালে লাল। আমরা সেইদিকেই এগিয়ে যাচ্ছি। সারা পথ রত্নাদি আমার সম্পর্কে অনেক কথা জিগ্যেস করলেন। এলা তখনও কোনও কথা বলল না, মনে হয় যেন আমাদের কথা শুনছেও না। মেয়েটা লাজুক না অহংকারী?

রত্নাদিদের বাড়িটা বেশ দূরে। একটা বড় মাঠ পেরিয়ে খুব ফাঁকা জায়গায়। স্টেশন থেকে যতদূরে হয়, ততই বাড়ি-ভাড়া কমে যায়।

সেদিন আর রত্নাদিদের বাড়ির মধ্যে যাইনি, রত্নাদিও ডাকেননি ভেতরে। হঠাৎ আকাশ অন্ধকার হয়ে এসেছিল। রত্নাদি বলেছিলেন, মাঝে-মাঝে চলে এসো, নীলু! আমরা প্রায় সব সময়েই বাড়িতে থাকি। আর হ্যাঁ, শোনো, ভালো কথা মনে পড়েছে! তুমি কি ট্রেনে চেপে ঝাড়গ্রাম যেতে পারবে?

আমি বললুম, আমি তো প্রায়ই যাই।

—একটা ওষুধ আনতে হবে, এখানে পাওয়া যাচ্ছে না, তুমি এনে দিতে পারবে?

আমি তৎক্ষণাৎ বানিয়ে বললুম, আমি তো কালকেই ঝাড়গ্রামে যাব বাজার করে আনতে।

—তাহলে তো ভালোই হল।

সেদিন ওখান থেকে ফেরার পথে আমি বেশ ভয় পেয়েছিলুম মনে আছে। অথচ ভয় পাওয়ার কোনও কারণ ছিল না, আমি তেমন একটা ভীতুও নই।

এবড়ো-খেবড়ো পাথর ছড়ানো বড় মাঠটা পেরিয়ে আসবার সময় হঠাৎ সাংঘাতিক ঝড় উঠেছিল। চতুর্দিক শোঁ-শোঁ শব্দে কেঁপে উঠল। ঘূর্ণিপাক খেয়ে উড়তে লাগল ধুলো, কোনও দিকে কিছুই দেখা যায় না। আমার মনে হল, এখন ছুটতে গেলেই আমি দিক ভুল করব।

মাঠের মধ্যে ঝড় দেখে ভয় পাওয়ার ছেলে আমি নই। কিন্তু তার একটু আগেই, রত্নাদিদের বাড়ির গেট পেরুবার একটু পরেই আমার মনে হয়েছিল, আমার জীবনে এবারে একটা পরিবর্তন আসছে। আমি সাবালকদের জগতে প্রবেশ করেছি, এবার শিগগিরই এমন কিছু ঘটবে যার ফলে বদলে যাবে আমার বাকি জীবনের গতি।

এই কথা ভাবতে-ভাবতে খানিক দূর আসার পরই অকস্মাৎ ওরকম ঝড় ওঠায় আমি বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিলুম। এই যে অন্ধ ঝড়, যার মধ্যে কোনও দিক বোঝা যায় না, এই কি তাহলে আমার ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতীক?

যাই হোক, সেই সন্ধেবেলা ঠিকঠাকই বাড়ি পৌঁছেছিলুম।

রত্নাদি যদি ঝাড়গ্রাম থেকে আমাকে ওষুধ আনবার কথা না বলতেন, তাহলে হয়তো পরের দিনই আমার ও-বাড়িতে যাওয়া হত না। যদিও আমার তৃষিত মন চাইছিল মানুষের সঙ্গ, কিন্তু রত্নাদিদের বাড়িতে যাব কি যাব না তা ভেবে ভেবে মন ঠিক করতে আমার দু-তিনদিন লেগে যেত।

ওষুধ নিয়ে পৌঁছবার পর সেদিন দেখলুম শৈলেনদাকে। শৈশবের অস্পষ্ট স্মৃতিতে শৈলেনদাকে মনে ছিল একজন শক্ত-সমর্থ পুরুষ হিসেবে। এখন দেখলুম বিছানার সঙ্গে একেবারে লেগে যাওয়া একজন কঙ্কালসার মানুষ। একটানা দু-তিনমিনিট কথা বলতে পারেন না, তার পরই দারুণ হাঁপানি ওঠে।

তবু আমি বিস্মিত হয়ে পড়ি অন্য কারণে। শৈলেনদা একবারও তাঁর অসুখের কথা বলেন না। মুখে ব্যথা-বেদনার কোনও চিহ্ন নেই। অত হাঁপানির মধ্যেও একটু সুযোগ পেলেই ঠাট্টা-ইয়ার্কি করেন, নিজেও হেসে ওঠেন। এরা অন্য ধরনের মানুষ।

রত্নাদি আমার পরিচয় দেওয়ার পর শৈলেনদা বললেন, ও হ্যাঁ, মনে আছে...তোমার বাবা তো ভীষণ ব্যস্ত মানুষ, সেই সকালে বেরুতেন আর ফিরতেন অনেক রাতে। আমি একদিন জিগ্যেস করেছিলুম, দাদা, আপনি আপনার ছেলেদের কারুকে রাস্তায় দেখলে চিনতে পারবেন? হা-হা-হা!

সেদিন রত্নাদি আমায় বলেছিলেন, নীলু, তুমি কি রোজ বাজার যাও? তাহলে আমাদের কিছু আলু আর পেঁয়াজ এনে দেবে? অনেকটা দূর তো, তাই আমরা রোজ বাজারে যাই না। অবশ্য তোমার যদি অসুবিধে না হয়...

কয়েকদিন পরে বোঝা গেল, আমি যে শুধু আমাদের বাড়িরই হেড অফ দা ফ্যামিলি তাই-ই নয়, রত্নাদিরাও অনেক ব্যাপারে আমার ওপরে নির্ভর করেন। উনিশ বছর বয়েসে দুটি সংসারের দায়িত্ব আমার ওপর। সকাল-বিকেল দু-বেলাই আমাকে রত্নাদিদের বাড়িতে যেতে হয়। আমাদের বাড়ির কেয়ারটেকারের একটি সাইকেল ছিল, আমি ব্যবহার করতে লাগলুম সেটা, ফলে অনেক সুবিধে হয়ে গেল।

অনেক গল্প-উপন্যাসে দেখা যায়, মধুপুর বা শিমুলতলার মতন জায়গায় বেড়াতে গেলে উঠতি বয়েসের ছেলেমেয়েদের মধ্যে একটা প্রেমের ব্যাপার হয়ে যায়, সেটা খানিকটা মধুর বিরহে শেষ হয়। কিন্তু এলার সঙ্গে আমার প্রেম হয়নি। এলা প্রায় আমারই বয়েসি, কলেজে সে আমার চেয়ে এক ইয়ার নীচে পড়ে, আমাদের মধ্যে প্রেম না হোক বেশ একটা বন্ধুত্ব হওয়া তো স্বাভাবিকই ছিল। আমার দিক থেকে ইচ্ছেও ছিল যথেষ্ট। তবু সেরকম কিছু হয়ে উঠল না।

এলা সত্যিই বড় কম কথা বলে। ওদের বাড়িতে যখনই যেতুম, দেখতুম সে কোনও বই নিয়ে বসে আছে। রান্নাঘরে তাকে রান্না করতে, কুয়ো থেকে জল তুলতেও তাকে দেখেছি। কিন্তু তার বই হাতে নিয়ে বসে থাকা ছবিটিই বেশি মনে পড়ে।

এলা যে আমার সঙ্গে একেবারে কথা বলত না তা নয়। চা খাবেন? বা, আপনাদের বাড়িতে খবরের কাগজ আসে? এই ধরনের মামুলি কথা সে বলত ঠিকই, কিন্তু তার মনটাকে সে যেন রেখেছিল একটা খড়ির গণ্ডি দিয়ে ঘিরে, যার মধ্যে সে কারুকে প্রবেশ করতে দেবে না। অনেক সময় কোনও কথা না বলে সে শুধু আমার চোখের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকত, সেটাই আমার অদ্ভুত লাগত। মেয়েরা সাধারণত পুরুষদের চোখের দিকে স্পষ্টভাবে তাকায় না।

পরের শনিবার কলকাতা থেকে এসে উপস্থিত হল অজিতদা আর সুকোমলদা। এদের মধ্যে অজিতদা হল রত্নাদির ছোটভাই আর সুকোমলদা তার বন্ধু। শৈলেনদার আত্মীয়-স্বজন বিশেষ কেউ নেই, রত্নাদির বাড়ির লোকেরাই মাঝে-মাঝে ওদের দেখাশুনো করতে আসে। পনেরো দিন অন্তর একবার। শনিবার বিকেলে এসে সোমবার চলে যায়।

যদিও ওরা আসে অসুস্থ শৈলেনদার খোঁজ-খবর নিতে, কিন্তু ওদের ব্যবহারের মধ্যে একটা বাইরে বেড়াতে আসার মেজাজ থাকে। বাড়িটা হইহল্লায় সরগরম হয়ে ওঠে। বাগানে মুরগি কাটা হয়। সন্ধের পর সুকোমলদার ব্যাগ থেকে বেরিয়ে পড়ে রামের বোতল। এমনকী শৈলেনদাকেও সেই রাম খাওয়ানোর চেষ্টা হয়েছিল, দু-চুমুক দিয়েই শৈলেনদা দারুণ কাশতে শুরু করেছিলেন।

সুকোমলদা সদ্য ডাক্তারি পাস করে হাউস সার্জেন হয়েছে তখন, এই ধাবধাড়া গোবিন্দপুরে এসে তার চালচলন বিধান রায়ের মতন। শৈলেনদার বুক পিঠ পরীক্ষা করে গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বলে, শুনুন, জামাইবাবু, আমি যা বলছি, তা যদি ঠিকঠাক মেনে চলেন, তাহলে দু-সপ্তাহের মধ্যে আপনাকে খাড়া করে দেব!

শৈলেনদা হেসে বলেছিলেন, ওরে, অনেক টাকা খরচ করে অনেক বড় ডাক্তার দেখিয়েছি। আমি কি ছেলেমানুষ যে আমাকে মিথ্যে স্তোকবাক্য দিয়ে ভোলাবি? এখানে এসেছিস, একটু আনন্দ ফুর্তি কর। কাল তোরা সবাই মিলে চিলকিগড় ঘুরে আয় না!

প্রথম দিন গালুডিতে পৌঁছোবার এক ঘণ্টা বাদেই আমি দেখেছিলুম, সুকোমলদা এলাকে বিরক্ত করতে শুরু করে দিয়েছে। আমি না হয় খুব লাজুক, কিন্তু সুকোমলদা তো গল্পের বাইরের চরিত্রের মতন, স্বাস্থ্য ভালো, ডাক্তারি পাস করেছে, পরিপূর্ণ সার্থক একজন যুবক। সে এলার মতন একজন যুবতী মেয়েকে দেখলে প্রেম না হোক একটু ফষ্টিনষ্টি তো করতে চাইবেই। আমার সামনেই সুকোমলদা এলার পিঠে একটা চাপড় মেরে বলল, এই মেয়েটা এত লাজুক কেন? কথাই বলে না!

সেদিন আমি ও-বাড়িতে বেশিক্ষণ থাকিনি।

পরের দিনও সকালে ও-বাড়িতে যাইনি অন্যদিনের মতন। বাজার-টাজার করবার জন্য আর তো আমার প্রয়োজন হবে না, দুজন শক্ত-সমর্থ পুরুষ মানুষই তো এসে গেছে।

বিকেলবেলা অজিতদা আর সুকোমলদা পিকলু আর এলাকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের বাড়িতে এসে হাজির। মা-র সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করল। তারপর সুকোমলদা আমাকে বলল, নীলু, তুমি আমাদের সঙ্গে চলো, আমরা একটু বেড়াব।

একথা ঠিক, সুকোমলদা কক্ষনো আমার সঙ্গে একটুও খারাপ ব্যবহার করেনি। আমাকে সে প্রতিযোগী হিসেবে ভাবেনি মোটেই। সেকথা সে ভাববেই বা কেন, আমি তো এলার প্রেমিক ছিলাম না, এমনকী বন্ধুও হতে পারিনি। ফাঁকা রাস্তা দিয়ে বেড়াবার সময় সুকোমলদা এলার কাঁধ জড়িয়ে ধরত, আমাকে ধর্তব্যের মধ্যেই গণ্য করত না। বোধহয় আমাকে মনে করত ছেলেমানুষ।

এলা কিন্তু সুকোমলদাকে দেখে গদগদ হয়ে যায়নি। স্বভাব পালটায়নি সে। সুকোমলদার মতন একজন আকর্ষণীয় ও উৎসাহী যুবককে দেখেও প্রগল্‌ভা হয়ে ওঠেনি সে। সুকোমলদা তার কাঁধ জড়িয়ে ধরলে সে আস্তে-আস্তে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়েছে। রেগে চ্যাঁচামেচিও করেনি, আবার প্রশ্রয়ও দেয়নি।

গালুডিতে আমাদের থাকার কথা ছিল কুড়ি-একুশ দিন। আমার ছোট-ভাইবোনরা দশ-বারোদিনের মধ্যেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। ওই বয়সে প্রকৃতি বেশি ভালো লাগে না। বন্ধু-টন্ধুর অভাবেই ওরা চঞ্চল হয়ে পড়েছিল। রোজই বায়না ধরত, মা, আর ভালো লাগছে না। এবার ফিরে চলো!

মা বলতেন, এত খরচ-পত্তর করে আসা, এর মধ্যেই ফিরে যাবি কী রে! দাঁড়া, আগে তোদের বাবা আসুক। এখানকার জল খুব ভালো—।

বাবা আসবেন-আসবেন করেও আসতে পারছিলেন না। চিঠিতে জানিয়েছিলেন, থাকো, আরও কয়েকটা দিন থেকে যাও!

এক পক্ষ কাল ঘুরে যাওয়ার পর অজিতদা সুকোমলদা আবার এল কলকাতা থেকে। এবারে সঙ্গে আর-একজন বন্ধু, তার নাম সৌমিত্র। সে খুব ভালো গান করে। শনিবার সন্ধেবেলা বসল গানের আসর। পরের রবিবার পূর্ণিমা, ঠিক হল, সেদিন বাগানে চাঁদের আলোয় পিকনিক হবে! সুকোমলদা আমাকে বলল, নীলু, তুমি বাড়িতে বলে আসবে, কাল রাতে তোমার ফেরা হবে না। বেশি রাত হয়ে যাবে, তুমি এখানেই শুয়ে থাকবে। কিংবা আমরা সারারাতই জাগতে পারি।

মা অবশ্য আমার বাইরে রাত কাটানোর প্রস্তাবে রাজি হননি। অন্যান্য কারণ ছাড়াও, ডাকাতির ভয় আছে, আমাদের বাড়িতে আর কোনও পুরুষ মানুষ তো নেই। মা বলেছিলেন, এগারোটার মধ্যে ফিরে আসিস।

রত্নাদিও রাত্তিরবেলা বাগানে পিকনিক করার ব্যাপারটা ভালোভাবে গ্রহণ করেননি। সন্ধের দিকে তিনি বলছিলেন, অজিত, তোরা বরং সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে পাহাড়ের দিকে চলে যা না! জানিস তো, তোর জামাইবাবু এইসব হইচই কত ভালোবাসত! এখন নিজে জয়েন করতে পারে না। ঘরে শুয়ে-শুয়ে সব আওয়াজ শুনবে, ওর খারাপ লাগবে!

একথা শুনে সুকোমলদা সহাস্যে বলেছিল, তুমি বলছ কী, মেজদি! এই ব্যাপারটা আমরা ভাবিনি? জামাইবাবুর অসুখটা তো বেশির ভাগই সাইকোলজিক্যাল। আজ ওকেও আমরা পিকনিকে নিয়ে আসব। বাগানে খাটে শুয়ে থাকবে।

শৈলেনদা সব শুনে খুব উৎসাহ দেখিয়ে বলেছিলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আজ আমি বেশ ভালো আছি। কতদিন খোলা আকাশের নীচে শুয়ে চাঁদের আলো দেখিনি। আমি যাব—

কেন যেন সেই পিকনিকে আমি খুব আনন্দ পাইনি। শৈলেনদা বারবার কাশছিলেন। সুকোমলদা আর সৌমিত্রদা রামের বোতল আর গান নিয়ে নিজেদের মধ্যে মশগুল হয়ে রইল। একবার তারা এলাকে খুব পীড়াপিড়ি করতে লাগল গান গাইবার জন্য। এলা কিছুতেই গান গাইবে না। ওরা এলার হাত ধরে জোর করে টেনে এনে বসিয়ে দিল ঘাসের ওপর। এলা মুখ গোঁজ করে রইল তবু। আমার মনে হল, কয়েকজন অত্যাচারী পুরুষ এলাকে বন্দি করে রেখেছে। কিন্তু আমি কী করব। আমি তো এলার প্রেমিকও নই, বন্ধুও নই।

রাত সাড়ে দশটার সময় আমি উঠে পড়লুম। অন্য কারুর কাছে বিদায় নেওয়ার কোনও দরকার নেই, আমি শুধু রত্নাদিকে বললুম, আমি যাচ্ছি রত্নাদি, মা চিন্তা করবেন। রত্নাদি একটুও আপত্তি করলেন না। মাথা নেড়ে বললেন, যাও। তোমার কাছে টর্চ আছে তো, নীলু?

গেটের কাছে এসে দেখি সেখানে এলা দাঁড়িয়ে আছে। কাঁদছিল কি? কি জানি, আমি তার চোখ দেখিনি। জায়গাটা বেশ অন্ধকার, কোনও মেয়ের মুখের ওপর টর্চও ফেলা যায় না।

আমাকে দারুণ চমকে দিয়ে এলা বলল, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।

আমি শুকনো গলায় বললুম, আমার...আমার সঙ্গে?

—হ্যাঁ।

—বলো!

আমার মুখের দিকে বড়-বড় চোখ দুটি মেলে এলা চুপ করে রইল। অন্ধকারের মধ্যেও যেন আমি দেখতে পেলুম তার কালো চোখের গভীরতা। এইরকম ভাবে পল, অনুপল খরচ হতে-হতে কত সময় কেটে গেল কে জানে!

একসময়ে অজিতদা এল, এলা, তোমাকে সুকোমল ডাকছে, এই বলে এগিয়ে আসতে লাগল আমাদের দিকে। আমরা দুজনেই মুখ ঘোরালুম সেদিকে। অজিতদা নিরীহ, ভালোমানুষ ধরনের, তার বন্ধুরা কীসে খুশি হয় তাই দেখার জন্যই সবসময় সন্ত্রস্ত।

এলা আমাকে বলল, আজ থাক। তুমি কাল আসবে? কাল সকালে ওরা চলে গেলে, তারপর বলব। ঠিক এসো—।

সে রাতে কি আমি ঘুমোতে পেরেছিলুম, একটুও? শুধু বিছানায় শুয়ে ছট্‌ফট করেছি। চোখের সামনে শুধু ভেসে উঠেছে গেটের কাছের সেই দৃশ্যটা। এলা কি ওখানে আমারই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল? এতদিন বাদে সে একসঙ্গে অতগুলো কথা বলেছিল, যেন সেই মুহূর্তে সে খড়ির গণ্ডিটা মুছে দিয়ে কাছে ডেকেছিল আমাকে।

আসলে রাত্তিরে বিছানায় শুলে সকলেই কোনও এক সময় ঠিক ঘুমিয়ে পড়ে। আমার যখন ঘুম ভাঙল, তখন সকাল আটটা বেজে গেছে। মা আমায় ডেকে তুলে বললেন, চা খাবি না? আজ আর বাজারে যেতে হবে না।

বাইরে অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে।

বছরের প্রথম বৃষ্টি, বাইরের দিকে তাকালে আরামের আমেজ লাগে। অন্যান্য দিন সকাল ন'টার মধ্যেই চচ্চড়ে রোদে একেবারে ঝলসে যেত চারদিক। আজ সজল স্নিগ্ধ রঙে ছেয়ে আছে পৃথিবী। গাছপালাগুলো আর রুক্ষ মাটি হ্যাংলার মতন চোঁ-চোঁ করে টেনে নিচ্ছে বৃষ্টির পানীয়।

আমি বারান্দায় বসে বৃষ্টি দেখছি বটে কিন্তু আমার বুকের মধ্যে সবসময় বেজে চলেছে একটা দামামা। এলা আমাকে কিছু বলবে! এলা আমাকে কিছু বলবে!

কী বলবে এলা? এমন কোনও কথা, যা অজিতদার সামনে বলা যায় না! অন্ধকারে গেটের সামনে দাঁড়িয়েছিল আমারই অপেক্ষায়? আমি কি এতখানি যোগ্য! এর আগে তো সে একবারও অন্তরঙ্গ সুরে কথা বলেনি আমার সঙ্গে। মাঝে-মাঝে শুধু স্থিরভাবে তাকিয়ে থেকেছে, আমি কি ওর চোখের ভাষা বুঝতে পারিনি?

বৃষ্টি থামল সাড়ে ন'টার পর। এখন সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়া যায়। মনটা যদিও ছুটে যেতে চাইছে, কিন্তু আরও একটুক্ষণ অপেক্ষা করাই ঠিক করলুম। দশটার পর অজিতদারা বেরিয়ে ট্রেন ধরতে যাবে। এখন গোছগাছ চলছে, এই সময় গিয়ে পড়লে কোনও কথাই হবে না। তা ছাড়া সুকোমলদা হয়তো আমাকে স্টেশন পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে চাইবে। আগেরবার তাই করেছিল। থাক আর-একটু দেরি করে যাওয়াই ভালো, অজিতদারা বেরিয়ে পড়ুক বাড়ি থেকে। এলাও সেই কথাই বলেছিল, ওরা চলে গেলে—

আমাদের বাড়ির কাছ দিয়েই ট্রেন লাইন গেছে, কখন কোন ট্রেন যায় আসে আমরা আওয়াজ শুনতে পাই। কলকাতার ট্রেনের জন্য কান খাড়া করে রইলুম।

তার মধ্যে আবার বৃষ্টি এল ঝেঁপে। এবারে আর বড়-বড় ফোঁটা নয়, এখন বেশ জোরে বাতাস বইছে, তার সঙ্গে ঢেউ-এর মতন আসছে বৃষ্টি। এরই মধ্যে ঝমঝমিয়ে চলে এল কলকাতার ট্রেন। বাড়িতে ছাতা বা রেইন-কোট নেই, কিন্তু একদিন বৃষ্টিতে ভিজলে কিচ্ছু আসে যায় না।

জামাটা গায়ে চড়িয়ে বললুম, মা, আমি একটু বেরুচ্ছি!

মা বললেন, এই বৃষ্টির মধ্যে? কোথায় যাবি? বললুম যে আজ বাজারে যাওয়ার দরকার নেই। ডিমের ঝোল করে দেব।

—একটু রত্নাদিদের বাড়ি থেকে ঘুরে আসব!

—এই বৃষ্টি মাথায় করে? কালই তো মাঝরাত্তির পর্যন্ত সেখানে ছিলি! আজ সকালেই আবার যেতে হবে কেন?

আমি চুপ করে রইলুম। কাল অত রাত করে ফেরার পর আজ সকালেই আবার ছুটে যাওয়ার কী যুক্তি আমি দেখাব?

আমি এখন হেড অফ দা ফ্যামিলি। যখন যেখানে খুশি যেতে পারি। এর আগে মায়ের কাছে কোনও যুক্তি দেখাবার প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু এখন রত্নাদিদের বাড়ির কথা একবার বলে ফেলে একটা দারুণ লজ্জা আমায় ছেয়ে ফেলল। কেন সেখানে যেতে চাই তা মাকে বলা যাবে না।

চুপ করে বসে রইলুম বারান্দায়। কিন্তু বৃষ্টির রূপ দেখার মন আমার নেই। এই বৃষ্টি আমার অসহ্য লাগছে। আগে কোনওদিন আমার বৃষ্টির ওপর এত রাগ হয়নি।

অজিতদাদের ট্রেন ধরতে হবে, তারা নিশ্চয়ই বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করেনি। এতক্ষণে বাড়ি ফাঁকা। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, রত্নাদি রয়েছেন রান্নাঘরে, পিকলু বারান্দায় খেলছে, আর এলা একটা বই সামনে নিয়ে বসে আছে। নিশ্চয়ই সে বারবার চোখ তুলে দেখছে গেটের দিকে। সামান্য বৃষ্টির জন্য আমি তার কাছে যাইনি। নিশ্চয়ই সে আমাকে কাপুরুষ ভাবছে।

এক-একবার ইচ্ছে হচ্ছিল মাকে কিছু না বলে ছুটে চলে যাই। কিন্তু বৃষ্টি আর হাওয়ার বেগ দুটোই বেড়েছে। এর মধ্যে বিনা কাজে বেরুনো খুবই অস্বাভাবিক। আমি তো সেরকম গোঁয়ার বা অবাধ্য ধরনের ছেলে ছিলাম না।

সেই বৃষ্টি থামল প্রায় পৌনে একটায়। মা তখনই আমাকে খেতে ডাকলেন। এই সময় কারুর বাড়িতে যাওয়াও ঠিক নয়। বারোটা থেকে তিনটে, এই সময় অযাচিতভাবে কেউ কারুর বাড়ি যায় না, এরকম একটা অলিখিত নিয়ম আছে। ও-বাড়িতে গেলে রত্নাদিই হয়তো আমাকে প্রথম দেখবেন, একটু অবাক হয়ে তাকাবেন। কিংবা দুপুরবেলা ও-বাড়ির দরজা বন্ধ থাকবে, আমি দরজা ধাক্কা দিলে ঘুম থেকে উঠে এসে রত্নাদি জিগ্যেস করবেন, কী ব্যাপার?

আড়াইটের সময় আবার বৃষ্টি ফিরে এল। এবারে বেশ হালকা, ঝিরঝিরে। কে বলবে গতকাল দুপুরেই এ-অঞ্চলে কী প্রচণ্ড গরম ছিল, এখন বেশ ঠান্ডা শিরশিরে ভাব।

জানলার পাশে এসে আমাদের কেয়ারটেকার লটপট সিং জানাল, এরকম সারাদিন ধরে বৃষ্টি এ-অঞ্চলে সাধারণত হয় না। এ যেন বঙ্গাল বারিষ-এর মতন।

আমি তখন প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছি, বৃষ্টি থামুক বা না থামুক, ঝড়-বজ্রপাত যা কিছু শুরু হোক, তিনটে বাজলেই আমি বেরিয়ে পড়ব।

মা, আমি যাচ্ছি! বলে উত্তরের অপেক্ষা না করেই আমি চলে এলুম গেটের বাইরে। বৃষ্টি থামেনি। জোরও হয়নি। সাইকেলটা নেওয়ার কথা মনে পড়েনি। আমাদের বাড়ির রাস্তাটুকু ছাড়াবার পরেই আমি দৌড় শুরু করে দিলুম। অন্ধকারে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে এলা আমাকে বলেছিল, তোমার সঙ্গে কথা আছে। এখনও নিশ্চয়ই সে আমার অপেক্ষায় গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকবে।

রত্নাদিদের বাড়ির কাছে এসে দেখলুম গেটটা হাট করে খোলা। ভেতরের দরজাটাও খোলা। আমার বুকটা ধক্ করে উঠল। কী যেন একটা কিছু ঘটেছে। তারপর লক্ষ্য করলুম বাগানের মধ্যে একটা ট্রাক দাঁড় করানো।

আমি গেটের কাছে এসে পৌঁছতেই বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এল অজিতদা। এ কি, অজিতদারা যায়নি সকালের ট্রেনে! কেন?

অজিতদা আমাকে দেখে বলল, তুমি এসে পড়েছ? তোমাদের বাড়িতে লোক পাঠাতে যাচ্ছিলুম।

একটু থেমে, মাটির দিকে চোখ করে, নীচু গলায় বললে, সাড়ে দশটার সময় শৈলেনদা মারা গেছেন!

আমার উনিশ বছরের জীবনের সবচেয়ে বড় শোক অনুভব করছিলুম সেই মুহূর্তে। শৈলেনদার জন্য নয়। এটা মৃত্যুর বাড়ি, এখানে অন্য কোনও কথা হবে না। এলা আমাকে তার সেই কথাটা বলতে পারবে না।

সাড়ে দশটার পর অনেকটা সময় কেটে গেছে, কান্নাকাটির পালাও চুকে গেছে। এখন সবাই নানা রকম ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত। রত্নাদিকে অন্যদিনের মতনই শক্ত দেখলুম। তিনি জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা করছেন। সন্ধের আগেই ওঁরা ট্রাকে করে সবাই মিলে রওনা হবেন কলকাতার দিকে। কী একটা ইনসিওরেন্সের ব্যাপারে শৈলেনদার দেহ কলকাতায় নিয়ে গিয়ে পোড়ালেই সুবিধে হবে।

আমি এক ফাঁকে বেরিয়ে গিয়ে মাকে নিয়ে এলুম এ-বাড়িতে। তারপর চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম বাগানে। আমার আর কিছুই করার নেই। এলার সঙ্গে কয়েকবার চোখাচোখি হয়েছে। তার দৃষ্টির ভাষা আমি বুঝতে পারিনি। তাতে কি ভর্ৎসনা ছিল? কিংবা, এলা কাল রাতের কথা ভুলে গেছে? আমাকে সে আর কিছু বলতে চায় না?

ওদের ট্রাক গালুডি ছেড়ে চলে যাওয়ার পর প্রথম জল এল আমার চোখে। জামার হাতায়

যতবার চোখ মুছি তবুও কান্না থামে না।

তারপর আর কোনওদিন এলাকে দেখিনি। রত্নাদি কোথায় থাকেন জানি না। আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার কোনও প্রয়োজনীয়তা ওঁরা বোধ করেননি। সেইটাই তো স্বাভাবিক।

আমার জীবনে সেই প্রথম একটি নারী আমাকে বলেছিল, আমাকে সে নিরালায় কিছু জানাতে চায়। কী বলতে চেয়েছিল এলা? আমি কিছুতেই তা অনুমান করতে পারি না আজও। হয়তো খুবই সাধারণ কোনও কথা। বোধহয় কোনও বই চাইত। কিন্তু অজিতদাকে দেখে থেমে গিয়েছিল কেন?

সেই কথাটা শোনা হয়নি, এলাকে আর কখনও দেখিনি, তাই আজও আমার জীবনে একটা শূন্যতা বোধ রয়ে গেছে। বৃষ্টির দিনে মনে পড়ে, শূন্যতাবোধটা আরও বেড়ে যায়, জানা হয়নি। একজন নারীকে, সে কিছু বলতে চেয়েছিল, আমার শোনা হয়নি!

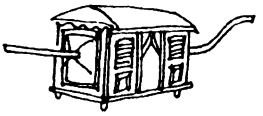

সহযাত্রী

বাথরুম থেকে ফিরে এসে কমলিকা চোখ বড়-বড় করে বলল, জানো, একটা লোক বসে আছে, হাতে হ্যান্ডকাফ...পাশে দুজন পুলিশ...লোকটার চোখ দুটো দেখলেই ভয় করে...

ট্রেনটা ব্রিজের ওপর দিয়ে যাচ্ছে বলে ঝমঝম শব্দ হচ্ছে, সুমিত্রা ভালো করে শুনতে পেল না মেয়ের কথা। জানলা থেকে মাথাটা সরিয়ে এনে জিগ্যেস করল, কী বললি?

কমলিকার মুখখানা এমনিতেই দেখলে মনে হয় বিস্ময় মাখানো। এখন ভুরু দুটো কপালের ওপর অনেকখানি তোলা। সে বলল, একটা ডাকাত!

ওপরের বাঙ্কে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে মনোজিৎ, বুকের ওপর একটা মোটা গোয়েন্দা বই, সারাদিনে সে প্রায় অর্ধেকটা পড়ে ফেলেছে, বই থেকে চোখ সরিয়ে সে একবার মেয়ের দিকে তাকাল। কমলিকা বানিয়ে-বানিয়ে কথা বলতে ওস্তাদ। এই গল্পটি নিশ্চয়ই তার ছোটভাইয়ের জন্য।

বাবুনও একটা কমিকস পড়ছিল। সে সঙ্গে-সঙ্গে বলল, ডাকাত? কোথায়? কোথায়?

বাবুন নেমে পড়েছে। মনোজিৎ সুমিত্রার চোখে চোখ ফেলে বলল, উঁহু, ওকে যেতে দিও না।

বাবুন অতি দুরন্ত। সে যাওয়ার পথে চলন্ত ট্রেনের দরজা খুলে ফেলেছিল। তাকে সবসময় চোখে-চোখে রাখতে হয়।

তাদের পাশে বসা দু-তিনজন লোক ঝিমোচ্ছে। কয়েকজন এমনিই চোখ চেয়ে বসে আছে, বইও পড়ছে না, কিছু না। তারা কেউ কমলিকার কথা শুনে কোনওরকম চাঞ্চল্য দেখাল না।

বাবুন যাবেই, সুমিত্রা তার হাত চেপে ধরেছে।

কমলিকা বলল, মা, আমি ওকে নিয়ে যাচ্ছি। আয় বাবুন!

একটু বাদেই বাবুন ফিরে এসে বলল, মা দেখবে এসো, দেখবে এসো! একটা সত্যি-সত্যি ডাকাত, লাল-লাল চোখ, অ্যাত্ত বড়-বড় চুল!

ছেলেমেয়েরা সুমিত্রাকে প্রায়ই ঠকায়। এখন বোধ হয় ভাই-বোন যেন একসঙ্গে যুক্তি করেছে। সে বলল, যাঃ!

বাবুন মায়ের হাত ধরে টানাটানি করল, তবু সুমিত্রা গেল না। বাবুন ফিরে গেল আবার।

পরের স্টেশন এসে পড়তেই ওপর থেকে মনোজিৎ বলল, ওরা গেল কোথায়, ওদের ডাকো?

মনোজিৎ কর্মব্যস্ত লোক, সারাবছর তাকে অফিসের কাজে প্রচণ্ড খাটতে হয়। কিন্তু যখন সে সপরিবারে বেড়াতে বেরোয়, তখন সে একেবারে আলস্যের চূড়ান্ত করে নেয়। সারাদিন শুয়ে-শুয়ে গল্পের বই নিয়ে কাটায়। এমনকি ট্রেন জার্নির সময় কোনও স্টেশন থেকে ওয়াটার বটলে জল ভরতে হলেও সে স্ত্রীকে বলে, যাও না, নিয়ে এসো। আজকাল মেয়েরা তো সবকিছুই পারে!

সুমিত্রাকে যেতে হল না। বাবুন আর কমলিকা তক্ষুনি ফিরে এল। দুজনেই খুব উত্তেজিত। ওদের কথা শুনে এখন বোঝা যাচ্ছে, ব্যাপারটা বানানো নয়। মাঝখানের কোন স্টেশন থেকে পুলিস একজন কয়েদিকে নিয়ে ট্রেনে উঠেছে। লোকটি নিশ্চয়ই কোন বিপজ্জনক আসামি, কেন না পুলিশরা মাঝে-মাঝে চড় মারছে তাকে। লোকটা দাঁত কিড়মিড় করছে রাগে। তাগড়া চেহারা।

ওরা কখনও জ্যান্ত ডাকাত দেখেনি, তাই দারুণ রোমাঞ্চিত। বাবুন বেশ জোরে-জোরে সব কথা বলতে শুরু করায় তার বাপ ওখান থেকে একবার বলল, আস্তে, বাবুন, আস্তে!

একটু বাদে সুমিত্রা কমলিকাকে বলল, এই, দেখিস যেন বাবুন কোথাও যায় না। আমি আসছি বাথরুম থেকে। ...বাথরুম যাওয়াটা একটা অছিলা। সুমিত্রাও আর কৌতূহল চেপে রাখতে পারছে না।

দরজার কাছেই, দুটো বাথরুমের মাঝখানের জায়গাটায় বসে আছে ওরা। দুজন পুলিশের মাঝখানে একজন লোক। হাতে তো হ্যাণ্ডকাফ আছে বটেই, পায়েও দড়ি বাঁধা। মুখটা নীচু করে আছে, তাই সুমিত্রা মুখ দেখতে পেল না ভালো করে। গায়ের জামাটা ছেঁড়া, মাথার চুল উস্কোখুস্কো, কপালের একপাশে খুব সম্ভবত রক্তের দাগ।

কন্ডাক্টর গার্ডের চেয়ারটিতে বসে আছে একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর। শুধু কনস্টেবল নয়, সঙ্গে অফিসারও আছে। তার মানে বেশ বড় ধরনের আসামি।

সুমিত্রার খুব ইচ্ছে করল, ইন্সপেক্টরটিকে জিগ্যেস করে। পুলিশ আর আসামি দেখলেই ঘটনাটা জানতে ইচ্ছে করে খুব। কিন্তু চক্ষুলজ্জায় সুমিত্রা আর কিছু বলতে পারল না।

নিজেদের কিউবিকলে ফিরে এসে সুমিত্রা তার স্বামীর উদ্দেশ্যে বলল, জানো, সত্যি পুলিশরা হাত-পা বেঁধে একটা লোককে নিয়ে যাচ্ছে। এরকম প্রকাশ্যে প্যাসেঞ্জার কম্পার্টমেন্টে নিয়ে যায়?

বই থেকে চোখ না সরিয়ে মনোজিৎ বলল, হুঁ!

কার্লোস নামে এক আন্তর্জাতিক ভয়াবহ দস্যুর কীর্তি-কাহিনি পড়ায় এমনই নিমগ্ন সে যে বাস্তব ডাকাত সম্পর্কে তার কোনও আগ্রহই নেই।

সুমিত্রার পাশে বসা দুজন লোক এবার উঠে গেল।

কমলিকা আর বাবুনও ছুটে গেল আবার।

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে কমলিকা ফিরে এসে বলল, মা, জানো, লোকটা বাঙালি! পানি না বলে জল চাইল!

সুমিত্রা ব্যস্ত হয়ে বলল, তুই বাবুনকে একলা রেখে এলি!

সুমিত্রার ঠিক পাশেই যে লম্বা, রোগামতন লোকটি বসেছিল এতক্ষণ, সে-ও বাঙালি। তাকে পছন্দ হয়নি সুমিত্রার। সে কমলিকার দিকে বারবার বিশ্রীভাবে তাকাচ্ছিল। পনেরোয় পা দিয়েছে কমলিকা, এই বয়েসের মেয়েদের নিয়ে সবসময় সাবধানে থাকতে হয়। বয়েসের তুলনায় কমলিকা এখনও বেশ ছেলেমানুষ রয়ে গেছে।

লম্বা লোকটা দু-একবার ভাব জমাবার চেষ্টা করেছিল, সুমিত্রা পাত্তা দেয়নি। লোকটিকে দেখলে কোনও কোম্পানির সেলসম্যান বলে মনে হয়।

সেই লম্বা লোকটাই আগে ফিরে এল। সোজা সুমিত্রার চোখের দিকে তাকিয়ে খুব পরিচিতের মতন ভঙ্গিতে বলল, ও লোকটা তো অর্ধেন্দু দাশগুপ্ত। সেই বঙ্কা! ব্যাটা ধরা পড়েছে এতদিনে!

সুমিত্রার বুকের মধ্যে ধক করে উঠল। নামটা খুব চেনা লাগছে। কে অর্ধেন্দু দাশগুপ্ত? কী করেছিল সে? নামটা কার মুখে শুনেছে?

সুমিত্রা আবার চোখ তুলতেই দেখল লম্বা লোকটি সোজা তার দিকে চেয়ে আছে। কোনও দ্বিধা নেই। সে যেন ধরেই নিয়েছে যে সুমিত্রা এখন আর তার সঙ্গে কথা বলতে আপত্তি করবে না!

আমি দেখেই চিনেছি, কাগজে দু-তিনবার ছবি বেরিয়েছিল। ইন্সপেক্টরটা ওখানে বসে আছে, সে তো লালবাজার থেকে এসেছে, তাকে জিগ্যেস করলুম—

সুমিত্রা জিগ্যেস না করে পারল না, কে অর্ধেন্দু দাশগুপ্ত?

কাগজে পড়েননি, গত মাসে, না-না, তার আগের মাসে প্রত্যেক দিনই তো বেরুত...শর্মিলা মার্ডার কেস!

সঙ্গে-সঙ্গে সব মনে পড়ে গেল। ফুলের মতন সুন্দর মেয়ে শর্মিলা, লেখা-পড়াতেও খুব ভালো ছিল, মাধ্যমিক-এর রেজাল্ট আনতে গিয়েছিল স্কুলে, তারপর আর ফেরেনি। তার এক সহপাঠিনী জানিয়েছিল যে শর্মিলার দাদার বন্ধুর পরিচয় দিয়ে একজন যুবক শর্মিলাকে একটুখানি দূরে ডেকে নিয়ে যায়। তারপর একটা ট্যাক্সি হঠাৎ ওদের কাছে এসে থামে। কেউ কিছু বুঝবার আগেই কয়েকজন ট্যাক্সি থেকে নেমে শর্মিলাকে আর তার সেই দাদার বন্ধুকে ট্যাক্সিতে তুলে নিয়ে যায়। এরপর চার-পাঁচদিন পুলিশ সারাদেশ তোলপাড় করে ফেলে শর্মিলাকে খুঁজে বার করবার জন্য। শর্মিলার বাবা একজন নামকরা ডাক্তার, মা সমাজসেবিকা। প্রত্যেকদিন খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় শর্মিলার ছবি, তার মা-বাবার ছবি, পাড়া-প্রতিবেশীর জবানবন্দি। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত শর্মিলাকে উদ্ধার করতে দেরি হওয়ার জন্য পুলিশকে ভর্ৎসনা দিয়ে বিবৃতি দিয়েছিলেন। দশদিন বাদে শর্মিলার মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল আসানসোলে এক পরিত্যক্ত কয়লাখনির কাছে।

জীবিত শর্মিলাকে খুঁজে বার করতে ব্যর্থ হলেও পুলিশ এরপর কয়েকদিনের মধ্যেই চটপট গ্রেফতার করল তিনজনকে। তাদের মধ্যে একজন স্বীকার করে ফেলল সব অপরাধ। চার বন্ধু মিলে অসৎ উদ্দেশ্যে অপহরণ করেছিল শর্মিলাকে। পুরুলিয়ার এক বাগানবাড়িতে লুকিয়ে রেখেছিল কয়েকদিন। প্রায় সবসময় মুখ বেঁধে রাখত শর্মিলার। ওরা সবাই মিলে যতরকমভাবে অত্যাচার করেছিল শর্মিলার ওপরে তার গরগরে বিবরণ বেরিয়েছিল সব সংবাদপত্রে। আসামি তিনজনের নাম পল্টু, পরেশ আর গজা। তারা তিনজনেই বলেছিল যে তাদের সর্দারের নাম অর্ধেন্দু। ওদের কারুরই ইচ্ছে ছিল না শর্মিলাকে খুন করার, সে কাজটা অর্ধেন্দু ওরফে বঙ্কা একাই করেছে।

অর্ধেন্দুকে ধরতে পারেনি পুলিস, কিন্তু তার একটা ছবি জোগাড় করে ছাপিয়ে দিয়েছিল কাগজে। সেই সময় অর্ধেন্দুর নাম ঘুরত সবার মুখে-মুখে। সুমিত্রা নিজেই তো কতবার বলেছে, ওই অর্ধেন্দুটাকে ধরতে পারলে ময়দানে সবার সামনে দাঁড় করিয়ে প্রকাশ্যে ওর গা চিরে-চিরে নুন ছিটিয়ে ছড়িয়ে দেওয়া উচিত!

মাত্র দু-মাস আগের ঘটনা, অথচ সেই নামটা শুনে প্রথমে চিনতেই পারেনি সুমিত্রা।

শর্মিলা মেয়েটা তো ছিল প্রায় কমলিকারই বয়েসি। কোনও দোষ করেনি মেয়েটি, তবু বীভৎস-ভাবে তার জীবনটা শেষ হয়ে গেল কয়েকটা নরপশুর জন্য। শর্মিলা নয়, কমলিকার জন্যই বেশি চিন্তা হচ্ছিল সুমিত্রার। মেয়ে বড় হচ্ছে। দু-দিন বাদে সে স্কুল ছেড়ে কলেজে যাবে, একা-একাই চলাফেরা করতে হবে তাকে, যদি হঠাৎ এরকম কিছু হয়ে যায়?

সেই সময় মনোজিৎকে এই আশঙ্কাটা প্রকাশ করায় মনোজিৎ হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল। ওরকম একটা-আধটা ঘটনা নিয়ে কাগজগুলো ঢাক পেটায় তাই সুমিত্রার মতন মায়েরা ভয়ে কাঁপে। ইওরোপ-আমেরিকাতে কত বেশি ভায়োলেন্স হয়। ওসব ভাবতে গেলে বাঁচাই যাবে না!

লম্বা লোকটা বলল, হাওড়া স্টেশনে নামবার পর, লোকে যদি বঙ্কাকে চিনতে পারে, বুঝলেন,

ওকে একেবারে ছিঁড়ে কুটি-কুটি করে ফেলবে! পুলিশ কিছুতেই আটকাতে পারবে না!

সুমিত্রা ব্যাকুলভাবে বলল, প্লিজ...বাচ্চাদের সামনে...আমার ছেলেমেয়েদের সামনে এসব কিছু বলবেন না। ওরা জানে না...জানবার দরকারও নেই।

বাবুনের বয়েস এগারো, এখন সে শুধু খবরের কাগজে খেলার খবরটা উলটে দেখে নেয়। কমলিকাও এখনও পর্যন্ত খবরের কাগজ পড়ার অভ্যেস করেনি। মাঝে-মাঝে সিনেমার পাতাটা দেখে। সুমিত্রাই মাঝে-মাঝে বলেছে, এত বড় হলি, এখনও খবরের কাগজ পড়তে শিখলি না?

মনোজিৎ তা শুনে বলেছে, না শিখলেই বা ক্ষতি কী? খবরের কাগজ পড়া একটা বাজে নেশা ছাড়া তো আর কিছু না!

শর্মিলা হত্যা-কাহিনি অবশ্য কমলিকা জানে। সব বাড়িতে তখন ওই নিয়ে আলোচনা হত। কিন্তু অর্ধেন্দু দাশগুপ্তর নাম কি আর মনে আছে?

লম্বা লোকটা এবার আপন মনেই বলল, পুলিশকে কেউ বিশ্বাস করে না। ওরাই বা কী করবে? কোনও পার্টির দাদা ফোন করে বলবে, ও আমার লোক, ওকে ছেড়ে দাও, ব্যস! অমনি ছাড়া পেয়ে যাবে। এই জন্যই তো পাবলিক আজকাল চোর-ডাকাত ধরতে পারলেই পেঁদিয়ে শেষ করে দেয়!

ধপাস করে একটা বই পড়ল ওপর থেকে।

মনোজিৎ মাঝে-মাঝে ঘুমিয়ে পড়ে, হাত থেকে বই খসে যায়। সুমিত্রা বইটা তুলে দিতে যেতেই মনোজিৎ বলল, দাঁড়াও, আমি নামছি।

সুমিত্রা খুব আলাপি নয়। অথচ সে একজন সহযাত্রীর সঙ্গে গল্প চালিয়ে যাচ্ছে দেখে মনোজিৎ একটু কৌতূহলী হয়েছে। সে এসে সুমিত্রার পাশে বসে লম্বা লোকটির চোখে চোখ ফেলে জিগ্যেস করল, কী ব্যাপার?

লম্বা লোকটি বলল, ওই বঙ্কার কথা বলছিলাম। ব্যাটা আমাদের সঙ্গে একই কম্পার্টমেন্টে যাচ্ছে।

মনোজিৎ ধীরেসুস্থে একটা সিগারেট ধরিয়ে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করল, বঙ্কা কে?

সুমিত্রা বলল, তোমার মনে আছে? শর্মিলা নামে একটা মেয়েকে....মাস দু-এক আগে...

মনোজিৎ চট করে ধরে ফেলল ব্যাপারটা। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। ওই বিষয়ে কোনওরকম আলোচনায় না গিয়ে সে বলল, বাবুন আর মামুন কোথায়?

সুমিত্রা বলল, আমি ডেকে আনছি।

মনোজিৎ লম্বা লোকটির দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করল, আপনি কলকাতায় থাকেন? কোন লাইনে আছেন, বিজনেস না চাকরি?

সুমিত্রার অনুমানই ঠিক। লোকটি একটি বেবি ফুড কোম্পানির সেলস রিপ্রেজেনটেটিভ। নাম সৌরীন সরকার।

দু-চারটি কথা বলেই মনোজিৎ বুঝে নিল লোকটির চাকরির ওজন কতখানি। মনোজিতের তুলনায় বেশ কম। কোম্পানিটাও সুবিধের নয়। সুতরাং মনোজিৎ খানিকটা ভারিক্কি চালে বলল, পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই বেবি ফুড ব্যান্ড হয়ে যাচ্ছে। বাচ্চাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। আমাদের দেশেও বেবি-ফুডের বিশেষ ভবিষ্যৎ নেই। অবশ্য আপনার সেলস-এর অভিজ্ঞতা অন্য যে-কোনও কোম্পানিতেই কাজে লেগে যাবে।

দাদা, আপনি কোথায় আছেন?

মনোজিৎ সে-কথার উত্তর না দিয়ে বলল, আপনাকে একটা রিকোয়েস্ট করছি। আমার ছেলেমেয়ের সামনে ওইসব খুন-জখমের কথা একদম তুলবেন না। বেঁচে থাকলে ওদের অনেক কিছুই দেখতে হবে ঠিকই, কিন্তু ছেলেবেলাটা যতদূর সম্ভব নিষ্পাপ রাখা যায়—

পকেট থেকে পার্স বার করে, তার থেকে আবার একটা কার্ড বার করল মনোজিৎ। সেটা তুলে দিল লোকটির হাতে। অর্থাৎ নিজের পরিচয় সে মুখে জানাতে চায় না।

সৌরীন সরকার বেশ ভক্তিভরে কার্ডখানা দেখছে, মনোজিৎ খানিকটা কৈফিয়তের সুরে বলল, আমি ফার্স্ট ক্লাসের ভাড়া পাই, কিন্তু ফ্যামিলি নিয়ে ট্রাভল করার সময় আমি সেকেন্ড ক্লাস স্লিপারই পছন্দ করি। অনেক খোলামেলা থাকা যায়।

সুমিত্রা ছেলেমেয়েকে নিয়ে ফিরে এল। কমলিকা মায়ের কাছে ধমক খেয়ে চুপ করে গেছে, কিন্তু বাবুন এখনও ছটফট করছে, সে এখানে আসতে চায় না। বাথরুমের পাশে অনেক কিছু ঘটছে।

মনোজিৎ একটু কড়া গলায় বলল, বাবুন, চুপ করে বসো!

বাবুন বলল, মামুন, জানো, ডাকাতটা কাঁদছিল!

বাবুনের গলার আওয়াজে এমন এক বিস্ময় ফুটে উঠল, যেরকম বিস্ময়বোধ শুধু শিশুদেরই সম্ভব। যত কমিক্স আর গল্পের বই সে পড়েছে, তাতে ডাকাতদের একটা ছবি তার মনের মধ্যে আঁকা হয়ে গেছে, সেই ডাকাতদের চোখে জল থাকবার কথা নয়।

মনোজিৎ জিগ্যেস করল, বাবুন, খিদে পায়নি? সামনের জংশনেই আমাদের খাবার দেবে।

বাবুন তবু জিগ্যেস করল, ডাকাতটা কাঁদছে কেন, বাবা?

মনোজিৎ আর এড়িয়ে যেতে পারল না, বাবুনের মাথায় হাত দিয়ে বলল, অন্যায় করলে শাস্তি পেতে হয়। ডাকাতরা তো খুব খারাপ কাজ করে, তাই পুলিশ ওদের মারে!

বাবুন বলল, না, পুলিস এখন মারছে না! লোকটা এমনি কাঁদছে! এইরকম, দ্যাখো, ঠিক এইরকম, হাঁটুতে মুখটা গুঁজে, ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে!

সুমিত্রা মুখখানা কঠোর করে আছে। ছেলে-মেয়েদের আনতে গিয়ে সে-ও দেখেছে বস্কার কান্না। তার একটুও মায়া-দয়া হয়নি। ওটা কি একটা মানুষ না নরপিশাচ! ওর মতন মানুষকে বাঁচিয়ে রাখাই অন্যায়। শর্মিলার মতন একটি মেয়েকে...শর্মিলার মুখটা যতই ভাবতে যাচ্ছে, সেটা কমলিকার মুখ হয়ে যাচ্ছে! তাতেই আরও শিউরে উঠছে সুমিত্রা। এই পৃথিবীর হিংস্রতা সম্পর্কে কোনও জ্ঞানই হয়নি কমলিকার, সে যে একটা মেয়ে এই বোধটাই তার সবসময় থাকে না, সেই কমলিকাকে যদি কোনওদিন ওইরকম কয়েকটা ছেলে...।

মনোজিৎ বাবুনকে অন্য গল্পে ফেরাবার চেষ্টা করে যেতে লাগল প্রাণপণে। কমলিকা গুম হয়ে বসে আছে। অন্য সময় ওরা জানলা দিয়ে বাইরের কত দৃশ্য দেখে, সেদিকে ওদের এখন মনই নেই।

পরের স্টেশনে থামতেই খাবার দিয়ে গেল। কোলের ওপর প্লেট রেখে খেতে গেলে বাবুন মাটিতে ভাত ছড়াবেই। তাকে অনবরত সামলাতে লাগল সুমিত্রা। কমলিকা আর-এক কাণ্ড করে বসল, শেষদিকে তার প্লেটটাই উলটে গেল, ঝোল লেগে গেল ফ্রকে। এক্ষুনি ধুয়ে ফেলা দরকার।

কমলিকা উঠে দাঁড়াতেই সুমিত্রা বলল, ডানদিকের বাথরুমে যাবি। ওদিকটা ফাঁকা আছে।

বাবুনকে উঠতেই দেওয়া হল না। কেটারাররা বোতলে যে জল দিয়ে গেছে তা দিয়ে ধুইয়ে দেওয়া হল ওর হাত মুখ।

মনোজিৎ বলল, এবার বাবুনের বিছানা করে দাও, ও শুয়ে পড়বে!

কমলিকা ফিরে এল একটু পরে। তার মুখখানা অসম্ভব বিবর্ণ।

কী হয়েছে, মামুন?

মা, লোকটা জল খেতে চেয়েছিল।

তুই এদিকের বাথরুমে গিয়েছিলি? তোকে বললুম যে...

ডানদিকের দুটো বাথরুমই বন্ধ ছিল যে!

ওদিকে খবর্দার আর যাবি না।

মা, লোকটা জল খেতে চাইছিল।

সে পুলিশের লোক বুঝবে। তোর মাথা ঘামাবার দরকার নেই।

পুলিশরা ওকে বাথরুম থেকে জল এনে দিল। ও সেই জল খাবে না!

কমলিকা কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, মা, আমাদের ফ্লাস্কে জল আছে, একটু দিয়ে আসব?

সুমিত্রা মেয়ের দিকে তাকাল। কয়েক পলক, তবু তার মধ্যে যেন কেটে গেল অনন্ত সময়। কমলিকা কি জানে ওই লোকটা সত্যিকারের কে? শর্মিলার ঘটনা ওর মনে আছে? কমলিকা কী ভাবছে? একজন মানুষ জল খেতে চেয়েছে, তাকে ও জল দিতে চায়...কমলিকা এখনও এই পৃথিবীর মানুষদের চেনে না...

সুমিত্রা স্বামীর দিকে তাকাল। নিঃশব্দে একটু ঘাড় নাড়ল মনোজিৎ।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুমিত্রা বলল, যা, দিয়ে আয়!



সেতুর ওপরে

গড়বন্দীপুরের ছেলেরা আমাকে একটা সাইকেল দিতে চেয়েছিল। কিন্তু রাস্তায় যা জল কাদা। সাইকেল আনলেই বরং বিপদ হত, সে সাইকেল ঘাড়ে করে বয়ে নিয়ে যেতে হত। তারচেয়ে নিজের দুটো পায়ের ওপর ভরসা করাই অনেক বেশি নিরাপদ।

কাদার রাস্তায় হাঁটার অভ্যেস আমার কাছে। সুন্দরবনের চেয়ে বেশি কাদা তো আর কোথাও নেই। সে একেবারে এঁটেল মাটি, কোথাও-কোথাও হাঁটু ডুবে যায়। সেই তুলনায় এই রাস্তা এমন কিন্তু ভয়ের নেয়।

পাজামা গুটিয়ে নিয়েছি উরু পর্যন্ত, পাঞ্জাবিটি কোমরের কাছে গিঁট দিয়ে নিয়েছি। হাতে একটা লাঠি থাকলে ভালো হত তাল সামলানো যেত, অন্তত পক্ষে একটি ছাতা। বৃষ্টি এখনও পড়ে চলেছে ঝিরিঝিরি সকাল-সন্ধে নেমে আসছে।

বৃষ্টির মধ্যেই পথে মানুষজন প্রায় নেই। তা ছাড়া আজ হাটবার নয়। সন্ধের সময় হাঁটাহাঁটি করার কারই বা গরজ পড়েছে! গড়বন্দীপুরে ওরা আমাকে রাতটা থেকে যাওয়ার জন্য খুব অনুরোধ করছিল। কিন্তু আমার আজ রাতের মধ্যেই মুক্তিপুরে পৌঁছোতে হবে। সেখান থেকে ট্রেন ধরতে হবে খুব ভোরে।

মাঝখানে আছে দ্বৈধা নদী। এমনিতে এলেবেলে ছোট্ট একটা শাখা নদী। জেলার ম্যাপে সুতোর মতন একটা দাগ আছে, দেশের ম্যাপে নামগন্ধও নেই। অন্য সময় হেঁটেই পার হওয়া যায়, কিন্তু বর্ষার কয়েকটা মাস বড় জ্বালাতন করে। এতটুকু নদী, তবু কোনও-কোনও বছরে জল উপছে বন্যায় দু-দশখানা গ্রাম ভাসায়। নদীটার ভালো নাম ছিল দ্বিধা। সবাই সেটা ভুলে গেছে। এখন দ্বৈধা বলেই ডাকে।

বেলাবেলি ওই দ্বৈধার ব্রিজটা পেরিয়ে যেতে হবে। পুরোনো আমলের কাঠের ব্রিজ, নড়বড় করে, কোথাও-কোথাও তক্তা খুলে গেছে, আচমকা সেখানে পা পড়লে আর রক্ষে নেই। অনেকদিন থেকেই ব্রিজটার এই দশা দেখে আসছি।

আকাশে এখনও একটু-একটু আলোর ইশারা আছে, তার মধ্যে ব্রিজটা পার হয়ে যেতে পারলে

হয়। একটু পরেই তো চরাচর একেবারে মিশমিশে অন্ধকারে ডুবে যাবে।

দূর থেকে দেখা যাচ্ছে ব্রিজটা। একবার পেছন ফিরে দেখলুম গড়বন্দীপুরের দিকে আকাশ আবার ঘন কালো, আবার নতুন উৎসাহে ঝড়বৃষ্টি তেড়ে আসবে। লম্বা-লম্বা গাছগুলোর মাথা নুয়ে-নুয়ে পড়ছে।

আমার পাশে-পাশে টোকা মাথায় একজন লোক হাঁটছিল, সে হঠাৎ ডান দিকের মাঠে নেমে গেল। এবারে সামনের দিকে আমাকে একাই যেতে হবে। কাদার মধ্যে যতটা সম্ভব জোরে পা চালালুম।

বৃষ্টির মধ্যে সিগারেট ধরানো যায় না এই একটা অসুবিধে। সিগারেটের বদলে গুনগুন করে গান ধরলে সময়টা তাড়াতাড়ি কেটে যায়।

ব্রিজের কাছাকাছি এসে একটা খ্যাস-খ্যাস শব্দ শুনতে পেলুম যেন। এদিকে কোথাও কাঠ চেরাই কল আছে নাকি? মনে তো পড়ে না। চোখ দুটোকে এবারে সতর্ক করে নিলুম। এবারে সাবধানে মেপে-মেপে পা ফেলতে হবে। এই সন্ধেবেলা আমি পা ফস্কে নদীতে পড়ে সাঁতার দিতে চাই না। দ্বৈধা নদী বেশ ফুলে ফেঁপে উঠেছে।

ব্রিজের মাঝামাঝি জায়গা উঁচু হয়ে বসে আছে একটা লোক। খ্যাস-খ্যাস শব্দটা আসছে ওখান থেকেই। কী করছে লোকটা?

কাছে এসে দেখি সে একটা করাত নিয়ে ব্রিজের তক্তা কাটছে মন দিয়ে। আমি যে পাশে এসে দাঁড়িয়েছি তাতে তার ভ্রূক্ষেপ নেই।

প্রথমে আমার মনে হল, ও বুঝি পি ডবলু ডি-র লোক। সেতু সারাই করতে এসেছে।

ওকে পার হয়ে একটুখানি যাওয়ার পর আমার খটকা লাগল। গভর্নমেন্টের লোকের কাজে এত দরদ? এই দুর্যোগের দিনে সন্ধেবেলা একা-একা কাজ করে যাচ্ছে? কাছাকাছি দেখবার কেউ নেই তবুও? এই সময় তো ওর নিশ্চিন্তে বাড়িতে বসে তেলেভাজা আর মুড়ি খাবার কথা!

তাহলে লোকটা নিশ্চয়ই চোর। কাঠ চুরি করছে। এই সন্ধেবেলা কেউ দেখবার নেই এই তো সুযোগ!

ঝপাং করে একটা শব্দ হল। একটা বড় কাঠের টুকরো পড়ল নদীর জলে; আর কোনও সন্দেহ নেই। লোকটা কাঠ কেটে-কেটে নদীতে ফেলে দিচ্ছে। কাছাকাছি নিশ্চয়ই ওর কোনও স্যাঙাৎ লুকিয়ে আছে, সে ভাসমান কাঠগুলো তুলে নেবে।

আমার মনে এক ধরনের বাষ্প ছড়িয়ে গেল, সেটা তিক্ততা আর বিষণ্ণতার মাঝামাঝি। এরা কি নিজেদের ভালো মন্দ কোনওদিন বুঝবে না? দ্বৈধা নদীর মধ্যে এই একখানি মাত্র সেতু, সামান্য কাঠের লোভে সেটা ওরা নিজেরাই ধ্বংস করছে? এই সরু রাস্তায় শহরের লোক আর ক'টা আসে, গ্রামের মানুষই তো এটা ব্যবহার করে।

একবার মনে হল, আমার কী দরকার, যা হয় হোক। আমি তো আর এখানকার বাসিন্দা নই! এরা নিজেরাই ফল ভোগ করবে।

তবু থমকে দাঁড়ালুম, আমরা অনেক কিছু দেখে যাই, মনে-মনে সমালোচনা করি, কিন্তু প্রতিবাদ বা সাহায্যের জন্য হাত বাড়িয়ে দিই না। এখানে যদি তিন-চারটে চোর এক সঙ্গে থাকত, তাহলে আমার পালানো ছাড়া পথ ছিল না। কিন্তু ওই লোকটা একা, আমিও একা, সুতরাং ওকে আমার ভয় পাওয়ার কী আছে?

ফিরে এসে বললুম, ওহে, তুমি এ কী করছ?

আজকাল চোরেরা অনেক বেশি দুঃসাহসী। বাবু শ্রেণির মানুষদের গ্রাহ্যই করে না।

লোকটি মাঝবয়সি, মোটামুটি স্বাস্থ্যবান, মুখ ভরতি দাড়ি। পরনে একটা লুঙ্গি আর খালি গা। আমার কথা শুনে মুখ না তুলে অবহেলার সঙ্গে বলল, দেখতেই তো পাচ্ছ, কাঠ কাটছি?

আমি বললুম, কিন্তু এটা কি কাঠ কাটবার জায়গা? কাঠ কাটতে চাও তো জঙ্গলে যাওনি

কেন, এটা ব্রিজ!

লোকটি বলল, তোমার যেমন চক্ষু আছে, আমারও তেমন চক্ষু আছে। আমি জানি এটা একখানা সেতু। একটা বট গাছ নয়কো!

—তা জেনেও তুমি এটাকে কাটছ? এটা ভেঙে পড়বে যে?

—তা জেনেই তো কাটছি, আর দু-খানা খুঁটির জোড় সরাতে পারলেই এটা ভেঙে পড়বে! প্রায় হয়ে এসেছে!

অ্যাঁ, জেনে শুনে তুমি এটার সর্বনাশ করছ? এই বর্ষায় লোক নদী পার হবে কী করে? তোমাদের মতন গ্রামের মানুষরাই তো...

আর একখানা কাঠ শব্দ করে জলে পড়ল, লোকটা এবারে আমার দিকে ফিরে বলল, তোমার বয়স কত? তুমি এই সেতুটি আগে দেখেছ, না নতুন এসেছ?

আমি বললুম, একেবারে নতুন নয়। আগে দু-তিনবার এসেছি!

—আগে যখন দেখেছ, তখন কি এটা টাটকা, মজবুত ছিল?

—না, তা ছিল না বটে!

—মাঝে-মাঝে একখানা দু-খানা তক্তা খসে পড়ে, লোকে বাড়ি নিয়ে যায়। এই সেতু সারাই করার কথা কেউ ভাবে না। সরকার বাহাদুরও ভাবে না। বাপের আমল থেকে যেমন নড়বড়ে দেখেছি, এখনও তাই। কী বলো? এবারে আমি একে একেবারে শেষ করে দিচ্ছি, আর একটু পরে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়বে।

—কী সর্বনাশ, আমি ঠিক সময়ে এসে পড়েছি! একটু দেরি হলে—

—হ্যাঁ, তুমিই শেষ মানুষ পার হলে!

—তবু এটাতে কাজ চলে যাচ্ছিল, তুমি শেষ করে দিচ্ছ কেন?

—এ কাজ চলছিল বলেই তো গন্ডগোল! কোনও মতে কাজ চলে গেলে কেউ আর নতুনের কথা ভাবে না। এবারে দেখবে, আর কাজ চলবে না, লোকে নতুন চাইবে!

আমি শিউরে উঠলাম এ-লোকটা চোর না দার্শনিক! কিংবা অতিপ্রাকৃত কেউ নয় তো? এই বৃষ্টির মধ্যে সন্ধেবেলা বসে-বসে একটা সেতু ধ্বংস করছে?

আমি জিগ্যেস করলুম, ওহে কর্তা, তুমি কোন গ্রামে থাকো? তোমার বাড়ি কোথায়?

লোকটি বলল, আমার বাড়ি নেই। থাকি এই কাঠখানা পেরিয়ে যে গ্রাম সেখানে!

—গ্রামে থাক, তোমার বাড়ি নেই মানে? অন্য বাড়িতে কাজ করো?

—না, তা নয়। ঠিক আমার একখানা বাড়ি। এই সেতুটার মতনই লজ্‌ঝরে। এখানে সেখানে মেরামত করে আর কুলোয় না। একদিক ঢাকি তো আর একদিক দিয়ে জল পড়ে। তাই ভাবলুম, ধুর, এ দিয়ে আর কী হবে? একদিন আগুন দিয়ে বাড়িটা পুড়িয়ে দিলাম!

—নিজের বাড়ি পুড়িয়ে দিলে? আবার নতুন বাড়ি বানাওনি।

—বানাব, বানাব! সরকার বাহাদুর যখন এখানে নতুন ব্রিজ বানাবে, তখন আমিও আমার নতুন বাড়ি বানাব!

আমার আর তাড়াতাড়ি মুক্তিপুরে ফেরার কথা মনে পড়ে না। আমি লোকটির পাশে বসে পড়ে জিগ্যেস করলুম, তা তুমি যে এই মাঝখানটায় বসে খুঁটির জোড়গুলো কাটছ, তো এটা ভেঙে পড়লে তো তুমি এটার সঙ্গে ডুববে!

লোকটি হেসে বলল, না, সে আমার হিসেব আছে। এই দ্যাখো না, এখুনি এই এক দিকটা ভাঙবে। এটা গড়বন্দীপুরের দিক। তারপর ওদিক খানিকটা সরে গিয়ে আবার বাকিটা সেরে ফেলব। আমার কি ডুবলে চলে, আমাকে দেশে বউ-এর জন্য নতুন বাড়ি বানাতে হবে না?

—তুমি বুঝি এই পুরোনো ব্রিজের কাঠ দিয়ে তোমার নতুন বাড়ি বানাবে?

—আরে রাম-রাম ছি-ছি! এমন কথা ভাবলে! তুমি, বাবুদের বাড়ির ছেলে বলেই এইসব কথা তোমাদের মনে আসে। এই কাঠের আর আছে কী? এত পচে গেছে! তা ছাড়া, আমাদের গ্রামে সবার মাটি-বাঁশের বাড়ি, সেখানে কি আমি কাঠের বাড়ি হাঁকতে পারি? আমার নতুন বাড়িও ওই মাটি বাঁশেরই হবে! তবে টাইম লাগবে।

—এ দ্যাখো, কারা যেন আসছে!

গড়বন্দীপুরের দিক থেকে কারা যেন আসছে ব্রিজের ওপর। দুটি ছায়ামূর্তি। মাথায় কীসের যেন বোঝা।

লোকটি ভয় পেয়ে বলল, আরে-আরে, ওরা মারা পড়বে যে। এই রোখো-রোখো এদিকে আর এসো না!

ছায়ামূর্তি দুটি থামল না, এগোতেই লাগল।

আমার পাশের লোকটি করাত সরিয়ে রেখে একটা কাঠ প্রাণপণে চেপে ধরল। আমাকে বলল, ও বাবু, তুমি পাশের খুঁটিটা ধরো। ওরা পা দিলেই ভেঙে পড়বে সব। ছায়ামূর্তি দুটি কাছে এল একজন নারী ও পুরুষ, তাদের কাঁধে ও মাথায় কয়েকটা পোঁটলা-পুটলি। আমাদের ওইরকম অবস্থায় দেখে তারা থমকে দাঁড়াল।

ব্রিজ ধ্বংসকারী লোকটি বলল, তোমরা পার হতে পারবে না। এই সেতু ভেঙে পড়ছে। খুব বিপদ, তোমরা ফিরে যাও।

যুবতী মেয়েটি কান্না-কান্না গলায় বলল, ওগো আমাদের যে যেতেই হবে!

—না পারবে না; এই সেতু পার হতে পারবে না।

যুবতীর সঙ্গের পুরুষটি বলল, ওগো, আমাদের যে আর ফিরে যাওয়ার উপায় নেই।

—কেন, ফেরবার উপায় নেই কেন? যে গ্রাম থেকে এসেছ, আজ রাত্তিরটার মতন সেখানে ফিরে যাও।

পুরুষটি বলল, না গো, সে উপায় থাকলে কি আর বলি। মহাজন আমাদের সর্বস্বান্ত করেছে। আমাদের ঘর-বাড়ি সব গেছে। একটুকরো জমি ছিল, তাও বেচে দিয়েছি!

—তাহলে এদিকে কোথায় যাবে? এদিকে কি তোমাদের কোনও ভরসা আছে?

—দেখি মুক্তিপুরে কোনও ঠাঁই মেলে কি না!

যুবতীটি বলল, পুরোনো জায়গা ছেড়ে এসেছি, ওখানে আর যাব না। এদিকে গিয়ে দেখি কী হয়। দুজনে মিলে খাটব, আবার ঘর বানাব! ওগো, আমাদের যেতে দাও। ব্রিজ ধ্বংসকারী এবারে শুয়ে পড়ে অনেকগুলি কাঠের মুখ বুকে চেপে ধরল। তারপর বলল, যাও তবে সাবধানে যাও! আমার পিটের ওপর পা দিতে পারো, তাতে কিছু হবে না! শিগগির চলে যাও, বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারব না!

নারী ও পুরুষটি তাকে ডিঙিয়ে তড়িঘড়ি চলে গেল। তারপর করাতওয়ালা লোকটি উঠে পড়তেই গড়বন্দীপুরের ব্রিজের অংশটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল একসঙ্গে।

আমি এবার তাকে জিগ্যেস করলুম, এই যে তুমি কাণ্ডটি করলে এর পর হয়তো গ্রামের লোক মহা অসুবিধেয় পড়বে তুমি জানো। কেউ আর পার হতে পারবে না। তবু তুমি এত কষ্ট করে এই মেয়েটাকে আর লোকটাকে পার হতে দিলে কেন? ব্রিজ ধ্বংসকারী তার দাড়িওয়ালা মুখখানা আমার দিকে ঘুরিয়ে এক গাল হেসে বলল, ওরা যে নতুন জায়গায় যাবে, নতুন করে ঘর বাঁধবে ওদের কথা আলাদা!



সার্থকতা

বুকের কাছে দু-হাত জোড় করে মহিলাটি বললেন, নমস্কার, কেমন আছেন? চিনতে পারেন?

অভ্যেসবশতই আধো-হেসে বাসুদেব বললেন, হ্যাঁ, আপনি ভালো তো? অনেকদিন পর দেখা।

তিনি মহিলাটির মুখের ওপর স্থির দৃষ্টি রেখে নিজের বুকের ছবিঘরে খোঁজাখুঁজি করতে লাগলেন। মশাল জ্বেলেও এখন পুরোটা দেখা যায় না। কিছুটা অন্ধকার থেকেই যায়। সম্পূর্ণ অচেনা মুখ, টসটসে দুটি ঠোঁট, অচেনা-অচেনা, চোখ দুটিতে মৃদু হাসি মাখা। অনেকের মধ্যেও দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতন মুখ ও শরীর, কিন্তু যৌবন একেবারে ঝুঁকে এসেছে শেষ প্রান্তে, রূপ যাই-যাই শব্দ তুলেছে।

মহিলাটি চিবুক উঁচু করে বললেন, চিনতে পারেননি তো? আমার কিন্তু ঠিক মনে আছে। আচ্ছা—

অন্য ঢেউ আসে, মহিলাটি দূরে সরে যান। হলঘরটিতে পঁচিশ-তিরিশজন নারী-পুরুষ। এঁদের অনেককেই বাসুদেব চেনেন না, তিনি দীর্ঘকাল বোম্বাই প্রবাসী। আজকের আপ্যায়নকর্তা তার এক বন্ধুর বন্ধু। কয়েক রকম সুরা আছে, নরম পানীয়, গান-বাজনা আছে। কলকাতা হিসেবে আলাদা কোনও বৈশিষ্ট্য নেই। বোম্বাই-দিল্লি-মাদ্রাজ সব জায়গাতেই আজকাল এই একই রকম পার্টি হয়। মেয়েদের নানারকম সাজপোশাক দেখা যায়, পুরুষদের নানারকম রসিকতায় যোগ দিতে হয়।

বাসুদেবের মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি রয়ে গেল। কে ওই মহিলাটি? অন্যদের সঙ্গে কথা বলতে-বলতেও বাসুদেব ওকেই খুঁজছেন, দূরে দু-একবার চোখাচোখি হতেই মহিলাটি আস্তে চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন, তাঁর ভুরুতে অভ্রবিন্দুর মতন ঝিকমিক করছে কৌতুক।

আগে অচেনা লোকজনের মধ্যে বাসুদেব খুব লাজুক হয়ে পড়তেন। চেহারা ছিল রোগা পাতলা, সব সময়েই যেন থাকতেন আড়ালে। কারুর সঙ্গে যেচে আলাপ করতে পারতেন না। এখন চেহারা বদলে গেছে অনেক, বেশ ভারিক্কি হয়েছেন, কিছুটা মেদ আসায় মুখের ধারাল ভাবটা সরে গিয়ে সৌম্য ভাব এসেছে। তা ছাড়া সার্থকতাও এক ধরনের ব্যক্তিত্ব এনে দেয়। কলকাতা ছেড়ে বম্বের নতুন পরিবেশে গিয়ে মানিয়ে নিতে প্রথম-প্রথম খুবই অসুবিধে হয়েছিল। কিন্তু তাঁর কাজের সুনামের সঙ্গে-সঙ্গে অনেকে যেচে এসে খাতির করতে লাগল তাঁকে।

অনেকদিন পর কলকাতায় এলে বোঝা যায় চেনাশুনো মানুষেরা বদলে যাচ্ছে। শুধু নিজের বদলটাই চোখে পড়ে না। সিদ্ধার্থর স্ত্রী রুমা একসময় খুব চুপচাপ স্বভাবের ছিল, কথা না বলে শুধু মৃদু হাসত, সেই রুমা কীরকম জোরে-জোরে হাসছে। ব্যবহারে ককেটিস ভাব। অথচ তার মুখের চামড়ায় আগেকার ঔজ্জ্বল্য নেই।

হাসতে-হাসতে রুমা একবার বাসুদেবের কাছে এসে বলল, কী বাসুদা, আপনি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন? আসুন, সবার সঙ্গে আলাপ হয়েছে?

এইসব পার্টির নিয়ম, ঘুরে-ঘুরে প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বলা। বাসুদেবের এখনও এটা রপ্ত হয়নি। তিনি ঘাড় নেড়ে বললেন, হয়েছে, অনেকের সঙ্গে।

রুমা হঠাৎ হাসি থামিয়ে বলল, আপনি বোম্বাইতে ফ্ল্যাট কিনেছেন? আপনার তো এখন খুব নাম, গত রবিবার টাইমস অফ ইন্ডিয়ায় ছবি ছাপা হয়েছিল আপনার।

বাসুদেব রীতিমতন অবাক হলেন। সাতেরো পাতায় এক কলম একটা অস্পষ্ট ছবি ছাপা হয়েছিল, তাও বোম্বের কাগজে। এখানে বাসুদেব সেকথা তো কারুকে বলেননি।

—তুমি জানলে কী করে?

—আমরা কলকাতায় বসে বুঝি বোম্বের খবর রাখি না? আপনারা, বোম্বের লোকেরা মনে করেন, কলকাতাটা একটা গণ্ডগ্রাম!

—না, না, মা, সেকথা বলছি না। আমি বোম্বের লোক নই। বোম্বের লোক তো কলকাতার কাগজ পড়ে না, তাই আমি ভাবছিলুম বোম্বের কাগজ এখানে...

—আমি লাইব্রেরিতে কাজ করি, সেখানে অনেক রকম কাগজ আসে। দেখলুম, আপনি কী একটা যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন। এর আগে সায়েন্স টু-ডে কাগজেও আপনার সম্পর্কে লেখা পড়েছি। আমাদের কত গর্ব হয়!

রুমা যে চাকরি করে সে খবরই বাসুদেবের জানা ছিল না। আগে মনে হতো রুমা বিশেষ পড়াশুনোর ধার ধারে না। জীবনের বাঁকে-বাঁকে কত বিস্ময় অপেক্ষা করে থাকে। একটু আগে রুমার তীক্ষ্ণ হাসি তাঁর খারাপ লাগছিল, এখন রুমাকে বেশ পছন্দ হল।

—বাসুদা, আমি সামনের মাসে বোম্বে যাব একবার। আপনার ওখানে উঠতে পারি?

—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। সিদ্ধার্থর সঙ্গে একটু আগে কথা হল, কই ও তো বম্বে যাওয়ার কথা কিছু বলল না।

ও তো যাবে না। আমি একলা যাব।

বাসুদেব একটু অপ্রস্তুত বোধ করলেন। পুরোনো ধারণা থেকে তিনি মনে করেছিলেন রুমা সবসময় তার স্বামীর সঙ্গেই বাইরে যায়। রুমাকে তিনি বোম্বাইয়ের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়ে বসলেন, কিন্তু রুমা কি জানে না যে সেখানে তিনি একা থাকেন?

দূরের মহিলাটির দিকে বাসুদেব আর একবার তাকালেন। একবার ভাবলেন রুমাকে জিগ্যেস করবেন এ মহিলারা পরিচয়। কিন্তু করলেন না। এক মহিলার কাছে অন্য মহিলার প্রসঙ্গ তোলা সব সময় নিরাপদ নয়। কী জানি এদের মধ্যে কী রকম সম্পর্ক।

রুমা অবশ্য আর সুযোগও দিল না, সে বাসুদেবের হাত ধরে টেনে আর একজন সোনালি ফ্রেমের চশমা পরা সুদর্শন পুরুষের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। এরকম চশমা আজকাল পুরুষ মানুষদের চোখে দেখা যায় না। তবে ভদ্রলোক ভালো সেতার বাজান শুনে বাসুদেব নিশ্চিন্ত হলেন। যারা প্রকাশ্য মঞ্চে অনুষ্ঠান করে, তাদের সাজপোশাক একটু অন্যরকম হয়ই। ওই ভদ্রলোকের মতন সবুজ সিল্কের পাঞ্জাবি পরার কথা বাসুদেব কল্পনাও করতে পারেন না।

সেই মহিলাটি একজন কিশোরীর সঙ্গে কথা বলছেন। বাসুদেব রুমা ও সেতার বাদকের সঙ্গে কথা চালিয়ে যেতে-যেতে কান খাড়া করে ওদের কথা শুনবার চেষ্টা করলেন। যদি দু-একটা টুকরো থেকে পরিচয়ের কোনও সূত্র পাওয়া যায়। পাওয়া গেল না, রহস্যময়ী মহিলাটি বলছেন কালিম্পং-এর কথা, শিগগিরই ঘুরে এসেছেন সেখান থেকে। ক্যামেলিয়া ফুলের বর্ণনায় উচ্ছ্বসিত। কালিম্পং? বাসুদেব কখনও যাননি।

একজন সুন্দরী মহিলার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, অথচ কিছুই মনে পড়ছে না, এটা বড় কষ্টের। ওঁর নামটাও জিগ্যেস করা হয়নি। উনি হাসিমুখে যেভাবে 'কেমন আছেন' বললেন, তারপর আর নাম জিগ্যেস করা যায় না।

এবারে একজন কেউ গান গাইবেন। কলরব প্রথমে গুঞ্জনে পরিণত হল, তারপর ফিসফিস নীরবতা। গায়কটিকে বেশ বিখ্যাত মনে হল, অনেকের মুখ উদ্‌গ্রীব, শুধু সেতার-বাদকটির মুখে

চাপা অবজ্ঞার ভাব। তিনি সঙ্গে সেতার আনেনি, তাঁকে শ্রোতার ভূমিকা নিতে হবে। গায়কটি চোখে সুর্মা দিয়েছেন মনে হচ্ছে, ডান হাতের আঙুলে তিনটে আংটি, এখন হারমোনিয়াম নিয়ে প্যাঁ-পোঁ করছেন।

শুভাশিস গায়কের পাশ থেকে চেঁচিয়ে বলল, বাসু, তুমি একেবারে পেছনে বসে আছ কেন? সামনে এসো, তোমার সঙ্গে ওঁর আলাপ করিয়ে দিই।

বাসুদেব হাত তুলে বললেন, ঠিক আছে। পরে—।

শুভাশিসের সঙ্গেই তিনি এখানে এসেছেন। ও বড্ড বেশি কথা বলে অতিশয়োক্তিতে ওস্তাদ। বাসুদেবের সম্পর্কে লোকজনের কাছে এমন পরিচয় দিতে শুরু করে যে তাঁর লজ্জায় মাথা নুয়ে যায়।

হাতের সিগারেটটা ফেলবার জন্য অ্যাশট্রে খুঁজতে-খুঁজতে বাসুদেব সেই মহিলাটির কাছে চলে এলেন। এঁর সঙ্গে কোনও পুরুষ নেই, বাসুদেব এতক্ষণ লক্ষ্য করে তা বুঝেছেন।

বাসুদেব হেসে জিগ্যেস করলেন, আপনি এখন কোথায় থাকেন?

মহিলাটি বাসুদেবের চোখে চোখ রেখে বললেন, অর্থাৎ আমার নামটা এখনও মনে পড়েনি তো? আমি বলব না, ভুলেই গেছেন যখন—

—খুব চেনা-চেনা লাগছে!

—মিথ্যে কথা! আমার চেহারা বদলে গেছে। সবাই বলে আজকাল। আমার কিন্তু আপনার কথা ঠিক মনে আছে। তখন ধুতি পাঞ্জাবি পরতেন, চঞ্চলদের বাড়ির আড্ডায় এক কোণে চুপচাপ বসে থাকতেন। ঠিক বলছি কি না?

—চঞ্চলদের বাড়ি?

গান শুরু হতেই কথা থামিয়ে দিতে হল। মহিলাটি ইচ্ছে করে বাসুদেবের পাশ থেকে সরে গিয়ে একটু দূরে সেই কিশোরী মেয়েটির পাশে বসলেন।

চঞ্চলদের বাড়ির কথা শুনেই সব মনে পড়ে গেছে বাসুদেবের। অনেকদিন আগেকার কথা, চোদ্দ-পনেরো বছর তো হবেই। এই সেই দুর্ধর্ষ তরুণী, মূর্তিমতী অহংকার? চেহারা অনেক বদলেছে ঠিকই, যেমন বাসুদেবেরও বদলেছে কিন্তু মুখের রেখা ও চাহনির ঝিলিক তো সেই একইরকম। নাম মনে পড়েনি। কারণ, ওর কোনও নামই ছিল না। অনামিকা কোনও মেয়ের নাম হয়? অনামিকা দত্ত চৌধুরী। সুশোভন দত্ত চৌধুরীর স্ত্রী, সেই সুশোভন, যিনি এশিয়ান গেমসে পরপর দু-বার ব্যাডমিন্টন চাম্পিয়ান হয়েছিলেন। অত নামকরা খেলোয়াড়, অথচ ছিলেন নিপাট ভালোমানুষ, খুবই নম্র আর বিনীত! অনামিকাও তো রাইফেল শুটিং-এ অংশ নিয়েছে, নিজেই সেদিন যেন রাইফেলের কার্তুজ...!

চঞ্চলদের বাড়ির আড্ডা, প্রত্যেক শনিবার, তুমুল এলাহি, রাত দুটো-তিনটে পর্যন্ত। সেখানে সবাই খ্যাতিমান, অথবা বড়-চাকুরে। বাসুদেব তখন একটা কলেজে ফিজিক্সের সামান্য লেকচারার, নেহাত চঞ্চল তার বাল্যবন্ধু বলেই সেই আড্ডায় সে স্থান পেত। চঞ্চলই ডেকে নিয়ে যেত জোর করে। অত সব নামকরা লোকজনদের মাঝখানে বাসুদেব হীনমন্যতায় ভুগত, তা ছাড়া নিজের গোটানো স্বভাবের জন্য সে সহজভাবে মিশতেও পারত না।

অনেকেই স্ত্রীদেব নিয়ে আসতেন সেই আড্ডায়, কেউ-কেউ বান্ধবীকেও। সেইসব মহিলাকুলের মধ্যে এই অনামিকা ছিল একটা আগুনের গোলা। তার সঙ্গে অন্য কারুর তুলনাই চলত না। হাসি-ঠাট্টা, গান, তাসখেলা, মদ্যপান, নাচ কোনওটাতেই তার জুড়ি ছিল না কেউ।

বাসুদেবের সঙ্গে অনামিকার কোনওদিনই ভালো করে আলাপ হয়নি। কোনওদিন তিনি ওর সঙ্গে সম্পূর্ণ একটি বাক্য বিনিময় করেছেন কিনা সন্দেহ, বাসুদেব ছিলেন পিছনের সারির মানুষ, তিনি দূর থেকে দেখতেন। তিনি ধরেই নিয়েছিলেন, অনামিকার মতন নারীরা বাসুদেব মজুমদারের

মতন মানুষের বৃত্তে কোনওদিনই আসবে না। ওরা অন্য বাতাসে নিঃশ্বাস নেয়।

তবু বাসুদেবের আকাঙ্ক্ষা ছিল, গভীর দুঃখবোধ ছিল। অনামিকাকে তিনি নিজের মতন করে চেয়েছিলেন, সে অন্যরকম চাওয়া। পরস্ত্রীর প্রতি লোভ করার স্বভাব ছিল না তাঁর। ছেলেবেলা থেকেই বই-পত্রের মধ্যে মানুষ হয়েছেন, মেয়েদের সঙ্গে মেশার সুযোগ পাননি। অনামিকার অহংকার ছটফটানি আর সবকিছুর মধ্যেই একটা চমৎকার সারল্য ছিল। কেউ কোনও মিথ্যে কথা বললে অনামিকা দারুণ বিস্ময়ের শব্দ করে উঠতো। কেউ আড়ালে অন্য কারুর নিন্দে করলে অনামিকা খাঁটি ভর্ৎসনার সুরে বলে উঠত, ছিঃ এসব কী! অনামিকার ডান হাতে জ্বলন্ত সিগারেট, বাঁ হাতে মদের গেলাস, তবু কোনওরকম অরুচিকর কথাবার্তা শুনলে তার মুখে একটা বেদনার ছায়া পড়ত, সে বলত আমি কিন্তু তাহলে আর এখানে থাকব না। তোমরা আনন্দ করতে জানো না, খারাপ কথা বলো কেন?

অনামিকার সারল্যের ঝাপটায় অন্যরাও বিশুদ্ধ হয়ে উঠত। এই সারল্যের সঙ্গে রূপ মিশে যে মাধুর্যের সৃষ্টি হয়েছিল, বাসুদেব চেয়েছিলেন সেই মাধুর্যের ভাগ নিতে। শারীরিক স্পর্শ নয়, শুধু মাধুর্যের ছোঁয়া। অনামিকা তার সামনে এসে বসবে, তার সঙ্গে অন্তরঙ্গ সুরে কথা বলবে, কোথাও কিছু হারাবে না, কিন্তু অনেক কিছু পাওয়া হয়ে যাবে।

কিন্তু সে রকম পাওয়া হয়নি। অন্যান্য চৌখস পুরুষরাই সবসময় অনামিকার সামনে থেকেছে বাসুদেব পড়ে থেকেছেন পেছনের সারিতে। অনামিকার চোখে চোখ ফেলতেও পারেননি ভালো করে। সেজন্য অবশ্য অনামিকাকে দোষ দেওয়া যায় না।

শুধু চঞ্চলের বাড়িতেই নয়, অন্য যে-কোনও জায়গায় গেলেই অনামিকার ওই মাধুর্যের জন্য তৃষ্ণাটা জেগে উঠত বাসুদেবের মনে। অন্য নারীদের সঙ্গে সে অনামিকার তুলনা করত মনে-মনে। যেখানে মানুষ সবচেয়ে একা থেকে সেই বাথরুমে বসে সে ধ্যান করত অনামিকার।

সর্বভারতীয় একটি বিজ্ঞান-মেধা প্রতিযোগিতায় একটি যন্ত্রের মডেল পাঠিয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন বাসুদেব, পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার পান। সেই সুবাদে বম্বে থেকে ভালো চাকরির আমন্ত্রণ। তারপর কলকাতা ত্যাগ। তারপর ব্যস্ত জীবন। চার বছর বাদে একবার চঞ্চলের বাড়িতে এসে দেখেছিলেন আড্ডা ভেস্তে গেছে। চঞ্চল ট্রান্সফার হয়ে গেছে দুর্গাপুরে।

বম্বেতে প্রথম গিয়ে সমুদ্র দেখেও অনামিকার কথা মনে হয়েছিল। সব সৌন্দর্যের মধ্যেই একটা মিল থাকে। সমুদ্রকে যেমন কেউ নিজের বাড়ির চৌবাচ্চায় আনতে চায় না, সেই রকমই বাসুদেব অনামিকাকে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে নিয়ে আসতে চাননি। শুধু তার রূপের মাধুর্যই তিনি চোখে নিতে চেয়েছিলেন। কলকাতা থেকে চলে আসার পর অনামিকার মুখচ্ছবি যেন বেশি ঝকঝক করত তাঁর মনে। অনেক দুঃখ, ব্যর্থতার মুহূর্তে ওই মুখ মনে করে তিনি শান্তি পেয়েছেন।

তারপর আস্তে-আস্তে দুঃখ কমতে লাগল। ব্যর্থতার বদলে একে-একে দেখা দিতে লাগল সার্থকতা। বাসুদেব মজুমদার টমাস এডিসনের মতন আবিষ্কারক নন বটে, কিন্তু ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বেশ সার্থকই বলতে হবে। সাতচল্লিশ বছর বয়সে তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে তিনি যথেষ্ট উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। বেশ কয়েকটি মৌলিক যন্ত্রের মডেল তিনি তৈরি করে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় করিয়েছেন নিজের দেশের। আর এই সার্থকতার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতে তিনি হারিয়ে ফেলেছেন সৌন্দর্যতৃষ্ণা। অনামিকা কবে যে মন থেকে হারিয়ে গেছে তিনি খেয়ালই করেননি। এই সেই অনামিকা। যাকে দেখলেই একসময় বুক কেঁপে উঠত, আজ তাকে দেখে তিনি চিনতেই পারলেন না।

বাসুদেব কোনওদিন অনামিকার চোখেই পড়েননি, অথচ অনামিকা তাঁকে মনে রেখেছে কী করে? অনামিকা তাঁকে লক্ষ্য করত তা হলে? অনামিকার মনে তাঁর জন্য একটু স্থান ছিল? ধুতি-পাঞ্জাবি পরা সাধারণ একজন কলেজের লেকচারার, যে মেয়েদের সঙ্গে চোখ তুলে কথা বলতেই

জানত না, তাকে অনামিকার মনে থাকবে কীজন্য?

এবারে এক ঝলক মনে পড়ল, সুশোভন দত্ত চৌধুরীর কী যেন একটা অ্যাকসিডেন্টের খবর তিনি পড়েছিলেন খবরের কাগজে। বেঁচে আছে না মরে গেছে?

এসব কথা কি এখন জিগ্যেস করা যায়? তিনি চিনতে পারেননি বলে অনামিকা কি অপমান বোধ করে চলে গেল এখান থেকে? বাসুদেব এবার ভাবলেন উঠে গিয়ে অনামিকার খোঁজ করবেন। কিন্তু উঠলেন না, তাঁর ভয় করছে, তাঁর বুক কাঁপছে। তিনি বসেই রইলেন মুখ নীচু করে।

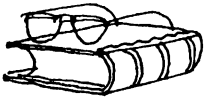

অশোক উপাখ্যান

যতদূর মনে পড়ে, ছেলেবেলায় একবারই মাত্র বাবার কাছে খুব বকুনি খেয়েছিল অশোক। তখন তার বয়স মাত্র সাত বছর। সাত বছরই তো, তখন সে ক্লাস টু-তে পড়ে। তখনও আলিপুর পার্ক রোডের বাড়িটা তৈরি হয়নি, ওরা থাকত চিত্তরঞ্জন এভিনিউয়ের হলদে রঙের তিনতলা বাড়িটায়, সে বাড়ির সামনে কোনও বাগান ছিল না, খেলবার কোনও জায়গাই ছিল না।

সেই দিনটা নিশ্চয়ই ছিল রবিবার কিংবা কোনও ছুটির দিন। কারণ, ঘটনাটা ঘটেছিল বেলা একটা বা দেড়টার সময়, ছাদে খুব গনগনে রোদ ছিল অশোকের স্পষ্ট মনে আছে। ছুটির দিন না হলে ওই রকম সময়ে তো বাবা বাড়িতে থাকতেন না, অশোকেরও স্কুলে থাকার কথা। অবশ্য অনেক ছুটির দিনেও বাবাকে দেখতে পেত না অশোক। বাবা খুবই ব্যস্ত মানুষ, প্রায়ই তাঁকে কাজের জন্য যেতে হত দিল্লি, বোম্বাই, আমেদাবাদ। মাসে অন্তত দু-বার যেতেন বাঙ্গালোরে, সেখানে বাবার আর একটা অফিস ছিল।

চিত্তরঞ্জন এভিনিউয়ের সেই বাড়িটায় অনেক ঘর ছিল, তার মধ্যে তিনতলার দুটো ঘর ভরতি বোঝাই ছিল বাবার অফিসের খাতাপত্র। সেই ঘরে ছোটদের ঢোকা নিষেধ। বাবা কলকাতার বাইরে থাকলে ঝি-চাকররাও সেই দুটো ঘরে ঝাড়-পোঁচ করতে ঢুকত না।

তবু সেই সাত বছর বয়েসে, দুপুরবেলা অশোক চুপিচুপি ঢুকেছিল বাবার একটা অফিস ঘরে। বাবা তখন পাশের ঘরেই কাজ করতে-করতে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

সেই অফিস ঘরটায় ছিল দুটো স্টিলের আলমারি আর একটা চেয়ার ও একটা টেবিল। অশোকের স্পষ্ট মনে আছে, সে ঘরে একটার বেশি চেয়ার ছিল না। বাবার যে দু-তিনজন কর্মচারী ওই ঘরে দেখা করতে আসত তারা সর্বক্ষণ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কথা বলত। দরজার বাইরে জুতো খুলে ঢুকত তারা। অবশ্য এক-তলায় তাদের মস্তবড় একটা বসবার ঘর ছিল, তার একদিকে সোফা সেট, আর একদিকে চৌকির ওপর ফরাস পাতা।

অশোক সেই ঘরে ঢুকে টেবিলের ডানদিকের দেরাজ খুলে ফেলেছিল আস্তে-আস্তে। সেটা চাবি দেওয়া ছিল না। তার মধ্যে হাত ঢোকাতেই অশোক পেয়ে গিয়েছিল জিনিসটা। একটা রিভলভার।

অশোকের নিজের খেলনা বন্দুক-পিস্তল ছিল। এই জিনিসটা প্রায় সেই রকমই দেখতে। অশোকের খেলনা বন্দুক পিস্তল দেখলে কেউ ভয় পায় না, বরং হাসে। চরতরাম কিংবা ভূপী ভাইয়া কিংবা লছমীকে যখন অশোক তার খেলনা পিস্তল দিয়ে গুলি করে, তখন তারা দু-হাতে বুক চেপে

ধরে 'আ মর গয়া' বলে হাসতে থাকে। কিন্তু বাবার হাতে এই পিস্তলটা দেখে সরকারজি ভয়ে কাঁপছিল কেন?

দৃশ্যটা অশোক দেখে ফেলেছিল আড়াল থেকে। ছাদের পেছন দিকের কার্নিস দিয়ে উঁকি মারলে এই ঘরের ভেতরটা দেখা যায়। লছমী দুধ খাওয়াতে এলেই অশোক ছাদের চতুর্দিকে দৌড়ে-দৌড়ে পালাত। আগের দিন সকালে সেই রকমভাবে দৌড়তে-দৌড়তেই অশোক একবার একেবারে এক কোণে এসে পড়ে কার্নিস ধরে ওঠবার চেষ্টা করছিল, তখনই সে দেখতে পেল যে বাবা এই পিস্তলটা উঁচিয়ে কড়া গলায় সরকারজিকে বলছেন, হাঁ, আমি বাংগালি লোকদের বেশি ফেভার করি, বেছে-বেছে তাদের নোকরি দিই, তাই বলে তোমরা আমার শির পর চড়ে বসবে? কুত্তেকে আওলাদ, তোর ছাতি আমি ফুঁড়ে দেব! বেইমান কাঁহিকা...

সরকারজি হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে ভয়ে কাঁপছিল, ঝুপ করে নীচু হয়ে বাবার পা ধরে কাঁদতে লাগল।

দৃশ্যটা দেখে বেশ মজা লেগেছিল অশোকের। সাত বছর বয়েসে সব ঘটনার মর্ম বোঝা যায় না। একজন কেউ ভয় দেখাচ্ছে, আর একজন ভয় পাচ্ছে, শিশুর মনোজগতে এই তো মানব-সমাজের স্বাভাবিক দৃশ্য। জন্ম থেকে এই রকমই তো তারা দেখে। এর মধ্যে যে ভয় দেখায়, যে কোনও শিশু তাকেই পছন্দ করে, সেও ওই রকমই একজন হতে চায়।

অশোকের চোখে বাবা একজন বীরপুরুষ। সেই জন্য সে বাবার খেলনাটা নিতে চেয়েছিল।

রিভলভারটা হাতে নিয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। সে জানে, তার হাতে এটা দেখলে লছমী বা ভূপী ভাইয়ারা ভয় পাবে না, খেলনা পিস্তলই ভাববে। তাকে এখন সরকারজির মতন কাল্পনিক কয়েকটি প্রতিপক্ষ তৈরি করে নিতে হবে, সেই জন্য ছাদে যাওয়া দরকার।

কিন্তু লছমীই আগে তাকে দেখতে পেল। অমনি সে চেঁচিয়ে উঠল, আরে-আরে, ছোটবাবু তুম পিতাজীর ঘরে ঘুষেছিল? ওটা কী নিয়েছ? আরে বাপ রে বাপ!

অশোকের বাবার ঘুম খুব পাতলা। তিনি লছমীর চিৎকার শুনেই বাইরে ছুটে এসেছিলেন। কনিষ্ঠ সন্তানের হাতে রিভলভারটি দেখা মাত্র তিনি চিনে ফেললেন, দারুণ আতঙ্কে তাঁর চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল। তাঁর মনে পড়ে গেল, রিভলভারটি লোড করা এবং খুব সম্ভবত সেফ্‌টি ক্যাচ আটকান নেই।

তিনি কাঁপা-কাঁপা গলায় বললেন, অশোক বেটা, কেন আমার জিনিস নিয়েছ? তুমার কত্তো টয় আছে, রাখ দো, জমিন পর রাখ দো, ধীরে-ধীরে।

অশোক রিভলভারটি উঁচিয়ে খলখল করে হেসে বলেছিল, পিতাজি, ডিসুম! ডিসুম।

তৎক্ষণাৎ রঘুবীরপ্রসাদ উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছিলেন মাটিতে। তাঁর দৃঢ় ধারণা হয়েছিল, এলোমেলো গুলি ছিটকে আসবে। ছেলেটা নিজেই মারা পড়তে পারে—

বাবাও সরকারজির মতন ভয় পেয়ে মাটিতে শুয়ে পড়েছেন দেখে আরও মজা পেয়েছিল অশোক। তাহলে বাবার চেয়েও সে বড় বীরপুরুষ! এই খেলাটা তো চমৎকার!

সে রিভলভারটার মুখ ঘোরাল বাবার দিকে।

মাটি থেকে মুখ না তুলে রঘুবীরপ্রসাদ বলে যাচ্ছিলেন, লছমী, উসকো পাকড়ো, অশোকবেটা, উয়ো টয় রাখ দো, অনেক ভালো ভালো টয় দিব, চকোলেট, পেস্টি, যো তুমি মাঙবে...লছমী, মাইজিকো তুরন্ত বোলাও, অশোক বেটা, এইসা মাৎ কর না, তুমার পিতাজি মরে যাবে—

শেষপর্যন্ত অবশ্য দুর্ঘটনা কিছু ঘটেনি। অশোকের মা এসে পড়েছিলেন! মা একটুও ভয় পাননি। মা সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে বলেছিলেন, দে, ওটা আমায় দে। অশোক, দুষ্টুমি

করিসনি, দে বলছি!

অশোক তবু দিতে চায়নি, মা হঠাৎ দৌড়ে এসে তাকে ধরে ফেলে হাত থেকে কেড়ে নিয়েছিলেন রিভলভারটা।

তখন দেখা গেল বাবার রাগ। এর আগে তিনি অশোককে কোনওদিন কড়া কথা বলেননি পর্যন্ত। সেদিন মাটি থেকে উঠে এসে তিনি অশোকের সামনে দাঁড়িয়ে গর্জন করতে লাগলেন। অশোকের হাতে তখন আর অস্ত্র নেই, বাবার শারীরিক শক্তি বেশি, সেইজন্য তিনি ভয় দেখাতে পারলেন ছেলেকে। শুধু ভয় দেখিয়েই তিনি ক্ষান্ত হলেন না, শেষ পর্যন্ত রাগ সামলাতে না পেরে দুটো চড় কষিয়ে দিলেন।

সেই ঘটনা অশোক কোনওদিন ভুলতে পারেনি। এর কয়েকমাস পরেই অশোককে পাঠিয়ে দেওয়া হয় দার্জিলিংয়ের কনভেন্ট স্কুলে। ছুটিতে বাড়ি এলে বাবা খুব ভালো ব্যবহার করতেন। অশোকের কোনও শখ মেটাতে বাবা কখনও কার্পণ্য করেননি।

অশোকের যখন সতেরো বছর বয়েস, তখনই বাবা তাকে একটি ফিয়াট গাড়ি উপহার দিয়েছিলেন। অশোকের নিজস্ব গাড়ি। এক বছর বয়েস বাড়িয়ে অশোক সেই সময়েই ড্রাইভিং লাইসেন্স করে নিয়েছিল।

কৈশোর পার হওয়ার পর অশোক বাবার একটা অন্য পরিবর্তন লক্ষ করেছিল। বাবা আগে প্রায়ই বাংলা বলতেন, বাংলা অনেকটা ভালোই শিখেছিলেন। কিন্তু আজকাল আর বাংলা বলতেই চান না। বাড়িতে কেউ বাংলায় কথা বললে তিনি স্পষ্ট বিরক্ত হন।

অশোকের মাতৃভাষা বাংলা, কিন্তু সে বাঙালি নয়।

রঘুবীরপ্রসাদ ছাত্র বয়েসে একবার শান্তিনিকেতনে দোল উৎসব দেখতে গিয়েছিলেন। সেই উৎসব দেখে তাঁর এত ভালো লেগেছিল যে তিনি মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে বাঙালি মেয়ে বিয়ে করবেন। যেন ইচ্ছেটা কাজে পরিণত করা খুব সহজ ছিল না। তিনপুরুষ ধরে তাঁদের পরিবার কলকাতাবাসী হলেও বিয়ে-শাদী হয় রাজস্থানে। রঘুবীরপ্রসাদের বাবা জবরদস্ত লোক ছিলেন, তাঁর অমতে যাওয়ার সাধ্য রঘুবীরপ্রসাদের ছিল না। স্বজাতির মধ্যেই বাবার মনোনীত পাত্রীকে বিয়ে করতে হল। কিন্তু সেই স্ত্রীর মৃত্যু হল এক বছরের মধ্যেই।

তার তিন বছর পর, রঘুবীরপ্রসাদ তাঁর বাবার মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করে তারপর তাঁর সাধ পূর্ণ করেছিলেন। পুণ্যশীলা রায়চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় দেরাদুনে। রঘুবীরপ্রসাদের কাছ থেকে বিবাহ প্রস্তাব রায়চৌধুরী পরিবার প্রত্যাখান করতে পারেনি।

বিয়ের পর কিছুদিন রঘুবীরপ্রসাদ বাংলা সংস্কৃতির প্রতি অনেকখানি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ঘন-ঘন বাংলা সিনেমা-থিয়েটার দেখতে যাওয়া, বাড়িতে বাংলা গানের রেকর্ড, কিছু-কিছু বাঙালি রান্না। বংশগত ভাবে নিরামিষাশী হলেও একদিন চিংড়ি মাছ চেখে দেখলেন এবং পছন্দও করলেন।

কিন্তু এই প্রীতি বেশিদিন টেকেনি। ব্যাবসা জগতে তিনি বাঙালি কর্মচারীদের কাছ থেকে বারবার আঘাত পেয়েছেন। তাদের তিনি বেশি-বেশি সুযোগ দিলেও তারা বিশ্বাসের মূল্য দিতে পারেনি। তাছাড়া, এদের অনেকের মুখেই একটা সূক্ষ্ম বিদ্রূপের হাসি লেগে থাকে, এটাই তার অসহ্য মনে হয়। দু-পয়সার মুরোদ নেই, তবু একটা সবজান্তা ভাব। অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বুঝেছেন যে বাঙালি জাতটা নিমকহারাম। যতই এদের দাও, একটু পেছন ফিরলেই নিন্দে শুরু করবে। বাঙালিরা নিজের যা পারে না, অন্য কেউ তা পারলেও ওরা তা মেনে নিতে শেখেনি।

পুণ্যশীলার একটা বড় কৃতিত্ব এই যে তিনি পরপর পাঁচটি সন্তানের জন্ম দিয়েছেন, প্রত্যেকটিই ছেলে। এইসব পরিবারে পুত্রসন্তানের বড় কদর। অবশ্য সব ভারতীয় পরিবারেই তাই, তবে ব্যবসায়ী

পরিবারের মেয়েরা শুধু যে সম্পত্তির একটা বড় অংশ নিয়ে চলে যায় তাই-ই নয়, ব্যবসায়েও ভাগ বসাতে চায়।

অশোকের ওপরের চারটি ভাই-ই বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে। প্রত্যেকেই মাঝারি ধরনের লেখাপড়া শিখে ব্যাবসাতে মন দিয়ে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। তারা ছড়িয়ে পড়েছে ভারতের নানা প্রান্তে।

অশোক একেবারে ছোট ছেলে বলেই হয়তো বেশি-বেশি মা ঘেঁষা! বড় হয়ে অশোক জানতে পারে যে বাঙ্গালোরে তার বাবার একটি রক্ষিতা আছে। তার দাদারাও এ ব্যাপারটা জানে, কিন্তু তারা কেউ এ নিয়ে মাথায় ঘামায় না। রঘুবীরপ্রসাদকে প্রায়ই বাঙ্গালোরে গিয়ে থাকতে হয়, তাঁর সেবা যত্নের জন্য সেখানে একজন মেয়েমানুষ রেখে দিলে দোষের কী আছে? কিন্তু এই ব্যাপারটা জানতে পেরে অশোক যেন আরও বেশি তার মাকে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিল। মা-ও কি জানে? অশোক মাকে জিগ্যেস করতে সাহস পায়নি। মা যেন বড় বেশি চাপা। মা সকলের সেবা যত্ন করেন, হাসেন, বই পড়েন, কিন্তু মনে-মনে তার সম্পর্কে যে কী ভাবেন তা বোঝা যায় না।

অশোক সাবালক হয়ে ওঠার পর তাকেও মায়ের আঁচল ছাড়া করে ব্যাবসায় লাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন রঘুবীরপ্রসাদ। কিন্তু ইতিমধ্যে একটা ব্যাপার ঘটে গেল।

সতেরো বছর বয়েসে একটা নিজস্ব ফিয়াট গাড়ি পেয়ে অশোক যেখানে-সেখানে চরকি দিয়ে বেড়াত। ততদিনে রঘুবীরপ্রসাদ পশ্চিমবাংলার এগারোখানা পেট্রল পাম্পের মালিক, সুতরাং অশোকের পেট্রলের কোনও চিন্তা নেই।

এক টিপিটিপি বৃষ্টিপড়া সন্ধেবেলা অশোক মোমিনপুরের মোড়ের কাছে উলটোদিক থেকে আসা একটা বাসকে কাটাতে গিয়ে হঠাৎ বাঁ-দিকে ঘুরে গিয়ে এক ভদ্রমহিলা আর তাঁর সঙ্গের একটি সাত-আট বছরের মেয়েকে চাপা দিল। গাড়ির ধাক্কায় দুটো শরীরই ছিটকে পড়ল মাটিতে, গাড়ির চারটে চাকা চলে গেল তার ওপর দিয়ে, মড়মড় করে শব্দ হল। পুরো ব্রেক করার পরও গাড়িটা বিকট শব্দ করে থামল একটু দূরে। অশোক পেছন ফিরে তাকাল।

গাড়িতে অশোকের এক বন্ধু ছিল। সে কোনও কথা না বলে দরজা খুলে নেমেই এক দৌড়ে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। অশোক আর কিছু ভাববার সময় পেল না, সেও গাড়ি থেকে নেমে দৌড় মারল।

বৃষ্টির জন্য রাস্তায় বেশি লোক ছিল না। কেউ তাকে তাড়া করে আসেনি। অশোক অন্ধের মতন ছুটতে-ছুটতে কোথায় যে গিয়ে পড়ল তা সে জানে না। এই শহরে সে এতদিন আছে কিন্তু কোনওদিন পায়ে হেঁটে ঘোরার অভ্যেস নেই। নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে সে একটা ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি ফিরে আসতে পারত! কিন্তু তার মাথার মধ্যে কোনও যুক্তি কাজ করছিল না। মাথাটা যেন ফাঁকা। তার কী নাম, কোথায় বাড়ি এসব কিছুই যেন মনে নেই।

অনেক রাতে জল কাদা মেখে, খালি পায়ে অশোক ফিরে এল বাড়িতে। ততক্ষণে তার বোধ ফিরে এসেছে। বাড়ির বাইরে কোথাও রাত কাটাবার কথা সে চিন্তাই করতে পারে না। তা ছাড়া তার কাছে টাকাকড়িও বিশেষ নেই। কোথায় আর যাবে, বাড়িতেই তো ফিরতে হবে! কিন্তু বাবা কী বলবেন, সেই ভয়েই সে কাঁপছিল থরথর করে।

বাড়ি ফিরে সে মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাঁদতে শুরু করেছিল পাগলের মতোন। সে কান্না আর থামেই না। দুঃখ বা ভয়ের কান্না নয়, তার মধ্যে সত্যিই যেন মিশে ছিল খানিকটা পাগলামি। মা অনেক প্রশ্ন করে-করে ঘটনাটা জেনে নিলেন। রঘুবীরপ্রসাদ সেদিন কলকাতাতেই ছিলেন, তিনি সব শুনে বললেন, বেওকুফ, গাড়ি কাঁহে ছোড়কে আয়া?

কলকাতা শহরে কোনও গাড়ি মানুষ চাপা দিলে সে গাড়ি আর থামে না। থামলেই জনতা এসে আক্রমণ করবে। গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ যখন ছিল, তখন অশোক কেন গাড়িটা অকুস্থলে ফেলে এল? রঘুবীরপ্রসাদের ছেলে এত দুর্বল কেন হবে?

পরদিন ভোরেই অশোককে পাঠিয়ে দেওয়া হল দিল্লিতে।

এই ঘটনার ফলে কয়েকটি অনভিপ্রেত প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। দুর্ঘটনাস্থলেই বাচ্চা মেয়েটি মারা যায়, তার মা দুদিন হাসপাতালে থেকে শেষ নিঃশ্বাস ফেলে। তবু অশোকের নামে কোনও মামলা-মোকদ্দমা হয়নি, রঘুবীরপ্রসাদের ব্যবস্থাপনা এমনই নিখুঁত। এমনকি কয়েকদিন বাদে খানিকটা কাচ-টাচ ভাঙাচোরা অবস্থায় গাড়িটাও ফেরত এনেছিলেন। খবরের কাগজে এই দুর্ঘটনার সায় দিয়ে তাঁদের পরিবারের কোনও উল্লেখও ছিল না।

কিন্তু এই উপলক্ষে পুণ্যশীলার সঙ্গে তাঁর স্বামীর একটা ঘোরতর মনোমালিন্য হয়। ব্যাবসার ব্যাপারে তাঁর স্বামী কোথায় কত নিষ্ঠুরতা দেখাচ্ছেন তার সব খবর তিনি রাখতেন না। কিন্তু এত বড় একটা মর্মান্তিক ব্যাপারের পরও রঘুবীরপ্রসাদের হৃদয়হীনতা তিনি ঠিক সহ্য করতে পারেননি। মামলা-মোকদ্দমা চাপা দেওয়া হয়েছে তা ঠিক আছে, যে-দুটি প্রাণ গেছে অন্য একজনকে শাস্তি দিলে তো তাদের ফিরে পাওয়া যাবে না। কিন্তু যে পরিবারটির ওপর এত বড় বিপদ নেমে এল তাদের তো সাহায্য করা যায়। রঘুবীরপ্রসাদের তো টাকা পয়সার অভাব নেই।

রঘুবীরপ্রসাদের বক্তব্য হল, টাকা পয়সার প্রশ্ন নয়, এই রকম ঘটনার সঙ্গে তাঁদের পরিবারের নাম জড়ানোটাই মুর্খতা। টাকা পয়সা তিনি গ্রাহ্য করেন না, পুরো ঘটনাটি ধামা চাপা দেওয়ার জন্য তাঁকে অনেক টাকা খরচ করতে হয়েছে।

তীব্র বিদ্রূপের সঙ্গে তিনি স্ত্রীকে বলেছিলেন যে, অত বেশি বাঙালি-বাঙালি কোরো না। যে-সব পুলিশ তাঁর কাছ থেকে ঘুষ খেয়েছে, লেবার কোর্টের যে হাকিম মামলা ডিসমিস করে দিয়েছে, তারা বাঙালি নয়?

অনেককাল পরে পুণ্যশীলা রাগ করে তিনমাসের জন্য বাপের বাড়িতে গিয়ে রইলেন। আর ওদিকে দিল্লীতে অশোকের মাথার গোলমালের স্পষ্ট লক্ষণ দেখা গেল। প্রায়ই তার মনে হয়, কয়েকটা ধারালো নখযুক্ত আঙুল তার মাথার ভেতরটা চিরে দিচ্ছে। সে যন্ত্রণায় চিৎকার করে ওঠে, তারপর হাউ-হাউ করে কাঁদে।

এদেশে কিছুদিন চিকিৎসার পর অশোককে পাঠিয়ে দেওয়া হল আমেরিকায় তার এক পিসতুতো দাদার কাছে। সেখান থেকে দু-বছর বাদে সে ফিরে এল নতুন মানুষ হয়ে। চেহারা তো ভালো হয়েছেই, ব্যবহারও অনাড়ম্বর, কথাবার্তা ঝকঝকে।

ফেরার সঙ্গে-সঙ্গেই রঘুবীরপ্রসাদ অশোককে জড়িয়ে ফেললেন ব্যাবসার কাজে। মায়ের সংস্পর্শে থেকে সে যাতে আবার দুর্বল না হয়ে পড়ে সেইজন্য তাকে দেওয়া হল রাঁচী অফিসের ভার।

বিদেশ থেকে অশোক এই তত্ত্বটি আরও ভালো করে শিখে এসেছে, অস্ত্র হাতে তুলে নাও, প্রতিযোগীদের ধ্বংস করো। অস্ত্র মানে আর বন্দুক-পিস্তল নয়, অস্ত্র হল টাকা। তুমি টাকা বাড়িয়ে যাও, অন্য সবাই এসে তোমার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়বে।

অশোক টাকা বাড়ানোর নেশায় মেতে উঠল। সে এখন সম্পূর্ণ নির্দয়। কোনও কর্মচারী তার নির্দেশ মানতে সামান্য গাফিলতি করলেই অশোক তাকে সম্পূর্ণভাবে সরিয়ে দেয়। কেউ তার কথার প্রতিবাদ করলে অশোক তাকে ধনেপ্রাণে মারে। পেট্রোলে কেরোসিন মেশাও, সিমেন্টে গেঁড়িমাটি মেশাও, তাতে টাকা বাড়বে। সরকারের কনট্রাক্ট নেওয়ার পর মাল সাপ্লাই না দিয়ে বিল সাবমিট

কর, কয়েক পারসেন্ট এদিক-ওদিক ছড়িয়ে দাও, তোমার টাকা বাড়বে। নতুন কারখানা খোলা হবে বলে আদিবাসীদের গ্রাম থেকে উচ্ছেদ করো, ঠিকেদারদের হাত করে ওদের ঝুপড়িগুলোতে আগুন লাগিয়ে দাও! এম-এল-এ আর মন্ত্রীদের মাঝে-মাঝে বি এন আর হোটেলে ডেকে এনে খাওয়াও-দাওয়াও আর হাতে একটি করে খাম ধরিয়ে দাও তারপর দেখো কেমন করে ওরা তোমার পা চাটে!

কয়েক বছরের মধ্যে রঘুবীরপ্রসাদকেও স্বীকার করতে হলো যে এ ছেলে তার দাদাদেরও ছাড়িয়ে যাবে। তার উন্নতি প্রায় সরল রেখায় চলেছে, একটুও বাঁক নেই। নতুন-নতুন ব্যাবসার দিকে ঝুঁকছে সে। এখন অশোক যা ছুঁচ্ছে তাই-ই সোনা হয়ে যাচ্ছে। একজন সরকারি অডিটারকে অশোক এমন নিখুঁত কায়দায় খুন করালো যে সে ব্যাপারে কেউ তার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারল না। রঘুবীরপ্রসাদ একেবারে চমৎকৃত হয়ে গেলেন। এই ছেলের বিয়ে দেওয়ার কথা তিনি ভাবছিলেন, এবার ঠিক করলেন আর একটু অপেক্ষা করা যাক। এ-ছেলে যেমন ভাবে উঠছে তাতে বিড়লা বা খৈতান বা জৈনদের বাড়ি থেকেই অশোককে জামাই করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করবে নিশ্চয়ই।

বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করে অশোক অবশ্য এর মধ্যে একটি অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়েকে রক্ষিতা করেছে, বাইরে অবশ্য তার পরিচয় অফিস সেক্রেটারি।

তারপর একদিন আর একটা ঘটনা ঘটল।

জুলাই মাসের এক শনিবার অশোক জরুরি কাজে রাঁচী থেকে খড়্গপুর আসছিল গাড়িতে। এখন অশোক নিজে গাড়ি চালায় না, ড্রাইভার থাকে। আর একজন বিশ্বস্ত কর্মচারীও থাকে সব সময়, যে আসলে তার বডি গার্ড।

ঝিরঝির বৃষ্টি পড়ে যাচ্ছে সকাল থেকেই, সেই জন্য গাড়ির গতি একটু ধীর। পেছনের সিটে বসে অশোক ব্যাবসার কাগজ-পত্র পড়ে যাচ্ছে। একটা হাত তার রক্ষিতা বনাম সেক্রেটারি স্টেলার উরুর ওপর রাখা! স্টেলা অবশ্য ঢুলছে অনেকক্ষণ ধরে।

বাহারাগোড়ার একটু আগে দেখা গেল রাস্তার ওপরে বেশ ভিড়। দুপাশে অনেক গাড়ি জমে গেছে। একটা পুলিশের গাড়িও দেখা যাচ্ছে।

কাগজপত্র থেকে চোখ তুলে অশোক জিগ্যেস করল, কেয়া হুয়া?

ড্রাইভার বলল, অ্যাকসিডেন্ট মালুম হোতা।

বিরক্তিতে অশোকের ভুরু কুঁচকে গেল। লাঞ্চের আগেই তার খড়্গপুরে পৌঁছনো দরকার। কিন্তু রাস্তা এমন জ্যাম হয়ে আছে যে গাড়ি এগোবার কোনও উপায় নেই।

একটুক্ষণ অপেক্ষা করার পর অশোক গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। স্টেলা ঘুমিয়েই রয়েছে। অল্প-অল্প বৃষ্টি এখনও পড়ছে, তার মধ্যেও এত লোক রাস্তায় দাঁড়িয়ে। হাইওয়ের ওপরে এত মানুষ আসে কোথা থেকে? অশোক এগিয়ে গেল পায়ে-পায়ে।

বেশ বড় রকম দুর্ঘটনা। একটা ট্রাক রাস্তা ছেড়ে বেরিয়ে গিয়ে ধাক্কা মেরেছে পাশের শাল গাছে। একটা সাদা রঙের ফিয়াট গাড়ি ত্যারচাভাবে বেঁকে দাঁড়িয়ে আছে। সেই ফিয়াট গাড়িতে চাপা পড়েছে এক গ্রাম্য মহিলা আর একটি বাচ্চা মেয়ে। প্রকাশ্য দিনের আলোয় এরকম দুর্ঘটনার কোনও কারণই নেই, কিন্তু ফিয়াট গাড়ির ড্রাইভার নাকি ঘুমে ঢলে পড়েছিল।

ডেড বডি দুটো এখনও সরানো হয়নি, রাস্তার পাশে চাপ-চাপ রক্ত বৃষ্টির জন্যেও ধুয়ে যায়নি। ঝাড়গ্রাম থেকে অ্যাম্বুলেন্স আসবে, সেই জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে।

দুর্ঘটনার পর ফিয়াট গাড়িটি পালাতে পারেনি, কারণ তার ব্রেক জ্যাম হয়ে গেছে। ঘটনাটার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই একটা পুলিশের গাড়ি এসে পড়েছিল বলে উত্তেজিত জনতা মারধোর বা ভাঙচুরের

তান্ডব শুরু করতে পারেনি। অবশ্য এরা শহরের জনতা তো নয়, তাই চট করে ক্ষিপ্ত হয় না। ফিয়াট গাড়িটিতে শুধু চালক ছাড়া আর কেউ ছিল না, সেই চাকলটি পুলিশের গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলছে।

এই দুর্ঘটনার দৃশ্যটি অশোকের মনে প্রথমে কোনও দাগ কাটেনি। সে খালি অস্থির হয়ে ভাবছিল, খড়্গপুর পৌঁছতে তার দেরি হয়ে যাচ্ছে, ব্যবসার কাজে লোকসান হয়ে যাবে, পুলিশ তো আগে রাস্তাটা পরিষ্কার করে দিলেই পারে।

ফিয়াট গাড়ির চালকটি একবার মুখ ফেরাতেই অশোক তাকে ভালো করে দেখতে পেল। সঙ্গে-সঙ্গে তার বুকের মধ্যে কামানের গোলার মতন প্রচণ্ড একটা শব্দ হল। এ কী! লোকটিকে অবিকল অশোকের মতন দেখতে। একরকম উচ্চতা, একরকম গায়ের রং, নাক-চোখেরও দারুণ মিল। সে একটা সিগারেট ধরিয়ে কথা বলছে পুলিশ অফিসারের সঙ্গে।

ফিয়াট গাড়ির চালকটির মুখে কোনও ভয়ের চিহ্ন নেই। দেখলেই বোঝা যায় সে যথেষ্ট অর্থবান। সে টাকা পয়সার অস্ত্র উঁচিয়ে ধরলেই পুলিশ থেকে আরম্ভ করে আর সবাই তার সামনে হাত জোড় করে দাঁড়াবে।

কিন্তু অশোক অহেতুকভাবে সাংঘাতিক ভয় পেয়ে গেল। তার মনে হল, যদি জনতা তাকে ওই লোকটির যমজ ভাই মনে করে? সবাই মিলে যদি তেড়ে আসে তার দিকে? কেউ অশোককে লক্ষ্য করছে না, তবু অশোক দু-হাতে মুখ চাপা দিয়ে নেমে গেল রাস্তার পাশের নালায়। তারপর অশোক আর আগের অশোক রইল না।

সে ভুলে গেল খড়্গপুরে তার জরুরি কাজের কথা, তার গাড়ির কথা, স্টেলার কথা। তার নাম যে অশোক তাও বোধহয় আর তার মনে নেই।

নালাটা পেরিয়ে সে চলে গেল ওপারে। তারপর একটা ছোট শালের জঙ্গল। অশোক সেই জঙ্গলে ঢুকে ছুটতে লাগল। এখন সে খালি শুনতে পাচ্ছে মড়-মড় শব্দ। কতকগুলো ধারাল নখযুক্ত আঙুল যেন তার মাথাটা চিরে দিচ্ছে। সে ফিরে গেছে তার সতেরো বছর বয়েসে, সে যেন মোমিনপুরের মোড় থেকে তার গাড়ি ছেড়ে পালাচ্ছে।

ছুটতে-ছুটতে কয়েকবার হোঁচট খেয়ে, দু-একবার দম নিয়ে প্রায় আড়াই ঘণ্টা পর অশোক এক জায়গায় এসে একেবারে থামল। সেখানে অদিবাসীদের একটা হাট বসেছে। একটা খেজুর গাছের তলায় বসে অশোক হাঁপাতে লাগল জিভ বার করে। তার খালি এখন একটাই ইচ্ছে করছে, কোনক্রমে মায়ের কোলে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে। কিন্তু মায়ের কাছে কী করে পৌঁছনো যায় তা আর অশোক এখন জানে না। প্রায় বছর দেড়েক হল সে তার মাকে একবার চোখেও দেখেনি।

একটু পরে একজন আধা মাতাল ভিখিরি এসে অশোকের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, এ-বাবু, একগো রুপিয়া দিবি?

অশোক কোনওদিন ভিখিরিদের পয়সা দেয়নি, কিন্তু আজ সে কোটের পকেটে হাত ঢোকাল। তার কাছে টাকা পয়সা কিছু নেই। বড়লোকরা সঙ্গে টাকা রাখে না, তাদের থাকে চেক বই, ডাইনাশ ক্লাবের কার্ড ইত্যাদি। খুচরো দু-পাঁচশো টাকা অশোক তার বডি গার্ডের কাছে রাখে সবসময়।

ভিখিরিটিকে পয়সা দিতে পারল না অশোক, কিন্তু তার হাত ঘড়িটা খুলে দিল। যেন এখন সে এই ঘড়িটার কোনও মূল্য বোঝে না। লোকটা নির্বিবাদে ঘড়িটা নিয়ে জুয়া খেলার বোর্ডের দিকে গেল। ওখানে ঘড়ি ভাঙিয়ে টাকা পাওয়া যায়।

এরপর আর-একটি লোক এসে হাত পাতল তার কাছে। অশোকের বাঁ-হাতে দুটো আঙটি, দুটোই খুলে সে দিয়ে দিল তাকে। সঙ্গে-সঙ্গে আর একজন ওর হাত থেকে কেড়ে নিল একটা।

তারপর রটে গেল যে একটা বাবু যা চাওয়া হচ্ছে, তাই দিয়ে দিচ্ছে। ধেয়ে এল আরও অনুগ্রহ প্রার্থীরা। যেহেতু অশোক সব জিনিসেরই মূল্য ভুলে গেছে তাই সে দিয়ে দিতে লাগল সব

কিছু। তার সিগারেট কেস, লাইটার, তার কোট, সার্ট, এমনকি প্যান্টলুন পর্যন্ত।

এরও পরে একজন উলঙ্গ লোক এসে বলল, এ-বাবু, আমায় কিছু দিবি না?

শুধু জাঙ্গিয়া ছাড়া অশোকের আর কিছু নেই। সেটাও সে খুলে দিল বিনা দ্বিধায়। তারপর সে আর বাবু শ্রেণিতে রইল না। জল কাদার মধ্যে উলঙ্গ অবস্থায় শুয়ে থেকে কিছুক্ষণের মধ্যেই সে একজন জংলি মানুষ হয়ে গেল।

বিকেল যখন শেষ হয়ে এসেছে, হাট ভাঙবার মুখে কয়েকটি বাচ্চা ছেলেমেয়ে ঘিরে ধরল তাকে। প্রথমে তারা ভেংচি কাটতে লাগল, তারপর অশোকের কাছ থেকে কোনওরকম সাড়া না পেয়ে তারা ছুড়তে লাগল ছোট-ছোট ঢিল, কেউ-কেউ লাথি মারতে লাগল তার গায়ে।

প্রয়াগের মেলায় সম্রাট অশোক সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে ধর্মাশোক হয়েছিলেন। আর এখানে, এই নাম না জানা অদিবাসীদের হাটে অশোক একেবারে নিঃস্ব হয়ে গিয়েও, সাধারণ পাগলের ভাগ্যে যা জোটে তাই ভোগ করতে লাগল।

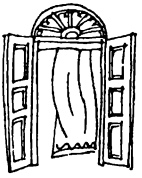

ভাঙা বারান্দা

এমন নয় যে এই বারান্দাটায় দাঁড়ালেই সুন্দর কোনও দৃশ্য দেখা যায়। তবু তো বারান্দা। জানলার থেকে অনেকখানি বেশি। জানলার গরাদে মুখ রাখলে কয়েদীর মতন লাগে, আর বারান্দা মানে মুক্তি।

বারান্দা একটা আছে, কিন্তু সেখানে দাঁড়াবার উপায় নেই।

যতদিন ছেলেটা ছোট ছিল, ততদিন বারান্দার দিকে দরজাটা বন্ধ করে রাখতে হত সব সময়। এখন ছেলে ইস্কুলে গেলে অসীমা দরজাটা খোলে, উদাস মুখ করে তাকিয়ে থাকে বাইরের দিকে, কিন্তু বাইরে পা বাড়াতে পারে না।

বারান্দাটার রেলিং ভেঙে পড়েছিল আট বছর আগে। তাতেও এমন কিছু ক্ষতি ছিল না, বয়স্ক লোকরা সাবধানে বারান্দায় দাঁড়িয়ে নীচের ফেরিওয়ালাদের ডাকতে পারত। কিন্তু একদিন দেখা গেল বারান্দাটার মাঝখান থেকে ফেটে অনেকখানি হাঁ হয়ে গেছে। ওপরের সিমেন্ট চুরচুরে। মাঝে-মাঝেই সুরকি খসে পড়ে নীচে। ওই বারান্দা এখন আর একজন মানুষের ভারও সহ্য করতে পারবে না। তবু সুদর্শন সাহস করে একদিন পা দিতেই বেঁকে গিয়েছিল।

সেই আট বছর আগেই ওই বারান্দা নিয়ে বাড়িওয়ালার সঙ্গে ঝগড়া করেছিল সুদর্শন। তখন সুদর্শনের চেহারা ছিল রোগা পাতলা, ডায়াবিটিস ধরেনি। মেজাজটাও ছিল তেড়িয়া। কিন্তু উগ্র স্বভাবের মানুষরাও চুনীলাল শীলের মতন বাড়িওয়ালার সঙ্গে কোনও সুবিধে করতে পারে না। কোনও গালাগালিই চুনীলাল শীলের গায়ে লাগত না। ঠান্ডা গলায় বলত, বারান্দা সারাব, সে পয়সা পাব কোথায়! দেখছেন না স্ত্রী পুত্র নিয়ে ডুবতে বসেছি। আপনার না পোষায় আপনি বাড়ি ছেড়ে দিন।

পাশের ঘরে থাকতেন গুরুসদয়বাবুরা। বারান্দাটায় তাঁদেরও কিছুটা অংশ ছিল। গুরুসদয়বাবুর স্ত্রীকে অসীমা কাকিমা বলে ডাকত। বেশ ভাব ছিল দুটি পরিবারে। অসীমা অবশ্য জানে না যে ওই গুরুসদয়বাবুর মেয়ে বুলা একসময় সুদর্শনকে বিয়ে করার জন্য পাগল হয়ে উঠেছিল। সুদর্শন রাজি না হয়ে দু-পক্ষেরই বাবা-মায়েদের খুশি করেছিল। বিয়ে করার মতন কোনও যোগ্যতাই

ছিল না তার।

গুরুসদয়বাবু সুদর্শনকে ওই বারান্দা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, বুঝলে খোকন, ভাড়াটে হিসেবে কি আমাদের কোনও অধিকার নেই? বারান্দা সমেত ঘর ভাড়া দিয়েছে, এখন সেই বারান্দা যদি ভেঙে পড়ে, বাড়িওয়ালা তা সারাতে বাধ্য নয়? থানায় খবর দিতে হবে, দরকার হলে আমরা কেস করব?

সে বছরই সুদর্শনের বাবা মারা গেলেন, পয়সা-কড়ির অবস্থা খুবই খারাপ, মামলা মোকদ্দমার নামে তার ভয় হয়েছিল। সে তো অনেক টাকার ব্যাপার, সে আর গা করেনি।

বাড়ি ফিরতে সুদর্শনের বেশ রাত হয়। তাদের এ-পাড়াটা বিশেষ ভালো নয়, কাছেই পোস্তার বাজার, সারাদিনরাত যেখানে অনেক টাকার কারবার চলে সেখানে গুন্ডা বদমাসরাও সবসময় ঘুর-ঘুর করে। রাত্তিরের দিকে ছিনতাই আর ছুরি চালাচালি লেগেই আছে। অবশ্য এ-পাড়ায় সবাই সুদর্শনকে চেনে। এ-পাড়াতেই তার জন্ম। সে একটা সাধারণ হেঁজিপেজি মানুষ। গুন্ডা বদমাসরা তাকে ছোঁবে কেন?

অসীমা তবু ভয় পায়। সুদর্শন ফেরার আগে রাস্তায় কোনও একটা গোলমাল হলেই সে বারান্দার দিকের দরজাটা খোলে, কিন্তু বাইরে কী ঘটছে তা দেখবার উপায় নেই।

এক-একদিন সুদর্শনের ওপর রাগ করে অসীমার ইচ্ছে করে ওই রেলিং ছাড়া বারান্দাটাতেই গিয়ে দাঁড়াতে। ভেঙে পড়ে তো পড়ুক।

সুদর্শন ফিরলেই সে ঝাঁঝের সঙ্গে বলে ওঠে, আমি আর একদিনও এ-বাড়িতে থাকতে চাই না। তোমার দোকানের কাছাকাছি একটা বাড়ি নিতে পারো না?

ম্লান হাসি ছাড়া এ কথার কোনও উত্তর নেই। দোকানের কাছাকাছি বাড়ি, অসীমা বোঝেই না, কত ধানে কত চাল! বর্ধমানের গ্রামের মেয়ে অসীমা, তাই মনটা এখনও সাদা!

কারখানায় যখন লক আউট চলছিল তখন কয়েকজন সহকর্মীর সঙ্গে মিলে কালীঘাটের মোড়ে রাস্তার ওপর ছিট কাপড়ের দোকান খুলেছিল সুদর্শন। সে কারখানা আর কোনওদিন খুললই না। অন্য চাকরির চেষ্টা না করে সুদর্শন এ-দোকান নিয়েই লেগে রইল। মোটামুটি বেশ চলে যাচ্ছিল। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই, পাতাল রেলের জন্য রাস্তা খুঁড়ছে ওই দিকে, এখন শোনা যাচ্ছে, যে-কোনওদিন ফুটপাথের দোকানগুলি সব তুলে দেওয়া হবে। তখন আবার জায়গা পাওয়া যাবে কোথায়?

আর বাড়ি পালটানো? সুদর্শনের বাবা ছত্রিশ বছর আগে এ বাড়িতে দেড় খানা ঘর ভাড়া নিয়েছিলেন। ভাড়া বাড়তে-বাড়তে এখন দাঁড়িয়েছে চুয়াত্তর টাকা। এই ঘর ছেড়ে অন্য যে-কোনও জায়গায় এরকম দেড়খানা ঘর ভাড়া নিতে গেলে অন্তত সাড়ে তিনশো, চারশো টাকা লেগে যাবে।

অসীমা ভাত বেড়ে দেয়। অসীমার দিকে তাকিয়ে সুদর্শনের বড় মায়া লাগে। সারাদিন তার দোকানে অনেক রকম মেয়েছেলে আসে, তাদের কত রকমের চেহারা, কেউ-কেউ তো বেশ সুন্দরী, তবু রাত্তিরবেলা বাড়ি ফিরে নিজের বউকে দেখতেই সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে সুদর্শনের। তার কোনও উঁচু আকাঙ্ক্ষা নেই। সারাদিন খাটাখাটনির পর যদি বিক্রিবাটা মোটামুটি ভালো হয় তাতেই সে খুশি আর রাত্তিরে বাড়ি ফিরে বউয়ের সঙ্গে একটু গল্প করা।

কিন্তু প্রত্যেকদিনই অসীমার অনেক অভিযোগ জমা থাকে।

সুদর্শন বলে, দাঁড়াও না, আগে একটা পাকা দোকান ঘরের ব্যবস্থা করি, তারপর বাড়ি পালটাব ঠিকই। একটা সুন্দর বারান্দা থাকবে, বেশ পার্কের পাশে, ছেলেটা খেলতে পারবে।

পাশের ছোট ঘরটা থেকে গোঙানির শব্দ পাওয়া যায়। সুদর্শনের মায়ের বয়েস হয়েছে অনেক, শরীরে শক্তি নেই, এখন শুধু মৃত্যুর অপেক্ষা। কিন্তু এইসব মানুষের মৃত্যু সহজে আসে না। কোনও রাত্তিরেই মায়ের সঙ্গে দেখা করে না সুদর্শন। বাড়ি ফেরার পথে এক-একদিন তার আশা হয়, ফিরেই হয়তো মায়ের মৃত্যু-সংবাদ শুনতে পাবে!

এ-বাড়ির বাড়িওয়ালার সঙ্গে ঝগড়াটা হঠাৎ একদিন থেমে গেল। কারণ বাড়িওয়ালা বলে কেউ রইলই না। চুনীলাল শীলের ব্যাবসা বেশ খারাপ চলছিল, অনেক মামলা মোকদ্দমাতেও জড়িয়ে পড়েছিল, হঠাৎ একদিন বিক্রি করে দিল সেই বাড়িটা। নতুন বাড়িওয়ালা যে কে হল তা বোঝাই গেল না। কানা-ঘুষোয় জানা গেল বটে তা কোনও মাড়োয়ারি কিনেছে, কিন্তু তাকে চোখে দেখা যায়নি একদিনও। এ-পাড়ার সব বাড়িই একে-একে মাড়োয়ারিদের দখলে চলে যাচ্ছে, কেউ বাড়ি বিক্রি করলে তা কোনও মাড়োয়ারি যে কিনবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে এই চারতলা বাড়িটার পুরোটাই ভাড়া, সবাই পুরোনো আমলের। এত ভাড়াটে শুদ্ধু বাড়ি কিনে মাড়োয়ারীর কী লাভ হবে?

এক রবিবার সকালে সব ভাড়াটে মিলে একটা মিটিং করল। যে বাড়িওয়ালাকে দেখা যায় না, সে অতি বিপজ্জনক। মাড়োয়ারি যখন বাড়ি কিনেছে তখন ভাড়াটে তোলার চেষ্টা করবেই সে। কোনদিক থেকে বিপদ আসবে কেউ জানে না। এ সময় সকলকে এককাট্টা হয়ে থাকতে হবে। ভাড়া বাকি পড়লে বাড়িওয়ালা সুযোগ পাবে, সুতরাং সকলেরই উচিত নিয়মিত রেন্ট কন্ট্রোলে ভাড়া পাঠানো।

খুব ভালো-ভালো কথা হল। যদিও সব ভাড়াটেদের মধ্যে মুখ দেখাদেখির সম্পর্ক নেই। মিটিং-এর পর থেকে আবার ঝগড়াঝাঁটি চলতে লাগল যথা নিয়মে।

কয়েক মাস বাদে সুদর্শন শুনতে পেল বাড়িওয়ালার এক দালাল নাকি বিভিন্ন ভাড়াটেকে টাকার লোভ দেখিয়ে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করছে। এক একজনকে পাঁচ-দশ হাজার টাকা দেবে।

কিন্তু সুদর্শনকে তো কেউ কিছু বলেনি? আবার সুদর্শন বেরিয়ে যায় সকাল সাড়ে আটটায় আর ফেরে সেই রাত ন'টার পর। তার দেখা পাবে কী করে?

অসীমাকে সে জিগ্যেস করে, তুমি কিছু শুনেছ? বাড়িওয়ালা নাকি টাকা দিতে চাইছে?

অসীমার গর্ভে আবার সন্তান এসেছে। তার মুখ ভার। ছেলে আজ বল খেলতে-খেলতে বারান্দায় চলে গিয়েছিল, এমন ভাবে ঝুঁকেছিল যে রাস্তার লোক হইহই করে উঠেছে। আর-একটু হলেই নীচে পড়ে যেত।

অসীমা বলল, তুমি আর কাকাবাবুরা মিলে বারান্দাটা সারিয়ে নিতে পার না? আমাদের যখন এখানেই থাকতে হবে...

সুদর্শন অবাক হয়ে বলল, কার বাড়ি তার ঠিক নেই, আমরা পয়সা খরচ করে বারান্দা সারাব?

অসীমা বলল, সব সময় ভয়ে-ভয়ে থাকতে হয়। টুকুন তো ছোট, ওকে আর দোষ দেব কী! তোমার মা-ই সকালবেলা ভুল করে বারান্দায় চলে যাচ্ছিলেন। কিছু একটা হলে আমার দোষ হত!

পাশের ঘরে মায়ের কাশির আওয়াজ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে! মা আজকাল চোখে প্রায় কিছুই দেখতে পান না। সুদর্শন সত্যিই তার মায়ের মৃত্যু চায়। কিন্তু বারান্দা ভেঙে পড়ে মরলে লোকে সত্যিই অসীমার নামে বদনাম দেবে।

অসীমা বলল, আমার দু-গাছা চুড়ি বেচে যদি কোনওরকমে বারান্দাটা মেরামত করতে পার, তাতেও আমি রাজি আছি।

সুদর্শন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। অসীমার চুড়ি দু-গাছার কথা সে ক'দিন ধরেই ভাবছে। কালীঘাটের মোড়ে ফুটপাতের ওপরে দোকান আর রাখা যাবে না। রাস্তা ভাঙতে-ভাঙতে তার দোকানের দিকে এগিয়ে আসছে। এ তো আর হকার উচ্ছেদ নয় যে পুলিশকে ঘুষ দিয়ে পার পাওয়া যাবে? ফুটপাতই যদি না থাকে! অন্য জায়গায় আবার দোকান বসাতে গেলে টাকা খরচ করতে হবে! জায়গা পাওয়াই দারুণ শক্ত ব্যাপার। তখন অসীমার চুড়ি দু-গাছা ছাড়া আর উপায় নেই।

দোকানই যদি না থাকে তাহলে বারান্দা দিয়ে কী হবে?

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই সুদর্শন দেখল গুরুসদয়বাবুদের বাড়ির মালপত্র তোলা হচ্ছে একটা লরিতে।

দারুণ অবাক হয়ে সে জিগ্যেস করল, কাকা, আপনারা চলে যাচ্ছেন?

গুরুসদয়বাবু গলায় খাঁকারি দিয়ে বললেন, হ্যাঁ,...আজ না হয় কাল তো যেতেই হবে... বাড়িওয়ালা এ-বাড়ি ভেঙে ফেলে দশতলা বাড়ি তুলবে শুনছি।

—আমাদের না তুলে কী করে বাড়ি ভাঙবে?

—ভাঙতে শুরু করলে আমাদের যেতেই হবে। সল্টলেকে বাড়ি করেছি একটা, কেন আর এখানে কষ্ট করে থাকা! তোমার কাকিমা বললেন এ পাড়াটাই আর ভালো লাগছে না। এ-পাড়ায় আর বাঙালিরা থাকতে পারবে না!

সুদর্শনের ভুরু কুঁচকে গেল। গুরুসদয়বাবু সল্টলেকের জমিতে ভিত খুঁড়ে অনেকদিন ফেলে রেখেছিলেন। ওঁর বড় ছেলে আলাদা হয়ে গেছে। টাকা পয়সার নাকি খুব টানাটানি যাচ্ছিল ইদানীং। তবে কী করে বাড়ি শেষ করলেন? হঠাৎ টাকা এল কোথা থেকে?

সুদর্শনের সন্দেহ হল। উনি বাড়িওয়ালার কাছ থেকে টাকা পেয়েছেন। নইলে এত সস্তার বাড়ি কেউ ছেড়ে চলে যায়! অন্য ভাড়াটে বসিয়ে দিলেও তো লাভ। কিন্তু উনি একেবারে ছেড়ে দিচ্ছেন।

আস্তে আস্তে অন্য ভাড়াটেও উঠে যেতে লাগল একজন দুজন করে। বাড়িওয়ালা নিজে আসে না। কিন্তু তার একজন দালাল ইদানীং ঘোরাঘুরি করে। টাকা দিয়েই ভাড়াটে তুলছে নির্ঘাৎ। অনেক জায়গাতেই এরকম শোনা যায়। কিন্তু সুদর্শনকে কেউ কিছু বলছে না কেন?

সন্ধের পর এ-বাড়িতে ঢুকতে এখন গা ছমছম করে। অনেক ঘরই অন্ধকার, সিঁড়ির আলো নেই। জলও মাঝে-মাঝে বন্ধ হয়ে যায়। সুদর্শন দেরি করে ফেরে, ফিরে তাকে অসীমার বিমর্ষ মুখ দেখতে হয়। আজকাল কোনও কথাই সে বলে না।

একদিন সকালবেলা সুদর্শন আবিষ্কার করল, অসীমা ওই ভাঙা বারান্দাতেই একটা ফুলের টব রেখেছে। তাতে কী যেন ফুলও ফুটেছে। বারান্দায় পা দেয় না, দরজার কাছে দাঁড়িয়েই অসীমা টবে জল দেয়।

দু-দিন ধরে সুদর্শনের দোকান উঠে গেছে। সে কথা সে অসীমাকে বলতে পারেনি। সে মুগ্ধভাবে নতুন ফোটা ফুলগুলো দেখে। তারপর চা মুড়ি খেয়ে বেরিয়ে পড়ে। নতুন জায়গা খুঁজে দোকান আবার চালু করতে না পারলে না খেয়ে থাকতে হবে পরের মাসে। দোকানের ক্যাপিটাল তার নিজস্ব নয়, সবই ধার।

সন্ধেবেলা পাড়ার দুটো মস্তান ছেলে তাকে ধরল। দুজনকেই চেনে সুদর্শন। এরা পোস্তা বাজারে গুন্ডামি করে। এদের মধ্যে হাবু তার সঙ্গে ক্লাস থ্রি পর্যন্ত পড়েছিল স্কুলে। এখন তাকে দাদা-দাদা বলে।

হাবু বলল, খোকনদা, শোনো, তোমার সঙ্গে একটা প্রাইভেট কথা আছে।

—কী রে হাবু, কী ব্যাপার?

বেশি সময় নষ্ট করে না হাবু। সুদর্শনের চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে বলে, তুমি এবারে পাড়া বদলাও। এ পাড়ায় তোমার মতন কমদামি মানুষদের আর জায়গা হবে না।

—বলিস কি রে, হাবু! বাড়ি ছাড়লে আমি যাব কোথায়? জানিস তো আমার অবস্থা। নতুন করে ঘর ভাড়া নেওয়ার কি আমার সামর্থ আছে?

—কালীঘাটের দিকে কোনও বস্তিতে ঘর খুঁজে নাও!

—এতকাল এ পাড়ায় আছি। তোদের কোনও ক্ষতি করেছি কখনও? হরেন মার্ডার হওয়ার

পর পুলিশ আমাকে সাক্ষী দিতে বলেছিল, তখন দিয়েছি আমি?

—ওসব জানি না। তুমি পাততাড়ি গুটোও। তুমি এখানে আর থাকতে পারবে না।

সুদর্শন ব্যাকুলভাবে হাবুর হাত জড়িয়ে ধরে বলল, তোরা আমার সঙ্গে এমন কচ্ছিস? দ্যাখ এ-পাড়ায় বাঙালিদের সব বাড়িগুলো একে-একে বেহাত হয়ে যাচ্ছে। বাঙালির কোনও জায়গা থাকবে না? তুই নিজে বাঙালি হয়ে আমাকে তাড়াতে চাস?

হাবু বলল, ও সব বাঙালি-ফাঙালি আমি বুঝি না। বাঙালিদের পয়সার মুরোদ আছে? আমাদের যে পয়সা দেবে আমরা তার দিকে টানব। বাঙালি নাম কি ধুয়ে খাব? তোমাকে ভালো কথা বলে দিচ্ছি—

সুদর্শনের বুকটা একেবারে খালি হয়ে গেল। বাড়িওয়ালা তাকে নেহাত চুনোপুটি জ্ঞান করে টাকা দিয়েও তুলতে চায়নি। হাবুদের দলকে কিছু টাকা দিয়েছে, ওরাই এখন ভয় দেখিয়ে বাকি ভাড়াটেদের তুলে দেবে। কিন্তু সুদর্শন এখন যাবে কোথায়?

অসীমার সঙ্গে এ-সম্পর্কে কিছুই আলোচনা করা যায় না। অসীমা এখন বারান্দায় তিনটে টব বসিয়েছে। সাহস করে সে আজকাল ওই বারান্দাতেও গিয়ে দাঁড়ায়। সুদর্শন নিষেধ করলেও শোনে না! কী যেন হয়েছে অসীমার।

বাড়িতে ঢোকার আগে সুদর্শন কিছুক্ষণ দেওয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে কাঁদে।

হাবুর চোখ দেখেই সুদর্শন বুঝতে পেরেছে, ওরা সহজে ছাড়বে না তাকে। ওরা পয়সার লোভ পেয়েছে। সুদর্শন যখন বাড়িতে থাকবে না তখন অসীমার ওপরে হামলা করতে পারে। এ পাড়াতে কেউ অন্যের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামায় না।

কালীঘাটে দোকান খোলার জন্য অন্য একটা জায়গা কোনওক্রমে খুঁজে পেয়েছিল সুদর্শন। সেখানেও পাড়ার মাস্তানরা এসে বাধা দিয়েছে। ও জায়গাটা এমনি-এমনি কেউ পাবে না। ওদের উপস্থিতিতে নিলাম হবে, যে বেশি টাকা দিতে পারবে সে পাবে। পাঁচ-ছ'হাজারের কমে কথাই নেই!

পাতাল রেলের মজুররা আজ সুদর্শনের দোকান যেখানে ছিল, সেই জায়গাটা ভাঙল। সুদর্শন নিজে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখেছে। পাতাল রেল তাকেও পাতালের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

বাড়ি ফিরে অসীমার সঙ্গে বেদম ঝগড়া হয়ে গেল সুদর্শনের। সাধারণত তার মাথা ঠান্ডা থাকে, কিন্তু আজ অসীমার একটা গায়ে বেঁধানো কথাই সে সহ্য করতে পারল না। প্রচন্ড জোরে চেঁচিয়ে বলল, মাগি তুই চুপ করবি!

অসীমা জ্বলন্ত চোখে সুদর্শনের দিকে তাকিয়ে খট্ করে দরজা খুলে চলে গেল বারান্দায়।

সুদর্শনের মনে হল, ও বুঝি ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে নীচে। সে বাধা দেওয়ার জন্য এগিয়ে গিয়েও থমকে গেল। দুজনে একসঙ্গে দাঁড়ালে আর দেখতে হবে না।

ভাঙা রেলিং-এর ওপর ঝুঁকে আছে অসীমা। কাঁদছে নিশ্চয়ই, তবে তা বোঝা যাচ্ছে না। তিনটে টবের গাছেই ফুল ফুটেছে। সে দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে রইল সুদর্শন। কী সুন্দর দেখাচ্ছে সব মিলিয়ে।

সুদর্শন যেন একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছে, ভেঙে পড়ার শব্দ, কিন্তু ভাঙছে না। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে অসীমা। সুদর্শনের মনে হল, সত্যি একটা বারান্দা না থাকলে বাড়ির মেয়েদের বড় কষ্ট।

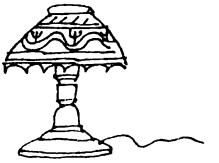

অলৌকিক

একদিন দিব্য স্নান শেষ করার আগেই বাথরুম থেকে বেরিয়ে পড়েছিল দরজা খুলে। নিজের শোওয়ার ঘরে না গিয়ে সে টানা বারান্দা পেরিয়ে নামতে শুরু করে দিল সিঁড়ি দিয়ে। তারপর সদর দরজা পার হয়ে চলে এসেছিল রাস্তায়। তখনও তার কিছু খেয়াল হয়নি।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটা ছোট রাস্তা, একটু পরে বাঁ-দিকে বেঁকে আর-একটা রাস্তা, তারপর এক মিনিট গেলে ট্রাম লাইন। দিব্য ছোট রাস্তাটা পেরিয়ে দ্বিতীয় রাস্তা পর্যন্ত চলে এসেছে, তখন তার চোখ পড়ল চন্দনের দিকে। চন্দনকে যেন ভূতে থাপ্পড় মেরেছে, তার মুখখানা এমনই বিহ্বল। চন্দন চোখের পাতা ফেলতে পারছে না।

চন্দনের চোখে দিয়েই যেন দিব্য নিজেকে দেখতে পেল। সে সম্পূর্ণ উলঙ্গ। তার গায়ে সাবানের ফেনা।

জামা কাপড় না থাকলে বোধহয় মানুষ নিজের শরীরটাকে খুব ছোট্ট মনে করে। নইলে দিব্য কেন ভাবল আড়া-আড়িভাবে দুটো হাত চাপা দিলেই সে তার নগ্নতা লুকোতে পারবে?

চন্দন কিছু বলবার আগেই দিব্য পেছন ফিরে ছুটল! বাড়িতে গিয়ে সিঁড়ির প্রথম ধাপে আছাড় খেয়ে তার থুতনি ফেটে রক্ত বেরিয়ে এল! এই সব কিছুই পাগলের মতন।

দিব্যকে যদি কেউ-কেউ পাগল ভাবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। ওই অবস্থায় শুধু তো চন্দন তাকে একা দেখেনি, অনেকেই দেখেছে। এ-বাড়ি ও-বাড়ির বারান্দায়, মোড়ের দোকানপাট থেকে। মানুষ তার গৌরবের সময় প্রায়ই নিঃসঙ্গ থাকে। কিন্তু অপমানের মুহূর্তে সাক্ষীর অভাব হয় না।

চন্দন অবশ্য পরে এ বিষয়ে একটা কথাও উচ্চারণ করেনি। পাড়ার কেউই কিছু বলেনি। দিব্যর বয়েস আটত্রিশ, সে প্যান্টের ভেতর সার্ট গুজে, মোজা ও শু পরে অফিস যায়। পাড়ার সবাই তাকে একই সঙ্গে উদার ও বুদ্ধিমান বলে জানে, তাই কিঞ্চিৎ সমীহ করে।

দিব্য নিজেই পরে অনেক ভেবেও বুঝতে পারেনি যে সেদিন সে কেন ওই অবস্থায় বাথরুম থেকে বেরিয়ে রাস্তায় চলে গিয়েছিল। হঠাৎ কি তার মনে পড়ে গিয়েছিল কোনও জরুরি কাজের কথা? কী সেই জরুরি কাজ?

বাথরুমে মানুষ নগ্ন থাকে, অন্যমনস্ক থাকে, নিজের চরিত্রটা বদলে ফেলে, বয়েসের খেয়াল থাকে না এই সবই ঠিক, কিন্তু কোমরের নীচে কিছু না জড়িয়ে কেউ তো বাইরে বেরোয় না। ভুল-মনা অধ্যাপকদের সম্পর্কে অনেক গল্প শোনা যায়, কিন্তু দিব্য তো সেরকমও নয়। দিব্য বেশ মেপে-টেপে কথা বলে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করে।

অনেকদিন আগে অবশ্য আর একবার এরকম হয়েছিল, সেটা কাশীতে। দিব্যর বয়েস তখন এখনকার অর্ধেক। কী কারণে যেন সেবার কাশীতে দেড়-দু-মাস থাকা হয়েছিল, মাসি-পিসিদের সঙ্গে সাময়িক যৌথ পরিবারের অছিলায়। টুনু ও পিনাকীর সঙ্গে দিব্য গঙ্গায় সাঁতার কাটতে নেমেছিল।

দিব্য সাঁতার জানে, পিনাকীই ছিল খানিকটা দুর্বল, তাকে সামলাচ্ছিল অন্য দুজন। হঠাৎ এক সময় দিব্য ওপরে উঠে এল। সুইমিং ট্রাঙ্ক নয়, জাঙ্গিয়া পরে নেমেছিল, সেটা যে শুধু পরা

নেই তা নয়, সে সম্পর্কে তার কোনও হুঁসই নেই। জাঙ্গিয়া আপনা আপনি খুলে যাওয়া খুব স্বাভাবিক নয়, দিব্য কি ইচ্ছে করে খুলে ফেলেছিল? তার মনে নেই।

কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটে সবসময় হাজার লোকের ভিড়। পাগল ভিখিরি ও সন্ন্যাসীর সংখ্যাও যথেষ্ট। দিব্যকে ওই অবস্থায় উঠে আসতে দেখে কেউ হইহই করে ওঠেনি, কেউ কোনও মন্তব্য করেনি।

ওদের স্নেহ মাসি আর রথীন মেসো বসে ছিলেন একটু দূরে জামা-কাপড় সামলাবার জন্য। আর ছিল দু-তিনটে কাচ্চা-বাচ্চা পিসতুতো-মাসতুতো ভাই বোন। রথীন মেসো হো-হো করে হেসে উঠেছিলেন, কাচ্চা-বাচ্চারা হাততালি দিয়েছিল আর স্নেহ মাসিও হাসতে-হাসতে একটা তোয়ালে ছুড়ে দিয়ে বলেছিলেন, এই পাগল, তুই সোজা উঠে এলি, অ্যাঁ?

রথীন মেসোর হাসির চেয়েও স্নেহ মাসির অত হালকা সুরে কথা বলাটাই দিব্যর স্মৃতিতে গেঁথে আছে। তখন দিব্যর উনিশ-কুড়ি বছর বয়েস, সে একটি পূর্ণাঙ্গ যুবক, তাকে ওই অবস্থায় দেখেও স্নেহ মাসি দিব্যকে একটি শিশুর মতন গ্রহণ করেছিলেন কী করে? পরে অনেকবার স্নেহমাসি হাসতে-হাসতে পারিবারিক মজলিসে ওই গল্প বলেছেন, জানো সেজদি, দিব্যটা এমন পাগল, ওই রকমভাবে যে উঠে এসেছে, তা খেয়ালই নেই। আমি তোয়ালেটা ছুঁড়ে দিলুম, তা দিয়ে প্রথমে মাথা মুছতে লাগল!

দিব্যর মা অবশ্য বরাবরই এ গল্পটা অবিশ্বাস করেছেন। একমাত্র মেয়েরাই বোধহয় প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের নগ্নতা মেনে নিতে পারেন না।

কেন কাশীর গঙ্গা থেকে দিব্য ওইরকমভাবে হঠাৎ উঠে এসেছিল তা সে আজও মনে করতে পারে না। সে তার চৈতন্যের গভীরতম দেশ পর্যন্ত খুঁজে দেখতে রাজি আছে এর উত্তর পাওয়ার জন্য। কিন্তু খানিকটা ডুব দিয়েই সে অন্য চিন্তায় হারিয়ে যায়।

আরেকটা ঘটনা ঘটেছিল, সেটা অবশ্য নগ্নতার কিছু নয়। মাত্র দেড় বছর আগেকার কথা। সেদিন দিব্য খানিকটা মদ্য পান করেছিল, আড়াই-তিন পেগের মতন। দিব্য অত্যন্ত সেয়ানা মাতাল। যাদের মধ্যে ভদ্রতাবোধ অতি প্রবল তারা সহজে মাতাল হয় না। অফিসের পার্টিতে কিংবা বন্ধুমহলে দিব্যর এইরকম একটা বিভ্রান্তিকর খ্যাতি আছে যে ছ-সাত পেগ হুইস্কি খেলেও দিব্যর পা টলে না, জিভ জড়ায় না। এমন কি একবার বোম্বাই গিয়ে হোটেলে পার্টির হই-চই তে সাত পেগ মদ খাওয়ার পর জেনারেল ম্যানেজারের অনুরোধে দিব্য একটা জরুরি চিঠি ড্রাফ্‌ট করেছিল, তার হাতের লেখা একটুও বদলায়নি, ভাবের প্রেসেন্টটেন্স থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বারে সে একবারও 'এস' দিতে ভুল করেনি। অফিসে দিব্যর এই চিঠি লেখার গল্প কিংবদন্তি হয়ে আছে।

সেই দিব্য এয়ারপোর্ট হোটেলের অফিসের পার্টিতে থেকে মাত্র আড়াই তিন পেগ হুইস্কি খেয়ে হঠাৎ কারুকে কিছু না বলে বাইরে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরেছিল। সোজা যোধপুর পার্ক। কম দূর তো নয়। এর মধ্যে দিব্য একটুও ঘুমিয়ে পড়েনি, ট্যাক্সি ড্রাইভারকেও নির্দেশ দিতে একবারও ভুল করেনি। যোধপুর পার্কের রাস্তাগুলো খুব গোলমেলে, বিশেষত গভীর রাত্রে। দিব্য তবু ঠিক বাড়ির সামনেই এসে উপস্থিত হয়েছিল।

দোতলা বাড়ি সামনে খুবই সামান্য, ক্ষমাপ্রার্থীর মতন এক চিলতে বাগান। হাফ গেট অনায়াসেই খোলা যায়, এইসব বাড়িতে হিংস্র কুকুর থাকা খুব স্বাভাবিক। দিব্য সেসব গ্রাহ্যই করেনি। একতলার দরজা কেন খোলা ছিল কে জানে, দিব্য সটান উঠে গিয়েছিল দোতলায়। তারপর বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কলিংবেলের বোতামে ডান হাতের তর্জনী চেপে ধরেছিল।

এ-বাড়িতে দিব্য আগে কখনও আসেনি, দূর থেকে দু-একবার দেখেছে মাত্র। দিব্য কি জানতো ডঃ খান্ডেলকর সে রাত্রে বাড়িতে থাকবেন না? দিব্য পরে বহুবার এ তথ্য অস্বীকার করেছে। ডঃ খান্ডেলকর কখন কোথায় যান তা দিব্যর জানবার কথা নয়। দিব্য আর ডঃ খান্ডেলকরের গ্রহ আলাদা।

একটানা কলিং বেল বাজার পর দরজা খুললেন মিসেস খান্ডেলকর। গলা থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ঝোলা একটা সাদা রঙের রাত-পোষাক পরা। মাথার সব চুল খোলা, ক্রিম মাখা মুখখানা চকচকে। এমন পোষাকে, এমন প্রসাধনে দিব্য ওই মিসেস খান্ডেলকর নাম্নী রমণীকে আগে কখনও দেখেনি। আসলে সে ওঁকে এর আগে দেখেছেই মাত্র তিনবার, নিছক সৌজন্য—আলাপ, বাংলায় কথাবার্তা হলেও আপনি ছেড়ে তুমিতে নামেনি। দরজা খোলার পর সেই শ্বেতবসনা রমণীকে দেখে দিব্য বলেছিল, কেমন আছ, মহাশ্বেতা?

মিসেস খান্ডেলকর বাঙালি হলেও তাঁর নাম মহাশ্বেতা নয়। কুমারী জীবনে তাঁর নাম ছিল অনসূয়া রায়।

প্রগাঢ় বিস্ময়ে তিনি কিছুক্ষণ কোনও কথাই বলতে পারলেন না।

দিব্য ফট করে দশটা জানালা খোলার মতন অনেকখানি হেসে বলেছিল, তুমি ভালো আছো তো, সেই খবরটা নিতে এলাম?

শ্রীমতী খান্ডেলকর বললেন, হোয়াট হ্যাপ্‌ড টু ইউ? আর ইউ...অর আই...ইন...ইজ সাম ট্রাবল? আর ইউ লস্ট?

দিব্য বলল, নো, নো, নো, নাথিং হ্যাপ্‌ড টু মি, আই ওয়াজ জাস্ট পাসিং থ্রু। ভাবলুম, তোমার খবরটা একবার নিয়ে যাই।

শ্রীমতী খান্ডেলকর এবার বাংলায় বললেন, কিন্তু, এত রাত্তিরে আপনি এদিকে কোথায় যাচ্ছিলেন, আপনার বাড়ি তো মানিকতলায়!

মানিকতলা যেন একটা দুর্বোধ্য শব্দ, এই ভাবে দিব্য একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল শ্রীমতী খান্ডেলকরের দিকে। কোনও উত্তর দিল না।

আপনার সঙ্গে গাড়ি আছে?

মহাশ্বেতা, তুমি ভালো আছ?

আপনি মহাশ্বেতা কাকে বলছেন? আপনার নিশ্চয়ই ভুল হয়েছে। ভুল জায়গায় এসেছেন।

কিচ্ছু ভুল হয়নি। তুমি নিজেকে চেনো না? তুমি 'কাদম্বরী'র একটা চরিত্র, মনে নেই? তুমি কেমন আছো আজ?

আপনি বাড়ি যান!

না, আমি আজ এখানেই থাকব, তোমার সঙ্গে সারারাত গল্প করব।

প্লিজ, একথা বলবেন না। আপনার সঙ্গে যদি গাড়ি না থাকে, আমার চিন্তা হচ্ছে আপনি কী করে ফিরবেন, কিন্তু...এখানে থাকা সম্ভব নয়, আপনি একটু বুঝবার চেষ্টা করুন...

শ্রীমতী খান্ডেলকর যদি তার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিতেন তাহলে দিব্য নিশ্চয়ই সেই দরজায় আবার দুমদুম করে ধাক্কা দিত। উনি যদি রূঢ় ব্যবহার করতেন, দিব্য চেষ্টা করত জোর করে ভেতরে ঢুকে পড়তে।

কিন্তু উনি দরজা খোলা রেখে মুখে এমন একটা বেদনার্ত দাবির ভাষা ফোটালেন যে দিব্য তখুনি মরমে মরে গেল। কোনওরকম বিদায় না জানিয়েই সে ছুট দিয়েছিল নীচের দিকে।

ট্যাক্সিটা দিব্যর জন্য অপেক্ষা করে ছিল না, সে থাকতেও বলেনি। দিব্য সে ব্যাপারে চিন্তাই করল না, সে আঁকাবাঁকা পায়ে হাঁটতে লাগল।

একটা কথাই শুধু ঘুরছিল তার মাথায়। খান্ডেলকরের বাড়িতে অন্তত দু-তিনজন দাস-দাসী থাকবেই। এত রাত্রে বেল দেওয়ার পর অনসূয়া, না, না, মহাশ্বেতা নিজেই কেন দরজা খুলে দিল? সে কি কারুর জন্য প্রতীক্ষা করছিল উঁহু, এরকম হতেই পারে না। তবে?

রাত একেবারে নিঝুম। এখন লোডশেডিং আছে কি নেই তা বোঝবারও উপায় নেই। দিব্য কোনদিকে হাঁটছে সে জানে না।

খানিক পরে তিন-চারটে ভুতুড়ে চরিত্র তাকে ঘিরে ফেলল। তাদের দাবি অনুযায়ী সে খুলে দিল হাতঘড়ি, পকেট থেকে পার্স। দিব্যর ঠোঁটে ফুরফুরে হাসি, সে যেন এসব ব্যাপারে বেশ মজা পাচ্ছে। ছায়ামূর্তিরা দিব্যর পার্সটা খুলে অসুখী ভাবে গজরাতে শুরু করতেই দিব্য বলেছিল, ওতে কিছু হল না? আমার হাওয়াই শার্টটা নেবে? প্যান্ট নেবে? খুলে দিচ্ছি!

একজন নিশাচর এগিয়ে এসে দিব্যর গালে জোরে এক থাপ্পড় কষিয়ে বলল, হারামির বাচ্চা, মাল খেয়ে আমাদের সঙ্গে মজাক করতে এসেছিস? যা, বাড়ি যা!

ওরা অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পরেও দিব্য একা ফাঁকা রাস্তায় দাঁড়িয়ে ফিক-ফিক করে হাসতে লাগল।

এসব কোনও কিছুই দিব্যর চরিত্রের সঙ্গে মানায় না। তার ঘনিষ্ঠ মানুষজনেরা বলবে, অসম্ভব, অবিশ্বাস্য!

॥ দুই ॥

নামের পরিচয়ে মহারাষ্ট্রের মানুষ হলেও দু-পুরুষ ধরে খান্ডেলকরেরা কলকাতায় প্রবাসী। অজয় খান্ডেলকরের দুই দাদাই উচ্চ পদস্থ ব্যাঙ্ক কর্মচারী, অজয় নিজে একজন অর্থনীতির পণ্ডিত। ওঁর বোন একটি বাংলা সংবাদপত্র সম্পাদকের স্ত্রী।

অজয় খান্ডেলকর দক্ষিণ কলকাতার একটি স্কুল থেকে হায়ার সেকেন্ডারিতে ফার্স্ট হয়েছিলেন, ইংরেজি ও বাংলায় সেবারে পেয়েছিলেন সর্বোচ্চ নম্বর।

তারপর কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ধাপগুলো অবহেলায় মেডেল তুলতে-তুলতে পেরিয়ে গিয়ে তিনি চলে গেলেন আমেরিকা। সেখান থেকে তিন বছর বাদে দেশে বেড়াতে এসে তিনি বম্বে-পুনে ঘুরে ট্রেনে এলেন হাওড়ায়। তারপর কলকাতা শহরে না ঢুকে পরবর্তী ট্রেনে চলে গেলেন শান্তিনিকেতনে।

অনসূয়ার সঙ্গে এর আগে কলকাতায় তাঁর দুবার মাত্র দেখা হয়েছিল। সৌজন্য মূলক আলাপ পরিচয় হয়েছিল, তার বেশি কিছু নয়। অজয় খান্ডেলকরের আশঙ্কা ছিল অনসূয়া তাঁকে চিনতে পারবে কি না।

অজয় খান্ডেলকরের চেহারায় বৈশিষ্ট্য আছে, একবার দেখলে ভুলে যাওয়ার কথা নয়। প্রায় সাহেবদের মতন ফরসা রং, মেদহীন লম্বা শরীর, লম্বাটে মুখ, তীক্ষ্ণ নাক, অত্যন্ত গাঢ় ভুরু। সম্ভবত ওই ভুরুর জন্যই তার চোখ দুটি বেশি উজ্জ্বল দেখায়। তাঁর বাংলা উচ্চারণে সামান্যতম আড়ষ্টতা নেই।

পূর্বপল্লীর গেস্টহাউসের প্রায় উলটোদিকেই অনসূয়াদের বাড়ি। হঠাৎ দেখা হওয়ায় অনসূয়া বেশ খুশি হয়ে উঠেছিল!

আপনি? আমেরিকা চলে গিয়েছিলে কেন? কবে ফিরলেন?

ফিরিনি এখনও।

শান্তিনিকেতনে আপনার কোনও লেকচার আছে বুঝি?

একটুও দ্বিধা না করে সহাস্য মুখে অজয় খান্ডেলকর বলেছিলেন, না, আমি শুধু আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্য এসেছি।

এরকম কথা অনেকেই বলে। অনসূয়া এটাকে হালকা রসিকতা হিসাবেই নিয়েছিল। তাদের বাড়িতে ডেকে এনে অজয় খান্ডেলকরকে সে চা খাওয়াল পরিচয় করিয়ে দিল বাবা-মায়ের সঙ্গে।

অজয় খান্ডেলকর স্কুলে পড়বার সময় একবার শান্তিনিকেতন এসেছিলেন বটে কিন্তু ভালো করে তাঁর দেখা হয়নি সেবার। অনসূয়াই হল তাঁর গাইড। এক সাইকেলরিক্সায় ঘুরতে লাগল দুজনে।

অনসূয়ার ডাক-নাম হাসি, শান্তিনিকেতনে ডাক-নামটাই বেশি চলে। রবীন্দ্রনাথের আমলে এখানে যে আন্তর্জাতিক আবহাওয়া ছিল তা এখনও মুছে যায়নি। রবীন্দ্রভবনের সামনে একজন বৃদ্ধ সুইডিস অনসূয়াকে হাতছানি দিয়ে ডেকে বললেন, হাসি, শোনো, তোমার সঙ্গে আমার প্রয়োজনীয় কথা আছে।

সাইকেলরিক্সা থেকে নেমে অনসূয়া গেল সেই বৃদ্ধের সঙ্গে কথা বলতে, অজয় খান্ডেলকর চুপ করে বসে রইলেন। মনে হল যেন তিনি তখন গভীর চিন্তায় মগ্ন। এই সময়টুকু পেয়েই তিনি একটা জটিল অঙ্কের সমাধান খুঁজছেন।

মিনিট পাঁচেক পর অনসূয়া ফিরে আসতেই তিনি হালকা গলায় বললেন, এখানে সবাই আপনাকে হাসি বলে ডাকছে, আমিও সেই নামে ডাকতে পারি!

স্বচ্ছন্দে! আমার আসল নামটা আমার নিজেরই তেমন পছন্দ নয়।

কে রেখেছিল ওই নাম?

আমার জ্যাঠামশাই, তিনি এখানে সংস্কৃত পড়াতেন। জ্যাঠতুতো দিদির নাম শকুন্তলা।

এখন বাঙালি মেয়েদের তিন অক্ষরে নামটাই ফ্যাসান তাই না?

না দু-অক্ষরের।

তারপর কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি, শ্রীনিকেতন ঘুরে আসবার পথে হঠাৎ অজয় খান্ডেলকর এক জায়গায় সাইকেলরিক্সা থামাতে বললেন।

একটা জলাশয়ের পাশে বড় আমগাছতলায় দাঁড়ালেন দুজনে। একটুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর অজয় খান্ডেলকর বললেন, আমি চোদ্দ হাজার মাইল দূর থেকে আপনাকে একটা কথা বলার জন্যই এখানে এসেছি। ওখানে বসে আমি আপনার কথা অনেক চিন্তা করেছি। কথাটা ঠিক কীভাবে বলতে হয় আমি জানি না, যদি কিছু ভুল হয় আপনি অপমানিত বোধ করবেন না। হাসি, আপনাকে আমি আমার স্ত্রী হিসেবে পেতে চাই।

পুরুষদের প্রণয় নিবেদন শোনার পূর্বী-অভিজ্ঞতা ছিল অনসূয়ার, তবু তার কানের ডগায় উষ্ণতা এসেছিল, মুখ রক্তিম হয়েছিল।

যাঃ, এসব কী কথা বলছেন।

না, না, না, আপনাকে এক্ষুণি কিছু উত্তর দিতে হবে না। আপনি ভালো করে চিন্তা করে দেখুন।

আপনার সঙ্গে আমার মাত্র কয়েকদিনের আলাপ।

তাতে কিছু যায় আসে না! এলগিন রোডে ডঃ মৈত্রর বাড়িতে আপনার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়েছিল মনে আছে? আপনি গান গেয়েছিলেন দুটো, সে গানের লাইনও আমি বলে দিতে পারি। শুনুন, আমি মিথ্যে কথা বলছি না, আমেরিকায় বসে আমি আপনার কথা অনেক ভেবেছি, তারপর এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আপনার সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আপনি সময় নিন। আমি দু-সপ্তাহ কলকাতায় থাকব, তারপর আর এক সপ্তাহ পুনেতে। তার মধ্যে আপনি জানাবেন। যদি রাজি না হন তাও জানাবেন। কিংবা যদি এক বছর, দু-বছর অপেক্ষা করতে হয়, তাতে আমি রাজি।

আপনি কেন এইসব কথা বলছেন? আমি একটা অতি সাধারণ মেয়ে।

আমার চোখে আপনি অপ্রতিম!

এরপর ফেরার পথে দুজনে আর একটাও কথা হল না।

এক রিক্সায় দুজনে বসায় অঙ্গস্পর্শ হয়েছিল বটে কিন্তু অজয় খান্ডেলকর একবারও হাসির হাত ধরার চেষ্টা করেননি। তাঁর সম্ভ্রমবোধ ও শিষ্টাচার নিখুঁত।

পরদিন হাসিকে কলকাতা ও পুনের দুটি ঠিকানা দিয়ে অজয় খান্ডেলকর ফিরে গেলেন।

তারপর কয়েকটি দিন হাসির মানসিক জগতে একটা প্রবল আলোড়ন চলল। একটা ঝড়ের মধ্যে সে যেন দিশেহারা, অথচ তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবীদের কাছেও সে এ ব্যাপারে সাহায্য চাইতে পারে না।

হাসি তখন সঙ্গীত ভবনের নাম করা ছাত্রী। রেডিওতে একবার অডিশান দিয়েই পাশ করেছে। কলকাতায় এক বড় অনুষ্ঠানে 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যে শেষ মুহূর্তে প্রধানা গায়িকা এসে পৌঁছতে না পারায় হাসিই শ্যামার চরিত্রের সবক'টি গান গেয়ে খুব সুখ্যাতি পেয়েছিল কাগজে-কাগজে। অনেকের আশা হয়েছিল শান্তিনিকেতন থেকে অনেকদিন পর আর একজন প্রতিভাবান রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়িকা উঠে আসছে।

শুধু গান গাইতে জানলে, ছবি আঁকা শিখলে বা লেখার ক্ষমতা থাকলেই হয় না, শিল্পী হওয়ার জন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকা দরকার। হাসির তা ছিল। হালকা আনন্দের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়ার মতন মেয়ে সে নয়। নিশ্চিন্ত সুখী জীবনের প্রতি তার আকর্ষণ ছিল না, সে চেয়েছিল নিজের যোগ্যতার দাবি অর্জন করতে।

কিন্তু অজয় খান্ডেলকর সব গোলমাল করে দিল।

হাসি মনে-মনে হাজার বার বলতে লাগল, না, না, না, আমি এখন বিয়ে করব না, কিছুতেই বিয়ে করব না।

কিন্তু হাসিকে এই কথা বারবার বলতে হচ্ছেই বা কেন? অজয় খান্ডেলকর তো জোর করেননি, এমনকি হাসির বাবা-মাকেও কিছু জানাননি। মাঠের মধ্যে আমগাছ তলায় দাঁড়িয়ে অতি সংক্ষেপে একটি প্রস্তাব দিয়ে গেছেন মাত্র। তারপর দূরে সরে গেছেন। এখন হাসি তো তাঁকে কোনও উত্তর না দিলেই পারে। এসব ক্ষেত্রে নীরবতাই প্রত্যাখ্যান।

অজয় খান্ডেলকরের কলকাতা বাসের দুটি সপ্তাহ কেটে গেল। হাসি চিঠি লেখেনি বটে, কিন্তু প্রতিটি দিন সে গুনেছে। এবারে অজয় যাচ্ছেন পুনেতে। সেখানে আর মাত্র সাতদিন।

শুধু সুপুরুষ আর গুণবানই নয়, অজয়ের চরিত্র ও ব্যবহারে এমন একটা কিছু ছিল যা হাসিকে চুম্বকের মতন টেনেছে। এরই নাম কি প্রেম? কেন সর্বক্ষণ হাসি ওই মানুষটির কথাই ভাবছে? চোদ্দ হাজার মাইল দূর থেকে একজন মানুষ এখানে এসেছিল শুধু হাসির সঙ্গে দেখার করার জন্য!

পুনে থেকে একটা টেলিগ্রাম এল হাসির নামে। হাসি তখন বাড়ি ছিল না, তার বাবা সেটি সই করে নিয়েছিলেন, কিন্তু খোলেননি।

হাসি বাড়ি ফেরার পর তিনি জিগ্যেস করলেন, পুনেতে তোর কোন বন্ধু আছে রে?

হাসির সারা শরীর কেঁপে উঠেছিল। হাসি তার মুখের ভাব লুকোতে পারে না। তার কান্না পেয়ে যাচ্ছে কেন? বাবার সামনেই টেলিগ্রামটা সে খুলল।

অজয় জানিয়েছে, আমার ফ্লাইট পরশুদিন রাত্রে! আমি কি কিছুই না জেনে ফিরে যাব?

বাবা জিগ্যেস করলেন, কে?

হাসি কিছুই উত্তর না দিয়ে ছুটে গেল বাড়ি থেকে। এবারে একবার তাকে তপনের কাছে যেতেই হবে। বাবা-মাও বন্ধুর মতন, কিন্তু এক্ষুনি সে বাবা-মাকে কিছু খুলে বলতে পারবে না।

সব পুরুষ মানুষই প্রেমিক হওয়ার যোগ্য হয় না। তপন সেইরকম একজন। সে হাসির যত না বন্ধু, তার চেয়ে বেশি ভক্ত। হাসি যে মাটি দিয়ে হেঁটে যায়, কেউ যদি বলে তপন ওই মাটি জিভ দিয়ে চাটো তো, তপন তা পারবে। কিন্তু তপন কোনওদিন বলতে পারবে না, হাসি, আমি তোমাকে ভালোবাসি। তুমি আমার হও।

লাইব্রেরি থেকে তপনকে হাসি টেনে আনল। দুজনে চলে গেল রেল লাইনের ধারে। তারপর তপনকে সব খুলে বলল।

তপনের একমাত্র চিন্তা হাসি যেন কিছুতেই কষ্ট না পায়। হাসির মুখ ম্লান হলে তপনেরও মুখ ম্লান হয়ে যায়।

কী হয়েছে হাসি?

হাসি ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। সে একটা কথাও বলতে পারছে না।

তপন চুপ করে চেয়ে রইল হাসির মুখের দিকে। তার বুকটা মুচড়ে উঠছে। কীসের যেন একটা সম্ভাবনা হঠাৎ কাঁপিয়ে দিচ্ছে তাকে।

একটু পরে, নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়ে হাসি বলল, তপন, আমি জানতুম না রে আমার মনটা এত দুর্বল! আমি কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারছি না।

আমাকে তুই সব খুলে বল!

আমাকে একজন ডাকছে, আমি যেতে চাই না, তবু আমাকে যেতেই হবে!

কে ডাকছে?

ক'দিন আগে একটি মারাঠি ছেলে এসেছিল, তুই দেখেছিলি? যাকে নিয়ে আমি সাইকেল রিক্সায় ঘুরছিলাম।

হ্যাঁ দেখেছি। ভালো নাচেন বোধহয় তাই নয়? চেহারা দেখে তাই মনে হয়।

ধুৎ! নাচ-গান কিছু জানে না। অঙ্কের পণ্ডিত! আমেরিকায় থাকে, বুঝলি? আমার সঙ্গে কলকাতায় সামান্য একটু আলাপ হয়েছিল, আমার গান শুনেছিল। কোনওদিন আমাকে চিঠি লেখেনি, কিছু না! আমেরিকাতে বসে নাকি শুধু আমার কথাই ভেবেছে, সেখান থেকে এই যে সেদিন এল, আমার সঙ্গেই দেখা করার জন্য! তুই এটা বিশ্বাস করতে পারিস?

না।

কেন তুই তাকে অবিশ্বাস করবি। তুই তার সঙ্গে একটু কথা বললেই বুঝতে পারতিস সে মিথ্যে কথা বলার মানুষ নয়।

সে তোকে নিয়ে যেতে চায়?

হ্যাঁ!

কোথায়? বোম্বেতে?

কী জানি কোথায়?

তুই কি পাগল হয়ে গেছিস হাসি? ওরকম চোখের ভালোলাগা তো অনেকেরই লাগে। এখানে কতজন তোকে—।

তপন আমি সত্যি পাগল হয়ে গেছি রে! ও সেই যে শান্তিনিকেতন থেকে চলে গেল, তারপর প্রত্যেকদিন, জেগে থাকার সবটা সময় আমি শুধু ওর কথাই ভাবছি। এ যেন একটা চুম্বক, আমাকে অনবরত টানছে! আমি কিছুতেই নিজের মনটা ফেরাতে পারছি না অন্যদিকে।

তুই আমাদের ছেড়ে চলে যাবি?

না-না-না, আমি শান্তিনিকেতন ছেড়ে কিছুতেই যাব না। আমি গান ছাড়তে পারব না, আমি তোকে ছাড়তে পারব না! আমি শুধু ওকে আর একবার দেখতে চাই! এরপর তপনের হাত দিয়েই একটা টেলিগ্রাম পাঠাল হাসি। অজয়কে লিখল, বিদেশে ফেরার আগে আপনি আর একবার শান্তিনিকেতনে আসতে পারেন?

দু-দিন পরে আবার একটি সাইকেল রিকশা এসে থামল হাসিদের বাড়ির সামনে। হাসি তখন ক্লাস করতে গেছে। হাসির বাবা অজয়ের সঙ্গে এমনভাবে গল্প করতে লাগলেন যেন তিনি কিছুই জানেন না। যদিও তপনের কাছ থেকে তিনি সব শুনেছেন।

তিনি শুধু একবার জিগ্যেস করলেন, শান্তিনিকেতন জায়গাটা আপনার খুব পছন্দ হয়েছে বুঝি? পরপর দুবার এলেন?

অজয় পরিষ্কার উত্তর দিলেন, আমি হাসির সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। হাসি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

হাসিকে খবর দেওয়া হল। সে এসে অজয়কে দেখেই যেন রাগে জ্বলে উঠল। যেন অজয় একজন অনভিপ্রেত অতিথি। সে বেশ কঠোর ভাবে জিগ্যেস করল, আপনি এখানে ফিরে এলেন? আপনার আজই দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা ছিল না?

অজয় হেসে বললেন, তাহলে কি অন্য কেউ মজা করার জন্য আপনার নামে আমার কাছে একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিল?

হাসির বাবা অল্প বয়েসিদের এইসব গোলমালের মধ্যে থাকতে চাইলেন না। তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, হাসি তাঁকে ডেকে বলল, বাবা, শোনো, এই লোকটা আমাকে বিরক্ত করছে! জ্বালিয়ে মারছে। এর জন্য আমি রাত্তিরে ঘুমোতে পর্যন্ত পারছি না।

অজয় তৎক্ষণাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে বললেন, আপনার মেয়েকে যদি আমি বিরক্ত করে থাকি, সে জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি। অনুগ্রহ করে এবারের মতন আমাকে মার্জনা করুন। আমি শপথ করছি, আমি জীবনে আর কোনওদিন এই শান্তিনিকেতনে পা দেব না।

অজয়ের নম্র, বিষণ্ণস্বর শুনে বাবা পর্যন্ত বিচলিত হয়ে বললেন, না, না, না আপনি কিছু মনে করবেন না। আমার মেয়েটা একবারে পাগল, কখন যে কী করে মাথার ঠিক নেই। আপনি বসুন, চা-টা শেষ করুন।

কিন্তু অজয় আর দাঁড়ালেন না। হাসির দিকে একবারও না তাকিয়ে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

বিকেলের আগে ট্রেন নেই। দুপুরটা অজয়কে ট্যুরিস্ট লজে কাটাতে হবে। দরজা বন্ধ করে তিনি ঘুম দিলেন। একটুপরেই দরজায় দুম-দুম শব্দ হল।

দরজা খুলতেই হাসি ঝড়ের বেগে ঢুকে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে বলল, আপনি...আপনি অতি নিষ্ঠুর! কেন বললেন যে জীবনে আর কোনওদিন শান্তিনিকেতনে পা দেবেন না? শান্তিনিকেতন কি আমার একলার? গুরুদেবের জায়গায় যে-কেউ আসতে পারে।

অজয় কিছু না বলে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন হাসির মুখের দিকে।

হাসি আবার বলল, আপনি...তুমি...শান্তিনিকেতন ছেড়ে যেয়ো না, তুমি এখানেই থাক। বিদেশে যাওয়ার কী দরকার? আমি শান্তিনিকেতন ছেড়ে যে যেতে পারব না।

সেই প্রথম অজয় এগিয়ে এসে হাসির হাত ধরে টেনে তুলে তাকে বুকের ওপর এনে বললেন, তুমি চল, কয়েক বছর মাত্র আমরা বিদেশে থাকব। তারপর আবার আমরা ফিরে আসব। তোমার গান বন্ধ হবে না।

অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বিবাহ-উৎসবের পরই অজয় ফিরে গেলেন আমেরিকায়। হাসিকে থেকে যেতে হল পরীক্ষার জন্য। পরীক্ষার আর তিনমাস বাকি, কিন্তু সেই সময়টাই হাসির মনে হল বিরাট লম্বা। যে শান্তিনিকেতনকে এত ভালোবাসত হাসি, সেই শান্তিনিকেতন ছেড়ে যাওয়ার জন্য সে ছটফট করতে লাগল। পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরদিনই হাসি দমদম ছেড়ে প্লেন ধরল।

অজয় খান্ডেলকরকে বিদেশে থাকতে হল সাত বছর। মাঝখানে হাসি একবার কয়েক সপ্তাহের জন্য মা-বাবার কাছে ঘুরে গিয়েছিল। বিদেশে হাসির স্বাস্থ্য অনেক ভালো হয়েছে, চোখে-মুখে এসেছে অন্যরকম দীপ্তি, সবসময় সে আনন্দ-উচ্ছল, বিয়েটা তার খুবই সার্থক হয়েছে।

সাত বছর বাদে যখন বিদেশে পাকাপাকি বসবাস কিংবা সবকিছু গুটিয়ে দেশে ফেরার ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এল তখন হাসির দেশ সম্পর্কে টান অনেকটা কমে গেছে। ওখানে থেকে যাওয়াই তার ইচ্ছে। কিন্তু অজয়ই ফিরতে চাইলেন। দেশ তাঁকে টানে। হাসিকে তিনি ফিরিয়ে আনবেন এই কথা দেওয়া ছিল।

দু-তিন জায়গা থেকে চাকরির অফার পেয়েছিলেন অজয়, তার মধ্যে দিল্লিরটাই সবচেয়ে

ভালো ছিল, তবু অজয় কলকাতার চাকরিটাই নিলেন।

সাত বছর পর হাসি তার ফুটফুটে শিশুপুত্রের হাত ধরে ফিরে এল শান্তিনিকেতনে। কলকাতায় পছন্দমতন বাড়ি পাওয়া যায়নি, অজয় থাকছেন কোম্পানির গেস্ট-হাউসে, হাসি কিছুদিন বাবা-মায়ের সঙ্গে কাটিয়ে যাবে।

কিন্তু এই ক'বছরেই শান্তিনিকেতন যেন অনেক বদলে গেছে। হাসির বন্ধু বান্ধবীরাও প্রায় কেউই নেই। শান্তিনিকেতনের গাছপালাও হাসিকে চিনতে পারল না। তপন থাকে দুর্গাপুরে, সেখানে গানের স্কুল খুলেছে, মাঝে-মাঝে বাংলা সিনেমায় উপ-নায়কের পার্ট করে। বয়স্ক নারী-পুরুষরা ছাড়া আর কেউ হাসির সঙ্গে যেচে কথা বলে না। গানের জন্য এক সময় হাসির কত নাম ছিল, সেকথা কেউ মনে রাখেনি। এমন কি মোহরদিও তার নামটা ভুলে গিয়েছিলেন।

হাসিও অবশ্য গানের চর্চা টিকিয়ে রাখতে পারেনি। অজয় ব্যবস্থা করেছিলেন সবরকম, দেশ থেকে হারমোনিয়াম আর তানপুরা আনিয়ে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতের আধুনিকতম রেকর্ড-ক্যাসেট কিছুই বাদ ছিল না। তবু হাসির উৎসাহ চলে গেছে আস্তে-আস্তে। শান্তিনিকেতনে সবাই মিলে রিহার্সালের সময় কতরকম মজা, মাঝে-মাঝে কলকাতায় ফাংশান করতে যাওয়া, অন্য গায়ক-গায়িকাদের সঙ্গে সূক্ষ্ম প্রতিযোগিতা, তার নেশাই ছিল অন্যরকম। বিদেশে সারাক্ষণ কাজ করতে হয়, তারপর সন্তান জন্মের পর হাসি আরও ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। সে মাঝে-মাঝে আপন মনে দু-চার লাইন গেয়ে ওঠে বটে, কিন্তু সে আর গানের জগতে নেই।

হাসি গায়িকা হয়নি বটে কিন্তু সে সুখী জীবন পেয়েছে। কিংবা খুব সহজেই সুখটাকে মেনে নিয়েছে বলে সে শিল্পী হতে পারল না।

॥ তিন ॥

সেদিন এমন কিছু নেশা হয়নি দিব্যর যে পরেরদিন সে কথা মনে থাকবে না।

লজ্জিত হওয়ার চেয়েও সে বিস্মিত হয়েছিল অনেক বেশি। কেন সে অমনভাবে অনসূয়া খান্ডেলকরের কাছে ছুটে গিয়েছিল অত রাতে? এটা তো নিছক অন্যমনস্কতা নয়! এ তো পাগলামি। অনসূয়ার সঙ্গে তার অতি সামান্য আলাপ, ভদ্রমহিলার চেহারা সুন্দর, ব্যবহারও বেশ ভালো, সকলেই তাকে পছন্দ করে। দিব্যর ক্ষেত্রেও তার বেশি কিছু নয়, সে অনসূয়ার প্রেমে পড়েনি, তাকে নিয়ে সে কোনও স্বপ্নও দেখে না। তাহলে?

দিব্য বেশ ভয় পেয়ে গেল। তার মেজমামা এমনই হিংস্র উন্মাদ যে তাঁকে বছরের পর বছর একটা নার্সিং হোমে রাখতে হয়। দিব্যর মধ্যেও সেই পাগলামির বীজ ঢুকেছে নাকি?

দিব্য দু-তিনদিন খুব মনমরা হয়ে রইল। অফিসে গেল না। কোনও ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়ার কথা চিন্তা করেও যেতে সাহস হল না। সে চুপচাপ বাড়িতে শুয়ে কাটাল।

ভদ্রমহিলা তাঁর স্বামীকে কি বলে দিয়েছেন সেই রাত্রির ঘটনা? বলাটাই স্বাভাবিক।

দিব্য অজয় খান্ডেলকরের অধীনে কাজ করে না, তার অফিস আলাদা, কিন্তু তার অফিসের স্বার্থে তাকে প্রায়ই ওঁর সঙ্গে দেখা করতে হয়। তার অফিস থেকে মাঝে-মাঝেই পার্টি দেওয়া হয়, অনসূয়া খান্ডেলকর সেখানে আসেন।

দিব্য বিষণ্ণভাবে ভাবল, হয়তো এই চাকরিটা ছেড়ে দিতে হবে। অজয় খান্ডেলকর তার নামে অভিযোগ করলে দিব্যদের অফিসের জি. এম. আর দিব্যকে রাখবেন না। কারণ, অজয় খান্ডেলকরের মূল্য অনেক বেশি। যদিও দিব্যর নামে দুশ্চরিত্রতার অভিযোগ শুনলে জেনারেল ম্যানেজার প্রথমবার একেবারে হাঁ হয়ে যাবেন।

চেষ্টা করলে দিব্য একটা অন্য চাকরি পেয়ে যাবে। তার যোগ্যতা আছে। কিন্তু এই অফিসটা তার বেশ পছন্দ ছিল। চাকরি জীবনে মাইনে ছাড়াও পছন্দ মতন সহকর্মী পাওয়া অনেক বড় ব্যাপার।

চারদিন পরে দিব্য আবার অফিসে গেল এবং কারুর মুখে কোনও ব্যাঁকা কথা শুনল না। কেউ কিছু জানে না। সবই আগের মতন স্বাভাবিক।

কিন্তু দিব্যর ব্যবহার অনেক আড়ষ্ট হয়ে গেছে। সে মেপে-মেপে কথা বলে। যে কোনও জায়গায় যাওয়ার আগে সে ভেবে নেয় ঠিক জায়গায় যাচ্ছে তো? বাথরুম থেকে বেরুবার আগে অন্তত তিনবার দেখে নেয় জামা-প্যান্ট ঠিক মতন পরা হয়েছে কি না!

শনিবার তার ঘনিষ্ঠ সহকর্মী অশোক বাজপেয়ীর বিবাহবার্ষিকীর নেমন্তন্ন ছিল, দিব্য কায়দা করে এড়িয়ে গেল। অশোকের বাড়িতে গেলেই খুব মদ্যপান হয়, অশোক খুব জোর করে। দিব্য এখন বেশ কিছুদিন মদ ছুঁতে চায় না। যথেষ্ট মদ খেলেও তার নেশা হয় না এই গর্ব ছিল, এক সন্ধেবেলা সব উলটে গেল। এয়ারপোর্ট হোটল থেকে সে ছুটে গেল যোধপুর পার্ক, এটা মাতলামি না পাগলামি?

মহাশ্বেতা! নামটা একেবারে কাল্পনিক নয়। কিন্তু কতদিন আগে হারিয়ে গেছে সেই মহাশ্বেতা। তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল ঘাটশিলায়, তখন দিব্যর বয়েস একুশ-বাইশ হবে। তার গায়ে তখন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের গন্ধ।

মহাশ্বেতারাও বেড়াতে এসেছিল। মহাশ্বেতাদের খুব বড় পরিবার! এক দঙ্গল লোক! মহাশ্বেতার বয়েস সতোরা-আঠারো হবে। তার বয়েসী আরও দুটি মেয়ে ছিল ওদের দলে। তাদের নাম মনে নেই। পাশাপাশি বাড়িতে থাকা তাই আলাপ পরিচয় হবেই। তারপর কিছু হাসি-ঠাট্টা, একসঙ্গে বেড়ানো, কোনও লোকজনের দিকে গাঢ় চোখে তাকান, এর বেশি আর কিছু না।

দিব্য তখন খুব লাজুক ছিল। অন্য অনেক ছেলে যেমন কথার পিঠে চালাক-চালাক কথা বলে, সে ক্ষমতা তার একেবারেই ছিল না। মহাশ্বেতার সঙ্গের অন্য দুটি মেয়ে বরং বেশ স্মার্ট। মহাশ্বেতা একটু চুপচাপ ধরনের।

ওই তিনজনের কোনও একজনের সঙ্গেই দিব্যর প্রেম হয়নি, মনে রাখবার মতন কিছু ঘটেওনি।

শুধু একটা বিকেলে, সেদিন বোধহয় ধারাগিরির দিকে সবাই মিলে বেড়াতে যাওয়া হয়েছিল একসঙ্গে, মহাশ্বেতা তাকে বলেছিল, আমার মাঝে-মাঝে ভীষণ মন খারাপ হয়! কোনও কারণ নেই, এমনি-এমনি, কেন যে হয় বুঝতে পারি না। কী করে মন খারাপ ভালো করা যায় বলতে পারেন?

অতিরিক্ত লাজুক লোকরা অনেক সময় রূঢ় হয়। সেই রকমভাবেই দিব্য বলেছিল, আমি কী করে জানব, আমি কী ডাক্তার?

মহাশ্বেতার মুখখানা ডিমের মতন। তার মুখের রঙ চাপা জ্যোৎস্নার মতন। ভুরু দুটি খুব গভীর। তখনও তার ভুরু প্লাক করার বয়েস হয়নি। খুব একটা সাজগোজের দিকেও মনোযোগ ছিল না।

গভীর ভুরু দুটি তুলে আহত বিস্ময়ের সঙ্গে সে বলেছিল, বাঃ শুধু ডাক্তাররাই বুঝি মন খারাপের কথা বোঝে? আর কেউ বোঝে না? এই যে বিকেলের আলো কমে আসছে, একটা দিন চলে যাচ্ছে, আকাশটা কী রকম হারিয়ে যাচ্ছে, এই সময়টায় আমার বেশি মন খারাপ হয়। আপনার হয় না?

দিব্য বলেছিল, না।

মহাশ্বেতা বলেছিল, আপনি বুঝি খুব গোঁয়ার? শুনেছি গোঁয়ার লোকদের মন খারাপ হয় না। আপনার সত্যিই কখনও হয় না?

দিব্য আবার বোকার মতন বলেছিল, না!

মহাশ্বেতা বেশ কয়েক মুহূর্ত দিব্যর চোখের দিকে চেয়ে থেকে খুব নরম ভাবে বলেছিল,

ও এই সব মানুষদের আমার ভয় করে।

তারপর সে আস্তে-আস্তে একা হেঁটে গিয়েছিল জঙ্গলের দিকে।

লাজুক দিব্য তখন এইটুকু শুধু বুঝেছিল যে মহাশ্বেতাকে সে ভুল কথা বলেছে। মহাশ্বেতা মনে একটু আঘাত পেয়েছে। কিন্তু ঠিক কী কথা তাকে বলা উচিত ছিল তা দিব্যর মনে পড়েনি।

মহাশ্বেতা যখন একলা চলে গেল তখনও সে একটা পাথরের ওপরেই বসে রইল, ওর সঙ্গে গেল না। মহাশ্বেতার সঙ্গে ঠিক কোন কথা বলতে হবে, সেটাই যে সে জানে না।

মহাশ্বেতার সঙ্গে দিব্যর আর কোনওদিন দেখা হয়নি। দিব্য যদি চালু ছেলে হত, তাহলে মহাশ্বেতাকে কলকাতায় ঠিকই খুঁজে বার করত, যোগাযোগ রাখত। কিন্তু দিব্য তখন ফাইনাল পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। মাঝে-মাঝে ধারাগিরির কাছে সেই বিকেলটার কথা মনে পড়ত। মহাশ্বেতাকে কী উত্তর দেওয়া উচিত ছিল?

বছর দেড়েক বাদে দিব্যর ছোট বোন একদিন বলল, দাদা, ঘাটশিয়াল সেই যে মহাশ্বেতা বলে একটা মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল মনে আছে! ইস্ কী কাণ্ড!

মহাশ্বেতার লম্বাটে মুখখানা চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল দিব্যর। হ্যাঁ তাকে মনে আছে, অন্য কোনও কারণে নয়, একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি বলে।

দিব্য জিগ্যেস করল, কী হয়েছে তার?

রিনি বলল, আজ কাগজে দ্যাখোনি? সে আত্মহত্যা করেছে। কাগজে লিখেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী মহাশ্বেতা সেনগুপ্ত স্লিপিং পিল খেয়েছে, তার আত্মহত্যার কারণ জানা যায়নি।

তৎক্ষণাৎ দিব্যর মনে পড়ে গিয়েছিল মহাশ্বেতার প্রশ্নের সঠিক উত্তরটা। দিব্যর বলা উচিত ছিল, আমাকে তোমার মন খারাপের খানিকটা ভাগ দাও। গোঁয়ার লোকদের শিখিয়ে দাও, কী করে মন খারাপের ভাগ নিতে হয়!

সেইদিন ধারাগিরির কাছে বিকেলে ঠিকঠিকভাবে মহাশ্বেতাকে এই কথাটা বলতে পারলে হয়তো সে আত্মহত্যা করত না। হয়তো এই প্রশ্ন সে আরও কারুর-কারুর কাছে করেছে, কেউ সঠিক উত্তর দেয়নি!

তারপর কতদিন কেটে গেছে, একেবারে হারিয়ে গেছে মহাশ্বেতা। দিব্য তার বুকের মধ্যে কোনও অপরাধবোধ পুষে রাখেনি, কেনই বা রাখবে?

অনসূয়ার সঙ্গে তো মহাশ্বেতার কোনও মিল নেই! যতদূর সে জানে, অনসূয়া খান্ডেলকরের জীবন খুব সুখী আর পরিতৃপ্ত। দিব্য তার কাছে কেন গিয়ে বলবে...। না, দিব্য কিছুতেই তার নিজের ব্যবহারের যুক্তি খুঁজে পায় না।

সোমবার দিব্য অফিসে গিয়েই শুনল যে অজয় খান্ডেলকর তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

জেনারেল ম্যানেজার বললেন, শোনো দিব্য মিঃ খান্ডেলকর তোমায় বেশ পছন্দ করেন, আমি আগেও লক্ষ্য করেছি। তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। মিঃ খান্ডেলকরকে আমরা উইথ ফ্যামিলি কাশ্মীরে একটা গুড ট্রিটমেন্ট দিতে চাই। ওখানে আমরা একটা সেমিনারের আয়োজন করব। সেটা হবে প্রধানত ওঁরই জন্য। তোমাকে খুব কায়দা করে কথাটা পাড়তে হবে। উনি যেন বুঝতে না পারেন যে ওঁর জন্য স্পেশাল কিছু করা হচ্ছে। তুমি ওঁর কাছ থেকে একটা ডেট নিয়ে এসো। তুমি এটা পারবে, আমি জানি।

দিব্য মৃদু হেসে বলল, আচ্ছা আমি চেষ্টা করব।

দিব্য অবশ্য মনে-মনে ঠিকই বুঝেছে, শুধু তাকে আলাদা করে ডাকার মানেটা কী! অজয় খান্ডেলকর খুব কড়া ধরনের নীতিবাগিশ মানুষ। বাইরে অত্যন্ত ভদ্র, কিন্তু নিজের বিশ্বাসে সব সময় স্থির থাকেন। এইবারে তিনি দিব্যকে নিজের চেম্বারে বসিয়ে গায়ের ঝাল ঝাড়বেন।

দিব্যকে হয়তো আজই চাকরিটা ছাড়তে হবে, তবু সে ঠিক করল তার যাওয়া উচিত। নইলে

ছিঁচকে অপরাধীর মতন মনে হবে নিজেকে। অজয় খান্ডেলকর যা খুশি বলার পর সে ক্ষমা চাইবে।

অজয় খান্ডেলকর বসেন চৌরঙ্গি অঞ্চলের উঁচু বাড়ির ষোলতলায়। তাঁর ঘর থেকে সম্পূর্ণ ময়দান ও তার একপ্রান্তে গঙ্গার বাঁক দেখতে পাওয়া যায়। খিদিরপুরের জাহাজগুলো দেখা যায় স্পষ্ট।

অজয় চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে দিব্যর হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, আসুন-আসুন। ওঃ, আজ রোদ বড় চড়া, আসতে আপনার কষ্ট হয়েছে নিশ্চয়ই। একটা খুব জরুরি পয়েন্ট ক্লিয়ার করার কথা, সেই জন্যই আপনাকে ডেকেছি।

সত্যিই অফিস সংক্রান্ত একটা জরুরি ব্যাপার। অজয় কোনওরকম ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ তুললেন না। একটা ইমপোর্ট লাইসেন্সের ব্যাপারে দিল্লি থেকে আপত্তি জানিয়েছে, তবু তাড়াতাড়ি তার উত্তর পাঠাতে হবে। প্রায় সওয়া ঘণ্টা ধরে দুজনে গভীর মনোযোগ দিয়ে বিষয়টি আলোচনা করল।

তখনও কাজ বাকি থেকে গেল খানিকটা। কিন্তু অজয়কে বেরুতে হবে, তাঁর একটা জরুরি অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। চেয়ারে হেলান দিয়ে অজয় বললেন, আমি দুঃখিত, দিব্যবাবু, কাজটা শেষ করা গেল না। অথচ কালই উত্তর পাঠানো দরকার।

দিব্য বলল, আমি কাল সকাল ঠিক সাড়ে-ন'টায় আবার আসতে পারি।

অজয় হুঁ, বলে চোখ বুজে চিন্তা করতে লাগলেন।

দিব্য এই সুযোগে কাশ্মীরের প্রস্তাবটা পেড়ে ফেলল। অজয় সে সম্পর্কে বেশি আগ্রহ প্রকাশ না করে বললেন, ওসব পরে ভেবে দেখা যাবে। আপনি আজ সন্ধেবেলা বিশেষ কিছু করবেন? ফ্রি আছেন?

দিব্য একটু অবাক হয়ে বলল, না তেমন কিচু নেই। কেন বলুন তো!

অজয় হেসে বললেন, আমি ভাবছিলুম, আপনি যদি আজ সন্ধেবেলা আমার বাড়িতে আসতে পারেন। কাজটাও শেষ করা যায়, খানিকটা গল্পগুজবও করা যায়। অফিসের সময়টা তো আমরা সবাই যন্ত্রের মতন, তাই না? যেন আমাদের কোনও সামাজিক পরিচয় নেই।

দিব্য চুপ করে চেয়ে রইল।

কোনও অসুবিধে আছে?

না।

তাহলে চলে আসুন। আমার বাড়ি চেনেন তো! এই সাড়ে সাতটা নাগাদ! হ্যাঁ, আমাদের ওখানেই খেয়ে নেবেন! তা হলে ওই কথা রইল?

দিব্য একবার জানলা দিয়ে ময়দানের দিকে তাকাল। এত উঁচু থেকে সব কিছুই সুন্দর দেখায়। এখান থেকে আত্মহত্যা করা কত সোজা। একটুও ভয় করবে না।

বাইরে বেরিয়ে এসে দিব্যর মনে হল, অজয় খান্ডেলকর কি একটা ফাঁদ পেতে তার মধ্যে দিব্যকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন? কিন্তু তাঁর ব্যবহারে কোনওরকম ধূর্ততার চিহ্ন নেই। তাঁর এই যে ভালোমানুষী ব্যবহার, এর সবটাই অভিনয় হতে পারে?

কিন্তু অজয় খান্ডেলকর অফিসের কাজে কোনওদিন কারুকে বাড়িতে নেমন্তন্ন করেছেন, এরকম শোনাই যায় না।

তবে কি সমস্ত ব্যাপারটাই স্বপ্ন? সেদিন রাতে দিব্য যায়নি যোধপুর পার্কে। কিন্তু তার মানি ব্যাগ, ঘড়ি খোয়া গিয়েছিল...

অফিস একটু ছুঁয়েই বাড়ি চলে এল দিব্য। তারপর বেশ খানিকক্ষণ ঘুমলো। ঘুম থেকে উঠে খুব ভালোভাবে স্নান করল। ঘুম আর স্নান, এই দুটোতেই মন বেশ স্নিগ্ধ থাকে অনেকক্ষণ। মনের এইরকম অবস্থায় নিজে বেশি কথা না বলে অন্যের কথা শুনতে ইচ্ছে হয়।

সাদা ট্রাউজার্স আর সাদা শার্ট পরল। সাদা পোষাকেও বেশ উৎফুল্ল লাগে তার। ঠিক সাড়ে

সাতটায় সে এসে পৌঁছল যোধপুর পার্কে। আশ্চর্য, আজ তাকে বাড়িটা খুঁজে পেতে ট্যাক্সি নিয়ে বেশ ঘুরতে হল খানিকক্ষণ।

পাজামা ও পাঞ্জাবি পরে অজয় খান্ডেলকর বসবার ঘরেই অপেক্ষা করছিলেন। দিব্য ঢুকতেই তিনি সহাস্যে বললেন, একটা ভালো খবর আছে। ইমপোর্ট লাইসেন্সের সেই প্রবলেমটা সলভ্ করে ফেলেছি এর মধ্যেই। ফাইলটা আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি, কাল সকালেই পাঠিয়ে দেবেন, কেমন?

দিব্য তখনও বসেনি, ফাইলটা হাতে নিয়ে সে ভাবল, তা হলে আর এখানে থাকার তো কোনও প্রয়োজন নেই, এখন চলে গেলেই তো হয়।

সে বলল, থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার। আমি আসি তাহলে?

অজয় ব্যস্ত হয়ে বললেন, না না, সে কী, বসুন! আমি তো আপনাকে সোস্যালি ইনভাইট করেছি। ভালোই হল, অফিসের কথাবার্তা আর বলতে হবে না, তাই না?

দিব্যর মনে হচ্ছে, সত্যিই সে একটা ফাঁদে এসে পড়েছে। অজয় খান্ডেলকরের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সঙ্গে সে পাল্লা দিতে পারছে না। কী চান ইনি?

অজয় জিগ্যেস করলেন, আপনাকে কী ড্রিঙ্কস দেব?

অনেক অনুরোধেও দিব্য কোনওরকম মদ নিতে রাজি হল না। সে একটা নরম পানীয় নিয়ে অল্প-অল্প চুমুক দিতে লাগল।

অজয় জিগ্যেস করলেন, একটা কিছু গান দেওয়া যাক। আপনি গান ভালোবাসেন নিশ্চয়ই? কোন ধরনের গান? রবীন্দ্রসঙ্গীত?

দিব্য মাথা নাড়ল।

অজয় একটা ক্যাসেট রেকর্ডার কাছে নিয়ে এসে বললেন, আপনি কি জানেন আমার স্ত্রী এক সময় ভালো রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাইতেন?

দিব্য মাথা নেড়ে জানাল যে সে তা জানে না।

আমি ছেলেবেলা থেকেই রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভক্ত। আমার স্ত্রী, যখন তিনি আমার স্ত্রী ছিলেন না, তাঁর গান শুনে আমি মুগ্ধ হয়েছিলুম। কিন্তু দুঃখের কথা এই যে তিনি গান একেবারে ছেড়ে দিয়েছিলেন।

কিছু তো একটা বলতে হবে, তাই দিব্য বলল, আপনারা তো অনেকদিন বাইরে ছিলেন।

হ্যাঁ সাত বছর। খুব দীর্ঘ সময় তাই না? কিন্তু বিদেশেও তো অনেকে গান-বাজনার চর্চা রাখে। বনানী ঘোষ রবীন্দ্রসংগীতের স্কুল চালান। আমরা যেখানে ছিলাম, তার কাছেই আলি আকবরের মিউজিক স্কুল। আমার স্ত্রী তবু গেল না।

দিব্য ক্রমশ আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অজয় খান্ডেলকর শুধু স্ত্রীর প্রসঙ্গে কথা বলছেন। এই জন্যই তিনি দিব্যকে ডেকে এনেছেন।

অজয় ক্যাসেট রেকর্ডারটা চালিয়ে দিলেন। নারী কণ্ঠের একটা গান শুরু হল। 'দিন যায়, যায় রে!' টানা সুরের গান, গভীর বিষাদে ভরা। কণ্ঠস্বর খুব গভীর। গানটা যেন ওই গায়িকার একেবারে বুকের ভেতর থেকে উঠে আসছে। দিব্যর কাছে এই কণ্ঠস্বর অচেনা।

দুজনে নিঃশব্দে গানটি শুনল। ওই একটা গান শেষ হওয়ার পরই অজয় যন্ত্রটা বন্ধ করে দিলেন।

দিব্য জিগ্যেস করল, এটা কার গান?

হাসি রায়ের। আপনি নাম শুনেছেন?

না।

হাসি রায়ের ভালো নাম ছিল অনসূয়া। এখন তিনি আমার স্ত্রী। এই গানটা উনি গেয়েছেন চারদিন আগে। প্রায় সাড়ে পাঁচ বছর পর আমি ওঁর গলায় একটা পুরো গান শুনলাম। রাত্তিরবেলা,

অনেক রাত্রি তখন, দুটো-আড়াইটে হবে ঘুম ভেঙে গেল, আমি দেখি, আমার স্ত্রী জানলার ধারে দাঁড়িয়ে আছেন, এই গানটা গাইতে-গাইতে তাঁর চোখ দিয়ে টপ-টপ করে জল পড়ছে। আমাদের বিবাহিত জীবনে তাঁকে কোনওদিন কষ্ট পেতে দেখিনি, আমি তাঁকে সবরকম সুখে রাখতে চেয়েছি। বরং আমারই মনে একটা দুঃখ ছিল উনি গান ছেড়ে দিয়েছেন বলে!

কেন গান ছেড়ে দিয়েছিলেন?

জানি না। কোনওদিন তো বলেননি। সেদিন মাঝরাতে ওঁকে এই গানটা গাইতে শুনেই আমি ক্যাসেটটা চালিয়ে দিই। তারপর গান শেষ হল, উনি তবু জানলার ধারে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন। 'দিন যায়, যায় রে।' গানের কথাগুলো লক্ষ করেছেন? তা হলে কি ওঁর দিনগুলো এইরকম দুঃখেই কাটছে, যা আমি খবর রাখি না? আমি তখন হাসির কাছে গিয়ে আস্তে জিগ্যেস করলাম, তোমার কীসের এত দুঃখ? আমি কি কিছু ভুল করেছি? উনি ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে আমার বুকে মাথা রাখলেন। আমি তাঁর চুলে হাত বুলোতে লাগলাম। তারপর একটু সামলে নিয়ে উনি বললেন, সত্যি আমার কোনও অভাব নেই, দুঃখ নেই। কিন্তু ক'দিন আগে একজন লোক এসে আমার মন খারাপ করে দিয়ে গেছে!

দিব্য সামনে ঝুঁকে পড়ে ব্যাকুলভাবে বললেন, মিঃ খান্ডেলকর, আমি...

অজয় তাকে বাধা দিয়ে বললেন, দাঁড়ান আমি আগে শেষ করে নিই! হাসির মুখে ওই কথা শুনে আমি স্বাভাবিকভাবেই অবাক হলুম। জিগ্যেস করলুম, রাত্তিরবেলা একজন লোক এসেছিল? কে? হাসি বললেন, ঘটনাটা তোমাকে জানাতে চাইনি, ড্রিংক করে কেউ-কেউ মাঝে-মাঝে এরকম পাগলামি করে, পরেরদিন সেজন্য খুব লজ্জা পায়। এ নিয়ে বেশি রাগারাগি বা কোনওরকম অ্যাকশন নেওয়া উচিত নয়। দিব্য ছেলেটিকে দু-একদিন যা দেখেছি, এমনিতে খুব ভদ্র। সে রাত্তিরে এসে আমার সঙ্গে কোনওরকম অসভ্যতা করেনি, শুধু বারবার বলছিল, তোমার নাম মহাশ্বেতা! কেন ওরকম বলছিল? তারপর থেকেই আমার ভীষণ মন খারাপ লাগছে। আমি কিছুতেই মনটা ঠিক করতে পারছি না। আমার কান্না এসে যাচ্ছে।

দিব্য মাথা নীচু করে বসে রইল।

অজয় একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আপনি কেন এসেছিলেন আমি জানি না। জানতে চাই না। কিন্তু আপনি আমার উপকারই করেছেন। আপনি হাসির গলা থেকে আবার গান বার করে এনেছেন। দাঁড়ান, হাসিকে ডাকি।

অজয় চট করে চলে গেলেন ভেতরে। দিব্য একলা বসে থেকে মরমে মরে যেতে লাগল। এখন কী করা উচিত, কী বলা উচিত, কিছুই সে বুঝতে পারছে না।

প্রায় পাঁচ মিনিট বাদে শ্রীমতী অনসূয়া খান্ডেলকর ঘরে ঢুকলেন একা। মুখখানা দেখে মনে হয় বিষাদ প্রতিমা। দিব্যর সামনে এসে বসলেন।

দিব্যর হাত-পা কাঁপছে। জীবনে সে কখনও এত নার্ভাস বোধ করেনি। কেন সে এখানে এল? পরদিনই তার চাকরি ছেড়ে দিয়ে কলকাতার বাইরে চলে যাওয়া উচিত ছিল।

মুখ তুলে দিব্য গভীর আবেগের সঙ্গে বলল, আমি দুঃখিত। সেদিনের ব্যবহার যদিও অমার্জনীয়, তবু আমি আন্তরিক ভাবে ক্ষমা চাইছি।

হাসি অস্ফুট স্বরে জিগ্যেস করল, আপনি কেন এসেছিলেন?

আমি জানি না। বিশ্বাস করুন, আমি কোনওদিন কারুর সঙ্গে এরকম...আমি নিজেই আমার ব্যবহারের মানে বুঝতে পারছি না! কেউ যেন আমাকে জোর করে টেনে এনেছিল।

মহাশ্বেতা কে? আপনি কেন বলেছিলেন, আমার নাম মহাশ্বেতা?

তাও আমি ঠিক জানি না। আপনাকে বিশ্বাস করতেই হবে, আমি ভেবেচিন্তে কিছু করিনি। কেন যে আপনাকে মহাশ্বেতা বললুম।

ওই নামে কেউ ছিল?

ছিল, অনেকদিন আগে হারিয়ে গেছে!

ওকে নিয়ে আপনার নিশ্চয়ই অনেক কষ্ট ছিল বুকের মধ্যে? সেই কষ্টটা আপনি আমাকে দিয়ে গেলেন। আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না ওই নাম। কেন আমাকে মহাশ্বেতা বলেছিলেন, ভাবতে গেলেই কান্না পেয়ে যায়। সেই কান্না হঠাৎ একদিন গান হয়ে বেরিয়ে এল। আমি যেন একটা, কী বলব, যেন একটা সুখের ফানুসের মধ্যে ছিলুম, হঠাৎ কী করে ঢুকে পড়ল দুঃখ।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে অজয় বললেন, এজন্য দিব্যবাবুকে আমাদের দুজনেরই ধন্যবাদ জানানো উচিত। তাই না? হাসি, তুমি এবারে আমাদের একটা গান উপহার দাও! তানপুরাটা আনি?

হাসি আর একটা গান শুরু করল। চির সখা হে, ছেড়ো না! এ গানেও দুঃখের সুর।

গান শুনতে-শুনতে দিব্যর চোখে জল এসে যাচ্ছে। কবে, কোথায় হারিয়ে গেছে মহাশ্বেতা! এখন তার মুখটাও আর দিব্যর মনে নেই। তবু সেই মহাশ্বেতার মন খারাপ কী করে যেন সুর হয়ে ঝরে-ঝরে পড়ছে হাসির কণ্ঠ দিয়ে। হাসি এখন সত্যিই মহাশ্বেতা!



সোনামণির অশ্রু

লোকটিকে ভালো করে লক্ষ্য করুন।

রোগা-পাতলা, লম্বাটে চেহারা, বছর চল্লিশেক বয়েস। মাথার চুল বেশ ঘন, তার মধ্যে দু-চারটে সাদা। তুলনা দিয়ে বোঝাতে গেলে বলতে হয়, লোকটির মুখখানা অনেকটা ঘোড়ার মতো। তা বলে খারাপ দেখতে বা হাস্যকর কিছু নয়, অনেক মানুষের মুখই এরকম হয়। ধুতির ওপর সাদা হাফ শার্ট পরা, তার পোশাক মোটামুটি পরিচ্ছন্ন, বাঁ-হাতে একটা সোনার আংটি।

লোকটি জগুবাবুর বাজারের বাইরের ফুটপাত থেকে দুপুর দেড়টার সময় তালশাঁস কিনছে। দুপুর দেড়টা।

রাস্তার অনেক মানুষের মধ্যে সাধারণ একটি মানুষ। ওকে দেখে বোঝবার কোনও উপায় নেই যে ওই লোকটি একটি খুনি।

খুনিরা কি রাস্তায় দাঁড়িয়ে তালশাঁস কেনে? টাকায় সাতটা দেবে না আটটা, তাই নিয়ে দরাদরি করে?

দু-টাকায় পনেরোটিতে রফা হল। লোকটি কাগজের ঠোঙাটি হাতে নিয়ে হাঁটতে লাগল হাজরার মোড়ের দিকে।

কালিকা সিনেমার এক পাশের একটা তিনতলা বাড়ির দরজায় তিনটে চিঠির বাক্স। লোকটি দেখল মাঝখানের বাক্সটি ফাঁকা!

দোতলায় আলো হাওয়া যুক্ত স্বতন্ত্র তিন কামরার ফ্ল্যাট। পনেরো বছর আগেকার ভাড়া। বেশ শস্তা। সল্টলেকে জমি রয়েছে তার, কিন্তু বাড়ি করার উৎসাহ নেই, দোকান থেকে অনেক দূর পড়ে যায়।

লোকটির স্ত্রী বাংলা-মাসিক পত্রিকা পড়ছিল বিছানায় শুয়ে। মোটার দিকে গড়ন, দুপুরে ব্রা পরে না। এই তো একটু আগে স্নান সেরে এসেছে, দুপুরবেলা এই সময় প্রত্যেকদিন তার স্বামী

দোকানে অন্য কর্মচারী বসিয়ে রেখে বাড়িতে ভাত খেতে আসে।

ওদের ছেলেটিই বড়, এই সবে কলেজে ভরতি হয়েছে। আর মেয়ে ছোট, ন'বছর মাত্র বয়েস, স্কুল বাসে সেও ফিরেছে একটু আগে।

দরজার বেল শুনে মাসিক পত্রিকাটি মুড়ে রেখে স্ত্রী বলল, পুষি দোর খুলে দে, বাবা এসেছে!

এক বুড়ি এ-বাড়িতে রান্নার কাজ করে, তিনদিন ধরে সে দেশে গেছে। গৃহকর্ত্রীকেই আজ খাবার গরম করতে হবে, আর গোটা কয়েক বেগুন ভাজা। একটা কিছু ভাজাভুজি না করলে ওর স্বামীর মুখে ভাত রোচে না।

খাট থেকে নেমে তখুনি সে রান্না ঘরের দিকে না গিয়ে ড্রেসিং টেবলের সামনে দাঁড়াল। গুমোট গরম, দু-চারটি ঘামাচি হয়েছে তার বুকে, বাঁ হাত দিয়ে নিজের বাম স্তনটি চেপে ধরে সে ডান হাত দিয়ে ঘামাচি মারতে লাগল।

মেয়ে দরজা খুলে বাবাকে জিগ্যেস করল, বাবা, কী এনেছ? কী এনেছ?

ঠোঙাটি মেয়ের হাতে দিয়ে লোকটি তার গাল টিপে একটু আদর করল। তারপর ঢুকল শয়ন ঘরে।

রক্ত মাংসের স্ত্রীর শরীরের চেয়েও আয়নায় আধো উন্মুক্ত বেশ বড় একটি বর্তুল স্তন তাকে মুগ্ধ করল বেশি। সে মৃদু-মৃদু হাসতে লাগল।

দেওয়ালে কালী ঠাকুরের ছবি, তাতে কাগজের লাল ফুলের মালা। ড্রেসিং টেবলের দু-পাশে দুটি বাঁকুড়ার ঘোড়া। জানলায় একটি পুরোনো বিলিতি মদের বোতলে মানি প্ল্যান্ট।

খুনির বাড়ি!

সেলিমপুরের এ পাশটা থেকে বড় রাস্তা পেরুলেই যোধপুর পার্ক। খানিকটা ভেতরে ঢুকলেই সোনামণির মাসির বাড়ি।

সোনামণির মা আর বাবা দুজনেই অফিসে যান, ফিরতে সন্ধে হয়ে যায় বলে সোনামণি ইস্কুল থেকে ফিরেই মাসির বাড়িতে চলে যায়! বাড়ির ঝি তাকে দিয়ে আসে, নিয়ে আসে!

সোনামণির বয়েস এগারো। গল্পের বই-এর জগত ছেড়ে সে এখনও বাস্তব পৃথিবীতে পা দেয়নি। এইবার দেবে-দেবে করছে। তার গায়ের রং বেশ ফরসা, সারশের সৌন্দর্যে তার মুখখানা অপরূপ, খুব বাচ্চা বয়েস থেকেই লোকে তাকে দেখলে বলত, ইস, একেবারে পুতুলের মতন দেখতে হয়েছে মেয়েটা। এক-এক সময় এই কথা শুনলে সে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলতো। সবাই এক কথা বলে, তার মোটেই পুতুল হতে ইচ্ছে করে না।

এখন সোনামণিকে কেউ-কেউ আদর করে বলে আকাশের পরী। সে সবে মাত্র লম্বা হতে শুরু করেছে, মাথা ভরতি কোঁকড়া চুল, চোখ দুটো দেখলেই মনে হয় কাজল টানা। পড়াশুনোতে সোনামণির তীক্ষ্ণ মেধা।

সন্ধে সাড়ে ছ'টা বাজে, সোনামণি মাসির বাড়ির থেকে নিজের বাড়িতে ফিরছে। খানিক আগেই লোডশেডিং হয়েছে, রাস্তাঘাট একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার। বিকেলে প্রবল তোড়ে বৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় রাস্তায় এখানে-সেখানে জমে আছে কালো জল।

বাড়ির দাসী বিমলা সোনামণির হাত ধরে হাঁটছিল, কিন্তু সোনামণি নিজেই মাঝে-মাঝে হাত ছাড়িয়ে নিচ্ছে। সে আর অত ছোট নেই। আর দু-দিন বাদেই তার জন্মদিন। তখন সে বারোতে পা দিয়ে বড়দের জগতেও পা দেবে।

এত অন্ধকারেও রাস্তায় মানুষজন কম নেই। হেড লাইট জ্বালিয়ে যাচ্ছে গাড়ি, তারই মধ্যে সাইকেল রিকশা, একটা গোরু...।

ফুটপাত থেকে বড় রাস্তায় নামতেই খানিকটা জল। সোনামণি সেখানে পা দেওয়া মাত্র কেউ যেন তাকে নীচে টানল হুস করে। সোনামণি হাত বাড়িয়ে বিমলাকে ধরতে গেল, পারল না।

রাস্তায় হাঁটু ডোবার চেয়েও কম জলে সোনামণি ডুবে গেল।

বিমলা প্রথমে কিছুই বুঝতে পারল না। কোনও গাড়ির হেডলাইটে সে এক পলকের জন্য সোনামণির গায়ের সাদা ফ্রকটাকে দুমড়ে নীচে পড়ে যেতে দেখল।

ও খুকু কোথায় গেলে? ও খুকু! কী হল গো? ও খুকু!

বিমলা হুড়োহুড়ি করতে গিয়ে নিজেও পড়ে গেল জলে, কিন্তু সে ডুবল না। এবং সে জানতেও পারল না তারই গোড়ালির ধাক্কায় সোনামণি আবার ডুবে গেল খোলা হাইড্র্যান্টের মধ্যে। একবার সে কোনওক্রমে ভেসে ওঠার চেষ্টা করেছিল।

বিমলার চ্যাঁচামেচির কারণটা রাস্তার লোকদের বুঝতেই অনেকটা সময় লাগল। সবাই তিতিবিরক্ত, কে আর অন্যের ব্যাপারে মাথা গলাতে চায়?

আড়াই ঘণ্টা বাদে নরকের পাঁক মাখা সোনামণির মৃতদেহ উদ্ধার করা হল। তখনও মিশমিশে অন্ধকার রাস্তায়, কেউ তার বিকৃত বীভৎস মুখ দেখতে পায়নি।

রাত পৌনে একটা। এ সময় শহর প্রায় ঘুমন্ত হলেও কেউ-কেউ জেগে থাকে।

পঞ্চাননতলা বস্তির পাশে রেল লাইনের ওপরেই জনা পাঁচেক যুবক আড্ডা জমিয়েছে। এদের মধ্যে দু জনের এখনও গোঁফ গজায়নি, তবু তারা টেনেটুনে যুবকদের দলে ঢুকতে চাইছে।

সামনে বাংলা মদের বোতল, আর ঝাল-ঝাল কিমার চাট। চারজনের মুখে সিগারেট, একজন গাঁজা পাকাচ্ছে।

রাতের দিকে দু-একটা মালগাড়ি চলে মাঝে-মাঝে। তাও ইদানীং বেশ কমে গেছে। মালগাড়ি এলে ওদের কাজ কারবার ভালো হয়। কিছুদিন ধরে বাজার মন্দা যাচ্ছে তাই ছ্যাঁচড়া কাজ করতে হচ্ছে।

হঠাৎ একজন ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, ভূ-ভূ-ভূ-ভূত!

আর-একজন তার উরুতে একটা থাবড়া মেরে বলল, চুপ বে! চেল্লাসনি! রং চড়ে গেছে?

প্রথম ছেলেটি তবু আতঙ্কে কাঁপতে-কাঁপতে বলল, ওই-ওই-ওই, ওই যে দ্যাখ! ভূ-ভূ-ভূত!

এবারে পাঁচজনেই দেখতে পেল। ধপধপে সাদা ফ্রক পরা, ফুটফুটে ফরসা, এগারো-বারো বছরের একটি পরী তাদের সামনে শূন্যে ভাসছে।

পাঁচজনে একেবারে থ। চোখের ভুল নয়, সত্যি দেখছে।

পরীটি খুব মিনতিপূর্ণ গলায় জিগ্যেস করল, ওগো, তোমরা আমায় মারলে কেন? আমি কী দোষ করেছি তোমাদের কাছে?

পাঁচ যুবকের শরীরে কাঁপুনি ধরল এবার। যেন পুলিশ তাদের অ্যারেস্ট করে ফলস কেস চাপিয়ে দিয়েছে। এবারে ফাঁসি দেবে। এরা তো ছুরি-ছোরা বা পেটো-পিস্তলের কারবার করে না। সেজন্য অন্য দল আছে। ওরা তো সবে মাত্র ছোটখাটো মাল সরাবার কাজে হাত পাকাচ্ছে।

বিনা নির্বাচনেই ওদের যে দলপতি, সেই গণা বলল, তোমায় কে মেরেছে? আমরা তো কোনও মেয়েছেলের গায়ে হাত দিই না? তুমি ভুল জায়গায় এসেছো!

কিশোরী পরী বলল, হ্যাঁ, তোমরাই মেরেছ। কেন মারলে, বলো, কেন মারলে? আমি কী দোষ করেছি? আমার বাবা-মা কি তোমাদের কাছে কোনও দোষ করেছে?

গণা বলল, আরে কী মুস্কিল, সত্যি বলছি, আমরা ওসব কাজ করি না। তোমাকে আমরা মারিনি!

কিশোরী পরী বলল, আর দু-দিন বাদে আমার জন্মদিন। আর হল না। আমার আর ইস্কুলে যাওয়া হবে না! মা-বাবা আমায় আর দেখতে পাবে না। ওগো, তোমরা কেন আমায় এই শাস্তি দিলে। তোমরা যোধপুর পার্কের সামনে রাস্তার তিনটে হাইড্র্যান্টের লোহার ঢাকা খুলে নিয়েছ...

গণা এবারে চোখ বুজল। পুলিশ যেন চোরাই মাল তুলে ধরে তার চোখের সামনে দেখাচ্ছে। হ্যাঁ, ও কাজটা তাদেরই বটে।

এবারে দ্বিতীয় নেতা নেবু খানিকটা সাহস সঞ্চয় করেছে। সে বলল, হ্যাঁ, নিয়েছি। পেটের দায়ে। তুমি যোধপুরে থাকতে, তোমরা বড়লোক, গাড়ি করে যাও, তোমাদের নর্দমায় পা দেওয়ার কথা নয়!

সোনামণি বলল, আমাদের গাড়ি নেই। আমি বিমলার সঙ্গে যাচ্ছিলুম, নর্দমায় পড়ে গিয়ে ডুবে গেছি, বিমলার পা ভেঙে গেল...ওগো, তোমাদের কি একটুও দয়া নেই?

গণা বলল, আজ শালা সন্ধেবেলা হেভি বৃষ্টি হয়েছে!

নেবু বলল, বৃষ্টি হয়ে রাস্তায় জল জমেছে সে তো শালা ভগবানের দোষ!

গণা সোনামণির উদ্দেশ্যে বলল, তুমি দয়ার কথা বলছো; আমরা যখন খেতে পাই না, তখন কেউ দয়া করে? তোমার বাপ-মা কি আমাদের খেতে দেবে? কোনও শালা খেতে দেয় না। কিছু চাইতে গেলে দূর-দূর করে খেদিয়ে দেয়!

—তোমরা অন্য কাজ করতে পারো না? বড়দা যেমন অফিসে কাজ করে—

—হাঃ! তুমি কোথাকার পরী গো? কিছু জানো না। শুধুমুধু আমাদের দোষ দিতে এসেছ? অন্য কাজ, হেঃ! নন্টেদা বেহালায় কারখানায় কাজ করত, তার চাকরি গেছে! এখন সেও আমাদের লাইনে ঢুকেছে।

—হিঃ, তা বলে তোমরা খারাপ কাজ করবে? যাতে মানুষ মরে?

—আবার ওই কথা বলছ? তুমি যে মরেছ, সে জন্য যদি কেউ দায়ী হয়, তাহলে সে হল জগুবাবুর বাজারের শিববাবু!

—সে কে?

—তার লোহার দোকান। সে আমাদের কাছ থেকে মাল কেনে। পার্কের রেলিং ভেঙে নিয়ে গেলে কম দর দেয়। নর্দমার ঢাকনা নিয়ে গেলে ভালো পয়সা। একখানা নিয়ে গেলে বলে, আর মাল নেই?

—হ্যাঁ গো পরী, তোমার মৃত্যুর জন্য শিববাবু দায়ী! ও মাল যদি সে না কিনত, তাহলে কি আমরা এমনি-এমনি খুলতুম? সেই শিববাবু শালা আবার খুব কালী ভক্ত! দোকানে অ্যা-ত্ত বড় ফটো!

সোনামণির আত্মা সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কালিকা সিনেমার পাশে দোতলার ফ্ল্যাটে শিববাবুর ঘুম ভেঙে গেল।

স্বামী-স্ত্রীর ডবল খাট, ছেলে মেয়েদের আলাদা-আলাদা ঘরে বিছানা। কিন্তু মেয়েটা বড় বাবার ভক্ত, প্রায়ই নিজের বিছানা ছেড়ে বাবা-মায়ের মাঝখানে শুয়ে পড়ে।

শিববাবু চোখ মেলে আঁতকে উঠল প্রথমটা।

জানলা দিয়ে ধোঁয়ার মতন কী যেন ঢুকছে। তারপর সেই ধোঁয়া একটি মূর্তি নিল। একটি অপূর্ব সুন্দরী কিশোরী মেয়ে, গায়ে সাদা ফ্রক, সে হাওয়ায় ভাসছে!

শিববাবু ভাবলেন, কোনও দেবতা বুঝি এসেছে তার ঘরে। লক্ষ্মী ঠাকরুণ? একটা লটারির টিকিট কিনেছে সে, যদি দু-কোটি দু-লাখ টাকার ফার্স্ট-প্রাইজটা লেগে যায়...

ভাসমান পরী দুঃখের সুরে বলল, ওগো, তুমি আমায় মারলে কেন? আমি কী দোষ করেছি তোমার কাছে?

—অ্যাঁ?

শিববাবু আঁতকে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে কুল-কুল করে ঘাম বইতে লাগল তার শরীরে। এই মেয়েটা খুন হয়েছে? বাপরে বাপ, কী সাংঘাতিক কথা! এমন একটা ফুটফুটে মেয়েকে যারা মারে, তারা কি মানুষ না শয়তান?

কিন্তু মেয়েটি তার কাছে এসেছে কেন? তার নামে অভিযোগ করছে? এ কী আশ্চর্য কথা!

—ওগো, তুমি কেন আমার মারলে?—আর দু-দিন পরে আমার জন্মদিন।

—এ কী কথা বলছ, মা? আমি কেন তোমায় মারব? আমি বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার করি, আমি তো খুন-জখমের ব্যাপারে থাকি না। তোমারই বয়েসি মেয়ে আছে আমার—

—কেন, রেললাইনের কাছে লোকগুলো যে বলল, তুমি আমাকে মেরেছো?

—রেল লাইনের পাশের লোক? তারা কারা? আমি তো চিনি না। তোমার কী হয়েছিল, খুলে বলো তো?

—আমি যোধপুর পার্ক থেকে আসছিলুম, সন্ধেবেলা লোডশেডিং ছিল, রাস্তায় জল ছিল।

—ও হ্যাঁ, রেডিও'র রাত্তিরের খবরে শুনলাম বটে, ওদিকে একটি মেয়ে রাস্তায় দুর্ঘটনায় মারা গেছে। আহা গো! এমন কাঁচা বয়েসের মেয়ে, ছি-ছি-ছি-ছি, গাড়ি চাপা দিয়েছিল?

—রাস্তার নীচে পাতাল থাকে, আমি সেখানে ডুবে গেছি। পাতালের ঢাকনা ছিল না।

—কী বললে, পাতাল?

—রেল লাইনের লোকেরা বললে, তুমি সেই পাতালের ঢাকনা কেনো, তাই ওরা সেগুলো তুলে আনে। তুমি না কিনলে ওরা আনতো না।

ও, এবার বুঝেছি! ওরা বাজে কথা বলেছে। আমি না কিনলে ওরা অন্য কারুর কাছে বেচতো। আমি দোকান খুলেছি, কেউ পুরোনো লোহা আনলেই কিনি। সে কোথা থেকে এনেছে তা আমার দেখার দরকার কী?

—তুমি জানো না, ওগুলো খুলে নিলে মানুষ মরে যেতে পারে? যেমন আমি মরে গেলাম? আমি কি দোষ করেছি যে এমনি করে আমাকে মরতে হবে?

তুমি শুধু-শুধু আমায় দোষ দিচ্ছ মা। জানো, ওই লোহার ঢাকনাগুলো আমার কাছ থেকে কে কেনে? কর্পোরেশনেরই অফিসার। আমার কাছ থেকে কিনে নিয়ে গিয়ে রাস্তায় বসায়, গণা-নেবুরা সেগুলো আবার তুলে আনে কর্পোরেশনের অফিসার আবার কিনতে আসে আমার কাছে। এর মধ্যে আমি কে, আমি তো নিমিত্ত মাত্র। কর্পোরেশনের মিঃ দাস, তার কাছে যাও। সে তো জেনে শুনেই এসব করাচ্ছে!

—তুমিও তো জানতে?

—আমি অত শত চিন্তা করি না। আমি মাল কিনি, মাল বেচি; রাস্তা রক্ষা করার দায়িত্ব তো আমার নয়। পুলিশ এই চুরি বন্ধ করতে পারে না? পুলিশ ইচ্ছে করে ওদের ধরে না, বুঝলে? ওখানকার থানার ও সি-কে গিয়ে বলো, সে তোমাকে মেরেছে। আর যারা রোজ সন্ধেবেলা লোডশেডিং করে? তারা জানে নে যে রাস্তায় এত গর্ত, কত নর্দমার ঢাকনা নেই, সারা সন্ধে অন্ধকার থাকলে কত লোকের অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে। হচ্ছেও তো রোজই। তারা দোষ স্বীকার করেছে কখনও, তুমি তাদের কাছে যাও। দ্যাখো গিয়ে, তারা সবাই এখন আরাম করে ঘুমোচ্ছে! তুমি একলা আমাকে দুষতে এসেছ কেন, মা? আহা, তোমার মতন একটা মেয়ে...

সোনামণি আবার ধোঁয়া হয়ে বেরিয়ে গেল জানলা দিয়ে।

শিববাবুর বুক কাঁপছে। হাত জোড় করে সে প্রমাণ জানাল ঠাকুরের উদ্দেশ্যে।

তারপর পাশের ঘুমন্ত মেয়ের গায়ে স্নেহের হাত রাখল।

তখুনি সে ঠিক করল, পুষিকে সে কোনওদিন সন্ধের পর রাস্তায় বেরুতে দেবে না।

রাত্রির তৃতীয় প্রহরের আকাশে দুলতে লাগল সোনামণির আত্মা।

শিববাবু নামের লোকটি কতগুল্লো লোকের নাম বলল। সে এখন কোথায় যাবে, কার কাছে তার দুঃখের কথা জানাবে। তার জন্মদিন আর হবে না। সে আর এই পৃথিবীতে বড়দের জগতে পা দিতে পারবে না।

এত বড় শহরের তো কিছুই চেনে না সোনামণি। শিববাবু যাদের নাম বলল, তাদেরকে এখন কোথায় খুঁজে পাবে?

ঢেউ-এর মতন অভিমান ঝাপটা দিতে লাগল তার বুকে। রাত্রির শিশিরের মতন টুপ-টুপ করে ঝরে পড়তে লাগল তার চোখের জল।



ফিরে আসা

পাশের তিন-চার খানা ফ্ল্যাটে খোঁজ করা হল, পাথরের থালা আছে কি না। নেই। সকলেরই স্বামী-স্ত্রী আর একটা-দুটো বাচ্চার ছিমছাম সংসার। ঠাকুমা-দিদিমাদের অস্তিত্ব নেই, সুতরাং পাথরের থালায় আর কে খাবে এখন। তা ছাড়া, আজকাল বয়স্কা বিধবারাও স্টেইনলেস স্টিলের থালায় ভাত খান!

পাথরের থালা পাওয়া গেল না বলে বাজার থেকে কিনে আনা হল কলাপাতা। তাতে খাবার দেওয়া হল স্বামীজিকে। লুচি, ফুলকপির তরকারি, বেগুন ভাজা, পটলের দোলমা, দই, মিষ্টি। স্নান সেরে খাবারের জায়গায় এসে ওই রকম আয়োজন দেখে সন্ন্যাসী বললেন, এ কি, কলাপাতা কেন?

এ-বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া হয় টেবিল-চেয়ারে। সব ফ্ল্যাট বাড়িতেই তাই। কিন্তু স্বামীজির জন্য বসবার জায়গায় কার্পেট তুলে সেখানটা ভালো করে মুছে একটা পশমের আসন পাতা হয়েছে। জল দেওয়া হয়েছে কাঁসার গেলাসে। দু-চারটে কাঁসার বাসন এখনও রয়ে গেছে মঞ্জুলির কাছে, পশমের আসনটি ধার পাওয়া গেছে পাশের ফ্ল্যাটের ওড়িয়া পরিবারটির কাছ থেকে।

স্বামীজি বললেন, আমার জন্য এরকম আলাদা ব্যবস্থা কেন, তোমাদের সঙ্গেই বসে খেতে পারতুম।

মঞ্জুলি বলল, না, না, আপনি বসুন, আমরা পরে খাব।

নীতিশ বলল, আপনি তো খাওয়ার সময় কথা বলেন না, মাঝখানে কিছু নেনও না। আর কিছু লাগবে? আর দু-খানা লুচি দিক?

স্বামীজি খোলা গলায় হা-হা করে হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, হাঁ লাগবে, দুটো কাঁচা লঙ্কা!

স্বামীজি মানে নীতিশের দ্বিজুমামা। তার মায়ের মামাতো ভাই। নীতিশের মনে আছে এক সময় এই দ্বিজু মামা খুব ভালো টেবিল টেনিস খেলতেন, বিহার ক্যাডারের আই এ এস পরীক্ষা

দিয়ে এক সময় দ্বারভাঙ্গার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিলেন। তারপর হঠাৎ সন্ন্যাসী হয়ে যান! সে প্রায় দশ-বারো বছর আগেকার কথা।

হিসেব অনুযায়ী বছর পঞ্চাশেক বয়েস, কিন্তু সুন্দর, মজবুত চেহারা। এককালে যে খেলোয়াড় ছিলেন তা বোঝা যায়! গায়ের রং-ও যেন আগের চেয়ে ফরসা হয়েছে, সাত্ত্বিক খাওয়া-দাওয়া করলে বোধহয় এরকম রং ফরসা হয়। মাথার চুল পাকেনি। দাড়ির মধ্যে একটু-আধটু রূপোলি ঝিলিক আছে। গেরুয়া লুঙ্গি ও গেরুয়া চাদর পরা।

সন্ন্যাসীদের নাম ধরে ডাকতে নেই, তাই নীতিশ আর ওঁকে দ্বিজুমামা বলে না। সন্ন্যাসীরা কারুর মামা, কাকা, পিসেও থাকেন না, সেইজন্য ওঁকে কী বলে ডাকবে তাই নিয়ে নীতিশ একটু সমস্যায় পড়েছিল। মঞ্জুলিই প্রথম স্বামীজি বলে সম্বোধন করে। নীতিশ অবশ্য আড়ালে এখনও প্রায়ই দ্বিজুমামা বলে ফেলে।

হৃষীকেশে থাকেন স্বামীজি, চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন যে কয়েকদিনের জন্য তিনি কলকাতায় আসবেন এবং নীতিশের কাছেই উঠবেন। কেন কলকাতায় আসবেন, সে কথা লেখেননি, নীতিশের ঠিকানা কী করে জানলেন তাই বা কে জানে। মাত্র তিন বছর হল নীতিশ এই নতুন ফ্ল্যাটে এসেছে। চিঠিতে উনি স্বামী প্রণবানন্দ নামে সই করেছিলেন, দ্বিজুমামার এই নতুন নাম নীতিশ আগেই শুনেছিল।

আসনের ওপর দাঁড়িয়ে স্বামীজি বললেন, তোরা লুচি খাওয়াচ্ছিস। অনেকদিন কাঁচা মুগের ডাল দিয়ে সেদ্ধ চালের ভাত খাইনি। ওদিকে তো সেদ্ধ চাল পাওয়াই যায় না—তাছাড়া আশ্রমে রুটিই খাই।

মঞ্জুলি বলল, ওমা, আপনি ভাত খাবেন তা তো জানতুম না, আমার মামাবাড়িতে একজন স্বামীজি আসতেন আগে, তিনি কোনও বাড়িতে এঁটো রান্না খান না শুনেছিলুম।

স্বামীজি বললেন, ভাত হলেই এঁটো আর লুচি এঁটো নয়, এসব কথা তোকে কে শিখিয়েছে? আমি সব খাই, বুঝলি, মাছ-মাংস ছাড়া। অনেকদিনের অভ্যাস তো, মাছ-মাংসের গন্ধ সহ্য করতে পারি না।

খাওয়ার সময় উনি কথা বলেন না ঠিকই। নীতিশ এটা কোথা থেকে জানল? সাধু হওয়ার পর দ্বিজুমামাকে সে একবারও দেখেনি। এমন কি বিয়ের পর যেবার মঞ্জুলিকে নিয়ে সে দিল্লি-হরিদ্বার যায়, সেবারও তার এই সাধু হয়ে যাওয়া মামার খোঁজ করার কথা তার মনে আসেনি। আর কোনও সাধু-সন্ন্যাসীও কখনও আসেনি নীতিশের বাড়িতে।

মঞ্জুলিই বা কী করে জানল যে সন্ন্যাসীদের পাথরের থালায়, নিদেনপক্ষে কলাপাতায় খাবার দিতে হয়? স্টেইনলেস স্টিল বা কাচের গেলাসের বদলে কাঁসার গেলাসে জল দিলে সাত্ত্বিক দেখায়? জানবার কথা নয় মঞ্জুলির। সে সিগারেট খায়, স্বামীর সঙ্গে পার্টিতে গিয়ে নাচে, দু-তিন বোতল বিয়ার উড়িয়ে দেওয়া তার পক্ষে কিছুই না, সে ইংরেজি গান গাইতে পারে। মঞ্জুলি পড়ায় লরেটো কলেজে। এখন সে মাথায় ঘোমটা দিয়ে খাঁটি বাঙালি গৃহবধূর ভঙ্গিতে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে আছে।

খাওয়া শেষ করার পর স্বামীজি এক মিনিট চোখ বুজে কোনও স্তব পাঠ করলেন। তারপর চোখ মেলে বললেন, তোদের বাড়িতে পানের ব্যবস্থা নেই নিশ্চয়ই?

মঞ্জুলি জিগ্যেস করলেন, আপনি পান খাবেন? আনিয়ে দিতে পারি!

স্বামীজি বললেন, ঠিক এগারো বছর আট মাস একটাও পান খাইনি! আজ একটা খেয়ে দেখতে ইচ্ছে করছে।

নীতিশ বললেন, এক্ষুনি আনিয়ে দিচ্ছি। দোকান থেকে সাজা পান কিনে আনলে...আপনার খেতে আপত্তি নেই তো?

স্বামীজি দার্শনিকভাবে বললেন, সারা পৃথিবী জুড়েই তো রয়েছে একটা দোকান। যতদিন

বাঁচা, ততদিনই দোকানদারির ওপরে ভরসা। এই যে কাপড়খানা পরে আছি, তাও তো দোকানের।

নীতিশ আর মঞ্জুলির দুটি পুত্র সন্তান, দুজনেই পড়ে দার্জিলিং-এ। নীতিশ নিজে দার্জিলিং স্কুলে পড়েছে বলে ওই স্কুলের ওপর তার দারুণ ভক্তি। অফিসের কাজে তাকে মাসে অন্তত দুবার শিলিগুড়ি যেতে হয়। সুতরাং তখন ছেলেদের সঙ্গে দেখা করে আসতে পারে। মঞ্জুলিকেও সে নিয়ে যায় প্রায়ই।

ছেলেদের ঘরখানাই পরিষ্কার করে, খাটের ওপর নতুন চাদর পেতে স্বামীজির জন্য বিছানা করা হয়েছে। স্বামীজি অবশ্য তখুনি শুতে গেলেন না, তিনি, বললেন, তোমরা আগে খেয়ে নাও, তারপর একটু গল্প গুজব করা যাবে!

প্রাণতোষ নামে কাজের লোকটি পান আনতে যাওয়ার সময় জিগ্যেস করল, কী পান আনব? সাদা না জর্দা?

স্বামীজি বললেন, খাচ্ছিই যখন, তখন জরদা পানই খাওয়া যাক।

নীতিশ একটু চিন্তিত ভাবে বলল, অভ্যেস না থাকলে কিন্তু জরদা খেলে মাথা ঘোরে।

স্বামীজি হেসে বললেন, দেখাই যাক না!

স্বামীজি গিয়ে দাঁড়ালেন বারান্দায়, নীতিশ আর মঞ্জুলি চটপট খাওয়া সেরে নিল। আজ ওদের খাবার নিরামিষ। মঞ্জুলি ভেবেছিল, কী জানি, একই রান্নাঘরে মাছ মাংস রান্না করলে যদি স্বামীজির খাবার অপবিত্র হয়ে যায়!

নীতিশ আজ অফিসে যায়নি। নিতান্ত অসুস্থ হয়ে না পড়লে নীতিশ কখনও অফিস যাওয়া বন্ধ করে না। ঝড়-বৃষ্টি-ভূমিকম্পও সে অগ্রাহ্য করে। নীতিশের বাবা-মা থাকেন এলাহাবাদে। ওর মামা বাড়ি পাটনা। অর্থাৎ ওরা প্রবাসী বাঙালি। এলাহাবাদ থেকে বাবা এসে কয়েকদিন থেকে যান নীতিশের কাছে। সে উপলক্ষে নীতিশ একবারও অফিস কামাই করেনি! এমনকী হয়তো বাবা আসবার কথা জানিয়ে চিঠি লিখেছেন, সেই সময়ই নীতিশকে ট্যুরে যেতে হবে। নীতিশ চলে যায়, বাবার সঙ্গে দেখাই হয় না।

অনেকদিন দেখা হয় না যে মামার সঙ্গে, নিতান্ত তিনি সন্ন্যাসী বলেই তাঁর সম্মানে নীতিশ আজ বাড়িতে থেকেছে।

মঞ্জুলিও অনেকদিন পর নিজের হাতে লুচি বেলেছে, ভেজেছে। তাদের কাজের লোকটি ব্রাহ্মণ নয়, যদি তার হাতের রান্না স্বামীজি না খান?

পানটা মুখে দেওয়ার একটু পরেই স্বামীজি বুকে চেপে ধরলেন। তার মাথা ঘুরছে, দম যেন বন্ধ হয়ে আসছে। এক শো বিশ জরদার তেজ তিনি সহ্য করতে পারবেন কেন?

নীতিশ বলল, এই রে! মুখ ধুয়ে ফেলুন! জল খান!

কোনও কথা না বলে হাত উঁচু করে স্বামীজি ইঙ্গিত জানালেন, ঠিক আছে, ঠিক আছে!

নীতিশ আর মঞ্জুলি উৎকণ্ঠিতভাবে তাকিয়ে রইল। একটু বাদে স্বামীজি ধাতস্থ হয়ে বললেন, বেশ ভয় পাওয়ারই মতন ব্যাপার। তবে, সহ্য করা যায় ঠিকই। সবই সহ্য করা যায়!

তারপর মঞ্জুলির চোখে চোখ রেখে বললেন, তোমার কীসের দুঃখ?

মঞ্জুলি অবাক হয়ে বলল, আমার? দুঃখ? তার মানে?

স্বামীজি বললেন, তুমি ভেতরে-ভেতরে কীসের যন্ত্রণায় যেন জ্বলছো!

মঞ্জুলি হেসে বলল, কই না তো!

দেখি তোমার হাতটা!

মঞ্জুলি আধুনিক মেয়ে, সে হাত দেখা, ঠিকুজী-কুষ্ঠি, গ্রহ-নক্ষত্রের বিচার কিছুই বিশ্বাস করে না। তবু সে বাড়িয়ে দিল তার হাতটা।

স্বামীজি অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন, তারপর কোনও মন্তব্য না করেই ছেড়ে দিলেন। মঞ্জুলিও

জিগ্যেস করল না কিছু।

নীতিশ বলল, আমার হাতটাও দেখবেন নাকি?

স্বামীজি বললেন, না, তোর সব ঠিক আছে।

নিজের জন্য নির্দিষ্ট ঘরটিতে গিয়ে স্বামীজি বসলেন খাটের ওপর। দুটো চেয়ারে মঞ্জুলি আর নীতিশ। সিগারেট খাওয়ার জন্য নিশপিশ করছে নীতিশের হাত কিন্তু এখন সম্ভব নয়।

তুই সিগারেট খেতে পারিস!

রীতিমতন চমকে উঠল নীতিশ। দ্বিজুমামা কি মানুষের মনের কথা বুঝতে পারেন? সত্যিই এরকম অলৌকিক ক্ষমতা থাকে কারুর?

দে দেখি তোর সিগারেট আমাকে!

আপনি সিগারেট খাবেন?

কল্কেতে গাঁজা খাওয়ার অভ্যেস হয়ে গেছে, তা এখানে আর গাঁজা পাওয়া যাবে কোথায়? তাই একটা সিগারেটই খাই।

মঞ্জুলি বলল, সাধু হলেই কল্কেতে গাঁজা খেতে হয় বুঝি?

স্বামীজি বললেন, পাহাড়ি জায়গা, শীত তো, মন্দ লাগে না। প্রথম-প্রথম আমি খেতাম না। ত্রিযুগীনারায়ণে এক সাধুজি আমায় বললেন, তোর মন চঞ্চল, একটু গাঁজা টেনে দ্যাখ, মন স্থির হবে।

স্বামীজিকে একটা সিগারেট দিয়ে নিজেরটা ধরাল নীতিশ। তারপর মঞ্জুলিকে জিগ্যেস করল, তুমি নেবে?

দু-চোখে ভর্ৎসনা মাখিয়ে মঞ্জুলি দু-দিকে মাথা নাড়ল। তারপরই স্বামীজিকে বললেন, আপনি হঠাৎ একদিন কেন সাধু হয়ে চলে গেলেন, তা আমরা কেউ জানি না। সেই গল্পটা বলবেন? অবশ্য যদি বাধা না থাকে—

স্বামীজি বললেন, গল্প তো কিছু নেই। কোনও আঘাত পেয়ে আমি সংসার ছাড়িনি। কোনও দৈব স্বপ্নও দেখিনি। দীক্ষাও নিইনি কোনও গুরুর কাছে। এমনিই! যখন চাকরিতে ছিলাম, ভীষণ কাজ করতে হত আমাকে। কাজ, কাজ, দিনরাত কাজ, ঠিক যেন পাগলের মতোন অবস্থা। তাই হঠাৎই একদিন ঠিক করলাম, সব ছেড়ে ছুড়ে নির্জন কোনও জায়গায় চলে যাব। যেখানে একটু শান্তি পাওয়া যাবে। আমি শুধু শান্তি চেয়েছি।

মঞ্জুলি জিগ্যেস করলেন, শান্তি পেয়েছেন?

দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে স্বামীজি উদাসীন ভাবে বললেন, হ্যাঁ, পেয়েছি, অদ্ভুত শান্তি। এ শান্তি যেন সমস্ত শরীর আর মন ভরিয়ে দেয়। সারাদিন কোনও দুশ্চিন্তা নেই, আকাশ, নদী, পাহাড় যেদিকেই তাকাই চোখ ভরে যায়।

স্বামীজির কথার মধ্যে অনেকটা বক্তৃতার সুর এসে যাচ্ছে বলে মঞ্জুলি একটা ছোট্ট হাত তুলল।

নীতিশ বলল, আপনি একটু বিশ্রাম নিন।

স্বামীজি বললেন, হ্যাঁ। শুধু আর একটা কথা বলি। কয়েক বছর পাহাড়ে থাকবার পর দেখলুম, শান্তি পাওয়াও একটা অভ্যেসের মতন দাঁড়িয়ে যায়। প্রত্যেকদিন সব কিছুই এক। সেই ভোরবেলা স্নান করা, তারপর জপ, তারপর সারা দিনরাতে একবারও ঈশ্বরের কথা মনে পড়ে না। চোখ বুজে থাকলেও মনে পড়ে না।

নীতিশ আর মঞ্জুলির কেউই ঈশ্বর নিয়ে তেমন মাথা ঘামায় না। ওরা উঠে দাঁড়াল।

স্বামীজি এবার হেসে বললেন, আমি হঠাৎ কলকাতায় এলাম কেন, সে বিষয়ে আমায় কিছু জিগ্যেস করলে না?

নীতিশ বলল, বাঃ, আপনি এমনিই বেড়াতে আসতে পারেন না?

স্বামীজি বললেন, না, বেড়ানো নয়...কিন্তু থাক সে কথাটা এখন বলব না।

নিজেদের ঘরে এসে মঞ্জুলি শাড়িটা খুলে ফেলল। বাড়িতে সে সাধারণত একটা ঢোলা সেজিম তার ওপরে একটা হাউস কোট পরে থাকে। শোওয়ার সময় শাড়ি পরে থাকলে তো তার রীতিমতো অস্বস্তিই হয়। আজ সন্ন্যাসীর প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য সে লাল পাড় সাদা শাড়ি পরেছিল।

নীতিশ বলল, দ্বিজুমামা হঠাৎ কলকাতায় এলেন কেন বলো তো?

সে কথায় সরাসরি উত্তর না দিয়ে মঞ্জুলি বলল, উনি কি আগে হাত দেখতে জানতেন?

ঠিক জানি না। তবে আগে ধর্ম-টর্মর দিকে কোনও ঝোঁক ছিল বলে শুনিনি।

সাধু হলেই কি হাত দেখা শিখে যায়। উনি আমার হাত দেখতে চাইলেন কেন বুঝতে পারলুম না।

বোধহয় তোমার কোনও গোপন কথা জেনে ফেলেছেন।

বিকেলবেলা স্বামীজিকে ঘরে খুঁজে পাওয়া গেল না। ফ্ল্যাটেও নেই। তবে কি ছাদে গেলেন? সন্ধেবেলা নির্জনে জপতপ করা অভ্যেস।

প্রাণতোষ বলল, সাধুবাবা তো বেরিয়ে গেলেন দেখলুম!

স্বামীজি ফিরলেন রাত সাড়ে আটটায়।

নীতিশ ব্যস্ত হয়ে কয়েকবার তাঁর খোঁজাখুঁজি করেছে, পুলিশে খবর দেবে কি না চিন্তা করছিল।

স্বামীজি বললেন, একটু ঘুরে এলাম কলকাতার রাস্তাঘাট দিয়ে। বারো বছর পাহাড়-পর্বতে আছি, মনে হল অভ্যেসটা একটু পালটানো দরকার। একসময় কলকাতার সব রাস্তা চিনতুম, এখন দেখছি, সবই প্রায় ভুলে গেছি। কত নতুন রকম বাড়ি উঠেছে।

নীতিশ বলল, প্রথম দিনটা আপনি একা না বেরুলেই পারতেন। আমি আপনাকে ঘুরিয়ে আনতাম।

স্বামীজি বললেন, না, আমি একাই ঘুরতে চাই। তবে, মনে হল কলকাতার লোক গেরুয়া কাপড় পরা মানুষদের বিশেষ পছন্দ করে না! কী রকম যেন ব্যাঁকা-ব্যাঁকা ভাবে তাকায়। ট্রামে উঠেছি, একজন লোক ইচ্ছে করে পা মাড়িয়ে দিল!

হেসে উঠল মঞ্জুলি।

নীতিশ বলল, বাসে ট্রামে যা ভিড়, কেউ না কেউ পা মাড়িয়ে দেবেই।

মঞ্জুলি বলল, আপনি গলায় একটা গাঁদা ফুলের মালা পরে কয়েকজন ভক্ত-টক্ত সঙ্গে নিয়ে বসুন, দেখবেন, অমনি কত ভিড় হবে। গ্র্যান্ড হোটেলে প্রেস কনফারেন্স করুন, দারুণ বড়লোকেরা এসে আপনার শিষ্য হতে চাইবে। বড়-বড় সাধুরা কলকাতায় ট্রামে-বাসে চাপে না, গাড়ি চড়ে ঘোরে।

নীতিশ বলল, আর একবার যদি রটিয়ে দেওয়া যায়, আপনি হাত দেখে ভূত-ভবিষ্যৎ বিশেষ করে রেস খেলার হার জিৎ আগে থেকে বলে দিতে পারেন, তাহলে তো, আর কথাই নেই!

স্বামীজি মুখ নীচু করে রইলেন। তারপর বললেন, তোর একটা পাঞ্জাবি আর পায়জামা দিস তো, তাই পরে বেরুব!

আপনাদের কি গেরুয়া ছাড়া অন্য পোশাক পরতে আছে?

আমি তো কারুর কাছে দীক্ষা নিইনি। নিজের ইচ্ছেয় সন্ন্যাসী হয়েছি। আমায় যখনই কেউ জিগ্যেস করে, তোমার গুরু কে? আমি হিমালয় পাহাড়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলি, ওই যে আমার গুরু!

নিজের ব্যবহৃত পাজামা-পাঞ্জাবি নয়, পরদিন সকালেই একজোড়া পাজামা আর পাঞ্জাবি কিনে আনল নীতিশ। তার মা মামা বাড়িতেই মানুষ হয়েছেন ছেলেবেলায়, সুতরাং ওঁদের কাছে নীতিশরা ঋণী।

সেই পাজামা-পাঞ্জাবি পরার পরই স্বামীজির চেহারাটা যেন একেবারে বদলে গেল।

মঞ্জুলি বলল, এবার দাড়ি গোঁফ কেটে ফেলুন!

নাঃ! এর ওপর বড্ড মায়া পড়ে গেছে। যখনই মনটা চঞ্চল হয়, তখন দাড়িতে হাত বুলোলে বেশ ভালো লাগে।

নীতিশ বলল, এরকম চুল দাড়িওয়ালা লোক কলকাতায় অনেক আছে। ছেলে-ছোকরারাও তো দাড়ি রাখে এখন। কিন্তু আপনাকে আর সন্ন্যাসী বলে মনেই হচ্ছে না, দ্বিজুমামা বলে ডাকতে ইচ্ছে করছে।

তাই ডাকিস!

একটা কথা বলব, দ্বিজুমামা? কলকাতায় রাস্তায় ঘুরবেন, হাতে কিছু টাকা পয়সা থাকা দরকার। আপনি আমার কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়ে রাখবেন,...ইয়ে ধার হিসেবে।

মঞ্জুলি বলল, ধ্যাৎ কোনও সাধু কখনও টাকা ধারেন নাকি?

স্বামীজি হাসতে লাগলেন।

নীতিশ একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, না, আমি ঠিক সেই হিসেবে বলিনি, মানে এমনিই কিছু টাকা পয়সা সঙ্গে না থাকলে—

স্বামীজি বললেন, এরপর তোরা ভাববি, এ লোকটা আর কতদিন ঘাড়ে চেপে থাকবে? ভয় নেই, বেশীদিন না, আমি শুধু একটা পরীক্ষা করতে এসেছি নিজের সঙ্গে—

মঞ্জুলি বলল, আমায় জিগ্যেস করেছিলেন, আমার কী কষ্ট! এবার আমারই জিগ্যেস করতে ইচ্ছে করছে, আপনার কী কষ্ট!

স্বামীজি এক দৃষ্টে চেয়ে রইলেন মঞ্জুলির দিকে, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, জানি না।

পরমুহূর্তেই মেজাজ পালটে তিনি বললেন, একটা মজার ব্যাপার কি জানিস, নিতু! যখন আমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাই, একেবারে সহায় সম্বলহীন হয়ে যাইনি। এক হাজার টাকা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম, যদি লাগে। সে টাকা খরচ হয়নি, প্রায় সব টাকাটাই আমার কাছে এখনও রয়ে গেছে। আমার পোঁটলার মধ্যে ওই টাকা পড়ে থাকত যেখানে-সেখানে, কেউ নেয়নি।

নীতিশ বলল, কলকাতায় কিন্তু অত টাকা সঙ্গে নিয়ে ঘুরবেন না। পকেটমার হয়ে যেতে পারে।

পাজামা-পাঞ্জাবি পরা স্বামীজি একা-একা কলকাতায় রাস্তায় ঘুরতে লাগলেন। এম.এ. পড়ার সময় দু-বছর ছিলেন কলকাতায়, অনেকদিন আগের কথা, একটু-একটু মনে পড়ে। ময়দানে ফুচকা খাওয়া, গঙ্গার ধারে শুয়ে থাকা। সেইসব জায়গায় ঘুরতে লাগলেন তিনি।

তারপর সেন্ট্রাল এভিনিউ ধরে চলে এলেন বিশেষ একটি পাড়ায়। একবার বন্ধুদের সঙ্গে এখানে এসেছিলেন তিনি, জায়গাটা ঠিক যেন আগের মতোনই আছে।

সেদিন মঞ্জুলির হাতটা ধরার সময় তাঁর শরীরটা ঝনঝন করে উঠেছিল। হাত দেখা তিনি একটু আধটু জানেন। মঞ্জুলির মুখ দেখে মনে হয়েছিল, সত্যিই ওর কিছু একটা চাপা কষ্ট আছে। কিন্তু হাত দেখার ব্যাপারটা অন্য রকম হল। তিনি কররেখা দেখতে পেলেন না, ঝাপসা হয়ে এসেছিল তাঁর চোখ। ঠিক বারো বছর পর তিনি কোনও রমণীকে স্পর্শ করলেন। ভেবেছিলেন সারা জীবনই নারী সংসর্গ থেকে দূরে থাকবেন। কোনওদিন এজন্য অভাব বোধও ছিল না। তাহলে কেন এমন হল? এটা একবার ভালো করে যাচাই করে দেখা দরকার।

অন্তত পঁচিশ বছর আগে বন্ধুদের সঙ্গে তিনি যে বাড়িটায় গিয়েছিলেন, ঠিক সেই বাড়িটার সামনে গিয়েই দাঁড়ালেন। দোতলার ডান দিকের কোণের ঘর, তাঁর ঠিক মনে আছে।

আবছা আলোয়, ক্ষয়ে যাওয়া সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলেন দোতলায়। আশা করেছিলেন যেন সেই মেয়েটিকেই দেখবেন। একই চেহারায়। কিন্তু পঁচিশ বছর কেটে গেছে, অন্য একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে

আছে দরজার কাছে, একটু বেশি জমকালো পোশাক। স্বামীজিকে আপাদমস্তক দেখে সে হিন্দিতে কথা বলতে শুরু করল।

স্বামীজি হিন্দি জানেন বাংলার চেয়েও ভালো। মেয়েটি তাঁকে পাঞ্জাবি ভেবেছে বোধহয়। তিনি বাংলায় বললেন, আসতে পারি?

মেয়েটি দরজা থেকে ভেতরে সরে গিয়ে বলল, এসো! এক ঘণ্টা বত্রিশ টাকা, আর যদি সারা রাত থাকতে চাও—

স্বামীজি ভেতরে এসে মেয়েটির বিছানার ওপর বসে বললেন, তোমার হাতটা দাও!

তিনি হাতটা ধরলেন, কিন্তু তাঁর শরীর কাঁপল না। সেই রকম চোখ ঝাপসা হয়ে এল না।

মেয়েটি বলল, আলো নিভিয়ে দেব, না আলো জ্বালা থাকবে? টাকাটা আগে দেবে?

শাড়িটা খুলে ফেলার ব্যাপারে অবশ্য সে অনুমতি নিল না।

স্বামীজি পূর্ণ দৃষ্টি মেলে তাকালেন তার দিকে। তারপর একবার চোখ বুজলেন। তিনি দেখলেন, চূড়ায় বরফের ওপর রোদ পড়েছে। বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছে বন। নদীর স্রোতের গর্জন শুনতে পাচ্ছেন।

তিনি আবার দেখলেন মেয়েটিকে। আবার চোখ বুজলেন। সেই একই দৃশ্য। তিনি গঙ্গায় স্নান সেরে উঠে আসছেন, চারপাশে সব চেনা লোক। সেই পাহাড়, সেই বন।

তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, সবই অভ্যেস।

সেই মুহূর্তেই বুঝে গেলেন, তাঁর আর ফেরা হবে না।



স্বর্ণলতা

ডাক্তারের বলার ইচ্ছে ছিল, মহিলাটি আপনার কে হন, কিন্তু চারদিকে কৌতূহলের দৃষ্টিতে তাকাতে-তাকাতে মুখে বললেন, দেখুন অ্যাক্সিডেন্টের ব্যাপারটা একটু খুলে বলুন।

সিঁড়ি দিয়ে নামছিলেন দুজনে, সেকেলে ধরনের চওড়া কাঠের সিঁড়ি, প্রতি পদক্ষেপে বেশ শব্দ হচ্ছিল। বাড়িটা বেশ বড়ই, কিন্তু ঘরগুলো সব ফাঁকা, লোকজন নেই বলেই মনে হয়। কথা বলতে-বলতে ভালো করে তাকালেন ছেলেটির দিকে—বয়েস তেইশ-চব্বিশ, জোয়ান ঘোড়ার মতো স্বাস্থ্য, গায়ের রংটা ঝরনার জলের মতো পরিষ্কার। থুতনির ঠিক নীচে অনেক কালের একটা পুরোনো কাটা দাগ—হাসলে ছেলেটিকে ভারী সুন্দর দেখায়।

প্রিয়ব্রত একটু গম্ভীর চোখে তাকাল। কোনও ভয়ের কারণ আছে কি না স্পষ্ট করে বলুন ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার হাসলেন। ইয়ংম্যান, এরকম বিচলিত হয়ে পড়ছেন কেন?

ততক্ষণে পৌঁছে গেছেন নীচে, প্রিয়ব্রত বলল, আপনি হয়তো হাসবেন শুনলে, অ্যাক্সিডেন্ট সম্বন্ধে আমাদের বংশে একটা কুসংস্কার আছে। আমাদের বাড়ির প্রায় সকলেই দুর্ঘটনায় মারা গেছেন।

হঠাৎ ডাক্তার প্রায় অবান্তরভাবে জিগ্যেস করলেন, ভদ্রমহিলা আপনার কে হন?

বউদি, আমার মা-ও বলতে পারেন। আমার বয়েস যখন ন'বছর তখন আমার মা মারা যান, তখন থেকেই বউদি আমাকে মানুষ করেছেন।

আপনার দাদা কি...

হ্যাঁ, আমার দাদা বেঁচে নেই। আপনার মনে আছে কি উনশশো ছেচল্লিশ সালে মাদ্রাজে সেই যে ব্রিজ ভেঙে একটা ট্রেনের দুটো কম্পার্টমেন্ট নদীতে পড়ে যায়? সাড়ে ছ'শো লোক মরেছিল—দাদা ছিল তার মধ্যে। মাত্র কয়েক বছর আগে দাদার বিয়ে হয়েছিল। আমার মায়ের মৃত্যু হয়েছিল দুর্ঘটনায়। গরম ফ্যান গেলে ভরতি ফ্যান একটা গামলায় করে নিয়ে যাচ্ছিলেন, এক ফোঁটা পড়েছিল মাটিতে, তার ওপর পা পড়ে পিছলে পড়লেন। গরম ফ্যান গায়ে উলটে পড়ল। সারা গায়ে শেষে এমন ঘা হয়েছিল যে মা শুতে বসতে পারতেন না। যন্ত্রণা দেখে শেষে আমরা মায়ের মৃত্যুই কামনা করতুম।

প্রিয়ব্রত উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল, ডাক্তার বললেন, থাক-থাক। এ-বাড়িতে আপনারা কতদিন এসেছেন?

বছর দুয়েক। আমরা বহুদিন থেকে বাংলাদেশ ছাড়া। আমরা প্রায় মাদ্রাজি হয়ে গিয়েছিলাম। বাবা ওখানে চাকরি করতেন। আমাদের জন্ম মাদ্রাজে লেখাপড়াও শিখেছি ওখানে। এ-বাড়িতে শুধু আমি, বউদি আর এক বুড়ি পিসিমা। বাবা মারা গেছেন গত এপ্রিলে, আশ্চর্য মৃত্যু। বাবা বুড়ো হলেও বেশ সুস্থ সমর্থ মানুষ। বাথরুমে পা পিছলে পড়ে গেলেন, সঙ্গে-সঙ্গে হার্টফেল। ডাক্তারবাবু, বউদি কি...

না, কোনও ভয় নেই, আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি। দুর্ঘটনাটা কী করে হল বলুন তো?

প্রিয়ব্রত মুখ নীচু করে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর একটু লাজুক ধরনের হেসে বলল, ব্যাপারটা শুনলে হয়তো আপনি হাসবেন। দুর্ঘটনার জন্য আমিই দায়ী। বউদি আমাকে ছেলেবেলা থেকে মানুষ করেছেন, বউদি আমার মায়ের মতো, বন্ধুরও মতো। বউদির সঙ্গে মাঝে-মাঝে খুব ঠাট্টা-ইয়ার্কি করি। আজ অফিস থেকে ফিরেছি বিকেলে, বউদি তখন সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছিলেন। আমি ভয় দেখাবার জন্য গলাটা গম্ভীর করে ডাকলুম, স্বর্ণ! স্বর্ণ!—বউদি চমকে ফিরে আমাকে দেখতে পেলেন, তারপর কী জানি কেন—অজ্ঞান হওয়ার মতো ঢলে পড়ে গেলেন। আমি ছুটে এসে ধরবার আগে ছ-সাতটা সিঁড়ি গড়িয়ে এসেছেন।

ডাক্তারবাবু মুখ লুকিয়ে হাসলেন। খুব ভয় দেখিয়েছেন যা হোক। কোনওদিন কি ফিটের অসুখ ছিল?

না, কোনওদিন না। প্রিয়ব্রত বলল।

থাক গে, এমন কিছু নয়। কোনও ফ্র্যাকচার হয়নি বলেই মনে হচ্ছে। অয়েন্টমেন্ট যেটা লিখে দিয়েছি ভালো কার লাগান আর ট্যাবলেটগুলো রোজ দুটো করে খাওয়াবেন। নড়াচড়া বন্ধ। পরশুদিন আমাকে খবর দেবেন।

স্বর্ণলতা ঘুমিয়ে আছেন। অন্তত তাই মনে হয়। শাড়ির পায়ের দিকটা অনেকখানি ভিজে—প্রথমে ডাক্তারকে না পেয়ে প্রিয়ব্রত অনেকটা বরফ এনে চাপিয়ে দিয়েছিল।

স্বর্ণলতাকে দেখলে বয়েস বুঝতে পারা যায় না, মনে হয় ভরাস্বাস্থ্য যুবতী, জ্যৈষ্ঠ মাসের বিকেলের মতো উজ্জ্বল হলুদ গায়ের রঙ। শুধু সাদা শাড়ি আর সিঁদুরহীন সিঁথির জন্য একটা নির্জন গাম্ভীর্য এসেছে।

প্রিয়ব্রতর বাবা স্বর্ণলতাকে একটা অদ্ভুত কথা বলেছিলেন। ছেলে মারা যাওয়ার বছর দেড়েক পর তিনি বলেছিলেন, ইচ্ছা করলে স্বর্ণলতা আবার বিয়ে করতে পারে। ওইটুকু মেয়ে, অমন রূপ, কেন শুকনো হয়ে পড়ে থাকবে! স্বর্ণলতা খুব সুন্দর উত্তর দিয়েছিলেন, বলেছিলেন, আপনার ছেলে ছাড়া যদি আর কারুর সঙ্গে আমার বিয়ে হত, তবে সেই স্বামীর মৃত্যুর পর হয়তো আবার বিয়ের কথা ভাবতুম। কিন্তু শুভব্রতকে যে একবার দেখেছে সে আর অন্য কারুর কথা ভাবতে পারে না। প্রিয়ব্রতর দাদাকে ভালোবেসে বাড়ির সকলের অমতে বিয়ে করেছিলেন স্বর্ণলতা। এ নিয়ে মাদ্রাজের বাঙালিপাড়ায় বেশ শোরগোল পড়ে গিয়েছিল।

প্রিয়ব্রত আস্তে দরজা খুলে দাঁড়াল। তার মুখে লজ্জা আর ক্ষোভের ছায়া দুলছে। খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর চলে যাচ্ছিল, স্বর্ণলতা ডাকলেন, টুনু শোন।

তোমার যন্ত্রণা কমেছে?

না, তুই আমার পাশে এসে বোস। স্বর্ণলতা অনেকক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন প্রিয়ব্রতর দিকে। তারপর একটু হেসে ম্লান গলায় বললেন, তুই এমন চমকে দিয়েছিলি...

বাঃ, তুমি এরকম করবে কী করে জানব!

স্বর্ণলতা একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। চোখের কোণ দুটো চিকচিক করে উঠল। বললেন, তুই কবে বড় হয়ে উঠেছিস লক্ষ্যই করিনি, টুনু। অনেক বড় হয়ে গেছিস।

কি কান্ডই বাধালে তুমি, ডাক্তারকে ব্যাপারটা বলতে আমার এত লজ্জা করছিল! যে শুনবে সে আমাকেই দোষ দেবে। আমার সবচেয়ে অবাক লাগছে একটা ব্যাপার। হঠাৎ পিছন থেকে ডাকলে চমকে কেউ পড়ে যেতে পারে। কিন্তু তোমাকে দেখলুম আমার ডাক শুনে হাসি-হাসি মুখে ফিরে তাকিয়ে আমার দিকে ঝাপসা চোখে পুরো একমিনিট তাকিয়ে রইল, তারপর হঠাৎ দেখি তুমি গড়িয়ে পড়ছ! আমাকে দেখতে পাওয়ার পরও কি হল তোমার?

না, তোকে দেখতে পাইনি। আমি ভূত দেখেছিলাম। স্বর্ণলতার কণ্ঠস্বর শূন্য ঘরে প্রতিধ্বনির মতো শোনাল।

ও, আমার চেহারা বুঝি ভূতের মতো হচ্ছে আজকাল? লঘুভাবে প্রিয়ব্রত বলল।

হ্যাঁ, হচ্ছেই তো! স্বর্ণলতা একটু হেসে বললেন, দেখ টুনু, তোকে রোজ দেখছি তাই বুঝতে পারিনি এতদিন তুই আর সেই দশ বছরের ছেলেটি নেই! তুই রেগে এককেবারে হুবহু তোর দাদার মতো দেখতে হয়েছিস। তুই যেভাবে ডেকেছিলি, রেগে গেলে তোর দাদাও ঠিক ওইরকমভাবে ডাকত। শুনে আমি চমকে উঠেছিলাম, তাই আমার মনে হল, তবে কি শুভো বারো বছর পর আবার আমার কাছে ফিরে এসেছে? তারপরই আমার চোখ ঝাপসা হয়ে এল, মাথাটা ঘুরে গেল।

অস্বস্তির ভাবটা কাটাবার জন্য প্রিয়ব্রত বলল, এইবার বুঝি কান্নাকাটি শুরু করবে!

যা, যা, স্বর্ণলতা হেসে উঠলেন, তোকে আর ফক্কুড়ি করতে হবে না। ডাক্তার কী বলল, পা-টা ভেঙেছে নাকি? দেখতে-দেখতে বাঁ-পায়ের গোড়ালিটায় যে ভীষণ ব্যথা হয়ে উঠল রে!

শোনো, এখন সাতদিন তুমি চুপ করে শুয়ে থাকবে বিছানায়। নড়াচড়া একেবারে বারণ। তোমার জন্য একটা নার্স ঠিক করতে হবে ক'দিনের রজন্য।

নার্স? নার্স কী হবে?

তোমার কাজগুলো দেখাশুনো...

চুপ কর। তুই আছিস কী করতে। না, না, ওসব নার্সটার্স বাড়িতে ঢোকাবি না বলে দিলাম। অর্জুনকে বল চা দিতে।

রাত্রি দশটা। প্রিয়ব্রত স্বর্ণলতার বাঁ-পায়ের গোড়ালিতে আস্তে-আস্তে মলম মালিস করে দিচ্ছে। নরম সুন্দর পায়ের পাতা স্বর্ণলতার, তাঁকে চিঠিতে 'শ্রীচরণকমলেষু' কথাটা সার্থকভাবেই লেখা যায়। প্রত্যেকটি আঙুল সুললিত, নখের ভিতর দিয়ে রক্তের আভা ফুটে বেরুচ্ছে, কোথাও একছিটে ময়লা নেই। মায়ের কথা মনে পড়ছে প্রিয়ব্রতর। মায়ের চেহারা ভালো করে মনে পড়ে না, কোনওদিন মায়ের পায়ে এমনভাবে হাত বুলিয়ে দেয়নি।

স্বর্ণলতা এক দৃষ্টিতে দেখছেন প্রিয়ব্রতকে। তাঁর সারা শরীর শিরশির করছে। ঘাড়ের পাশ দিয়ে দেখলে কে বলবে, ও শুভব্রত নয়! একদিন সামান্য সর্দিজ্বর হয়েছিল তাঁর, শুভব্রত খাটের পাশে হাঁটুমুড়ে ঠিক এমনিভাবে বসেছিল, মনে হয় যেন এই সেদিন। তবে শুভব্রত টুনুর মতো শান্ত ছিল না, সে ছিল জলপ্রপাতের মতো তীব্র আবেগপ্রবণ। দুজনে যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটত, শুভর ব্যবহারের জন্য সমস্ত শহরের লোক তাকিয়ে থাকত ওদের দিকে। মনে হয় যেন এই সেদিন, কিন্তু

কতদিন অনেক দিন।

স্বর্ণলতা ডাকলেন, টুনু শোন। থাক, তোকে আর সেবা করতে হবে না। এদিকে এসে বস্। প্রিয়ব্রত তোয়ালেতে হাত মুছতে-মুছতে উঠে এসে চেয়ারে বসল। এখন একটু ভালো লাগছে?

হ্যাঁ। কিন্তু সারা শরীরটায় ক্রমে-ক্রমে ব্যথা হয়ে আসছে। কতদিন শুয়ে থাকতে হবে কে জানে!

না হয় থাকলেই, বেশ শুয়ে-শুয়ে গল্পের বই পড়বে। আমি কয়েকদিনের ছুটে নিচ্ছি। গল্প করব দুজনে সারাদিন।

স্বর্ণলতা কোনও কথা বললেন না। আজ অনেকদিন বাদে কেমন যেন বারেবারে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছেন।

প্রিয়ব্রত উঠে গিয়ে দেয়ালের একটা কাত হয়ে থাকা ছবিকে সোজা করে দিল। দাদার চেহারা আমার চেয়ে অনেক ভালো ছিল। আচ্ছা বউদি, দাদার সঙ্গে তোমার কী করে আলাপ হয়েছিল প্রথমে?

স্বর্ণলতা তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন ওর দিকে। ও কী বুঝতে পেরেছে যে আজ সারাদিন আমি ওর দাদার কথাই ভাবছি। না, সরল মুখ প্রিয়ব্রত। নরম গলায় জিগ্যেস করলেন, তুই খুব ভয় পেয়েছিলি, না? যদি আমি মরে যেতাম! এবার তোর একটা বিয়ে দিতে হবে টুনু। আমি আর থাকতে পারি না, বড় একা একা লাগে রে।

দাদার মৃত্যুর খবর শুনে বউদি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল, প্রিয়ব্রতর আজও মনে আছে। সেদিন ওরা মীনাক্ষীদেবীর মন্দির দেখতে যাবে ঠিক করেছিল। টিফিন কেরিয়ারে খাবার-দাবার ভরে রেডি হয়েছিল। বাবা এলেন স্টেশন থেকে। বাগানের দরজা দিয়ে ঢুকতে-ঢুকতে একবার সারা বাড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন। দোতলায় দাদার ঘরের দিকে একবার তাকালেন। তারপর নীচু হয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে বাগানের দরজাটা বন্ধ করে ভিতরে এলেন, খুব আস্তে বললেন, আজ বেড়াতে যাওয়া হবে না। স্পষ্ট মনে পড়ে সেই দিনটা। বউদির ছিল সবচেয়ে বেশী উৎসাহ বেড়াতে যাওয়ার জন্যে। একটা ফুল-ফুল ছাপ দেওয়া সিল্কের শাড়ি পরেছিলেন বউদি। ছুটতে-ছুটতে এসে জিগ্যেস করলেন, কেন কী হয়েছে বাবা, রামস্বামীর সঙ্গে বুঝি দাবা খেলতে বসবেন? আজকে একটা দিন...

বাবা সোজা চোখ তুলে তাকালেন বউদির দিকে। একটুও না কেঁপে বললেন, শুভো মারা গেছে, শুভো বেঁচে নেই। এইমাত্র খবর পেলাম স্টেশনে, আমাদের শুভো মারা গেছে। স্বর্ণ, শুনতে পাচ্ছো, শুভো বেঁচে নেই। শুভো শুভো...

কী ভাবছিস টুনু, স্বর্ণলতা ওকে একা ছোট্ট ধাক্কা দিয়ে বললেন, অনেক রাত হল, এবার শুতে যা।

টুনু, টুনু!

কে যেন ডাকছে, একবার মনে হল সে যেন স্বপ্ন দেখছে। স্বপ্নে কণ্ঠস্বরের মতো অস্পষ্ট, নরম।

টুনু, টুনু!

কার ডাক কোথা থেকে আসছে প্রিয়ব্রত মধ্যরাত্রে ঘুম থেকে উঠে কিছুই বুঝতে পারছিল না। পাশের ঘর থেকে পিসিমা বললেন, ও টুনু ওঠ, তোর বউদি তোকে ডাকছে দেখ। পিসিমার বাতের অসুখ, নিজে উঠতে পারেন না। প্রিয়ব্রত হাতের উলটো পিঠ দিয়ে চোখ দুটো একবার মুছে বাইরে এল, বারান্দা পেরিয়ে বউদির ঘরে ঢুকে আলো জ্বালল। স্বর্ণলতা ঘরে নেই। ডানদিকে বাথরুমের দরজাটা ফাঁক করে খোলা, সেখান থেকে একটা গোঙানির শব্দ আসছে। স্বর্ণলতা হাঁটু দুমড়ে মেঝেতে উপুড় হয়ে পড়ে আছেন। প্রিয়ব্রত আজ পর্যন্ত বউদিকে কোনওদিনও কাঁদতে দেখেনি। যখন দাদা মারা যান তখনও বউদি একেবারে ভেঙে পড়েননি। যেন দাদার ওপর অভিমানেই একটা ছুরির

মতো অনমনীয়, তীক্ষ্ণ হয়েছিলেন। সেই স্বর্ণলতা আজ তার হাতের তালুতে মুখ রেখে কাঁদছেন। টুনু আমার কী হল, তোর পিসির মতো আমিও কি একেবারে অথর্ব হয়ে গেলুম! হাঁটুতে একদম জোর পাচ্ছি না, দাঁড়াতে পারলুম না এসে! আঃ লাগে রে লাগে, আঃ আস্তে...প্রিয়ব্রত স্বর্ণলতাকে দুই বলিষ্ঠ বাহু দিয়ে তুলে নিয়েছে, থুতনি দিয়ে দরজা ফাঁক করে তাঁকে এনে বিছানায় শুইয়ে দিল।

কে তোমায় সর্দারি করে একা আসতে বলেছে! আমি কালই নার্স আনব।

স্বর্ণলতা বড়-বড় নিশ্বাস নিচ্ছেন। তাঁর বেশবাস বিস্রস্ত। প্রিয়ব্রত তাঁর শায়ার দড়িটা টেনে বেঁধে দিল। কাপড়টা মোটামুটি একটু গুছিয়ে দিল ঠিক করে। তুমি ঘুমোও, বউদি, আমি তোমার পাশে বসে আছি। কিছু ভয় নেই, ডাক্তার খুব জোর দিয়ে বলছে। আর তুমি যদি এরকম কর, তবে যে আমার ভীষণ লজ্জা করে আমার ছেলেমানুষির জন্যই তো এরকম হল।

না, তুই না, তোর কোনও দোষ নেই, এর জন্য দায়ী অন্য একজন।

প্রিয়ব্রত স্বর্ণলতার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। আঙুলগুলো কপালের উপর দিয়ে ঘুরে কানের পাশ দিয়ে যখন নামছে, তখন চোখের জলে তার আঙুল ভিজে যাচ্ছে। স্বর্ণলতা একটুক্ষণ বাদে প্রিয়ব্রতর হাতখানা মুঠো করে ধরে রইলেন। একটু সামলে নিয়ে বললেন, এবার তোর একটা বিয়ে দিতে হবে, টুনু। বেশ ছোট্টখাট্টো একটা বউ আনব, দুই সখীতে মিলেমিশে থাকব। তোর হাতটা ঠিক তোর দাদার মতো—সেইরকম লম্বা-লম্বা পরিষ্কার আঙুল, তালুর উলটো পিঠে কালো রোম ঠিক এইরকম...

ওদের পরিবারে দুর্ঘটনা সম্পর্কে কুসংস্কার ছিল—আশ্চর্য, স্বর্ণলতাও সহজে সারল না। পায়ে কোনও ফ্র্যাকচার হয়নি, প্লাস্টার করতে হল না, কিন্তু হাঁটু আর গোড়ালিতে ব্যথা হয়ে রইল। স্বর্ণলতা একেবারে শয্যাশায়ী হয়েই রইলেন। তাছাড়া তার তলপেটেও ভীষণ ব্যথা হতে লাগল, মাঝে-মাঝে পেটের মধ্যে মুচড়ে উঠে তাঁর সমস্ত আত্মাটাকেই যেন সেখানে বন্দি করতে চায়। ডাক্তার আসতে লাগলেন রোজ। প্রিয়ব্রত ভীষণ বিপদে পড়ল। কলকাতায় তাদের আত্মীয়স্বজন তেমন কেউ নেই। স্বর্ণলতা কিছুতেই নার্স রাখতে রাজি হলেন না, সমস্ত দেখাশুনো তাকে একাই করতে হয়। সে চাকরি করে একটা বিলেতি ফার্মে। তাকে লম্বা ছুটি নিতে হল!

মাঝে-মাঝে শুধু চেতলার সদানন্দ কাকার বাড়ি থেকে সকলে আসে। সদানন্দবাবু রিটায়ার্ড হেডমাস্টার, প্রিয়ব্রতর বাবার বাল্যবন্ধু। প্রায় বছর কুড়ি বাদে একদিন কলকাতায় একটা সিনেমা হলে দেখা হতেই দুই বন্ধু পরস্পরকে চিনতে পেরেছিলেন।

সদানন্দবাবু বললেন, শোনো টুনু, বউদিকে দার্জিলিঙ কিংবা পুরী এরকম কোনও জায়গা থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে এসো। কলকাতা ওর বোধহয় ঠিক সুট করছে না। গতবারেও তো দেখলুম, সর্দিজ্বরে খুব ভুগল। আর তা ছাড়া ওর দেখাশুনো করবার জন্য একজন নার্সটার্স রাখো—তুমি বড় হয়েছ পুরুষ-মানুষ, তুমি কি আর সবরকম করতে পারবে! না হয় স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনে কিছুদিন...। প্রিয়ব্রত খুব অস্বস্তি বোধ করল, সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, আপনি একটু বুঝিয়ে বলুন না, কাকাবাবু। বউদি যদি আমার কোনও কথা শোনেন।

সদানন্দবাবু স্বর্ণলতাকেও বলেছিলেন একথা। স্বর্ণলতা অত্যন্ত কঠিন চরিত্রের মেয়ে। হেসে বললেন, না কাকাবাবু, নার্সটার্স আমি দু-চক্ষে দেখতে পারি না। আর হাসপাতালে গেলে আমি মরেই যাব। তার চেয়ে, মরি যদি টুনুর হাতেই মরব! বলে, এমন চমকপ্রদভাবে হেসে উঠলেন, যে সকলকেই হাসতে হল।

সদানন্দবাবুর মেজো মেয়ে নীলিমা বলল, টুনুদা, আপনি তো এখন বাড়িতেই থাকবেন। আমি দুপুরের দিকে কেমিস্ট্রি আর বায়োলজিটা দেখে নিতে আসব?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, কেন আসবি না? সদানন্দবাবু হুড়োহুড়ি করে বললেন, তোর পড়াশুনোও হবে। আর ওদের একা-একা লাগবে না।

অথচ ওদের তো কখনও একা লাগে না, কখনও সময় বিরক্তিকর রকম অচল লাগে না। বউদি যে ওর বন্ধু একথা প্রিয়ব্রত কাউকে বোঝাতে পারবে না। সারাক্ষণ দুজনে বসে গল্প করে! মধুর স্মৃতির গল্প। কখনও-কখনও দাবা খেলে দুজনে। স্বর্ণলতাকে দাবায় হারানো খুব শক্ত, তবু দু-একবার যদি প্রিয়ব্রত তাঁকে মাত করে দেয়, স্বর্ণলতা হাত দিয়ে সমস্ত গুটি এলোমেলো করে হেসে উঠে বলেন, দাবায় আমাকে হারাতে পারবি; কিন্তু ব্যাডমিন্টনে কিছুতেই পারবি না। ওখানে থাকতে তোর দাদা আর আমি মিক্সড্ ডব্‌লস-এর চ্যাম্পিয়ান ছিলুম, একবার খেলতে গিয়েছিলুম ওয়ালটেয়ারে, সেটা নভেম্বর মাসে...তখন ওয়ালটেয়ারের গল্প হয়।

সন্ধেবেলা একটা কালো রঙের মলম স্বর্ণলতার হাঁটুতে প্রিয়ব্রত মালিশ করে দেয়। ধবধবে ফরসা পা স্বর্ণলতার, তার ওপর কালো সাপের মতো রেখা পড়ে। প্রিয়ব্রত হাটতা যতবার ওঠায়, ততবার স্বর্ণলতার গা শিরশির করে। যন্ত্রণায় নয়, ভালো লাগায় নয়, অন্যরকম লাগে। একটু বাদে বলে ওঠেন এক-একদিন, আর না, শুভো আর পারি না। প্রিয়ব্রত তাড়াতাড়ি হাত তুলে নিয়ে বলে, আমি শুভ নয়, প্রিয়ব্রত। আজকাল তোমার বারে-বারে ভুল হচ্ছে।

নীলিমা প্রত্যেকদিন দুপুরবেলা আসে। নীলিমা মেয়েটি যেমন কলেজের মেয়েরা হয়, ছিমছাম চেহারা, সপ্রতিভ কথাবার্তা। কথা বলতে-বলতে আঁচল দিয়ে বাঁ হাতটা জড়ায় আবার খুলে ফেলে। পড়ার মধ্যে বলে ওঠে, কেন ছাই মরতে সায়ান্স নিয়েছিলাম। ফিজিক্স কেমিস্ট্রি মোটেই ভালো লাগে না। তার চেয়ে এই কবিতাটা একটু বুঝিয়ে দিন।

মাঝে মাঝে স্বর্ণলতা ডেকে পাঠান প্রিয়ব্রতকে। হয়তো বলেন, ঘুম আসে না দুপুরবেলা কিছুতেই। মাথার কাছের জানালাটা একটু বন্ধ করে দিয়ে যা তো। কোনওবার হয়তো, সেই বইটা কোথায় রেখেছিস, যেটা সকালবেলা পড়ছিলাম। তারপর হেসে বলেন, দেখিস বেশি পড়িয়ে যেন মেয়েটাকে আবার দিগ্‌গজ করিয়ে দিসনি।

প্রিয়ব্রত একদিন নীলিমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এল। শীতের ক্ষীণ বিকেল, তখনই আলো নিভে আসছে। নীলিমা মেয়েটি বড় ছটফটে, রাস্তায় যেতে-যেতে অনর্গল কথা বলে, লোকে পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তার দিকে ফিরে-ফিরে তাকায়। প্রিয়ব্রত স্বভাবত শান্ত, গম্ভীর পা ফেলে, কৌতুকের সঙ্গে নীলিমার কথা শুনতে-শুনতে হেঁটে চলে।

দুপুরটা আজকাল ভীষণ অসহ্য মনে হয় স্বর্ণলতার। প্রিয়ব্রত কাল থেকে অফিসে যাচ্ছে। আয়নায় নিজের মুখ দেখছিলেন, কেমন যেন কর্কশ হয়ে গিয়েছে তাঁর চেহারা। স্বাস্থ্য যে খুব খারাপ হয়েছে তা নয়, চোখ থেকে দৃষ্টির চিক্কনতাই কেমন যেন কমে গেছে। নিজেকে এমন অসহায়, নির্জন এর আগে আর কখনও মনে হয়নি। জানলা দিয়ে রোদ আসে ঠিক তাঁর শিয়রে, একটু পরেই রোদটা বিরক্তিকর লাগে, কিন্তু জানালাটা উঠে বন্ধ করতে ইচ্ছে করে না। একটা হলুদ রঙের পতঙ্গ বোঁ-বোঁ শব্দ করে সারা ঘরে ঘুরতে থাকে। সেই একঘেয়ে শব্দটা একটু বাদেই ক্লান্ত করে দেয়। পাশের বাড়ির ছোট ছেলেটি একটি পয়সা হারিয়ে সারা দুপুর ধরে একঘেয়ে ভাবে কাঁদছে—স্বর্ণলতা বহুক্ষণ মনোযোগ দিয়ে কান্না শুনলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হল, যে-জীবন রোদ্দুরে, পতঙ্গের ডানায়, এই পাশের বাড়িটির শিশুর চিৎকারে—একে তিনি কিছুতেই স্পর্শ করতে পারছেন না। অথচ এসব শুধু তাঁর অসুখের জন্যই নয়, একথা স্বর্ণলতা জানেন। এ অসুখ সারবেই কিছুদিনের মধ্যে—স্বর্ণলতা শরীর দিয়ে বুঝতে পারছেন। কিন্তু তবু তাঁর মনে হয়, সকলে মিলে তাঁকে যেন আস্তে-আস্তে নির্বাসন দিচ্ছে, দুঃসহ একাকিত্বের অন্ধকারে। এই জুলাইতে তাঁর বয়েস হল বত্রিশ, এখনও সামনে দীর্ঘ জীবন, অথচ তাঁর সমস্ত স্বপ্ন সম্পদ পড়ে রইল গোদাবরীর অন্য পারে যেখানে শুভো ডুবে মরেছে। স্বর্ণলতা একা ঘরে আপন মনে কাতরে ওঠেন, আমি তো বারণ করেছিলাম শুভোকে, আমি যেতে বারণ করেছিলাম।

এই সময় তাঁর তলপেট ব্যথা করে। অসহ্য অবর্ণনীয় ব্যথা। ভূমিকম্পে ধরিত্রী যেমন যন্ত্রণায়

অভিভূত হয়, স্বর্ণলতাও সেইরকম ব্যথায় মুষড়ে পড়েন। বালিশের তলা থেকে ট্যাবলেটটা বের করে পর্যন্ত খাবার সামর্থ্য থাকে না। চোখ জ্বালা করে জল আসে।

অফিস থেকে ফেরবার পথে ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করে এসেছে প্রিয়ব্রত। বলল বউদি, ডাক্তারবাবু বললেন, এখন থেকে রোজ তোমাকে একটু-একটু হাঁটা অভ্যেস করতে হবে। এবার তুমি শিগগিরই সেরে উঠবে। স্বর্ণলতা মেয়ের মতো খুশি হয়ে উঠলেন। বললেন, চল আজ থেকেই অভ্যেস করি। এরকমভাবে শুয়ে থাকলে আমি এমনিতেই মরে যাব।

চল, একটু বারান্দায় বেড়িয়ে আসি। তোমার কাপড়টা ঠিক করে নাও।

না বারান্দায় নয়, ছাদে। তুই একটু ধরলে আমি ঠিক উঠতে পারব! প্রিয়ব্রতকে ধরে-ধরে স্বর্ণলতা ছাদে উঠলেন। শীতের পরিষ্কার নীল আকাশের দিকে পুরো চোখ মেলে তাকালেন। বহুদিন পরে অনেকখানি আকাশের নীচে দাঁড়ালেন, বহুদিন পর অনেক বাতাসের মধ্যে। অনেকদিন স্বর্ণলতাকে এমন চঞ্চল দেখা যায়নি। প্রিয়ব্রত একহাতে স্বর্ণলতাকে বেষ্টন করে রইল, স্বর্ণলতা একহাতে প্রিয়ব্রতর কাঁধে হাত দিয়ে রইলেন, তারপর খুব আস্তে-আস্তে দুজনে সমানভাবে পা ফেলে ছাদের এদিক-ওদিক করতে লাগলেন।

জানিস টুনু, আজ তোর দাদাকে স্বপ্ন দেখলাম।

প্রিয়ব্রত এই প্রসঙ্গটি সবচেয়ে বেশি ভয় করে। সেজন্য কথা ফেরাবার জন্য বলল, অফিস থেকে অনেককে দিল্লি বোম্বাই ম্যাড্রাস পাঠাচ্ছে। তোমার যদি ইচ্ছা করে, তবে আবার আমরা ম্যাড্রাস চলে যাই।

স্বর্ণলতা বললেন, না, ও পোড়ার দেশে আর না। হ্যাঁ রে, ভোরের স্বপ্ন তো সত্যি হয় রে? স্বপ্ন দেখলাম তোর দাদা বেঁচে আছে।

চলো, নীচে যাই, তোমার ঠান্ডা লাগবে।

শোন, দেখলুম গোদাবরীর জলে তোর দাদা সাঁতার দিয়ে ভাসছে। কীরকম ভালো সাঁতারু ছিল জানিস না তো। ও জলে ডুবে মরবে, একথা আমার বিশ্বাস হয় না।

কথা বলতে-বলতে উত্তেজনায় স্বর্ণলতা দাঁড়িয়ে পড়েছেন। চাঁদের আলো অন্ধকারকে একটা স্নিগ্ধ জ্যোতি দিয়েছে। প্রিয়ব্রত অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। স্বর্ণলতা দুই হাতে তার গলা জড়িয়ে সামনাসামনি তাকিয়ে আচ্ছন্ন গলায় বললেন, কী রকম অদ্ভুত স্বপ্ন! আমি নদীর একধারে দাঁড়িয়ে আছি, ট্রেন ভেঙে-ভেঙে কম্পার্টমেন্টগুলো জলে পড়ছে...শব্দ...চিৎকার...কান্না...তার মধ্যে শুভোকে দেখলাম ডুব সাঁতার দিয়ে বেরিয়ে আসছে। নদীর অন্য পারে চলে যাচ্ছে বাঁচবার জন্য—সে যত এগুচ্ছে নদীর পাড় তত ভেঙে-ভেঙে সরে যাচ্ছে। স্বর্ণলতা আর্তনাদ করে উঠলেন, অথচ আমি যেদিকে ছিলাম, সেদিকের মাটি শক্ত ছিল, ও কেন সেদিকে এল না!

হঠাৎ ক্লান্ত হয়ে অজ্ঞানের মতো প্রিয়ব্রতর কাঁধে মুখ গুঁজে দিলেন স্বর্ণলতা। নিজের নরম, দুর্বল পায়ের ওপর ভরসা না করে শরীরের সমস্ত ভার প্রিয়ব্রতর শরীরে এলিয়ে দিলেন। প্রিয়ব্রত তাঁকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তার কেমন যেন একটা ভয় করতে লাগল, বউদিকে তার এমন রহস্যময় আর কখনও মনে হয়নি।

বউদি, চলো, নীচে যাই। তোমার কি পায়ে যন্ত্রণা হচ্ছে?

পায়ে না রে, তলপেটের কাছটায় ভীষণ ব্যথা। একটু দেরি কর, একটু। প্রিয়ব্রত হঠাৎ অনুভব করল, বউদির তলপেট তার শরীরের সঙ্গে লেগে আছে। অল্প-অল্প কেঁপে উঠছে সে বুঝতে পারছে। শুধু তলপেট নয়, স্বর্ণলতার দুই স্তন, তাঁর সমস্ত শরীর তার শরীরের সঙ্গে মিশে আছে। একথা জীবনে সেই প্রথম অনুভব করল। হঠাৎ তার শরীরে অসহ্য উত্তাপ এল কোথা থেকে। কানের লতি, চোখের পাশ দুটো জ্বলতে লাগল। ইচ্ছে হল স্বর্ণলতাকে আরও জোরে শরীরের সঙ্গে চেপে ধরতে, তাঁর মুখটা তুলে তাঁর তেরো বছরের শুকনো ওষ্ঠে নিজের ওষ্ঠে চেপে ধরতে। একথা তার

আগে কখনও মনে হয়নি। ছেলেবেলা মা মারা যাওয়ার পর, বহুদিন সে বউদির সঙ্গে একসঙ্গে শুয়েছে, ঘুমের ঘোরে ভয় পেয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরেছে। কোনওদিন শরীরে উত্তাপ লাগেনি। তখন বউদির মাতৃস্মৃতি লেগেছিল।

আজ একটা ভয়ংকর বাসনা তাকে ছুঁয়েছে, তার নিজের হাত অক্টোপাশের বাহুর মতো বউদিকে পিশে ফেলতে চাইতে। সে তৎক্ষণাৎ বলল, চলো, নীচে যাই বউদি, এক্ষুনি।

না, একটু পরে। সত্যি করে বল, সেদিন সিঁড়ির নীচে কে দাঁড়িয়ে ছিল? তুই না শুভব্রত?

আমি।

কে নীলিমাকে পড়ায়?

আমি।

কিন্তু তুই যখন নীলিমার সঙ্গে কথা বলতে-বলতে হো-হো করে হেসে উঠিস—আমি ঠিক চিনতে পারি—শুভব্রত ওর বন্ধুদের সঙ্গে তাস খেলে ঠিক এইরকম ভাবে হাসত। আমি কি সব ভুলে যাব? না, না—

প্রিয়ব্রত একটু উষ্ণ স্বরে বলল, কী উলটোপালটা কথা বলছ তুমি, আজ এতদিন পর...। চলো, নীচে চলো।

না, এখন না, আর একটু পর...স্বর্ণলতা প্রিয়ব্রতকে আর একটু দৃঢ়ভাবে ধরে রইলেন। প্রিয়ব্রতর তখন আঙুলের ডগাগুলো পর্যন্ত জ্বালা করতে শুরু করেছে, কপালে ভুরুর ঠিক ওপরে মনে হচ্ছে কে যেন একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে ঘষছে। সে অসহিষ্ণু গলায় বলল, আর না, চলো নীচে, বউদি...

না, অমি নীচে যাব না, আর নীচে গেলে আমি পাতালে নেমে যাব।

কী পাগলের মতো কথা বলছ, চলো। প্রিয়ব্রত প্রায় জোর করে তাঁকে সিঁড়ির কাছে নিয়ে এল। স্বর্ণলতা ছটফট করে নিজেকে মুক্ত করবার জন্য চেষ্টা করলেন, কান্না-ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি এখন যাব না, আমি আর কতকাল, না, যাব না, কত ভুলব আমি, না, না...

অর্জুন চাকরটা সিঁড়ির গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে। পিসিমা ঘর থেকে ডাক ছেড়ে বললেন, আবার কী হল রে, আবার কেউ পড়ল না কি টুনু, স্বর্ণ, কী হল, ও টুনু, প্রিয়ব্রত স্বর্ণলতাকে এনে খাটে শুইয়ে দিয়ে যা। স্বর্ণলতা বালিশে মুখ গুঁজে রইলেন। শব্দহীন চাপা কান্নায় তাঁর শরীর কেঁপে উঠতে লাগল। প্রিয়ব্রত পরিশ্রান্ত হয়ে হাঁপাতে লাগল। একটু বাদে মুখ তুলে স্বর্ণলতা বললেন, টুনু তুই এখন এ ঘর থেকে একটু যা, আমাকে একটু একা থাকতে দে।

প্রিয়ব্রত তখন অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল।

শুভব্রত, তুমি, শেষে তুমি...

প্রিয়ব্রত, তখন নীলিমাকে চুম্বন করছিল। প্রথমে নীলিমা দু-একবার বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, পরে সে ঘনঘন তার বুকে মাথা ঘষছে। সে এসেছে সকালবেলায় তার টেস্ট পরীক্ষার রেজাল্ট জানাতে। প্রিয়ব্রত নীচের ঘরে খবরের কাগজের দিকে মুখ করে বসেছিল।

নীলিমা চোখের ফাঁক দিয়ে একবার দরজার দিকে চেয়ে বলল, ওরকম উস্কো-খুস্কো চেহারা কেন আপনার? রাত্তিরে ঘুম হয়নি বুঝি?

প্রিয়ব্রত ওর হাতটা টেনে এনে মুঠোয় চেপে ধরল।

ও কী! হাত ছাড়ুন, হাত ভেঙে যাবে যে! নীলিমা অর্ধেকটা ঠোঁট উলটে নকল ভয়ে হেসে পিছিয়ে এল।

নীলিমা তোমার হাতখানা ধরতে দাও! প্রিয়ব্রতর কণ্ঠস্বর ভূতে পাওয়া মানুষের মতো।

না, সকালবেলায় একী ছেলেমানুষি!

প্রিয়ব্রত তৎক্ষণাৎ চেয়ার থেকে উঠে তরুণ সিংহের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর। নীলিমা ভয় পেয়ে ঘরের সেই কোণে পিছিয়ে গেল—দরজার বাইরে থেকে যে-দিকটা দেখা যায় না। প্রিয়ব্রত একটিও কথা না বলে তাকে চুম্বন করতে লাগল। দু-হাতে তাকে মাটি থেকে একটু উঁচুতে তুলে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

শুভব্রত, তুমি, শেষে তুমিও ঠকাতে চাও আমাকে।

প্রিয়ব্রত মুখ ফিরিয়ে দেখল স্বর্ণলতা দরজার কাছে দাঁড়িয়েছেন। প্রিয়ব্রত নীলিমাকে মুক্ত না করেই ঈষৎ বিরক্তি-মিশ্রিত ঝাঁঝাল গলায় বলল, তুমি কেন নীচে নেমে এসেছ বউদি?

দেবী প্রতিমার মতো রূপ ছিল স্বর্ণলতার। আজ দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন, এক হারিয়ে যাওয়া নিঃস্ব মানুষের মতো। শরীরের সোনার রঙ ম্লান হয়ে এসেছে, চোখের নীচে ঘন কালির রেখা, দৃষ্টি কেমন যেন অস্বাভাবিক।

আমি তোমাকে চিনতে পেরেছি, শুভব্রত। কেন তবু লুকিয়ে আছো?

প্রিয়ব্রত নীলিমাকে ছেড়ে ওঁর দিকে এগিয়ে এল। বলল, বউদি, আমি টুনু। আমাকে চিনতে পারছ না?

না, না, আমি ঠিক চিনেছি। আমি জানতুম তুমি মরতে পারো না। কিন্তু কেন তুমি এখনও আমায় ভয় দেখাচ্ছ? শেষে কি ওই মেয়েটার মায়ায় ভুললে! ও তোমার সব রক্ত শুষে নেবে—বেরিয়ে যা তুই, বেরিয়ে যা এখুনি। কেন তুই আসিস এখানে, না—

প্রিয়ব্রত স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। নীলিমা ফিসফিস করে বলল, পাগল হয়ে গেছে। একদম পাগল হয়ে গেছে।

আমি তোমার জন্য তেরো বছর ধরে প্রতীক্ষা করে বসে আছি, আর তুমি ভুললে এই মেয়েটার মায়ায়!

স্বর্ণলতা আর দাঁড়াতে পারলেন না। তাঁর পায়ে জোর কমে আসতে লাগল। প্রাণপণে দরজাটা চেপে আস্তে-আস্তে তিনি বসে পড়তে লাগলেন। প্রিয়ব্রত এসে তাঁর হাত ধরল। বলল, বউদি, আমি টুনু, প্রিয়ব্রত। আমি কিছুতেই শুভব্রত হতে পারি না। ভালো করে আমার দিকে চেয়ে দেখ। চেষ্টা করেও আমি শুভব্রত হতে পারব না।

স্বর্ণলতা আর উত্তর দিতে পারলেন না। গলার কাছে অনেকখানি বাষ্প জমে গেল, চোখ এল ঝাপসা হয়ে। নীলিমাও কাছে এসে তাঁকে ছুঁয়ে বলল, বউদি চলুন, ওপরের ঘরে চলুন। স্বর্ণলতার ডান হাতের মনিবন্ধে পাশাপাশি নীলিমা আর প্রিয়ব্রতর হাত! প্রিয়ব্রতর হাতটাকে যেমন শুভব্রতের হাত বলে চিনতে পারলেন—তেমনি হঠাৎ নীলিমার হাত দেখেও তেরো বছর আগেকার স্বর্ণলতার হাতের মতোই মনে হল। সেইরকম, উজ্জ্বল, মসৃণ, লঘু চামড়া প্রতিটি রোমকূপের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে চঞ্চল আনন্দের প্রবাহ আঁকা আছে।

আর তাঁর নিজের ত্বক—অভিজ্ঞ, মন্থর, গোধূলির আলোর মতো করুণ, প্রতীক্ষায় ক্লান্ত। একবার দুজনের মুখের দিকে তাকালেন, দুটি উজ্জ্বল তরুণ মুখ। তাঁর মনে হল, ওরা দুজনে তাঁর থেকে অনেক দূরে আছে। অনেক দূরে, এক নদীর অন্য পারে। তিনি কিছুতেই ওদের ছুঁতে পারবেন না, শুধু তার দীর্ঘশ্বাস ওদের ঘিরে থাকবে।

ওরা দুজনে আর একবার একসঙ্গে ডাকল, বউদি, বউদি।

স্বর্ণলতা কোনও উত্তর দিলেন না।

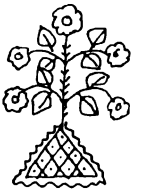

চোখাচোখি

দূর পাল্লার ট্রেনযাত্রায় আমার ইচ্ছে করে পরিচয়টা বদল করতে। চব্বিশ ঘণ্টা একই কামরায় থাকলে সহযাত্রীদের সঙ্গে একটু-আধটু আলাপ পরিচয় হবেই। তখন আমি অন্য মানুষ হতে যেতে চাই।

টিকিট ছিল চেয়ার কারের। ট্রেন ছাড়ার আগেই দেখলুম, সেখানে তিনজন আমার মুখচেনা। এদের মধ্যে একজনের সাহিত্য বাতিক আছে। আমি মনে-মনে প্রমাদ গুণলুম, সারা রাস্তা বকবক করে যেতে হবে এদের সঙ্গে? অথচ দু-খানা না-পড়া বই সঙ্গে নিয়ে এসেছি। তা ছাড়া, চলন্ত প্রাকৃতিক ছবি দেখার সময় আমার কথা বলতে ভালো লাগে না।

পাশের কামরাটা এয়ার-কন্ডিশানড টু-টায়ার স্লিপার। ভাড়া অনেক বেশি। কিন্তু আমার এবারের দিল্লী যাত্রার ভাড়া কোনও এক গৌরী সেন দেবে। প্রায় শেষ মুহূর্তে যাওয়া ঠিক হয়েছে, তাই চেয়ার কার ছাড়া অন্য টিকিট পাওয়া যায়নি। কিন্তু ট্রেন ছাড়ার পর সব ক্লাসেই দু-একটি ফাঁকা সিট থাকে।

বর্ধমান স্টেশনে নেমে আমি পাশের কামরার কণ্ডাক্টর গার্ডকে জিগ্যেস করলুম, আমাকে টু-টায়ারের একটা সিট দিতে পারবেন?

এইসব ক্ষেত্রে কখনও-কখনও ঘুষের ব্যাপার থাকে আমি জানি। বিপন্ন ব্যক্তিরা পঞ্চাশ একশো টাকা বেশি দিয়েও সিট নিতে রাজি হয়। যেহেতু আমি যে-কাজ করি তাতে কোনওদিন ঘুষ পাওয়ার কোনও সম্ভাবনাই নেই। সেইজন্য আমিও কারুকে কখনও ঘুষ দিই না। ঘুষ আটকাবার একটা মোক্ষম ওষুধও আমার জানা আছে।

কালো কোট পরা লোকটির চোখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে আমি আবার বললুম, আমি খবরের কাগজে কাজ করি।

সঙ্গে-সঙ্গে কাজ হল। লোকটির কঠোর মুখখানা নরম হয়ে গেল। বিনীত গলায় বলল, একটু অপেক্ষা করুন। আসানসোল কোটা আছে, সেখানে যদি কেউ না ওঠে, তাহলে আপনি পেয়ে যাবেন।

আসানসোল পর্যন্ত আমি ঘুমের ভান করে রইলুম এবং তারপরেই সুটকেস হাতে নিয়ে চলে এলুম পাশের কামরায়। দুটি বার্থ খালি আছে, একটি এর মধ্যেই বিলি করা হয়েছে এক মাড়োয়ারি ভদ্রলোককে, আমাকে দেওয়া হল প্যাসেজের ধারে একটি ওপরের বাংক। তাই সই।

রিজার্ভ কম্পার্টমেন্টে মাঝপথে কেউ উঠলে অন্য যাত্রীরা সন্দেহের চোখে তাকায়। বিনা টিকিটের যাত্রী মনে করে। বসবার জায়গা দিতে চায় না। আজকাল আবার যখন তখন ট্রেনে ডাকাতের উপদ্রব।

সুটকেসটা একটা বাংকের তলায় চালান করলুম। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই যে দিনের বেলায় কেউ ওপরে উঠে শুয়ে থাকতে পারে না। [illegible]ড়া বাংলা-বিহার-উত্তর প্রদেশের পট পরিবর্তন দেখতে আমার সব সময়ই ভালো লাগে।

নীচের বাংকের পুরোনো যাত্রীরা সবাই সুজনি বিছিয়ি আধো শোয়া হয়ে আছে। আমার যেখানে জায়গা, তার নীচের বাংকে পুরোদস্তুর বিছানা পাতা। মিশমিশে কালো সিল্কের শাড়ি পরা

একজন প্রৌঢ়া মহিলা সেখানে পা ছড়িয়ে বসে একখানা পেপারব্যাক বই পড়ছেন। নিয়ম অনুযায়ী দিনের বেলা নীচে বসার আমার ন্যায্য অধিকার আছে। কিন্তু একজন মহিলা একেবারে বিছানা-টিছানা পেতে ফেলেছেন, তাঁকে নিয়ম দেখানো ঠিক সঙ্গত নয়।

আজকাল ট্রেনে ভদ্রতা-সভ্যতা উঠে গেছে, ডেলি প্যাসেঞ্জাররা যে-কোনও কম্পার্টমেন্টে যখন তখন উঠে পড়া, গা-জুয়ারি করে রিজার্ভ সিটের যাত্রীদের ঠেলে-ঠুলে বসে পড়ে। প্রতিবাদ করতে সাহস পাই না কিন্তু এসব দেখে মর্মাহত হই। ছোটবেলায় আমাদের শেখানো হত, অন্য কারুর জন্য নিজের সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে।

আমি পাশেই এক শুয়ে-থাকা ভদ্রলোককে জিগ্যেস করলুম একটু বসতে পারি?

তিনি উত্তর না দিয়ে দয়া করে পা-টা একটু সরালেন।

চোখ বুলিয়ে দেখলুম, এই কামরায় আমার কেউ চেনা নেই। সঙ্গে-সঙ্গে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আমি অন্য মানুষ হয়ে গেলুম।

ধানবাদ পৌঁছবার আগেই শুয়ে-থাকা লোকটি আমার সঙ্গে আলাপ জমাতে চাইলে আমি বেশ উচ্চকণ্ঠে জানালুম যে আমি একটা ওষুধের কোম্পানির ভ্রাম্যমাণ বিক্রয়-প্রতিনিধি, আমার নাম অর্জুন ভরদ্বাজ।

এক সময় সত্যি আমি কিছুদিন একটা ওষুধ কোম্পানিতে কাজ করেছিলুম, সুতরাং ওষুধ-বিপণনের ব্যাপারটা আমি কিছুটা জানি। দৈবাৎ কেউ যদি আমার পেশা সম্পর্কে জেরা করে তাহলে আমি বিশ্বাসযোগ্য উত্তর দিতে পারব।

ধানবাদ পেরুবার পর কণ্ডাক্টার গার্ড এলেন আমার কাছ থেকে এই কামরার অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করতে। আমি তাঁকে দিলুম একশো চুরানব্বই টাকা, তিনি রীতিমতন রশিদ লিখে দিলেন। তারপর তিনি অতিরিক্ত কর্তব্যপরায়ণ হয়ে বললেন, আপনার ওই ওপরের বাংক, দিনেরবেলা আপনি নীচে বসতে পারেন। ওইটা আপনার জায়গা।

কালো সিল্কের শাড়ি পরা মহিলাটির দিকে তিনি আঙুল তুলে বললেন, ম্যাডাম, দিনেরবেলা আপনার বিছানাটা গুটিয়ে নিতে হবে, এই জেন্টলম্যানটি ওইখানে বসবেন।

আমি সঙ্কুচিতভাবে বললুম, ঠিক আছে, ঠিক আছে, ওঁকে ডিসটার্ব করার দরকার নেই। আমি এখানেই বেশ আছি।

মহিলাটি বিছানাটি খানিকটা গুটিয়ে নিয়ে ইংরিজিতে বললেন, ইউ ক্যান কাম।

যেখানে আমি বসেছিলুম, সেখানকার ভদ্রলোকটি অযাচিতভাবে বললেন, যান না, নিজের জায়গাটা অকুপাই করে নিন।

অগত্যা আমাকে উঠে গিয়ে ভদ্রমহিলার পায়ের কাছে বসতে হল। তিনি বইখানা সরিয়ে আমাকে লক্ষ্য করছেন। আমিও ওঁর আপাদমস্তক পর্যবেক্ষণ করলুম। দিনেরবেলা এরকম কালো সিল্কের শাড়ি কেমন যেন বেমানান। কেমন যেন বোরখার কথা মনে পড়িয়ে দেয়। উত্তর প্রদেশের অনেক খানদানি মুসলমান পরিবারের মেয়েদের আমি কালো সিল্কের বোরখা পরতে দেখেছি। ভদ্রমহিলার গায়ের রং টুকটুকে ফরসা, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা, এককালে নিশ্চয়ই বেশ রূপসী ছিলেন, এখন যৌবন ঢলে পড়েছে। তবে তিনি সহজে বার্ধক্য মেনে নিতে রাজি নন, মুখের চামড়ার মসৃণতা চলে গেলেও চোখে সুর্মা, ভুরুতে কাজল, মাথার চুল নিশ্চয়ই কালো রং করা।

এই বয়সের কোনও-কোনও রমণীর একটা বিষণ্ণ সৌন্দর্য থাকে, গোধূলির আলোর মতন, খাঁচায় আটকানো হরিণীর চোখের মতন।

ভদ্রমহিলা মুসলমান বলেই মনে হয়। কিন্তু এই বয়েসের মুসলমান রমণীরা কি একা-একা ভ্রমণ করেন? ওঁর উপস্থিতির মধ্যে একটা বেশ আভিজাত্য আছে।

আমি ওঁর সঙ্গে নিজে থেকে কথা বলার কথা ভাবতেই পারিনি। বই খুলতে যাচ্ছিলুম,

উনিই প্রথম জিগ্যেস করলেন, আপনি কোথায় যাবেন?

আমি সংক্ষেপে বললুম, দিল্লি।

উনি আবার জিগ্যেস করলেন, তাহলে আপনার কাছ থেকে অত কম টাকা নিল কেন? দিল্লীর ভাড়া তো অনেক বেশি!

আমি দু-এক মুহূর্ত চুপ করে রইলুম। মহিলাটি ভেবেছেন, আমি বিনা টিকিটে এই কামরায় উঠে পড়ে কিছু টাকা দিয়ে ম্যানেজ করে নিয়েছি। ওঁর এই ধারণাটা না ভাঙলে কী হয়? আমার যে চেয়ার কারের টিকিট ছিল, সেটা চেপে গিয়ে হেসে বললুম, প্রায়ই তো এ লাইনে যাতায়াত করি, ওরা চেনে, শস্তা করে দেয়।

মহিলা আমার কথা শুনে খুশি হলেন না। উনি পুরো ভাড়া দিয়েছেন, অথচ একজন হাফ-ভাড়া দেওয়া লোকের জন্য তাঁকে জায়গা ছেড়ে দিতে হল!

এখন আমি সত্যিই অর্জুন ভরদ্বাজ হয়ে গেছি। ভাবছি, দেখাই যাক না কী হয়!

মহিলাটি কিছুক্ষণ বইতে মন দিলেন। একসময় অন্যমনস্কভাবে তাঁর পা আবার ছড়িয়ে গেল, সেই পা আমার গায়ে এসে লাগল।

কোনও পুরুষ মানুষের পা হলে আমি নিশ্চয়ই আপত্তি জানাতুম। ফরসা রমণীর পা, হোক না যৌবনোত্তীর্ণ, তাতে আপত্তির কোনও কারণ নেই।

একসময় তাঁর খেয়াল হল। তাড়াতাড়ি পা সরিয়ে নিয়ে বললেন, আমি দুঃখিত, ক্ষমা চাইছি, আপনার গায়ে পা লেগেছে বুঝতেই পারিনি।

আমি বললুম, তাতে কিছু হয়নি।

—আমার হাঁটুতে একটা ব্যথা, পা-টা টান করে রাখলে ভালো লাগে।

—আপনি পা-টা ছড়িয়ে দিন না, আমার কোনও অসুবিধা হবে না। এমন সুন্দর, ফরসা পা, পরিষ্কার, তকতকে, এর ছোঁয়া পেতে ভালো লাগে!

কথাটা বলে ফেলেই আমি লজ্জা পেলুম। কোনও অচেনা মহিলাকে ভালো করে আলাপ হওয়ার আগেই এতখানি স্তুতি করা ঠিক আমার স্বভাবসঙ্গত নয়। তবু কেন এরকম বললুম? ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিরা খুব চটপটে হয়, কোনও কিছু বলতেই তাদের মুখে আটকায় না। আমি এখন সেই ভূমিকায়।

মহিলাটি আমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। একসময় তিনি নিশ্চয়ই তাঁর রূপের অনেক স্তুতি শুনেছেন, ইদানীং আর কেউ এমনভাবে বলবে না। খানিকটা অবাক হয়েছেন মনে হল।

শেষপর্যন্ত পা-দুটো তিনি আবার ছড়ালেন। আমি চেষ্টা করে একটু সরু হয়ে বসলুম।

তিনি জিগ্যেস করলেন, আপনি কোন কোম্পানিতে কাজ করেন?

একসময় আমি অনেক ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধির সঙ্গে মিশেছি, অনেকে এখনও আমার বন্ধু। আমার ঘনিষ্ঠ এক বন্ধু যে-কোম্পানিতে কাজ করে, সেই জার্মান কোম্পানিটির নাম বলে দিলুম। এবং সেইসঙ্গে যোগ করলুম, আমাকে দিল্লী-কানপুর-এলাহাবাদ এইসব অঞ্চলেই বেশি ঘুরতে হয়।

—আপনার সঙ্গে কার্ড আছে?

এইবার আমি প্যাঁচে পড়লুম। ঠিক তো, এইসব প্রতিনিধিদের সব সময় নিজস্ব কার্ড নিয়ে ঘুরতে হয়। এটা আমার খেয়াল হয়নি।

চোখের পাতা না কাঁপিয়ে বললুম, হ্যাঁ, আছে।

উঠে দাঁড়িয়ে প্যান্ট ও শার্টের পকেট চাপড়ে বললুম, ও সুটকেসের মধ্যে রয়ে গেছে। আপনাকে দিচ্ছি একটু পরে।

মহিলা বললেন, আমি কানপুরে নামব। অনেক দেরি আছে। সেই রাত্তির তিনটের সময়। ট্রেনের দুলুনিতে আমার ঘুম পায় খুব। যদি রাত্তিরে ঘুমিয়ে থাকি, কণ্ডাক্টর গার্ড কি আমাকে ডেকে দেবে?

আমি বললুম, আমিও ডেকে দিতে পারি। ট্রেনে আমার ঘুম আসে না।

—ধন্যবাদ।

—আপনি কি ট্রেনে প্রায়ই যাতায়াত করেন?

—না। মানে, দশ বছর পর এই প্রথম।

আমি ভেবেছিলুম এই ট্রেন যাত্রায় কারুর সঙ্গে কথা না বলে চুপচাপ কাটাব। সেইজন্যই আমার ছদ্মবেশ ধারণ। কিন্তু আমি নিজে থেকেই এই মহিলার সঙ্গে বেশি-বেশি কথা বলছি যেন। বোধহয় আমার ছদ্মবেশটা ভুল হয়েছে। ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিরা খুব সপ্রভিত হয়, তারা চটপট নতুন লোকের সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেলতে পারে।

মহিলাটি সমস্ত কথাই বলছেন ইংরেজিতে। উচ্চারণ নির্ভুল। তাতে একটু আশ্চর্য লাগে!

না না, মেয়েদের মুখে নির্ভুল উচ্চারণে ইংরেজি শোনা আশ্চর্যের কিছু নয়। কিন্তু যে-সব মহিলা ইংরেজি সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত তাদের কেউ কি গরমকালের দিনেরবেলা কালো রঙের সিল্কের শাড়ি পরে? শুধু তাই-ই নয়, ভদ্রমহিলার মাথায় ঘোমটা দেওয়া, লক্ষ্য করে দেখলুম, সেটা একটা আলাদা পাতলা কালো ওড়না।

দশ বছর ট্রেনে চাপেননি, এখন উনি একলা কোথায় যাচ্ছেন? তা জানার জন্য আমার এত কৌতূহলই বা কেন?

সন্ধে হয়ে এসেছে, ভদ্রমহিলা একবার নামলেন। বোধহয় বাথরুমে যাবেন।

আমি জানলা দিয়ে চেয়ে রইলুম বাইরের দিকে। বাংলার সরল ভূমি ছেড়ে এখন ট্রেন ছুটছে বিহারের পার্বত্য এলাকা দিয়ে। সূর্য ডুবে গেছে, তবু আকাশের সব আলো এখনও মিলিয়ে যায়নি। ছোট-ছোট পাহাড়গুলির ওপরে যেন স্মৃতির মতন ছায়া পড়ছে।

ভদ্রমহিলার নাম জানা হল না। জানা যাবেও না। মহিলার নাম অকারণে জিগ্যেস করা যায় না।

একটু বাদে মহিলা ফিরে এলেন বাথরুম থেকে। ওঁর শরীরের গড়নটি বেশ লম্বা। বয়েস হলেও কোমরে মেদ জমেনি। হাতে বা গলায় কোনও অলংকার নেই। এমনকি একটি আংটিও নেই। ট্রেনে ছিনতাইবাজদের ভয়ে খুলে রেখেছেন? তবু মেয়েরা একেবারে বিনা অলংকারে থাকে না সাধারণত, অন্তত নকল কিছু পরে।

বিছানার ওপর একটা নীল কাপড়ের ব্যাগ। ভদ্রমহিলা ওপরে উঠতে যেতেই তাঁর হাতের ধাক্কায় ব্যাগটা ছিটকে মাটিতে পড়ে গেল। ঝনঝন শব্দ হল। টাকা-পয়সার নয়, অন্য কিছুর।

আমি ব্যাগটা তুলে নিলাম মাটি থেকে। তাতে শব্দ হল আবার। মনে হল ঘুঙুরের শব্দ। হ্যাঁ, কোনও সন্দেহ নেই।

ভদ্রমহিলা যেন খানিকটা ব্যস্ত হয়ে কাপড়ের ব্যাগটা নিয়ে নিলেন আমার হাত থেকে। সেটা পিঠের কাছ রেখে জানালা দিয়ে তাকালেন বাইরে। অর্থাৎ এখন আমার সঙ্গে কথা বলতে চান না।

এক প্রৌঢ়া মহিলা সঙ্গে ঘুঙুর নিয়ে চলেছেন কেন? নর্তকী নাকি! এই বয়সে নাচ কি মানায়? তা ছাড়া উনি বললেন, ওঁর হাঁটুতে ব্যথা। হয়তো কারুর জন্য ঘুঙুর উপহার নিয়ে যাচ্ছেন।

ভদ্রমহিলা পা মুড়ে আমার দিকে পেছন ফিরে বসলেন। চকিতে তাকালেন দু-একবার। কিছু কি বলতে চান? উনি কি চান আমি কিছুক্ষণের জন্য উঠে যাই? প্রসাধন-ট্রসাধন করবেন?

এয়ার কন্ডিশান্ড কামরায় সিগারেট খাওয়ার জন্য এমনিই মাঝে-মাঝে বাইরে যেতে হয়।

বেশ অনেকক্ষণ সিগারেট টানা হয়নি। আমি উঠে এলাম। কিন্তু কৌতূহল রয়ে গেল। কিছু যেন একটা রহস্য আছে। বাইরে থেকে যা দেখা যায়, তার ভেতর থেকে হঠাৎ একটা কী যেন উঁকি মারে।

কাচের দরজা, আমি একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে উঁকি মারলুম। ভদ্রমহিলা হাঁটু গেড়ে বসেছেন, হাতে একটা ছোট্ট বই। যতদূর মনে হচ্ছে উর্দুতে লেখা।

প্রথম দেখে আমার যা ধারণা হয়েছিল, দেখা যাচ্ছে সেটাই ঠিক। মহিলা মগরেবের নামাজ পড়ছেন।

ইনি শুধু মুসলমান নন, রীতিমতন ধর্মপ্রাণা। ট্রেনের মধ্যেও নামাজ পড়া বাদ দিতে চান না। অথচ ইনি শুধু ইংরিজিতে কথা বলেন। এঁর সঙ্গে একটা থলির মধ্যে ঘুঙুর। কোনওটার সঙ্গে কোনওটা মেলে না।

নামাজ শেষ করতে কতক্ষণ সময় লাগে আমার ঠিক ধারণা নেই। পরপর দুটি সিগারেট শেষ করলুম। তারপরেও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম বাইরের দরজায় ঠেস দিয়ে। আমি এখন অর্জুন ভরদ্বাজ। তবু আমার বুকের মধ্যে এত কৌতূহল ছটফট করছে কেন? অর্জুন ভরদ্বাজের কী এরকম হয়?

ফিরে এসে দেখলুম, প্রার্থনা শেষ হয়ে গেছে। মহিলাটি এখন একটা কৌটো খুলে কিছু খাচ্ছেন। আমার মনে পড়ল, উনি সারাদিন কিছুই খাননি, আমরা লাঞ্চ খেয়েছি, বিকেলের চা খেয়েছি, উনি বেয়ারাদের ফিরিয়ে দিয়েছেন। এখন কি রোজার মাস চলেছে নাকি?

আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই ভদ্রমহিলা চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন। কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত উনি আমার সঙ্গে বেশ গল্প করছিলেন। ওই ঘুঙুরের থলিটা আমি দেখে ফেলার পরেই কেমন যেন বদলে গেলেন। উনি ভাবছেন, আমি কি ওঁর ব্যাপারে কিছু সন্দেহ করেছি? না, সন্দেহ নয়, তবে একটু খটকা লেগেছে ঠিকই।

খানিকবাদে পৌঁছে গেলুম গয়া স্টেশনে। শরীরের আড়ভাঙার জন্য নেমে প্লাটফর্মে পায়চারি করতে লাগলুম খানিকটা। হিন্দিতে কী যেন একটা ঘোষণা হচ্ছে। কান পেতে শুনলুম একবার। অদ্ভুত ঘোষণা। বারবার একই কথা বলছে।

ঘোষণাটি হচ্ছে এই যে, যাত্রী সাধারণকে সাবধান করে দেওয়া হচ্ছে, কোনও অচেনা সহযাত্রী যদি বিড়ি, সিগারেট, খৈনি, পান, চা বা প্রসাদের নাম করে খাবার আপনাকে দেয়, তা হলে তা খাবেন না! কারণ, কোনও অপরাধ-কর্মী ওই সব খাবারের মধ্যে বিষ মিশিয়ে দিতে পারে। আপনি ঘুমিয়ে পড়লে বা অজ্ঞান হয়ে পড়লে আপনার মালপত্র নিয়ে পালাবে। এই সব অপরাধ-কর্মীদের থেকে সাবধান!

গয়া স্টেশনে বুঝি খুব ঠক আর ফেরেবাজ বেড়েছে? এতবার এই কথা বলে যাচ্ছে কেন?

সেই ঘোষণা থেকে আমি একটা শব্দ শিখলাম। অপরাধ-কর্মী, এই হিন্দি শব্দটা বাংলাতেও অনায়াসেই ব্যবহার করা যায়।

ভদ্রমহিলাও উঠে এসে কামরার দরজার কাছে দাঁড়িয়েছেন। একবার মুখ বাড়িয়ে বললেন, পান, এই পান!

এই প্রথম আমি তাঁর মুখ থেকে একটা অ-ইংরেজি শব্দ শুনলুম।

কাছাকাছি কোনও পান-বিড়িওয়ালা নেই। মহিলা আমাকে কি অনুরোধ করবেন পান খোঁজার জন্য? কিন্তু এবারেও আমার দিকে চোখ পড়তেই মুখ ফিরিয়ে চলে গেলেন ভেতরে।

তবু আমি কাছাকাছি খুঁজলাম। পান পাওয়া গেল না।

ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে, আমাকে দৌড়ে এসে উঠতে হল।

এইসব ট্রেনের সব কামরার ভেতর দিয়ে যাতায়াত করা যায়। আমাদের এই কামরার পাশেই

ডাইনিং কার। সেইজন্য মাঝে-মাঝেই কিছু লোক এখান দিয়ে যাচ্ছে।

আমি আমার সিটে সবে এসে বসেছি, হঠাৎ একটি যুবক আমাকে দেখে চেঁচিয়ে বলে উঠল, আরে সুনীলদা! আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

আমি আঁৎকে উঠলুম। ছেলেটির মুখ বেশ চেনা-চেনা যদিও নামটা মনে নেই। আর তো ছদ্মবেশ রাখা যাবে না।

অতি উৎসাহে ছেলেটি নানা রকম বকবক করতে লাগল। তাও শুধু বাংলায় কথা বললে নিষ্কৃতি ছিল। তার সঙ্গে তার এক বন্ধু, তার সঙ্গে সে ইংরিজিতে পরিচয় করে দিল আমার। কিউবিকলের কয়েকজন লোক চোখ সরু করে তাকাল আমার দিকে। এরা জেনে গেছে, আমার নাম অন্য, পেশা অন্য।

ছেলেটিকে বিদায় দেওয়ার পর আমি গল্পের বইতে মুখ আড়াল করে রইলুম। আমি নিজেই একটা খেলা খেলছিলুম তাতে কারুর তো কোনও ক্ষতি হয়নি।

মুশকিল হচ্ছে, কালো শাড়ি পরা মহিলার মুখোমুখি বসতে হয়েছে আমাকে। মুখ তুললেই চোখাচোখি হয়ে যায়। সঙ্গে-সঙ্গে তিনি মুখটা সামান্য একটু সরিয়ে নেন। এখন তাঁর ঠোঁটে যেন একটা পাতলা হাসি। যেন তিনি একটা প্রতিশোধের সুযোগ পেয়েছেন। তাঁর ঘুঙুরের থলিটা দেখে ফেলে আমি তাঁর একটা গোপন ব্যাপার জেনে ফেলেছি। এবারে তিনিও আমারটা জেনেছেন।

যাক, কাটাকুটি হয়ে গেছে। তবু উনি আর আমার সঙ্গে কথা বলছেন না কেন? আমি ছেঁড়া আলাপ আবার জমাবার জন্য বললুম, বাইরের আকাশটা লাল, বৃষ্টি আসবে মনে হচ্ছে!

ভদ্রমহিলা কোনও উত্তর দিলেন না।

আমি তাঁর পায়ের দিকে তাকালুম। এই পায়েই কি ঘুঙুর বাঁধা হয়? কিন্তু এঁর পেশা যদি নাচ হয়, তা হলে তিনি দশ বছর ট্রেনে চাপেননি? এটা কি বিশ্বাসযোগ্য? যে নিয়মিত নামাজ পড়ে তার পক্ষে নাচ-গান কি হারাম নয়? কিছুই যেন মেলাতে পারছি না। পরের স্টেশনে আবার আমি নামলুম সিগারেট খাওয়ার জন্য। সামনে দিয়েই একজন পানওয়ালা যাচ্ছে। আমার মনে পড়ে গেল, ভদ্রমহিলা পান খুঁজছিলেন। উনি কি পান খান, সাদা না জর্দা দেওয়া? জিগ্যেস করে আসার সময় নেই। আমি দুরকমের দুটি পানই নিলুম।

যাদের পানের নেশা তারা নিশ্চয়ই পান পেলে খুশী হয়। আমি কামরায় ঢুকে হাসি মুখে বললুম, আপনার জন্য পান এনেছি।

মহিলার মুখ অন্যদিকে ফেরানো।

আমি আরও কাছে এসে বললুম, আপনার জন্য পান এনেছি, আপনি খুঁজছিলেন।

ভদ্রমহিলা এবার মুখ ফিরিয়ে একটা বিস্ময়ের দৃষ্টি দিলেন। তারপর বললেন, আমি তো এখন পান চাই না।

আমি আন্তরিক অনুনয়ের সুরে বললুম, আপনি আগের স্টেশনে খুঁজছিলেন, আমি দুরকম পান...

উনি আবার বললেন, আমার পান দরকার নেই।

তারপর সেই ঘুঙুরের থলিটা তুলে শক্ত করে বুকে চেপে রইলেন।



ট্যাক্সির হর্ন

চিঠির বাক্সে একটি সাদা খাম পেলেন অমৃত।

এ চিঠি ডাকে আসেনি, কেউ নিজে এসে দিয়ে গেছে। ভেতরে একটি খাতা-ছেঁড়া আধখানা পাতায় মাত্র দুটি লাইন লেখা, 'আমি আগামী বুধবার বেলা এগারোটায় আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই, সেদিন যদি আপনার সময় না থাকে, তাহলে আর কিছু দরকার নেই।'

এ চিঠিতে কোনও সম্বোধন নেই, স্বাক্ষরও নেই। হাতের লেখাও চেনা নয় অমৃতর, তবে মেয়েলি হাতের লেখা বলে মনে হয়।

এরকম চিঠি পেয়ে মানুষ কী করে? খাম শুদ্ধু মুড়ে ফেলে দেওয়াই তো স্বাভাবিক। কিন্তু অস্বাক্ষরিত মেয়েলি হাতের চিঠির কথা চট করে মন থেকে মুছে ফেলা যায় না।

আজ সোমবার। একটা কনফারেন্সে যোগ দিতে অমৃত গিয়েছিলেন এলাহাবাদ। বাড়ি ফিরেছেন কিছুক্ষণ আগে। দশ-বারোখানা চিঠি জমে আছে। তার মধ্যে এই একটি চিঠিই বারবার অন্যমনস্ক করে দেয়। যে এই চিঠি লিখেছে সে দেখা করতে এসেছিল। অমৃতকে না পেয়ে খামটি রেখে গেছে। কিন্তু সাদা খামটা সে পেল কোথায়, এনেছিল সঙ্গে করে? কোনও মেয়ের ব্যাগে এরকম সাদা খাম থাকা কি স্বাভাবিক?

পাঁচ দিন কলকাতায় ছিলেন না তিনি, এর মধ্যে কবে সেই মেয়েটি বা মহিলাটি এসেছিল, গতকাল না চারদিন আগে? আগামী বুধবার লিখেছে, অথচ চিঠিটা লেখার কোনও তারিখ দেয়নি।

চিঠিটার ভাষাও মোটেই ভালো নয়। অমৃত চৌধুরী একজন ব্যস্ত মানুষ, তাঁর কখন সময় হবে না হবে, তা জিগ্যেস করা উচিত ছিল না কি? পত্র লেখিকা নিজের থেকেই সময় ঠিক করেছে। বুধবার বেলা এগারোটা। চিঠির নীচে নাম সই না করে একটা রহস্য সৃষ্টি করার চেষ্টা হয়েছে। অমৃতর মনে হল, এটা অভদ্রতা এবং ন্যাকামি।

বুধবার বেলা এগারোটায় তাঁর বাড়িতে থাকার তো প্রশ্নই ওঠে না। অমৃতকে যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে পৌঁছতে হয় রোজ এগারোটার মধ্যেই। তাঁর নিজের ক্লাস না থাকলেও যেতে হয়। এ-বছর তিনি হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট। এগারোটায় যাদবপুরে পৌঁছতে গেলে বাড়ি থেকে বেরুতে হয় দশটার মধ্যে। একটা ন্যাকামি চিঠির জন্য তিনি নিজের কাজ নষ্ট করে বাড়িতে বসে থাকবেন কেন?

এই বুধবার তাঁর আরও একটি জরুরি কাজ আছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দল এসেছে। এই বুধবার ঠিক ওই বেলা এগারোটাতেই একটি আলোচনা সভায় যোগ দিতে হবে অমৃতকে।

এতখানি ট্রেন জার্নি করে এসেও ক্লান্ত বোধ করলেন না অমৃত, ঠিক এগারোটার মধ্যেই যাদবপুর পৌঁছলেন। গত সপ্তাহের জমে থাকা কাজকর্ম শেষ করতে-করতে বিকেল পাঁচটা বেজে গেল। বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব নিয়ে প্রচুর ফাইলপত্র সই করতে হয় তাঁকে, নানান অভিযোগ ও নালিশ শুনতে হয়। এত সব ব্যস্ততার মধ্যেও ওই একটা সামান্য নামহীন চিঠির কথা বারবার উঁকি দিয়ে গেল তাঁর মনে। কে লিখতে পারে ওই চিঠি? সাধারণ কোনও ছাত্রী বা দর্শনপ্রার্থিনী

হতে পারে না। ওই চিঠির মধ্যে যেন বেশ একটা দৃঢ় ছবি আছে।

হাতের লেখাটা স্পষ্ট মেয়েলি বলে চেনা না গেলে কি অমৃত এমন উতলা হতেন? নিজেকেই তিনি এই প্রশ্ন করেছেন। উত্তরটাও তিনি তৈরি করেছিলেন সঙ্গে-সঙ্গে। তাঁর খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছাড়া আর কোনও পুরুষ এরকম হুকুমের সুরে তাঁকে চিঠি লেখার সাহসই পেত না। কোনও পুরুষ এরকম নামহীন চিঠিও লেখে না।

বিকেলে বাড়ি ফিরে তিনি মাধুরীকে জিগ্যেস করলেন, আমি যে ক'দিন বাড়িতে ছিলুম না, কোনও মেয়ে কি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল?

বসবার ঘরের টেবিলে একটা খাতা রাখা আছে। অমৃত যখন বাড়িতে থাকেন না, তখনকার টেলিফোন বার্তা বা অন্যান্য দরকারি খবর মাধুরী ওই খাতায় লিখে রাখে। অমৃত খাতাটার পাতা উলটে আগেই দেখে নিয়েছেন। সেখানে ওই পত্র লেখিকার কোনও সন্ধান নেই।

প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে মাধুরী জিগ্যেস করলেন, কেন, কোনও মেয়ের আসবার কথা ছিল?

—না। তা নয়...

—ডঃ ভট্টাচার্যি আর তাঁর স্ত্রী সতী এসেছিল, তাও কোনও দরকারে নয়, এদিকে বাজার করতে এসেছিল। একটু চা খেয়ে গেল, ওই সতী ছাড়া আর কোনও মহিলা তো এর মধ্যে তোমার কথা জিগ্যেসও করেনি। আগে তোমার দু-চারজন ছাত্রী প্রায়ই আসত, আজকাল কেউ আসে না। কী ব্যাপার বলো তো, ছাত্রীদের মধ্যে তোমার পলুলারিটি কমে যাচ্ছে নাকি? তুমি তোমার চশমার ফ্রেমটা বদলাও। এই চশমাটা পরলে তোমায় বড্ড ভারিক্কী আর গম্ভীর দেখায়।

একটু হেসে অমৃত বললেন, একটি মেয়ে চিঠি লিখে ডাক বাক্সে ফেলে গেছে, আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। সে ওপরে আসেনি।

মাধুরী হাত বাড়িয়ে বললেন, কই চিঠিটা দেখি?

অমৃত তক্ষুণি বুঝতে পারলেন, মাধুরীকে না দেখিয়ে চিঠিটা ফেলে দেওয়া উচিত হয়নি। কিংবা, চিঠিটা যখন ফেলেই দেওয়া হয়েছে, তখন আর এ প্রসঙ্গটা মাধুরীর সামনে উত্থাপন না করলেও চলত।

চিঠিটা যে কোথায় রাখলাম!

কী নাম মেয়েটির?

নন্দিতা না ছন্দা, এই রকম যেন কী একটা নাম, ঠিক মনে পড়ছে না। এই মিথ্যেটুকু ব্যবহার করতেই হল, কারণ একটা নামহীন চিঠির জন্য অমৃতর এই কৌতূহল মাধুরী ভালোভাবে নিতে পারত না। একটা কিছু নাম থাকলেই চিঠিটা অতি সাধারণ। অকিঞ্চিৎকর হয়ে যায়।

বাড়িতে এসে চিঠি লিখে গেছে? চিঠি দেওয়ার দরকার কী ছিল, আমাকে বলে গেলেই তো পারত।

—সেই তো।

—দরকারটা কার, সেই মেয়েটির, না তোমার?

সঙ্গে-সঙ্গে অমৃতর মনে পড়ল চিঠিটার দ্বিতীয় লাইনটা। 'সেদিন যদি আপনার সময় না থাকে, তাহলে আর কিছু দরকার নেই।' এর মানে কী? এই বুধবার বেলা এগারোটায় দেখা কারাটাই চরম দরকারি। সেদিন দেখা না হলে মেয়েটি আর আসবে না?

বুধবার কি কোনও চাকরির ইন্টারভিউ আছে? না, কিছু মনে পড়ে না তো। কোনও চাকুরি প্রার্থিনী কি এরকম কড়া সুরে চিঠি লেখে?

অমৃত উত্তর দিলেন, মেয়েটিকে না দেখলে কী করে বুঝব, দরকারটা তার নাম আমার?

—আবার কবে আসবে বলেছে?

—এই বুধবার বেলা এগারোটায়। কিন্তু তখন তো আমি থাকব না। যদি সেই মেয়েটি আসে,

তুমি জেনে নিও তার বক্তব্য।

—সে আমার সঙ্গে দেখা না করে চিঠি দিয়ে গেছে, সে কি পরদিন এসে আমার কাছে কোনও গোপন কথা বলবে?

—গোপন কথা?

—সেই রকমই তো মনে হচ্ছে?

অমৃত উঁচু গলায় হেসে ব্যাপারটা উড়িয়ে দিলেন।

বুধবারের আলোচনা সভার জন্য তাঁকে একটা পেপার তৈরি করতে হবে। বিদেশি অতিথিদের সামনে পড়ার জন্য দু-তিনটি পেপার তাঁর আগে থেকে কেনাই আছে, তবু প্রসঙ্গ এবং দেশ অনুযায়ী সামান্য কিছু অদলবদল করে নিতে হয়।

রাত জেগে তাঁকে লেখাপড়া করতে হল। মাঝে-মাঝেই তাঁর মনঃসংযোগ নষ্ট করে দিতে লাগল একটা নামহীন সামান্য দু-লাইনের চিঠি।

পরদিনও তাঁর অনেক কাজ। বাড়ি ফিরলেন রাত সাড়ে ন'টায়। খাওয়ার টেবিলে বসে মাধুরী জিগ্যেস করল, সেই মেয়েটির চিঠিটা কোথাও খুঁজে পেলাম না তো কোথায় রেখেছিলে?

আজ সারাদিনে সে চিঠির কথা অমৃতর একবারও মনে পড়েনি। বুধবার মেয়েটির সঙ্গে তিনি দেখা করতে পারবেন না। সুতরাং তিনি ঠিকই করে ফেলেছিলেন যে ও নিয়ে আর মাথা ঘামাবেন না। কিন্তু মাধুরীর কৌতূহল মেটেনি, প্রসঙ্গটা সে-ই তুলল।

সরল, অবাকভাবে অমৃত বলল, কোন মেয়েটির চিঠি?

—বাঃ, তুমি যে কাল বললে, কোন রহস্যময়ী তোমার সঙ্গে গোপনে দেখা করতে চায়।

—যাঃ কীসব বলছ। চিঠিটা কে লিখেছে তা আমিই জানিই না।

—সেইজন্যই তো রহস্যময়ী বলছি। চিঠিটা তুমি লুকিয়ে রেখেছ কেন, আমাকে দেখাতে চাও না?

—কী মুস্কিল, লুকবো কেন, নিশ্চয়ই কোথাও ফেলে দিয়েছি।

—ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটেও তো দেখলুম না।

—তাহলে জানলা দিয়ে ফেলে দিয়েছি হয়তো। মনে নেই, তুমি ওয়েস্ট পেপার বাস্কেট পর্যন্ত খুঁজে দেখেছ? তোমার হঠাৎ সন্দেহ বাতিক হল নাকি?

—তুমি তো কোনও চিঠি পড়েই সঙ্গে-সঙ্গে ফেলে দাও না।

—এটার নাম নেই, ঠিকানা নেই, উত্তর দেওয়ার কোনও ব্যাপার নেই, সেটা রেখে কী করব?

—তুমি না বললে নন্দিতা না ছন্দা কী একটা নাম ছিল?

—ওই নামের কোনও মেয়েকে আমি চিনি না।

—আমাকে দেখালে আমি হয়তো হাতের লেখা দেখে চিনতে পারতুম। অরবিন্দর বউয়ের নামই তো নন্দিতা, তাকে তুমি চেনো না?

—অরবিন্দর বউ নন্দিতা এরকম অড্ ব্যবহার করবে কেন? সে তোমার সঙ্গে দেখা না করে ডাক বাক্সে চিঠি রেখে যাবে?

—অরবিন্দর সঙ্গে নন্দিতার সেপারেশন হয়ে যাবে শুনছি।

—মিঠু প্লিজ, এইসব বাজে কথা এখন বোলো না। অরবিন্দর সঙ্গে নন্দিতার যদি সেপারেশন হয়ই, সেজন্য কি আমি দায়ী নাকি?

—নন্দিতা আমাকে পছন্দ করে না। কিন্তু তোমার সঙ্গে খুব হেসে-হেসে গল্প করে।

বেশ কয়েক মুহূর্ত স্ত্রীর চোখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল অমৃত। তাঁর মাথায় রাগ চড়ে যাচ্ছে। এই রাগ সংযত করে [illegible] হেসে উঠতে পারলে ব্যাপারটা লঘু করা যায়। কিন্তু

মুখে কিছুতেই হাসি আসছে না। তাঁর খুব বলতে ইচ্ছে করছে, নন্দিতা তোমাকে পছন্দ না করলেও অরবিন্দ তোমাকে খুবই পছন্দ করে। আমি বাড়িতে না থাকলেও সে তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসে।

কিন্তু একথা বললেই কথা কাটাকাটি আরও বাড়বে। নিছক সময় নষ্ট। অরবিন্দ বা নন্দিতার জীবনে তাঁর বা মাধুরীর কোনও ভূমিকাই নেই। মাধুরী অরবিন্দ সম্পর্কে কোনও দুর্বলতা পোষণ করে না। তিনি ভালোভাবেই তা জানেন। সেই রকম নন্দিতার সঙ্গেও তাঁর কোনওরকম গোপন সম্পর্ক নেই।

তিনি গম্ভীরভাবে বললেন, কাল বেলা এগারোটায় মেয়েটি যদি আসে, তুমি তো তাকে দেখতেই পাবে। ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার কৌতূহলটা একটু চাপা দিয়ে রাখো না।

পরদিন সকালে স্নান করতে গিয়ে অমৃতর আবার মনে পড়ল সেই চিঠিটার কথা। তিনি দশটার মধ্যে খেয়ে দেয়ে বেরিয়ে যাবেন, তারপর মেয়েটি আসবে। সে লিখেছে, আজ দেখা না হলে তার আর কোনও দরকার নেই। আজ তার সঙ্গে অমৃতর দেখা হবে না। তারপর সে আর আসবে না কোনওদিন?

মাধুরী কি মেয়েটির সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবে? মাধুরীর সেরকম স্বভাবই নয়, সে বরং বেশি-বেশি ভদ্রতা দেখাবে। কিন্তু মেয়েটি যদি মাধুরীকে কোনও কথা বলতে না চায়? মাধুরী তাহলে অপমানিত বোধ করবে নিশ্চিত, পরে সেইজন্য খোঁচা দেবে অমৃতকে। আঃ কী অশান্তি, কোথাকার কোনও উটকো মেয়ে কেন এরকম বিঘ্ন ঘটাতে এল তাঁর জীবনে? কিন্তু কেউ দেখা করতে চাইলে তাকে ঠেকানোই বা যায় কীভাবে?

খেতে-খেতে দশটা কুড়ি বেজে গেল। যাদবপুরের বদলে আজ গোলপার্ক পর্যন্ত যেতে হবে। একটু দেরি হলেও ক্ষতি নেই। তা ছাড়া আজ তিনি ট্যাক্সি নিয়ে যেতে পারেন, তাঁর যাওয়া আসার ট্যাক্সি ভাড়া দিয়ে দেওয়া হবে।

লেখার ফাইলটা গুছিয়ে নিয়ে তিনি মাধুরীর গালে একটা টোকা দিলেন। মাধুরী বিচিত্রভাবে হেসে একবার দেওয়ালের বড় ঘড়িটা দেখল। মাধুরী আজ সকাল থেকেই কম কথা বলছে। ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে মাধুরী কি কিছু বলতে চাইল?

তাহলে আসি, বলে অমৃত নেমে গেলেন দোতলার সিঁড়ি দিয়ে। বড় রাস্তায় মোড় পর্যন্ত যেতে হবে ট্যাক্সি ধরবার জন্য। বাড়ি থেকে বোধহয় অমৃত এদিক-ওদিক তাকালেন। এগারোটায় আসবে বলেছে, তার একটু আগে যদি আসত মেয়েটি, তাহলে অন্তত চাক্ষুষ দেখা হয়ে যেত।

রাস্তা দিয়ে যে দু-একজন মহিলা হেঁটে যাচ্ছেন তাদের মুখের দিকে একটু বেশিক্ষণ ধরে চোখ রাখলেন অমৃত। এদের মধ্যে কেউ কি? বাস থেকে নেমে যে মেয়েটি লাল ছাতা মাথায় দিয়ে আস্তে-আস্তে হেঁটে আসছে, সে হতে পারে? কিন্তু সে মেয়েটি একবারও অমৃতর দিকে তাকাল না।

ট্যাক্সি পাওয়া গেল সহজেই। ঠিক আধঘণ্টা সময় আছে। মিনিটকুড়ির মধ্যেই পৌঁছে যাওয়া উচিত। অমৃত একটা সিগারেট ধরালেন। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউটে সিগারেট খাওয়া যাবে না। সেমিনার অন্তত ঘণ্টা দু-এক চলবে।

ট্যাক্সির জানলা দিয়ে আজ অমৃত পুরুষদের চেয়ে নারীদেরই বেশি দেখছেন। অন্যদিন অন্যমনস্ক থাকেন, কিছুই দেখেন না। আজ এগারোটার সময় একটি মেয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসবে। দেখা না পেয়ে ফিরে যাবে, আর কোনওদিন আসবে না। কেন সে আর একদিন আসতে পারবে না?

হাতে মিনিট দশেক সময় নিয়েই অমৃত গোলপার্ক পৌঁছে গেলেন। ট্যাক্সি ভাড়া মিটিয়ে, লেখার ফাইলটা হাতে নিয়ে তিনি নামলেন। গেটের কাছেই প্রফেসার মহাপাত্র দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর

দিকে হাত তুলতে গিয়ে অমৃতর কীরকম যেন ফাঁকা-ফাঁকা লাগল। কীসের যেন একটা অভাব। তিনি দু-হাত দিয়ে পাঞ্জাবির পকেট ছাড়ালেন।

তার পরেই তাঁর খেয়াল হল, চশমা আনা হয়নি!

বুকের মধ্যে ধক করে উঠল তাঁর। সব নষ্ট হয়ে যাবে। এমনি সময়ে তাঁর চশমার দরকার হয় না। কিন্তু প্লাস পাওয়ার চশমা ছাড়া তিনি একটি অক্ষরও পড়তে পারেন না। তিনি পেপার পড়ে শোনাবেন কী করে?

আর্তের মতন তিনি জিগ্যেস করলেন, প্রফেসার মহাপাত্র, আপনার চশমা কি প্লাস পাওয়ার?

প্রফেসার মহাপাত্র বললেন, আমার চশমা? মাইনাস নাইন। আমি তো প্রায় অন্ধ।

একমাত্র উপায় এক্ষুণি আবার বাড়ি ফিরে গিয়ে চশমা নিয়ে আসা। প্রথমে স্বাগত ভাষণ ইত্যাদিতে খানিকটা সময় যাবেই। চশমা না নিয়ে ওই সেমিনারে উপস্থিত থাকার কোনও মানেই হয় না।

তিনি বললেন, প্রফেসার মহাপাত্র, আমি চশমা ফেলে এসেছি, আনতে যাচ্ছি, আমার একটু দেরি হবে, আপনি বলে দেবেন।

তাড়াতাড়ি পেছন ফিরে তিনি আগের ট্যাক্সিটা ধরতে গেলেন। সেটা এর মধ্যেই চলে গেছে। মাঝ রাস্তায় ছুটোছুটি করে তিনি আর-একটা ট্যাক্সি ধরে ফেললেন দু-মিনিটের মধ্যে। ড্রাইভারকে বললেন, একটু তাড়াতাড়ি।

এইবার তাঁর আর-একটা কথা মনে হল। কেন তিনি বাড়ি যাচ্ছেন তা কি মাধুরী বুঝবে? মাধুরীর মন এমনিতে সন্দেহপ্রবণ নয়, সচরাচর সে তার স্বামীর কথা অবিশ্বাস করে না। কিন্তু আজ তার মনে হওয়া স্বাভাবিক যে ওই রহস্যময়ী মেয়েটির সঙ্গে দেখা করার জন্যই অমৃত সামান্য একটা ছুতো করে বাড়ি ফিরে এসেছেন। আজই তাঁর চশমাটা আনতে ভুল হয়ে গেল?

অমৃতর চোখ ঘড়ির দিকে। এগারোটা বেজে গেলে মেয়েটি এসেও ফিরে যাবে। অমৃত যখন বাড়িতে যাচ্ছেনই, তখন দু-এক মিনিটের জন্য তিনি মেয়েটির বক্তব্য শুনতে পারতেন।

এই ট্যাক্সিটা বেশ জোরে যাচ্ছে বটে, তবু এগারোটার মধ্যে পৌঁছতে পারবে না। কোনও মানে হয় না, কী মানে হয় না, চশমাটা ফেলে আসা? চশমাটার জন্য যদি ফিরেই যেতে হল, তা হলে এগারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে এলেই হত। এইসব সেমিনার-টেমিনারে দু-চার মিনিট দেরি হলে কী আসে যায়।

এগারোটা বেজে আট মিনিট, অমৃত বাড়ির সামনে নেমে পড়ে ড্রাইভারকে বললেন, আপনি ভাই একটু অপেক্ষা করুন, আমি এক্ষুণি ফিরে আসছি।

ড্রাইভারটি গাঁইগুঁই করতে যেতেই অমৃত ব্যাকুলভাবে বললেন, আমার বিশেষ দরকার। আমাকে এক্ষুনি ফিরতেই হবে।

এখন তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গেলে হাঁপিয়ে যেতে হয়, তবু অমৃত ভ্রূক্ষেপ করলেন না, তিনি প্রায় লাফিয়ে-লাফিয়ে উঠতে লাগলেন। অন্য কোনও ফ্ল্যাটের দরজা খোলা নেই। সিঁড়িটা একেবারে শূন্য। অমৃত তিনতলায় একটা দরজা খোলা ও বন্ধের শব্দ শুনলেন। সেই শব্দে অকারণেই তাঁর বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। এক্ষুণি যেন কিছু একটা ঘটবে। সে কি এসে চলে গেছে? মাধুরী কীরকম ব্যবহার করেছে তার সঙ্গে।

সিঁড়ির বাঁক ঘুরতেই অমৃত দেখলেন, তাঁর ফ্ল্যাটের বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটি যুবতী, তার খোলা চুল পিঠময় ছড়ানো, কাঁধে একটা ঝোলানো ব্যাগ, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা।

অমৃত থমকে দাঁড়িয়ে জিগ্যেস করলেন, তুমি?

ঠিক প্রেমের সংলাপের শুরুর মতন নয়। অমৃতের কণ্ঠে ফুটে উঠল খানিকটা নৈরাশ্য আর খানিকটা বিরক্তি।

মেয়েটি হাসল না, অবাক হল না, ঠান্ডা উদাসীনতা মাখা তার মুখ, চোখ দুটি সুদূর। সে আস্তে-আস্তে বলল, আমি চিঠি লিখে গিয়েছিলাম, আপনি বাড়িতে ছিলেন না।

অমৃত ঝাঁঝের সঙ্গে বললেন, এই সময় আমি বাড়িতে থাকি? উইক ডেতে...আমার অফিস-টফিস নেই? তুমি আরও আগে আসতে পারোনি?

মেয়েটি বলল, আমি পৌনে দশটায় হাওড়ায় পৌঁছেছি। জামশেদপুর থেকে সোজা—

'তুমি...তুমি একটা চিঠি লিখে গেছ, যা পড়ে কিছুই বোঝা যায় না, নিজের নামটাও লেখা নেই...

'নাম লিখিনি বুঝি? তাহলে ভুলে গেছি।'

যেন এটা একটা অতি তুচ্ছ ভুল, চিঠির নীচে নাম না লেখা যেন এমন কিছুই অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। মেয়েটি নিষ্পলকভাবে চেয়ে আছে অমৃতর মুখের দিকে।

এমনসময় আবার দরজা খুলে গেল। দরজার ওপাশে মাধুরী। তার ঠোঁটে চাপা হাসি, যেন সে জানত, অমৃত ফিরে আসবেনই।

এক ধাপ ওপরে উঠে এসে অমৃত বললেন, মাধুরী এর নাম নীলিমা।

হাসিটি অক্ষুণ্ণ রেখে মাধুরী বলল জানি, আমার সঙ্গে এই মাত্র আলাপ হয়েছে।

অমৃত তবু বললেন, নীলিমা হচ্ছে আমার বন্ধু প্রদীপের বোন। জামশেদপুরে থাকে। ও যখন খুব ছোট ছিল তখন আমি ওকে কিছুদিন পড়িয়েছি।

মাধুরী আবার বলল, জানি, শুনেছি। আমি ওকে বসতে বললুম, বসতে চাইল না।

একটা কথা অমৃতর মাথায় ঝিলিক দিয়ে গেল। মাধুরী আর নীলিমা দুজনেই ভেবেছে যে তিনি ইচ্ছে করে ফিরে এসেছেন। তিনি প্রায় মনে-পড়া মানুষের মতন ব্যাকুলভাবে বললেন, মাধুরী, আমার চশমা!

মাধুরী জিগ্যেস করল, তোমার চশমা, কী হয়েছে?

অমৃত প্রথমে মাধুরীর দিকে চেয়ে বললেন, চশমাটা ভুল করে ফেলে গেছি। সেইজন্য বাধ্য হয়ে ফিরে আসতে হল, পেপার পড়তে পারব না। খাবার টেবিলের ওপর বোধহয় চশমাটা রয়েছে।

তারপর নীলিমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, আমি এখন ভীষণ ব্যস্ত, আমার এক মুহূর্ত সময় নেই।

মাধুরী বলল, কই, খাওয়ার টেবিলে তো তোমার চশমা নেই।

নীলিমা বলল, আপনি ব্যস্ত? ঠিক আছে, আমি চলে যাচ্ছি।

অমৃত মাধুরীর উত্তরটা অপেক্ষা করে নীলিমাকে বললেন, তোমার যদি বিশেষ কিছু জরুরি কথা থাকে, চটপট বলে ফেলো!

নীলিমা বলল, না থাক। আপনি ব্যস্ত। আমি চলে যাচ্ছি।

—তুমি আর একদিন আসতে পারো না? এই রবিবার? এখন তো কলকাতাতে থাকবে নিশ্চয়ই কয়েকদিন।

—নাঃ থাক, পরে আর দরকার নেই।

না বললে নয়?

মাধুরী বলল, তুমি একটু শুনে নাও না, এতদূর থেকে এসেছে।

অমৃত বললেন, বলতে তো বলছি, এই করে আরও সময় নষ্ট হচ্ছে।

মাধুরী বলল, বাইরে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ওরকম ভাবে কথা হয় নাকি? ভেতরে এসো। ও বোধহয় আমার সামনে বলতে লজ্জা পাবে।

নীলিমা একবার মাধুরীর দিকে তাকাল, কিন্তু প্রতিবাদ করল না!

অমৃত বললেন, আমার সেমিনার শুরু হয়ে গেছে। আর বেশি দেরি হলে একটা লজ্জার ব্যাপার হবে।

মাধুরী ভ্রূভঙ্গি করে বলল, ভারী তো সেমিনার।

নীলিমা অমৃতর পাশ কাটিয়ে তরতর করে নেমে যাচ্ছিল, অমৃত তার একটা হাত চেপে ধরে রূঢ়ভাবে বললেন, কী ব্যাপার? কী হয়েছে তোমার?

মাধুরী বলল, এই, সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ওরকম করে না। লোকে কী ভাববে।

তারপর সে খুব নরমভাবে নীলিমাকে বলল, তুমি ভাই রাগ করে চলে যেও না। ও মাঝে-মাঝে এরকম অদ্ভুত ব্যবহার করে। ভেতরে এসে বসো, প্লিজ।

মাধুরী নিজে এগিয়ে এসে নীলিমার হাত ধরে ভেতরে নিয়ে গেল। অমৃতকে আসতে হল পেছনে-পেছনে।

মাধুরী স্বামীকে বলল, তোমরা বাবলুর ঘরে বসে কথা বলো। ওই ঘরটা ফাঁকা আছে। আমি ততক্ষণ একটু চা করি।

অমৃত বুঝলেন, আর কথা বাড়ালে আরও সময় নষ্ট হবে। ভেতরে-ভেতরে তিনি ফুঁসতে শুরু করেছেন। নীলিমা তাঁর জীবনে একটা অশান্তি ঘটাতে এসেছে। নিশ্চয়ই কোনও কারণে প্রশান্তর সঙ্গে ওর ঝগড়া হয়েছে। তাতে অমৃতর কী করার আছে।

বাবলুর ঘরের দরজাটা টেনে খুলে তিনি নীলিমাকে বললেন, এসো। আমি মিনিট পাঁচেকের বেশি সময় দিতে পারব না।

ঘরে ঢুকতে-ঢুকতে তিনি চেঁচিয়ে বললেন, মাধুরী, আমার চশমাটা একটু খুঁজে দাও।

অমৃত বাবলুর পড়ার টেবিলের সামনের চেয়ারটায় বসে নীলিমাকে অন্য একটা চেয়ার দেখিয়ে দিলেন। কিন্তু নীলিমা বসল না। চেয়ারের পিঠ ধরে দাঁড়িয়ে সে চেয়ে রইল অমৃতর দিকে।

হাঁটু দোলাতে-দোলাতে অমৃত জিগ্যেস করলেন, কী হয়েছে তোমার? এবারে বলো।

নীলিমা বলল, আমি আজ আত্মহত্যা করব।

কথাটাতে বিন্দুমাত্র গুরুত্ব দিলেন না অমৃত। বিশুদ্ধ ন্যাকামি বলে মনে হল তাঁর। সামান্য মান-অভিমানের ব্যাপার হলেই মেয়েরা এরকম মরে যাওয়ার কথা বলে। সারা জীবনে প্রত্যেক মেয়েই বোধহয় প্রায় এক হাজার বার আত্মহত্যা করে। তা ছাড়া, আরও ভাবলেন, নীলিমা যদি আত্মহত্যা করতে চায় করুক না। তাঁর বাড়িতে এসে এরকম নাটক করার কী মানে হয় অমৃতর কী দায়িত্ব আছে? নীলিমার সঙ্গে তো তাঁর কখনও ভাব-ভালোবাসার সম্পর্ক হয়নি। যদিও মাধুরী বোধহয় সেইরকমই ভাবছে, একে যুবতী মেয়ে, তার ওপরে আবার বন্ধুর বোন, এ যেন এক বাঁধা ফর্মুলা।

তিনি নীরস গলায় জিগ্যেস করলেন, কেন?

আজ রাত্তিরে প্রশান্ত অন্য একজনকে বিয়ে করছে।

এবারে দারুণ চমকে উঠলেন অমৃত। কথাটা যেন বুলেটের মতন তাঁর কানে বিঁধল। এমনই অপ্রত্যাশিত এই বাক্যটি যে ভালো করে তার মাথাতেই ঢুকতে চাইল না।

—যাঃ, কী বলছ তুমি পাগলের মতন। প্রশান্ত...অন্য একজনকে...

—আপনার কাছে তো আমি মিথ্যে কথা বলতে আসিনি।

—অন্য মেয়েকে মানে কাকে?

—আপনি তাঁকে চিনবেন না। জামশেদপুরেরই মেয়ে।

—এরকম কিছু কি...হঠাৎ হল? তুমি আগে টের পাওনি? আগে আমায় কিছু জানাওনি কেন?

—আগে আপনার জানালে কী হত? সে যদি আমার কথাই না ভাবে, সে কি আপনার কথা শুনত? শুনলেও কি সেটা আমার পক্ষে সম্মানজনক হত?

—প্রশান্ত...প্রশান্ত এমন কাজ করবে? এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না।

—আজ সন্ধেবেলায় ওদের রেজিস্ট্রি হবে।

তুমি জামশেদপুর ছেড়ে চলে এলে? তুমি বাধা দিতে পারলে না?

—বাধা, এখন যদি কোনওক্রমে প্রশান্তর বিয়ে ভেঙেও যায়, তা হলেও কি আমি আর কোনও দিন ওর সঙ্গে কথা বলতে পারব? আমার পক্ষে তা সম্ভব?

অমৃত একবার বলতে চাইলেন, তুমি যদি প্রশান্তকে ধরে রাখতে না পারো, তার জন্য কি আমি দায়ী? কিন্তু একথাটা উচ্চারণ করতে পারলেন না। এ ব্যাপারে তিনি নিজের দায়িত্ব পুরোপুরি অস্বীকার করতে পারেন না।

আজ থেকে তিন বছর আগে, তাঁর বন্ধু প্রদীপের বাড়িতে এই নীলিমা আর প্রশান্তকে নিয়ে একটা বিরাট গোলমাল হয়েছিল। প্রশান্তকে নীলিমার দাদা কিংবা বাবা-মায়ের একেবারেই পছন্দ নয়। অসবর্ণ বিয়েতেও ওদের ঘোর আপত্তি। অমৃত তখন প্রেমের পক্ষ নিয়েছিলেন। তিনি নীলিমাকে বলেছিলেন, তুমি যদি মন ঠিক করে থাকো, তাহলে তুমি মা-বাবা-দাদার কথা শুনো না। প্রশান্ত আমার ছাত্র ছিল, আমি মানুষ চিনি। সে খাঁটি মানুষ।

বাড়ির সঙ্গে ঝগড়া করে নীলিমা জামশেদপুরে একটা মাস্টারি নিয়ে চলে গিয়েছিল। কিন্তু বিয়েটা তখনই হয়নি। কারণ প্রশান্ত বলেছিল, ওর একজন বড় বোন আছে, তার বিয়ে না হলে বাড়িতে বউ নিয়ে যাওয়া তার পক্ষে খানিকটা লজ্জার। সেই বোনের বিয়ের চেষ্টা চলছিল, নীলিমাও গরজ করেনি, প্রশান্তর সঙ্গে তার প্রায়ই দেখা হত, আর সব কিছুই স্বামী-স্ত্রীর মতন। আজ যদি রেজিস্ট্রিটাও হয়ে থাকত...

—প্রশান্তটা বড় স্কাউন্ড্রেল?

নীলিমা একটুও উত্তেজিত না হয়ে বলল, তার যদি অন্য একজনকে বেশি ভালো লেগে থাকে, সেজন্য খুব বেশি দোষ দেওয়া যায় কী? মানুষের জীবনে তো ও রকম হয়ই। প্রশান্ত আমার কাছে ক্ষমা চেয়েছে। কিছু গোপন করেনি, সব খুলে বলেছে।

—কিন্তু তুমি?

—আমার কি আর অন্য কোনও উপায় আছে?

এই সময় খুব জোরে বেজে উঠল ট্যাক্সির হর্ন। সেই হর্ন শুনে কেঁপে উঠলেন অমৃত। ট্যাক্সিটার কথা ভুলেই গিয়েছিলেন তিনি। ড্রাইভার নিশ্চয়ই তাঁকে মিথ্যুক বা জোচ্চোর ভাবছে। ভাড়া না দিয়ে ফ্ল্যাট বাড়িতে পালিয়ে যাওয়া...মাধুরী রান্নাঘরে গিয়ে মনে-মনে হাসছে নিশ্চয়ই। সে ভাবছে, বন্ধুর বোন মানেই প্রাক্তন প্রেমিকা, সেই প্রেমিকা এসে বিপদে ফেলে দিয়েছে অমৃতকে...আলাদা ঘরে বসে গোপন কথা...ওদিকে সেমিনার শুরু হয়ে গেছে, অমৃতকে খোঁজাখুঁজি হচ্ছে। বিশিষ্ট অধ্যাপক অমৃত চৌধুরী কথা দিয়ে রাখবেন না, এ কেউ বিশ্বাস করতেই পারবে না, প্রফেসার মহাপাত্র বলবেন, ওঁকে যেন দেখলাম একবার...

এই সবকিছুর মধ্যে একটি মেয়ের আত্মহত্যার প্রস্তাব...তিনি কী উত্তর দেবেন। শুকনো উপদেশ দেওয়ার কোনও মানে হয় না। প্রশান্ত সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, আমি মানুষ চিনি, মানুষ চিনতে তো ভুল হতেই পারে, সেটা এমন কিছু অপরাধ নয়, তবু নীলিমা তার মধ্যে একটা অপরাধবোধ জাগিয়ে দিতে এসেছে...

আবার ট্যাক্সির হর্ন, সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়ে উঠল অমৃতর। এই মুহূর্তে যেন সবচেয়ে জরুরি ব্যাপার ওই ট্যাক্সি ড্রাইভারের কাছে সম্মান রক্ষা করা, লোকটি যদি চেঁচামেচি শুরু করে...

ঝট করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন অমৃত। খাবারের টেবিলের সামনে তাঁর চশমাটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মাধুরী, ঠোঁটে সেই হাসি, আবার সে দেওয়াল ঘড়িটা দেখল।

অমৃত কাছে আসতেই মাধুরী বলল, আজ আর সেমিনারে গিয়ে দরকার নেই।

মাধুরীর হাত জড়িয়ে ধরে ব্যাকুলভাবে অমৃত বলল, আমার জন্য সবাই অপেক্ষা করছে, আমাকে যেতেই হবে। মাধুরী, তুমি মেয়েটির সঙ্গে কথা বলো, প্লিজ, ওকে আটকে রাখো, দ্যাখো যদি কোনও সাহায্য করতে পারো, আমার জন্য এইটুকু করো, প্লিজ...ট্যাক্সিটা চলে গেলে খুব বিপদ হবে...

চশমাটা নিয়ে তিনি দৌড়ে নেমে গেলেন সিঁড়ি দিয়ে।

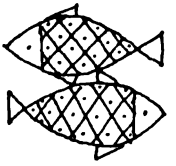

অন্য আয়না

ব্যারাকপুরে এক বন্ধুর বাড়িতে আমার নেমন্তন্ন ছিল, সেখান থেকে রাত্তিরে আর বাড়ি ফেরা হয়নি। পরদিন সকালে ফিরতে-ফিরতে সাড়ে আটটা বেজে গেল। দরজা খুলেই বউদি বললেন, একজন ভদ্রমহিলা তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, প্রায় আধঘণ্টা ধরে বসে আছেন।

অনেক রাত পর্যন্ত আড্ডা হয়েছে, ভালো করে ঘুম হয়নি। তা ছাড়া অফিসে দরকারি কাজ আছে, ছুটি নেওয়ারও উপায় নেই, এক্ষুনি চান খাওয়া সেরে ছুটতে হবে। এই সময় ভিজিটর এলে কারুর ভালো লাগে? তবু, মহিলা বলে কথা, কিছুটা সময় দিতেই হবে।

বসবার ঘরে ঢুকে দেখি ঠিক মাঝখানের চেয়ারটিতে একজন মহিলা বেশ রাজেন্দ্রাণীর ভঙ্গিতে বসে আছেন। পরনে দামি শাড়ি, গায়ের শালটিও বেশ কারুকার্য করা। মেয়েদের বয়েস আমি ঠিক ধরতে পারি না, তবে এই মহিলার বয়েস যে অন্তত পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন হবে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। মুখের চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে, ফর্সা টুকটুকে রং বলে তা স্পষ্ট বোঝা যায়, মাথার ঈষৎ কোঁকড়া চুল কিন্তু সম্পূর্ণ কালো, মনে হয় রং করা। ভদ্রমহিলা তার যৌবনকালে যে যথেষ্ট সুন্দরী ছিলেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

আমি খানিকটা অভদ্রের মতন বেশি ব্যস্ততা দেখিয়ে বললুম, নমস্কার, কী ব্যাপার বলুন তো?

ভদ্রমহিলা একটি পত্রিকার পাতা ওলটাচ্ছিলেন, মুখ তুলে হাসিমুখে আমার দিকে মুহূর্ত চুপ করে তাকিয়ে রইলেন। তারপর ভাঙা গলায় বললেন, তুমিই সুনীল? আমি তোমার জন্য কতদূর থেকে এসেছি বলো তো? তুমি তো রাত্তিরে বাড়িতে ফেরোনি। যাও, মুখ-টুক ধুয়ে এসো, তারপর কথা হবে। আমি বসছি, আমার তাড়া নেই।

কিন্তু আমার যে তাড়া আছে! সেটা তক্ষুনি মুখের ওপর বলা যায় না। ভদ্রমহিলার চেহারা ও ব্যক্তিত্বে একটা সম্ভ্রান্ত ভাব আছে। ভদ্রমহিলার বয়েস আমার থেকে যথেষ্ট বেশি হলেও আমিও তো আর ছেলেমানুষ নই, প্রথম আলাপে আমাকে কেউ চট করে তুমি বলে না!

বসবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বউদিকে জিগ্যেস করলুম, কে ইনি?

বউদি মুচকি হেসে বললেন, উনি দিল্লিতে থাকেন, শুধু তোমার সঙ্গেই দেখা করার জন্য কলকাতায় এসেছেন। আমার সঙ্গে গল্প করছিলেন। দিল্লিতে ওঁর স্বামীর কীসের যেন বড় ব্যবসা। তিনটি ছেলেমেয়ে আছে। কাল রাত্তিরে কলকাতায় পৌঁছেছেন। আজ সক্কালেই ঠিকানা খুঁজে-খুঁজে এসেছেন তোমার সঙ্গে দেখা করতে।

বাথরুমে গিয়ে টুথব্রাশটা খুঁজতে-খুঁজতে বললুম, বউদি, দু-কাপ চা করে দাও। গেল আজ

অফিসের দেরি হয়ে! কেন যে উইকডেতে সকালবেলা এরা আসে! কোনও সেন্স নেই!

বউদি বললেন, লোকে ভাবে কবি-টবিদের কোনও অফিস থাকে না, তারা চাকরি-বাকরি করে না! তারা বসন্তের বাতাস খেয়ে থাকে। তা বলে ভদ্রমহিলার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার কোরো না। অতদূর থেকে এসেছেন।

খানিকবাদে আবার বসবার ঘরে এসে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বললুম, হ্যাঁ বলুন। আপনি দিল্লিতে থাকেন?

ভদ্রমহিলা সে কথার উত্তর না দিয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন এক দৃষ্টিতে। তারপর আস্তে-আস্তে বললেন, দাঁড়াও, আগে তোমাকে দেখি ভালো করে। কত তোমার কথা শুনেছি, তোমার কত লেখা পড়েছি। এর আগে তোমাকে চোখে না দেখলেও তুমি যে আমার অনেক দিনের চেনা গো!

মনে-মনে ভাবলুম, এই রে! এইরকম ধানাই-পানাই শুরু করলে কত সময় লাগিয়ে দেবে, তার কোনও ঠিক আছে! এরা ভাবে, নিজেদের কোনও কাজ না থাকলে অন্যদেরও কোনও কাজ থাকতে পারে না।

আমি চা শেষ করে একটা সিগারেট ধরাবার পর তিনি বললেন, তুমি কেমন আছ, সুনীল? তোমার শরীর ভালো আছে তো?

আমি অধৈর্যের সঙ্গে বললুম, আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার শরীর খুব ভালো আছে।

ভদ্রমহিলা বললেন, ওমা, তুমি আমার সঙ্গে আপনি, আজ্ঞে করে কথা বলছ কেন? আমি যে তোমার অনেক দিনের বন্ধু। আমাকে তুমি-তুমি বলবে!

এসব সিনেমা-সিনেমা সংলাপ, আমার পছন্দ হয় না। অবশ্য ভদ্রমহিলার বয়েস যদি অর্ধেক হত, তাহলে আমার মরেন ভাব কী হত তা বলা যায় না। উনিই বা এই বয়েসে এভাবে কথা বলছেন কেন? যে বয়েসে যা মানায়!

—আপনি কি কলকাতায় কিছুদিন থাকবেন? পরে যদি আর-একদিন আসেন, কোনও রবিবার-টবিবার, আজ আমাকে অফিসে যেতে হবে।

—তোমাকে আজ অফিসে যেতে হবে না! আমি কতদূর থেকে এসেছি তোমার সঙ্গে কথা বলার জন্য!

তিনি হ্যান্ডব্যাগ খুলে একটা নতুন কলম বার করে বললেন, এই নাও, এটা তোমার জন্য এনেছি।

লেখকদের নাকি কলম সম্পর্কে দুর্বলতা থাকে। কোনও-কোনও লেখকের একশো-দুশো কলম আছে শুনেছি। আমার ওসব বাতিক নেই। আমি সাধারণ ডট পেনে লিখি। হাতের কাছে যখন যেটা পাই। ভদ্রমহিলার কলমটা বেশ দামিই মনে হচ্ছে। দামি কলম নিয়ে আমি কী করব? দামি কলমের জন্য দামি কাগজ দরকার, সেরকম আজকাল পাওয়াই যায় না। কিন্তু কেউ কিছু উপহার দিলে সেটা ফিরিয়ে দেওয়া অভদ্রতা। আমি শুকনোভাবে বললুম, ধন্যবাদ!

—তুমি এই কলমটা দিয়ে আমার নামে একটা সুন্দর কবিতা লিখবে, কেমন?

আমি মুখ নীচু করে হাসি গোপন করলুম। ভদ্রমহিলা আবার বললেন, তুমি কাল রাত্তিরে বাড়ি ফেরোনি। কবিরা খুব বোহেমিয়ান হয়! আমারও খুব রাত জাগতে ভালো লাগে। এক-একদিন ইচ্ছে করে সারারাত রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়াই!

এবারে আমার অন্যরকম একটা সন্দেহ হল। ভদ্রমহিলার কি নিজের বয়েসটা একদম খেয়াল নেই? উনি অনায়াসেই আমার কাকিমা বা পিসিমা হতে পারতেন। উনি এসব কী বলছেন?

—আপনার নাম কী?

—ও, এই দ্যাখো, আমার নামটাই বলা হয়নি এখনও। আমার নাম রত্না রায়চৌধুরী। আমাদের

বাড়ি ছিল বহরমপুরে। বিয়ের পর থেকে দিল্লিতেই আছি। সে অনেকদিন হয়ে গেল। প্রায় চল্লিশ বছর। কলকাতাতে খুব কম আসা হয়। কাল রাত্রে পৌঁছেই ফোন করলুম রবিশঙ্করকে। ওকে খবর না দিলে রাগ করবে তো। কিন্তু ওর সঙ্গে কথা হল না।

—কাকে ফোন করেছিলেন?

—রবিশঙ্করকে। তুমি চেনো না?

শুধু রবিশঙ্কর নামটা শুনলে একজনের কথাই মনে পড়ে। তাকে প্রায় সারা পৃথিবীর লোকই এখন চেনে। কিন্তু মহিলাটি এমনভাবে কথাটা বললেন যেন রবিশঙ্কর আমার কোনও বন্ধুর নাম।

সন্দেহ কাটাবার জন্য আমি বললুম, রবিশঙ্কর মানে...যিনি সেতারে...

—হ্যাঁ, তা ছাড়া আর ক'জন রবিশঙ্কর আছে? তুমি জানো, অত বিখ্যাত হলে কি হয়, মানুষটা বড় দুঃখী! বড় একা!

রবিশঙ্করের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে আমার কিছু জানা নেই। অফিসের দেরি করে সে কথা আলোচনা করাও কি আমার পক্ষে সঙ্গত?

আমি ভুরু কুঁচকে তাকাতেই তিনি আমার দিকে বালিকার মতন ভঙ্গি করে রহস্যময় হাসি হাসলেন। তারপর বললেন, আমাকে কথা বলতে দিল না। ওর বউ ফোনটা ধরেছিল, আমার গলা শুনেই চিনতে পেরেছে। হিংসে করে তো খুব আমাকে!

রবিশঙ্করের বউ! তাও আবার কলকাতায়? এসব কি উলটোপালটা বলছেন মহিলা। আমার কেমন যেন খটকা লাগল। আর রবিশঙ্কর যতই বিখ্যাত হোন, আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে কেউ রবিশঙ্কর সম্পর্কে গল্প করে যাবেন, এটাও ঠিক মানা যায় না বোধহয়।

আমি খানিকটা কঠোরভাবেই এবার জিগ্যেস করলুম, আপনি কি আমার কাছে কোনও দরকারে এসেছেন?

আমার কণ্ঠস্বরের উষ্মা গায়ে না মেখে রত্না রায়চৌধুরী আবার হাসলেন। আবার তার দামি চামড়ার হাতব্যাগটা খুলে একটি ছোট্ট লাল রঙের নোট বই বার করে বললেন, তোমার কাছে তো বিশেষ দরকারে এসেছি। তোমার সাহায্য ছাড়া চলবে না। আমি কবিতা লিখেছি, তুমি দেখে দেবে।

আমি দীর্ঘশ্বাস গোপন করলুম। এরকম উপদ্রব আমাকে প্রায়ই সহ্য করতে হয়। তবে এরকম বেশি বয়েসি কোনও মহিলা আগে আসেননি। ভদ্রমহিলার বিয়ে হয়েছে চল্লিশ বছর আগে, তাহলে এর বয়েস ষাটের আশেপাশে হবেই। তবে ওর মুখের হাসিটি অল্প বয়েসি মেয়েদের মতন।

ছোট খাতাটি হাতে নিয়ে দেখলুম, সেটা প্রায় ভরতি কবিতায়। প্রথম কবিতাটির নাম 'তুমি'। খুবই আবেগময় প্রেমের উচ্ছ্বাস, ভাষা খুবই কাঁচা, কোনও মতেই কবিতা পদবাচ্য নয়। পরের পাতাগুলোতেও এ একই ব্যাপার, বিশেষ কোনও একজনকে উদ্দেশ্য করেই এগুলি লেখা হয়েছে, তা স্পষ্ট বোঝা যায়।

সব কবিতাগুলো পড়বার দরকার নেই। তবু আমি খাতাটা হাতে নিয়ে খানিকটা সময় নিলুম। অন্যদের যা বলি তা কি একেও বলা যাবে? অল্পবয়েসি ছেলেমেয়েদের বলি ছন্দের চর্চা করতে, অনেক লিখে আগে হাত পাকাতে। ষাট বছরের এক মহিলা কবে আর হাত পাকাবেন?

রত্না রায়চৌধুরী বললেন, এই আমার জীবনের প্রথম কবিতা, বুঝলে সুনীল। আমাদের বয়সে কেউ কোনওদিন কবিতা লেখেননি, আমি নিজেও তো জীবনে কখনও কবিতা লেখার কথা ভাবিনি। দেখতেই তো পাচ্ছ, বাংলা বানান ভালো জানি না। এখন বাংলার থেকে হিন্দি ভালো বলতে পারি।

—তাহলে হঠাৎ বাংলায় কবিতা লেখার কথা মনে হল কেন আপনার?

—ঠিক বলেছ, হঠাৎ! একদম হঠাৎ! কেন যে লিখলুম তা আমি নিজেই জানি না। হঠাৎ একদিন মাঝরাত্তিরে ঘুম ভেঙে গেল। আমি ধড়মড় করে উঠে বসলুম, তারপর আমার মুখ দিয়ে

বেরিয়ে এল, 'ভুল করেছি, তোমার কথা শুনিনি, তুমি ভুল বুঝো না আমায়, ওগো, কান্না আমার ঝর্ণা হয়ে হারিয়ে গেল কোথায়!' আমি নিজেই একেবারে অবাক। এর মানে কী? এরকম কবিতার মতন কথা কী করে বেরিয়ে এল আমার মুখ দিয়ে? শুধু একটা নয়, আরও বলতে লাগলুম, বুঝলে! আমার স্বামী পাশের খাটে ঘুমিয়ে আছে, আজকাল ও আমার সঙ্গে শোয় না, আমি জোরে এইসব বলে যাচ্ছি, তাও জাগল না। রোজ ড্রিংক করে তো, সহজে ঘুম ভাঙে না!

আমি মুখ নীচু করে হাসতে লাগলুম। এ যে দেখছি বাল্মীকির মতন ব্যাপার। হঠাৎ একদিন মুখ দিয়ে ঝরঝর করে বেরিয়ে এল কবিতা!

মুখ তুলে দেখি রত্না রায়চৌধুরী স্থিরভাবে তাকিয়ে আছেন, তাঁর দু-চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে।

এই অবস্থায় কঠোর কথা বলা যায় না। আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, খাতাটা রেখে যান, আমি পরে ভালো করে পড়ে রাখব। আজ আমায় এখন বেরুতেই হবে।

উনি হাত তুলে বললেন, আর একটু বসো, প্লিজ! আমি অনেকদূর থেকে এসেছি! আমার আর-একটু কথা আছে।

হতাশভাবে বসে পড়ে বললুম, বলুন!

—যেদিন রাত্তিরে এরকম হল, তার পরদিন সকালে ভাবলুম, ওসব বোধহয় স্বপ্ন দেখেছি। কিন্তু লাইনগুলো সব মনে আছে। এইসব লাইন কে বানাল? লিখে রাখলুম এই খাতাটায়। তারপর দু-তিনদিন আর কিছু হল না। খাতা নিয়ে কিন্তু লেখার চেষ্টা করলুম, কিছু মাথাতেই আসে না ছাই! একটা লাইনও বানাতে পারি না। তারপর আবার একদিন মাঝরাত্তিরে ঘুম ভেঙে গেল, কে যেন জোর করে আমায় টেনে তুলল, আবার আমি গড়গড় করে কবিতা বলতে লাগলুম, খুব ভালো কবিতা, এসব আগে কেউ লেখেনি, কোনও বইতে নেই, আমার নিজেরই বানানো।

—এসব কবিতা অন্য কারুকে দেখিয়েছেন?

—প্রথমে ভেবেছিলুম, শুধু একজনকেই দেখাব। কিন্তু তাকে যে পাওয়া যায় না। কখন কোথায় থাকে তার ঠিক নেই, সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ায়। তাই একদিন আমার স্বামীকে দেখলুম। ও কী বলল জানো?

—কী?

—কী বল তো? আন্দাজ করো!

—দেখুন আপনার স্বামীকে তো আমি চিনি না, কী করে আন্দাজ করব তিনি কী বলবেন?

—ও বলল, আবার তুমি পাগলমি শুরু করেছ? এসব কবিতা না তোমার মুণ্ডু। ও খাতাটা ছুঁড়ে ফেলে দাও আস্তাকুঁড়ে! ভাবতে পারো, কেউ বলতে পারে এরকম কথা?

আমার মনে হল, ভদ্রমহিলার স্বামী খুব একটা ভুল কিছু বলেননি। কিন্তু আমি কৃত্রিম সমবেদনা দেখিয়ে বললুম, তাই নাকি?

—হ্যাঁ, ও তো এই রকমই কথা বলে। সারা জীবনই তো আমার কোনও ব্যাপারে ওর উৎসাহ নেই। আমি বিয়ের আগে নাচ শিখেছিলুম জানো, ও নাচ বন্ধ করে দিয়েছে। গানের গলা ছিল, বাপের বাড়ি থেকে হারমোনিয়াম নিয়ে গিয়েছিলুম, সেটাকে সারাবার নাম করে একটা দোকানে দিয়ে এল, আর কোনওদিন নিয়ে এল না! তার [illegible]লে? ও চায় না, আমি নাচি, গান করি। কারুর সঙ্গে মিশতেও দিত না। সবসময় আগলে-আগলে রাখত। আমি সুন্দরী ছিলাম তো, তাই ভয় ছিল আমাকে যদি অন্য কেউ নিয়ে যায়!

এবার আমি ভালো করে তাকিয়ে দেখলুম, ভদ্রমহিলা যে কিছুদিন আগেও যথেষ্ট সুন্দরী ছিলেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই। উনি তখন আমার কাছে আসেননি কেন?

রত্না রায়চৌধুরী আঁচল দিয়ে চোখ মুছে বললেন, গান-বাজনা, নাচ সব ছেড়ে দিলুম কেন জানো? ওর জন্য। ওকে আমি সত্যি ভালোবাসতুম যে। ও তার কোনও মূল্য দেয়নি। বাড়িতে

পুতুল বানিয়ে রেখেছিল। এখন তাকিয়েও দেখে না আমার দিকে। একসময় একজন আমার মূল্য বুঝেছিল, আমাকে ভালোবেসেছিল, তখন বুঝিনি, তখন তার ডাকে সাড়া দিইনি।

ভদ্রমহিলাকে এখন কথার নেশায় পেয়ে বসেছে। আমি আর-একটি সিগারেট ধরিয়ে জিগ্যেস করলুম, আপনি আমার ঠিকানা পেলেন কোথায়?

হঠাৎ যেন ঘোর ভেঙে গেল। কথা থামিয়ে ভদ্রমহিলা আমার দিকে আবার তাকিয়ে রইলেন একদৃষ্টে। বাইরে কেউ দরজার বেল দিতেই আমাকে উঠে যেতে হল। সেরকম কেউ নয়, একজন ফেরিওয়ালা।

ফিরে এসে দাঁড়িয়েই বললুম, তাহলে এই পর্যন্ত আজ থাক। আপনি এই রবিবার সকালে আসুন না।

মিনতি-মাখা চোখ হলেও খানিকটা আদেশের সুরে তিনি বললেন, আর একটু বসো। আমি একা চলাফেরা করতে পারি না। আমার ভাসুরের বাড়িতে এসে উঠেছি। আজ ওঁদের একটা গাড়ি পেয়েছি। রোজ তো পাব না।

আমি আবার বসলুম।

—তোমার লেখাটেখা আমি আগে বিশেষ পড়িনি। বই পাই না তো ওখানে। আমার এক দেওরের মেয়ে কবিতা-টবিতা লেখে। তাকে আমার এই খাতাটা একদিন পড়ালুম। ও বললে, জ্যাঠাইমা, তুমি এগুলো সুনীলবাবুকে দেখাও, উনি ঠিকঠাক করে ছাপার ব্যবস্থা করে দেবেন।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বিমর্ষ মুখ করে বললুম, কিন্তু আমার তো ছাপিয়ে দেওয়ার কোনও ক্ষমতা নেই। আমি পড়ে মতামত দিতে পারি।

একটু আগে কাঁদছিলেন মহিলা, এখন মুখে ঝিকমিক করছে হাসি। মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, তুমি ইচ্ছে করলে নিশ্চয়ই পারো। তোমার কত জায়গায় চেনাশুনো। তুমি আমার কবিতাগুলো একটু ছাপিয়ে দাও, সুনীল আমার বিশেষ দরকার আছে। কী দরকার বলো তো?

—আপনিই বলুন!

—ওকে তো আমি নিজে গিয়ে এই কবিতাগুলো দেখাতে পারব না। ওর বউ যে আমাকে হিংসে করে। টেলিফোন করলে টেলিফোন দেয় না, এখন ও কলকাতায় আছে আমি জানি, কাগজে দেখেছি, তবু ওর বউ বলল, আমরা সঙ্গে এখন দেখা করা সম্ভব নয়। আমার গলা শুনেই চিনে ফেলেছে তো।

আপনি কার কথা বলছেন?

—রবিশঙ্কর। ও যে আমায় ভালোবাসে। ওর জন্যই তো এই কবিতাগুলো বেরিয়ে এল আমার মন থেকে। কতদিন ওর সঙ্গে দেখা হয়নি জানো? কুড়ি বছর!

এবারে আমার আবার খটকা লাগল। রবিশঙ্করের এখন কোনও বউ আছে বলে তো শুনিনি! কুড়ি বছর রবিশঙ্করের সঙ্গে দেখা হয়নি, তবু এঁর গলা শুনেই রবিশঙ্করের তথাকথিত স্ত্রী চিনে ফেলেছেন এঁকে!

রবিশঙ্করের সঙ্গে আপনার কোথায় আলাপ?

—আমাদের বাড়িতে এসেছিল একদিন। বাজনা বাজিয়েছিল। ছবি আছে, দেখবে?

হাত ব্যাগ থেকে তিনি একখানা ছবি বার করলেন। অনেক পুরোনো ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ছবি, এখন হলদেটে হয়ে আসছে। কোনও জায়গায় বসে রবিশঙ্কর সেতার বাজাচ্ছেন। তবলচির পাশে একজন সুন্দরী যুবতী। হ্যাঁ, সুন্দরী ঠিকই। তার পাশে আর-একজন পুরুষ।

রত্না রায়চৌধুরী ঝুঁকে পড়ে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, এই দ্যাখো, আমার ছবি। চিনতে পারছ? আর এই আমার স্বামী।

আমি ছবিটার দিকে তাকিয়ে রইলুম।

—সেদিন আমি একটা গান গেয়েছিলুম, রবিশঙ্কর আমাকে দেখেই বলল, তোমাকে দেখলেই মনে হয় তুমি গান জানো। গান করো না একটা। আমি তাকালুম আমার স্বামীর দিকে। রবিশঙ্কর নিজে অনুরোধ করেছে তো, তাই আপত্তি করল না। বলল, গাও। গাইলুম। মাত্র একখানা। চর্চা ছিল না তো। সেই গান শুনে রবিশঙ্কর বলল, বাঃ! সুন্দর! তুমি চর্চা করো, তোমার হবে!

—আর দেখা হয়নি?

—হ্যাঁ। আর একদিন দেখা হয়েছিল। ওই দিল্লিতেই। আমার পরিচয় দিলুম। রবিশঙ্কর খুব দুঃখ-দুঃখ মুখ করে বলল, তুমি গান গাও না? কি ভীষণ দুঃখ ছিল সেই গলায় আওয়াজে, তা তুমি বুঝবে না। তখনও বুঝিনি যে ও আমায় ভালোবেসে ফেলেছে। আমি ঘরের বউ, ঘরের বউ হয়েই থাকতে চেয়েছিলুম।

—তারপর?

—তারপর অতিকষ্টে দু-বার ওর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছি। ওর বউ জানতে পারলেই লাইন কেটে দেয়। কিন্তু জানি, ও এখনও আমার জন্য প্রতীক্ষা করে আছে।

আমি একবার ভাবলুম, পাশের ঘর থেকে একটা আয়না এনে ভদ্রমহিলার মুখের সামনে ধরি। যাট বছর বয়েস, রীতিমতো গিন্নিবান্নি, উনি এসব কী প্রেমের কথা বলছেন! রবিশঙ্করের জীবনী আমি পড়েছি। কোনও একদিন গান-বাজনার আসরে রত্না রায়চৌধুরীর মতন একজন সুন্দরী যুবতীর গান শুনে উনি উৎসাহ দেওয়ার জন্য বলেছিলেন, বাঃ তোমার গানের গলা তো বেশ ভালো, তুমি চর্চা করো! এরকম কথা উনি হয়তো আরও শত-শত মেয়েকে বলেছেন!

রত্না রায়চৌধুরী বললেন, তুমি আর-একটা কথা শুনবে? কয়েক মাস ধরেই আমার মনটা খুব খারাপ। খালি মনে হচ্ছিল বেঁচে থেকে আর লাভ নেই। কী হবে এই জীবনটা নিয়ে। কতই তো করে দেখলাম অন্যদের জন্য। তারপর একদিন মনে পড়ল রবিশঙ্করের কথা। ও আমায় ভালোবেসেছিল, ও চেয়েছিল আমি বড় হই। সেই দিনই রাতে আমার ঘুম ভেঙে গেল, আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এল ওই কবিতা! আমি যেন অন্য মানুষ হয়ে গেলাম।

এতক্ষণ ঠাট্টা ইয়ার্কির ভাব নিয়ে ভদ্রমহিলার কথা শুনছিলাম, এবারে রত্না রায়চৌধুরীর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার সর্বশরীরে একটা শিহরণ বয়ে গেল। যেন আমি একটা অলৌকিক দৃশ্য দেখছি। রত্না রায়চৌধুরীর বয়েস কমে গেছে কুড়ি বছর, মুখখানা জ্বলজ্বল করছে। জীবনের ব্যর্থতাবোধের মধ্যে একটা ভালোবাসার স্মৃতি যেন তাকে এই মুহূর্তে নতুন রূপ দিয়েছে। সেই ভালোবাসার স্মৃতি থেকে উৎসারিত হয়েছে কবিতা। শুধু ছন্দ, মিল, শব্দ দিয়ে এ-কবিতার বিচার হয় না। এ-রচনা একজন মানুষের জীবনে, কবিতার চেয়ে অনেক বড়।

আমি বললুম, আপনার কবিতা কিন্তু চমৎকার হয়েছে। কারেকশন করার কিছুই নেই। আপনি যদি চান, আমি নিজে গিয়ে এই কবিতা রবিশঙ্করকে দেখাতে পারি। ওঁর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে।

আমার হাত দুটি জড়িয়ে ধরে ব্যাকুলভাবে মহিলা বলতে লাগলেন, সত্যি তুমি দেখাবে? সত্যি? তুমি ওকে বোলো, আমি আজও ওকে ভুলিনি। বুকের মধ্যে যত্ন করে রেখে দিয়েছি!

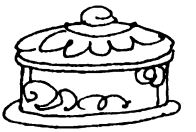

ভেজাল

পেছনের গাড়িটার খুব বেশি দোষ ছিল না। বেশ কয়েকবার হেডলাইট জ্বালিয়ে নিবিয়ে সিগন্যাল দিয়েছে রাস্তা ছেড়ে দেওয়ার জন্য। তবু সামনের ফিয়াট গাড়িটা হেলতে-দুলতে চলেছে রাস্তার মাঝখান দিয়ে। যেন ওদের পেরিয়ে আর কোনও গাড়ির যাওয়ার অধিকার নেই।

আলো ফেললে দেখা যাচ্ছে, ফিয়াট গাড়িটায় রয়েছে দুজন। এক পুরুষ ও এক মহিলা, দুজনেই মাথা ঝাঁকাচ্ছে মাঝে-মাঝে, যেন খুব হাসাহাসিতে ব্যস্ত। সন্ধে হয়ে এসেছে, জঙ্গলের রাস্তা, এই রাস্তায় সকলেই ব্যস্ত থাকে, শুধু গাড়িটার কোনও তাড়া নেই মনে হয়।

পেছনের জিপ গাড়িটা এক জায়গায় রাস্তাটা একটু চওড়া পেয়ে জোর হর্ন দিয়ে ওভারটেক করতে গেল। ফিয়াট গাড়িটা যেন কোনও অপটু ড্রাইভার চালাচ্ছে, বাঁ-দিকে যথেষ্ট জায়গা থাকতেও সে কেন যেন ডান দিকে চলে আসতে চাইল। তার পেছনের জিপটার সঙ্গে ধাক্কা খাবার ঠিক আগের মুহূর্তে সে হঠাৎ এমন সাপটে বাঁ দিকে ঘোরালো যে আর তাল সামলাতে পারল না। রাস্তা ছেড়ে বাঁ দিকের ঢালু দিয়ে গড়িয়ে নামতে লাগল নীচে।

জিপটা তীব্র ব্রেক কষে থামিয়ে দিয়ে দারুণ বিস্ময়ের সঙ্গে তার ড্রাইভার বলল, কী হল? কোন উল্লুকের বাচ্চা চালাচ্ছে ওই গাড়িটা?

জিপে চার-পাঁচ জন লোক। তাদের মুখগুলি উদগ্রীব। তারা রাস্তার বদলে ঘর-বাড়ি ভালোবাসে, তারা থামতে চায় না। তারা পৌঁছতে চায়।

ড্রাইভারের পাশের লোকটি বলল, তুই ওকে টাচ করেছিস, টের পেলাম না তো। ড্রাইভার জোর দিয়ে বলল, মোটেই না। আমার গাড়ি ওই ফিয়াট একটুও টাচ করেনি। আমার ডান দিকে গাছ, আর একটু হলে আমারই অ্যাকসিডেন্ট হয়ে যেত!

পাশের লোকটি বলল, নিশ্চয় ড্রাংক! নবাবের মতন সারা রাস্তা জুড়ে গাড়ি চালাচ্ছে!

পেছন থেকে একজন বলল, একবার নেমে দেখবে নাকি ওদের কী হল?

ড্রাইভারের পাশের লোকটি দলপতি। সে বলল, আমাদের কী দায় পড়েছে? আমাদের কোনও দোষ নেই। কিন্তু তুই ওদের সঙ্গে কথা বলতে যা, অমনি ওরা বলবে, আমরাই ওভার টেক করতে গিয়ে ওদের ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছি!

পেছন থেকে আর-একজন বলল, রাস্তাটা এখানে বেশ উঁচু। দুপাশ ঢালু হয়ে অনেকখানি নেমে গেছে। ঠিক মতন হ্যান্ড ব্রেক না দিতে পারলে গড়িয়ে পড়ে যাবে!

দলপতি বলল আমাদের ওসব ঝুটঝামেলায় যাওয়ার দরকার কী? শুধু-শুধু ফেঁসে যাব! তা ছাড়া আটটার মধ্যে না পৌঁছতে পারলে...চল। সুধীর চল...

ড্রাইভার আবার স্টার্ট দিল। জিপ গাড়িটা হুশ করে মিলিয়ে গেল সামনের অন্ধকারে।

ফিয়াট গাড়িটা গড়াতে-গড়াতে চলছে, প্রথমে স্টিয়ারিং-এ কপাল ঠুকে যাওয়ায় অজ্ঞান হয়ে গেছে অবনী। আর ভয়ে চিৎকার করছে কেতকী। তার প্রসাধন চর্চিত সুন্দর মুখখানি এখন আতঙ্কে বীভৎস, সে যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে মৃত্যু। পাহাড়ি রাস্তা নয়। এ-গাড়ি যেন নেমে যাচ্ছে নরকে।

একটা মহুয়া গাছে ধাক্কা লেগে গাড়িটা থামল। ঝনঝন করে ভেঙে গেল হেড লাইটের কাচ। রেডিয়েটার ফুটো হয়ে ঝরঝর করে পড়তে লাগল জল, কেতকীও চেতনা হারিয়েছে।

কিছুক্ষণ বাদে কেতকীরই আগে জ্ঞান ফিরে এল। প্রথমেই তার মনে হল সে কি মরে গেছে? এই কী মৃত্যু! খুব বেশি যন্ত্রণা হল না তো! তারপর সে হাত বুলিয়ে দেখল, তার নাক-চোখ-চিবুক কিছুই নষ্ট হয়নি। পাশের দিকে তাকিয়ে দেখল, স্টিয়ারিং-এর ওপর এলিয়ে পড়ে আছে অবনী। তবে কি অবনী বেঁচে নেই! অবনীর গায়ে হাত ছোঁয়াতে গিয়েই কেতকী দেখতে পেল, ডান দিকে দাঁড়িয়ে আছে দুজন লোক। লুঙ্গি পরা, খালি গা।

আবার বুকটা ধক করে উঠল কেতকীর। মুসলমান! গুণ্ডা! ওরা খুন করবে, তার আগে রেপ করবে!

সে পাগলের মতন অবনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ঠেলতে-ঠেলতে চ্যাঁচাতে লাগল, অবনী, শিগগির ওঠো, মরে যাব, আমরা মরে যাব, ওঠো...

অবনীর শরীর নিথর। সেই অবস্থাতেও কেতকী দ্রুত চিন্তা করতে লাগল। অবনী সঙ্গে একটা রিভলভার রাখে, সেটা কোথায়, ড্যাসবোর্ডে না অবনীর পকেটে? সে রিভলভার চালাতে জানে না, তবু সেটা পেলে ওদের ভয় দেখাতে পারত।

এবারে বাইরের লোক দুটির পাশে এসে দাঁড়াল একজন স্ত্রী লোক। সে জিগ্যেস করল, কী হল, বেঁচে আছে?

স্ত্রী লোকটিকে দেখে কয়েক মুহূর্তের জন্যে চিৎকার থামাল কেতকী। তার খটকা লেগেছে ডাকাত দলের সঙ্গে কি স্ত্রীলোক থাকে?

গাড়িটা কাত হয়ে গিয়েছিল, বাইরের তিনজন প্রাণপনে ঠেলে সেটা সোজা করে। একটা দরজা খুলে ফেলল। একজন পাঁজা কোলা করে অবনীকে তুলে নিয়ে শুইয়ে দিল ঘাসের ওপর।

কেতকী এসব দেখে দৌড়ে গিয়ে ঝুঁকে পড়ল অবনীর বুকের কাছে। হ্যাঁ। অবনীর নিশ্বাস ঠিকই পড়ছে। কপালটা ফুলে গেছে তার। এছাড়া শরীরে আর কোনও ক্ষত নেই। খুব গোপনে কেতকী অবনীর প্যান্টের পকেট ও কোমর হাতড়েও দেখে নিল, না, রিভলভারটা অবনীর সঙ্গে নেই।

একজন পুরুষ বলল, অজ্ঞান হয়ে গেছে গো! চোখে মুখে পানি দিতে হবে!

স্ত্রীলোকটি বলল, আমাদের ঘরে নিয়ে চলো। এসো গো বউদি!

মাত্র শ-দুয়েক গজ দূরেই একটা ছোট গ্রামের মতন। কাছাকাছি চার-পাঁচখানা ঘর, সামনে একটা ডোবা একটি গরুর গোয়াল। দুজন লোক ধরাধরি করে এনে অবনীকে শুইয়ে দিল উঠোনে পাতা খাটিয়ার ওপর। স্ত্রী লোকটি একটা চকচকে পেতলের ঘটি ভরতি জল এনে কেতকীকে বলল। দাও গো বউদি। তুমি ভালো করে পানি ছিটিয়ে দাও!

স্ত্রী লোকটি কেতকীর চেয়ে বয়েসে ঢের বড়। তবু সে বিশেষ ভূমিকায় কেতকীকে বউদি সম্বোধন করতে শুরু করেছে। অবনীর মাথায় ও চোখে এক ঘটি জল ঢেলে দেওয়ার পরেও কেতকী ওর জামার বোতাম খুলে ওকে জলের ঝাপটা দিতে লাগল। তবু অবনীর জ্ঞান ফিরল না। কেতকীর খুব অসহায় লাগছে। এরা কেমন লোক এখনও বোঝা যাচ্ছে না। পুরুষগুলো প্যাট-প্যাট করে তাকিয়ে আছে তার শরীরের দিকে। অবনীর জ্ঞান না ফিরলে সে তো কিছুই করতে পারবে না।

একজন বলল একটু গরম দুধ খাওয়ালে কাজ হত না?

সঙ্গে-সঙ্গে আরও দু-তিনজন বলে উঠল, গরম দুধ, গরম দুধ খাওয়াও!

গোয়াল ঘর থেকে একজন একটা গাভীকে নিয়ে এল বাইরে। আকাশে খানিকটা জ্যোৎস্না উঠেছে। সব কিছুই এখন ছায়া-ছায়া দেখায়।

চ্যাঁ-চোঁ শব্দে দুধ দোওয়া হতে লাগল। কেতকী অনেকদিন এরকম দুধ দোওয়া দেখেনি।

দুধ দুইছে স্ত্রী লোকটি। এই উঠানেরই এক কোণে জ্বলছে একটা কাঠের উনুন। এদের বুঝি রান্না ঘর নেই? বৃষ্টি হলে কী করে?

একটা ছোট ডেকচির অর্ধেকটা দুধে ভরে গেলে স্ত্রীলোকটি সেটাকে বসিয়ে দিল উনুনে।

কেতকী দ্রুত অনেক কিছু চিন্তা করে যাচ্ছে। অবনী আসার পথে অনেকটা হুইস্কি খেয়েছে। বোতল থেকে নিট, এর পর দুধ খাওয়া কি ঠিক হবে? হুইস্কির পর দুধ কি চলে? বমি হয়ে যাবে না? দেখাই যাক না, বমি হলেও হয়তো তাতে খানিকটা উপকার হবে।

এরা দুধ দুয়েই সঙ্গে-সঙ্গে উনুনে চড়িয়ে দিল! জল মেশাল না? জল না মেশানো খাঁটি দুধ কেউ খায় পৃথিবীতে? কেতকীর মনে পড়ল, ছেলেবেলায় সে তার মাকে দেখেছে, উনুনে দুধ গরম করার সময় মা নিজেই খানিকটা জল মিশিয়ে দিত। সবাইকে একটু-একটু দুধ দিতে গেলে জল না মেশালে কুলোত না তার সঙ্গে গোয়ালাবাও নিশ্চয়ই জল মেশাত।

জঙ্গলের মধ্যে গ্রাম হলেও এদের কাছে কাচের গ্লাস আছে। একটা গ্লাস দুধে ভরতি করে, গরম হওয়ার জন্য সেটা একা ন্যাকড়া দিয়ে জড়িয়ে এনে স্ত্রীলোকটি বলল, একটু-একটু করে খাইয়ে দাও গো বউদি। আমি বাবুর মাথাটা তুলে ধরছি।

অবনীয় গায়ে ছোট-ছোট চড় মেরে, তার ঠোঁট জোর করে ফাঁক করিয়ে দিয়ে তাতে খানিকটা গরম দুধ ঢালতেই অবনী ছটফটিয়ে উঠল। চোখ মেলে বলল, আরে কী হচ্ছে? এটা কী?

কেতকী বলল, সব ঠিক হয়ে গেছে। তুমি দুধটা খেয়ে নাও।

তারপর সে যোগ করল, একদম খাঁটি দুধ। এইমাত্র দেওয়া হল।

অবনী চারপাশটা চোখ বুলিয়ে জিগ্যেস করল, কেতকী, কী হয়েছে?

কেতকী বলল, গাড়ির অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। মনে নেই? বেশি কিছু ক্ষতি হয়নি। এখন কেমন লাগছে?

অবনী দু-তিন ঢোঁক দুধ খেল। তার বমি হল না বটে, কিন্তু এরপর হাত দিয়ে গ্লাসটা সরিয়ে দিয়ে বলল, আর না।

ধপাশ করে সে শুয়ে পড়ল আবার।

গ্লাসের বাকি দুধটা ফিরিয়ে দিতে ইচ্ছে করল না কেতকীর। এঁটো দুধ, ওরা নিশ্চয়ই ফেলে দেবে। সে নিজেই একটু-একটু চুমুক দিতে লাগল। খাঁটি দুধের এরকম স্বাদ? এরকম দুধ সে জীবনে খায়নি।

অবনী আবার চোখ বুজেছে। খানিক বাদেই তার একটু-একটু নাক ডাকতে লাগল।

আরও কয়েকবার তাকে ঠ্যালাঠেলি করল কেতকী। অবনীর কোনও সাড়া নেই। এটা নেশার ঘুম। ওরকম ভাবে কাঁচা হুইস্কি খেতে কতবার বারণ করেছিল কেতকী। অবনী গর্ব করে বলেছিল, সে কক্ষনো আউট হয় না।

কেতকী দুর্বল গলায় জিগ্যেস করল, কাছাকাছি কোনও ডাক্তারখানা আছে?

একজন বলল, এখানে তো ডাক্তার নেই, সেই শহরে যেতে হবে।

আর-একজন বলল, একটু ঘুমিয়ে নিতে দাও না। ঠিক হয়ে যাবে।

যার নাক ডাকে, সে তো গুরুতর অসুস্থ নয়। তা গ্রামের লোকেও বোঝে। কেতকীরও খুব ক্লান্ত লাগছে। কিন্তু সে তো এতগুলো চোখের সামনে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়তে পারে না।

ছোটখাটো একটা ভিড় জমে গেছে তাদের ঘিরে। কেতকী ওদের সঙ্গে কথা বলছে টুকিটাকি। এটা একটা মুসলমান গোয়ালাদের গ্রাম। দুধ বিক্রিই জীবিকা। তবে দুধ নিয়ে এদের শহরে যেতে হয় না। প্রতিদিন সকালে পাইকার এসে এদের কাছ থেকে দুধ সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। সব মিশিয়ে মোট আটটি পরিবার। কিছু চাষের জমিও আছে।

কয়েকটি অল্প বয়েসি মেয়ে একেবারে কাছে এসে পড়ল কেতকীর। কেতকীর দু-কানে নকল

হিরের দুল, আংটিতে ঝুটো মুক্তো, রোল্ড গোল্ডের ব্যান্ডের ঘড়ি, সেইসব ওরা অবাক হয়ে দেখছে।

একজন বলল, বাবু আর দিদিমণিটা দুজনেই দেখতে কী সুন্দর! কেমন মানিয়েছে দ্যাখ। সিনেমার মতো!

আর একজন জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের কতদিন বিয়ে হয়েছে গো?

একটু দ্বিধা করে কেতকী বলল, আড়াই বছর!

—ছেলেমেয়ে হয়নি?

কেতকী হেসে বলল, না!

বয়স্কা স্ত্রী লোকটি এসে অন্যদের তাড়া দিয়ে বলল এই যা, যা, ওনাদের একটু বিশ্রাম নিতে দে! আল্লার দয়ায় বেঁচে গেছে।

তারপর সে খানিকটা কুণ্ঠিতভাবে বলল, বউদি, তোমার খিদে পায়নি? রাত তো বাড়ছে। আমরা অল্পরাতে খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়ি। খুব সকাল-সকাল উঠতে হয় তো। তোমাকে কী খেতে দিই, ভাত তো খাবে না।

কেতকী জিগ্যেস করল, তোমরা রাত্রে কী খাও?

স্ত্রীলোকটি বলল, আমরা তো এখন ভাত বানব, খাব। কিন্তু তোমরা...ঘরে তো চিড়ে-মুড়ি কিছু নাই আর।

কেতকী ক্ষীণভাবে হাসল। এরা কী ভাবছে, এরা মুসলমান বলে কেতকীরা এদের হাতের ভাত খাবে না? অবনীর বাড়ির বাবুর্চি মুসলমান। স্টুডিওর অধিকাংশ কর্মীই মুসলমান। ওসব জায়গায় যাওয়ার সময় কে হিন্দু, কে মুসলমান মনেই থাকে না। গ্রামে বোধহয় এইসব তফাত এখনও চলে।

এখন ভাত খাবার একটুও ইচ্ছে নেই। কোনওক্রমে এখান থেকে চলে যেতে পারলে হয়।

ভয় আর লাগছে না বটে, অস্বস্তি হচ্ছে। কিন্তু যাওয়া হবে কী করে? অবনীর স্বভাব সে জানে, নেশার ঝোঁকে একবার অজ্ঞান হলে, দু-তিন ঘণ্টার আগে জ্ঞান ফিরবে না। আশ্চর্য নেশা, এতবড় একটা কাণ্ডের পরও কেউ ঘুমোতে পারে? অবনী না জাগলে গাড়িটার কী অবস্থা হয়েছে, তাও বোঝা যাচ্ছে না।

ভাত খেতে আপত্তি করলে এরা ভাববে কেতকী মুসলমানের হাতের ছোঁয়া খায় না। কী জ্বালা, এরা এত ভালো ব্যবহার করছে। কেতকী কৃত্রিম উৎসাহ দেখিয়ে বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভাত খাব না কেন?

স্ত্রীলোকটি বিস্মিত-খুশির সঙ্গে বলল, খাবে? ভাত খাবে? চল এনে দিই, তুমি নিজেই ফুটিয়ে নাও তবে!

কেতকী বলল, আলাদা রাঁধতে হবে কেন? একসঙ্গেই করে নাও, তোমাদের থেকেই একটু দিও।

আমাদের ঢেঁকি ছাঁটা চাল, একটু লাল হয়, মোটা খেতে পারবে তো?

ঢেঁকি ছাঁটা চাল তো খুব ভালো।

পাশ থেকে একজন পুরুষ বলল ভাত তো খেতে বললে, খাবে কী দিয়ে? ওবেলার ডাল আর সবজি। সে কি ওনারা খেতে পারবেন?

স্ত্রীলোকটি ঝংকার দিয়ে বলল, পুকুরে একবার জাল ফেলে দ্যাখ না, যদি দুটো মাছ পাস। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে হাঁ করে দেখছিস কী? কত রাত হল খেয়াল আছে?

কেতকী বারণ করতে গেল, কিন্তু কেউ কর্ণপাত করল না, দু-তিনজন হইহই করে চলে গেল।

হঠাৎ বেশ জ্যোৎস্না উঠে গেছে। একেবারে অচেনা জায়গায়, এতগুলো মানুষের মধ্যে কেতকী

কখনও বসে থাকেনি। তার খাটিয়ার চারপাশে বসে পড়েছে অনেকগুলো বাচ্চা এখন তারা কেউ কেতকীর হাত ধরেছে, কেউ তার হাত ধরে শাড়িটায় হাত বুলিয়ে দেখছে। তাদের গ্রামে এরকম মানুষ কখনও আসে না, তারা তাই একটা মজার খেলা পেয়েছে। শবনম নামে একটি কিশোরী নানা প্রশ্ন করতে লাগল কেতকীকে। শহর সম্পর্কে তার দারুণ কৌতূহল। মেয়েটির মুখের গড়ন অনেকটা পান পাতার মতন বেশ সুশ্রী, ঠিক মতন সাজগোজ করালে একে খুবই সুন্দর দেখাবে।

পুকুরের পাড়ে একটা বেশ আনন্দ কলরব শোনা গেল। শবনম কেতকীর হাত ধরে টেনে বলল মাছ উঠেছে। চল দেখতে যাবে! এসো না!

কেতকী উঠে গেল ওদের সঙ্গে। অবনীর নাম ডাকা থেমে গেছে সে কি চোখ বুঁজে সব শুনছে?

একটা মাঝারি আকারের রুই মাছ ধরা পড়েছে! পুকুরটার চেহারা দেখলে মনেই হয় না যে এখানে এরকম মাছ থাকতে পারে। ছেলে-মেয়েদের চ্যাঁচামেচি শুনে বোঝা যায় যে এরকম মাছ ধরার ঘটনা খুবই বিরল। বিশেষ-বিশেষ উৎসবেই হয়। কেতকীরা এসেছে বলে আজ এলাকার ছেলেমেয়েরাও একটুকরো মাছ খেতে পাবে।

রান্না হয়ে গেল ঘণ্টাখানেকের মধ্যে। গরম ভাত, গরম মুসুরির ডাল আর পাতলা মাছের ঝোল। অবনীকে দু-একবার ডাকতেই সে উঠে পড়ল। তার কপালই ফুলে আছে এখনও, চোখও লাল।

খাটিয়ার ওপরে বসেই খাওয়া। ভাতের থালা ওদের দুজনের হাতে তুলে দেওয়ার পর বয়স্কা মহিলাটি শবনম-এর কানে-কানে কী যেন বলল। সে ছুটে গিয়ে নিয়ে এল একটা টিনের কৌটো। তার থেকে কয়েক চামচ ঘি তুলে দেওয়া হল ওদের পাতে। টাটকা ঘিয়ের গন্ধে আমোদিত হয়ে গেল হাওয়া।

প্রায় রাত্রেই অবনীর কিছু খাওয়া হয় না। আজ সে তৃপ্তি করে খেল। চর্বি কমাবার জন্য সে সপ্তাহে একদিন মাত্র কয়েক চামচ ভাত খায়, আজ সে ভাত চেয়ে নিল এবং দ্বিতীয়বার ঘি নিতেও সে আপত্তি করল না।

খেয়ে উঠে হাত ধোওয়ার পর সে নিজে একটি সিগারেট ধরিয়ে তার প্যাকেট থেকে উদার হস্তে অন্যদের সিগারেট বিলিয়ে দিল। তারপর বলল। তোমরা ভাই অনেক উপকার করলে। এখন একটু গাড়িটায় হাত লাগাবে?

একটা বেশ বড় দল নিয়ে সে গেল গাড়িটার কাছে। গাড়িটার ইঞ্জিন চালু করতে কোনও অসুবিধে হল না। গাড়িতে একটা সাবান ছিল, সেটা দিয়ে কোনওক্রমে আটকানো হল রেডিয়েটারের ফুটো। হেডলাইট ছাড়াই কাজ চলে যাবে।

কেতকী এসে বসল গাড়িতে। জানলার ধারে ব্যাকুল ভাবে দাঁড়িয়ে আছে শবনম আর অন্যান্য বাচ্চারা। অবনী ঘড়ি দেখল। মাত্র সাড়ে ন'টা। এ রাস্তা দিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত গাড়ি চলে, ভয়ের কিছু নেই।

গাড়ি থেকে খানিকটা সরে এসে সে মানিব্যাগটা বার করে প্রথমে দুটো পঞ্চাশ টাকার নোট দু-আঙুলে তুলে একটু দ্বিধা করল। তারপর একটা রেখে দিয়ে বাকিটা তুলে সে মুরুব্বি জাতীয় একজনের কাঁধ ধরে বলল, ভাই তোমরা যা উপকার করলে...কী আর বলব...এই সামান্য কিছু...

লোকটি জিভ কেটে দু-পা পিছিয়ে গিয়ে বলল, না, না, এ কী বলছেন বাবু...আপনারা আমাদের মেহমান, এখন রমজান মাস...

অবনী খানিকটা পিড়াপিড়ি করলে, লোকটি প্রবল মাথা নেড়ে আপত্তি জানাতে লাগল। এরপর আর কিছু করা যায় না, ব্যাগটা পকেটে ভরে ফেলল অবনী।

ওপরের দিকে খাড়াভাবে রাস্তায় ওঠা যাবে না, পাশ দিয়ে-দিয়ে যেতে হবে খানিকটা। সেই

রাস্তা ওরাই এগিয়ে দিল। গাড়ি চলার পর সঙ্গে-সঙ্গে কিছুক্ষণ দৌড়ে এল বাচ্চারা।

ওপরের রাস্তায় উঠে স্বাচ্ছন্দে গাড়ি চলার পর একটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল অবনী। কেতকীর সাংঘাতিক বিপদ হয়ে যেতে পারত আজ, কিন্তু শেষপর্যন্ত কিছুই হল না। কেতকীকে নিয়ে সারারাত বাড়ির বাইরে থাকতে হলেই তো একটা কেলেংকারি হয়ে যেত। নিজের স্ত্রীর কাছে কী জবাবদিহি করত অবনী? আর আহত হয়ে দুজনে একসঙ্গে যদি ভরতি হত হাসপাতালে, তাহলে সে খবর ছাপা হয়ে যেত অনেক কাগজে।

আর-একটি সিগারেট ধরিয়ে অবনী বলল, বেশ লোকগুলো তাই না? সরল, হসপিটেবল।

কেতকী জিগ্যেস করল, তুমি ওদের কিছু দিলে তো?

ধোঁয়া ছেড়ে অবনী বলল, দিতে চাইলুম তো, নিল না কিছুতেই। অবশ্য বাচ্চাগুলোকে মিষ্টি খাবার জন্য কিছু দিয়ে এলে হত!

কেতকী বলল, ইস, ওখানে একটি মেয়ের আমার হাতের চুড়িগুলো খুব পছন্দ হয়েছিল। এগুলোর এমন কিছু তো দাম নয়। ওকে দিয়ে দিলে পারতুম, তখন মনে পড়ল না। চল, একটু ফিরে যাবে?

পাগল নাকি? এখন আবার অতটা নীচে নামা যায়? অনেক দেরি হয়ে যাবে না? জোরে চালিয়ে গেলে বারোটার মধ্যে বাড়ি পৌঁছে যাব!

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে কেতকী বলল, আজ যা ঘি খেলাম, এরকম ঘি জীবনে খাইনি বোধহয়। এত সুন্দর গন্ধ!

অবনী বলল, খাঁটি ঘি, তবে বিক্রি করার আগে নিশ্চয়ই ভ্যাজাল মেশায়। এরকম খাঁটি জিনিস কেউ বাজারে ছাড়ে না আজকাল। লোকে স্বাদই বুঝবে না।

দুধটাও এত ভালো। সদ্য দোওয়া দুধ।

গয়লাপাড়া তো। এ দুধও যখন শহরে যায়, তখন আর এতটা খাঁটি থাকে না। মাছটারও কি ফাস্টক্লাস টেস্ট ছিল। একেবারে সদ্য-সদ্য পুকুর থেকে ধরা...অপূর্ব, তাই না? কোথায় আক্সিডেন্টে মারা যেতে বসেছিলুম, তার বদলে এমন সব চমৎকার খাবার ঢেঁকি ছাটা চালের গরম ভাত...। জানো কেতকী, এত টাটকা ভালো খাবার টাটা বিড়লাও খেতে পারে না বোধহয়। শহরে বসে তুমি যত টাকা দামই দাও, এরকম সবকিছু খাঁটি কিছুতেই জোগাড় করতে পারবে না...তারা আমাদের কাছে কোনও পয়সাই নিল না...

হঠাৎ হেঁচকি তুলে কাঁদতে আরম্ভ করে দিল কেতকী। অবাক হয়ে সেদিকে তাকিয়েও অবনী আবার রাস্তার দিকে মন দিল। আর একবার অ্যাক্সিডেন্ট না হয়! মদ খেয়ে সে আর কোনওদিন গাড়ি চালাবে না।

একটু পরে সে একটা হাত বাড়িয়ে কেতকীর পিঠে চাপড় মেরে জিগ্যেস করল, এই কী হল?

কেতকী দুদিকে মাথা ঝাঁকাল শুধু, মুখে কিছু বলল না।

অবনীর মুখে শহুরে সভ্য মানুষের একটা হাসি ফুটে উঠল। সে বুঝেছে। সেন্টিমেন্ট একেবারে বাদ দেওয়া যায় না জীবন থেকে, তবে, একদিন সন্ধেবেলা অন্যরকম একটা ঘটনা ঘটল বলেই তো বদলে ফেলা যায় না জীবনটা। মানুষ তার জীবনে যে ফ্রেম তৈরি করে নেয়, তার থেকে নিজেও সে বেরুতে পারে না। এটাকেই বোধহয় নিয়তি বলে। আজকের সন্ধেবেলাটাকে বেশি গুরুত্ব না দিয়ে ভুলে যাওয়াই ভালো!

কেতকী বিজ্ঞাপনের মডেলের কাজ করে। আজ বিকেলেই একটা সুটিং ছিল। ক্যামেরার

সামনে তাকে যত না বে-আব্রু হতে হয়, তার চেয়েও অনেক বেশি জামাকাপড় খুলতে হয় কয়েকটি বড়-বড় ক্লায়েন্টের কাছে। নইলে কেতকীর মতন মেয়ে তো কতই আছে। সবাই কি কাজ পায়?

অবনী একটি বিজ্ঞাপন কোম্পানির ম্যানেজার। বেবিফুড, চুলের তেল, সাবান, ঘি, সিগারেটের মনোহারি বিজ্ঞাপন তৈরি করা তার কাজ। ওইসব বেবিফুড যে বাচ্চাদের পক্ষে ভালো নয়, ওই সব চুলের তেলে যে চুলের কোনও উপকারই হয় না, একজন শিক্ষিত মানুষ হয়ে অবনী কি তা জানে না? তবু কাজ হচ্ছে কাজ, জীবিকা হচ্ছে জীবিকা! এর মধ্যে সেন্টিমেন্টের স্থান নেই।

কেতকীর পিঠে আর-একটা চাপড় মেরে সে হাসতে-হাসতে বলল, আমাদের ওরা স্বামী-স্ত্রী ভেবেছিল, তাই না? আদর্শ দম্পতি! হা-হা-হা-হা।

কেতকী মুখটা ফেরাল অবনীর দিকে। গ্লিসারিন না মেখেও তার চোখ দিয়ে বেশ ঝরঝর করে জল পড়ে।

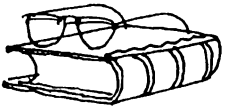

নিশীথ কুসুম

বিরাট জুতোর দোকানের কাচে নাকটা ঠেকাল যূথী। বেশ শীত, এই সময় ঠান্ডা কাচ ছুঁতে গা শিরশির করে, একটু আরামও লাগে।

পাশ থেকে মনসিজ জিগ্যেস করল, কোন জুতো জোড়া তোমার পছন্দ?

আঙুল দেখিয়ে যূথী বলল, ওইটা, ওইটা আর ওইটা।

তিন জোড়াই?

হ্যাঁ, ওই তিন জোড়াই আমার চাই।

প্রত্যেক জুতোর সঙ্গে নাম লেখা লেবেল ঝোলানো। মনসিজ ওই তিন জোড়া জুতোর দাম মনে-মনে যোগ করল। একশো বাইশ টাকা সাতষট্টি পয়সা। মনসিজ পকেটে হাত ঢুকিয়ে গম্ভীরভাবে বলল, ঠিক আছে, কিনে নাও। যূথী চোখ কুঁচকে হাসল। তার পায়ে এক জোড়া বেশ পুরোনো চটি। সে বলল, যখন কিনব, একসঙ্গে তিন জোড়ার কম কিনব না। চল—ওরা কিন্তু জুতোর দোকানে ঢুকল না। আবার মন্থরভাবে হাঁটতে লাগল রাস্তা দিয়ে। শীতের মধুর দুপুর। ঝকঝক করছে রোদ, এখন চলার ছন্দে একটা আনন্দ স্পষ্ট অনুভব করা যায়।

এবার একটা শাড়ির দোকান। শো-কেসের সামনে আবার থেমে পড়ল যূথী। নতুন শাড়ির স্টক এসেছে। চেয়ে থাকলে চোখ জুড়িয়ে যায়। যে-কোনও একটার চেয়ে আরেকটা যেন বেশি ভালো।

মনসিজ বলল, কোনটা-কোনটা?

যূথী এবার পছন্দ করল পাঁচটা।

মনসিজ বলল, দেব, সবক'টাই কিনে দেব।

যূথী বলল, কেন জানি না আজ আমার খুব সাজতে ইচ্ছে করছে। নতুন শাড়ি, নতুন ব্লাউজ, ব্রা, নতুন জুতো, সেইসঙ্গে একটা ভালো পারফিউম। মনসিজের হাতে একটা ব্রাউন প্যাকেটে তিনটে মোটা-মোটা বই। সে প্যাকেটটা যূথীর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, এটা একটু ধরো, আমি চট করে একটা ব্যাংক ডাকাতি করে কিছু টাকা নিয়ে আসি।

যূথী বলল, তুমি একলা পারবে না। আমিও সঙ্গে যাই। এই বইয়ের প্যাকেটটা দেখিয়ে আমি বলব, এর মধ্যে বোমা আছে! তুমি একটা খেলনা বন্দুক কিনে নাও না।

আবার হাঁটতে গিয়েই একজন লোকের সঙ্গে যূথীর ধাক্কা লাগল। লোকটি অস্পষ্টভাবে 'মাফ করবেন' বলে দাঁড়িয়ে রইল একটু দূরে। মনসিজ লোকটির দিকে চেয়ে আছে। মনসিজের বিশাল চেহারা, প্রায় ছ'ফুট, চওড়া কাঁধ।

লোকটি মনসিজকে ভয় পাচ্ছে, সে বলল, দেখতে পাইনি, মাফ করবেন।

মনসিজ নরম করে বলল, ঠিক আছে।

যূথী মুখ তুলে ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, দাঁড়িয়ে আছেন কেন?

লোকটি চমকে উঠে দ্রুত পা চালাল।

মনসিজ হাসতে-হাসতে জিগ্যেস করল, তুমি লোকটাকে অমন বকলে কেন?

যূথী বলল, আমরা বুঝতে পারি।

কী?

কখন হঠাৎ লেগে যায় আর কে ইচ্ছে করে ধাক্কা মারে।

ওই লোকটা ইচ্ছে করে ধাক্কা মেরেছিল? ওর ঘাড়টা ভেঙে দিয়ে আসি? এখনও বেশি দূর যায়নি।

সেইজন্যেই তো ওকে চলে যেতে বললাম। আমার চোখের দিকে তাকালেই তুমি বুঝতে পারতে, তারপর ওর ঘাড় ভেঙে দিতে! চল, গঙ্গার ধারে যাব।

হেঁটে?

হ্যাঁ, হেঁটে, যতই দূর হোক।

তোমার খিদে পায়নি?

খুব।

চল, ওই পার্কটার কাছে একটা দোকানে ভালো ঘুগনি বানায়। পাঁউরুটি আর ঘুগনি। দোকানটায় টিনের চাল, চেয়ার নেই, বেঞ্চ।

তাতে কী হয়েছে, ঘুগনির স্বাদটা খুব ভালো।

আমার আজ ইচ্ছে করছে গ্র্যান্ড হোটেলে গিয়ে খেতে। সব চেয়ে ভালো খাবার, গদি-মোড়া চেয়ারে বসে আমি পা দোলাব, ধপধপে সাদা পোশাক পরা বেয়ারা এসে খাবার দিয়ে যাবে।

ঠিক আছে, চল গ্র্যান্ড হোটেলে।

পকেটে কত আছে?

সাড়ে তিন টাকা। তাতে কোনও ক্ষতি নেই, বইগুলো ধরো একটু।

ব্যাঙ্ক ডাকাতি করবে?

না, তার দরকার হবে না। বলে বইয়ের প্যাকেটটা যূথীর হাতে দিয়ে মনসিজ কাছেই একটা ঘড়ির দোকানে ঢুকে গেল।

একটুক্ষণ অপেক্ষা করল যূথী। পথচারীরা তার দিকে ফিরে-ফিরে তাকায়। যূথী আগে এত সুন্দরী ছিল না, টি-বি থেকে সেরে ওঠার পর তার শরীরে, চোখে-মুখে একটা লাবণ্য এসেছে। প্রাচীন দিঘির মতন গভীর কালো চোখ। অন্য মেয়ের তুলনায় সে-ও বেশ লম্বা, আগে তাকে বড্ড রোগা লাগত, এখন ঢল-ঢল করছে স্বাস্থ্য। লাল ব্লাউজ ও লাল শাড়িতে সে অগ্নিকন্যা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এখন তাকে দেখে অনেকেই পতঙ্গ হতে চায়।

যূথী গিয়ে ঘড়ির দোকানে ঢুকল। কাউন্টারের ওপর মনসিজের হাতঘড়িটা খোলা। যূথী জিগ্যেস করল, কত দেবে বলছে?

মনসিজ মুখ না ফিরিয়েই বলল, সত্তর।

মোটে, একটা ঘড়ির দাম?

আমি নব্বই পেলেই—

কখনও না।

আহা এটা দেশি দামি ঘড়ি নয়, এইচএমটি সেকেন্ড হ্যান্ড—

যূথী কাউন্টার থেকে ঘড়িটা তুলে নিয়ে বলল, বিক্রি করতে হবে না, এসো। দোকানের লোকেরা হতভম্ব। মনসিজের আর কিছুই করার নেই। কারণ যূথী ঘড়িটা নিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে গেছে। কাঁধ ঝাঁকানি দিয়ে বেরিয়ে আসতে হল মনসিজকে।

যূথী বলল, চল, আমি ঘুগনিই খাব।

কাল আমি তোমাকে নিশ্চিত গ্র্যান্ড হোটেলে খাওয়াব। তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগেই বিক্রি করে দিয়ে আসব ঘড়িটা।

কাল?

হ্যাঁ।

কাল আমি বাঁচব কি না জানি না।

ওসব কি পাগলের মতন কথা। তুমি তো একদম সেরে গেছ। তা ছাড়া টি-বি কি আজ আবার একটা অসুখ নাকি? জল ভাত।

তা জানি। কিন্তু লোকে তো অ্যাক্সিডেন্টেও মরে। সে জন্য নয়, আমি কালকের কথা ভাবছি না। আমার আজকের দিনটাই দারুণ সুন্দর লাগছে। কী চমৎকার রোদ। শরীরটা এত ভালো আছে আজ আমার, নিজেকে রানি মনে হচ্ছে।

রানি হয়ে যাও, কে বারণ করছে?

আজ খুব টাকা খরচ করতে ইচ্ছে হচ্ছে! দারুণ ভালো-ভালো হোটেলে খাব, সারাদিন ট্যাক্সি চড়ে বেড়াব কিংবা ট্রেনে চড়ে বাইরে কোথাও চলে গিয়ে আমরা এক হোটেলে থাকব, ধরো, পুরীতে—

চল, পুরী চলে যাই।

আমার কাছে দশ টাকা আছে, তোমার কাছে সাড়ে তিন টাকা।

দাঁড়াও, ভেবে দেখি যদি কারুর কাছে ধার পাওয়া যায়।

ধার কেন? কেন আমাদের অনেক টাকা থাকবে না?

দাঁড়াও, ডাক্তারিটা পাশ করে নিই।

ওই লোকটাকে দ্যাখো—

গাড়ি থেকে একটা লোক নামল। গাড়িটা প্রায় নতুন, লোকটার গায়ে ঝলমলে স্যুট, মুখখানা গম্ভীর। অর্থবল থাকলে যে ধরনের গম্ভীরতা আসে। লোকটি মনসিজকে উপেক্ষা করে যূথীর দিকে দু-বার তাকাল।

যূথী বলল, লোকটার অনেক টাকা আছে তাই না?

মনসিজ বলল, টাকা থাকলেও এই ধরনের লোকদের অনেক দুঃখ থাকে। সে আমি জানতে চাই না। ওর অনেক টাকা। অথচ আমাদের কেন টাকা থাকবে না? কেন আমরা আনন্দ করতে পারব না?

পৃথিবীতে কত লোক খেতে পায় না। আমরা তবু—

ওসব কথা আজ আমি ভাবতে চাই না। আজ আমি শুধু নিজের কথাই ভাবছি। অনেক দিন তো কিছু না খেয়ে শুধু হেঁটে-হেঁটে ভালো লাগে। কিন্তু আজ আমার ইচ্ছে করছে যা খুশি তাই করতে, খুব হইহই করতে, অনেক দূরে-দূরে বেড়ানো—তুমি আমার হাতে এক ডজন লাল গোলাপ তুলে দেবে, আমি তোমার জামায় লাগিয়ে দেব মুক্তোর বোতাম।

মনসিজ গুম হয়ে রইল।

যূথী তার বাহু ছুঁয়ে খুব মায়াময় গলায় বলল, তখন স্যানাটোরিয়ামের বিছানায় শুয়ে থাকতাম, যখন-তখন মুখ দিয়ে রক্ত উঠত, আমি জানতাম, আমি মরেই যাব। টি-বি মোটেই শক্ত অসুখ না। তোমরা ডাক্তারেরা বলো, তবু তো এই অসুখে মানুষ মরে, মরে না? আমি ভাবতাম আমিও মরে যাব, কেন? কেন এত তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাব, চলে যাব এই পৃথিবী থেকে?

মনসিজ মৃদু গলায় বলল, তুমি এখন সেরে গেছ, তুমি একদম আমার চেয়েও বেশি দিন বাঁচতে পারো।

তা হোক। তবু আজ সকালে হাসপাতালের দিনগুলো মনে পড়ছিল হঠাৎ। তারপর ভাবলুম যখন বেঁচেই উঠেছি, তখন এই জীবনটা ইচ্ছে মতন খরচ করব না কেন? যতরকম আনন্দ আছে সব আমার চাই। সব। ঘুগনি, ঘুগনি খাবে না?

না, আগে গঙ্গার ধারে যাব।

গঙ্গা এখান থেকে অনেক দূর। অত দূর যূথীর পক্ষে হেঁটে যাওয়া উচিত নয়। যূথীর যখন ওখানে যাওয়ার খেয়াল হয়েছে, তখন যেতেই হবে। প্রতিটি বাসে সাংঘাতিক ভিড়, মনসিজ ট্যাক্সি ডাকল তাতেই উড়ে গেল যূথীর দশ টাকা।

তারপর এক কাপ করে কফি আর দু-ঠোঙা করে ঝালমুড়ি। বিকেলের পড়ন্ত আলোয় ঝলমল করছে নিসর্গ।

কিন্তু নদীর ধারে বসে যূথীর মন আরও খারাপ হয়ে গেল। নদী দেখে তার মনে পড়ছে সমুদ্রের কথা। পুরী কিংবা দীঘা। মনসিজের সঙ্গে একটা ঘরে অন্তত একটা রাত্রি।

একটু সন্ধে হয়ে আসবার পর গাছের আড়ালে মিশে মনসিজ যূথীকে গাঢ়ভাবে একটা চুমু খেল। যূথী একটুও বাধা দিল না কিংবা লজ্জা পেল না। সে বলল, আঃ! আঃ! তুমি আমাকে শক্ত করে ধরে থাকো, যদি আর একদিনও না বাঁচি তবু যেন আজকের দিনটা...মনসিজ কিন্তু সরে গেল। গম্ভীরভাবে বলল, চল।

কোথায়?

চলই না।

এবার হেঁটে-হেঁটেই আসতে হল। চৌরঙ্গীর কাছে মনসিজ জিগ্যেস করল, যদি আজই পুরী যাই তুমি যেতে পারবে? এখনও ট্রেন আছে! যূথী বলল, কেন পারব না? বাড়িতে শুধু একবার বলে যাব যে চন্দনার সঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছি। চন্দনাকেও আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাব, কিংবা চন্দনা না গেলেও ক্ষতি নেই।

মনসিজ দু-এক মুহূর্ত ভেবে নিল। সে হোস্টেলে থাকে তার পক্ষে পালাবার কোনও অসুবিধে নেই।

মিউজিয়ামের সামনে যূথীকে দাঁড় করিয়ে বলল, তুমি এখন চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকো। নিউ মার্কেটে আমার বাবার এক বন্ধুর একটা বড় দোকান আছে। উনি আমাকে ছোটবেলা থেকে চেনেন। একটা কিছু সাংঘাতিক গুল ঝাড়লে উনি চার-পাঁচশো টাকা ঠিক দিয়ে দেবেন। দোকান বোধহয় এখনও বন্ধ হয়নি। তুমি আমার পেছনে-পেছনে এসো না। প্লিজ। বাবার বন্ধু তোমাকে দেখে ফেললে...

তা বলে আমি এতটা দূরে দাঁড়িয়ে থাকব?

বুঝছ না, উনি যদি বাইচান্স আমাকে একটু এগিয়ে দিতে আসেন, কিংবা বলেন, চল, তোমাকে পৌঁছে দিচ্ছি, তাই তোমাকে এতটা দূরে...।

মনসিজ সেই যে গেল তো গেলই। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে পা ব্যথা হয়ে গেল যূথীর। মনসিজ যদি সারারাতও না আসে, তা হলেও যূথীকে এখানেই দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। কারণ মনসিজ কোনও দিন তার কাছে একটাও মিথ্যে বলেনি! সে জানে প্রয়োজনের বেশি এক মুহূর্তও দেরি

করবে না মনসিজ।

লোকেরা তার দিকে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে। দু-একজন কাছাকাছি ঘুরঘুর করছে। তাতে ভয় নেই যূথীর। এটা কলকাতা শহর, এখনও আটটা বাজেনি, এখানে ভয়টা কী? আরও দু-একটা মেয়ে দূরে-দূরে দাঁড়িয়ে আছে। ওরাও নিশ্চয়ই অপেক্ষা করছে কারুর-না-কারুর জন্য।

একটা ট্যাক্সি একটু দূরে এসে থামল। সেটা থেকে নেমে এল একটা রোগা মতন লোক। আস্তে-আস্তে হেঁটে লোকটি যূথীর ঠিক পাশে এসে দাঁড়াল। যূথীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল কয়েকবার। যূথীও দেখল লোকটিকে। লোকটির মুখে মদের গন্ধ।

লোকটি আরও কাছে ঘেঁষে এসে ফিস-ফিস করে জিগ্যেস করল, যাবে? যূথী লোকটির চোখে চোখ রেখে বলল, কোথায়?

লোকটি বলল, ওই যে আমার ট্যাক্সি দাঁড় করানো আছে।

যূথী বলল, একটু দাঁড়ান, আমার এক বন্ধু আসছে, সে-ও যাবে আমার সঙ্গে।

বন্ধু, কে বন্ধু?

আপনার চেয়ে অনেক লম্বা, গায়ে খুব জোর।

লোকটি যেন কেঁপে উঠল। আর একটুও দেরি না করে হনহন করে এগিয়ে গেল ট্যাক্সির দিকে। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই মনসিজ এসে পৌঁছল। সে একটু-একটু হাঁপাচ্ছে, দৌড়ে এসেছে তো!

ওই লোকটা কে?

জানি না তো!

তোমার সঙ্গে কথা বলছিল দেখলাম।

হ্যাঁ, কথা বলছিল। তুমি এত দেরি করলে?

দেরি তো করিনি। গেলাম আর এলাম। ধুৎ, কাজ কিছুই হল না। আমার বাবার সেই বন্ধু একটু আগে বেরিয়ে গেছেন। দোকানে একজন কর্মচারী ছিল, সে-ও আমাকে চেনে, অনেক বুঝিয়ে বললাম, সে আমাকে চল্লিশ টাকা দিল, ক্যাশের চাবি তার কাছে নেই।

তবু তো অনেক টাকা পাওয়া গেছে!

মাত্র এই ক'টা টাকা নিয়ে পুরী যাওয়া যায় না।

তাহলে আমরা ডায়মন্ডহারবার যাই।

মনসিজ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। টাকার কাছে পৌরুষ অসহায়। যূথী নিজে থেকে পুরী যেতে চাইছে, অথচ নিয়ে যাওয়ার সামর্থ তার নেই।

যূথী বলল, ওই লোকটা আমাকে কী বলছিল জানো। বলছিল, চল! ও কোথায় নিয়ে যেতে চাইছিল আমাকে?

মনসিজ আবার চঞ্চল হয়ে সামনে তাকাল। ট্যাক্সিটা ছেড়ে গেছে, লোকটাকে আর ধরা যাবে না। মনসিজ তিক্তভাবে বলল, হয়তো কোনও হোটেলে। অথবা ডায়মন্ডহারবারে। এমনকী পুরীতেও নিয়ে যেতে পারত।

যূথী বলল, বাঃ বেশ মজা তো, তাহলে তো লোকটাকে আটকালেই হত। ওকে নিয়েই না হয় আমরা সেসব জায়গায় যেতাম।

তুমি পাগল! ও তোমাকে একা নিয়ে যেতে চায়। আমাকে সঙ্গে নেবে কেন?

তবু ওকে একবার বলে কয়ে বুঝিয়ে যদি রাজি করানো যেত।

যূথী ন্যাকার মতন কথা বলো না। ওইরকম একটা লম্পটের সঙ্গে আমরা যাবই বা কেন? যে লোক রাস্তাঘাট থেকে মেয়ে ধরে।

ওদের কেন অনেক টাকা? কেন আমাদের নেই? আমাদের বুঝি বাঁচতে ইচ্ছে করে না?

তোমার যদি এত আনন্দ করার লোভ থাকে, ওইরকম কোনও লোকের সঙ্গে গেলেই পারতে।

তুমি আমাকে এতরকম কথা বললে?

হ্যাঁ বললাম। আমার টাকা নেই, এই আমাদের মস্ত অপরাধ। তুমি যদি চাও, তুমি ওইরকম লোকের সঙ্গে আজ ফুর্তি করতে পারো। আমি কোনও আপত্তি করব না! কী আর আসে যায়, ফুর্তি নিয়ে তো কথা!

তুমি আপত্তি করবে না?

না।

ঠিক আছে, আমি এখানেই দাঁড়িয়ে থাকব।

আর মাত্র দু-মিনিট কথাবার্তাতেই ঝগড়া চরমে উঠল। মনসিজ বড্ড গোঁয়ার, সে যূথীকে একা ফেলে রেখে চলে গেল গটগট করে।

একটু বাদেই আর-একটা ট্যাক্সি থামল। একজন স্থূলকায় লোক তার থেকে নেমে হেলতে-দুলতে এগিয়ে এল। লোকটি বেশ মোটা আর বেঁটে, মাথায় বাবরি চুল।

সে-ও এসে যূথীর পাশে দাঁড়িয়ে বলল, কী—যাবে?

যূথী অন্য কোনও দিকে না তাকিয়ে বলল, হ্যাঁ, যাব। কতদূরে?

লোকটি পানের রস ভরতি লালা মুখে বলল, ওই যে ট্যাক্সি। লোকটির সঙ্গে গিয়ে যূথী ট্যাক্সিতে উঠল।

ট্যাক্সিটা ছাড়ার পর দশ বারো গজও এগোয়নি, আবার থেমে গেল ঘচাং করে। তার ভেতর থেকে যূথীর গলার চিৎকার শুনতে পাওয়া যাচ্ছে।

শীতের রাত, তবু রাস্তায় মানুষ জন আছে।

নারীর কণ্ঠ শুনে ছুটে এল অনেকেই। যূথী কাঁদতে-কাঁদতে বলল, এই লোকটা জোর করে আমার ওপর অসভ্যতা করছে।

রাস্তার লোকজন সেই বেঁটে মোটা লোকটাকে মেরেই ফেলত। তার মধ্যেই মনসিজ এসে ট্যাক্সিটার অন্য দরজা দিয়ে উঠে পড়ে লোকজনকে বলল, আমি একে চিনি, আর কোনও চিন্তা নেই। পথের লোকেরা যূথীকে দিয়ে যাচাই করে নিল সত্যিই সে মনসিজকে চেনে কি না?

মনসিজ ড্রাইভারকে বলল, আপনি গাড়ি চালান।

ট্যাক্সি একটু দূরে যাওয়ার পর মনসিজ জিগ্যেস করল, একে নিয়ে কী করব?

যূথী বলল, একে খুন করে ফেলো! এ আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল।

মনসিজ লোকটার চুলের মুঠি চেপে ধরতেই সে হাউমাউ করে উঠল, প্রাণে মারবেন না, দয়া করুন, ছেড়ে দিন, জীবনে আর কখনও...মনসিজ লোকটার চুল ঝাঁকাতে-ঝাঁকাতে আবার জিগ্যেস করল, জড়িয়ে ধরেছে? আর কী করেছে? কোথায় হাত দিয়েছে?

যূথী বলল, ওকে ছেড়ে দাও। ও একটা নরকের কীট। তোমার শাস্তির যোগ্যও নয়।

লোকটা পকেট একটা মোটা মানিব্যাগ বের করল, আমার সব টাকা নিন। আমাকে বাঁচান।

মনসিজ প্রচণ্ড এক চড় কষাল লোকটার গালে। ট্যাক্সিওয়ালা গাড়ি থামিয়েছে।

লোকটা প্রায় আলুর মতন গড়িয়ে নেমে গেল গাড়ি থেকে।

ট্যাক্সিওয়ালা জিগ্যেস করল, এবার যাব?

মনসিজ বলল, আর এক মুহূর্ত এখানে থাকলে আমি ওকে খুনই করে ফেলব! ট্যাক্সি চলতে শুরু করল আবার। মনসিজ জিগ্যেস করল, তোমার লেগেছে কোথাও? তোমাকে চুমু খেয়েছে?

যূথী বলল, না।

মনসিজ বলল, ড্রাইভারদাদা, আপনি একটু চোখ বুজবেন? ট্যাক্সি ড্রাইভার বলল, চোখ বুজে আমি গাড়ি চালাব? এসব কী হচ্ছে আজ? এত রকম কাণ্ড চলছে, আমি মাথার ঠিক রাখতে পারছি না।

মনসিজ বলল, চোখ বুজতে হবে না। কিন্তু আপনি এদিকে মুখ ফেরাবেন না। যূথী বলল, তুমি যদি আসতে আর এক মিনিট দেরি করতে, তাহলে আমার সারা জীবনটা ব্যর্থ হয়ে যেত।

তুমি লোকটার সঙ্গে ট্যাক্সিতে উঠলে কেন?

আমি দেখতে চেয়েছিলাম, তুমি কী করো।

মনসিজ যূথীকে নিজের বুকের কাছে টেনে এনে চুম্বনে আবদ্ধ করল। কিন্তু চুম্বনটি দীর্ঘস্থায়ী হল না। যূথী নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে হাসিমুখে বলল, টি-বি রুগিকে অত বেশি চুমু খেতে নেই।

মনসিজ আবার তাকে টেনে নিতে যেতেই যূথী বলল, আমার পায়ে কী যেন ঠেকছে!

নীচু হয়ে সে তুলে নিল। একটা মানিব্যাগ। সেই বেঁটে মোটা লোকটার। ব্যাগটির মধ্যে অন্তত সাতশো টাকা।

মনসিজ স্থিরভাবে তাকাল যূথীর দিকে। দুজনের দৃষ্টি কয়েক পলক আবদ্ধ হয়ে রইল। টাকা! তার মানে পুরী, তার মানে আনন্দ, তার মানে যা খুশি করার স্বাধীনতা!

যূথী বলল, ট্যাক্সি ঘোরাও, এখনও লোকটাকে পাওয়া যেতে পারে। গাড়ি ঘুরিয়ে আনা হল সেই জায়গায়। না লোকটি নেই। পালিয়েছে। কিংবা সাতশো টাকার মূল্য ওর কাছে বেশি নয়।

মনসিজ বলল, এখনও পুরীর ট্রেন পাওয়া যায়।

যূথী বলল, আমার বুক ব্যথা করছে। এটা বোধহয় নতুন কোনও অসুখ।

বাড়ি যেতেই হবে।

মনসিজ বলল, টাকা দিয়ে কী হবে?

যূথী সেটা নিজের হাতে নিয়ে এক গোছা টাকা মুঠোয় ধরে হাতটা জানলায় রাখল। ফরফর করে উড়তে লাগল টাকাগুলো।

যূথী সারা মুখ হাসিতে ভরিয়ে বলল, তোমাকে বলেছিলাম না আজ আমার খুব টাকা ওড়াতে ইচ্ছে করছে? দ্যাখো সেই শখটা কেমন মিটে গেল!

মনসিজ বলল, সব টাকা উড়িও না। ট্যাক্সি ভাড়া দিতে হবে কিন্তু। তা ছাড়া গ্র্যান্ড হোটেলে সেই খাবার ব্যাপারটা?

যূথী বলল, তুমি যদি আর এক মিনিট দেরি করে আসতে, তাহলে আমি ওই লোকটার সঙ্গে গ্র্যান্ড হোটেলে গিয়ে খেতাম। কাল যদি শরীর ভালো থাকে, তোমাতে-আমাতে সেই ঘুগনি আর মিষ্টি খাব। দু-প্লেট করে? বাকি টাকাটা সে ফেলে দিল ট্যাক্সি ড্রাইভারের কোলে। বলল, এগুলো সব আপনার।

ট্যাক্সি থেমেছে ট্র্যাফিকের লাল আলোয়। একটা লোক দৌড়ে এসে বলল, ফুল? ফুল নেবেন?

ট্যাক্সি ড্রাইভার দরাজ গলায় বলল, যতগুলো আছে, সব দিয়ে দাও। ওই মেমসাহেবকে দাও।

ঠিক যেমনভাবে ট্যাক্সি ড্রাইভারের কোলের ওপর নোটের গোছা পড়েছিল, সেইভাবে যূথীর কোলের ওপর এসে পড়ল গুচ্ছ-গুচ্ছ ফুল।

যূথী একটা গোলাপ তুলে নিলে। তারপর আপন মনে বলল, কিছু ফুল দিনের বেলা ফোটে, কিছু ফুল রাত্তিরে। এগুলো সব দিনের বেলার ফুল।

মনসিজ বলল, এ ফুলগুলো ওরা কবরখানা থেকে চুরি করে আনে।

যূথী বলল, চমৎকার! তাহলে আমাকে খুব মানাবে! সব ফুলগুলো একসঙ্গে তুলে নিয়ে সে খুব আদর করতে লাগল।

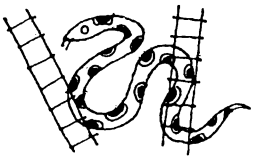

নীল আগুন

যেরকম পথে ঘাটে হিপিদের দেখা যায়, লম্বা-লম্বা চুলওয়ালা ছেলে ও মেয়ে অনেক সময় খালি পা, নোংরা পোশাক,—সেইরকমই একজোড়া যুবক-যুবতীকে আমি দেখেছিলাম। কিছুই অবাক হইনি।

ওরা পার্কস্ট্রিটে চৌরঙ্গির মোড়ে দাঁড়িয়েছিল। দুজনেরই পোশাক একরকম, প্যান্ট ও সার্ট, সোনালি রঙের চুল, হালকা নীল চোখের মণি, দুধে আলতা রং, অন্য হিপিদের মতো এরা তেমন নোংরা নয়, যদিও পোশাক ছেঁড়াখোঁড়া।

ওরা চুপ করে দাঁড়িয়ে পরস্পরের মধ্যে নীচু গলায় কথা বলছিল। আমি দু-এক পলক ওদের দিকে তাকিয়েছিলাম, ওরা এতই রূপবান যে, না তাকিয়ে পারা যায় না। দুজনেরই মুখ অপরূপ সারল্য মাখানো।

আমি ভাবলাম, ওরা তো বেশ ভালোই আছে। চাকরি-বাকরি কিংবা ঘর সংসার নিয়ে থাকাই এই পৃথিবীর নিয়ম। এ নিয়ম বড্ড পুরোনো হয়ে গেছে, ওরা যদি সে নিয়ম না মানে, তাহলে বুঝতে হবে ওরা অন্যরকম সুখ চাইছে।

অধিকাংশ হিপিই একরকম চেহারার হয়, এবং সাহেব-মেমদের মুখ একবার মাত্র দেখে মনে রাখাও যায় না। সুতরাং ওদেরও মনে রাখার কোনও কারণ ছিল না। কিন্তু আমি ঘাম মুছবার জন্য যেই পকেট থেকে রুমাল বার করতে গেছি অমনি ঝনঝন করে কয়েকটা খুচরো পয়সা রাস্তায় পড়ে গেল। কয়েকটা গড়িয়ে গেল ওদের পায়ের কাছে।

আমি নীচু হয়ে পয়সা তুলতে গেলাম। ছেলেমেয়ে দুটিও পয়সা কুড়িয়ে আমার হাতে দিল। আমি হেসে বললাম থ্যাঙ্ক য়ু।

ওরা দুজনে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। তারপর কি বলল আমি বুঝতে পারলাম না। বোধহয় ওদের ভাষা ইংরেজি নয়, জার্মান, ফরাসি ডাচ ছেলেমেয়েরাও তো হিপি হয়।

আমি আর সেখানে দাঁড়ালাম না। হাঁটতে লাগলাম ধর্মতলার দিকে। ওরা সেখানেই রইল দাঁড়িয়ে। মেয়েটির হাসি আমার এতই সুন্দর লেগেছিল যে, আমি দু-একবার ওদের দিকে ফিরে-ফিরে না তাকিয়ে পারিনি। বেশিবার তাকানো আবার অভদ্রতা। তবে, ছেলেটার চোখ যেন বেশি জ্বলজ্বল করছিল।

এটা একটা সামান্য ঘটনা মনে রাখবার মতন কিছু নয়। আমিও মনে রাখিনি।

এর কয়েকদিন পর আমি বেনারস গিয়েছিলাম। বেনারস তো একেবারে হিপিদের রাজত্ব। রাস্তায়, বিশেষত গঙ্গার ধারে শতশত হিপিদের যখন-তখন দেখা যায়। এদের মধ্যে যদি সেই দুজন হিপিকে হঠাৎ একদিন দেখি, আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। আমি কিন্তু ওদের দুজনকে অত ভিড়ের মধ্যেও চিনতে পেরেছিলাম। সেই মেয়েটির হাসি দেখেই চিনলাম। হাসিটা আমার চোখে লেগেছিল, মেয়েটির শরীরটা এত সুন্দর এবং মুখখানা এত লাবণ্যময়, যে সিনেমায় নামলে দারুণ নাম করতে পারত, তার বদলে একটা পাতলা জামা ও প্যান্ট পরে গঙ্গার ধারে শুয়ে রোদ পোয়াচ্ছে।

এর দুদিন পরে বেনারসে একটা ছোটখাটো দাঙ্গা লেগেছিল। একদল লোক লাঠিসোটা এমন

কি খোলা তলোয়ার হাতে রাস্তায় নেমে পড়ল। তারা সব হিপিদের তাড়াবে। কয়েকজন হিপিকে মারধোরও করল খুব। তবে ঠিক সময়ে পুলিশ এসে পড়ায় বেশিদূর গড়াল না। অনেক গ্রেপ্তার হল। লোকগুলো নাকি অধিকাংশ গুন্ডাশ্রেণির।

হিপিদের ওপর ওদের অত রাগের কারণটা পরে জানতে পারলাম। বেনারসে আমি উঠেছিলাম আমার বন্ধু প্রশান্তর বাড়িতে। আমার বন্ধুর স্ত্রী গীতি যাকে বলে সরকারি গেজেট। রোজ সকালবেলা বাজার করতে গিয়ে গীতি যাবতীয় খবর সংগ্রহ করে আনে।

গীতি আমাদের একটি লোমহর্ষক কাহিনি শোনাল।

বেনারসের আশেপাশে এখনও অনেক ছোটখাটো রাজা ও জমিদার রয়ে গেছে, তারা প্রায় মধ্যযুগীয় কায়দায় জীবন কাটায়। তারা নিজস্ব গুন্ডা পোষে, অনেক সময় লোকজনকে খুন করে মৃতদেহ গায়েব করে দেয়, নানা জায়গা থেকে স্ত্রীলোক ধরে আনে।

হিপিদের মধ্যে অনেক সুন্দর-সুন্দর মেয়ে আছে বলে অনেক সময় এইসব রাজা ও জমিদাররা গুন্ডা দিয়ে হিপি মেয়েও লুঠ করে। আগেকার দিনে কোনও মেমসাহেবকে ভোগ করার কথা তারা ভাবতেও পারত না। এখন অনেক সুযোগ, বেনারসে এত হিপি মেয়ে গিসগিস করছে। তার মধ্যে দু-একজন হারিয়ে গেল কি না গেল কে খোঁজ রাখে।

সেই রকমই একটা ঘটনা ঘটেছিল গতকাল। একজোড়া হিপি ছেলেমেয়ে রাত্তিরবেলা একটা সরু গলি দিয়ে যাচ্ছিল, এই সময় তিনজন গুন্ডা তাদের অনুসরণ করে। গুন্ডাদের সঙ্গে লাঠি ও ছুরি ছিল।

গলিটা ছিল কানাগলি। এক জায়গায় শেষ হয়ে গেছে। সামনে দেওয়াল, হিপি ছেলে ও মেয়েটা বুঝতে পেরেছিল, তাদের পিছনে গুন্ডা লেগেছে। কিন্তু রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে, তাদের আর পালাবার উপায় নেই, তাই পিছনে ফিরল।

সঙ্গে-সঙ্গে গুন্ডা তিনজন ঝাপিয়ে পড়ল মেয়েটির ওপর। মেয়েটি কিন্তু একটুও ভয় পায়নি। সে চিৎকার করে কি যেন বলল ছেলেটিকে।

ছেলেটি একজন গুন্ডাকে টেনে তুলল। তারপর সে গুন্ডাটির দুটি হাত ধরে টেনে ছিঁড়ে ফেলে। ছিঁড়ে ফেলে মানে শরীর থেকে একেবারে ছিঁড়ে আলাদা করে মাটিতে ফেলে দেয়। তারপর সে গুন্ডাটার চোখ দুটো খুবলে নেয়।...

গল্পের মাঝখানে বাধা দিয়ে আমি বললাম, গীতি বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে না? গীতি তার সুন্দর মুখে দারুণ বিস্ময় ফুটিয়ে বলল, আপনি বিশ্বাস করছেন না? সবাই একথা শুনেছে। সাহেব ছেলেটার চোখ দিয়ে নাকি আগুন বেরুচ্ছিল।

—তারা কী করে জানল? ওখানে কি আর কেউ উপস্থিত ছিল? তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, তুমি যেন পাশে দাঁড়িয়ে সব দেখছিলে।

এসব কথা ঠিক জানা যায়, বুঝলেন। পরে সেই ডেড বডিটা অনেকে দেখেছে, তার মুখটা আগুনে পোড়া, অথচ সেখানে কোনও আগুন ছিল না।

বাকি গুন্ডা দুজন কী করল?

তারা সেই বীভৎস দৃশ্য দেখে ভয়ে পালিয়ে গেল।

মানুষের হাত টেনে ছিঁড়ে ফেলা একটা অমানুষিক কাজ, হিপিরা সাধারণত নিরীহ হয়। ওদের কাছে অস্ত্র থাকে না, তা ছাড়া গাঁজা-ভাঙ খেয়ে-খেয়ে শরীরেও জোর থাকে না বিশেষ। তবে জুডো আর ক্যারাটে নামে কয়েক রকম যুযুৎসু আছে, যাতে একজন ছোটখাটো মানুষও বিশাল চেহারার লোককে টিট করে দিতে পারে। কিন্তু হাত ছিঁড়ে ফেলা অসম্ভব। আমরা এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলাম, এমনসময় প্রশান্তর বন্ধু তুষার এল।

তুষার সব শুনে বলল, গল্পটার অনেকখানি অংশ সত্যি। গতকাল রাত্রে কাশীর একটা সরু

গলিতে একজন কুখ্যাত গুন্ডার মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা গেছে। তার একটা হাত কাটা অবস্থায় পড়ে ছিল পাশে। চোখ দুটোও গেলে দেওয়া হয়েছে।

তুষারের মামা এখানকার পুলিশের একজন হোমড়া-চোমড়া অফিসার। তিনি দিয়েছেন এ খবর। ব্যাপারটার মধ্যে বেশ রহস্য আছে।

মারা গেছেন একজন কুখ্যাত গুন্ডা—সে একটা মেয়েকে চুরি করতে গিয়েছিল। সুতরাং সে যোগ্য শাস্তিই পেয়েছে বলা যায়। কিন্তু দেখা গেল, বেনারসে অধিকাংশ লোক হঠাৎ ক্ষেপে গেল হিপিদের ওপরে। দাবি উঠল সব হিপিকে তাড়িয়ে দেওয়ার। থাইল্যান্ড কিংবা শ্রীলঙ্কায় যে রকম করা হয়েছে। গুন্ডারা বেনারসে চিরকালই ছিল এবং থাকবে। তাদের ঘাঁটাবার কোনও মানে হয় না।

শিক্ষিত লোকেরা বলতে লাগল, হিপিদের মধ্যে সি.আই.এ.-র দালাল এবং নানারকম স্পাই মিশে থাকে। ওদের এরকম যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াবার স্বাধীনতা দেওয়া যায় না। কথাটার মধ্যে হয়তো কিছু সত্যি থাকতেও পারে। তবে হিপিদের মধ্যে যে অন্য অনেক কিছু মিশে থাকে, তার প্রমাণ আমি পেলাম কয়েকদিন পরে।

বেনারসে ওই ঘটনা শুনে আমার মনে হচ্ছিল আমি যে হিপি যুগলকে চিনি এই ব্যাপারটা বোধহয় তাদের নিয়েই। অবশ্য এর কোনও ভিত্তি নেই। হাজার-হাজার হিপি রয়েছে। তবে হিপিদের মধ্যে অনেক সুন্দর মেয়ে থাকলেও ওই মেয়েটির মতো সুন্দর আমি কারুকে দেখিনি।

শুনলাম অনেক হিপি বেনারস ছেড়ে চলে গেছে। নিশ্চয়ই ওদের স্বর্গস্থান নেপালে আরও ভিড় বাড়বে।

প্রশান্তর ফিয়াট গাড়িটা গ্যারেজ থেকে মেরামত হয়ে আসার পরই ও বলল, চলো কাছাকাছি কোনও জায়গা থেকে ঘুরে আসি।

বেনারসে আমি বেশ কয়েকবার এসেছি। অনেক কিছুই দেখা। শুধু চুনারে আমার যাওয়া হয়নি। তাই ঠিক হল চুনারে যাওয়া হবে।

কথা ছিল, সকালে গিয়ে সন্ধের আগে ফিরে আসা। কিন্তু চুনারে দুর্গের ওপরের গেস্ট হাউসটি দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। আমি ভারতের বহু জায়গায় গেস্ট হাউসে থেকেছি, কিন্তু এমন সুন্দর জায়গা দেখিনিই প্রায় বলতে গেলে।

পাহাড় কেটে বসানো হয়েছে দুর্গ, সেই দুর্গে একসময় যেটা ছিল দরবার এখন সেটাই জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত। বিশাল-বিশাল সুসজ্জিত ঘর। সামনে সুন্দর সাজানো চাতাল, অনেক নীচে গঙ্গা। গঙ্গা এখানে একটা বাঁক নিয়েছে, সন্ধের আধো অন্ধকারে মনে হল ঠিক যেন বাঁকা চাঁদ।

আমি গীতি আর প্রশান্তকে বললাম, এসো আজ রাতটা এখানেই থেকে যাই। গীতি বলল, দারুণ জায়গা। আমারও থাকতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু সঙ্গে জিনিসপত্র যে কিছু আনিনি!

প্রশান্তর থাকার খুব ইচ্ছে, কিন্তু কাল সকালেই ওর অফিসের ব্যাপারে একটা জরুরি অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।

তখন ঠিক হল, আমি একাই ওখানে থেকে যাব। প্রশান্ত আর গীতি আজ ফিরে যাবে, ফিরে আসবে কাল বিকেলে। তারপর তিন-চারদিন থাকা হবে।

গেস্ট হাউসের ঘর দুটোই ফাঁকা ছিল। সুতরাং রিজার্ভেশন পেতে কোনও অসুবিধা হল না।

যাওয়ার সময় গীতি আবার বলল, সুনীলদা, আপনার একা-একা এখানে ভয় করবে না তো!

আমি বললাম, যাঃ ভয় আবার কী!

প্রশান্ত হাসতে-হাসতে বলল, এখানে রাজা-মহারাজাদের আমলে যুদ্ধ চলছে, কত খুন জখম হয়েছে, তাদের ভূতটুত থাকতে পারে।

আমি বললাম, ভূতরাও মিলিটারিদের ভয় পায়।

দুর্গটার এক অংশ এখন মিলিটারিদের দখলে। একদিকে একটা মন্দির আছে আর এই গেস্ট হাউস শুধু জনসাধারণের জন্য।

আমি এক জামাকাপড়ে রয়ে গেলাম সেখানে। প্রশান্ত আর গীতি চলে যাওয়ার পর আমি একটা চেয়ার টেনে নিয়ে সামনের চত্বরটায় বসে গঙ্গা দেখতে লাগলাম। সন্ধের পর এখানে আর বাইরের লোকদের আসতে দেওয়া হয় না। জায়গাটা এখন খুবই নির্জন। অনেকদিন এমন নির্জনতা উপভোগ করার সুযোগ পাইনি।

সাব!

আমি চমকে উঠলাম। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম, ডাকবাংলোর চৌকিদার। সে জিগ্যেস করল রাত্তিরে আমার জন্য খাবার বানাতে হবে কি না। তাইতো! নির্জনতা নিয়ে কবিত্ব করতে গিয়ে আমি খাবার কথাই ভুলে গিয়েছিলাম। কথাটা ভাবতেই আমার খিদে পেয়ে গেল। জিগ্যেস করলাম, খাবার কী পাওয়া যাবে?

সবচেয়ে সুখাদ্য এবং সহজে রান্না করা যায়, অর্থাৎ ভাত আর মুরগির মাংস তারও ব্যবস্থা আছে। আমি সেটারই অর্ডার দিলাম, এবং বললাম, খুব জলদি বানাতে।

আপশোশ হতে লাগল কেন একটা হুইস্কি বা ব্র্যান্ডির বোতল সঙ্গে আনিনি, তাহলে এই নির্জনতা আরও ভালোভাবে উপভোগ করা যেত।

চৌকিদারকে কথাটা জিগ্যেস করতে লজ্জা করছিল। তারপর লজ্জার মাথা খেয়ে জিগ্যেস করেই ফেললাম। সে বলল, এনে দিতে পারে, তবে অনেকটা সময় লাগবে। পাহাড়ের নীচে বাজারে যেতে হবে কি না।

আমি তাকে পাঁচ টাকা বকশিশ দিয়ে বললাম, যাও তাই নিয়ে এসো।

চৌকিদার চলে যাওয়ার পর জায়গাটা আরও বেশি নির্জন মনে হতে লাগল। একটা জিনিস লক্ষ্য করে আমি অবাক হয়ে গেলাম। চারপাশে এত সৌন্দর্য, মাথার ওপরে বিশাল আকাশ, নীচেও বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়, গঙ্গার রূপও এখানে অসামান্য, চমৎকার হাওয়া দিচ্ছে—তবু একা থাকার জন্য আমি এসব তেমনভাবে উপভোগ করতে পারছি না। আমার একটু ভয়-ভয় করছে। সঠিক ভূতের নয়, বরং চোর-ডাকাতের ভয়ই বেশি। চৌকিদারকে না পাঠালেই হত। আমাকে এখানে একা পেয়ে কেউ যদি খুন করে টাকাপয়সা কেড়ে নিয়ে যায়? আমার কাছে মাত্র শ'দেড়েক টাকা রয়েছে যদিও কিন্তু এদেশে পাঁচ-দশ টাকার জন্যেও অনেক সময় খুন হয়। হঠাৎ মনে হল, ঠান্ডা হাওয়ার জন্য আমার একটু শীত-শীত করছে। আসলে এটা একটা অজুহাত। বাইরে একা বসে থাকতে আমার গা ছমছম করছিল। ঘরের মধ্যে এসে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। বেশি নরম গদি। খুব আরামের। একটুক্ষণ বাদেই আমি বাইরে কার যেন গলার আওয়াজ শুনলাম। দরজা দিয়ে উঁকি মেরে দেখি চত্বরের একেবারে শেষপ্রান্তে গঙ্গার দিকে দুজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। নিজেদের মধ্যে গল্প করছে মনে হয়।

সিগারেট ধরিয়ে আমি বাইরে এলাম। অল্প চাঁদের আলোয় দেখলাম, একজন সাহেব ও মেম। রাত্রে সাধারণত কাউকে আসতে দেওয়া হয় না। তবে সাহেব ও মেমদের জন্য সব সময়ই অনেক বেশি সুযোগ সুবিধে থাকে। কিংবা হয়তো ওদের আগে থেকে ঘর রিজার্ভ করা ছিল।

একটু এগিয়ে এসে আমি দারুণ চমকে উঠলাম। সেই দুজন হিপি যুবক-যুবতী। এদের একবার আমি দেখেছি কলকাতায় পার্ক স্ট্রিটে, একবার কাশীতে, আবার এখন চুনারে! আমি যেখানে যাচ্ছি, এরা কি সেখানেই যাচ্ছে?

নিজের মনকে বোঝালাম হয়তো ব্যাপারটা কাকতালীয় যোগাযোগ। হঠাৎ এরকম মিলে যেতেই পারে। বেনারস থেকে হিপিরা বিতাড়িত হচ্ছে বলেই বোধহয় ওরা দুজন চুনারে এসেছে। অস্বাভাবিক কিছু নয়।

ওরা যখন আমার প্রতিবেশী, তখন ওদের সঙ্গে আলাপ করা যেতে পারে।

এগিয়ে গিয়ে বললাম, হ্যালো।

ওরা একটু চমকে ঘুরে দাঁড়াল। ওরা নিজেদের মধ্যে গল্পে মশগুল হয়েছিল। মেয়েটির দিকেই আমার প্রথম চোখ পড়েছিল। মেয়েটির মুখে সেইরকম হাসি নেই। বরং একটা রাগের ভাব। আমাকে কিছু না বলে দুর্বোধ্য কী একটা ভাষায় কিছু বলল ছেলেটিকে। আমি ভুলে গিয়েছিলাম ওরা ইংরেজি জানে না।

আমি ছেলেটির দিকে তাকালাম। ভারতবর্ষে যখন ঘুরছে তখন কিছু একটা দুর্বোধ্য ভাষা তো জানবে। বোধহয় হিন্দি জানে। তাই আমি বললাম, আপ লোক...

ছেলেটি আমায় কিছু বলতে দিল না। দুর্বোধ্য একটা শব্দ করে আমার দিকে তাকাল। আমার শরীরে একটা শিহরণ বয়ে গেল। ছেলেটির দু-চোখ দিয়ে নীল রঙের আলো বেরুচ্ছে। দুটো নীল আগুনের রেখা এসে ভেদ করল আমার মুখ। সেরকম ভয়ঙ্কর দৃশ্য আমি কখনও দেখিনি।

ছেলেটি এগিয়ে এসে আমার একটা হাত ধরল। কী অসম্ভব গরম তার হাত। একশো পাঁচ ডিগ্রি জ্বর হলেও মানুষের দেহে অতখানি উত্তাপ থাকে না।

স্বীকার করতে একটু লজ্জা নেই, আমি ভয়ে কাঁপতে লাগলাম। হাত ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেও পারলাম না। সমস্ত শরীর দিয়ে বুঝতে পারলাম এরা সাধারণ মানুষ নয়।

আমার মনে পড়ে গেল কাশীর সেই গুন্ডাটার হাত ছিঁড়ে যাওয়ার এবং চোখ নষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা। আমি এক হাতে চোখ ঢেকে চিৎকার করে বললাম, আমায় ছেড়ে দিন! দয়া করে ছেড়ে দিন! আমার কোনও খারাপ মতলব নেই! আমি সেখানে অজ্ঞান হয়ে অনেকক্ষণ পড়েছিলাম। চৌকিদারটা ফিরে এসে আমাকে ওই অবস্থায় দেখতে পেয়ে মাথায় জলের ছিটে দেয়, চোখ মেলেও প্রথমে আমার মনে হয়েছিল আমি মরেই গেছি। তারপর দেখলাম নিজের দুটো হাত ও দুটো চোখ অক্ষত আছে কি না। সবই ঠিক আছে। সেই ছেলেটি ও মেয়েটি সেখানে নেই। তাদের কেউ দেখেনি। চৌকিদার জোর দিয়ে বলল রাত্তিরে এখানে কারুর আসার হুকুম নেই।

আমি আজও ভূতে বিশ্বাস করি না। আমার দৃঢ় ধারণা ওরা ভূতটুত নয়—অন্য কিছু। আমাদের জানা জগতের বাইরের কোনও অস্তিত্ব। বন্ধুরা অবশ্য সব শুনে বলে, পুরো ব্যাপারটাই আমার চোখের ভুল। নির্জন জায়গায় সম্পূর্ণ একা থাকলে ওইরকম নাকি হয়। কিন্তু এখনও আমি চোখ বুজলেই দেখতে পাই! দুটো নীল আগুনের শিখা! ভাবলেই আমার বুক কেঁপে ওঠে।



নারী

সুজাতার সেই হেঁটে যাওয়ার ভঙ্গিটা আজও আমার স্পষ্ট মনে পড়ে। সেদিন সারাদুপুর প্রবল বৃষ্টি হয়েছিল, আমি ভেবেছিলুম, সন্ধের আগে থামবে না, বাড়ি ফেরার ব্যাপারে খুব সমস্যা হবে। কিন্তু বিকেল চারটের মধ্যেই হঠাৎ সেই বৃষ্টি যেন উড়ে চলে গেল অন্য দেশে, দিব্যি ঝিকিমিকি রোদ উঠে গেল। জানলা দিয়ে দেখলুম, কলেজ স্ট্রিটে এক হাঁটু জল জমে গেছে।

রোদ্দুরের একটি শিখা এসে পড়েছে সুজাতার মুখে। আমি তাকে বললুম, তোমার চেয়ারটা একটু এদিকে সরিয়ে আনো।

চেয়ার না সরিয়ে সুজাতা উঠে দাঁড়াল। তারপর ব্যাগটা তুলে নিয়ে বলল, আমি এবার বাড়ি যাব।

আমি রীতিমতন অবাক হয়ে বললুম, এখন বাড়ি যাবে কী করে? বসো, আমি তোমায় পৌঁছে দেব।

সুজাতা মৃদু গলায় বলল, না, আমি একাই যেতে পারব!

কোনও মানুষ যদি হঠাৎ কখনও তার স্বভাবের সম্পূর্ণ উলটো ধরনের ব্যবহার করে, তা হলে তাকে বলার মতন কোনও কথা চট করে খুঁজে পাওয়া যায় না।

সুজাতার পরিচ্ছন্নতার বাতিক। একদিন তার চটিতে কুকুরের অ্যা লেগে গিয়েছিল বলে সে চটিটাই ফেলে দিয়েছিল, সেই চটি আবার ধুয়ে ব্যবহার করার কথা যেন সে চিন্তাই করতে পারে না। সে এরকম নোংরা জল কাদার মধ্য দিয়ে হাঁটবে? গত বছর এইরকম একটি দিনে সে রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিল, জল কমে যাওয়ার জন্য।

তা ছাড়া হঠাৎ তার কী হল, সে একা চলে-চলে যেতে চাইছে কেন?

সুজাতা নামতে লাগল কফি হাউসের সিঁড়ি দিয়ে। আমি তার পেছন-পেছন এসে বললুম, এই, তোমার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল নাকি?

সুজাতা কোনও উত্তর দিল না।

জলের মধ্যে অবলীলাক্রমে পা দিয়ে সে এগিয়ে গেল ট্রাম লাইনের দিকে। আমি তখনও কিছুই বুঝতে পারছি না। সুজাতার সঙ্গে আমার রাগারাগি হয়নি। একটাও কথা কাটাকাটি পর্যন্ত হয়নি। শুধু শেষ পাঁচমিনিট আমরা দুজনেই চুপ করেছিলুম। এমন তো প্রায়ই হয়, কথা থেমে যায়, কিন্তু চিন্তার তরঙ্গ পরস্পরকে ছোঁয়।

আমি সুজাতার হাত ধরে বললুম, কী পাগলামি করছ? তুমি এখানে দাঁড়াও, আমি একটা ট্যাক্সি ডেকে আনছি!

সুজাতা হাতটা ছাড়িয়ে নিল, শান্ত অথচ দৃঢ় গলায় বলল, আমি একলা যাব, তুমি আমার সঙ্গে এসো না!

সুজাতার রাগ আমি চিনি। অভিমানও চিনি। আমি আবার সুজাতার হাত ধরতে যেতেই সে মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে স্থিরভাবে তাকাল। সেই মুখ আমার সম্পূর্ণ অচেনা। এই সুজাতা

আমার সঙ্গে যাবে না। আমার সঙ্গে সে কথা কাটাকাটিও করবে না, সে স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে।

ট্রাম বন্ধ হয়ে গেছে। রাস্তার ঠিক মাঝখান দিয়ে হাঁটতে লাগল সুজাতা। একটা চাঁপাফুল রঙের শাড়ি পরা, মাথার খোঁপাটা একটুখানি ভেঙে গেছে। কাপড় বাঁচাবার একটু চেষ্টা করছে না সে। পাশ দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে জল ছিটিয়ে, সেদিকেও তার একটুও ভ্রূক্ষেপ নেই। সুজাতার সেই কথার মধ্যে একটা তীব্র আঘাত ছিল। কোনওদিন সে আমার সঙ্গে ওই সুরে কথা বলেনি। তা ছাড়া কেনই বা সে হঠাৎ এমনভাবে আমাকে প্রত্যাখ্যান করবে? আমি কী ভুল বলেছি, কী দোষ করেছি?

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম।

বৃষ্টি থামার পর অনেক লোকই একসঙ্গে রাস্তায় নেমে এসেছে। চতুর্দিকে নানা রকম গাড়ির হর্ন। কিন্তু আমি যেন আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। আমার মনে হচ্ছে, সমস্ত রাস্তাটা শূন্য। সেখানে শুধু রয়েছে একমাত্র সুজাতা। কোনওদিন সে রাস্তার জলকাদায় নামেনি, আজ সে হাঁটু পর্যন্ত শাড়ি ভিজিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। সে একবারও তাকাচ্ছে না পেছন ফিরে। যেন আমার আর কোনও অস্তিত্বই নেই তার কাছে।

মোড়ের মাথায় পৌঁছবার আগেই একটা সাদা রঙের গাড়ি থামল তার পাশে। দরজাটা খুলে গেল, কে যেন ডাকল তাকে। সামান্য একটু দ্বিধা করে সুজাতা উঠে পড়ল সেই গাড়িতে, এবারেও সে তাকাল না আমার দিকে। আমার মনে হল, ওই গাড়িটা যেন সুজাতাকে গ্রাস করে নিরুদ্দেশে নিয়ে চলে গেল।

॥ দুই ॥

সুজাতাকে আমি অল্প বয়েসে দেখেছি। কিন্তু তাকে আমি অল্প বয়েস থেকে চিনি না। তখন আমার বয়েস ছিল চোদ্দো কি পনেরো হবে, বাড়ির লোকজনদের সঙ্গে গিয়েছিলুম আগ্রায়। টুন্ডলা জংশনে আমার মেজোমামা স্টেশন মাস্টার ছিলেন, তিনি আমাদের নেমন্তন্ন করেছিলেন।

তখন আমার সদ্য গলা ভাঙছে, হাফপ্যান্ট পরলে পা দুটো বড্ড লম্বা-লম্বা মনে হয়। গালে সবসময় দুটো-তিনটে ব্রণ থাকে বলে লজ্জা-লজ্জা করে। সেই বয়েসেই বাবা-মায়েদের সঙ্গে বেড়াতে যেতে আমার খারাপ লাগতে শুরু করেছিল। মুখখানা সবসময় গোঁজ হয়ে থাকত।

তাজমহল দেখতে গিয়ে একগাদা বাঙালির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। অক্টোবর-নভেম্বরে বাঙালিরা দলে-দলে ভারত অভিযানে বেরিয়ে পড়ে। তাজমহল দেখেনি এরকম মধ্যবিত্ত বাঙালি বিরল, এবং অনেক বাঙালিই সেখানে গিয়ে গদ্গদভাবে, 'একথা জানিতে তুমি ভারত ঈশ্বর শাজাহান...' আবৃত্তি করতে শুরু করে। আমরা একবার দিনেরবেলা তাজমহল দেখতে যাই, একবার রাত্তিরে। এরকমই নিয়ম। প্রত্যেকবারই নাকি তাজমহলকে নতুন মনে হয়। আমার অবশ্য তাজমহল দেখে নতুন কিছু আহামরি লাগেনি, সেই বয়েসটাই বোধহয় ওইসব দেখে মুগ্ধ হওয়ার কথাও নয়।

অন্য বাঙালিদের মধ্যে আমার মায়ের এক বান্ধবীকে হঠাৎ আবিষ্কার করা গেল। সেই ভদ্রমহিলা আবার তাঁদের পাড়ার তিন-চারটি পরিবারের সঙ্গে একটা দল মিলে এসেছেন। বিরাট এক দঙ্গল। সেই দঙ্গলের মধ্যে ছিল সুজাতা। তার তখন ঠিক বারো বছর বয়েস! সেই বয়েসের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বাবা-মায়েরা আলাপ করিয়ে দেয় না, তারা নিজেরাই ভাব করে নেয়।

সুজাতার সঙ্গে আমি দু-একটা কথা বলেছিলাম বোধহয়। আমার ঠিক মনে নেই। তখনও মেয়েদের সম্পর্কে আমার তেমন কোনও আগ্রহ জাগেনি। পূর্ণবয়স্কা মহিলা, বিশেষত যাদের

স্বাস্থ্যও ভালো, যাদের বলা যায় সম্পূর্ণ নারী, তাদের শরীর ও মুখের লাবণ্যের দিকে ভীরু-ভীরু চোখে তাকাতে ইচ্ছে করত বটে, কিন্তু নিজের চেয়ে কমবয়েসি মেয়েদের সম্পর্কে একটা অবজ্ঞার ভাবই ছিল।

সে রাতটা ছিল পূর্ণিমা রাত। প্রায় সবাই সঙ্গে করে নানা রকম খাবার নিয়ে গিয়েছিল। তাজমহল দেখার নামে আসলে সামনের বাগানে চাঁদের আলোয় পিকনিক।

সব পরিবারের খাবার-দাবারগুলো মিশিয়ে নানা রকম খাওয়া-দাওয়া হচ্ছিল, হঠাৎ একটা রব উঠল, একটি মেয়েকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অনেকক্ষণ ধরে সেই মেয়েটিকে কেউ দেখেনি।

সেই মেয়েটিই সুজাতা।

পুরুষরা সবাই খুঁজতে গেল। তাতে আমারও উৎসাহ ছিল, তাতে নিজেকেও পুরুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তা ছাড়া, এ যেন চোর-চোর খেলার মজা।

শেষপর্যন্ত সুজাতাকে খুঁজে পাওয়ার কৃতিত্ব কিন্তু আমার নয়। হয়তো তেমন মন দিয়ে খুঁজিনি, কারণ, মেয়েটিকে তো আমি চিনতামই না ভালো করে। তবে ছুটোছুটি করেছিলাম বেশ কিছুক্ষণ।

মেয়েদের স্মৃতিশক্তি কি বেশি? সুজাতা কিন্তু ঠিক মনে রেখেছিল। সেদিন সেই বাঙালিদের দলটায় নানা বয়েসের ছেলে ও পুরুষ ছিল, তাদের মধ্য থেকে বেছে-বেছে শুধু আমাকেই কি মনে রেখেছিল সুজাতা? না, সকলকেই তার মনে আছে? আমি তো সেদিন কোনও বিশেষ ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিইনি!

এর বেশ কয়েক বছর পর, সুজাতার সঙ্গে একদিন গঙ্গার ধার দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে, আকাশে একটা কমলালেবু রঙের চাঁদ দেখে সুজাতা বলেছিল, তোমার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়েছিল তাজমহলের সামনে!

আমাকে অবাক চোখে তাকাতে দেখে সুজাতা আবার বলেছিল, হাফপ্যান্ট-পরা বয়েসে তুমি একবার আগ্রায় যাওনি? সেবারে আমরাও ছিলুম ওখানে।

সুজাতা যতই মনে করাবার চেষ্টা করে, আমার কিছুতেই মনে পড়ে না। একটি মেমসাহেবকে প্রায় তার বাপের বয়েসি একজন সাহেব একটা গম্বুজের আড়ালে দাঁড়িয়ে চুমু খাচ্ছিল, আমি দেখে ফেলেছিলুম, তাজমহল সম্পর্কে সেটাই আমার প্রধান স্মৃতি। আর দ্বিতীয় স্মৃতি সন্ধ্যায় আজানের মধুর সুর!

সুজাতা বলল, একটা মেয়ে সেবার হারিয়ে গিয়েছিল, তোমার তাও মনে নেই?

হ্যাঁ, সেই ঘটনাটা মনে আছে বটে, কিন্তু কিশোরী মেয়েটির মুখ তো মনে করতে পারি না।

সুজাতা বলল, তুমি কেন আমাকে খুঁজতে যাওনি?

তুমি কি সেই জন্যই হারিয়ে গিয়েছিলে নাকি? আমি তোমায় খুঁজে বার করব বলে?

মোটেই না। তাজমহলের সামনে সবাই এত-এত খাবার খাচ্ছিল, আর চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে কথা বলছিল, সেটা আমার মোটেই ভালো লাগছিল না। তাই আমি ছুট্টে চলে গিয়েছিলুম, তাজমহলের পেছন দিকে, নদী খুঁজতে।

পেয়েছিলে সেই নদী?

হ্যাঁ। জলের ধারে একা-একা বসে থাকতে খুব ভালো লাগছিল। মনে-মনে ভাবছিলুম, আমাকে যেন আর কেউ কখনও ডাকতে না আসে। আমি ওইখানেই থাকব।

আমার তুলনায় সেই বয়েসেই সুজাতা অনেক বেশি পরিণত ছিল। আমি তাজমহলের দৃশ্য উপভোগ করিনি, নদীর কথা আমার মনেও পড়েনি। আর সুজাতা একা-একা গিয়ে বসেছিল যমুনার তীরে।

॥ তিন ॥

কেন সুজাতা রাস্তার জল ভেঙে একা-একা চলে গেল?

তার ঠিক দু-দিন আগেই আমার এম এ পরীক্ষা শেষ হয়েছিল। হাতে অফুরন্ত অবসর। কয়েকজন বন্ধু মিলে ঠিক করেছিল উটি যাবে, টানাটানি করছিল আমাকে নিয়েও। কিন্তু সুজাতা সেটা চায়নি। সে চেয়েছিল, আমার সঙ্গে পুরীতে যেতে।

হ্যাঁ, আর কেউ থাকবে না, শুধু আমার সঙ্গে সে পুরীতে যাবে, এক হোটেলে থাকবে। এসব কথা সুজাতা নিঃসঙ্কোচভাবে বলে। সে বাড়ির অভিভাবকদের ভয় পায় না।

প্রথমে একটু চমকে উঠেছিলুম ঠিকই। চাকরি-টাকরি পাওয়ার আগে বিয়ে করার প্রশ্নই ওঠে না। আমাদের বাড়ির অবস্থা ভালো না, টানাটানির সংসার। বিয়ের আগেই বান্ধবীকে নিয়ে সমুদ্রের ধারে একটা হোটেলে থাকা, ইংরেজি উপন্যাসেই এরকম হয়। যদিও আমরা ইংরেজি উপন্যাসের জগতেই অনেকটা বাস করি, তবু মধ্যবিত্ত বাঙালি সংস্কার একেবারে যায় না, কোথাও একটু ভয়-ভয় করে। যদি চেনাশুনো কারুর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়?

আমাকে একটু ইতস্তত করতে দেখে সুজাতা খানিকটা বিদ্রুপের সুরে জিগ্যেস করল, আমার সঙ্গে যেতে তুমি ভয় পাচ্ছ? বন্ধুদের সঙ্গে যাওয়াটাই তোমার বেশি পছন্দ? তাহলে আমিও তোমাদের সঙ্গে উটিতে যাব।

আমি অমনি কৃত্রিম উৎসাহ দেখিয়ে, চোখে একটা হাসির ঝিলিক দিয়ে বললুম, পাগল! বন্ধুদের সঙ্গে কে যাবে! শুধু তুমি আর আমি, পুরীর হোটেলে সারাদিন বিছানায় শুয়ে-শুয়ে সমুদ্র দেখব, আর...দারুণ, দারুণ, কবে যাবে বলো!

বন্ধুদের সঙ্গে উটি যাওয়ার বদলে সুজাতার সঙ্গে পুরী যেতে আমার আপত্তি থাকবে কেন? আমি তো সুজাতার প্রস্তাবে সঙ্গে-সঙ্গে রাজি। শুধু টাকাপয়সার চিন্তাটা মনের মধ্যে একটু খচখচ করছিল। আজেবাজে হোটেলে তো থাকতে পারবে না সুজাতা। আমার নিজস্ব কোনও জমানো টাকা ছিল না, বাবা-মায়ের কাছে দু-তিনশো টাকার বেশি চাওয়া যায় না। তবু হাজারখানেক টাকা কোনও-না-কোনও উপায়ে জোগাড় হয়ে যেতই! আমার ওই অর্থচিন্তা কি মুখে ফুটে উঠেছিল?

সে কি ভেবেছিল, আসলে তাকে নিয়ে পুরীতে বেড়াতে যাওয়ার সাহস আমার নেই? আমার কিছুক্ষণ নীরবতার সে ভুল অর্থ করেছিল?

এত সামান্য কারণে সুজাতা রাগ করে চলে যাবে? আমার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে কঠিন গলায় বলল, তুমি আমার সঙ্গে এসো না!

॥ চার ॥

সুজাতাদের বাড়ি এলগিন রোডে। কলকাতার অধিকাংশ বাঙালি বড়লোকদের মতন ওদের পরিবারেরও তখন পড়ন্ত দশা। অত বড় বাড়িটা অনেকদিন সারানো হয়নি। কিছুটা অংশ ভাড়াটে বসে গেছে। ওদের উঠোনটায় হয়েছে গাড়ি সারাবার গ্যারাজ। মাড়োয়ারি ও গুজরাতি ব্যবসায়ীরা বাড়িটা কিনে নেওয়ার জন্য ঘোরাঘুরি শুরু করে দিয়েছে।

তবু সুজাতার বাবা-কাকাদের মুখে একটা অহংকারী ভাব। লোকের সঙ্গে কথা বলে ভুরু তুলে। সুজাতার বড়দা সিনেমা কোম্পানি খুলে প্রচুর টাকা খোয়াল। কিন্তু তা নিয়ে বিন্দুমাত্র হা-হুতাশ করেনি। এমন ভাব দেখায় যেন দু-পাঁচ লাখ টাকা কিছুই না।

সুজাতার ছোড়দার নাম মন্তাদা, ক্রিকেট খেলা নিয়ে পাগল। একবার রঞ্জি ট্রফিতে চান্স

পেয়েছিল, দু-ইনিংসে মোট রান এগারো। তবু মুখে কী গর্বিত ভাব! আমার দিকে এমন ভাবে তাকায়, যেন আমি একটা কানা-খোঁড়া-পঙ্গু। কিংবা বামন। তার কারণ আমার জামাকাপড়ের চাকচিক্য ছিল না, আমার কোনও উঁচু বংশ পরিচয় ছিল না। আমি কথায়-কথায় বলতে পারি না যে বার্ড কোম্পানির ম্যানেজার আমার মামা কিংবা অমুক নাম করা ব্যারিস্টার আমার মেসোমশাই! সুজাতার মতন মেয়ে যে আমাকে বাড়িতে ডাকে, সেটা যেন তার দয়া!

কিছুদিন আগে সুজাতার মা মারা গেছেন, সুজাতা বলত, এই পৃথিবীতে মাকে ছাড়া আর কারুকে সে কখনও গ্রাহ্য করেনি। সুজাতার বাবা রাজনীতিতে ঢুকে পড়েছিলেন, মেয়ের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার তাঁর সময় নেই। সুজাতা একদিন ওদের বাড়িতে আমাকে খেতে নেমন্তন্ন করেছিল। আশ্চর্য ব্যাপার, ওদের বাড়ির আর কারুর সঙ্গে সেদিন একটা কথাও হল না আমার। আমি গিয়ে বসলুম তেতলায় সুজাতার নিজস্ব ঘরে, কিছুক্ষণ গল্প করার পর সুজাতা সেই ঘরেই খাবার নিয়ে এল, আমাদের বাড়িতে এই রকমটা চিন্তাও করা যায় না। বন্ধু-বান্ধবদের খেতে বললে মা নিজে খাবার পরিবেশন করেন। সুজাতার মা বেঁচে নেই বলে আর কেউ এ-বাড়িতে ভ্রূক্ষেপই করল না যে, তিনতলার ঘরে ওই যুবতীটি কার সঙ্গে অত গল্প করছে।

অন্য কেউ যদি বিরক্ত করতে না-ই আসে, তাহলে সুজাতাকে চুমু না খাওয়ারও কোনও মানে হয় না! আমি সুজাতাকে একবার পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে ওর মুখটা ফেরাতেই সুজাতা আমার ঠোঁটে একটা হাত চাপা দিয়ে বলল, এখনও সময় হয়নি।

আমি হকচকিয়ে গিয়ে বলেছিলুম, তার মানে?

সুজাতা পাতলাভাবে হেসে বলেছিল, তার মানে সময় হয়নি!

সুজাতার মতন মেয়েকে জোর করে চুমু খাওয়া যায় না।

শরীরের ব্যাপারে সুজাতার সেরকম কিছু শুচিবাই ছিল না। ও হঠাৎ-হঠাৎ আমার মুখে হাত বুলিয়ে আদর করত। আমি কখনও ওকে জড়িয়ে ধরলে ও আপত্তি জানাত না। আমরা কোলাঘাট কিংবা ব্যারাকপুর গেছি ট্রেনে গায়ে গা ঠেকিয়ে বসে। কিন্তু চুমু পর্যন্ত পৌঁছনো হয়নি।

সুজাতা আমার ঠোঁটে হাত চাপা দিয়ে বলেছিল, এখনও সময় আসেনি। তার মানে, সময় আসবে, তখন ও নিজেই জানাবে। সেইজন্যই কি ও আমার সঙ্গে পুরীতে যাওয়ার কথা তুলেছিল। দুজনে হোটেলের এক বিছানায়...।

আমি ছাড়াও সুজাতার আরও কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। অনন্য, গৌতম, অনির্বাণ। ওদের সঙ্গেও সাবলীলভাবে মিশত সুজাতা। প্রেসিডেন্সি কলেজের একজন বাংলার অধ্যাপক নাকি সুজাতার প্রেমে পাগল হয়ে উঠেছিল, সেই অধ্যাপকটিকে নিয়ে আবার হাসাহাসি করতুম আমরা সবাই। সেই ভদ্দরলোক সুজাতাকে নিয়ে চার-পাঁচটা কবিতাও লিখে ফেলেছিলেন। তার মধ্যে একটা কবিতা এখন আবৃত্তিকারদের মুখে-মুখে ফেরে।

সুজাতার অন্য বন্ধুদের সঙ্গে আমার তফাত ছিল এই যে, সুজাতার সঙ্গে দেখা করার জন্য আমাকে কখনও বিশেষ উদ্যোগ নিতে হয়নি। একদিন দেখা হলেই ঠিক হয়ে যেত, পরে আবার কখন কোথায় দেখা হবে। একবার হঠাৎ খুব কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসায় আমি সুজাতার সঙ্গে দেখা করতে পারিনি, রাত সাড়ে আটটায় সুজাতা আমার হস্টেলে চলে এসেছিল। একদল ছেলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ও জিগ্যেস করেছিল, অনীশ কোথায়?

অনীশের কী হয়েছে?

আমি ঠিক জানতুম, সুজাতা আসবে।

কিন্তু আমি আজও বুঝতে পারি না সেই বৃষ্টির দিনে সুজাতা কেন অমনভাবে চলে গেল। পরের বার কোথায় দেখা হবে তা কিছুই বলল না।

সুজাতার বাড়িতে গিয়ে এর পর আমারই কি খোঁজ নেওয়া উচিত ছিল যে সুজাতা কেন

রাগ করেছে? রাগের তো কোনও প্রশ্নই ওঠে না। দু-দিন পরেই সুজাতার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল অবশ্য। সুজাতার সঙ্গে আরও দুটি মেয়ে ছিল। তাদেরও আমি চিনি। সুজাতা আমাকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে নেয়নি। আগের দিনের ব্যবহারে কোনও কৈফিয়ৎ ও দেয়নি। স্বাভাবিক হাসিমুখে বলেছিল, অনীশ, তোমার দুটো বই আছে আমার কাছে। আর তোমার একটা কলমও আমি একদিন ভুল করে নিয়ে গিয়েছিলুম, দীপার হাত দিয়ে ফেরত দিয়ে দেব, তা হলেই তুমি পেয়ে যাবে তো?

সুজাতা আমার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে ছিল, যেন আমি অনীশ নয়, অনন্য, গৌতম, অনির্বাণ কিংবা অন্য যে-কেউ।

এরপর পোষা কুকুর ছাড়া আর কারুর কি ওই মেয়েকে অনুসরণ করা উচিত?

সুজাতার ওই অদ্ভুত ব্যবহারে আমার অভিমান কিংবা দুঃখ হয়নি, সর্বাঙ্গ জ্বলে গিয়েছিল অসম্ভব রাগে। যেসব রাগী ছেলেরা অহংকারী প্রেমিকার মুখে অ্যাসিড বাল্‌ব ছুড়ে মারে, তাদের মনস্তত্ত্ব যেন বুঝতে পারছিলুম অনেকটা। কিন্তু আমি তো অত নীচে নামতে পারি না! আমি শুধু মনে-মনে সুজাতাকে বলেছিলুম, বিদায়!

তবু আমার আশা ছিল, সুজাতা দু-চারদিনের মধ্যেই নিজের ভুল বুঝতে পারবে, ও নিজেই আমার কাছে আসবে কিংবা চিঠি লিখবে।

পরে একদিন দেখা হল, সুজাতা আর আমার সঙ্গে ভদ্রতা করেও কোনও কথা বলল না। যেন সব কথা শেষ হয়ে গেছে!

অনন্য, গৌতম, অনির্বাণদের চেয়েও সুজাতা যে আমাকে কেন বেশি পছন্দ করত, তার কারণটা বোঝাও শক্ত। ওদের সঙ্গেই সুজাতাদের পারিবারিক মিল বেশি। তবু সুজাতা বেছে নিয়েছিল আমাকে, সুজাতার সারল্য ও পবিত্রতার সংস্পর্শে আমি ধন্য হয়ে গিয়েছিলুম, আমি নিজেকে সুজাতার যোগ্য করে তুলতে চেষ্টা করছিলুম। সুজাতার তুলনায় অন্য সব চেনা মেয়েদেরই মনে হত তুচ্ছ।

যে-সুজাতা প্রায়ই নিজে থেকে আমার হাতটা নিয়ে খেলা করত, সেই সুজাতা অকারণে আমার হাত জোর করে ছাড়িয়ে চলে গেল হঠাৎ?

সেই বৃষ্টির দিনে সুজাতার মুখোমুখি টেবিলে বসে আমি চুপ করে ছিলুম মিনিটপাঁচেক। সেইটাই কি আমার দোষ হয়েছিল!

॥ পাঁচ ॥

দুর্গাপুরে চাকরি পাওয়ার দু-বছর বাদে আমি বিয়ে করি পারমিতাকে।

তারপর সাড়ে তিন বছরের মধ্যেই আমাদের একটি ছেলে ও মেয়ে জন্মাল। ব্যস, আর দরকার নেই। ছিমছাম, সুপরিকল্পিত পরিবার। পারমিতা একটা ছোট্ট অপারেশন করিয়ে নিল। সংসার চালাবার ব্যাপারে পারমিতার দক্ষতা অসাধারণ। তার সবচেয়ে বড় গুণ এই যে নিছক গৃহিণী সে নয়। ছেলেমেয়ে মানুষ করার নামে অনেক মেয়ে এমন ভাব দেখায় যেন বিরাট একটা স্বার্থত্যাগ করছে। তাদের জীবনে আর কোনও আনন্দ-উপভোগ থাকে না, শুধু সন্তানই ধ্যান-জ্ঞান।

পারমিতা কিন্তু ছেলেমেয়েদের যেটুকু-যত্ন করবার তা ঠিকই করে, তার পরেও সে প্রত্যেকটি গান-বাজনার আসরে যায়।

পারমিতার সঙ্গীতের নেশা। আধুনিক ফিলম বা সাহিত্যের সে মোটামুটি খবর রাখে।

পারমিতার গানের গলাটাও বেশ সুরেলা।

পারমিতার সঙ্গে আমার ভালোবাসার সম্পর্কে কোনও খাদ ছিল না। যদিও আমার প্রায়ই মনে হত, বিয়ে না করে পারমিতা গানের জগতে লেগে থাকলে নাম করতে পারত। বিয়ে করে বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে বাঙালি মেয়েরা আর ঠিক শিল্পী হতে পারে না। বড়-বড় কয়েকজন গায়কের

নাম উচ্চারিত হলেই পারমিতা এমন উচ্ছ্বাস দেখায়, যেন ওই গায়কেরা তার প্রেমিক। পারমিতা একদিন বলেও ফেলেছিল, ওস্তাদ মইজুদ্দিন খাঁ চাইলে ও সবকিছু দিয়ে দিতে পারে। আমি অবশ্য এই নিয়ে পারমিতার সঙ্গে মজা করি।

সুজাতাকে আমি মন থেকে একেবারে বিসর্জন দিয়েছি, একথা বললে মিথ্যে বলা হবে। মনে পড়ে মাঝে-মাঝে। হঠাৎ-হঠাৎ!

সুজাতার খবরও কিছু-কিছু কানে আসে।

কলেজ ছাড়ার পর সুজাতা বিলেতে চলে গেছে পড়াশুনো করতে। উচ্চাকাঙ্ক্ষা? এই জন্যই কি সুজাতা আমার সঙ্গে সব সম্পর্ক কাটাকাটি করেছিল? সে ভেবেছিল, আমি মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে, আমি কোনওদিন ওইসব দেশে যেতে পারব না?

ইকোনমিকসে আমার রেজাল্ট নেহাত খারাপ হয়নি। বিলেত আমেরিকায় একটা কিছু স্কলারশিপ জোগাড় করা আমার পক্ষে খুব একটা শক্ত হত না। আমার বন্ধুদের মধ্যে চার-পাঁচজন চলে গেছে, তার মধ্যে দুজনের রেজাল্ট আমার চেয়েও নীচে ছিল। কিন্তু সুজাতা গেছে শুনেই বিলেত-অ্যামেরিকার ওপর আমার ঘেন্না ধরে গিয়েছিল।

অফিস থেকে আমাকে এর মধ্যে দু-বার লন্ডন ঘুরিয়ে এনেছে। সুজাতা শেফিল্ডে থাকে জেনেও আমি তার কোনও খোঁজও করিনি।

॥ ছয় ॥

সল্টলেকের জমিটা আজ রেজিস্ট্রি হয়ে গেল। বাড়ির প্ল্যানও রেডি। সামনের মাসেই কাজ শুরু হয়ে যাবে। পারমিতার ইচ্ছে অন্তত ছ'খানা ঘরওয়ালা দোতলা বাড়ি করা, আমি আপাতত একতলার বেশি চাই না। বেশি বড় বাড়ি করা ভালো দেখায় না। পেছনে ভিজিলেন্স লেগে যেতে পারে।

ঠিকঠাক ট্যাক্স দিয়ে বাঁধা মাইনের চাকরিতে কোনও ভদ্দরলোকের পক্ষে বাড়ি বানানো অসম্ভব। অনেক লোক রিটায়ার করার পর প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটির সব টাকা দিয়ে একখানা বাড়ি বানায় এবং সেটা ভোগ করার আগেই দু-চার বছরের মধ্যে টুক করে মরে যায়। আমি ওসব বাজে ব্যাপারে নেই। যা কিছু ভোগ করার, তা যৌবন বয়েসেই চাই। একটা সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি কিনেছি আগেই। মাসে এখন প্রায় দশ-বারো হাজার টাকা উপরি রোজগার হয়। নেহাত এখনও চক্ষুলজ্জা আছে তাই, নইলে পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকা তো কিছুই না। আমার হাত দিতে প্রায় এক কোটি টাকার বিল পাশ হয়, এর মাত্র এক পার্সেন্ট তো যে-কোনও পার্টিই হেসে খেলে দিতে রাজি।

চাকরি পাওয়ার পর প্রথম চার বছর একটা আস্ত গাড়লের মতন একটা পয়সাও নিইনি কারুর কাছ থেকে। তখনও একটা ফাঁপা আদর্শবাদ মাথা জুড়ে ছিল যে! মনে আছে, প্রথম যে লোকটি আমাকে ঘুষ দেওয়ার সামান্য ইঙ্গিত করেছিল, তার ওপর এমন রেগে গিয়েছিলুম যে, টংটং করে বেল বাজিয়ে বেয়ারা ডেকে লোকটিকে বলেছিলুম আমার চেম্বার থেকে দূর করে দিতে। জেনারাল ম্যানেজারের কাছে গিয়ে নালিশ করেছিলুম, যেন ওই ফার্মকে ব্ল্যাক লিস্টেড করা হয়। জেনারাল ম্যানেজার আমার প্রশংসা করেছিলেন, সহকর্মীরা আমার প্রতি সমর্থন জানিয়েছিল, তবু কোনও এক অলৌকিক উপায়ে সেই ফার্মটি ঠিকই অর্ডার পেয়ে গেল!

সে বিষয়ে প্রশ্ন করতে গেলে সহকর্মীরা এ-ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে, কেউ-কেউ কাঁধ ঝাঁকায়। জেনারাল ম্যানেজার সেবারই আমাকে একটা ট্রেইনিং-এর জন্য বিলেত পাঠালেন।

আমারই সমান পোস্টের এক ডি পি ও, অর্থাৎ ডেপুটি পারচেজ অফিসার তার বাচ্চা মেয়ের জন্মদিনে সাড়ে চারশো লোককে নেমন্তন্ন করে খাওয়াল। একটা ঘরে উপহারের পাহাড় জমে

গিয়েছিল। সেদিন বাড়ি ফেরার পথে পারমিতা জিগ্যেস করেছিল, ওই উৎপল ব্যানার্জি আর তোমার টেবিল সমান মাপের?

আমাদের দুই ছেলে মেয়ের জন্মদিনে কাছাকাছি কোয়ার্টারের দু-চারটি বাচ্চা ছাড়া আর কারুকেই নেমন্তন্ন করা হয় না। সাড়ে চারশো লোক খাওয়ান মানে চোদ্দ-পনেরো হাজার টাকার ধাক্কা। অবশ্য উৎপল ব্যানার্জির মেয়ে সোনা-রূপোর গয়না উপহার পেয়েছে অনেক।

উৎপল ব্যানার্জির স্ত্রী ছবির গলা দিয়ে একবার রক্ত পড়তেই তাকে নিয়ে যাওয়া হল কলকাতায় এক নাম-করা নার্সিংহোমে।

আমাদের দুর্গাপুরে ভালো হাসপাতাল আছে! কিন্তু উৎপল কোনও চান্সই নেয়নি। ছবির অবশ্য সাধারণ ব্রঙ্কাইটিস হয়েছিল, সেই নার্সিংহোমে পনেরো দিন থেকে, সবরকম চেক-আপ করিয়ে সে সুস্থ হয়ে ফিরে এসেছে। ওদের বাড়িতে কিছুদিন পরেই আবার একটা বড় পার্টি হল।

পারমিতার সহজে কোনও অসুখ-বিসুখ হয় না। ভালো স্বাস্থ্য। কিন্তু একবার কলকাতায় ডোভার লেন মিউজিক কনফারেন্স শুনে ফিরে আসার ঠিক পরদিনই সে অবিকল উৎপলের স্ত্রী ছবির মতন রক্ত বমি করল।

দুর্গাপুরে বড্ড কনকনে শীত পড়ে। গোটা শীতকালটা সাবধানে না থাকলে অনেকেরই ব্রঙ্কাইটিস হয়ে যায়। ব্রঙ্কাইটিসের চিকিৎসার জন্য নার্সিংহোমে যাওয়া তো দূরের কথা, হাসপাতালেও যাওয়ার দরকার হয় না, ডাক্তার বাড়িতে এসে ইঞ্জেকশান দিয়ে যেতে পারে। কিন্তু উৎপলের স্ত্রী ছবি যদি যেতে পারে, তা হলে, আমার স্ত্রী পারমিতা কেন কলকাতায় চিকিৎসা করতে যাবে না? অযাচিতভাবে পারমিতাকে দেখতে এসে কয়েকজন জিগ্যেস করলে, কোন নার্সিংহোমে ভরতি হচ্ছ? একবার থরো চেকআপ করিয়ে নেওয়া ভালো।

টাটা-বিড়লারা এখন নার্সিংহোমের ব্যবসাও করে। সেখানে কোনও সরকারি অফিসারের স্ত্রীর কি চিকিৎসা করানোর সাধ্য থাকতে পারে? তবু অনেকেই যায়।

সেবারই আমি এখানে স্ত্রীর নামে একটা এজেন্সি খুললাম। এটাই আইনসম্মত প্রথা। আমাদের পাঁচ লাখ টাকার স্পেয়ার পার্টস কিনতে হবে, যে-কোম্পানি সেগুলো সাপ্লাই করার জন্য মনোনীত হল, আমার স্ত্রী তার একজন স্লিপিং পার্টনার। দুর্গাপুর ক্লাবে মিঃ বাজোরিয়া আমাকে সাড়ে সাত হাজার টাকার নোটসমেত একটা খাম দিল গোপনে। পারমিতার চিকিৎসার খরচ।

খামটা হাতে নেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে মনে হল একটু দূরে দরজার কাছে একজন মহিলা এসে দাঁড়িয়েছে। চাঁপাফুল রঙের শাড়ি পরা আধখোলা খোঁপা, সরল, গভীর দুটি চোখ। সুজাতা!

আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সুজাতা নীরবে বলল, ছিঃ অনীশ, তোমার কাছ থেকে এ রকম আশা করিনি!

বলাই বাহুল্য, সেই মহিলা সুজাতা নয়। অন্য একজন, অনেকটা সুজাতার মতনই শরীরের গড়ন, তবে সুজাতার মতো এর সৌন্দর্যের জ্যোতি নেই।

আমিও মনে-মনে বললুম, সুজাতা, তুমি কেন আমায় ছেড়ে চলে গেলে? যদি তুমি অকারণে আমায় আঘাত না দিতে, তা হলে আমিও এরকম বদলে যেতুম না!

॥ সাত ॥

পারমিতার বাপের বাড়ি টালিগঞ্জ। বাচ্চারা সমেত পারমিতাকে সেখানে নামিয়ে দিয়ে ট্যাক্সি করে আমি ফিরছি, আমাকে হাওড়ায় গিয়ে ট্রেন ধরতে হবে, হঠাৎ কী খেয়াল হল ট্যাক্সিটা ঘোরাতে বললুম এলগিন রোডে। কিছুদূরে গিয়ে তাকে দাম মিটিয়ে ছেড়ে দিলুম। সুজাতাদের বাড়িটা আরও জরাজীর্ণ হয়েছে, কিন্তু এখনও বিক্রি হয়নি, আশে পাশে অনেক নতুন ঝকঝকে বাড়ি উঠেছে, তবু

সেই বাড়িটা পুরোনো আভিজাত্যের গর্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ির সামনে সুজাতার দাদা এক পাঞ্জাবি ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছেন। অবিকল সেই আগেকার মতন ভুরু তোলা ভঙ্গি।

রাস্তার উলটোদিকে দাঁড়িয়ে আমি বাড়িটার দিকে চেয়ে রইলুম। সুজাতা এখানে নেই, সে বিলেতেই রয়ে গেছে।

তাহলে এই বাড়িটা হঠাৎ দেখতে আসার কী মানে হয়? ওই বাড়িটার সঙ্গে মিশে আছে আমার প্রথম যৌবনের তীব্র ব্যর্থতা!

এই বাড়ির তিনতলার সেই ঘরটায় এখন কি অন্য কেউ থাকে?

এ-ঘরে সুজাতাকে আমি প্রথম চুম্বন করতে গিয়েছিলাম, সুজাতা আমার ঠোঁটে হাত চাপা দিয়ে বলেছিল, এখনও সময় হয়নি! সারাজীবনেও আর সে সময় আসবে না!

॥ আট ॥

ওস্তাদ মজিদ খাঁ একটা অনুষ্ঠান করতে এসেছিলেন দুর্গাপুরে। তাঁর এখন দারুণ নাম। এক সন্ধেবেলা গান গাইবার জন্য কুড়ি হাজার টাকা নেন—গায়কদের এত রোজগার! আমি ক্লাসিক্যাল গান-বাজনা তেমন বুঝি না। তবু স্বীকার করতেই হবে সে মানুষটির কণ্ঠস্বরে জাদু আছে।

ওস্তাদজির বয়েস বছরপঞ্চাশেক হবে, সুন্দর স্বাস্থ্য, চোখ দুটি মায়াময়। তিনটি দিন তিনি আমাদের বাড়িতে থেকে গেলেন, তা নিয়ে পারমিতার কী গর্ব। আমাদের সোশ্যাল স্টেটাস অনেক উঁচুতে উঠে গেল। অন্যদের আরও অনেক বেশি টাকা থাকতে পারে, কিন্তু অত বড় একজন ভারত বিখ্যাত গায়ক তো আমাদের বাড়িতেই উঠেছেন।

সেই তিনটি দিন পারমিতা কী মাতামাতিই না করল! বেচারি গান বাজনা এত ভালোবাসে, সে তার স্বপ্নের গায়ককে এত কাছাকাছি পেয়েছে সব রকম যত্নআত্তি, একসঙ্গে গলা সাধা, ওস্তাদজির রেওয়াজের টেপ করা, এইসব নিয়ে মেতে রইল পারমিতা। ছেলেমেয়েদের দিকে নজর দেওয়ারও সময় নেই।

আমাকে অবশ্য তিনদিনই অফিস করতে হয়েছে, তা ছাড়া গুরু-শিষ্যার অন্তরঙ্গতার মধ্যে আমি মাথা গলাতে চাইনি। পারমিতার আনন্দ উদ্ভাসিত মুখখানা দেখে আমার খুব ভালো লাগছিল। পারমিতাকে বোধহয় আমিও কখনও এতটা আনন্দ দিতে পারিনি। গুরুর কাছে আত্মনিবেদন করতে গিয়ে পারমিতা কি তার সবকিছু দিয়েছিল? অসম্ভব নয় মোটেই। ওস্তাদজির সেই মায়াময় চোখে মাঝে-মাঝে নারী-লোলুপতার ঝিলিক আমি লক্ষ করেছি। ওস্তাদজির তিনটি স্ত্রী এবং সারা ভারতে তাঁর অনেক প্রেমিকা, কাগজেই এসব খবর বেরিয়েছিল একসময়। গুণী শিল্পীদের জীবন তো এ রকমই হয়!

ওস্তাদজি যদি কখনও পারমিতার কাছ থেকে সবকিছু দাবি করে থাকেন, তাতে পারমিতা আপত্তিও জানাতে পারবে না, সে এমনই ঘোরের মধ্যে ছিল। ওস্তাদজির বিদায় নেওয়ার সময় পারমিতার চোখ ছলছল করছিল, ওস্তাদজি তাকে জড়িয়ে ধরে আদর করেছিলেন।

এতে দোষেরই বা কী আছে! পারমিতার আর বাচ্চাকাচ্চা হবে না, সে যদি একবার তার স্বপ্নের পুরুষের সঙ্গে শোয়, তাতে তার শরীরটা তো আর ক্ষয়ে যাচ্ছে না! এটাকে ঠিক ভালোবাসাও বলে না। এক ধরনের মোহ, এর জন্য পারমিতার সঙ্গে আমার সম্পর্কের চিড় খাওয়ার কোনও কারণ নেই!

আমি নিজের চোখে ওদের সেই ধরনের ঘনিষ্ঠতা দেখিনি, আমি সন্দেহপ্রবণ মানুষও নই। তবু ঠাট্টার ছলেও ওই কথাটা পারমিতাকে জিগ্যেস করতে পারি না।

সপ্তাহখানেক বাদে এক রাত্রে পারমিতা নিজে থেকেই আমাকে আদর করতে এল, আমার

বুকে মাথা রাখল।

সেই রাতে আমি বেশ খানিকটা হুইস্কি পান করেছিলুম, ওস্তাদজির জন্য আমার দুটো বোতল স্কচ খরচ হয়ে গিয়েছিল, বাড়িতে আর স্টক ছিল না, সুতরাং বাধ্য হয়ে খেতে হয়েছিল ইন্ডিয়ান। শরীর বেশ উত্তপ্ত। পারমিতাকে জড়িয়ে ধরতেই অন্ধকারের মধ্যে ফট করে ভেসে উঠল সুজাতার মুখ।

পারমিতাকে চুম্বন করে তেমন স্বাদ পেলুম না। মনে হল, জীবনে একটা পরম চুম্বন পাওয়াই বাকি রয়ে গেছে।

সুজাতা লন্ডন থেকে ফিরে এসেছে বছরতিনেক আগে। চাকরি করছে বম্বেতে। বিয়ে করেনি। এসব খবর অনন্যর মুখে শুনতে পাই।

অফিসের কাজে আমাকেও বছরে অন্তত পাঁচ-ছ'বার বম্বে যেতে হয়। সুজাতার খোঁজ করার কথা মনেও আসেনি।

কিন্তু এটা আমার কী হল? পরপর তিন-চারবারই পারমিতার শরীরটা আমার কাছে নিরামিষ মনে হচ্ছে! স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে প্রথম দিককার সেই উন্মাদনা খানিকটা মিইয়ে যায় ঠিকই। কিন্তু পারমিতার সঙ্গে শুয়ে বারবার সুজাতার কথা মনে আসছে কেন? সুজাতার শরীর আমি কখনও পরিপূর্ণভাবে দেখিনি, কিন্তু আজকাল প্রায়ই আমি তাকে মনে-মনে নগ্ন করি!

॥ নয় ॥

একটা এক্সপেরিমেন্ট করা দরকার।

এলাহাবাদে তিনদিনের একটা কনফারেন্স ছিল। টুক করে করে সেখান থেকে একদিন পালিয়ে চলে এলুম কাশীতে।

ছাত্রজীবনে কাশীতে এসে একবার এক মধ্যবয়স্ক দাদার পাল্লায় পড়ে একটা বাঈজির বাড়িতে যেতে হয়েছিল। বেশ ভয়-ভয় করেছিল সেবার, মনের মধ্যে খানিকটা পাপবোধও ছিল। একটি মেয়েকে ভালোবেসে অন্য কোনও নারীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করাটা অন্যায় মনে হত। এখন ওসব বিবেকের দায় চুকে গেছে। পকেটে পয়সার জোর থাকলে এইসব পাড়ায় আসতে ভয়ও করে না।

ডালপট্টিতে একজন দালালকে ধরে এলুম সুর্মা বাঈজির ঘরে। ছদ্ম নামটা এই মেয়েটিকে বেশ মানিয়েছে। হয়তো বছর পঁয়তিরিশেকের মতন বয়েস, দেখায় পঁচিশ বছরের মতন, চোখ দুটি বেশ দীঘল কালো। মাথায় অনেক চুল, ঠোঁটে লাস্য আছে।

প্রথমেই পাঁচশো টাকা দিয়ে বললুম ড্রিংকস আনতে। বুঝিয়ে দেওয়া হল যে টাকাপয়সার ব্যাপারে আমি কোনও কার্পণ্য করব না, তার বদলে আমি যা-চাই, তাই-ই আমাকে দিতে হবে। সুজাতা নাচ জানত না, তেমন কিছু গানের গলাও ছিল না। এই বাঈজির সঙ্গে সুজাতার চেহারারও কোনও মিল নেই।

তবু সুজাতার মুখখানা যেন বাতাসে ভাসছে। তার চোখে তীব্র ভর্ৎসনা। আমাকে এই ভূমিকায় সে একটুও পছন্দ করছে না। সে আমাকে পছন্দ-অপছন্দ করার কে? আমি সিগারেটের ধোঁয়ায় সেই মুখখানা উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি।

আজকাল প্রায়ই এমন হয়। চুপচাপ একলা বসে থাকলেই সুজাতা আমার কাছে চলে আসে। সঙ্গে-সঙ্গে আমার শরীরে একটা রোমাঞ্চ হয়। আমার ঠোঁটের থেকে যেন হাত সরিয়ে নিয়েছে সুজাতা, আমি তার ছায়ামূর্তিকে চুম্বন করেছি, সেরকম চুম্বনের স্বাদ পৃথিবীর আর কোনও নারীর কাছ থেকে পাওয়া যাবে না!

সুর্মা বাঈ পরপর দুটো গান শেষ করল। আমার মন লাগছে না। ঝোঁকের মাথায় নেশা

করে ফেললুম অনেকটা। নেশা না করলে কি এক ঘণ্টার পরিচয়ে কোনও নারীকে স্পর্শ করা যায়?

তাতেও কিছু লাভ হল না।

সুর্মা বাঈকে জড়িয়ে ধরে আমি সর্বক্ষণ আসলে সুজাতাকেই আদর করতে লাগলুম।

॥ দশ ॥

সল্টলেকের বাড়ির আজ ছাদ ঢালাই হচ্ছে। আমি একটা রঙিন ছাতা মাথায় দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি কৃষ্ণচূড়া গাছটার তলায়। হঠাৎ একসময় আমার মনে হল, আমি কেন এখানে দাঁড়িয়ে আছি? কী হবে এই বাড়ি তৈরি করে? আমার বুকটা অসম্ভব কষ্টে মুচড়ে-মুচড়ে উঠছে। আমি সুজাতাকে পাইনি, এই জীবনে যেন আর কোনও কিছু পাওয়ারই মূল্য নেই!

প্রথম তিন-চার বছর এমন হয়নি, সুজাতাকে অনেকটা দূরে সরিয়ে রাখতে পেরেছিলুম। কিন্তু এখন প্রায় প্রতিদিনই সুজাতা আমার কাছে ফিরে আসে। সে আমাকে চরমভাবে হারিয়ে দিয়ে যেন আনন্দ পায়।

পাশেই আর-একটা বেশ বাড়ি তৈরি হচ্ছে। ইচ্ছে করলে আমিও ওইরকম বাড়ি তৈরি করতে পারতুম। সুজাতাদের এলগিন রোডের বাড়িটাও কিনে নেওয়া আমার পক্ষে অসাধ্য নয়। টাকা আমি কম রোজগার করিনি। এবং তার অনেকখানিই আইনমাফিক টাকা। পারমিতার নামে সত্যি-সত্যি আলাদা একটা ব্যাবসা চালিয়ে ভালো প্রফিট হচ্ছে। অফিসেও আমার সুনাম আছে। অনেকে বলে অনীশ রায় কাজ পাগল মানুষ। হ্যাঁ, অফিসের কাজে, আমার কোনও খুঁত নেই। সর্বক্ষণ আমি কাজে ডুবে থাকতে চাই! আমার ছেলেমেয়ে দুটি ভালো স্কুলে পড়ছে, ব্যবহারও চমৎকার। পারমিতার সঙ্গে আমার সম্পর্কে কোনও ফাটল ধরেনি। ওস্তাদ মজিদ খাঁ আর দুর্গাপুরে আসেননি, পারমিতার কাছে সেই তিনটি দিন শুধু এখন মধুর স্মৃতি। আর কোনও একটা কনফারেন্সে ওস্তাদজি পারমিতাকে দেখে স্টেজ থেকে হাত নেড়েছিলেন, ব্যস ওই পর্যন্ত। অত্যন্ত ভিড়ের চাপে পরে পারমিতা আর তাঁর কাছে যেতে পারেনি, বিশেষ চেষ্টাও করেনি। দুর্গাপুরের দু-একটা ফাংশনে অন্যান্য অফিসারদের স্ত্রীর সঙ্গে পারমিতাও গান করে। সে বেশ আনন্দেই আছে।

পারমিতাকে আমি ভালোবাসি। পারমিতা আমাকে সুন্দর সাহচর্য দেয়। তার শরীরেও বেশ উত্তাপ আছে।

আমি সুজাতার খোঁজ করি না। এর মধ্যে একবারও তার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করিনি। সে বম্বেতে থাকে, তার ঠিকানা জোগাড় করা কিছুই শক্ত নয়। কিন্তু একবার আমি তাকে বিদায় জানিয়েছি। কেন আবার তার পায়ে লুটোতে যাব!

আমি সুজাতাকে বিদায় জানিয়েছি, তবু সে কেন ফিরে-ফিরে আসে? বিশেষ-বিশেষ মুহূর্তে? মৃত্যুশোক থেকে একটা প্রেতিনীর মতন?

আমাদের সমস্যাহীন সংসার। টাকাপয়সার অভাব নেই। সব দিক থেকেই তো আমরা সুখী! তবু ওই হারামজাদিটা আমার বুক ভেঙে দিয়েছে! কোনও কিছুতেই আমার তৃপ্তি নেই!

শুধু সে সুর্মা বাঈ নয়, তার পরেও আরও দুটি মহিলার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল।

আজকাল প্রত্যেক পার্টিতেই একজন-দুজন তরুণী থাকে, তারা কীরকম যেন ছলছলে চোখে তাকায়। একটু প্রশ্রয় দিলেই তাদের সঙ্গে আলাদা দেখা করা যায়। আগে আমার এসব জানা ছিল না।

কিন্তু সেই দুই তরুণীও সুজাতার বিকল্প হতে পারেনি। প্রত্যেকবার আমি হেরে গেছি। সুজাতা এসে পাশে দাঁড়িয়েছে।

বাথরুমে স্নান করার সময় এক-একদিন আমি অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি। নিজেরই বাহুতে একটা চুম্বন দিয়ে ভাবি যেন সুজাতাকেই আদর করছি। সঙ্গে-সঙ্গে আমার শরীর উষ্ণ হয়ে যায়। শুধু কল্পনাতেই আমি সুজাতাকে জড়িয়ে ধরে যত রোমাঞ্চ বোধ করি, কোনও বাস্তব নারী আমাকে তা দিতে পারে না!

হারামজাদি! সে শুধু আমাকে তার ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত করেনি, আমার জীবনের সব রকম সার্থকতা, আমার বাকি জীবনের নারীসঙ্গসুখও সে কেড়ে নিয়েছে!

সুজাতা আমার সঙ্গে পুরী যেতে চেয়েছিল। আমাকে সেদিন টাকার চিন্তায় চুপ করে থাকতে হয়েছিল কিছুক্ষণ। তারপর জীবনে কত টাকা রোজগার করেছি। কী লাভ হল? এক-একসময় সব ছুড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে হয়।

॥ এগারো ॥

কলকাতায় এলে অনন্যর সঙ্গে দেখা হয় মাঝে-মাঝে। অনন্য প্রায়ই বম্বে যায়, সুজাতার সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে। অনন্য এমন ভাব দেখায় যেন সুজাতার সঙ্গে তার প্রেম। আন্ধেরি ওয়েস্টে সুজাতার ফ্ল্যাট, সেখানে সে একলা থাকে, একবার হোটেলে জায়গা না পেয়ে অনন্য সুজাতার কাছে ছিল এক রাত।

সেই বৃষ্টির দিনে সুজাতা আমার হাত ছাড়িয়ে চলে যাওয়ার পর জল-জমা কলেজ স্ট্রিটে একটা সাদা রঙের গাড়ি সুজাতাকে তুলে নিয়েছিল। গাড়ির রংটাও আমি ভুলিনি।

সেটা ছিল অনন্যর বাবার গাড়ি, অনন্যও মাঝে-মাঝে চালাত। তবু অনন্যর সঙ্গে সুজাতা কথা বলত উপহাসের ভঙ্গিতে। অনন্যর চেহারাটাও বেশ সুন্দরই বলা যায়। রং ফরসা, সিনেমায় নামলে ন্যাকা প্রেমিকের রোলে মানিয়ে যেত।

অনন্যদের সেই গাড়িটা বিক্রি হয়ে গেছে। অনন্য বিলেত যায়নি! আমার সঙ্গে বিচ্ছেদের পর সুজাতা অনন্যর সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠতা করেনি, সেটুকু আমি জানি। এখন নতুন করে বন্ধুত্ব হয়েছে ওদের?

অনন্যর কথা ঠিক বিশ্বাস হতে চায় না। জীবনে সেরকম কিছু করতে পারেনি অনন্য। আমাকে হিংসে করে, তা বুঝতে পারি। সুজাতার কথা তুলে আমাকে খোঁচা মারতে চায়।

কলকাতায় একটা বেশ বড় টেন্ডারের স্পেশিমেন ইন্সপেকশানের জন্য দু-তিন দিন থাকতে হল। শ্বশুরবাড়িতে না উঠে গভর্নমেন্টের টাকায় গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে রইলাম। সেখানে অর্জুন চৌধুরী নামে একজন লোক কার্ড পাঠিয়ে দু-তিনবার দেখা করতে চেয়েছে, আমি পাত্তা দিইনি। পার্টির কোনও লোকের সঙ্গে এই সময় দেখা করা নিয়ম নয়।

দুর্গাপুরে ফেরার পর সেই অর্জুন চৌধুরী একদিন অফিসে এসে হাজির হল। বেশ দীর্ঘকায়, সুপুরুষ, মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। নাম দেখে বুঝতে পারিনি, দেখেই চিনেছি। সুজাতার ছোড়দা, এঁকে আমরা বলতুম মন্তাদা, বেশ ভালো ক্রিকেট খেলতেন। সেই ভুরু তুলে কথা বলার ভঙ্গি। একটা চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করে আমি বললুম, বসুন মিঃ চৌধুরী, হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ?

মুখে একটা জ্বলন্ত পাইপ। আর কোনও কোম্পানির লোক আমার ঘরে পাইপ মুখে দিয়ে কথা বলার সাহস পায় না। অন্যদের মুখে একটা তেলেতেলে হাসি লেগে থাকে, মন্তাদা এমনভাবে আমার দিকে তাকালেন যেন তিনি আমাকেই দয়া করতে এসেছেন।

আমার কাছে উনি কিছু সুযোগ সুবিধে চাইতে এসেছেন ঠিকই, কিন্তু প্রথমেই সেকথা তুললেন না। পুরোনো বনেদিয়ানা, ভাঙবে তবু মচকাবে না। মিনিটদশেক ধরে আমার সঙ্গে কাজের কথা বলে গেলেন।

আমার পুরোপুরি সরকারি ব্যবহার দেখে মন্তাদা এক সময় বললেন, এক্সকিউজ মি, একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করছি, আপনি অনীশ রায়, মানে, তুমি কি সুজাতার বন্ধু সেই অনীশ?

হ্যাঁ কিংবা না কিছুই না বলে আমি শুধু একটু হাসলুম।

মন্তাদা বললেন, তোমাকে আমাদের বাড়িতে কয়েকবার দেখেছি। একবার আমাকে ক্যারাম খেলে হারিয়ে দিয়েছিলে। মনে আছে। আমি সুজাতার ছোড়দা।

অর্থাৎ মন্তাদার ভাবখানা এমন, আমি সুজাতার ছোড়দা, এবার তুমি বুঝে নাও আমাকে কতখানি সাহায্য করবে! সব দায়িত্ব তোমার।

আমি তবুও কোনও মন্তব্য করলুম না।

মন্তাদা আবার বললেন, সুজাতা এখন বম্বেতে আছে জানো তো? শিগগিরই একবার কলকাতায় আসবে। ও তো আবার বিয়ে করল!

আমার ভুরু দুটো সামান্য কুঁচকে গেল। আবার মানে? অনন্য বলেছিল সুজাতা বিয়েই করেনি। অনন্যটা এক নম্বরের মিথ্যেবাদী!

মন্তাদা চলে যাওয়ার পরই আমি উৎপল ব্যানার্জিকে ডেকে পাঠালুম। মাঝখানে উৎপলের নামে একটি পার্টি মামলা করেছিল বলে ওর প্রোমোশন আটকে গেছে। এখন উৎপল আমার সাবর্ডিনেট, সুতরাং আমাকে দু-চক্ষে দেখতে পারে না। অথচ হাসিমুখে কথা বলে।

যে-ফাইলটায় মন্তাদার স্বার্থ আছে, সেটা উৎপল ব্যানার্জির দিকে এগিয়ে দিয়ে বললুম, এই কেসটা পুরোপুরি আপনিই ডিল করবেন। আপনার সিদ্ধান্তই ফাইনাল। আমার মতামত নেওয়ারও কোনও দরকার নেই।

ফাইলটা নিয়ে উৎপল ব্যানার্জি দরজার কাছে যেতেই আমি আবার মত বদলে ফেলে বললুম, আচ্ছা দাঁড়ান, ফাইলটা বরং ছ'মাস পেন্ডিং রাখুন। ওই আইটেমটা তেমন জরুরি নয়। পার্টিরা খোঁজ নিতে এলে বলবেন, আমরা একসঙ্গে আরও বেশি মালের অর্ডার দেব, অন্তত লাখ পঞ্চাশেক হবেই, তবে এখন না, ছ'মাস বাদে। টেন্ডারের ওপেনিং-এর তারিখ পিছিয়ে দিন।

মন্তাদাকে হতাশ কিংবা খুশি কোনওটাই করতে চাই না। তার চেয়ে ঝুলিয়ে রাখা অনেক ভালো। দেখা যাক, তাতে তার ভুরু নীচু হয় কি না!

আমার অনুমান মিথ্যে নয়। এক মাস বাদেই মন্তাদা আমার বাড়িতে একটা মস্ত বড় কেক আর দু-বোতল স্কচ পাঠিয়ে দিল। আমি কোন ব্র্যান্ডটা পছন্দ করি, তা পর্যন্ত গোপনে খবর নিয়েছে! এই তো নামতে আরম্ভ করেছে একটু-একটু করে। সুজাতার সঙ্গে যত দিন আমার ভাব ছিল, সেই সময় আমি এক ফোঁটাও মদ্যপান করতুম না। পারমিতা ছেলেমেয়েদের নিয়ে একটা জন্মদিনের নেমন্তন্ন খেতে গেছে। এখানে জন্মদিন লেগেই থাকে। বাড়ি ফাঁকা। অনেকক্ষণ ধরে সুজাতা আমার ঘরে এসে বসে আছে। আমি তার শরীরের পারফিউমের গন্ধও পাচ্ছি।

সুজাতার মুখে, বুকে চুমু খেতে কোনও বাধা নেই। সমস্ত শরীরে আমার শিহরন হচ্ছে। ঠিক যেন আমার সেই বাইশ বছর বয়েসে ফিরে গেছি!

॥ বারো ॥

সুজাতার সঙ্গে শেষপর্যন্ত সত্যিই দেখা হল। ঠিক বারো বছর পর।

কলকাতা শহরে ঘোরাঘুরি করলে চেনাশুনো কারুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়াটা আশ্চর্য কিছু না।

অফিসের কাজেই তিনটে মিটিং সেরে বিকেলের দিকে বেশ ক্লান্ত হয়ে এক পরিচিত ব্যক্তির

সঙ্গে গিয়ে বসলুম পার্ক স্ট্রিটের এক রেস্তোরাঁয়। খানিকক্ষণ সময় কাটাবার জন্য। কিন্তু হঠাৎ বৃষ্টি নেমে গেল। রীতিমতন আকাশ ভাঙা বৃষ্টি। রাস্তায় এখনও জল জমেনি অবশ্য, কিন্তু এত বৃষ্টিতে বেরুনো যায় না। দ্বিতীয়বার বিয়ার নিতে হল।

সেই সময় ঢুকল সুজাতা। সঙ্গে আরও দুজন পুরুষ। কিছু একটা কথা বলতে-বলতে ওরা ভেতরের দিকে চলে যাচ্ছিল। আমি ঠিক দরজার সামনের টেবিলেই বসেছি বলে সুজাতার সঙ্গী একজন পুরুষের সঙ্গে আমার চোখাচোখি হয়ে গেল। নাম মনে নেই, তবে লোকটিকে আমি দু-বার দেখেছি কোথাও। সামান্য মুখ চেনা। কিছু একটা ব্যাবসার সঙ্গে জড়িত।

সেই লোকটা হঠাৎ প্রবল উৎসাহের সঙ্গে বলল, এই যে অনীশবাবু, আপনি কলকাতায়? কবে দুর্গাপুর ফিরছেন? আমি আগামী সপ্তাহে একবার যাব ভাবছিলাম আপনার সঙ্গে দেখা করতে।

আমি বললুম, হ্যাঁ, আসবেন। তার মধ্যে ফিরে যাব।

সুজাতাকেও দাঁড়াতে হয়েছে। সে আমাকে এড়াবার কোনও চেষ্টা না করে মুখে অনেকখানি হাসি ফুটিয়ে বলল, অনীশ! কত দিন পরে দেখা। কেমন আছ?

আমিও হেসে বললুম, ভালো! তোমার খবর কী, সুজাতা?

সুজাতা বলল, আমার খবর ভালোই। ছোড়দার মুখে শুনছিলুম, তুমি দুর্গাপুরেই থাকো।

এরপর আরও দু-চারটি সামান্য টুকিটাকি কথাবার্তা। তারপর সুজাতা ও তার সঙ্গীরা চলে গেল একটা ভেতরের টেবিলে।

মানুষ কত মিথ্যে কথাই বলে! সুজাতার জন্য আমি সর্বক্ষণ জ্বলছি, আজ সকালেও অনেকক্ষণ চিন্তা করেছি তার কথা, অথচ তাকে স্বচক্ষে দেখবার পর মামুলিভাবে বললুম, ভালো! এক বৃষ্টির দিনে সুজাতা আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল, আর-এক বৃষ্টির দিনে তার সঙ্গে আবার দেখা। আমি আর অপেক্ষা না করে সেই বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে পড়লুম।

সুজাতা অন্য এক টেবিলে অন্য লোকদের সঙ্গে বসে আছে, এটা আমার সহ্য হচ্ছে না। আমি সামান্য ইচ্ছে প্রকাশ করলেই সেই টেবিলের লোকেরা আমাকে খাতির করে ডেকে নিয়ে যেত। কিন্তু সুজাতার সঙ্গে কথা বলার কোনও আগ্রহও তো আমার নেই। আমি যখন একা থাকি, তখনই সুজাতাকে খুব নিবিড় করে পাই। অন্য সময় আমি পারমিতার স্বামী। আমি একজন ব্যস্ত মানুষ, অনেকের চোখে আমার বেশ গুরুত্ব আছে!

সুজাতা কলকাতায় এল কেন? এক শহরে আমার আর সুজাতার একসঙ্গে থাকা সম্ভব নয়। আজই দুর্গাপুরে ফিরে যেতে হবে।

সুজাতা আমার কেউ না!

॥ তেরো ॥

অনন্যর সঙ্গে দেখা হতেই সে প্রায় বিনা ভূমিকায় দশ হাজার টাকা ধার চাইল।

আমি চোখের একটাও পাতা না কাঁপিয়ে ব্রিফ কেস খুলে ক্যাশ পাঁচ হাজার টাকার নোট তুলে দিলুম ওর হাতে। কেন সে চাইছে, সে সম্পর্কে আমার কোনও আগ্রহ নেই। দশ হাজারই দিতে পারতুম, সঙ্গেই ছিল, কিন্তু ওইটুকু অপমান না করলে চলে না। জানি অনন্য ও-টাকা কোনওদিন ফেরত দেবে না, আমিও আশা করি না। তা ছাড়া, যারা ধার চায়, তারা একটু বাড়িয়েই চায়। আমাদের কলেজ জীবনে অনন্য ওর বাবার গাড়ি হাঁকিয়ে বেড়াত। টাকা ওড়াত দু-হাতে। সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে বলে আমার প্রতি ওর একটা অবজ্ঞার ভাব ছিল। অনন্যকে টাকা ধার দিয়ে আমার মেজাজটা বেশ প্রসন্নই হল। অনন্যর কাঁধ চাপড়ে বললুম, চল, গ্র্যান্ড হোটেলে আজ ডিনার খাই। অনেক দিন আড্ডা মারা হয়নি।

যারা একসময় আমাকে গরিব বলে জানত, তাদের সামনে বড়লোকি দেখাতে না পারলে আর টাকা রোজগার করে লাভ কী?

অনন্য যে সুজাতার ব্যাপারে আমাকে মিথ্যে কথা বলেছিল, সেজন্য আমি কিছু মনে করিনি। ও তো কোনও-না-কোনও দিক থেকে জিতবার চেষ্টা করবেই।

খানিকটা মদ পেটে পড়তেই অনন্যর মুখ থেকে আসল গল্পটা বেরিয়ে এল। লন্ডনে সুজাতা একজন ইংরেজকে বিয়ে করেছিল। এক বছরের মধ্যে সেপারেশান হয়ে যায়। তারপর বম্বেতে সুজাতাকে বিয়ে করবার জন্য তিনজন লোক খুব খেপে উঠেছিল। তাদের মধ্যে একজন খুবই বিদগ্ধ মারাঠি। শেষপর্যন্ত অবশ্য সুজাতা একজন বাঙালিকেই বিয়ে করেছে দু-বছর আগে, কিন্তু সেই বিয়েটাও খুব সার্থক হয়নি। অনন্যর ধারণা, ও যদি আগেই একটা বাজে বিয়ে না করে ফেলত, তাহলে নির্ঘাত সুজাতা ওরই ঘরণী হত।

বিবাহিত জীবনে সুখ পায়নি সুজাতা, তা জেনে আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। সুজাতার মতন মেয়ের একটা সুন্দর জীবন প্রাপ্য ছিল। আমার সঙ্গে যদি দৈবাৎ বিয়ে হত সুজাতার, তা হলেও কি সে সুখী হত? সুজাতা আমার স্ত্রী হলে ঘুষ নিতাম না, বড়লোক হতুম না, আমি একজন আদর্শবাদী, মধ্যবিত্ত, কিছুটা তিক্ত মানুষ হয়ে জীবনটা কাটিয়ে দিতুম। সে জীবন কি সুজাতারও কাম্য হত?

সুজাতার দ্বিতীয় স্বামী ওর ছোড়দা মন্তাদার সঙ্গে পার্টনারশিপে ব্যাবসা করে বড়লোক হওয়ার চেষ্টা করছে। আঃ ওদের আমারই কাছে আসতে হবে কেন? এটা আমার মোটেই পছন্দ নয়। ওদের কোনও ব্যাপারে আমি মাথা ঘামাতে চাই না, আমি প্রতিশোধ নিতে চাই না। আবার আমি ইচ্ছে করলেই একটা বড় অর্ডার পাইয়ে ওদের ব্যাবসাটা দাঁড় করিয়ে দিতে পারি।

সুজাতা যেন তার স্বামী কিংবা ছোড়দার হয়ে আমার কাছে কোনওদিন অনুরোধ করতে না আসে! সুজাতার ততখানি অধঃপতন কিছুতেই আমি সহ্য করতে পারব না!

॥ ॥চোদ্দো

এক বছর আগেও মনে হয়েছিল, রক্ত-মাংসের সুজাতার সঙ্গে আমার আর কখনও দেখা হবে না। পার্ক স্ট্রিটের রেস্তোরাঁয় সুজাতার সঙ্গে দেখা হওয়ার দিন দশেক বাদে আমার সংযমের বাঁধ ভেঙে গেল।

বিনা কারণে দুর্গাপুরে অফিস করতে-করতে হঠাৎ বেরিয়ে এসে, গারমিতাকে লোক মারফৎ খবর পাঠিয়ে, আমি চলে এলাম স্টেশনে। কলকাতায় পৌঁছেই ট্যাক্সি নিয়ে সোজা এলগিন রোডে সুজাতাদের বাড়ি।

মন্তাদা যে আমাকে আকস্মিকভাবে দেখেও দারুণ খুশির ভাব দেখাবেন, তা আমি জানতুম। রীতিমতো হইচই করতে লাগলেন। সুজাতাকে ডাকলেন, বড়দাকে ডাকলেন। আমি এ-বাড়িতে গণ্যমান্য অতিথি। একসময় আমি এ-বাড়িতে যখন আসতুম, একমাত্র সুজাতা ছাড়া অন্য কেউ বিশেষ পাত্তাই দিত না। আমার চেয়ে অনন্য, গৌতমদের বেশি খাতির ছিল, কারণ ওদের বাবারা ছিলেন কলকাতায় কেষ্ট-বিষ্টু ধরনের। এখন আমার বেয়াদপি করারও অধিকার আছে। আমাকে একতলার ঘরে বসিয়ে চা-টা খাওয়ানো হচ্ছিল, হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে সুজাতার দিকে তাকিয়ে বললুম, চল, তোমার ঘরে যাই! তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ কথা আছে!

অর্থাৎ অন্যদের সঙ্গে আজে-বাজে কথা বলতে আমার ইচ্ছে করছে না। আমার পকেটে কলম। একখানা সইতেই মন্তাদা আর সুজাতার স্বামীর ব্যাবসা দাঁড়িয়ে যেতে পারে। আমি এ-বাড়িতে

নিজে থেকে এসেছি, তাতেই ওরা ধরে নিয়েছে যে অনেকখানি কাজ হয়ে গেছে!

সুজাতার বরটি কোথায়? তাকে তো দেখছি না। তাকে দেখবার আগ্রহও আমার নেই।

সুজাতা কিছু বলার আগেই আমি ওপরের সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালুম।

মন্তাদা, আর বড়দারা সামান্য আপত্তিও জানাল না। হাসি-হাসি মুখে চেয়ে রইল। ওদের সামনে দিয়ে আমি কাঠের সিঁড়িতে ধপধপ শব্দ করতে-করতে উঠে গেলুম ওপরে।

ঘরখানা ঠিক আগের মতনই আছে। জানলার ধারে খাট পাতা। দরজার পাশটায় টেবিল ও চেয়ার। দু-দিকের দেওয়াল জোড়া র‍্যাকে প্রচুর বই। খুঁজলে ওর মধ্যে আমারও কিছু বই পাওয়া যাবে হয়তো, সুজাতার কাছ থেকে শেষপর্যন্ত বইগুলো ফেরত নেওয়া হয়নি।

দরজাটা বন্ধ করে দিলেই বা ক্ষতি কী?

একটা পাল্লা শুধু ভেজানো রইল। আমরা দুজনেই চুপ করে রইলুম বেশ কিছুক্ষণ। ঠিক কোনও কথা তা ভেবেও আসিনি। শুধু সুজাতাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করেছিল।

সুজাতার চেহারা অনেকটাই আগের মতন আছে। দুটি বিবাহের ছাপ পড়েনি। মেদহীন, উন্নত শরীর। চোখের দৃষ্টি পরিষ্কার। জীবনের কাছ থেকে এই নারীর অনেক কিছু প্রাপ্য ছিল।

একটু পরে সুজাতা জিগ্যেস করল, তুমি কি অনেক বদলে গেছ, অনীশ?

আমি জোর দিয়ে বললুম নিশ্চয়ই! আগে আমি একটা বোকা, ইডিয়েট ছিলুম!

মুচকি হেসে সুজাতা বলল, এখন বুঝি অনেক বুদ্ধিমান হয়েছ? অবশ্য তোমার মুখ দেখলে মনে হয়, বেশ প্র্যাকটিক্যাল হয়েছ ঠিকই।

সুজাতা, তোমার মনে আছে, ঠিক ওইখানে দাঁড়িয়ে, এক যুগ আগে তুমি আমার মুখে হাত চাপা দিয়ে বলেছিলে, এখন নয়। এখনও সময় হয়নি!

অনীশ, সেই সামান্য কথা তোমার এত দিনেও মনে আছে?

মনে থাকবে না? সেটা সামান্য কথা! সেই থেকে তুমি আমাকে বন্দি করে রেখেছ!

তার মানে?

আমি সুজাতার চোখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলুম। সুজাতা আমার এত কাছে? এখনও যেন ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না! আমি টের পাচ্ছি, আমার বুক ধকধক করছে, মুখের চামড়া টানটান, নিশ্বাস পড়ছে দ্রুত।

লোকে যাকে সার্থকতা বলে, তার সবই তো এসেছে আমার জীবনে। তবু সবসময় মনে হয়, জীবনটা ব্যর্থ হয়ে গেল। বারোটা বছর এই মেয়েটা আমাকে একটা গভীর অতৃপ্তির মধ্যে রেখে দিয়েছিল। আবার কি আমরা সেই বারো বছর আগে ফিরে যেতে পারি?

সুজাতা বলল, বসো, অনীশ। কত কথা জমে আছে। তোমার সব খবর বলো। তোমার বাড়ির কথা বলো।

আমি অস্থিরভাবে বললুম, আমার আর কিছুই বলার নেই। এই ঘরে এসে শুধু একটাই কথা মনে পড়ছে, তুমি আমার মুখে হাত দিয়ে বলেছিলে, এখনও সময় হয়নি! তুমি সময়ের কাছে আমাকে সত্যিই বন্দি করে রেখেছ!

সুজাতা বলল, যাঃ, তা কখনও হয়! মানুষের জীবনে ওরকম কত ছোটখাটো ঘটনাই তো ঘটে!

পৃথিবীর কোনও মেয়েকে আমি আর চুমু খেতে পারিনি।

যাঃ, এটা তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে বলো? তুমিই তো বললে, তুমি আর বোকা নেই। তুমি সেন্টিমেন্টালও নও, প্র্যাকটিকাল। বন্দি-টন্দি আবার কী?

মিথ্যে বলিনি, সুজাতা। অন্য দু-একটি মেয়েকে চুমু খেয়েছি ঠিকই, কিন্তু তুমি যেটাতে বাধা দিয়েছিলে, বলেছিলে সময় হয়নি, সেটা পাইনি বলে আর কোনও চুম্বনেই স্বাদ নেই। এরকম সত্যিই আমার মনে হয়।

ওটা ছিল একটা কথার কথা। অল্প বয়েসের লজ্জা। তার কি কোনও গুরুত্ব আছে? তুমি আমাকে কত অপমান করেছিলে অনীশ, আমি তো সেটা মনে রাখিনি!

আমি তোমায় অপমান করেছি? কক্ষনো না! তুমিই বরং, অদ্ভুতভাবে একদিন চলে গেলে। সেই বৃষ্টির দিন, আমি তোমার হাত ধরতে গেলে তুমি ঘৃণার সঙ্গে বলেছিলে, তুমি আমার সঙ্গে এসো না! মনে নেই।

মনে থাকবে না? কিন্তু কেন ওরকম ব্যবহার করেছিলাম?

সেটা তুমিই জানো! আজও আমি সেই উত্তরটা খুঁজছি!

থাক, ওসব কথা আর তুলে লাভ কী? দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বসো, অনীশ!

না, বলো, কেন সেদিন অমন ব্যবহার করেছিলে?

এখন বললে ঠিক বোঝা যাবে না। এখন মনে হবে, সবটাই ছেলেমানুষি! কিন্তু তখন সাংঘাতিক রাগ হয়েছিল। তুমি আমাকে পুরী নিয়ে যেতে চেয়েছিলে, এক হোটেলে।

তুমিই যেতে চেয়েছিলে। আমি উটি যাওয়া ঠিক করে ফেলেছিলুম বন্ধুদের সঙ্গে, তুমিই বললে পুরীতে।

হ্যাঁ, বলেছিলুম। তখন আমার কী-ই বা বয়েস। যদি ঝোঁকের মাথায় বলেই থাকি, তুমি অমনি রাজি হবে? তুমি নিশ্চয়ই আমাকে খারাপ মেয়ে ভাবতে!

এর মধ্যে খারাপের কী আছে? তুমি নিজে আমার সঙ্গে পুরী বেড়াতে যেতে চাইলে।

এখন হয়তো কিছুই খারাপ মনে হবে না। সময় বদলে গেছে। এখন অনেক ছেলেমেয়েরা যায়। কিন্তু বারো বছর আগে, আমাদের মতন রক্ষণশীল বাড়ি, তবু তুমি ভেবেছিলে, বিয়ের আগেই আমার মতন মেয়েকে কোনও হোটেলে নিয়ে গিয়ে ফুর্তি করা যায়। আমার এমন অপমান লেগেছিল।

সেই তুচ্ছ একটা পুরী যাওয়ার কথা নিয়ে তুমি আমার সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করে দিলে? আমি তোমাকে খারাপ মেয়ে ভাবব কেন? আমার মনে হয়েছিল, তুমি আমার চেয়েও সাহসী...

আমি অন্যদের সঙ্গেও খোলামেলাভাবে মিশতুম, কিন্তু তুমি ছিলে আমার কাছে সবচেয়ে আপন, অনীশ। কিন্তু তুমি যদি আমাকে সহজলভ্যা মনে করো, সেটা আমার কাছে অপমান নয়?

সুজাতা, আমি তোমাকে পুরী নিয়ে যাওয়ার কথা একবারও মুখ ফুটে বলিনি। আমার টাকা পয়সা ছিল না। তোমার শখ হয়েছিল বলেই আমি...

তুমি কেন আমাকে বারণ করোনি, অনীশ? তুমি তো তারপর একবারও আমার কাছে আসনি? এত তোমার অহংকার?

তুমি বিলেতে চলে গেলে, আমাকে একবার জানালেও না!

তুমি বারণ করলে আমি কিছুতেই বিলেত যেতুম না। থাক, থাক, উত্তেজিত হোয়ো না, অনীশ। বসো আমরা গল্প করি। অন্য কথা বলি। আমাদের জীবন দু-দিকে ঘুরে গেছে, অনেক আলাদা হয়ে গেছে।

সুজাতা, আমার জীবনটা যেদিকে গেছে, সেদিকটা আমি মোটেই চাইনি। তুমিই সেদিকে ঠেলে দিয়েছ আমাকে। ঠিক যেন তুমি আমাকে নির্বাসনে পাঠিয়ে দিয়েছিলে। তুমি আমাকে ফিরিয়ে আনতে পারো না?

অনীশ, এখন কি আর তা হয়! আর কিছুই মিলবে না। আমরা এখন অন্যরকম।

আমি কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে সুজাতার একটা হাত চেপে ধরে বললুম, আমি অন্য কিছু জানি না; আমি তোমাকে চাই।

সুজাতা ফ্যাকাশেভাবে হেসে বলল, আমি একটা সামান্য মেয়ে!

আমি প্রায় বাঘের মতো গর্জন করে বললুম, আমার জীবনটা তুমি পুরোপুরি নষ্ট করে দেবে? আমি তোমাকে চাই!

কোনওদিন জোর করিনি সুজাতার ওপর, আজও সেটা সম্ভব নয়। একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলুম

ওর চোখের দিকে।

সুজাতা আস্তে-আস্তে বলল, আমার কী ভুল হয়েছিল, আমি জানি না। কিন্তু সবকিছু হারিয়ে গেল। আমার জীবনটা আর আমার নয়!

আমার নিশ্বাসে আগুনের হলকা বেরুচ্ছে, আমার শরীরটা কাঁপছে, আমি যেন এক অল্প বয়েসি প্রেমিক, আর অপেক্ষা করতে পারছি না। কাতর গলায় বললুম, তোমাকে একবার অন্তত নিজের করে পুরোপুরি না পেলে কিছুই পাওয়া হবে না আমার জীবনে। আর সবকিছু আমার কাছে বিস্বাদ লাগে।

সুজাতা বলল, শুধু শরীরটা পাওয়া মানেই কি পাওয়া?

আমি জোর দিয়ে বললুম, হ্যাঁ, শরীর! শরীর! তোমার ওই শরীরের মধ্যেই আমার মুক্তি!

সুজাতা এগিয়ে এসে আগেকার মতন আমার গালে হাত দিয়ে আদর করল।

তারপর জানলাটা ভেজিয়ে দিয়ে দরজায় ছিটকিনি তুলে দিল। বুক থেকে আঁচলটা খসে পড়ল ওর। সুজাতা আবার বলল, আমি একটা সামান্য মেয়ে।

এত সহজ? বারো বছরের যন্ত্রণাটা কি তাহলে কিছুই না? এক্ষুনি সুজাতাকে আমি পেতে পারি? সুজাতার ভেজা-ভেজা ঠোঁটে ঝিলিক দিচ্ছে, স্পষ্ট আহ্বান। লাল রঙের ব্লাউজের ফাঁকে উপছে উঠেছে স্বর্ণ রঙের বুক। এখন আর কল্পনায় নয়, ওই ঠোঁটে, ওই বুকে আমি মুখ রাখতে পারি সত্যি-সত্যি। একেবারে বাস্তব!

কিন্তু এত সহজ! মাঝখানের বারোটা বছর তাহলে কোথায় গেল? এ কি আমার সেই সুজাতা, না অন্য কেউ?

সুজাতার বুকের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে আমি চোখ বুজলাম। ইস, কী সাংঘাতিক ভুলই না আমি করতে যাচ্ছিলুম?

ঘুরে দাঁড়িয়ে আমি খুলে দিলুম দরজার ছিটকিনি।

সুজাতা বলল, এখন এখানে কেউ আসবে না।

আমি অট্টহাসি করে বললুম, পাগল নাকি! সন্ধে সাতটার সময় দরজা বন্ধ করে এইসব, যাঃ তা কি হয়! আমি ইয়ার্কি করছিলুম তোমার সঙ্গে। চলো, নীচে যাই, সবার সঙ্গে গল্প করি।

সুজাতাকে আর কোনও কথা বলতে না দিয়ে আমি তরতর করে নেমে আসতে লাগলুম সিঁড়ি দিয়ে।

আসলে আমি পালাচ্ছি আমার ভুল থেকে। এত দিন তবু আমার কল্পনায় একজন নারী ছিল, যার চুম্বন সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, যার কথা চিন্তা করলেই আমার রোমাঞ্চ হয়। সুজাতার শরীরটা সত্যিকারের পেয়ে যদি আমার সেরকম না লাগে? যদি মনে হয়, সে-ও অন্য মেয়েদেরই মতন। তাহলে আমি আমার সেই কল্পনার নারীকেও চিরকালের মতন হারিয়ে ফেলব যে! সুজাতা এখনও তিনতলার ঘরে দাঁড়িয়ে আছে। সে কিছু বুঝতে পারছে না। না বোঝাই ভালো। আজ পর্যন্ত বোধহয় আর কোনও পুরুষ এত কাছাকাছি এসেও ওকে প্রত্যাখ্যান করেনি। সুজাতার বিস্ময়টা আমি উপভোগ করছি। ও নিজের হাতে দরজার ছিটকিনি দিয়েছিল, আমি সেটা খুলে দিয়েছি।

এরপর অন্য কোনও পুরুষের সঙ্গে যখন সুজাতা ঘনিষ্ঠ হবে, তখন কি মনে পড়বে আমার কথা? একটা অতৃপ্তি ওকে কুরে-কুরে খাবে? যদি তা-ই হয়, তবে সেটাই আমার জয়।

আমি সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছি, খুব জোরে, সুজাতার কাছ থেকে অনেক দূরে চলে যেতে হবে, যেন আর দেখা না হয়, আর সিঁড়িগুলো ফুরোচ্ছে না কেন?



মেয়েদের ভয়

এই নিয়ে চার বার দেখা হল স্নিগ্ধার সঙ্গে ওর বিয়ের পর। প্রথম বার লছমনঝোলায়। দিল্লি থেকে দু-দিনের জন্য বেড়াতে গিয়েছিলুম হরিদ্বারে। লছমনঝোলায় ব্রিজ পেরিয়ে এসে এপারের সিঁড়ি দিয়ে নামছি, নীচে অনেক নারী-পুরুষ মাছগুলোকে ময়দা খাওয়াচ্ছে, সেখানে একটি মহিলার পিঠ দেখেই মনে হয়েছিল চেনা-চেনা। ব্রিজ দিয়ে হেঁটে আসার সময়ই, যখন নীচের মানুষগুলিকে বেশ ছোট-ছোট দেখায় তখনও ওদের মধ্যে একজনকে আমার চেনা মনে হয়েছিল। এখন পিঠ দেখে আর সন্দেহ রইল না।

আট বছর ধরে স্নিগ্ধাকে আমি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেছি, তার কোনও ভঙ্গিই আমার অপরিচিত নয়—সুতরাং পিঠ দেখেই বা চিনব না কেন। বিরাট-বিরাট মাছগুলো একেবারে হাতের কাছে এসে লুটোপুটি করছে খাবার নেওয়ার জন্য। স্নিগ্ধা ময়দার গুলি ছুড়ে দিয়ে খিলখিল করে হাসছে। তার আশেপাশে আরও চার-পাঁচজন নারী-পুরুষ তাদেরই দলের।

তখন আমারও প্রবল অভিমান। আমিই বা কেন স্নিগ্ধার সঙ্গে সেধে কথা বলতে যাব। আমি দাঁড়ালাম বেশ খানিকটা দূরে। আমিও ময়দার গুলি ছুড়ে মাছগুলোকে আমার দিকে টেনে আনবার চেষ্টা করলাম। আমি একবার আড়ি চোখে তাকিয়েছি, স্নিগ্ধাও তাকিয়েছে, চোখাচোখি হয়ে গেল, কিন্তু স্নিগ্ধা চিনতে পারার কোনও লক্ষণই দেখাল না। আমি যেন সম্পূর্ণ অপরিচিত এলেবেলে লোক, আমাকে গ্রাহ্য করার কোনও দরকারই নেই। স্নিগ্ধার সঙ্গে চোখাচোখি হওয়া মুহূর্তে আমার বুক কেঁপে উঠেছিল ঠিকই, কিন্তু প্রবল অভিমানভরে আমি মনে-মনে বলেছিলাম, পৃথিবীতে কত মেয়ে আছে স্নিগ্ধার মতন! ওরকম একটা মেয়ের জন্য বয়ে গেছে আমার ভাবতে!

সেবার লছমনঝোলায় একদিন থাকব ঠিক করেছিলাম, কিন্তু পাছে স্নিগ্ধার সঙ্গে আবার দেখা হয়, তা ফিরতি বাসে চলে এলাম সেদিনই। এমনকী হরিদ্বারেও আর থাকলাম না।

দ্বিতীয়বার দেখা একটা নেমন্তন্ন বাড়িতে, অফিসের বন্ধু রমেনের বিয়ের বউ ভাতে নেমন্তন্ন খেতে গেছি, সেখানে স্নিগ্ধার সঙ্গে দেখা হবে কল্পনাই করিনি। পরে শুনলাম, রমেনের বউ স্নিগ্ধার দূর সম্পর্কে ননদ হয়। তিনতলার ছাদে খাবার ব্যবস্থা সিঁড়ি দিয়ে উঠছি, ওপর থেকে সিল্কের শাড়ি সপসপ করে নামছে কয়েকজন মহিলা। আমরা রমেনের অফিসের বন্ধু, স্বভাবতই আজ একটু ঠাট্টা ইয়ারকি করব, সুন্দরী মেয়েদের দিকে তাকাব ছুড়ে দেব উড়ো মন্তব্য—এ অধিকার আমাদের আছেই। কে যেন একজন মন্তব্য করল, একি মেয়েরা সব চলে যাচ্ছে নাকি? খাওয়াদাওয়া সব শেষ? একজন মহিলা স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে বললেন, কেন, মেয়েদের চলে যাওয়ার সঙ্গে খাওয়াদাওয়া শেষ হওয়ার কী সম্পর্ক? আমরা চলে যাচ্ছি না, নীচ থেকে আসছি!

একটি মেয়ের মুখ দেখতে পাইনি, দেখছিলাম ঘাড় ও পিঠের এক পাশ, উঁচু করে নতুন ডিজাইনের চুল বাঁধা, তবু চিনতে আমার অসুবিধে হয়নি স্নিগ্ধাকে। স্নিগ্ধা কি ইচ্ছে করে মুখ ফিরিয়ে আছে! আগেই দেখতে পেয়েছে আমাকে, চোখাচোখি হল না স্নিগ্ধা অন্য মহিলাদের সঙ্গে নীচে নেমে গেল।

তখন স্নিগ্ধার বিয়ের পর সাড়ে তিন বছর পেরিয়ে গেছে। সেবার স্নিগ্ধাকে দেখে আগের

মতো আর বুক কাঁপল না। তবে চমকে উঠেছিলাম, সেকথা স্বীকার করতেই হবে।

মাংসের পর চাটনি পড়ছে যখন, তখন স্নিগ্ধাকে ছাদে দেখতে পেলাম আবার ব্যস্তভাবে কাকে যেন খুঁজছে। আমাকে! নাঃ! সামান্য অভিমানের সঙ্গে আমার মনে হল এ ওভাবে স্নিগ্ধা তার কখনও আমাকে খুঁজবে না। অথচ একদিন ছিল, এরকম কোনও বিয়ে বাড়িতে হঠাৎ দেখা হলে আমাকে ছাড়া আর কারুকেই খুঁজত না স্নিগ্ধা। রেবার বিয়ের সময় স্নিগ্ধা আর আমি শেষ রাত্রে ছাদে বসে-বসে কত গল্প করেছি। অন্য মেয়েরা তখন বাসর ঘরের হাসি-ঠাট্টায় ব্যস্ত, স্নিগ্ধা উঠে এসেছিল শুধু আমার জন্য।

আমি চোখ দিয়ে স্নিগ্ধাকে অনুসরণ করতে লাগলাম। যদিও তৈরি হয়েই আছি। চোখে চোখ পড়লেই মুখ ফিরিয়ে যেত। স্নিগ্ধা ভেবেছে কী। ও অপমান করতে পারে, আমি পারি না?

স্নিগ্ধা একজন পরিবেশনকারীকে জিগ্যেস করল, আচ্ছা, নতুন বউয়ের ছোট বোন ইরা কোথায় বসেছে জানেন!

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখুন না ওই থার্ড সারিতে।

আমাদের সামনের সারিতেই বসেছিল অনেকগুলো মেয়ে। স্নিগ্ধা চলে এল সেদিকে। হঠাৎ একবার চোখাচোখি হয়ে গেল, আমি কিন্তু মুখ ঘুরিয়ে নিতে ভুলে গেলাম। স্নিগ্ধাও কিন্তু চোখ সরিয়ে নিল না। প্রায় আধমিনিট আমার দিকে চেয়ে রইল। ঠোঁটের কোণে কি সামান্য একটা হাসির রেখা দেখা দিয়েছিল, ঠিক বুঝতে পারলুম না অবশ্য। ঝুঁকে ইরা নাম্নী মেয়েটির কানে-কানে কথা বলে যেই মুখ তুললে, আবার চোখ পড়ল আমার চোখে। এবার আমিই আস্তে-আস্তে চোখ নামিয়ে নিলাম। স্নিগ্ধা ভাবছে আমি ওর দিকে সর্বক্ষণ প্যাট-প্যাট করে তাকিয়ে আছি। ও ভাববে, হ্যাংলা পানা করছি আমি। কী দরকার আমার, স্নিগ্ধা কিন্তু ছাদ থেকে চলে যাওয়ার সময় আর-একবার তাকাল আমার দিকে এবারও বোধহয় আধ মিনিটখানেক চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে রইল—হয় তো সে দৃষ্টির কোনও ভাষা ছিল, আমি বুঝতে পারিনি।

বিয়ের আগে ছিপছিপে চেহারা ছিল স্নিগ্ধার। এখন একটু ভারীর দিকে স্বাস্থ্য হয়েছে। মোটা বলা যায় না কিছুতেই, বরং প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গড়ন নিটোল, সুন্দর মসৃণ মুখের চামড়া, বুক ও উরুর কাছে সুন্দর ভাঁজ পড়েছে। বিয়ে বাড়ির অত রূপসি মহিলার মধ্যেও স্নিগ্ধার দিকে চোখ পড়ে। আমার একবার মনে হল, এই রূপসি স্নিগ্ধা অনায়াসেই আমার স্ত্রী হতে পারত, আমি যদি আর-একটু বেশি কঠিন হতে পারতাম সেই সময়ে।

রমেন এল আমাদের খাওয়া-দাওয়ার তদারক করতে। আমার পাশে বসা অফিসের কলিগটি স্নিগ্ধার দিকে ইঙ্গিত করে রমেনকে জিগ্যেস করল, ওই মহিলাটি কে রে? তোর শালি নাকি!

রমেন এক পলক ফিরে দেখে নিয়ে বলল, না শালি নয় তবে আমার বউয়ের কীরকম যেন আত্মীয় হয়, এখনও সবাইকে চিনে উঠতে পারিনি।

কলিগটি বললে, দারুণ চেহারা মাইরি। আলাপ করিয়ে দে না! রমেন মুচকি হেসে বললেন, হবে হবে, পরে হবে!

—দেখিস, মাখা ঘুরে না যায়! শেষকালে নিজের বউকে ছেড়ে ওর দিকেই—

—যা!

আমার রাগ হল না। বরং একটু খুশিই হলাম। স্নিগ্ধাকে অন্যরাও সুন্দরী বলছে, এটাই আমার ভালো লাগল যদিও স্নিগ্ধা এখন আমার কেউ নয়!

খাওয়ার পর অবশ্য স্নিগ্ধাকে আর দেখতে পেলাম না। আমি চোখ দিয়ে অনেক খুঁজলাম ও বাড়িতে আরও অনেক মেয়ে ছিল তাকিয়ে দেখার মতন, রমেনের ছোটবোনের কজন বান্ধবীই তো দারুণ সুন্দর, কিন্তু আর কারুর দিকে আমার চোখ বসল না। স্নিগ্ধাকে খুঁজে পেলাম না আর।

এরপর তিন-চারদিন স্নিগ্ধার কথা খুব মনে পড়েছিল। অনেক দিন বাদে পুরোনো দুঃখটা

মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। কিন্তু নিজে থেকে স্নিগ্ধার খোঁজ করব কিংবা দেখা করার চেষ্টা করব—অতটা দুর্বল হয়ে পড়িনি।

তারপর আস্তে-আস্তে আবার স্নিগ্ধার কথা ভুলতে শুরু করলাম। স্মৃতি আঁকড়ে কেউ বসে থাকে না। বিশেষত কলকাতা শহরে মন খারাপ করে বেশিদিন থাকার উপায় নেই। অফিসের টেলিফোন অপারেটরের সঙ্গে এক রবিবার বিকেলে পার্ক স্ট্রিটে দেখা। মেয়েটি মোটেই গল্প-উপন্যাসের টেবিলে টেলিফোন অপারেটরদের মতন চালু ধরনের মেয়ে নয়, বেশ শান্ত লাজুক মেয়েটি। আমি তাকে চা খাওয়াতে নিয়ে যেতে চাইলাম। সে রাজি হল। তারপর অনেকদিন তাকে নিয়েই মেতে থেকে স্নিগ্ধাকে ভুলে গেলাম।

স্নিগ্ধার সঙ্গে তৃতীয়বার দেখা হল শীতকালে। মহাজাতি সদনে একটা মিউজিক কনফারেন্সে গিয়েছিলাম, সারা রাতের অনুষ্ঠান। স্নিগ্ধা অবশ্য আমার কাছাকাছি বসেছিল, আমরা তিন বন্ধুতে মিলে গিয়েছিলাম, পাঁচ টাকার টিকিটে। স্নিগ্ধা বসেছে একেবারে সামনের দিকে, হয় গেস্ট টিকিট, নয়তো দামি টিকিট। সুতরাং স্নিগ্ধাকে আমার দেখতে পাওয়ার কথা ছিল না।

ভীমসেন যোশীর গানের পর আমার বন্ধু দুজন উঠে গেল বাইরে চা খেতে। আমি গেলাম না, ওদের বলে দিলাম আমার জন্য এককাপ চা নিয়ে আসতে। রাত প্রায় আড়াইটে বাজে, ভেবেছিলাম এই ফাঁকে একটু ঘুমিয়ে নেব। কিন্তু আমার ঘুমটুম সব ছুটে গেল, যখন দেখতে পেলাম মঞ্চের প্রায় সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে এক নারী। অস্পষ্ট আলোয় মুখ দেখা না গেলেও চিনতে এক মুহূর্ত দেরি হল না। স্নিগ্ধা একাই যাচ্ছে, সঙ্গে কেউ নেই, আমার দুর্দমনীয় ইচ্ছে হল উঠে গিয়ে স্নিগ্ধার মুখোমুখি দাঁড়াই। জিগ্যেস করি। স্নিগ্ধা, তুমি কেমন আছ।

স্নিগ্ধা যখন আমার কাছে কথা না রেখে বিভাসকে বিয়ে করেছিল তখন যে সাংঘাতিক রাগ এবং অভিমান জমেছিল আমার বুকে তার অনেক খানিই মিলিয়ে গেছে। এখন মনে হয়, আহা, স্নিগ্ধা সুখী হোক! আমি স্নিগ্ধার যেন লক্ষ্য নই। আমাকে বিয়ে না করে স্নিগ্ধা ভালোই করেছে, আমি বাউণ্ডুলে লক্ষ্মীছাড়াই হয়ে গেলাম, আমার সঙ্গে বিয়ে হলে স্নিগ্ধা হয়তো জীবনে শান্তি পেত না। কিন্তু স্নিগ্ধার সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক ফিরিয়ে আনা যায় না! এমনি একটু কথা বলব, হাসব একসঙ্গে, ওর স্বামীর সঙ্গে রসিকতা করব! আগে তো শুধু ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা স্নিগ্ধার সঙ্গে কথা বলেই দারুণ আনন্দ পেতাম।

চেয়ার থেকে উঠেও পড়েছিলাম কিন্তু আবার বসে পড়লাম। স্নিগ্ধার যদি এখনও রাগ থেকে থাকে? যদি আমাকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে নেয়? এক গাদা লোকের মধ্যে অপমান করে? বিয়ের ঠিক ঠাক হয়ে যাওয়ার পর স্নিগ্ধা আমার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছিল, সেদিন দারুণ অপমান করেছিলাম ওকে। তখন আমার বুকে প্রচণ্ড অভিমান, কটু ভাষায় ওকে বলেছিলাম, এখন নাকে কান্না কাঁদতে এসেছ, লজ্জা করে না? সরে যাও আমার সামনে থেকে। তোমার আমি মুখ দেখতে চাই না! তোমরা মেয়েরা সবাই এক, সবাই সমান স্বার্থপর! স্নিগ্ধা তখনও বলতে চেয়েছিল, না বরুণদা, আমি তোমাকে সত্যি ভালোবাসতাম! আমি এক ধমক দিয়ে বলেছিলাম চুপ করো! মেয়েদের ভালোবাসা কী জিনিস, তা আমার বোঝা হয়ে গেছে! শুধু স্বার্থ! যাও, ওই মুখ আর আমাকে দেখিও না!

সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে সব কিছুই নরম হয়ে এসেছে। এখন এক ধরনের চাপা উদাসীনতা নিয়ে আমি দেখছি স্নিগ্ধাকে। কিন্তু স্নিগ্ধাও কি রাগ ভুলতে পেরেছে?

আবার আলো নিবল, আবার অনুষ্ঠান শুরু হল। স্নিগ্ধাকে ভুলতে চেয়ে আমি মনোযোগ দিয়ে মুস্তাক আলির সেতার শুনতে লাগলাম। ঘুম আর এল না। আমার বন্ধু দুজন অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল হাত-পা ছড়িয়ে।

সেতারের পর খেয়াল আর তারানা ধরল একজন নতুন গায়ক। কর্কশ গলা, শুনতে একটুও ভালো লাগে না অথচ ঘুম আসার কোনও সম্ভাবনা নেই। চোখ দুটো একেবারে খড়খড়ে। সিগারেট

খাওয়ার জন্য আমি উঠে বাইরে এলাম। রাত প্রায় চারটে বাজে, হলের মধ্যে অনেকেই তখন ঘুমন্ত, বাইরেও বিশেষ লোকজন নেই। বেশ জাঁকিয়ে শীত পড়েছে, সিগারেট টানতে এখন বেশ ভালো লাগছে।

—বরুণদা, কেমন আছ?

আমি দারুণ চমকে উঠেছিলাম। একাগ্র হয়ে আমি ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকাতে-পাকাতে স্নিগ্ধার কথাই ভাবছিলাম, স্নিগ্ধা এখন আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, টেরই পাইনি। এতদিন বাদে বুকের মধ্যে আবার দুপদুপ করতে শুরু করল।

আমি শুকনোভাবে মুখ ফিরিয়ে বললাম, ভালো আছি। তুমি কেমন আছ?

সারা মুখ উজ্জ্বল করে হেসে ফেলল স্নিগ্ধা। বলল, খুব ভয় করছিল, আপনি আমাকে চিনতে পারবেন কি না? কিংবা হয়তো অপমান করবেন।

আমিও হাসলাম। হেসে বললাম, চার বছর কেটে গেছে। চার বছরে অনেক কিছু বদলে যায়।

বিয়েবাড়িতে যেমন দেখেছিলাম স্নিগ্ধার চেহারা তেমন সুন্দর নেই আর। আবার একটু রোগা হয়েছে। মুখে সামান্য ম্লান ছায়া। সেটা গোপন করার জন্যই স্নিগ্ধা আবার হাসল। বলল, চার বছরেও তুমি কিন্তু সেইরকম একই আছ সেইরকম ছেলেমানুষ!

আমি বললাম, ছেলেমানুষ? আমার ঝুলপির কাছে দুটো চুল পেকে গেছে।

—ওতে কিছু হয় না। তুমি এখনও বিয়ে করোনি কেন?

—কী করে জানলে বিয়ে করিনি।

—আমি সব জানি। লছমনঝোলায় আমাকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিলে কেন?

—তুমিই তো আমাকে দেখে চিনতেই পারলে না!

—মোটেই না! আমি বরং তোমার কাণ্ড দেখে হাসছিলাম।

—স্নিগ্ধা, চলো একটু রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসি!

ইস্! এখন বেড়াতে যাব কী করে? আমার বাড়ির লোকজনরা কী ভাববে?

—তোমার স্বামী এসেছেন?

—না, ও আসেনি।

এরপর আমি যে কথাটি বললুম, সেরকম কথা যে আমি বলতে পারি, তা এক মুহূর্ত আগেও ভাবিনি। আমি কিছুটা আবেগপ্লুত গলায় বললাম, স্নিগ্ধা, আমি তোমাকে ছাড়া আর কারুকে ভালোবাসতে পারব না! তোমার জন্যই আমার বুকটা শূন্য হয়ে আছে!

স্নিগ্ধা দু-তিন মুহূর্ত স্থিরভাবে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। তারপর একটা অন্যমনস্ক ধরনের বড় নিশ্বাস ফেলে বলল, ছিঃ বরুণদা, ওরকম করে না! এখন এসব কথা বলে লাভ কী? শোনো, আমি চাই, তুমি সুন্দর দেখতে একটি মেয়েকে বিয়ে করে সুখী হও! দেখো, বিয়ে হলেই তুমি আমার কথা ভুলে যাবে!

—তুমি বুঝি বিয়ে করে আমাকে ভুলে গেছ?

—হ্যাঁ গেছিই তো! আমি এখন লক্ষী বউ, আমার শাশুড়ি আমায় কত প্রশংসা করেন!

—স্নিগ্ধা, তোমার ছেলেমেয়ে হয়নি।

—না, ওসব ঝঞ্ঝাট এখনই পোহাতে চাই না!

স্নিগ্ধা আমার কত কাছে দাঁড়িয়ে আছে, ইচ্ছে করছে ওকে জড়িয়ে ধরে একটু আদর করি। কতদিন স্নিগ্ধার দুই স্তনের সামনে মুখ রাখিনি। সত্যিই তো, এতদিন রাগ আর অভিমানের বশে খেয়াল করিনি, স্নিগ্ধা ছাড়া অন্য কোনও মেয়েকে ভালোবাসা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

আমি বললাম, স্নিগ্ধা আজ না হোক, অন্য কোনওদিন আমার সঙ্গে একবার দেখা করবে?

আমি তোমার সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করতে চাই। আসবে?

—না।

—কেন?

—বরুণদা, পাগলামি করো না! ওসব হয় না। আমাদের দুজনের জীবন আলাদা হয়ে গেছে, এখন দেখা করলেই শুধু দুঃখই বাড়বে।

—শুধু দেখা করাতেও দোষ? তোমার স্বামী খুব গোঁড়া বুঝি!

—না, উনি কিছু বলবেন না। কিন্তু আমি নিজেই আর চাই না। তোমার আগে বিয়ে হোক, তারপর তুমি তোমার বউকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে বেড়াতে এস। হলের মধ্যে কিছু লোক হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠে চড়চড় করে হাততালি দিতে লাগল। বুঝলাম, সেই অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে এবং আবার কিছু লোক বাইরে আসবে। স্নিগ্ধা বলল, আমি এবার যাই!

—স্নিগ্ধা, সত্যিই আর দেখা হবে না?

—না!

কিন্তু আমি তখনই জানতাম, আবার দেখা হবে। স্নিগ্ধাকে আমার বিষম দরকার। স্নিগ্ধার জন্য দুঃখ পেয়ে আমি সাধু-সন্ন্যাসী হয়ে যাইনি, অন্য আর পাঁচজন মানুষের মতন আমারও ইচ্ছে করে মেয়েদের সঙ্গে মিশতে, নিরালায় কোনও মেয়ের মুখোমুখি বসতে। শরীরের মধ্যেও তুফান ওঠে। ইচ্ছে করে কোনও মেয়ের শরীরের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে। কিন্তু যে-কোনও মেয়ের সঙ্গে মিশতে গেলেই কিছুদিন বাদে স্নিগ্ধার কথা মনে পড়ে। অন্য কোনও মেয়ের হাত ছুঁয়েও মনে হয়, স্নিগ্ধাকে ছুঁয়ে আমি এর চেয়ে বেশি আনন্দ পেতাম।

এইজন্য কারুকে বিয়ে করতে ভরসা পাইনি। বিয়ে করে মানুষ এক ধরনের শাস্তি পাবার জন্য কিন্তু যাকে বিয়ে করব, তাকে ছুঁয়েও যদি স্নিগ্ধার কথা মনে পড়ে, তবে তার চেয়ে দুঃখের আর কিছু নেই। সেইসব দম্পতিরাই অভিশপ্ত। যারা পাশাপাশি শুয়ে অন্য কারুর কথা ভাবে।

স্নিগ্ধার সঙ্গে চতুর্থবার আমার দেখা হল দিল্লিতে। দু-বছর বাদে। আমাকে দিল্লি আসতে হয়েছে অফিসের কাজে। দিনসাতেক থাকতে হবে। মধ্যে একদিন সরস্বতী পুজা। সরস্বতী পুজোর দিন অঞ্জলি দেওয়ার অভ্যেস আমার ছেলেবেলা থেকে। বিদ্যার সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচে গেছে বহুদিন। অফিসের ফাইল আর 'লয়ের কাগজ ছাড়া আর কিছুই পড়ি না। তবু ছেলেবেলার ওই অভ্যেসটা রয়ে গেছে। এখনও অঞ্জলি দেওয়ার আগে চা-ও খাই না।

আজমীর গেটের কাছে বাঙালিদের একটা পুজা মন্ডপে হাজির হলাম সকাল-সকাল। তখনও পুজো আরম্ভ হয়নি। রীতিমতো ভিড় সেখানে।

এবার আমি স্নিগ্ধাকে প্রথম দেখতে পাইনি, স্নিগ্ধাই আমাকে খুঁজে বার করল। রীতিমতন খুশি মুখে বলল, তুমি; তুমি এখানে।

আমিও অবাক হয়ে জিগ্যেস করলাম, সে প্রশ্ন তো আমিও করতে পারি! তোমরা এখানে বেড়াতে এসেছ বুঝি।

—না, আমরা তো এখন দিল্লিতেই থাকি।

—বিভাস বুঝি এখানে পোস্টেড?

দেখা গেল, স্নিগ্ধা এখানে খুব জনপ্রিয়। অনেক ছেলেমেয়ে এসেছে কেউ স্নিগ্ধাদি, কেউ বউদি বলে ডেকে কথা বলছে ওর সঙ্গে। স্নিগ্ধা আমাকে বলল, আমাকে না বলে চলে যেও না! তারপর ওদের সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

আট বছর আগে স্নিগ্ধা আর আমি আমাদের ভবানীপুর পাড়ার পুজোতে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে অঞ্জলি দিয়েছিলাম। আজ আবার তার পুনরাবৃত্তি হল। স্নিগ্ধা আমার পাশে দাঁড়িয়ে জিগ্যেস করল, মনে আছে?

সেই যেবার তুমি এম এ পরীক্ষা দিলে?

আমি বললাম, আমার সব মনে আছে! কিছু ভুলিনি!

সত্যি সব মনে আছে। শুধু রাগ আর অভিমান নিঃশেষ হয়ে গেছে! এখন স্নিগ্ধা আর আমি কথা বলছি আগেকার আন্তরিকতায়।

অঞ্জলি দেওয়া হয়ে যাওয়ার পর স্নিগ্ধা আমাকে জিগ্যেস করল, তুমি নিশ্চয়ই এখনও চা-ও খাওনি?

—কী করে জানলে।

বাঃ, আমার বুঝি সব মনে থাকে না! তুমি তো কোনওদিনই অঞ্জলি দেওয়ার আগে কিছু খেতে না। এসো, আমার বাড়ি কাছেই, চা খাবে চলো!

বড় রাস্তার ওপারেই দোতলায় ফ্ল্যাট স্নিগ্ধাদের। বেশ সুন্দর। রাজস্থানী ঝি-কে চা বানাতে বলে স্নিগ্ধা খাবারের প্লেট নিয়ে বসল আমার সামনে। আমি জিগ্যেস করলাম, বিভাস কোথায়?

মুচকি হেসে স্নিগ্ধা বলল, ও তো ট্যুরে গেছে আগ্রায়! তা না হলে কি তোমাকে এত সহজে ডেকে আনতে পারি?

—কেন, বিভাস বুঝি খুব হিংসুটে?

—তা নয়। কিন্তু তাহলে তোমরা দুজনেই গল্প করতে! আমার আর কথা বলা হত না!

এই দু-বছরে খানিকটা আবার বদলেছে স্নিগ্ধা। এবার তার স্বাস্থ্য বড় বেশি ভালো, এখন সাবধান না হলে, এরপরে মোটা হয়ে পড়বে। খুশিতে ঝলমল করছে। আমাকে দেখে যেন সত্যিই খুব আনন্দিত হয়েছে স্নিগ্ধা। বিয়ের পর দু-বছর কেটে গেছে, সেই কঠিন দাম্পত্য নিষ্ঠা ওর আজ নেই মনে হল। স্নিগ্ধার তো উচিত আমাকে ভয় পাওয়া।

আমি শান্ত হয়ে বসে আছি, কিন্তু উত্তেজনায় আমার বুক কাঁপছে। আমি বোধহয় নিজেকে সামলাতে পারব না। এত কাছাকাছি, নির্জন ঘরে বসে আছে স্নিগ্ধা, যার জন্য আমি—

স্নিগ্ধা জিগ্যেস করল, কোথায় উঠেছ!

—ইন্টারন্যাশনাল হোটেলে।

—ওরে বাবা, খুব বড়লোক হয়েছ তো!

—মোটেই না। অফিস থেকে বিল দিচ্ছে।

—আমার এখানে একটা ঘর ফাঁকা পড়ে আছে। ও যদি থাকত, তুমি তাহলে আমার এখানে এসেও থাকতে পারতে।

—বিভাস না থাকলে বুঝি থাকতে পারি না?

স্নিগ্ধা রেগে গেল না। রহস্যময়ভাবে আমার দিকে চেয়ে দেখল। বলল, তুমি এখনও বিয়ে করোনি?

—না।

—কেন?

—কী জানি, জানি না। হয়ে ওঠেনি!

—আহা-হা! বলো, তোমার জন্য মেয়ে দেখব? দিল্লিতে অনেক ভালো-ভালো মেয়ে আছে।

—ঠিক তোমার মতন একজন মেয়ের খোঁজ দিতে পারবে?

—আমার মতন? আমি তো বুড়ি হয়ে গেছি। একত্রিশ বছর বয়েস হয়ে গেল!

—আমিও তো বুড়ো তাহলে, আমার চৌত্রিশ বছর।

—মোটেই তোমার চৌত্রিশ না, তেত্রিশ। তুমি আমার থেকে দু-বছরের বড় ছিলে—

—বিভাস বুঝি মাঝে-মাঝেই এরকম ট্যুরে যায়।

হ্যাঁ।

—তখন তুমি একা থাকো? তোমার ভয় করে না!

ভয় আবার কী? দিল্লিতে থেকে ভয় নেই, তা ছাড়া ঝি থাকে।

চায়ের কাপটা রাখতে গেছি; স্নিগ্ধা নিজেই সেটা নিতে এল। আঙুলে-আঙুলে ছোঁয়া লাগল। ঠিক দু-বছর সাড়ে চার মাস বাদে স্নিগ্ধার শরীর স্পর্শ করলাম আমি। এখন আর আগেকার মতন অনুভূতি অত তীব্র থাকার কথা নয়। তবু শরীরে যেন একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল।

কিন্তু নিজেকে সামলে রইলাম। চৌত্রিশ বছর বয়েস হয়ে গেছে, দায়িত্বপূর্ণ পদে চাকরি করি। এখন অসমীচীন কিছু করা উচিত নয় আমার পক্ষে। আমরা সভ্য মানুষ। যখন-তখন দাঁত-চোখ বার করে হিংস্র হয়ে ওঠা উচিত নয় আমাদের পক্ষে। স্বামীর অসাক্ষাতে স্ত্রীর সঙ্গে বসে চা খাওয়া যায়—কিন্তু সেই সুযোগ নিয়ে—

আমি হঠাৎ দাঁড়িয়ে বললাম, চলি!

স্নিগ্ধা বেশ অবাক হয়ে জিগ্যেস করল, এক্ষুণি যাবে? কেন?

হ্যাঁ, যাই স্নিগ্ধা!

—না বসো! কতদিন বাদে দেখা। অনেক গল্প করব তোমার সঙ্গে। দুপুরে এখানেই খেয়ে যাবে তুমি?

—না, স্নিগ্ধা উপায় নেই। অফিসের জরুরি কাজ আছে!

প্রায় জোর করেই বেরিয়ে পড়লাম স্নিগ্ধার বাড়ি থেকে। আর বেশিক্ষণ থাকলে আমি নিজেকে সামলাতে পারতুম না! নিজের হাত থেকেই আমাকে বাঁচাতে হবে।

হোটেলে ফিরে গেলাম না। অফিসের কাজ এমন কিছু জরুরি ছিল না, তবুও সেই কাজ সারতেই গেলাম। ইচ্ছে করে বেশিক্ষণ কথা বলতে লাগলাম—আমার এখন একা থাকা উচিত নয়।

সারা দিল্লি শহর চষে ফেলেও তিনটের বেশি সময় কাটাতে পারলাম না। আমার আর কোনও উপায় নেই। আমি আবার গেলাম স্নিগ্ধার ফ্ল্যাটে।

দরজা খুলল স্নিগ্ধাই। একটা চওড়া লাল পাড়ের শাড়ি পরে আছে। খোলা চুল পিঠের ওপর ছড়ানো। নিঃশব্দে হেসে স্নিগ্ধা বলল, আমি জানতাম, তুমি আবার ফিরে আসবে!

আমি কোনও কথা না বলে ঘরে ঢুকেই স্নিগ্ধাকে জড়িয়ে ধরলাম। তারপর ফিসফিস করে আমি ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে বললাম, আমি আর পারছি না। আমি আর পারছি না! আমি ক'বছর কোনওক্রমে নিজেকে সামলে ছিলাম, কিন্তু—

স্নিগ্ধা নিজেকে ছাড়িয়ে নিল না। নিশ্চিন্তভাবে আমার বুকে মাথা রেখে বলল, বরুণদা, তুমি আমার কী ক্ষতি করেছ জানো না!

—তোমার ক্ষতি করেছি?

—নিশ্চয়ই। আমি দু-বছর ধরে তোমাকে ভুলতে চেয়েছি। চেয়েছি স্বামীর সংসারকে সুখী করতে। কিন্তু যখনই একা থাকি শুধু তোমার কথা মনে পড়ে! কেন? কেন? তুমি কি আমাকে অভিশাপ দিয়েছ?

—স্নিগ্ধা, জীবনের প্রথম ভালোবাসাটাই বোধহয় এরকম অভিশাপ!

—বিয়ে করার পর সত্যিকারের আনন্দ আমি একদিনও পাইনি। মনে হয়, আমার চরম আনন্দ তোমার কাছে জমা আছে। তুমি চুম্বকের মতন আমাকে টেনে রেখেছ—

চুমুতে-চুমুতে আচ্ছন্ন করে দিতে লাগলাম স্নিগ্ধাকে। এতদিন বাদে শরীরের সমস্ত অবসাদ কেটে গেছে!

স্নিগ্ধাকে ছেড়ে দিয়ে আমি দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এলাম। ফেলে দিলাম জানলার পরদা। আবার ফিরে এসে ওকে জড়িয়ে ধরে ব্লাউজের বোতামে হাত দিলাম।

স্নিগ্ধা বলল, বরুণদা আমার ভয় করছে!

আমি বললাম, স্নিগ্ধা, আমরা দুজনেই দুজনকে চাই। তুমি একটু আগে যা বললে, আমারও অবস্থা তাই। আমি অন্য কোনও মেয়েকে স্পর্শ করে আনন্দ পাই না—মনে হয় আমার সব আনন্দ তোমার কাছে জমা আছে। আমরা দুজনে যদি পরস্পরকে আজ গ্রহণ করি সেটা কি ব অন্যায় হবে?

—আমি ন্যায়-অন্যায় বোঝার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছি। কিন্তু আমার ভয় করছে!

—কেন?

—জানি না।

ব্লাউজ ও ব্রা খুলে ফেলে দেখতে পেলাম স্নিগ্ধার পদ্মফুলের মতন দুটি স্তন। তারপর স্নিগ্ধার চোখে চোখ রেখে আমি ওর শায়ার দড়িতে হাত দিলাম। আমার হাত কাঁপছে। আমি আর সহ্য করতে পারছি না। স্নিগ্ধা বাধা দিল না। ফিসফিস করে বলল। আমার ভয় করছে!

—কেউ এসে পড়বে?

—বিভাস কবে আসবে!

—ওসব ভয় নয়। অন্য ভয়!

—আমার কাছে তোমার কোনও ভয় নেই!

হঠাৎ ঝট করে স্নিগ্ধা আমার হাত সরিয়ে দিয়ে সরে দাঁড়াল। তীব্র গলায় বলল, না-না, আমি কি সাংঘাতিক ভুল করতে যাচ্ছিলাম!

—স্নিগ্ধা এটা কি অন্যায়? এটা ভুল?

—আমি ন্যায়-অন্যায়ের কথা নিয়ে একটুও মাথা ঘামাচ্ছি না! আমি আমার জীবনের শেষ সম্বল হারিয়ে ফেলতে যাচ্ছিলাম।

আমি বুঝতে না পেরে স্নিগ্ধার দিকে তাকিয়ে রইলাম। স্নিগ্ধা আঁচল দিয়ে শরীর ঢাকতে-ঢাকতে বলল, তুমি বুঝতে পারলে না! আমার যখন মন খারাপ হত, যখনই অতৃপ্ত থেকেছি, তখনই আমার মনে হয়েছে, বরুণদার কাছে জমা আছে আমার সব আনন্দ! বরুণদা কাছে এলে বরুণদা যদি আমায় আদর করে তা হলেই আমি স্বর্গসুখ পাব। কিন্তু যদি সত্যি তা না হয়? যদি সত্যি সেরকম আনন্দ না পাই? তাহলে আমার কল্পনা করে আনন্দ পাওয়ারও কিছু থাকবে না!

আমি হাত বাড়িয়ে বললাম স্নিগ্ধা অত ভেবে কিছু করা যায় না! আমার বুক জ্বলছে এসো—

—না আমি আমার কল্পনার আনন্দটুকুও হারাতে পারব না। বরুণদা তোমার পায়ে পড়ি, তুমি যাও!

স্নিগ্ধা আমার কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গিয়ে দাঁড়াল।

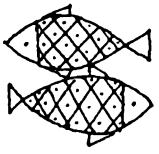

মাছ

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে সুরমা বারান্দায় এলেন কাক তাড়াতে। দুটো কাক অনেকক্ষণ থেকে বিশ্রী সুরে ডেকেই চলেছে। সুরমা এর আগে দু-তিনবার এসে তাড়িয়ে দিয়ে গেছেন, তবু ওরা ফিরে আসে। ওদের কি আর কোনও জায়গা নেই? এই বারান্দায় এসেই ডাকতে হবে? ওরা কী চায়? তারের জাল দিয়ে বারান্দাটা ঢেকে দিলে হয়, কিন্তু বাড়িওয়ালা দেবে না, নিজেদের খরচ করতে হবে। প্রস্তাবটা শুনে প্রতুল হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। সুরমার কাকের ডাক সহ্য হয় না,

তা বলে কি জালের বাইরে বসে কাক ডাকতে পারে না?

রান্নাঘরের জানলাটা সবসময় মনে করে বন্ধ করে দিতে হয়। একটা হুলো বেড়াল ঢুকে পড়ে যখন-তখন। হুলো বেড়ালটা মহা চোর, একটু অন্যমনস্ক হলেই মাছ নিয়ে পালাবে। সুরমা রান্নাঘরে থাকলেও সেটা এক-একসময় জানলা দিয়ে বাঘের মতন মুখটা বাড়িয়ে দেয়। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে। মুখে হুসহুস করলেও সে ভয় পায় না। যেন সে বলতে চায়, আমায় কিছু দেবে না কেন? দাও, দাও! ওটাকে তাড়াবার জন্য সুরমা রান্নাঘরে একটা লাঠি রেখেছেন।

সকাল দশটার পর বাড়ি খালি হয়ে যায়। স্বামী অফিসে, দুই ছেলেমেয়ে স্কুলে। ফ্ল্যাটের দরজাটা বন্ধ করে রাখেন সুরমা। এ-পাড়ায় খুব ভিখিরি আর ফেরিওয়ালাদের উপদ্রব। বছরখানেক আগে চাঁদা চাইবার নাম করে এক দুপুরবেলা তিনটি ছেলে সেনেদের বাড়ির দোতলায় এসে ডাকাতি করে গিয়েছিল। সেইজন্য সুরমা কক্ষনো দরজা খোলেন না। তবু প্রায় সারা দুপুরই সুরমার ওই হুলো বেড়াল আর কাকের ভয়ে কাটে। ওরা যে কখন ঢুকে পড়ে কী খাবে, তার কোনও ঠিক নেই।

সুরমা খুব কাছে গিয়ে কাক দুটোকে তাড়ালে ওরা উড়ে গিয়ে পাশের বাড়ির ছাদের কার্নিশে বসে। একটু পরেই আবার ফিরে আসে। ওরা কি অন্য কোনও বাড়ি চেনে না। শুধু এ-বাড়ির জিনিসই চুরি করতে হবে? প্রতুলের ধারণা, কাকদের মধ্যে নাকি আলাদা-আলাদা বাড়ি ভাগ করা আছে। এক কাক অন্য কাকে বাড়িতে ভাগ বসাতে যায় না। হুলো বেড়ালটা অবশ্য সারা পাড়া ঘুরে বেড়ায়, মনে হয় তার খিদের শেষ নেই।

ফ্ল্যাটের দরজায় খটখট করে শব্দ হতেই সুরমা ভয় পেয়ে একটু কেঁপে উঠলেন। এত জোর শব্দ কোনও ভিখিরি বা ফেরিওয়ালার তো নয়! সুরমার ধারণা, পৃথিবীর সব গুন্ডা-বদমাশরা জেনে গেছে যে দুপুরবেলা তিনি একা থাকেন। কিছুদিন আগেও একটা সর্বক্ষণের কাজের মেয়ে ছিল। একদিন জানা গেল সে চিনি, আটা, তেল চুরি করে। সুরমা শুধু-শুধু তাকে সন্দেহ করেননি, একদিন ধরেও ফেললেন হাতে নাতে। সেই মুহূর্তে তাড়িয়ে দিলেন তাকে। মেয়েটা কান্নাকাটি করে সুরমার পায়ে ধরে ক্ষমা চাইতে গিয়েছিল, তিনি গ্রাহ্য করেননি। একটা চোরকে কখনও বাড়িতে রাখা যায়? দুনিয়াটাই যেন চোর-ডাকাতে ভরে গেছে।

দরজার কাছে এসে সুরমা একটু কাঁপা গলায় জিগ্যেস করলেন, কে?

ওধার থেকে একজন ভাঙা-ভাঙা গলায় বললেন, মাসিমা, আমি ঝুনু। একবার দরজা খুলুন।

ঝুনু নামটি সুরমার মনে কোনও দাগ কাটল না। কে ঝুনু? মাসিমা বলে ডাকল। গলার আওয়াজটা একটু যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। তিনি আবার জিগ্যেস করলেন, কী চাই?

—মাসিমা, দরজাটা একবারটি খুলুন না!

—কী দরকার, ওইখানে থেকেই বলো।

—একটা জিনিস এনেছি আপনার জন্য।

—কী জিনিস? কে পাঠিয়েছে?

—নন্তুদা পাঠিয়েছে।

সুরমার সারা শরীর ঝিমঝিম করে উঠল। নন্তু! এ-বাড়িতে কেউ ও নাম উচ্চারণ করে না। গত এক বছরের মধ্যে নন্তু এদিকে ভুলেও পা বাড়ায়নি। সে কেন জিনিস পাঠাবে? নন্তুর নাম করে যারা আসে, তাদের তো দরজা খোলার কোনও প্রশ্নই নেই। ওরা কতজন এসেছে কে জানে!

নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়ে সুরমা বললেন, আমার কোনও জিনিসের দরকার নেই। ফেরত নিয়ে যাও!

ওপাশ থেকে ভাঙা কণ্ঠস্বরে উত্তর এল, নন্তুদা দিয়ে যেতে বলেছে। আমি এখাইে রেখে

যাচ্ছি। নন্তুদা আজ একবার আসতে পারে!

ধপাস করে কী যেন একটা পড়ল মেঝেতে। তারপর সিঁড়ি দিয়ে একজনের নেমে যাওয়ার শব্দ শুনতে পেলেন সুরমা।

কী রেখে গেল? বোমা, বন্দুক? গয়নার পুঁটলি? এখন কী হবে? সুরমা দরজার কাছে পাথরের মূর্তির মতন দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। নন্তু কি এইভাবে গায়ের ঝাল মেটাতে চায়? দরজার বাইরে যে জিনিসটা পড়ে পইল, পাশের ফ্ল্যাটের কেউ-না-কেউ একটু বাদেই সেটা দেখতে পাবে! জিনিসটা বাইরে পড়ে থাকবে, না ভেতরে নিয়ে আসা উচিত?

দরজার ছিটকিনি খুলে সামান্য একটু ফাঁক করলেন সুরমা। গলা-ভাঙা ছেলেটা চলে যাওয়ার নাম করে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে নেই তো? কী জিনিস ফেলে গেল তাও দেখা যাচ্ছে না।

এবার দরজাটা ভালো করে খুলে সুরমা দেখলেন মাটিতে পড়ে আছে একটা বেশ বড় আকারের বোয়াল মাছ। অন্তত আড়াই কেজি ওজন হবেই। মাছটার কানকোয় সুতলি বাঁধা। ছেলেটা হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে এসেছিল।

ভয়াবহ কোনও জিনিস নয়, হঠাৎ নন্তু একটা মাছ পাঠিয়েছে?

মাছটা সোনালি রঙের, চকচক করছে গা। একেবারে টাটকা। এত বড় মাছ এ-বাড়িতে কোনওদিন কেনা হয় না।

ওই মাছ ভেতরে আনার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু দরজার বাইরে পড়ে থাকবে? এক্ষুণি ফেলে দেওয়া দরকার। অতবড় মাছটা কোথায় ফেলবেন সুরমা? ছেলেটা বলে গেল নন্তু আজ আসবে। এত সাহস সে কোথায় পেল, নাকি সে আসছে উলটে ভয় দেখাতে!

মাছটা তাড়াতাড়ি ভেতরে এনে দরজা বন্ধ করে দিলেন সুরমা। এত ভালো, টাটকা একটা মাছ কি ফেলে দেওয়া যায়?

অন্য কোনও মাছ না পাঠিয়ে নন্তু বোয়াল মাছ পাঠিয়েছে। এত বড় বোয়াল মাছ বাজারে সচরাচর দেখাই যায় না। বোয়াল মাছের চচ্চড়ি প্রতুল খুব ভালোবাসেন। পেটি-গাদা করে কেটে ঝোল নয়, সমস্ত মাছটা সেদ্ধ করে ভেঙে ফেলে, তারপর ঘি গরম মশলা দিয়ে শুকনো-শুকনো করে রান্না। প্রতুল প্রায়ই বলতেন, সেই দেশে থাকতে মায়ের হাতে রান্না যে বোয়াল মাছের চচ্চড়ি খেয়েছি, সেরকম আর পেলাম না কখনও! তারপর সুরমা প্রতুলের মায়ের কাছ থেকে এই রান্না শিখেছেন। প্রতুল তারিফ করেছেন। বোয়াল মাছের চচ্চড়ি নন্তুরও খুব প্রিয় ছিল। কিন্তু টানাটানির সংসারে আস্ত একটা মাছ কেনা হয় আর ক'দিন! বছরে বড়জোর একবার কি দু-বার!

নন্তু খবর পাঠিয়েছে, সে আজ আসবে, তার আগে পাঠিয়ে দিয়েছে এই মাছ। সে সুরমার হাতের রান্না চচ্চড়ি খেতে চায়। কোনও হোটেল রেস্টুরেন্টে তো বোয়াল মাছের চচ্চড়ি পাওয়া যাবে না!

কেন আসবে নন্তু? এ-বাড়িতে ঢোকা না তার নিষেধ, তা কি সে ভুলে গেল? একটা মাছ পাঠালেই তাকে খাতির করার হবে?

সুরমার চোখে জল এসে গেল। বাড়িতে আর একটা লোক নেই যে পরামর্শ চাওয়া যায়! স্বামীকে লুকিয়ে কোনও কিছু করতে ভয় পান সুরমা। কঠোর আদর্শের মানুষ প্রতুল, ন্যায়-অন্যায় বোধ অতি প্রবল।

এখন বাজে মোটে এগারোটা। চারটের আগে ছেলেমেয়েরা কেউ স্কুল-কলেজ থেকে বাড়ি ফিরবে না। কিন্তু তাহলে দুপুরেই খেতে আসবে, সেসময় প্রতুল বাড়িতে থাকবেন না, সে জানে!

নিজের মায়ের পেটের ভাই একদিন তাঁর হাতের রান্না খেতে চেয়েছে, তাও খাওয়াতে পারবেন না সুরমা? যতই অন্যায় করুক, তবু মায়ের পেটের ভাই তো!

একটু ছাই মেখে কুটতে হয় এই মাছ, কিন্তু আজকাল তো রান্নাঘরে ছাই থাকে না। গ্যাসের

স্টোভ। সুরমা বড় আঁশবঁটিটা বার করলেন। বাড়িতে গরম মশলা নেই। ঘি আছে একটুখানি। এমন টাটকা মাছের এমনিতেই ভালো স্বাদ হবে।

জেল থেকে যেদিন ছাড়া পায় নন্তু, সেদিন নিজে তাকে আনতে গিয়েছিলেন প্রতুল। ট্যাক্সি করে এনেছেন। সুরমা রান্না সেরে রেখেছিলেন আগেই। জেলে ভালো করে খেতে পায়নি বলে, বাড়িতে ফেরার একটু পরেই তাকে খেতে বসিয়ে দেওয়া হল। প্রতুল তার সঙ্গে খেতে বসলেন না, পায়চারি করতে লাগলেন বারান্দায়। নন্তুর খাওয়া শেষ হয়ে গেলে প্রতুল তার সামনে একটা একশো টাকার নোট ছুড়ে ফেলে দিয়ে বলেছিলেন, আমার বাড়িতে এই তোমার শেষ খাওয়া, নন্তু। সুটকেস গুছিয়ে নাও, এ-বাড়িতে তোমার আর জায়গা হবে না। তুমি যেখানে ইচ্ছে যাও!

মাথা নীচু করে নন্তু মিনমিন করে বলেছিল, আমাকে শেষবারের মতন ক্ষমা করুন, জামাইবাবু। একটা লাস্ট চান্স দিন।

প্রতুল বলেছিলেন, তোমাকে অনেকবার ক্ষমা করেছি। আর কোনও চান্স দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তোমার জন্য আমার মান-সম্মান সব খোয়াব? তোমার সঙ্গে আমাদের আর কোনও সম্পর্ক নেই।

সুরমা প্রতিবাদ করতে পারেননি। প্রতুলের যুক্তি তিনি আগেই মেনে নিয়েছিলেন। নিজের ভাইয়ের জন্য কি তিনি নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করবেন?

এত বড় মাছটা কোটার পর একটা ডেকচি ভরে গেল। এত মাছ, কে খাবে? ভাগ্যিস ইনস্টলমেন্টে একটা রেফ্রিজারেটার কেনা হয়েছে গত মাসে, তাই কিছুটা রেখে দেওয়া যাবে।

নন্তু কখন এসে পড়বে কে জানে! সুরমা মাছটা যখন রান্না করছেন, তখন নন্তু এলে খেতে দেবেন ঠিকই। তবু তাঁকে বলতে হবে, তোর জামাইবাবু এসে পড়ার আগেই তুই চলে যা! আর কখনও এরকম মাছ-টাছ পাঠাবি না।

চচ্চড়িতে মুড়ো দেওয়া যায় না। যে-কোনও মাছের মুড়ো নন্তুর খুব পছন্দ। মুড়োটা দিয়েও আলাদা একটা ঝোল করতে হবে!

নন্তু কি ভালো হয়ে গেছে? সে কি সৎপথে রোজগার করে এই মাছটা কিনে পাঠিয়েছে? প্রতুল বলেছিলেন, অন্তত তিন বছর যদি সে সৎ পথে থাকতে পারে, তার প্রমাণ দেয়, তাহলে তাকে আবার এই বাড়িতে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হবে।

নন্তুকে দেখার জন্য সুরমার মনটা হঠাৎ আকুলি-বিকুলি করে উঠল!

সুরমার বিয়ের পাঁচ বছর বাদে তাঁর বাবা আর মা মারা গেলেন ছ'মাসের মধ্যে। সুরমারা তিন বোন, একটা মোটে ছোট ভাই ওই নন্তু। তিন বোনেরই বিয়ে হয়ে গেছে। নন্তুকে প্রথমে পাটনায় নিয়ে গেলেন তাঁর দিদি। সুরমার তুলনায় তাঁর দিদির সংসার অনেক সচ্ছল, জামাইবাবু পাটনার নামকরা উকিল। সুরমার ছোট বোনও নন্তুকে নিজের কাছে রাখতে চেয়েছিল দুর্গাপুরে, কিন্তু দিদি জোর করলেন। পাটনাতেই নন্তু প্রথম কুসঙ্গে পড়ে। লেখাপড়া নষ্ট হয়ে গেল। তিন বছর পর দিদি নন্তুকে পাঠিয়ে দিলেন সুরমার কাছে। নন্তুর কাণ্ড-কারখানায় জামাইবাবু খুব বিরক্ত, তা ছাড়া কলকাতায় না থাকলে ও ছেলে একেবারে উচ্ছন্নে যাবে!

জানলায় ঝপাস করে একটা শব্দ হতেই সুরমা চমকে উঠে দেখতে পেলেন হুলো বেড়ালটাকে। মাছের গন্ধে-গন্ধে ঠিক এসেছে! সুরমা লাঠি তুলে মারতে গেলেন। ওর মুখখানা দেখলেই ভয় করে। এক-একসময় মনে হয় গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে!

বেড়ালটাকে তাড়িয়ে জানলাটা বন্ধ করে দিলেন সুরমা। এত মাছ, ওই বেড়ালটা কখন এসে মুখ দিয়ে ফেলবে তার ঠিক নেই।

দরজায় কি কোনও শব্দ হল? নন্তু এসে গেল? রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে সুরমা শুনতে পেলেন পাশের ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ হচ্ছে।

নন্তুকে এখানকার স্কুলে ক্লাস টেনে ভরতি করা হয়েছিল। পরপর দু-বার সে ফেল করল। প্রতুল নিজে তাকে পড়াতে বসিয়ে চড়-চাপড় মারলেন কয়েকবার। তারপর একদিন বললেন, ওর পড়াশুনোয় মাথায় নেই, ও কোনওদিন পাশ করতে পারবে না। পাটনায় হিন্দি মিডিয়ামে কয়েক বছর পড়িয়ে ওর আরও ক্ষতি করা হয়েছে।

পড়াশুনোয় সবার মাথা থাকে না, নন্তু অন্য কোনও কাজ শিখতে পারত। প্রতুল বললেন, কিন্তু অন্তত হায়ার সেকেন্ডারি পাশ না করলে আজকাল কোনও লাইনেই যাওয়া যায় না। অফিসে বেয়ারার চাকরিও কেউ দেবে না।

কী করে যেন ঠিক খারাপ-খারাপ ছেলেদেরই বন্ধু হিসেবে বেছে নিল নন্তু। প্রায়ই তার নামে গুন্ডামি মারামারির অভিযোগ আসে। অনেক চেষ্টা করে তার জন্য বেহালায় একটা কারখানায় অ্যাপ্রেন্টিসের কাজ জুটিয়ে দিলেন প্রতুল। সেখান থেকেও নন্তু একদিন ফিরে এল রক্তাক্ত শরীর নিয়ে। একদল শ্রমিক নাকি তাকে সেই কারখানায় ঢুকতে দিতে চায় না, তাদের নিজেদের লোক আছে, তাই নন্তুকে মেরেছে।

তারপর থেকে নন্তু প্রায় ছাড়া গরু হয়ে গিয়েছিল। বাড়িতে খায়, সারাদিন বাইরে-বাইরে কাটায়। চেহারাটাও হয়ে উঠল পাড়ার মাস্তানদের মতন।

সুরমার ছেলে সৈকত নন্তুর থেকে সাত বছরের ছোট, সে সেবার স্কুল ফাইনাল দিচ্ছে। শেষ পরীক্ষা দিয়ে ফেরার দিন দুটি অচেনা ছেলে রাস্তায় তাকে ধরে হঠাৎ ঠ্যাঙাল। তারা নাকি বলেছিল, শালা, নন্তু তোর মামা হয়! তাকে পেলে গলা কেটে দিতুম!

সেইদিনই প্রতুল সুরমাকে বলেছিলেন, তোমার গুণধর ভাইটির জন্য তোমার নিজের ছেলের সর্বনাশ হবে, তাই কি তুমি চাও? ও ছেলের সংস্পর্শে থাকলেই তোমার ছেলেমেয়ের ক্ষতি হবে!

এরপর কিছুদিন নন্তু চুপচাপ ছিল। কিন্তু অতবড় ছেলে হয়েও সে কোনও রোজগার করে না, দিদির সংসারে বসে-বসে খায়, এর গ্লানি সে অনুভব করেছিল ঠিকই।

এক রাত্তিরে সে বাড়ি ফিরল না। সারারাত জেগে কাটিয়েছিলেন সুরমা। একটা বাপ-মা মরা ছেলে, লেখাপড়া হল না বলে কি একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে? প্রতুল তাকে শাসন করেন ঠিকই, কিন্তু তার খাওয়া-পরার জন্য কোনও গঞ্জনা দেন না কখনও। লেখাপড়া শেখেনি বলে কোনও ক্রমেই কি সে ভালো পথে কিছু রোজগার করতে পারে না?

দু-দিন পরে জানা গেল, আরও তিনটি ছেলের সঙ্গে নন্তু পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। বেলগাছিয়ায় রেলের ইয়ার্ডে ওরা চুরি করতে ঢুকেছিল। ওদের মধ্যে একটি ছেলে পেটে গুলি খেয়ে এখন তখন অবস্থা।

দেড় বছরের জেল হয়েছিল নন্তুর। প্রতুল সুরমাকে জিগ্যেস করেছিলেন, এর পরেও তুমি তোমার ভাইকে আশ্রয় দিতে চাও? তোমার ছেলেমেয়েরা রাস্তায় বেরুলে অন্যরা আঙুল দেখিয়ে বলবে, তোর মামা একটা জেল-খাটা চোর!

দেড়টার মধ্যে রান্না শেষ করে ফেললেন সুরমা। এখন স্নান করতে গেলে তার মধ্যেই যদি নন্তু এসে পড়ে, দরজা খুলবে কে? স্নানের ঘর থেকে সুরমা শুনতেও পাবেন না, নন্তু দরজা ধাক্কিয়ে ফিরে যাবে। থাক, তিনি বরং বিকেলে স্নান করবেন।

আড়াইটে...পৌনে তিনটে বেজে গেল, তার মধ্যেও নন্তু এল না। আর কখন সে আসবে? কাক দুটো অলুক্ষুণেভাবে ডেকেই চলেছে। এই নিস্তব্ধ দুপুরে শুধু কাকের ডাকের মতন কর্কশ যেন আর কিছু হতে পারে না! সুরমা হুসহুস করতে লাগলেন। কাক দুটো যেন মজা করছে সুরমাকে নিয়ে, একটু উড়ে যায়, আবার ফিরে আসে।

আর দেরি করা যায় না। সুরমার খিদে পেয়ে গেছে। এতখানি মাছ রান্না করা কি সোজা কথা! সুরমা খেতে বসে গেলেন তিনটের সময়। দুটো ডেকচিতে ভরা মাছ, তবু সুরমা একটু নিলেন

না। অন্য কেউ খাবার আগেই তিনি খাবেন, তা কি কখনও হয়!

নন্তু এল না কেন? বোয়াল মাছের চচ্চড়ি খাওয়ার শখ হয়েছিল তার, কোনও জায়গায় এতবড় একটা টাটকা মাছ দেখে কিনে ফেলেছে ঝোঁকের মাথায়। দিদির কাছে পাঠিয়েছে নিশ্চয়ই সে ভেবেছে, সে খেতে চাইলে দিদি তাকে ফেরাবে না! কোথায় থাকে নন্তু কে জানে! একশো টাকা সম্বল করে সে এ-বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল। পাটনায় দিদির কাছে যায়নি, দুর্গাপুরে রূপার কাছেও যায়নি। এতদিনের মধ্যে আর কোনও খবর পাওয়া যায়নি তার!

সে কি রাত্তিরে আসতে সাহস করবে, প্রতুলের সামনে?

চারটের পর স্কুল থেকে ফিরল দুই মেয়ে। ওরা পাশের একটা ক্লাবে খেলতে যায় বিকেলে। স্কুল থেকে ফিরেই ক্লাবে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। রুটি-তরকারি করা আছে ওদের জন্য। এত মাছ একদিনে খেয়ে শেষ করা যাবে না। সুরমা জিগ্যেস করলেন, রুটি দিয়ে একটু মাছের চচ্চড়ি খাবি? খুব ভালো মাছ।

দুই মেয়েই আঁতকে উঠে প্রায় একসঙ্গে বলল, বিকেল বেলায় মাছ খাব? তোমার মাথা খারাপ হয়েছে মা!

মেয়েরা কেউ মাছ তেমন ভালোবাসে না। ওদের পছন্দ শুধু মাংস। মাংস আর ক'দিন হয়! মাছ দেখলে ওরা ঠোঁট ব্যাঁকায়। কোনটা কী মাছ তাও জানে না। মাছের বদলে ডিমের ঝোল পেলেও ওরা খুশি।

প্রতুল ফিরলেন সাতটার সময়, ছেলে তার দু-পাঁচ মিনিট আগে। সুরমা ওদের দুজনকে এড়িয়ে-এড়িয়ে থাকার চেষ্টা করলেন। তিনি কোনও কথা গোপন রাখতে পারেন না। তাঁর মুখ দেখলেই বোঝা যায়। তিনি ছাদে চলে গেলেন। এই ফ্ল্যাট বাড়ির ছাদটা মস্ত বড়, অনেকখানি ফাঁকা জায়গা। আকাশ আজ মেঘলা। শুক্লপক্ষ বলে চাপা একটা আলো রয়েছে, পাশের নারকোল গাছটায় হাওয়া বইছে ঝিলিমিলি শব্দে।

সুরমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। শুধু নন্তুর জন্য নয়। নন্তু চলে যাওয়ার পর মাঝে-মাঝেই তার জন্য কেঁদেছেন বটে, কিন্তু এতদিনে সেই শোক খানিকটা ফিকে হয়ে গেছে। নন্তুর জন্য চেষ্টা তো কম করা হয়নি। পৃথিবীতে এত চোর-গুন্ডা, তাদের পরিবার থেকেও একজন সেই দলে যোগ দিয়েছে। তার জন্য তো এ-বাড়ির অন্য ছেলেমেয়েদেরও নষ্ট হতে দেওয়া যায় না।

নন্তু আজ হঠাৎ মাছটা পাঠিয়ে বিপদে ফেলতে গেল কেন? এমনিতে মাছটা ফেলে দিলেও হত, এখন এত কষ্ট করে রান্না করা হল, শুধু নন্তু খেতে চেয়েছিল বলেই, এখন কি ফেলে দেওয়া যায়? প্রতুল ওই মাছ খেতে এত ভালোবাসেন! এখন প্রতুলের কাছে কী মিথ্যে কথা বলবেন তিনি!

মাঝে-মাঝে এই ফ্ল্যাট বাড়িতে তরকারিওয়ালা, মাছওয়ালা আসে। বেশ বেলা করেই আসে। তখন ওদের কাছ থেকে সুরমা কোনওদিন মাছ কেনেন না। কিন্তু যদি বলা যায়, একটা মাছওয়ালা এসে এই মাছটা খুব সস্তায় দিতে চাইল, এত ভালো মাছ, তাই কিনে ফেললাম! এটা খুব অবিশ্বাস্য হবে না। বেশি বেলা হয়ে গেলে মাছওয়ালারা অনেক সময় খুব সস্তায় মাছ দিয়ে যায়। এই কথাটা শুনে প্রতুল কী বলবেন তাও সুরমা আন্দাজ করতে পারেন। প্রতুল হেসে বললেন, তুমি সস্তায় মাছ কিনেছ, নিশ্চয়ই পচা মাছ, তোমাকে ঠকিয়েছে! মাছটা পচা কি না তা তো খেয়েই বুঝবেন প্রতুল!

ছাদের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে ঘুরতে-ঘুরতে সুরমা সেই বাক্যটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতে লাগলেন বারবার। কোনভাবে বললে পুরোপুরি সত্যি মনে হবে! মাছওয়ালার নাম বিরজু, তার নামটাও জুড়ে দিতে হবে!

রাত্রে সবাই খেতে বসে একসঙ্গে। সুরমা আগে অন্যদের পরিবেশন করে তারপর বসে পড়েন নিজেও। আজ প্রত্যেকের জন্য আলাদা বাটিতে করে মাছ সাজিয়ে দিলেন।

সৈকতই প্রথম অবাক হয়ে বলল, এ কী মা, এত মাছ? কে বাজার করল?

একটুখানি মুখে দিয়ে সে আবার বলল, দারুণ রান্না হয়েছে তো!

প্রতুলও বিস্মিতভাবে চেয়ে বললেন, এত মাছ কোথায় পেলে!

—নন্তু পাঠিয়েছে!

কথাটা বলে ফেলেই সুরমার ইচ্ছে করল নিজের গালে ঠাস-ঠাস করে চড় মারতে। ছাদে গিয়ে এতক্ষণ ধরে রিহার্সাল দিয়েও ঠিক সময়ে কথাটা মনে এল না? নিজের বোকামিতে নিজের ওপরেই প্রচণ্ড রাগ হয়।

প্রতুল বাটির দিকে হাত বাড়াতে গিয়েও হাত গুটিয়ে নিয়ে বললেন, নন্তু পাঠিয়েছে মানে? সে হঠাৎ মাছ পাঠাল কেন? নিজে এসেছিল?

আর মিথ্যে কথা বলার উপায় নেই সুরমার। রক্ত শূন্য মুখে বললেন, একটা ছেলে এসে ওর নাম করে দিয়ে গেল!

—তুমি অমনি নিয়ে নিলে?

—দরজার সামনে ফেলে রেখে গেল যে।

—দিদিকে সে চুরির টাকায় মাছ ঘুষ দিতে চেয়েছে? তুমি এই মাছ খেতে চাও তো যত ইচ্ছে খাও, আমি...

মাছের বাটিটা এত জোরে ঠেলে দিলেন প্রতুল যে আর একটু হলেই পড়ে যাচ্ছিল টেবিল থেকে। সুরমার হাতে লেগেই সেটা আটকে গেল।

প্রতুল ছেলেমেয়েদের দিকে কড়া চোখে তাকালেন। তারপর আপন মনে বললেন, যার খুশি সে ওই চুরির টাকার মাছ খেতে পারে, আমি বরং সারাজীবন নিরামিষ খেয়ে থাকব, তবু...

সুরমা চোখের জল ফেলতে চলে গেলেন রান্নাঘরে। এই চোখের জল শুধু নিজের ওপর রাগে। একটা মিথ্যে কথা বলতে পারলেই যদি স্বামী ও সন্তানদের একদিন ভালো করে খাওয়ানো যেত...সেটুকু যোগ্যতাও তার নেই!

একসময় ছোট মেয়ে এসে পিঠে হাত দিয়ে বলল মা, খেতে যাবে না? এসো, খেয়ে নাও!

খাওয়ার টেবিল থেকে সবাই উঠে গেছে। প্রতুলের ওরকম কথার পর কেউ আর মাছের বাটি ছোঁয়নি।

সবক'টা বাটির মাছ তিনি আবার ডেকচিতে ঢাললেন ফেললে তো একসঙ্গেই ফেলতে হবে। নিজের হাতে যত্ন করে রান্না জিনিস ফেলে দেওয়া যে কত শক্ত, তা অন্যরা কী করে বুঝবে?

নন্তু আসবে বলেও এল না কেন? সে তো এমনি এমন মাছ পাঠায়নি, নিজে এসে সেই মাছ খাবে, সে কথাও বলে পাঠিয়েছিল। তাহলে সে মত বদলাল কেন?

কেন যেন সুরমার ধারণা হচ্ছে, এই মাছ কেনার টাকা কোনও ভালোভাবেই রোজগার করেছে নন্তু। জামাইবাবুকে সে চেনে, না হলে কি সে পাঠাতে সাহস পেত নিজে এসে সে কথা বলতে পারল না?

আর-একটা নতুন চিন্তা চাপল সুরমার মাথায়। আজ নন্তুর কোনও বিপদ হয়নি তো? পুলিশের হাতে ধরা পড়ল আবার? ওদের দু-দলের মধ্যে মারামারিও তো যখন-তখন হয়, দু-একজন মরে যায়। দিদিকে দিয়ে রান্না করিয়েও খেতে এল না সে?

খুটখাট করে কাজ সারতে অনেকক্ষণ সময় কাটিয়ে দিলেন সুরমা। প্রতুল ঘুমিয়ে পড়েছেন। বিছানায় শুয়েও ঘুম এল না সুরমার, ছটফট করতে লাগলেন। তাঁর এখনও মনে হচ্ছে, নন্তু ঠিক আসবে।

হঠাৎ কীসের শব্দ হল না? দরজায় কেউ ধাক্কা দিলেন? এত রাত্রে বেল না বাজিয়ে ঠুকঠুক করছে দরজায়!

সুষমা হুড়মুড় করে উঠে বসলেন। হ্যাঁ একটা শব্দ হচ্ছে ঠিকই। সুরমা প্রায় ছুটেই চলে এলেন বাইরে। প্রতুল যাই বলুন না কেন, নন্তুকে তিনি ফেরাতে পারবেন না আজ।

না, বাইরের দরজায় কোনও শব্দ নেই। শব্দটা হচ্ছে রান্নাঘরে। জানলাটা ভেজানো ছিল, সেটা ঠেলে-ঠেলে খুলেছে হুলো বেড়ালটা। আকাশে এখন কিছুটা জ্যোৎস্না ফুটেছে, তাতে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। সুরমাকে দেখেও বেড়ালটা জানলার শিকে মুখ গলিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন সুরমা। হুলোটাকে দেখে ভয় পেলেন না, তাড়ালেন না। তিনি বললেন, আয়, খাবি আয়!

মাছের ডেকচিটা নিয়ে এসে মাটিতে অনেকটা মাছ ঢেলে দিলেন তিনি। হুলোটা নির্ভয়ে এসে তাতে মুখ দিল। যেন এটা তার দাবিই ছিল। খাক, তৃপ্তি করে খাক।

সুরমা ভাবলেন, খানিকটা রেখে দেবেন কাল সকালের জন্য। কাক দুটোকে দিতে হবে। ওদের দেখলেই লোকে তাড়ায়, ওদেরও প্রত্যেক দিনই খেতে হয় চুরি-চামারি করে। যত্ন করে ডেকে তো কেউ কখনও খাওয়ায় না!



গোপন

জয়াকে নামিয়ে দিয়ে ট্যাক্সিটা ঘুরিয়ে নেওয়ার একটু পরেই সব আলো নিভে গেল। একেবারে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। সঙ্গে-সঙ্গে প্রবল আপশোশের সঙ্গে ঘাড় ঘুরিয়ে পেছন দিকে তাকাল রজত। আর পাঁচ মিনিট আগে লোডশেডিং হতে পারত না? নেমে যাওয়ার সময় জয়া তার হাতটাও ছুঁতে দেয়নি। জয়া ভয় পায়। ভয় ঠিক নয়। লজ্জাও নয়। এক ধরনের অস্বস্তি। এ-পাড়ার একটি যুবককে জয়া প্রত্যাখ্যান করেছে, সেই অবনীর সামনে সে রজতের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা দেখাতে চায় না! ট্যাক্সির মধ্যেও জয়া খানিকটা দূরত্ব রেখে বসে। তা বসুক। রজত তো আর ট্যাক্সির মধ্যে জয়াকে চুমু খেতে চায় না। কিন্তু বিদায় নেওয়ার সময় একটুখানি হাতের সঙ্গে হাতের স্পর্শ...

একটু আগে লোডশেডিং হলে রজত জয়ার একটা হাত ধরে নাকের কাছে আনত। জয়ার হাতেরও একটা সুগন্ধ আছে।

এখন আর কোথাও যাওয়ার নেই। রজত বাড়িতেই ফিরবে।

রজতদের পাড়াটাও অন্ধকার। আজ সন্ধেবেলা বাতাসেরও তেজ নেই, বাড়ি ফিরে অন্ধকারে ভূত হয়ে থাকতে হবে। একটা ইনভার্টার কেনা খুবই দরকার, কিন্তু নতুন বাড়িতে যাওয়ার আগে এনে লাভ নেই, শুধু-শুধু লাইন পালটাবার ঝামেলা।

ট্যাক্সিটা গলির মধ্যে ঢুকতে চাইল না। ঝগড়া করার ইচ্ছে নেই রজতের। সে ভাড়া মিটিয়ে নেমে পড়ল। এখন তাকে হিসেব করে হাঁটতে হবে ফুটপাথের কোথায়-কোথায় ভাঙা তা প্রায় তার মুখস্থ, ডান পাশে দুটো হাইড্রান্টের ঢাকনা নেই। ফুটপাথের এক দিকে ঘেঁষে পাড়ার ছেলেরা গাছ লাগিয়েছে। কিছুই দেখা যায় না।

রজতের বেশি ভয় কুকুরদের। ভুলে গায়ে পা পড়লেই কামড়ে দেবে। গ্রামের রাস্তায় অন্ধকারে যেমন সাপের ভয়, কলকাতায় তেমনি কুকুর। ওরা যেখানে সেখানে শুয়ে থাকে।

খানিক আগে রজত তার বান্ধবীর সঙ্গে আমেজময় সময় কাটিয়েছে, এখন সে কুকুরের ভয়ে সিঁটকে হাঁটছে। একই অন্ধকার, যদি সে এখন জয়ার পাশে বসে থাকত। এই অন্ধকারই স্বর্ণাভ

বাঙ্ময় হয়ে উঠত।

সদর দরজাটা খোলা। রজত ভেতরে পা দিতেই সিঁড়ির নীচে কী যেন খচর-খচর করে উঠল রজতের। সে চোর-গুন্ডার কথা ভাবল না। তার মনে হল, রাস্তার কুকুর!

পুরোনো আমলের ফ্ল্যাটবাড়ি। এক সময় দরজার কাছে একজন দারোয়ান থাকত, এখনও সে আছে বটে, কিন্তু তার কাজের ঠিক নেই। এ-বাড়ির দেওয়ালে প্লাস্টার, চুন-বালি খসে খসে পড়ছে, কিন্তু এ-বাড়ির মালিকের কোনও মায়া নেই বাড়ি সম্পর্কে। সিঁড়ির রেলিং দু-এক জায়গায় বিপজ্জনকভাবে ভাঙা কিন্তু পুরোনো ভাড়াটেদের অসুবিধের দিকগুলো দেখতে যাবে কেন?

যদি সিঁড়ির ধাপেও কোনও কুকুর শুয়ে থাকে? রজতের মাথায় খেলে গেল চোদ্দোটি ইঞ্জেকশানের কথা; এ-পাড়ার একটি ড্রাইভারকে নিতে হয়েছে কয়েকদিন আগেই।

নিঃসাড়ে একটুখানি দাঁড়িয়ে থাকার পর রজত পকেট থেকে লাইটার বার করে জ্বালল।

সিঁড়ির মুখটা পরিষ্কার, কিন্তু সিঁড়ির নীচে কিছু আছে।

রজত আবার চমকে উঠল। কুকুর নয়, একটি রমণী। জোড়াসনে সোজা হয়ে বসে স্থিরভাবে চেয়ে আছে রজতের দিকে। এক রাশ কালো চুলের পটভূমিকায় শুধু দেখা যাচ্ছে তার মুখখানা।

লাইটার বেশিক্ষণ জ্বালিয়ে রাখলে সেটা গরম হয়ে যায়। নিভিয়ে দিয়ে রজত কয়েক মুহূর্ত বিমূঢ় হয়ে রইল! সে কি ভুল দেখছে? বাইরের কোনও ভিখিরি-টিখিরি এসে এরকম একটা বারোয়ারি বাড়ির সিঁড়ির নীচে আশ্রয় নেওয়া বিচিত্র কিছু নয়। কিন্তু রজতের মনে হল, এরকম অসাধারণ সুন্দরী সে আগে কখনও দেখেনি।

আবার লাইটার জ্বেলে রজত দেখল সেই রমণীটি সেইরকম একই ভঙ্গিতে চেয়ে আছে। রজতের দৃষ্টি বিভ্রম নয়। সত্যিই সে সুন্দরী। এবার তার কাছাকাছি অন্ধকার থেকে শোনা গেল ওঁয়া ওঁয়া করে একটা বাচ্চার কান্না।

রজত আর দাঁড়াল না। সে এ-বাড়ির ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামায় না। সিঁড়ির নীচে যে খুশি এসে আশ্রয় নিক, তাতে তার কী যায় আসে? আর দু-মাসের মধ্যেই সে এ-বাড়ির মালিককে একেবারে হতবাক করে দিয়ে নিঃশর্তে তার ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে যাবে।

রজত উঠে এল তিনতলায়। দাদা, বউদি তাদের দুই ছেলে মেয়ে, মা, একজন কাজের লোক, অথচ সব মিলিয়ে ঘর মাত্র আড়াইখানা। সবচেয়ে ছোট ঘরখানা রজতের। এই ঘরে জয়াকে আনা যায় না।

মোমবাতির আলোয় জামা-প্যান্ট ছেড়ে রজত বাথরুমে গিয়ে চোখে-মুখে জল দিল। কয়েকদিন ধরে বেশ জমপেশ করে গরম পড়ছে। বঙ্গোপসাগরের বাতাস আসছে না। এখন কালবৈশাখীর সময়, কিন্তু সেই ঝড়ও নিরুদ্দেশ।

নিজের ঘরে ফিরে রজত রাস্তার দিকের জানলাটা খুলে দিল। অন্ধকারের মধ্যেও লোকজনের চলাফেরার বিরাম নেই। একসময় এ-বাড়িটার সামনে অনেকখানি খোলা জায়গা ছিল। এখন ঘেঁষাঘেঁষি অনেক বাড়ি উঠে গেছে।

রজত ভুরু কুঁচকে ভাবল। অস্পষ্ট আলোয় দেখা ওই সুন্দরী রমণীটি কে? ঠিক যেন টিশিয়ানের আঁকা একটা ছবি। এমন এক সুন্দরী এলে সিঁড়ির নীচে বসে থাকবে কেন? কী গভীর কালো চোখে সে তাকিয়েছিল রজতের দিকে।

মোমবাতির আলোয় বই পড়া যায় না। টি.ভি. দেখা যাবে না। ক্যাসেট প্লেয়ারটিতে ব্যাটারি ভরা নেই। তাহলে এই সন্ধে সাড়ে সাতটায় তুমি আর কী করতে পারো?

রজত একটা সিগারেট ধরিয়ে শুয়ে পড়ল।

কয়েকদিন আগে এই ঘরের শিলিং থেকে হুড়মুড় করে বেশ বড় একটা চাঙর ভেঙে পড়েছিল। বেশ বিপজ্জনক ব্যাপার। ঘুমের মধ্যে আচমকা এরকম মাথায় এসে পড়তে পারে বলে রজত মশারি টাঙিয়ে শোয়। বাড়িওয়ালা তো কিছু করবে না। দাদাও এ-ফ্ল্যাট সারাবার জন্য একটা পয়সাও খরচ করতে রাজি নয়। চাকরি বদল করে দাদা সপরিবারে চলে যাচ্ছে ব্যাঙ্গালোরে আগামী মাসে। রজতও একটা সরকারি অ্যাপার্টমেন্ট পেয়ে যাচ্ছে আয়রন সাইড রোড়ে। খুব সুন্দর সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। মাকে নিয়ে সে ওখানে উঠে যাবে। তারপর জয়া আসবে।

সিঁড়ির নীচে একজন রহস্যময়ী বসে আছে। সঙ্গে একটা শিশু।

কিছুক্ষণ বাদে রজত খেয়াল করল, ঘুরে ফিরে ওই রমণীটির মুখখানা বারবার ভেসে উঠছে তার চোখের সামনে। সে জয়ার কথা ভাবছে না। এই রহস্যটা ভাঙা দরকার।

একটা টর্চ নিয়ে নীচে নামার জন্য তৈরি হতেই আলো জ্বলে উঠল। যাক ভালোই হল, টর্চ নিয়ে নীচে নামতে গেলে মা হয়তো কৌতূহলী হয়ে কারণটা জানতে চাইতেন। এখন রজত সিগারেট কেনার ছুতো করে যেতে পারে।

উজ্জ্বল আলোয় রহস্য অনেকটা কেটে যেতে বাধ্য। সেই রমণীটি এখনও সেখানে বসে আছে বটে, কিন্তু বিশেষ বিস্ময়ের কিছু নেই। লাইটারের শিখায় শুধু ওর মুখখানি দেখতে পেয়েছিল। এখন চড়া আলোয় বোঝা গেল, সে ভদ্দরলোক শ্রেণির নয়, লাল ফুল ছাপ শাড়ি পরা একজন দেহাতি স্ত্রীলোক। ঈষৎ পাশ ফিরে বসে সে বাচ্চাটিকে স্তন পান করাচ্ছে। রজতের পায়ের শব্দ শুনে সে একবার শুধু মুখ ফিরিয়ে তাকাল।

রজত একেবারে ভুলে দেখেনি। যে-কোনও বিচারেই মেয়েটাকে যথেষ্ট রূপসী বলা যায়। টানা-টানা চোখ, টিকোলো নাক, প্রশস্ত কপাল, সম্পূর্ণ ভরা নদীর মতন স্বাস্থ্য। শুধু মুখে একটা ভয় মাখানো সারল্যের জন্যই গ্রাম্যতার ছাপটা বোঝা যায়। এই নারী এখনও শহর চেনে না।

রজত আর বেশি কৌতূহল দেখাল না। বাড়ি থেকে বেরিয়ে সিগারেট কিনতে গেল। ফিরে আসার সময় সে আবার স্ত্রীলোকটির দিকে একঝলক না তাকিয়ে পারল না। তার মনে হল, গ্রাম কিংবা পাহাড় অঞ্চলের এই স্বাস্থ্যবতী তরুণীটি কেন শহরে এসে সিঁড়ির তলায় এমনভাবে বসে থাকে? প্রকৃতি কি তার সন্তান সন্ততিদের ধরে রাখতে পারে না?

রাত্তিরবেলা জয়ার মুখের পাশাপাশি এ মুখখানা রজত দেখল অনেকবার।

পরদিন রহস্যটা একেবারেই পরিষ্কার হয়ে গেল।

ষাট-সত্তর বছর আগে কলকাতার বড়লোক শ্রেণি বিভিন্ন জায়গায় বাড়ি বানিয়ে ভাড়া দেওয়াটা একটা লাভজনক ব্যাবসা মনে করত। তখন এত রকম ট্যাকসের ঝামেলা ছিল না। তখন এইসব ফ্ল্যাট বাড়ির ব্যবস্থাও বেশ ভালো ছিল, ঝি, চাকর, দারোয়ানদের আলাদা ঘরের ব্যবস্থা ছিল, ছেলেমেয়েদের খেলবার সেই জায়গাটিতে এখন গাড়ি সারাবার কারখানা হয়েছে।

এ-বাড়ির দারোয়ান ছিল হীরালাল। বয়স তার বেশি নয়, চল্লিশের নীচেই হবে, কিন্তু প্রায়ই অসুখে ভুগত সে। একবার ছুটি নিয়ে দেশে গেল, ছ'মাসের মধ্যে আর ফিরল না। এ-বাড়ির মালিক তার ঘরখানাও ভাড়া দিয়ে দিল একজন দোকানদারকে। হীরালাল ফিরলে তাকে জানানো হল যে তার আর চাকরি নেই।

হীরালাল তবু গেল না। সে বিনা মাইনের দারোয়ানগিরি চালিয়ে যেতে লাগল। শুয়ে থাকে তারই আগেকার কোয়ার্টারের বারান্দায়। তার অসুখও সারেনি। চেহারাটা শুকিয়ে অর্ধেক হয়ে গেছে, সবসময় খকখক করে কাশে। যেহেতু অন্য কোনও দারোয়ান আর নিয়োগ করা হয়নি বাড়ির মালিক হীরালালকেও মাইনে দেবে না। ভাড়াটেরা দয়া করে প্রত্যেকে ওকে মাসে পনেরো-কুড়িটাকা করে

দেয়। কারুর বাড়িতে রান্না বেশি হলে হীরালালকে ডাকে।

সেই হীরালাল আবার দেশে গিয়ে নিয়ে এসেছে তার বউ আর দুটি বাচ্চাকে। বউকে তো আর বারান্দায় বেআব্রু অবস্থায় রাখা যায় না। পুরোনো বাড়ি, সিঁড়ির নীচে অনেকটা জায়গা প্রায় একটা ছোটখাটো ঘরের মতন।

আর তো সবই ঠিক ছিল, কিন্তু রুগ্ন, বুড়োটে চেহারার হীরালালের এমন স্বাস্থ্যবতী যুবতী বউ থাকবে কেন? এটা ঠিক যেন মেনে নেওয়া যায় না। যোগ্য প্রহরী না থাকলে এরকম যৌবন অনেক বিপদ ডেকে আনতে পারে।

এ-বাড়ির ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামায় না রজত। সে সকালে বেরিয়ে যায়, সন্ধের পর ফিরে নিজের ঘরে বসে থাকে। অন্য ফ্ল্যাটের লোকজনদের সঙ্গে মেলামেশা করে না কখনও। সুতরাং অন্য ভাড়াটেরা হীরালালের বউকে নিয়ে কী আলোচনা করছে তা রজতের জানার কথা নয়।

যাওয়া আসার পথে সে শুধু মেয়েটিকে একবার করে দেখে। দিনেরবেলা মেয়েটি প্রায় অধিকাংশ সময় মাথায় ঘোমটা দিয়ে থাকে। সিঁড়ির তলায় ওই কুঠুরি থেকে ওকে কখনও বেরুতেও দেখে না রজত। অমন যৌবন নিয়েও অন্য কোনও পুরুষকে প্রলুব্ধ করার বিন্দুমাত্র চেষ্টা নেই তার।

মেয়েটিকে দেখে রজত প্রত্যেকবার এক ধরনের বিরক্ত বোধ করে। চোখের সামনে একটা কিছু অন্যায় দেখেও যখন প্রতিকার করা যায় না, তখন মানুষের মনে এরকম আত্ম-বিরক্তি আসে। এই রমণীটি দিনের-পর-দিন ওই অন্ধকার সিঁড়ির তলায় জীবন কাটাবে। ওর সুন্দর স্বাস্থ্যটি তা হলে অচিরেই নষ্ট হয়ে যাবে। এটা একটা অন্যায় না? কিন্তু এ বিষয়ে রজতের কোনও কথা বলার উপায় নেই।

প্রথম দিন লাইটারের কাঁপা-কাঁপা আলোয় মেয়েটির মুখখানা দেখে রজতের যে অসাধারণ সুন্দর মনে হয়েছিল, সে ছবিটি তার চোখ থেকে এখনও মুছে যায়নি। দিনের আলোতেও সে সুন্দর। একদিন মেয়েটিকে উঠে দাঁড়ানো অবস্থায় সে দেখল, রজত একবার চোখ ফিরিয়ে নিয়েও আবার তাকাল। মেয়েটি বেশ দীর্ঘাঙ্গী, তার কোমরের নিখুঁত ভাঁজ দেখলে কোনারকের ভাস্কর্যের কথা মনে পড়ে। এর বয়স তিরিশ-বত্রিশের কম নিশ্চয়ই নয়। পরিপূর্ণ রমণী বোধহয় একেই বলা যায়।

হীরালালের বউয়ের নাম জানে না রজত। মনে-মনে ওর নাম দিয়েছে শঙ্করী। আপনে না পায় ঠাঁই শঙ্করাকে ডাকে এরকম একটা প্রবাদ আছে না।

এক-একসময় রজতের মনে একটা অপরোধবোধও জাগে। সে যে প্রত্যেকদিন এ শঙ্করীকে দুবার করে দেখে যায়, তার মধ্যে কি লোভ আছে? জয়াকে সে ভালোবাসে, অথচ লোভ করছে অন্য রমণীর শরীর?

তারপর সে নিজেকে বোঝায়, লোভ নয়, সে দেখছে সৌন্দর্য। জয়াকে ভালোবাসে বলে সে সারাজীবন অন্য মেয়েদের দিকে তাকাতে পারবে না, এর কি কোনও মানে আছে? জয়াও তো কত অন্য পুরুষের সঙ্গে কথা বলে, হাসে, গল্প করে। এমনকি ওদের পাড়ার অবনী নামে যে ছেলেটিকে জয়া প্রত্যাখ্যান করেছে একবার, তার সঙ্গে জয়া কথা বলা বন্ধ করেনি। অবনীর যাতে মনে আঘাত না লাগে, সেইজন্য জয়া রজতের পাশাপাশিও হাঁটে না।

রেডিয়ো স্টেশনে জয়ার একটা প্রোগ্রাম রেকর্ডিং ছিল, রজত ওর জন্য অপেক্ষা করছিল বাইরে। জয়া বেরিয়ে আসার পর একসঙ্গে দুজন হাঁটতে লাগল রাজভবনের পাশ দিয়ে।

সন্ধের পর এদিকটা বেশ নিরালা থাকে। ইচ্ছে করলে হাতও ধরা যায়। আকাশের গুমোট দশা কেটেছে। প্রবল হাওয়া দিচ্ছে আজ, বারবার উড়ে যাচ্ছে জয়ার শাঁড়ির আঁচল।

এক-একবার রজতের চোখ চলে যাচ্ছে জয়ার নগ্ন কোমরের দিকে। জয়াকেও অনেকেই সুন্দরী বলে, তবে তেমন লম্বা নয়। জয়ার শরীর থেকে আসছে একটা সুন্দর গন্ধ।

তবু রজতের বারবার মনে পড়ে যাচ্ছে শঙ্করীর কোমরের খাঁজ ও সুঠাম গড়ন। হীরালালদের বাড়ি দুমকা জেলায়, ওর স্ত্রীর ঠিক যেন পাথর কাটা মূর্তির মতন শরীর।

জয়ার সঙ্গে শঙ্করীর কোনও তুলনাই চলে না। জয়ার সৌন্দর্য শুধু তার শরীরে নয়, তার ব্যক্তিত্বেও। তার ব্যবহার, তার হাসি, তার গানের গলা, তার নম্রতা, যে-কোনও একটা কথা অর্ধেকটা শুনেই বুঝে ফেলার ক্ষমতা এইসব মিলিয়েই তো জয়া। সেই জয়াকে ভালোবাসে রজত। জয়া যদি এর দ্বিগুণ সুন্দরী হত, অথচ বোকা হত, তাহলে সেই জয়াকে কিছুতেই রজত বিয়ে করতে রাজি হত না।

তবু জয়ার কোমরের দিকে বারবার চেয়ে রজত শঙ্করীর কোমরের সঙ্গে তুলনা না দিয়ে পারছে না। এই অদ্ভুত ইচ্ছেটার জন্য তার নিজের গালে চড় মারতেও ইচ্ছে করছে।

এই কথাটা জয়াকে বলা যাবে না। জয়ার সঙ্গে সে আকাশ-পাতাল কত রকম বিষয় নিয়ে গল্প করে, কোনও কিছুই গোপন থাকে না, কিন্তু হীরালালের বউয়ের প্রসঙ্গটা একবারও তোলা হয়নি। দুজনের কোমরের তুলনাটা মনে আসার পর এখন কেমন যেন সংকোচ হচ্ছে। আর বলা হল না। তাহলে, পৃথিবীতে সবচেয়ে যে কাছের মানুষ তার কাছেও সব কথা খুলে বলা যায় না।

মাসখানেক হয়ে গেল শঙ্করী এসেছে, এখন সে আর রজতকে দেখে তেমন লজ্জা পায় না। এক-একসময় ঘোমটা খুলে রাখে। যদিও রজত ওর সঙ্গে এ পর্যন্ত একটাও কথা বলেনি, তবু দুজনের চোখের দৃষ্টিতে খানিকটা পরিচয়ের ভাব ফুটে ওঠে।

সিঁড়ির নীচেই শঙ্করী রান্না করে। ওখানে প্রায় একটা ছোটখাটো সংসার পেতে ফেলেছে। তার দুটি সন্তানের মধ্যে একটির বয়েস বছরছয়েক, অন্যটি দেড়-দু-বছরের বেশি না। বাচ্চা দুটো সামনের চাতালে খেলা করতে যায়। একদিন শঙ্করীকে পেছনের উঠোনের খোলা কল থেকে স্নান করে আসতে দেখেছিল রজত। কিন্তু সে শঙ্করীর ভেজা শরীরের দিকে একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিল দ্বিতীয়বার তাকায়নি।

রজত নিজেকে পরীক্ষা করে। নিজের কাছে সে উত্তীর্ণ হয়ে যায়। শঙ্করীর শরীরের দিকে সে লোভের দৃষ্টি দেয় না। সে জয়াকে ভালোবাসে, অন্য নারীর প্রতি তার কোনও আকর্ষণ এখনও পর্যন্ত নেই। তবে, শঙ্করীকে দিনে দু-বার অন্তত দেখার ইচ্ছেটা তার আছে ঠিকই। এরকম কোনও ভাস্কর্যের দিকেও সে বারবার তাকাত নিশ্চয়ই।

শঙ্করীও বোধহয় বুঝতে পারে রজতের দৃষ্টির মানে। তাই সে আর অযথা লজ্জা পায় না।

কোনওদিন হয়তো রজত ওখান দিয়ে যাওয়ার সময় হীরালালকে দেখতে পায়। দেওয়াল ঠেস দিয়ে পা ছড়িয়ে হীরালাল ছোট ছেলেটাকে কোলে নিয়ে আদর করে। আর মাঝে-মাঝে কাশে। কাশির অসুখটা আর তার গেলই না।

রজতকে দেখলে হীরালাল ডেকে কিছু না কিছু কথা বলার চেষ্টা করে। রজতরা ছেড়ে দিলে ওই ফ্ল্যাটটায় হীরালাল অন্য কোনও ভাড়াটে জোগাড় করে আনবে। তাতে তার কিছু টাকা পাওয়ার আশা আছে। সেই রোজগারের সম্ভাবনায় সে খুব উৎসাহিত। কিন্তু রজতের দাদা এর মধ্যে মত বদলে ফেলেছে। সে ব্যাঙ্গালোরে বদলি হলেও এই ফ্ল্যাটের দখল ছাড়বে না। নিতান্ত নির্বোধ ছাড়া কলকাতা শহরে মাত্র দুশো পঁচিশ টাকা ভাড়ায় ফ্ল্যাট কেউ কি ছাড়ে? দাদা এখানে তার শ্যালককে ঢুকিয়ে দিয়ে যাবে।

রজত সে কথা এখন ভাঙে না হীরালালকে আশায় রাখে। সে সময় শঙ্করী ভেতর দিকে সরে যায় না, রজতের দিকে সরাসরি তাকায়। এর মধ্যে একটু রোগা হয়েছে শঙ্করী, কিন্তু তার রূপ ঝরেনি। সে যে কত সুন্দর, তা কি সে নিজে জানে? হীরালালের সেরকম কোনও বোধ আছে বলে মনেই হয় না।

এই সিঁড়ির নীচের গহ্বরে আরও দু-পাঁচবছর থাকলে, আরও দু-তিনটে বাচ্চা হয়ে গেলে

শঙ্করীও হয়ে যাবে অতি সাধারণ। তখন অবশ্য রজত আর তাকে দেখতে আসবে না।

একদিন রজত একটা সাংঘাতিক দৃশ্য দেখে ফেলল।

সেটা অফিসের দিন হলেও রজত বেরোয়নি। শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছিল বলে সে শুয়েছিল প্রায় সারা দুপুর। গলায় বেশ ব্যথা, সিগারেট খাওয়া উচিত না, সে সিগারেট রাখেনি নিজের কাছে, কিন্তু এক সময় আর পারা গেল না।

তখন বেলা সাড়ে তিনটে। এ-বাড়ির ছেলেমেয়েরা স্কুল থেকে ফেরেনি, বাড়ি একেবারে নিঃসাড়। রবারের চটি পরে নেমে আসছিল রজত। পাজামার ওপর গেঞ্জি পরা, অবিন্যস্ত চুল, সে বেশ অন্যমনস্ক ছিল, হঠাৎ এক তলার কাছাকাছি এসে সে থমকে গেল।

রেলিং-এর ফাঁক দিয়ে সিঁড়ির নীচের জায়গাটা দেখা যাচ্ছে। শঙ্করীর বুকে শাড়ি নেই। ব্লাউজ খোলা, এক হাত দিয়ে ধরে আছে সে নিজের একটি খোলা স্তন।

রজত প্রথমে নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারেনি। এটা কী ব্যাপার হচ্ছে নিজেই নিজেকে আদর করছে শঙ্করী? ওই স্তন, অমন সুগোল, মসৃণ, ঘুঘু পাখির মতো স্তন সত্যিকারের কোন নারীর হয়?

রজতের সমস্ত শরীর ঝিমঝিম করে উঠল! এই প্রথম সে যেন কোনও নারীর নগ্ন বুক দেখছে। তা ঠিক নয়। আগে সে দেখেছে কয়েকবার, কিন্তু আগেকার সব অভিজ্ঞতা এই বুকের কাছে তুচ্ছ।

শঙ্করী একহাতে নিজের একটি স্তন চেপে ধরেছে, তারপর সে অন্য হাতে একটি পেতলের বাটি এনে তার নীচে রাখল। ফোঁটা-ফোঁটা করে পড়তে লাগল দুধ।

এর আগে রজত দু-একবার দেখতে পেয়েছে যে শঙ্করী তার ছোটছেলেটাকে দুধ খাওয়াচ্ছে। তখন সে দেওয়ালের দিকে ফিরে বসে, ব্লাউজ খোলা থাকলেও শাড়ি দিয়ে এমন ঢাকাঢুকি করা থাকে বলে বুক দেখা যায় না। কিন্তু আজ পুরো বুক খুলে সে বাটিতে স্তন্য দুধ রাখছে কেন?

রজত দাঁড়িয়ে আছে প্রায় দু-মিনিট, তার সারা শরীর ঝাঁঝাঁ করছে, আজ সে দেখছে পুরোপুরি লোভীর মতন। ওই অপরূপ স্তনের দিকে তাকিয়ে শুধু সৌন্দর্য দর্শন নয়, সে ভোগ করছে যৌন রোমাঞ্চ। তার একবার মনে পড়ল জয়ার কথা। তবু সে সরে যেতে পারছে না। সে হেরে গেছে।

মুখখানা নীচু করে আছে শঙ্করী। তার একদিকে গাল, চিবুক, তার স্তনের ওপর আঙুল, সব মিলিয়ে একটা অবর্ণনীয় চিত্র, কোনও ছবিতেও এরকম আঁকা দেখেনি রজত।

ওপর তলায় একটা দরজা খোলার শব্দে রজত আবার কেঁপে উঠল। কেউ এসে পড়লে তাকে এখানে চোরের মতন দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ফেলবে। হ্যাঁ, অবিকল চোরের মতন।

রজত এবার জুতোর শব্দ করে তরতরিয়ে নেমে গেল, নীচে গিয়ে এই প্রথম সে শঙ্করীর দিকে চাইল না। ছুটে বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে।

সিগারেটের দোকানে গিয়ে প্যাকেটটা নিতে গিয়ে সে টের পেল, তখনও তার হাত কাঁপছে।

গেঞ্জি গায় দিয়ে তো রজত রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে পারবে না। তাকে বাড়ি ফিরতেই হবে। তবু বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে সে একটা সিগারেট শেষ করল।

ভেতরে ঢুকেও সে আর সিঁড়ির নীচের দিকে তাকাবে না ঠিক করেছিল, কিন্তু একটা শব্দ শুনে চোখ ঠিক চলে গেল সেদিকে।

শঙ্করী একটা পাথরের ওপর নোড়া দিয়ে কী যেন বাটছে। মনে হয় কোনও শেকড়বাকড়। পাথরের ওপরটা সাদা হয়ে গেছে। শঙ্করী তার ওপর আবার পেতলের বাটি থেকে একটু দুধ

ঢেলে দিল।

এখন শঙ্করীর ব্লাউজ বোতাম-আঁটা। শাড়ি ভালো করে বুকে জড়ানো, তবু যেন রজত আগেকার দৃশ্যটাই দেখছে। সে ওপরে উঠতে পারছে না।

ঘাড় ফিরিয়ে শঙ্করী দেখল রজতকে। লজ্জাভাবে হাসল।

এর আগে কোনওদিন কথা বলেনি রজত, আজ হঠাৎ মুখ থেকে বেরিয়ে এল একটা প্রশ্ন। ওটা কী করছ?

শঙ্করী ফিসফিসে গলায় বলল, দাওয়াই?

রজত আবার জিগ্যেস করল, কীসের দাওয়াই।

শঙ্করী বললে, খাঁসিকা দাওয়াই!

রজত বুঝল, স্বামীর জন্য কাশির ওষুধ বানাচ্ছে শঙ্করী। এই ওষুধের জন্য দুধ লাগে। এমনি দুধ কিনতে পারে না বলেই কি শঙ্করী বুকের দুধ মেশাচ্ছে? না, স্তনদুগ্ধই এই ওষুধের অনুপান?

রজতের মনে হল, আহা, আমি যদি হীরালাল হতাম!

এক মুহূর্তের জন্য এরকম মনে হওয়া। এর কোনও মূল্য নেই। ট্রেনে যেতে-যেতে কোনও একটা ছোট্ট, ছিমছাম স্টেশন দেখলে ইচ্ছে হয়, সারাজীবন এরকম একটা জায়গায় স্টেশনমাস্টার হয়ে কাটিয়ে দিলে বেশ হত। কিংবা মোষের পিঠে চড়ে কোনও সাঁওতাল বালককে নদী পার হতে দেখলে, মনে হয়, আহা, আমার জীবনটা ওরকম হল না কেন? গ্রাম্য রথের মেলায় কাচের চুড়িওয়ালাকে দেখলেও এরকম মনে হয়। এই সবই বিলাসিতা। এরকম জীবন সত্যিই আমাদের দিলে আমরা নিতাম না।

জয়াকে যে ভালোবাসে, সেই রজত মোটেই হীরালালের স্ত্রীর স্তনে মুখ দিতে চায় না।

শঙ্করী পাথরের ওপর এক মনে ঘষতে লাগল সেই স্তন্য মেশানো শেকড়, সেদিকে চুম্বকের মতন দৃষ্টি আটকে গেছে রজতের। প্রায় জোর করেই যেন নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সে উঠে গেল ওপরে।

কিন্তু সারা বিকেল, সন্ধে সে বিদ্যুৎ ঝলকের মতন বারবার দেখতে লাগল শঙ্করীর নিজের স্তনে নিজের হাত দেওয়ার দৃশ্য।

পরদিন হীরালালের সঙ্গে দেখা দরজার বাইরে। ফ্ল্যাটটার ব্যাপারে সে খুবই আগ্রহী। রজত তাকে তার দাদার সঙ্গে ভজিয়ে দিতে পারলে বাঁচে। রজত নিজে শিগগিরই চলে যাচ্ছে, তার প্রায় সব ঠিক।

কথা বলার সময় সে লক্ষ করল, হীরালাল একবারও কাশছে না। স্ত্রীর নিজের হাতে তৈরি ওষুধ খেয়ে ওর কাশি ম্যাজিকের মতন সেরে গেল? কী সেই আশ্চর্য শিকড়? কিন্তু এটা জিগ্যেস করা যায় না। রজত যে শঙ্করীর ওষুধ বানাবার প্রক্রিয়াটা দেখে ফেলেছে, এটা জানাতেই তার লজ্জা লাগবে।

জয়ার সঙ্গে সন্ধে সাড়ে ছ'টায় গঙ্গার ধারে রেস্তোরাঁটার সামনে দেখা করার কথা। আজও শরীরটা ভালো নেই রজতের, বেশ জ্বর-জ্বর ভাব, আজ না গেলেই ভালো হয়। কিন্তু জয়াকে কিছুতেই ফোনে ধরা গেল না সারাদিন। কোনও খবর দিতে পারলে জয়া ওখানে দাঁড়িয়ে থাকবে। একা-একা ওখানে দাঁড়ানো কোনও মেয়ের পক্ষে মোটেই ভালো নয়।

এক-একদিন কোনও কিছুই ঠিকঠাক হয় না। গঙ্গার ধারের রেস্তোরাঁটার আজ এত অসম্ভব ভিড় কেন? বসবার জায়গা তো নেই-ই, সামনে বেশ কিছু নারী-পুরুষ অপেক্ষা করছে। রজত আর জয়া দুজনেই এসেছে অফিস থেকে, বেশ খিদে পেয়ে গেছে, এখানে বসবে বলে আজ টিফিনও

খায়নি। বাইরের ভেলপুরি কিংবা আলুর চপ জয়া একেবারেই খেতে চায় না। খাওয়ার ব্যাপারে সে খুঁতখুঁতে।

ওরা একটু দূরে সরে গিয়ে একটা রেলিং ধরে দাঁড়াল। এর মধ্যে আবার বৃষ্টি পড়তে লাগল গুঁড়িগুঁড়ি। জয়া ছাতা খুলে বলল, ভালোই হল, কাছাকাছি লোক থাকবে না। যা ভিড় হয় আজকাল এখানে!

এক ছাতার নীচে দুজনে বেশ ঘনিষ্ঠ হওয়া যায়। একটা ল্যাম্প পোস্টের আলো তির্যক হয়ে এসে পড়েছে জয়ার শরীরে। রজতের ডান বাহু ছুঁয়ে রইল জয়ার বুক, জয়া সরে গেল না।

রজতের হঠাৎ মনে পড়ল, সে আজও জয়ার নগ্ন বুক দেখেনি, কিন্তু অন্য একজনের দেখেছে। সে জয়ার বুকের দিকে তাকাল। একটুখানি আভাস। সে যদি জয়াকে বলে, তোমার ব্লাউজটা খুলে একবার দেখাবে? জয়া অসম্ভব রাগ করবে। জয়ার সম্ভ্রমবোধ খুব বেশি। এ পর্যন্ত মাত্র গোটাপাঁচেক চুমু খেয়েছে রজত। কিন্তু জয়া তার সঙ্গে কোনও নির্জন ঘরে বেশিক্ষণ থাকতে চায় না।

শঙ্করীর বুকের সঙ্গে জয়ার বুকের তুলনা করতে চায় কেন রজত? এটা তার পাগলামি নয়? আর ঠিক পাঁচদিন বাদে সে নতুন ফ্ল্যাটে চলে যাবে, শঙ্করীকে সে আর কোনওদিন দেখবে না। সিঁড়ির ওপরে দাঁড়িয়ে ওইরকম দৃশ্য জীবনে এক আধবারই মানুষ দেখে। কেউ-কেউ দেখেই না। শেকড়টা বাটছিল শঙ্করী, তার নাম জানা হবে না। কোনওদিন।

তবু, শঙ্করীর সেই নিজের বুকে হাত রাখা, সেই দৃশ্য অন্ধকার নদীর ওপর দুলছে। রজত দাঁড়িয়ে আছে জয়ার পাশে। সে দেখেছে সেই দৃশ্য, এটা যেন সহ্য করা যায় না। এখন জয়া নিজের বুক খুলে দেখালে।...কিন্তু তা সম্ভব নয়।

জয়া জিগ্যেস করল, বন্ধুদের জন্য একটা হাউজ ওয়ার্মিং পার্টি দিতে হবে না? অনেকেই তোমাকে ধরবে।

রজত বলল, আমাদের রেজিস্ট্রি হয়ে যাক, তারপর একসঙ্গে...

জয়া একটু উদ্বিগ্নভাবে বলল, তুমি কাশছ? খুব কাশি হয়েছে দেখছি...ওষুধ খেয়েছ কিছু?

রজত কোনও উত্তর দিতে পারল না। মুখটা ফিরিয়ে নিল।

কিছু-কিছু কথা সারা জীবনেও জয়াকে জানানো যাবে না।



শিকার কাহিনি

মেয়েটিকে দেখলেই বোঝা যায়, সে আগে কখনও কলকাতায় আসেনি।

হাওড়া স্টেশনে সকাল পৌনে দশটায় ভিড়ের মধ্যে সে স্পষ্টতই একা। একটা হলদে ডুরে তাঁতের শাড়ি পরা। কপালে লাল টিপ। সিঁথিতে অনেকখানি সিঁদুর। তার বয়েসে তেইশ-চব্বিশের বেশি না। পাতলা দোহারা। একটু বেশি লম্বা বলে হিলহিলে ভাব আছে। তার চোখে প্রতিফলিত হচ্ছে প্রথম দেখা শহরের ছবি!

অফিস টাইমে সবাই ব্যস্ত। হুড়োহুড়িতে মত্ত। এমনসময় সিঁথিতে অতখানি সিঁদুর দেওয়া কোনও রমণীকে মানায় না। সে জনস্রোতে ধাক্কা খাচ্ছে। কেউ-কেউ ইচ্ছে করে তাঁকে খোঁচা মারছে। সে স্রোতের ফুলের মতো দুলছে এদিক-ওদিক।

তার হাতে একটা ছোট চটের থলি, অন্য হাতে একটি পোস্ট কার্ড।

সে একজন মহিলার সামনে দাঁড়িয়ে ব্যাকুলভাবে বলছে, ও দিদি, ও দিদি!

সবাই কাঁটায়-কাঁটায় সময় ধরে ট্রেনে চাপে। হাওড়ায় নেমেই ছুটে গিয়ে বাসের জন্য লাইনে দাঁড়াতে হয়। নইলে অফিসে লেট মার্ক পড়ে। এমনকী কারুর একটা বাজে হাতে লেখা পোস্টকার্ড পড়ার সময় আছে?

তবু কেউ-কেউ দাঁড়ায়। সমস্ত শরীরটা অস্থিরভাবে দুললেও সহানুভূতির সঙ্গে মেয়েটির কথা শুনতে চায়। শুনে, অসহায় ভাব করে।

পোস্টকার্ডটায় এক-পিঠে একটা ঠিকানা লেখা আছে। তারামা কেমিক্যাল ওয়ার্কস। ৩।২, গণেশ সাহা লেন। কলিকাতা।

এরকম একটা অজ্ঞাত রাস্তা কে চিনবে? পোস্টাল জোন পর্যন্ত লেখা নেই।

একজন মধ্যবয়স্কা, ফরসা, গালভারি চেহারার মহিলা সমস পোস্টকার্ডটি পড়লেন। তারপর জিগ্যেস করলেন, তুমি একলা এসেছ? কলকাতায় তোমার আর কেউ চেনা নেই?

মেয়েটি দু-দিকে মাথা নাড়ল।

মহিলা বললেন, এরকম হুট করে কি কেউ আসে? কলকাতা শহর...বড় কঠিন জায়গা।

মহিলাটি বেশ জোরে জোরে কথা বলছেন, তাঁর চেহারার একটা আকর্ষণ আছে। তাই তাঁকে ঘিরে ছোটোখাটো একটা ভিড় জমে যায়।

মহিলাটি অন্যদের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনারা কেউ গণেশ সাহা লেন চেনেন?

একজন বললে, ভবানীপুরে বোধহয়। আর-একজন বলল, বাগবাজারে। আর-একজন বলল, বড়বাজারে গণেশ দাশ লেন আছে একটা। আর-একজন বলল, কলকাতাতে নয়, তারামা কেমিক্যাল ওয়ার্কস তো দক্ষিণেশ্বরে।

মহিলাটি রাগ-রাগ চোখ করে অন্যদের দিকে তাকিয়ে বললেন, কেউ এই মেয়েটিকে পৌঁছে দিতে পারবেন?

অমনি ভিড় পাতলা হয়ে গেল।

ফরসা মহিলাটি এই পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরের বউটিকে বললেন, আমার হাতে তো একদম সময় নেই ভাই। না হলে আমি একটা কিছু ব্যবস্থা করতাম। তুমি বরং পুলিশের কাছে গিয়ে খোঁজ করো।

মহিলাটি পোস্টকার্ডটি ফেরত দিয়ে এগিয়ে গেলেন। একটুখানি গিয়ে আবার পেছন ফিরে বললেন, দাঁড়িয়ে রইলে কেন, যাও।

মেয়েটি তবু মূর্তির মতন দাঁড়িয়ে রইল। পুলিশ শব্দটি তাকে কাঁপিয়ে দিয়েছে। জন্ম থেকেই সে জেনে এসেছে, পুলিশের কাছাকাছি যেতে নেই। প্রজাপতি যেমন চড়াইপাখির কাছে যায় না, চড়াইপাখি তেমন বেড়ালের কাছে যায় না।

কলকাতার পুলিশ কি আর অন্যরকম হবে?

একটা ট্রেন পৌঁছে গেছে। পরবর্তী ট্রেন একটু পরে আসবে। মাঝখানের সময়টায় প্লাটফর্ম একটু ফাঁকা হয়।

তখন পাজামার ওপর নীল শার্ট পরা একটা লোক, চিমসে চেহারা, মুখখানা ছুঁচোলো ধরনের, একটা সিগারেট টানতে-টানতে তার পাশে এসে দাঁড়িয়ে জিগ্যেস করল, তুমি বিষ্টুপদকে খুঁজতে এসেছ?

মেয়েটি আবার কেঁপে উঠল। কেউ যেন তার হাতে চাঁদ গুঁজে দিল এইমাত্র। এই লোকটা তার স্বামীকে চেনে।

লোকটি বলল, তুমি বিষ্টুদার বউ?

মেয়েটি এবার জোরে-জোরে মাথা নাড়ল।

লোকটি আবার বলল, তারা-মা কেমিকেলে বিষ্টু তো আমার সঙ্গেই কাজ করে। বিষ্টু বলছিল বটে, ছ'মাস বাড়ি ফেরা হয়নি। আমার বউটা নিশ্চয়ই খুব চিন্তা করছে। বিষ্টু গতহপ্তায় তোমাকে একটা চিঠি লিখেছে, তুমি পাওনি?

মেয়েটি বলল, কই, না তো!

লোকটি বলল, বিষ্টু কখনও বাড়ি ভাড়া করতে পারেনি, তাই তোমাকে এখানে আনার ব্যবস্থা করতে পারেনি। আমার সঙ্গেই থাকে। তা বলে তুমি হুট করে চলে এলে? কানের ফুল দুটো কীসের, রূপোর? হাতের লোহাটা সোনা দিয়ে বাঁধানো, না পেতলের? আরে দিদি, এইসব গয়না পরে কোনও মেয়েছেলে একা-একা কলকাতা শহরে আসে? এ কেমন জায়গা তা তো জানো না! পদে-পদে বিপদ? ভাগ্যিস, আমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। চলো!

মেয়েটি অসহায়ভাবে জিগ্যেস করল, কোথায় যাব? আপনি আমাকে আমার স্বামীর কাছে নিয়ে যাবেন?

লোকটি বলল, হাওড়ায় শালকেতে আমাদের জায়গা। তার পাশেই আমার বাড়িতে বিষ্টু থাকে। তোমাকে দেখে বিষ্টু একেবারে অবাক হয়ে যাবে! তুমি এমন ভাবে চলে এসেছ বলে বকুনিও দেবে তোমাকে। যাক গে, সে তোমরা বুঝবে!

লোকটির সঙ্গে এবার নিশ্চিন্তে এগোল মেয়েটি। তার স্বামী তাকে বকুনি দেয় তো দিক! সেও কম বকবে না। ছ'মাস আগে ওই একখানা পোস্টকার্ড এসেছিল তারপর মানুষটার আর কোনও পাত্তা নেই।

যেতে-যেতে লোকটি বলল, আমার নাম ঘনশ্যাম। বিষ্টু আমার কাছে সব কথা বলে। তোমার জন্য ওর খুব কষ্ট। তোমার নাম কী যেন! বিষ্টু বলেছে, ভুলে যাচ্ছি।

—সাবিত্রী। সাবিত্রী মাইতি।

—ও হ্যাঁ, সাবিত্রী। সকালে কিছু খেয়েছ? মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, খাওয়া হয়নি কিছু। সঙ্গে পয়সাকড়িও কিছু নেই নিশ্চিত। ছি, ছি, এভাবে কলকাতায় এসে পড়লে। আমার সঙ্গে দেখা না হলে কী বিপদেই যে পড়তে! নাও, একটু চা আর বিস্কুট খেয়ে নাও।

সাবিত্রীর চোখে জল এসে গেল। সারা রাস্তা সে ভয়ে-ভয়ে এসেছে ট্রেনেও দুটো লোক তাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছিল। তবু সে এসেছে বেপরোয়া হয়ে। এখন একজন মানুষের মুখে এসব সহৃদয় কথা শুনলে তার কান্না আসবে না?

চা ও একখানা নোনতা বিস্কুট খেয়ে ওরা বেরিয়ে এল স্টেশন থেকে। ভিড়ের জায়গাগুলো এড়িয়ে, পেছন দিকের ব্রিজের কাছে এসে একটা রিকশা ডাকল ঘনশ্যাম। সাবিত্রীকে আগে তাতে ওঠাল। তারপর সে রিকশায় পা দিতে যাবে, এমনসময় একটা ঘটনা ঘটল।

একটু দূর থেকে একজন হেঁড়ে গলায় ডাকল, অ্যাই লট্‌কা!

সেই ডাক শুনে চোখ বড়-বড় হয়ে গেল ঘনশ্যামের। মুখ ঘুরিয়ে আহ্বানকারীকে দেখতে পেয়েই সে এক মুহূর্ত দেরি করল না। পাঁই-পাঁই করে ছুট দিল প্রাণপণে। এঁকেবেঁকে ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেল কোথায়।

যে ডেকেছিল, তার পরনে একটা কালো রঙের প্যান্ট, ধূসর গেঞ্জি, গলায় একটা রুমাল বাঁধা। এক হাতে লোহার বালা, মাথার চুল তেল চকচকে। বেশ মজবুত শরীর।

সে কাছে এসে সাবিত্রীকে আপাদমস্তক দেখল, হুঁ! এই মেয়ে, তুমি ওর সঙ্গে কোথায় যাচ্ছিলে?

সাবিত্রীর বুক ঢিপঢিপ করছে। ওই লোকটা তার স্বামীর বন্ধু, তাকে তার স্বামীর কাছে পৌঁছে দেবে বলেছিল, তবু হঠাৎ পালাল কেন? এবার তার কী হবে?

সাবিত্রী বলল উনি আমাকে আমার স্বামীর কাছে নিয়ে যাচ্ছিলেন! ঘনশ্যামবাবু কোথায় গেলেন?

মজবুত চেহারার ছোকরাটি বলল, ঘনশ্যাম? সাত জন্মে ওর নাম ঘনশ্যাম নয়। ওর নাম লটকা। ও ব্যাটা তো একটা শেয়াল! প্ল্যাটফর্মে ঘুরঘুর করে! ও তোমাকে কোথাও পৌঁছে দেবে বলেছিল? হা-হা-হা-হা!

হাসি থামিয়ে সে বলল, ব্যাটাকে ধরতে পারলে মাথা গুঁড়িয়ে দিতুম। আমার টাকা মারার তাল! ওগো মেয়ে, ও তোমাকে খাবার মতলবে ছিল!

সাবিত্রী বলল, না, না, উনি আমার স্বামীকে চেনেন। নাম বললেন, এক সঙ্গে কাজ করেন!

—লটকা কাজ করে? ছোঁক-ছোঁক করা ছাড়া আর কোনও কাজ ও জানে? তোমার হাতে ওটা কী?

—আমার স্বামীর চিঠি।

—ওই লটকা ব্যাটা কোনও ফাঁকে উঁকি মেরে চিঠিখানা দেখে নিয়েছে। তাই থেকেই বানিয়েছে যে তোমার স্বামীকে চেনে। ছেঃ! ব্যাটাকে ধরা গেল না। দেখি, ঠিকানাটা দেখি—

পোস্টকার্ডটা হাতে নিয়ে উলটে-পালটে দেখে সে বলল, তারামা কেমিকেল! গণেশ সাহা লেন। শিবপুরে। আমাদের পাড়াতেই। দ্যাখা যাক, সেখানে তোমার মরদকে পাওয়া যায় কি না। সঙ্গে বসো!

এক লাফ দিয়ে রিকশায় উঠে বসে রিকশাওয়ালাকে বলল, এই ব্যাটা, জোরে ছুটবি! টিকিস-টিকিস করলে লাথি খাবি!

রিকশাটা ছুটতে শুরু করতেই মেয়েটি বলল, ভয় নেই। আমি তোমায় ভালো জায়গায় রাখব!

সাবিত্রী বলল, আমি আমার স্বামীর কাছে যাব।

তা তো যাবেই। ওই লোকটার হাতে পড়লে কোনওদিন পৌঁছতে পারতে না; সোজা তোমাকে আসল পাড়ায় নিয়ে গিয়ে তুলত।

—আমার স্বামীকে আপনি চেনেন?

—চিনি না। কিন্তু খুঁজে বার করতে কতক্ষণ। ঠিকানা যখন আছে। আজ না হয় কাল পাওয়া যাবে, কাল না হয় পরশু!

—আমি আজকেই যাব!

—যাবে, যাবে! ঠিক হয়ে বসো। কান্নাকাটি করো না কোনও লাভ নেই। তুমি সিগ্রেট খাবে?

—আমি খাই না!

ব্রিজ পার হওয়ার পরেই বৃষ্টি নামল। রিকশার ছাউনি তুলে দিতে হল। ছোকরাটি তখন তার একটা হাতে সাবিত্রীর কোমর বেষ্টন করল। তারপর বেশ ভাব দিয়ে বলল, গ্রাম থেকে চলে এসেছ, ভালো। গ্রামে কি মানুষ থাকে? যত সব ক্যাংলা পার্টি! আমিও চলে এসেছি।

—একটু সরে বসুন। গায়ে হাত দিচ্ছেন কেন?

—তবে কি তোমার বুকে হাত দেব, সোনা!

ঠিক এইসময় এমনভাবে একটা জিপ এসে থামল সামনে যে রিকশটা উলটে যেত আর একটু হলে।

একজন পুলিশ অফিসার ঝট জিপ থেকে নেমেই রিভলভার তুলে বললেন, এই ছোটেলাল, নাব নাব। এদিক-ওদিক করলেই কিন্তু খোপরি উড়িয়ে দেব।

জিপ থেকে আরও একজন কনস্টেবলও নেমেছে। তার হাতে বেঁটে লাঠি।

ছোটেলাল একবার কোমরের কাছে লুকনো ছুরিতে হাত বুলোল, কিন্তু বার করল না। এই রজত দারোগা কতটা হিংস্র সে ভালো করেই জানে, সত্যি-সত্যি গুলি চালিয়ে দিতে পারে।

দু-মাস একে কোনও টাকা দেওয়া হয়নি। রোজগারপাতি যে এখন কম, তা এই দারোগা বুঝবে না।

দারোগাটির পেটানো চেহারা, চওড়া বুক, সরু মধ্যদেশ। চোখ দুটি অত্যুজ্জ্বল। সে বলল, হারামজাদা, আমার হাত এড়িয়ে পালাবি ক'দিন? আমি ইচ্ছে করলে ধরতে পারিনি, এমন কালপিট জন্মায়নি আজও! সঙ্গে আবার ভালো চেহারার মেয়ে জুটিয়েছিস! দিন-দুপুরে মেয়ে নিয়ে রিকশায় ঘুরছিস, তোর পাখা গজিয়েছে দেখছি!

কনস্টেবলটিকে সে বলল, ওর হাত দুটো পিছ মোড়া করে বাঁধো। দেখো, সাবধান, এটা একেবারে নেকড়ের মতন শয়তান। ছুরি থাকে, বার করে নাও আগে।

ছোটেলাল বলল, বড়বাবু, এই মেয়েছেলেটি ঠিকানা খুঁজে পাচ্ছিল না, তাই ওকে পৌঁছে দিচ্ছিলুম!

দারোগাটি মাথা ঝাঁকিয়ে-ঝাঁকিয়ে প্রবল জোরে হেসে উঠল।

তারপর বললে, তুই পৌঁছে দিচ্ছিলি? অ্যাঁ? কেন, তোর বুঝি খিদে নেই?

ছোটেলাল বললে, বড়বাবু, আপনি তবে ওকে নিন। আমাকে ছেড়ে দিন এবারটির মতন।

দারোগা গর্জন করে বলে উঠল, চোপ! ওর কথা তোকে চিন্তা করতে হবে না!

তারপর ছোটেলালের চুলের মুঠি ধরে বলল, ওঠ গাড়িতে! এবার তোর মাথা যদি ভেঙে না দিই তো আমার নাম মাধব সরদার নয়।

ছোটেলালকে জিপের মধ্যে ঠেলে দিয়ে মুখ ফিরিয়ে বেশ নরম গলায় দারোগাটি সাবিত্রীকে জিগ্যেস করল, তুমি কবে থেকে লাইনে নেমেছ? আগে তো দেখিনি!

সাবিত্রী সিঁটিয়ে গিয়ে বলল, বাবু, আমি পুরুলিয়া থেকে এসেছি, আমার স্বামীকে খুঁজতে। এই যে আমার স্বামীর চিঠি!

পোস্টকার্ডটি হাতে নিয়ে দারোগাটি সব পড়ল। তারপর বলল, ঠিক আছে। একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবে। ওঠো, জিপে এসো!

সামনের সিটে ড্রাইভারের পাশে বসল দারোগা, তার পাশে বসাল সাবিত্রীকে। সাবিত্রী কখনও এরকম গাড়িতে চড়েনি।

একটু পরে দারোগাটি জিগ্যেস করল, তোমার স্বামী তোমাকে একলা গ্রামে ফেলে কলকাতায় চাকরি করতে এল?

সাবিত্রী বলল, এখান থেকে কয়েকজন বাবু গিয়েছিল আমাদের গ্রামে। তারা ওকে বলল, কলকাতায় চাকরি দেবে। ভালো মাইনে, কারখানায় কাজ। বাবুরাই তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এল।

—হুঁ, বাবুরা সঙ্গে করে নিয়ে এল। কীরকম বাবু কে জানে। তোমাকে একা রেখে এল?

—ওখানে আমার এক বুড়ি পিসিমা থাকে। ও বলেছিল, এ-মাসের মধ্যে আমাকে পুরুলিয়া থেকে কলকাতায় নিয়ে আসবে!

—তারপর আর পাত্তা নেই? এই একটা মাত্র চিঠি লিখেছে।

—আমি দু-খানা পত্তর পাঠিয়েছি, কোনও উত্তর পাইনি।

—হুঁ, তাহলে কলকাতায় অন্য কোনও মেয়ের পাল্লায় পড়ে মজেছে। তোমাকে ভুলে গেছে।

—না গো, বাবু, না-না সে তেমন মানুষই

—কে কখন বদলে যায়, তা কি বলা যায়? এ তো আর গ্রাম নয়, শহর বড় মজার জায়গা। তা তুমি চলে এসে ভালো করেছ। গ্রামে থাকলে তো খেতেই পেতে না। শুধু শুধু এমন শরীরটা নষ্ট করতে।

—বাবু আমার এখন কী হবে?

—ব্যবস্থা হয়ে যাবে, ঠিক ব্যবস্থা হয়ে যাবে!

—থানার কাছে এসে জিপটি থামতেই দারোগাটি কনস্টেবলকে বলল, তুমি ছোটেলালকে গারদে নিয়ে যাও। একটু দলাই-মলাই করো। আমি আসছি। এই মেয়েটাকে কোনও আশ্রম-টাশ্রমে পৌঁছে দিতে হবে তো!

ছোটেলাল জিপ থেকে নামবার পর ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, আশ্রম না ছাই। ওগো মেয়ে, তুমি এবার বাঘের খপ্পরে পড়লে!

জিপের ড্রাইভার এবং কনস্টেবল দুজনেই গোঁফের ফাঁকে হাসল।

জিপ ছাড়তেই সাবিত্রী বলল, আমি আশ্রমে যাব না। আমি স্বামীর কাছে যাব।

দারোগা বলল, যাবে, যাবে, যেখানেই যাও, অত তাড়াহুড়ো কীসের? পুলিশের হাতে পড়েছ। এজাহার দিতে হবে না? ড্রাইভার, আগে গেস্ট হাউজ চলো।

এই খানার মধ্যে কয়েকটা জুট মিল আছে। তার মধ্যে একটির রয়েছে চমৎকার গেস্ট হাউজ। গঙ্গার ধারে, নিরিবিলি। সবরকম খাদ্য পানীয়ের ব্যবস্থা। দারোগাবাবু সে গেস্ট হাউজ যখন-তখন ব্যবহার করতে পারে।

বাঘের যেমন স্বভাব, দেরি সহ্য হয় না। খিদে পেয়েছে, সামনে খাদ্য তৈরি, সন্ধের অন্ধকার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারবে না। তাকে বাধা দেওয়ার কেউ নেই। বাঘকে কে না ভয় পায়।

জিপটা এসে থামল বাগান বাড়ির পেছন দিকে। সেখানে একটা ছোট দরজা। দারোগাকে দেখে একজন আর্দালি সসম্ভ্রমে দরজা খুলে দিল। সাবিত্রী ভয়ের চোটে নামতে চাইছিল না, তাকে টেনে হিঁচড়ে আনা হলে ভেতরে।

কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে দারোগা তার ঘাড় কামড়ে ধরে গরগর করতে-করতে বলল, চেঁচাবি না, হারামজাদি, তাহলে এক্ষুনি শেষ করে দেব। চুপচাপ থাক, দু-তিনদিন পর স্বামীর কাছে পৌঁছে যাবি।

দোতলার বড় ঘরটির দরজা ঠেলে খুলতেই অন্য দৃশ্য!

লোকে বলে, এক অরণ্যে বাঘ আর সিংহ একসঙ্গে বাস করে না। কিন্তু শহরে ও নিয়ম খাটে না। এখানে বাঘেরও বাবা আছে, বাঘ আর সিংহ দিব্যি সহাবস্থান করতে পারে।

এই ঘরটার সোফায় গা এলিয়ে বসে আছে সাত খানা জুট মিলের মালিক দুর্জয় সিং। বিশাল চেহারা। চোখ দুটো ভাটার মতন। মাথায় পরচুলা। সে ঘনঘন নিশ্বাস ফেলচে।

দারোগাকে দেখেই দুর্জয় সিং হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠল, এই যে দারোগাবাবু, আপনি আমার দুজন লোককে অ্যারেস্ট করেছেন? আপনাকে প্রতি মাসে মোটা খাওয়াচ্ছি, তাতে হয় না। মন্ত্রীদের দিয়ে টেলিফোন করতে হবে?

দারোগা খানিকটা কুঁকড়ে গিয়ে বলল, আপনার লোককে ধরেছে? কই, আমি জানি না তো।

দুর্জয় সিং আবার ধমক দিয়ে বলল, আপনি জানেন না। তাদের এমনি ফটকে পুরল? বাঁকুড়ায় ট্রান্সফার হতে চান, না সাসপেন্ড হতে চান!

দারোগা বলল, নিশ্চই ভুল করে ধরেছে। আমি দেখেছি। একটু পরেই থানায় গিয়ে দেখছি।

দুর্জয় সিং বলল, একটু পরে কেন, এক্ষুণি যান? ডিউটি ফেলে রাখবেন না! এখানে এখন কী করতে এসেছেন?

দারোগা বলল, এই মেয়েটা স্যার, হারিয়ে গেছে। ছোটেলালের খপ্পরে পড়েছিল। এর সঙ্গে ক্রিমিন্যালদের কোনও কানেশান আছে কি না একটু জেরা করে দেখতে হবে। সেইজন্যই নিরিবিলিতে...বেশিক্ষণ লাগবে না, বড়জোর চল্লিশ মিনিট।

দুর্জয় সিং এই প্রথম সাবিত্রীকে দেখল। উঠে এসে, একবার সামনে, একবার পেছনে, একবার থুতনি তুলে।

তারপর বলল, বাঃ এ যে একেবারে ফ্রেস মাল দেখছি। কোথায় পেলে?

—আজই ট্রেন থেকে নেমেছে।

—বা-বা-বা-বা! আজকাল যতই টাকা খরচ করুন, ফ্রেস কিছুতেই পাওয়া যায় না। সবই কোলড্ স্টোরেজ ডিপ ফ্রিজের মাল। জানেন তো, যতই খুবসুরত হোক, আর এসব পোশাকের বাহার থাকুক, ফ্রেস জিনিসের স্বাদই আলাদা। এখানে একে আপনি জেরা করবেন?

—হ্যাঁ, স্যার।

—আপনি থানায় গিয়ে ডিউটি করুন। আমি জেরা করছি। আজ আমার মনমেজাজ ভালো নেই। দেখি, এই ফ্রেস জিনিসটি খেলে আমার তবিয়ৎ ঠিক হয় কি না।

দারোগাটি দুর্জয় সিং-এর চোখের দিকে তাকাল। নিজের লেজটা আছড়াতে-আছড়াতে প্রতিবাদের ভঙ্গিতে গরগর করতে-করতে বলল, না একে আমিই জেরা করব। বলছি তো বেশিক্ষণ লাগবে না।

দুর্জয় সিং হেসে বলল, ঠিক আছে, একদিনের জন্য জামিন তো দিতে পারেন? একদিন জামিন রাখতে কত লাগবে বলুন। তারপর কাল আপনি যত ইচ্ছে জেরা করবেন। কত লাগবে, কত?

পকেট থেকে এক মুঠো একশো টাকার নোট বার করে সে ছুড়ে দিল দারোগার বুকে। নোটগুলো কুড়িয়ে নিয়ে দারোগা একবার তাকাল সাবিত্রীর দিকে, আর-একবার দুর্জয় সিং-এর দিকে। তারপর ঠোঁট চাটতে-চাটতে পিছিয়ে গেল এক-পা এক-পা করে।

দুর্জয় সিং বলল, দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যান।

সিংহ সমাজে একটা নিয়ম আছে। পুরুষ সিংহরা বসে থাকে এক জায়গায়, সিংহিনীরা শিকার করে। সিংহিনী সব জোগাড় করে দেয়, সিংহ দয়া করে খায়। তারপর সিংহিনীই সিংহের গা চেটে পরিষ্কার করে দেয়।

এখানেও সেরকম একটা কিছু ঘটল।

একটা এয়ারকন্ডিশান্ড গাড়ি এসে থামল প্রধান দরজায়। খুব ফরসা, স্থূলাঙ্গিনী, চোখে কালো চশমা পরা এক মহিলা সেই গাড়ি থেকে নেমেই ধুপধাপ করে উঠতে লাগল সিঁড়ি দিয়ে। একজন আর্দালি কিছু বলতে এল তাকে, সে এক ঠেলায় সরিয়ে দিল তাকে। তারপর ওপরে এসে ধাক্কা মেরে খুলে ফেলল দরজা।

দুর্জয় সিং তখন সবেমাত্র সাবিত্রীর আঁচলটা খুলে ফেলেছে, ঘুরে দাঁড়িয়ে গর্জন করে বলল, কে?

স্থূলাঙ্গিনী মহিলাটি তা গ্রাহ্য না করে সাবিত্রীর দিকে এগিয়ে আসতে-আসতে বলল, এ কে?

দুর্জয় সিং কোনও উত্তর দিল না।

মহিলাটি নাক কুঁচকে বলল, ছিঃ, এই তোমার রুচি হয়েছে? অ্যাংলো মেয়ে, বম্বের ফিলম্ অ্যাকট্রেস, আমেরিকান হিপি, কলেজে পড়া বাঙালি মেয়ে, এসব কোনও কিছুতেই আমি আপত্তি করি না। খাও না, যত ইচ্ছে খাও। তা বলে এই নোংরা, গরিব, গাঁইয়া চাই তোমার? এত কত, কোন রোগ আছে তার ঠিক কী? ছিছি-ছিছি, তুমি খানদানি মুসলমান, পাহাড়ি মেয়ে, অফিসারের বউ কী চাও বলো? এটাকে দূর করে দাও।

তারপর পা থেকে চটি খুলে সাবিত্রীকে মারতে-মারতে বলতে লাগল, বেহুদা, রেন্ডি কাঁহিকা! দূর হয়ে যা! মর, তুই মর। তোকে শিয়াল-কুকুর খাক! তুই এসেছিস সিংহের গুহায়।

মার খেয়ে সাবিত্রী মাটিতে পড়ে যেতেই স্ত্রী লোকটি হাঁক দিল, আর্দালি, এই রেন্ডিটাকে অনেক দূরে মাঠের মধ্যে ছুড়ে ফেলে দিয়ে এসো।

নদীর ধারে, একটা আবর্জনার স্তূপের ধারে বসে সাবিত্রী এখন অঝোরে কাঁদছে। শুধু কেঁদেই চলেছে। সে এখন কোথায় যাবে, তা জানে না। এরপর কী।

কোনও কবি হলে এই জায়গায় হয়তো লিখতেন, একসময় সাবিত্রীর প্রতিটি অশ্রুবিন্দু মুক্তো হয়ে ঝরতে লাগল, যাদের হৃদয়ে পরিতাপ থাকে, তারাই শুধু দেখতে পায় সেই মুক্তো, তারা হাত জোড় করে সাবিত্রীর সামনে এসে বসল।

কোনও পেশাদার প্রগতিশীল হলে বলতেন, সাবিত্রীর চোখের জলের ফোঁটাগুলো আসলে এক-একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। ক্রমশ সেইসব অগ্নিস্ফুলিঙ্গ থেকে দাউদাউ করে জ্বলে উঠল আগুন, সেই আগুন পুড়িয়ে ছারখার করে দিল দুর্জয় সিংয়ের মতন অত্যাচারীদের।

কিন্তু সেরকম কিছুই ঘটল না। সাবিত্রী শুধু অসহায় ভাবে কেঁদে চলেছে।

গল্প লেখকের মুশকিল, এভাবে গল্প শেষ করা যায় না। ধরা যাক, অন্য একজন পুলিশ অফিসার, কিছু-কিছু পুলিশ তো সৎ ও ভদ্র থাকতেই পারে, তাদের একজন সাবিত্রীকে পৌঁছে দিল তার স্বামীর কাছে। তাহলে কিন্তু সেটা গল্প হবে না। কিংবা এক সহৃদয় ভদ্রলোক কিংবা তরুণ আদর্শবাদী সাবিত্রীকে যত্ন করে তুলে দিলে পুরুলিয়ার ট্রেনে। বাস্তবে এরকম ঘটে, কিন্তু ছাপার অক্ষরে পড়লে সবাই বলবে, বাজে গল্প।

সুতরাং সাবিত্রী ওখানেই বসে থাক, কাঁদুক।

শুধু অসমাপ্ত গল্পের অস্বস্তিতে আর সাবিত্রীর কান্নার শব্দে লেখকের একটা দিন মন খারাপ অবস্থায় কাটবে।



সূর্যকান্তর প্রশ্ন

নার্সিংহোমের খাটে শুয়ে সূর্যকান্ত কী ভাবছেন এখন?

সাদা ধপধপে চাদরের ওপর সূর্যকান্তর লম্বা শরীরটা যেন পুরো খাট জুড়ে আছে। চোখ বোজা। একটা হাত বুকের ওপর রাখা। একটু দূরে জানলার কাছে বসে আছে একজন নার্স। ইঞ্জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছিল সূর্যকান্তকে, কিছুক্ষণ আগে তিনি খানিকটা ছটফট করছেন। এখন তিনি ঘুমিয়ে না জেগে তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

মমতা কাল সারারাত সূর্যকান্তর শিয়রের কাছে জেগে বসেছিল। এখন তাকে জোর করে বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, একটু বিশ্রাম নেওয়ার জন্য। আর কারুকে এখন এ-ঘরে ঢুকতে দেওয়া হবে না। দরজার বাইরে থেকে অনেকেই উঁকি মেরে দেখে যাচ্ছে। নার্সিংহোমের বাইরে বেশ ভিড়। দূর-দূর থেকে অনেকে ছুটে আসছে সূর্যকান্তর খবর নেওয়ার জন্য।

সূর্যকান্তর বয়েস বাহান্ন, বেশ নিটোল স্বাস্থ্য, লম্বা, মেদহীন শরীর। কিছুদিন আগে সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন, অন্য কোনও নেশা নেই, এককালে খেলাধুলোর ঝোঁক ছিল। এখনও প্রায় শীতকালে ব্যাডমিন্টন খেলেন। তবু এরকম একটি কাণ্ড ঘটে গেল।

খাদিমগঞ্জ থেকে একটা জিপে ফিরছিলেন সূর্যকান্ত। সারাদিন ধরে ধকল গেছে খুব। দুপুরে ভালো করে খাওয়াও হয়নি, সন্ধেবেলা হেড়োডাঙ্গায় পৌঁছে সত্যনারায়ণ পুজোর সিন্নি খাওয়ার কথা। সূর্যকান্ত পরিশ্রম করতে পারেন প্রচণ্ড, তাঁর সঙ্গের লোকেরাও মেতে থাকে, খিদে-তেষ্টার কথা জানায় না।

পৌষ মাসের অপরাহ্ণ, আকাশের আলো মিলিয়ে যায় দ্রুত। রাস্তার দুপাশে খোলা মাঠ

ধূ-ধূ করছে, পাতলা কুয়াশার মতন নেমে আসছে অন্ধকার। ঠান্ডা-ঠান্ডা বাতাস বইছে।

সূর্যকান্ত বসেছিলেন জিপের সামনে। সাধারণত তিনি সামনের সিটেই বসতে ভালোবাসেন, কখনও-কখনও নিজেই জিপ চালান। কিন্তু বাবলু আর জয়দীপ কিছুতেই তাঁকে সামনে বসতে দেবে না। দু-দিন আগেই একটা নির্জন রাস্তায় তাঁর জিপ আটকাবার চেষ্টা হয়েছিল, হঠাৎ দমাদ্দম করে এসে পড়েছিল পাথর। এর আগেও মানু দত্তর লোকেরা তাঁকে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছে দুবার। সূর্যকান্ত ভয় পান না, কিন্তু বাবলু-জয়দীপরা ঝুঁকি নিতে চায় না। থানা থেকে একজন বডিগার্ড দেওয়া হয়েছে, বন্দুক নিয়ে সে বসে আছে ড্রাইভারের পাশে।

চলন্ত গাড়িতে বাবলু আর জয়দীপ নানান কথা বলে যাচ্ছে, সূর্যকান্ত চুপ করে শুনছিলেন। মাঝে-মাঝে ছোট-ছোট কিল মারছিলেন। নিজের বুকে। কীসের যেন একটা অস্বস্তি হচ্ছে। খানিকটা বাতাস যেন আটকা পড়ে গেছে বুকের মধ্যে কিছুতে বেরুতে পারছে না। এরকম তাঁর কখনও হয়নি আগে।

কথার মাঝখানে হঠাৎ তিনি হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে জিগ্যেস করলেন, দ্যাখ তো বাবলু, আমার জ্বর এসেছে নাকি?

বাবলু হাতটা ছুঁয়ে বললেন, কই না তো। গা তো গরম নয়।

তারপর সে সূর্যকান্তর কপালে হাত রেখে তাপ অনুভব করতে গিয়ে চমকে উঠে বলল, এ কী সূর্যদা, আপনি ঘামছেন?

সূর্যকান্ত বললেন, ঘামছি তাই না? মাঝে-মাঝে শরীরটা ঝাঁঝাঁ করছে, ঠিক জ্বরের মতন, তার পরেই আবার ঘাম হচ্ছে।

জয়দীপ বলল, আমার তো শীত-শীত লাগছে। এর মধ্যে আপনার ঘাম হবে কেন?

বাবলু বলল, তারপর দু-রাত তো ঘুমই হয়নি। রাত দুটো-আড়াইটেয় শুয়েই আবার ভোর পাঁচটায় ওঠা। সূর্যদা, আজ রাত দশটায় শুয়ে পড়বেন। ঘুম চাই ভালো করে না হলে খাটবেন কী করে?

সূর্যকান্ত বললেন, হ্যাঁ, আজ ঘুমোব।

খানিক বাদে সূর্যকান্ত আবার বললেন বড্ড জলতেষ্টা পাচ্ছে রে। গাড়িতে কি জলের বোতল-টোতল আছে?

বাবলু আর জয়দীপ পরস্পরের দিকে তাকাল। গরমকাল নয়, তাই গাড়িতে জল রাখার কথা ওরা ভাবেনি।

জয়দীপ বলল, আর মাইলসাতেক পরে কমলাপুর, সেখানে গিয়ে খাবেন।

সূর্যকান্ত বুক চেপে ধরে বললেন, তেষ্টায় গলা ফেলে যাচ্ছে রে। অতক্ষণ থাকতে পারব না। গাড়িটা এখানে থামাতে বল তো!

এই মাঠের মধ্যে কোথায় জল পাওয়া যাবে? নালা ডোবা থাকলেও তো সেই জল পান করা যাবে না!

গাড়ি চালাচ্ছে পরিতোষ, সে বলল সামনে একটা কুঁড়ে দেখা যাচ্ছে, আলো জ্বলছে, ওখানে থামাব।

সূর্যকান্ত বললেন, হ্যাঁ, থামা।

মাঠের মাঝখানে জিপ থামলে হঠাৎ মানু দত্তের লোকেরা এসে হামলা করবে কি না, তা নিয়ে চিন্তায় পড়ে গেল বাবলু-জয়দীপরা। কিন্তু সূর্যকান্ত প্রায় ছটফট করছেন তৃষ্ণায়।

জিপটা থামতে জয়দীপ বলল, আপনি বসুন সূর্যদা, আমি জল আনছি।

সূর্যকান্ত বললেন, তোকে যেতে হবে না। আমি খেয়ে আসছি। যার বাড়ি, তার সঙ্গে একটু কথাও বলে আসব।

বাবলু বলল, আপনার শরীর ভালো লাগছে না, আপনি বসুন না, আমরা জল আনছি।

সূর্যকান্ত সেকথা শুনলেন না। লাফিয়ে নামলেন জিপ থেকে। একটুখানি টলে গিয়ে আবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, এমন কিছু শরীর খারাপ নয় সে নিজে জল খেতে যেতে পারব না।

কুঁড়েঘরটা রাস্তা থেকে খানিকটা দূরে, একেবারে মাঠের মধ্যে। বাড়িটার সামনে একটা মস্ত তালগাছ। বন্দুকধারী গার্ডটি নেমে দাঁড়িয়েছে জিপ থেকে। সূর্যকান্ত একটু হেসে বললেন, তোমায় আসতে হবে না। বন্দুক নিয়ে কি কেউ লোকের বাড়িতে জল চাইতে যায়?

দুপাশে বাবলু আর জয়দীপ, সূর্যকান্ত রাস্তা ছেড়ে মাঠের মধ্যে নেমে এগিয়ে গেলেন কয়েক পা। তারপর এমনভাবে হঠাৎ ঝুপ করে পড়ে গেলেন মাটিতে যে বাবলু-জয়দীপরা তাঁকে ধরারও সুযোগ পেল না।

মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সূর্যকান্তর জ্ঞান চলে গেছে।

একটুক্ষণের জন্য দিশেহারা হয়ে গেল বাবলু-জয়দীপরা। ছোটাছুটি করে কুঁড়েঘরটা থেকে জল এনে সূর্যকান্তকে খাওয়াবার চেষ্টা করল, মাথায় জল ছেটাল, কিন্তু কিছুতেই সূর্যকান্তর সাড়া এল না। সূর্যকান্তর মতন একজন স্বাস্থ্যবান মানুষ কোন কারণে আচমকা এমন অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন, সে সম্পর্কে ওদের কোনও ধারণাই নেই।

অজ্ঞান সূর্যকান্তকে নিয়ে নার্সিংহোমে পৌঁছতে-পৌঁছতে হয়ে গেল রাত দশটা। হাসপাতালের বদলে নার্সিংহোমে নিয়ে আসার কারণ ডাক্তার সন্তোষ মজুমদার সূর্যকান্তর বন্ধু মানুষ। নার্সিংহোম ছেড়ে এক জায়গায় তাস খেলতে গিয়েছিলেন তাঁকে খুঁজে আনতে সময় লেগে গেল আরও আধঘণ্টা।

সূর্যকান্তকে একনজর দেখেই সন্তোষ মজুমদারের মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। তিনি নিজেই যেন অজ্ঞান হয়ে যাবেন।

সূর্যকান্তকে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে এনে ওষুধ দিতে-দিতে সন্তোষ মজুমদার সব ঘটনা শুনলেন। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, জল খাওয়ার জন্য সূর্য যে জিপ থেকে লাফিয়ে নামল, তাতেই ওর...তোমরা ওকে জোর করে বসিয়ে রাখতে পারলে না? অবশ্য তোমরাই বা বুঝবে কী করে? তারপর খাদিমগঞ্জ থেকে কমলাপুর খুব খারাপ রাস্তা, জিপটা এসেছে লাফাতে-লাফাতে...ইস, গাড়িটা থামিয়ে সূর্যকান্তকে যদি শুইয়ে রাখতে পারতে...ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক, এই সময় একটু নড়াচড়া করা মানেই মৃত্যুকে আরও কাছে ডেকে আনা...।

সন্তোষ মজুমদার সূর্যকান্তকে নিজের দায়িত্বে রাখতে সাহস পাচ্ছেন না। এই মফস্বল শহরের নার্সিংহোমে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি কিছুই নেই, সবরকম ওষুধও পাওয়া যায় না, সূর্যকান্তকে বাঁচাতে হলে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া দরকার। হাসপাতালের ডাক্তার চন্দন রায় দেখতে এসে বললেন, এই অবস্থায় সূর্যকান্তকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়াও খুব বিপজ্জনক, পথেই চরম কিছু ঘটে যেতে পারে।

সূর্যকান্ত গুন্ডা-বদমাইশদের হাতে আক্রান্ত হয়েছেন শুনলে কেউ অবাক হত না। কিন্তু তাঁর হার্ট অ্যাটাক হয়েছে শুনে সবাই অবাক। এমন নীরোগ, সুস্থ-সমর্থ মানুষটার হার্ট হঠাৎ বেঁকে বসল কেন?

আর ঠিক এগারো দিন পরে ভোট। সূর্যকান্তর জেতার সম্ভাবনা প্রায় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। এখন কি লোকে আর এরকম একটা মুমূর্ষু মানুষকে ভোট দেবে?

সূর্যকান্ত নিজে নির্বাচনে দাঁড়াতে চাননি। তিনি রাজনীতির লোকও নন। সূর্যকান্তর বাবা ছিলেন উকিল, তিনি শেষ বয়েসে এখানে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সূর্যকান্ত সেই কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক। ছাত্রদের শুধু পড়িয়েই তিনি ক্ষান্ত হননি, আরও বহুদিকে তাঁর উৎসাহ। ছাত্রদের সঙ্গে খেলাধুলো করা, পিকনিকে যাওয়া, গান গাওয়া এসব তো আছেই। তা ছাড়া তিনি ছুটির সময় ছাত্র-ছাত্রীদের ছোট-ছোট দল করে বিভিন্ন গ্রামে পাঠাতেন, যাতে গ্রামের নিরক্ষর মানুষরাও

কিছুটা লেখাপড়ার স্বাদ পেতে পারে। গ্রামের মানুষদের কিছু-কিছু স্বাস্থ্যবিধি বোঝানো, গাছপালা রক্ষা করা বিষয়ে সচেতন করে তোলা, এইসব কাজ নিয়েও তিনি ঘুরেছেন বহু গ্রামে। এ মহকুমার অনেকেই তাঁকে চেনে।

এই এলাকায় আগে পরপর তিনবার এম পি হয়েছিলেন বিধুভূষণ রায়। পুরোনো আমলের জেলখাটা, আদর্শবাদী মানুষ, সবাই তাঁকে ভক্তিশ্রদ্ধা করত। তাঁর মৃত্যুর পর থেকেই ডামাডোল চলছে। একবার বামপন্থীরা, একবার কংগ্রেসিরা জেতে। দু-পক্ষে মারামারি হয়। গত নির্বাচনে হঠাৎ জিতে গেল মানু দত্ত, নির্দল প্রার্থী হিসেবে। মানু দত্ত যে গুন্ডা ও স্মাগলারদের নেতা, তা সবাই জানে। সে তিন-চারখানা পেট্রল পাম্পের মালিক, আর কতরকম ব্যাবসা তার আছে তার ঠিক নেই। প্রচুর টাকা ছড়ায় বলে তার সাঙ্গোপাঙ্গ অনেক। গুন্ডার সর্দারও দিব্যি ভোটে জিতে যায়। জিতে যাওয়ার পর মানু দত্ত অন্যান্য দলের সঙ্গে দরাদরি শুরু করে দিল। সে কখনও এ-দলে, কখনও ও-দলে যায়। পুলিশও তাকে ভয় পায়।

সূর্যকান্ত এসব নিয়ে মাথা ঘামায়নি। একদিন তাঁর ছেলে নীলকান্ত বলল, বাবা, আমাদের এই মহকুমার মানু দত্তর মতন একজন বদমাশ লোক নেতা সেজে যাচ্ছে, সে চতুর্দিকে অত্যাচার করে বেড়ায়, চোর-ডাকাতদের পোষে, তবু সে লোকসভায় আমাদের প্রতিনিধিত্ব করবে, এটা ভাবতে আমাদের লজ্জা করে।

সূর্যকান্ত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, সত্যি তো লজ্জার কথা। দেশটা এরকমই হয়ে যাচ্ছে। জানিস, ওই মানু দত্ত আমার সঙ্গে ইস্কুলে পড়ত। এক ক্লাসে। স্কুল ফাইনাল পাশ করতে পারেনি, তার আগে থেকেই ও স্মাগলারদের সঙ্গে মিশতে শুরু করে। এখন সে দিল্লিতে মন্ত্রীদের সঙ্গে ওঠা-বসা করে।

নীলকান্ত বলল, বাবা, আমার কলেজের বন্ধুরা বলছে, তোমাকে দাঁড়াতে। মানু দত্তকে যে-কোনও উপায়ে এবার হারানো দরকার।

সূর্যকান্ত সে প্রস্তাব হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন।

কিন্তু তার পরদিন থেকে দলে-দলে ছেলে এসে তাঁকে ওই একই অনুরোধ জানাতে লাগল। সূর্যকান্ত যতই অস্বীকার করেন ততই তারা চেপে ধরে। এল ছোটখাটো ব্যবসায়ীরা, তারা সূর্যকান্তকে সাহায্য করবে। স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের একটা বিরাট দল এল ওই একই প্রস্তাব নিয়ে।

একসময় সূর্যকান্ত নিমরাজি হলেও ঘোর আপত্তি তুললেন মমতা। রাজনীতি মানেই অনেক নোংরা ব্যাপার, অনেক মিথ্যে কথা ও গালাগাল, অন্য পার্টির ওপর কুৎসিত দোষারোপ, টাকাপয়সায় ছিনিমিনি খেলা। এই পরিবেশের মধ্যে তিনি তাঁর স্বামীকে যেতে দিতে চান না কিছুতেই।

তখন একদল ছাত্র অনশন করতে শুরু করল এই বাড়ির সামনে। নীলকান্তও তাদের মধ্যে একজন।

দুদিন সেই ছেলেরা একেবারে কিছুই না খেয়ে শুয়ে থাকার পর মমতা কেঁদে ফেললেন।

তখন সূর্যকান্ত রাজি হলেন এই শর্তে যে, তিনি কোনও দলের হয়ে দাঁড়াবেন না। কারুর কাছ থেকে টাকা নেবেন না। কেউ যদি গাড়ি দিয়ে সাহায্য করে কিংবা স্বেচ্ছাসেবকদের একবেলা খাওয়াতে চায় তাহলে ঠিক আছে। তাঁর নিজের বিশেষ টাকা নেই, অন্যের টাকা নিয়েও তিনি নির্বাচনে লড়বেন না।

সূর্যকান্ত নির্দল হিসেবে দাঁড়াবার পর বামপন্থী এবং কংগ্রেসিরা আলাদা-আলাদাভাবে এসে তাঁকে ধরেছিল, নিজেদের দলে আসবার জন্য। সূর্যকান্ত বলেছিলেন, আমি কোনও দলে যাব না কেন জানেন? এক দলে গেলেই অন্য দলকে গালাগাল দিতে হয়। সত্য-মিথ্যে মিলিয়ে অনেক রকম অভিযোগ তুলতে হয়। কিন্তু আমার স্ত্রী মাথার দিব্যি দিয়েছেন, আমি কারুকে গালাগালাও দিতে পারব না, একটা মিথ্যে কথাও উচ্চারণ করতে পারব না। আমি লড়ব শুধু সততার পক্ষে। গুন্ডামি,

অরাজকতা, মিথ্যে আর কুরুচির বিরুদ্ধে। মানুষের ভালোবাসাই আমার একমাত্র সম্বল।

ভোটের প্রচারে নেমে সূর্যকান্ত অভিভূত হয়ে গেলেন। সাধারণ মানুষ আসলে দলাদলি, অশান্তি, ধর্মীয় বিরোধ এসব কিছুই চায় না। তিনি যেখানেই যান, হাজার-হাজার লোক তাঁর কথা শুনতে আসে। মুসলমানরা তাঁকে নিজেদের বাড়িতে ডেকে নিয়ে যায়। হরিজনরা চাঁদা তুলে তাঁর লোকজদের খাওয়ায়। হিন্দুরা তাঁকে আশীর্বাদ করে। সূর্যকান্ত সব জায়গায় বলেন, আমি মন্দির কিংবা মসজিদ গড়ার পক্ষে নই, আমি চাই আরও ইস্কুল-কলেজ-হাসপাতাল হোক, গ্রামের মেয়েদের উপার্জনের ব্যবস্থা হোক। ধর্ম থাকুক যার-যার বাড়িতে, আর আমি ধর্মের বিপক্ষে নই, কিন্তু ধর্মের নামে যারা ছুরি-বোমা চালায় তারা সবাই পাষণ্ড, অধার্মিক, আপনারাও এই কথাটা ঘোষণা করুন।

একদিন মানু দত্তর সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল রাস্তায়। মানু বাঁকা হেসে বলেছিল, সুয্যি, তুইও শেষপর্যন্ত লোভে পড়ে ভোটে দাঁড়ালি? তোর মতন ভালো মানুষের জন্য এসব লাইন নয়। পারবি না ছেড়ে দে, ছেড়ে দে!

সূর্যকান্তও হেসে বলেছিলেন, মানু, লোকের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে, তোদের লাঠি-বন্দুক চোখরাঙানি দেখেও সাধারণ মানুষ আর ভয় পাচ্ছে না। তুই এবার এসব ছেড়ে দে। নইলে দেখবি, একদিন হাজার-হাজার নিরীহ মানুষ তোদের মতন লোকদের তাড়া করছে!

সূর্যকান্তর জনপ্রিয়তা যত বাড়তে লাগল, ততই খেপে উঠল মানু দত্ত। সে নিজের চ্যালাদের লেলিয়ে দিয়ে মারবার চেষ্টা করেছিল সূর্যকান্তকে। তিনি বডিগার্ড নিতে চাননি, তবু থানা থেকে একজনকে দেওয়া হয়েছে। সবাই বুঝে গিয়েছিল, সূর্যকান্ত নির্ঘাত জিতবেন। তার মধ্যে হঠাৎ বজ্রপাতের মতন এরকম একটা ব্যাপার হয়ে গেল।

ডাক্তারদের চোখ-মুখ দেখলেই বোঝা যায়, সূর্যকান্তর বাঁচার আশা খুব কম। কয়েকদিন বা কয়েক ঘণ্টার আয়ু আছে তাঁর।

প্রথম দুদিন সম্পূর্ণ ঘোরের মধ্যে কাটলেও আজ সূর্যকান্তর জ্ঞান ফিরেছে। তিনি চোখ বুজে আছেন, কারুর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না, কিন্তু তাঁর মাথা পরিষ্কার।

একটা কথাই তাঁর মনে আসছে বারবার। কেন এরকম হল? শরীরের ওপর তেমন অত্যাচার করেননি কখনও, হৃদযন্ত্রটা তবু কেন এমন দুর্বল হল? মানুষের জন্ম-মৃত্যুর কথা কিছুই বলা যায় না, তা ঠিকই। তাহলেও, মানু দত্তর মতন লোকেরা বহাল তবিয়তে বেঁচে থাকবে, আর তাঁকে মরতে হবে অসময়ে, এটা কীরকম বিচার? কে এই বিচার করে? ঈশ্বর? তবে কি ঈশ্বর গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নন? তিনি মানু দত্তদেরই জিতিয়ে দিতে চান?

একটু পরে তিনি চোখ মেলে নার্সকে বললেন, একবার ডাক্তারকে ডাকুন তো!

সূর্যকান্ত পরিষ্কার গলায় কথা বলছেন শুনে নার্স খুশি হয়ে দৌড়ে চলে গেল। অনেক রোগ-মৃত্যু দেখেছে এই নার্স, কিন্তু সে-ও সূর্যকান্তর জন্য লুকিয়ে-লুকিয়ে কাঁদছিল।

তক্ষুনি এসে উপস্থিত হলেন সন্তোষ মজুমদার। শুরু করে দিলেন নানারকম পরীক্ষা। সূর্যকান্ত আপত্তি জানাতে গিয়েও হাত সরিয়ে নিতে পারলেন না। শরীর দুর্বল। তিনি ফিসফিস করে বললেন, সন্তোষ আর-একটু কাছে আয়। সন্তোষ মজুমদার বন্ধুর খুব কাছে মুখটা আনলেন।

সূর্যকান্ত জিগ্যেস করলেন, ঠিক করে বল তো, আমার কি বাঁচার আশা আছে?

সন্তোষ মজুমদার একটু ইতস্তত করে কিছু বলতে যেতেই সূর্যকান্ত আবার বললেন, সত্যি কথা বল। আমাকে শুধু-শুধু সান্ত্বনা দেওয়া দরকার নেই। আমি আর কখনও সুস্থ হয়ে উঠে দাঁড়াতে পারব?

সন্তোষ মজুমদার বললেন, আমরা ডাক্তাররা আর কতটুকু জানি? অনেক কিছু অলৌকিকভাবে ঘটে যায়। তুই তো ভগবানে বিশ্বাস করিস না, আমি করি। ভগবানের দয়া হলে তুই নিশ্চয়ই আবার সেরে উঠবি।

সূর্যকান্ত বড় নিশ্বাস ফেলে বললেন, ভগবানের দয়া। ভগবান কি রাগ করে আমায় এমন রোগ দিলেন? আমি কী অন্যায় করেছি?

সন্তোষ মজুমদার বললেন, ওসব কথা এখন ভাবিস না। কথা বলতে হবে না, চুপ করে থাক। সব ঠিক হয়ে যাবে।

সূর্যকান্তর চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। শারীরিক কষ্টের চেয়েও তাঁর মানসিক কষ্ট হচ্ছে অনেক বেশি। তিনি কোনও উত্তর খুঁজে পাচ্ছেন না। মানু দত্তর মতন লোকেরা এত অন্যায় অত্যাচার করেও কী করে ভোটে জেতে? কত লোক ধর্মের নামে ছুরি শানায়, অন্য ধর্মের মানুষের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়, ধর্মের নামে নৃশংস খুনোখুনি হয়, তবু লোকে ধর্ম কিংবা ঈশ্বরের ওপর ভরসা রাখে কী করে?

সূর্যকান্তর অসুস্থতার খবর রটে গেছে চতুর্দিকে। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীরা এখন প্রচার করছে যে সূর্যকান্ত বেঁচে উঠলেও কোনওদিন আর পূর্ণ কর্মক্ষম হবেন না। সুতরাং এই লোককে জয়ী করে কী হবে?

সূর্যকান্তর সমর্থকরা মুষড়ে পড়েছে খুব। কেউ-কেউ যখন-তখন ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছে। সূর্যকান্ত যুবসমাজকে মাতিয়ে রেখেছিলেন, এই অঞ্চলে একটা সুস্থ, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, তখন তারা একেবারে দিশেহারা।

সেদিন বিকেলবেলা হঠাৎ মানু দত্ত সদলবলে এল নার্সিংহোমে। সূর্যকান্তর সঙ্গে বাইরের কারুকেই দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না, কিন্তু মানু দত্ত ওসব বাধা মানবার পাত্র নয়। তার দলের লোকেরা চিৎকার চ্যাঁচামেচি শুরু করে দিল।

মানু দত্ত তাদের থামতে বলে, সন্তোষ মজুমদারের সামনে হাতজোড় করে বেশ আবেগের সঙ্গে বলল, দেখুন ডাক্তারবাবু, আমি, আমি সূর্যকান্তর অপোনেন্ট হিসেবে আসিনি, আমি এসেছি আমার পুরোনো ইস্কুলের বন্ধুকে দেখতে। সে এত অসুস্থ, তাকে একবার দেখে যাব না? আমি কি এতই অমানুষ?

সন্তোষ মজুমদার বুঝলেন, আপত্তি জানিয়ে লাভ নেই। তাহলে তাঁর নার্সিংহোম এরা ভেঙে দিয়ে যাবে। সূর্যকান্তর সঙ্গে দেখা করতে আসাটা নিশ্চয়ই মানু দত্তর একটা রাজনৈতিক চাল। সঙ্গে ফটোগ্রাফার নিয়ে এসেছে।

সূর্যকান্তর নাকে তখন অক্সিজেনের নল। নিশ্বাস খুব ক্ষীণ। কিন্তু এখনও মাথা পরিষ্কার। মানু দত্তকে চিনতে তাঁর অসুবিধে হল না। মানু দত্ত কী বলছে তা তিনি শুনতেও পাচ্ছেন, কিন্তু উত্তর দিতে পারছেন না।

খানিকক্ষণ মামুলি সান্ত্বনার কথা বলার পর মানু দত্ত খুব কাছে এসে বলল, সূর্য, তুই আমার পুরোনো বন্ধু, তোকে আমি বাঁচাবই। মতভেদ যতই থাকুক, তবু বন্ধুকে বন্ধু দেখবে না? তোর জন্য কলকাতা থেকে আমি বড় ডাক্তার আনব। যত টাকা লাগে লাগুক। আমার গাড়িতে ডাক্তার আনতে পাঠাচ্ছি এক্ষুণি। তোকে বাঁচতেই হবে।

হঠাৎ সূর্যকান্ত বুঝতে পারলেন মানু দত্তর আসল উদ্দেশ্যটা। সে চ্যালাদের দিয়ে বোমা ছুঁড়িয়ে সূর্যকান্তকে জখম করতে চেয়েছিল আগে, এখন সে সূর্যকান্তকে বাঁচাবার জন্য এত ব্যস্ত কেন? কারণ একটাই। সূর্যকান্ত এখন হঠাৎ মরে গেলে এই কেন্দ্রে নির্বাচনই বন্ধ হয়ে যাবে। আবার কবে হবে তার ঠিক নেই। মানু দত্ত এবারে যে এত টাকাপয়সা খরচ করল, তা বরবাদ হয়ে যাবে। আবার নতুন করে সবকিছু করতে হবে পরের বার। সূর্যকান্ত আর দশটা দিন অন্তত বেঁচে থাকলেও মানু দত্ত জিতে যেতে পারে।

সূর্যকান্তর ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল, তিনি দুদিকে মাথা নেড়ে অস্ফুট কণ্ঠে বললেন, না!

অর্থাৎ তিনি বলতে চাইলেন, মানু দত্তকে তিনি এবার জিততে দেবেন না।

ভগবান তাঁর ওপর রাগ করেছেন কিংবা পরে আবার দয়া করবেন কি না, তা নিয়ে আর সূর্যকান্ত মাথা ঘামাতে চান না। অক্ষম দুর্বল হয়ে, সবরকম অবিচার মেনে নিয়ে তিনি বাঁচতেও চান না। এখনও মানু দত্তর মতন মানুষকে হারাবার ক্ষমতা তাঁর আছে।

সূর্যকান্ত দুর্বল হাতটা তুলে নাক থেকে খুলে নিলেন অক্সিজেনের নল!

সূর্যকান্তর নিশ্বাস ভারী হয়ে আসছে, মাথার মধ্যে শুনতে পাচ্ছেন মৃত্যুর পদশব্দ। তবু তিনি ভাবতে লাগলেন, নির্বাচন স্থগিত হয়ে যাবে এখানে। আবার কয়েক মাস পরে যখন নির্বাচন হবে তার মধ্যে অন্য কেউ, আর-একজন সাহসী, সত্যবাদী কেউ কি মানু দত্তের প্রতিদ্বন্দ্বীতা করতে পারবে না?

সূর্যকান্তর বুকে শেষ ধ্বনিটা এইরকম, পারবে, পারবে, পারবে...নিশ্চয়ই পারবে!



মা

জানলার পরদাটা সরিয়ে দিল দীপ।

সকাল থেকেই ঝুরুঝুরু বরফ পড়ছে। বাড়ির সামনের রাস্তার ওপারেই পার্ক।

ওয়াশিংটন স্কোয়ার। এর মধ্যেই পার্কটা প্রায় সাদা হয়ে এসেছে তুষারে।

শুরু হল সুদীর্ঘ শীতকাল। কঠিন শীতকাল। সব সময়ে একগাদা পোশাকে জবরজং হয়ে থাকতে হবে।

এই সোমবারটাও ছুটি ছিল। শুক্কুরবার বিকেল থেকে সোমবার রাত্তির পর্যন্ত টানা ছুটি, ভাবাই যায় না। লং উইক এন্ড। যেন এক অত্যাশ্চর্য উপহার।

কিন্তু সোমবার বিকেল হতেই মনে হয়, ছুটি ফুরিয়ে এল। কাল থেকে আবার কাজ। কাজ। কাজ আর কাজ। ধরা বাঁধা রুটিন। ভাবলেই জ্বর আসে।

চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে খানিকটা দেখল দীপ। তারপর জানলার কাচের একটা পাল্লা খুলে দিল। একঝলক ঠান্ডা বাতাস এসে লাগল তার বুকে। সে বাইরে হাত বাড়িয়ে দিল পেঁজা তুলোর মতন তুষারের স্পর্শ অনুভব করার জন্য। প্রত্যেক বছরই প্রথম তুষারপাতের দিনটায় খানিকটা উত্তেজনা আসে। দেখতে-দেখতে বারো বছর কেটে গেল, তবু এখনও এই দিনটাকে একটা বিশেষ দিন বলে মনে হয়। এখন মোটে সাড়ে চারটে, হিসেব অনুযায়ী বিকেল, কিন্তু এর মধ্যেই আলো কমে এসেছে খুব। শীতকালের বিকেলটা টেরই পাওয়া যায় না দুপুরের পরেই সন্ধে।

কাপের চা পুরো শেষ হয়নি, দীপের হঠাৎ ইচ্ছে হল সবসুদ্ধু রাস্তায় ছুড়ে ফেলে দিতে। সে প্রায় ছোঁড়ার মতন করে তুলে ধরেও কেঁপে উঠল।

এ কী করছে সে?

তার অ্যাপার্টমেন্ট সাততলায়। এখান থেকে রাস্তায় একটা কাপ ছুড়ে ফেলার কথা কেউ কল্পনাই করতে পারে না। ব্রুকলিনের একটা ব্যস্ত রাস্তা। এদেশের রাস্তা দিয়ে লোকজন প্রায় হাঁটেই না, সবাই গাড়িতেই যায়। কিন্তু কাছেই কিছু দোকান-পাট রয়েছে, কেউ-কেউ খানিক দূরে গাড়ি পার্ক করে এখানে হেঁটে আসে, দীপ দেখতে পাচ্ছে ছাতা মাথায় কিংবা রেন কোট গায়ে কয়েকজন

যাওয়া-আসা করছে।

তবু দীপের অদম্য ইচ্ছে হতে লাগল কাপটা জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলার।

দীপ যেন নিজের ওপর প্রবল জোর খাটিয়ে সরে এল সেখান থেকে। কাপটা রাখল রান্নাঘরের টেবিলে। একটা সিগারেট ধরাল। তার হাত কাঁপছে।

বাথরুমের দরজাটার পেছনে একটা মানুষ-সমান আয়না লাগানো। আগে থেকেই ছিল। এই অ্যাপার্টমেন্টটা দীপ কিনেছে দেড়বছর। আগে এখানে থাকত দুবার বিয়ে-ভাঙা এক ইটালিয়ান মহিলা। দীপের বন্ধু বাল্লু বলেছিল, তুই ওই অ্যাপার্টমেন্টটা যার কাছ থেকে কিনেছিস, সে মেয়েটার তো মাফিয়া কানেকশান আছে শুনেছি। সে বেচল কেন, কোনও গোলমাল নেই তো?

সে যাই হোক, মহিলাটি এই আয়নাটা লাগিয়েছিল? স্নান করার সময় সে কি নিজের সর্বাঙ্গ দেখতে ভালোবাসত? কিংবা অন্য কিছু উদ্দেশ্য ছিল?

সেই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দীপ জিগ্যেস করল, কী ব্যাপার তোমার? হঠাৎ কাপটা রাস্তায় ছোঁড়ার ইচ্ছে হল কেন?

আয়নার ভেতরের দীপ একটু হাসল।

তারপর বাঁকা সুরে বলল, আজকাল প্রায়ই তো দেখছি, তোমার এরকম এক-একটা উদ্ভট ইচ্ছে হচ্ছে। পরশুদিন কী করেছিলে? পরশু মানে গত শনিবার। দীপ তার পাড়ার সুপার মার্কেট থেকে সপ্তাহের বাজার করতে গিয়েছিল?

ট্রলিটা নিয়ে ঘুরছে। এক প্যাকেট মাখন তুলতে গিয়ে আর-একটা মাখনের প্যাকেট পড়ে গেল মাটিতে। কোনও কিছু চিন্তা না করেই দীপ সেই প্যাকেটটা জুতো দিয়ে মাড়িয়ে দিল। চেপে পিষে দিল প্রায়। তারপর ঠেলে র‍্যাকের নীচে।

সে তো চুরি করেনি। একটা মাখনের প্যাকেটের ওপর পা পড়ে যাওয়া কোনও অপরাধ নয়। কেউ দেখতে পেলেও কিছু বলত না। কিন্তু ইচ্ছে করে সে কেন একটা প্যাকেট মাখন নষ্ট করল? কোনও যুক্তি নেই এর।

আয়নার ভেতরের দীপ বলল, আরও বলব?

খোলা জানলাটা দিয়ে হুহু ঠান্ডা হাওয়া আসছে এখন। ঘরের হিটিং চালু আছে, তার মধ্যে এই হাওয়া ঢুকে একটা বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপার হচ্ছে। বাথরুমের দরজাটা বন্ধ করে দীপ দৌড়ে গেল জানলার কাছে।

সেটা তক্ষুনি বন্ধ করে দীপ মাথা বাড়িয়ে দেখল।

কাপটা ছুড়লে রাস্তা পর্যত পড়ত না। তাদের এই অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এর সামনের দিকে একটা চত্বর রয়েছে। এক চিলতে বাগান।

ওখানেই পড়ত, এমন কী ক্ষতি হত তাতে? ওখানে তো সে মাঝে-মাঝে বীয়ার ক্যান পড়ে থাকতে দেখে। সিগারেটের প্যাকেট, পেপার গ্লাস। বাইরে জিনিস ফেলা এমনকিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। এদেশে এদের পরিষ্কার-বাতিক আছে বটে, আবার কেউ-কেউ ইচ্ছে করে নোংরাও করে। গাড়ির জানলা দিয়ে রাস্তায় বোতল ছুড়ে দেয়।

নীচে কেউ নেই। এখন কাপটা ছুঁড়ে ফেললে মন্দ হয় না, কেউ দেখবে না। তাহলে ফেলাই যাক না।

দীপ আবার কাপটা আনবার জন্য ফিরেও থমকে গেল। সে কি পাগল হয়ে যাচ্ছে নাকি? আস্ত একটা কাপ, চারখানার সেটের মধ্যে একটা, এটা শুধু-শুধু সে ভাঙবে কেন? এই চিন্তাটা আসছে কোথা থেকে?

লম্বা উইক-এন্ডের ছুটিতে অনেকেই বাইরে যায়। বীরেনদা সুরূপা-বউদিরা গেল ওয়াশিংটন ডি.সি.। দীপকেও সঙ্গে যাওয়ার জন্য অনেক অনুরোধ করেছিল। চয়ন আর বাল্লু গেল হারভার্ড,

ওদের গাড়িতে জায়গা ছিল। জুডিও গেল কানেটিকাট, ওর দিদির কাছে। দীপকে নিয়ে যাওয়ার জন্য খুব ঝুলোঝুলি করেছিল, কিন্তু সে রাজি হয়নি। সবাইকে সে বলেছিল, এই ছুটিতে সে তার ঘরগুলোর ওয়াল পেপার পালটাবে।

কিছুই করেনি দীপ। শুক্রবার সন্ধে থেকে স্রেফ শুয়ে-শুয়ে কাটিয়ে দিল ছুটিটা। কারুর সঙ্গে দেখা হয়নি। এদেশে এমন একাকিত্ব অতি মারাত্মক।

কাল থেকে অফিস। আজ সন্ধের মধ্যে সবাই ফিরবে। আজ রাত্তিরে কেউ আর আড্ডা দেবে না। তবু দীপ একটু পরেই ফোন করল বাল্লুকে। পেয়েও গেল। গম্ভীরভাবে জিগ্যেস করল, বাল্লু, আমার আজ রাত্তিরে রান্না করতে ইচ্ছে করছে না, তোর ওখানে গেলে খেতে দিবি? কিংবা, ডাউন-টাউনে আমার সঙ্গে খেতে যাবি কোথাও?

বাল্লু বলল, আমার এখানেই চলে আয়! দীপ এইরকম একা থাকে বলে সবাই অবাক! অত ভালো একটা অ্যাপার্টমেনট কিনেছে কেন তবে? বিয়ে করবার ইচ্ছে যদি তার নাও থাকে, একজন সঙ্গিনী তো পেতেই পারে। জুডি নামের মেয়েটির সঙ্গে দীপ স্টেডি যাচ্ছে অনেকদিন। জুডির ভারী মিষ্টি স্বভাব। অন্য সবাই পছন্দ করে তাকে।

দীপ বিয়ের কথা একেবারেই ভাবে না।

জুডিকে সে পছন্দ করে খুবই, জুডির ব্যবহারে কোনও মালিন্য নেই, জুডি তার মন বোঝে। শারীরিক সম্পর্কও বেশ পরিষ্কার। কিন্তু জুডির সঙ্গে লিভ টুগেদার করার ইচ্ছে নেই দীপের। জুডির মনে-মনে ইচ্ছে আছে তা সে বোঝে, কিন্তু জুডি মুখ ফুটে কথাটা বলেনি। জুডিকে অন্য একটি মেয়ের রুম শেয়ার করে থাকতে হয় কুইনসে, দীপ একবার বললেই সে চলে আসবে।

দীপ একবার বললেই সে চলে আসবে।

কিন্তু দীপ সর্বক্ষণ জুডিকে চায় না।

জুডি তার এখানে এসে একসঙ্গে থাকলে অন্য বাঙালিরা বা তার বন্ধুরা কী বলবে, তা গ্রাহ্য করে না দীপ। যেদিন ইচ্ছে করবে, সেদিনই সে জুডিকে ডাকবে। কিন্তু এখনও তার একা থাকতে ভালো লাগে মাঝে-মাঝে।

পরদিন সকালবেলা পুরো সাজপোশাক করে অফিসে বেরুতে গিয়ে দীপ একবার ভাবল, গাড়ি নেবে, না সাবওয়েতে যাবে? বরফের মধ্যে গাড়ি চালানো এক ঝকমারি। দীপের বাড়ির কাছেই স্টেশন, তিন মিনিটে হেঁটে যাওয়া যায়।

তারপর মনে পড়ল, জুডি গাড়ি আনে না, ওদের অফিসের কাছে পার্কিং-এর কোনও জায়গাই পাওয়া যায় না। তিনদিন পর দেখা হবে, আজ জুডিকে নিয়ে কোথাও খেতে যাওয়া এবং তারপর তার নিজের বাড়িতে ওকে কিছুক্ষণের জন্য আনা কিংবা জুডিকে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া তার উচিত।

গাড়ির চাবিটা সে নিয়ে নিল।

আজই ব্রুকলিনে ব্রিজের ওপর সাংঘাতিক জ্যাম।

এখান থেকে নিউইয়র্ক শহরটা অপূর্ব দেখায়, এতবার দেখে-দেখেও দীপ মুগ্ধতা হারায়নি, কিন্তু আজ তার সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল। অফিসের দেরি হয়ে যাচ্ছে, কেন সে গাড়িটা আনতে গেল?

রেডিওটা খুলে সে ট্রাফিক পোজিশান জানার চেষ্টা করল।

বিশ্রী খবর, সামনের তিন-চার জায়গায় গাড়ির জটলা। কখন ঠিক হবে, তার কোনও ঠিক নেই। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ছটফট করতে লাগল দীপ। অফিসের দেরি হয়ে যাবে, এটা সে সহ্য করতে পারবে না! অথচ ট্রাফিক জ্যাম কি নতুন কিছু? অফিসের লোকরাও জেনে যাবে ব্রুকলিন ব্রিজের অবস্থা!

দীপের ইচ্ছে হল, গাড়ির দরজা খুলে নেমে চাবিটা জলে ছুড়ে ফেলে দিতে। তারপর সে হেঁটে চলে যাবে। গাড়িটা থাক এখানে পড়ে। পেছনের লোকগুলো চেঁচামেচি করুক।

পুলিশ এসে গাড়িটা টো করে নিয়ে যাক, যত ইচ্ছে ফাইন হোক, যা খুশি হোক, তবু দীপ কিছুতেই এখানে বসে থাকতে পারবে না।

গাড়ি থেকে নেমে দীপ আবার ধাতস্থ হল। এটাও পাগলামির লক্ষণ। এভাবে গাড়ি ছেড়ে যাওয়াটা চলে না।

দীপ অফিসে পৌঁছল ঠিক পঁয়তাল্লিশ মিনিট দেরিতে।

বিভিন্ন সহকর্মীদের দিকে তাকিয়ে সে হাই ল্যারি, হাই বার্ট, হাই লিন্ডা এইসব বলতে-বলতে এগোল। তার দেরি বিষয়ে কেউ কোনও প্রশ্ন করল না। সে পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে এসেছে। ছুটির পর আরও পঁয়তাল্লিশ মিনিট থেকে যাবে, এটা তো স্বাভাবিক ব্যাপার! নিজের ঘরে ঢুকে দীপ তার ওভারকোট, জ্যাকেট এমনকি সোয়েটার পর্যন্ত খুলে ফেলল। ভেতরটা বেশ গরম, কে বলবে যে বাইরের তাপমাত্রা এখন শূন্যের নীচে সাত ডিগ্রি। হঠাৎ শীত এসেছে! অথচ শীতকালেই অফিসের মধ্যে দীপের বেশি গরম লাগে।

কাজে ডুবে রইল তিন ঘণ্টা। এর মধ্যে দুবার বসের ঘরে যেতে হল, টেলিফোন ধরল এগারো বার। দু-কাপ কফি খেল, দুজন সহকর্মী ও একজন সহকর্মিনী গল্প শোনাল উইক-এন্ডের ছুটিতে কী-কী মজা হয়েছে।

দীপ কীভাবে ছুটি কাটিয়েছে তা অন্যরা জানতে চাইলে সে অম্লানবদনে বলল, তিনখানা ঘরের ওয়ালপেপার বদল করেছি, খুব খাটুনি গেছে।

এরপর সামান্য একটা ঘটনা ঘটল।

টেবিল থেকে একটা পেপার ওয়েট পড়ে গেল নীচে। সেটা তোলার বদলে দীপ প্রায় যেন নিজের অজান্তেই সেটাকে একটা শট লাগাল। খুব জোরে। এত জোরে যে ফাইবার গ্লাসের পার্টিশানে সেটা লেগে বোমা ফাটার মতন দড়াম করে একটি শব্দ হল।

পাশের ঘর থেকে তার সহকর্মী ল্যারি উঠে এসে উঁকি মেরে জিগ্যেস করল, হোয়াট হ্যাপনড্?

দীপ কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, নার্থিং।

ল্যারিও বিনা বাক্যব্যয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে ফিরে গেল।

পেপার ওয়েটটার দিকে তাকিয়ে দীপ দাঁতে দাঁত চেপে খুব খারাপ একটা গালাগালি দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল, এনাফ ইজ এনাফ! ঠিক পরের মুহূর্তেই তার ঘরে এলো বার্ট লিন্ডা।

বার্ট দীপেরই সমবয়সী, লিন্ডা বছর দু-একের ছোট। কিন্তু পদ-মর্যাদায় লিন্ডা একটু ওপরে। লিন্ডা বিয়ে করেনি, তার মন-প্রাণ সবকিছু সে অফিসের কাজে ঢেলে দেয়।

তেমন লম্বা নয় লিন্ডা, একটু ভারীর দিকে গড়ন, কিন্তু মুখে একটা শ্রী আছে। সে কেন বিয়ে করেনি, সেটা একটা রহস্য, তার কোনও বয়ফ্রেন্ডও নেই। লিন্ডার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কোনও প্রশ্নও করা যায় না, কখনও সেরকম প্রসঙ্গ উঠলেই সে এড়িয়ে যায়। বার্ট বেশ খোলামেলা, হাসিখুশি ধরনের মানুষ। শুধু সে দীপের সহকর্মী নয়, তার সঙ্গে সম্পর্কটা অনেকটা বন্ধুর মতন। বার্ট বিবাহিত, লিন্ডার সঙ্গে তার হৃদয়-ঘটিত কোনও গোলযোগ নেই।

লিন্ডা বসল একটা চেয়ার টেনে, বার্ট বসল টেবিলের এক কোণে। দীপের সিগারেটের প্যাকেটটা তুলে নিয়ে বলল, আবার তুমি সিগারেট খাচ্ছ? বলেছিলে যে অফিসে একটাও খাবে না? দীপ ক্লিষ্ট ভাবে হেসে বলল, ছাড়তে পারছি না যে!

লিন্ডা বলল, সিগারেট ছাড়ার প্রথম স্টেপ হল, কাছাকাছি সিগারেট না রাখা। চোখের সামনে একদমই প্যাকেট রাখবে না। যাই হোক, তুমি আজ লাঞ্চ খেতে কোথায় যাচ্ছ? যদি কোনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট না থাকে, আমাদের সঙ্গে চলো। তোমার মিনিয়াপোলিস ট্রিপটা সম্পর্ক সব কিছু ব্রিফ করে দেব!

দীপ অবাক হয়ে বলল, মিনিয়াপোলিস ট্রিপ মানে?

বার্ট বলল, তোমাকে মিনিয়াপোলিস যেতে হবে। মনে নেই? গত সপ্তাহে কথা হয়েছিল। মিঃ জ্যাকসন তোমাকেই পাঠাতে চাইছেন।

একটা ইনস্টলেশানের ব্যাপার আছে। বোধহয় দিনচারেক লাগবে তোমার।

দীপ দূরের পেপার ওয়েটটার দিকে আবার তাকাল।

যেমনভাবে পেপার ওয়েটটা আচমকা মেঝেতে পড়ে গিয়েছিল, সেই রকমই সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে দীপ বলল, আমি তো মিনিয়াপোলিস যেতে পারব না। আমি বাড়ি যাব, ইন্ডিয়ায়।

বার্ট বলল, হোম, সুইট হোম। বাড়ি যেতে কার না ইচ্ছে হয়। কিন্তু মাই ডিয়ার, তুমি তো জানুয়ারির আগে তোমার অ্যানুয়াল ছুটি নিতে পারছ না। জর্জ আর জিমি দুজনেই ছুটিতে। লিন্ডা বলল, তুমি জানুয়ারিতে চার-পাঁচ সপ্তাহ ছুটি নিতে পারো। তখন ইন্ডিয়ার ওয়েদার কী রকম?

দীপ বলল, অ্যানুয়াল ছুটি নয়। আমি একেবারে দেশে ফিরে যাব। লক স্টক অ্যান্ড ব্যারেল!

বার্ট ভুরু তুলে বলল, হোয়াট? আর ইউ কিডিং?

দীপ দু-দিকে ঘাড় নাড়ল।

না, সে ঠাট্টা করছে না। একবার মুখ ফসকে যখন কথাটা বেরিয়ে গেছে, তখন আর নড়চড় হবে না সে কথার। এনাফ ইজ এনাফ। তার আর ভালো লাগছে না। সেসব কিছু ছেড়ে দেশে চলে যাবে।

সারা অফিসে রটে গেল যে ডীপ রে মিনিয়াপোলিস যেতে হবে শুনে চাকরি ছেড়ে দিচ্ছে। সেখানকার একটা ফ্যাকট্রিতে কয়েকটা মেশিন ইনস্টলেশান নিয়ে ঝঞ্ঝাট হচ্ছে কিছুদিন ধরে। একটা বয়লার বার্স্ট করে দুজন লোক আহত হয়েছে পর্যন্ত।

আসল নাম ছিল দীপক রায়চৌধুরী। ও নাম উচ্চারণ করতে এখানকার লোকের দাঁত ভেঙে যায়। তাই দীপক হয়েছে ডীপ। আর যে পদবিটা এদের অনেকেরই চেনা।

একটু পরে দরজায় নক করে আবার ঘরে এসে ঢুকল লিন্ডা।

হাসিমুখে বলল, ওকে ডীপ, তোমার মিনিয়াপোলিস যেতে হবে না। মিঃ জ্যাকসনকে আমি কনভিনস করিয়েছি, তোমার বদলে ল্যারি যেতে পারে।

দীপ খানিকটা চটে উঠে বলল, হোয়াট? কে তোমাকে বলেছে যে ওখানে যাওয়ার ভয়ে আমি চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি! ওখানে যেতে আমার কোনও আপত্তি ছিল না। আমার মনে হয় না, কাজটা খুব ডিফিকাল্ট! আমি চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি, তার কারণ, দু-একদিনের মধ্যেই আমি দেশে ফিরে যেতে চাই!

লিন্ডা খুব নরম ভাবে জিগ্যেস করল, দেশে ফেরার জন্য তোমার এত আর্জেন্সি কীসের তা কি জানতে পারি? এই কোম্পানির কেউ তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে? তুমি কি কোম্পানির কাছ থেকে আরও কিছু আশা করেছিলে?

লিন্ডা নিজের ব্যক্তিগত কারণ কারুকে বলে না। তবে সে দীপের ব্যক্তিগত কারণ জানতে চায়। দীপের মতন একজন অশ্বেতাঙ্গ ইঞ্জিনিয়ার চাকরি ছেড়ে দিচ্ছে, তাতে কোম্পানির কী আসে যায়? তার বদলে আরও অনেককে পাবে। তবু লিন্ডার মতন মেয়ে এরকম একটা প্রশ্ন করেছে বলেই একটা উত্তর দিতে হয়।

দীপ লিন্ডার চোখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বলল, কারণটা শুনলে বোধহয় তোমরা হাসবে! এদেশে কেউ এরকম কথা বলে না। কিন্তু আমাদের দেশে অনেক পুরোনো ট্র্যাডিশান, পুরোনো ভ্যালুজ রয়ে গেছে। আমি ফিরে যাচ্ছি আমার মায়ের জন্য! তোমার মায়ের জন্য?

হ্যাঁ। কয়েকদিন ধরে আমার মায়ের কথা খুব মনে পড়ছে। আমাকে ছেড়ে থাকতে আমার মায়ের খুব কষ্ট হয়। প্রায়ই কান্নাকাটি করেন। চোখে ভালো দেখতে পান না। তাই আমার ইচ্ছে হচ্ছে, শেষের কয়েকটা বছর মায়ের কাছে গিয়ে থাকতে!

লিন্ডা যেন এরকম কথা কখনও শোনেনি।

সেকথায় হাঁ করে চেয়ে রইল বেশ কয়েক মুহূর্ত।

তারপর আস্তে-আস্তে বলল, চাকরি ছেড়ে দিয়ে তোমার মার কাছে থাকবে? কোথায় থাকে তোমার মা?

কলকাতা শহর থেকে কিছুটা দূরে। একটা গ্রামে একা।

উনি কোনও কাজ-টাজ করেন?

না, লিন্ডা। আমার মা এখন কোনও কাজ করেন না। করতে পারেন না। তবে প্রায় সারা জীবন একটা স্কুলে পড়িয়েছেন। এখন চোখে ভালো দেখতে পান না বলে রিটায়ার করেছেন।

তোমার মা সম্পর্কে আরও কিছু বলো, ডীপ। তোমার বাবা বেঁচে নেই নিশ্চয়ই।

না, আমার যখন পাঁচ বছর বয়েস, তখন বাবা মারা যান। আমার মায়ের বয়েসও তখন মাত্র ছাব্বিশ।

উনি কি আবার বিয়ে করেছিলেন?

না, লিন্ডা, আমাদের দেশের বিধবারা চট করে বিয়ে করেন না। কোনও বাধা নেই। তবু অনেকেই...আমার মা অবশ্য বিয়ে করতে পারতেন, আমার গ্র্যান্ড ফাদার খুব লিবারাল ছিলেন, মায়ের অত কম বয়েস, দেখতেও সুন্দরী ছিলেন বেশ। কিন্তু মা আমার জন্য সবকিছু স্যাক্রিফাইস করলেন। মা রঙিন পোশাক পরতেন না, সিনেমা-থিয়েটার দেখতে যেতেন না। শুধু আমাকে মানুষ করে তোলাই ছিল তাঁর একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান। মা দুপুরে স্কুলে পড়াতেন, আর সকাল-সন্ধে আমাকে নিয়ে পড়াতে বসতেন। মায়ের জন্যই আমি বরাবর ভালো রেজাল্ট করেছি। ইঞ্জিনিয়ার হয়েছি।

আরও বলো। আরও বলো তোমার মায়ের কথা।

আমি যখন আমেরিকায় পড়তে আসি, তখন প্লেন ভাড়ার টাকা জোগাড় করাই এক সমস্যা হয়েছিল। আমি বন্ধুদের কাছ থেকে ধার করব ভেবেছিলাম, তার আগেই মা তাঁর গয়না সব বিক্রি করে দিলেন। গয়না বেশি ছিল না, কিন্তু শেষ টুকরোটা পর্যন্ত বিক্রি করে...আমার জন্য মা সব কিছু করতে পারতেন। পরে আমি জানতে পেরেছি, একসময় যখন আমাদের খুবই টাকার টানাটানি ছিল, তখন মা নিজে না খেয়ে আমাকে সবকিছু ঠিকঠাক দিতেন, অভাব-অনটনের কথা আমাকে টেরই পেতে দিতেন না।

তোমার মাকে এখন এদেশে নিয়ে এসো তাহলে। এখানে ভালো থাকবেন। তুমি চাকরি ছাড়বে কেন, ডীপ। তোমার মাকে এনে তোমার কাছে রাখো।

এখন আর সেটা সম্ভব নয়। অনেক দেরি হয়ে গেছে। মা চোখে দেখতে পান না ভালো, এখন আর ততদূর ট্রাভল করতে পারবেন না। আমাকেই যেতে হবে।

লিন্ডা চুপ করে দীপের দিকে চেয়ে রইল। তার মুখখানি করুণ। দীপ সম্পর্কে লিন্ডার এতখানি আগ্রহ দেখবার কারণটা যেন দীপ খানিকটা আন্দাজ করতে পারছে। এ-অফিসে আর একজনও অশ্বেতাঙ্গ নেই। কেউ দীপকে কখনও অপমান করেছে কি না, কিংবা দীপের ওপর কোনও অবিচার হয়েছে কিনা, সেসবই বোধহয় লিন্ডা জানতে চায়।

দীপের অবশ্য সেরকম অভিজ্ঞতা অন্য দু-এক জায়গায় হলেও এই অফিসে হয়নি। অফিস সম্পর্কে তার কোনও ক্ষোভ নেই। টাকাকড়ি ভালোই তো দেয়!

লিন্ডা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তাহলে আর তোমাকে বাধা দিতে চাই না দীপ। তুমি যখন মন স্থির করে ফেলেছ, হয়তো ঠিকই করেছ! অফিস থেকে রিলিজ পেতে তোমার যাতে অসুবিধে না হয়, সেটা আমি দেখব!

ছুটির পর জুডিকে তার অফিস থেকে তুলে নিল দীপ। পার্ক অ্যাভেনিউ-এর এক দামি রেস্তোরাঁয় খেতে গেল। প্রথমে কিছুই জানাল না। জুডি আজ একটা গাঢ় লাল রঙের স্কার্ট পরে

এসেছে। তার ব্লন্ড চুলের সঙ্গে দারুণ মানিয়েছে পোশাকটা।

কানেটিকাটে জুডির দিদির বাড়ির গল্প শুনতে-শুনতে একসময় ফস করে দীপ বলল, আমি দেশে ফিরে যাচ্ছি, জুডি। চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি!

অফিসের সহকর্মীদের যা-যা বলেছিল, সবটাই শুনিলে নিল ও জুডিকে।

জুডি ঈষৎ ম্লান গলায় বলল, ক'দিন ধরে কেন যেন মনে হচ্ছিল, আমাদের দুজনের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে। তবু আমি নিজেকে প্রস্তুত করতে পারিনি, দীপ। অন্য কোনও মেয়েকে তোমার ভালো লেগেছে?

আরে না, না, আমি এ-দেশ ছেড়েই চলে যাচ্ছি। চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি।

কেন ছেড়ে দিচ্ছ?

বললাম যে, আমার মায়ের জন্য। মায়ের কাছে গিয়ে থাকব।

তোমার মায়ের কথা আগে আমাকে কখনও বলোনি তো। একবার উল্লেখ করোনি।

বান্ধবীর কাছে মায়ের গল্প করে নির্বোধরা। তা ছাড়া এমনভাবে মায়ের কথা মনেও পড়েনি আগে।

তোমার মায়ের সঙ্গে তো আমার প্রতিযোগিতা চলে না। একমাত্র এই কারণটার জন্যই আমি তোমাকে বাধা দিতে পারি না। অন্য কোনও কারণ হলে বলতাম, তুমি চলে যেও না। থাকো।

আমি মনস্থির করে ফেলেছি, জুডি। আমার মন আর এখানে টিকছে না। আর বেশিদিন থাকলে আমার মাথার গোলমাল হয়ে যাবে। আমাকে যেতেই হবে।

আজ রাত্তিরটা আমি তোমার সঙ্গে থাকতে পারি? তোমার বাক্স গুছিয়ে দেব?

দুদিনের মধ্যেই ম্যানহাটন, ব্রুকলিন, নিউ জার্সির সমস্ত পরিচিতরা জেনে গেল যে দীপ হঠাৎ এদেশের পাট চুকিয়ে দিয়ে ফিরে যাচ্ছে দেশে। বুড়ি মায়ের কাছে গিয়ে থাকবে শুনে হাসাহাসি করতে লাগল অনেকে। কেউ-কেউ বলল, আহা দুধের বাছা রে! মায়ের আঁচলের হাওয়া খাবে! কেউ-কেউ বলল, ওসব আদিখ্যেতা ঘুচে যাবে দুদিনেই। একবার কলকাতার গরম লোডশেডিং আর মিছিলের মধ্যে গিয়ে পড়ুক না। বাপের নাম পর্যন্ত ভুলিয়ে দেয়। কোনও চাকরি-বাকরি পাবে না, সবাই খারাপ ব্যবহার করবে, টাকাপয়সা ফুরিয়ে এলে ওর মা-ই আবার বলবেন, যারে খোকা, আমেরিকায় গিয়ে কিছু রোজগার করে নিয়ে আয়! বাল্লু সিনহা অবাঙালি বিহারের ছেলে, কিন্তু দীপের অন্যান্য বাঙালি বন্ধুদের চেয়েও বাল্লু তার সবচেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠ। দুজনে এক সঙ্গে অনেকদিন পড়েছে, দেশে ও এখানে।

আরও দু-একদিন বাদে বাল্লু হঠাৎ হাজির হয়ে বলল, সবাই যেটা জানে, সেটা তুই আমাকে বলিসনি কেন রে, রাস্কেল?

দীপ মুচকি হেসে বলল, টিকিটটা কাটার আগে তোকে জানাতে চাইনি! তুই নির্ঘাত বাধা দিতিস। আজই বুকিং কনফার্মড হয়ে গেছে। আমি শনিবার যাচ্ছি!

তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?

প্রায় খারাপ হয়ে যাচ্ছিল রে! এখন আবার ঠিক হয়ে গেছে।

যেই ফাইনাল ডিসিশানটা নেওয়া হয়ে গেল, তারপর থেকেই মাথাটা সুস্থির হল।

কেন ফিরে যেতে চাস, আমায় বুঝিয়ে বলবি?

আমার ভালো লাগছিল না রে, একদম ভালো লাগছিল না।

তোর অফিসের লিন্ডা বলে মেয়েটার সঙ্গে দেখা হল ট্রেনে। তার মুখে একটা অদ্ভুত কথা শুনলাম। তুই নাকি তোর মার জন্য ফিরে যাচ্ছিস? মার কাছে গিয়ে থাকবি?

দীপ এবার কোনও উত্তর না দিয়ে মিটিমিটি হাসতে লাগল।

বাল্লু চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে কাবার্ড খুলে একটা স্কচের বোতল খুঁজে বার করল। দুটো

গেলাসে খানিকটা করে ঢেলে এনে, নিজে প্রথমে একটা চুমুক দিয়ে বলল, তুই কবে থেকে এরকম গুলবাজ হয়েছিস রে, দীপু? সবাইকে বলেছিস, তোর মায়ের জন্য ফিরে যাচ্ছিস? তোর মা, দাঁড়া, তারিখটা মনে করি, ফোর্থ ডিসেম্বর, চার বছর আগে ওইদিন টেলিগ্রাম এল তোর মা মারা গেছেন।

আমার মনে নেই ভাবছিস? চার বছর আগে তোর মা মারা গেছেন, তুই তাঁর কাছে ফিরে যাবি?

দীপ চুপ করে রইল।

বাল্লু বলল, বীরেনদা, সুরূপাবউদি, রণজয়, স্বপন আরও অনেকেই জানে যে তোর মা বেঁচে নেই, তুই তাদের কী করে ধাপ্পা দিবি?

দীপু তবু কোনও কথা বলল না।

বাল্লু, আর-এক চুমুকে গেলাস শেষ করে বলল, এটা কি ফর অফিস কনজাম্পশন? কেন, অফিসকে এরকম একটা মিথ্যে কথা না বললে কি তোকে ছাড়ত না? এমনিই ছেড়ে দিত। বড় জোর তিন মাসের নোটিশ দিতে বলত! ও বুঝেছি, এটা রটিয়েছিস জুডিকে বোঝাবার জন্য। মা-মা বলে কেঁদে ফেলে তুই জুডির কাছ থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিস! সে একটা ভালো মেয়ে। তার কাছে এরকম একটা বাজে মিথ্যে কথা বলাটা আমি মোটেই পছন্দ করছি না!

দীপ এবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, হঠাৎ মায়ের কথাটা মুখে এসে গিয়েছিল, তা ঠিকই। কিন্তু পুরোটাই কি মিথ্যে? মা বেঁচে না থাকলেও কি মায়ের কাছে ফেরা যায় না?

বাল্লু ভুরু কুঁচকে বলল, তার মানে?

দীপ বলল, ভালো করে ভেবে দ্যাখ। দুবার বলতে হবে কেন?

আবার খানিকটা হুইস্কি ঢেলে বাল্লু বলল, অ্যাবস্ট্রাক্ট মাদার নিজের মা নয়, দেশমাতৃকা। তুই দেশ জননীর কাছে ফিরে যেতে চাস? হঠাৎ তোর এরকম পেট্রিয়টিক ফিলিং কী করে জেগে উঠল রে?

দীপ বলল, না, না, ওসব কিছু নয়। আমি সাধারণ মানুষ, দেশ-টেশ নিয়ে কখনও মাথা ঘামাইনি। অতবড় দেশ তোর আমার মতন কয়েকজনকে বাদ দিয়েও দিব্যি চলবে। এখনও তো চলছে। আমি শুধু ভেবেছি আমার মায়ের কথা। আমার মা চাপা স্বভাবের ছিলেন, মুখে কিছু বলতেন না, চিঠিতেও পীড়াপিড়ি করেননি। কিন্তু মনে মনে খুব চাইতেন আমি ফিরে যাই। মা খুব কষ্ট করে আমাকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন, তারপর তাঁর ইচ্ছে ছিল, বিলেত-আমেরিকা থেকে একটা ডিগ্রি নিয়ে আমি তাঁর কাছাকাছি থাকব। দেশে চাকরি তো একটা পেতামই!

ইডিয়েট, তাহলে তোর মা যখন বেঁচে ছিল, তখন ফিরলি না কেন? তখন তোর এই বোধটা হয়নি! তাহলে তো কিছুদিন অন্তত খুশি করতে পারতিস।

তখন একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম।

ঘোর মানে? চার বছর আগে জুডির সঙ্গে তো তোর আলাপ হয়নি!

সে ঘোরের কথা বলছি না। ধর, তুই আর আমি একসঙ্গে এম এস পড়তে এলাম। প্রথম বছরটা আমাদের কী সাংঘাতিক কষ্ট করতে হয়েছিল মনে আছে? গুণে-গুণে পয়সা খরচ করতাম। ভালো করে কিছু খেতাম না পর্যন্ত। তারপর তো এম এসটা হল। তখন তুই-ই বললি, আয় পি-এইচ-ডি-টাও করা যাক। আরও তিন বছর। তারপর কী করলাম এতদিন পড়াশুনার কষ্ট করেছি, এবার চাকরি করে সবটা উশুল করা যাক। ঝট করে পেয়ে গেলাম চাকরি। একটা ছেড়ে আর একটা। বেশি টাকা। নতুন গাড়ি। বাড়ি কেনা। বান্ধবী। এইগুলোই তো ঘোর।

কেন, আমরা দেশে টাকা পাঠাইনি? প্রত্যেক মাসে দুশো ডলার, নট আ ম্যাটার অফ জোক।

হ্যাঁ, আমি মনে করতাম, টাকা পাঠালেই সব দায়িত্ব চুকে যায়। এটাও একটা ঘোর।

দ্যাখ, দীপু, দেশে ফিরে যাওয়া মানে কি বেকারের সংখ্যা বাড়ানো নয়? তুই বা আমি চাকরি পেয়ে যেতে পারি, কিন্তু তার ফলে আর দুটো ছেলে তো বেকার হবে। চাকরির সংখ্যা তো বাড়বে না? আমি তো মনে করি, দেশে ফিরে গাদাগাদি না করে, এখান থেকে যে আমরা ফরেন এক্সচেঞ্জ পাঠাচ্ছি, তাতেই দেশের যথেষ্ট উপকার করা হচ্ছে।

তোর কথা খানিকটা আলাদা রে বাল্লু। তোর আরও ভাই-বোন আছে। মা-বাবা দুজনেই বেঁচে। তুই এখানে বিয়ে করেছিস, তোর একটা বাচ্চা ইস্কুলে যায়। তোর পক্ষে এক্ষুনি ফেরা মুশকিল। না ফিরলেও ক্ষতি নেই। কিংবা তাড়াহুড়ো করার কিছু নেই। কিন্তু আমার এখনও এখানে শেকড় গাড়েনি!

শেকড় আমারও গাড়েনি। আমিই বরং ইচ্ছে করলে যে-কোনওদিন ফিরে যেতে পারি। কিন্তু তোর যুক্তিটা আমার মাথায় কিছুতেই ঢুকছে না। তোর বাবা-মা কেউ নেই। খুব কাছের আত্মীয় কেউ নেই। তুই ফিরতে যাবি কোন দুঃখে? তুই-ই বরং এখানে মজাসে থাকতে পারিস।

আমার ভালো লাগছে না। ভালো লাগছে না। কিচ্ছু ভালো লাগছে না।

সাময়িক ডিপ্রেশন। তুই বরং এক কাজ কর। ছুটি নিয়ে কিছুদিন দেশ থেকে ঘুরে আয়। যাসনি তো অনেকদিন। দেশের অবস্থা দেখলেই তোর এই ঘোরটাও কেটে যাবে। ওখানে কোনও মানুষ থাকতে পারে? যারা বাধ্য হয়ে পড়ে আছে, তাদের কথা আলাদা। ব্লাডি পলিটিশিয়ানরা দেশটার সর্বনাশ করে দিচ্ছে। পরিমলের কথা মনে আছে? দেশে ফিরে গিয়ে নিজের টাকায় একটা কারখানা খুলল। বেশ ভালোই চলছিল, তারপর হঠাৎ কিছু বদমাশ এসে স্ট্রাইক করে কারখানাটা তুলে দিল। গর্ভনমেন্ট কোনও সাহায্যই করল না। পরিমল আবার ফিরে এসেছে, এখন দেশের নাম শুনলে চটে যায়।

আমার মায়ের হঠাৎ স্ট্রোক হল, আমি যখন খবর পেলাম, তখন সব শেষ! গিয়ে শেষ দেখাটাও হল না।

ডোনট বি সেন্টিমেন্টাল দীপু। যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে। চার বছর আগে। এখন আর তা নিয়ে আপশোশ করে কী হবে?

মা নেই, কিন্তু মায়ের ইচ্ছেটা তো রয়ে গেছে? মা চেয়েছিলেন...।

আরও তো অন্য মা আছে। আরও কোনও বুড়ি, চোখে ছানি পড়ে গেছে, ভালো দেখতে পায় না তার ছেলে চলে গেছে কোথায়। সেরকম একটা বুড়ির পাশে বসব, তার গায়ে হাত বুলিয়ে বলব, মা, দ্যাখো, আমি ফিরে এসেছি!

দিস ইজ আটারলি রিডিকুলাস। তোর কি সত্যি মাথা-টাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি রে, দীপু?

বোধহয় তাই!

এরকম তর্ক-বিতর্ক চলল অনেক রাত পর্যন্ত। কিন্তু দীপু গোঁয়ারের মতন জেদ ধরে আছে, সে কিছুতেই মত পালটাবে না। সে যাবেই। সব ছেড়ে-ছুড়ে চলে যাবে!

বাল্লু খুব রাগ করে চলে গেল।

শনিবার দিন দীপের ফ্লাইট সন্ধেবেলা। সকাল ন'টার সময় লিন্ডা টেলিফোন করে জিগ্যেস করল, দীপু, তোমার কাছে একবার আসতে পারি? তুমি নিশ্চয়ই খুব ব্যস্ত। আমি বেশিক্ষণ সময় নেব না।

দীপু বলল, অফ কোর্স, অফ কোর্স। ইউ আর ওয়েলকাম। আমি মোটেই ব্যস্ত নই!

টেলিফোন রেখে দীপ গালে হাত দিয়ে বসে রইল।

লিন্ডা হঠাৎ আসতে চাইছে কেন? লিন্ডার সঙ্গে তার কোনওরকম ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা হয়নি কখনও। লিন্ডা সবসময়েই তার সঙ্গে ভদ্র ও ভালো ব্যবহার করেছে, কিন্তু সবটাই ফর্মাল! অফিসের

বাইরে কক্ষনো যোগাযোগ হয়নি তাদের। অফিসের সঙ্গে তো সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছে দীপ। লিন্ডা অবশ্য সাহায্য করেছে সে ব্যাপারে।

আধ ঘণ্টা পরে এসে উপস্থিত হল লিন্ডা।

দীপ তাকে দরজা খুলে ভেতরে এনে বসাল। শয়নকক্ষ ও বসবার ঘরের চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে লিন্ডা জিগ্যেস করল, তোমার এখানে আর কেউ নেই?

দীপ বলল, না। এখন কেউ নেই। বন্ধুরা আসবে দুপুরে।

এতে যেন বেশ স্বস্তিবোধ করল লিন্ডা।

দীপ তার ওভারকোটটা খুলে দিল। একটা হালকা নীল পোশাক পরে এসেছে লিন্ডা। হাতে সাদা রঙের গ্লাভস। তার মুখে লজ্জা-লজ্জা ভাব।

গ্লাভস দুটো খুলতে-খুলতে লিন্ডা বলল, তুমি নিশ্চয়ই খুব অবাক হয়েছ? তোমাকে একটা কথা জানাতে এলাম। সেটা শুনলে তুমি আরও চমকে যাবে। কিংবা অবিশ্বাস করবে? তবু বলি। নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।

কী করে শুরু করব, ঠিক বুঝতে পারছি না। প্রথম থেকেই বলি, সেদিন তোমার কথা শুনে আমি বাড়িতে গিয়ে খুব কেঁদেছিলাম!

সে কি! কোন কথা শুনে লিন্ডা? আমি কি কোনও কারণে তোমাকে আঘাত দিয়েছি?

হ্যাঁ, আঘাত দিয়েছ তো বটেই। আমার মনের খুব ভেতরের একটা জায়গায় খুব জোরে আঘাত দিয়েছ! অবশ্য, তুমি না জেনেই—আমি এখনও বুঝতে পারছি না লিন্ডা।

সেদিন তুমি তোমার মায়ের কথা বললে।

আমি জানি, ইন্ডিয়া গরিব দেশ! এখানে তুমি ভালো চাকরি করতে, দেশে গিয়ে এরকম আরামে থাকতে পারবে না! তোমার অনেক কষ্ট হবে। তবু তুমি সব ছেড়ে চলে যাচ্ছ তোমার মায়ের জন্য। তোমার মায়ের কাছে থাকবে বলে। এটা আমার চেতনাকে কাঁপিয়ে দিয়েছে!

কেন? কেন?

মা আর সন্তানের এইরকম সম্পর্কের কথা আমি জানতাম না। কখনও দেখিনি, শুনিওনি। আমার মা নেই, কোনওদিন ছিলও না!

তার মানে? কোনওদিন ছিল না মানে?

বড় বেশি ব্যক্তিগত কথা হয়ে যাচ্ছে, তুমি কিছু মনে করবে না তো?

মোটেই না। তুমি বলো।

আমার জন্মের ছ'মাস পরেই আমার মা আমাকে ছেড়ে চলে যায়? আমি আনওয়ান্টেড চাইল্ড। মা অ্যাবরশন করতে চেয়েও শেষপর্যন্ত করেনি। আমি আমার সেই জননীর স্বামীরও সন্তান নই, অন্য একজনের তাই নিয়ে দুজনের ঝগড়া হয়। তারপর সেপারেশন, ডিভোর্স। মা আমাকে ফেলে পালায়। আর কোনওদিন আমার খোঁজ করেনি।

আই অ্যাম সরি টু হিয়ার দ্যাট। ভেরি সরি, লিন্ডা!

আমাকে যে জন্ম দিয়েছিল, সেই স্ত্রীলোকটি আমাকে এই পৃথিবীতে আনতে চায়নি। আমার সম্পর্কে তার কোনও টান ছিল না। আমি তার ছবি দেখিনি। তার মুখ কেমন দেখতে তাও জানি না। যার ঔরসে আমার জন্ম, তার পরিচয়টাও জানাজানি হয়নি। সুতরাং আমার বাবাকেও আমি চিনি না। আইনত যিনি আমার পিতা, তিনি অবশ্য দয়ালু মানুষ ছিলেন, আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন, আমার জন্য ওয়েট নার্স রেখেছিলেন, একটু বড় হলে আমাকে হস্টেলে পাঠিয়ে দেন। কিছুদিন পর্যন্ত আমার পড়ারও খরচ দিয়েছেন। আমি ভাগ্যিস লেখাপড়ায় ভালো ছিলাম, তাই এ পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছি। নইলে সমাজের অনেক নীচু স্তরে আমার স্থান হত। গোটা মাতৃজাতির ওপর আমার ঘৃণা আছে। নিজে বিয়ে করার কথা ভাবি না সেইজন্য!

তোমার কথায়, ব্যবহারে কোনওদিন সেই তিক্ততা ফুটে ওঠেনি!

পৃথিবীতে আমি একা। সবার সঙ্গে মানিয়ে চলার চেষ্টা করি। কিন্তু একজন মা আমাকে জন্ম দিয়ে ফেলে চলে গেছে, কোনওদিন আমায় আর দেখা দিল না। এটাও ভুলতে পারি না কিছুতে! সেদিন তুমি বললে, তুমি তোমার মায়ের কাছে ফিরে যেতে চাও। তোমার মা তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছেন। এটা যেন একটা অন্য জগতের কথা। এমন স্নেহের টান, পরস্পরের জন্য ব্যাকুলতা, আমার মনটা হুহু করতে লাগল, দীপ। আমি এসব কখনও পাইনি। তবু যে আমার ভেতরে একটা হাহাকার ছিল...

লিন্ডা হঠাৎ চুপ করে গেল।

দীপও মাথা নীচু করে রইল।

খানিকটা বাদে রুমাল দিয়ে নাক মুছে লিন্ডা বলল, আমি আর তোমার বেশি সময় নেব না। তোমাকে একটা অনুরোধ জানাব?

দীপ মাথা তুলে বলল, বলো!

লিন্ডা বলল, আমি তোমার মাকে একটা কিছু দিতে চাই। কী দেব, ভেবেই পাচ্ছিলাম না। ফুল দেওয়া যেত, কিন্তু তুমি ইন্ডিয়ায় পৌঁছতে-পৌঁছতে ফুল শুকিয়ে যাবে। কিছু খাবারও পাঠাবার কোনও মানে হয় না।

তোমার মা এদেশি পোশাক নিশ্চয়ই পরেন না। তাই ভাবলাম...

লিন্ডা তার হাত-ব্যাগ থেকে একটা সুন্দর বাক্স বার করল। সেটা খুলতেই দেখা গেল, তার মধ্যে একটা মুক্তোর মালা।

দীপ আঁতকে উঠে বলল, এ কী, এত দামি জিনিস? না, না।

লিন্ডা কুণ্ঠিতভাবে বলল, সেদিন তুমি বলেছিলে, আমেরিকায় আসার সময় তোমার টিকিট কাটার পয়সা ছিল না। তোমার মা নিজের সব গয়না বিক্রি করে দিয়েছিলেন। আমার মা নেই, আমি কি আমার দেশের পক্ষ থেকে তোমার মাকে এই গয়নাটা দিতে পারি না? তুমি প্রত্যাখ্যান কোরো না, প্লিজ! যদি নাও, আমার খুব ভালো লাগবে, আমার প্রাণ জুড়োবে! তাঁকে বলো, আমেরিকার এক অনাথিনী মেয়ে এক আদর্শ মাতৃত্বকে এই সামান্য উপহারটুকু দিয়েছে!

দীপ তখনও চুপ করে আছে দেখে লিন্ডা আবার বলল, আমার শিগগির ইন্ডিয়ায় যাওয়ার কথা আছে। তখন তোমার বাড়িতে যাব। তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা করব। তোমার মায়ের হাতের রান্না খেতে চাইলে তিনি খাওয়াবেন? দীপ মনে-মনে বারবার বলে যাচ্ছে, না, আমি মিথ্যে বলিনি, মিথ্যে বলিনি। মিথ্যে বলিনি। লিন্ডাকে ঠকাইনি। আমার মা সত্যিই আমার জন্য এক সময়...হয়তো একটু দেরি হয়ে গেছে আমার, কিন্তু মায়ের ইচ্ছেটা মিথ্যে হয়ে যায়নি।

একটু পরে মুখ তুলে, লিন্ডার দিকে স্পষ্ট চোখে তাকিয়ে দীপ বলল, হ্যাঁ, এসো তুমি ইন্ডিয়াতে। মাকে দেখবে। ভারতীয় মা। গ্রামে, মাটির ঘরে বসে আছেন। চোখে ভালো দেখতে পান না। বসে আছেন তাঁর সন্তানের প্রতীক্ষায়। তুমি এই মালাটা এখন রেখে দাও, যখন যাবে, নিজের হাতে তাঁকে দিও!

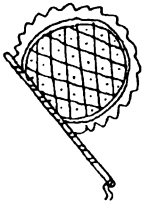

পুরোনো স্পর্শ

প্রথম দর্শনে বুকটা খুব দমে যায়। মনে হয় যেন সম্পূর্ণ একটা অচেনা বাড়ি! লোহার গেটের দু-পাশে দোকান ঘর, তারপর সরু এক চিলতে বাগান, তাতে কিছু চন্দ্রমল্লিকা নেতিয়ে আছে। একজন ছুতোর মিস্ত্রি চেয়ার সারাচ্ছে এক পাশে বসে। বাড়ির ভেতর থেকে একটি চোদ্দো-পনেরো বছরের ছেলে বেরিয়ে এসে প্রায় ছুটতে-ছুটতে চলে গেল গেটের বাইরে।

ভদ্রলোকটি বললেন, আসুন, ভেতরে আসুন।

বিকাশ থমকে দাঁড়িয়ে আছে। চার পাশ দেখছে। ঠিকানা ভুল হয়নি তো? সে কিছুই চিনতে পারছে না। এ বাড়িটাকেও তো খুব নতুন বলে মনে হয় না।

বিকাশ আপন মনে বলল, অনেক বড় বাগান ছিল, অনেক গাছপালা, দুটো পুকুর ছিল...ভদ্রলোক বললেন, একটা পুকুর অবশ্য এখনও আছে। সেরকম বড় কোনও বাগানের কথা আমার মনে পড়ে না।

বিকাশ লোকটিকে মনোযোগ দিয়ে দেখল। বিকাশের থেকে অন্তত পনেরো-ষোলো বছরের ছোট তো হবেই। সদ্য পাট ভাঙা ক্রিম সাফারি স্যুট পরা, মাথার চুল নিখুঁতভাবে আঁচড়ানো, চোখে ফ্রেম ছাড়া চশমা, একটু বেশি-বেশি ভদ্র ব্যবহার।

বিকাশ বলল, চলুন তো পুকুরটা একবার দেখি।

বাড়ির ডান পাশটায় কীসের যেন ছোটখাটো একটা কারখানা। ভেতরে লোহার সঙ্গে লোহা ঘষার কর্কশ শব্দ হচ্ছে।

হাঁটতে হাঁটতে বিকাশ জিগ্যেস করল, আপনার নামটা যেন কী বললেন?

ইউসুফ রেজা। আপনি বোধহয় আমার বাবাকে চিনবেন। মাহবুব খান, দশ বছর আগে তাঁর ইন্তেকাল হয়েছে। তিনি কলকাতায় থাকতেন। তিনিই এই বাড়ি...

অনেক কাল আগের কথা। আমারও ভালো মনে নেই সব কথা। কিন্তু কী জানেন। এই বাড়ির ছবি আমার চোখে যেন জ্বলজ্বল করত। গোলাপ বাগান, আম বাগান, একটা দোতলা বাড়ি, একটা পেয়ারা গাছের ডাল ভেঙে আমি পড়ে গিয়েছিলাম...সেসব কিছুই মিলছে না।

অনেক কিছুই বদল হয়ে গেছে। বেশ কিছু জমি বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। আমার আব্বুরা ছিলেন তিন ভাই।

আপনি কলকাতায় আসেন না?

সেভেন্টি টুতে একবার গিয়েছিলাম। তাও দুই-তিন দিনের জন্য।

আমি ঢাকা থেকে এলাম, প্রায় তিরিশ বছর বাদে। এত কাছে, কলকাতা থেকে প্লেনে মাত্র আধ ঘণ্টা লাগে, ইচ্ছে করলেই তো আসা যায়। তবু আসা হয়নি!

আপনি হোটেলে উঠেছেন? ইচ্ছে করলে এখানে এসেও থাকতে পারেন। একটা গেস্টরুম আছে আমাদের বাড়িতে। এটা আপনারও বাড়ি বলে মনে করতে পারেন।

ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। আমি এসেছি অফিসের কাজে, হোটেলে আমার সঙ্গে আরও দুজন কলিগ আছেন। আমার খুব শখ ছিল জন্মভিটেটা একবার দেখে আসব। এখানে জন্মেছি, খেলা করেছি!

রেজা সাহেব, আপনার কলকাতার বাড়িটা দেখতে ইচ্ছে করে না।

আমি তো কলকাতায় জন্মাইনি। আমার জন্ম এই ঢাকা শহরেই। শুনেছি, কলকাতায় আমাদের প্রপার্টি ছিল, আমার বাপ-দাদারা কোন হিন্দু ভদ্রলোকের সঙ্গে এক্সচেঞ্জ করেছিলেন।

আমাদেরও ঢাকায় বিরাট প্রপার্টি ছিল, একান্নবর্তী পরিবার তো।

হঠাৎ কথা থামিয়ে বিকাশ প্রায় চিৎকার করে উঠল, আরে, এই তো সেই পুকুর!

ইউসুফ রেজা মৃদু হেসে বলল, তাহলে একটা কিছু চিনতে পেরেছেন।

বিকাশ দ্রুত এগিয়ে গিয়ে বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই সেই ঘাটটা। এই আমগাছটা আমার বাবা নিজের হাতে লাগিয়েছিলেন। আমি গাছটাকে বেশ বড় অবস্থাতেই দেখে গেছি। খুব মিষ্টি আম হত।

এটা বোধহয় সে গাছটা নয়। এ গাছের আম বেশ টক।

তাই নাকি! সেই গাছটা নয়? তার জায়গায় অন্য গাছে হয়েছে, কিন্তু টক আম হবে কেন? আমি দাদা আম খাই না। আমের মর্ম বুঝি না?

এই পুকুরে আমি সাঁতার শিখেছি। এখানে মাছ ধরেছি কত। বড়-বড় কালিবউস মাছ ছিল।

এই পুকুরটাও বুজিয়ে ফেলা হবে। এখানে একটা মাল্টিস্টোরিড বাড়ি উঠবে!

বিকাশ আঁতকে উঠে বলল, অ্যাঁ? এই পুকুরটাও থাকবে না।

কতকালের পুকুর! এখানে একদিন আমার মা...

ইউসুফ বলল, ঢাকা শহর এখন কত বড় হয়ে গেছে, জমির দাম বেড়ে গেছে সাংঘাতিক ভাবে। কলকাতায় কি অনেক বাড়িতে এখনও প্রাইভেট পুকুর আছে?

সে প্রশ্নই ওঠে না।

আপনারা যদি ঢাকায় থাকতেন, তাহলে আপনারাও এখন পুকুর বুজিয়ে বাড়ি তুলতেন।

হয়তো তাই। পুরোনো দোতলা বাড়ি ভেঙে পাঁচতলা বাড়ি হত। আচ্ছা রেজা সাহেব, বাড়িটার পেছন দিকটা বেশি পুরোনো মনে হচ্ছে না? বটের চারা গজিয়ে গেছে, একটা জায়গা ভাঙা!

ঠিক বলেছেন। এই অংশটা পুরোনো। আমার ঠাকুমা থাকেন। এদিকটায় নতুন কনস্ট্রাকশন হয়নি।

তার মানে এই দিকটায় এখনও অরিজিনাল বাড়ি রয়েছে?

খুব সম্ভবত।

বিকাশ একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করে পুকুরটার চারপাশে একবার ঘুরে এল। তার বাল্যকালের স্মৃতিতে পুকুরটাকে যেন আরও অনেক বড় মনে হত। এখন আর সেরকম কিছু লাগছে না।

নিজেদের বসতবাড়ির ছবিটাও যেন ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে যাচ্ছে। যেখানে গোলাপের বাগান ছিল, সেখানে কারখানা!

এক সময় বিকাশ দেখল, ইউসুফ পাশে নেই। তাকে নস্টালজিয়ার সুখ ভোগ করতে দিয়ে সে কোথায় যেন চলে গেছে।

এখানে এলে যত রোমাঞ্চ হবে ভেবেছিল বিকাশ, তেমন যেন হচ্ছে না। একসময় এখানে তাদের বাড়ি গমগম করত, নিজেদের পরিবারেই দশ-বারোজন মানুষ, তা ছাড়া বেশ কয়েকজন আশ্রিত ও দাসদাসী। পাড়া প্রতিবেশীরা আসত যখন-তখন।

বিকাশ এখন একা পুকুরধারে দাঁড়িয়ে আছে, কাউকেই চেনে না, বাড়ি-ঘর সব অন্যরকম, একমাত্র এই পুকুরটাকেই আপন বলে মনে হয়। জলের রং কালো হয়ে গেছে। এই জলের কাছে মুখ ঝোঁকালে কি সে তার বাল্যকালের মুখচ্ছবিটা দেখতে পাবে?

ইউসুফ আবার ফিরে এসেছে।

বিকাশ বলল, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, রেজা সাহেব। আপনি আমার জন্য এতখানি সময়

নষ্ট করলেন। এবার আমি চলি!

ইউসুফ বলল, এর মধ্যে যাবেন কি? বাড়ির ভিতরে আসেন, একটু চা খেয়ে যাবেন।

বিকাশ বলল, থাক, এখন আর চা খাব না। এরপর সন্ধে হয়ে যাবে। আমি তো এতকাল পরে এসে ঢাকার রাস্তাঘাটও চিনতে পারছি না। সন্ধের পর হোটেলে পৌঁছতে অসুবিধে হবে।

ইউসুফ বলল, তার কোনও সমস্যা নেই। আমার গাড়ি আপনাকে ছেড়ে দিয়ে আসবে। চায়ের ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

বসবার ঘরটি অত্যন্তই সুসজ্জিত। দেওয়ালে বিদেশের আধুনিক শিল্পীদের ছবির কয়েকটি প্রিন্ট।

ইউসুফ রেজার অবস্থা বেশ সচ্ছল বোঝা যায়। ব্যবহারও অত্যন্ত মার্জিত ও ভদ্র। সোফায় বসার পর বিকাশের ক্ষীণ মনে পড়ল, তাদের বাড়ির বৈঠকখানায় তক্তাপোষ আর তাকিয়া থাকত।

একটু পরে একজন মহিলা ঢুকে বললেন, আস্‌সালাম আলাইকুম।

বিকাশ তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, নমস্কার।

মহিলাটিকে দেখলে প্রথমেই মনে হয়, এত সুন্দরী?

এরকম সুন্দরীকে যেন শুধু সিনেমা-টিনেমাতেই দেখা যায়। যেমন রং, তেমন শরীরের গড়ন। মুখে-চোখে সপ্রতিভ ভাব। দেখলেই বোঝা যায়, লেখাপড়া ভালোই জানেন।

ইউসুফ বলল, আমার স্ত্রী হেনা।

হেনা একটু দূরে বসে বলল, এই বাড়ি, বাগান সব আপনাদের ছিল? এতসব সম্পত্তি ফেলে রেখে কলকাতায় চলে গেলেন।

বিকাশ কিছু বলার আগেই ইউসুফ বললেন, না, না, ফেলে রেখে যাননি। ওনারা আমাদের কলকাতার একটা প্রপার্টির সঙ্গে এক্সচেঞ্জ করেছেন। সেটা বোধহয় উনিশ শো পঞ্চান্ন-বাহান্ন সালে, তাই না?

বিকাশ বলল, অনেককাল আগের ব্যাপার, আমাদের বাবা-জ্যাঠারা এসব করেছিলেন। আমার সেসব কিছুই মনে নেই। শুধু আমি এখানে জন্মেছিলাম, ছোটবেলায় এখানে খেলাধুলো করেছি। সেইসব একটু-একটু মনে আছে।

হেনা বলল, নিজের জন্মস্থান অপরের হয়ে গেছে, এর জন্য কষ্ট হয় খুব, তাই না?

বিকাশ হেসে ফেলে বলল, আমার বাবা, জ্যাঠামশাইদের কষ্ট হয়েছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু এতদিন পরে...আমার যদি কষ্ট হয়, তবে সেটা নিছক মনগড়া। লোকেরা নিজেদের বাড়ি বিক্রি করে অন্য কোথাও আবার নতুন বাড়ি বানায় না? আমার কত বন্ধু উত্তর কলকাতা ছেড়ে দক্ষিণ কলকাতায় চলে এসেছে।

ইউসুফ বলল, হেনার বাপের বাড়ি টাঙ্গাইল। সেখানকার প্রপার্টি বেচে আমার শ্বশুর ধানমুন্ডিতে নতুন বাড়ি করেছেন। হেনা, তোমার জন্মস্থানও তো এখন পরের হয়ে গেছে।

হেনা হেসে বলল, আমার জন্মস্থান একটা হাসপাতালের কেবিনে!

বিকাশ মনে-মনে বেশ অবাক হচ্ছে। ছোটবেলায় তাদের বাড়িতে সবচেয়ে সুন্দরী ছিল জ্যাঠতুতো দাদার স্ত্রী। তাকে বিকাশ বলত, নতুন বউদি। তার সঙ্গে এই মহিলার খানিকটা মিল আছে।

কিন্তু নতুন বউদি বাইরের লোকের সামনে বেরুতেন না। অচেনা কোনও লোকের সঙ্গে কথা বলার প্রশ্নই ছিল না।

বিকাশের ধারণা ছিল, মুসলমান বাড়ির মেয়েরা পরদানশিন হয়।

কিন্তু হেনা কত সহজভাবে তার সঙ্গে আলাপ করছে, হাসছে। সময় কত বদলে গেছে।

শুধু চা নয়, তার সঙ্গে খাবার দাবারের এলাহি ব্যবস্থা। মস্ত বড়-বড় সন্দেশ, অমৃতি, কচুরি।

বিকাশ বলল, এত! না, না, আমি পারব না।

হেনা বলল, আপনি নিজের বাড়িতে এসেছেন, একটু মিষ্টি মুখ করবেন না?

বিকাশ বলল, নিজের বাড়ি? যাদের সত্যিকারের এ-বাড়িটা নিজের বাড়ি ছিল, তারা কবে এ পৃথিবী থেকে চলে গেছে।

ইউসুফ বলল, আমার বাবাও বেঁচে নেই। তিনি গেছেন অনেকদিন, আমার মা-ও চলে গেলেন গত বছর।

বিকাশ বলল, আমার ছেলেমেয়েরা আমার মুখে ঢাকার গল্প শুনলে হাসে! তারা বলে, বাবা তুমি কতবার ওই একই গল্প বলবে! এখানে এসে বুঝতে পারছি, তাদের আমি মিথ্যে গল্প বলি। সে তো আমার একটা কল্পনার বাড়ির গল্প, সেরকম বাড়ি এখন ঢাকাতে কোথাও নেই। রেজা সাহেব, আপনিও কলকাতায় গেলে আপনার বাড়িটা চিনবেন না।

ইউসুফ বলল, আমি সেখানে জন্মাইনি, সে বাড়ি কখনও দেখিনি, আমার চেনার কোনও প্রশ্নই ওঠে না!

চা শেষ করার পর বিকাশ বলল, শুধু আর একটা অনুরোধ। এ-বাড়ির পেছন দিকটায় পুরোনো খানিকটা অংশ রয়ে গেছে। সে জায়গাটা একটু দেখতে পারি? যদি কিছু মনে পড়ে।

হেনা আর ইউসুফ দুজনেই একসঙ্গে বলে উঠল, নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই!

নতুন বাড়ির পর একটা উঠোন, তারপর পুরোনো মহল। একতলার ঘরগুলো ঘুরে বিকাশ উঠে এল দোতলায়। এখনও সে কিছু চিনতে পারছে না। এই দিকটা কি ছিল জ্যাঠামশাইয়ের অংশ! তার স্মৃতির বাড়ির দোতলায় যেন একটা টানা বারান্দা ছিল, এখানে তো বারান্দার কোনও অস্তিত্বই নেই। আগেকার কালের মতন খুপরি-খুপরি ঘর।

একটা বেশ দরজাওয়ালা ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে বিকাশ বলল, হ্যাঁ, এইটা, মনে আছে। স্পষ্ট মনে আছে। আমার ঠাকুমা থাকতেন। আমি এখানে দুপুরবেলা এসে ঠাকুমার কোলে মাথা রেখে ঘুমাতাম। ঠাকুমা আমাকে নারকোল নাড়ু খাওয়াতেন! এই ঘরের ভেতরটা একবার দেখা যায় না?

দরজার একটা পাল্লা খোলা, অন্য পাল্লাটাও ঠেলে খুলে দিল হেনা।

সঙ্গে-সঙ্গে বিকাশের বুকের মধ্যে ধক করে উঠল। মনে হল, সে চোখে ভুল দেখছে। রোমাঞ্চ হল তার সমস্ত শরীরে।

ঘরের মাঝখানে জোড়াসন করে বসে আছেন একজন বৃদ্ধা। সাদা ধপধপে কাপড় পরা, চক্ষু বোজা। ঠিক যেন বিকাশের নিজের ঠাকুমা। ওই ভাবে বসে ঠাকুমা প্রত্যেক সন্ধেবেলা পুজো-আহ্নিক করতেন। চল্লিশ বছর ধরে তিনি কি সেই একই জায়গায় বসে আছেন।

ইউসুফ ফিসফিস করে বলল, আমার ঠাকুমা। নামাজ পড়ছেন।

এখন আর হাঁটু গেড়ে বসতে পারেন না। তবে স্মৃতিশক্তি খুব ভালো আছে। সবাইকে চিনতে পারেন।

বিকাশ জিগ্যেস করল, আমায় চিনতে পারবেন?

ইউসুখ আর হেনা উত্তর দিল না।

বিকাশের মনে হল, সে যদি এখন ওই বৃদ্ধার পাশে গিয়ে বসে পড়ে, তাহলে উনি তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দেবেন। পুরোনো স্নেহের স্পর্শে বিকাশের শরীর জুড়িয়ে যাবে।

ওই বৃদ্ধা তাঁকে আদর করতে-করতে জিগ্যেস করবেন, এতদিন পরে এলি? তুই কেমন আছিস, বিকাশ?



দুজন

এক পলকের জন্য আমার মনে হল, ঘরের অন্য দেওয়ালের কাছে বসে থাকা একজন লোক আমার দিকে কটমট করে তাকিয়েছিল, আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই মুখ ফিরিয়ে নিল।

লোকটির মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, চোখে আরশোলা রঙের ফ্রেমের চশমা, বেশ শক্ত-পোক্ত চেহারার প্রৌঢ়, মাথার চুল চিনেবাদামের খোসার মতন। ঘরে আরও প্রায় পঁচিশ-ছাব্বিশ জন নারী-পুরুষ, কারুকেউ আমি চিনি না। আমার দিকে কারুরই তো কটমট করে তাকাবার কোনও কারণ নেই!

বিয়ে বাড়িতে গিয়ে খাবার জন্য অপেক্ষা করাটা বড় বিদ্‌ঘুটে। বর-কনে দেখা হয়ে গেছে, এখন শুধু বসে থাকা কখন খাবারের জায়গা খালি হবে। অনেক রেস্তোরাঁয় সব টেবিল ভরতি হয়ে গেলেও কিছু লোক দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে দৃষ্টিতে ঝরে পড়ে একটাই চিন্তা, ওদের খাওয়া শেষ হতে এত দেরি হচ্ছে কেন? এই দৃশ্যটা আমি সহ্য করতে পারি না।

বন্ধুর ছোট ভাইয়ের বিয়ে, নববধূকেও আমি আগে থেকে চিনি। এসে পড়েছি যখন, তখন না খেয়ে চলে যাওয়া যায় না। বেশি লোককে নেমন্তন্ন করে ফেলেছে, সেই তুলনায় বাড়িটা ছোট, ছাদে এর মধ্যে দু-ব্যাচ খাওয়া শেষ করেছে, এখনও অনেক লোক বাকি! যতদূর জানি, এ বিয়েতে দু-পক্ষেরই কোনও আপত্তি ছিল না। সুতরাং কোনও মন কষাকষির ব্যাপার নেই। তা হলে ওই ফ্রেঞ্চ কাট দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক আমার দিকে অমন ক্রুদ্ধ দৃষ্টি দিল কেন? লোকটিকে আগে কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। অবশ্য আমার ভুলও হতে পারে। আমি ভালো করে দেখিনি। এটা আমার একটা অনুভূতি মাত্র। যেন কারুর বিরাগ আমাকে ঝলসে দিচ্ছিল।

লোকটি এখন অন্যদিকে তাকিয়ে এক মহিলার সঙ্গে কথা বলছে।

একটু আগে বৃষ্টি হয়েছে বলে ঘরের সব জানলা বন্ধ। এখানে সিগারেট ধরালে ধোঁয়ায় চোখ জ্বালা করবে। তাই আমি উঠে এলাম দরজার বাইরে। আজই দুজন পরিচিত লোকের হাস্যময় মুখ দেখলাম।

আমাদের কথাবার্তায় মাঝখানে এসে দাঁড়াল বেগুনি রঙের শাড়ি পরা এক রমণী। আমাদের তিনজনের ঠিক কার সঙ্গে যে সে আগে থেকে পরিচিত তা ঠিক বোঝা গেল না। কিন্তু কথায় বেশ আপন-আপন সুর। খুব ভালো জাতের পারফিউমের গন্ধ আসছে তার শরীর থেকে। বিয়ে বাড়িতে এসে নতুন শাড়ি পরা কয়েকজন নারীর রূপ আর কিছু সুগন্ধ আমি উপভোগ করি। বাদবাকি সব কিছুই অকিঞ্চিৎকর।

সেই ফ্রেঞ্চকাট দাড়িওয়ালা লোকটি এর মধ্যে ঘর থেকে বেরিয়ে বেশ রাশভারী ভঙ্গিতে চলে গেল আমাদের পাশ দিয়ে। এবারও তার মুখখানা আমি পুরোপুরি দেখতে পেলাম না। সে আমার দিকে কোনও ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হেনে গেল না বটে, কিন্তু আমাদের দিকে যে মোটেই চাইল না, সেটাই সন্দেহজনক নয়? আমাদের পাশে মোটামুটি একজন সুন্দরী মহিলা রয়েছে, তাকেই বা উপেক্ষা করার কী মানে হয়?

অবশ্য এটাও আমার ভুল হতে পারে। তাকাতেই যে হবে, তার কী মানে আছে?

ওপরের সিঁড়ি দিয়ে একজন দুদ্দাড় করে নেমে এসে বলল, নতুন ব্যাচ বসছে। আপনারা চলে যান, চলে যান। আগে-আগে বসে পড়ুন।

অর্থাৎ নিছক খাওয়ার জন্য অন্যদের চেয়ে আগে গিয়ে জায়গা দখল করতে হবে।

অগত্যা যেতেই হল। বেগুনি শাড়ি পরা মহিলাটি ক্ষণেকের জন্য হারিয়ে গেল বটে, কিন্তু ওপরে আমাদের ঠিক উলটো দিকের সারিতেই তাকে আবার দেখা গেল অন্য কয়েকটি মেয়ের পাশে। সেইখান থেকেই চেঁচিয়ে বলল, আপনি এখনও শ্যামবাজারে থাকেন?

আমি দু-দিকে ঘাড় নেড়ে জানালাম, না।

তারপর পাশ ফিরে সুব্রতকে মৃদু গলায় জিগ্যেস করলাম, ওই মহিলাটি কে? কী নাম?

সুব্রত বলল, তা তো জানি না। আমি তো এতক্ষণ ভাবছি, তোমারই চেনা।

আমার হাসি পেয়ে গেল। এরকম প্রায়ই হয়। নামজানার দরকারই বা কী? যেটুকু সময়ের জন্য দেখা, হাসিঠাট্টা করে কাটিয়ে দিলেই হল।

খাওয়ার মধ্যে-মধ্যেও সুব্রতর সঙ্গে গল্প করতে-করতে আমার চোখ দুটো সেই ফ্রেঞ্চকাট দাড়িওয়ালা লোকটিকে খুঁজছে। তাকে পাওয়াও গেল, একেবারে কোণের দিকে, পেছন ফিরে বসা। লোকটি কি ইচ্ছে করেই আমার থেকে অতদূরে গিয়ে বসেছে?

কী মুশকিল, লোকটাকে নিয়ে আমার এত মাথাব্যথা কেন? আমি তাকে চিনি না। কিন্তু লোকটি কেন আমার ওপর রেগে আছে তা জানতে হবে না? রেগেই যে আছে, তারও কোনও প্রমাণ নেই। শুধু একটা অনুভূতি, আর কিছু না।

আমার বন্ধু রবি আর তার ছোট-ভাই অভিজিৎ ঘুরে-ঘুরে সবার সঙ্গে ভদ্রতা করছে। আমি লক্ষ্য করলাম, রবি সেই ফ্রেঞ্চকাট দাড়িওয়ালার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে হেসে-হেসে কী যেন বলছে। রবির সঙ্গে ভালো পরিচয় আছে। লোকটি কেউকেটা গোছের?

রবির কাছে জিগ্যেস করলেই লোকটির পরিচয় জানা যায়। কিন্তু খামোখা জিগ্যেস করতে যাব কেন? একজন অচেনা লোক সম্পর্কে এমন কৌতূহল দেখানো আমার স্বভাব নয়।

খাওয়া শেষ করে ভিড় ঠেলে নীচে নামবার সময় সুব্রত বলল, সুনীলদা, তুমি একটু অপেক্ষা করো আমার জন্য, চলে যেও না। আমি একবার অভিজিতকে বলে আসছি!

বৃষ্টি থেমে যাওয়ার পরেও খুব গুমোট গরম। রাস্তায় নেমে আসবার পর তবু একটু আরাম হল। একটা সিগারেট ধরালাম।

বেগুনি শাড়ি পরা রমণীটির সঙ্গে আবার দেখা!

সিল্কের শাড়ি শপশপিয়ে কাছে এসে জিগ্যেস করল, আপনি শ্যামবাজারে থাকেন না। এখন কোথায় থাকেন?

আমি বললাম, গড়িয়াহাটের দিকে।

মহিলাটি হেসে বলল, অনেকদিন পর আপনার সঙ্গে দেখা। ভেবেছিলাম একসঙ্গে ফিরব। অনেক গল্প হবে। আমি শ্যামবাজারের দিকে যাওয়ার একজন সঙ্গী খুঁজছি। যাদের সঙ্গে এসেছি, তাদের ফিরতে অনেক রাত হবে।

আমি বললাম, আমি তো হেঁটেই চলে যাব, বেশি দূর নয়।

আমার সঙ্গে গাড়ি-টাড়ি কিছু নেই। আপনাকে একটা ট্যাক্সি ডেকে দেব?

মহিলাটি বলল, ওরে বাবা, এত রাতে আমি একা-একা ট্যাক্সিতে যেতে পারব না। দেখি আর কারুকে পাই কি না!

একটু পরেই এক দম্পতিকে দেখে এগিয়ে গেল সে।

সুব্রত এল আরও মিনিটপাঁচেক পরে। হাতে দু-খিলি পান। বলল, তুমি তো পান খাও না, তোমারটাও আমি নিয়ে এলাম। বেগুনি শাড়ি পরা যে মেয়েটি কথা বলছিল আমাদের সঙ্গে, তার

নামটাও জেনে এসেছি। শ্রেয়া দাশগুপ্ত। ভদ্রমহিলা ডিভোর্সি। একটা বিজ্ঞাপন কোম্পানিতে কাজ করেন। অভিজিৎ-এর সঙ্গে যার বিয়ে হচ্ছে, সেই মিলির মাসতুতো দিদি। তুমি চিনতে না?

শ্রেয়া নামটা শুনে একটা চেনা ঝিনঝিন শব্দ হচ্ছে বটে। আগে কোথাও শুনেছি, কিংবা কোনও উপন্যাসের নায়িকার নাম?

মেয়েটি গাড়িতে উঠে পড়েছে, আর কোনওদিন হয়তো দেখা হবে না। নামটা জেনেই বা কী লাভ? আমাকে চেনে এটুকু বুঝতে পারা গেল। সত্যিই আমি একসময় শ্যামবাজারে থাকতাম।

হঠাৎ রবি নেমে এসে বলল, এই তোরা তো গড়িয়াহাটের দিকে যাবি। দাঁড়া, দাঁড়া, একটা গাড়ির ব্যবস্থা করেছি।

আমি বললাম, গাড়ির কোনও দরকার নেই। বেশি খাওয়া হয়ে গেছে। এরপর খানিকটা হাঁটাই ভালো।

রবি বলল, ইচ্ছে করলে গাড়িতেও যেতে পারিস। তাপসবাবু তোদের নামিয়ে দিতে পারেন। উনি যাদবপুর যাবেন।

তারপর পেছন ফিরে বলল, তাপসবাবুর সঙ্গে তোর আলাপ আছে তো? তাপস হালদার। নাট্যকার। অনেকগুলো নাটক লিখেছেন।

সেই ফ্রেঞ্চকাট দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক।

তিনি শুকনো মুখে একটা নমস্কার জানিয়েই অন্যদিকে তাকালেন। আমাকে তাঁর গাড়িতে তোলার কোনওই ইচ্ছে নেই বোঝা গেল।

আমি প্রথমে খুবই চমকে গিয়েছিলাম। তারপর বুক ঠেলে হাসি বেরিয়ে আসতে চাইল। একটা রুমাল গুঁজে কাসি, সামলাবার ভান করলাম। তারপর হাত নেড়ে এগিয়ে গেলাম সামনের দিকে। তাপস হালদার! চেহারা অনেক বদলে গেছে। নইলে নিশ্চয়ই চিনতে পারতাম আমি। এত বছর পরেও তিনি আমার দিকে বিষদৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন!

মনে আছে সেই প্রথম দিনটার কথা।

ঝিরিঝিরি বৃষ্টি হচ্ছে দুপুর থেকে। এইরকম বৃষ্টিতে রাস্তায় জল জমে না, আবার হাঁটাহাঁটি করতে গেলেও জামা ভিজে যায়। বিডন স্ট্রিট ধরে আমি হাঁটছি বন্যার সঙ্গে। ছাতা নেই। বন্যা ওর হাতের বইগুলো মুড়ে নিয়েছে আঁচলে। ময়ূরকণ্ঠি রঙের শাড়ি। আমি বারবার বলছি, বন্যা, আজ যেতে হবে না! আজ যেও না!

বন্যা শুনছে না। আজই প্রথম দিন। সব কথাবার্তা ঠিকঠাক হয়ে আছে, ওকে যেতেই হবে!

আমি বললাম, ধরো, যদি খুব জোর বৃষ্টি পড়ত?

বন্যা বলল, নামাও না, খুব জোরে বৃষ্টি ডেকে আনো, তাহলে আমি যাব না। তখন সমস্ত রাস্তা খালি হয়ে যাবে। ঠিক মাঝখান দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে তুমি আর আমি ভিজব।

বন্যা পাগলের মতন বৃষ্টি ভালোবাসে।

ও ইচ্ছে করে বৃষ্টিতে ভেজে, সম্পূর্ণ ভিজে কাপড়ে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে একটুও সঙ্কোচ বোধ করে না, রাস্তায় হাঁটু সমান জল জমলে আনন্দে হইহই করে জল ছেটাতে-ছেটাতে যায়। আজকের এই সামান্য ছিটছিটে বৃষ্টি ওর মোটেই পছন্দ নয়। কোন মন্ত্রে ওর জন্য ঝমঝমে বৃষ্টি আমি ডেকে আনব?

কেন সেই মন্ত্র আমি জানি না? আকাশের ওপরেই আমার রাগ হয়।

হঠাৎ যেন মাটি ফুঁড়ে উদয় হল সন্দীপ। আমি তাকে আসতে দেখিনি, কিন্তু সে একেবারে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

কোথায় যাচ্ছিস, বন্যা?

মানিকতলায়।

সেখানে কী? আমার মা তোকে একবার ডেকেছে।

অতি সাধারণ কথাবার্তা। আমি এক পাশে সরে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরলাম। সন্দীপকে যে আমি চিনি না তা নয়। কিন্তু তার সঙ্গে এখন আমার কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। কেন কথা বলতে ইচ্ছে করছে না? কেন সন্দীপকে দেখেই আমার মেজাজ বিগড়ে গেল? মনে হচ্ছে যেন ওদের কথা আর শেষই হবে না। আমি রাস্তার গাড়ি গুনছি, ফিয়াট, অ্যাম্বাসেডার, স্ট্যান্ডার্ড...তেতাল্লিশটা, রিকশা দশটা, একটা ময়লা ফেলা গাড়ি...

সন্দীপ এক-একবার আমার দিকে তাকাচ্ছে, কিন্তু আমি কিছুতেই তার চোখে চোখ ফেলছি না। বৃষ্টি একেবারেই থেমে গেছে। শেষ বিকেলের রোদ ঝিলিক দিল আকাশে।

একটা ফাঁকা ট্যাক্সি দেখে সন্দীপ দৌড়ে চলে গেল।

সঙ্গে-সঙ্গে আমি সিগারেটটা ছুড়ে ফেলে রক্তচক্ষে বললাম, উঃ, এতক্ষণ ধরে কী কথা বলছিলে?

বন্যা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল।

আমি অবার কর্কশ গলায় বললাম, এক ঘণ্টা ধরে এত আজেবাজে কথার কী ছিল?

বন্যা বলল, মোটেই অতক্ষণ কথা বলিনি। তুমি রেগে যাচ্ছ কেন?

আমি বললাম, ওই সন্দীপটা, ওই সন্দীপটা...

বন্যা বলল, ও আবার কী করল? তোমার কী হয়েছে বলো তো?

আমি আর কথা খুঁজে পাচ্ছি না। সত্যিই তো এত রাগের কী হয়েছে। সিগারেট ধরাবার পর সেটা শেষ হয়নি, অর্থাৎ পাঁচ মিনিটও কাটেনি, তবু এটা মনে হল কেন? রাগে আমার সারা শরীর জ্বালা করছে। যুক্তিহীন রাগ।

সন্দীপ বন্যার নিজের মামাতো ভাই। ছেলেবেলা থেকে একসঙ্গে মানুষ হয়েছে। সন্দীপ ছেলেটার ব্যবহারও খারাপ নয়, তবু ওকে আমি সহ্য করতে পারি না কেন?

একটা কথা কারুকে বলা যায় না। বন্যাকেও না।

বন্যার সঙ্গে যে-কোনও পুরুষ মানুষ কথা বললেই আমার রাগ হয়। শুধু রাগ নয়, সাংঘাতিক ঈর্ষা। অন্য পুরুষের তো কথাই নেই, এমনকী বন্যার কাকা কিংবা ওর জামাইবাবু বন্যার সঙ্গে একটু হেসে কথা বললেই আমার চোয়াল শক্ত হয়ে আসে। ইচ্ছে করে ওদের ঠেলে সরিয়ে দিই। বন্যার জামাইবাবু কথা বলার সময় মাঝে-মাঝে বন্যার পিঠে হাত রাখেন, আমি জানি, এটা সাধারণ ব্যাপার, বন্যার জামাইবাবু অতি রসিক, সুন্দর মানুষ, শ্যালিকার পিঠে একটু হাত রাখবেন, এতে দোষের কী আছে? জানি, সবই বুঝি, তবু ঈর্ষায় আমার বুক জ্বলে যায়। বন্যাকে যদি আমি সর্বক্ষণ ঘিরে রাখি, সেটা বন্যাও পছন্দ করবে না।

কথা ঘোরানোর জন্য বললাম, তোমার ওখানে কতক্ষণ লাগবে?

বন্যা বলল প্রথম দিন তো। বড়জোর এক ঘণ্টা।

আমি বললাম, আমি উলটো দিকের রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকব।

বন্যা প্রবল আপত্তির সুরে বলল, না, না, না, না! তুমি আসবে না।

কেন?

তুমি কি পাগল নাকি, এক ঘণ্টা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবে কেন?

অন্য কোনও জায়গা থেকে ঘুরে আসব।

না, প্লিজ, ওরকম কোরো না। তুমি কাল সকালে বাড়িতে চলে এসো।

কেন, আমি এখান থেকে তোমার বাড়ি পর্যন্ত তোমার সঙ্গে যেতে পারি না?

কেন এরকম করবে? ফেরার সময় আমি বাসে চলে যাব। তোমাকেও তো টিউশনি করতে যেতে হবে!

একদিন নাই-বা গেলাম।

বলছি তো, কাল সকালে বাড়িতে চলে এসো।

আমরা পৌঁছে গেছি মানিকতলার মোড়ের কাছে। ডান দিকে একটা সরু গলি, তার মুখে প্রথম বাড়িটার দেওয়ালে মস্ত বড় সাইন বোর্ড। 'ইউনিক টিউটোরিয়াল'।

বাজারে এখন টিউটোরিয়াল হোমগুলোর খুব নাম রমরমা। প্রাইভেট টিউটরদের ভাত মারা যেতে বসেছে। পাড়ায়-পাড়ায় গজিয়ে উঠেছে টিউটোরিয়াল হোম, সেখানে অল্প মাইনেতে কোচিং পাওয়া যায়। এরা শিওর সাজেশন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। সেটাই বড় টোপ।

ইউনিক টিউটোরিয়ালের খুব নাম হয়েছিল একসময়। আগেরবার এখান থেকে পাঁচজন ছাত্র-ছাত্রী অঙ্কে খুব ভালো রেজাল্ট করেছে! পাঁচজনই ফার্স্ট ক্লাস। খবরের কাগজে ওরা বড়-বড় করে বিজ্ঞাপন দেয়। সেই পাঁচজন ছাত্র-ছাত্রীর ছবি ছাপিয়েছে, সন্দেহের কোনও কারণ নেই।

বন্যাকে সায়েন্স পড়ার মাথার দিব্যি কে দিয়েছিল? ও এত ভালো ছবি আঁকে, ওর উচিত ছিল আর্ট কলেজে ভরতি হওয়া। ওর বড় কাকা বেঙ্গল কেমিক্যালের চিফ কেমিস্ট, তিনি বন্যাকেও কেমিস্ট বানাতে চান। তা ছাড়া, বন্যাকে কোনওদিনই লেবরেটরিতে অ্যাসিড-অ্যালকালি ঘাঁটাঘাঁটি করতে হবে না।

কেমিস্ট্রি অনার্স নিয়ে পড়ছে বন্যা, কিন্তু টেস্টে অঙ্কে খুব খারাপ করেছে।

আমি নিজে টিউশনি করে জীবিকা অর্জন করি। সারাদিনে তিন জায়গায় ছেলেমেয়েদের ইংরিজি আর বাংলা পড়াই। কিন্তু ইস্কুলের অঙ্কতেই আমার গায়ে জ্বর আসত, বি. এস.সি.-র অঙ্কে আমার সাহায্য করার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

বন্যা একটা টিউটোরিয়াল হোমে অঙ্কের কোচিং নেবে, এটা তো অস্বাভাবিক কিছু না। বাড়িতেও আলাদা টিউটর রাখতে পারত, ওদের অবস্থা বেশ ভালো। কিন্তু ইউনিক টিউটোরিয়ালে যিনি অঙ্কা পড়ান। তাঁর সঙ্গে বন্যার দাদার চেনা থাকলেও তিনি কারুর বাড়িতে গিয়ে পড়ান না। তাঁর কাছ শিখতে হলে এখানেই আসতে হবে।

সেটাও অস্বাভাবিক কিছু না। আরও ছাত্র-ছাত্রীরা আসে, বন্যাও সপ্তাহে দুদিন এখানে পড়ে যাবে। কিন্তু আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না।

দরজাটা খোলা। বন্যা আমার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বলল, যাই? ঠিক সেই সময় দরজার কাছে এক ব্যক্তি এসে দাঁড়াল। বেশ লম্বা ও স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ, তিরিশের কাছাকাছি বয়েস, মাথা ভরতি সুন্দর চুল, একটা বেশ দামি পাঞ্জাবি পরা।

বন্যার দিকে চেয়ে তিনি হাসলেন।

আমি চিনি এই ব্যক্তিটিকে, ইনিই সেই বিখ্যাত অঙ্কের অধ্যাপক।

তিনি বন্যার দিকে চেয়ে হেসে বললেন, এসো। বন্যা তাঁর সঙ্গে ভেতরে চলে গেল।

আমার মনে হল, আমি যেন বন্যাকে ওই লোকটির হাতে তুলে দিলাম। ওই টিউটোরিয়াল হোমে আর কেউ নেই। শুধু ওই লোকটি আর বন্যা, ওরা চলে গেল এক অন্ধকার গহ্বরে।

ওঃ, কী কষ্ট পেয়েছিলাম সেদিন। হৃৎপিণ্ডটা যেন ফালাফালা হয়ে গিয়েছিল, অবিরাম রক্ত ঝরছিল সেখান থেকে। আমি ছটফট করছিলাম পাগলের মতন। যদিও যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করছিলাম নিজেকে যে, আমি এরকম অদ্ভুত ভাবছি কেন? এত নাম করা একটা টিউটোরিয়াল হোম বিকেলবেলা ফাঁকা থাকতে পারে না, আরও অনেক ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে ভেতরে। বন্যা সেখানে শিখতে গেছে নীরস অঙ্ক! কিন্তু মন তবু অবুঝের মতন মাথা ঝাঁকানি দিচ্ছে। ওই সুপুরুষ অঙ্কের মাস্টারটা ঠিক এই সময় এসে কেন দরজার কাছে দাঁড়াল। কেন বন্যার দিকে মিষ্টি হাসি দিয়ে

বলল, এসো! ওর পিঠে একটা ছুরি বসিয়ে দেওয়া উচিত ছিল না আমার?

কোথায় হাঁটছি খেয়াল নেই, একসময় দেখি মানিকতলায় ব্রিজ পেরিয়ে গেছি!

আমার যাওয়ার কথা এখন নিউ আলিপুর। সেখানে দুটি মাত্র ছাত্রীকে ব্যাকরণ পড়াতে হবে।

আজ না গেলে হয় না? মাঝে-মাঝেই যাওয়া হয় না। এক-একদিন পকেটে ট্রাম ভাড়াও থাকে না। ছাত্র-ছাত্রীর মা খুব সদাশয়া, আমি কামাই করলেই আমার শরীর খারাপ কি না জিগ্যেস করেন। অথচ কিছুতেই আমার জ্বর-টর হয় না।

নিউ আলিপুর গেলে ফিরতে অন্তত আড়াই ঘণ্টা লেগে যাবে। বন্যা তার মধ্যেই বেরিয়ে আসবে। ও আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে বারণ করেছে। কিন্তু আমার পক্ষে দূরে থাকা যেন কিছুতেই সম্ভব নয়, আমি মানিকতলা অঞ্চলেই ঘুরতে লাগলাম, এক-একটা দোকানের সামনে দাঁড়াই। কাগজের স্টলে দাঁড়িয়ে পত্রিকার পাতা ওলটাই।

একশো গ্রাম বাদাম কিনে ভাবলাম, বন্যার জন্য অর্ধেক রেখে দেব?

সময় আর কাটে না, একটা-একটা করে সব বাদামই খাওয়া হয়ে গেল।

টিউটোরিয়াল হোমটা থেকে বেশ খানিকটা দূরে, একটা বকুল গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে রইলাম। গাছটা বেশ পুরোনো। তবু ফুল ফুটেছে। দু-একটা পড়ে আছে মাটিতে। একটা ফুল কুড়িয়ে নিলাম। অবিকল বন্যার শরীরের ঘ্রাণ।

ঠিক এক ঘণ্টা পরেই বন্যা ছুটি পেল। কিন্তু আমি ওর সামনে গেলাম না, আমি টিউশানিতে যাইনি বুঝতে পারলে ও রেগে যাবে।

বন্যা কোনওদিকে না তাকিয়ে সোজা হাঁটতে লাগল বাড়ির দিকে। আমি ওকে অনুসরণ করছি। কেন? এ পৃথিবীতে যে আমার সবচেয়ে আপন, সমস্ত জাগ্রত মুহূর্তে যার কথা চিন্তা করি, একজন অচেনা মানুষের মতন আমি যাচ্ছি তার পেছনে-পেছনে। বন্যাকে আমার বুকে জড়িয়ে ধরেছি, বন্যা অনায়াসে আমার চুলে হাত দেয়, অথচ আমি তার সঙ্গে কথা বলছি না। অন্য যে-কেউ দেখলে আমাকে পাগল ভাববে।

অনেকটা হেঁটে এসে বন্যা ট্রামে উঠল। আমি সেকেন্ড ক্লাসে। এত ভিড় যে এখান থেকে বন্যাকে দেখতে পাওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। তবু তো আমরা একসঙ্গে যাচ্ছি। ফার্স্ট ক্লাসে উঠলেও আমি ওর পাশে বসার সুযোগ পেতাম না।

আমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছি। জানি বন্যা এসময় অন্য কোথাও যাবে না। বাড়ির স্টপেই নামবে। তবু প্রতিটি স্টপ আমার দেখা চাই। লোকজন উঠছে নামছে, কেউ-কেউ আমার পা মাড়িয়ে দিচ্ছে, কেউ-কেউ ধমকাচ্ছে আমাকে, তবু আমার ভ্রূক্ষেপ নেই।

সন্ধে হয়ে গেছে। ফড়েপুকুরের মোড়ে দুজনে একসঙ্গে নামলেও বন্যা আমাকে দেখতে পেল না। ও কিছু একটা নেওয়ার জন্য ওষুধের দোকানে ঢুকল। এখানে বন্যাকে অনুসরণ করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। এ-পাড়ার অনেকেই আমাকে চেনে।

বন্যাদের বাড়িতে তো অনায়াসেই যেতে পারি। কোনও বাধাই নেই। তবু এখন যাওয়া যাবে না।

বকুল ফুলটা আমি পকেটে রেখেছিলাম। বার করে গন্ধ নিলাম একবার। এই তো, বন্যা এখন সারারাত আমার সঙ্গে থাকবে।

তাপস হালদার তখনও নাট্যকার হননি, একটি কলেজে পড়াতেন এবং দু-একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকায় ভারী-ভারী প্রবন্ধ লিখতেন। সে প্রবন্ধ বোঝা দুঃসাধ্য। দু-একটা মিটিং-এ

আমি তাঁর বক্তৃতা শুনেছি।

দরিদ্র বুদ্ধিজীবীদের একরকম চেহারা থাকে, রোগা, লম্বা, নাকটা খাঁড়ার মতন, গেরুয়া পাঞ্জাবি, কাঁধে ঝোলা ব্যাগ। তাপস হালদারও দরিদ্র ছিলেন বটে, তবে যথেষ্ট সুপুরুষ। ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চেহারার জন্য তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে, বিশেষত ছাত্রীদের খুব প্রিয় ছিলেন। কিন্তু তিনি বিয়ে করে ফেলেছিলেন অনেক আগেই। তখন তিনি দুটি ছেলেমেয়ের বাবা, তা ছাড়া তাঁর নিজের বাবাও ছিলেন অসুস্থ, তাই সামান্য অধ্যাপনার চাকরিতে তাঁকে খুব টানাটানি করে চালাতে হত। ওইসব শক্ত-শক্ত প্রবন্ধ লেখার জন্য কোনও পারিশ্রমিক পাওয়ারও প্রশ্ন ছিল না। অবশ্য সম্মান ছিল। শিয়ালদার কাছের এক কলেজে তিনি ছিলেন দুপুরবেলার অধ্যাপক, সকালে ব্যারাকপুরে পার্ট টাইমে কাজ করতে যেতেন। বিকেলবেলা টিউটোরিয়াল। হঠাৎ সেখানকার কয়েকটি ছাত্র-ছাত্রী খুব ভালো রেজাল্ট করায় টিউটোরিয়ালটার নাম তো খুব ছড়াল বটেই, ফুলে ফেঁপে উঠল ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা। দু-বছরের মধ্যে তাপস হালদার সেই টিউটোরিয়ালের মালিক হয়ে গেলেন। তাঁর আর্থিক অবস্থা সম্পূর্ণ বদলে গেল।

তখন থেকে তাঁর পোশাক ধপধপে আদ্দির পাঞ্জাবি। চটির বদলে পাম্প শু। হাতে দামি সিগারেট। চরম দারিদ্র্য থেকে আকস্মিক স্বচ্ছলতায় এসে তিনি কৃপণের মতন টাকা জমাতে লাগলেন না, খরচ করতে লাগলেন দু-হাতে।

আগে তিনি দারিদ্র্য নিয়ে গর্ব করতেন, অপরকে বঞ্চিত না করে কেউ ধনী হতে পারে না এ দেশে, এরকম মতামত ব্যক্ত করতেন, প্রায়ই। আসলে জীবনের ভালো-ভালো জিনিস উপভোগ করার জন্য তাঁর মনে একটা গুপ্ত বাসনা ছিল। ভালো খাওয়া-দাওয়া দামি পোশাক, সুন্দর বাসস্থান।

সম্ভবত তিনি তাঁর মনকে বুঝিয়ে দিলেন। তিনি মোটেই কোনও রকম শোষণ বঞ্চনা করে ধনী হননি। পণ্ডিত রবিশঙ্কর যদি সেতার বাজিয়ে এক লক্ষ টাকা, শিল্পী হুসেনের একখানা ছবি যদি পঞ্চাশ হাজার টাকায় বিক্রি হয়, তাহলে একজন ভালো অঙ্কের শিক্ষকই বা কেন ছাত্র-ছাত্রীদের পড়িয়ে মাসে পাঁচ হাজার টাকা রোজগার করতে পারবে না? এসব তো গুণের স্বীকৃতি।

তবে টাকা রোজগার করার একটা নেশা আছে। আরও চারটে ছাত্রকে নিলে যদি আরও চারশো টাকা আসে, তাহলে নিতে আপত্তি কী?

তাপস হালদার হয়ে উঠলেন অঙ্ক শেখানোর যন্ত্র। সকাল থেকে ব্যাচ বাই ব্যাচ শুধু পড়িয়ে যাওয়া। ব্যারাকপুরের পার্ট টাইমটা ছেড়ে দিলেন, সেখানে পেতেনও খুব সামান্য। দুপুরের কলেজেও ছুটি নেন প্রায়ই। বিকেল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত তার নিশ্বাস ফেলায় অবকাশ নেই।

তাঁর প্রবন্ধ লেখা বন্ধ হয়ে গেল। সভা-সমিতিতে আর যান না। সাহিত্যিক ও অধ্যাপক বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়ারও সময় নেই। তিন বছরের মধ্যেই তিনি পাইকপাড়ায় একটা ছোট বাড়ি কিনে ফেললেন।

তাপস হালদারের অঙ্কের জ্ঞান সত্যিই অসাধারণ, সেই জ্ঞানটাকে তিনি কাজে লাগালেন ব্যবসায়। মাত্র দু-খানা ঘর নিয়ে শুরু হয়েছিল ইউনিক টিউটোরিয়াল, তাপস হালদার পুরো তিন তলা বাড়িটা ভাড়া নিয়ে সব ঘরে ক্লাস বসালেন, আরও অনেক নাম করা অধ্যাপকদের নিযুক্ত করলেন সেখানে। যেন সেটাই একটা আলাদা কলেজ। বাড়িটার ছাদের একখানা ঘর তিনি রেখে দিলেন নিজের জন্য, দুপুরে বাড়ি ফেরার সুযোগ হয় না অনেক দিনই। ওই নিজস্ব ঘরটায় তিনি বিশ্রাম করেন।

কিন্তু টিউটোরিয়াল হোমগুলির ভাগ্য বেশ অনিশ্চিত।

ইউনিক টিউটোরিয়ালের যখন বেশ রমরমা অবস্থা, তখন হঠাৎ একটা বিশ্রী ঘটনা ঘটল। এ-টিউটোরিয়ালের ক্লাস সেরে বেরিয়ে আসছে একটি ছাত্র। এমনসময় দূর থেকে একটি যুবক ছুটে এসে তার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করতে লাগল। তারপর সে ছাত্রটিকে ছুরি মেরে পালাল।

ছাত্রটি ছুরির গা খেয়ে রক্তাপ্লুত অবস্থায় ছটফট করছে। তক্ষুনি আর-একটা গুন্ডা মতন ছেলে এসে তার জামাটা টেনে ছিঁড়ে নিয়ে দৌড়োল। ততক্ষণে অন্য ছাত্ররাও বেরিয়ে এসেছে, জমা হয়েছে রাস্তার লোক, তারা ছুটে গিয়ে ধরে ফেলল দ্বিতীয় গুন্ডাটিকে।

সেই গুন্ডার হাতের ছেঁড়া জামাটার পকেটে ফিজিকস পার্ট টু পরীক্ষার প্রশ্নপত্র। যে পরীক্ষা আর চারদিন পরে আরম্ভ!

পুলিশ কেস তো হলই, খবরের কাগজেও খুব চাঞ্চল্য চলল কয়েকদিন এই নিয়ে। টিউটোরিয়াল হোমের ছাত্রের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র থাকে কী করে? এরা কি প্রেসের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে প্রশ্নপত্র ফাঁস করে?

টিউটোরিয়াল হোমগুলো ছাত্রদের ক্ষতি করছে না উপকার করছে, এই নিয়েও তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়ে গেল।

ইউনিক টিউটোরিয়ালের মধ্যে হানা দিল পুলিশ, বিজ্ঞানের পার্ট টু প্রত্যেকটি ছাত্র-ছাত্রীর বাড়ি সার্চ করা হল, ফিজিকসের এক অধ্যাপককে জেরা করা হল থানায় নিয়ে গিয়ে। সব মিলিয়ে কেলেংকারির এক শেষ।

তাপস হালদার অবশ্য দৃঢ়ভাবে বলতে লাগলেন বারবার যে ওই প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে তাঁর টিউটোরিয়াল হোমের কোনও সম্পর্ক নেই। ছাত্রটি কোথা থেকে সেই কোশ্চেন পেপার পেয়েছে পুলিশ তা খোঁজ করুক। ছাত্রটি ওটা টিউটোরিয়ালের কারুকে দেখায়নি, ও বিষয়ে কেউ বিন্দুবিসর্গও জানত না।

তাপস হালদারের বিবৃতি আমার কাছে সত্য মনে হয়েছিল। প্রশ্নপত্র আগে থেকে বার করে ছাত্রদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়ার মতন বোকামি তিনি করবেন কেন? যদি কোনওক্রমে একটা ছাপা প্রশ্নপত্র তাঁর হাতে এসে যায়, তাহলে তিনি সযত্নে সেটা গোপন রাখারই তো চেষ্টা করবেন। তিনি আর দশটা প্রশ্নের সঙ্গে ওই প্রশ্নগুলো মিশিয়ে দিয়ে ছাত্রদের তৈরি করে দেবেন, সবাই বলবে কমন এসেছে। সেটা কিছু দোষের নয়।

তবু একটা দুর্নামের ধাক্কা ইউনিক টিউটোরিয়ালকে গ্রাহ্য করতেই হল।

ছুরিকাহত ছাত্রটি বেঁচে গেল এবং যথারীতি এই ব্যাপারটা চাপা পড়ে গেল কয়েকদিনের মধ্যেই।

কিন্তু সেবার রেজাল্ট বেরুবার পর দেখা গেল, ওই টিউটোরিয়ালের কোনও ছাত্র-ছাত্রীরই ওপরের দিকে নাম নেই। অর্ধেকের বেশি ফেল করেছে।

এই দ্বিতীয় ধাক্কা সহ্য করবার ক্ষমতা খুব কম টিউটোরিয়ালেরই থাকে। হুহু করে কমে গেল ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা। পাইয়োনিয়ার টিউটোরিয়াল খুব বড় বিজ্ঞাপন দিতে লাগল। সবাই ছুটল সেদিকে।

তাপস হালদার দমে গেলেও একেবারে ভেঙে পড়লেন না।

দু-মাস তিনি বন্ধ করলেন টিউটোরিয়াল। তারপর আবার নতুনভাবে সাজালেন। ফিজিকস্-এর দুজন অধ্যাপককে তিনি আগেই ছাঁটাই করেছিলেন। এবার অন্য সবাইকেই চলে যেতে বললেন। অনেকে তখন মনে করেছিল, তাপস হালদার বুঝি টিউটোরিয়াল হোম একেবারে তুলে দিয়ে অন্য ব্যাবসা করবেন। কিন্তু তা নয়। ফিজিকস, কেমিস্ট্রি, বোটানি, বায়োলজি, ইংরিজি, বাংলা সব ক্লাস বন্ধ হয়ে গেল, রইল শুধু অঙ্ক।

যারা অঙ্কে কাঁচা, তাদের জন্য এবং যারা অঙ্কে খুব ভালো রেজাল্ট করতে চায়, তাদের জন্য এই টিউটোরিয়াল। এবারে সত্যিই এটা হল ইউনিক। একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ নিলেন তাপস হালদার। তিনি বিজ্ঞাপন দিলেন, এখানকার একটিও ছাত্র-ছাত্রী অঙ্কে ফেল করবেন না।

প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছিল ফিজিকস-এর। তাপস হালদার ফিজিকস পড়াতেন না, শুধু অঙ্কের

ক্লাস নিতেন, তাই তাঁর গায়ে ব্যক্তিগতভাবে কালিমা লাগেনি। অসম্ভব তাঁর আত্মবিশ্বাস। আগের মতন আর শত-শত ছাত্র-ছাত্রী তিনি নিতে চাইলেন না। তিনি ভরতি করাতে লাগলেন বেছে বেছে। মাত্র দুটি শিফটে ক্লাস হবে, পঞ্চাশজন করে। পড়াবেন তিনি একলা। আর কয়েকজনকে তিনি আলাদা কোচিং দেবেন।

এবছর ইউনিক টিউটোরিয়ালের সব ছেলেমেয়ে অঙ্কে পাশ। কয়েকজন অন্য সাবজেক্টে ফেল করল বটে, কিন্তু অঙ্কে তাদের ভালো রেজাল্ট।

তাপস হালদার আবার খবরে ফিরে এলেন। টিউটোরিয়ালের জগতে তিনি একটি বিশিষ্ট নাম।

সব ঘরগুলো আর কাজে লাগে না। এ-বাড়ির কিছু-কিছু ঘর তিনি কয়েকটি অফিসকে ভাড়া দিলেন। অফিসের সুবিধে এই যে তারা কেউ সন্ধের পর থাকে না। ভাড়া বেশি পাওয়া যায়, কিন্তু জল-ইলেকট্রিসিটি কম খরচ হয়। কম সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে চালালেও তাপস হালদারের উপার্জন বিশেষ কমল না।

এই সময় তাপস হালদারের জীবনে এল বন্যা নামে একটি মেয়ে। কিংবা বলা যায়, আমার জীবনে এল তাপস হালদার।

তাপস হালদার জনপ্রিয় অধ্যাপক এবং সুপুরুষ, সুতরাং মেয়েরা অনেকেই তাঁর ভক্ত হবে। এটা স্বাভাবিক। গত দশ বছরে তিনি অনেক ছাত্রীকে পড়িয়েছেন, তাদের মধ্যে কেউ-কেউ নিশ্চয়ই রূপসী ও রূপবতী ছিল। কিন্তু তাপস হালদারের নারীঘটিত দুর্বলতার কথা আগে শোনা যায়নি। তা ছাড়া তিনি টাকা রোজগারের নেশায় এমনই মেতে ছিলেন যে অন্য কিছুর জন্যই তাঁর সময় ছিল না। যে মানুষ সর্বক্ষণ অঙ্ক কষায়, সে কখনও কোনও মেয়ের সঙ্গে প্রেম করতে পারে?

কিন্তু বন্যার মতন মেয়েকে তো তাপস হালদার আগে দেখেনি!

বন্যা তেমন কিছু সুন্দরী নয়। আমাদের দেশে রূপের প্রধান মাপকাঠিই হল রং, বন্যাকে কোনওক্রমেই ফরসা বলা যাবে না। তার শরীরের কোনও অঙ্গটাকেই বলা যাবে না অপরূপ। তবু সব মিলিয়ে এমন একটা কিছু আছে, যাতে তাকে অন্যসব মেয়ের চেয়ে আলাদা মনে হয়।

তার শরীরটা হিলহিলে, কোনও কিছুই যেন স্থির নয়। সবসময় খেলা করছে একটা চাঞ্চল্য। সে যখন কোনও কথা বলে না, তখনও তার চোখ ও ঠোঁটের চাপা হাসি যেন কিছু বলে।

তাপস হালদার আমার সম্পর্কে কিছুই জানতেন না।

নিউ আলিপুর থেকে বাসে ফেরার সময় দারুণ ভিড় ছিল। গরমও প্রচণ্ড। ক'দিন ধরে খুব গুমোট চলছে, বৃষ্টির নামগন্ধও নেই। লোকজনের চাপে, ঘেমে-নেয়ে আমার একেবারে দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতন অবস্থা।

এসপ্ল্যানেডে নেমেই মনে হল, এক গেলাশ আখের রস খেতে হবে।

এই রস আমার প্রিয়। যে-কোনও বোতলের কোলড-ড্রিংকসের চেয়ে দামেও সস্তা। মিষ্টি রসে শরীরটাও চাঙ্গা হয়।

পরপর দু-গেলাস রস খেলাম আরাম করে।

তারপর দাম দেওয়ার জন্য পকেটে হাত দিতেই বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল।

আমার মানি ব্যাগ রাখার অভ্যেস নেই। দু-চার টাকা থাকলে বুক পকেটেই রাখি, একটু বেশি হলে রাখি প্যান্টের পকেটে। আজই আমার ছাত্র-ছাত্রীর মা খামে করে আমাকে এ-মাসের মাইনে দিয়েছেন। ওঁরা খুব ভদ্র। কখনও এমনি টাকা দেন না, ভদ্রমহিলা নিজে আমার পড়ানো হয়ে যাওয়ার পর আলাদাভাবে ডেকে কিছু একটা খাওয়ার জিনিস দেওয়ার পর বলেন, এই

খামটা রাখুন।

খামটা নেই!

একশো পঁচিশ টাকা! মাইনে পাব জেনেই আমি আর কোনও টাকাপয়সা নিয়ে বেরুইনি। তেমন কিছু ছিল না বাড়িতে। শুধু কিছু খুচরো পয়সা রয়েছে।

এ-পকেট ও-পকেট চাপড়াতে লাগলাম। প্যান্টের তিনটে পকেট আর জামার বুক পকেট। নেই মানে নেই। কোথাও পড়ে টড়ে গেছে? অসম্ভব! একশো টাকার মূল্য আমার কাছে অনেক। বাসের ভিড়ের মধ্যেও আমি দু-তিনবার খামটা অনুভব করেছি।

পকেটমার? ভিড়ের বিরক্তি কাটাবার জন্য আমি কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক ছিলাম ঠিকই। যখন কোনও একটা পরিবেশ আমার একেবারে পছন্দ হয় না তখন আমি ইচ্ছে করে মনটাকে অন্যদিকে ফেরাই। সুন্দর কোনও জায়গার কথা ভাবি। চলন্ত বাসে বসে আমি চিন্তা করছিলাম কাঁকড়াঝোড় জঙ্গলের কথা।

আমার হাতে দু-খানা বই। সেগুলোরও পাতা ফরফর করে দেখলাম।

পকেটমাররা জানল কী করে যে আজই আমার পকেটে একটা টাকাওয়ালা খাম আছে? অন্যদিন আমার পকেটে পাঁচ-সাত টাকার বেশি থাকেই না!

বাঁ-হাত থেকে হাতঘড়িটা খুললাম। এটা আমার বাবার। বেশ পুরোনো।

ঘড়িটা এগিয়ে দিলাম রসওয়ালার দিকে।

সে চমকে উঠে বলল, ইয়ে কেয়া?

সত্যি কথা বলতেও আমার বুক কাঁপছে। আমার পকেটে যে টাকা ছিল, সেই জন্যেই আমি রস খেতে এসেছি, সেকথা কি ও বিশ্বাস করবে?

বললাম, রুপিয়া খো গ্যয়া। পাকিটমার। আপ এ-ঘড়ি রাখ দিজিয়ে।

লোকটি আঁতকে উঠে বলল, নেহি, নেহি! ঘড়ি নেহি লেঙ্গে, আপ পয়সা দিজিয়ে।

জানতাম বিশ্বাস করবে না। ও ভাবছে আমি ওর সঙ্গে কৌতুক করছি। কিংবা ঠকাতে চাইছি।

বারবার পীড়াপীড়ি করাতে রসওয়ালা একসময় গোমড়া মুখে জানাল যে, ঠিক আছে আমাকে পয়সা দিতে হবে না। ঘড়িও সে রাখবে না।

তখন আমি ঘড়িটা জোর করে তার হাতে গুঁজে দিয়ে বললাম, তুমি রাখো। কাল আমি পয়সা এনে ঘড়িটা ছাড়িয়ে নিয়ে যাব। সে ঘড়িটা নাড়াচাড়া করে দেখল। কানের কাছে নিয়ে আওয়াজ শুনল। খেলনা ঘড়ি নয়। চলবে। যতই কম দাম হোক, দু-গেলাস সরবতের চেয়ে নিশ্চয়ই বেশি।

লোকটিকে ভ্যাবাচ্যাকা অবস্থায় রেখে আমি হনহন করে এগিয়ে গেলাম ট্রাম গুমটির দিকে।

বাড়িতে র‍্যাশান তোলার টাকাটা আমি দিই। এই টাকা থেকে দেওয়ার কথা। কালই সেই দিন। টাকাটা যে-কোনও ভাবে জোগাড় করতে হবে। ঘড়ির ব্যাপারটা গোপন রাখতে হবে সাবধানে। কাল এখানে এসে যদি দেখি রসওয়ালা নেই, তাতেও কিছু যায় আসে না। দু-চারদিন পর বাড়িতে জানিয়ে দেব যে ঘড়িটা হারিয়ে গেছে। হারাতে তো পারেই।

ছোটখাটো অপমান আমি একেবারে সহ্য করতে পারি না। তিন-চারদিন ধরে সেটাই শুধু মাথার মধ্যে ঘোরে, অন্য কিছু ভাবতে পারি না। লিখতে পারি না।

রসওয়ালাকে যদি শুধু বলতাম টাকা হারিয়ে গেছে, দাম দিতে পারছি না। তাহলে সে আমাকে মনে করত ঠক-জোচ্চোর। যদি কোনও খারাপ কথা বলত, আগুন জ্বলত আমার মাথার মধ্যে। তার চেয়ে ঘড়িটা যাওয়া অনেক ভালো।

পকেটে যা খুচরো আছে, তাতে কোনও রকমে ট্রাম ভাড়াটা হয়ে যাবে।

একটা ট্রাম এসে থামবার পর সবেমাত্র হাতলটা ধরেছি, সেই রসওয়ালা ছুটতে-ছুটতে এসে বলল, আপ ঘড়ি লে যাইয়ে। কই ফিকির নেহি। আবার যেদিন রস খেতে আসবেন, সেদিন দাম

দিয়ে দেবেন। তাড়াতাড়ির কিছু নেই।

আমি তবু বললাম, কেন তুমি ঘড়িটা রাখো না!

লোকটি কাতরভাবে বলল, না।

এরপর আর জোর করা যায় না। আমি লোকটিকে ঘড়িটা একেবারে মেরে দেওয়ারও সুযোগ দিয়েছিলাম। কাল থেকে সে যদি এখান থেকে সরে গিয়ে অন্য জায়গায় বসত, তাকে আমি খুঁজে পেতাম না আর। দুদিন পরে ভুলে যেতাম তার মুখ।

ট্রামে উঠে পড়ে তার দিকে আমি একটা কৃতজ্ঞতার হাসি দিলাম।

লোকটির এই অদ্ভুত সততার কথাটা সবাইকে জানাবার মতন না?

অন্তত বন্যাকে এক্ষুনি বলতে হবে!

আজ সকালেই বন্যার সঙ্গে দেখা হয়েছে। সন্ধের সময় আবার যাওয়া যায় না। কিন্তু এখন মনে হল, যেতেই হবে। বন্যাকে এই ঘটনাটা না বললে আজ রাত্তিরে আমার ঘুমই আসবে না।

ফড়েপুকুরের মোড়ে ট্রাম থেকে নেমে আমি ছুটতে লাগলাম। যেন একটা মুহূর্তও নষ্ট করলে মহাবিপদ হয়ে যাবে।

বন্যাদের বাড়ির একতলার বাঁ-দিকের ঘরে বসে আছেন বন্যার কাকা আর তাপস হালদার। বন্যা দাঁড়িয়ে আছে একটা বইয়ের র‍্যাকের পাশে। কিছু একটা বেশ জমাট গল্প হচ্ছে।

এটা বন্যাদের লাইব্রেরি ঘর। বন্যার ঠাকুরদার খুব বইয়ের শখ ছিল, তিনি প্রচুর বই কিনতেন। সবই সাহিত্যের বই। ইংরিজি-বাংলা ক্লাসিক। বন্যার বাবা-কাকারা কেউ সাহিত্যের ভক্ত নন, এখন বিজ্ঞানের হাওয়া বইছে। ঠাকুরদার আমলের বইগুলো অনেকদিন অযত্নে পড়েছিল। এখন বন্যা সেগুলোকে আবার ধুলোটুলো ঝেড়ে ভদ্রস্থ করেছে।

আমি মাঝে-মাঝে এখান থেকে বই পড়তে নিই। কেউ আপত্তি করে না।

কোনও প্রয়োজন ছিল না, তবু আমি ঘরের মধ্যে ওই দুজনকে দেখে প্রথমেই বলে ফেললাম, এই বই দুটো ফেরত দিতে এসেছি!

বন্যার দাদার সহপাঠী আমি। দীপেন এখন চাকরি নিয়ে চলে গেছে রাঁচি। সবাই জানে, আমি বন্যারও বন্ধু। এ-বাড়িতে যখন খুশি আসতে পারি। তবু কেন আমার মুখ দিয়ে একটা কৈফিয়ৎ বেরিয়ে আসে?

বন্যা বলল, এর মধ্যে পড়া হয়ে গেল?

আমি বললাম, হ্যাঁ, আর-একখানা নেব!

বন্যার কাকা বললেন, এখনও চা-টা দিল না কেন? বসো, বসো, তোমরা একটু বসো। আমি দেখছি। আমাকে একটু বেরুতে হবে।

তাপস হালদার এখানে অঙ্কের শিক্ষক হিসেবে আসেননি। এসেছেন স্পেশ্যাল ভিজিটে। বন্যা পড়াশুনো করে অন্য একটা ঘরে।

তাপস হালদারের সঙ্গে সেই আমার মুখোমুখি দেখা।

বন্যা আমাদের আলাপ করিয়ে দিল। তাপস হালদার আমার সঙ্গে শুকনো ভদ্রতা করলেন, বিশেষ পাত্তা দিলেন না। তিনি একটা বইয়ের পাতা ওলটাতে লাগলেন।

বন্যা আবার বলল, সুনীলদা একজন কবি। কবিতা পত্রিকা, চতুরঙ্গ, দেশ পত্রিকায় অনেকগুলো কবিতা বেরিয়েছে।

এবার তাপস হালদার মুখ তুলে খানিক কৌতূহলের চোখে তাকালেন।

আমি বিনীতভাবে বললাম, আমি আপনার বেশ কয়েকটা প্রবন্ধ পড়েছি। আপনি অনেকদিন আর তো কিছু লেখেন না!

তিনি উদাসীনভাবে বললেন, এখন আর সময় পাই না।

তিনি যে অতি ব্যস্ত তা সবাই জানে। কিন্তু আজ এক ছাত্রীর বাড়িতে বেড়াতে আসার সময় পেলেন কী করে, সেটাই খুব আশ্চর্যের ব্যাপার।

হয়তো আমার চোখের মধ্যে এই প্রশ্ন ছিল। তাই তিনি আবার বললেন, আমাদের কোচিং কলেজের ঠিক সামনেই আজ একটা পুজো হচ্ছে। ইতু পুজো না ষষ্ঠী পুজো কী যেন! এত জোরে মাইক আর ঢাক বাজাচ্ছে যে ওখানে আর বসে থাকা যায় না। তাই আজ বেরিয়ে পড়েছি!

তাপস হালদারের চেহারা ও ব্যক্তিত্বের কাছে এমনিতেই আমি কাঁচুমাচু হয়ে গেছি। এরপর আবার তিনি প্রশ্ন করলেন, আপনি কী করেন ভাই!

এই একটি প্রশ্নই যে-কোনও বেকার যুবককে কাত করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

আমি ঢোঁক গিলতে-গিলতে বললাম, বিশেষ কিছু না। চেষ্টা করছি কিছু একটা জোগাড় করার।

তাপস হালদার একটা সিগারেট ধরালেন।

বন্যা একটা বই এনে বলল, আপনি ওর কবিতা পড়েছেন। এটা ওর প্রথম বই।

আমি ভুরু নাচিয়ে-নাচিয়ে বন্যাকে বারণ করার অনেক চেষ্টা করেও পারলাম না। বন্যা বইটা তাপস হালদারের হাতে তুলে দিল।

তাপস হালদার খুব অবহেলার সঙ্গে পাতা ওলটাতে লাগলেন। এক জায়গায় তাঁর চোখ থেমে গেল। একটা গোটা কবিতা পড়লেন মনে হল। তিন-চার পাতা পরে আর-একটা।

আমি ব্যগ্র চোখে চেয়ে আছি। বুকটা দুরুদুরু করছে। আমার সামনে বসে কেউ আমার লেখা পড়লে যেমন লজ্জা করে, তেমনি কৌতূহলও দমন করতে পারি না।

বইখানা পাশের টেবিলে রেখে দিয়ে তাপস হালদার বললেন বাঃ, বেশ ভালোই তো। কয়েকটা লাইন বেশ ইন্টারেস্টিং।

তারপর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে, চোখ নাচিয়ে, খানিকটা হেসে বললেন, কয়েকটা ছন্দ ভুল আছে!

সঙ্গে-সঙ্গে আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে গেল!

সাহস কী লোকটার! বুদ্ধদেব বসু পর্যন্ত আমার ছন্দের ভুল ধরতে পারেননি কখনও। আর হঠাৎ এই কথা বলল একজন অঙ্কের মাস্টার।

আমার মুখচোখ লাল হয়ে গেছে। কোনওরকমে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে যতদূর সম্ভব বিনীতভাবে জিগ্যেস করলাম, কোথায়-কোথায় ভুল আছে, একটু দেখিয়ে দেবেন?

তাপস হালদার তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, নাঃ! এখন আর মাস্টারি করতে ইচ্ছে করছে না।

তারপর বন্যার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, তোমাদের বাড়িতে চা দিতে খুব দেরি করে তো? তোমার কাকা কোথায় গেলেন?

বন্যা বলল, দেখছি। আপনি একটু বসুন!

বন্যা এক ছুটে বেরিয়ে গেল।

ও কেন শুধু বলল, আপনি একটু বসুন? কেন বলল না, আপনারা? ও চায় না, আমি এখানে বসে থাকি? ধ্যাৎ, তা হতেই পারে না। আমার সঙ্গে কি বন্যার ভদ্রতার সম্পর্ক?

তাপস হালদার আমার সঙ্গে আর একটিও কথা না বলে অন্য একটা বইয়ের পাতা ওলটাতে লাগলেন। আমিও বসে রইলাম চুপ করে। দেওয়ালে একটা বড় ঘড়ি, তার পেন্ডুলামের শব্দও শোনা যাচ্ছে।

তাপস হালদার গোড়া থেকেই আমাকে পছন্দ করেননি। উনি কি আমার নিশ্বাসে হিংস্রতার গন্ধ পেয়েছিলেন?

একসময় আমিও উঠে গিয়ে বইয়ের র‍্যাকের পাশে দাঁড়ালাম।

বন্যা ফিরে এল দু-কাপ চা নিয়ে। জিগ্যেস করল, স্যার, আপনি চিনি খান তো?

তাপস হালদার বেশ অবাকভাবে বললেন, কেন, চিনি খাব না কেন?

বন্যা এক কাপ চা তাপস হালদারের হাতে তুলে দিল, কিন্তু আর-এক কাপ টেবিলের ওপর রেখে বলল, এই-ই, তোমার চা!

বন্যা আমাকেও কাপটা হাতে তুলে দিল না কেন?

বন্যা বলল, কাকা ওপরে টেলিফোনের কাছে বসে আছেন। বিদেশ থেকে একটা কল আসবার কথা আছে।

তাপস হালদার বললেন, আমারও বাড়িতেও একটা টেলিফোন নেওয়ার অনেক চেষ্টা করছি। কিছুতেই দিচ্ছে না।

বন্যা বলল, পেয়ে যাবেন, সামনের মাসের মধ্যেই!

সামনের মাসে পাব? সত্যি? তোমার কেউ চেনা আছে?

না কেউ চেনা নেই।

তাহলে? তুমি কী করে জানলে।

আমি বলছি, দেখুন মেলে কি না। ঠিক এক মাসের মধ্যে।

বন্যা, তুমি মাঝে-মাঝে এমনভাবে কথা বলো, যেন মনে হয়, তুমি হাত গুণতে জানো!

আপনি ওসবে বিশ্বাস করেন বুঝি?

না। বিশ্বাস করি না। তবে মজা পাই। একসময় হাত-দেখার চর্চা করেছি।

আমি সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়ালাম। ওদের সংলাপে আমার কোনও ভূমিকা নেই। যেন ঘরে আর কেউ নেই।

তাপস হালদার যদি বন্যার হাত দেখার চেষ্টা করে, তাহলে আমি একটা মোটা বই ওর মাথায় ছুড়ে মারব। হাত দেখা? পুরোনো টেকনিক!

বন্যাও ইঙ্গিতটা নিল না। হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। ও আমার মনোভাব ঠিক বুঝেছে। এই জন্যই বন্যা অন্য মেয়েদের থেকে আলাদা।

তাপস হালদার চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে বললেন, তুমি সারাদিনে অন্তত দু-ঘণ্টা সময় দিতে পারবে অঙ্কের জন্য? তা হলেই আমি তোমাকে ফার্স্ট ক্লাস পাইয়ে দেব।

পড়াশুনোর কথাবার্তা। তাপস হালদার ভাবছেন, আমি একজন অপ্রয়োজনীয় মানুষ। বই নিতে এসেছি, এখন আমার চলে যাওয়া উচিত!

বন্যাকে এই লোকটার কাছে একা রেখে আমি চলে যাব?

শুরু হল একটা স্নায়ুযুদ্ধ। কে আগে যাবে? আমার আগে যাওয়ার তো কোনও প্রশ্নই ওঠে না। এসপ্ল্যানেডের আখের রসওয়ালার গল্পটা বলতে হবে না বন্যাকে? তাপস হালদারের সামনেও সেকথা বলা চলে না।

বন্যা আমাকে জিগ্যেস করল, তোমার বই বাছা হয়নি?

কেউ যেন আচমকা আমাকে একটা চড় মেরেছে! বন্যার এই কথা বলার মানে কী? বন্যা আমাকে চলে যেতে বলছে?

এরপর আমার সামনে দুটি মাত্র পথ।

এই মুহূর্তে বন্যাকে খুব করে আমার বলা উচিত, আর কোনওদিন অন্য লোকের সামনে আমার সঙ্গে এভাবে কথা বোলো না! অথবা, এক্ষুনি এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যাব, আর আসব না কোনওদিন, আর কোনওদিন মুখ দেখব না বন্যার।

দু-এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে আমাকে পথটা বেছে নিতে হল।

তারপর বললাম, থাক, আজ আর কোনও বই নেব না। এমনকি তাপস হালদারের দিকেও চেয়ে বললাম, আসি! নমস্কার!

বন্যার দিকে না তাকিয়ে আমি বেরিয়ে গেলাম ঘর থেকে। কেউ কি আমাকে কিছু বলল? কেউ আমার নাম ধরে ডাকল?

আমি শুনতে পেলাম না কিছু।

রাস্তায় বেরিয়ে হলুদ রঙের বাড়িটার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললাম, বিদায়!

হুহু করে আমার শরীরের ওজন কমে যাচ্ছে। আমি এত হালকা হয়ে গেছি যে যেন হাওয়ার উড়ে যেতে পারি। ঝড়ের মুখে একটা শুকনো পাতার মতন আমি একটা ট্রামের ভেতর ঢুকে পড়লাম।

বন্যাকে আমি এত বেশি আঁকড়ে ধরেছিলাম, সে আমার বুক এতটাই জুড়ে ছিল যে তাকে পরিত্যাগ করা মাত্র আমি একেবারে শূন্য হয়ে গেলাম। আমার অস্তিত্বটাই টলমলে হয়ে গেল।

এইরকম সময়ে কেউ-কেউ আত্মহত্যা কিংবা খুন করে। আমি কলম ছাড়া আর কোনও অস্ত্র কখনও হাতে নিইনি। অনেক সময়েই কোনও-কোনও লোককে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে ইচ্ছে করে বটে, কিন্তু আমি জানি, সেরকম ইচ্ছে আমি কোনওদিনই কাজে পরিণত করতে পারব না। তার চেয়ে নিজে সরে যাওয়া অনেক সহজ।

আহিরীটোলার একটা বাড়িতে একতলার আড়াইখানা ঘর আমাদের। এ-বাড়িতে পাঁচ ঘর ভাড়াটে, অনরবত লোকজন আসে যায়, সর্বক্ষণ যেন একটা হট্টমেলা চলছে। রাত্তিরে কে সদর দরজা বন্ধ করবে। ভোরবেলা কে এসে খুলে দেবে তার কোনও ঠিক নেই।

দরজার পাশেই ছোট্ট ঘরখানা আমার আর ছোট কাকার। ছোট কাকা খুব ঘুম কাতুরে আর আমার রাত জাগার অভ্যেস। দোতলার বিপিনবাবুর খুব চোর-ডাকাতের ভয়, তিনি রাত দশটা বাজলেই ওপর থেকে চিৎকার করেন, সদর বন্ধ হয়েছে? সদর বন্ধ হয়েছে? অন্ধকারে কেউ সিঁড়ির নীচে ঢুকে বসে থাকবে!

তিনি নিজে নামবেন না, আমাকেই দরজা বন্ধ করে দিতে হয়।

কিন্তু তার পরেও এগারোটা, সাড়ে এগারোটায় কেউ-কেউ ফেরে, তারা খটাখট করে দরজায় ঝড়া নাড়ে। আমাকেই খুলে দিতে হয়, এবং আমার ওপরেই চোখ রাঙিয়ে তারা বলে, এত তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করতে কে বলেছে?

রাস্তার দিকে একটি মাত্র জানলা। সেটা খুলে রাখারও বিপদ আছে। রাত বারোটার পর যখন সব দিক নিঝুম হয়ে যায় তখন আমি লেখাপড়া করতে বসি। তারপর শুরু হয় উপদ্রব।

আমাদের পাড়ার মোড়ে একটা ছোট্ট স্যাকরার দোকান আছে।

বেশিরভাগ দিনই দিনের বেলা সেটার ঝাঁপ বন্ধ থাকে, সন্ধের পর খোলে। আসলে সেটা একটা চোলাই মদের আড্ডাখানা।

এ-পাড়ার দুই মাতাল মাস্তুদা আর সানুদা প্রায়ই মাঝরাত্তিরে এসে দাঁড়ায় আমার জানলার কাছে। দুজনেই কিন্তু ভালো লোক, আমাকে পছন্দ করে বেশ। তবে, রাত্তিরে নেশা করার পর আমার জন্য তাদের দরদ উথলে ওঠে।

আমি হয়তো তখন একটা কবিতা লিখছি। দুটো লাইন লেখার পর তৃতীয় লাইনটা কিছুতেই মনে আসছে না। ঠিক মতন শব্দ খোঁজার জন্য কলম কামড়াচ্ছি। তখন মাস্তুদা আর সানুদা জানলার কাছে এসে দাঁড়িয়ে গভীর দুশ্চিন্তার সঙ্গে বলবে, ইঃ, তুই এখনও লেখাপড়া করছিস? তোর কি সারাবছর ধরেই পরীক্ষা থাকে? আগের বারে পাস করিসনি? এত পড়া আর পড়া, তোর যে চোখ নষ্ট হয়ে যাবে রে! ব্রেনের ওপর এত টর্চার, ভালো করে মাখন খাস

তো? আহা রে, ছেলেটার কী কষ্ট!

এইরকম কথা অনেকক্ষণ ধরে। কখনও তারা আমার কাছ থেকে সিগারেট চায়, আবার তাদের হাতের বোতল থেকে আমাকে দু-এক ঢোঁক খাওয়াবারও চেষ্টা করে। এইজন্য, গরমের মধ্যেও আমাকে জানলা বন্ধ রাখতে হয়।

তবে গ্রীষ্মকালটায় আমার মুক্তির একটা জায়গা আছে। ছাদ। রাত্তিরবেলা ছাদে মাদুর পেতে শুতে আমার দারুণ ভালো লাগে। ভাড়াটেদের আরও কেউ-কেউ শোয়, তবে আমি একটা কোণ বেছে নিই, অন্যদের সঙ্গে বিশেষ কথা হয় না।

একটু মেঘলা-মেঘলা থাকলে আরও ভাবনা। সেদিন আর অন্য কেউ যায় না।

আজ এদিকে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। সেইজন্য ছাদে আর কেউ মাদুর পাতেনি। আকাশ এখন লাল হয়ে আছে।

সারাদিন এত গরম ছিল যে ওই এক পশলা বৃষ্টিতে ছাদ একটুও ভেজেনি। বরং ধুলো সরে গেছে। আজ পুরো ছাদটা আমার, তবু কোণের দিকটায় আমার নিজস্ব জায়গাতেই মাদুর পাতলাম। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়লেও আমি উঠি না। ঝমঝমিয়ে নামলে সিঁড়ির মুখে ছোট্ট জায়গাটাতেই শুয়ে থাকি।

চিৎ হয়ে শুয়ে বিশাল আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকলে মনটাও যেন উন্মুক্ত হয়ে যায়। আকাশে প্রত্যেকদিন নতুন ছবি। যেদিন মেঘ থাকে না, সেদিন চলে যাই নক্ষত্রলোকে। দেখতে পাই উল্কার ছোটাছুটি। মেঘরাও কতরকম ভাস্কর্য ও স্থাপত্য তৈরি করে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে মনে হল, বন্যা আমার জীবনে আর নেই। আজ বিকেলেও কি আমি ভাবতে পারতাম, বন্যাকে বাদ দিয়ে আমি বেঁচে থাকতে পারব? এত বেশি ভালোবাসা আমার চোখ অন্ধ করে দিয়েছিল। আমি ভালোবাসলেই বন্যা পুরোপুরি তার প্রতিদান দেবে, এটা ধরেই নিয়েছিলাম? আর কোনও দিকে তাকাইনি। আর কোনও মেয়ের সঙ্গে আমার ভাব নেই। সবসময় শুধু বন্যা আর বন্যা! কিন্তু ও আমাকে ভালোবাসতে যাবে কেন? আমি একটা অতি সাধারণ পরিবারের বেকার ছেলে, দুটো-চারটে কবিতা লিখেছি মাত্র, ভবিষ্যতের কোনও আশা নেই।

বন্যা আমাকে হয়তো খানিকটা পছন্দ করে। খানিকটা প্রশ্রয়ও দেয়। কিন্তু সেটা ভালোবাসা নয়। সেটাই আমি এতদিন বুঝতে পারিনি।

বুকটায় একটা বড় ক্ষত হয়ে আছে, তার ওপর লাগছে ঠান্ডা হাওয়া। আঘাতটা এত বেশি যে সম্পূর্ণ ব্যথাটা এখনও টের পাচ্ছি না। হাওয়াটাই খুব ভালো লাগছে। সত্যিকারের মিষ্টি হাওয়া। যারা আজ ঘরের মধ্যে শুয়ে আছে, তারা আজ ফুল স্পিডে পাখা চালিয়েও এ আরাম পাবে না।

ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসবেই একসময়। তবু আবার জেগে উঠলাম।

বন্যা আমার পাশে এসে বসেছে। ওর নরম হাত রেখেছে আমার কপালে।

এটা স্বপ্ন। না, বন্যা, আমি তোমাকে আর স্বপ্নেও দেখতে চাই না।

বন্যা হেসে বলল, কেন, এত রাগ?

আমি বললাম, নাঃ, রাগ নয় তো! দ্যাখো আমি কত শান্ত। আমি সব বুঝে গেছি।

বন্যা বলল, তুমি পাগলের মতন দৌড়ে আমাদের বাড়ি থেকে, বেরিয়ে এলে? একবার আমার দিকে তাকালে না?

আমি বললাম, মোটে দৌড়ে বেরোইনি। তোমার কাছ থেকে, তোমার অঙ্কের মাস্টারের কাছ থেকে ভদ্রতা করে বিদায় নিয়ে এসেছি। তুমি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ছিলে।

বন্যা বলল, মোটেই না। আমি সোজা তোমার দিকে তাকিয়ে ছিলাম, তুমি মুখ তোলোইনি।

আমি বললাম, আঃ! এটা তো স্বপ্ন। স্বপ্নের মধ্যে তর্ক করে কী লাভ? তুমি যাও, বন্যা,

আমার স্বপ্ন থেকে চলে যাও। আমি কোনও স্বপ্ন দেখতে চাই না, চাই না, তুমি যাও!

বন্যা জেদির মতন বলল, না, আমি যাব না!

হঠাৎ ধড়মড় করে জেগে উঠলাম। স্বপ্ন ভেঙে দেওয়ার সবচেয়ে ভালো উপায় জেগে ওঠা।

এ কী। রীতিমতন রোদ উঠে গেছে। এবং আমার পাশে সত্যিই বন্যা বসে আছে। মুখে তার মিটিমিটি হাসি। একটা কচি কলাপাতা রঙের শাড়ি পরা।

আমি গভীর দৃষ্টিতে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম তার দিকে। সত্যিই কি বন্যা? আমাদের বাড়ির ছাদে! বন্যা আমাদের বাড়িতেই কখনও আসেনি, আমার বাড়ি সে চেনে না।

বন্যা আমার পাশে বসে আমার চুল নিয়ে খেলা করছে। আমি একটা হাত তুলে রাখলাম তার উরুতে।

বন্যা আমার হাতটা ধরে বলল, অনেক ঘুমিয়েছ, এবার ওঠো!

আর কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না। সত্যিই রক্ত-মাংসের নারী। কাল রাত্রে কী ঘটেছে, আমি সমস্ত ভুলে গেলাম। আমার মনে একটাই প্রশ্ন, বন্যা এখানে এল কী করে?

বন্যা দুষ্টুমির হাসি দিয়ে বলল, আকাশ দিয়ে উড়তে-উড়তে।

অধিকাংশ নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারই খুব রক্ষণশীল। এ-বাড়ির অন্য ভাড়াটেরাও পরচর্চার সামান্য সুযোগ পেলেই জিভে শান দেয়। ভোরবেলা একটি যুবতী মেয়ে ছাদে আমার পাশে বসে গল্প করছে। এ দৃশ্য কেউ সহ্য করবে না। হয়তো ওরা ভাববে, বন্যা সারারাতই আমার সঙ্গে এখানে ছিল।

বন্যা আমার ঠিকানা জানে। ঠিকানা খুঁজে এসেছে। ফড়েপুকুর থেকে এতদূর এই ভোরে এল কী করে, ট্যাক্সিতে? সদর দরজা কে খুলে দিল? বন্যা কী করেই বা জানল যে আমি ছাদে শুয়ে থাকব!

বন্যা সেসব প্রশ্নের কোনও উত্তরই দেবে না।

বালিশের তলা থেকে ঘড়িটা বার করলাম। খুব ভোর নয়, সাতটা বাজে। এতক্ষণে কলকাতা অনেকটাই জেগে উঠেছে, আমাদের বাড়িতেও একতলায় বাথরুমে কাজের মেয়েদের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে।

বন্যা বলল, তোমাদের এখান থেকে তো গঙ্গা কাছেই। চলো, গঙ্গার ধারে কোনও দোকানে গিয়ে চা খাই!

আমি বললাম, জানো, এই ঘড়িটা, কাল সন্ধেবেলা এসপ্লানেডে একটা আখের রসওয়ালার কাছে বাঁধা রাখতে চেয়েছিলাম। সে কিছুতেই নিল না। আমি জোর করলাম, তবু নিল না। এত ভালোমানুষ এখনও হয়?

বন্যা বলল, ঘড়ি বাঁধা দিয়েছিলে? কাল টিউশনির মাইনের টাকা হারিয়ে ফেলেছ বুঝি?

বন্যাকে সব বলতে হয় না, ও অনেক কিছুই আগে থেকে বুঝে নেয়। আমি কেন বুঝতে পারি না?

বন্যা বলল, চলো, চলো, এরপর বেশি রোদ উঠে যাবে!

সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় মনে-মনে জপ করছি, কেউ যেন দেখতে না পায়। মা-বাবার সামনে যেন পড়ে না যাই।

আমি যে বাবা-মাকে খুব ভয় পাই, তা নয়। তবু লজ্জা, সমীহ মেশানো একটা কিছু তো থাকেই। তা ছাড়া অনেক দিনের সংস্কার। একটি তরুণী মেয়ের সঙ্গে পা টিপেটিপে ছাদ থেকে নামা, এটা দেখলে ওঁরা আঁতকে উঠবেন। অন্য কেউ বুঝবে না যে প্রায় সারারাত ধরে স্বপ্নে ওর সঙ্গে তর্কাতর্কি করেছি বলেই সকালবেলা বন্যা এখানে এসেছে।

বিপিনবাবু গামছা পরে ঘর থেকে বেরুতে গিয়ে বন্যাকে দেখতে পেয়ে নিজেই লজ্জায়

ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন। ছোটকাকা বাথরুমের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁত মাজতে-মাজতে দেখল, আমার বদলে বন্যাকেই বেশি করে দেখল। কিন্তু অবাক হল না। হয়তো ভাবল, বন্যা এ-বাড়ির অন্য কোনও ভাড়াটেদের অতিথি। আমার সঙ্গে যোগাযোগটা কল্পনাই করেনি। সেইটাই সুবিধে। একতলায় কেউ ভাববে না। বন্যা আর আমি একসঙ্গে ছাদ থেকে নামছি।

ময়লা, চটকান, পাজামা, তার ওপর একটা গেঞ্জি। সদর দরজার কাছে এসে বললাম, তুমি বাইরে দাঁড়াও, আমি একটা জামা পরে আসছি।

বন্যা বলল, কোনও দরকার নেই।

বন্যা আমার হাত ধরে টানতে যাচ্ছিল, আমি নিজেই বেরিয়ে এলাম। কোনওদিন আমি গেঞ্জি পরে রাস্তায় বেরোই না, আর আজ একটি মেয়ের সঙ্গে...

কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে বন্যা বলল, ছেলেদের কত সুবিধে, তবু তারা গরমের মধ্যে সবসময় জামা পরে থাকে কেন? ইস, আমরা যদি এরকম পারতুম! সকালবেলা শুধু একটা শায়া আর গেঞ্জি পরে বেরুলে সবাই ভাবত খারাপ মেয়ে, তাই না?

আমি কথা খুঁজে পাচ্ছি না।

বন্যা বলল, একদিন কোনও একটা নির্জন সমুদ্রের ধারে আমি তোমার সঙ্গে ঠিক এইরকম ভাবে হাঁটব।

মোড়ের মাথায় একটা রিকশা দাঁড়িয়ে আছে। বন্যা তাকে পয়সা দিয়ে ছেড়ে দিল।

তারপর আমাকে জিগ্যেস করল, তোমাদের বাড়ি থেকে গঙ্গা এত কাছে। তুমি গঙ্গায় সাঁতার কাটতে যাও না?

ছেলেবেলায় যেতাম।

তুমি আমাকে সাঁতার শিখিয়ে দেবে? কলকাতায় না, বাইরে কোথাও গিয়ে। আমার পরীক্ষাটা হয়ে যাক! ঘাটশিলায় তোমার এক বন্ধু থাকে না? ওখানে নদীটার কী যেন নাম?

বন্যা, তুমি কী করে জানলে যে আমি ছাদে শুয়ে থাকব?

ওসব থাক। নদীটার নাম বলো না!

সুবর্ণরেখা।

খুব গভীর?

না, বেশি জল থাকে না। তুমি ওখানে সাঁতার শিখতে পারো!

তাহলে যদি এই সেপ্টেম্বরে। কথা রইল।

তুমি এত সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলে। কেউ তোমার খোঁজ করবে না?

তুমি এত আজেবাজে জিনিস নিয়ে চিন্তা করো কেন? এগুলো কি দরকারি কথা? আমি সকালবেলা দেশবন্ধু পার্কে বাস্কেটবল খেলতে যাই, জানো না? তোমাদের এখানে এখন জিলিপি পাওয়া যাবে?

হ্যাঁ, খুব ভালো জিলিপি! চলো, কাছেই।

কাল ক'গেলাস আখের রস খেয়েছিলে?

দু-গেলাস।

কত দাম?

আড়াই টাকা।

সেই টাকাও তোমার কাছে ছিল না। তুমি ঘড়িটা দিতে গিয়েছিলে? আমি ওই লোকটার কাছে গিয়ে আখের রস খাব। আজই বিকেলে।

বিকেলে তুমি টিউটোরিয়ালে যাবে না?

আবার বাজে কথা! আখের রস খেতে চেয়েছি, তুমি খাওয়াবে কি না বলো! আমরা দুজনে

মিলে চার গেলাস খাব। তারপর লোকটাকে আমার একটা সোনার চুড়ি বাঁধা দিতে চাইব। দেখতে হবে, সেটাও ও ফেরত দিতে চায় কি না!

বন্যা এমনভাবে এ কথাটা বলে হাসতে লাগল যে আমারও না হেসে উপায় রইল না। সোনার চুড়ি হাতে সেই রসওয়ালা লোকটার ভ্যাবাচ্যাকা মুখখানা যেন দুজনেই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

গঙ্গার ধারে প্রচুর স্নানযাত্রীর ভিড়। এখানকার অনেক দোকানই খুব ভোরে জেগে ওঠে। কাছেই শ্মশান বলে কোনও-কোনও দোকান জেগে থাকে সারারাত।

জিলিপি সিঙারা ভাজার গন্ধে ম-ম করছে জায়গাটা।

একটা দোকানের সামনের বেঞ্চে বসলাম দুজনে। বন্যাকে বললাম, আমি জামা পরে আসিনি, পয়সা না থাকলেও ক্ষতি নেই। এরা আমাকে ধার দেয়।

বন্যা চোখ বড়-বড় করে বলল, কেন, ধার কেন? তোমার হাতে তো ঘড়িটা রয়েছে!

আবার সেই হাসি!

হাসতে-হাসতে আমার মনে হল, একদিন কোথাও বন্যা আর আমি এরকম পাশাপাশি বসে জিলিপি খাব আর মজার গল্প করব। তাপস হালদার হেঁটে যাবে আমাদের সামনে দিয়ে, আমরা ফিরেও তাকাব না।

তাপস হালদার যেন প্রায় পাগল হয়ে গেলেন।

অত ব্যস্ত মানুষ, কিন্তু তিনি প্রত্যেকদিন সন্ধেবেলা আসতে লাগলেন বন্যাদের বাড়িতে। বন্যাকে তিনি আলাদা পড়াবেন। বন্যা অঙ্কে এবছর রেকর্ড নম্বর পাবে, এই তাঁর প্রতিজ্ঞা।

এতখানি সময় তিনি ব্যয় করবেন, কিন্তু তাঁর জন্য বেশি টাকাও তিনি চান না। বন্যার কাকাকে তিনি বুঝিয়েছেন যে বছরের-পর-বছর মাস্টারি করতে-করতে তাঁর একঘেয়েমি এসে গেছে। পয়সার জন্য টিউটোরিয়াল হোম তাঁকে চালাতে হবেই। কিন্তু প্রতি বছর অন্তত একজন কোনও ছাত্র বা ছাত্রীকে আলাদা করে বেছে নিয়ে তিনি মনপ্রাণ দিয়ে অঙ্ক শেখাতে চান। এটা তাঁর আনন্দের ব্যাপার। এজন্য তাঁর টাকা চাই না। বন্যার মতন বুদ্ধিমতী মেয়ে তিনি আগে দেখেননি।

বন্যা যদি অঙ্কে ফার্স্ট হয়, তাহলে তিনি ওর কাকার কাছ থেকে নিজেই কিছু চেয়ে নেবেন।

প্রত্যেকদিন সন্ধেবেলা দু-ঘণ্টা, আড়াই ঘণ্টা ধরে অঙ্ক! লোকটা তো পাগল হয়েছেই। মেয়েটাকেও পাগল করে দেবে নাকি? এত অঙ্ক কারুর সহ্য হতে পারে?

এখন প্রত্যেকদিন সন্ধেবেলা সাড়ে ছ'টা থেকে ন'টা পর্যন্ত বন্যাদের বাড়িতে যাওয়া আমার নিষেধ। কেউ নিষেধ করেনি। আমরা নিজেরাই ঠিক করেছি। ভালো রেজাল্ট করার সম্ভাবনায় বন্যা তাপস হালদারের আগ্রহের আতিশয্য মেনে নিয়েছে। উনি যে সত্যিই ভালো পড়ান, তাতে তো কোনও সন্দেহ নেই।

উনি আমাকে একেবারেই সহ্য করতে পারেন না। এর মধ্যে আর দু-তিনবার দেখা হয়েছে। আমাকে দেখলেই উনি উৎকটভাবে গম্ভীর হয়ে যান। এখন আর আমার রাগ হয় না, ওকে রাগিয়ে আমি মজা পাই!

ঠিক ন'টা বাজতে পাঁচ মিনিট আগে আমি ফড়েপুকুরের মোড়ে এসে দাঁড়াই! অপেক্ষা করি। দূর থেকে তাপস হালদারকে আসতে দেখলে আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে হাঁটতে শুরু করি।

ঠিক ওঁর সামনে এসে, ইচ্ছে করে মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বলি, ভালো আছেন?

উনি এতই অবাক হয়ে যান যে কোনও কথাই বলতে পারেন না। রাত ন'টার পর আমি বন্যার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি, এটা উনি যেন বিশ্বাসই করতে পারেন না। আমারই মতন নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে এসেছেন তাপস হালদার, ওঁর মধ্যেও নানান সংস্কার কাজ করছে।

কিন্তু বন্যা যদি ভোরবেলা আমাদের বাড়ির ছাদে গিয়ে দেখা করতে পারে, তাহলে আমিই বা রাত ন'টার সময় ওর বাড়িতে আসতে পারব না কেন? বন্যাদের বাড়িতে এ ব্যাপার নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না।

দ্বিতীয় দিন আমাকে ওভাবে দেখার পর তাপস হালদার আবার ফিরে এলেন।

বন্যা তখন দরজার দিকে পেছন ফিরে বসে বইপত্র গোছাচ্ছে, আমি চুপিচুপি এসে ওর চোখ টিপে ধরলাম।

আমার স্পর্শ চেনে বন্যা, তবু কৃত্রিম ভয়ে বলে উঠল, এই, এই, কে? কে?

আমি গলার স্বর গম্ভীর করে বললাম, যথেষ্ট অঙ্ক হয়েছে, এখন কবিতা পড়ার সময়! সারাদিন যারা শুধু কেমিস্ট্রি, ফিজিকস আর অঙ্ক কষে, একটাও কবিতা পড়ে না, তাদের ভবিষ্যৎ একেবারে ঝরঝরে! বন্যা বলল, আমি রাত্তিরে শুয়ে-শুয়ে কবিতার বই পড়ি! রোজ! দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন তাপস হালদার। বন্যাকে শোনাবার জন্য নয়, তাঁকে শোনাবার জন্য আমি আবার বললাম, শুধু কাজ, কেরিয়ার আর টাকা রোজগারের চিন্তা করলেই চলে না, মানুষকে মাঝে-মাঝে স্বপ্ন দেখতে হয়। যে স্বপ্ন দেখে না, সে ভালোভাবে বাঁচতেও জানে না!

তাপস হালদার এবার গলা খাঁকারি দিলেন।

বন্যা সঙ্গে-সঙ্গে আমার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ঘুরে তাকাল।

তাপস হালদার খানিকটা নার্ভাস গলায় বললেন, একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, বন্যা। কেমিস্ট্রির কয়েকটা ফর্মুলার অঙ্ক...কথা বলতে-বলতে তিনি চেয়ারে এসে বসলেন। অর্থাৎ তাঁর কথাটা দু-এক মিনিটে ফুরোবে না।

বন্যার সঙ্গে আমার শর্ত আছে, ওঁর সামনে আমি পারতপক্ষে থাকব না। তাই হাতের একটা বই টেবিলের ওপর রেখে বললাম, আমি চলি!

পরদিন দুপুরে বন্যা আমাকে হাসতে-হাসতে জানাল, স্যার তোমার সম্পর্ক কী বলছিলেন জানো? কাল বেশ রেগে গিয়েছিলেন। এর আগে সরাসরি তোমার সম্পর্কে কিছু বলেননি। কিন্তু কাল বললেন, ওই ছেলেটি তোমাকে এত বিরক্ত করতে আসে কেন? বারণ করে দিতে পারো না? এতে তোমার কনসেনট্রেশন নষ্ট হয়ে যাবে!

তুমি কী বললে?

আমি নিরীহভাবে বললুম, বারণ করব কী করে? আমার দাদার বন্ধু, অনেকদিন ধরে এ-বাড়িতে আসছেন?

তারপর?

তখন উনি বললেন, বাড়িতে এলেও তোমাকে জ্বালাতন করবে কেন? না, না, এখন পরীক্ষার আগে এভাবে সময় নষ্ট করা ঠিক নয়! জানো না। যাদের আর কিছু হয় না, চাকরি-বাকরি পায় না, তারাই কবিতা লেখে!

শোনো বন্যা, তোমার ওই অঙ্কের মাস্টারটিকে কবিতা সম্পর্কে আলোচনা করতে বারণ করো! সেটা আমি টলারেট করব না।

এই মাথা গরম করবে না, প্লিজ! আর তো মাত্র কয়েকটা মাস। তারপর আমরা সুবর্ণরেখা নদীর ধারে যাব।

কয়েকদিনের মধ্যেই দুটি মিরাকল ঘটল। আমি একটা চাকরি পেয়ে গেলাম মধ্যশিক্ষা পর্ষদ-এ। কয়েক মাস আগেই ইন্টারভিউ দেওয়া ছিল, তখন শুনেছিলাম কোনও আশা নেই। দুটি ছেলের অ্যাপয়েন্টমেন্টও হয়ে গেল। হঠাৎ নাকি সেই দুজনই ভালো সুযোগ পেয়ে এই চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। তাই আমার ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ল।

অতি সাধারণ চাকরি, তাই বা এ-বাজারে ক'জন পায়?

তাহলে এতদিন বাদে আমার বেকার দুর্নামটা ঘুচল। মধ্যশিক্ষা পর্ষদে কাজ করি, কী পোস্ট তা আর ক'জন জানছে? এবার আরও বেশি করে কবিতা লিখতে হবে।

আমার চাকরি পাওয়ার মতনই আর-একটা অত্যাশ্চর্য ঘটনা, তাপস হালদার একটা টেলিফোন পেয়ে গেলেন!

বন্যা বলেছিল বটে, উনি এক মাসের মধ্যে টেলিফোন পেয়ে যাবেন। সেটা একটা কথার কথা। লোককে চমকে দেওয়ার জন্য বন্যা এই ধরনের কথা বলে। সেটা মিলে গেল! এক মাস না হোক, আড়াই মাসের মধ্যে। অনেকে বহু সাধ্যসাধনা করে দশ বছরের মধ্যেও পায় না!

নতুন ফোন পেলে কেউ-কেউ খানিকটা আদিখ্যেতা করেই। অকারণে যখন-তখন ডায়াল ঘোরায়। তাপস হালদার দিনের মধ্যে অন্তত পাঁচবার বন্যাকে টেলিফোন করতে লাগলেন। প্রথমেই জিগ্যেস করেন, কী করছিলে? যেন উনি জানতে চান, বন্যা আমার সঙ্গে সময় নষ্ট করছে কি না!

বন্যার কাকার সঙ্গে তাপস হালদারের আগে থেকেই পরিচয় ছিল। তিনি আর বাড়ির অন্যান্য লোকও বুঝতে পারলেন যে তাপস হালাদার বাড়াবাড়ি করে ফেলছেন। কিন্তু সকলেই এই কথাও ভাবছেন, আর তো মাত্র কয়েকটি মাস। পরীক্ষা হয়ে গেলে তো অঙ্কের মাস্টারের সঙ্গে তাঁর ছাত্রীর আর বিশেষ কোনও সম্পর্ক থাকার কথা নয়। এই কয়েকটা মাস তাঁর বাতিকগুলো মেনে নিতেই হবে।

রাত ন'টার পর ফড়েপুকুরের মোড়ে আমি মাঝে-মাঝেই তাপস হালদারের মুখোমুখি এসে ওঁকে চমকে দিই!

আমার অফিস পার্ক স্ট্রিটে। নিউ আলিপুরের টিউশনিটা এখনও ছাড়িনি। বছরের মাঝখানে ছাড়া যায় না। সেখানে থাকতে হয় সাড়ে ছ'টা থেকে আটটা পর্যন্ত। অফিস ছুটির পর আমি আর বাড়ি ফিরি না, মাঝখানের সময়টা ওই অঞ্চলেই ঘোরাঘুরি করে কাটিয়ে দিই। বন্যা মাঝে-মাঝে চলে আসে। দাঁড়িয়ে থাকে পার্কের কোণে। এ-পাড়ার কোনও রেস্তোরাঁয় ঢোকার সাধ্য আমার নেই। প্রথম মাসের মাইনে পেলে একবার বন্যাকে খুব বড় কোনও জায়গায় খাওয়াব ঠিক করে রেখেছি। তা ছাড়া, ঘাটশিলায় যাওয়ার জন্য পয়সা জমাতে হবে।

আমরা দুজনে চিনেবাদাম খেতে-খেতে হাঁটি। কখনও চলে যাই পুরোনো কবরখানায়। কখনও ময়দানে। ঘোর বর্ষা এসে গেছে। বন্যার প্রিয় ঋতু। বৃষ্টির মধ্যে বন্যা ইচ্ছে করে ভেজে।

পুরোপুরি ভিজলেও আমাদের অসুখ করে না। কয়েকবার হাঁচি হয়। হয়তো জ্বর হয়। কিন্তু এগুলোকে মোটেই অসুখ বলা যায় না।

পার্ক স্ট্রিট থেকে বেরিয়ে, চৌরঙ্গি পার হয়ে আমরা সবে ময়দানের দিকে যাচ্ছি, এমনসময় ঘ্যাঁচ করে একটা ট্যাক্সি আমাদের থেকে একটু দূরে থামল। তারপর পিছিয়ে এল।

সেই ট্যাক্সি থেকে নেমে এলেন তাপস হালদার। রাগে তাঁর মুখখানা গনগন করছে। এই প্রথম বন্যার বদলে তিনি সরাসরি আমার দিকে তাকালেন।

ধমকের সুরে বললেন, এসব কী হচ্ছে? তুমি মেয়েটাকে বৃষ্টিতে ভেজাচ্ছ? আর দু-মাস বাদে ওর পরীক্ষা!

আজ বৃষ্টি পড়ছে টিপিটিপি। একে ঠিক বৃষ্টি ভেজা বলে না। মাথাও ভেজেনি। আমাদের কারুর কাছেই অবশ্য ছাতা নেই।

আমি বললাম, দু-মাস তো অনেক দেরি!

তাপস হালদার রীতিমতন চেঁচিয়ে বললেন, অনেক দেরি মানে?

একটা দিন নষ্ট হওয়া মানেই অনেক ক্ষতি। যদি শক্ত কোনও অসুখ হয় পরীক্ষা দিতেই পারবে না!

বন্যা বলল, না, স্যার, আমার সহজে অসুখ হয় না।

বন্যার কথা গ্রাহ্য না করে তিনি আমাকে আবার বললেন, একটা ব্রিলিয়ান্ট মেয়ের কেরিয়ার তুমি নষ্ট করে দিতে চাইছ? এটা আমি কিছুতেই টলারেট করব না। আমি একটা চ্যালেঞ্জ নিয়েছি। ওকে এখন খুব সাবধানে থাকতে হবে।

বন্যা বলল, আমি একটু বাদেই বাড়ি ফিরে যেতাম, স্যার।

তাপস হালদার বললেন, এক্ষুনি চলো। এই ট্যাক্সিতে। আমি তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছি।

আমি বাসেই চলে যাব স্যার। আপনি কেন...

কোনও কথা শুনতে চাই না। তুমি চলো আমার সঙ্গে।

বন্যা আমার দিকে তাকিয়ে ভুরুর সামান্য ইঙ্গিত করল। এটা আমাদের একটা নিজস্ব কোড। এখন আপত্তি করা চলবে না। আমিও একটু ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি জানালাম।

তাপস হালদার বন্যার হাত ধরতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই বন্যা এগিয়ে গেল ট্যাক্সিটার দিকে। ভেতরে গিয়ে বসল।

তাপস হালদার আমার দিকে পেছন ফিরে দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, রাস্কেল!

তাপস হালদার, সুপুরুষ, সুপ্রতিষ্ঠিত। বন্যাকে তিনি নিজের মতো গড়তে চাইছেন। মাঝখান থেকে আমার মতন একটা চ্যাংড়া ছেলে বন্যার অনেকটা সময় হরণ করে নিচ্ছে, এটা তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারবেন না। তিনি সর্বক্ষণ বন্যাকে চান।

তাপস হালদার বিবাহিত, দুটি ছেলেমেয়ে আছে, সেসব কথা তিনি গোপন করেননি। কিন্তু তাতে কি হয়েছে! বউ থাকে বাড়িতে, সংসার সামলায়। বউয়ের কথা মনে রাখবার তো দরকার নেই। তিনি বন্যাকে চান, এটাই বড় কথা।

বন্যা এক কথায় তাঁর সঙ্গে ট্যাক্সিতে যেতে রাজি হওয়ায় তাঁর আহত অহংকারে খানিকটা প্রলেপ পড়ল। আমাকে তিনি একটা গালাগালিও দিয়ে ফেললেন। ওঁর ধারণা, ওঁর বিরুদ্ধে আমার কিছুই করার ক্ষমতা নেই।

কিন্তু তাপস হালদারকে আমি এতটা সন্তুষ্ট হতে দেব কেন? বন্যাকে আমি কথা দিয়েছি, এই ক'মাসের মধ্যে কোনওক্রমেই আমি ওঁর সঙ্গে ঝগড়া করব না। তবে, বন্যার গায়ে উনি হাত ছোঁয়াতে পারবেন না। যদি কখনও বন্যাকে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করেন, তাহলে আমি তুলকালাম কাণ্ড বাধাব।

উনি বন্যার গায়ে হাত দেননি, আমাকে একটা গালাগাল দিয়েছেন। সামান্য একটু শোধ নিতেই হবে।

ট্যাক্সিটা ছাড়বার আগে আমি দৌড়ে উলটোদিকের জানলার কাছে গিয়ে বন্যাকে বললাম, কাল আবার এসো! ঠিক সোওয়া পাঁচটায়।

তাপস হালদার ক্রুদ্ধ কণ্ঠে ড্রাইভারকে বললেন, চলো, চলো, জলদি!

কলকাতার নানা মহলে রটতে শুরু করেছে যে তাপস হালদার বন্যা নামে একটি মেয়ের প্রেমে পড়েছেন, প্রায় সর্বক্ষণ তার সঙ্গে থাকেন।

কফি হাউসে প্রায়ই কেউ-কেউ আমার সামনে এই ইঙ্গিত করে।

কেউ স্পষ্ট বলে ফেলে। আমি গায় মাখি না। বন্যার সঙ্গে আমার গোপন বোঝাপড়ার কথা তো জানে না এরা কেউ!

কেউ-কেউ নানান রসসিক্ত কাহিনি বানায়। জানি, সেসব মিথ্যে। বন্যা কখনও আমার কাছে মিথ্যে কথা বলবে না। প্রেম শব্দটা শুনলেই অধিকাংশ মানুষের মনে আদিরস উথলে ওঠে।

তাপস হালদার আমার নামে নালিশ জানালেন বন্যার কাকার কাছে।

তাতে কোনও ক্ষতি হল না। নরেকশকাকা একদিন ডেকে পাঠালেন আমাকে। খুব ভালো

ব্যবহার করলেন।

তারপর বললেন, জানো, সুনীল, তোমাদের বয়েসি ছেলেমেয়েদের বন্ধুত্বটা এখনও অনেকে মেনে নিতে পারে না। কিন্তু আমি মনে করি, এটা স্বাস্থ্যকর ব্যাপার। মিশবে না কেন, নিশ্চয়ই মিশবে। ছেলেরা মেয়েরা দূরে থাকলেই বরং তাদের মনে নানারকম খারাপ চিন্তা জাগে। বন্যাকে তুমি এতদিন ধরে চেনো, হঠাৎ মেলামেশা বন্ধ করবে কেন? না, না, আমি এসব সাপোর্ট করি না। তবে, পরীক্ষার আগে পর্যন্ত কয়েকটা মাস একটু আড়ালে থেকো। তাপস বন্যাকে ফার্স্ট করাবার জন্য একেবারে খেপে গেছে। একটুও সময় নষ্ট করতে দিতে চায় না। দেখা যাক না, ও কতটা করতে পারে। বন্যা ফার্স্ট হলে তো তুমিও খুশি হবে। তাই না?

আমি জিগ্যেস করলাম, নরেশকাকা, আমি রাত ন'টার পর এসে একবার বন্যার সঙ্গে একটু গল্প করে যেতে পারি? সারাক্ষণ পড়াশুনো করা কি ভালো?

নরেশকাকা বললেন, মোটেই ভালো নয়। হ্যাঁ, এসো, তুমি একবার এসে আধ ঘণ্টা, পঁয়তাল্লিশ মিনিট গল্প করে যেও। তাতে বন্যার ভালোই হবে। হ্যাঁ, এসো, নিশ্চয়ই এসো! তারপর নতুন কী কবিতা লিখলে বলো!

পরীক্ষার দেড় মাস আগে তাপস হালদার একটু অদ্ভুত কাণ্ড করলেন। ভদ্দরলোক আর মাথার ঠিক রাখতে পারছেন না।

সেদিন ইউনিক টিউটোরিয়াল হোমের প্রতিষ্ঠা দিবস। ওই দিনটায় ওখানে খাওয়া দাওয়া হয়। বন্যা এখন সেখানে পড়তে যায় না অবশ্য, তবু তারও নেমন্তন্ন।

সেখানেই প্রথম তাপস হালদারের স্ত্রীর সঙ্গে বন্যার আলাপ হল। তিনিও লেখাপড়া জানা মহিলা। এম.এ. পড়ার সময় তাপস হালদারের সঙ্গে প্রেম, প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে বিয়ে। দুটি ছেলেমেয়েকে মানুষ করবার জন্য তাঁকে বাড়িতেই থাকতে হয়। ইউনিক টিউটোরিয়ালের খাওয়াদাওয়ার দিনে তাঁকে তো আসতেই হবে।

একটা খালি ঘরে বন্যাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে তিনি বললেন, ও, তুমিই তাহলে সেই বন্যা? তোমার নাম আমার ছেলেমেয়েরাও এখন জানে। যেখানে থাকি, সেই পাড়ার লোকেরা ডেকে-ডেকে আমাকে বলে যায়, বন্যা নামে একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে আমার স্বামীকে কাল গঙ্গার ধারে, আজ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে দেখা গেছে। বন্যা বিবর্ণ মুখে বলল, না, না, এসব মিথ্যে কথা!

সেই মহিলা বললেন, কিছুটা তো মিথ্যে হবেই, তা কি আমি বুঝি না? তোমাকে উনি বাড়িতে গিয়ে পড়ান?

বন্যা মাথা হেলিয়ে বলল, হ্যাঁ, উনি আমাকে...

এই সময় তাপস হালদার সেই ঘরে ঢুকে পড়লেন।

তাঁর স্ত্রী তীক্ষ্ণভাবে হেসে বললেন, উনি শুধু মেয়েদের মধ্যেই প্রতিভার সন্ধান পান। কোনও ছেলেকে আজ অবধি আলাদা পড়াননি।

তোমাকে নিয়ে এই তৃতীয়। তোমাকে আমি কিন্তু সাবধান করে দিচ্ছি ভাই, এর আগে একটি মেয়ে...

তাপস হালদার হুঙ্কার দিয়ে বললেন, চুপ!

ভদ্রমহিলা বললেন, কেন চুপ করব! এ একটা সরল, ভালো মেয়ে, তাকে আমি সাহায্য করব না?

তাপস হালদার ছুটে এসে স্ত্রীকে সজোরে এক থাপ্পড় কষালেন!

বন্যার মুখে এই ঘটনা শোনার পর আমি জিগ্যেস করলাম, এর পরেও তুমি ওঁর কাছে পড়তে চাও?

বন্যার মুখখানা ম্লান। সে এক গভীর সঙ্কটে পড়েছে।

সে বলল, আমার এত খারাপ লেগেছিল, কান্না পেয়ে গেল, আমি ছুটে সেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। স্যারের এরকম চেহারা আমি কখনও আগে দেখিনি!

এত রাগ যে বউকে ধরে মারবে? ওর বউ কোনও গোপন কথা ফাঁস করে দিচ্ছিল!

উনি এরপর আমার কাকাকে এসে কী বলেছেন জানো? ওঁর বউয়ের পাগলামির অসুখ আছে। ভদ্রমহিলা বানিয়ে বানিয়ে উদ্ভট কথা বলেন।

বউ পাগল, না স্বামীটাই পাগল হয়ে গেছে?

কাকাকে উনি কাগজপত্র দেখিয়েছেন, ওঁর স্ত্রীর পাগলামির চিকিৎসা হয়েছে। সত্যিই। আর উনি নাকি আগে কখনও কোনও মেয়েকে আলাদা করে পড়াননি।

সেটা খোঁজ নিয়ে দেখা যেতে পারে।

কাকা খোঁজ নেবেন বলেছেন। তার আগে, কাকা বলছেন, এই স্টেজে আমার অঙ্কের পড়া বাদ দেওয়া ঠিক হবে না। তাতে আমার খুব ক্ষতি হবে। সব গুলিয়ে যাবে।

কাকা ওঁর কাছেই পড়তে বলছেন?

হ্যাঁ, মাত্র তো দেড় মাস। আমিও ভয় পাচ্ছি।

তোমাকে কি অঙ্কে ফার্স্ট হতেই হবে, বন্যা? না হলে কী হয়?

আমিও যেন চ্যালেঞ্জটা বিশ্বাস করে ফেলেছি। ফার্স্ট হতে কেমন লাগে, সেটা একবার দেখতে ইচ্ছে করছে।

এর দু'দিন বাদেই জানা গেল যে তাপস হালদার তাঁর স্ত্রীকে ডিভোর্সের নোটিশ দিয়েছেন। বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছেন তিনি। টিউটোরিয়ালের তিনতলার ঘরে একা থাকবেন।

অর্থাৎ তাঁর আর পিছুটান রইল না। বিবাহিত মাস্টার ছাত্রীর সঙ্গে প্রেম করলে লোকে তাকে অপবাদ দেয়। কিন্তু অচিরেই তিনি মুক্ত হচ্ছেন সম্পূর্ণভাবে। আর বাধা থাকবে না।

যে-কোনও উপায়ে তিনি বন্যাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে চান।

এরপর কেটে গেছে উনিশ বছর।

তাপস হালদার এখনও আমার ওপর রাগ আর ঘৃণা পুষে রেখেছেন? অথচ ওর কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।

এতগুলো বছরের মধ্যে কয়েকবার ওঁর কথা শুনেছি অবশ্য।

একসময় প্রবন্ধ লিখতেন, পরে নাটক লিখতে শুরু করেন। খুব একটা উচ্চাঙ্গের কিছু লেখেননি অবশ্য। কয়েকটি নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে, তার থেকে দুটো সিনেমাতেও জনপ্রিয় হয়েছিল। কিন্তু সাহিত্যের মূল স্রোতে তিনি স্থান পাননি। এখন যাত্রার জন্য লিখছেন।

অর্থাৎ টাকা বানানোর নেশাটা তাঁর আজও রয়েছে। টিউটোরিয়ালটা একেবারে উঠে যায়নি, টিমটিম করে চলে। টিউটোরিয়ালের ব্যাবসা এমনিতেই এখন মন্দা। উনি বিয়ে করেছেন আবার।

এই দীর্ঘ সময় আমাদের দুজনকেই সম্পূর্ণ দুদিকে সরিয়ে নিয়ে গেছে। এর মধ্যে ওঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি কখনও।

বিয়ে বাড়িতে সেদিন যোগাযোগটা সত্যি অদ্ভুত। শ্রেয়া দাশগুপ্ত নামে যে মহিলাটিকে দেখেছিলাম, তিনিই তাপস হালদারের প্রথম স্ত্রী। আমি আগে ওঁকে কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। অথচ উনি আমার বিষয়ে অনেক খবর রাখেন। ওঁর চেহারা সম্পর্কে আমার অন্যরকম ধারণা ছিল, কিন্তু এখন চুল-ছাঁটা, ভুরু কামানো এক অতি আধুনিক মহিলা তিনি। আর বিয়ে করেননি, বিয়ের আগের পদবিটা ব্যবহার করেন।

তাপস হালদারের অমন মেজাজ খারাপ, গোমড়া মুখো অবস্থাটার কারণ বোঝা যায়। একই

জায়গায় তিনি শ্রেয়াকে আর আমাকে দেখেছেন। শ্রেয়া তাঁর স্ত্রী ছিলেন, এখন স্ত্রী নন। আর আমি তাঁর প্রেমের প্রতিপক্ষ, তাঁর এককালের প্রেমিকার বন্ধু, কিন্তু আমিও তো আসলে তা নই!

তাপস হালদারের সঙ্গে একবার দেখা করা খুবই দরকার।

ভেবেছিলাম রবির কাছ থেকে ঠিকানা জেনে নেব, তারপর মনে হল টেলিফোন গাইডেই নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। অন্য কারুকে জানাবার দরকার নেই।

সকাল আটটার সময় হাজির হলাম তাপস হালদারের বাড়ির সামনে। এই বয়েসেও আমার বুকটা একটা দুরু-দুরু করছে। উনি কি প্রথমেই আমাকে অপমান করে তাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন। একটা কিছু কাজের ছুতো দেখাতে হবে।

দরজা খুলে দিল একজন কাজের লোক। ভেতরে নিয়ে বসাল।

একতলার বসবার ঘরটা বেশ পরিচ্ছন্ন। সচ্ছলতার চিহ্নও বেশ স্পষ্ট।

পাজামা ও পাঞ্জাবি পরে, চটি ফটফটিয়ে তাপস হালদার ঘরে ঢুকেই আমাকে দেখে থমকে গেলেন। মুখখানা আড়ষ্ট হয়ে গেল।

আগে তাঁর মুখে ফ্রেঞ্চ কাট দাড়ি ছিল না, এত মোটা ফ্রেমের চশমা পরতেন না। মাথার চুলও খুব পাতলা হয়ে গেছে, তাই ওঁকে দেখে আমি চিনতে পারিনি। কিন্তু আমার চেহারারও অনেক বদল হয়েছে, তবু উনি আমাকে চিনতে ভুল করেননি।

এক সময়ে উনি আমার চেয়ে বয়েসে বেশ বড় ছিলেন। অনায়াসে তুমি বলতেন। কিন্তু এখন আমরা যে বয়েসে পৌঁছেছি, তাতে দশ-বারো বছরের তফাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না।

আমি নিজের নাম জানিয়ে বললাম, নমস্কার। আপনার কাছে একটা বিশেষ প্রয়োজনে এসেছি।

তাপস হালদার দাঁড়িয়ে থেকেই ভুঁরু কুঁচকে বললেন, বলুন!

আমি বললাম, আমার এক বন্ধু ফিলম্ পরিচালক। সে আপনার একটা নাটক নিয়ে ছবি করতে চায়। তাই একটা খবর নিতে এসেছি।

একথা শুনে নরম হয় না, এরকম লেখক বিরল।

আমার কথাটা একেবারে মিথ্যেও নয়। সত্যিই আমার এক বন্ধু একজন মোটামুটি পরিচিত চলচ্চিত্র পরিচালক। কমার্শিয়াল ছবি তোলে। সে একটা নতুন কাহিনির খোঁজ করছিল। তাপস হালদারের কাহিনি আমার পরামর্শ শুনে সে অনায়াসে নিতে পারে। ভালোই চলতে পারে।

আমি বললাম, আমি শুধু জানতে এসেছি, আপনার ওই কাহিনিটা এখনও ফ্রি আছে কি না। কারুকে কি দিয়ে দিয়েছেন?

তাপস হালদার বললেন, না। এখনও ফ্রি আছে।

আমি বললাম, ঠিক আছে। তাহলে বাকি কথাবার্তা সেই-ই বলবে। কবে তাকে আসতে বলব বলুন তো?

রবিবার সকালে। এগারোটার মধ্যে।

এবার আমার ওঠা উচিত। আমার আর কোনও ভূমিকা থাকার কথা নয়। তবু আমি উসখুস করতে লাগলাম কয়েক মুহূর্ত।

তারপর হঠাৎ জিগ্যেস করলাম, আপনি আমাকে চিনতে পারছেন?

উনি শুকনোভাবে বললেন, হ্যাঁ।

আমি আপনাকে আর একটা কথাও জানাতে এসেছিলাম। বন্যা আমাকে শেষ যে চিঠি লিখেছিল, তাতে আপনার কথা ছিল।

বন্যা?

তাপস হালদার তীব্র চোখে আমার দিকে চেয়ে রইলেন বেশ কিছুক্ষণ। তাঁর মুখের রেখা বদলে যাচ্ছে। তীব্রতা কমে যাচ্ছে দৃষ্টির।

খানিকটা অভিমানী কণ্ঠে তিনি জিগ্যেস করলেন, বন্যা? সে আমার কথা লিখেছিল?

আমি বললাম, হ্যাঁ। চিঠিটা আমি নিয়ে এসেছি।

হঠাৎ উঠে গিয়ে ভেতরের দরজার কাছে গিয়ে একবার উঁকি মারলেন। তারপর আবার ফিরে এসে বললেন, সকালবেলা আমার কাছে অনেক লোক আসে। এক্ষুনি সব আসতে শুরু করবে। তিনতলায় আমার একটা ঘর আছে, সেখানে চলুন!

ভেতরের সিঁড়ির কাছে একগাদা ময়লা জামাকাপড় পড়ে আছে। ধোপা বাড়ি যাবে মনে হয়। একটি মেয়ে গলা সাধছে হারমোনিয়ামে।

একজন মহিলা নেমে এলেন ওপর থেকে, খুব সম্ভবত তাপস হালদারের দ্বিতীয় স্ত্রী। তিনি আমার দিকে কিছুটা কৌতূহলের চোখে তাকালেও তাপস হালদার তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলেন না।

তিনতলার ঘরটি খুবই সুন্দর। আমি আগেও লক্ষ্য করেছি, যারা সঠিক অর্থে লেখক নয়, তাদের অনেকেরই ঘর ঠিক লেখকের ঘরের মতন সাজানো থাকে। তিন দিকের র‍্যাক ভরতি বই। একটা জানলার ধারে টেবিল। পাশে একটা দারুণ টেবিল ল্যাম্প।

অনেকগুলি দামি-দামি কলম। সুদৃশ্য আশট্রে, পাশে চার-পাঁচ প্যাকেট সিগারেট।

একটা গদিওয়ালা চেয়ার দেখিয়ে তিনি বললেন, বসুন, আমার সকালের চা খাওয়া হয়নি। চা নিয়ে আসছি।

দরজাটা ভেজিয়ে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

বন্যার চিঠির কথা বললে একটা কিছু প্রতিক্রিয়া হবে আমি আশা করেছিলাম, কিন্তু এতটা হবে আমি বুঝিনি।

চা বোধহয় তৈরিই হচ্ছিল, তাপস হালদার একটু বাদেই ফিরে এলেন। নিজে একটা ট্রে নিয়ে এসেছেন, তাতে এক পট চা ও দুটো কাপ। কিছু বিস্কুট।

কাপে চা ঢালতে-ঢালতে তিনি বললেন, আপনাকে দেখে অনেকদিন পর বন্যার কথা মনে পড়ল। তারপর আপনি নিজেই বন্যার কথা বললেন। সত্যি সে চিঠিতে আমার কথা লিখেছিল?

আমি বুক পকেট থেকে চিঠিটা বার করলাম। সাড়ে সতেরো বছর আগেকার। মলিন হয়ে গেছে কাগজ। এমনভাবে চার ভাঁজ পড়েছে যে সেখানকার কথাগুলো পড়া যায় না।

আমি চিঠিটা উলটে শুধু তলার দিকটা দেখালাম। আঙুল দিয়ে নির্দেশ করে দিলাম জায়গাটা।

"অঙ্কের মাস্টারমশাইয়ের কথা আমার প্রায়ই মনে পড়ে। উনি আমার দারুণ উপকার করেছেন। দেশে ফিরলে ওঁর সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা করব।"

তিনটি মাত্র বাক্য। তাপস হালদার তাই-ই যেন পড়লেন বেশ কয়েকবার। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আমি ওর উপকার করিনি তো! আসলে ওর ক্ষতি করেছি!

আমি চুপ করে রইলাম।

উনি আবার বললেন, আমি অত জেদ ধরে বন্যাকে না পড়ালে ও অঙ্কে অত ভালো রেজাল্ট করতে পারত না। তাহলে কি বিদেশে পড়াশুনো করতে যেতে পারত? বরং এদেশে থাকলে...

বন্যার কাকা আগে থেকেই সব ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। পরীক্ষা শেষ হওয়া মাত্র বন্যাকে তিনি পাঠিয়ে দিলেন লন্ডনে। সেখানে ওঁর শালা বিরাট চাকরি করেন। তিনি বন্যাকে স্পনশর করেছিলেন।

বিলেত যাওয়ার প্রস্তাবটা তখন এমনই লোভনীয় ছিল যে প্রত্যাখ্যান করা যায় না। বন্যা তবু আমাকে জিগ্যেস করেছিল, আমি কী করব বলো তো? যাব? আমার যেতে ইচ্ছে করছে না।

আমি কী করে বলব যে, না, যেও না!

আমি নিজে এরকম একটা সুযোগ পেলে লাফিয়ে উঠতাম না।

প্রস্তাবটা এমনই আকস্মিক যে বেশি বিবেচনারও সময় পেলাম না। আমি ঘাটশিলায় যাওয়ার পরিকল্পনা সব করে ফেলেছিলাম। বন্যা যাবে তার মাকে নিয়ে। আমি তখন সুবর্ণরেখায় বন্যাকে সাঁতার শেখাবার কল্পনায় মশগুল।

কিন্তু লন্ডন যেতে হবে না, সুবর্ণরেখার তীরে চলো, একথা কোনও বাঙালির ছেলেই বোধহয় বলতে পারে না। আমি বললাম, কেন যাবে না, নিশ্চয়ই যাবে। এরকম সুযোগ কেউ ছাড়ে।

তাপস হালদার এই খবর শুনে খেপে উঠেছিলেন। তিনি প্রতিবাদ জানালেন বন্যার কাছে। তিনি বলেছিলেন, বন্যা, খুব ভালো রেজাল্ট করবেই। এখানেই এম এস সি পড়া উচিত তার। তারপর সে বিলেতে পি এইচ ডি করতে যদি যেতে চায় তো যাবে, এখনই যাওয়ার কী দরকার!

শেষপর্যন্ত মরিয়া হয়ে তিনি বন্যাকে বিয়ের প্রস্তাব জানালেন। বন্যার কাকা এটা আগেই অনুমান করেছিলেন, তিনি পাত্তা দিলেন না। বন্যা লন্ডনে উড়ে চলে গেল।

প্রথম-প্রথম সপ্তাহে দু-খানা করে চিঠি লিখতাম আমরা। ডাকটিকিটের জন্য যাতে আমি কার্পণ্য না করি, সেইজন্য বন্যা মাঝে-মাঝে খামের মধ্যে পাঁচ পাউন্ড, দশ পাউন্ডের নোট ভরে পাঠিয়ে দিত।

তাপস হালদারকে সে কোনও চিঠি লেখেনি বোধহয় একটাও। তাপস হালদার আহত বাঘের মতন গজরাতে লাগলেন। রেজাল্ট বেরুবার পর দেখা গেল, বন্যা সত্যিই অঙ্কে ফার্স্ট হয়েছে, রেকর্ড নম্বর পেয়ে। তবু তাপস হালদার কোনও কৃতিত্ব পেলেন না। বন্যাকে বিয়ে করতে চেয়ে নিজেকে যেন অনেকটা ছোট করে ফেললেন। তাপস হালদারের নাম কেউ উল্লেখও করল না।

তাপস হালদার একদিন বন্যার কাকার বাড়িতে গিয়ে ঝগড়া করে এলেন চেঁচিয়ে-মেচিয়ে। অনেকের ধারণা হল, সত্যি লোকটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

আবার শোনা গেল, তাপস হালদার নিজেই ইংল্যান্ডে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। পাসপোর্ট অফিসেও হইচই করে এলেন একদিন। তারপর তিনি নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন, মৃদু ধরনের সেরিব্রাল অ্যাটাক।

সুস্থ হয়ে উঠলেন মাসচারেক পরে। তারপর থেকে তিনি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত মানুষ। একেবারে শান্ত। আর বন্যা সম্পর্কে কোনও আগ্রহ প্রকাশ করেননি কখনও।

চিঠিটা আমাকে ফেরত দেওয়ার পর তাপস হালদার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ওর কী হয়েছিল ঠিক করে বলুন তো? আপনি নিশ্চয়ই জানেন। কী হয়েছিল? আত্মহত্যা?

আমি বললাম, না। একটা অত্যন্ত সাধারণ দুর্ঘটনা।

জলে ডুবে গিয়েছিল, এটা সত্যি?

হ্যাঁ। একটা সুইমিং পুলে সাঁতার শিখতে গিয়েছিল।

এই কথাটা উচ্চারণ করতে গেলেই একতাল পরেও আমার গলার কাছে বাষ্প আটকে যায়। সুবর্ণরেখা নদীতে বন্যাকে সাঁতার শেখাবার কথা ছিল আমার। সত্যি যদি সাঁতারটা শিখিয়ে দিতাম, তাহলে এমন অকারণে ওর প্রাণ যেত না। জল এত ভালোবাসত বন্যা, সেইজন্যই ওকে টেনে নিল!

তাপস হালদার চাপা গলায় বললেন, আমি কি ওর মৃত্যুর জন্য দায়ী? আমি ওকে অনেক বিরক্ত করেছি, আমি লন্ডনে গিয়েও ওকে জ্বালাতন করব ঠিক করেছিলাম।

আমি বললাম, না, না, নিশ্চয়ই তা নয়। ও শেষ চিঠিতে আপনার কথা লিখেছে, খুব শ্রদ্ধার সঙ্গেই তো লিখেছে।

চিঠিটা আবার পড়লেন তাপস হালদার। বড় শ্বাস ফেলে বললেন, তা ঠিক। ও কখনও আমাকে চিঠি লেখেনি। আপনার চিঠিতে আমার সম্বন্ধে লিখেছে। আচ্ছা, আপনি এতদিন পর আমাকে এই চিঠিটা দেখাতে এলেন কেন?

আমি কোনও উত্তর দিলাম না। মুখে বলা যায় না। সেদিন বিয়ে বাড়িতে আমার প্রতি ওঁর তীব্র রাগের ভাব দেখেই আমার মনে হয়েছিল, বন্যার প্রতি ওঁর এখনও দারুণ ভালোবাসা রয়ে গেছে। সেই ভালোবাসার মূল্য আর কারুর কাছে না থাকুক, আমার কাছে থাকবেই।

এতগুলো বছর কেটে গেছে, কে আর মনে রেখেছে বন্যাকে? এখন আর কেউ তার কথা বলে না। তাপস হালদারের রাগ, ক্ষোভ, অভিমানের মধ্যে বন্যা এখনও বেঁচে আছে। তাপস হালদারকে এখন আমার খুব আপনজন মনে হচ্ছে।

তাপস হালদার আমার দু-হাত জড়িয়ে ধরে চুপ করে বসে রইলেন অনেকক্ষণ।

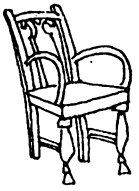

চেয়ার

আগাগোড়া শ্বেতপাথরে বাঁধানো বিশাল চওড়া সিঁড়ি। দুধের মতন সাদা, কোথাও এক ছিটে ধুলো নেই। এক পাশের রেলিংটা মনে হয় যেন সোনা দিতে তৈরি। এককালে যেসব ছিল রাজা-রানিদের বাড়ি, এখন সেগুলিই মিউজিয়াম!

সিঁড়ির মুখে এসে অমিত জিগ্যেস করল, মা, তুমি এতখানি সিঁড়ি উঠতে পারবে?

হৈমন্তী মাথা নেড়ে বললেন, হ্যাঁ, পারব।

অমিত আবার বলল, তোমার পায়ে ব্যথা।

হৈমন্তী বললেন, না, না, ব্যথা নেই, আজ ব্যথা নেই!

রাজা-রানিদের নিশ্চয়ই শরীরে বেশ জোর থাকত। রোজ এতটা সিঁড়ি ভেঙে ওঠা-নামা, তারপর বারান্দাগুলো কী দারুণ লম্বা, কত যে ঘর তার ইয়ত্তা নেই। রাজা-রানিরা এত হাঁটতে পারতেন? বাড়ির মধ্যে তো আর পালকি চড়া যায় না!

অমিত বলল, মা, আস্তে-আস্তে ওঠো!

হাঁটুতে জোর কমে গেছে, ইদানীং সিঁড়ি ভাঙতে হৈমন্তীর বেশ কষ্ট হয়। সিঁড়ি ভাঙার অভ্যেসটাও চলে গেছে। এদেশে তাঁর ছেলের বাড়িটা দোতলা। হৈমন্তী একতলার একটি ঘরে থাকেন। রেল স্টেশানে কিংবা বিমানবন্দরে এমনকি বড়-বড় দোকানেও এসকেলেটর থাকে, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয় না।

দু-হাঁটুই বেশ টনটন করছে, তিনতলা পর্যন্ত উঠতে বুকে চাপ লাগছে, তবু হৈমন্তী মুখে কিছুই স্বীকার করবেন না। ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে রেখেছেন। কষ্ট হচ্ছে বলে কি এত সব ভালো-ভালো জিনিস দেখবেন না? দিনের পর দিন তো বাড়িতেই বসে থাকতে হয়। এসব দেশে এই এক জ্বালা! নিজে-নিজে বাড়ি থেকে বেরুনো যায় না। কলকাতায় থাকতে হৈমন্তী একা-একা ট্রামে-বাসে চলাফেরা করতেন। এখানে কেউ সঙ্গে নিয়ে না গেলে কোথাও যাওয়ার উপায় নেই। সব কিছুই দূর-দূর। গাড়ি ছাড়া যাওয়া যায় না। হৈমন্তী ফরাসি ভাষাও জানেন না। একা চলাফেরা করতে ভয় হয়। ছেলে আর ছেলের বউ দুজনেই চাকরি করে, সারা সপ্তাহ খুব ব্যস্ত, আর ছুটির দিনে ক্লান্ত হয়ে থাকে।

সবাই জানে, হৈমন্তী এখন ফরাসি দেশে আছেন ছেলের বাড়িতে। কিন্তু আসলে তো থাকেন প্রায় বন্দি অবস্থায় একটা বাড়ির মধ্যে, সে বাড়িও শহর থেকে বেশ দূরে। এইভাবেই

কেটে যায় মাসের-পর-মাস।

ভাগ্যিস অমিতের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু এসেছে কলকাতা থেকে। তাই অমিত তাকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে। অন্য সময় অমিত যখন বন্ধুদের বাড়িতে পার্টিতে যায়, তখন হৈমন্তীকে দু-একবার অনুরোধ করলেও তিনি সঙ্গে যেতে চাননি। অল্পবয়েসি ছেলেমেয়েদের মধ্যে তিনি কী করবেন? ওদেরই অস্বস্তি হবে।

আজ হৈমন্তী নিজেই ছেলেকে বলেছেন, তোরা মিউজিয়াম দেখতে যাচ্ছিস, আমাকে সঙ্গে নিবি?

অমিতের বন্ধু সত্যেশ ছবি ভালোবাসে, ইতিহাস ভালোবাসে। একতলা, দোতলা ঘুরে-ঘুরে সবাই চলে গেল তিনতলায়। কতরকম ছবি আর ভাস্কর্য। দোতলাটায় শুধু ইজিপশিয়ান শিল্প। হৈমন্তীর সবই দেখতে ভালো লাগছে। শুধু বাড়িতে বসে থাকার চেয়ে এইসব মূল্যবান সব শিল্প দেখার আনন্দ কত বেশি। শরীরের কষ্ট হচ্ছে হোক। হৈমন্তীর পুত্রবধূ ফরাসি মেয়ে, সে অবশ্য আজ আসতে পারেনি, তার অফিস আছে। এলেন মেয়েটি খুবই ভালো, হৈমন্তীর যত্ন করে প্রাণ দিয়ে।

তিনতলায় সব আধুনিক কালের ছবি। এসব ছবি হৈমন্তী ঠিক বুঝতে পারেন না, তবু অমিত আর সত্যেশ কতরকম আলোচনা করছে, তিনি শুনছেন।

একসময় ওরা দুজন খানিকটা দূরে সরে গেল। বোধহয় সিগারেট খাবে। ছেলেকে হৈমন্তী বলেই দিয়েছেন তাঁর সামনে সিগারেট খেতে, কিন্তু সত্যেশ লজ্জা পায়।

ওরা দুজন আড়ালে যেতেই হৈমন্তীর শরীরটা একটু বিশ্রাম নেওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল। শুধু দুই হাঁটু নয়, কোমরের নীচের সব অংশটা যেন অবশ হয়ে আসছে। একবার একটু না বসলেই নয়।

কিন্তু বসবেন কোথায়? একটার পর একটা ঘরে দেওয়াল ভরতি ছবি। কোনও কোনও ঘরে পুরোনো আমলের সোনা-রুপোর জিনিসপত্র। অনেক জিনিসে যাতে হাত না দেওয়া হয়, সেইজন্য দড়ি দিয়ে ঘেরা।

ঘুরতে-ঘুরতে হৈমন্তী হঠাৎ দেখতে পেলেন, এক জায়গায় একটা চেয়ার। ভেলভেট দিয়ে মোড়া চেয়ারটার হাতল দুটো সোনালি রঙের। অনেকটা যাত্রা দলের রাজা-রানিদের চেয়ারের মতন। এসব জায়গায় প্রত্যেক ঘরে একজন করে গার্ড থাকে। হৈমন্তী ভাবলেন, এটা কোনও গার্ডের চেয়ার। সে কোথাও উঠে গেছে। এখানে একবার বসা যায় না?

শরীর আর বইছে না। পা দুটো বিদ্রোহ করছে। একটু বসলে ক্ষতি কী?

হৈমন্তী আর দ্বিধা না করে বসে পড়লেন। চওড়া কালো পাড়ের শাড়ি পরা, সাদা ব্লাউজ, মাথার সিঁথি সাদা, চোখে নস্যি রঙের চশমা, হৈমন্তী সেই চেয়ারে বসে একটা আরামের নিশ্বাস ফেললেন।

পা দুটি শান্তি পেয়েছে। হৈমন্তী হাত দুটি চেয়ারের হাতলের ওপর রাখতেই একটা হাতল টুপ করে খসে পড়ে গেল।

এইসব দেশে কেউ জোরে কথা বলে না। মিউজিয়ামে ফিসফিস করে কথা বলাই নিয়ম। ঘরের মধ্যে অন্য অনেক লোক ছিল, কোনও শব্দ ছিল না, চেয়ারের হাতলটা ভেঙে পড়ার একটা শব্দ হল।

হৈমন্তী লজ্জা পেয়ে হাতলটা কুড়োতে যেতেই একজন গার্ড ছুটে এল তাঁর সামনে। মধ্যবয়েসি লম্বা লোকটি কী যে বলতে লাগল, হৈমন্তী কিছুই বুঝতে পারলেন না। লোকটি বেশ উত্তেজিত হয়েছে মনে হচ্ছে। হৈমন্তী ভাবলেন, চেয়ারটা যদি ভেঙেই গিয়ে থাকে, তাঁর ছেলে এসে সারাবার খরচ দিয়ে দেবে। তাঁর ছেলে ভালো চাকরি করে।

গার্ডের চেঁচামেচিতে হৈমন্তী কোনও সাড়া শব্দ করছেন না দেখে আরও দু-তিনজন এল

সেখানে। তার মধ্যে একজনের চেহারা মেয়ে পুলিশের মতন। সেই মহিলাটি হৈমন্তীর হাত ধরে টেনে তুলল।

হৈমন্তী ফরাসি ভাষা জানেন না বটে, কিন্তু মোটামুটি কাজ চালানো ইংরিজি জানেন। তিনি বললেন, কী হয়েছে? আমার ছেলে এখানে আছে, তাকে ডাকো।

পুলিশের মতন মহিলাটি সে কথায় কর্ণপাত করল না। হৈমন্তীর হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল একটা ছোট ঘরে। তারপর তিন-চারজন নারী পুরুষ এসে তর্জন-গর্জন করতে লাগল তাঁর ওপর।

কিছুই না বুঝতে পেরে হৈমন্তী ভয়ার্ত স্বরে বলতে লাগলেন, আমার ছেলে? আমার ছেলে?

একটুক্ষণের মধ্যেই অমিত আর সত্যেশ সেখানে এসে পৌঁছল অবশ্য। অমিত চোস্ত ফরাসি ভাষায় তর্ক শুরু করে দিল। ক্রমশ একটা ঝগড়া লাগার উপক্রম।

মিনিট পনেরো এইরকম বাদানুবাদ চলার পর অমিত একসময় বলল, মা, ওঠো! চলো এবার।

বেশ রাগত স্বর। ওই লোকগুলোর সঙ্গে কথা কাটাকাটি করে অমিতের মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে।

মিউজিয়ামের বাইরে এসে হৈমন্তী জিগ্যেস করলেন, ওই লোকগুলো কী বলেছিল রে?

অমিতের বদলে তার বন্ধু সত্যেশ হাসতে-হাসতে বলল, মাসিমা, আপনি বেশ ওই চেয়ারটাতে বসে পড়লেন?

হৈমন্তী বললেন, পায়ে ব্যথা করছিল। খালিই তো ছিল চেয়ারটা। তবে বিশ্বাস করো, হাতলটা আমি ভাঙিনি। লাগানো ছিল আলগা করে। আমি হাত রাখতেই মটাং করে ভেঙে গেল!

সত্যেশ হাসতে লাগল।

হৈমন্তী আবার বললেন, একটা হাতল ভেঙে গেছে, তাতে অত রাগারাগি করার কী আছে? হাতলটা আগেই ভাঙা ছিল। সে যাই হোক, হাতলটা কি আমরা সারিয়ে দিতে পারতাম না?

এবার অমিত মায়ের দিকে ফিরে দারুণ ঝাঁঝাল গলায় বলল, ওই চেয়ারটার দাম কত জানো? শুধু আমাকে না, আমার তিন পুরুষকে বিক্রি করলেও ওর দাম উঠবে না!

সব মাকেই মাঝে-মাঝে ছেলের কাছে ধমক খেতে হয়। হৈমন্তী অবিশ্বাসের সুরে, হাসিমুখে বললেন, যাঃ কী বলছিস! ওইরকম একটা ভাঙা চেয়ার, তার দাম...

অমিত একইরকম বদমেজাজে বলল, ওটা কার চেয়ার জানো? মেরি আঁতোয়ানেৎ-এর!

সত্যেশ বলল, মাসিমা, মেরি আঁতোয়ানেৎ ছিলেন—

তাকে বাধা দিয়ে হৈমন্তী বললেন, জানি। ফরাসি দেশের রানি। ফরাসি বিপ্লবের সময় তাঁকে মেরে ফেলা হয়।

ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে গেলে ভাবে, মায়েরা বুঝি কিছুই জানে না। হৈমন্তী কলেজ জীবনে ইতিহাসে ফরাসি বিপ্লবের কথা পড়েছিলেন, এখনও মনে আছে সেসব কথা।

রাস্তা পার হয়ে পার্কিং লটের দিকে যেতে-যেতে অমিত আবার বলল, ওই চেয়ার ছোঁয়াই নিষেধ। ওখানে বসলে ফাইন হয়। আর হাতলটা ভেঙে ফেলার জন্য ওরা তোমাকে জেলে দেবে বলেছিল!

সত্যেশ বলল, ওদেরও দোষ আছে। দড়ি দিয়ে ঘেরা থাকে, দড়িটা যে খুলে গেছে, তা ওরা খেয়াল করেনি কেন?

অমিত বলল, পাশেই তো বোর্ড লাগানো আছে!

গাড়িটা খুঁজে পেয়ে দরজা খুলতে-খুলতে অমিত আবার বলল, আমরা একটুখানির জন্য

বাইরে গেছি, তার মধ্যেই এমন একটা কাণ্ড করে ফেললে? মা, তোমাকে কতবার বলেছি, এসব দেশে যেখানে-সেখানে হাত দিতে নেই!

এতক্ষণ বাদে অভিমান হল হৈমন্তীর।

তিনি বললেন, ওরা আমাকে জেলে দিতে চেয়েছিল, ছাড়িয়ে আনলি কেন? ভালোই তো হত! আমার কাছে সবাই সমান!

বাড়িতে আসার পর পুত্রবধূ এলেন, সব শুনে চোখ কপালে তুলল।

সে বলল, আপনি কী করেছিলেন মা? এর আগে একজন লোকের দশ হাজার ফ্রাংক ফাইন হয়েছিল এজন্য।

হৈমন্তী আর কী বলবেন, মুখ নীচু করে রইলেন। এতক্ষণে তিনি গুরুত্বটা বুঝতে পেরেছেন। একসময় চলে গেলেন নিজের ঘরে।

এসব দেশে ঘটনাবৈচিত্র্য খুব কম। সপ্তাহের-পর-সপ্তাহ, মাসের-পর-মাস, একইরকম জীবন। কিন্তু এটা একটা বলার মতন রোমহর্ষক ঘটনা। এক বিধবা বাঙালি মহিলা আর একটু হলে ফরাসি দেশের জেলে চলে যাচ্ছিলেন! টেলিফোনে-টেলিফোনে চেনাশুনো। সকলের কাছে ঘটনাটা জানাজানি হয়ে গেল।

সন্ধেবেলা দুটি দম্পতির নেমন্তন্ন এ-বাড়িতে, সত্যেশেরও তারা চেনা। অন্য দিন হৈমন্তী সকলের সঙ্গে এসে বসেন, ওরা তাঁর সামনেই মদ খায়, তিনি কিছুই মনে করেন না। এদেশে তো মদ খেয়ে কেউ মাতলামি করে না, অনেকটা চা-কফির মতনই ব্যাপার। আজ কিন্তু হৈমন্তী রয়ে গেলেন রান্নাঘরে। ওখানেও আজকের ঘটনাটাই আলোচনা হচ্ছে। মেরি আঁতোয়ানেৎ-এর চেয়ার ভেঙে ফেলার জন্য অমিতের মায়ের নির্ঘাত জেল হতে পারত, হয়নি যে সেটাই আশ্চর্যের ব্যাপার। অমিত চোস্ত ফরাসি ভাষায় মিউজিয়ামের প্রহরীদের নিরস্ত করেছে। প্রহরীদের কী-কী যুক্তিবাদে অমিত বিদ্ধ করেছে, তা সে বন্ধুদের শোনাতে লাগল বারবার।

শেষপর্যন্ত ব্যাপারটা নিয়ে হাসাহাসি হতে লাগল।

দু-গেলাস মদ খাবার পর অমিতের মেজাজটা ভালো হয়ে গেছে। রান্নাঘরে বরফ নিতে এসে সে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বলল, ওঃ আজ কী ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে! ওদের ওপর চোটপাট করছিলাম বটে, কিন্তু ভেতরে-ভেতরে ভয়ে কাঁপছিলাম! সত্যি যদি তোমাকে জেলে দিত। মেরি আঁতোয়ানেৎ-এর চেয়ার ভেঙে ফেলা, এটা একটা খবরের কাগজে বেরুবার মতন খবর।

হৈমন্তী মিনমিন করে বললেন, চেয়ারটা ভাঙা ছিল। আমি শুধু একটু হাত রেখেছি।

অমিত বলল, বোধহয় আঠা দিয়ে জুড়ে রেখেছিল। কিন্তু সে কে প্রমাণ করতে যাবে? ওরা বলল, ভেঙে গেছে। যাক গে, তুমি আর মন খারাপ করে থেকো না।

রাত্তিরবেলা হৈমন্তী এক সুন্দরী রমণীকে স্বপ্ন দেখলেন। মাথা ভরতি সোনালি চুল, কিন্তু মুখখানা খুব বিষণ্ণ। মেয়েটি নিজের গলায় হাত বুলোচ্ছে আর হৈমন্তীকে কিছু যেন বলতে চাইছে। মুখখানা চেনা-চেনা লাগছে।

জানলার কাছে দাঁড়িয়ে আছে মহিলাটি, সাদা রঙের পোশাক পরা। মাঝে-মাঝে রুমাল দিয়ে চোখ মুছছে।

হৈমন্তী এবার দেখতে পেলেন তার গলায় একটা গোল দাগ, সঙ্গে-সঙ্গে তিনি শিউরে উঠলেন।

এ তো রানি মেরি আঁতোয়ানেৎ!

ফরাসি বিপ্লবের সময় এঁর গিলোটিনে প্রাণ গিয়েছিল। অর্থাৎ গলাটা কেটে ফেলা হয়েছিল! সেই মেরি আঁতোয়ানেৎ স্বপ্নে দেখা দিলেন কেন? হৈমন্তী আজ তাঁর চেয়ারে বসে পড়েছিলেন বলে রেগে গেছেন? রাজা-রানিদের চেয়ারে তাঁর মতন সাধারণ মানুষদের বসতে নেই!

মেরি আঁতোয়ানেৎ যেন হৈমন্তীর মনের কথা বুঝতে পারলেন, সঙ্গে-সঙ্গে মাথা নাড়লেন

খুব জোরে। যেন বলতে চাইছেন, না, না, না, না...

হৈমন্তী বললেন, আপনি কিছু মনে করবেন না, আমি ভুল করে বসে ফেলেছি...

মেরি আঁতোয়ানেৎ কিছু বলতে গেলেন, বোঝা গেল না। আর তাঁকে দেখাও গেল না। এইসময় হৈমন্তী শুনতে পেলেন নীচের দরজায় কলিং বেল বাজছে।

বেলটা বেজেই চলল, কেউ খুলছে না। অমিতরা অনেক রাত পর্যন্ত আড্ডা দিয়ে এখন গভীর ঘুমে মগ্ন। সহজে জাগবে না।

হৈমন্তী নিজেই বেরিয়ে এলেন। এসব দেশে গভীর রাতে কিংবা শেষ রাতে অতিথি আসা আশ্চর্যের কিছু নয়। মাঝরাতে প্লেন আসে। দেশ থেকে হঠাৎ কেউ এসে পড়তে পারে।

দরজা খুলতেই দেখলেন একজন সাহেব দাঁড়িয়ে আছে।

নীল রঙের একটা লম্বা কোট পরা, বুকে একটা হাত, মাথায় সামান্য টাক। বাইরে আবছা অন্ধকার বলে মুখটা ভালো দেখা যাচ্ছে না।

সাহেবটি অনেকটা ঝুঁকে হৈমন্তীকে অভিবাদন জানাল। তারপর ভাঙা-ভাঙা ইংরিজিতে জিগ্যেস করল, তুমি হৈমন্তী দেবী?

হৈমন্তী বিহ্বলভাবে মাথা নাড়লেন। তারপর বললেন, দাঁড়ান, আমার ছেলেকে ডেকে দিচ্ছি।

সাহেবটি হাত তুলে বলল, কোনও দরকার নেই।

তারপর পেছন ফিরে মুখ দিয়ে একটা শব্দ করল।

একটু দূরেই দাঁড়িয়ে আছে একটা ঘোড়ার গাড়ি। সেখান থেকে দুটো লোক নেমে, ধরাধরি করে নিয়ে এল একটা চেয়ার।

হৈমন্তীর রক্ত হিম হয়ে গেল। এই তো সেই চেয়ারটা! ওরা এখনও ছাড়েনি? এই চেয়ারের দাম দিতে হবে নাকি? এত রাত্তিরে বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করে এসেছে। তাঁর ছেলে অত টাকা পাবে কোথায়?

নীল কোট পরা সাহেবটি বাড়ির সামনের ছোট্ট বাগানে চেয়ারটা নামিয়ে রাখতে বলল।

হৈমন্তী ব্যাকুলভাবে বললেন, বিশ্বাস করুন, মেরি আঁতোয়ানেৎ-এর চেয়ারটা আমি ভাঙিনি। ভাঙাই ছিল। আমি শুধু ভুল করে বসেছিলাম। সেজন্য আমাকে জেলে দিতে চান নিয়ে চলুন, আমার ছেলেকে কিছু বলবেন না।

নীল কোট পরা সাহেবটি উগ্র স্বরে বলল, কে বলেছে, এটা মেরি আঁতোয়ানেৎ-এর চেয়ার? ওরা কিচ্ছু জানে না। এটা আমার চেয়ার ছিল। আমি এই চেয়ারে বসে জুতো পরতাম!

সাহেবটি চেয়ারে বসে পড়ে একবার দু-পা তুলল। আবার সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমার চেয়ার। আমি অনুমতি দিচ্ছি, তুমি এই চেয়ারে যত খুশি বসতে পারো। বসো, এখন বসে দ্যাখো।

হৈমন্তী বললেন, না, না, আমি আর বসতে চাই না।

সাহেবটি বলল, আমি বলছি, তুমি বসো। তোমার জন্যই আমি নিয়ে এসেছি।

হৈমন্তী বললেন, এটা আপনার চেয়ার? তবে যে ওরা বলল...আপনার নাম কী?

সাহেবটি হাসল, হৈমন্তীর দিকে সম্পূর্ণ মুখ ফিরিয়ে বলল, আমাকে নিজের মুখে নাম বলতে হবে? আজকাল লোকে বুঝি আমায় ভুলে গেছে?

এবার হৈমন্তী চিনতে পারলেন। ছবিতে দেখেছেন বহুবার। নেপোলিয়ান বোনাপার্ট!



স্বপ্নের নেশা

একটা সরু গলির শেষ প্রান্তে সেই বাড়িটি। ট্যাক্সিওয়ালা বড় রাস্তায় আমাকে নামিয়ে দিয়ে আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল। এ দেশের ট্যাক্সিওয়ালারা একেবারে ঠিকানা মিলিয়ে বাড়ির দোর গোড়ায় নামিয়ে দেয়, কিন্তু এই সরু গলিতে গাড়ি ঢুকবে না, ভারী সুটকেসটা আমাকে বয়ে নিয়ে যেতে হবে।

দুপুরবেলা, কোনও জন-মনুষ্য নেই, থাকার কথাও নয়। গলিটার দুপাশে উঁচু দেয়াল, একেবারে নিরেট, মনে হয় কোনও কলকারখানা আছে দু-ধারে। বাড়িটার দরজার সামনে এসে ঠিকানাটা ভালো করে দেখে নিয়ে আমি বেলের বোতামে হাত দিলাম।

একটু পরে দরজা খুলল একজন লোক, বয়েস হবে চল্লিশের কাছাকাছি, মুখে না-কামানো দাড়ি, ময়লা জিনসের প্যান্ট আর একটা গেঞ্জি পরা, হাতে একটা হাতুড়ি। কিচ্ছু না বলে সে তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

সুটকেসটা নামিয়ে রেখে বললাম, আমি ইণ্ডিয়া থেকে এসেছি, এটা নিশ্চয়ই একটা গেস্ট হাউস? এখানে আমার একটা ঘর বুক করা আছে আজ থেকে।

লোকটি তবু নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল বলে আমি পকেট থেকে চিঠিটা বার করে দেখালাম।

সে চিঠিটা আমার হাত থেকে নিয়ে ভেতরে চলে গেল। দরজা খোলা রেখে। দুমদাম করে সিঁড়ি দিয়ে ওঠার পায়ের শব্দ পেলাম।

এক মিনিট বাদেই সে ফিরে এল হাসি মুখে। হাতুড়িটা রেখে এসেছে, প্যান্টে হাত মুছে সে তুলে নিল আমার সুটকেসটা। মাথা নেড়ে ইঙ্গিত করল ভেতরে আসবার জন্য।

এসব দেশে নিজের মালপত্র নিজেকেই বইতে হয়। আর এটা তো হোটেল নয় যে-কোনও বেল বয় থাকবে! আমি লোকটিকে বললাম, না, না, সুটকেসটা আমিই নিচ্ছি! লোকটি সে-কথা শুনল না, দ্রুত এগিয়ে গেল।

এ পর্যন্ত লোকটি একটিও শব্দ উচ্চারণ করেনি। বোবা? সাহেব-বোবা আমি কখনও দেখিনি আগে।

সরু কাঠের সিঁড়ি, কার্পেট নেই, বেশ খানিকটা দৈন্য দশা বলেই আমার মনে হয়। আমি অসন্তুষ্ট হলাম। যেসব বাড়ির দু-একটা ঘর বাইরের লোকদের ভাড়া দেওয়া হয়, তার একটা নির্দিষ্ট মান থাকার কথা। এরকম ভাঙাচোরা সিঁড়ি কেন?

উঠতে হল তিনতলায়। এখানটা অবশ্য বেশ ঝকঝকে তকতকে। সদ্য রং করা ও ওয়াল পেপার বদলানো হয়েছে বোঝা যায়। ঘরে সুন্দর বিছানা পাতা। বাথরুমটি পরিচ্ছন্ন। অভিযোগ করার কিছু নেই।

সেই লোকটি বাথরুমের কল খুলে গরম জল, ঠাণ্ডা জল দেখিয়ে দিল, একবার ফ্লাস টানল, আলোর সুইচ জ্বালাল-নেভাল, সবই নিঃশব্দে।

সামনা-সামনি দুটো ঘর, মাঝখানে বসবার জায়গা। একটা শ্বেত পাথরের টেবিল। তার ওপর একটি চিঠি চাপা দেওয়া। লোকটি সেই চিঠিটা দিল আমাকে।

তাতে ইংরেজিতে আমার উদ্দেশ্যেই লেখা আছে যে, তোমার ঘর প্রস্তুত। তোমার বিছানায় পাশের টেবিলের ড্রয়ারে একটি চাবি আছে। তুমি যখন খুশি যাওয়া আসা করতে পারো, ওই চাবিতে সদর দরজা খোলা যাবে। তোমার আর কিছুর প্রয়োজন থাকলে সন্ধেবেলা আমাকে জানিও।

তলায় একজন মহিলার সই।

আমি বললাম, থ্যাংক ইউ। আর কিছুর প্রয়োজন নেই।

লোকটি হাসি মুখে আমার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে চলে গেল।

আমি সুটকেস খুলে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিলাম। এখন থেকে সাতদিন এই ঘরের মধ্যে আমার সংসার। হোটেলের চেয়েও এই ধরনের গেস্ট হাউস আমার বেশি পছন্দ। খরচ একটু কম পড়ে তো বটেই, তা ছাড়াও একটা বাড়ি-বাড়ি বোধ থাকে। হোটেলগুলো সব দেশেই প্রায় একই রকম আর একঘেয়ে।

ভালো করে স্নান সেরে নিয়ে শুয়ে পড়লাম।

খিদে নেই, শরীর এখন ঘুম চাইছে। বহুক্ষণ প্লেন জার্নি করে এলে মাথাটা কেমন অবশ হয়ে যায়।

বিছানাটা বেশ নরম। জানলাগুলোতে সাদা সিল্কের পর্দা। ভেবেছিলাম শোওয়ামাত্র ঘুমিয়ে পড়ব, কিন্তু তা হল না। ঘুমের প্রয়োজন হলেই যে ঘুম আসবে তার তো কোনও মানে নেই। এক একসময়ে ঘুমের পায়ে ধরে সাধাসাধি করলেও ঘুম আসে না।

খানিকক্ষণ ছটফট করার পর হঠাৎ মনে পড়ল, দুটো টেলিফোন করা খুব দরকার। এ ঘরে টেলিফোন নেই। হোটেলের তুলনায় এই একটা অসুবিধে। অধিকাংশ গেস্ট হাউসেই টেলিফোন ব্যবহারের ব্যবস্থা থাকে না।

বোবা লোকটি ছাড়া এ বাড়িতে আর কোনও লোক আছে বলে মনে হল না। ওর কাছ থেকে কিছু জানারও উপায় নেই। রাস্তায় বেরুলেই অবশ্য টেলিফোন বুথ পাওয়া যাবে। ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরটি আমার একেবারে অচেনা নয়, আগে এসেছি।

জামা-প্যান্ট জুতো পরে আবার তৈরি হয়ে নিতে হল। চাবিটা নিয়ে নামবার সময় দেখলাম, সেই লোকটি হাতুড়ি-করাত নিয়ে সিঁড়ি সারাচ্ছে। এক জায়গায় কাঠ-ফাঠ সব খুলে ফেলেছে, আমাকে ডিঙিয়ে যেতে হল, লোকটির সঙ্গে হাসি বিনিময় করলাম।

ঘণ্টাখানেক বাদে ফিরে এসে দেখি, তখনও সে একমনে কাজ করে যাচ্ছে। সিঁড়ির অনেকটা অংশ সে নতুন করে ফেলেছে। তাঁর গেঞ্জিটা ভিজে গেছে ঘামে।

সন্ধের সময় গৃহকর্ত্রী আমার খবর নিতে এল। বেশ গাঁট্টা-গোঁট্টা চেহারার জার্মান মহিলা, মুখের ভঙ্গি প্রাশিয়ানদের মতন। মোটামুটি কাজ চালানো ইংরেজি জানে। কাছাকাছি ট্রাম-স্টপ, বাস-স্টপ ও হোটেল রেস্তোরাঁর কথা জানিয়ে দিল আমাকে। আমি ভাড়ার টাকা দিয়ে দিলাম অগ্রিম।

সেই বোবা লোকটি একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। সাধারণত বোবারা কালাও হয়। কিন্তু এই লোকটি যেন সবকথা শুনছে মন দিয়ে। ওর গলায় বেশ বড় একটা লকেট, তাতে কার যেন একটা ছবি। আমাদের দেশে যেমন সাঁইবাবা কিংবা অন্য কোনও গুরুর ছবি অনেকে গলায় ঝোলায়, সেইরকমই কোনও ব্যাপার মনে হল। লোকটি আপন মনে লকেটটি নাড়াচাড়া করছে এক হাতে।

মহিলাটি বলল, আমার স্বামীর সঙ্গে তোমার তো আগেই আলাপ হয়েছে? আমি সারাদিন বাড়ি থাকি না। কিন্তু ফিলিপ থাকবে। তোমার যখন যা প্রয়োজন হয়, এর কাছে চাইবে।

এই বোবা লোকটি এই মহিলার স্বামী? আমি ওকে ছুতোর মিস্তিরি ভেবেছিলাম। তাড়াতাড়ি ডানহাত বাড়িয়ে ওর সঙ্গে করমর্দন করলাম। ওর হাসিটি বেশ সারল্য মাখা।

গৃহস্বামিনী তার নিজের খুব একটা শক্ত নাম বলে বললেন, আমাকে অবশ্য এ নামে কেউ ডাকে না, আমাকে সবাই নোরা বলে। এবং আগেও আমাদের এখানে দু-একজন ভারতীয় অতিথি

থেকে গেছে। তাদের কোনও অসুবিধে হয়নি। আশা করি, তোমারও...

আমি বললাম, না, না, চমৎকার জায়গা। রেল স্টেশনেরও খুব কাছে। আমার খুব পছন্দ হয়েছে। এখান থেকে বুক ফেয়ার যাওয়া-আসারও সুবিধে হবে।

নোরা বলল, আমরাও একদিন বুক মেসে দেখতে যাব। তুমি কি আমাদের জন্য টিকিট এনে দিতে পারবে? আমার স্বামী খুব বই ভালোবাসে, ও নিজেও একজন কবি!

আমি আবার চমকে উঠলাম। সঙ্গীত স্রষ্টা বিথোফেন একসময় কালা হয়ে গিয়েছিলেন, হোমার-মিল্টন হয়েছিলেন অন্ধ, কিন্তু মূক ব্যক্তি কখনও কবিতা রচনা করেছে, এমন শুনিনি!

নোরা বলল, ও অবশ্য জার্মান ভাষায় লেখে না। লেখে ম্যাসিডোনিয়ান ভাষায়!

আমি বললাম, মাকেদোনিয়ান?

এবার নোরা একটু চমকে উঠল। কৌতূহলী হয়ে তাকিয়ে বলল, তুমি ওই ভাষার কথা জানো? আমরা জার্মান নই, মাকেদোনিয়ান!

আমি আরও একটু জ্ঞান ফলাবার জন্য বললাম, তার মানে তোমরা ঠিক কোথাকার? মাকেদোনিয়া নামে তো কোনও দেশ নেই। সে দেশ টুকরো-টুকরো হয়ে খানিকটা বুলগেরিয়া, খানিকটা যুগোশ্লোভিয়া আর খানিকটা গ্রিসের মধ্যে ঢুকে গেছে। বোধহয় আলবেনিয়ার মধ্যেও কিছুটা গেছে, তাই না? তোমরা কি যুগোশ্লাভিয়া থেকে এসেছ? আমি একবার...

আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই এক কাণ্ড ঘটল।

এতক্ষণ যাকে বোবা ভেবেছিলাম, এবার সে কথা বলে উঠল। বেশ রাগত সুরে সে কী যেন জিগ্যেস করল নোরাকে। সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য ভাষা!

তারপর নোরা আর ফিলিপ নিজেদের মধ্যে কথা বলে যেতে লাগল ওই ভাষায়। যেন ঝগড়া করছে। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম বোকার মতন।

একটু বাদে নোরা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আমার স্বামী তোমাকে ভেবেছে স্পাই! আমি ওকে বোঝাবার চেষ্টা করছি যে তুমি ইন্ডিয়ান, তোমার এ ব্যাপারে কোনও স্বার্থ নেই, ইণ্ডিয়ানরা এসব সাতে-পাঁচে থাকে না...

যাঃ বাবা আমাকে স্পাই ভেবেছে? তার মানে এখানে কি কোনও গোপন ষড়যন্ত্রের ব্যাপার চলছে? বোমা-বন্দুক বানায়? এ কোথায় এলাম?

নোরা আমাকে গুটেন নাখট জানিয়ে স্বামীর হাত ধরে টানতে-টানতে নিয়ে গেল। দুজনে তখনও তর্কাতর্কি করছে।

খুব একটা ভয় না পেলেও আমার খানিকটা দুশ্চিন্তা হল ঠিকই। হঠাৎ স্পাই-এর কথা উঠল কেন? বিদেশ-বিভুঁইয়ে এসে কোনও গণ্ডগোলে জড়িয়ে পড়ব না তো? একজন লোক কথা বলতে পারে, তবু বোবা সেজে থাকে, এটাও বেশ সন্দেহজনক!

ফিলিপের মুখখানা দেখলে তাকে সরল, ভালোমানুষ বলেই মনে হয়। কিন্তু হঠাৎ সে রেগে উঠল কেন? আমি এমন কী বলেছি?

কয়েক বছর আগে আমি যুগোশ্লাভিয়াতে ওখরিদ নামে একটা হ্রদের পারের ছোট্ট শহরে গিয়েছিলাম। সেখানে একটা আন্তর্জাতিক কবি সম্মেলন হয়। সেখানে গিয়েই আমি শুনেছিলাম যে সে অঞ্চলের ভাষা হচ্ছে ম্যাসিডোনিয়ান এবং সেই ভাষার দাবি-প্রতিষ্ঠার জন্য একটা আন্দোলন চলছে। আমি যে বাংলা কবিতাটি পাঠ করেছিলাম, তার অনুবাদ শোনানো হয়েছিল ম্যাসিডোনিয়ার ভাষায়!

ম্যাসিডোনিয়া! নামটা শুনলেই রোমাঞ্চ হয়।

যিশুর জন্মেরও প্রায় সাড়ে তিনশো বছর আগে ওই ছোট্ট একটা দেশের রাজা ফিলিপের ছেলে আলেকজান্ডার দুনিয়া কাঁপিয়ে দিয়েছিল। আমাদের দেশের গল্পে-ইতিহাসে আলেকজান্ডারের

একটি বিশেষ স্থান আছে, তার কারণ, পারস্য, মিশর, ব্যাবিলন পায়ের তলায় মাড়িয়ে এলেও দিগ্বিজয়ী আলেকজান্ডার ভারত জয় করতে পারেননি। তক্ষশিলার বিশ্বাসঘাতক রাজার সাহায্য নিয়ে তিনি ঝিলাম নদীর পারে মহারাজ পুরুকে যুদ্ধে পরাস্ত করেছিলেন বটে, কিন্তু পুরুর পরাক্রম দেখে তিনি তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্বও করেছিলেন। ভারতীয় সৈন্যদের শৌর্য দেখে আলেকজান্ডারের বাহিনীও আর এগোতে চায়নি, গঙ্গা পার হননি আলেকজান্ডার।

আমার ধারণা ছিল, এত হাজার বছরের ইতিহাস-ভূগোলের নানান ওলোট-পালোটে ম্যাসিডোনিয়া নামটা মুছে গেছে মানচিত্র থেকে। আলেকজাণ্ডারের অকাল মৃত্যুর পরই তাঁর সাম্রাজ্য টুকরো-টুকরো হয়ে যায়। ম্যাসিডোনিয়া নামটা তো আর কোথাও পাইনি।

কিন্তু যুগোশ্লাভিয়া গিয়েই জানতে পারলাম, ম্যাসিডোনিয়া নামে দেশটা হারিয়ে গেলেও সে নামটা এখনও লুপ্ত হয়নি। তিন-চারটি দেশে ছড়িয়ে আছে ম্যাসিডোনিয়া, সেই প্রাচীন ভাষা এখনও গ্রিক কিংবা সার্বো-ক্রোয়াশিয়ানের সঙ্গে টক্কর দেয়। ম্যাসিডোনিয়া নামটারও আসল উচ্চারণ মাকেদোনিয়া।

জার্মানিতে বহু জাতের মানুষ থাকে। আমি এসে পড়েছি এক ম্যাসিডোনিয়ান পরিবারে। কিন্তু এরা স্পাই-এর ভয় পায় কেন? এরা এখানে অবৈধভাবে আছে? কিন্তু আমিও তো আন্দাজে এখানে আসিনি। বইমেলা কর্তৃপক্ষের কাছে হোটেল ও গেস্ট হাউসের একটা তালিকা থাকে, সেখান থেকে ঠিকানা দেখে আমি আগে যোগাযোগ করেছি। বইমেলা কর্তৃপক্ষ তো ভালো করে খোঁজ খবর না নিয়ে কারুর নাম সুপারিশ করবে না! তারা গেস্ট হাউসগুলোও পরিদর্শন করে যায়। সুতরাং এদের নাগরিকত্ব নিয়ে কোনও গণ্ডগোল থাকলে ধরা পড়ে যেত।

এরা যদি বোমা-বন্দুকের কারবারি হয়, তা হলে সামান্য কিছু টাকার জন্য বাইরের অতিথি রাখবেই বা কেন?

সকালবেলা ঘুম ভাঙার পরেই মনে পড়ল চায়ের কথা।

গেস্ট হাউসে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা থাকে না, বাইরেই খেতে হয়, কিন্তু সাধারণত ব্রেক ফাস্ট দেয়। কিন্তু হোটেলের মতন ঘরে চা দিয়ে যাবে না নিশ্চয়ই। ঘুম ভাঙার পর চায়ে চুমুক না দিয়ে আমার দিনটাই শুরু করতে পারি না।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার পর মনে হল, লজ্জা করে লাভ নেই, নীচে গিয়ে চাইতে হবে।

তিনতলার অন্য ঘরটিতে কেউ আসেনি। দোতলা-একতলায় ওরা স্বামী-স্ত্রী ছাড়া আর কারুর অস্তিত্ব টের পাইনি।

সিঁড়ির মুখটায় দাঁড়াতেই দেখলাম, একতলার একটি ঘর থেকে ঘুমচোখে বেরিয়ে এল স্বামীটি। একটা হাফ-প্যান্ট পরা, খালি গা। মুখ তুলে আমার দিকে তাকিয়েই সে পেছন ফিরে এক দৌড় মারল। ঢুকে গেল ঘরের মধ্যে।

এই রে, লোকটা বোধহয় আমার ওপর এখনও রেগে আছে।

কিন্তু রাগ করুক আর নাই করুক, আমার তো চা না হলে চলবে না। মহিলাটিকে ডাকি কী করে? নেমে এলাম নীচে।

ফিলিপ আবার বেরিয়ে এল ঘর থেকে। এখন প্যান্ট-শার্ট পরা, খুব তাড়াতাড়ি ভদ্রস্থ হয়ে এসেছে। খালি-গায়ে ছিল বলে আমাকে দেখে লজ্জা পেয়েছিল।

মাথা নেড়ে বলল, 'মর্নিং! মর্নিং!'

ফিলিপ তা হলে ইংরেজিও জানে? কাল আমার সামনে একটি অক্ষরও উচ্চারণ করেনি। এটাই বা কী রহস্য?

ড্রেসিং গাউন পরে এবার বেরিয়ে এল নোরা। সুপ্রভাত বিনিময় করার পর আমি জিগ্যেস করলাম, দয়া করে আগে এক কাপ চা দিতে পারবে কী? ব্রেক ফাস্ট পরে খাব।

আগে একটু চা চাই।

মহিলাটি খানিকটা হকচকিয়ে গিয়ে বলল, ব্রেক ফাস্ট? তোমার সঙ্গে যে রেট ঠিক হয়েছে, তার মধ্যে তো ব্রেক ফাস্ট নেই! ব্রেক ফাস্টের জন্য ডেলি আরও পঁচিশ মার্ক বেশি লাগে। তুমি সে কথা কিন্তু চিঠিতে জানাওনি!

আমি বললাম, ও! দুঃখিত! দুঃখিত! ঠিক আছে, আমি ব্রেক ফাস্ট বাইরে খেয়ে নেব!

ওপরে উঠতে-উঠতে হিসেব করলুম। পঁচিশ মার্ক? ওতে আমার লান্চ হয়ে যাবে। জ্যাম-জেলি-বিস্কিট কিনে ঘরে বসে খেলে সস্তা পড়বে অনেক। দরকার নেই আমার ব্রেক ফাস্ট!

মুশকিল হচ্ছে এই যে চা খেতে হলেও এখন জুতো-মোজা পরে বেরুতে হবে বাইরে। বাসি মুখে চা খাওয়া আমার অভ্যেস। বাথরুম-টাথরুম কিছুই সারা যাবে না। সকালবেলা উঠে টাকা-পয়সার কথা শুনে মেজাজ বিগড়ে গেল।

কোনওরকমে মুখ চোখ ধুয়ে এসে মোজাটা সবে পায়ে গলিয়েছি, সেই সময় নোরা এসে দাঁড়াল খোলা দরজার কাছে। হাতে একটা ট্রেতে চায়ের পট, আর একটা ক্রোয়াশ।

আমি একটু বিরক্তভাবে বললাম, আমি তো চাইনি। বাইরে খেয়ে নেব।

নোরা বলল, এটা ফ্রি! এটা ফ্রি!

শুনে আমার আরও খারাপ লাগল। কেন আমি ওর দয়ার দাক্ষিণ্য নিতে যাব? এরা যদি এক কাপ চায়ের দাম নিয়েও হিসেব কষে, তা হলে আমিই বা বিনা পয়সায় নেব কেন?

চা তৈরি করে এনেছে, ফেরানো যায় না। বললাম, না, না, তুমি কেন ফ্রি দেবে? ঠিক আছে, আজকের পঁচিশ মার্ক দিয়ে দিচ্ছি কাল থেকে তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না।

নোরা আবার বলল, তোমায় পয়সা দিতে হবে না। আমার স্বামী তোমার জন্য এটা বানিয়ে দিয়েছে।

নোরার ইংরেজি ভাঙা-ভাঙা। সবকথা গুছিয়ে বলতে পারে না। ভাষাজ্ঞানের অভাবেই ওর মুখে পয়সার কথাটা অমন রূঢ় শুনিয়েছে। না হলে, এককাপ চা চাইলে এদেশে কেউ দাম চায় না। ও বোধহয় ভেবেছিল, শুধু ঘর-ভাড়ার রেট দিয়ে আমি ওর কাছে ব্রেক ফাস্ট দাবি করছি।

ট্রে-টা নামিয়ে রেখে নোরা বলল, আমাকে খুব তাড়াতাড়ি অফিস যেতে হয়, ব্রেক ফাস্ট বানাবার সময় পাই না। তবে, তুমি যদি চাও, তা হলে আমার স্বামী তোমাকে বানিয়ে দিতে পারে। কাল তুমি ফিলিপের কথা শুনে রাগ করোনি তো?

আমি বললাম, আমি তো ওর ভাষা বুঝতে পারিনি। রাগ করব কী করে? তোমার স্বামী কি আমার কোনও কথা শুনে রাগ করেছে?

নোরা বলল, না, রাগ করেনি। একটু দুঃখ পেয়েছে। তুমি যে বললে, মাকেদোনিয়া নামে কোনও দেশ নেই! সেই কথা শুনে!

একটু হেসে নোরা নিজের বুকের মাঝখানে একটা হাত রেখে বলল, আসলে ওই দেশটা এখনও আছে। এখানে!

আমি বললাম, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, তা তো বটেই। আচ্ছা, তোমার স্বামী ইংরেজি জানে, কিন্তু অন্য লোকদের সামনে বলে না কেন?

নোরা বলল, ও খুব কমই ইংরেজি জানে। আমার চেয়েও কম। কিন্তু ও ইংরেজি বা জার্মান কিছুই বলতে চায় না। মাকেদোনিয়ান ভাষায় তো ফিলিপি কবিতা লেখে, বিদেশে থাকতে-থাকতে সেই ভাষা যাতে ও না একটুও ভুলে যায়, তাই সব সময় সেই ভাষাই বলে। সে ভাষাতেই চিন্তা করে।

কিন্তু তোমার স্বামী যখন বাইরে যায়, কিংবা চাকরি বাকরি করতে গেলে তো মাকেদোনিয়ান ভাষা চলবে না।

ও বিশেষ বাইরে যায় না। ও একজন কবি, চাকরি করবে কেন? এ-বাড়িতেই ওর অনেক কাজ। আমি চাকরি করি, সেটাই যথেষ্ট।

তোমার স্বামীর কবিতার অনুবাদ হয়নি?

নাঃ! কে করবে?

নোরা চলে যাওয়ার পর মনে পড়ল, আমাকে কেন ফিলিপ স্পাই ভেবেছিল, সেটা তো জিগ্যেস করা হল না! স্বামী কবিতা লেখে বলে বউ তাকে চাকরি করতে দেয় না, এ যে দারুণ ব্যাপার! আগে কখনও শুনিনি!

এরপর দু-তিনদিন আমি ব্যস্ত রইলাম, ওদের সঙ্গে দেখাই হল না ভালো করে। যাওয়া-আসার পথে দেখেছি, বিকেলের দিকে এ-বাড়িতে আরও কিছু লোক আসে, প্রায় সবাই-ই বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, দোতলার একটা ঘরে ঢুকে যায়। তাদের অতি নিরীহ চেহারা। ফিলিপ সিঁড়ি সারায়, ইলেকট্রিকের লাইন ঠিক করে! আমার সঙ্গে চোখাচোখি হলে একটু হাসে।

আমি ঘরেই চায়ের ব্যবস্থা করে নিয়েছি। ব্রেক ফাস্ট, লাঞ্চ বাইরে খাই, রাত্তিরে প্রায়ই নেমন্তন্ন থাকে। কোনও অসুবিধে নেই।

দিনচারেক পরে এক সকালবেলা নোরা এসে বলল, আজ তুমি আমাদের সঙ্গে ব্রেক ফাস্ট খাও।

আমি বললাম, কেন? আমার ঘরেই অনেক খাবার রয়েছে, আজ আর অন্য কিছু খাবারের দরকার নেই।

নোরা বলল, আজ আমার ছুটি। ফিলিপ প্যান কেক বানাচ্ছে। তুমি যদি আমাদের সঙ্গে খেতে আস, আমরা খুশি হব।

এরপর আপত্তি করা যায় না। আমি এক প্যাকেট বেকন-বিস্কিট কিনে রেখেছিলাম, সেটা নিয়ে নেমে গেলাম নীচে। রান্নাঘরটি ছোট, তার মধ্যেই ডাইনিং টেবল। এ-দেশের রীতি অনুযায়ী কারুকে রান্না ঘরে আড্ডা দিতে ডাকা মানে ঘনিষ্ঠতার ইঙ্গিত।

ফিলিপ গায়ে একটা অ্যাপ্রন বেঁধে প্যানে কী যেন ভাজছে। আমার দিকে তাকিয়ে অভিবাদনের ভঙ্গি করে বলল, 'মর্নিং! সিট! এগ?'

শুধু কয়েকটা ইংরেজি শব্দ, কোনও ক্রিয়াপদ নেই! নোরা বলেছিল, ওর স্বামী মাকেদোনিয়ান ভাষায় লেখে বলে, অন্য কোনও ভাষা বলে না। ওই ভাষাতে চিন্তা করে সব সময়। আমাকে দেখে আজ যে দয়া করে দু-চারটি ইংরেজি শব্দ বলছে, তাই-ই যথেষ্ট।

ভারতবর্ষ সম্পর্কে টুকিটাকি প্রশ্ন করতে লাগল নোরা। সাধারণ কৌতূহল। ফিলিপ কোনও প্রশ্ন করছে না, মন দিয়ে শুনছে। আমরা নানারকম খাবারের সঙ্গে কাপের পর কাপ কফি পেয়ে যাচ্ছি।

একটু পরে একটা টুলের ওপর দাঁড়িয়ে ওপরের কাবার্ড থেকে একটা বোতল নামাল ফিলিপ। সেটা আমার সামনে ধরে বলল, উজো! লাইফ।

নোরা বলল, এটা উজো। খাঁটি মাকেদোনিয়ান। খেয়ে দেখবে?

উজো আমি চিনি। একরকমের গ্রিক মদ। অনেকটা আমাদের দিশি মদের মতন। সকালবেলা ও জিনিস পান করার কোনও ইচ্ছে নেই আমার।

আমি বললাম, না, এখন থাক। ফিলিপ বরং দু-একটা তার নিজের কবিতা পড়ে শোনাক না।

নোরা বলল, তুমি কি তা বুঝতে পারবে? তুমি আমাদের ভাষা জানো?

আমি বললাম, তা জানি না। বুঝবো না, ধ্বনিটা শুনবো। যুগোশ্লাভিয়ায় গিয়ে আমি তিন-চারদিন ধরে অনেকের মুখে মাকেদোনিয়ান ভাষা শুনেছি, বেশ মিষ্টি ভাষা মনে হয়।

এটা আমি ওদের খুশি করার জন্যই বললাম। ওরাও শিশুর মতন খুশি হয়ে উঠল। নোরা দৌড়ে গিয়ে কয়েকটা বই, পত্র-পত্রিকা ও বড়-বড় রোল করা পোস্টার নিয়ে এল।

ফিলিপ নোরাকে কী যেন বলল, নোরা আমাকে বুঝিয়ে দিল যে ফিলিপ নিজের কবিতা পড়বে না। লজ্জা-লজ্জা পাচ্ছে। ও আমাদের ভাষায় অন্য কয়েকজন বড়-বড় কবির লেখা শোনাচ্ছে।

শুনতে-শুনতে আমি মাথা দোলাতে লাগলাম। খারাপ লাগছে না। পড়ার ভঙ্গি আর শব্দগুলির সমন্বয়ে কবিতার মর্ম খানিকটা ধরা যায়।

পড়তে-পড়তে ফিলিপের গলা আবেগে কাঁপতে লাগল একসময়। বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। নোরা তাকে থামিয়ে দিয়ে কফি খেতে বলল।

আমি জিগ্যেস করলাম, মাকেদোনিয়ান ভাষা কত লোকে পড়ে? কবিতার বই বিক্রি হয়?

নোরা মাথা নেড়ে বলল, তেমন কিছু হয় না। আজকাল মাকেদোনিয়ানরা অনেক দেশে ছড়িয়ে গেছে। নিজেদের ভাষার আর চর্চা করে না। সেইজন্যই আমরা আন্দোলন করছি।

ফিলিপ কাগজের রোলগুলো খুলে ফেলল। তাতে বেশ সুন্দর-সুন্দর ছবি আঁকা, আর দু-এক লাইন কবিতা। চমৎকার সব পোস্টার।

ফিলিপ নিজের ভাষায় কী যেন বলল খনিকটা, নোরা বুঝিয়ে দিল, এইসব পোস্টার করে আমরা পার্টি ফাণ্ডে টাকা তুলি।

আমি জিগ্যেস করলাম, তোমাদের কী পার্টি?

নোরা বলল, মাকদোনিয়ান পার্টি। আমার স্বামী ফিলিপ তার লিডার।

ফিলিপ বাধা দিয়ে বলল, নো। মাদার! মাদার লিডার।

নোরা বলল, হ্যাঁ। ফিলিপ এখানকার লিডার। আর আমাদের সকলের লিডার হল মা।

আমি জিগ্যেস করলাম, কার মা? তোমার, না ফিলিপের?

ওরা দুজন পরস্পরের দিকে তাকাল। তারপর কীভাবে উত্তর দেবে তার ভাষা খুঁজে না পেয়ে ভাঙা-ভাঙা ভাবে বলল, মা, সকলের মা, আমাদের প্রেরণাদাত্রী। তিনি আমাদের শিক্ষা দেন, তাই তিনি মা। সকলের মা।

ব্যাপারটা ঠিক ধরা গেল না। আমি জানতে চাইলাম, তোমাদের পার্টি কী নিয়ে আন্দোলন করছে?

এর উত্তরে ওরা যা জানাল তা শুনে আমি প্রায় স্তম্ভিত।

ফিলিপ আর নোরা দুজনেই জার্মানিতে এসেছে প্রায় তিরিশ বছর আগে, বাবা-মায়ের সঙ্গে। এখন ওরা জার্মান নাগরিক। কিন্তু এখানে বসে স্বাধীন মাকেদোনিয়ার আন্দোলন চালাচ্ছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রে ছড়িয়ে থাকা ম্যাসিডোনিয়াকে এরা আবার সংযুক্ত করবে এবং সেটা হবে একটা স্বাধীন আলাদা দেশ। এই বাড়িটা সেই আন্দোলনের কেন্দ্র। যে-সব ম্যাসিডোনিয়ান জীবিকার সন্ধানে জার্মানিতে বসতি নিয়েছে, তাদের একত্র করার কাজ চলছে। এ বাড়ির ওপরের দুটি ঘর অতিথিদের ভাড়া দেওয়া হয় এই আন্দোলনেরই টাকা তোলার জন্য। নোরা এবং আরও কয়েকজন চাকরি করে যে টাকা পায়, সবই এই কাজে ঢেলে দেয়। ফিলিপ এখানকার চব্বিশ ঘণ্টার কর্মী।

ফিলিপের গলায় যে লকেটটা ঝুলছে, তার ভেতরের ছবিটা আমি এবার চিনতে পারলাম। কোঁকড়া-কোঁকড়া চুলওয়ালা আলেকজাণ্ডারের প্রোফাইল!

একমাত্র আলেকজাণ্ডারের জন্য ম্যাসিডোনিয়ার নাম সারা পৃথিবী জেনেছিল। তারপর আর কোনও দুর্ধর্ষ বীর সেখানে আসেনি। ইওরোপ-আফ্রিকা-মধ্যপ্রাচ্যের বিশাল ভূ-ভাগেই ওই ছোট্ট দেশটির আধিপত্য শেষ হয়ে যায় কিছু কালের মধ্যেই। গ্রিকদের পর জেগে ওঠে রোমানরা। রোমান সাম্রাজ্য বিস্তীর্ণ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ম্যাসিডোনিয়ার দর্প চূর্ণ হয়ে যায় চিরতরে। রোমানদের পরে এসেছিল বাইজানটাইন ও অটোমান শাসকরা। অ্যাড্রিয়াটিক সমুদ্র থেকে মর্মর সাগর পর্যন্ত একটা রাস্তা ছিল প্রাচীন ম্যাসিডোনিয়ায়, সেই রাস্তাটা দখল করার লোভে বিদেশি শক্তি বারবার

এখানে হানা দিয়েছে।

বহুকাল ধরে যে-দেশ সামরিক শক্তিহীন ও খণ্ড-বিখণ্ড, সেই দেশকে আবার সম্পূর্ণাঙ্গ ও স্বাধীন করার স্বপ্ন দেখছে কয়েকজন মানুষ জার্মানিতে বসে!

নোরা জিগ্যেস করল, তুমি আমাদের মন্দির দেখবে?

আমি আবার অবাক হয়ে জিগ্যেস করলাম, মন্দির? কোথায়?

নোরা বলল, এই বাড়িতেই। এসো!

আমি একটা সিগারেট ধরিয়েছিলাম, সেটা দেখিয়ে বললাম, এটা নিয়ে কি যাওয়া যাবে?

ফিলিপ আমাকে ইঙ্গিতে বোঝাল সিগারেটটা শেষ করে নিতে।

দোতলার একটি দরজা খুলে দেখা গেল প্রথমে একটা ছোট্ট ঘর। সেখানে সবাই জুতো খোলে। দেয়ালে কয়েকটি ছবি।

একটি ছবির দিকে আঙুল তুলে নোরা জিগ্যেস করল, এটা কার ছবি জানো?

আমি চিনতে পারলাম না। নোরা খানিকটা গর্বের সঙ্গে বলল, অ্যারিস্টটল!

আমি কোনও ভক্তি না দেখিয়ে শুকনো গলায় বললাম, ও!

গ্রিক দার্শনিকদের মধ্যে সক্রেটিস আমার নমস্য, কিন্তু অ্যারিস্টটল আমার প্রিয় নন মোটেই। তিনি বলেছিলেন, যারা গ্রিক নয়, তাদের সকলকেই ক্রীতদাসের মতন গণ্য করা উচিত!

এরপর একটি বিরাট বড় হলঘর।

ঘরটিকে একটা মিউজিয়ামের মতন মনে হয়। সব দেওয়াল জুড়ে অনেক ছবি, এদিকে-ওদিকে বহু মূর্তি, পুরোনো আমলের বাসন-কোসন, একদিকে সাজানো রয়েছে কিছু অদ্ভুত ধরনের পোশাক।

কয়েকজন নারী-পুরুষ এক কোণে বসে কিছু জামা-কাপড় সেলাই করছে, একজন মেঝেতে কাগজ ছড়িয়ে পোস্টার আঁকছে।

দেওয়ালের ছবিগুলোর মধ্যে আলেকজান্ডারেরই তিন চারখানা। ইনিও আমার প্রিয় নন। ইতিহাসের এইসব দিগ্বিজয়ীদের নিয়ে অনেক রোমান্টিক কাহিনি তৈরি হয় বটে, কিন্তু আসলে তো এরা রক্তপিপাসু, নির্দয়, খুনি। ধ্বংসের সওদাগর। কুড়ি বছর বয়সে রাজা হয়ে আলেকজাণ্ডার এক দুর্ধর্ষ বাহিনী গড়ে তুলে ছিলেন। দুঃসাহসী ও অকুতোভয় এই ছোকরাটির পরাক্রমের তুলনা ছিল না ঠিকই, আরও কয়েকটি গুণও ছিল, যা না থাকলে নেতৃত্বই দেওয়া যায় না। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত বদরাগী, প্রচণ্ড মাতাল ও নিষ্ঠুর। মদের ঝোঁকে তিনি পার্সিপোলিস নগর পুড়িয়ে দেননি? নেশাগ্রস্ত অবস্থায় খুন করেননি অতি ঘনিষ্ঠ এক বন্ধুকে?

রাজা হওয়ার পরই আলেকজান্ডার গিয়েছিলেন ডেলফির মন্দিরে দৈববাণী শুনতে। সেখানে এক পিথিয়ান সন্ন্যাসিনী তাকে বলেছিলেন, বৎস, তুমি অজেয় হবে। তারপর বহু রাজ্য জয় করতে-করতে আলেকজান্ডারের ধারণা হয়ে গিয়েছিল, তিনি সত্যিই অজেয়, সমস্ত বিশ্ব তাঁর পদানত হবে। ক্ষমতার মদ গিলতে-গিলতে এক সময় সেই যুবকটির বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল যে তিনি সাধারণ মানুষ নন, তিনি দেবতা, তিনি জিউসের সন্তান। তেত্রিশ বছর বয়েসে তিনি এক উন্মাদ। তিনি চেয়েছিলেন, জীবন্ত দেবতা হিসেবে সবাই তাঁকে মান্য করুক। স্পার্টানরা চাপা ঠাট্টার সুরে বলেছিল, আলেকজান্ডারের যখন এতই দেবতা হওয়ার ইচ্ছে, তাহলে হোন তিনি এক দেবতা!

অতি অল্প বয়েসে সেই দেবতাটির মৃত্যু হয়েছিল অতিরিক্ত মাতলামিতে।

নোরা আর ফিলিপ আমাকে দেওয়ালের অন্য ছবিগুলো বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। সেগুলো ম্যাসিডোনিয়ার অন্যান্য বীর পুরুষ, কবি ও নাট্যকারদের। কস্মিনকালেও ওঁদের কারুর নাম শুনিনি।

আমার মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন খচখচ করছিল। যুগোশ্লাভিয়া, বুলগেরিয়া, গ্রিসের মধ্যে ছড়িয়ে আছে টুকরো-টুকরো ম্যাসিডোনিয়া, সেগুলোকে ওরা এক করবে কোন পন্থায়? ওই সব দেশ ছাড়বে কেন? এরা কি যুদ্ধ কিংবা সন্ত্রাসবাদ ছড়িয়ে ম্যাসিডোনিয়াকে স্বাধীন করতে চায়?

কিন্তু এ-প্রশ্ন করা বোধহয় আমার পক্ষে সঙ্গত নয়। আবার ওরা আমাকে স্পাই ভাববে।

যেখানে নানারকমের পোশাক ঝুলছে, সেখানে এসে নোরা বলল, এগুলো আমাদের জাতীয় পোশাক। অনেক পুরনো ছবি দেখে বানানো হয়েছে।

আরও কয়েকজন সেই পোশাক সেলাই করছে দেখে আমি জিগ্যেস করলাম, এগুলো কি বিক্রির জন্য?

নোরা ঘাড় নেড়ে বলল, হ্যাঁ। এগুলো বিক্রি করে টাকা তোলা হয়।

পোশাকগুলো নানারকম ঝলমলে রঙের। মেয়েদেরগুলো বেশ সুন্দর। একটা কিনে নিয়ে গেলে মন্দ হয় না। এদেরও কিছুটা সাহায্য করা হয়।

আমি জিগ্যেস করলাম, কত দাম?

নোরা বলল, দুঃখিত, এটা আমরা শুধু মাকেদোনিয়ানদের বিক্রি করি। আমাদের অল্প বয়েসি ছেলেমেয়েরা তো পুরোনো ঐতিহ্য ভুলে গেছে, নিজেদের ভাষা ভুলে গেছে, এখানকার উগ্র পোশাক পরে। আমরা তাদের আবার জাতীয়তাবাদের ধারায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাই। তাদের জন্য ভাষা শেখাবারও ব্যবস্থা আছে।

আধুনিক জার্মানির জীবনযাত্রার সঙ্গে মিশে গেছে যেসব ছেলেমেয়ে, তারা আবার দু-হাজার বছরের পুরোনো পোশাক পরবে, এখানকার পক্ষে সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় একটা ভাষা শিখবে, যে-দেশের অস্তিত্ব নেই, সেই দেশের জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হবে? সময়ের চাকাটাকে এরা ঘুরিয়ে দিতে চায়?

আমার মনে হল, এটা নোরা, ফিলিপ আর কয়েকজনের অলীক স্বপ্ন। অলীক হলেও নিশ্চয়ই খুব মধুর। ওরা এই স্বপ্ন নিয়ে মেতে আছে। এও এক দারুণ নেশা।

একদিকের দেয়ালের পর্দা সরিয়ে ওরা আর-একটা দরজা খুলল।

সেখানে একটা ছোট ঘর, কেমন যেন অন্ধকার-অন্ধকার, ধুলোর ধোঁয়া উড়ছে। সামনে কীসের যেন একটা মূর্তি। এক পাশের জানলার কাছে একটা চেয়ারে বসে আছেন এক বৃদ্ধ মহিলা, মুখের একটা পাশ শুধু দেখা যাচ্ছে। আমরা ঘরে ঢুকলেও তিনি মুখ ফেরালেন না।

বুঝলাম, এটাই ওদের মন্দির।

নোরা ফিসফিস করে বলল, উনি আমাদের মা। সকলের মা। উনি পৃথিবীর সবকিছু জানেন। ওঁর নির্দেশেই আমরা চলি।

ফিলিপ তার নিজের ভাষায় বৃদ্ধাকে কী যেন বলল। বৃদ্ধা মুখ না ফিরিয়ে সেই ভাষাতেই উত্তর দিলেন।

নোরা আমাকে বলল, মা তোমাকে আশীর্বাদ জানাচ্ছেন।

আমি বললাম, ওঁকে আমার নমস্কার জানিয়ে দাও!

ফিলিপ এবার সুইচ টিপে একটা আলো জ্বালাল।

আমার বুকটা ধক করে উঠল। সামনের মস্ত বড় মূর্তিটা আলেকজান্ডারের বুকেফেলাস নামে অশ্বের পিঠে চেপে আছেন সেই দৃপ্ত যুবা, হাতে তলোয়ার, মাথার পেছনে একটা জ্যোতির আভা।

অত্যন্ত সুদর্শন হলেও এ যে আর এক হিটলার! আলেকজান্ডারকে আদর্শ করে ম্যাসিডোনিয়ানরা কি আবার বিশ্বজয়ের চিন্তা করছে?

আমার মুখ দিয়ে ফস করে বেরিয়ে গেল, আলেকজান্ডারকে তোমরা সত্যিই দেবতা বানিয়ে ফেলেছ?

বৃদ্ধা এবার মুখ ফিরিয়ে পরিষ্কার ইংরেজিতে বললেন, ইনি সত্যিই তো দেবতা। ওঁর অনুপ্রেরণায় আমরা স্বাধীন মাসেদোনিয়া ফিরে পাব। তার বেশি দেরি নেই।

বৃদ্ধার মুখ শত কুঞ্চিত, মাথার চুল পাউডার পাফের মতন, কিন্তু চক্ষু দুটি উজ্জ্বল। আমার মনে হল, এঁর বয়েস দু-হাজার চারশো বছর। ইনিই সেই ডেলফির নারী পুরোহিত।

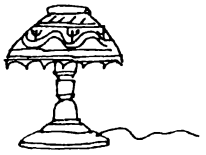

যূথপতি

দরজায় বেলের শব্দ শুনে কয়েক মুহূর্ত উৎকর্ণ হয়ে রইলেন হেমকান্তি। কে দরজা খুলবে? সাধারণত পরাণই খুলে দেয়। দ্বিতীয়বার বেল বাজবার পর হেমকান্তির মনে পড়ল পরাণ একটু আগে বাজারে গেছে। সে তো হেমকান্তিকে বলেই গেল। যখন বাড়িতে অন্য কেউ থাকে না, তখনই পোস্টম্যান কিংবা যত রাজ্যের ফেরিওয়ালা আসে, হেমকান্তিকে দরজা খুলতে যেতে হয়। আর পরাণটারও যখন-তখন বাজারে যাওয়া চাই!

খবরের কাগজ পড়ার মতন জরুরি কাজ ফেলে, চটি ফটফটিয়ে হেমকান্তি গেলেন সদর দরজার দিকে।

পোস্টম্যান কিংবা ফেরিওয়ালা নয়, মলয়।

সে একমুখ হেসে বলল, কেমন আছেন, মেসোমশাই! আপনার জ্বর হয়েছিল শুনেছিলাম।

হেমকান্তি বললেন, এখন ভালো আছি। জ্বর নেই আর।

মলয় আবার জিগ্যেস করল, রিঙ্কি নেই? ওর সঙ্গে একটা দরকার আছে।

হেমকান্তি বললেন, না, রিঙ্কি তো এখন বাড়িতে নেই!

—কোথায় গেছে? ফিরতে দেরি হবে?

—ওর মা আর ও গেছে একটা শ্রাদ্ধবাড়িতে, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরবে বোধহয়...

হঠাৎ হেমকান্তির খেয়াল হল, তিনি মলয়কে দরজার বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন! তাঁর কি ভীমরতি হয়েছে? ছি-ছি, কী কাণ্ড!

তিনি তাড়াতাড়ি বললেন, ভেতরে এসো, ভেতরে এসো, রোদ্দুরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছ কেন?

মলয়ের হাতে একটা পলিথিনের ঝোলা। মুখখানা একেবারে ঘর্মাক্ত। অসম্ভব গরম পড়েছে সকাল থেকেই।

ভেতরে এসে, বসবার ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে মলয় হাঁক দিল, পরাণ! পরাণ শোন।

হেমকান্তি বললেন, পরাণও নেই, বাজারে গেল এক্ষুনি।

মলয় বলল, মোড়ের দোকানে সিঙাড়া ভাজছিল দেখলুম। বেশ ভালো সাইজ। কয়েকটা নিয়ে এলুম।

একটু আগে পাখা ঘুরছিল, এরই মধ্যে লোডশেডিং হয়ে গেছে।

মলয় ভেতরে এসে ওপরের দিকে তাকিয়ে বলল, পাখা চলছে না?

হেমকান্তি এমন একটা মুখের ভাব করলেন, যেন লোডশেডিং হওয়াটা তারই অপরাধ। গরমের মধ্যে ঘেমে নেয়ে এসেছে মলয়, তাকে তিনি একটু বাতাস দিতে পারছেন না। বাড়িতে হাতপাখাও নেই।

খবরের কাগজটা ভাঁজ করে হাওয়া করতে-করতে মলয় বলল, ওরা আসুক, ততক্ষণ আপনি সিঙাড়া খান। গরম-গরম আছে, ঠান্ডা হলে তেমন ভালো লাগে না।

নিজেই সে ঠোঙা বার করে বলল, মেসোমশাই, এই নিন।

এখন মেসোমশাই বলে ডাকছে, আর কয়েকমাস বাদেই মলয় ওঁকে বাবা বলবে। রিঙ্কির

সঙ্গে ওর বিয়ের কথা পাকা হয়ে আছে।

বাড়িতে আর কেউ নেই, এখন হবু-জামাইকে আপ্যায়ন করার ভার সব হেমকান্তির ওপর। আর কী করবেন ভেবে না পেয়ে হেমকান্তি জিগ্যেস করলেন, তুমি জল খাবে?

মলয় বলল, না। সিঙাড়ার সঙ্গে চা হলে জমে না। পরাণ আসুক।

পরাণ যদি আসতে দেরি করে, তা হলে কি হেমকান্তিরই চায়ের জল চাপানো উচিত? সত্যিই তো সিঙাড়ার সঙ্গে চা পেলেই ভালো লাগে। হেমকান্তি জীবনে কখনও বাড়ির এই সব কাজ করেননি। রান্নাঘরের কোথায় চা-চিনি থাকে, তিনি জানেনই না।

সিঙাড়া খেলেই তার অম্বল হয়। কিন্তু মলয় আগ্রহ করে দিচ্ছে, তাতে না বলা উচিত নয়। মলয় নিজেও খেতে শুরু করেছে। হেমকান্তিও দুটো খেয়ে নিলেন। একটু পরেই বুক জ্বালা করবে।

বাথরুমে হাত ধুতে গিয়েই বেরিয়ে এসে মলয় বলল, তোয়ালে নেই। না-না, আপনাকে উঠতে হবে না, বসুন, বসুন মেসোমশাই। আমি নিয়ে আসছি।

মলয় ভেতরের ঘরে চলে গেল, নিয়ে এল একটা তোয়ালে। এ-বাড়িতে কোথায় তোয়ালে রাখা থাকে, তাও মলয় জানে।

কতক্ষণের মধ্যে রিঙ্কি আর তার মা ফিরবে, তার ঠিক নেই। এতক্ষণ মলয়ের সঙ্গে তিনি কী যে কথা বলবেন, ভেবেই পাচ্ছেন না। মলয়ের চাকরির কথা, বাড়ির কথা, সবই তাঁর জানা হয়ে গেছে।

নিজেরাই বিয়ে ঠিক করেছে, হেমকান্তিরা মেনে নিয়েছেন প্রথম থেকেই। না মানার কোনও কারণ নেই। মলয়ের চেহারা সুন্দর, স্বাস্থ্য ভালো, রেলের চাকরি করে। মলয়ের বাবা-মায়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, তাঁরাও বেশ সজ্জন, মোটামুটি অবস্থাপন্ন। সুতরাং পাত্র হিসাবে মলয় আদর্শ। জাতের অমিল আছে। কিন্তু হেমাকান্তি ওসব মানেন না।

মলয় তো যে-কোনওদিন বিয়ে করতে রাজি। কিন্তু রিঙ্কির মায়ের ইচ্ছে রেজিস্ট্রি-ফেজিস্ট্রি নয়, একটিমাত্র মেয়ে, তার ঘটা করে বিয়ে দিতে হবে। পুরোপুরি অনুষ্ঠান, শ-চারেক লোক খাওয়ানো। কিন্তু হেমকান্তির বড় শালক অনুপের হঠাৎ ক্যানসার ধরা পড়ল গত মাসে। হেমকান্তির স্ত্রী গায়ত্রী তাঁর এই দাদাকে খুব ভালোবাসে, দাদার এরকম অসুখের মধ্যে কি বাড়িতে একটা বিয়ে লাগানো যায়?

অনুপ অবশ্য বেশিদিন ভুগল না। চলে গেল। আজ তার শ্রাদ্ধ।

মামা মারা গেলে কালাশৌচ হয় না। দু-তিনমাস অপেক্ষা করার পরই বিয়েটা হতে পারবে। সামনের শীতকালেই একেবারে প্রথম দিকে হেমকান্তিরা সেইরকম ভাবেই তৈরি হচ্ছেন। ততদিনে নতুন বাড়িটাও পাওয়া যাবে।

মলয় বলল, মেসোমশাই, আপনি শ্রাদ্ধবাড়িতে গেলেন না?

হেমকান্তি বললেন, কাল অনেকক্ষণ ছিলাম। আজ আবার বিকেলের দিকে যাব। শ্রাদ্ধের ওই যজ্ঞটজ্ঞ আমার ঠিক সহ্য হয় না!

মলয় বললে, রিঙ্কির জন্য একটা নতুন ক্যাসেট এনেছি। একটু শুনবেন? বাজাব?

হেমকান্তি বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাজাও না!

হেমকান্তিদের সি আই টি রোডের পৈতৃক বাড়িটা ভেঙে বড় ফ্ল্যাট বাড়ি উঠছে। নিজের দাদার সঙ্গে শেয়ারে বাড়ি ছিল, বিক্রি করে দেওয়ার পর হাতে কিছু টাকা এসেছে, নতুন বাড়িতে একখানা বড় ফ্ল্যাটও পাবেন। তিনটে বেডরুম, ততদিন এই একটা ছোট্ট ভাড়া বাড়িতে থাকতে হচ্ছে। নীচের তলা, একটা বেডরুম, একটা বসবার ঘর, আর রান্নাঘর, বাথরুম। এই বসবার ঘরেই রাত্তিরে হেমকান্তিকে শুতে হয়। রিঙ্কি থাকে তার মায়ের কাছে। ছেলে চাকরি পেয়েছে দুর্গাপুরে, সে মাঝে-মাঝে যখন আসে, তখন আরও অসুবিধে।

বসবার ঘরটাতেই অনেক কিছু ঠাসা।

টু-ইন ওয়ানে ক্যাসেট ভরে চালিয়ে দিল মলয়। বিরাট একটা ঝনঝন শব্দ হল। ইংরেজি গান! মাইকেল জ্যাকসান না কী যেন নাম গায়কের। শুনলেই হেমকান্তির পিত্তি জ্বলে যায়। এই সব গানে না আছে সুর, না আছে ছন্দ। শুধু চ্যাঁচামেচি। অথচ রিঙ্কিরা এই সব শুনতেই ভালোবাসে। ওরা রবীন্দ্রসঙ্গীত, পল্লীগীতির ধারও ধারে না।

এখন এই গান বসে-বসে শুনতে হবে? অন্য ঘরে উঠে যাওয়ারও উপায় নেই। গায়ত্রী ফিরে এসে যদি দেখে মলয়কে তিনি একা বসিয়ে রেখেছেন, তাহলে বকুনি দিয়ে মাথা খাবে।

হেমকান্তি হাসি-হাসি মুখ করে রইল, ভেতরটা তাঁর জ্বলছে!

তিনি নিজেই অবশ্য তাঁর মনের মতিগতির ঠিক হদিশ পান না।

তাঁর মেয়ে রিঙ্কিকে যে বিয়ে করেছে, সে তো বাড়ির ছেলের মতনই হয়ে যাবে। মলয় খুব প্র্যাকটিক্যাল, এর মধ্যে একদিন ফ্রিজটা সারাবার জন্য লোক ডেকে এনেছিল। ভবিষ্যতে ওকে দিয়ে গায়ত্রীর অনেক উপকার হবে। এরা আধুনিক ছেলেমেয়ে। বিয়ের আগে থেকেই যদি পরস্পরের বাড়ি যাতায়াত করে, একসঙ্গে বেড়াতে বা সিনেমা দেখতে যায়, তাতে আপত্তির কী আছে?

রিঙ্কিও প্রায়ই যায় মলয়দের বাড়িতে। মলয় এখানে এসে প্রায়ই সন্ধ্যে কাটায়, দু-একদিন রাত্তিরে খাবারও খেয়ে যায়। কয়েক মাস আগে আর পরে। বিয়ের পরে মলয় তো এ-বাড়িতে না হোক, নতুন ফ্ল্যাটে এসে থাকবেও মাঝে-মাঝে। বাকি জীবনটার জন্য মলয় তাদের সংসারের সঙ্গে গেঁথে গেল।

হেমকান্তির তাতে বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। রিঙ্কির পছন্দের ওপর তিনি কোনওখানে হস্তক্ষেপ করতে চান না। বরং তিনি একটা বিরাট ঝামেলা থেকে বাঁচলেন। মেয়ের বিয়ের জন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে হত যদি, বারবার পাত্রপক্ষের সামনে মেয়ে দেখানো, তারপর বিয়ের জিনিসপত্র, সোনাদানা নিয়ে দরাদরি, এসব একদম পছন্দ করেন না হেমকান্তি। অথচ করতে বাধ্য হতেন। রিঙ্কি সেই গ্লানি থেকে তাঁকে বাঁচিয়েছে। গায়ত্রীও খুশি, মলয়কে তাঁর খুবই মনে ধরেছে।

এ-বাড়িতে যখন মলয় আসে, তখনি গায়ত্রী কেমন যেন বদলে যান। তখন তাঁর এবং হেমকান্তির, এমনকী পরাণেরও একমাত্র কর্তব্য শুধু মলয়কে খুশি করা। রিঙ্কিও এক এক সময় মাকে বকুনি দেয়, মা, তুমি ওকে নিয়ে এত বাড়াবাড়ি করো কেন? বেশি পাত্তা দিও না তো! অত জামাই-আদরের যুগ এখন আর নেই!

কোনওদিন একসঙ্গে খেতে বসলে গায়ত্রী হেমকান্তির তুলনায় মলয়কে বড় মাছভাজা দেবেনই। মলয়কে তিনি আরও একখানা দেওয়ার জন্য জোর করবেন, কিন্তু স্বামীর কথা তখন তাঁর মনেই থাকে না। রিঙ্কিই বলে, এ কী, বাবাকে আর-একটা দাও।

হেমকান্তি হাত গুটিয়ে বলেন, না, আমি আর খাব না রে। আমার বেশি খাওয়া ভালো নয়।

সন্ধের দিকে মাঝে-মাঝে মদ্যপানের অভ্যেস আছে হেমকান্তির। কখনও দু-একজন বন্ধুও আসে। কোনওদিন এসব ব্যাপার তিনি স্ত্রী-পুত্র-কন্যার কাছে গোপন করেননি, হবু-জামাইয়ের কাছেও গোপন করার কোনও মানে হয় না।

একদিন হেমকান্তি তাঁর বন্ধু দেবেশের সঙ্গে বসে রাম খেতে-খেতে পুরোনো আমলের গল্প করছিলেন, এমনসময় এসে পড়ল মলয়।

হেমকান্তি দেবেশের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। নিজেদের গল্প বন্ধ হয়ে গেল, অন্য কথাবার্তা শুরু হল। দেবেশই একসময় মলয়কে জিগ্যেস করল, তুমি খাও নাকি? নেবে?

মলয় হাসি মুখে তাকিয়ে ছিল হেমকান্তির দিকে।

হেমকান্তি অতিরিক্ত উৎসাহ দেখিয়ে বলেছিলেন, যদি অভ্যেস থাকে তো নাও! এই যে গেলাস! আমি এসব ব্যাপারে কিছু মনে করি না। আমার সামনে তুমি স্বচ্ছন্দে সিগারেটও খেতে পারো। আমাকে অতটা ওল্ড ফ্যাশানড মনে কোরো না।

মলয় দু-তিন পেগ খেল, একটুও বেচাল হল না, কথাবার্তাতেও বাচালতা প্রকাশ পেল না। এই তো বেশ। এতে আপত্তির কিচ্ছু নেই।

কিন্তু পরে একদিন মলয় নিজেই একটা হুইস্কির পাঁইট কিনে এনে বলল, মেসোমশাই, এটা আপনার জন্য।

সঙ্গে-সঙ্গে হেমকান্তির মনটা গুটিয়ে গেল। একেবারেই পছন্দ হল না তাঁর। হেমকান্তির কোনও বন্ধু সেদিন আসেনি, মলয়ের সঙ্গে বসে-বসে ড্রিংক করতে হবে, এই সম্ভাবনাতেই তাঁর পেটটা গুলিয়ে উঠল। আজকাল তো নাকি অনেক বাবা-ছেলেও একসঙ্গে খায়। আগেও ছিল, রাজনারায়ণ বসুর বাবা তাঁর ছেলেকে নিজের হাতে মদ ঢেলে দিতেন। তাহলে জামাইয়ের সঙ্গে বসে খেতেই বা আপত্তি কীসের? আরও অনেক লোক থাকলে তবু চলতে পারে, কিন্তু শুধু জামাইয়ের সঙ্গে বসে মদ্যপানের চিন্তাটাই হেমকান্তির অসহ্য বোধ হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, আজ শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছে, আজ আর আমি খাব না।

এক-একদিন মলয় তার দু-একজন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে আসে। তারা রিঙ্কিরও বন্ধু। তখন তাদের জন্যে বসবার ঘরটা ছেড়ে দিতে হয়। একালের ছেলেমেয়েদের বাড়ি ফেরার তাড়া থাকে না। এক-একদিন তারা রাত দশটা পর্যন্ত আড্ডা মারে। হেমকান্তি পাশের ঘরে চুপচাপ বসে থাকেন।

একদিন তিনি গায়ত্রীকে বলেছিলেন, রিঙ্কিকে ডেকে বলবে নাকি? এবার ওরা আড্ডা বন্ধ করুক। আমি ওঘরে গিয়ে শোব না? আমার ঘুম পাচ্ছে।

গায়ত্রী চোখ কপালে তুলে ধমকে বলেছিলেন, তুমি কি আক্কেলের মাথা খেয়েছ নাকি? ময়লদের চলে যেতে বলবে? ওরা গান-বাজনা শুনছে। এমন কিছু দেরি হয়নি। একদিন একটু জেগে থাকতে পারো না? তোমার আবার বেশি-বেশি ঘুম!

আগে ইলিশ মাছের পেটির মধ্যেই ডিমগুলো থাকত। এখন সবটা ডিম বার করে নিয়ে ভাজা হয়। মলয় ইলিশের ডিমভাজা খেতে খুব ভালোবাসে। ঝোলের মাছের ফাঁকা পেটির মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে হেমকান্তি ঘোরাতে থাকেন। তিনি যে ঝোলের মাছেরই ডিম পছন্দ করতেন, তা গায়ত্রী ভুলে গেছে।

মলয়ের এক দিদি-জামাইবাবু থাকে সুইডেনে, তারা বেড়াতে এসেছে কলকাতায়। জামাইবাবুর অফিসের কিছু একটা কাজও আছে দিল্লিতে। এখন কলকাতায় এসে গেল, শীতকালে আবার মলয়-রিঙ্কির বিয়েতে আসতে পারবে না। ওরা একদিন রিঙ্কিকে খাওয়াতে নিয়ে গেল পার্ক স্ট্রিটে।

সে রাতে ফিরে এসে রিঙ্কি বলল, মা, মলয়ের দিদি কী চমৎকার মানুষ তুমি ভাবতে পারবে না। আর ওর জামাইবাবুও দারুণ ভালো। ওরা একদিন তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। মলয় তোমার এত প্রশংসা করেছে দিদি-জামাইবাবুর কাছে—

গায়ত্রী বলল, ঠিক আছে, ওদের একদিন আসতে বল।

শুধু আসতে বললেই তো হয় না, নেমন্তন্ন করতে হয়। বিয়ের সময় ওরা থাকবে না, সুতরাং ভালো করে খাওয়ানো উচিত।

হেমকান্তি এলাহি বাজার করে আনলেন।

দিদি-জামাইবাবু, তাদের দুটি ছেলেমেয়ে, সেই সঙ্গে মলয়ের ছোট বোনকেও বাদ দেওয়া যায় না। এইটুকু ফ্ল্যাটে এত লোকের জায়গা হওয়াই মুশকিল। মলয় অবশ্য দিদিকে অনেকবার জানিয়েছে যে রিঙ্কিরা শিগগিরই সি আই টি রোডের নিজস্ব বড় ফ্ল্যাটে উঠে যাবে।

বসবার ঘরে জামাইবাবু, রিঙ্কি, মলয়, আর দিদির ছেলেমেয়ে দুজন। শোওয়ার ঘরে মলয়ের দিদি আর ছোট বোন। মলয়ের দিদি সত্যি এক মিনিটে মানুষকে আপন করে নিতে পারে। বিদেশে থাকো বলে কোনও অহঙ্কার নেই। গায়ত্রীর সঙ্গে তার কত গল্প।

হেমকান্তি কিছুক্ষণ বসলেন বসবার ঘরে। প্রথম দিকে সবাই তাঁকে খুব খাতির করল। তারপর তারা এমন পারিবারিক গল্পে মেতে উঠল যে হেমকান্তি তাতে যোগ দিতে কোনও উৎসাহ বোধ করলেন না। তাঁর হাই উঠতে লাগল। রিঙ্কি আর দুদিন পরেই ও বাড়ির বউ হয়ে যাবে, সুতরাং মলয়দের বাড়ির একটা পোষা কুকুর কিংবা পুরোনো রান্নার লোক সম্পর্কে চুটকি শুনতে তার আগ্রহ হতে পারে, কিন্তু হেমকান্তি এসব কতক্ষণ ধরে শুনবেন?

তিনি উঠে এলেন পাশের ঘরে।

গায়ত্রী কী যেন একটা কথা নিয়ে খুব হাসাহাসি করছে অন্য দুই নারীর সঙ্গে। মলয়ের দিদি হেমকান্তিকে দেখে সম্ভ্রমের সঙ্গে বললেন, বসুন, মেসোমশাই বসুন।

গায়ত্রী বললেন, তুমি আবার এখানে এলে কেন? মেয়েদের কথা তুমি কী শুনবে? অন্য জায়গায় যাও না।

আর অন্য জায়গা কোথায়?

বাথরুমের কাছে চিলতে বারান্দা। হেমকান্তি সেখানে এসে দাঁড়ালেন, তাঁর মুখে একবার রাগ, একবার বিষণ্ণতা ঢেউ খেলে যাচ্ছে।

একদিন ছিলেন তিনি এই পরিবারের প্রধান ব্যক্তি। একমাত্র পুরুষ। তাঁর ইচ্ছে-অনিচ্ছের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করত, তাঁর ভালো-লাগা, মন্দ-লাগার মূল্য দিত অন্যরা। এখন থেকে মলয় সেই জায়গা নিয়ে নেবে। গায়ত্রীর কাছেও তাঁর আর মূল্য নেই।

মাত্র একষট্টি বছর বয়েস হয়েছে হেমকান্তির। শরীরে কোনও স্থায়ী রোগ নেই। গায়ে জোর আছে যথেষ্ট। তবু অন্য একজন ছোকরা এসে তাঁকে বুড়োদের দলে, বাতিলের দলে ফেলে দিচ্ছে। তিনি এখন আর হেমকান্তি নামে একটি ব্যক্তিত্ব নন, তিনি রিঙ্কির বাবা!

বুনো পশুদের মধ্যে একজন থাকে যূথপতি। তাকেই সবাই মানে। সে বুড়ো হয়ে গেলে অন্য একটা জোয়ান পশুর সঙ্গে তার লড়াই হয়, একদিন, জোয়ানটা জিতে গেলে সে-ই দলপতির জায়গা নেয়, বুড়োটা দল ছেড়ে চলে যায়। মানুষের সমাজেও যে অনেকটা সে রকমই, তা এতদিন খেয়াল করেননি হেমকান্তি। মলয় তাঁর জায়গা কেড়ে নিতে এসেছে।

কিন্তু লড়াই তো হল না। হেমকান্তির গায়ে এখনও যথেষ্ট শক্তি আছে ইচ্ছে করলে তিনিও আধ বোতল মদ উড়িয়ে দিতে পারেন, অন্য মেয়ের সঙ্গে প্রেমও করতে পারেন। মলয়কে তিনি এত সহজে জায়গা ছেড়ে দেবেন কেন?

পরের মুহূর্তেই হেমকান্তির লজ্জা হল। মলয় তাঁর অতি আদরের অতি স্নেহের মেয়ে রিঙ্কির স্বামী হতে যাচ্ছে। তার সঙ্গে লড়াইয়ের প্রশ্ন আসে কী করে? তিনি কি এত স্বার্থপর হতে পারেন? রিঙ্কির যাতে ভালো হয়, সে যাতে জীবনে সুখী হয়, তা তিনি চাইবেন না।

মানুষের সমাজেও লড়াই হয়, কিন্তু বাইরে থেকে বোঝা যায় না। মলয়ের সঙ্গে তাঁর লড়াই চলছিল অনেক দিন ধরেই, হেমকান্তি কখন যে হেরে বসে আছেন, তা তিনি টেরও পাননি।

তিনি বুক খালি করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।



তিনু ও তিনি

উঠোনে পা দিয়েই বলরাম উগ্র গলায় জিগ্যেস করল, তিনু কোথা? তিনু? কোথায় গেল সেই ছোঁড়াটা?

তিনু এ-বাড়ির যেখানে সেখানে থাকে। তার নিজস্ব কোনও জায়গা নেই, রাত্তিরে শোয় রান্নাঘরের বারান্দায়, অন্য সময় সে চতুর্দিকে ঘুরঘুর করে। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। এসময় সে বাড়ির বাইরে যায় না।

দু-তিনবার হাঁক দিয়েও তার সাড়া পাওয়া গেল না।

বাইরের ঘরে তক্তাপোষের ওপর হ্যারিকেনের আলোয় পড়তে বসছে শিবু আর গৌর, এই একটা ছুতো পেয়ে তারা পড়া ছেড়ে লাফিয়ে বেরিয়ে গিয়ে তিনু-তিনু বলে চিৎকার করতে লাগল।

তিনু গোয়ালঘরে, নেই, রান্নাঘরের কাছাকাছি নেই, পুকুর ধারেও নেই। একটু আগেও সে ছিল! গৌর আর শিবু তাকে দেখেছে। কত্তা বাড়ি ফেরার সময় সে গেল কোথায়? নিশ্চয়ই আজ কিছু একটা কাণ্ড করেছে সে।

বলরাম বারান্দায় এসে চটি খুলল, ঘাড় ঘুরিয়ে বলতে লাগল, কোথায় সে? কোথায়? তাকে পাওয়া যাচ্ছে না শুনে জিগ্যেস করল, গরু বেঁধেছে? বাড়ি ফিরেছিল?

হ্যাঁ, বাড়িতে সে ফিরেছে ঠিকই। গরুটাকে গোয়ালে তুলেছে, জাবনা দিয়েছে, নিজেও ঢকঢক করে এক ঘটি জল খেল, তারপর কোথায় গেল?

বলরাম নিজের ঘরে গিয়ে ধুতি-পাঞ্জাবি ছেড়ে লুঙ্গি পরল, তারপর পুকুরে গেল হাত-পা ধুতে। জল শুকিয়ে গেছে অনেকখানি, পুকুর এখন প্রায় একটা ডোবা। ঝিঁঝি ৎ কছে তেঁতুল গাছে। ওপারে মেজো জ্যাঠার বাড়িতে হ্যাজাক জ্বেলেছে, দূরে ঘেউঘেউ করছে কয়েকটা কুকুর।

ফিরে এসে বলরাম একটা ট্রানজিস্টার রেডিও খুলে বিড়ি ধরাল। হুঁকো তামাকের পাট তুলে দিতে হয়েছে কিছুদিন আগে, বিড়িতে কম খরচ পড়ে। সন্ধের পর বাড়িতে ফিরে রেডিও শোনাই বলরামের অবসর বিনোদন। বাড়ির লোকজনদের সঙ্গে সে কথাবার্তা বিশেষ বলে না। গাম্ভীর্যই তার ব্যক্তিত্ব।

এমনই কপাল যে চার ছেলেমেয়ের মধ্যে মেয়ে দুটোই জন্মেছে আগে। অর্থাৎ শুধু খরচ আর খরচ, পাশে দাঁড়াবার কেউ নেই। এর মধ্যে আবার বড় মেয়েটি ফিরে এসেছে বিধবা হয়ে। তার বিয়ের জন্য যে জমি বিক্রি করতে হয়েছিল, তা আর ফিরে এল না।

শুধু জমির চাষে আর সংসার চালানো যাবে না। এখন সকলেরই ঝোঁক পঞ্চায়েতের দিকে। ভোটে জিতে পঞ্চায়েতের মেম্বার হতে পারলে অনেক কিছুর সুরাহা হয়। বলরাম তাই কিছুদিন ধরে পঞ্চায়েতের প্রেসিডেন্টের কাছ ঘেঁষবার চেষ্টা করছে। সে রাজনীতি বোঝার চেষ্টা করে রেডিও শুনে-শুনে! সে বুঝে গেছে যে রেডিওতে যা বলে, পঞ্চায়েত প্রেসিডেন্ট হারানবাবুর কাছে উলটো সুর গাইতে হয়। ও শালারা সব মিথ্যে কথা বলে, এ কথাটা হারানবাবুর মুখে প্রায়ই শোনা যায়।

খানিকবাদে দামিনী এসে জিগ্যেস করল, তিনু কী করেছে?

বলরাম স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাল শুধু একবার। সে কোনওরকম ব্যাখ্যা কিংবা কৈফিয়ৎ

দেওয়ার প্রয়োজন মনে করে না। হারানবাবুর বাগানে আম পাড়তে গিয়ে ধরা পড়েছিল তিনু। সেখানে প্রচণ্ড মার খেয়েছে। হারানবাবুর শখের কলমের গাছের আম। তিনি নিজে শাস্তি দিয়েছেন তিনুকে। তাতে বলরামের কোনও আপত্তি ছিল না। কিন্তু হারানবাবু জেনে গেছেন যে তিনু বলরামের বাড়িতে রাখালের কাজ করে।

এতে বলরামের ওপরেই তো সব দোষ পড়বে!

বলরাম বলল, সেটাকে পাওয়া গেল না? পালিয়েছে?

দামিনী বলল, এতক্ষণ তো ছিল না, এখন তো দেখলাম রান্নাঘরে বসে খাচ্ছে।

বলরাম সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। লুঙ্গির কষিতে শক্ত করে গিঁট বেঁধে ঘরের কোণ থেকে তুলে নিল একটা লাঠি। মজা দেখার জন্য শিবু আর গৌর আবার পড়া ছেড়ে ছুটল বাবার পেছনে।

বিধবা মেয়ে নীতার ওপরেই এখন রান্নাবান্নার ভার। রাত্তিরে সে তিনুকেই সবচেয়ে আগে খেতে দেয়। ওকে সব কিছু না দিলেও চলে। সন্ধের পর থেকেই তিনুর পেট জ্বলে খিদেয়। নীতার কাছে এসে ঘ্যানঘ্যান করে রোজ। এক কাঁড়ি ভাতের সঙ্গে একটু ডাল ও তরকারি দিলেই চলে, তরকারি না হলেও ক্ষতি নেই, তিনু ডাল-ভাতই চেটেপুটে খেয়ে নেবে।

রান্নাঘরের বারান্দায় বসে কলাইকরা থালায় ভাতের অর্ধেকটা তখন সবে শেষ করেছে তিনু। বলরামকে সদলবলে আসতে দেখেই সে কেঁপে উঠল। ভয়ে আমসি হয়ে গেল মুখ, অবশ হয়ে গেল হাত।

বলরাম কাছে এসে দাঁড়িয়ে কয়েক মুহূর্ত নিস্তব্ধ থেকে বুঝিয়ে দিল নিজের মেজাজ। তারপর ধীরস্বরে বলল, খাওয়া শেষ কর!

দ্বিতীয়বার ধমকে তিনু আবার খাওয়া শুরু করল এবং চার্লি চ্যাপলিনের ভঙ্গিতে নিমেষের মধ্যে ভাত শেষ করে ফেলল।

বলরাম বলল, হাত ধুয়ে আয়!

উঠোনের এক কোণে বড়-বড় মাটির গামলায় তিনুই জল ভরে রাখে। চটপট আঁচিয়ে সে শরীর বেঁকিয়ে দাঁড়িয়ে মিনমিনে গলায় বলল, আর করব না। কোনওদিনও।

বলরাম লাঠি দিয়ে ঠিক এক ঘা মারল তার পিঠে। খুব জোরে নয়। তার নিজের হাতে শাস্তি দেওয়া দরকার, তাই সে মেরেছে। তারপর বলল, এই দণ্ডে দূর হয়ে যা! যা, বেরিয়ে যা! কোনওদিন আর এমুখো আসবি না!

গোয়ালঘরের মধ্যে থাকে তিনুর জামা-কাপড়ের একটা পুঁটলি। ঘরটা এতই ছোট যে তার ভেতরে দাঁড়াবার জায়গাও বিশেষ নেই। গরুটার নাম তিন্নি। এ নাম তিনুই রেখেছে। অনেকে বলে তিনু আর তিন্নি ভাই-বোন। শিবুরা বলে, তিনুটা আগের জন্মে গরু ছিল।

গোয়ালের মধ্যে ভনভন করছে মশা আর ডাঁশ। তিন্নি কান লটপট করে ডাঁশ তাড়াচ্ছে। তার মাথায় হাত দিয়ে তিনু ফিসফিস করে কী যেন বলতে গেল। দরজার কাছ থেকে বলরাম ধমক দিয়ে বলল, আদিখ্যেতা করতে হবে না। বেরিয়ে আয়!

পুঁটুলিটা বুকে চেপে বেরিয়ে আসতেই বলরাম লাঠিটা উঁচিয়ে ধরে বলল, দূর হয়ে যা! আর কোনওদিন যেন তোর মুখ দেখতে না হয়! তিনু একবার শুধু শিবুর মুখের দিকে তাকাল। শিবুর কাছে সে দুটো টাকা পায়। কিন্তু সে কথা এখন উচ্চারণ করলে সে বলরামের হাতে তো মার খাবেই, পরে শিবুও তাকে মারবে।

বলরাম সকলের দিকে এমনভাবে চোখ ঘোরাল যে তাতেই বুঝিয়ে দিল, এই নিয়ে আর কোনও আলোচনার দরকার নেই।

মানুষের চরিত্র বোঝা বড় দুষ্কর। হারানবাবুকে খুশি করবার জন্য বলরাম তাড়িয়ে দিল তিনুকে, অথচ সেই হারানবাবুই দুদিন বাদে বললেন, ওহে বলরাম, তুমি নাকি তোমার বাড়ির রাখাল

ছোঁড়াটাকে বিদেয় করে দিয়েছ? আরে, না, না! আমার গাছ থেকে সে দুটো আম ছিঁড়েছিল, সেজন্য আমি তাকে শাস্তি দিয়েছি। সে-ই তো যথেষ্ট! তুমি তাকে তাড়ালে, এখন সে খাবে কী? শুনলাম তো ছোঁড়াটার বাপ নেই, মামারা খেতে দেয় না। এদের আমরা যদি একটুআধটু না দেখি, তা হলে আর কে দেখবে!

একটু থেমে আবার তিনি বললেন, ছোটবেলায় আমরাও কি অন্যের গাছ থেকে ফল-পাকড় চুরি করিনি দু-একবার? আসলে জানো কী ভায়া, দুরন্ত ডানপিটে ছেলেদের আমি পছন্দই করি। সেদিন হঠাৎ মাথায় রাগ চড়ে গিয়েছিল, আমগুলো এখনও পাকেনি, এ বছরেই প্রথম ফল এসেছে...

সুতরাং আবার ফিরিয়ে আনতে হল তিনুকে। বাড়ি ফিরে বলরাম ব্যাজার মুখে বড় ছেলেকে বলল, যা, ছোঁড়াটাকে ডেকে নিয়ে আয়। শিবু মুচকি হাসল। আসল মজার ব্যাপারটা বাবা জানে না। কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিলেও তিনু এই ক'দিন রোজই মাঠে গিয়ে তিন্নির কাছে বসে থেকেছে। শিবু মাঠে গিয়ে গরুটাকে ছেড়ে দিয়েই নিশ্চিন্ত। তিনু বিনে মাইনের, বিনে খোরাকির রাখালি করতেও রাজি। বলরামের ভয়ে সে এ-বাড়িতে আর ঢোকে না, কিন্তু সন্ধের আগে সে-ই তিন্নিকে বাড়ির দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়। তিন্নিকে ছেড়ে সে একদিনও থাকতে পারে না, ভাই-বোন যে!

খবর পেতেই তিনু তার পুঁটুলিটা বগলে নিয়ে লাফাতে-লাফাতে চলে এল। রান্নাঘরের বারান্দায় উঠে বলল, ও নীতাদি, ভাত দাও, ভাত দাও!

যেন কিছুই হয়নি এই ক'টা দিন!

রাত্তিরবেলা শিবু একবার পেচ্ছাপ করতে বেরিয়ে এসে শুনতে পায়, তিনু গোয়ালঘরের মধ্যে বসে গরুটার সঙ্গে কী সব বকবক করে চলেছে।

অনেকেই জানে, তিনু মাঠে সারাদিন তার গরুর সঙ্গে কথা বলে। বাছুরটা মারা যাওয়ায় ইদানিং দুধ দেওয়া বন্ধ করেছে তিন্নি, রোগাও হয়ে গেছে বেশ। বলরাম এক একবার গরুটা বিক্রি করে দেওয়ার কথা ভাবে। তাতে অবশ্য দামিনীর খুবই আপত্তি। কিন্তু গরু পোশার খরচও তো কম নয়। শুধু ঘাস খাওয়ালে চলে না, তেমন ঘাসই বা কোথায়? রাখালের দু-বেলার খোরাকি আর পনেরো টাকা মাইনেও তো আছে। তিনু এখন তিন্নিকে অনেকটা দূরে নদীর ধার পর্যন্ত নিয়ে যায়। সেখানে কিছু বিন্নি ঘাস আছে। অন্যের জমি থেকে চুপিচুপি ছিঁড়ে আনে কচি ধান। তিন্নির মুখের কাছে এনে বলে, খা, খা তাড়াতাড়ি খেয়ে নে!

তিন্নি মুখ দিয়ে ফ-র-র-র শব্দ করতেই তিনু তার গলকম্বলে আদর করতে-করতে বলে, ধানের মধ্যে দুধ আছে। খুব মিষ্টি না?

তিনু কখনও দূরে চলে গেলে গরুটা মুখ তুলে হাম্বা রব তোলে। সত্যিই যেন সে তিনুকে ডাকে। এক-এক সময় গাছের ছায়ায় গরুটার পাশে চিত হয়ে শুয়ে থাকে তিনু, গল্প শোনাতে-শোনাতে হঠাৎ-হঠাৎ জিগ্যেস করে, বুঝলি তো? গরুটা কান লটপটিয়ে জানিয়ে দেয়, বুঝেছি।

প্রতিদিনের জীবন থেকে অনেক গল্প খুঁজে পায় তিনু, কিন্তু শোনবার জন্য শুধু রয়েছে তিন্নি।

হারানবাবু একদিন মটোর সাইকেলে আসতে-আসতে নদীর ধারে থেমে গেলেন। সদ্য মটোর সাইকেল কিনেছেন তিনি! প্রায়ই এটা নিয়ে দাবড়ে বেড়ান। গোটা পঞ্চায়েত এলাকায় ঘুরতে তিনি যেন জমিদারি পরিদর্শনের সুখ পান। আগে ছিলেন প্রাইমারি স্কুলের কেরানি, এখন সে-কাজ ছেড়ে দিয়েছেন। পার্টি তাঁকে মদত দিচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে এম এল এ হওয়ার আশা আছে।

পাকুড় গাছের নীচে বসে-বসে জাবর কাটছে একটা গরু আর তার পাশে আছে একটি কিশোর। ছেলেটিকে চিনতে পারলেন তিনি। তাঁর সাধের গাছের দুটো আম চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল বলে খুবই রেগে গিয়েছিলেন সেদিন। বিশেষ করে কাঁচা আম ছিঁড়েছিল বলেই অত রাগ। কলমের গাছের প্রথম ফল, গোটা আষ্টেক মোটে ফলেছিল। মারতে-মারতে ছেলেটা,ক তিনি মাটিতে শুইয়ে ফেলেছিলেন।

সেজন্য আজ হারানবাবুর অনুতাপ হল। ছেলেটার জন্য কিছু একটা করা দরকার। তিনি ডাকলেন, এই, এদিকে শোন।

বছর সতেরো বয়েস। চেহারাটা মন্দ না। হারানবাবু তার আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে দেখে বুঝলেন যে হাত পায়ের গড়ন ভালো, মুখেও একটু শ্রী আছে, ভালো করে খাওয়ালে-দাওয়ালে তরতরিয়ে জোয়ান হয়ে যাবে। পড়ন্ত চাষি পরিবারে রাখালের কাজ করে। এ দেশের ভবিষ্যৎ কী? এরপর বড় জোর খেত মজুর হবে! বাবা নেই, ওর মা থাকে মামাদের কাছে, তারও নাকি শরীরে কী অসুখ বাসা বেঁধেছে, কোনও কাজ করতে পারে না, সুতরাং মামারাই বা ওকে শুধু-শুধু খেতে পরতে দেবে কেন? আজকাল কেউ দেয়?

ছেলেটার জন্য কিছু একটা করা দরকার। হাত-পাগুলো আর একটু শক্ত হলে এ ছেলে একদিন লাঠি ধরতে পারবে। লাঠি ধরতে না শিখলে কোনও ভবিষ্যৎ নেই।

তিনুর সঙ্গে কয়েকটা কথা বলে তিনি আবার মটোর সাইকেল হাঁকিয়ে রওনা দিলেন। বলরামকে ডেকে পাঠালেন পরের দিন।

প্রস্তাব শুনে বলরাম সঙ্গে-সঙ্গে রাজি।

হারানবাবুর মেয়ে-জামাই থাকে বর্ধমানে। জামাই সর্বক্ষণ রাজনীতি করে, রীতিমতন একজন পাণ্ডা। বিরোধীপক্ষের ছেলেরা তাকে একবার মারার চেষ্টা করেছিল। তাই সে সবসময় দলবল নিয়ে ঘোরে।

সেই মেয়ে-জামাইয়ের কাছে তিনুকে পাঠাতে চান হারানবাবু। আজকাল কাজের লোক পাওয়া খুব মুশকিল। গ্রাম থেকে একটা ছেলেকে পাঠাবার জন্য মেয়ে অনেকবার অনুরোধ জানিয়েছে বাবাকে। এ ছেলেটা বর্ধমানে গিয়ে কিছুদিন ফাই-ফরমাস খাটুক। তারপর আর একটু বয়েস বাড়লে জামাই ওকে বডিগার্ড করে নিতে পারবে! বর্ধমানে গেলে ওর রোজগার হবে অনেক বেশি, অসুস্থ মায়ের জন্য টাকা পাঠাতে পারবে নিয়মিত, নিজেরও একটা সুরাহা হবে। শুধু-শুধু এখানে রাখালি করে মরতে যাবে কেন?

হারানবাবু এ প্রস্তাবটা শোনালেন আরও পাঁচজনের সামনে। প্রত্যেকেই বলল, ওই রাখাল ছোঁড়ার জন্য এমন ভালো ব্যবস্থা আর হতে পারে না। হারানবাবুর দয়াতেই ছেলেটার একটা হিল্লে হবে।

বলরাম বলল, আমিও গরুটাকে বেচে দেওয়ার কথাই ভাবছিলাম। তখন আর ওকে রাখতামই বা কী করে?

মার খেয়েও কক্ষনও কাঁদে না তিনু। কিন্তু এবার সে বলরামের পা জড়িয়ে হাপুস নয়নে কাঁদতে লাগল। বলরামের কাছ থেকে সে দামিনীর পায়ে মাথা কোটে। দামিনীর মনটা একটু নরম, অভাবের সংসারে নিজেদের যেমন চলে যাচ্ছে, কোনওক্রমে, এ ছেলেটারও একটা পেট চলে যেত। গরু দেখা ছাড়াও আরও অনেক কাজ করে। এরপর তিন্নিকে দেখবে কে?

বলরাম অনড়। হারানবাবুকে সে খুশি করতে চায় তো বটেই, তা ছাড়াও আর গরু পোষার দম তার নেই। পঞ্চায়েতে ঢুকতে পারলে যদি কিছু অবস্থা ফেরে, তখন না হয় আবার গরু কেনা যাবে!

দামিনী বলল, ছেলেটা তিন্নিকে বড় ভালোবাসে!

বলরাম ধমক দিয়ে বলল, ন্যাকামি কোরো না! মানুষের ভালোবাসারই এখন কোনো দাম নেই তো গরু!

পালিয়ে গিয়েও নিষ্কৃতি পেল না তিনু। হারনবাবুর প্রচুর লোকবল, তারা বেড়াজালের মতন ঘিরে তিনুকে ছেঁকে তুলল। তিনুকে যেতেই হবে।

তিনু দুঃখের কথা আর কাকেই বা বলবে, তিন্নিকে ছাড়া? তার মা, তার মামারা, এ বাড়ির

লোকেরা সবাই চায় সে কোন অচেনা দূর জায়গায় চলে যাক। সে এখানে বেশ ছিল, তার তো কোনও অভাব ছিল না! সে আর কারুর বাগান থেকে ফলও চুরি করেনি, তবু কেন তার এই শাস্তি!

গভীর রাতে গোয়ালঘরে ঢুকে তিন্নির গায়ে হাত বুলোতে গিয়ে সে কেঁদে ফেলল। ফোঁপাতে-ফোঁপাতে বলতে লাগল ওরে তিন্নি, আমি চলে যাচ্ছি! তুই একা থাকতে পারবি?

আজ আর তিন্নি ফোঁস করে নিশ্বাসও ফেলছে না, কানও লটপট করছে না। মুখ ফিরিয়ে তাকালও না একবার। একটু বাদে তিনু খেয়াল করল যে তিন্নি তার কথা শুনছে না, ঘুমিয়ে পড়েছে!

পরদিন সকালে শিবু মাঠে নিয়ে গেল তিন্নিকে, তিন্নি একটুও আপত্তি করল না। তা হলে সে কি কিছুই বুঝতে পারছে না। তিনু তার পিছু-পিছু গেল খানিকটা, শিবু তাড়া দিয়ে বলল, এই, তুই আসছিস যে! তোকে তৈরি হতে হবে না?

সকাল ন'টার মধ্যে হারানবাবুর ভাই সনাতন এসে হাজির হল। সে তিনুকে পৌঁছে দেবে বর্ধমান। এখান থেকে মাইলতিনেক হাঁটা পথ, তারপর বাস রাস্তা। হারানবাবু এক সেট জামা-প্যান্ট পাঠিয়েছেন ওর জন্য।

গ্রামের প্রান্ত ছেড়ে দূরে চলে যাচ্ছে তিনু আর বারবার পিছু ফিরে তাকাচ্ছে। তিন্নি কি কিছুই বলল না। এতদিন ধরে সে এত গল্প বলছে, তাও শোনেনি? এর আগে তিন্নি কতবার তাকে ডেকেছে, তার গায়ে মাথা ঘষে আদর করেছে।

একটু পরে তিন্নির নিশ্চয়ই খেয়াল হবে। তার বদলে শিবু। তিনুকে ছেড়ে তিন্নি একদিনও থাকেনি।

হঠাৎ মনে পড়ল, তিন্নি ছুটে আসছে তার দিকে। দূরের রাস্তায় ধুলো উড়ছে। তার মধ্যে দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে কে? আসছে, আসছে, তিন্নিই আসছে তার জন্য।

তিনু দাঁড়িয়ে পড়তেই সনাতন তার হাত চেপে ধরল। জোর করে হাত ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে তিনু চেঁচিয়ে উঠল, তিন্নি!

ধুলোর ঝড়ের মধ্যে বিরাট আওয়াজ তুলে ছুটে এল একটা লরি। তার ওপরে গাদাগাদি করা দশ-বারোটা গরু বাঁধা। ওদের মধ্যে তিন্নি আছে কি না তা চেনবার আগেই লরিটা তিনুকে ছাড়িয়ে পার হয়ে গেল।



মৃত্যুদণ্ড

অনেকের কাছে মনে হবে, লোকটির অপরাধ অতি সামান্য। কিন্তু রাগে আমার গা জ্বলে গিয়েছিল!

ট্রেনে যাচ্ছিলাম হাজারিবাগ। রাত্তিরের ট্রেন, তেমন কিছু ভিড় নেই। কামরাটি মোটামুটি পরিচ্ছন্ন, আলোর জোর আছে। বই পড়া যাবে, সুতরাং যাত্রাটা বেশ আরামদায়কই হওয়ার কথা।

ট্রেন ছাড়ার আগে একটা ব্যাপার নিয়ে গোলমাল চলেছিল খানিকক্ষণ, ওপরের মালপত্র রাখবার জায়গায় একজন যাত্রী এক গাদা কাপড়ের গাঁঠরি রেখে সব জায়গাটা ভরে ফেলেছে। অন্য যাত্রীরা মালপত্র রাখার একটুও জায়গা পাচ্ছে না। একজন লোক এত বেশি মালপত্র এনে

এতখানি জায়গা দখল করবে কেন? এই নিয়ে কয়েকজন রাগারাগি করতে লাগল।

সেই যাত্রীটি ধুতি ও সাদা শার্ট পরা। মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, সে একগুঁয়ের মতন একটা মালও নামাল না, বারবার হিন্দিতে বলতে লাগল, আমি আগে এসেছি, মালপত্র রাখার জায়গায় কি রিজার্ভেশন থাকে?

কেউ-কেউ পালটা যুক্তি দিয়ে বললে বেশি মালপত্র থাকলে লাগেজ ভ্যানে বুক করা নিয়ম। কিন্তু লোকটি এসব কথায় কানই দিল না।

লোকটিকে দেখলে মনে হয়, ছোটখাটো কাপড় ব্যবসায়ী, গাঁঠরিগুলোতে সে ধুতি শাড়ি নিয়ে চলেছে। আমি একা, সঙ্গে ছোট একটা ব্যাগ, সেটা সিটের নীচেই রাখা যায়, আমার কোনও অসুবিধে হয়নি।

সুতরাং আমি ওই ঝগড়ার মধ্যে মাথা না গলিয়ে চুপচাপ শুনে চললাম।

ট্রেন চলতে শুরু করতেই অবশ্য আস্তে-আস্তে সব থেমে গেল। অন্যদের সুটকেস বেডিং কোনওরকমে অন্য জায়গায় ঠেসে ঠুসে দেওয়া হল। দু-একজন একটুক্ষণ রাগে গরগর করে কয়েকটা বাঁকা-বাঁকা কথা বলল। কিন্তু সেসব ওই গাঁঠারিওয়ালার গায়ে বিঁধছে বলে মনে হল না।

বেশ ঝলমলে রঙের ছাপা শাড়ি পরা এক মহিলা জানলার ধারে বসে আগাগোড়া তাকিয়েছিল বাইরের দিকে, ঝগড়ার সময় একবারও মুখ ফেরায়নি। তার উলটো দিকের জানলার পাশেই রয়েছে কাপড়ের ব্যবসায়ীটি। কিছুক্ষণ বাদে ঝুঁকে পড়ে সে মহিলাটির সঙ্গে কিছু একটা কথা বলতেই বোঝা গেল, ওরা স্বামী-স্ত্রী।

আগেভাগে স্টেশনে এসে ওরা শুধু ওপরের তাক মালপত্র বোঝাই করেনি, ভালো-ভালো দুটি বসবার জায়গাও দখল করেছে।

যখনকার কথা বলছি, তখন সেকেন্ড ক্লাসকে বলা হতো থার্ড ক্লাস। সেই থার্ড ক্লাসের বেশ কিছু কামরায় সিট রিজার্ভেশনের কোনও বালাই ছিল না। যার যেমন খুশি বসে পড়ত। কেউ-কেউ বিছানা পেতে ফেলে অনেকটা জায়গা নিয়ে নিত।

মহিলাটির মাথায় ঘোমটা দেওয়া। সর্বাঙ্গে ঢাকাঢুকি দেওয়া থাকলেও বোঝা যায় শরীরের গড়নটি বেশ ভালো।

আমি বসেছি তার ঠিক পাশেই। মহিলাটির মুখ দেখার জন্য যে-কোনও পুরুষেরই কৌতূহল হবে।

দেখাও গেল। ঘি-এর মতন রং, টানাটানা চোখ, নাকটিও চোখা। সুন্দরীই বলা যায়। খোঁচা-খোঁচা দাড়িওয়ালা কাপড়ের ব্যবসায়ীটির স্ত্রী একেবারেই মানায় না।

তবে, মহিলাটির নাকে একটা বড় নোলক, চুল তেল জবজবে, মুখ থেকে গ্রাম্যতার ছাপ একটুও মোছেনি। হয়তো বিহারের কোনও প্রত্যন্ত গ্রামের মেয়ে, কিংবা উত্তর প্রদেশের। এইসব গ্রামের কোনও মেয়ে যদি হঠাৎ খুব সুন্দরী হয়ে যায়, তাহলে শহরের কেউ-না-কেউ টাকার জোর দেখিয়ে তাকে বিয়ে করে নিয়ে যাবেই।

কোনও ভালো জিনিসই গ্রামের জন্য নয়। গ্রামের ভালো-ভালো তরি-তরকারি মাছ মুরগি যেমন শহরে চালান হয়ে যায়, তেমনি সুন্দরী মেয়েরাও চালান হয়ে যাবে, এতে আর আশ্চর্য হওয়ার কী আছে?

কাপড়ের ব্যবসায়ীটি অত কাপড় সঙ্গে নিয়ে চলেছে, কিন্তু নিজের পোশাক বেশ মলিন। বউটির শাড়িটি খুব দামি না হলেও তার রঙের উজ্জ্বলতা চোখ টানে। তার গায়ের রঙের সঙ্গে বেশ মানিয়েছে।

কিছুক্ষণ বাদে স্বামীর নির্দেশে বউটি তার পাশ থেকে একটা পুঁটুলি বার করে সেটা খুলল।

আমি যদিও একটা বই খুলে পড়ছি, কিন্তু মাঝে-মাঝে পাশের দিকে চোখ চলে যাচ্ছে। বইটি বেশ কঠিন, জেমস জয়েসের ইউলিসিস। আগে যতবার পড়তে শুরু করেছি, শেষ করতে পারিনি। তাই সেবারে ঠিক করেছিলাম, সঙ্গে আর কোনও বই রাখব না। যাওয়া আসার ট্রেন যাত্রায় বইটি শেষ করতেই হবে। কোনও একটা বই, ভালো জেনেও অর্ধসমাপ্ত রাখা তো কাপুরুষতা।

তখন আমার বয়েস সাতাশ। পাশে একজন সুন্দরী রমণী বসে থাকলে নীরস ছাপার অক্ষরের দিকে বেশিক্ষণ মনসংযোগ রক্ষা করা সম্ভব নয়।

পুঁটুলির মধ্যে একটা বড় সাইজের টিফিন কৌটো। তাতে রয়েছে দিস্তেখানেক পরোটা, কালো-কালো রঙের কী একটা তরকারি, অনেকখানি আচার আর গোটা কয়েক লাড্ডু।

মাত্র সাড়ে সাতটা বাজে, এর মধ্যেই খাওয়া শুরু করেছে।

আমার ও কামরার অনেকের কাছ থেকে রেলের কেটারার খাবারের অর্ডার নিয়ে গেছে। আমাদের খাবার দেবে আসানসোলে। সওয়া ন'টায়। তার আগে রাত্তিরের খাওয়া আমার অভ্যেস নেই।

ওরা স্বামী-স্ত্রী দিব্যি তৃপ্তি করে খাচ্ছে। মাঝে-মাঝে ফিসফিস করে অতি দুর্বোধ্য হিন্দিতে কী সব বলছে, তা আমার বোধগম্য হচ্ছে না।

বউটি দু-একবার তাকাল আমার দিকে।

আমার মনে হল, ওরা বোধহয় ওদের খাবার থেকে আমাকে কিছুটা দিতে চায়। সহযাত্রীদের প্রতি অনেকেই এরকম ভদ্রতা করে।

আমি জোর করে বইয়ে চোখ সেঁটে রইলাম। অন্যের খাবারের দিকে তাকানো মোটেই ভদ্রতাসম্মত নয়। ওরা আমাকে কিছু দিতে চাইলেই আমি সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করব। অন্যের খাবারে ভাগ বসাতে যাব কেন? তাছাড়া ঠান্ডা পরোটা কিংবা লাড্ডু আমার একেবারেই পছন্দ নয়।

কিন্তু ওই খাবারের দিকে তাকায়েই আমার জিভে জল এসে গেছে। গ্রামের লোকদের আমের ঝাল-ঝাল আচার অতি চমৎকার যে। আচার দেখলে আমি কিছুতেই লোভ সামলাতে পারি না। ওরা যদি খুব পীড়াপীড়ি করে তা হলে খানিকটা খাবারের সঙ্গে এক টুকরো পরোটা আমি চেখে দেখতে পারি। কিংবা শুধু খাবার।

শেষপর্যন্ত ওরা অনুরোধ করলই না। সব খাবার চেটেপুটে খেয়ে শেষ করলেন দুজনে।

বউটি বর্তন ধোওয়ার জন্য চলে গেল বাথরুমের দিকে।

এতে আমার মনে একটা ক্ষোভ জন্মানো স্বাভাবিক। আমাকে পরোটা লাড্ডু প্রত্যাখানের সুযোগও দিল না! কিংবা, ওদের আচার চেখে দেখে কত প্রশংসা করতাম, তা থেকে ওরা বঞ্চিত হল!

অন্য কোনও লোকের সঙ্গে ভাব জমাবার ওদের কোনও ইচ্ছেই নেই।

তার জন্য ওদের দোষ দেওয়া যায় না। প্রথমেই কামরার কিছু লোকের সঙ্গে ঝগড়া করে এখন ওরা কোণঠাসার মতন আচরণ করতেই পারে। কিংবা হয়তো ওদের নতুন বিয়ে হয়েছে, নিজেদের নিয়ে মত্ত থাকতে চায়।

বউটির সঙ্গে স্বামীটির বয়সের অনেক তফাত, স্বামীটির বয়েস অন্তত ডবল। প্রৌঢ়স্য তরুণী ভার্যা। কাপড়ের ব্যবসায়ীটি নির্ঘাত টাকার জোরেই তরুণীটিকে বিয়ে করেছে। গ্রামে তো এরকম হয়ই।

কিছুক্ষণ বাদে আমাদের কামরায় উঠল একজন ভিখিরি গায়ক।

রাত্তিরের দিকে সাধারণত ভিখিরির উৎপাত কম থাকে। অনেকে ট্রেনে ওঠার পর থেকেই ঘুমের উদ্যোগ করে। এসময় ভিখিরিরা পাত্তা পায় না।

কিন্তু এই ভিখিরিটির বয়েস কুড়ি-একুশ, খালি-গা, মালকোচা মেরে ধুতি পরা। হাতে একটা

বাঁশি। ঠিক যেন রাখাল-বেশি কেষ্টঠাকুর।

উঠেই ছেলেটি একটি গান ধরল। পরিষ্কার চাঁছাছোলা গান। গলায় তেজ আর সুর দুটোই আছে। ছেলেটি যেন জানে, ওর গান শুনলে কেউ আপত্তি জানাতে পারবে না।

তখন আর ছেলেটি ভিখিরি রইল না।

সে একজন গায়ক। রেডিও বা রেকর্ড কোম্পানি তাকে চেনে না। পাড়ার জলসায় সে ডাক পাবে না। সেইজন্য সে ট্রেন যাত্রীদের গান শোনাচ্ছে। গান গাওয়াটাই তার জীবিকা। গানের পরে সে যখন লোকের কাছে পয়সা চাইবে, সেটা ভিক্ষে নয়, সেটা তার পারিশ্রমিক।

পরপর তিনটে গান শোনাল ছেলেটি।

সত্যিই সে ভালো গায়। চলন্ত ট্রেনে খুব চেঁচিয়ে গাইতে হয় বলে অনেকেরই গলা ভেঙে যায়। এর এখনও ভাঙেনি। অল্প বয়েস।

তিনখানা গান গেয়ে সে যখন থামল, তখন কেউ-কেউ তাকে আরও দু-একটা গানের ফরমায়েস করল।

ছেলেটির কোনও আপত্তি নেই। যে-যা বলে, সে গেয়ে দেয়।

কাপড় ব্যবসায়ীটিও একটা বিশেষ হিন্দি গান গাইবার জন্যে অনুরোধ করে বসল।

কাপড়ের ব্যবসায়ীটি যে গান-বাজনার সমঝদার তা তো তার চেহারা দেখে বোঝা যায়নি!

দিব্যি তাল দিতে লাগল মাথা নেড়ে। একটা গান শেষ হওয়ার পর অনুরোধ জানালো আর একটার জন্য। সেটা শুনতে-শুনতে যেন আবেশে বুঁজে গেল তার চোখ।

এতগুলো গান গাইবার পর ছেলেটি হাত পাতলো অন্যদের সামনে।

অনেকেই কিছু-কিছু দিল। আমি তখন কাঠ-বেকার, আমি সাধ্যের অতিরিক্ত দুটি টাকা দিলাম তাকে। ছেলেটি সত্যিই ভালো গেয়েছে।

কাপড়ের ব্যবসায়ীটি যে চোখ বুঁজেছে, চোখ আর খোলেই না।

ছেলেটি তার সামনে হাতের পয়সা ঝনঝন করল, দু-তিনবার দাদা, দাদা বলে ডাকল, তাতে কোনও সাড়া নেই। লোকটি এর মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছে, এটা অসম্ভব। মটকা মেরে আছে। একটাও পয়সা দেবে না।

ছেলেটি কিছু না পেয়েই চলে গেল!

আমি স্তম্ভিত!

গান শুনেও অনেকে পয়সা দেয় না, তা ঠিক। কেউ-কেউ ভিখিরি বা কোনও কারুকেই পয়সা দেয় না, সেটাও তাদের ব্যক্তিস্বাধীনতার ব্যাপার। কিন্তু এই লোকটা গান শোনার জন্য অনুরোধ জানালো কেন? তাও কিছু দক্ষিণা দেবে না গায়ককে? লোকটা মহা ফেরেববাজ তো।

এরকম লোক আমি দেখিনি। কেমন যেন গা ঘিনঘিন করতে লাগল আমার। মানুষ এমন হীন হয় কেন? কাপড়ের ব্যাবসা করছে, ওই ছেলেটিকে কি অন্তত একটা আধুলিও দিতে পারত না?

আমার খুব রাগ হচ্ছে বটে কিন্তু তা নিষ্ফলা রাগ। কেউ যদি ভিখিরিকে ভিক্ষে না দেয় কিংবা কারুর গান শুনেও পয়সা দিতে না চায়, তার জন্য কোনও অভিযোগ জানানো যায় না। জোর করে ওকে দিয়ে পয়সা দেওয়ানোও যায় না।

গুম মেরে বইতে চোখ ফেরালাম।

কেটে গেল বেশ কিছুক্ষণ। অনেকেই ঘুমে মন দিয়েছে। নিস্তব্ধ হয়ে এসেছে কামরা। আমার চোখে ঘুম নেই।

হঠাৎ আমার কাঁধে কেউ রূঢ়ভাবে একটা ধাক্কা দিল।

সেই কাপড় ব্যবসায়ী। সে বেশ অভদ্রভাবে বলল, আপ জেরা হট যাইয়ে!

লোকটির স্ত্রী ঘুমের ঘোরে আমার কাঁধে দু-একবার মাথা ছুঁইয়েছে। আমি একটু-একটু সরে-সরে বসলেও এ পাশে আর জায়গা নেই। ওকে ঘুম থেকে জাগিয়েও দেওয়া যায় না। ঘোমটাপরা একটা মাথা দু-একবার আমার কাঁধে লাগালেও মহাভারত এমন কিছু অশুদ্ধ হয়ে যায় না।

আমি কটমট করে লোকটার দিকে তাকালাম।

লোকটি এর পরেও বলল, আপ ইধার উঠকে আইয়ে!

ইচ্ছে হল ঠাস করে ওর গালে একটা চড় কষিয়ে দিই।

কিন্তু কিছু একটা গোলমাল করলে আমারও বিপদ হবে, যদি লোকটা দুম করে বলে বসে যে আমি ওর যুবতী বউয়ের গায়ে ইচ্ছে করে হাত দিয়েছি?

আমার প্রতিবাদ কেউ বিশ্বাস করবে না। মেয়েদের দিকেই সকলের সহানুভূতি থাকে। আমার বয়সটাই দায়ী হবে।

লোকটি আবার ওই কথা বলতেই আমি উঠে দাঁড়ালাম, অন্য কেউ যেন কিছু শুনতে না পায়। জায়গা বদলাবদলি করলাম লোকটার সঙ্গে।

অপমানে আমার গা শিরশির করছে। কোনও দোষ করিনি, তবু লোকটা আমার সম্বন্ধে বিশ্রী সন্দেহ করেছে।

লোকটা এখনও তাকিয়ে আছে আমার দিকে। ও শুধু একটা স্বার্থপর, কৃপণ চশমখোরই নয়, অতিশয় সন্দেহপ্রবণ, অভদ্র, অনেক কিছু।

আমি বললাম, হারামজাদা! যদি আমার একটা রিভলভার থাকত, তোকে গুলি করে মেরে ফেলতাম। তোর মতন নরকের কীটের বেঁচে থাকার দরকার কী?

মনে-মনে! মনে-মনে ছাড়া আর কী? কোনওদিনই আমার কাছে রিভলভার থাকবে না। দৈবাৎ কখনও হাতে নিলেও গুলি করতে পারব না। যারা অনায়াসে মানুষ মারতে পারে, তাদের মনের গঠনটাই অন্যরকম হয়।

আমি শুধু মনে-মনেই এরকম গজরাতে-গজরাতে বহু লোককে শাস্তি দিই।

কিছুতেই জেমস জয়েসে আর মন বসল না। এক সময় ঘুম এসে গেল। বই খসে পড়ে গেল হাত থেকে।

শেষরাতের দিকে ঘুম ভাঙল আবার। ট্রেন থেমে আছে কোনও একটা বড় স্টেশনে, বোধহয় ধানবাদ।

সেই কাপড়ের ব্যবসায়ী ও তার স্ত্রী নেমে যাচ্ছে এখানে। কুলি এসে নামাচ্ছে কাপড়ের গাঁঠরিগুলো। আমি ভাবলাম, যাক, আপদ বিদায় হল।

ঘোমটা দেওয়া বউটি যাওয়ার আগে এক ঝলক তাকাল আমার দিকে। সেই দৃষ্টিতে কিছু একটা ছিল। হয়তো সে তার স্বামীর দুর্ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চাইছে। কিন্তু মুখে কিছু বলল না, কী করে এসব কথা বলতে হয়, তা জানে না।

ওই দৃষ্টিটার জন্যই মেয়েটির মুখ আমার মনে গেঁথে গেল।

দিনতিনেক বাদে ফিরলাম হাজারিবাগ থেকে। ওই একই ট্রেনে।

ট্রেন ধানবাদ স্টেশনে অনেকক্ষণ দাঁড়ায়।

প্ল্যাটফর্মে এক জায়গায় ছোটখাটো একটা ভিড়। সেখানে কেউ চিৎকার করছে, অন্যরাও গলা মিলিয়েছে তার সঙ্গে। প্রথমেই মনে হয়, কারুর কোনও জিনিস চুরি গেছে। এরকম তো প্রায়ই হয়।

নেমে উঁকি মেরে দেখি, কান্নাকাটি করছে একজন মহিলা। সাদা শাড়ি পরা। মাথায় ঘোমটা নেই, সব চুল খোলা!

ভিড়ের একজনের দিকে তাকাতেই সে বলল, ও বেচারার স্বামী কাল হঠাৎ মরে গেছে।

হার্ট ফেল। বেচারার আর কেউ নেই এখানে!

আমার বুকের মধ্যে যেন একটা গুলি লাগল।

এখন মুখখানা অন্যরকম দেখালেও এ যে সেই কাপড়ের ব্যবসায়ীর স্ত্রী, তাতে কোনও সন্দেহ নেই!

বউটি একবার চোখ তুলে আমাকে দেখেই যেন থেমে গেল কয়েক মুহূর্তের জন্য।

ধরা পড়া চোরের মতন ভয়ে কেঁপে উঠলাম আমি। আমাকে চিনতে পেরেছে? ও কী বুঝতে পেরেছে যে আমিই ওর স্বামীকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলাম!

ওর স্বামীটি ছিল নিতান্তই চুনোপুঁটি। ওর অপরাধ এমন কিছু গুরুতর নয়। আমি কি সত্যি-সত্যি ওকে মারতে চেয়েছিলাম? আরও কত বড়-বড় রাঘব বোয়াল কতরকম জঘন্য অন্যায় করে দাপটে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কত সময় আমি মনে-মনে তাদের কঠোর শাস্তি দিই, কিন্তু তাদের তো কিছু হয় না!

দ্রুত পালিয়ে গেলাম সেখান থেকে। যেন আমারই একটা কঠিন শাস্তি প্রাপ্য।



ঘড়ি

আমার হাত ঘড়িটা কে চুরি করেছে, আমি জানি না। বেশি রাত্তিরে বাড়ি ফিরছিলাম চোখে একটু ঘোর ছিল, দোতলা বাসে জানালার পাশে বসতে পাওয়া তো বিরাট সৌভাগ্য, সেইসঙ্গে ঠান্ডা হাওয়া—ঘুম আসবে, তাতে আশ্চর্য কী! তা ছাড়া, বাসে ঘড়ি পরে ঘুমানো তো অন্যায় নয়।

ঘুম ভাঙল যখন অন্ধকার, বাস ডিপোতে এসেছে। খারাপ লাগল না, একটা সিগারেট ধরালাম। বাসে বসে সিগারেট টানাও তো বেশ মজার। সময় দেখতে গিয়ে টের পেলাম আমার কবজিতে কোনও বন্ধন নেই। ঘড়িটা কেউ খুলে নিয়ে গ্যাছে।

নেমে এলাম, কিছু-কিছু কন্ডাকটর, ডিপোর ওয়াচ অ্যান্ড ওয়ার্ড বিভাগের লোক কিছু ছিল, বেশ চেঁচামেচি করলাম, পৃথিবীর সবাইকে চোর বললাম। একজন বলল, আমার হাতে কোনও ঘড়িই ছিল না, ওটা আমার ভুল ধারণা। কিন্তু আমার লোমশ হাতে ঘড়ি পরার ফলে একটা দাগ হয়ে আছে, সেই হাত ওদের মুখের সামনে তুলে ধরলাম।—আপনার ঘড়ির নাম কী?

—ঘড়ির আবার নাম থাকে নাকি?

—থাকে না? কোন কোম্পানির ঘড়ি?

আশ্চর্য, কোনও ঘড়ির কোম্পানির নাম সেই মুহূর্তে আমার মনে পড়ল না। নাইজিরিয়ার প্রেসিডেন্টের নামও আমার মনে আছে, কিন্তু ঘড়ির নাম মনে নেই। নতমুখে চলে এলাম।

ঘড়িটা হারিয়ে আমি খুশিই হয়েছিলাম বলা যায়। আমি একধরনের সময়ের বিড়ম্বনা থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছি। শরীর মন সবই এখন হালকা। তবে রাস্তাঘাটে অন্য কারুর হাতে ঘড়ি দেখলেই আমি আড়চোখে তাকাই। এদের যে কেউ একজন আমার হাতঘড়িটা পরেছে হয়তো। হয়তো সবাই চোর নয়, কিন্তু চোরাই জিনিস, সেকেন্ড হ্যান্ড কিনতে তো কারুর আটকায় না। আমি মনে-মনে বলি, বুঝবে মজা, আমার ঘড়ি হাতে দেওয়ার ফলে সময় তোমাকে চরকি বাজিতে ঘোরাবে!

তারপর, একদিন, একটা রেস্তোরাঁয় ঘণ্টাখানেক বসার পর বাথরুমে গেছি, ঢুকেই দেখি

মাটিতে একটা ঘড়ি পড়ে আছে। কী সাংঘাতিক সেটা, সবুজ ডায়াল, লেখাগুলো জ্বলজ্বল করছে, ব্যান্ডটা মনে হয় সোনার। একটা দুর্লভ মূল্যবান টোপ। ঘড়িটা যেন সাপের মতো আমার দিকে তাকিয়ে আছে। বুকের মধ্যে টিপটিপ করছে আমার, বন্ধ বাথরুমের মধ্যে আমাকে কেউ দেখবে না, কোনও সাক্ষী নেই। কিন্তু ওইটুকু ছোট্ট বন্ধ ঘরে নিজেকে বিষম দেখা যায়, আমি দারুণ ভয় পেয়ে গেলাম, পেচ্ছাপ না করেই দৌড়ে পালিয়ে এলাম! সঙ্গিনী জিগ্যেস করল, কী হয়েছে কী?

—বুক কাঁপছে?

—কেন?

—বুকের দোষ।

বেয়ারাকে বিল আনতে বলেছি, ট্রেতে করে সে নিয়ে এল সেই ঘড়ি। জিগ্যেস করল, সাব, ইয়ে আপকা হ্যায়? বাথরুমমে—

সবুজ সাপের মতন সেই ঘড়িটা দেখছে আমাকে। এখানে অনেক মানুষ আমাকে দেখছে। আমি নিজেকে নিজে দেখতে পাচ্ছি না। গম্ভীরভাবে বললাম হ্যাঁ, এটা আমার। সঙ্গে-সঙ্গে সেটা তুলে নিয়ে বেয়ারাকে প্রচুর বকশিশ দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম সেখান থেকে। সঙ্গিনী ক্রুদ্ধভাবে জিগ্যেস করল, এর মানে কী, আমি আগে জানতে চাই। যা তোমার নয়—

—হ্যাঁ, এটা আমারই।

—তোমার হাতে ঘড়ি ছিল না।

—এই ঘড়িটা আমার নয়! কিন্তু এ আমার জন্য দুঃসময় নিয়ে এসেছে। সেই দুঃসময়কে আমি...ঘড়িটা আমি অত্যন্ত জোরে ফুটপাতে আছড়ে ফেললাম। টুকরো-টুকরো হয়ে সেটা ছিটকে ছড়িয়ে গেল। এখন থেকে সময় আমার কাছে স্থিরমুহূর্ত!



বাবা

বাইরের ঘরের জানলা দিয়ে সকালবেলা বেশ সুন্দর রোদ্দুর আসে। ওটাই বসবার ঘর, আর ওটাই ছেলেমেয়েদের পড়বার ঘর। সকালবেলা হঠাৎ কোনও অতিথি এসে গেলে মুশকিল হয়, ছেলেমেয়েদের পড়াশুনোর মাঝখানেই অতিথিকে বসিয়ে কথা বলতে হয়। নিতু, সিতু, মাস্তুরা এই জন্য রাগ করে।

শীতকালে ওই সিল্কের চাদরের মতন রোদটা উপভোগ করবার জন্য জয়দেব নিজেই এসে বসেন ওই জানলার ধারে, খবরের কাগজ নিয়ে অনেকটা সময় কাটান। এটাও নিতু, সিতু, মাস্তুদের পছন্দ নয়। মাস্তু প্রায়ই বলে, বাবা, তুমি ভেতরে যাও না। তুমি থাকলে আমাদের পড়াশুনোর অসুবিধে হয়।

আজকাল ছেলেমেয়েরা বাবাকে একটুও ভয় পায় না। জয়দেবদের ছেলেবেলায় কাছাকাছি বাবার চটি জুতোর শব্দ শুনলেই ভয়ে কাঁপত। বাবা ও জ্যাঠামশাই মাঝে-মাঝেই হুংকার দিতেন, এই ছেলেমেয়েরা, মুখ বুজে আছিস কেন, কী হচ্ছে ওখানে, চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে পড়! এখন নিতু, সিতু, মাস্তুদের ওসব বালাই নেই। চেঁচিয়ে পড়ার কথা বললে ওরা হাসে। ওদের পড়াশুনোর ব্যাপারে বেশি নাক গলাতে গেলে চটে যায়। মাস্তু একদিন বলেছিল, বাবা, তুমি তো সায়েন্স পড়েছিলে, তুমি ইক্‌নমিক্‌সের কী জানো? আমি কতটা পড়ছি, না পড়ছি তা তুমি কী করে বুঝবে?

অবশ্য ছেলেমেয়ে তিনটিই পড়াশুনোয় বেশ ভালো। প্রাইভেট টিউটর রাখতে হয় না। টপাটপ পাশ করে যায় শুধু না, ভালো রেজাল্ট করে। মাস্তু স্কলারশিপ পেয়েছে।

তবু শীতকালের এই আরামটকু ছাড়তে রাজি নন জয়দেব। একতলার ফ্ল্যাটে আর কোনও ঘরে এরকম আলো হাওয়া ঢোকে না। জানলার ধারে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে তিনি বলেন, তোরা পড়াশুনো কর বা গল্প কর, যা খুশি কর, আমি কিছু শুনছি না, আমি কাগজ পড়ছি!

বড় ছেলে সদ্য বদলি হয়েছে জামশেদপুরে, সেখানে সে একা থাকে। তার বউ ছেলেমেয়ে এখানে। দুটি যমজ নাতি মাঝে-মাঝে তাঁর ঘাড়ে চড়ে উপদ্রব করতে আসে। ওদের সঙ্গে খুনসুটি করতে-করতে, হাসতে-হাসতে জয়দেবের খেয়াল থাকে না, তখন মাস্তু ধমক দিয়ে বলে, আঃ বাবা, তোমার জন্য আমরা পড়তে পারছি না। কেউ কখনও শুনেছে, বাবার জন্য ছেলেমেয়েদের পড়াশুনোর ক্ষতি হয়?

মাস্তুর স্বভাবটা প্রায় তার মায়ের মতন, সব কথার মধ্যেই ধমকের সুর। শুনতে জয়দেবের খারাপ লাগে না, অনেক দিনের অভ্যেস তো!

সাড়ে ন'টার সময় মাস্তুরা একে-একে স্নান করতে যায়। দুপুরবেলা এই ঘরটা ফাঁকা। তখন অবশ্য রোদ পোহাবার দরকার থাকে না। কলকাতার শীতে দুপুরের রোদ আরামদায়ক নয়। তবু দুপুরবেলা জয়দেব এই ঘরেই অনেকটা সময় কাটান। রিটায়ার করার পর থেকে তাঁর খুব বই পড়ার ঝোঁক হয়েছে। অন্য কোনও বই না পেলে তিনি এক-একদিন ছেলেমেয়েদের বই ঘেঁটে দেখেন পড়ার মতন কিছু আছে কি না।

সদর দরজাটা খোলা, তবু কলিংবেল বাজল। এই জানলা দিয়েই পুরো রাস্তাটা দেখা যায়। জয়দেব মুখ বাড়িয়ে দেখলেন, সদ্য পাট-ভাঙা ধুতি ও পাঞ্জাবি পরা একজন সুদর্শন যুবক দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে। একে আগে কখনও দেখেননি জয়দেব।

তিনি জানলা দিয়ে জিগ্যেস করলেন, এই যে ভাই, এদিকে আসুন। বলুন কাকে খুঁজছেন?

যুবকটি সরে এসে বলল, উজ্জয়িনী আছে?

মাস্তুর ভলো নাম উজ্জয়িনী। জয়দেব টেবিলের ওপর টাইমপিসটা দেখলেন। মাস্তু স্নান করে খেয়ে বেরিয়ে গেছে কি না তিনি খেয়াল করেননি, তবে এখনও সাড়ে দশটা বাজেনি।

একবার বাইরের দু-তিনটি ছেলেমেয়ে এরকম মাস্তুর খোঁজ করতে এসেছিল, জয়দেব দরজার সামনে থেকেই মাস্তু, বলে চেঁচিয়ে ডেকেছিলেন বলে মাস্তু খুব রাগ করেছিল। বাইরের লোকের সামনে তার ডাকনাম ধরে ডাকা ঠিক হয়নি। তা ছাড়া, ওরকম চেঁচিয়ে ডাকাও নাকি আজকালকার প্রথাবিরুদ্ধ। কিন্তু মাস্তুকে তো তিনি কোনওদিন উজ্জয়িনী বলে ডাকেননি, জিভে কেমন যেন আটকে যায়। মাস্তু বলেছিল, যদি আমাকে কখনও উজ্জয়িনী বলে না-ই ডাকবে, তা হলে ওই নামটা রেখেছিলে কেন? শুধু মাস্তু নাম রাখলেই পারতে! বাবা-মায়ের দেওয়া নাম বুঝি শুধু অন্যদের জন্য?

জয়দেব যুবকটিকে বললেন, আপনি ভেতরে এসে বসুন, আমি দেখছি।

যুবকটি বললেন, না, না। আমি বসব না, শুধু একটা কথা বলে চলে যাব।

জয়দেব ভেতরে চলে গেলেন। এখনও বেরিয়ে যায়নি মাস্তু, খেতে বসেছে।

জয়দেব তার পাশে গিয়ে মুচকি হেসে বললেন যে উজ্জয়িনী দেবী, খুব সুন্দর দেখতে তোমার এক বন্ধু তোমাকে ডাকছেন!

মাস্তু এবং তার মা একই সঙ্গে বলে উঠল, কে?

জয়দেব বললেন, নাম তো জানি না! আগে কখনও দেখিওনি।

মাস্তু ভুরু কুঁচকে দু-এক মুহূর্ত চিন্তা করল। তারপর এঁটো হাতেই সে ছুটে গেল দরজার কাছে। তার পরেই এক অদ্ভুত বিস্ময়ে চিৎকার করে বলল, ওমা, আপনি? আসুন, আসুন, বসবেন আসুন! না, না, একটু বসতেই হবে। এক মিনিট, প্লিজ, আমি হাতটা ধুয়ে আসছি।

বাকি ভাত-টাত আর খেলেই না মাস্তু, ফিরে এসে হাত-মুখ ধুতে-ধুতে বলল, মা, একটু চা হবে?

মেয়ের বন্ধুর সঙ্গে কথা বলার সময় বাবার উপস্থিত থাকার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। জয়দেব শুধু একবার বসবার ঘরে ফিরে এলেন খবরের কাগজটা নেওয়ার জন্য। কুণ্ঠিতভাবে তিনি আগন্তুকটির দিকে একটু হাসি দিয়ে কাগজটি তুলে নিয়ে ভেতরে চলে গেলেন তাড়াতাড়ি।

একটা ব্যাপারে তাঁর মজা লাগল। যে মাস্তু বাড়ির লোকজনদের সঙ্গে সবসময় বকে-বকে কথা বলে, এখন তার গলা দিয়ে কী মিষ্টি সুর বেরুচ্ছে। ছেলেটিকে দেখে মাস্তুর মুখেও খুব গদগদ ভাব।

হিমানী জিগ্যেস করলেন, কে এসেছে? মাস্তুর ইউনিভার্সিটি যেতে দেরি হয়ে যাচ্ছে না?

জয়দেব দুদিকে মাথা নেড়ে বললেন, আমি তো নাম জানি না। তুমি গিয়ে নাম জিগ্যেস করে এসো, কিংবা মাস্তুকে বলো যে ওর দেরি হয়ে যাচ্ছে!

হিমানী একটা রাগের মুখভঙ্গি করলেন। হিমানীরও বাইরের লোকের সামনে মাস্তুকে এরকম কথা বলার সাহস নেই!

বাবা কিংবা মা কেউই মাস্তুকে শাসন করতে পারে না। ইউনিভার্সিটিতে ওঠার পর থেকে মাস্তু যখন খুশি বাড়ি থেকে বেরুতে পারে। এক একদিন রাত সাড়ে-আটটা, ন-টার সময় বাড়িতে ফেরে, মাঝখানে একবার কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে শান্তিনিকেতন ঘুরে এল দুদিনের জন্য, সেই বন্ধুদের দলে দু-একটি ছেলেও ছিল। কিন্তু মাস্তুর মুখে এমন একটা সারল্যের তেজ আছে যে তাকে বকুনি দেওয়ার উপায় নেই। মাস্তুর পক্ষে কোনও অন্যায় কাজ করা যেন সম্ভবই নয়। শান্তিনিকেতনে গিয়ে ওরা থাকার জায়গা পায়নি। পাঁচজন ছেলেমেয়ে মিলে বোলপুরের এক হোটেলে একটা ঘরে রাত কাটিয়েছে। মাস্তু নিজেই এই গল্প শুনিয়েছে মজা করে, যেন এ কাহিনি শুনে বাবা মায়ের মনে করার মতন কোনও ব্যাপারই থাকতে পারে না।

আজকের ছেলেটিকে জয়দেবের বেশ পছন্দ হয়েছে। আজকাল ধুতি-পাঞ্জাবি পরা ইয়াংম্যান তো দেখাই যায় না। শুধু সেজন্য নয়, ওর মুখে বেশ একটা ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে, দেখলেই বোঝা যায় ভালো পড়াশুনো জানে। জোর করে ধরে বেঁধে, কিংবা নিজেরা সম্বন্ধ করে মাস্তুর যে বিয়ে দেওয়া যাবে না, তা জয়দেব আর হিমানী দুজনেই জানেন। সে চেষ্টাও তাঁরা করবেন না। কী একটা প্রসঙ্গে মাস্তু একদিন হিমানীকে বলেছিল, আমার যেদিন ইচ্ছে হবে সেদিন যাকে খুশি বিয়ে করব, তোমরা তার আগে একটি কথাও উচ্চারণ করতে পারবে না।

তবু হিমানী মেয়ের বিয়ের চিন্তা করেন। রাত্তিরে শুয়ে-শুয়ে জয়দেবকে বকুনি দেন। জয়দেবকে তখন বলতে হয়, মাস্তু যাকে পছন্দ করবে, সে কক্ষনো খারাপ হতে পারে না।

আজকের এই যুবকটিই যদি মাস্তুর সেই পছন্দের পাত্র হয়, তা হলে দুজনকে সুন্দর মানাবে!

সন্ধেবেলা জয়দেব জিগ্যেস করলেন, আজ যে ছেলেটি এসেছিল ওর নাম কী রে?

মাস্তু ভুরু তুলে বললেন, ছেলেটি? কোন ছেলেটি? অরুণাভ রায়? বাবা, তুমি কী আশ্চর্য, অত বড় একজন লোক, তাকে তুমি ছেলে বলছ? তোমার চোখে কি সবাই বাচ্চা? তুমি এমন কিছু বুড়ো হওনি!

জয়দেব হাসতে-হাসতে বললেন, তোর বন্ধু তো, সেই জন্যই ছেলে বললুম। রাস্তায় ঘাটে এমনি দেখলে ভদ্রলোক বলতুম!

মাস্তু একইরকম বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, আমার বন্ধু? তুমি পাগল হয়েছ? উনি অরুনাভ রায়, কত বড় নামকরা লোক, উনি যে নিজে আমাদের বাড়িতে আসবেন, আমি প্রথমে চোখে দেখেই বিশ্বাস করতে পারিনি। আমার সঙ্গে একদিন মাত্র আলাপ হয়েছিল।

—খুব নামকরা লোক? সিনেমা করেন বুঝি?

—বাবা, তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না! সিনেমার লোকের সঙ্গে আমি আলাপ করতে

যাব কেন, তারাই বা কেন আমাদের বাড়িতে আসবে? অরুণাভ রায় খুব বড় একজন কবি, 'যৌবন' পত্রিকার সম্পাদক, তোমরা তো কিছু পড়ো না, তাই নাম জানো না! ওঁকে নিয়ে আমাদের এই গলি থেকে বেরুতেই একটি ছেলে ওঁর কাছে অটোগ্রাফ চাইল!

জয়দেব সত্যিই অরুণাভ রায়ের নাম শোনেননি। 'যৌবন' পত্রিকাও চোখে দেখেননি।

তিনি এবারে মেয়েকে একটু ধমক দিয়ে বললেন, তা ওরকম একজন নামকরা লোক বাড়িতে এসেছিলেন, আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলি না কেন?

—তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে তুমি কী কথা বলতে? তুমি তো ওর একটা লেখাও পড়নি? তুমি ওর নাম শুনে চিনতে পারবে না, উলটো-পালটা কীসব বলে ফেলতে...

হিমানী শ্লেষের সঙ্গে বললেন, কবিদের সঙ্গে কথা বলতে গেলে সবসময় বুঝি কবিতার কথা বলতে হয়, অন্য কোনও বিষয় নিয়ে ওঁরা কথা বলেন না!

জয়দেব বললেন, আমি ঠিক কথা বলতে পারতুম! জানিস, একসময় আমিও কবিতা লিখতুম?

—বাবা? তুমি? কবিতা লিখতে?

মাস্তু এবারে হেসে সারা শরীর দোলাতে লাগল। যেন এরকম মজার কথা সে সারা জীবনে শোনেনি। বাবা শ্রেণির লোকেরা কবিতা লিখবে, এরকম অবিশ্বাস্য ব্যাপার যেন হয় না। তার ধারণা, কবিরা চিরযৌবনের প্রতীক, তারা কখনও বাবা বা জ্যাঠামশাই হয় না।

—তুমি সারা জীবন রেলের চাকরি করে এলে, তুমি কবিতা...

—রেলে চাকরি করলে বুঝি কবিতা লেখা যায় না? তোর মাকে জিগ্যেস করে দ্যাখ!

হিমানী এই সময় ব্যস্ততার ভান দেখিয়ে বললেন, যাঃ, যত সব পাগলের কাণ্ড!

বিয়ের পর চাকরি জীবনে প্রথম ট্রান্সফার হয়ে আদ্রা জংশনে থাকার সময় জয়দেব মেঘদূতের যক্ষের স্টাইলে হিমানীকে লম্বা-লম্বা কবিতায় চিঠি লিখতেন। সে চিঠিগুলো হিমানী নষ্ট করেননি। কয়েকদিন আগেও বড় ট্রাঙ্কটা গোছাবার সময় সেই পত্রকাব্য বেরিয়ে পড়েছিল। জয়দেব সেগুলি পড়ছিলেন আর হিমানী বারবার তাড়া দিয়ে বলেছিলেন, এই, কী করছ কী, ওগুলো ভেতরে রেখে দাও, ছেলেমেয়েরা দেখে ফেলবে!

পরদিন দুপুরে, যদিও বসবার ঘরে কেউ নেই, তবু অনেকটা চোরের ভঙ্গিতে জয়দেব মাস্তুর খাতাপত্র ঘাঁটতে লাগলেন। হ্যাঁ, তিনি ঠিকই আন্দাজ করেছিলেন, মাস্তু কবিতা লেখে, তার দু-খানা খাতা ভরতি শুধু কবিতা। পাতা উলটে-উলটে সেগুলো তিনি পড়লেন অনেকক্ষণ ধরে, কিন্তু কিছুই প্রায় বুঝতে পারলেন না। এসব আধুনিক কবিতা, ছন্দ নেই, মিল নেই, মাথামুণ্ডু কিছুই নেই মনে হয়, কারা এসব পড়ে কে জানে! তবু পড়তে পড়তে জয়দেব গভীর বিস্ময় বোধ করতে লাগলেন। এইসব অদ্ভুত, জটিল সব বিষয়, চিন্তা, শব্দ মাস্তুরই তো মাথা থেকে বেরিয়েছে। যতই বড়-বড় ভাব করুক, মাস্তু তো এখনও ছেলেমানুষই, ভূতের গল্প শুনলে বা পড়লে রাত্তিরবেলা একা একা বাথরুমে যেতে ভয় পায়, পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুবার আগের দিন এখনও কেঁদে-কেঁদে চোখ ফোলায়, পাগলের মতন আচার খেতে ভালোবাসে, সেই মাস্তুর একটা আলাদা চিন্তার জগৎ আছে, যা বাবা হয়েও জয়দেব কিছুই জানেন না।

কখন লেখে মাস্তু এসব কবিতা? এক একদিন মাস্তু অনেক রাত জেগে পড়ে, সেই পড়াশুনো করার নামেই সে এসব লিখে-লিখে পাতা ভরায়। মাস্তুর কবিতা কি ছাপা হয়েছে কোথাও? নইলে আধুনিক কবি অরুণাভ রায় দেখা করতে এল কেন মাস্তুর সঙ্গে?

মাস্তুকে এই কথাটা জিগ্যেস করতে হবে অনেক কায়দা করে। জয়দেব লুকিয়ে-লুকিয়ে মাস্তুর কবিতার খাতা দেখেছেন, এটা জানতে পারলে মাস্তু রেগে আগুন হবে।

দুপুরবেলা হিমানী সিনেমা দেখতে গেলেন তাঁর বোনের সঙ্গে। দুপুরে জয়দেবের আর কাটতে চায় না কিছুতেই। তাঁর দুপুরে ঘুমোনো অভ্যেস নেই, কিন্তু সিনেমা দেখতে গেলেই তাঁর চোখ জুড়ে রাজ্যের ঘুম নেমে আসে, সেই জন্য হিমানী তাঁর স্বামীকে সিনেমায় নিয়ে যেতে চান না!

তা ছাড়া বাড়ি পাহারা দেওয়ারও ব্যাপার আছে!

ফাঁকা বাড়ি, দোতলার বাড়িওয়ালারাও পুরীতে বেড়াতে গেছে, রাস্তায় আজ কোনও ফেরিওয়ালার ডাকও শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না। নাতি দুটোও বাড়িতে নেই। জয়দেব যেন কোনওদিন এমন একা বোধ করেননি। একবার তিনি এ ঘরে গিয়ে বসছেন, আবার অন্য ঘরে যাচ্ছেন। হঠাৎ তাঁর মাথায় একটা চিন্তা খেলে গেল।

বড় ট্রাঙ্কটা খুলে তিনি পুরোনো চিঠিগুলো আবার পড়তে লাগলেন। মোট আটখানা কবিতা। তখন জয়দেবের বয়েস ছিল সাতাশ আর হিমানীর একুশ। পড়তে-পড়তে মৃদু-মৃদু হাসতে লাগলেন জয়দেব। তাঁর মনে পড়ে গেল, এক রাত্তিরেই তিনি হিমানীকে তিনখানা চিঠি লিখেছিলেন।

এই কবিতাগুলো ছাপানো যায় না? হিমানীর নামটা বাদ দিয়ে দিতে হবে অবশ্য। কিন্তু কবিতাগুলো মোটেই খারাপ হয়নি, যা সব লেখা হচ্ছে আজকাল, সেই তুলনায় লোকে এই কবিতা পড়ে মানে বুঝবে, আনন্দ পাবে।

সাদা কাগজ নিয়ে জয়দেব দুটি কবিতা কপি করলেন। তারপর একটা নতুন কবিতা লিখে ফেললেন। নিজের এই ক্ষমতায় নিজেই অবাক হলেন তিনি। বাঃ, বেশ এসে যাচ্ছে তো লাইনগুলো, প্রায় তিরিশ-বত্রিশ বছর তিনি বাংলায় প্রায় কিছুই লেখেননি। কিন্তু ভুলে যাননি কিছুই। ইস্কুল-কলেজে তিনি বাংলায় ভালো ছাত্র ছিলেন, তাঁর বানান ভুল হয় না।

নতুন কবিতাটি লেখা সবে শেষ করেছেন, এই সময় বেল বেজে উঠল। যমজ নাতি দুটিকে নিয়ে তাঁর পুত্রবধূ দু-দিন আগে বোধহয় বাড়ি গিয়েছিল, তার বাপের বাড়ি পাশের পাড়াতেই, সে বোধহয় ফিরে এসেছে।

জয়দেব দরজা খুলে অবাক হলেন, মাস্তু। সে কোনওদিন এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরে না। মেয়েটার শরীর খারাপ হয়নি তো?

মাস্তু ভালো করে উত্তর দিল না বাবার প্রশ্নের। সে খুব অন্যমনস্ক। ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস বন্ধ হয়ে গেছে, তাই সে ফিরে এসেছে।

জয়দেব হেসে জিগ্যেস করলেন, কফি হাউসে আড্ডা দিতে গেলি না?

মাস্তু গভীরভাবে বলল, নাঃ।

বেশ কিছুক্ষণ মাস্তু বাথরুমে সময় কাটাল, তারপর বেরিয়ে সে দুকাপ চা বানাল। জয়দেব আবার লিখতে বসেছিলেন। চায়ের কাপ নিয়ে তিনি মাস্তুকে ঢুকতে দেখে তাড়াতাড়ি লেখার ওপর একটা বই চাপা দিলেন।

চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়ে তিনি জিগ্যেস করলেন, হ্যাঁরে, মাস্তু, তোর বন্ধু ওই যে অরুণাভ রায় 'যৌবন' বলে পত্রিকা বার করেন, সেই পত্রিকা একটাও আছে তোর কাছে?

মাস্তু বলল, হ্যাঁ, অনেক আছে।

—কোথায় রেখেছিস? একটু দিবি আমাকে, পড়ে দেখব!

—ও তোমার ভালো লাগবে না।

—কেন ভালো লাগবে না? বুড়ো হয়েছি বলে কি যৌবনের কথা পড়তে ভালো লাগে না? বুড়ো বয়সের চেয়ে যৌবনের কথা চিন্তা করতেই তো ভালো লাগে।

—সেজন্য নয়। ওসব লেখা অন্যরকম। বাবা, একটু বাদে আমি আবার বেরুব, ফিরতে-ফিরতে হয়তো আটটা-ন'টা বেজে যাবে। তোমরা চিন্তা কোরো না!

—কোথায় যাবি রে?

বাবার দিকে কয়েক পলক চেয়ে রইল মাস্তু। মিথ্যে কথা তার মুখে দিয়ে বেরোয় না। আবার এমন অনেক কথা থাকে, যা বাবা-মাকে বলা যায় না বা বলার কোনও মানে হয় না।

—দু-একজন বন্ধুর সঙ্গে হাওড়ায় শালকে-তে যাব।

—শালকে যাবি? কেন, হঠাৎ? ওটা কি একটা বেড়াবার জায়গা হল?

—বেড়াতে নয়, একটা মিটিং আছে।

—মিটিং? কীসের মিটিং? তুই পলিটিক্স্ করছিস নাকি? যাসনি তো আগে কোনওদিন।

—সেরকম মিটিং নয়। এটা সভা, মানে সাহিত্যসভা।

—অরুণাভ রায় সেখানে যাবে?

—ইয়ে, হ্যাঁ, উনিও যাবেন, হঠাৎ ওঁর কথা জিগ্যেস করছ?

—ওকে দেখে আমার খুব আনন্দ হয়েছে। অরুণাভ রায় ওখানে কবিতা পড়বেন বুঝি?

—হ্যাঁ। অরুণাভ রায়ের একটা সম্বর্ধনা হবে। উনি কবিতা পড়বেন, আরও অনেকে পড়বে।

—চল না। আমিও তোর সঙ্গে যাই। একটু দেখে আসি!

এইবার মাস্তুর রেগে ওঠার পালা। সবচেয়ে যেটা সে বেশি অপছন্দ করে, তা হল অবিশ্বাস। একটু দেখে আসি মানে? বাবা কি ভেবেছেন সাহিত্যসভার নাম করে সে অন্য কোথাও যাচ্ছে? কিংবা সে একা-একা শালকে যেতে পারে না? সে কি কচি খুকি?

মাস্তুর মেজাজের উপক্রম দেখেই ভয়ে পেয়ে জয়দেব বললেন, না, না, আমি তা বলিনি, আমি ভেবেছিলাম, তোর সঙ্গে গিয়ে আমিও কবিতা শুনব, আমার ইচ্ছে করে, তুই বিশ্বাস করলি না, আমিও কবিতা লিখেছি এককালে। এখনও লিখতে পারি। আমার একটা কবিতা পড়ে দেখবি?

মাস্তু হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, কই দেখি?

জয়দেব বসে আছেন বেতের চেয়ারে, একটু দূরে দাঁড়িয়ে কবিতাটা পড়তে লাগল মাস্তু। বাথরুম থেকে বেরুবার পর তার আলগা করে শাড়ি পরা, চুল সব খোলা, ভুরু দুটো কোঁচকানো।

জয়দেবের বুক ঢিপঢিপ করছে। মাস্তু যেন বিচারক, একটু পরেই রায় দেবে। এই মেয়েকে তিনি জন্ম দিয়েছেন যেন বিশ্বাসই করা যায় না। যখন পুঁচকে একরত্তি ছিল, তখন কী কান্নাই কাঁদত। একবার তিনি মাস্তুকে কোলে নিয়ে তাঁর শ্যালিকার বিয়েতে গিয়েছিলেন, মাস্তু হিসি করে তাঁর জামা-টামা ভিজিয়ে দিল...মনে হয় যেন সেদিনের কথা।

কবিতাটি পড়া শেষ করে কোনও মন্তব্য না করে মাস্তু সেটি ফিরিয়ে দিল।

জয়দেব ভাঙা গলায় জিগ্যেস করলেন, কেমন হয়েছে রে? ছাপালে লোকে পড়বে না?

মাস্তু বলল, তোমাদের আমলে যে-সব পত্রিকা ছিল, প্রবাসী, বসুমতী, ভারতবর্ষ, সেসব পত্রিকা থাকলে বোধহয় ছাপা হত। কিন্তু সেরকম পত্রিকা তো এখন আর নেই। কে ছাপবে?

—কেন, তোদের ওই অরুণাভ রায়ের পত্রিকায় দিলে ছাপাবে না?

—না!

—তুই কী করে জানলি ছাপাবে না? আমি অরুণাভ রায়কে দেখাব? তুই বলতে চাস একেবারেই ভালো হয়নি?

—ভালো হয়নি তা তো বলছি না, বাবা! হ্যাঁ, ভালো হয়েছে। তুমি তো বেশ ছন্দ-টন্দ জানো দেখছি। কিন্তু এখনকার কবিতা অন্যরকম। তোমার কবিতা রাবীন্দ্রিক স্টাইলের, ওসব এখন অচল!

—তুই বললেই হল অচল! রবীন্দ্রনাথ অচল!

—রবীন্দ্রনাথ অচল তা তো বলিনি। কালিদাস কি অচল? তাও না।

কিন্তু কালিদাস বা রবীন্দ্রনাথের স্টাইলের এখন আর লেখা চলে না।

—আমি যদি তোদের শালকের সভায় আমার কবিতা পড়ে শোনাই, দেখব লোকে কী বলে?

—বাবা, তোমার ওখানে যাওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

—কেন, একটা সভা হচ্ছে সেখানে সবাই যেতে পারে না? কেউ যদি কবিতা পড়তে চায়।

—ঠিক আছে তা হলে তুমি যাও, আমি যাব না!

কয়েক মুহূর্ত থেমে গিয়ে মাস্তুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন জয়দেব! তাঁর বুক অভিমানে ভরে গেল। মেয়ের মুখের বকুনি তিনি কোনওদিন সিরিয়াসলি নেননি। সবসময় কৌতুকই বোধ

করেছেন, কিন্তু আজ যেন মাস্তুর গলায় একটা তিক্ততা ফুটে উঠেছে।

তিনি আস্তে-আস্তে বললেন, ও, আমি সঙ্গে গেলে তোর বুঝি অপমান হবে? ঠিক আছে, আমি যাব না, তুই যা!

মাস্তুর চোখ জলে ভরে গেল। ঝোঁকের মাথায় সে বেশি কঠিন সুরে কথা বলে ফেলেছে বাবার সঙ্গে! কিন্তু কী করে সে বাবাকে বোঝাবে? সে, উজ্জয়িনী সেন, শালকিয়ার একটি সাহিত্য সভায় যাবে, স্বয়ং অরুণাভ রায় তাকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন, সেখানে সে আজ কবিতা পড়বে, সেখানে কি সে তার বাবাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারে? সবাই হাসাহাসি করবে না? তার ওপর, বাবা যদি সেখানে গিয়ে নিজের ওই অদ্ভুত কবিতা পড়ার বায়না ধরেন...তা হলে তারপর সে আর কারুর কাছে মুখ দেখাতে পারবে?

তার বাবা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বাবা, তিনি মাস্তুকে কত স্বাধীনতা দেন, কত ভালোবাসেন, কিন্তু তা বলে বাবাকে তো সে কবি হিসেবে মেনে নিতে পারে না! বাবা যদি অরুণাভ রায়কে ওই সব কবিতা ছাপার জন্য বিরক্ত করেন, তা হলে অরুণাভ রায় ভয়ে আর এদিক মাড়াবেন না, মাস্তুকে এড়িয়ে চলবেন, মাস্তুর লেখাও ছাপবেন না।

মাস্তুকে কাঁদতে দেখে জয়দেব এবারে কড়া গলায় বললেন, ঠিক আছে, বলছি তো, আমি যাব না। তুই যা, যখন খুশি ফিরিস, আমি কিছু বলব না!

—বাবা—

—আর ন্যাকামি করিস না, মাস্তু! এর মধ্যে কাঁদবার কী আছে? না হয় আমি ভুল করে একবার যাওয়ার কথা বলে ফেলেছি! আমার সঙ্গে যেতে তোর অপমান বোধ হবে, তা তো বুঝিনি। আর কোনওদিন বলব না!

চেয়ার ছেড়ে উঠে চটি ফটফটিয়ে জয়দেব চলে গেলেন রান্নাঘরের দিকে। তাঁর আর-এক কাপ চা খেতে হবে, তিনি নিজেই চা বানিয়ে নেবেন।

নিজের ঘরে গিয়ে সাজগোজ শুরু করল মাস্তু। সাড়ে চারটের সময় এসপ্লানেডে মিট করতে হবে! অরুণাভ রায়ের সঙ্গে একই গাড়িতে, এত বড় সৌভাগ্য...এখন দেরি হয়ে গেছে, ফিরে এসে সে বাবাকে সব বুঝিয়ে বলবে। বাবা যদি লিখতেই চান, তাহলে প্রবন্ধ-ট্রবন্ধ লেখার চেষ্টা করতে পারেন...

সাজ শেষ করে মাস্তু বেরিয়ে দেখল, রান্নাঘরের সামনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন বাবা, হাতে চায়ের কাপ, ধুতির ওপর গেঞ্জি পরা, কণ্ঠার হাড় দুটি স্পষ্ট, মুখে যেন একটা কালো ছাপ পড়েছে। মাস্তুর বুকটা ধক করে উঠল। বাবা যে এত রোগা হয়ে গেছেন, এতদিন যেন সে লক্ষই করেনি। কী অসহায় তাঁর দাঁড়াবার ভঙ্গি, যেন এই পৃথিবীতে তাঁর আর কোনও মূল্যই নেই।

মাস্তুর ইচ্ছে করল তার হাতের খাতাটা ছুড়ে ফেলে দিতে। কোনও দরকার নেই শালকে যাওয়ার, সে বাবার গলা জড়িয়ে ধরে বলবে, বাবা তুমি রাগ কোরো না! তোমাকে এরকম ফাঁকা বাড়িতে আমি একা রেখে যেতে পারি? বাবা, তুমি যখন কবিতা লিখতে তখনকার গল্প বলো, তোমার অন্য কবিতাগুলো পড়ে শোনাও, সবক'টা পড়ো। বাবা, তুমি রবীন্দ্রনাথকে চোখে দেখেছ? বাবা, তুমি কি মাকে কখনও কবিতা পড়ে শুনিয়েছ? এইরকম গল্প, অনেক গল্প, হবে বাবার সঙ্গে...

কিন্তু সাড়ে-চারটে বাজতে আর বেশি বাকি নেই, কথা দেওয়া আছে, অরুণাভ রায়রা দাঁড়িয়ে থাকবে, হয়তো অনেকক্ষণ অপেক্ষা করবে মাস্তুর জন্য, ওদের দেরি হয়ে যাবে...

বাবা, আমি আসছি, বলেই ছটফটিয়ে বেরিয়ে গেল মাস্তু।



সেই গাছটির নীচে

আমার বন্ধু তপন প্রথম আমাকে নিয়ে গিয়েছিল সেই ক্লাবে। ক্লাবের নামটি বিচিত্র, 'সুখী পরিবার', বিশেষ কেউ এর নাম শোনেনি। যে-কেউ এ-ক্লাবের সদস্য হতে পারে না। এখানে ভরতি হওয়ার শর্ত হল, অন্য সদস্যদের সঙ্গে কিছু-না-কিছু একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকতে হবে। অর্থাৎ সবাই এক পরিবারের মানুষ।

আসলে কিন্তু তা নয়।

বকুলবাগানে গগন ভদ্রের একটা ছিমছাম দোতলা বাড়িতে এই ক্লাবের অধিবেশন হয় প্রত্যেক শনি-রবিবার। এ-বাড়ির একতলায় বসবার ঘরটি প্রায় একটা হলঘরের মতন বড়। বাড়ির সামনেটায় বাগান ও সবুজ ঘাসের লন, এই পাড়াটাও খুব নিরিবিলি। গগন ভদ্র একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মের মালিক, বেশ সচ্ছল অবস্থা, উচ্চমধ্যবিত্ত বাঙালি বলা যায়, আমরা অল্প বয়েসে অবশ্য তাঁকে খুব বড়লোক ভাবতাম। গগন ভদ্রের স্ত্রী নমিতা অতি চমৎকার মহিলা, এক-একজন মানুষের দিকে তাকালেই ভালো লাগে, নমিতার মুখখানি সেরকম স্নিগ্ধ।

সারা সপ্তাহ গগন ভদ্র খুব ব্যস্ত থাকলেও শনিবার আর রবিবার কোনও কাজ করবেন না প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। এই দুদিন শুধু আড্ডা, গান, কবিতা, আবৃত্তি, নাটক। সেই জন্যই ক্লাব। গগনদা এই ক্লাবের প্রেসিডেন্ট আর নমিতাদি মধ্যমণি।

এই সুখী দম্পতিটির কোনও ছেলেমেয়ে ছিল না। আরও অদ্ভুত ব্যাপার, গগন ভদ্রের কোনও ভাইবোন নেই, নমিতাদির একটি মাত্র বোন ছিল, সে-ও মারা গেছে। এমন সুন্দর একটা বাড়ি টাকা-পয়সারও অভাব নেই, অথচ মধ্য-জীবনে পৌঁছে ওরা দুজন বুঝলেন, একটা ধূসর রুক্ষ মাঠের মতন ওঁদের সামনে পড়ে আছে নিদারুণ নিঃসঙ্গতা।

নমিতাদির যে-বোন মারা গেছে, তার দুটি ছেলেমেয়ে, পিঠোপিঠি ভাইবোন, দুজনেই তখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। তারা এ-বাড়িতে আসত মাঝে-মাঝে। গগনদার বাবার দুটি বিয়ে, দ্বিতীয় পক্ষের দুই বোন, তাদের তিনটি ছেলে আছে। এইসব ছেলেমেয়েদের নিয়ে শুরু হয়েছিল ক্লাবটা। তারপর ওইসব ছেলেমেয়েদের মাসতুতো-পিসতুতো ভাইবোনেরাও আসতে লাগল। আত্মীয়তার সম্পর্কটা অতি ক্ষীণ হতে থাকলেও রইল তো কিছু একটা! নমিতাদির বোনের মেয়ে গীতালি আর মিতালির পিসতুতো জামাইবাবুর ভাই হচ্ছে তপন। তাহলে গগনদার সঙ্গে তার সম্পর্ক দাঁড়াল? সে হিসেব আমি জানি না!

তপন আমার বন্ধু, ছেলেবেলা থেকে একসঙ্গে স্কুলে পড়েছি। কোনও আত্মীয়তা নেই। কিন্তু আমার এক পিসতুতো দাদার বিয়েতে গিয়েছিলাম শ্রীরামপুর, সেই বিয়েবাড়িতে হঠাৎ তপনের সঙ্গে দেখা। অবাক হয়ে জিগ্যেস করলুম, তুই কোনও সুবাদে নেমন্তন্ন খেতে এলি রে? তপন বলল, বাঃ, কনে যে আমার দিদি। আপন দিদি নয়, আমার ফুলমাসির মেয়ে। তাহলে আমার পিসতুতো বউদি হল তপনের মাসতুতো দিদি। খুব একটা দূর সম্পর্ক বলা যায় কি?

এর কয়েকদিন পরেই তপন বলল, চল, তোকে একটা ক্লাবে নিয়ে যাব।

আমার পরিচয় জানতেই নমিতাদি বললেন, বাঃ, তুমি আমাদের নতুন সদস্য হলে। নিয়মিত

প্রত্যেক সপ্তাহে আসতে হবে কিন্তু।

এই ক্লাবে একটা দারুণ সম্বোধন সমস্যা থাকার কথা। সম্পর্কের সূত্র ধরে গগনদা কারুর কাকা বা মামা বা পিসে বা দাদু। সেইজন্য নিয়ম হয়েছে, সবাই শুধু গগনদা আর নমিতাদি বলবে।

গগনদার ছিপছিপে চেহারা, মাথার চুল কাঁচা-পাকা, মুখখানা গম্ভীর ধরনের হলেও হঠাৎ-হঠাৎ মজার কথা বলেন। নমিতাদির বেশ ভরা শরীর, রানি-রানি ভাব, কিন্তু একটুও অহঙ্কারী নন, ঠোঁটে সবসময় হাসি লেগে আছে।

শনি আর রবিবার আমাদের আসর বসত সন্ধে সাড়ে ছ'টায়, চলতে ন'টা-সাড়ে ন'টা পর্যন্ত। আমরা অনেকেই তখন ছাত্র, কেউ-কেউ সদ্য চাকরিতে ঢুকেছে। এই ক্লাবের এমনই আকর্ষণ ছিল যে এই দু-দিন অন্য কোথাও যেতে ইচ্ছেই করত না।

গগনদা পেশায় ইঞ্জিনিয়ার হলেও নানারকম বই পড়তেন। আমাদের না পড়া অনেক বই সম্পর্কে শুনেছি ওঁর কাছ থেকে। নমিতাদিও গগনদার অফিসের কাজকর্ম দেখেন, শিক্ষিতা মহিলা, তাঁর গানের গলাটিও বেশ ভালো। আমার দৃঢ় ধারণা, ইচ্ছে করলেই তিনি নামকরা গায়িকা হতে পারতেন। কিন্তু নাম করার দিকে ওঁর কোনও ঝোঁকই ছিল না।

ওঁদের দুজনেরই স্বভাবের আর-একটা ভালো দিক এই যে ওঁরা কক্ষনো বেশি-বেশি কর্তৃত্ব করতেন না, নিজেরাই বেশি কথা বলতেন না। ওঁরা আমাদের সমবয়েসির মতন ফক্কুড়ি-ইয়ার্কিও করতেন, প্রশ্রয় দিতেন ছোটখাটো দুষ্টুমির। আর-একটা নিয়ম ছিল প্রত্যেক সদস্যকেই মাঝে-মাঝে কিছু একটা করতে হবে। হয় গল্প বলা কিংবা আবৃত্তি কিংবা গান বা নাচ। যে বলবে, কিছুই পারি না, তার পেছনে লাগা হবে। আমি যেদিন প্রথম ওই কথা বলেছিলাম, সেদিন একটি ছেলে আর একটি মেয়ে এসে জোর করে আমার হাত ধরে টেনে তুলে বলেছিল, আর কিছু না পারো, নাচতে পারবে নিশ্চয়ই! তারপর সে কি হাসির হুল্লোড়।

তখন এই ক্লাবের সদস্যের সংখ্যা ছাব্বিশজন তার মধ্যে আঠারো-উনিশজন নিয়মিত আসে। আড্ডা ও নাচ-গান-কবিতা ছাড়াও আর-একটা আকর্ষণ ছিল। খাওয়া-দাওয়া হত দারুণ। গগনদাদের একজন বাবুর্চি ছিল, তার রান্নার হাতখানা বাঁধিয়ে রাখার মতন! প্রত্যেক সপ্তাহে নিত্যনতুন চপ-কাটলেট ফ্রাই আর মিষ্টি। খুব দামি চা, যতবার খুশি! চাঁদা নেই!

এই ক্লাবে বেশ কয়েকবার যাওয়ার পর আমি দুটো জিনিস লক্ষ করলুম। বেশ সুন্দর সময় কাটে, আনন্দ ও হুল্লোড় হয়, সাহিত্য-সঙ্গীতের চর্চা হয় বটে, কিন্তু ভেতরে-ভেতরে কিছু কিছু সদস্যের মধ্যে একটা টেনশন আছে। এই নিঃসন্তান দম্পতিটির উত্তরাধিকারী কে হবে? সবাই যখন কিছু না কিছু আত্মীয়, তখন এদেরই মধ্যেই তা কারুর পাওয়া উচিত! সেইজন্য কার কতটা আত্মীয়তা বেশি কিংবা কে ওঁদের দুজনের বেশি প্রিয় হতে পারে, তা নিয়ে কয়েকজনের মধ্যে রীতিমতো একটা প্রতিযোগিতা আছে! আমার অবশ্য এতে মাথা গলাবার কোনও কারণ নেই, কারণ সম্পর্কের বিচারে আমি কুড়িজনের চেয়েও পিছিয়ে!

আর একটা প্রতিযোগিতাও আছে। প্রেমের! এর মধ্যে অনেকেই অনেককে আগে চিনত না, লতায়-পাতায় আত্মীয়তা এতই দূরের যে প্রেম তো হতেই পারে, সম্বন্ধ করে বিয়েতেও কোনও বাধা নেই। কে কার পাশে বসে, কে কার দিকে বেশিক্ষণ চেয়ে থাকে, তা থেকে বোঝা যায় কী রকম প্রেমের খেলা চলছে।

উত্তরাধিকারের প্রতিযোগিতায় আমার কোনও স্থান নেই বটে, প্রেমের ব্যাপারে উদাসীন থাকব কী করে? কিন্তু আমি বোকার মতন এমনই একজনের প্রেমে পড়লুম, যার হৃদয় স্পর্শ করার কোনও সম্ভাবনাই আমার নেই। কিন্তু প্রেম যে যুক্তি মানে না!

দীপা, ভাস্বতী, রীণা, পুতুল এবং শকুন্তলা এই পাঁচজনই ছিল মোট এগারোটি মেয়ের মধ্যে বেশি আকর্ষণীয়া। এদের মধ্যে আবার শকুন্তলা সবাইকে ছাপিয়ে একেবারে আলাদা। শকুন্তলা

সাইকোলজি নিয়ে এম. এস. সি পড়ছে, প্রখর তার রূপ, সেই রূপ সম্পর্কে সে নিজেও খুব সচেতন। তার শরীরে ঢলঢল করছে লাবণ্য, ভুরু দুটি যেন কন্দর্পের ধনুক। সে আবার নমিতাদির বোনের বড় মেয়ে, আত্মীয়তার দিক থেকেও ওঁদের খুব কাছাকাছি। শকুন্তলাদের নিজেদের অবস্থাও বেশ সচ্ছল, এই পরিবারের সম্পত্তিও খুব সম্ভবত তার ভাগ্যেই ঝুলছে।

অন্তত চারজন যুবক শকুন্তলার কাছাকাছি সবসময় ঘুরঘুর করে। আমার বন্ধু তপনও তাদের মধ্যে একজন। ওদের মধ্যে আবার সুব্রত আর দীপকের মধ্যে খুব রেষারেষি চলছে! সুব্রত ইঞ্জিনিয়ার, সুন্দর স্বাস্থ্য, ভালো কবিতা আবৃত্তি করে। দীপক ডাক্তারির ফাইনাল ইয়ারে, দুর্দান্ত গান গায়।

অর্থাৎ আমি প্রথম থেকেই ব্যর্থ প্রেমিক।

আমি শকুন্তলার পাশে বসবার কখনও চেষ্টাও করি না। বরং একটু দূরে বসলে তার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকা যায়। সত্যিই সে দেখার মতন নারী।

শকুন্তলার ব্যবহারে অবশ্য অহংকার নেই। সকলের সঙ্গেই সে মেশে, সকলের সঙ্গেই সে হেসে কথা বলে। যদি কেউ চুপচাপ বসে থাকে, শকুন্তলাই তাকে যেচে বলে, এইভাবে সে দুবার আমাকে দিয়েও কবিতা পাঠ করিয়েছিল। এর বেশি কিছু না।

একদিন, একবারই শুধু কিছুক্ষণের জন্য আমি শকুন্তলার খুব কাছাকাছি এসেছিলাম নাটকীয়ভাবে।

সারা দিনটাই ছিল মেঘলা, বেড়াবার মতন একটি দিন। আমি অবশ্য বেড়াতে বেরুইনি, হাওড়া স্টেশনে গিয়েছিলাম আমার এক কাকাকে ট্রেনে তুলে দিতে। বাসে করে ফিরছি প্রায় ঝুলতে ঝুলতে, আকাশে কড়কড়াৎ শব্দে বাজ ডাকছে, যে-কোনও সময় অঝোরে বৃষ্টি নামবে। রেড রোড ধরে আসতে-আসতে হঠাৎ মনে হল, ঠিক শকুন্তলার মতন একটি মেয়ে একলা দাঁড়িয়ে রাস্তায়। বাসটা তাকে ছাড়িয়ে চলে এসেছে, ভালো করে দেখতে পাইনি, শকুন্তলা এরকম মাঝরাস্তায় একলা দাঁড়িয়ে থাকবেই না কেন! নিশ্চয়ই চোখের ভুল। আমার বাসটার সামনে অন্য কোনও গাড়ি আসতেই যেই একটু গতি কমিয়েছে, আমি ঝুঁকি নিয়ে লাফিয়ে নেমে গেলাম।

তখনও বাসটার বেশ গতি ছিল, ঝোঁক সামলাতে না পেরে একটা আছাড় খেয়ে আমার হাঁটু ছড়ে গেল বটে, কিন্তু পুরস্কারও পেলাম আশাতীতভাবে।

সত্যিই শকুন্তলা দাঁড়িয়ে আছে একা। কাছেই ওদের বাড়ির গাড়ি, তার বনেট তোলা। গাড়িটা খারাপ হয়েছে, ড্রাইভার সেটা সারাবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে আর শকুন্তলা হাত তুলে ডাকতে চাইছে ট্যাক্সি। কিন্তু এরকম দুযোর্গের দিনে ট্যাক্সি পাওয়া অসম্ভব প্রায়, তাও মাঝরাস্তায়।

আমি তার পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই তার উদ্বেগমাখা মুখখানাতে আলো ফুটল। সে বলল, কী মুশকিল বলো তো, গাড়িটা কখন ঠিক হবে কে জানে, ড্রাইভার যা পারে করবে, আমি বাড়ি যাই কী করে? কোনও ট্যাক্সি থামছে না।

শকুন্তলা বলল, হাত দেখাচ্ছি তো, অন্য দু-একটা গাড়ি থামছে। তারা লিফ্‌ট দিতে চাইছে। সব গাড়িতে একলা একলা লোক। তাই ভয় করল।

আমি বললাম, সেরকম কারুর গাড়িতে উঠলে তোমাকে নিরুদ্দেশে নিয়ে যাবে!

এই সময় আবার একশোটা কামান দাগার মতন শব্দ হল আকাশে।

শকুন্তলার সুন্দর মুখখানা ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল। আমাকে জিগ্যেস করল, কী হবে, যদি মাথায় বাজ পড়ে?

আমি বললাম, পার্ক স্ট্রিটের দিকে গেলে তবু ট্যাক্সির চেষ্টা করা যেতে পারে।

শকুন্তলা সঙ্গে-সঙ্গে বলল, চলো, আমরা ওদিকে যাই। তুমি আমাকে তুলে দেবে।

ড্রাইভারকে নির্দেশ দিয়ে আমার পাশে-পাশে হাঁটতে লাগল শকুন্তলা। বেশি দূর যাওয়া গেল না, হঠাৎ যেন আকাশ থেকে নামল জলপ্রপাত। বৃষ্টি নয় যেন আকাশগঙ্গা। আমরা দৌড়ে একটা

কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচে দাঁড়ালাম।

এখানে কাছাকাছি আর গাছ নেই। বৃষ্টির সঙ্গে-সঙ্গে আকাশ একেবারে অন্ধকার হয়ে গেল, মাঝে-মাঝে চোখ ধাঁধানো বিদ্যুৎ।

শকুন্তলা বলল, বাজের শব্দে আমার খুব ভয় করে। ছেলেবেলা থেকেই।

শকুন্তলা নিজেই আমার একটা হাত চেপে ধরল। এই প্রথম স্পর্শ।

বাজ সামলাবার কোনও ক্ষমতা নেই আমার, তবু সান্ত্বনা দিয়ে বললাম ভয় নেই, ভয় নেই।

শকুন্তলা বলল, শুনেছি গাছতলায় দাঁড়ালে, গাছের ওপরেই বাজ পড়ে?

আমি বললাম, সেটা ফাঁকা মাঠের মধ্যে। শহরে কত বড়-বড় বাড়ি, টেলিগ্রাফ-ইলেকট্রিকের পোল, ওরাই টেনে নেবে। তুমি গাড়িতেই ফিরে যাবে, শকুন্তলা?

শকুন্তলা বলল, একদম ভিজে যাব যে! এখানেই ভালো।

গাছ মানুষকে আশ্রয় দেয় বটে কিন্তু এমন তীব্র বৃষ্টির দিনে তাও বেশিক্ষণ পারে না।

শকুন্তলা বলল, ভাগ্যিস তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল সুনীল! আমার এমন ভয় করছিল—

সেদিন এক ঘণ্টা দশ মিনিট একটানা বৃষ্টি হয়েছিল প্রবল তোড়ে। জলে ডুবে ভাসছিল কলকাতার অর্ধেকটা। পরদিন খবরের কাগজে বেরিয়েছিল নানান বিপর্যয়ের কাহিনি।

আমরা দুজনে দাঁড়িয়েছিলাম সেই গাছতলায়, আমাদের কোনও বিপদ হয়নি অবশ্য। ভিজে জবজবে হয়ে গিয়েছিলাম। বৃষ্টি যেন ধোঁয়ার মতন আমাদের ঘিরে ফেলেছিল, আমরা কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না, আমাদেরও দেখছিল না কেউ। বেদব্যাস যখন সত্যবতীকে সম্ভোগ করতে চেয়েছিলেন, তখন নৌকার চারদিক ঘিরে ফেলেছিলেন কুয়াশায়। আমাদের দুজনেরও যেন সেইরকম অবস্থা। তবে সম্ভোগ-টম্ভোগ কিচ্ছু না। শকুন্তলা শীতে কাঁপছিল থরথর করে, সেইজন্য আমি তাকে জড়িয়ে ধরেছিলাম। সে আমার কাঁধে মাথা রেখেছিল। চুমু খেতে চাইলে আপত্তি করত কি না কে জানে! আমি সাহস করিনি, তাকে কোনও প্রেমের কথা তো বলিনি কখনও, ওই অবস্থায় বলাও যায় না, আর প্রেমের কথা কিছু না বলে চুমু খাওয়াটা অতি বাজে ব্যাপার। শকুন্তলা যে আমার ওপর ভরসা করেছিল, আমার কাঁধে মাথা রেখেছিল, তাতেই আমি কুড়িটা চুম্বনের চেয়ে বেশি আনন্দ পেয়েছি। দুজনের শরীরে নিবিড় স্পর্শ, আমরা খুব কাছাকাছি, শকুন্তলার এত কাছাকাছি কখনও আসব, স্বপ্নেও ভাবিনি।

তারপর কয়েকদিনের মধ্যেই আমাদের অমন চমৎকার ক্লাবটা ভেঙে গেল। নমিতাদি হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন, তাঁর চিকিৎসার জন্য গগনদা তাঁকে নিয়ে গেলেন বম্বে। এক মাসের মধ্যে শকুন্তলা চলে গেল অক্সফোর্ডে পড়তে, দীপক আর সুব্রত দুজনেই গেল জার্মানি।

শকুন্তলার সঙ্গে আর মাত্র দু-একবার দেখা হয়েছিল আমার। বিদেশ যাওয়ার আগে আরও অনেকের সঙ্গে আমাকেও নেমন্তন্ন করেছিল ওর বাড়িতে। ওই বৃষ্টির দিনের ঘনিষ্ঠতার জন্যই নেমন্তন্নটা পাওয়া, নইলে ওর কাছের লোকদের মধ্যে আমি পড়ি না। শকুন্তলার ব্যবহারে অবশ্য আর তেমন ঘনিষ্ঠতা ছিল না। ছিল শুধু কৃতজ্ঞতা।

বিদেশেই বিয়ে করে সেটল করে গেছে শকুন্তলা। আর তার সঙ্গে দেখা হওয়ার প্রশ্ন নেই। সেজন্য আমার কোনও হা-হুতাশও নেই। শকুন্তলার কাছ থেকে কিছুই প্রাপ্য ছিল না আমার। তবু যে এক সন্ধেবেলা ওকে এত কাছে পেয়েছিলাম, সেটাই আমার কাছে একটা পুরস্কারের মতন।

রেড রোড থেকে পার্ক স্ট্রিট যাওয়ার রাস্তাটায় সেই কৃষ্ণচূড়া গাছটার নীচে আমি মাঝে-মাঝে দাঁড়াই। এই গাছটার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। অনেক মানুষ যেমন মন্দিরে যায়, এই গাছটা আমার কাছে সেরকম একটা মন্দির। সেই কৃষ্ণচূড়ার নীচে আমি একা-একা কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি, অনুভব করি শকুন্তলার শরীরের সান্নিধ্য। আমি তার ওপর কোনও জোর করিনি, সে নিজে আমার হাত ধরেছিল। সে মাথা রেখেছিল আমার কাঁধে।

এ এক বিচ্ছেদের কাহিনি। ঠিক শকুন্তলার সঙ্গে নয়। শকুন্তলাকে আমি নিজের করে পাব, তা তো আশাও করিনি। সেই এক বৃষ্টি সন্ধের মধুর স্মৃতিই যথেষ্ট। কিন্তু একদিন রেড রোড থেকে পার্ক স্ট্রিটের দিকে যেতে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। আমার বুকে যেন হাতুড়ির ঘা লাগল। সেই কৃষ্ণচূড়া গাছটা নেই। কেউ কেটে ফেলেছে। একেবারে গোড়া থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে কোনও শয়তান। সেই শয়তানই শকুন্তলাকে আমার জীবন থেকে একেবারে কেড়ে নিয়ে গেল!



ভুল মানুষের গল্প

হোটেলটা নতুন। এদিক দিয়ে যাওয়া-আসার পথে বাইরে থেকে কয়েকবার দেখেছে মনোজ, এর আগে ভেতরে কখনও ঢোকেনি। প্রয়োজন হয়নি।

ট্যাক্সি থেকে নামবার পর মনোজ কার্ডটা আর-একবার দেখে নিল। পার্টিটা হচ্ছে পার্ল রুমে। কাচের দরজা টেনে ভেতরে ঢুকে মনোজ দাঁড়িয়ে রইল একটুক্ষণ। মস্তবড় একটা হল, তার এদিক-সেদিকে সোফায় বসে নানা ধরনের মানুষ, কিছু সাহেব-মেমও রয়েছে। হোটেলটা নতুন, তাই চতুর্দিক একেবারে ঝকঝকে তকতকে।

পার্ল রুমটা কোন দিকে? কোথাও তা লেখা নেই। রিসেপশান কাউন্টারে জিগ্যেস করতেই সেখানকার মেয়েটি মিষ্টি হেসে বলল, আপনি ডানদিক দিয়ে সোজা চলে যান, স্যার, একেবারে সামনেই দেখতে পাবেন।

অফিস সংক্রান্ত ব্যাপারেই মনোজকে মাঝে-মাঝে এরকম পার্টিতে আসতে হয়। ককটেল অ্যান্ড ডিনার। একই ধরনের কথাবার্তা, দেঁতো হাসি, মদ্যপান করতে হয় সাবধানে, রাতে নেশা না হয়। খাওয়ারগুলো পাঁচমিশেলি, খানিকটা পাঞ্জাবি, খানিকটা মোগলাই আর খানিকটা ওয়েস্টার্ন, এরকম খাবার মনোজ খুব উপভোগ করে না।

পুনার একটা ফার্মের সঙ্গে কোলাবরেশানে বেশ বড় ধরনের নতুন একটা প্রজেক্ট পেয়েছে মনোজের অফিস, কথাবার্তা প্রায় পাকা, সেইজন্যই আজ সন্ধের পার্টি। সাড়ে সাতটায় আরম্ভ, মনোজ প্রায় একঘণ্টা দেরি করে ফেলেছে, তার ইচ্ছে আগে কেটে পড়া।

লম্বা করিডোর দিয়ে অনেকখানি হেঁটে আসার পর মনোজ দেখতে পেল, সামনেই লেখা রয়েছে পার্ল রুম। দেরি হয়ে গেছে বলে নিশ্চয়ই তাদের এম. ডি. তালুকদার সাহেব একটু ভুরু কুঁচকোবেন। উনি অনেক ব্যাপারে পাক্কা সাহেব, যে-কোনও অ্যাপয়েন্টমেন্টে এক মিনিটও সময়ের এদিক-ওদিক করেন না।

মনোজ তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢুকে পড়ল। ভিড়ের মধ্যে পেছনের দিকে চলে যাওয়া যায়, তাহলে তালুকদার সাহেবকে বোঝানো যেতে পারে যে সে কিছুটা আগেই এসেছে।

ঘরের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশজন নারী-পুরুষ। এইসব পার্টিতে এলেই একটা ভোমরার চাকের মতন গুঞ্জন শোনা যায়, এখানে কেউ জোরে কথা বলে না, জোরে হাসে না।

মনোজ অনেকটা পেছন দিকে চলে এসে অন্যদের থেকে একটু দূরত্ব রেখে দাঁড়াল। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে সে দেখার চেষ্টা করল তালুকদার সাহেব কোন দিকে।

তালুকদার সাহেবকে কোথাও দেখা গেল না।

তালুকদার প্রায় ছ'ফুট লম্বা। চওড়াও কম নয়, সবসময় স্যুট পরে থাকেন, যে-কোনও ভিড়ের মধ্যে তাকে দেখা যাবেই। তাহলে কি তালুকদার আসেননি? এরকম কক্ষনো হয় না। আজ দুপুরেও তাঁর সঙ্গে মনোজের কথা হয়েছে। তাহলে নিশ্চয়ই গুরুতর কিছু ঘটেছে। একটি বেয়ারা এসে তার সামনে ট্রে নিয়ে দাঁড়াতেই মনোজ একটা হুইস্কির গেলাস তুলে নিল।

তাহলে শৈলেশ পান্ডেকে জিগ্যেস করতে হবে তালুকদারের কথা। পান্ডে কোথায়? চতুর্দিকে চোখ বুলিয়ে পান্ডেকেও খুঁজে পেল না মনোজ।

তালুকদার আসেনি, পান্ডে আসেনি, কী ব্যাপার? সুহাস বলেছিল, সে মনোজের সঙ্গেই ফিরবে। সুহাস কোথায়?

হঠাৎ মনোজের শরীরে যেন একটা বিদ্যুৎ তরঙ্গ খেলে গেল। তাদের অফিস থেকে আটজনের আসার কথা, তার মধ্যে সাতজনই সস্ত্রীক। সেই সাতজোড়া স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একজনকেও দেখতে পাচ্ছে না মনোজ। কেউ আসেনি! পার্টি শুরু হয়ে গেছে একঘণ্টা, অথচ এর মধ্যে তাদের অফিসের একজনও আসেনি, এ হতেই পারে না।

তাহলে মনোজ নিশ্চয়ই ভুল জায়গায় এসেছে। দেওয়ালের দিকে ফিরে মনোজ গোপনে পকেট থেকে কার্ডটা বার করে দেখল। না, পার্ল রুম স্পষ্ট লেখা আছে। তারিখ ভুল করারও প্রশ্ন ওঠে না। অফিসে আজই কয়েকজনের সঙ্গে কথা হয়েছে এই পার্টি বিষয়ে। পুনার ফার্মটির কয়েকজনের সঙ্গে তিন-চারদিন ধরে অনেকবার দেখা হয়েছে, ভালোই মুখ চেনা হয়ে গেছে, তাদেরও কেউ নেই। কয়েকজন সরকারি অফিসারের থাকার কথা, তাদেরও দেখা যাচ্ছে না।

তাহলে কি শেষ মুহূর্তে ক্যানসেল্ড হয়ে গেছে কোনও কারণে? অফিস থেকে আজ একটু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে উত্তরপাড়ায় অসুস্থ বড়মামাকে দেখতে যেতে হয়েছিল মনোজকে। সেখান থেকে সে সোজা এসেছে এর মধ্যে অন্য কিছু ঘটে গেল?

সে যাই হোক, মনোজ যে ভুল পার্টিতে এসেছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

কেউ তার দিকে তাকাচ্ছে না, কেউ তার সঙ্গে কথা বলছে না। তবু মনোজের সারা শরীরময় অস্বস্তি। কেউ কি ভাবছে, সে একটা বাজে লোক, বিনা আমন্ত্রণে এখানে ঢুকে পড়েছে বিনা পয়সায় মদ আর খাবার খাবে বলে? সে কারুর সঙ্গে গল্প করছে না দেখে বেয়ারারাও কি সন্দেহ করছে কিছু?

মনোজ একটা ভালো কোম্পানির চিফ ইঞ্জিনিয়ার, কিন্তু এখানে কেউ তাকে চেনে না। কেউ যদি তাকে এসে এখন চ্যালেঞ্জ করে, সে কিছু প্রমাণও করতে পারবে না। এক্ষুনি এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া উচিত। একটা লোক ঢুকল, এক গেলাস মদ খেলো, তারপর কারুর সঙ্গে কিছু কথা না বলে বেরিয়ে গেল, এটাই বা কেমন দেখায়? এখন দরজার সামনেই তিন-চারজন দাঁড়িয়ে আছে, তারা যদি কিছু জিগ্যেস করে?

এক জায়গায় তিন-চারজন মহিলা বসে আছে, তাদের একজনের সঙ্গে চোখাচোখি হতে মহিলাটি চোখ ফিরিয়ে নিল না। বরং তার দৃষ্টিতে যেন ফুটে উঠল কৌতূহল।

মনোজ আর-একবার তাকাতেই মহিলাটি হাসল। তারপর সোজা এগিয়ে এল মনোজের দিকে। মনোজের কেমন যেন ভয় করতে লাগল। অথচ একজন সুন্দরী মহিলাকে দেখে তার কি ভয় পাওয়ার কথা?

মহিলাটি কাছে এসে সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে বলল, কী খবর? অনেকদিন দেখিনি, কলকাতায় ছিলে না বুঝি?

মহিলাটিকে একেবারেই চিনতে পারল না মনোজ। কিন্তু কোনও মহিলার মুখের ওপর সে-কথা বলা যায় না। এমনও হতে পারে, অনেকদিন আগে কোথাও আলাপ হয়েছিল।

এইসব ক্ষেত্রে দু-তিন মিনিট তা-না-না-না করে আলাপ চালিয়ে গেলে হঠাৎ কোনও পরিচয়ের

সূত্র বেরিয়ে পড়ে। তবু তো একজন কথা বলল মনোজের সঙ্গে।

মহিলাটির বয়েস তিরিশের এপাশে-ওপাশে। সাজ পোশাকের বেশ বাড়াবাড়ি আছে, গলায় লম্বা একটা সোনার হার, আজকাল সাধারণত কেউ এরকম হার পরতে সাহস পায় না। মুখখানা সুন্দর, কিন্তু চোখ দুটি বড় বেশি তীক্ষ্ণ।

মনোজ হাত জোড় করে বলল, নমস্কার, ভালো আছেন!

মহিলাটি মনোজের গলা নকল করে বলল, হ্যাঁ গো, মশাই, ভালো আছি। প্রায় দু-বছর আমাদের কোনও খোঁজই নাওনি!

মহিলাটি তাকে তুমি-তুমি বলছে। তার মানে অনেকখানি ঘনিষ্ঠতার সম্পর্ক। মনোজের কি এতটা ভুল হতে পারে? এই মহিলাকে সে জীবনে কখনও দেখেছে বলেই মনে পড়ছে না।

মহিলাটি এবার নীচু গলায় জিগ্যেস করল, আমার ওপর এখনও রাগ আছে বুঝি?

এ প্রশ্নের উত্তর মনোজ কিছু বলার সুযোগ পেল না। মহিলাটি মুখ তুলে একটু দূরের একজনকে ডেকে বলল, এই দ্যাখো, এতকাল পরে বিজন কোথা থেকে এসে হাজির হয়েছে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল, আমাদের সঙ্গে কোনও কথাও বলেনি।

রোগা-পাতলা, ভালোমানুষ চেহারার একজন লোক অন্য একজনের সঙ্গে গল্পে মত্ত ছিল, এদিকে তাকিয়ে যেন ভূত দেখার মতন কয়েক মুহূর্ত থমকে রইল। তারপর এগিয়ে এসে মনোজের পিঠে এক চাপড় মেরে বলল, কী রে, বিজন, তুই এতদিন কোথায় ছিলি! এর মধ্যে গোঁফটা কামিয়ে ফেলেছিস দেখছি!

এবারে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, ওরা মনোজকে অন্য লোক বলে ভুল করেছে।

মনোজ শুধু ভুল পার্টিতে আসেনি, সে এখন অন্য মানুষ!

এখুনি ওদের ভুল না ভাঙিয়ে দিলেও চলে। দেখাই যাক না।

সেই লোকটি বলল, তুই বছর দু-এক আগে হায়দ্রাবাদ থেকে একটা পোস্টকার্ড পাঠিয়েছিলি, তারপর আর কোনও খবর দিসনি!

মনোজ জীবনে কখনও হায়দ্রাবাদে যায়নি। সে তাকিয়ে রইল হাসি-হাসি মুখে।

মহিলাটি জিগ্যেস করল, তোমার মা এখন কেমন অছেন?

মনোজ বলল, ভালো। এখন ভালো আছেন।

এটা মিথ্যে কথা নয়।

লোকটি বলল, এ কী গেলাস খালি কেন? এই বেয়ারা, এদিকে হুইস্কি দাও।

মহিলাটি বলল, এই, তুমি ওকে বেশি-বেশি মদ খাওয়াবে না! তুমি নিজে যত ইচ্ছে খাবে বলে অন্যদেরও জোর করে খাওয়াবে।

পুরুষটি হেসে বলল, সুনন্দা, তোমার দেখছি, স্বামীর চেয়েও বিজনের ওপর বেশি দরদ। অথচ এতদিন তো তোমার খোঁজও নেয়নি।

মহিলাটির নাম জানা গেল। সুনন্দা। পুরুষটির নাম কী?

মনোজ বলল, আমাকে ঘনঘন দিল্লি যেতে হয়েছে, খুব কাজের চাপ ছিল।

সুনন্দা পাতলা অভিমানী গলায় বলল, আহা, তাহলে বুঝি একটা চিঠিও লেখা যায় না?

লোকটি বলল, সেই যে তোমাদের মধ্যে একদিন খুব কথা কাটাকাটি হল, মান-অভিমান, তারপর থেকেই তো বিজন হাওয়া।

সুনন্দা বলল, সেটা আমাদের নিজস্ব ব্যাপার। তার মধ্যে তুমি নাক গলাতে এসো না।

লোকটি বলল, আমি নাক গলাতে চাইও না।

নিজের হুইস্কির গেলাসটা এক নিশ্বাসে শেষ করে সে হঠাৎ আরও কাছে এসে ফিসফিস করে বলল এই পার্টিটা একেবারে ডাল! সবাই গম্ভীর হয়ে আছে। চলো, এখান থেকে কেটে পড়ি।

অরুণের কাছে যাই।

মনোজ বলল, অরুণ?

লোকটি বলল, অরুণের বাড়িতে একটা ঘরোয়া পার্টি আছে। অনেক করে যেতে বলেছিল। তোকে দেখলে খুব খুশি হবে!

সুনন্দা বলল, তাই ভালো। চলো, চলো যাই। কিন্তু অরুণের ওখানেই বা যাওয়ার দরকার কী? আমাদের বাড়িতেই তো বসতে পারি। আমার তো ড্রিঙ্কস রয়েছে।

লোকটি বলল, একবার অরুণের বাড়িটা ছুঁয়ে যেতে হবে।

সুনন্দা মনোজের বাহু ছুঁয়ে বলল, চলো, বিজন, চলো। তোমার জন্য আমার অনেক কথা জমে আছে।

মনোজ ভাবল, এই লোকটি সুনন্দার স্বামী। দুজনকে ঠিক যেন মানায় না। বিজন নামে এদের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছে। তার সঙ্গে সুনন্দার খুব ভাব, মান-অভিমানের সম্পর্ক। কিন্তু সেটা সে স্বামীকে গোপন করে না, তার স্বামী সব জানে, মেনে নিয়েছে। একদিন কোনও কারণে বিজন এই সুনন্দার ওপর রাগ করে চলে গিয়েছিল।

এর আড়ালে যেন একটা গল্প আছে। সেই গল্পটা পুরো জানবার জন্য মনোজের দারুণ কৌতূহল হল। কিন্তু নিজের পরিচয় গোপন করে রাখা কি অন্যায়? ওদের ভুল ভাঙিয়ে দেওয়া উচিত। অবশ্য মনোজ তো নিজে থেকে বিজন সাজেনি। ওদের ভুলটা আর-একটু পরে ভাঙলেই বা ক্ষতি কী?

সে বলল, ঠিক আছে, চলো!

দরজার সামনে একজন লোক সুনন্দার স্বামীকে জিগ্যেস করল, এ কী, প্রীতমদা, এর মধ্যেই চললেন নাকি? খাবেন না?

প্রীতম বলল, না ভাই, আর-একটা জায়গায় যেতেই হবে।

সুনন্দা মনোজের হাত ধরে ততক্ষণে বাইরে নিয়ে এসেছে।

এবারে মনোজ দেখল, পাশেই আর-একটা হল রয়েছে, সেখানেও পার্টি চলছে একটা, তারও বাইরে লেখা পার্ল রুম। পার্ল রুম দুটো আছে, ওয়ান আর টু। মনোজ অত লক্ষ্য করেনি, সে দুনম্বর পার্ল রুমের পার্টিতে যোগ দিয়েছিল।

তার মানে এক নম্বর পার্ল রুমে তার অফিসের পার্টি চলছে। কিন্তু ওখানে গিয়ে এখন আর কী হবে। এখন মনোজ অন্য একটা গল্পে ঢুকে পড়েছে। সে দ্রুত সরে এল সেখান থেকে।

বাইরে এসে প্রীতম গাড়ির নাম্বার বলে দিল। তারপর মনোজকে জিগ্যেস করল, তুই কি এখনও দিল্লিতে থাকছিস?

মনোজ বলল, না, কলকাতায়।

সুনন্দা জিগ্যেস করল, তুমি কি ফ্ল্যাট নিয়েছ, বিজন? কোন পাড়ায়?

মনোজ বলল, যোধপুর পার্ক!

সুনন্দা বলল, তাহলে তো আমাদের বাড়ির কাছেই।

প্রীতম বলল, শালা, তুই চুপিচুপি কলকাতায় ফ্ল্যাট নিয়ে সেটল করেছিস, তবু আমাদের কোনও খবর দিসনি? সুনন্দা বুঝি তোকে খুবই কঠিন কিছু বলেছিল?

সুনন্দা বলল, আমি মোটেই সেরকম কিছু বলিনি সেদিন। বিজন আসলে ভুল বুঝেছিল। তুমি আর আমাদের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না তো।

মনোজ সুনন্দার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। এ কীরকম সম্পর্ক স্বামী-স্ত্রীর। বিজন কি প্রীতমের স্ত্রীর প্রেমিক? প্রীতম সেটা মেনে নিয়েছে?

গাড়িটা এসে পোর্টিকোতে দাঁড়াল।

গাড়িতে উঠতে একটু দ্বিধা করল মনোজ। বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না তো? সে আর কতক্ষণ বিজন সেজে থাকবে? বিজন সত্যিই রাগ করে কিংবা অভিমানে দূরে সরে আছে, সে হয়তো কোনওদিনই এদের মাঝখানে আর আসতে চায় না।

ওঠ-ওঠ বলে প্রায় ঠেলেই মনোজকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিল প্রীতম। সুনন্দাকে মাঝখানে বসিয়ে সে বসল অন্য পাশে।

তারপর প্রীতম বলল, তাহলে অরুণের ওখানে আগে একটু ঘুরে আসব তো?

সুনন্দা বলল, তা আজ থাক। বাড়িতেই চলো। বাড়িতেই আড্ডা দেব। রাত বেশি হয়নি!

প্রীতম বলল, ঠিক আছে। আজ বিজনের অনারে ভালো স্কচের বোতলটা খোলা হবে। কোনও দোকান থেকে কাবাব কিনে নিয়ে গেলে হয় না?

সুনন্দা বলল, দোকানের খাবার দরকার নেই। বাড়িতে মাছ আছে, ভেজে দিতে বলব। বিজন মাছ ভাজা ভালোবাসে।

প্রীতম বলল, তোর কী হয়েছে রে, বিজন? এত চুপচাপ কেন?

মনোজ শুকনোভাবে হেসে বলল, না শুনছি!

খানিকদূর যাওয়ার পর প্রীতম বলল, সুনন্দা, অরুণের বাড়িটা একবার অন্তত না গেলে খারাপ দেখাবে। অনেক করে বলেছিল। চলো না মাত্র আধঘণ্টা থাকব!

সুনন্দা বলল, আজ ইচ্ছে করছে না। তা ছাড়া অরুণটা বিজনকে ভালো করে চেনে না।

প্রীতম বলল, তাহলে এক কাজ করা যাক। তুমি আর বিজন বাড়িতে নেমে যাও! আমি একবার অরুণের ওখানটা ঘুরে আসি।

সুনন্দা ভুরু কুঁচকে বলল, তোমাকে অরুণের বাড়িতে যেতেই হবে? কেন?

প্রীতম বলল, কথা দিয়েছিলাম, একবার ঘুরে আসি!

সুনন্দা বলল, আট-দশজনের পার্টি। একজন না গেলে কিছু হয় না। অরুণও কয়েকবার কথা দিয়ে তারপর আসেনি!

প্রীতম বলল, তুমি যেতে না চাও যেও না, কিন্তু আমি গেলে তোমার আপত্তি কীসের?

সুনন্দা বলল, তুমি একবার ওখানে জমে গেলে কতক্ষণে ফিরবে তার কোনও ঠিক নেই। আমরা শুধু-শুধু বসে থাকব?

প্রীতম এবার ভুরু তুলে কৌতুকের সুরে বলল, শুধু-শুধু বসে থাকবে কেন? গল্প করবে। তুমিই তো বললে, বিজনের জন্য তোমার অনেক গল্প জমে আছে। আমি সেখানে থেকে কী করব?

সুনন্দা হঠাৎ তীব্রভাবে বলল, তার মানে?

প্রীতম হাসতে-হাসতেই বলল, তার মানে, তোমাদের মান-অভিমান ভাঙাবার ব্যাপার চলবে। তার মধ্যে থেকে আমি কী করব?

সুনন্দা বলল, তুমি কী ভাবছ বলত?

প্রীতম বলল, আমি কিছুই ভাবছি না। তোমরা গল্প করো না নিরিবিলিতে!

সুনন্দা বলল, বিজনের সঙ্গে তুমি বুঝি গল্প করতে চাও না?

প্রীতম বলল, আমি ফিরে আসি। তখন গল্প হবে। বিজনকে আজ রাতটা রেখে দাও আমাদের ওখানে!

সুনন্দা বলল, তোমার আজ অরুণের বাড়িতে যাওয়া চলবে না।

প্রীতম বলল, তুমি এত আপত্তি করছ কেন? আমি তোমাদের দুজনকে খানিকটা সুযোগ দিচ্ছি—

সুনন্দা চিৎকার করে বলল, সুযোগ দিচ্ছ? ছিছি-ছিছি, তুমি এমন একটা কথা বলতে পারলে আমাকে?

প্রীতম বলল, অত উত্তেজিত হোয়ো না।

সুনন্দা বলল, গাড়ি থামাও! আমি এক্ষুনি নেমে যাব!

প্রীতম বলল, এই, এই, কী হচ্ছে কী? বিজন, তুই একটু বুঝিয়ে বলত?

মনোজ গম্ভীরভাবে বলল, আমি বিজন নই!

সুনন্দা গাড়ির দরজা খুলতে যাচ্ছিল, চমকে ফিরে তাকাল।

মনোজ বলল, আমি বিজন নই, কোনও কালে আমার গোঁফ ছিল না। আমার নাম মনোজ বর্মন, আমি স্মিথ মার্টিন কোম্পানিতে কাজ করি। আপনারা আমাকে বিজন বলে ভুল করেছিলেন, তাই আমি একটু মজা করছিলাম!

প্রীতম মনোজের চিবুকটা ধরে ঘুরিয়ে দিল। তারপর ফিসফিস করে বলল, প্রায় হুবহু মিল, শুধু ডানদিকের জুলপির পাশে কাটা দাগটা নেই!

সুনন্দা ফ্যাকাসে গলায় বলল, তুমি...আপনি সত্যি বিজন নন!

মনোজ বলল, মাপ করবেন! প্রথমেই হয়তো আমার বলা উচিত ছিল।

প্রীতম বলল, সত্যিই তো! যাক গে, তাতে কী হয়েছে, আপনি বিজন না হোন মনোজই হলেন। চলুন, আপনার সঙ্গেই আলাপ করা যাক। আমাদের বাড়িতে চলুন। আমি তাহলে অরুণের ওখানে যাব না!

মনোজ বলল, আজ থাক। আজ আমাকে তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। আমাকে ওই সামনের মোড়ে নামিয়ে দিন। ওখানে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে।

সুনন্দা একেবারে চুপ করে গেছে। প্রীতম আরও কয়েকবার অনুরোধ করলেও মনোজ প্রায় জোর করেই নেমে গেল গাড়ি থেকে।

রাস্তায় নেমে একটা সিগারেট ধরাল মনোজ। তার মনে হল, ভুল করে অন্য পার্টিতে ঢুকে পড়া যায়, কিন্তু জোর করে অন্যের জীবনের গল্পের মধ্যে ঢুকে পড়া বিপজ্জনক। সেই জন্যই বোধহয় তার বুক কাঁপছে।

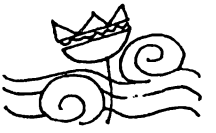

সুধাময়ের বাবা

ধানের বদলে এবার রজনীগন্ধার চাষ দিয়েছে জয়কেষ্ট। নতুন রকমের চাষ, তাই তার শরীরে এসেছে নতুন শক্তির জোয়ার।

বুদ্ধিটা দিয়েছিল কাশেম আলি। ফুলের চাষের কথা জয়কেষ্ট সাতজন্মে শোনেনি। ফুল ফোটে বসত বাড়ির ধারে পাশে, চাষের জমিতে ফলে ধান, পাট, গম রবিশস্য! কিন্তু কাশেম আলি বললেন, ফুলেরও ভালো বাজার আছে, দরও বেশ চড়া, ঝপ করে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

ফুলের বাগান নয়, ফুল চাষের খেতে ঘুরছে জয়কেষ্ট, এর মধ্যেই কুঁড়ি আসতে শুরু করেছে, ফসল তোলার আর দেরি নেই। এই মাল বেচবার জন্য হাটে যেতে হয় না, কলকাতার হাওড়া ব্রিজের নীচে বিরাট ফুলের বাজার, সেখানকার পাইকাররা এসে মাল তুলে নিয়ে যায়।

একটা ঝাড়ে কুঁড়ি ফুটে গেছে, সবুজের মধ্যে ফুটফুট করছে সাদা-সাদা ফুলের গন্ধ। জয়কেষ্ট আপন মনে বলল, আহা রে। ধান কাটার সময় মায়া লাগে না। অনেকখানি ডাঁটা শুদ্ধু এই গাছ

কেটে ফেলতে হবে।

হঠাৎ জয়কেষ্টর মনে হল, তার পায়ের তলায় মাটি কাঁপছে। এ কী, ভূমিকম্প শুরু হল নাকি? জয়কেষ্টর পা কাঁপছে, বুক কাঁপছে, মাথা ঘুরছে। না, এ তো তার শরীরের অসুখ নয়, ফুলগাছগুলোও দুলছে খুব জোরে-জোরে, অথচ বাতাস নেই, তাহলে দুলছেন বসুমতী।

কিন্তু একটু দূরের তালগাছ জোড়া স্থির, তার জমির দুপাশের ধানের খেতে ঢেউ নেই, আর কোথাও কোনও চাঞ্চল্য নেই। তাহলে কি ফুলের খেতই শুধু কাঁপে? হবেও বা। মাটি থেকে ধানের চারায় যে রস ওঠে, আর ফুলের চারায় যে রস ওঠে, তা নিশ্চয়ই আলাদা।

জয়কেষ্ট গুটিগুটি পায়ে বাড়ি ফিরতে লাগল। এসেছে সেই কাকভোরে। এখন সূর্য মাথার ওপরে। এখন আর জমিতে অত তদারকি লাগে না, কীটনাশক স্প্রে করে দিয়েছে, দুদিন বৃষ্টির জন্য ভিজে আছে জমি। তবু জয়কেষ্ট এখানে এসে বসে থাকে। বসে থাকতে তার ভালো লাগে। নতুন রকম চাষ তো!

বাড়ি বেশ খানিকটা দূরে। হাঁটতে-হাঁটতে জয়কেষ্ট দুপাশের জমির দিকে তাকায়। আগে এইসব অনেকটাই ছিল তাদের বংশের। দুই কাকা মামলা করে অনেকখানি নিয়ে নিয়েছে। জয়কেষ্টর তিন মেয়ের বিয়ের জন্য মোট চোদ্দো বিঘে জমি বেচতে হয়েছে। এখন আছে মাত্র পাঁচ বিঘে। তাতে সম্বৎসরের খোরাকি জোটানো কষ্টকর, একটা বড় পুকুরের ছ'আনি মালিকানা আছে বলে কিছু টাকা পায়। চলে যায় কোনওক্রমে। আগে জয়কেষ্ট নিজের হাতে চাষও করত না। তারা আসলে তাঁতি, তারা কখনও হাল ধরেনি। কিন্তু এখন মিলের যুগ, কো-অপারেটিভের যুগ, একলা তাঁত বুনে কোনও সুসার নেই, পড়তা পোষায় না। তাঁতগুলো পড়ে-পড়ে পচছিল, কিছুদিন আগে উনুনে গুঁজে দেওয়া হয়েছে। জমিও অন্যদের হাতে ফেলে রাখা যায় না। বর্গাদার নাম লিখিয়ে নেবে।

জয়কেষ্ট নিজেই মাঝে-মাঝে হাসতে-হাসতে বলে, খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে, কাল হল তার এঁড়ে গরু কিনে।

বাড়ির কাছাকাছি এসে জয়কেষ্ট একটা কান্নার শব্দ শুনতে পেল। তার বাড়িতেই কেউ কাঁদছে।

উঠোনে জয়কেষ্টর স্ত্রী দামিনীকে ঘিরে রয়েছে গুটিপাঁচেক রমণী। দামিনী মাথা চাপড়ে চাপড়ে ডাক ছেড়ে কান্নাকাটি করছে। প্রতিবেশী পুরুষরা দাঁড়িয়ে আছে অনেক দূরে, তারা বাড়ির মধ্যে আসবে না।

এই কিছুক্ষণ আগে, দশ-বারোজন লোক লাঠি-সোঁটা-বর্শা নিয়ে এসেছিল। তারা লুটপাট করেনি, শুধু সুধাময়কে জোর করে টেনে-হিঁচড়ে ধরে নিয়ে গেছে। সুধাময় তখন পড়তে বসেছিল। এই দম্পতির প্রথমেই একটি ছেলে জন্মেছিল, সে বেঁচে নেই, তিন মেয়ের পর ছোট ছেলে সুধাময়, সে কলেজে দুটো পাস দিয়েছে, আর-একটা পাস বাকি। এ-বংশের কেউ আগে স্কুলের পাঁচ ক্লাসের বেশি পেরোয়নি। সুধাময় একেবারে কলেজে। তাও তার মাইনে লাগে না, জলপানি পায়। পড়ার দিকে তার এত ঝোঁক যে, বই নিয়ে বসলে নাওয়া-খাওয়ার জ্ঞান থাকে না। কিন্তু তাঁতির ছেলের পেটে অত বিদ্যে সহ্য হবে কেন, উগ্রপন্থী রাজনীতিতে যোগ দিয়ে সে ইদানীং আর কলেজে যায় না। ছেলে একটা মাস্টারির চাকরি পেলেও জয়কেষ্ট বর্তে যেত, এই বয়েসে তাকে আর জমির জন্য খেটে মরতে হত না। কিন্তু শুধু নিজেদের সংসার নিয়ে চিন্তা করার সময় নেই সুধাময়ের। সারা পৃথিবীর দায়িত্ব তার ঘাড়ে চেপেছে যে! এখনকার দিনকালে এক দঙ্গল লোক মিলে যদি কোনও একটা জোয়ান ছেলেকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যায়, তবে তার পরিণতি একটাই। খানিক বাদে মাঠের মধ্যে কিংবা খাল ধারে পাওয়া যাবে সুধাময়ের লাশ।

একটা গাছের মতন চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল জয়কেষ্ট। দামিনীর বুকফাটা কান্নায় সে কী সান্ত্বনা দেবে! দামিনীও তো বুঝেছে, তাই এত কান্না।

এখন বদলা-বদলির যুগ। খুনোখুনি জল ভাত। যাদের বাপ চোদ্দোপুরুষ কোনওদিন যুদ্ধ করেনি, যাদের কোনও সাহস নেই, তারা দশ-বারোজন মিলে একজন নিরস্ত্র লোককে অনায়াসে মেরে ফেলে। সুধাময়ের দলের লোকেরাও নিশ্চয়ই অন্য দলের কোনও ছেলেকে বেকায়দায় পেয়ে খুন করেছে। সেই খুনের সময় সুধাময় উপস্থিত থাকুক বা না থাকুক, দলের তো বটে। হাতের কাছে তাকে পাওয়া গেছে। সুধাময়ের দলের ছেলেরা যখন এখবর শুনবে, তখন তারা সুধাময়কে বাঁচাবার জন্য একটুও চেষ্টা করবে না, এখন লুকিয়ে পড়বে, মনে-মনে বলবে, ঠিক আছে, সুধাকে মারুক না, আমরাও পরে ওদের একটাকে মেরে শোধ নেব।

ছেলের জন্য শোক করবে কী, খিদেয় জয়কেষ্টর পেট জ্বলছে। সকাল থেকে কিছু খায়নি, এখন তার ভাত খাওয়ার কথা। এই বয়েসে খিদে সহ্য হয় না। ছেলে মরছে বলে কি তার পেটের আগুন চুপ করে থাকবে?

একটা কিছু করা দরকার ঠিকই। পার্টির নেতাদের কাছে যেতে হবে, পুলিশের কাছে যেতে হবে। কিন্তু খিদেয় দুর্বল শরীর নিয়ে জয়কেষ্ট যে এক পা-ও হাঁটতে পারবে না।

স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে সে মনে-মনে বলল, দামিনী, ছেলের জন্য কষ্ট সহ্য করতে যদি না পারিস, তাহলে আর কী করবি, মরে যা! তিপান্ন বছর তো বাঁচলি। মায়ের কান্না শুনে খুনোখুনি বন্ধ হয় না। যারা খুন হচ্ছে এবং পরে আরও যারা খুন হবে, তাদের প্রত্যেকেরই তো মা আছে।

রান্নাঘরে ঢুকে নিজেই সে খেতে বসে গেল।

এ-গ্রামে সুধাময়দের দলের কোনও ঘাঁটি নেই। লেখাপড়া জানা ছেলের কী বুদ্ধি, কাছাকাছি কোনও মুরব্বি না ধরে, সে এগারো মাইল দূরে কলেজপাড়ার দলে নাম লেখাতে গেল! এ-গ্রাম থেকে কোনও সাহায্য পাওয়া যাবে না। নিজের দলের ছেলে না হলে আজকাল কোনও পার্টিই মাথা ঘামায় না। এ-গ্রামের নেতা নরেনবাবু। তিনি বলবেন, সুধাময় খুন হয়েছে। ও তো একটা সমাজবিরোধী।

আর পুলিশ? নরেনবাবুর পার্টির ছেলে হলে পুলিশ তবু ব্যস্ত হওয়ার ভান করত, সুধাময়দের পার্টির নাম শুনলেই পুলিশ দাঁত কিড়মিড় করে। নিশ্চয়ই বলবে, যাক গেছে, একটা আপদ গেছে! সমাজবিরোধীর বাবা হিসেবে জয়কেষ্টকেই না গরাদে ভরে দেয়!

তবু তো যেতে হবে জয়কেষ্টকে।

রোগাপাতলা চেহারা সুধাময়ের। একসঙ্গে অত লোককে আসতে দেখে সে দিশাহারা হয়ে শূন্য গোয়ালঘরে লুকিয়েছিল। সেখান থেকে চুলের মুঠি ধরে তাকে টেনে বার করা হয়েছে। দামিনী বাধা দিতে এসেছিল, তাকে প্রচণ্ড ধাক্কায় মাটিতে ফেলে বুকের ওপর পা ধরেছিল একজন। উঠোনে ছড়িয়ে আছে দামিনীর ভাঙা কাচের চুড়ি, সুধাময়ের একপাটি চটি, গেঞ্জির ছেঁড়া টুকরো ঠোঁট থেকে গড়ানো কয়েক ফোঁটা রক্ত। এখনও কি বেঁচে আছে সুধাময়?

গ্রামের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে লাগল জয়কেষ্ট।

অনেকের মনেই নেই যে জয়কেষ্টও একসময় জেল খেটেছিল। তার বয়েস কি কম হল? ইংরেজ আমলে, সেই ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় তার বয়েস ছিল সুধাময়ের সমান। জয়কেষ্ট অবশ্য পার্টি-ফার্টিতে নাম লেখায়নি, কিন্তু সেই বিয়াল্লিশ সালে আবেগের একটা জোয়ার এল, কংগ্রেসের নেতারা সবাইকে ডাক দিলেন, সবার ঘরে-ঘরে গান্ধীজির ছবি। জয়কেষ্টও মিছিলের সঙ্গে গিয়েছিল আদালত ঘেরাও করতে। কী মার মেরেছিল পুলিশ! একটা দৃশ্য জয়কেষ্টর এখনও মনে আছে। এই অঞ্চলে কংগ্রেসের নেতা ছিলেন সত্যময় সেন, কী সুন্দর, সৌম্য চেহারা ছিল তাঁর। অনেকটা যেন সুভাষ বসুর মতন। সাদা খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবি পরা, মাথায় গান্ধী টুপি, মিছিলের একেবারে সামনে ছিলেন তিনি। পুলিশ এসে লাঠি চালাল, সত্যময় সেনের কপাল থেঁতলে গিয়ে রক্তে ভিজে গেল সাদা জামা। তিনি একটুও বিচলিত হলেন না, হাত তুলে সবাইকে বললেন এগিয়ে

যাওয়ার জন্য। জয়কেষ্ট অবশ্য মার খায়নি। তবে সত্যময়বাবুর কাছাকাছি ছিল বলে সে-ও ধরা পড়ে জেল খেটেছিল দু-মাস। ছাড়া পাওয়ার পর বাবার ধমক খেয়ে বাড়ি থেকে আর বেরুত না। তারপর তো স্বাধীনতা এল। সত্যময়বাবু তখন বাতে পঙ্গু। এখানকার কংগ্রেসের নেতা হলেন তাঁর ভাই অঘোরনাথ। একদিন জয়কেষ্ট দেখল, সত্যময়বাবুদের বাড়ির সামনে চেয়ার পেতে বসে আছে দারোগাবাবু, লুচি আর মাংস খাচ্ছেন। শিউরে উঠেছিল জয়কেষ্ট। যে পুলিশ সত্যময়বাবুকে অমনভাবে মেরেছিল, আজ তাঁর বাড়িতেই পুলিশের এত খাতির? পুলিশরা সব গঙ্গাজলে ধোয়া শুদ্ধ হয়ে গেল নাকি? কোথায় কী, এক-একটা বছর যায়, জয়কেষ্ট দেখতে পায় পুলিস ঠিক সেইরকমই আছে। কিংবা আগেকার চেয়েও বেশি লোভী! জমিদার-জোতদার ঠিকাদারদের কথায় ওঠে বসে, গরিবের কথা কেউ শোনে না। অঘোরনাথবাবুরও ওইসব লোকদের সঙ্গেই ওঠা-বসা। প্রায়ই তিনি থানায় যান। একবার কংগ্রেসের দুটো ছেলে ডাকাতির দায়ে ধরা পড়ল, অঘোরনাথবাবু দিব্যি তাদের ছড়িয়ে আনলেন। তারা ড্যাং-ড্যাং করে ঘুরে বেড়ায়।

সেই সময় সেই তল্লাটে এলেন জীবন ঘোষাল। তখন এখানে কেউ কমিউনিস্ট পার্টির নামও শোনেনি। জীবন ঘোষাল একাই এখানে পার্টির তিনটে শাখা অফিস গড়ে তুললেন, কী পরিশ্রমটাই না করতে পারতেন তিনি। কোথায় খাবেন, কোথায় ঘুমোবেন তার ঠিক নেই। গ্রামে-গ্রামে ঘুরে যে-কোনও চাষির বাড়ির দাওয়ায় শুয়ে থাকবেন। চাষি-মজুর-তাঁতি-জেলেদের তিনি এককাট্টা করেছিলেন, তিনি সবসময় বলতেন, গরিবরা চিরকাল পড়ে-পড়ে মার খাবে নাকি? দিন বদলাচ্ছে, বুঝলি জয়কেষ্ট, চাষি মজুররাই এরপর গভর্নমেন্ট চালাবে।

একবার জ্বরে পড়ে জীবন ঘোষাল পরপর তিনরাত ছিলেন জয়কেষ্টদের বাড়ি। যেমন জ্বর, তেমনি কাশি। ওষুধপত্তর কিছু খেলেন না, অসাধারণ তাঁর মনে জোর। জীবন ঘোষালের কথা চিন্তা করলে এখনও শ্রদ্ধায় জয়কেষ্টর মাথা নীচু হয়ে আসে। নিজস্ব বাড়ি, ঘর সংসার কিছুই ছিল না তাঁর। পুলিসের হাতে কম মার খেয়েছেন? তখন অবশ্য খুনোখুনি ছিল না, কংগ্রেসিরা নানান ছুতোয় তাঁকে গ্রেপ্তার করায় তিন-তিনবার জেল খাটলেন, জেল থেকে বেরিয়ে এসেই আরও বেশি উৎসাহে কাজে লেগে পড়তেন। একবার জেল থেকে বেরিয়ে এসে দেখিয়েছিলেন, পুলিশ তাঁর ডানহাতের কনুই ছেঁচে দিয়েছিল, সেই হাত আর তুলতে পারতেন না তিনি, ভাত খাওয়া অভ্যেস করলেন বাঁ-হাত দিয়ে।

শেষদিকে থাকতেন পার্টি অফিসে। টি বি রোগের কথা কারুকে জানতে দেননি, মারা গেলেন পঁয়ষট্টি সালে, তার পরের বারের ভোটেই কংগ্রেস এদিকে হেরে ভূত হয়ে গেল। জীবন ঘোষাল তাঁর পার্টির সুদিন দেখে যেতে পারলেন না। পরবর্তী নেতা হলেন বীরেনবাবু। এখন নরেনবাবু। কংগ্রেস আর একবারও জিততে পারেনি, এখান থেকে প্রায় মুছেই গেছে। নরেনবাবুর সঙ্গে এখন পুলিসের খুব দহরম-মহরম। দারোগারা হাত কচলিয়ে স্যার-স্যার করে। নরেনবাবুর পার্টির ছেলেরা জোর জুলুম করে চাঁদা তোলে, যাকে-তাকে ধরে পিটিয়ে দেয়, পুলিশ কিছু বলে না। নরেনবাবুর চেহারাটাও যেন দিন-দিন অঘোরনাথবাবুর মতন হয়ে যাচ্ছে!

সুধাময়টা কী বোকা, সে যদি নরেনবাবুর পার্টিতে গিয়ে জুটত, তাহলে কিছুদিনের মধ্যে নেতা-গোছের হয়ে যেতে পারত, পয়সাকড়িরও অভাব থাকত না। তা নয়। সে গিয়ে জুটল আর এক সর্বহারার পার্টিতে।

জয়কেষ্ট ফিরে এল সাতদিন পর। সুধাময়ের লাশ এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি বটে, কিন্তু তার বাঁচার সম্ভাবনাও কেউ বিশ্বাস করে না। বিভিন্ন পার্টি অফিস, স্থানীয় থানা, সদর থানা, মন্ত্রীর দালাল—এইসব জায়গায় ঠোক্কর খেতে-খেতে জয়কেষ্টর মন বাড়ি ফেরার জন্য উতলা হয়ে উঠল।

তার বাড়িতে কেউ নেই, দরজা হা-হা করছে। দামিনী খুবই অসুস্থ হয়ে পড়ায় তার বড়

ভাইয়ের ছেলে সুধীর এসেছিল, দামিনীকে সে হাসপাতালে ভরতি করে দিয়েছে। এখন-তখন অবস্থা। বাড়ি ফাঁকা পেয়ে এরমধ্যে চোরেরা দরজা ভেঙে যা পেরেছে জিনিসপত্র নিয়ে গেছে।

জয়কেষ্ট এসব কিছুই গায়ে মাখল না। দামিনীকে দেখতে একবার হাসপাতালে তো যেতেই হবে। কিন্তু তার আগে সে তার ফুলের চাষ দেখে যাবে না? ওই টানেই তো বেশি করে ছুটে এসেছে।

এই সাতদিন আর বৃষ্টি হয়নি, জল দেয়নি কেউ, তবু ফুটে গেছে সব কুঁড়ি। নিজের ফুলের খেতে এসে অভিভূত হয়ে গেল জয়কেষ্ট! এত ফুল সে নিজের হাতে ফুটিয়েছে। পৃথিবীটাই এখন শ্বেতশুভ্র। কী সুন্দর গন্ধ! আর বেশি ফুটে গেলে এ ফুল আর বিক্রি হবে না। বিক্রি করবার তার সময়ই বা কোথায়!

কাশির দমক শুনে সে ঘুরে তাকাল। তালগাছ দুটির ফাঁকে একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে ঢ্যাঙা চেহারা, কালো রং, মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। আধময়লা পাঞ্জাবি পরা। চিনতে ভুল হল না জয়কেষ্টর। এ তো জীবন ঘোষাল!

মৃত্যুর ওপারের দেশ থেকে এই দিনদুপুরে জীবন ঘোষাল কী করে ফিরে আসবে সে প্রশ্নই তার মনে জাগল না। এইভাবে জীবন ঘোষালকে কতবার দেখেছে।

জয়কেষ্ট জিগ্যেস করল, কেমন আছ, জীবনদা?

জীবন ঘোষাল কোনওদিন নিজের শরীর-স্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলা পছন্দ করতেন না। আজও এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বললেন, ছেলেটাকে খুঁজে পেলি না তো, জয়কেষ্ট? পাবি না। এখন ধরে নিয়ে গেলে আর ছাড়ে না। আধমরাও করে না, একেবারে জানে মেরে দেয়। বুকে গুলি করার পরও ছুরি দিয়ে পেট ফাঁসায়। নদীতে ফেলে দিলে লাশও পাওয়া যায় না।

সাতদিনের মধ্যে এই প্রথম দু-ফোঁটা জল গড়িয়ে এল জয়কেষ্টর চোখ দিয়ে। এই ক'দিন অন্যদের কথা ঠিক সে বিশ্বাস করেনি। কিন্তু জীবন ঘোষালের কথা অবিশ্বাস করা যায় না। সুধাময় আর নেই।

একটুক্ষণ জীবন ঘোষালের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকার পর সে পটাপট করে কিছু ফুল ছিঁড়ল। তারপর এগিয়ে গিয়ে বলল, জীবনদা, তোমার মতো খাঁটি মানুষ আমি আর দেখিনি। তুমি মরার পর তোমার পায়ে আমি ফুল দিতে পারিনি—

জীবন ঘোষাল বললেন, দুর বোকা! ফুল দিয়ে কী হবে। তুই মরলে কে তোকে ফুল দেবে, কেউ না! ও, তুই নিজেই তো ফুলের চাষ করেছিস! তাহলে এক কাজ কর জয়কেষ্ট, তুই এখানেই মরে যা! আর বেঁচে থেকে কী করবি? তোর ছেলেটা গেছে, বউটারও আর আশা নেই, আর কে আছে? তোদের মতন মানুষদের দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে। ছুরি-ছোরা-বন্দুক-বোমা নিয়ে আর কি লড়তে পারবি? যদি না পারিস—

জীবন ঘোষাল অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর জয়কেষ্ট শুয়ে পড়ল তার জমিতে। জীবনদা ঠিক সময় এসে ঠিক কথাটা বলে গেছেন। অন্য জায়গায় তার মৃত্যু হলে কে তাকে ফুল দিত! এই তো কী সুন্দর, কী শান্তি, তার নিজের হাতে তৈরি করা ফুল!

জয়কেষ্ট টের পেল, তলার মাটি কাঁপছে।

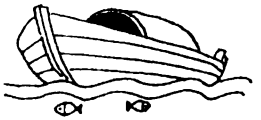

নদীর মাঝখানে

অনেক লোকজনের ভিড় ঠেলে সেই মেয়েটি এসে অবনীশের পায়ের ওপর একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রণাম করবার জন্য।

অবনীশ সেই মুহূর্তে হেডমাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করছিলেন, বেশ চমকে উঠে কিছুটা পিছিয়ে গেলেন। মেয়েটি হাঁটু গেড়ে বসে থাকা অবস্থাতেই মুখ তুলে জিগ্যেস করল, আমায় চিনতে পারছেন? মনে আছে?

কোনও মেয়েকে মুখের ওপর মনে নেই, চিনতে পারছি না বলা যায় না। অবনীশ হাসি-হাসি মুখ করে মাথাটা হেলালেন একটুখানি।

হেডমাস্টার ও অন্যান্য কয়েকজন বললেন, আরে পাগল মেয়ে, ওঠ, ওঠ!

মেয়েটি এবার উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমার নাম শান্তি, শান্তি সান্যাল। আপনি বর্ধমানে বইমেলায় আমার খাতায় চার লাইন কবিতা লিখে দিয়েছিলেন।

অবনীশ এবার খুব নিপুণ মিথ্যে আন্তরিকতার সঙ্গে বললেন, বাঃ, মনে থাকবে না কেন?

হেডমাস্টার মশায়ের সঙ্গে আলোচনা আর জমল না। অন্যদের দু-একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগলেন অবনীশ। শান্তি মাঝে-মাঝে বাধা দিয়ে বলতে লাগল, আঃ, তোমরা ওঁকে অত বিরক্ত কোরো না, উনি টায়ার্ড হয়ে আছেন। বিকেলবেলা তো উনি মিটিং-এ বলবেনই।

অন্যরা তবু ছাড়তে চায় না, শান্তি তাঁর হাত ধরে টেনে বলল, এই ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে কী করবেন? আসুন, আমার সঙ্গে আসুন!

ইস্কুল বাড়ির সামনের মাঠে মেলা বসেছে। একদিকে ঘুরছে নাগরদোলা। আর-একদিকে মঞ্চ বাঁধা হচ্ছে, বিকেলে সেখানে শুরু হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অবনীশ সেটা উদ্বোধন করবেন।

প্যান্ট-শার্টের বদলে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে এসেছেন অবনীশ। তিনি ভেবেছিলেন, গ্রামের অনুষ্ঠানে প্যান্ট-শার্ট পরাটা মানাবে না। এসে অবশ্য দেখছেন, গ্রামের অনেকেই এখন প্যান্ট-শার্ট পরে, ইস্কুলের মাস্টাররা পর্যন্ত, ধুতি প্রায় চোখেই পড়ে না।

ইস্কুল বাড়ির পেছন দিকে ছোট বাগান আর পুকুর। বেশ পরিষ্কার জল। হাঁটতে-হাঁটতে সেদিকে এসে শান্তি বলল, আপনার সঙ্গে যখন প্রথম দেখা হয়, তখন আমি ছাত্রী ছিলাম।

কিছু একটা কথা খুঁজে পেয়ে অবনীশ জিগ্যেস করলেন, তুমি কোন কলেজ থেকে পাস করেছ? এখন তুমি কী করো?

শান্তি ফিক করে হেসে বলল, আমাদের এখানেই তো কলেজ আছে। মাত্র তিন মাইল দূরে! সেখান থেকেই পাস করেছি। তারপর এখন বেকার। হাজার-হাজার ছেলেমেয়ের মতন! টুকটাক টিউশনি করি।

অবনীশ অনেকদিন কোনও গ্রামের দিকে আসেননি। আজকাল অনেক জায়গাতেই কলেজে হয়েছে। গ্রামের ছেলেমেয়েদের উচ্চশিক্ষার জন্য শহরে আসতে হয় না। খুব ভালো কথা। গ্রামের ছেলেমেয়েরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে এবং গ্রামে শিক্ষিত বেকার তৈরি হচ্ছে। গ্রামের মেয়ে টিউশনি করে জীবিকা অর্জন করছে, এটা তাঁর কাছে একেবারে নতুন খবর!

কালো রঙের ছিটছিপে গড়ন শান্তির। মুখখানায় তেমন সৌন্দর্য নেই তবে সপ্রতিভ ভাব আছে। সে কথা বলার সময় অবনীশের চোখের দিকে সোজাসুজি তাকায়।

সে আবার হেসে বলল, আপনি আমাকে মোটেই চিনতে পারেননি, পারবেনও না তা জানতুম!

অবনীশ বললেন, তুমি গ্রাজুয়েট মেয়ে, অমন টিপ করে পায়ের ওপর আছড়ে প্রণাম করতে গেলে কেন? সেইজন্যই তোমায় চিনতে পারিনি। অত ভক্তির কী আছে!

শান্তি বলল, ওইরকম করতে হল আপনার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য। যদি শুধু অটোগ্রাফের খাতা বাড়িয়ে দিতুম, আপনি আমার মুখের দিকে ফিরেও তাকাতেন না! আপনি কি ভিড় পছন্দ করেন?

—না! একেবারেই না!

—তাহলে এইসব সভা-সমিতিতে আসেন কেন?

—দু-একটা জায়গায় না গিয়ে পারা যায় না। চেনাশুনারা ধরাধরি করে। তবে, এ জায়গাটায় আমি আগ্রহ করেই এসেছি। অনেকদিন গ্রামের মাটিতে পা দিইনি, খেজুরের রস খাইনি!

—ভাগ্যিস এসেছেন, তাই আপনাকে কাছাকাছি পাওয়া গেল। আপনার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। আজ রাত্তিরটা থাকছেন তো? কাল সকালে আপনাকে খেজুরের রস খাওয়াব।

—আমার সঙ্গে তোমার অনেক কথা আছে?

—হ্যাঁ। তার আগে একটা অভিযোগ জানাই। আমি আপনাকে অন্তত সাতখানা চিঠি লিখেছি। আপনি মোটে একবার উত্তর দিয়েছেন, সেই প্রথমবার। তারপর একদম চুপ। আমাদের বুঝি চিঠি লিখতে পয়সা খরচ হয় না?

চিঠির প্রসঙ্গে অবনীশের মনে পড়ল! হ্যাঁ, শান্তি সান্যাল নামটা তার চেনা। বেশ গোটা-গোটা হাতের লেখা। চিঠির সঙ্গে একটি-দুটি কবিতা থাকে।

সব চিঠির উত্তর দেওয়া যায় না। শুধু সময়ের অভাবেই নয়। একজনকেই বারবার কী লিখবেন! সাধারণ চিঠি লিখতে ইচ্ছে করে না। প্রায় প্রতিটি চিঠিকেই অসাধারণ করে তোলার প্রতিভা একমাত্র রবীন্দ্রনাথেরই ছিল।

চিঠির সঙ্গে যদি কেউ গল্প-কবিতা পাঠায়, তাহলে উত্তর দেওয়া আরও মুশকিল হয়। সেই সব লেখা খারাপ লাগলে মিথ্যে প্রশংসা করা যায় না, আবার সত্যি কথাও বলা যায় না।

শান্তির কবিতাগুলি বেশ কাঁচা। কবি হওয়ার কোনও সম্ভাবনাই তার মধ্যে নেই।

অবনীশ কথা ঘোরাবার জন্য বললেন, তোমার কবিতাগুলো আমার মনে পড়ছে। তুমি শুধু প্রেমের কবিতা লেখো। কারুর সঙ্গে তোমার গভীর প্রেম আছে বুঝি?

শান্তি বলল, ওসব বানানো। গ্রামে আবার প্রেম নয় নাকি?

—কেন, রাধা-কৃষ্ণও তো গ্রামের ছেলেমেয়ে ছিল!

—কৃষ্ণ কালো, রাধা ফরসা। এটা মনে নেই? কালো মেয়েরা প্রেমিকা হতে পারে না। কেউ পাত্তাই দেয় না!

অবনীশ বুঝতে পারলেন, এই প্রসঙ্গটা আর বেশিদূর না টানাই ভালো। শান্তি শুধু বেকার নয়! তার বয়েসি মেয়েদের বিয়ে হয়ে যাওয়ার কথা। বিশেষত গ্রামে। শান্তির বিয়ে হয়নি বোঝাই যাচ্ছে।

পুকুরের ঘাটে বসে অবনীশ একটা সিগারেট ধরাতেই উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে দুটি ছেলে এসে বলল, স্যার, আপনাকে আমাদের প্রেসিডেন্ট একবার ডাকছেন।

শান্তি একজনকে ধমক দিয়ে বলল, আবার ওনাকে বিরক্ত করছিস? প্রেসিডেন্টকে বল যে উনি গ্রাম দেখতে বেরিয়ে গেছেন।

অন্যজনকে সে বলল এই তাপস, তোরা ওনাকে ডেকে নিয়ে এসে শুধু বকাবকি করবি?

উনি কাছাকাছি গ্রাম-ট্রাম একটু ঘুরে দেখতে চান।

তাপস বলল, একটা গাড়ির ব্যবস্থা হচ্ছে। দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর ওঁকে নিয়ে বেরুনো হবে। প্রেসিডেন্ট বলেছেন, বিকেলে তাঁর বাড়িতে স্যারকে চা খেতে হবে।

শান্তি সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে বলল, শুনলেন তো। এরা যা ঠিক করবে, আপনাকে তাই করতে হবে! আপনি প্রেসিডেন্টের বাড়িতে চা না খেলে তাঁর প্রেস্টিজ থাকবে না।

বাইরে সভা-সমিতি করতে গেলে এরকম কিছু বাধ্যবাধকতা যে থাকেই, তা কি অবনীশ জানেন না? তিনি ছেলে দুটিকে বললেন, ঠিক আছে, বিকেলে যাব চা খেতে। তোমরা ওকে বলে দিও।

ছেলে দুটি চলে যাওয়ার পর শান্তি খানিকটা ঠাট্টার সুরে বলল, আপনি গাড়িতে চেপে গ্রাম ঘুরতে বেরুবেন?

অবনীশ বললেন, আর কী ভাবে যাওয়া যায়?

—পায়ে হেঁটে না ঘুরলে কিছুই দেখা হবে না। আপনি এক-দেড়মাইল হাঁটতে পারবেন? তাহলে আপনাকে একটা চমৎকার জায়গায় নিয়ে যেতে পারি!

—কীরকম চমৎকার জায়গা?

—একটু দূরেই আমাদের গ্রাম। আমাদের বাড়িতে একবার আপনাকে নিয়ে যেতে চাই। একটা নদী পেরিয়ে যেতে হয়। আমাদের গ্রামে এখনও অনেক গাছপালা আছে, এরকম সবুজ গ্রাম আপনি বেশি দেখেননি!

ঠিক আছে, যেতে পারি। হাঁটতে আমার আপত্তি নেই। সঙ্গে আর কেউ যাবে না?

—আর কারুর যাওয়ার দরকার কী? আপনাকে নিয়ে আমি চুপিচুপি পালিয়ে যাব। ভয় নেই, ঠিক সময়ে আবার আপনাকে ফিরিয়ে দেব!

অবনীশ একটুক্ষণ চিন্তা করলেন। মিটিং করতে এসে একটি মেয়ের সঙ্গে আলাদাভাবে কোথাও চলে যাওয়া কি ভালো দেখাবে? কেউ-না-কেউ নিশ্চয়ই তাঁর খোঁজ করবে!

শান্তি তাঁর হাত ধরে টেনে বলল তাহলে দেরি করে কী লাভ, উঠুন!

অবনীশ বললেন, উদ্যোক্তাদের কারুকে একটু খবর দিয়ে এসো।

—কিছু খবর দিতে হবে না। ওরা তো জানেই, আপনি আমার সঙ্গে আছেন। আমাকে সবাই চেনে, ঠিক বুঝতে পারবে।

পুকুরের পাশ দিয়ে রাস্তা, তারপর ধানখেত। আলের ওপর দিয়ে শর্টকার্ট করতে চায় শান্তি। জমিতে এখন সদ্য ধান রোয়া হয়েছে। এরকমভাবে মাঠের মধ্য দিয়ে অনেক দিন হাঁটেননি অবনীশ। ধুতিটা উঁচু করে ধরে রেখে ভাবলেন, প্যান্ট পরে এলেই হত। চটিতে কাদা লেগে যাচ্ছে। এইসব জায়গায় সবচেয়ে সুবিধে খালি পায়ে হাঁটা।

শান্তির পায়ে রবারের চটি। সে-ও তার হলদে রঙের শাড়িটা একটু উঁচু করে গুঁজে নিয়েছে। প্রাইভেট টিউশানি করার বদলে ধান রোয়ার কাজ করলেই যেন শান্তিকে বেশি মানাত। অবশ্য যে চাষিরা মাঠের কাজ করে, তারা যে কলেজে পড়াশুনো করতে পারবে না, তারও কোনও মানে নেই।

অবনীশ জিগ্যেস করলেন, তুমি ক'টা টিউশনি করো শান্তি?

—তিনটে। তার মধ্যে এক জায়গায় মাইনে দেয় না। আমার বাবা একজনের কাছ থেকে আড়াইশো টাকা ধার নিয়েছিলেন, আমি তার মেয়েকে পড়িয়ে সেই ধার শোধ দিচ্ছি। এক বছর পড়াতে হবে!

—আজকাল গ্রামের ছেলেমেয়েদেরও বুঝি বাড়িতে মাস্টার লাগে?

—মাধ্যমিক পরীক্ষার আগে অনেকেই মাস্টার রাখে। ইস্কুলে লেখাপড়া তো বিশেষ

হয় না।

—তুমি কবিতা লেখার উৎসাহ পেলে কার কাছ থেকে?

—কেউ উৎসাহ দেয়নি। এমনকী আপনিও কিছু সাহায্য করলেন না। আপনাদের শহরের ছেলেমেয়েযরাই বুঝি সবকিছু করবে? কোনও পত্রপত্রিকায় আমাদের চান্স দেয় না।

—দেয় না বুঝি?

—আহা-হা, আপনি তো ভালো করেই জানেন। আপনি নিজেই তো চান্স দেননি আমাকে। কত কবিতা পাঠিয়েছি!

—মুশকিল কী জানো, কবিতার ভাষা খুব তাড়াতাড়ি বদলায়। গ্রামে বসে তোমরা ঠিক বুঝতে পারো না, তোমরা যে কবিতা লেখো, তা বড্ড পুরোনো ভাষায়।

—আমরা তো গ্রামে বসে সব বই আর পত্রপত্রিকা পাই না, আমরা শিখব কী করে?

—সে সমস্যার সমাধান তো আমি করতে পারব না। তবে না শিখলে চান্স পাওয়া অসম্ভব। তুমি বরং গল্প-টল্প লেখার চেষ্টা করতে পারো। কবিতার চেয়ে গল্প লেখা বোধহয় সহজ!

—গল্প লেখা সহজ? তাহলে তো সবাই গল্প লিখত।

কোনাকুনি একটা ধানখেত পার হয়ে ওরা একটা আমবাগানে ঢুকল। এই বাগানটা আগে বেশ বড় ছিল বোঝা যায়, এখন ভেতরে ভেতরে বাড়ি উঠছে। এক জায়গায় একটা গাছ কেটে তার ডালপাল চাপানো হচ্ছে একটা গোরুর গাড়িতে।

বাগানটার পাশেই নদী।

সেই নদীটি দেখে অবনীশ প্রথমে অবাক, তারপর খুশি হলেন। এরকম একটা নদী তিনি আশাই করেননি। অধিকাংশ নদীই তো এখন মজে-হেজে গেছে। এই শীতকালে প্রায় কোনও নদীতেই জল থাকে না। কিন্তু এই নদীটিতে বেশ জল আছে, স্রোত আছে। বেশ টলটলে জল, দুপাশে উঁচু পাড়। বেশ একটা ঝকঝকে তকতকে ভাব।

অবনীশ বলল, বাঃ, বেশ সুন্দর তো!

শান্তি বলল, বলেছিলাম না আপনার ভালো লাগবে! ওপাশে আমাদের গ্রাম। আমাদের বাড়িটা কিন্তু মাটির বাড়ি।

—আমার জন্মও মাটির বাড়িতে।

—আপনি গ্রামে জন্মেছিলেন।

—হ্যাঁ। তবে গ্রাম ছেড়েছিও বহুবছর হয়ে গেল।

—চলুন, আমাদের বাড়িতে আপনাকে মুড়ি আর পাটালিগুড় খাওয়াব। নিশ্চয়ই অনেকদিন খাননি। আপনারা তো সকালে স্যান্ডুইচ খান, তাই না?

—কলকাতায় মুড়ি আর পাটালিগুড় দুটোই পাওয়া যায় তবে, অনেকদিন মুড়ি-পাটালিগুড় একসঙ্গে খাইনি তা ঠিকই। আমি কোনওদিন স্যান্ডুইচ খাই না। মুড়ির সঙ্গে ডিমভাজা খাই।

জলের কাছে এসে অবনীশ বললেন, কাছাকাছি কোনও ব্রিজ নেই তো দেখছি, এদিক থেকে ওপারে যায় কী করে?

—খেয়া নৌকো আছে। দেখি, মাঝি কোথায় গেল!

ঘাটে দু-তিনটে নৌকো বাঁধা। কিন্তু কাছাকাছি কোনও মানুষজন দেখা গেল না। একটু দূরে একটা দোকানঘর, শান্তি সেদিকে খোঁজ নিতে গিয়েও ফিরে এল। খেয়া নৌকোর মাঝি সেখানে নেই। কেউ বলছে, তার নাকি খুব জ্বর, অন্য একজনের আসবার কথা।

শান্তি বলল, আসুন নৌকোয় উঠে বসি।

নৌকোয় ওঠার কায়দাটা একেবারেই ভুলে গেছেন অবনীশ। তিনি আনাড়ির মতন গলুইতে পা দিতেই নৌকোটা সরে গেল, তিনি আর একটু হলে আছাড় খাচ্ছিলেন। শান্তি শেষ মুহূর্তে তাঁকে

ধরে ফেলে হাসিতে একেবারে নুয়ে পড়তে লাগল। অবনীশের মতন একজন খ্যাতিমান মানুষকে লজ্জায় পড়তে দেখে সে বেশ মজা পেয়েছে।

নৌকোর খোলে বেশ খানিকটা জল জমা রয়েছে। শান্তি একটা মগ দিয়ে জল ছেঁচতে লাগল। অবনীশ বসে পড়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে ব্যক্তিত্ব ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করলেন। তিনি যে এখন আটান্ন বছর বয়স্ক একজন ভারিক্কি মানুষ, সেটা মাঝে-মাঝে ভুলে যান।

শান্তি বলল, আমি নৌকো চালাতে পারি জানেন? মাঝির জন্য বসে না থেকে, আমিই আপনাকে ওপারে নিয়ে যেতে পারি। যাব?

কিছু না ভেবেই অবনীশ মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন।

শান্তি প্রায় বালিকার মতন খুশি হয়ে দড়ি খুলে দিল। তারপর বইঠা জলে ডুবিয়ে বলল, আমি ভালো কবিতা লিখতে পারি না বটে, কিন্তু গোরুর দুধ দুইতে পারি, কাসুন্দি বানাতে পারি, বড়ি দিতে পারি, এমনকি গাছেও উঠতে পারি।

অবনীশ স্মিত হেসে শান্তির দিকে তাকিয়ে রইলেন। এত গুণের মেয়ে, অথচ তার বিয়ে হচ্ছে না শুধু গায়ের রং কালো বলে? নিশ্চয়ই ওর বাবার পণ দেওয়ার সাধ্য নেই। অপমানজনকভাবে বিয়ে করার চেয়ে এরকম একটা মেয়ে কুমারী অবস্থাতেও তো কাটিয়ে দিতে পারে সারাজীবন!

কিন্তু বিয়ে না হোক, একজন প্রেমিকও থাকবে না। তখন প্রেমের প্রসঙ্গ তুলতে শান্তি চোখ নামিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল। মেয়েটি এমনিতে বেশ হাসিখুশি হলেও ওর কোনও গোপন দুঃখ আছে। সে কথা জিগ্যেস করা যায় না। ওর কবিতাগুলিকে তিনি নিতান্ত তুচ্ছ, অকিঞ্চিকর ভেবেছিলেন, কিন্তু সেগুলির রচনার পিছনে আছে এক যুবতীর অকপট হৃদয়বেদনা।

বেশ ভালোই বইঠা চালাতে পারে শান্তি। নৌকোটা হেলল দুলল না, ঘুরে গেল না, সোজাই এগোল। অবনীশের মুখোমুখি বসেছে শান্তি, আঁচলটা জড়িয়ে নিয়েছে কোমরে। এখন, এই ভূমিকায় তার মুখে একটা অন্যরকম সৌন্দর্য এসেছে।

ষড়যন্ত্র করার মতন মুখটা ঝুঁকিয়ে এনে শান্তি ফিসফিস করে বলল, নৌকোটা যখন পাওয়াই গেছে তখন এটুকু গিয়ে কী হবে? আরও খানিকটা ঘুরবেন? ওই যে দূরে তালগাছটা দেখছেন, ওই পর্যন্ত ঘুরিয়ে আনতে পারি। যাবেন?

এ ক্ষেত্রে হ্যাঁ কিংবা না কী বলা উচিত, তা ভেবে পেলেন না অবনীশ। আর কেউ নেই, শুধু একটি মেয়ের সঙ্গে নৌকোয় করে বেড়ানো তো আনন্দের ব্যাপার। কিন্তু সেটা কি বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে না? এইরকম গ্রাম দেশে নিশ্চয়ই এ নিয়ে কথা উঠবে। অবনীশ তো ফিরে যাবেন আগামীকাল, তারপর যদি শান্তির ওপর অত্যাচার হয়?

কিন্তু অবনীশ তাঁর লেখার মধ্যে কোনওরকম সংস্কারকে প্রশ্রয় দেন না। নারী-পুরুষের সহজ মেলামেশায় বিশ্বাস করেন। তিনি একটি মেয়ের আহ্বানে সাড়া দেবেন না।

তিনি জিগ্যেস করলেন, এটা তো খেয়ার নৌকো, অন্যদের লাগবে না?

—অন্যরা না হয় একটুখানি দাঁড়িয়ে থাকবে।

—না চলো, ওপারে গিয়ে তোমার বাড়িটাই ঘুরে আসি। মুড়ি আর গুড় খাওয়াবে বললে যে!

—এই যাঃ! ধরুন, ধরুন!

বৈঠাটা শান্তির হাত থেকে খসে জলে পড়ে গেল না শান্তি ইচ্ছে করে ফেলে দিল? বেশ স্রোত আছে, হাত বাড়িয়েও সেটা ধরা গেল না। এবার নৌকোটা ঘুরতে লাগল।

শান্তি বলল, এখন আমরা ভাসতে-ভাসতে যেখানে খুশি চলে যাব! আর ইচ্ছে করলেও ফেরা যাবে না!

অবনীশ বিরক্ত হওয়ার বদলে হালকাভাবে হাসলেন। হঠাৎ একটি মেয়ে তাকে ভিড় থেকে

টেনে নিয়ে এল, তারপর নদীর বুকে তাঁর সঙ্গে নৌকোয়, এই নৌকো আপন মনে ভাসবে! এ যেন এক প্রেমের দৃশ্য!

বয়েসটা আর একটু কম হলে আরও উৎসাহিত হওয়া যেত। শান্তির সঙ্গে তাঁর বয়েসের তফাত প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর তো হবেই। কেউ তাঁকে শান্তির প্রেমিক ভাববে না ভুলেও। অন্যদের চোখে তিনি একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি! তাঁর বদলে অন্য কারুর সঙ্গে শান্তির এই পাগলামির খেলাটা খেলা উচিত ছিল।

সেরকম তো চওড়া নদী নয়, অকূলে ভেসে যাওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। দু-পাড়ে কিছু কিছু লোক জমছে। তারা এই দৃশ্য দেখছে।

কে একজন চেঁচিয়ে উঠল, এই শান্তি, নৌকোটা এদিকে নিয়ে এসো!

শান্তি অবনীশকে বলল, ওদের কথা শুনবেন না। ওদিকে তাকাবেন না!

অবনীশ মনে মনে বললেন, আমি বেদব্যাস, তুমি মৎস্যগন্ধা?

ক্রমে চেঁচামেচি বাড়তে লাগল। নদীর বুকে একটা নৌকোয় শুধু একটি নারী ও পুরুষ আপন মনে বসে আছে, এই দৃশ্য অন্যদের সহ্য হয় না! অবনীশও বেদব্যাস নন, চারপাশে কুয়াশার আড়াল সৃষ্টি করার ক্ষমতা তাঁর নেই।

একসময় শান্তি চেঁচিয়ে বলল, ফিরতে পারছি না। বইঠা ভেসে গেছে!

এবার আর-একটা নৌকো এগিয়ে এল। তাতে দুজন মানুষ। একজন নৌকোটা চালাচ্ছে, অন্যজন দাঁড়িয়ে রাগত সুরে বলতে লাগল, এই শান্তি, তুই কার হুকুমে এই নৌকো নিয়ে এসেছিস? খেয়ার নৌকো নেওয়ার অর্ডার তোকে কে দিয়েছে? কলকাতা থেকে ভদ্রলোক এসেছেন, যদি নৌকো উলটে যেত?

অবনীশ সে ব্যাপারে চিন্তিত ছিলেন না। একসময় তিনি ভালোই সাঁতার জানতেন। সাঁতার কেউ ভোলে না। ধুতি-টুতি নিয়ে একটু অসুবিধে হত বটে, কিন্তু জলে ডুবে যেতেন না!

শান্তি সেই লোকটিকে বলল, তুমি এত ধমকাচ্ছ কেন, তোমার নৌকো এনেছি নাকি?

লোকটি দাঁত কিড়মিড় করে বলল, তোর বড্ড বাড় বেড়েছে না?

শান্তি অবনীশের দিকে তাকিয়ে বলল, আমরা বেড়াচ্ছিলুম তো, তাই ওদের হিংসে হয়েছে।

দুটো নৌকো গায়ে-গায়ে লাগল। সেই লোকটি আবার বলল, শান্তি, তুই কারুকে কিছু না বলে কেন এনাকে নদীতে নিয়ে এসেছিস?

শান্তি বলল, বেশ করেছি। তুমি বেশি চোখ রাঙাবে না। বিশুদা!

তখন সেই বিশুদা নামের যুবকটি ঝুঁকে এসে ঠাস করে একটা চড় কষাল শান্তির গালে।

অবনীশ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এ কী কাণ্ড! কিন্তু তিনি কিছু প্রতিবাদ করার আগেই শান্তিও উলটে চড় লাগাতে গেল যুবকটিকে, দুজনের ঝটাপটিতে নৌকো এবার সত্যি উলটে যাওয়ার জোগাড়।

তা অবশ্য হল না। অন্য নৌকাচালকটির বকুনিতে দুজনেই থেমে গিয়ে ফুঁসতে লাগল। অবনীশ আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলেন।

সভার উদ্যোক্তাদেরও দুজন ছুটে এসেছে নদীর ধারে। এদিকে নৌকো ভিড়তেই তারা শান্তিকে খানিকটা বকাবকি করে, অবনীশের কাছে ক্ষমা চেয়ে তাঁকে নিয়ে গেল ইস্কুলবাড়িতে। সেখানে আলাদা একটি ঘরে তাঁর বিশ্রামের ব্যবস্থা।

শান্তির বাড়িতে আর যাওয়া হল না, শান্তির সঙ্গে তার দেখাও হল না। বিকেলের মিটিং-এর সময়ও শান্তি নেই। অভিমান হয়েছে তার? তা তো হতেই পারে। কিন্তু শান্তিকে যে চড় মারা হয়েছে, তা নিয়ে কোনও চাঞ্চল্য নেই, কেউ সে বিষয়ে আলোচনাও করছে না।

সন্ধের পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সবটা বসে দেখতে হল অবনীশকে। খুব যে ভালো লাগছে

তা নয়, কিন্তু ভদ্রতা করে বসে থাকতেই হয়। একসময় তিনি সিগারেট টানবার জন্য বাইরে এলেন।

বেশ বড় মাঠ, পেছন দিকে লোকজন রয়েছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। অবনীশ হাঁটতে-হাঁটতে অনেকটা চলে এলেন। একেবারে পেছন দিকে, আধো অন্ধকারে দুটি নারী ও পুরুষ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। অবনীশ সেদিকে আর এগোতে চাইলেন না।

হঠাৎ একটা হাসির শব্দ শুনে তিনি চমকে উঠলেন। হাসিটা চেনা। শান্তি!

অবনীশ একপলক তাকিয়ে দেখলেন তার পাশের যুবকটি সেই বিশুদা। ওদের দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠতার স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে।

আজ দুপুরের ঘটনার পরেই ওদের মধ্যে এই ঘনিষ্ঠতা হল? শান্তি তাঁকে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিল বলেই ঈর্ষা হয়েছিল ওই বিশু নামের ছেলেটির? তাহলে, এতটা বয়েস হলেও, তিনি পুরোপুরি বুড়োদের দলে চলে যাননি, যুবকেরা এখনও তাঁকে ঈর্ষা করে!

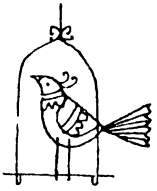

শিল্পী

দুপুরে খাওয়া-দাওয়া হয়েছে প্রচুর, তারপর একটু ঘুম দিলে মন্দ হয় না। কিন্তু তার উপায় নেই।

বাইরে কোথাও বেড়াতে এলে সকাল থেকে মাঝরাত পর্যন্ত পিকনিকের মেজাজ, এর মধ্যে ঘুমিয়ে সময় নষ্ট করার মানে হয় না।

স্থান মধ্যপ্রদেশ, চতুর্দিকে জঙ্গল ও ছোট-ছোট পাহাড়, তার মাঝখানে এই সুদৃশ্য অতিথিভবন, অনেকগুলি ঘর। সামনে অনেকখানি ফুলের বাগান আর প্রকৃতির সুষমা দেখলে বোঝাই যায় না যে এর কাছাকাছি রয়েছে মস্ত ইস্পাত কারখানা, কয়লাখনি ও বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র। অতিথিভবনটি ওইরকমই কোনও সংস্থার। আরামের উপকরণের কোনও অভাব নেই। সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার, দুপুর দুটোয় কিংবা রাত এগারোটাতেও চা চাইলে পাওয়া যায়।

সত্যি, এটাতেই বেশি আশ্চর্য হয়েছেন সুকুমার চৌধুরী। তাঁর দারুণ চায়ের নেশা। দিনে দশ-বারো কাপ তো লাগেই। তিনি মদ্যপান করেন না। সন্ধের পর অন্যরা যখন মদের বোতল নিয়ে বসে, সুকুমার চৌধুরীর জন্য চা আসে ঘনঘন।

বহু জায়গায়, অনেকরকম ডাকবাংলো ও অতিথিভবনে তিনি থেকেছেন। সব জায়গাতেই নিয়মকানুনের কড়াকড়ি। সকালে চা দিলে বেলা দশটার পর আর পাওয়া যাবে না। দুপুরে প্রশ্নই নেই। রাত ন'টার মধ্যে খাওয়াদাওয়া সেরে নিতে হবে, নইলে বন্ধ হয়ে যাবে রান্নাঘর। ঠান্ডা খাবার চাপা দেওয়া থাকবে টেবিলে, পরিচারকদের ডিউটি অফ হয়ে যাবে!

এখানে কাল রাত্তিরে সবাই আড্ডা থামিয়ে খেতে বসেছিল রাত পৌনে একটায়, তখনও সব গরম-গরম। পরিচারকরা খাতির করে বলেছিল, আর-একটু মাংস নিন, পাঁপড়ভাজা এনে দেব স্যার?

অন্য কোথাও এরকম ব্যবহার অকল্পনীয়। অবশ্য এই অতিথিশালার ম্যানেজার বাঙালি, দুজন পরিচারকও বাংলায় কথা বলে। কিন্তু বাঙালিরা খুব অতিথিপরায়ণ নাকি? খোদ পশ্চিম বাংলার গেস্ট হাউস, ট্যুরিস্ট লজগুলোতে অনেক সময় এক গেলাস জল চাইলেও দু-ঘণ্টা লেগে যায়।

মশারির দড়ি থাকে না।

প্রবাসে বাঙালির স্বভাবও বদলে যায়।

এত বড়-বড় সংস্থায় কাজ করে অনেক বাঙালি, সব মিলিয়ে বাঙালির সংখ্যা সাড়ে আটশো। সুতরাং বাঙালিদের নিজস্ব ক্লাব থাকবেই এবং দুর্গাপুজোও হবে। এখনও দলাদলিতে দু-ভাগ হয়নি।

বছরে একবার সাংস্কৃতিক উৎসবও হয়, সবাই আজকাল যাকে বলে 'কালচারাল ফাংশান'। কলকাতা থেকে নাচ-গান-বাজনার শিল্পীদের আনানো হয়, এবং আবৃত্তিকার, দু-একজন সাহিত্যিক।

যাওয়া-আসার জন্য অনেকটা সময় লাগে, ট্রেন ছাড়া গতি নেই। তবু কলকাতার শিল্পীমহলে জানাজানি হয়ে গেছে যে মধ্যপ্রদেশের ওই বাঙালি ক্লাবের আমন্ত্রণে খাতিরযত্ন পাওয়া যায় খুব, বেড়াবারও সুযোগ অনেক। তাই প্রায় সকলেই আগ্রহের সঙ্গে রাজি হয়।

সুতরাং এবারে যে এগারোজন এসেছেন, তাঁরা সারাদিন পিকনিকের মেজাজে থাকলেও কেউ কারুর আত্মীয় নন, কলকাতায় সারাবছর হয়তো অনেকের সঙ্গে দেখাই হয় না। কিন্তু এখানে এসে প্রথম দিন থেকেই ভাব জমে যায়।

প্রীতম অনেক ছায়াছবি ও টিভি ধারাবাহিকের ব্যস্ত নায়ক, কিন্তু এখানে ছুটির আনন্দে হইহই করছে সবসময়। কখনও সে নদীতে স্নান করতে যাচ্ছে, কখনও ব্যাডমিন্টন খেলছে বাগানে, কখনও মেতে যাচ্ছে তাস খেলায়। সে যে খালি গলায় এত ভালো লোকসঙ্গীত গাইতে পারে, তা কারুর জানা ছিল না। নীপা নাম্নী গায়িকাটির হাসির গল্পের স্টক অফুরন্ত। সে পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মদ্যপানও করতে পারে।

ঔপন্যাসিক সুকুমার চৌধুরী এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বয়স্ক, তিনিই দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানের মূল সভাপতি। ধীর, স্থির মানুষ, বেশি কথা বলেন না, কিন্তু চায়ের কাপ নিয়ে আড্ডায় বসে থাকেন শেষপর্যন্ত। তিনি মদ্যপান না করলেও সেটা পুষিয়ে দিয়েছে কবি অরিন্দম সেনগুপ্ত। সকাল দশটা বাজতে-না-বাজতেই সে বিয়ারের বোতলে চুমুক দেয়। বাঙালি লেখকদের মধ্যে গদ্যকারদের তুলনায় কবিদেরই মদের প্রতি আসক্তি বোধহয় বেশি।

সুকুমার চৌধুরী সিগারেটটা শেষ করে একটুখানি শুতে যাবেন ভেবেছিলেন, অরিন্দম তাঁকে ডেকে নিয়ে গেল আবৃত্তিকার সুরঞ্জনের ঘরে। সেখানে জমিয়ে তাস খেলা চলছে।

সুরঞ্জন সুকুমারকে বলল, স্যার, আপনি ভালো ব্রিজ খেলেন শুনেছি। বসুন না আমাদের সঙ্গে। সুকুমারের ব্রিজ খেলার দুর্বলতা আছে। তিনি আপত্তি করলেন না।

অরিন্দম নিজে অবশ্য তাস খেলে না। ভাত খাওয়ার পরেও তার হাতে তৃতীয় বিয়ারের বোতল। সে বলল, সুকুমারদা তো তাসখেলা শিখছেন প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাছে, তাই না?

সুকুমার বললেন, প্রেমেনদা দারুণ তাস খেলতেন। কিন্তু বুদ্ধদেব বসু তাস খেলা দু-চক্ষে দেখতে পারতেন না। জীবনানন্দ দাশও না। কবিরা তাস খেলে না।

খানিকক্ষণ পরেই আর দুটি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে এ-ঘরে ঢুকে পড়ল নীপা।

রীতিমতন ধমকের সুরে সে বলল, এত চমৎকার দিনটায় আপনারা ঘরে বসে-বসে শুধু তাস খেলছেন। চলুন, বেড়াতে চলুন!

প্রীতম বলল, এই রোদ্দুরের মধ্যে কোথায় বেড়াতে যাব?

নীপা বলল, শীতকালের রোদ্দুর কী মিষ্টি! উঠুন, উঠুন!

অরিন্দম বলল, শীতকালে বেড়াতে হয় সন্ধেবেলা। চাদর মুড়ি দিয়ে তোমার কাঁধে হাত রেখে বেড়াব!

নীপা বলল, সন্ধেবেলা তো ফাংশান!

প্রীতম বলল, ফাংশান আর কতক্ষণ? এই, কেউ বেশি গান গাইবে না, বড়জোর দু-তিনখানা। সুকুমারদা, আপনি প্লিজ লম্বা বক্তৃতা দেবেন না!

সুকুমার বললেন, আমি জীবনে কখনও দশ মিনিটের বেশি বলি না। তোমরা অরিন্দমকে সামলাও। ও এখন দারুণ পপুলার, শ্রোতারা অনুরোধ করবে, ও দশ-বারোটা কবিতা পড়ে যাবে!

অরিন্দম হাসতে-হাসতে বলল, যদি ততক্ষণ আমার জ্ঞান থাকে। তা ছাড়া, আমি আজ পড়বই না। কাল দেখা যাবে। আজ তোমরা তাড়াতাড়ি ফাংশান শেষ করবে। তারপর আমরা জঙ্গলে বেড়াতে যাব!

প্রীতম বলল, তখন, জঙ্গলে, কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা! নীপা, আমার সঙ্গে হারিয়ে যেতে রাজি আছ?

নীপা বলল, ইস! এই জঙ্গলে ভাল্লুক আছে শুনেছি। তার পরেও অবশ্য বেড়াতে যাওয়া হল না। শুরু হয়ে গেল গল্প।

একটু পরে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল বিশ্বজিৎ। সে এখানকার বাঙালি ক্লাবের সেক্রেটারি। পেশায় ইঞ্জিনিয়ার, সুন্দর চেহারা, খুবই সপ্রতিভ। সে যেমন সকলের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেখাশুনো করছে, তেমনই ব্যবস্থা করছে অনুষ্ঠানের, আবার ফাঁকে-ফাঁকে অফিসেও ঘুরে আসছে।

বিশ্বজিৎ হাত জোড় করে বলল, আপনাদের কারুর কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো? বিশেষ করে অরিন্দমের দিকে চেয়ে বলল, দাদা, যখন যা লাগবে চেয়ে নেবেন!

নীপা বলল, ওকে দিনের বেলা অত বিয়ার খেতে দেবেন না। রাত্তিরে তো আছেই।

অরিন্দম বলল, চোপ! আমি কতটা কী খাব, তাতে তোর কী রে?

নীপা বলল, বিশ্বজিৎ, আমরা জঙ্গলে বেড়াতে যাব না!

বিশ্বজিৎ বলল, নিশ্চয়ই। কাল ফাংশান হয়ে যাক, পরশু সবাই মিলে—এ সি বাস ব্যবস্থা করে রেখেছি।

প্রীতম বলল, পরশু থাকতে হবে? আমি পারব না।

বিশ্বজিৎ বলল, তার আগে ছাড়ছিই না।

একটু থেমে, মুখটা কাচুমাচু করে বিশ্বজিৎ বলল, সবাইকে একটা অনুরোধ করব? আজ বিকেল সাড়ে পাঁচটার সময় আমাদের এম ডি আপনাদের সঙ্গে আলাপ করতে আসবেন। একসঙ্গে চা খেতে চান। সেই সময়টায় আপনারা সবাই থাকবেন? বেশিক্ষণ না, আধঘণ্টা।

প্রীতম বলল, সাড়ে পাঁচটা তো চা খাবারই সময়। ঠিক আছে, সবাই থাকব।

বিশ্বজিৎ অরিন্দমকে বলল, দাদা, সেই সময়টা যদি বিয়ারের বোতলটা নীচে নামিয়ে রাখেন! বুঝতেই তো পারছেন, এম ডি আমাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা! ফিনান্সটাও ওঁর হাতে। উনি ওকে না করলে এই ফাংশান করাই যেত না। উনি খুব ব্যস্ত লোক, তবু বলেছেন আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করতে চান!

নীপা বলল, ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি তখন অরিন্দমের কাছ থেকে বিয়ারের বোতল সরিয়ে রাখব।

বোঝাই গেল, বিশ্বজিৎ চায়, এম ডি-কে যেন সবাই খাতির করে। সৌজন্য দেখায়।

সাড়ে পাঁচটার অনেক আগেই ডাইনিং হলে পাতা হল পরপর পাঁচটা টেবিল। তার ওপরে ধপধপে চাদর। পরিচারকরা সবাই ফিটফাট পোশাক পরেছে। ম্যানেজার মহাদেব নিজের হাতে সাজাচ্ছে চেয়ার।

টেবিলের ওপর রাখা হতে লাগল প্লেট ভরতি-ভরতি কাজুবাদাম, নানারকম কেক—পেস্ট্রি, সন্দেশ, চানাচুর।

অতিথিরা সবাই এসে বসেছে চেয়ারে, মেয়েরা এর মধ্যে নতুনভাবে সেজেগুজে নিয়েছে। অরিন্দমের চোখ লাল, কিন্তু হাতে বিয়ারের বোতল নেই, আছে জ্বলন্ত সিগারেট। টেবিলে অ্যাশট্রে নেই।

বিশ্বজিৎ নিজে একটা অ্যাশট্রে তার সামনে এনে বলল, এই সিগারেটটা শেষ করে নিন, তারপর খানিকক্ষণ মানে, এম ডি সাহেব ধোঁয়া সহ্য করতে পারেন না।

সাড়ে পাঁচটা বেজে গেল, পৌনে ছ'টা, এম ডি-র দেখা নেই। সবচেয়ে বেশি ছটফট করছেন সুকুমার চৌধুরী। টেবিলে চায়ের সব সরঞ্জাম প্রস্তুত, অথচ তিনি চা খেতে পারছেন না। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে যাচ্ছে।

এক-একটা গাড়ি এসে থামছে বাইরে, অমনি ছুটে যাচ্ছে বিশ্বজিৎ। কোনওটাই সেই মহামান্য ব্যক্তিটির নয়।

এবার সবাই ছটফট করতে শুরু করেছে। এম ডি কখন আসবেন, সেজন্য সবাইকে চুপ করে বসে থাকতে হবে?

ঠিক ছ'টায় সময় এম ডি-র সচিব টেলিফোনে জানালেন, তাঁর প্রভু বিশেষ কাজে আটকে গেছেন, আসতে পারছেন না। অতিথিরা যেন চা খেয়ে নেন। অরিন্দম আপন মনে বলে উঠল, ধুর শালা!

আবৃত্তিকার সুরঞ্জন বিশ্বজিৎকে বলল, দেখুন, এখানে অনেকেই রয়েছেন, বিশেষত সুকুমার চৌধুরী অত্যন্ত বিখ্যাত মানুষ তাঁকে এভাবে এতক্ষণ বসিয়ে রাখাটা কি ঠিক?

সুকুমার চৌধুরী অপমানিত বোধ করছেন, মুখে কিছু বললেন না। প্রীতম এমন মুখের ভাব করল, যেন সে-ও কম বিখ্যাত নয়!

বিশ্বজিৎ ওদের কাছে এসে হাত জোড় করে কাতরভাবে বলল, কিছু মনে করবেন না, আমাকে যত ইচ্ছে গালাগালি দেবেন, মানে, উনি খুবই ব্যস্ত, উনি নিজেই বলেছিলেন—

প্রীতম গম্ভীরভাবে জিগ্যেস করল, এম ডি-র নামটা কী?

বিশ্বজিৎ বলল, এ এন ব্যানার্জি, উনি বাঙালি বলেই বিশেষ করে...

অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার কথা সাড়ে ছ'টায়। স্টেজ সাজানো হয়ে গেছে, দর্শকও এসে গেছে অনেক। এরা চা খেয়ে নিল তাড়াতাড়ি।

তবু অনুষ্ঠান শুরু হল না। ওই এম ডি-ই সভাপতি, তিনি এসে প্রদীপ জ্বালবেন, উদ্বোধনী ভাষণ দেবেন।

আবার অপেক্ষা। তিনি আসছেন না। কোনও খবর নেই। সামনের সারিতে বসে অরিন্দম বলল, এখনও আরম্ভ হচ্ছে না, কত রাতে শেষ হবে, অ্যাঁ? আমি কিন্তু আবার মাল খাওয়া শুরু করব।

উৎকণ্ঠিতভাবে ছুটোছুটি করছে বিশ্বজিৎ, শ্রোতারাও অনেকে চঞ্চল। মঞ্চে এখনও পরদা ফেলা। তার আড়ালে শোনা যাচ্ছে ফিসফাস।

সুরঞ্জন সুকুমার চৌধুরীকে বলল, এইসব ধ্যাড়ধ্যেড়ে গোবিন্দপুরে এম ডি-রাই রাজা। এরা শিল্পীদের সম্মান দিতে জানে না। কিন্তু আসলে তো এই লোকটি একজন চাকরিজীবী, যত বড়ই চাকরি হোক। সমাজে ওদের কে চেনে?

সুকুমার গম্ভীরভাবে বললেন, আজকাল তো ওদের হাতেই সব ক্ষমতা।

সুরঞ্জন বলল, ক্ষমতা মানে টাকার ক্ষমতা। রিটায়ার করার পর এঁদের কে পুঁছবে? আপনাকে বহুকাল মানুষ মনে রাখবে। এইসব এম ডি ফেম ডি-দের কোনও রাইট নেই আমাদের এইভাবে বসিয়ে রাখার। চলুন, আমরা উঠে যাই।

প্রীতম বলল, আমরা তো বিশ্বজিতের মুখ চেয়েই এসেছি। এত কম টাকায় আমি কোথাও যাই না।

নীপা বলল, আমার রবীন্দ্রসদনে প্রোগ্রাম ছিল, সেটা ছেড়ে চলে এসেছি—

স্টেজের পাশ থেকে লাফিয়ে নেমে বিশ্বজিৎ সুকুমার চৌধুরীর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে

ফিসফিস করে বলল, দাদা, আমাদের এম ডি আসতে পারছেন না, আরও দেরি হবে। আপনিই উদ্বোধনটা করে দেবেন?

সুকুমার কঠিন গলায় বললেন, না। আমি অন্য কারুর প্রক্সি দিই না।

ঠিক বুঝতে না পেরে বিশ্বজিৎ আবার বলল, আপনি প্রদীপটা জ্বেলে দিন, তারপর প্রোগ্রাম শুরু করে দেব।

সুকুমার বলল, অন্য কারুর উদ্বোধন করার কথা ছিল, তার বদলে সুকুমার চৌধুরী কখনও যায় না।

সুকুমারকে কিছুতেই রাজি করানো গেল না। অগত্যা দর্শকদের মধ্য থেকে তুলে নেওয়া হল এক ডিভিশনাল ম্যানেজার আগরওয়ালকে। তিনিই উদ্বোধন করলেন। ভদ্রলোক ভাঙা-ভাঙা বাংলা জানেন, বাংলার সংস্কৃতির প্রভূত প্রশংসা করে শরৎচন্দ্র বিষয়ে বলতে লাগলেন অনেকখানি। তারপর স্থানীয় শিল্পীদের সমবেত গান ও আবৃত্তি দিয়ে শুরু হল অনুষ্ঠান।

কলকাতার শিল্পীদের মেজাজ বিগড়ে আছে। সবাই ঠিক করেছিল খুব সংক্ষেপে সেরে দেবে। কিন্তু শ্রোতাদের সামনে ফাঁকি দিতে পারল না।

নীপা গান গাইল সাতখানা। প্রীতম নানারকম অভিনয় করে দেখাল আধঘণ্টা ধরে। এমনকি অরিন্দমও কবিতা পড়ল অনেকগুলো। শুধু সুকুমার চৌধুরী বক্তৃতা দিলেন ঠিক ন'মিনিট।

পৌনে ন'টা বেজে গেল। এরপর আছে এখানকার বেঙ্গলি ক্লাবের একটা থিয়েটার। সেটা না দেখলেও চলবে।

কলকাতা শিল্পীরা মঞ্চ থেকে নেমে এগিয়ে যাচ্ছে অতিথি ভবনের দিকে। এই সময় এক সঙ্গে দুটো গাড়ি এসে থামল, অমনি হুড়োহুড়ি পড়ে গেল স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে।

নিশ্চিত কোনও ভি আই পি এসেছে।

অরিন্দম বলল, এখন যদি ওই শালা এম ডি-টা এসে থাকে, আমি কিন্তু ওর সঙ্গে দেখা করতে রাজি নই।

সুরঞ্জন হাসতে-হাসতে বলল, অরিন্দম অনেকক্ষণ ধৈর্য ধরে থেকেছে। এখন ওকে অবশ্যই বোতল দেওয়া উচিত।

সুকুমার বললেন, আমি স্নান করতে যাব। রাত্তিরে আর-একবার স্নান করা আমার অভ্যেস।

প্রীতম তিনটি মেয়ের দিকে তাকাল, দুষ্টুমির স্বরে বলল, এই অন্ধকারে বেড়াতে যাবে নাকি। যদি ভাল্লুক আসে, আমি হিন্দি ফিল্মের হিরোদের মতন ফাইট করব।

পরিচারকরা দৌড়োদৌড়ি করে খাবার ঘরের টেবিলগুলো আবার সাজাচ্ছে। বিশ্বজিৎ বলল, সুকুমারদা, এম ডি এসে গেছেন। তিনি আপনাদের সঙ্গে চা খাবেন বলছেন।

কয়েকজন একসঙ্গে বলে উঠল, এখন চা?

বিশ্বজিৎ অপরাধীর মতন বলল, উনি অ্যালকোহল টাচ করেন না। বেশিক্ষণ লাগবে না। ওঁর সঙ্গে এককাপ চা খাবেন, তারপর আমাদের আড্ডা তো আছেই।

সুকুমার বললেন, আমি এককাপ চা খাব ঠিকই, কিন্তু নিজের ঘরে বসে।

বিশ্বজিৎ তাঁর হাত জড়িয়ে ধরে বলল, সুকুমারদা, প্লিজ, প্লিজ!

নীপা, শান্তা, বিশাখারা একেবারেই রাজি নয়। সুরঞ্জন বলল, বিশ্বজিৎ এটা বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। আমাদের মানসম্মান নেই?

বিশ্বজিৎ বারবার বলতে লাগল, প্লিজ, প্লিজ, দশ মিনিটের জন্য।

প্রীতমই বিশ্বজিতের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে এগিয়ে এল।

সে দু-হাত তুলে বলল, আর মাত্র দশ-পনেরো মিনিট আমরা অপেক্ষা করতে পারব না? বিশ্বজিৎ বেচারা ফলস পজিশানে পড়ে যাবে।

সুরঞ্জন বলল, দশ-পনেরো মিনিটের প্রশ্ন নয়। একজন বুরোক্রাটের এরকম অপমানজনক

ব্যবহার শিল্পীরা কেন সহ্য করবে? লোকটা আবার বাঙালি? ছিঃ!

প্রীতম বলল, বিশ্বজিৎও তো বুরোক্রাট। ও যে কত ভালো ব্যবহার করছে। আমার বিশেষ অনুরোধ, আসুন আমরা একটুখানি বসে যাই।

প্রীতমের এতখানি আগ্রহ দেখে অন্যরা আর আপত্তি করতে পারল না।

অরিন্দম বলল, আমি বসব, কিন্তু চা খাব না।

সবাই গিয়ে বসল, আগেকার যে-যার চেয়ারে। স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ঢুকলেন এম ডি। তাঁকে দেখে বাঙালি বলে মনেই হয় না। দীর্ঘকায়, মুখে ফ্রেঞ্চ কাট দাড়ি, রং খুব ফরসা, নিখুঁত সুট পরা। ভুরু তোলা অহঙ্কারী ভাব। স্ত্রীটিও খুব রূপসী, সম্ভবত পাঞ্জাবি, স্কার্ট পরা।

নমস্কার করতে-করতে ঢুকলেন দুজনে। এম ডি ইংরিজিতে বলতে লাগলেন, আই অ্যাম এক্সট্রিমলি সরি, ঠিক সময় আসতে পারিনি, দিল্লি থেকে হঠাৎ একজন মিনিস্টার এসে পড়েছিলেন—

অন্য কেউ কোনও সাড়া শব্দ করল না। বিশ্বজিৎ একে-একে পরিচয় করিয়ে দিল সকলের সঙ্গে।

এম ডি নমস্কার করতে-করতে ইংরেজিতে দু-একটা ভদ্রতার কথা বলতে লাগলেন। পেছনে-পেছনে তাঁর স্ত্রী। তাঁর ঠোঁটে স্থায়ী হাসি আঁকা।

পরিচারকরা কাপে চা ঢালছে। সুরঞ্জন ফিসফিস করে নীপাকে বলল, নামেই বাঙালি, বাংলা-ফাংলা বোধহয় ভুলে গেছে।

নীপা বলল, বড় অফিসার হলেই ইংরিজি বলতে হয়। নিজের মায়ের সঙ্গে কী ভাষায় কথা বলে?

সুরঞ্জন বলল, বউ নিশ্চয়ই বাংলা জানে না।

অরিন্দম বেশ জোরে-জোরেই বলল, না, না, আমি চা খাব না।

তারপর সে টেবিল থেকে উঠে গিয়ে ওপরে ওঠার সিঁড়িতে গিয়ে বসল, একটা সিগারেট ধরিয়ে ফেলল।

বিশ্বজিৎ চোখ দিয়ে আপত্তি জানাচ্ছে, অরিন্দম তা গ্রাহ্য করল না। কেউ কোনও কথা বলছে না। এম ডি-র স্ত্রী নীপাদের সঙ্গে ভাব করতে এল, কিন্তু তাঁর কথা শুনলেই বোঝা যায়, তিনি এইসব বাঙালি শিল্পীদের কারুরই নাম জানেন না।

হঠাৎ অরিন্দম বলে উঠল, আপনার নাম এ এন ব্যানার্জি—মানে পুরো নামটা কী বলুন তো?

এম ডি উত্তর দেওয়ার আগেই বিশ্বজিৎ জানাল, অমরনাথ, অমরনাথ ব্যানার্জি।

অরিন্দম বলল, অমরনাথ? আপনাকে চেনা-চেনা লাগছে। আগে কলকাতা ছিলেন?

এম ডি সম্মতিসূচক মাথা ঝাঁকালেন।

এবার সুদর্শন বিস্ময়ের সঙ্গে বলে উঠলেন, অমরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। হ্যাঁ, আমারও চেনা লাগছে। আমি আপনাকে দেখেছি। আপনার ফ্রেঞ্চ কাট দাড়ি ছিল না তখন, অনেক দিন আগে। আমার যদি ভুল না হয়, আপনি কি গ্রুপ থিয়েটারে অভিনয় করতেন?

এবারেও অমরনাথ কিছু বলার আগেই বিশ্বজিৎ বলল, না, না, স্যার অনেকদিন ইংল্যান্ডে ছিলেন। তারপর হাঙ্গেরিতে।

তাকে থামিয়ে দিয়ে অমরনাথ এই প্রথম পরিষ্কার বাংলায় বললেন, হ্যাঁ, আমি কিছুদিন 'বহুরূপী'তে অভিনয় করেছি।

অরিন্দম বলল, অফ কোর্স, 'বিসর্জন' নাটকে। আমি দেখেছি। আমার মনে আছে।

সুরঞ্জন বলল, আমি বহুরূপীর বিসর্জন দেখেছি বহরমপুরে। তাতেও আপনি অভিনয় করেছিলেন না?

এবার অমরনাথের মুখে একটা ফ্যাকাসে হাসি ফুটে উঠল। মাথা নেড়ে বললেন, হ্যাঁ, সেসব

কবেকার কথা। আপনারা মনে রেখেছেন?

সুরঞ্জন বলল, বেশ ভালোই মনে আছে। নতুন অভিনেতা হিসেব অমরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের খুব নাম হয়েছিল। তারপর হঠাৎ অন্য একজন জয় সিংহ করতে লাগল। আপনি কোথায় চলে গেলেন!

সুকুমার চৌধুরী একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন অমরনাথের মুখের দিকে।

কয়েক মিনিটের মধ্যে কী দারুণ বদলে গেছে ওই মুখখানি।

একটু আগে ছিল একজন অতি সার্থক, খুব ক্ষমতাসম্পন্ন একজন মানুষের অহঙ্কারী মুখ। এখন যেন তার আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে এক গ্রুপ থিয়েটারের তরুণ অভিনেতা। বহরমপুরে নিশ্চয়ই ট্রেনের ভিড়ে ঠাসা সেকেন্ড ক্লাস কামরায় গিয়েছিল। সাধারণ হোটেলে থাকত অন্যদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে এক ঘরে।

সুরঞ্জন জিগ্যেস করল, তার মানে একসময় আপনি আমাদের মতনই একজন স্ট্রাগলিং শিল্পী ছিলেন। অভিনয় ছেড়ে দিলেন কেন হঠাৎ?

অমরনাথ বললেন, হয়তো নিয়তি।

সুরঞ্জন আবার বলল, সেই যে জীবন ছিল, আর এখনকার এই যে ব্যস্ত জীবন, এর মধ্যে কোনটা ভালো বলুন তো!

অমরনাথ মুখ নীচু করে বললেন, কী জানি!

সিঁড়ির দিক থেকে অরিন্দম চেঁচিয়ে বলল, তুমি তো আমাদেরই বয়েসি হবে। ওহে অমরনাথ, সেই বিসর্জন নাটকের কিছু এখনও মনে আছে তোমার? এরপর কী বলো তো—

অরিন্দম আবৃত্তি করতে লাগল।

নহি কি রে আমি তোর পিতার অধিক
পিতৃবিহীনের পিতা বলে? এই দুঃখ,
এত করে স্মরণ করাতে হল! কৃপা—
ভিক্ষা সহ্য হয়, ভালোবাসা ভিক্ষা করে
যে অভাগ্য, ভিক্ষুকের অধম ভিক্ষুক
যে! বৎস, তবু নিরুত্তর?...

উঠে দাঁড়ালেন অমরনাথ। রুমাল দিয়ে মুছলেন কপাল, তারপর বলতে লাগলেন উদাত্ত স্বরে ঃ

পিতা, এ বিদীর্ণ বুকে
আর হানিয়ো না বজ্র। রাজরক্ত চাহে
দেবী, তাই তারে এনে দিব! যাহা চাহে
সব দিব! সব ঋণ শোধ করে দিয়ে
যাব। তাই হবে। তাই হবে!

বিশ্বজিৎ, মহাদেব ও অন্যান্য স্থানীয় কর্মীরা হতবাক।

এখানকার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, গম্ভীর এম ডি [illegible] এরকম সংলাপ বলছেন? বাংলায়? তাঁর স্ত্রীরও চোখ বড়-বড় হয়ে গেছে।

অমরনাথ চেয়ার ছেড়ে সোজা চলে গেলেন অরিন্দমের কাছে। সিঁড়িতে অরিন্দমের পাশে বসে পড়ে লাজুক গলায় বললেন, আপনার একটা সিগারেট দিন। একসময় খুব খেতাম, অনেকদিন পর আবার ইচ্ছে করছে—

তারপর বিশ্বজিতের উদ্দেশে চেঁচিয়ে বললেন, বিশ্বজিৎ, এঁদের জন্য ড্রিংকসের ব্যবস্থা করোনি? আনতে বলো!

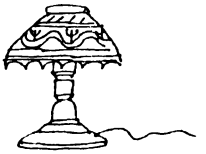

পরম ও দীপালি

ইস্কুল থেকে ফিরে, সদর দরজা দিয়ে ঢুকতে পরম দেখতে পেল, তাদের বসবার ঘরের দরজার বাইরে অনেকগুলো জুতো।

পরম অবাক হল না। সে বুঝতে পারল, কারা এসেছে। জুতোগুলো গুনে দেখল, মোট পাঁচ জোড়া, তার মধ্যে তিনজোড়া মেয়েদের চটি। প্রত্যেকবার ঠিক পাঁচজনই আসে কেন?

এখন পরমের ও-ঘরে ঢোকা নিষেধ।

বসবার ঘরটা ঠিক আলাদাভাবে বৈঠকখানা নয়, ওটা অনেক রকমভাবে কাজে লাগানো হয়। সন্ধেবেলা পরমের মাস্টারমশাই এলে ওই ঘরে বসেন, এক পাশে ডাঁই করা আছে অনেকগুলো বড়-বড় কাগজের বাক্স, তাতে ছোটকাকার ব্যাবসার কী সব জিনিসপত্র আছে, শান্তি পিসি রাত্তিরে ওই ঘরেই শোয়। তবে, বাইরের কোনও বিশিষ্ট লোক এলে ঘরটা সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা হয়, এমনকি মেঝেতে পাতা হয় জুট কার্পেট।

পরম সোজা চলে যায় দিদির ঘরে। সে আর দিদি দুজনেই এ-ঘরে থাকে, কিন্তু দিদির অধিকারটাই বেশি।

রান্নাঘরে রুটি-তরকারি রাখা আছে। পরম ইচ্ছে করলে খেয়ে নিয়ে চলে যেতে পারে তাপসদের বাড়িতে। সে-বাড়ির ঠাকুর দালানের সামনে বড় উঠোনে সবুজ সংঘের ছেলেমেয়েরা খেলাধুলো করে। কিন্তু ইস্কুল থেকে এসে কারুর সঙ্গে একটাও কথা না বলে কি আবার বেরিয়ে যেতে ভালো লাগে?

মা, বাবা, দিদি সবাই এখন বাইরের ঘরে। এমনকি শান্তি পিসি পর্যন্ত। কাকা এখন এখানে থাকে না। শান্তি পিসি কিন্তু পরমের নিজের পিসি নয়, তকে আনানো হয়েছে শক্তিগড় থেকে রান্নাবান্না করাই কাজ, কিন্তু বাবার দূরসম্পর্কের জ্যাঠতুতো বোন বলে ঠিক কাজের লোকের মতন ব্যবহার করা হয় না।

শান্তি পিসির এখন ওখানে থাকার কী দরকার? পরম চিনির কৌটোটা খুঁজে পাচ্ছে না। তাহলে সে দুধ খাবে না, থাক পড়ে!

হঠাৎ বাবা ডেকে উঠলেন, পরম, পরম, এদিকে একবার আয় তো! পরম গিয়ে দাঁড়াল ও-ঘরের দরজার কাছে।

পড়ার টেবিলটা সরিয়ে রাখা হয়েছে একপাশে, মেঝের কার্পেটে বসেছে সবাই, শুধু একজন বুড়ো মতন ভদ্রলোক বসেছেন চেয়ারে। মাঝখানে অনেকগুলো প্লেটে রয়েছে দু-তিন রকমের সন্দেশ আর সিঙাড়া আর চায়ের কাপ।

বাবা বললেন, এই আমার ছোট ছেলে পরম।

তারপর পরমকে বললেন, প্রণাম কর, প্রণাম কর!

একদম যাদের চেনে না, তাদের প্রণাম করতে পরমের একটুও ভালো লাগে না। রাগ হয়। কিন্তু পরম জানে, এই লোকদের সামনে একদম রাগ দেখানো চলবে না, বরং এদের খুশি করার চেষ্টা করতে হবে।

একে-একে অতিথিদের প্রণাম করার পর পরম বাবা, মা, দিদি, শান্তি পিসিকেও প্রণাম করল

পায়ে হাত দিয়ে। কেউ বাদ পড়ে কি না তা তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ করছিলেন মা।

বৃদ্ধটি জিগ্যেস করলেন, তুমি কোন ক্লাসে পড়ো?

পরম বলল, ক্লাস ফাইভ।

বৃদ্ধ বললেন, বাঃ, বেশ ভালো ছেলে। মুখে একটা লক্ষ্মীশ্রী আছে। তুমি কি দিদির সঙ্গে কখনও ঝগড়া-টগড়া করো নাকি?

পরম অবাক হয়ে মুখ তুলল। দিদির সঙ্গে তার ঝগড়া হয় কি না সে কথা সে একজন বাইরের লোককে বলতে যাবে কেন?

পরম কিছু বলার আগেই বাবা গদগদ ভাবে বললেন, না, না, ঝগড়া করবে কেন, দিদির সঙ্গে ওর খুব ভাব!

কথাটা মোটেই সত্যি নয়। দিদির সঙ্গে এক ঘরে থাকে পরম, মাঝে-মাঝে তো ঝগড়া হবেই। রাস্তার দিকের জানলাটা দিদি কিছুতেই খুলতে দেয় না, আর জানলা বন্ধ থাকলে পরমের কেমন দমবন্ধ লাগে।

পরম দিদির দিকে তাকাল।

দিদি মুখ নীচু করে উরুর ওপর শাড়িটা সমান করছে।

বৃদ্ধটি আবার বললেন, খোকা, তুমি পড়ার বই ছাড়া গল্পেই বই-টই পড়ো?

এবারেও পরম কিছু বলার আগেই বাবা বললেন, ও তো এবারে পরীক্ষায় সেকেন্ড হয়েছে!

পরম বলল, হ্যাঁ, আমি গল্পের বই পড়ি।

বৃদ্ধটি বলল, বেশ, একটা কবিতা মুখস্থ বলতে পারো? শোনাও না।

পরম দেখল, বাবা আর মায়ের মুখ কেমন যেন শুকিয়ে এসেছে। এরা পছন্দ করতে এসেছে দিদিকে, কিন্তু পরমকে এত প্রশ্ন করছে কেন?

একটুপরেই পরম চলে গেল খেলতে।

যেতে-যেতে পরম ভাবল, প্লেটের সিঙাড়া-সন্দেশগুলোর বেশ কয়েকটা বেঁচে যাবে। প্রত্যেকবারই বেশি-বেশি আনানো হয়, সব খরচ হয় না। ফিরে এসে পরম সিঙাড়া খাবে। অন্যদিন তাদের বাড়িতে সিঙাড়া আসে না। মায়ের ধারণা ওগুলো খেলে বদহজম হয়।

বাড়ি থেকে বেরুলে একটা গলি, সেটা ডানদিকে বেঁকে গেলে বড় রাস্তা। গলির মোড়ের একদিকে মিষ্টির দোকান, আর-একদিকে কাঠের ফার্নিচারের দোকান।

গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকে পাড়ার বড় বয়েসি ছেলেরা।

তাদের মধ্যে একজন পরমকে ডেকে জিগ্যেস করল, তোর দিদিকে আজ আবার দেখতে এসেছে, না রে?

পরম মাথা নাড়ল।

সেই ছেলেটি বলল, এই নিয়ে ক'টা পার্টি এলো রে? বারো-চোদ্দোটা তো হবেই? তাই না?

পরম মনে-মনে গুনে দেখবার চেষ্টা করল। বেশিও হতে পারে।

সেই ছেলেটির নাম বাপি। সুন্দর চেহারা। চাকরি-বাকরি করে না, একটা ক্লাবে শনি-রবিবার বাচ্চা ছেলেদের ক্রিকেট খেলা শেখায়।

বাপি বলল, শোন, পরম, আজকের পার্টিটা কিন্তু সুবিধের নয়।

ছেলেটার নাম তো শেখর, তাই না? সঙ্গে ওর একটা মাসি এসেছে, সেই মাসিটাকে আমি চিনি। জয়শ্রী। জয়শ্রী দাস, ঠিক তো?

যারা এসেছে, তাদের মধ্যে কে মাসি আর কে পিসি, তাই-ই জানে না পরম, নাম জানবে কী করে? তিনজন মহিলা ছিল।

বাপি বলল, এখান থেকে যখন গেল, তখন আমি দেখেই স্পষ্ট করেছি। শ্যাম পার্কে আমরা ক্রিকেট খেলতে যেতাম, তার পাশেই একটা বাড়িতে থাকে। ওই জয়শ্রীর দুবার বিয়ে। প্রথম বিয়েটার পরেও ওর একটা বয়ফ্রেন্ড ছিল। তারপর সেই বয়ফ্রেন্ড আর জয়শ্রী মিলে স্বামীটিকে খুন করেছে। পুলিশ ধরেছিল, দুজনকেই ধরেছিল। মজার ব্যাপার কী জানিস, জয়শ্রীটা কীভাবে ম্যানেজ করে কেটে বেরিয়ে এল, যাবজ্জীবন জেল হল সেই বয়ফ্রেন্ডটার, তার নাম নিখিল। কিন্তু ও-পাড়ার সবাই জানে, খুনের ব্যাপারে জয়শ্রীই ছিল আসল। ওর এখনকার হাজব্যান্ড অন্য একজন লোক। কী তালেবর মেয়ে!

নিপু নামে আর-একটি ছেলে বলল, অ্যাই বাপি, তুই ওইটুকু ছেলেকে এসব কথা শোনাচ্ছিস কেন? ও কী বুঝবে?

বাপি বলল, ওইটুকু ছেলে মানে? পরম মোটেই আর ছোট নেই। কী রে পরম, তুই ছোট? এখনকার বাচ্চারাও অনেক ম্যাচিওরড।

পরম চুপ করে রইল।

নিপু বলল, ওসব নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার কী দরকার! তুই যা রে পরম!

বাপি বলল, বাঃ, সাবধান করে দিতে হবে না? আমাদের পাড়ার মেয়ে। যদি একটা বাজে ফ্যামিলিতে গিয়ে পড়ে। শোন পরম, তোর বাবাকে বলিস, এই পার্টি যদি রাজিও হয়, তাহলেও পাত্তা দেওয়ার দরকার নেই।

সন্ধের পর পরম বাড়িতে ফিরে দেখল, তখনও আজকের অতিথিদের নিয়ে আলোচনা চলছে।

পাত্র কাজ করে খিদিরপুর ডকে, ভালো মাইনে পায়। সে নিজে এসেছিল, আর তার বাবা, মা এবং দিদি আর মাসি। সত্যিই সেই মাসির নাম জয়শ্রী। মা আর বাবা সেই মাসিরই প্রশংসা করছে বেশি। মা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলতে লাগলেন, ছেলের মাসির ব্যবহার কী চমৎকার! মা একটু চুপচাপ। আমার তো মনে হল, জয়শ্রী পছন্দ করে ফেলেছে আমাদের দীপালিকে। আজেবাজে প্রশ্ন করেনি, বরং যাওয়ার সময় থুতনি ধরে আদর করল। ওই মাসির পছন্দ হলেই ওরা মেনে নেবে।

মা যার এত প্রশংসা করছে, সেই জয়শ্রী যে একজন খুনি, তা কি পরম বলে দেবে?

নিজে-নিজেই পরম বুঝেছে, সবকথা বলে দিতে নেই। কিছু-কিছু কথা চেপে রাখতে হয়।

তা ছাড়া, কোনও ছেলের মাসি যদি খুনিও হয়, তাতে ছেলেটার কী দোষ?

এরপর শুরু হয় দিন গোনা। কবে চিঠি আসবে। কিংবা বাবা-মাকে ডাকবে ওদের বাড়িতে।

আসে না। কোনও খবরই আসে না।

রাত্তিরে আয়নায় চুল আঁচড়াতে-আঁচড়াতে দীপালি বলল, পরম, সেদিন ওই বুড়োটা আমায় কিছু জিগ্যেস করেনি, কিন্তু তোকে অত কথা জিগ্যেস করছিল কেন বল তো?

বিছানায় শুয়ে পরম বলল, আমি তার কী জানি?

দীপালি বলল, আমায় প্রথম থেকেই ওদের পছন্দ হয়নি। আমি যে বেঁটে। কিন্তু ওই বুড়োটার একটা ছোট মেয়ে আছে বলল। তোকে ওদের এত ভালো লেগেছে যে তোর সঙ্গেই বোধহয় সেই মেয়েটার বিয়ে দিতে চাইবে!

পরম লজ্জা পেয়ে বলল, যাঃ! আমি মোটেই বিয়েই করব না। দীপালি হাসতে-হাসতে বলল, তুই বিয়ে করবি না? কেন রে?

পরম দু-দিকে মাথা ঝাঁকাতে-ঝাঁকাতে বলল, না, আমি বিয়ে-ফিয়ে করব না। পরম অনেক কিছুই বোঝে, কিন্তু একটা ব্যাপার তার কাছে এখনও পরিষ্কার নয়। বিয়ে ব্যাপারটা ঠিক কী? ছেলে মেয়েতেই শুধু বিয়ে হয় কেন?

বড়দের কথা শুনে-শুনে তার একটা অস্পষ্ট ধারণা হয়েছে যে, বিয়ের সঙ্গে ছেলেমেয়ে জন্মানোর একটা সম্পর্ক আছে। মেয়েদের পেটেই তো বাচ্চা হয়, বিয়ে না হলে মেয়েরা মা হতে

পারে না কেন? কী সেই রহস্য?

খবরের কাগজের পাত্র-পাত্রী সংবাদ দেখে বাবা চিঠি লেখেন। দলে-দলে নারী-পুরুষ দিদিকে দেখতে আসে। শেষপর্যন্ত কেউ পছন্দ করে না, শুধু সন্দেশ-টন্দেশ খেয়ে মিষ্টি-মিষ্টি কথা বলে চলে যায়। কিন্তু আগের দুই দিদির বিয়ে হয়ে গেছে সহজেই। বড়দি একটা ফাংশানে নাচতে গিয়েছিল, সেখানেই তাকে দেখে পছন্দ করেছি বড় জামাইবাবু। আর মেজদি নিজেই তার কলেজের বন্ধু অপূর্বদাকে বিয়ে করল, প্রথমে বাড়িতে জানায়নি, কী যেন জাত-টাতের গণ্ডগোল ছিল, এখন মা-বাবা দুজনেই অপূর্বদাকে খুব ভালোবাসে।

দুই দিদিই থাকে কলকাতার বাইরে। মেজদি তবু বছরে একবার-দু-বার আসে কানপুর থেকে। বড়দির আসাই হয় না। সে থাকে আরও দূরে চণ্ডীগড়ে।

ছোড়দি এই দীপালির নিজের কোনও ছেলে বন্ধু নেই। কোনও পাত্রপক্ষই তাকে পছন্দ করে না। কারণ দীপালি বেশ বেঁটে। পৃথিবীতে কি বেঁটে ছেলে নেই? তাদের বিয়ে হয় না?

এই পাড়াতেই তো কত ছেলে আছে, তাদের কারুর সঙ্গে ছোড়দির বিয়ে হতে পারে না?

আড়াল থেকে মা-বাবার টুকরো-টুকরো কথা শুনে পরম বুঝতে পারে, ছোড়দির বিয়ে হওয়াটা খুব দরকার। ওঁরা ছোড়দিকে এ-বাড়িতে বেশিদিন রাখতে চান না। কেন? ছেলেরা বাড়িতে থাকে, আর মেয়েদের কেন অন্য বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে হয়? আগের দুই মেয়ের বিয়ে নিয়ে কোনও ঝামেলা হয়নি, ছোড়দির কিছুতেই বিয়ের ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না বলে মা-বাবা দুজনেই বিরক্ত হয়ে উঠছেন। মাঝে-মাঝে তুচ্ছ কারণে ছোড়দিকে ওঁরা বকুনি দেন।

ছোড়দি যে বেঁটে হয়েছে, সেটা কি ছোড়দির দোষ? ভগবানই তো এজন্য দায়ী।

পাড়ার ছেলেরা বড় হচ্ছে আর বিয়ে হয়ে যাচ্ছে টপাটপ। বাপিদার সঙ্গে ছোড়দির বিয়ে হলে বেশ হত। কারা কখন ছোড়দিকে দেখতে আসছে, বাপিদা তার ঠিক খবর রাখে।

বাপিদাকে নিয়েও মা-বাবার মধ্যে আলোচনা হয়।

মা একদিন বলেছিলেন, আমি মরে গেলেও ওই বাপি ছেলেটার সঙ্গে দিপুর বিয়ে দেব না। তার চেয়ে ও যদি আইবুড়ো হয়েও থাকে—

বাপিদার কী দোষ? বাপিদার বাবা খুব মাতাল, প্রায় দিনই ও-বাড়িতে খুব চ্যাঁচামেচি আর ঝগড়া হয়। কিন্তু বাপিদা তো মদ খায় না। বাপিদা গালাগালিও করে না। কিন্তু বাপিদা কোনও চাকরি করে না, শুধু ক্রিকেট খেলে। তাও তো খেলার চান্স পায়নি, পাড়ার ক্লাবের খেলোয়াড়।

এবারের পাত্রপক্ষ বাড়িতে আসবে না, সেকেলে ধরনের মেয়ে দেখা তাদের পছন্দ নয়। বাবা-মা ছোড়দিকে নিয়ে গেলেন গঙ্গার ধারের রেস্তোরাঁয়, পাত্রপক্ষ সেখানে আসবে, আলাপ পরিচয় হবে।

পরম একা রইল বাড়িতে। শান্তি পিসির জ্বর হয়েছে, শুয়ে-শুয়ে ঘুমোচ্ছে সারাদিন।

পরমের বেশ অভিমান হয়েছে। গঙ্গার ধারের রেস্টুরেন্টে বুঝি তাকে নিয়ে যাওয়া যেত না?

ওঁরা ফিরলেন রাত সাড়ে আটটার পর।

ছোড়দি প্রায় ছুটে গিয়ে বিছানায় উপুড় ঝাঁপিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগল ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে।

নিজের ঘরে গিয়ে বাবা প্রায় গর্জন করে উঠলেন, জোচ্চোর! চশমখোর!

পরম জানে, কী হয়েছে জানতে চাইলে সে কোনও উত্তর পাবে না। সে যে ছোট!

কিন্তু কিছু একটা অপমানজনক ঘটনা যে ঘটেছে তা বোঝার মতন বয়েস তার হয়েছে।

অনেক ডাকাডাকি সত্ত্বেও দীপালি আর বিছানা ছেড়ে উঠল না, কিছু খেতেও রাজি হল না।

একসময় আলো নিবিয়ে দিল পরম।

পাশাপাশি দুটো খাট। অন্যদিন শোওয়া মাত্র পরম ঘুমিয়ে পড়ে, আজ তার ঘুম আসছে না।

নিশ্বাসের শব্দ শুনেই বোঝা যায়, দীপালি এখনও ঘুমোয়নি। মাঝে-মাঝে ফুঁপিয়ে উঠছে।

একসময় কৌতূহল চাপতে না পেরে পাশের খাটে উঠে সে জিগ্যেস করল, এই ছোড়দি, ছোড়দি, আজ কী হয়েছে রে?

ফোঁপানি থেমে গেল দীপালির। পরমের প্রশ্নের কোনও উত্তরও দিল না।

তার পরই ধড়মড় করে উঠে বসে বলল, ছোটু, তুই খানিকটা পেট্রল জোগাড় করে আনতে পারবি?

পরম বলল, পেট্রোল? পেট্রল কী হবে? আমাদের তো গাড়ি নেই! দীপালি বলল, আমার গায়ে পেট্রল ঢেলে আগুনে পুড়ে মরব।

মৃত্যু সম্পকে এখনও কোনও অভিজ্ঞতা হয়নি পরমের। কোনও নিকটজনের মৃত্যু দেখেনি। তবু মরার কথা শুনলেই ভয়-ভয় করে। সে ছোড়দির মাথায় হাত রেখে বলল না, না।

দীপালি সেই হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, তুই কেন ফরসা হলি? তোর তো কোনও দরকার ছিল না। তোর বদলে আমি ফরসা হলে কাজে লাগত!

ফরসা-কালোর তফাতটাও পরম ঠিক বোঝে না। তবে, নানান টুকরো-টুকরো কথা শুনে তার ধারণা হয়েছে, ছেলেদের ফরসা হওয়ার তেমন কোনও দরকার নেই, কিন্তু মেয়েদের ফরসা হওয়াটা খুব জরুরি। নইলে তাদের বিয়ে হয় না।

ছেলে আর মেয়েদের মধ্যে এই তফাত কেন? কালীঠাকুরের গায়ের রংও তো কুচকুচে কালো, সেই কালীঠাকুরের কত ধুমধাম করে পুজো হয়, অথচ কালো মেয়েদের বিয়ে হবে না কেন?

পরম কি ইচ্ছে করলে তার গায়ের রংটা ছোড়দিকে দিয়ে দিতে পারে?

মাঝে-মাঝেই সে প্রশ্নটা মাথায় ঘোরে, এবার সেটা বলে ফেলল পরম।

আবার দীপালির মাথায় হাত রেখে সে জিগ্যেস করল, বিয়ে না হলে কী হয় রে ছোড়দি?

দীপালি চোখ মুছে, খানিকটা শান্ত হয়ে বলল, যা, শুয়ে পড় ছোটু, অনেক রাত হয়েছে। কাল ইস্কুল আছে না?

পরম তবু জিগ্যেস করল, বল না! মেয়েদের কেন বিয়ে করতে হবেই? কাকু তো বিয়ে করেনি।

দীপালি এবার বলল, ছেলেদের কথা আলাদা। মেয়েদের অবস্থা হয় শান্তি পিসির মতন। ঝি-গিরি করতে হয় পরের বাড়িতে।

পরম আর কোনও অবিবাহিতা রমণীর কথা মনে করতে পারল না। কিন্তু একটা যুক্তি তার মাথায় এল।

সে বলল, শান্তি পিসির তো মা-বাবা কেউ নেই।

দীপালি বলল, মা, বাবা কারুর চিরকাল থাকে না। বুড়ো বয়েসে আমি কোথায় যাব? আমি কোনও ভালো চাকরিও পাব না!

দীপালি পাড়ার একটা স্কুলে বাচ্চাদের আঁকা শেখায়। মাইনে পায় অতি সামান্য।

দীপালি পার্ট-টু পরীক্ষায় পাশ করতে পারেনি। প্রথমবার টাইফয়েড হল, পরীক্ষা দিতেই পারল না। দ্বিতীয়বার দিতে বসে সে কেঁদেছিল, তার কিছু মনে পড়েনি।

ছেলেবেলা থেকেই তার আঁকার হাত ভালো। কিন্তু আঁকা শেখানোর কথা কেউ ভাবেনি, এখন নিজে-নিজে বড়জোর ফুল পাখি আঁকতে পারে।

পরম বলল, আমি তো বড় হয়ে চাকরি করব। তুই আর আমি থাকব একসঙ্গে।

দীপালি বলল, মিত্তিরবাড়ির অর্চনাদিকে দেখিস না? আমার অবস্থা হবে সেই রকম। অর্চনাদি বিধবা হওয়ার পর দাদার সংসারে থাকে। বউদি কীসব বিচ্ছিরি গালাগালি দেয়। ভালো করে খেতেও দেয় না। তপনদাও কিছু বলে না। ওরকম ভাবে বেঁচে থাকার বদলে মরে যাওয়াও ভালো!

পরম বলল, তপনদাটা বাজে লোক। সক্কলের সঙ্গে ঝগড়া করে।

দীপালি বলল, আমি তো দেখেছি, ছোটবেলায় তপনদা ঘুড়ি ওড়াত, আর লাটাই ধরত অর্চনাদি। এখন সারাদিনে তপনদা একটাও কথা বলে না অর্চনাদির সঙ্গে। বিয়ের পর মানুষ বদলে যায়।

কেন বদলে যায়?

বউ এলে তখন সেটা হয় বউয়ের সংসার। বউয়ের কথা মতনই সব কিছু চলে। যারা আশ্রিত হয়ে থাকে, তাদের লাথি-ঝ্যাঁটা খেতেই হয়।

বউরা কেন এরকম করে?

তুই বড় হবি, একসময় বিয়ে করবি, তখন এসব বুঝবি।

আমি বিয়েই করব না।

আহা-হা, তোকে আর পাকামি করতে হবে না। ঘুমো বলছি না?

সত্যি বলছি, আমি বিয়ে করব না। কিছুতেই করব না!

কেন করবি না? তুই আমাদের বাড়ির একমাত্র ছেলে, তুই বড় হবি, বিয়ে করবি, বাবা-মায়ের নাতি-নাতনি হবে, তাদের কত আনন্দ হবে। ততদিনে শান্তি পিসি মরে গেলে, তার জায়গাটা নিতে হবে আমাকে। আর বাবা-মাও যদি মরে যায়, তাহলে আমি হব সেই সংসারের বোঝা।

আমি বিয়ে করব না, করব না, করব না!

আবার পাকামি? এই বয়সে তোকে বিয়ের চিন্তা করতে কে বলেছে? শুতে যা বলছি!

ছোড়দি, তুমি শুনে রাখো! আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, বিয়েটা একটা বিচ্ছিরি ব্যাপার, আমি কোনওদিনই বিয়ে করব না।

প্রতিজ্ঞা করেছিস? ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা নাকি?

পরম মহাভারত পড়েছে। তাই জোর দিয়ে হ্যাঁ, ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা। তুমি দেখো! তুমি আর আমি একসঙ্গে থাকব।

সে রাত্রি প্রায় কেটে গিয়েছিল বিনা ঘুমে।

সেই প্রতিজ্ঞার কথা ভোলেনি পরম।

স্কুল ছেড়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভরতি হয়েও সে মেয়েদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশেনি। তার জেদ ছিল পড়াশুনোয়।

সে সুদর্শন তরুণ, নামকরা ছাত্র, তার দিকে সহপাঠিনী তো আকৃষ্ট হবেই। কিন্তু সে তাদের কারুর সঙ্গেই নিরিবিলিতে দেখা করতে চায়নি। অনেক জনের দলের মধ্যে সে হাসিঠাট্টাতেও যোগ দেয়, কিন্তু কেউ তাকে একা পায় না।

কেমিস্ট্রিতে এম. এস সি পাশ করার পর রিসার্চ করতে-করতেই সে একটা ভালো চাকরি পেয়ে গেল বড় একটা ওষুধ কোম্পানিতে। তখন তার মা-বাবা তার বিয়ের জন্য তো চিন্তা করবেনই।

সে প্রসঙ্গ উঠলেই পরম হাত নেড়ে উড়িয়ে দেয়।

কেন যে পরম মেয়েদের ব্যাপারে নির্লিপ্ত, তা মা-বাবা জানবেন কী করে? শুধু ছোড়দি জানে।

দীপালিও মাঝে-মাঝে বলে, পরম, তুই এখনও সেই প্রতিজ্ঞার কথা ধরে বসে আছিস? ওসব প্রতিজ্ঞার কোনও মূল্য আছে নাকি? তখন তোর কম বয়েস ছিল, তখন মাথায় কত কী আসে। আমার জন্য তুই তোর জীবনটা নষ্ট করবি কেন? আমি বলছি, তুই বিয়ে কর। লক্ষ্মী ভাইটি আমার।

পরম শুধু হাসে। কম বয়েসে সে আবেগের মাথায় একটা প্রতিজ্ঞা করে বসেছিল, সেজন্য সে মোটেই আপশোশ করে না। এখন বুদ্ধি-বিবেচনা দিয়ে বোঝার পর বিয়ে জিনিসটারই প্রতি তার ঘেন্না ধরে গেছে। বিয়ে একটা কৃত্রিম সামাজিক বন্ধন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মেয়েদের প্রতিই বন্ধন

আর অবিচার হয় বেশি। পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা, নানারকম মোলায়েম প্রলেপ দিয়েও এই নীতিটাই তো চালু আছে এখনও।

বারো বছর বয়সে এক অন্ধকার রাতে ছোড়দির পাশে দাঁড়িয়ে একটা কঠিন প্রতিজ্ঞা করেছিল পরম। তারপর কেটে গেছে উনিশ বছর।

এরমধ্যে বদলে গেলে অনেক কিছু।

ক্যানসার ধরা পড়ার পর মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যে চলে গেলেন মা। বাবা আর কলকাতায় থাকতেই চাইলেন না, জোর করেই চলে গেলেন হরিদ্বারের এক আশ্রমে।

সেই ভাড়াবাড়ি ছেড়ে দিয়েছে পরম, এখন সে কোম্পানির ফ্ল্যাট পেয়েছে যোধপুর পার্কে। দীপালির শেষপর্যন্ত বিয়ে হয়নি, সে-ই এখন সংসারের কর্ত্রী। কোনদিন কী বাজার হবে, এমনকি পরম কোনদিন কী শার্ট পরবে, তাও ঠিক করে দেয় দীপালি। অবসর সময়ে সে ছবি আঁকে। অনেকটা উন্নতি করেছে।

সেই শান্তি পিসি রয়ে গেছে এখনও। শান্তি পিসির মেজাজ খুব চড়া, মাঝে-মাঝেই ছোড়দির সঙ্গে টক্কর লাগে, কিন্তু তাতে মাথা গলায় না পরম। মেয়েরা এরকম ঝগড়া আসলে উপভোগই করে, এই তার ধারণা।

দিদির নামে পরম আলাদা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলে দিয়েছে, প্রতিমাসে সেখানে দেড় হাজার টাকা জমা হয়। সে টাকা দীপালি ইচ্ছে মতন খরচ করতে পারবে। পরমের কাছে হাত পাততে হবে না কখনও।

শান্তি পিসিই প্রথম দেখতে পেল দীপালির মৃতদেহ।

শীতকালের দুপুরে একবার ঘুমোলে শরীর এত ভারী হয়ে যায় যে চোখ আর খুলতেই চায় না। অনেকক্ষণ ধরেই শান্তি পিসি একটা পোড়ো গন্ধ পাচ্ছিল, একসময় বাধ্য হয়ে উঠে সারা বাড়ি খুঁজতে লাগল।

একতলার উঠোনে পড়ে আছে দীপালি। তখনও তার গায়ের আগুন জ্বলছে, প্রাণ বেরিয়ে গেছে আগেই।

অফিস থেকে ছুটে এসেছে পরম। পুলিশকে ফোন করা হয়েছে, পুলিশ না এলে লাশ সরানো যাবে না।

সেই লাশের পাশে একটা চেয়ারে নিথর হয়ে বসে আছে পরম, তার হাতে দীপালির শেষ চিঠি। অতি সংক্ষিপ্ত, আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। পরম, তুই আমাকে ক্ষমা করিস। অশেষ পুণ্য না করলে মানুষ তোর মতন ভাই পায় না।

পরম ভাবতে লাগল, ভুলটা হল কোথায়? সে নিজে বিয়ে করতে না চেয়ে দিদির জন্য বিরাট স্বার্থত্যাগ করেছে, তাও তো নয়। বিয়ে ব্যাপারটাই তার ঘোর অপছন্দ, সেকথা ছোড়দিকে বুঝিয়েছে অনেকবার। বংশরক্ষার ব্যাপারেও তার কোনও মোহ নেই। এ-দেশের যা জনসংখ্যা, তাতে আর দু-চারটি যোগ না করলেও চলবে।

গার্গীকে দেখেই কি দিদির ভাবান্তর হল?

গার্গীর সঙ্গে পরমের পরিচয় হয়েছে বছরখানেক, অফিসে কাজের সূত্রে। সে একজন ডাক্তার। দুজনের রুচির মিল আছে, মনের তরঙ্গেরও যোগ হতে দেরি হয়নি। কিন্তু বিয়ের প্রশ্ন ওঠেনি একবারও। এ ব্যাপারে গার্গী যেন পরমের চেয়েও উগ্র, বিয়ে শব্দটাই সে সহ্য করতে পারে না। এবং সে মনে করে, আজ থেকে আগামী দশবছর প্রত্যেক শিক্ষিত নারীর সন্তান জন্ম দেওয়া নিষিদ্ধ করা উচিত। তার বদলে দত্তক নেওয়া উচিত অনাথ শিশুদের।

মনের মিল হলে ভালোবাসা হবে না কেন? পরস্পরের শরীরের প্রতি আকর্ষণও অস্বাভাবিক নয়। আর দুজনেই যখন বিয়ে করতে চায় না, তখন এর মধ্যে অন্যায় কিংবা দুর্নীতির প্রশ্নই বা

আসবে কেন? অনেক সভ্য দেশে এরকম সম্পর্ক অনেকদিন চালু হয়ে গেছে।

এমনকি পরমের সঙ্গে এক বাড়িতেও থাকতে চায় না গার্গী। তার বাড়িতে রয়েছেন একমাত্র বিধবা মা। আর একটি পালিত শিশু। মাঝে-মাঝে পরমের সঙ্গে দেখা হবে, সেই তো ভালো।

সামনের সপ্তাহের ছুটিতে গার্গীর সঙ্গে পরম দার্জিলিং-এ কয়েকটা দিন কাটিয়ে আসবে ঠিক করেছিল। এর মধ্যে গার্গীর মায়ের সঙ্গে তার আলাপ হয়েছে, তিনি সব জানেন। গার্গীও এসেছিল ছোড়দির সঙ্গে দেখা করতে। গার্গীর এমনই প্রাণোচ্ছল ব্যবহার, তাকে অপছন্দ করা কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়। ছোড়দির আঁকা ছবি দেখেও সে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছে।

গার্গী চলে যাওয়ার পর ছোড়দিও বলেছিল, ভারি চমৎকার মেয়ে। এতদিনে তোর ঠিক যোগ্য একটা মেয়েকে দেখলাম রে ছোটু। দেরি করিস না, ওকে বিয়ে করে ফ্যাল।

পরম হাসতে-হাসতে বলেছিল, বিয়ে? বিয়ের কোনও প্রশ্নই নেই।

ছোড়দি বলেছিল, কেন? ছোটবেলায় ওইসব বাজে প্রতিজ্ঞা-ট্রতিজ্ঞা ভুলে যা। আমি তো তোকে বলেছি, ওর সঙ্গে আমি ঠিক মানিয়ে নেতে পারব।

পরম বলেছিল, ছোড়দি, ও নিজেই বিয়ে-টিয়ের ঝঞ্ঝাট চায় না। আমরা মাঝে-মাঝে একসঙ্গে থাকব—

দীপালির মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল। আস্তে-আস্তে বলেছিল, বিয়ে না করেও একসঙ্গে থাকবি, ছিছি—

তারপর থেকেই দীপালি যেন আর স্বাভাবিক হতে পারেনি।

চিঠিখানা হাতে নিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পরম ভাবল, কেন গার্গীর সঙ্গে এই সম্পর্কটা ছোড়দি মানতে পারল না? একজন নারী হিসেবে অন্য নারীর প্রতি ঈর্ষা? কিংবা দিদি কি তাকে প্রতিজ্ঞা থেকে মুক্তি দিতে চাইল? অথচ সেই প্রতিজ্ঞাটাই তো এখন অবান্তর হয়ে গেছে।

দীপালির বীভৎস, পোড়া শরীরটার দিকে একপলক চেয়েই মুখ ফিরিয়ে নিল পরম।

দিদি বলেছিল, ছি, ছি!

নিজে সারাজীবন বিয়ের জন্য কত লাঞ্ছনা, কত অপমান সহ্য করেছে ছোড়দি। তবু বিয়ে ব্যাপারটার ওপর তার এত ভক্তিশ্রদ্ধা! অন্য সম্পর্ক মেনে নিতে পারল না।

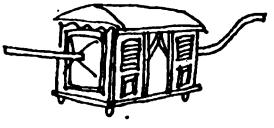

অদৃশ্য বাঁশি

আমি জীবনে তিনবার সেই বাঁশি শুনেছি।

সুন্দর, মিষ্টি সেই বাঁশির সুর শুনলেই আমার চোখে একটা ছবি ভেসে ওঠে। একটা চোদ্দো-পনেরো বছরের রাখাল ছেলে একটা মোষের পিঠে চড়ে বাঁশি বাঁজাচ্ছে।

ক্যালেন্ডারে কৃষ্ণের যেমন ছবি থাকে, তেমন নয় কিন্তু। সে কৃষ্ণ বাঁশি বাজায় গাছতলায় বসে। মোষের পিঠে চাপা কৃষ্ণর কোনও ছবি আমি দেখিনি। কিন্তু বিহারে বেশ কয়েকবার দেখেছি, রাখাল ছেলেরা মোষের পিঠে চেপে দুলতে-দুলতে যায়। কিন্তু তাদের কারুর হাতে বাঁশি থাকে না।

প্রথমবার শুনেছিলাম মধ্যপ্রদেশে বস্তারের জঙ্গলে।

আমি আর আমার বন্ধু শক্তি হেঁটে-হেঁটে যাচ্ছিলাম মুড়িয়া ঘাটের দিকে। দিনেরবেলা।

শীতকালের পরিষ্কার আকাশ। খুব বেশি শীত নেই, গায়ে রোদের ছোঁয়া লাগলে আরাম হয়।

জঙ্গলটা বেশ পরিষ্কার, বড়-বড় গাছ, কিন্তু ঝোপঝাড় বিশেষ নেই। অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। সুরকি বেছানো লাল রঙের রাস্তা। রায়পুরের থানার দারোগা বলে দিয়েছেন, এই জঙ্গলে ভয়ের কিছু নেই, ছোটখাটো ভাল্লুক, বেরোয় মাঝে-মাঝে। তাও দিনেরবেলা তাদের দেখা যায় না।

মাত্র সাড়ে ছ'মাইল রাস্তা, হেঁটে যেতে বড়জোর দু-ঘণ্টা লাগবে।

এক ঘণ্টার মতন হেঁটেছি সেখানটায় জঙ্গল বেশ ঘন, মানুষজন কিছু নেই। কোনও শব্দও নেই।

হঠাৎ শুনতে পেলাম একটা বাঁশির সুর।

শুনে মনে হল, জঙ্গলে অনেকে গরু-মোষ চরাতে আসে নিশ্চয়ই কোনও রাখাল ছেলে আপন মনে বাঁশি বাজাচ্ছে।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে কোনও গরু-মোষ দেখা গেল না। অথচ বাঁশির আওয়াজটা বেশ কাছেই। শক্তিকে জিগ্যেস করলাম, কোথায় বাঁশি বাজছে বলো তো?

শক্তি বলল, বাঁশি? কোথায় বাঁশি?

আমি বললুম, একটু মন দিয়ে শোনো।

শক্তি চোখ কুঁচকে মাথাটা একটু হেলিয়ে থেকে একটু পরে বলল, ধুৎ। কিছু শুনতে পাচ্ছি না তো।

আশ্চর্য ব্যাপার, শক্তি শুনছে না, অথচ আমি শুনতে পাচ্ছি স্পষ্ট। শুধু তাই নয়, সুরটা যেন চুম্বকের মতন টানছে।

শক্তি এগোতেই আমি তার হাত ধরে টেনে বললাম, দাঁড়াও, পুরোটা শুনে যাই।

শক্তি বলল, পাগল হলে নাকি? গাছের পাতায় বাতাসের সরসর শব্দ হচ্ছে, তুমি তাই শুনে ভাবছ—

আমি শুধু বাঁশি শুনছি না, কল্পনায় দেখতেও পাচ্ছি, মোষের পিঠে চেপে একটি কিশোর বাঁশি বাজাচ্ছে তন্ময় হয়ে।

শক্তির সঙ্গে আমার ঝগড়া হওয়ার উপক্রম। শক্তি এগোবেই, আমি বসে পড়লাম রাস্তার ধারে একটা পাথরের ওপর।

একটু কাছেই চ্যাঁচামিচি—গোলমাল শুনে চমকে উঠলাম।

কয়েকজন উলটো দিক থেকে ছুটতে-ছুটতে আসছে। তাদের চিৎকার শুনলে মনে হয়, কোনও কারণে ভয় পেয়েছে খুব।

কাছে আসতেই দেখা গেল, তাদের মধ্যে একজনের সারা গায়ে রক্ত, তাকে অন্যরা কোলে করে আনছে।

আমাদের দেখে তারা বলল, ভাগো, ভাগো।

কী হয়েছে? কী হয়েছে?

তাদের বেশি কথা বলার সময় নেই। লোকটিকে এক্ষুনি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। আহত লোকটির বুক থেকে ভলকে-ভলকে রক্ত বেরুচ্ছে।

সংক্ষেপে তারা জানাল, এখান থেকে একটু দূরেই দুটো প্রকাণ্ড ভাল্লুক রয়েছে রাস্তার ওপরে। তারাই আক্রমণ করেছে ওদের। ওরা জঙ্গলে কাঠ কাটতে আসে। আগে কখনও এমন বিপদে পড়েনি।

বলাই বাহুল্য, আমরাও দৌড়োতে লাগলুম ওদের সঙ্গে।

রায়পুরের দারোগাটি আমাদের ভুল বুঝিয়েছিল। যে জঙ্গলে ছোট-ছোট ভাল্লুক আছে, সেখানে কি বড় ভাল্লুক থাকতে পারে না? আর তারা শুধু রাত্রিতেই বেরুবে, দিনেরবেলা বেরুবে না, এমনকী কথা দিয়েছে কারুর কাছে?

আমরা খানিকটা এগুলে, ভাল্লুক দুটো আমাদেরও আক্রমণ করতে পারত। তাহলে বাঁশির আওয়াজটাই বাঁচিয়ে দিল আমাদের। কিন্তু কে সেই বাঁশি বাজাল?

একথা অন্যদের বললেও তো কেউ বিশ্বাস করবে না। শক্তি আমার সঙ্গে ছিল, সে-ও বিশ্বাস করবে না। কিন্তু বাঁশির আওয়াজ যে আমি শুনেছি, তাতে কোনও ভুল নেই। এবং ভাল্লুকের ঘটনাটাও সত্যি। শক্তি একটা ভ্রমণ কাহিনিতে লিখেছে।

দ্বিতীয়বার সেই বাঁশি আমি শুনতে পাই কয়েক বছর পর। কল্যাণেশ্বরী ডাকবাংলোয়। সেবারে আমার সঙ্গে কেউ ছিল না।

সেবারে কোনও বিপদ থেকে বাঁচার মতনও কিছু ঘটেনি।

কল্যাণেশ্বরীর বাংলোটি খুব নিরিবিলি। সেখানে আমি এক মাস ছিলাম। লেখার জন্য।

সরকারি বাংলো, তাই ভাড়া খুব সামান্য। চৌকিদার ও রান্নার লোক আলাদা, তারা দুজনে খুব ঝগড়া করে বটে, কিন্তু আমার যত্নের কোনও ত্রুটি হয় না। রান্নার লোকটির হাত খুব চমৎকার। এখানে নানান রকমের মদ পাওয়া যায়। আর পাঁঠার মাংসের স্বাদও কলকাতার চেয়ে অনেক ভালো।

আমি মাঝে-মাঝে কলকাতার ভিড় থেকে পালিয়ে গিয়ে কোথাও একা দিনের-পর-দিন কাটিয়ে দেওয়া বেশ উপভোগ করি। লেখাতেও মন বসে।

একা থাকায় বিপদও আছে। বাইরের বিপদ নয় ভেতরের বিপদ।

কয়েকদিন থাকবার পর হঠাৎ মন খারাপ হয়। সে মন খারাপের কোনও ব্যাখ্যা নেই। কোনও কিছু না পাওয়ার জন্য নয়। এমনকী নারীসঙ্গ থেকে বঞ্চিত হওয়ার জন্যও নয়। এক-একসময় মেয়েদের সঙ্গে খানিকটা দূরত্ব রেখে মনে মনে তো আরও নিবিড় করে পাওয়া যায়। অবশ্য বেশি দিনের জন্য নয়। অন্তত দিন পনেরো কোনও নারীকেই না দেখে কাটিয়ে দেওয়া যায়। ষোলো দিনের দিন ছটফটানি শুরু হবেই।

আমি ঠিক পনেরো দিনের জন্যই গিয়েছিলাম কল্যাণেশ্বরী ডাকবাংলোয়। দোতলার ঘরটি চমৎকার। এই বাংলোটি ফাঁকাই থাকে বেশিরভাগ সময়, অন্তত আমি থাকার সময় আর কেউ আসেনি।

ছ'দিনের মাথায় আমার আচমকা মন খারাপ শুরু হয়ে গেল। যেন ভাইরাস জ্বরের মতন। কোথা থেকে আসে কে জানে। একবার মন খারাপ হলে তা বাড়তেই থাকে। কোনও কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। অ্যাসিডিটি হয়নি, গায়ে ব্যথা নেই, শরীর বেশ সুস্থই আছে, তবু খাবারের স্বাদ হারিয়ে গেল। এই সময় হয়তো আশেপাশে মানুষজন থাকলে খানিকটা চাঙ্গা হওয়া যায়। কিন্তু আমি পনেরো দিনের আগে ফিরবই না প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছিলাম। এবং সে প্রতিজ্ঞা ভাঙারও কোনও ইচ্ছে জাগল না।

লেখাও বন্ধ হয়ে গেল।

এরকম সময়, বেঁচে থেকে লাভ কী, কেন পাতার-পর-পাতা লিখছি, না লিখলেই বা ক্ষতি কী। আমার জীবনের কী মূল্য আছে। এই ধরনের আজে-বাজে চিন্তাই বেশি আসে।

তখনও আমি বিয়ে করিনি।

দু-তিনজন বান্ধবীর কথা চিন্তা করে মনটা ফেরাবার চেষ্টা করি। এবং বাস্তবে যা সম্ভব নয়, মনে-মনে তাদের সমস্ত জামা-কাপড় খুলে ফেলারও অসুবিধে নেই। তবু কয়েক মুহূর্ত বাদেই তাদের শরীর মিলিয়ে যায়। কে না কে আমাকে কিছুটা বিদ্রূপ করেছে, আমার চেয়ে অন্য কাজের প্রতি বেশি মনোযোগ দিয়েছে, সেইসব কথা ও দৃশ্য উঠে আসে মনের ভেতর থেকে।

শেষপর্যন্ত এমনই অবস্থা হল, লিখতে তো ইচ্ছে করেই না, বরং যে কয়েক পাতা লিখেছি, তাও ছিঁড়ে ফেলতে হয়।

দুপুরবেলা চিত হয়ে শুয়ে যাই, ঘুমও আসে না।

এরকমভাবে একদিন, দুদিন, তিনদিন কেটে যাওয়ার পর, যখন আমি মন খারাপের একেবারে

শেষ সীমায় নেমে গেছি, তখনও বেজে উঠল সেই বাঁশি।

ধড়ফড় করে বিছানা ছেড়ে নেমে এসে দাঁড়ালাম জানলার কাছে। সামনে অনেকখানি ফাঁকা মাঠ, ঝোপঝাড়, ঘাসে ভরা, বড় গাছ নেই। অন্য দিন এখানে গরু-মোষ চরতে দেখেছি।

আজও কয়েকটা গরু-মোষ রয়েছে ইতস্তত, কিন্তু কোনও রাখালকে দেখা যাচ্ছে না। বাঁশি কিন্তু বেজেই চলেছে। আর সে সুর এমনই বাস্তব যে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হল, কাছাকাছি কেউ নিশ্চিত সেই বাঁশি বাজাচ্ছে।

আমি তড়বড়িয়ে নীচে নেমে এসে ছুটে গেলাম বাইরে।

ও দিকের মাঠটায় কেউ নেই। অন্যদিকে খানিকটা জঙ্গলের মতন, সেখানেও কেউ নেই।

ভুতুড়ে ব্যাপার নাকি? ভূতে বাঁশি বাজায়, এমন কখনও শুনিনি। ভূত না হলে, দৈব ব্যাপার? আমার মতন একজন বদ্ধমূল অবিশ্বাসীর জন্য কোনও দেবতা এসে বাঁশি বাজাচ্ছে কেন? এটাও বিশ্বাসযোগ্য নয়।

বাঁশির আওয়াজ বেশ মৃদু আর সুমধুর। মিনিটদশেক পরে যেন হাওয়ার মিশিয়ে গেল।

তারপর সারা বিকেল সেই বাঁশির কথা ভাবতে-ভাবতেই আমার অনেক সময় কেটে গেল। এরকম এক-একটা ধাঁধার সমাধান করতে না পারলে কিছুতেই স্বস্তি পাওয়া যায় না। মধ্যপ্রদেশের কবলে আমি যে বাঁশির সুরটা শুনেছিলাম, আজকের সুর ঠিক একই রকম।

দু-জায়গায় রাখাল, এতখানি দূরত্ব, ঠিক একই সুরে বাজাবে? লোক সঙ্গীতের সুরের মিল থাকে, তা বলে এতটা মিল?

এটা আমার নিছক কল্পনা? আগেরবার, আমি স্পষ্ট শুনেছি। অথচ শক্তি শুনতে পায়নি।

কিন্তু কল্পনা আর বাস্তবের প্রভেদ বোঝার বয়েস আমার এখনও হয়নি? কোনও রকম অলৌকিক ব্যাপারেই যে আমার বিশ্বাস নেই!

ভাবতে-ভাবতে আমার ঘুম এসে গেল।

জেগে উঠলুম প্রায় সাতটার সময়। শরীরটা বেশ ঝরঝরে হয়ে গেছে।

এককাপ চা খাওয়ার পর খুঁজতে লাগলাম কলমটা। এবার লেখার প্যাডে কলমটা চলতে লাগল সাবলীলভাবে।

তৃতীয়বার সেই বাঁশি শুনি আরও সাড়ে চার বছর পর।

একটা সাহিত্যসভা উপলক্ষে গিয়েছিলাম ত্রিপুরায়। উদ্যোক্তারা আমাদের খাতির করে এক রাতের জন্য সিপাহিজলা ডাকবাংলোয় রাত কাটাবার ব্যবস্থা করেছিল। দলে আমরা চারজন, আর দেখাশুনো করার জন্য স্থানীয় দুজন।

জঙ্গল ও জলাভূমির পাশে ডাকবাংলোটি ভারী মনোরম।

এসব জায়গায় একলা এলে প্রকৃতির দিকে যতটা মনোযোগ দেওয়া যায়, দল বেঁধে এলে তার উপায় থাকে না।

কিছুক্ষণ আহা-আহা করার পরই মন চলে যায় খাওয়াদাওয়ার দিকে। সঙ্গে পানীয়ও থাকবে অবশ্যই। তারপর আড্ডা। পানীয়ের মাত্রা যত চড়ে, আড্ডা ততই হয়, কেউ অন্যের কথা শুনতে চায় না।

সেই সময় আমার পক্ষে একা থাকাটাই ছিল বিপজ্জনক।

একা হয়ে পড়লেই আমি এক সাংঘাতিক দ্বন্দ্বে কাতর হয়ে যাই, কোনটা সঠিক পথ তা বুঝতে পারি না কিছুতেই। তার চেয়ে আড্ডা, হইহল্লা ও মদ্যপানে মেতে থাকলে তবু বিলক্ষণ ভুলে থাকা যায়।

আমি যদি চাই, যে মুহূর্তে বলব, এসো, তক্ষুনি অপর্ণা আমার হবে। সেসব কিছু ছেড়ে চলে আসবে আমার কাছে।

আর আমি যদি না চাই, যদি দ্বিধা করি, যদি প্রকৃত পৌরুষ দেখাবার বদলে দুর্বল হয়ে পড়ি, তাহলে সে চলে যাবে সদ্য পাশ করা এক ডাক্তারের সঙ্গে।

অপর্ণাও যে আমাকে ভালোবাসে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই, না হলে সে আমার ইঙ্গিতমাত্র সবকিছু ছেড়ে কাছে চলে আসতে চাইবে কেন?

কিন্তু আমি একটু দ্বিধা করলেই সে আরেকজনের সঙ্গিনী হবে, এ আবার কী ধরনের ভালোবাসা? এরকম মনে হতে পারে, কিন্তু আমি জানি, অপর্ণার কোনও দোষ নেই। সে ভালোবাসা নিয়ে দরাদরি করতে চায় না।

একট পচে যাওয়া বনেদি বাড়ির মেয়ে অপর্ণা। বিশাল একটা অট্টালিকা, কিন্তু সে অট্টালিকার রন্ধ্রে-রন্ধ্রে ঘুণ ধরে গেছে। বিরাট পরিবার, সেখানে কেউ কারুকে ভালোবাসে না, মায়াদয়া নেই, সম্পত্তি ভাগাভাগি নিয়ে হিংসে ও সন্দেহের বিষের ছোঁয়া সে-বাড়িতে ছেয়ে আছে সবসময়।

অপর্ণা মরিয়া হয়ে সে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চায়। মাঝে-মাঝে সে অসুখে ভুগছে। ও-বাড়িতে থাকলে ওর মতন সূক্ষ্ম, স্পর্শকাতর মেয়ে বেশিদিন বাঁচবে না।

আর আমি দরিদ্র, উদ্বাস্তু পরিবারের ছেলে। দুখানা ঘরের ফ্ল্যাটে মা-বাবা, ভাই-বোনদের সঙ্গে থাকি। সেখানে অপর্ণাকে টেনে আনা যায়? সদ্য একটা চাকরি পেয়েছি বটে, সামান্য ধরনের, সে উপার্জনে অন্য জায়গায় সংসার পাতাও সম্ভব নয়। তা ছাড়া বাবা অসুস্থ, তিনি এতদিন সংসার টেনেছেন, এখন আমি তাঁর পাশে দাঁড়াবার বদলে যদি নিজে বিয়ে করে আলাদা হয়ে চলে যাই, সেটাও হবে চরম স্বার্থপরতা। অমানবিকতা। সেই গ্লানি মনের মধ্যে থাকলে, ভালোবাসা কতদিন টিকবে? আমার অপরাধবোধ অপর্ণাকেও যন্ত্রণা দেবে।

তরুণ ডাক্তারটিকে যে অপর্ণা ভালোবাসে, তা নয়, মোটামুটি পছন্দ করে। মেয়েরা নিজের প্রেমিক ছাড়াও আরও পুরুষকে তো পছন্দ করতেই পারে। পুরুষরা এরকম করে না? ডাক্তার ছেলেটিরই ঝোঁক বেশি।

আমি বুঝতে পারি, ডাক্তারটির সঙ্গে অপর্ণা চলে গেলে একটা সুস্থ জীবন পেতে পারে। সে-ছেলেটির মা ছাড়া আর কেউ নেই, তা ছাড়া বিদেশে যাওয়ার কথা চলছে।

আমাদের মাঝখানে ঝুলে আসে ভালোবাসা।

কিন্তু শুধু ভালোবাসা যে নিজের পায়ে বেশিদিন দাঁড়াতে পারে না। কয়েকটা খুঁটি লাগে। তা যে একটাও আমার নেই।

কিন্তু অপর্ণাকে অন্যের কাছে চলে যেতে দিলে আমার পৌরুষে চরম ঘা পড়বে না? নিজেকে কোনওদিন ক্ষমা করতে পারব? একটি মেয়ে যাকে আমি সত্যিকারের ভালোবাসি, সে-ও আমাকে মনপ্রাণ দিয়ে চাইছে, সে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রশ্নও তোলেনি, তবু আমি তাকে প্রত্যাখ্যান করব? আমি কি তাহলে পুরুষ নামের অযোগ্য হয়ে যাব না?

বরাবরই আমি ব্যক্তিগত ব্যাপারে গোপনীয়তা প্রিয়। নিজের সমস্যার কথা অন্য কারুকে জানাতে পারি না। বন্ধুরা কেউ কিছুই জানে না।

সিপাইজলার ডাকবাংলোতে খাওয়াদাওয়া ও আড্ডা চলল অনেক রাত পর্যন্ত। যে-যেখানে পারে ঘুমিয়ে পড়েছে।

আমার চোখে ঘুম নেই, আমি এসে বসলাম সামনের বারান্দায়।

প্রথম রাতে অন্ধকার ছিল, এখন জ্যোৎস্না ফুটেছে। সময়ের বিস্তীর্ণ জলাভূমিতে চিকচিক করছে সেই জ্যোৎস্না। লম্বা লম্বা গাছগুলো যেন দূরের আকাশের প্রান্ত ছুঁয়ে ছবি হয়ে আছে। এ-দিক ও-দিক উড়ছে জোনাকি।

আমি সেদিকে তাকিয়ে আছি বটে, কিন্তু দেখছি না। চোখের সামনে ভেসে উঠছে অপর্ণার মুখ। ত্রিপুরায় আসবার আগে অপর্ণার সঙ্গে যখন দেখা হয়েছিল, তখন সে কাঁদছিল নিঃশব্দে। এখনও

দেখতে পাচ্ছি তার সেই কান্নাভরা মুখ।

সেই মুখ যেন একটা প্রশ্ন চিহ্ন, কিন্তু উত্তর দিতে পারছি না আমি।

তখনই বেজে উঠল সেই বাঁশি। সেই একই সুর।

এবার আর খোঁজাখুঁজির জন্য ব্যস্ত হলাম না। জানি, খুঁজে লাভ নেই। এই সাড়ে চার বছরের মধ্যে এই বাঁশির কথা অনেকবার ভেবেছি। এর মধ্যেও দু-তিনবার সঙ্কট এসেছে আমার জীবনে, তখন কিন্তু বাঁশি শুনিনি। আমার প্রয়োজন বা ইচ্ছে মতন এ-বাঁশি বাজবে না।

যখন বাজবার তখন এমনিই বাজবে এই বাঁশি। এর জন্য সারাজীবন অপেক্ষা করে থাকতে হবে।

মন দিয়ে শুনলাম সেই সুর। এবারও কিছুক্ষণ পর হঠাৎ থেমে গেল। আমি আপনমনে ফিসফিস করে বললাম, অপর্ণা, তুমি ডাক্তারটির সঙ্গে চলে যেও। আমি মুছে যাব তোমার জীবন থেকে।

যাকে ভালোবাসি, তাকে দুঃখ কষ্টের মধ্যে টেনে আনার বদলে তাকে সুস্থ ও সুখী দেখতে চাইব না? তাতে অপর্ণা এবং সারা পৃথিবীর মানুষ আমাকে কাপুরুষ কিংবা নপুংসক যা-ই ভাবুক।

সেই বাঁশির রহস্যের খানিকটা সমাধানের ইঙ্গিত পেয়েছিলাম একবার। পুরোটা নয়, একটুখানি। যেন একটা বিশাল কালো পরদা হঠাৎ সামান্য ফাঁক হয়েও আবার ওদিকের দৃশ্য ঢেকে দিল।

অপর্ণাকে আমি মন থেকে মুছে ফেলতে সক্ষম হয়েছিলাম। মানুষের জীবনে দ্বিতীয় প্রেম আসতেই পারে। প্রথম প্রেমের মুখখানি অস্পষ্ট হয়ে যেতে শুরু করে, যেমন অপর্ণার মুখ আমার আর মনে পড়ে না, শুধু থাকে কিছুটা বেদনাবোধ। সে সুখী জীবন পেয়েছে, জেনে ভালোও লাগে।

দ্বিতীয় নারী আসে অনেক গাঢ়ভাবে। তখন ভালোবাসা স্থাপন করা যায় অনেক শক্ত ভিতের ওপর। নিছক ভুল বোঝাবুঝিতে সে ভিত কাঁপে না।

অনেক বছর পরের কথা, শক্তি ও আমি সস্ত্রীক কয়েকটা দিন কাটিয়েছিলাম পাঁচমারির সরকারি বাংলোয়। এখন আর আমাদের বাউণ্ডুলে মতন ঘুরে বেড়াতে হয় না, এখন চাইলেই ভালো-ভালো থাকার জায়গা পাওয়া যায়, আমন্ত্রণকারীরা গাড়ি দেয়।

এখানে শুধুই বিশ্রাম। বেশি ভিড় নেই, মাত্র চারজন। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থার জন্যও চিন্তা নেই। রাত্রিতে খাওয়ার পরও কিছুক্ষণ গল্প হয় বারান্দায় বসে। আমাদের স্ত্রী দুজন একসময় ঘুমোতে যায়, শক্তি ও আমি আরও কিছুক্ষণ বসে থাকি প্রায় নিঃশব্দে।

সেদিন শক্তিকে সারাদিনই অন্যমনস্ক মনে হয়েছে। মাঝে-মাঝে ঝিলিক দিয়ে গেছে বিষণ্ণতা। যখনই ও লিখতে পারে না, তখনই ওর এমন হয়।

একসময় শক্তি বলল, এখানে কে বেহালা বাজায় বলো তো?

আমি বললাম, বেহালা? জানি না তো? শুনিনি।

শক্তি অবাক হয়ে বলল, শুনতে পাচ্ছ না? এই তো বাজছে এখন। মনে হয়, ওপরের ঘরে কেউ থাকে। একজন বুড়ো মতন লোক, সাদা ধপধপে দাড়ি।

আমার সর্বাঙ্গে শিহরণ হল। শক্তি শুনতে পাচ্ছে বেহালার সুর, অথচ আমি ঝিঁঝির ডাক ছাড়া আর কিছুই শুনছি না।

তবে কীসব মানুষের জন্যই আলাদা-আলাদা সুর থাকে?

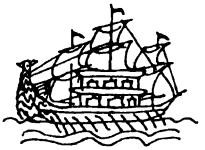

নদীর দু-ধারে

কীসের আওয়াজ? বোমা, না গুলি?

কত রাত কে জানে। সূর্য টুপ করে ডুবে যাওয়ার পরই আলোর সঙ্গে আর সম্পর্ক থাকে না। আকাশ দেখেও তো প্রহর বোঝার উপায় নেই, পূর্ণিমা আর অমাবস্যার সীমারেখা ঘুচে গেছে যে! আকাশে স্তরে-স্তরে কাজল মেঘ।

মানুষ কত দিন, কত মাস মেঘের জন্য হা-পিত্যেশ করে তাকিয়ে থাকে। মেঘের জন্য কত প্রেম। কত গান। আল্লা ম্যাঘ দে, পানি দে...। সাধের বুইন গো মেঘা রানি, কোথায় তোমার ঝরঝরানি...। প্রথম ধারাবর্ষণে ঠিক যেন সারা গায়ে হোলির রং মাখার আনন্দ।

আবার কখনও মেঘ দেখলেই ভয়। গুরু-গুরু ডাক শুনলেই বুক কাঁপে, ছিরছিরে বৃষ্টি শুরু হলে চোখে কান্না আসে। লেবুর পাতা, করমচা, দূরের বৃষ্টি দূরে যা!...

অলুক্ষুণে বৃষ্টি, ভেসে যায় যে সৃষ্টি!

আকাশের দয়া, বৃষ্টি। আকাশের অভিশাপ, বৃষ্টি!

মেঘ আছে, কিন্তু ওটা মেঘের গর্জন নয়। তবে কীসের শব্দ? বোমা না গুলি?

যারা ঘুমিয়ে ছিল, জেগে উঠেছে। যারা ঘুমোয়নি, এপাশ-ওপাশ করছিল, উঠে বসেছে। তারা শুনছে।

প্রথমে দুবার, তারপর একটু থেমে আবার তিনবার। বোমার শব্দ গোল মতন, আর গুলির শব্দ চেরা-চেরা। তবু সন্দেহ যায় না।

কিছু নীল রঙের পলিথিনের ঠেকনো দেওয়া তাঁবু, আর হোগলা আর শন্-ছাওয়া অস্থায়ী আশ্রয়। তার মধ্যে, স্যাঁতসেঁতে মাটিতে শুয়ে আছে হাজারদেড়েক মানুষ, বুড়ো-বুড়ি, কুচো-কাচার সংখ্যাই বেশি, জোয়ানের সংখ্যা কম, সেইসব পুরুষদেরও আর জোয়ান বলা চলে না, দু-তিন সপ্তাহেই বুক-পেট চুপসে গেছে।

তাদেরই মধ্যে একজনের নাম চানু। সে-ই প্রথম গিরগিটির মতন একটু-একটু করে বুকে ভর দিয়ে বেরিয়ে আসে তাঁবু থেকে।

মনুষ্যজীবনের এই একটা মজার ব্যাপার, কৌতূহল। কৌতূহলের জন্য কত প্রাণও চলে যায়, তবু কৌতূহল অদম্য। কীসের আওয়াজ, তা জানতে হবে না?

সাঁইথিয়া আর আমোদপুরের বাইরের জগৎ দেখেনি চানু, তবু সে অনেক কিছু জেনে গেছে। যেমন, সে হেলিকপ্টারের আওয়াজ চেনে, সে জানে, এ শব্দ হেলিকপ্টারের হতে পারে না, তবু বড় আশা করে সে আকাশের দিকে তাকাল চোখ সরু করে। কালো আকাশ, একেবারে বোবা। বিদ্যুৎ চমকও নেই।

আরও একবার সেই পিলে চমকানো শব্দ হতেই, চানুর বুকের কাঁপুনি পৌঁছে গেল মাথায়। সঙ্গে-সঙ্গে সে নিশ্চিত হয়ে গেল, বোমা নয়, গুলিরই আওয়াজ। খুব দূর থেকেও নয়। কাছেই পুলিশ পোস্ট।

বোধের উদয় হওয়ার পরেও চানুর খটকা লাগে। আর কোনও হুড়োহুড়ি, গোলমাল শোনা

যাচ্ছে না তাহলে পুলিশ শুধু-শুধু গুলি চালাবে কেন? বোমা হলে মানে বোঝা যেত, বোমাবাজরা অতর্কিতেই আসে। অনেক লোকজন জড়ো না হলে তো পুলিশ গুলি খরচ করে না। চারদিক শুনশান, মানুষের কণ্ঠস্বর তো দূরে থাক, এখন কোনও রাতচরা পাখিও ডাকেনি। সেপাইগুলো কি এমনি-এমনি নিশানা প্র্যাকটিশ করছে?

চানু একাই সাহসিকোত্তম নয়, আরও কিছু-কিছু লোক, এমনকী নারী ও গুঁড়োগাড়াও বেরিয়ে এসেছে বাইরে। কৌতূহল প্রবৃত্তিই তাদের টেনে এনেছে।

মুখ দেখা যায় না, এমনই একজন উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলে উঠল, পুলিশ গুলি চালাইচ্ছেঁ গো!

সে চিৎকারে মিশে আছে আনন্দের ঝিলিক।

সবচেয়ে আনন্দ হয়, হেলিকপ্টারের শব্দ শুনলে। পুরোটা উচ্চারণ করতে পারে না, এরা বলে হেলি। কেউ একটু বেশি চালাকি করে বলে, কোপার! হয়তো কারুর মুখে শুনেছে, চপার। সে যাই হোক, হেলিকপ্টার এলে সমবেত উল্লাসের ধ্বনি শোনা যায়, কারণ ওই উড়ন্ত বৃহদাকার ফড়িংটি খাদ্য আনে, বস্ত্র আনে, ওষুধ আনে। যখন শহর থেকে কোনও গাড়ি আসতে পারে না, প্রবল স্রোতে নৌকাও ভেসে যায়, তখন ওই হেলিই তো আকাশ থেকে খুব নীচুতে নেমে বস্তা বেঁধে সব ছুড়ে-ছুড়ে দেয়। বেশি ব্যস্ত হয়ে হুড়োহুড়ি করতে গিয়ে কেউ-কেউ মরে, ওপর থেকে বস্তা এসে পড়ে মাথায়, যেমন এবারে মরেছে নিরাপদ (আহা, বাপ-মা কী নামই রেখেছিল!) আর বিপলাই। ওদের মৃত্যুর জন্য কেউ শোক কিংবা আফসোস করেনি। কেন ওরা ধৈর্য ধরতে পারেনি, ছুটে গেল সাত তাড়াতাড়ি, অন্যদের ঠকাবার মতলবে? ভলান্টিয়ার বাবুরা কত নিষেধ করেছিলেন। তা ছাড়া, বন্যা হবে, কিছু লোক মরবে না, এ কী মামাবাড়ির আবদার নাকি! মা ধরিত্রী মাঝে-মাঝে এত মানুষের ভার সহ্য করতে পারেন না। তাই এক একবার খরা, বন্যা, ভূমিকম্প, ঝড়-বাদলে কিছু মানুষ কমিয়ে দেন। কথা হচ্ছে, কে কে মরবে, আর চাচা, আপন প্রাণ বাঁচা!

দ্বিতীয় উৎসাহজনক ঘটনা, পুলিশের গুলি।

বোমাবাজদের বিশ্বাস নেই। তারা পুলিশের সঙ্গে ঠক্কর লড়ে। কিন্তু তারা গরিব-গুর্বোদের দিকেও তাকায় না। তারা কেন আসে, কেন যায় কে জানে। তাদের বোমায় পুলিশ কেতরে পড়ল, না গরিব ছত্রখান হয়ে গেল, সে দিকে তারা ভ্রুক্ষেপও করে না।

বোমাবাজরা আসেনি, গোলমাল নেই, তবু পুলিশ গুলি চালাচ্ছে, নিশ্চয়ই এর বিশেষ একটা তাৎপর্য আছে। অর্থাৎ বড় সড়কের পানি কমেছে, এসে গেছে গরমেন্টের রিলিফের ট্রাক, ছাতু এনেছে, চিঁড়ে-মুড়ি-গুড় এনেছে, এমনকী দুধও আনতে পারে।

চলো, চলো, রিলিফের ট্রাকের দিকে চলো!

এর আগে রিলিফের ট্রাকের সামনে গুলি চলেছে দুবার। সাঁইথিয়ায় আর মহম্মদবাজারে।

যখন খাওয়ার-দাওয়ার কিছুই থাকে না, তখন মানুষ পেটে কিল মেরে বসে থাকতে পারে। কয়েকটা দিন না খেয়ে থাকলেও তো মানুষ মরে না, বেঁচে থাকতে হয়তো আশায়-আশায়। বাচ্চাগুলো চেঁচায় বটে, মায়েরা তাদের মারে, মারতে-মারতে নিজেরাও কাঁদে, আর পুরুষরা নিঃশব্দে চেয়ে থাকে মাটির দিকে। নিজেদের হাত দেখে, পা দেখে। মনে-মনে প্রশ্ন করে, এটা কি পুরুষের শরীর? বউ-ছেলে-মেয়েদের খাওয়ানো পরানোর দায়িত্ব পুরুষ মানুষের, যখন তা পারে না তখন কী করে আর সে পুরুষ থাকে? সে তখন ওলটানো বজ্রকীটের মতন অসহায়।

মানুষ আগুনকে ভয় পায়, জলকে ভালোবাসে। জল থেকেই তো জন্ম আর আগুনে শেষ সৎকার। কিন্তু বেঁচে থাকার সময়টায় আগুনের থেকেও জল কখনও-কখনও ভয়ঙ্কর সর্বনেশে হতে পারে। জল দিয়ে আগুন নেভানো যায়, কিন্তু জলকে আটকাবার উপায় নেই। আগুন বড়জোর একখানা দু-খানা কিংবা দশখানা বাড়ি খেয়ে শান্ত হয়, আর জল যে গ্রামের পর গ্রাম ভাসিয়ে

দিতে পারে! জল শুধু বাড়ি-ছাড়া করে না, ডুবিয়ে দেয় ফসলের খেত, গ্রাস করে ভবিষ্যৎ।

হ্যাঁ, কয়েকটা দিন জলের তোড় থেকে কোনওক্রমে প্রাণ বাঁচিয়ে উপোস করেও থাকা যায়, কিন্তু চোখের সামনে খাবার দেখলে আর তর সয় না। তাই যখন রিলিফের ট্রাক আসে, তখন কর্তাব্যক্তিদের শত ধমকানি সত্ত্বেও মানুষ লাইন বেঁধে দাঁড়াতে চায় না, সবাই একসঙ্গে ট্রাকগুলো ঘিরে চিলুবিলু করে, ধাক্কাধাক্কিতে আপন-পর ভেদ থাকে না। তবু প্রথমবার তেমন কিছু বিশৃঙ্খলা হয়নি, কিন্তু চিঁড়ে-গুড় বিলি করতে-করতে অর্ধেক লোকের পর ফুরিয়ে গেল। এবার? বাকি অর্ধেক মাটিতে মুখ ঘষবে?

তাই, দ্বিতীয় দফায় রিলিফের ট্রাক আসতে-না-আসতেই সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ল একসঙ্গে। জোর যার, চিঁড়ে-গুড় তার। দশ মিনিটের মধ্যে লুট হয়ে গেল সব কিছু। এবারে অর্ধেকেরও অনেক বেশি লোক পেল না কিছুই।

লুটপাটের সময় পুলিশ তো গুলি চালাতেই পারে। নইলে আর তারা কাঁধে বন্দুক রাখে কীসের জন্য? তবু লুটপাট থামে না। এ যেন জুয়া খেলার মতন। কার গায়ে গুলি লাগবে আর কে চিঁড়ে-গুড় নিয়ে দৌড়বে, তার তো কোনও ঠিক নেই। জুয়া খেলতে কে না ভালোবাসে। জীবনটাও বাজি ধরা যায়।

নিঝুম রাতে পুলিশের গুলির শব্দ শুনে সেই জন্যই মনে হয়, হঠাৎ বুঝি আবার এসে পড়েছে রিলিফের ট্রাক। শুরু হয়ে গেছে লুট। এ তো বড় আনন্দের সংবাদ। তাহলে চলো, আমরাও যাই জুয়া খেলতে। লুটের মাল সব শেষ হওয়ার আগেই ভাগ বসাতে হবে, তাতে কারুর গায়ে যদি দু-একটা গুলি লাগে তো লাগুক। গুলি খেয়ে যদি কেউ মরে, পুরুষ হয়েই মরবে।

চানু, বিমল, খাদু, জিনজিরা, সুলেমান, মকাই, অনন্ত, কালু, নিতাই, পিতু, জলিল, ছকু এইসব নামের পুরুষরা ছুটতে লাগল আগে, তাদের পেছনে স্ত্রীলোক ও বাচ্চারা, এমনকী হাড় জিরজিরে বুড়োরাও সবাই জুয়া খেলতে চায়।

ছুটতে-ছুটতে ওদের মনে একটা প্রশ্ন জাগে।

রিলিফের ট্রাকগুলো আসে সিউড়ির দিক থেকে, তা ছাড়া তো আর পথ নেই। ময়ূরাক্ষীর ওপারে বিহার। ট্রাকগুলো যাবে এদিক থেকেই, কই কেউ তো আওয়াজ শোনেনি। সেই গাঁকগাঁক শব্দে মরা মানুষেরও জেগে ওঠার কথা।

তা ছাড়া, ক্যাম্পগুলো সব এদিকের বাঁধের ওপর, ওদিক থেকে লুট করতে আসছে কারা? ওদিকের গ্রামগুলো থেকে মানুষ পালিয়ে এসেছে অনেক আগেই, এখনও জল নামেনি। তবে?

একটু পরেই ওরা দাঁড়াল পুলিশ পোস্টের কাছে এসে।

একটাও ট্রাক নেই, লুটেরার দল নেই। শুধু তিনজন পুলিশ রাইফেল উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সার বেঁধে।

পুলিশদের বড় মজবুত তাঁবুটির মধ্যে জ্বলছে একটা জোরাল হ্যাজাক বাতি। আর সবদিকে মিশমিশে অন্ধকার। একটা জোনাকিও আলো ধার দিতে আসেনি।

তাঁবুতে একটা যন্ত্রের সামনে বসে আছে আর-একজন পুলিশ। ঘর-র ঘর-র আওয়াজের মধ্যে মাঝে-মাঝে শোনা যাচ্ছে যেন প্রেত কণ্ঠের কয়েকটি শব্দ।

বাচ্চাগুলো সেখানে উঁকিঝুঁকি মারতেই সেই পুলিশটি বেরিয়ে এল। সমবেত জনতার উদ্দেশে, পুলিশ-সুলভ উগ্রকণ্ঠে নয়, বরং আবেদনের ভঙ্গিতে বিনীতভাবে বলল, আপনারা গোলমাল করবেন না প্লিজ, প্লিজ, তাতে আরও বিপদ হতে পারে। যে-যার জায়গায় ফিরে যান। আমাদের কাজ করতে দিন।

বিপদ মানে? কথায় বলে, মড়ার বাড়া গাল নেই। আর কী বিপদ হতে পারে? নদী কি আবার ফুঁসে উঠল? কই না, অন্ধকারে অদৃশ্য নদী চুপ করে আছে।

আর ঠিক তখনই দূরের জমাটবাঁধা অন্ধকার থেকে ভেসে এল ভয়ংকর শব্দ। শুধু অন্ধকার নয়, যেন আকাশও চিরে গেল সেই আওয়াজে। এ শব্দ কিছু মানুষের একেবারে অচেনা নয়, তবু যেন মনে হল, পাতাল থেকে উঠে এসেছে একদঙ্গল দৈত্য-দানব।

॥ দুই ॥

ভোরের আলো ফুটেছে একটু আগে।

পুলিশ ক্যাম্পের মধ্যে নেয়ারের খাটিয়ায় ঘুমোচ্ছে দুজন, আর-একজন দাঁতন করছে বাইরে, আর ওদের যিনি অফিসার, সেই তাপস বড়াল জেগে আছেন সারারাত, খাঁকি প্যান্ট ও গেঞ্জি পরা ডান বাহুতে বড় রূপোর তাবিজ, মাথার চুল নস্যি রংয়ের, সিগারেট টানছেন অনরবত।

রেডিও টেলিফোনটি থেমে আছে আপাতত, যে-কোনও মুহূর্তে আবার ঘড়ঘড়িয়ে উঠতে পারে।

তাঁবুর ধারেকাছে কিছু লোক এমনিই উবু হয়ে বসে আছে। কেউ ঘাস ছিঁড়ছে, কেউ চুলকোচ্ছে উরু।

এর মধ্যেই খবর রটে গেছে অনেকখানি। বানভাসি মানুষেরা নদীর ধারে উঁচু বাঁধে আশ্রয় নিলেও তাদের কৌতূহলবোধটি তো নিবৃত্ত হয় না। কয়েকজনের ট্রানজিস্টার রেডিও আছে, কেউ-কেউ জালি নৌকো বা তালের ডোঙায় চেপে এদিক ওদিক ঘুরতেও যায়। দেখে আসে আধোডুবন্ত বাড়ি আর জমিতে ধানগাছের ডগাটুকু অন্তত জলের ওপর জেগে আছে কি না। ডগা পর্যন্ত ডুবলেই একেবারে সর্বনাশ।

আকাশে মেঘ থাকলেও কাল রাত থেকে আর বৃষ্টি হয়নি। জল কমছে একটু-একটু। এইরকমভাবে চললে কাল পরশুই বাড়ি ফেরা যাবে।

সিউড়ির দিক থেকে রাস্তা সারাই চলছে পুরোদমে। সরকারের টনক পড়ে দেরিতে। বন্যা যখন আসে, বাড়ি ঘর, খেত-খামার ভেসে যায়, ব্যাকুল-উদ্‌ভ্রান্ত মানুষেরা উঠে বসে গাছের ওপরে, তলিয়ে যায় দু-চারটি শিশু, তখন সরকারের কোনও চিহ্নও পাওয়া যায় না, বরং বাঁধ থেকে আরও জল ছাড়া হয়। বাঁধ বাঁচাতে হবে তো!

এখন শুধু সরকার নয়, আসছে আরও কিছু-কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। আজ থেকে খোলা হবে খিচুড়ির লঙ্গরখানা।

বিপদ আসছে অন্য দিক থেকে।

ওদিকে বিহার, এদিকে বাংলা। ওদিকে দুমকা জেলা, এদিকে বীরভূম। দুমকা জেলায় তাণ্ডব শুরু করেছে হাতির পাল। তিনটি বাচ্চা সমেত মোট তেরোটি, তাদের নায়ক ঐরাবতের মতন এক প্রকাণ্ড দাঁতাল।

ওদিকে রানিপুর থানায় কয়েকখানা গ্রাম তছনছ করে দিয়েছে সেই হাতির পাল, বাড়িঘর ভেঙেছে, মানুষ মেরেছে। কতজন? মৃত্যু নিয়েই গুজব ছড়ায় বেশি। যত না ঘটে, তার চেয়ে অনেক বেশি রটে। কুড়ি জন? পঁচিশ জন? মহিষবাথান গ্রামে শেষ রাতে হাতির দঙ্গল এসে হুড়মুড়িয়ে সব ঘুমন্ত মানুষদের চেপটে দেয়নি? পালের গোদাটি এক বুড়িকে শুঁড়ে তুলে আছাড় মারেনি? যারা শোনে, তারাও যেন চাক্ষুষ করেছে দৃশ্যটি।

রানিপুর থেকে এদিকের মহম্মদবাজার আর কতটাই বা দূর!

চানু, বিমল, সুলেমান, কালু, মকাই, জলিল, পিতুরা তো মহম্মদবাজারেরই মানুষ। জল কমতে শুরু করায় তারা ঘরে ফেরার সুখস্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল। পুলিশ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে

এখন তাদের ফেরা হবে না।

কাল রাতে একবার শুধু হাতির পালের ক্রুদ্ধ ডাক শোনা গিয়েছিল, চোখে দেখা যায়নি। এখন দিনের আলোতেও নদীর ওপারে কিছু দেখা যায় না। যদিও ওদিকে জঙ্গল নেই, ঘাপটি মেরে থাকবেই বা কোথায়? ওদিকেও বন্যা হয়েছে অনেকখানি, ডুবেছে অনেক ধানি জমি।

রেডিও-টেলিফোন যন্ত্রটি আবার চিড়বিড় করে উঠল। তাপস বড়াল সেটার সামনে গিয়ে বসে মন দিয়ে শুনলেন খানিকক্ষণ। তারপর এক সময় দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলে উঠলেন, মামদোবাজি! অ্যাঁ?

তিনি বাইরে বেরিয়ে এসে দাঁতন-করা কনস্টেবলটিকে ধমক লাগিয়ে বললেন, আর কতক্ষণ দাঁত খোঁচাবে? এক ঘণ্টা তো হয়ে গেল?

রঘুনন্দন নামে কনস্টেবলটির দাঁতন করতে সত্যিই এক ঘণ্টার বেশি সময় লাগে। যেন সে ওই কর্মটিতে যৌন আনন্দ পায়। নিমডালের গোছাটি সে মাথার কাছে রেখে রাত্রে শোয়।

পিচ করে থুতু ফেলে সে জিগ্যেস করল, স্যার, কী খবর পেলেন?

তাপস বড়াল বললেন, বিহার পুলিশ কী করছে জানো? হাতির পালটাকে খেদিয়ে দিচ্ছে বেঙ্গলের দিকে। পরশু রাতে নাকি তাড়াতে-তাড়াতে বক্রেশ্বরের কাছ পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হাতিগুলো নদীতে নামেনি। আবার উলটোদিকে ফিরেছে।

রঘুনন্দন বলল, কাল রাতে এদিক পানে এসেছিল এখন তারা কোথায়, কিছু শুনলেন?

তাপস বড়াল বললেন, সিউড়ি থেকে তা কিছু বলতে পারছে না। বারবার শুধু বলছে, মহম্মদবাজারে ঢুকে পড়ার চান্স খুব বেশি। মাঝে-মাঝে আমাদের ফায়ারিং চালিয়ে যেতে হবে।

রঘুনন্দন বলল, স্যার, হাতি তাড়ানো কি পুলিশের কাজ?

তাপস বড়াল যেন সামনের কোনও প্রতিপক্ষের দিকে তাকিয়ে ভেংচি কেটে বললেন, সেই কথাই তো বলছি বারবার। এটা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের দায়িত্ব? তা মিঃ রায় কী বললেন, শুনবে? উনি বললেন, বীরভূমে আগে কখনও হাতি ঢুকেছে? মেদিনীপুর-বাঁকুড়ায় মাঝে-মাঝে হাতির পাল আসে, ওদের হাতি খেদাবার অভিজ্ঞতা আছে। আমরা তো ওসব জানিই না।

রঘুনন্দন বলল, বা বা বা বা বাঃ! আমরা এখানে শিখণ্ডি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকব? পাবলিক যদি খেপে যায়? যদি ধরুন সত্যিই হারামজাদা হাতিগুলো এই পর্যন্ত এসে পড়ে, আমরা কি সত্যিই গুলি চালাব?

তাপস বড়াল বললেন, সে চেষ্টাও কোরো না। তার আগেই প্যান্টলুন নষ্ট হয়ে যাবে। তা ছাড়া, হাতি বধ করা নিষেধ। গণেশ ঠাকুরের বংশধর না ওরা?

একটু বেলা হতেই চলে এল ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের একটা জিপ। দুজন অফিসার, দুজন আর্মড গার্ড। কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণের পর সেই জিপটা আবার চলেও গেল বক্রেশ্বরের দিকে।

এরপর আরও জিপের পর জিপ, দুখানা ট্রাক। দুধ দেওয়া হবে আজ বাচ্চাদের। আজ হুড়োহুড়ি নেই, লুটপাটের প্রশ্নই নেই, আবহাওয়াতেই বোঝা যায়, আজ সবাই কিছু-না-কিছু পাবে। এমনকী জামা-গেঞ্জিও বিলি হতে পারে।

হিন্দু ও মুসলমানদের ছাউনিগুলি আলাদাভাবে ভাগ করা, মাঝখানে কিছুটা ফাঁক। দু-দিকের পুরুষদেরই পরনে লুঙি, চেহারা দেখে ধর্ম চেনার উপায় নেই। তবে মুসলমানদের দিকে কয়েকজন নামাজ আদায় করতে বসে গেছে ফাঁকা জায়গায়, হিন্দুদের প্রতিদিনের ধর্মচর্যার দায় নেই, তারা গুলতানি করছে এদিকে।

সকলেরই মাঝে-মাঝে চোখ চলে যাচ্ছে নদীর ওপারে। হাতিরা কি এল? হাতির পাল এসে পড়লে কী যে বিপদ হবে, তা এখন সকলেই বুঝেছে, তবু অনেকেই ভাবছে, কেন আসছে না এখনও? মানুষ তো বিপদ নিয়েও জুয়া খেলে। বিপদ থেকে যেমন বাঁচতে চায়, তেমন বিপদকে

ডেকেও আনে।

গুজব এখন পাখনা মেলছে নানারকম। দুপুরের মধ্যে দুবার মিথ্যে রব উঠে গেল, হাতিদের দেখা গেছে, হাতিরা ধেয়ে আসছে। ভয়ার্ত হুড়োহুড়ি, চেঁচামেচি, কান্নাকাটির পর সত্যিই হাতিরা আসেনি বলে হাসির ধুমও পড়ে গেল। এই প্রথম সর্বস্ব হারানো, পলাতক, দয়াজীবী, ন্যাংলা মানুষগুলো হাসছে। যে উপলক্ষ নিয়ে তারা হাসাহাসি করছে, সেই উপলক্ষটি তাদের পরবর্তী চরম বিপদ এনে দিতে পারে।

সত্যিই যদি তেরোখানা হাতি নদী পেরিয়ে এদিকে তেড়ে আসে, তা হলে যে কী উপায় হবে, তা পুলিশরাও জানে না। একটা-আধটা নয়, তেরোটা, বন্যারই মতন এ এক অদ্ভুত প্রতিপক্ষ, যাকে রোধ করা সম্ভব নয়। এও কি প্রকৃতির তাণ্ডব?

বিহার পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে কয়েকবার। তারা ইচ্ছে করে হাতিগুলোকে খেদিয়ে দিচ্ছে বাংলার দিকে, এ অভিযোগ অস্বীকার করেছে তীব্রভাবে। ইচ্ছে করলেই বুনো হাতির পালের গতিপথ বদলানো যায়? একবার এদিকে এসে দেখে যাক না বঙ্গাল পুলিশ!

এই হস্তিযূথটি পথভ্রষ্ট। এদিকে আসবার কথাই নয়, তবু এসে পড়ে দিশেহারা হয়ে গেছে। ওদের খাবার নেই। ধানখেত, গমখেত বন্যায় ডুবে গেছে। বর্ষায় বড়-বড় ঘাস হয়, সেসবও নেই, ওরা খাবে কী? হাতিদের জন্য রিলিফের ট্রাক পাঠাবার কি ব্যবস্থা আছে কোনও?

দুপুর গড়িয়ে বিকেল, সন্ধে, তারপর আবার নিশ্চিদ্র অন্ধকারের রাত। এর মধ্যে মাঝে-মাঝে অতিরঞ্জিত দুঃসংবাদ পিলে চমকে দিয়েছে অনেকের। হাতিরা পাহাড়ে ফিরতেও পারছে না, কোনও জঙ্গলও খুঁজে পাচ্ছে না। যে কোনও গ্রামের কাছাকাছি এলেই গ্রামের মানুষ ঢাক-ঢোল পিটিয়ে, মশাল আর বর্শা আর ইট-পাথর ছুড়ে তাড়াতে চাইছে তাদের। তাতে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে তারা সামনে যা-কিছু দেখছে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে, তা বাড়িই হোক, মানুষের মাথাই হোক।

অন্ধকারেই বহু যুগ প্রবাহিত ভয়। আজ রাতে আর কে ঘুমোবে? যদি গভীর রাতে আসে? অত বড় একটা প্রাণী, তবু নাকি চলাফেরা করতে পারে নিঃশব্দে। ওদের সাঁতার শিখতে হয় না, যখন-তখন পার হয়ে যেতে পারে নদী। পুলিশের এইসব বন্দুকের গুলিতে মানুষ মারা যায়, মানুষ মারা অতি সহজ, কিন্তু এই গুলিতে হাতির গায়ে ফোস্কাও পড়বে না।

সরকার কী করছে, কলকাতার সরকার? খবর পায়নি তারা? এদিকে বনদপ্তর অনবরত কথা চালাচালি করছে ওদিকের বনদপ্তরের সঙ্গে। কথার পিঠে কথা, তর্কাতর্কি। সরকার এখানে আসবে ঠিকই। একটা কিছু ঘটে যাওয়ার পর। খুব বড়রকম কিছু ঘটে গেলে দিল্লির সরকারও আসবে। আগে কেউ আসে না।

এই রাতে নদীর ওপর থেকেও মাঝে-মাঝে শোনা যাচ্ছে গুলির শব্দ। তাতে আরও বুক কাঁপে। ওদিক থেকে তাড়ালে তো এদিকে আসবেই। যে-কোনও সময়ে। এদিক থেকে অকারণে ফায়ারিং করতে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে, দরকার হলে মিলিটারি আসবে, পুলিশের আপাতত কিছু করার দরকার নেই।

এক-একটা রাত কত লম্বা হয়! কেউ-কেউ হঠাৎ-হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। বিপদের সম্ভাবনায় নতুন করে জেগে ওঠে শোক। খালি পেটে অনুভূতিগুলি ভোঁতা হয়ে যায়, আজ দুপুরে খিচুড়ি পেটে পড়েছে। সন্ধের সময় পাওয়া গেছে চিড়ে-মুড়ি, পেটের আগুন নিভে এখন জ্বলছে মাথার আগুনে। যার সন্তান মারা গেছে, যার হালের গরু বাঁচানো যায়নি তাদের এখন উথলে উঠছে সেই দুঃখ।

মুসলমানদের ছাউনির দিক থেকে হঠাৎ একটা শোরগোল শোনা গেল। কেউ ফোসফোসানি শুনেছে, কেউ দেখেছে একটা লম্বা দাঁড়াশ সাপ। এখন আর দেখা যাচ্ছে না। গ্রামের মানুষ অনেকেই টর্চ রাখে, খুব দরকার না হলে জ্বালে না। অনেকের ব্যাটারি ভিজে গেছে, তবু দু-তিনটি ছোট টর্চ

পাওয়া গেল, সাপটাকে নিকেশ করতে না পারলে এক মুহূর্ত নিশ্চিন্ত থাকা যাবে না। চানু, হাবু, কানুরাও ছাউনি থেকে বেরিয়ে এসে সাপটাকে খুঁজতে থাকে। দাঁড়াশ সাপ ঢেউয়ের গতিতে চলে, ওদিক থেকে এদিক আসতে আর কতক্ষণ। গত পরশুই সাপের কামড়ে মরেছে একজন, জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে তার শব।

তাপস বড়াল এখানে এসে বললেন, কী হয়েছে? সাপ? কত বড় বললেন?

জালাল বলল, আমি নিজের চোখে দেখিচি, অ্যাই অ্যাত্ত বড়, চার-পাঁচ হাত তো হবেই।

তাপস বড়াল বললেন, এত বড় সাপ বিষাক্ত হয় না। তা খুঁজতে হয় খুঁজুন। মারতে হয় মারুন। হইহল্লা করছেন কেন? গোলমাল করাটা আপনাদের স্বভাব! যদিবা হাতিরা এসে পড়ে—

আজকাল গ্রামের মানুষদের সঙ্গেও তুই-তুকারি চলে না। আপনি আজ্ঞে করতে হয়, কিন্তু মুখে অবজ্ঞার ভাবটা লুকোতে পারেন না তাপস বড়াল। অনবরত সিগারেট টেনে-টেনে তাঁর ঠোঁট এমনিতেই তেতো হয়ে আছে।

যেদিকে গোলমাল হয়। সেদিকেই হাতিরা আসে? হবেও বা। সবাই চুপ মেরে যায়।

তাপস বড়াল একটা বড় টর্চ হাতে নিয়ে এসে দাঁড়ালেন নদীর ধারে। তাঁর চোখ থেকে ঘুম উবে গেছে একেবারে। সারাদিন অসম্ভব গুমোট, একটুও বাতাস ছিল না, এখন তবু নদীর ধারে ঘামে ভেজা শরীরে একটু-একটু বাতাস লেগে নিস্তব্ধতার স্বাদ পাওয়া গেল। তাঁর এখন একটা গান গাইতে ইচ্ছে হল। তাঁর ঠাকুরদা ছিলেন কীর্তনিয়া, তিনি শুনেছিলেন সেই ঠাকুরদা মৃত্যুর ঠিক আগে আপন মনে প্রায় এক ঘণ্টা ধরে গান গাইতে-গাইতে তারপর ঢলে পড়েছিলেন। সে দৃশ্যটি ভাবলেই বড় ভালো লাগে।

শেষ রাত থেকে শুরু হল গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি, সেইসঙ্গে ঝড়ো হাওয়া। কিছুক্ষণ পরে তা থামল বটে, কিন্তু সকাল হলেও সূর্য দেখা গেল না। ছাইছাই রঙের দিন। অন্য জেলা থেকে যেন উড়ে এসে আকাশ জুড়ে বসছে কালো রঙের মেঘ।

দশ-বারো বছর বয়েসি কয়েকটি ছেলেমেয়েই প্রথম চিৎকার করে ছুটে এল আকাশ কাঁপিয়ে। তারা দেখেছে। সত্যিই দেখেছে। নদীর ওপারে মূর্তিমান যম।

হাজার মানুষ এসে দাঁড়িয়েছে নদীর উঁচু বাঁধে। অপরিচ্ছন্ন আলোর জন্য খুব স্পষ্ট বোঝা যায় না, তবু সন্দেহ নেই, হাতির পালই দাঁড়িয়ে আছে ওপারে সার বেঁধে।

মিলিটারি আসেনি, বন বিভাগের লোক ফিরে গেছে, এখন কী করা হবে; হাতির পাল যে-কোনও সময় নদী পেরুতে পারে। তাপস বড়াল আর. টি. চালু করে চিৎকার করতে লাগলেন, বলুন, বলুন, এখন কী করব? বলুন, লোকগুলোকে বলব, যে যেদিকে পারে পালাক। তার আগে ক্যাম্প ফেলে রেখে আমরা পালাব? বলুন, বলুন!

ওদিক থেকে উত্তর এল, মিলিটারিকে খবর দেওয়া হয়েছে, পৌঁছে যাবে, কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে যাবে। আর এক গাড়ি পুলিশ যাচ্ছে। ক্যাম্প ছেড়ে যাবেন না, প্লিজ। একজন ডেপুটি মিনিস্টার বিকেলের দিকে...জনসাধারণকে ধৈর্য ধরে থাকতে বলুন, সবাই যেন এক জায়গায় জড়ো হয়ে থাকে, কেউ এদিক ওদিক ছিটকে গেলেই বিপদ হতে পারে। গভর্নমেন্ট থেকে সবকিছু ব্যবস্থা করা হচ্ছে! ওভার!

তাপস বড়ালের ইচ্ছে হল আর. টি. যন্ত্রটায় একটা কথাতে।

দৃশ্যটি ক্রমশ আর একটু স্পষ্ট হল। চেনা যাচ্ছে দাঁতালটিকে, কয়েকটি হাতি শুঁড় দোলাচ্ছে। এক, দুই, তিনটি বাচ্চা হাতি, ঠিক গণেশ ঠাকুরের মতনই ও এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে কেন?

ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত, দিশেহারা, এক পাল হাতি। মধুগাঙীতে এখন প্রবল স্রোতের টান, ওরা জলে নামছে চাইছে না। তবু বাচ্চাগুলো, দুরন্ত মানব শিশুরই মতন, জলে নেমে খলবলাচ্ছে, আর

অভিভাবকরা তাদের টেনে তুলে আনছে ওপরে।

একটা বিদ্যুতের ঝলক চিরে গেল আকাশের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত। সেই ধবল আলোয় ওপারে দৃশ্যটিকে মনে হল একটা বাঁধানো ছবি। ভারি অপরূপ।

তারপরই প্রচণ্ড বজ্রগর্জন। দশ-কুড়িটা কামানের গুঙ্কারের পরেও গুরু-গুরু রব গড়াতে লাগল আকাশে। যেন পাথরে কেউ পাথর ঘষছে। মেঘ কি পাথরের মতন হয়? আবার গলে গলেও তো পড়ে।

আবার বৃষ্টি? আবার জল বাড়বে, আবার বন্যা? আর কত কষ্ট দেবে, হে ভগবান, হে আল্লা? আবার ডুবে যাবে সিউড়ির সড়ক। খাদ্য আসবে না, ওষুধ আসবে না, সাপে কামড়াবে, ভেদবমি হবে। এর মধ্যে যদি হাতিগুলো তেড়ে আসে, কোন দিকে পালাবে মানুষ। মাঠে-মাঠে এখনও বুক জল।

মানুষ ভাবছে, হাতিরা তাদের মারতে আসবে। হাতিরাও কি কিছু ভাবে না? এক সঙ্গে অত মানুষ দেখে তাদেরও কি মনে হতে পারে না যে মানুষরাই তেড়ে আসবে তাদের দিকে? ওরাই বা পালাবে কোন দিকে? জলে ডোবা মাঠ দিয়ে ছুটতে পারে না জোরে, সব দিকেই তো মানুষ, তারা আগুন ছোঁড়ে, কাঁটা বিঁধিয়ে দেয়।

হাতিগুলো মাঝে-মাঝে শুঁড় তুলে আকাশের দিকে তাকাচ্ছে কেন? ওপরেও কি ভগবান কিংবা আল্লার মতন কিছু আছে? ওরাও কি বাঁচার জন্য প্রার্থনা জানায়? ওপারের মানুষ দেখল, কয়েকটা হাতি একসঙ্গে শুড়মুড়িয়ে নেমে পড়েছে জলে। তা হলে ওরা এবার নদী পার হবারই সিদ্ধান্ত নিল?

সঙ্গে-সঙ্গে শুরু হয়ে গেল ভয় পাওয়া চিৎকার, ঠেলাঠেলি, দৌড়। বাচ্চারা জড়িয়ে ধরল মায়েদের, দু-তিনটে ছেলেমেয়েকে একসঙ্গে কোলে কাঁখে নিয়ে পালাচ্ছে এক-একজন মা, বুড়ির হাত ধরে ছুটছে বুড়ো, সমর্থ পুরুষরা ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিচ্ছে সেই বুড়ো বুড়িদের। শুধু কিশোর-কিশোরীরা মৃত্যুর সঙ্গে জুয়া খেলা বেশি ভালোবাসে বলে খানিকটা দৌড়ে পালিয়েও ফিরে আসছে আবার।

অন্য পুলিশদেরও পাত্তা নেই, শুধু একা পাথরের মূর্তির মতন দাঁড়িয়ে আছেন তাপস বড়াল, হাতে সিগারেট। তিনি কিছুতেই পালাবেন না ঠিক করেছেন। মৃত্যুভয়ে পালাতে তাঁর ঘেন্না হয়। তাঁর বুকের ভেতর থেকে ঠেলে উঠে আসছে একটা কীর্তন গান।

শুরু হয়ে গেছে বৃষ্টি।

একটা হাতির বাচ্চা খেলাচ্ছলে পা পিছলে চলে গেছে গভীর জলে, ভেসে যাচ্ছে স্রোতের টানে। মা-বাবা স্থানীয় কয়েকটি বয়স্ক হাতি সাঁতরে যাচ্ছে বাচ্চাটাকে উদ্ধার করতে এপারের মানুষদের দিকে তাদের মন নেই।



ত্রয়ী

একটি মহিলার সঙ্গে চোখাচোখি হওয়ার পর কয়েক মুহূর্ত সে যদি অপলক তাকিয়ে থাকে, মুখ ফিরিয়ে না নেয়, তবে তার কী মানে হতে পারে?

চেনা? অন্য কোনও চেনা লোকের সঙ্গে মিল পেয়েছে? অনুপম আগে কখনও এ-মহিলাকে দেখেছে বলে মনে করতে পারল না। তার নিজের মুখখানা এমন কিছু দর্শনীয় নয়। ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে অনুপম দৌড়ে এসে দাঁড়িয়েছিল রাস্তার উলটো দিকে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের বারান্দার নীচে। একটু আগেই যে বৃষ্টি শুরু হয়েছে, তা সে অফিসে বসে বুঝতে পারেনি। অফিস থেকে একবার বেরুলে আর ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না। রাস্তা পার হতে গিয়ে সে খানিকটা ভিজেও গেছে।

বারান্দার নীচে অনেক মানুষ। বর্ষার দিনে মানুষ দু-দলে বিভক্ত। যারা ছাতা নিয়ে বেরোয়, যারা বেরোয় না। অনুপমের ছাতা ব্যবহার করার অভ্যেসই নেই।

মহিলাটি হাঁটছিল একটা লাল রঙের ছাতা নিয়ে।

রাস্তায় তখনও জল জমেনি। লাল ছাতাধারিণীও এল রাস্তা পেরিয়ে, তারপর বাসস্টপের দিকে যেতে-যেতে একবার মুখ তুলতেই দেখতে পেল অনুপমকে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে কী দেখল অনুপমের মুখে।

বয়েস হবে চল্লিশ-বেয়াল্লিশ, পাতলা গড়ন, গায়ের রং ফরসা নয়, আবার কালোও বলা যায় না, মুখখানা সুশ্রী। সাধারণত পুরুষরা সরাসরি তাকায়, মেয়েরা মুখ নীচু করে। এ-মহিলার দৃষ্টিতে কোনও আড়ষ্টতা ছিল না।

অনুপম চোখ দিয়ে মেয়েটিকে অনুসরণ করল।

সে বাসস্টপের দিকে গেলেও, পরপর দুটি ভিড়ের বাস দেখে আবার হাঁটতে লাগল ময়দানের দিকে। তারপর চলে গেল চোখের আড়ালে।

পঞ্চাশ বছর বয়েস হয়ে গেলে মানুষ আস্তে আস্তে অনেক কিছু ভুলতে শুরু করে। শীতকালের গাছের মতন অনেক পাতা ঝরে যায়। অনুপম মাত্র দেড় মাস আগে পঞ্চাশে পা দিয়েছে। তবে ভুলে যাওয়া মানে একেবারে হারিয়ে যাওয়া নয়, স্মৃতির অতলে নাকি সব কিছুই থাকে, কিছু-কিছু আবার উদ্ধার করাও যায়।

অনুপম এই মহিলার মুখখানি উদ্ধার করার চেষ্টা করল। নাঃ, কিছুতেই মনে পড়ল না। যদি আগে পরিচয় হয়ে থাকে, একটি মেয়ে তাকে মনে রেখেছে, অথচ অনুপম ভুলে গেছে, এটা অস্বাভাবিক নয়?

মনে করতে না পারলে অস্বস্তি কাটে না। অনুপমের অস্বস্তি রয়েই গেল।

ব্যাঙ্কে বেশ উঁচু চাকরি করে অনুপম। কিছুদিন আগেও তার নিজের গাড়ি ছিল, বিক্রি করে দিয়েছে। চাকরিটা আর তার ভালো লাগছে না। কিছুদিন ধরেই তার মনে একটা বিচিত্র বাসনা উঁকি মারছে। চাকরি ছেড়ে, কলকাতা শহর ছেড়ে কোনও একটা ছোট্ট পাহাড়ি শহরে একা-একা বাকি জীবনটা কাটালে কেমন হয়?

অনুপম অবশ্য সাধুসন্ন্যাসী হতে চায় না। আশ্রমটাশ্রমের দিকে তার ঝোঁক নেই। শুধু শহরের

জীবনটা দিন-দিন তার অসহ্য লাগছে।

অনুপম আত্মবিশ্লেষণ করে এর কারণটাও বোঝার চেষ্টা করেছে।

শ্রীপর্ণার প্রতি রাগ থেকেই কি তার এমন বিতৃষ্ণা জন্মাচ্ছে? শ্রীপর্ণা তার স্ত্রী, স্ত্রী ছিল প্রায় দশ বছর, তারপর ছ'বছর ধরে সেপারেশন। সম্প্রতি শ্রীপর্ণা ডিভোর্স চেয়েছে। আপত্তি করার কোনও প্রশ্নই নেই, সঙ্গে-সঙ্গে তার সম্মতি জানিয়ে দিয়েছে উকিলকে। শ্রীপর্ণা আবার বিয়ে করবে। করুক না।

অনুপম জানে, তাদের বিচ্ছেদের ব্যাপারে তার নিজেরও দোষ ছিল যথেষ্ট। কিছুদিন বেশি মদ্যপান শুরু করেছিল, মাতাল অবস্থায় বাড়ি ফিরে কাঁচুমাচু হয়ে থাকার বদলে খুবই রুক্ষ ব্যবহার করত শ্রীপর্ণার সঙ্গে। কোন স্ত্রী তা সহ্য করবে মাসের-পর-মাস? একবার নেশাগ্রস্ত অবস্থায় আছাড় খেয়ে সাংঘাতিকভাবে মাথা ফাটিয়েছিল অনুপম।

শ্রীপর্ণা রাগ করে বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার পরেও অনুপম ক্ষমা চায়নি, তাকে ফিরিয়ে আনতে যায়নি। বরং ভেবেছিল আত্মহত্যার কথা।

সে অবস্থাটা কাটিয়ে উঠেছে অনুপম। এখন আর অত মদ খায় না। আত্মহত্যার কথাও ভাবে না। কিন্তু শ্রীপর্ণা অন্য একজন পুরুষের সঙ্গে ভাব জমিয়ে তাকে বিয়ে করতে চলেছে, অনুপমের কোনও বান্ধবী নেই। ইচ্ছে করলেই সে একাধিক নারীকে নিয়ে খেলায় মেতে উঠতে পারত। শ্রীপর্ণার নিজেরই পিসতুতো বোন দীপা ঘনঘন আসতে শুরু করেছিল তার বাড়িতে, দীপাও ডিভোর্সি, তাকে ভালোও লাগত অনুপমের। কিন্তু দীপা খেলা চায়নি, সংসার চেয়েছে। একজনকে ডিভোর্স করে তারই বোনকে বিয়ে করার ব্যাপারটা অরুচিকর বোধ হয়েছিল অনুপমের।

তার শরীরের চাহিদা ছিল, মন টানেনি।

এই মহিলাটি কে? চোখ দুটি টানা-টানা, গভীর দৃষ্টিতে কিছু কি বলতে চেয়েছিল?

এ-দেশের পুরুষদের একলা থাকার সুযোগ দেয় না আত্মীয়স্বজনরা।

শ্রীপর্ণা চলে যাওয়ার কিছুদিন পরেই অনুপমের দিদি তাঁর দুটি ছেলেমেয়ে নিয়ে এসে উঠেছিলেন অনুপমের ফ্ল্যাটে। প্রায় মায়ের বয়েসি দিদি, স্বামীর মৃত্যুর পর জলে পড়েননি, জামাইবাবুর অবস্থা যথেষ্ট সচ্ছল ছিল, নৈহাটির শ্বশুরবাড়িতে দিদির দুটি আলাদা ঘর ছিল। সুতরাং দিদি আশ্রিতা হয়ে আসেননি, ভাইকে দেখাশুনো করাবার জন্য এসেছেন। অনুপমের সেটা মোটেই পছন্দ হয়নি, কিন্তু দিদিকে ফিরিয়ে দেবেই বা কী করে?

দিদির ধারণা, তিনিই অনুপমের মদের নেশা ছাড়িয়েছেন। যদিও সেটা মোটেই ঠিক নয়।

সেই মহিলাটির সঙ্গে আবার দেখা হয়ে গেল প্রায় একই জায়গায়। বেশ নাটকীয়ভাবে।

আজও বৃষ্টি পড়ছে, তবে তেমন জোরে নয়, অনুপম দাঁড়িয়েছিল হোটেলের পোর্টিকোর নীচে। কাল রাত থেকে তার সামান্য জ্বর এসেছে, মিনিবাসের বদলে ট্যাকসিতেই যাবে ঠিক করেছে।

অনেকক্ষণ ধরে ট্র্যাফিক জ্যাম, মাঝে-মাঝে ইঞ্চি-ইঞ্চি করে এগুচ্ছে গাড়িগুলো, এসময় ট্যাকসি পাওয়ার সম্ভাবনা কম।

হঠাৎই একটা ট্যাকসির দিকে চোখ পড়তেই সে দেখল, এক রমণী, অপলক দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আছে। সে দিনের সেই নারী।

আজ রমণীটি হাতছানি দিয়ে অনুপমকে ডাকল।

পুরুষের প্রবৃত্তিই এই, কোনও নারীর সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে সে-ই অগ্রণী ভূমিকা নেবে। অচেনা কোনও মেয়ের সঙ্গেও কোনও পুরুষ প্রথম কথা বলতে পারে, কোনও নারীর তা মানায় না। কোনও নারী আগ বাড়িয়ে আগ্রহ দেখালে পুরুষের সন্দেহ হয়।

অনুপমেরও মনে হল, এ মেয়েটা বেশ্যা নাকি?

অনুপম মুখটা ফিরিয়ে নিল।

আবার একটু পরে তাকিয়ে দেখল, তখনও ট্যাক্সিটা এগোতে পারেনি, রমণীটি একইভাবে চেয়ে আছে।

অনুপম এবার ট্যাক্সির কাছে গিয়ে জিগ্যেস করল, আপনি আমাকে কিছু বলছেন?

আপনি কেমন আছেন?

ভালো আছি। কিন্তু আপনাকে তো...

আপনি তো অনুপম, যদি আমার ভুল না হয়। অনেকটা রোগা হয়ে গেছেন আগের থেকে—

এটা কোনও পথের নারীর সংলাপ নয়। নাম জানল কী করে? সত্যি অনুপম একসময় বেশ হৃষ্টপুষ্ট ছিল।

আমায় চিনতে পারেননি তো? মুখ দেখেই বুঝতে পারছি। আপনি কোথায় যাবেন? আপনাকে খানিকটা এগিয়ে দিতে পারি—

রমণীটি ট্যাক্সির দরজা খুলে দিয়েছে।

আর দ্বিধা না করে উঠে পড়ল অনুপম।

তারপরই কথা নেই বার্তা নেই, হুহু করে কেঁদে ফেলল রমণীটি। দুহাতে মুখ ঢাকল।

অনুপমের হতভম্বের মতন অবস্থা। অনেকদিন সে কোনও রমণীকে এত কাছ থেকে কাঁদতে দেখেনি।

একটু পরে রুমাল দিয়ে চোখ মুখে রমণীটি ধরা গলায় বলল, আমি দুঃখিত, হঠাৎ খুব সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়েছিলাম। এর আগেও এখানে একদিন আপনাকে দেখেছি। সেদিনও কথা বলার খুব ইচ্ছে হয়েছিল—

আপনি কে?

আমি রুমা। আপনি তো মানসের বন্ধু...

সঙ্গে-সঙ্গে একটা বিদ্যুৎ ঝলক। স্মৃতির গহন থেকে উঠে এল সবকিছু।

মানসের বান্ধবী সেই রুমা? অবশ্য অনুপম রুমা নামটা যতবার শুনেছে, সেই তুলনায় দেখা হয়েছে খুব কম। তাও তো আট-ন বছর আগেকার কথা।

অনুপম বলল, আপনি তো কলকাতায় ছিলেন না।

আপনি আমার খোঁজ করেছিলেন কখনও?

হ্যাঁ। তখন একবার...আপনার এক ভাই আছে না, তপন? তপনই বলেছিল—

আমি একটা চাকরি নিয়ে চলে গিয়েছিলাম সিমলা। কয়েক মাস আগে ট্রান্সফার হয়ে এখানে এসেছি। আপনি সেই বাড়িতেই আছেন?

সেই বাড়িতেই। মানে, আপনি তো কখনও আমার বাড়িতে আসেননি।

যাইনি, কিন্তু জানি। মানসের কাছে শুনেছি আপনার বাড়িতে খুব আড্ডা হত। যে ঘরে আড্ডা হত, সেই ঘরটা একবার আমার দেখার ইচ্ছে হয়।

আসবেন একদিন আমার বাড়িতে। আড্ডা অবশ্য অনেকদিন বন্ধ।

এখন আপনি কোথায় যাচ্ছেন? আমার সঙ্গে যাবেন?

কোথায়?

আমি যেখানে থাকি। মানে, এটা আমার নিজের বাড়ি নয়। আমাদের বাড়ি ছিল চন্দননগরে। আমার মামার একটা ফ্ল্যাট আছে যোধপুর পার্কে। মামা সবাইকে নিয়ে এখন অস্ট্রেলিয়ায় থাকেন, ফ্ল্যাটটা খালি পড়েছিল বলে আমাকে ব্যবহার করতে দিয়েছেন।

কয়েক মিনিট আগেও অনুপম যাকে চিনতে পারেনি, সেই নারী যদি নিজের ফ্ল্যাটে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানায়, তবে তাকে নির্লজ্জ উপযাচিকা মনে হতেই পারে।

কিন্তু অনুপমের তা মনে হল না। মানসের নামের উল্লেখই সব ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়েছে।

অনুপম বলল, চলুন। আমার সেরকম কোনও কাজ নেই এখন। আপনি একা থাকেন?

হ্যাঁ। মা-বাবা চলে গেলেন, দাদারা চন্দননগরেই আছেন।

আপনি আর বিয়ে করেননি?

আর মানে? আমার কি একবারও বিয়ে হয়েছিল?

না, তা নয়।

নাঃ, বিয়ে-টিয়ে করা হয়ে উঠল না। এখন এত বয়েস হয়ে গেছে, ওসব কথা আর ভাবি না। একা থাকা অভ্যেস হয়ে গেছে।

যোধপুর পার্কে পৌঁছতে প্রায় এক ঘণ্টা লেগে গেল।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হল তিনতলায়। সারা বাড়িটাই ফাঁকা মনে হয়। ওপরের সিঁড়ি একেবারে অন্ধকার।

চাবি দিয়ে দরজা খুলে রুমা বলল, সকালে একটি কাজের মেয়ে আসে। ঘর পরিষ্কার করে দেয়। নিজের রান্না নিজেই করে নিই। কাজের লোকের রান্না আমার পছন্দ হয় না। আপনি চা খাবেন তো?

খাব।

সঙ্গে ডিমের ওমলেট করে দিতে পারি।

তার দরকার নেই, শুধু চা হলেই হবে।

আপনি তো ডিম খুব ভালোবাসেন।

অনুপম হাসল। যে রমণীকে সে চিনতে পারেনি, সে তার বাড়ির আড্ডার কথা জানে। তার খাদ্য-পছন্দের কথা পর্যন্ত জানে।

ফ্ল্যাটটি দামি আসবাবপত্রে সাজানো। রুমার মামা বেশ অবস্থাপন্ন বোঝা যায়। বৃষ্টি এখনও বন্ধ হয়নি। বসবার ঘরের একটা জানলা খোলা ছিল, বৃষ্টির ছাঁট এসে মেঝেতে পাতা কার্পেট ভিজিয়ে দিয়েছে।

একটা লম্বা ব্রাশ এনে রুমা সেখানটা পরিষ্কার করতে লাগল।

অনুপম জিগ্যেস করল, রুমা, তুমি কী চাকরি করো?

সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের পে অ্যান্ড অ্যাকাউন্টসে। আপনি তো সেই ব্যাঙ্কেই আছেন?

হ্যাঁ।

চাকরি ছেড়ে যে ব্যাবসা করার কথা ছিল? তা আর শুরু করলেন না?

আমার একার পক্ষে...নাঃ, আর ইচ্ছেই করল না। তোমাকে আমি চিনতে পারিনি, তার কারণ তোমাকে দেখেইছি খুব কম, তা ছাড়া মাথার চুল এত ছোট করেছ, যতদূর মনে পড়ে তোমার খুব চুল ছিল, কোমর ছড়ানো—

এখন তো কেউই আর বড় চুল রাখে না। চুল কেটে ফেলার অনেক সুবিধে। আমি তো ভাবছি আরও ছোট করব, পুরুষদের মতন। আপনিও তো তখন গোঁফ রাখতেন?

মাথায় চুল কমে গিয়ে যখন টাক পড়তে শুরু করল, তখনই গোঁফটা বাদ দিলাম। টাক মাথায় গোঁফ রাখলে হাস্যকর দেখায়।

আপনার এমন কিছু টাক পড়েনি। চুল পাতলা হয়ে গেছে, কপালটা চওড়া দেখাচ্ছে। তবু কিন্তু আপনাকে দেখামাত্র চিনতে পেরেছি। শ্রীপর্ণা কেমন আছে?

শ্রীপর্ণার সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছিল কখনও?

না। তা হয়নি। আপনি তো কখনও আপনার বাড়িতে আমাকে যেতে বলেননি।

বাঃ! তুমি চন্দননগরের মেয়ে, কলকাতায় কম আসতে। তোমাদের বাড়ি খুব কনজারভেটিভ ছিল, সন্ধের আগেই তোমাকে ফিরে যেতে হয়। তোমাকে আমাদের কফি হাউসের আড্ডাতেই পাওয়া

যায়নি, বাড়িতে নিয়ে আসার সময় পেলাম কোথায়? মানসই যখন তখন চলে যেত চন্দননগরে।

দাঁড়ান, চা-টা নিয়ে আসি।

অনুপম সাদা দেওয়ালের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইল।

তার মনটাও যেন ওই দেওয়ালের মতন হয়ে গেছে। এক একটা ছবি ফুটে উঠেই আবার মিলিয়ে যাচ্ছে সাদা রঙে।

চা নিয়ে এল রুমা। দুটো কাপ দুরকম। রুমারটা কালো, অনুপমের জন্য কাপটা বেশ বড়, নীল রঙের।

রুমা অনুপমের কাপটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, ওটা কতদিনের পুরোনো। ভাঙেনি কিন্তু। চন্দননগর থেকে সিমলা নিয়ে গিয়েছি, মাঝখানে কিছু দিন চন্ডীগড়ে ছিলাম, সেখানেও, তারপর আমার সঙ্গে কলকাতায় এসেছে।

অনুপম একটা চুমুক দিয়ে কাপটা সাবধানে রাখল টেবিলের ওপর। তার হাতে যেন না ভাঙে। সে বুঝতে পেরেছে।

দেওয়ালে কোনও ছবি নেই।

অপ্রত্যাশিতভাবে রুমা হঠাৎ বলল, আপনার হাতটা আমি একবার ছোঁব? ওই হাতেই তো মাথা রেখে...এর মধ্যেও কোনও নির্লজ্জতা নেই। অনুপম হাতটা বাড়িয়ে দিল। একজন মানুষের জন্য কতজন মানুষের জীবন বদলে যায়।

অনুপমের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল মানস। দুজন পুরুষের মধ্যে যদি সত্যিকারের বন্ধুত্ব হয়, তা হলে তো নারী-পুরুষের সম্পর্কের চেয়েও অনেক গভীর হতে পারে।

একেবারে বাচ্চা বয়েস থেকে মানস আর অনুপম একসঙ্গে বেড়ে উঠেছে। যৌবনে যখন ওরা একসঙ্গে ঘোরাফেরা করত, তখন ওদের সমকামী বলে সন্দেহ করা অস্বাভাবিক ছিল না। প্রতিদিন দুজনের দেখা হতেই হবে।

অনুপমের তুলনায় মানস ছিল অনেক বেশি উচ্ছল, প্রাণবন্ত। পড়াশুনোতেও বেশি ভালো। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে দুজনেই চাকরি নিয়েছিল বটে, কিন্তু মানস প্রায়ই বলত, ধ্যাৎ, রোজ দশটা-পাঁচটার গোলামি করে জীবন কাটাব নাকি? ঠিক পাঁচ বছরের মাথায় চাকরি ছেড়ে দেব।

প্রথমে ঠিক করেছিল, দুজনেই বিদেশে গিয়ে আরও পড়াশুনো করবে। দুজনেই আমেরিকার দুটো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভরতির সুযোগ আর স্কলারশিপও পেয়ে গেল, কিন্তু মানসের যাওয়া হল না। তার মা তখন অন্ধ হয়ে আসছেন, ছেলেকে ছেড়ে তিনি কিছুতেই থাকতে পারবেন না। মানসের যে আর কোনও ভাইবোনও নেই।

মানস যাবে না বলে অনুপম গেল না। মানস অনেক পীড়াপীড়ি করেছিল, কথা বন্ধ করে দেবে বলে শাসিয়েছিল, নিজে অনুপমের জন্য পাসপোর্টের ফর্ম এনে দিয়েছিল, অনুপম তার জেদ ছাড়েনি। বিদেশে যায়নি বলে তার কখনও অনুতাপ হয়নি।

তারপর দুজন মিলে একটা ব্যবসার পরিকল্পনা করেছিল।

ছোট ব্যাবসা, এক লক্ষ টাকা মূলধন। মানসের দমদমের বাড়িটার একতলায় সাজিয়ে নেওয়া হয়েছিল কারখানা ও অফিস ঘর। ইনভার্টার বানানো হবে, তখন কলকাতায় ভয়াবহ লোডশেডিং চলছে। ব্যাটারি-ইনভার্টারের চাহিদা। মানস বিজ্ঞানের ছাত্র, সে দেখবে প্রোডাকশান আর অনুপম দেখবে হিসেব ও বিক্রি।

দিনের পর দিন, রাতের পর রাত জেগে সেই আলোচনা, সেই স্বপ্ন। মোট চারজন কর্মচারী লাগবে, মানস ঠিক করেছিল, তার মধ্যে দুজনকে নেওয়া হবে দমদমের মূক-বধির বিদ্যালয় থেকে। শিখিয়ে দিলে এক জায়গায় বসে বসে একটা জিনিসের সঙ্গে আর-একটা জিনিস জোড়ার কাজ ওরাও পারবে। দুজন প্রতিবন্ধী পাবে উপার্জনের সুযোগ। ছেলেদুটিকে বাছাও হয়ে গিয়েছিল।

খালি একটা ব্যাপার মানস আর অনুপম করতে পারেনি। বিয়ে। ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময়ই শ্রীপর্ণার সঙ্গে অনুপমের পরিচয়। মানস রুমাকে তারও আগে থেকে চেনে। কিন্তু রুমা ঠিক করেছিল, তার দিদির বিয়ে না হলে সে কিছুতেই বিয়ে করতে পারবে না। তার দিদি কিছুতেই ঠিক মানুষটিকে খুঁজে পায় না। এ দিকে শ্রীপর্ণার মা খুবই অসুস্থ ছিলেন বলে তিনি ওর বিয়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। অনুপম দ্বিধা করলেও মানসই জোর করে ওদের রেজিস্ট্রির ব্যবস্থা করে দেয়। সেদিন কী দারুণ হইচই করেছিল মানস, একগাদা ফুল নিয়ে এসেছিল রেজিস্ট্রারের অফিসে, ছুড়ে-ছুড়ে পুষ্প বৃষ্টি করছিল ওরা দুজনে সই করার সময়। শ্রীপর্ণা আর অনুপমকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে, মাথার ওপর একটা রুমাল চাপা দিয়ে বলেছিল, এবার শুভ দৃষ্টি হয়ে যাক!

রুমার দিদি শেষ পর্যন্ত বিয়ে করে ফেলল এক পাঞ্জাবি যুবককে। তারপর আর বাধা রইল না। তবে রুমাদের বাড়ি থেকে শুধু শুকনো রেজিস্ট্রি বিয়েতে আপত্তি ছিল, রীতিমতন ঘটা করে বিয়ে হবে। মন্ত্রতন্ত্র পড়ে, শুভদিন দেখে। নেমন্তন্নর চিঠিও ছাপা হয়ে গেল।

তারপরেই সেই অর্থহীন ঘটনাটা ঘটল। শুধু অর্থহীন নয়, কোনও ব্যাখ্যা নেই। একটা দুর্ঘটনা, কিন্তু এরকম দুর্ঘটনার কথাও কেউ কখনও শোনেনি। একে কি নিয়তি বলা যায়? একটা মূল্যবান জীবনের এমন অপচয়!

ট্রেনে করে দুই বন্ধু ফিরছিল জামশেদপুর থেকে। জুন মাস, প্রচণ্ড গরম, বর্ষা আসবে-আসবে করেও দেরি করছে। কামরাটায় ভিড় ছিল খুব, অনেকেই বসার জায়গা পায়নি, অনুপম আর মানস দাঁড়িয়ে ছিল। খোলা দরজার কাছে। তখন সবসময় ব্যাবসার আলোচনা, ব্যাঙ্ক থেকে আরও ঋণের ব্যবস্থা করেছে অনুপম, সে জন্য মানস তাদের বাড়িটা বন্ধক রাখার জন্য মাকে রাজি করিয়ে ফেলেছে। ব্যাবসাটা কতখানি সার্থক হবে, তার ঠিক নেই, তবু ঝুঁকি তো নিতেই হবে।

কথার মাঝখানে মানস একবার বলল, দাঁড়া, একবার বাথরুম থেকে আসছি। বাইরের দিকে তাকিয়েছিল, সে ঘুরে দাঁড়াল।

তারপর কী হল, ঠিক বোঝা গেল না।

ভি সি আর-এ ছবি রিওয়াইন্ড করে দেখার মতন দৃশ্যটাকে পরে অন্তত একশোবার দেখেছে অনুপম। তবু ব্যাখ্যা খুঁজে পায়নি। বাথরুমে যাওয়ার জন্য ঘুরতেই আর মানসকে দেখা গেল না। পেছন দিক থেকে হাওয়ার ঝাপটা লাগলেও তো এরকম হওয়ার কথা নয়, তবু কী করে সে পড়ে গেল বাইরে? প্রত্যেক দিন কত ট্রেনে কত লোক দরজার সামনে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে যায়, কেউ তো পড়ে না, মানসের মতন একজন শক্ত সমর্থ যুবক কেন পড়ে যাবে? সে ভুলোমনা, অসাবধানী ধরনেরও নয়।

অনুপম কিছু বোঝাবার আগেই আরও দু-তিনজন লোক চেঁচিয়ে উঠে চেন টেনে দিয়েছিল। ট্রেনটা থামল খানিকটা দূরে। সেখান থেকে ছুটে আসতে-আসতে অনুপম ভাবছিল, মানসের বড় জোর হাত-পা ভাঙবে, আর কিছু ভয় নেই, সদ্য একটা স্টেশন থেকে ট্রেনটা ছেড়েছে, তখনও গতি খুব বাড়েনি। আর কিছু হতেই পারে না।

কাছে এসে দেখল, মানস চিত হয়ে পড়ে আছে, তার চোখ খোলা, সারা শরীরে কোনও রক্তের চিহ্ন নেই। তখন সন্ধে হয়ে এসেছে, আকাশটা লাল, সেই লাল রঙের আভা লেগেছে মানসের মুখে, রক্ত নয়। অনুপম স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ভেবেছিল, যাক, বিশেষ কিছু হয়নি।

অনুপম বসে পড়ে মানসের মাথাটা কোলে তুলে নিল। জিগ্যেস করল, কী রে, কোথায় লেগেছে? বেশি লাগেনি তো?

মানস বলল, অনুপম, এ কী হল রে? রুমার সঙ্গে আর আমার দেখা হবে না?

সেটাই মানসের শেষ কথা।

আরও অনেক যাত্রী নেমে দৌড়ে এসেছিল। তাদের মধ্যে একজন চেঁচিয়ে বলেছিল, সুইসাইড।

সুইসাইড। আই হ্যাভ সিন ইন মাই ওন আইজ। ভদ্রলোক ইচ্ছে করে লাফিয়ে পড়লেন।

একদম বাজে কথা। একজন সুস্থ, সবল মানুষ, যার চোখে ভবিষ্যতের অনেক স্বপ্ন, যে তার অনেকদিনের প্রণয়িণীকে বিয়ে করতে যাচ্ছে আর সতেরো দিন পর, ব্যাবসা শুরু করার সব ঠিকঠাক, ঘনিষ্ঠতম বন্ধু তার পাশে দাঁড়িয়ে, সে হঠাৎ আত্মহত্যা করতে যাবে কেন?

একটা জীবনের জন্য কতগুলো জীবন নষ্ট হয়ে যায়।

মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি, বাবা-মায়ের জীবিত অবস্থায় সন্তানের মৃত্যু। মানসের মা আর বেশিদিন বাঁচেননি। ইনভার্টারের ব্যাবসা আর শুরুই হল না। মূক-বধির ছেলে দুটির জীবিকার সুযোগ নষ্ট হয়ে গেল। অনুপম তার পর থেকেই প্রচণ্ড মদ্যপান শুরু করে। তার ফলেই তার বিবাহ-বিচ্ছেদ। আর রুমা, রুমার সঙ্গে দেখা করার সাহস সঞ্চয় করতে পারেনি অনুপম, ওদের চন্দননগরের বাড়িতে একবার গিয়েছিল বটে, রুমাই তখন কারুর সঙ্গে কথা বলছিল না।

তারপর অনুপম কখনও রুমার খোঁজ করেনি। একটা অপরাধবোধ তাকে পেয়ে বসেছিল, সে দাঁড়িয়েছিল মানসের একেবারে পাশে, সে কোনওরকমে মানসকে বাঁচাবার চেষ্টা করেনি কেন? তারই হাতের ধাক্কা লেগে কি মানস পড়ে গিয়েছিল? সেরকম ধাক্কা লাগেনি। তবু লোকে তো এরকম ভাবতেই পারে!

এতদিন পর রুমার সঙ্গে দেখা, রুমাই প্রথম কথা বলেছে তার সঙ্গে।

অনুপমের হাতটা একবার ছুঁয়ে রুমা একটু দূরে গিয়ে বসল।

এতক্ষণের মধ্যে সে আর রুমা কিন্তু একবারও মানসের নাম উচ্চারণ করেনি।

কিন্তু মানস যেন উপস্থিত রয়েছে সেখানে। রুমার সঙ্গে অনুপমের একমাত্র যোগসূত্রই তো মানস! দুজনের দৃষ্টির আড়ালে অব্যক্ত মানস যে-দুজন মাত্র মানুষ মানসকে সবচেয়ে বেশি মনে রেখেছে, মানসের জন্য যাদের জীবন বদলে গেছে, তারা আজ মুখোমুখি।

কে-কাকে সান্ত্বনা দেবে? ওরা কথা খুঁজে পাচ্ছে না। নিস্তব্ধতা দিয়ে ওরা তর্পণ করছে মানসের।

বৃষ্টি থামার লক্ষণ নেই, এখানে কতক্ষণ বসে থাকবে অনুপম?

সে উঠে গিয়ে জানালার কাছে দাঁড়াল। কাচের শার্শি বন্ধ। বাইরে প্রায় কিছুই দেখা যায় না। শুধু কাচের গায়ে বৃষ্টির ফোঁটা লাগার শব্দ হচ্ছে।

আমি এবার যাই, রুমা?

আপনি চায়ের সঙ্গে কিছুই খেলেন না। রাত্তিরে খেয়ে যাবেন আমার সঙ্গে? একটু মাংস রান্না করা আছে।

না, আজ থাক। আর-একদিন না হয় আসব।

আচ্ছা।

দরজার কাছে জুতো খুলে রেখেছে অনুপম। সেখানে এসে সে জুতোর ফিতে বাঁধতে লাগল। রুমা কাছে এসে বলল, আবার একদিন...অনেকক্ষণ।

কথা শেষ করতে পারল না, দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে সে কেঁদে উঠল। এতগুলি বছর পরেও এত কান্না জমে আছে তার? ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে, কাঁপছে সারা শরীর।

এইরকম অবস্থায় একটি নারীকে ফেলে চলে যাওয়া যায়? অথচ কী কথা বলবে সে। তারও চোখ জ্বালা করে উঠছে।

সে রুমার পিঠে হাত রাখল।

সঙ্গে-সঙ্গে রুমা ঘুরে দাঁড়িয়ে অনুপমের বুকে চেপে ধরল তার মুখ। অনুপমের জামা ভিজে যাচ্ছে।

দুই করতলে বৃষ্টিভেজা ফুলের মতন রুমার মুখখানি ধরে বলল, আর কেঁদো না, শান্ত হও—

রুমা মুখ তুলে তাকাল তার দিকে। মুখখানা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। ঠোঁট দুটিতে এ কীসের ব্যাকুলতা! এসময় ওই ওষ্ঠাধর একটি চুম্বন দাবি করে। একমাত্র চুম্বন দিয়েই রমণীটির কান্না থামানো যায়।

একথা অনুপমেরও মনে পড়ল, নিজের মুখটা নামিয়ে আনতে গিয়েও থমকে গেল। এ কী করছে সে? মানসের দয়িতাকে চুমু খাবে, এর চেয়ে বেশি বিশ্বাসঘাতকতা আর হতে পারে? রুমাও কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে?

রুমার দু-কাঁধ চেপে ধরে রুক্ষ স্বরে সে বলল, এ কী করছ? চোখ মুছে ফেলো। ওখানে গিয়ে বসো।

রুমাকে সে টানতে-টানতে এনে বসিয়ে দিল সোফায়। এবং তার অসাবধানে কনুইয়ের পাশের টেবিলে রাখা নীল কাপটা মাটিতে পড়েগিয়ে ভাঙল ঝনঝন শব্দে।

অনুপম মেজাজ শান্ত করে অপ্রস্তুত অবস্থায় বলল, ইস, তোমার এতদিনের কাপটা ভেঙে ফেললাম!

নিজেকে একটু সামলে নিয়েছে রুমা। আঁচল দিয়ে চোখ মুছে বলল, তাতে কিছু হবে না, একদিন-না-একদিন তো ভাঙতই।

কিন্তু নিজের ওপর আবার হঠাৎ খুব রাগ হয়ে গেছে অনুপমের। এসময়ে তার ভাষার মাত্রাজ্ঞান থাকে না।

সে বলল, শোন রুমা, একটা স্পষ্ট কথা বলি। মানস নেই, এটা একটা চরম সত্যি। তাকে আর ফেরানো যাবে না। কিন্তু তার জন্য বছরের পর বছর, এরকমভাবে বসে থাকা অস্বাস্থ্যকর। অ্যাকসিডেন্টের ওপর তো মানুষের কোনও হাত নেই। এটা আমাদের মেনে নিতেই হবে। এখন তার জন্য সবসময় তোমার কান্নাকাটি করা...কেন নিজের জীবনটা নষ্ট করবে? সহজ হও, স্বাভাবিক হও!

রুমা আড়ষ্টভাবে বলল, তাই তো হয়েছি।

না, হওনি। তোমার আবার বিয়ে করা উচিত ছিল।

আবার বিয়ে? অনেক মেয়ে তো চাকরি করে। একা-একা জীবন কাটায়।

তাদের কথা আলাদা। তুমি শুধু-শুধু স্মৃতি আঁকড়ে পড়ে আছ! হ্যাঁ মাঝে-মাঝে তো মনে পড়বেই, তবু নিজের জীবনটা...তোমার সঙ্গে আমার দেখা না হলেই ভালো ছিল, আবার পুরোনো দুঃখ উথলে উঠবে। আমার আর না আসাই ভালো, তুমি আর রাস্তাঘাটে আমাকে ডেকো না—!

আচ্ছা! আর ডাকব না।

ঝট করে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল অনুপম।

রাস্তায় বেরিয়ে অনেকদিন পর তার আবার মদ্যপানের তীব্র ইচ্ছে জেগে উঠল। এখন দোকান বন্ধ হয়নি, একটা বোতল কিনে নিয়ে এল বাড়িতে।

দিদির সঙ্গে ভালো করে কথাও বলল না। রাতে কিছু খাব না বলে দরজা বন্ধ করে দিল নিজের ঘরের।

এখন রাগে তার গা জ্বলছে। কীসের জন্য রাগ?

নীল রঙের কাপটা নিশ্চয়ই মানসের ছিল। সেটা সে ভেঙে ফেলেছে।

কে যেন ফিসফিস করে বলল, ভেঙেছিস, বেশ করেছিস। তুই ভাঙলে কি আমি রাগ করতে পারি?

মানস!

অনুপম এবার হাসল। এখন সে হয়তো মানসকে দেখতেও পারে। আগেও মদ খেয়ে খুব

নেশা করার পর মানসের কথা শুনতে পেত, মানস এসে তার পাশে দাঁড়াত।

অনুপম ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করে না। আত্মার অবিনশ্বরতায় তার একটুও আস্থা নেই। সে জানে, মানস আর কোথাও নেই, একটা অত্যন্ত বাজে দুর্ঘটনায় সে চিরকালের মতন হারিয়ে গেছে।

কিন্তু মানস রয়ে গেছে তার মনের মধ্যে। সে-ই মানসকে ফিরিয়ে আনে, তাকে দিয়ে কথা বলায়, মানসকে অবয়ব পর্যন্ত দেয়।

তার মন থেকেই বেরিয়ে এসে মানস তাকে বলে, কেন শুধু-শুধু নিজেকে নষ্ট করছিস অনুপম! ব্যাবসাটা শুরু করলি না? সব ঠিকঠাক ছিল, অন্য পার্টনার নিতে পারতিস! তুই সব ছেড়ে-ছুড়ে কলকাতা থেকে চলে যেতে চাইছিস। কিন্তু তুই তো সন্ন্যাসী হতে পারবি না, তাহলে অন্য কোনওখানে গিয়ে শান্তি পাবি না।

আজ রুমাকে যখন কঠোর কথাগুলো বলেছে, তখন মানস ভেতর থেকে তাকে বাধা দিচ্ছিল।

রুমার চোখে অনুপম আর কিছুই নয়। সে যেন মানসেরই প্রতিমূর্তি। অনুপমের দিকে তাকিয়ে সে মানসকেই দেখছিল।

মদের গেলাসে চুমুক দিয়ে অনুপমের রাগ বাড়তে লাগল। শুধু নিজের ওপরে নয়, রাগ হচ্ছে মানসের ওপরেও! কেন মানস বোকার মতন অমনভাবে মরল, কেন সে সব তছনছ করে দিয়ে গেল?

জানলায় কাছে এসে দাঁড়িয়েছে মানস। তার প্রিয় জিনসের শার্ট গায়ে। চুল ঠিক মতন আঁচড়াত না কোনওদিন।

অনুপম বলল, তুই আর কোথাও নেই রে মানস। আমি জানি। এই জানাটাও যে কত কষ্টের!

মানস হাসছে।

অনুপম বলল, আমিই তোর এই চেহারাটা তৈরি করেছি। তোকে যে আমি দেখতে পাচ্ছি, এটাও আমার ইচ্ছে থেকে হয়েছে। কিন্তু তুই কেন হাসছিস, তা তো বুঝতে পারছি না।

মানস বলল, দুঃখের রং কী বল তো অনুপম? সব রংই একসময় সাদা হয়ে যায়। আমিও ভেবেছিলাম আমার সঙ্গেও আর রুমার দেখা হবে না। না দেখা হওয়াই তো ভালো ছিল, তাই না? তবুও দেখা হয়ে গেল। রুমাই নিজে থেকে...।

শুধু রুমা নয়, তুইও ওকে ডেকেছিলি।

আমি ডেকেছিলাম? না, না, আমি তো ওকে চিনতেই পারিনি।

চুল ছোট করে ছেঁটে ফেলেছে, তাই প্রথমটায় চিনতে পারিসনি। কিন্তু এর আগে রাস্তার অন্য কোনও মেয়েকে দেখে হঠাৎ তোর রুমার কথা মনে হয়নি?

সেরকম তো হতেই পারে।

শ্রীপর্ণার কথা মনে পড়েনি, অন্য মেয়েকে দেখে রুমার কথাই মনে পড়েছে।

আমি আর রুমার সঙ্গে দেখা করতে চাই না।

তুই ছাড়া এ পর্যন্ত আর কোনও পুরুষকে রুমা ছোঁয়নি।

সেই জন্যই তো আমার আর দেখা না করা উচিত।

মানস আবার হাসল।

অনুপম টেবিলে এক চাপড় মেরে বলল, হাসছিস কেন? আমি তোকে তৈরি করেছি, তবু হঠাৎ-হঠাৎ তোর হাসির কারণ বুঝতে পারছি না।

কেন আমাকে তৈরি করেছিস অনুপম? বরং আমাকে মুক্তি দে।

ব্লেড দিয়ে কি স্মৃতি চেঁছে ফেলা যায়? না, না, মানস, আমি তোকে কিছুতেই মুক্তি দিতে চাই না। যতদিন বাঁচব, তুই আমার বুকের মধ্যে থাকবি। আর কেউ দেখতে পাবে না। শুধু আর

একজন দেখতে পাবে।

বেশি মদ্যপান করলে একসময় ঘুম এসে যাবে, কিংবা জ্ঞান চলে যায়। কিন্তু আজ সে জেগে রইল সারা রাত। মদ খাওয়া বন্ধ করেও কথা বলতে লাগল মানসের সঙ্গে।

ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে-সঙ্গে সে বেরিয়ে পড়ল, একটা ট্যাকসি নিয়ে ছুটে এল যোধপুর পার্কে। কেন এল, তা সে নিজেই জানে না।

সে বাড়িটার সদর দরজা বন্ধ।

অনুপম দাঁড়িয়ে রইল রাস্তার উলটোদিকে।

খানিকবাদে দুধের বোতল হাতে বেরিয়ে এল একজন কাজের লোক। অনুপম তার পাশ দিয়ে ঢুকে গেল ভেতরে।

তিনতলায় এসে দরজায় বেল দেওয়ার পর একটুও অপেক্ষা করতে হল না। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে দরজা খুলে দিল রুমা। একটা শুধু ঢোলা রাত-পোশাক পরা। এর ওপর কিছু চাপা না দিয়ে কোনও নারী কাজের মেয়েকেও দরজা খোলে না।

প্রথমে কিছুই বলতে পারল না অনুপম।

পাজামার ওপর শার্ট পরা, অনুপম বাইরে বেরুবার মতন পোশাক পরেনি। চুল আঁচড়ায়নি, দু-চোখের নীচে কালি, ছাই রঙের মুখ।

রুমাই তার দু-হাত ধরে বলল, এসো।

খসখসে গলায় অনুপম বলল, আমি কিছুতেই মানসের জায়গা নিতে পারব না তোমার কাছে। সেই কথাটাই বলতে এলাম।

ম্লান, দুঃখী গলায় রুমা বলল, তুমি ছাড়া যে আমার আর কেউ নেই!

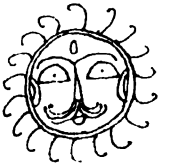

ঝুটো পাথর

একটু বিপজ্জনকভাবেই রাস্তা পার হয়ে গেল জুয়েল। তার স্বভাবই এইরকম, কখন লাল বাতি জ্বলছে, কখন সব গাড়ি থেমে যাবে, সে পর্যন্ত তার ধৈর্য থাকে না। এদেশে গাড়িতে কেউ হর্ন বাজায় না, তবু ফোর্ড গাড়িটা জুয়েলের একেবারে গা ঘেঁষে এসে খুব জোরে একটা হর্ন বাজাল।

গাড়িটা চালাচ্ছেন একজন মাঝবয়সি কালো মহিলা। রাগে তার মুখখানা গনগনে হয়ে গেছে, কী যেন একটা গালাগালি ছুড়ে দিলেন জুয়েলের দিকে।

জুয়েল আর পেছন ফিরে তাকাল না। একটা সিগারেট ধরিয়ে হাঁটতে লাগল হনহন করে। আর পনেরো মিনিট দেরি হলে হাসপাতালে ঢুকতে দেবে না। তার চেয়ে বড় কথা সাতটার সময় শিরিনের ছুটি হয়ে যাবে। তারপর সে এক মিনিটও অপেক্ষা করতে চায় না। হাসপাতালে একটু মুখ দেখিয়েই জুয়েলকে ছুটতে হবে। হাসপাতালের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে কামাল আর বাবলু। দুজনেরই মুখ শুকনো।

জুয়েল ভুরু নাচিয়ে জিগ্যেস [illegible] কেমন [illegible]।

বাবলু বলল, ভালো না রে। আর বোধহয় আশা নাই।

কামাল বলল বিকেলে রিপোর্ট এসেছে। দুটো কিডনিই ড্যামেজ। বাদ দিতে হবে।

জুয়েল বলল, দুটো কিডনি কখনও বাদ দেওয়া যায় নাকি? বাবলু বলল, একটা কিডনি বাদ দিলে মানুষ বাঁচতে পারে। খারাপ দুটো কিডনি বাদ দিয়ে অন্তত একটা কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট করাতে পারলে কাজ চলে যাবে। জুয়েল বলল, তা হলে আশা নেই বলছিস কেন? কামাল বলল, কিডনি পাওয়া যাবে কোথায়? কিনতে গেলে কত দাম লাগে জানিস, অন্তত তিরিশ হাজার ডলার! বাবলু বলল, চল, উপরে যাবি তো একবার?

তিনজনকে একসঙ্গে যেতে দেবে না। কামাল রয়ে গেল। লিফট দিয়ে উঠতে-উঠতে একবার ঘড়ির দিকে তাকাল জুয়েল। এখানে পাঁচ মিনিটের বেশি থাকা যাবে না। কল্পনায় সে শিরিনকে দেখতে পাচ্ছে। গ্রিনিচ ভিলেজে একটা পিৎসার দোকানের সামনে এসে অস্থির ভাবে পা ঠুকছে। রাগলে শিরিনের মুখখানা আরও সুন্দর দেখায়।

একটা ঘরে দুজন করে রোগী। পাশের রোগীটির বয়স বেশ কম, ছাব্বিশ-সাতাশ বছর হবে, তার শয্যার পাশে একজন দারুণ চেহারার তরুণী। যেন আগুনের ঢেলা।

ডানদিকের শয্যায় আছেন অধ্যাপক জিয়া হায়দার। প্রশান্ত মুখ। এককালে খুব সুপুরুষ ছিলেন, বার্ধক্য ও রোগে এখনও পুরোপুরি কাবু হননি। ওদের দেখে হাসবার চেষ্টা করলেন।

তারপর জুয়েলের হাত ধরে বললেন, আমার জন্য চিন্তা কোরো না। সবাইকে তো এক সময় যেতে হয়। তোমরা ভালো থাকো।

এদেশে এই এক অদ্ভুত নিয়ম। রোগীর কাছে কিছুই গোপন করা হয় না। যার ক্যানসার ধরা পড়ে তাকেও জানিয়ে দেওয়া হয় সঙ্গে-সঙ্গে। অধ্যাপক নিজের নিয়তির কথা জেনে গেছেন।

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে ঢাকা থেকে কয়েকটি বক্তৃতা দেওয়ার জন্য এসেছিলেন অধ্যাপক জিয়া হায়দার। বক্তৃতা শেষ হওয়ার পর তাঁকে ফিরতে দেয়নি কামাল-জুয়েলরা। ১৬ই ডিসেম্বর ব্রুকলিনে তাদের সংস্কৃতি উৎসব। সেখানে সভাপতিত্ব করবার জন্য তারা স্যারকে ধরে রেখেছে। এর মধ্যে এই কাণ্ড। কিডনির এই অবস্থার কথা তিনি খেয়াল করেননি আগে। কিংবা টের পেলেও গ্রাহ্য করেননি।

এদেশে মেডিক্যাল ইনসিওরেন্স যদি না থাকে, তা হলে রোগ-ভোগে সর্বস্বান্ত হয়ে যেতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণ ছিল এক মাসের জন্য, ওই সময়ের মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়লে বিশ্ববিদ্যালয়ই সব দায়িত্ব নিত। এখন তারা নেবে না! বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্যার দুহাজার ডলার পেয়েছিলেন, এ দেশে চিকিৎসার খরচের তুলনায় তা নস্যি। আমেরিকায় স্যারের অসংখ্য ছাত্র ছড়িয়ে আছে। তাদের কাছ থেকে চাঁদা তোলা হচ্ছে।

অধ্যাপক জিয়া হায়দার এরকম দাতব্য চিকিৎসা একেবারেই চান না,

পাঁচ মিনিটের জায়গায় দশ মিনিট কেটে গেছে। তবু জুয়েল উঠতে পারছে না। স্যার কী শান্তভাবে কথা বলছেন! সামনে নির্ঘাত মৃত্যু জেনেও কোন মানুষ এমন শান্ত থাকতে পারেন?

এক সময় তিনিই বললেন, তোমরা ব্যস্ত হোয়ো না। আমার ফেরার ব্যবস্থা করে দাও। শেষ ক'টা দিন জন্মস্থানে কাটানোই তো ভালো। আমার টিকিট তো আছেই, যত তাড়াতাড়ি বুকিং পাও।

বাবলু কুণ্ঠিতভাবে স্যার আপনাকে এখন এই হসপিটাল থেকে রিমুভ করা যাবে কিডনির ব্যবস্থা করা যায়।

স্যার তার দরকার নেই। অনেক খরচ আমি জানি। তোমাদের কা থেকে টাকা নিয়ে

জুয়েল ফস করে বলে ফেলল, টাকা লাগবে না স্যার। আমি একটা কিডনি ডোনেট করতে রাজি আমি যদি মেলে

অবাক হয়ে জুয়েলের দিকে তাকিয়ে রইলেন নিঃশব্দে। তারপর বললেন, তুমি

কিডনি দেবে? কেন? না, না, আমি কিছুতেই নিতে পারি না। জুয়েল বললেন, একটা কিডনি নিয়েও মানুষ দিব্যি বেঁচে থাকতে পারে। শরীরের অনেককিছু বেশি থাকে।

স্যার বললেন, তোমার কী-ই বা বয়েস, সামনে তো অনেকখানি জীবন পড়ে আছে। আমি তো ষাট বছর বাঁচলাম, আমাদের দেশে অ্যাভারেজে তাই-ই যথেষ্ট। তুমি যে বললে, এতে আমি খুশি হয়েছি।

জুয়েল এবার জোর দিয়ে বলল, না, স্যার, শুধু মনের কথা নয়। আপনার কাছ থেকে আমার মতন হাজার-হাজার ছেলে কত কিছু শিখবে, যদি এইটুকু প্রতিদান দিতে না পারি—

এতক্ষণ পরে স্যারের দুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

শিরিনের কাছে আর যাওয়া হল না। কামাল আর বাবলু তখনই জুয়েলকে নিয়ে গেল ডাক্তারের কাছে। পরীক্ষা করে দেখা গেল, জুয়েলের কিডনি স্যারের শরীরে নিখুঁতভাবে লেগে যাবে।

হঠাৎ নিউ ইয়র্কের বাঙালিদের মধ্যে হিরো হয়ে গেল জুয়েল। অনেকেই টেলিফোনে তাকে অভিনন্দন জানায়। দু-একজন অবশ্য বলে, তারাও নিজেদের কিডনি দান করার কথা ভেবেছিল, কিন্তু জুয়েল যখন আগেই বলে ফেলেছে, তাকেই সুযোগ দেওয়া হোক।

অনেকেই তাকে বাড়িতে ডেকে খাওয়াতে চায়। সীমাভাবী শুধু যে নানারকম রান্না করে খাওয়ালেন তাই-ই নয়, একটা খুব দামি জামা উপহার দিলেন। ছলছলে চোখে বললেন, তুমি যা করলে জুয়েল, তুমি আমাদের গর্ব। এখনকার দিনে মাস্টারমশাইদের জন্য ক'জন এরকম করে।

ঢাকাতেও খবর পৌঁছে গেল। অনেক রাতে ফোন এল জুয়েলের কাছে। স্যারের স্ত্রী ভালো করে কথা বলতে পারছেন না, কাঁদছেন। ফোঁপাতে ফোঁপাতে কোনওরকমে বললেন, এজন্য আল্লা তোমাকে অনেক দেবেন...আমি তোমার জন্য দোয়া করব...কোনওরকমে ওনাকে সুস্থ করে দেশে পাঠিয়ে দাও, সামনের মাসে আমার মেয়ের বিয়ে...

শিরিনের সঙ্গে দেখা হলো তিনদিন পরে। জুয়েল আগে থেকেই টেলিফোন করে ক্ষমা চেয়েছে অনেকবার, কিন্তু এই খবরটা জানায়নি। শিরিন হস্টেলে থাকে, তার সঙ্গে অন্যদের বিশেষ যোগাযোগ নেই।

শাড়ি পরতেই পছন্দ করে শিরিন কিন্তু ডিসেম্বর মাসে শাড়ি পরে চলাফেরা করা অসম্ভব।

প্যান্টের ওপর ওভারকোট পরে দাঁড়িয়ে আছে শিরিন, দু-হাতে দস্তানা, মাথায় টুপি, ঝিরঝির করে তুষারপাত শুরু হয়েছে। শিরিন একেবারে গাড়ি ধরে কাঁটায়-কাঁটায় আসে।

বাসটা থামতে-না-থামতেই প্রায় লাফ দিয়ে নেমে দৌড়তে লাগল জুয়েল। তার ঠিক এক মিনিট দেরি হয়েছে।

কলেজে পড়ে আর-একটা কিংসার দোকানে পার্ট টাইম কাজ করে শিরিন।

জুয়েল চাকরি করে একটা সুপার মার্কেটে। তা ছাড়া ছবি আঁকার কোর্স নিচ্ছে। তার দারুণ গড়াপেটা স্বাস্থ্য, সেই তুলনায় শিরিন ছিপছিপে, তীক্ষ্ণ নাক, গায়ের রং একটু চাপা, কিন্তু চোখদুটি খুব সুন্দর। অর্থাৎ যাকে বলে, তন্বী শ্যামা।

জুয়েল এসেই বলল, এক মিনিট, মাত্র এক মিনিট, তার জন্য সরি ভেরি সরি!

আজ শিরিন রাগেনি। হাসি মুখে বলল, শুধু সরি বললে হবে না। ফাইন হবে।

—রাজি আছি। কী ফাইন দেব, বলো।

—তোমার অ্যাপার্টমেন্টে আমাকে আজ নিয়ে যেতেই

—এই তো, এই একটা ব্যাপারেই আমি পারি না।

—কেন পারো না?

—তোমাকে কতবার বলেছি, আমার রুমমেট আছে হাবা নীতিবাগীশ। আমার ওপর যখন তখন লেকচার দেয়

—অমন রুমমেট রাখো [illegible]য়েল, এই শীতের মধ্যে কি রাস্তায় ঘোরা যায়?

—তাহলে চলো, কোন রেস্টুরেন্টে বসি

—আমি চারঘণ্টা পিৎসা হাটে কাজ করি। তারপর কোনও খাবারের জিনিসের গন্ধ নাকে এলেই বমি আসে।

—শিরিন, আমি কথা দিচ্ছি, সামনের মাসেই নিজস্ব একটা অ্যাপার্টমেন্ট নেব।

—তোমার নাকটা লাল হয়ে গেছে। ঠান্ডা লাগিয়েছ?

হাতে দু-তিনঘণ্টা সময়। শিরিন থাকে হোস্টেলে, আর জুয়েলের ঘরে রুমমেট। ঠান্ডার মধ্যে কোথায়-কোথায় আর বেড়াবে? দুজনে ট্রেনে চেপে আপ স্টেট নিউ ইয়র্কের দিকে খানিকটা ঘুরে এল।

অন্যান্য কথার মধ্যে জুয়েল এ কথাটা বলি-বলি করেও শেষপর্যন্ত বলতে পারল না। তার কিডনি দেওয়ার প্রস্তাব শুনে শিরিনের কী প্রতিক্রিয়া হবে! যদি, ঘোরতর আপত্তি তোলে? কিন্তু জুয়েল কথা দিয়ে ফেলেছে। জেনে গেছে অনেকে। এই তো আজই চেনা একজন জুয়েলকে দেখে রাস্তাতেই জড়িয়ে ধরল। টেলিফোন তো অনবরত আসছেই। এখন তো সে আর পেছোতে পারে না।

এই কদিন তার রুমমেট হারুনের সঙ্গে ভালো করে কথা হয়নি। রাত্রে হারুন তাকে ধরল। শুধু রুমমেট নয়। হারুন তার আত্মীয়ও বটে। নিউক্লিয়ার ফিজিক্স্ নিয়ে পি এইচ ডি করছে। বুদ্ধি খুব চোখা।

পালা করে রান্না করে দুজনে। আজ হারুন ইলিশ মাছ রেঁধেছে। মাইক্রোওয়েভে ভাত গরম করতে-করতে সে জিগ্যেস করল তুই নাকি শহীদ হতে চাচ্ছিস? চতুর্দিকে গুজব!

জুয়েল বলল, শহীদ আবার কী? জীবন্ত মানুষ শহীদ হয় নাকি? হারুন তার দিকে সরু চোখে তাকিয়ে, চিবিয়ে-চিবিয়ে উচ্চারণ করে বলল, এখনও জীবন্ত আছিস ঠিকই। হায়দার স্যারের জন্য নিজের একটা কিডনি দিবি! মহান আত্মত্যাগ! সে জন্য অপারেশন টেবিলে শুতে হবে। আগে অজ্ঞান করে এই ধার থেকে ওই ধার পর্যন্ত ফালা করে দেবে। তারপর করাত দিয়ে ঘ্যাসঘ্যাস করে কাটবে তোর একখান কিডনি। সেটা নিয়ে একজন নাচতে-নাচতে চলে যাবে। তার পরেও যদি তোর জ্ঞান ফেরে, সেটা তোর সাতপুরুষের ভাগ্য। অবশ্য তুই মরলেও কেউ দুঃখ করবে না। বরং সকলে জয়ধ্বনি দেবে। কত বড় মহৎ ছিল জুয়েল মিঞা। তোকে নিয়ে সভা হবে মিলনী ক্লাবে।

জুয়েল বলল, এসব কী বলছ? মরব কেন? কত লোক কিডনি ডোনেট করে। তারা মরে নাকি?

হারুন বলল, কারা ডোনেট করে জানিস? বেশির ভাগই অ্যাকসিডেন্টের ভিকটিম, যাদের বাঁচার আশা নেই...আর আমাদের মতন গরিব দেশের অনেকে সংসার চালানোর জন্য কিডনি বিক্রি করে, তাদের মধ্যে ক'জন বাঁচে না মরে, কে তার হিসাব রাখে?

জুয়েল বলল, এ দেশে অত সহজে অপারেশনে কেউ মরে না। একটা কিডনিতেও মানুষ দিব্যি বেঁচে থাকতে পারে। মাস্টারম াইকে বাঁচিয়ে রাখা...এত বড় একজন মানী লোক। আমরা তাঁর কাছে ক [illegible] ঋণী, তার জন্য একটা কিডনি দেব, এ আর বড় কথা কী?

হারুন ভাতটা নামিয়ে বলল, খা, খেতে শুরু কর। সোমবার অপারেশন হবে। এই ক'টাদিন ভালো করে খেয়ে [illegible] মাস্টারম াইয়ের বয়স সত্তর বছর। তোর কিডনির জোরে তিনি সেরে উঠলে আর কতদিন বাঁচবেন? বড় জোর পাঁচ-সাত বছর। তোর বয়স তো উনতিরিশ, তোর সামনে লম্বা জীবন পড়ে আছে। মনে কর, এরপর একটা কিডনিতে যদি চোট লাগে, তখন কী করবি? ওই জন্যই কথায় বলে চাচা, আপন প্রাণ বাঁচা। আর-একটা কথা আছে, আপনে বাঁচলে বাপের নাম।

তোর বন্ধুরা, কামাল, বাবলু, রফিকুল, মন্টিরা কেউ নিজের কিডনি দিল না কেন?

জুয়েল কিছু বলার আগেই তাকে বাধা দিয়ে হারুন বলল, তুই আগ বাড়িয়ে কেন বলতে গেছিলি, তা আমি জানি। তোর নেচারটাই ইমপালসিভ। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করা তোর ধাতে নেই। তুই যেমন চলন্ত বাস থেকে নামিস, রাস্তার ট্রাফিকের মধ্যে দিয়ে ছুটে যাস, সেইরকমই হুট করে বলে ফেলেছিস। তোর একটু হিরো সাজার ঝোঁকও আছে। হিরো তো হয়েই গেছিস, এরপর লোকে তোর ফটো ঝুলিয়ে রাখবে। তোর মাকে কিছু জানিয়েছিস?

জুয়েল বলল, তুমি আমাকে বেশি-বেশি ভয় দেখাচ্ছ।

হারুন বলল, আমার কথায় এখন আর কী আসে যায়। তোর তো আর ফেরার পথ নেই। তুই কথা দিয়ে ফেলেছিস, মরদ কা বাৎ, হাতি কা দাঁত!

ঝোল দিয়ে ভাত খাবার পর ইলিশ মাছ জুয়েলের মুখে তেতো লাগল! মাছটা পচা নাকি? হারুন তো দিব্যি খেয়ে যাচ্ছে।

সারারাত বিছানায় ছটফট করলে জুয়েল।

হারুন তাকে শুধু ভয় দেখায়নি, তার ভেতরের ভয়টাকে উস্কে দিয়েছে।

সেদিন ঝোঁকের মাথায় ওই কথাটা বলে ফেলার পর থেকেই সে মাঝে-মাঝে বুকের মধ্যে একটা ঠান্ডা বরফের স্রোত অনুভব করে। স্যারকে দেখে সে আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েছিল, মনে হয়েছিল, যে-ভাবেই হোক স্যারকে বাঁচিয়ে তোলা উচিত। কিন্তু তার নিজের একটা অঙ্গ বাদ যাবে, পেটের মধ্যে একটা জিনিস ছিল, সেটা চলে গেলে ফাঁকা-ফাঁকা লাগবে না?

জুয়েলের স্বাস্থ্য বরাবরই ভালো, কখনও কোনওরকম অপারেশন দূরে থাক, সে জীবনে একদিনও হাসপাতালে থাকেনি। ইঞ্জেকশান নিতেই তার ভয় লাগে। চোখ বুজে তাকিয়ে থাকে অন্য দিকে। তাকে অজ্ঞান করে পেট কাটবে? পুরো পেটটা? হারুন যেভাবে বলল, সেইরকম করাত দিয়ে কিডনি কাটে?

যদি আর জ্ঞান ফিরে না আসে?

জুয়েলের শরীরে কাঁপুনি ধরে গেল। শীতে নয়, ভয়ে। তারপরেই জ্বর। একটা দিন আর বাড়ি থেকে বেরুল না জুয়েল। দেওয়ালে একটা ক্যালেন্ডার ঝুলছে। বারবার সেদিকে চোখ চলে যায়। সোমবার ১৮ তারিখ অপারেশান। হায়দার সাহেবের ব্লাডসুগার খুব বেশি। সেটা নীচের দিকে না নামিয়ে আনলে অপারেশান করানো যাবে না। তাই কয়েকটা দিন সময় নেওয়া হচ্ছে।

জুয়েলের বার বার মনে হচ্ছে তার কিডনি পেয়ে হায়দার স্যার বেঁচে যাবেন ঠিকই, কিন্তু সে আর বাঁচবে না! অপারেশান সহ্য হবে না তার।

এটা যে একটা যুক্তিহীন ভয়, তা সে নিজেও বোঝে! নিজেকে মনে হয় কাপুরুষ। তবু সে চিৎকার করে বলতে চায়। পারব না, পারব না, আমি কিছুতেই পারব না।

বন্ধুদের ওপর খুব রাগ এসে যায়। কামাল, বাবলু, মন্টু এরা সব প্রাণের বন্ধু। ওরা কেন বারণ করল না জুয়েলকে? হারামজাদারা নিজে কেউ দিতে চায়নি!

শিরিন ঠিক জেনে গেছে। টেলিফোনে প্রথমেই সে জিগ্যেস করল, তুমি এরকম একটা সিদ্ধান্ত নিলে, আমাকে আগে জানালে না? তার মানে আমার মতামতের কোনও মূল্য নেই তোমার কাছে?

জুয়েল বলল, না, না, তা নয়। তোমাকে জানাতে লজ্জা করছিল। এমন তো কিছু ব্যাপার নয়। শিরিনি বলল, এমন কিছু ব্যাপার নয়, তা আমি জানি। কিন্তু সেদিন যে আমি রুম হিটার কিনলাম। সেটাও তোমাকে আগে জানাইনি? আমার সবকথা প্রথমেই তোমাকে—

—শিরিন তোমার যদি আপত্তি থাকে।

—আমি আপত্তি করব কেন? তোমার স্যারের জন্য তুমি...কিন্তু কথাটা আমাকে অন্যের কাছ থেকে শুনতে হল?

শিরিনের অভিমান শুধু ওই একটি কারণে। শিরিন যদি জোর দিয়ে বলত, না তুমি কিডনি দেবে না! তাহলে?

জুয়েল বলল, শিরিন, আমি আজ কাজে যাব না। হারুন এখন নেই, তুমি চলে এসো না আমার আপার্টমেন্টে।

শিরিন বলল, অন্য কোনদিন যেতে বলো, আর আজই...। আজ আমার ডাবল ডিউটি, ডরোথি আসেনি। আমার বেরোবার কোনও উপায় নেই।

চলে এসো, প্লিজ।

—কী করে যাব? আজ ইমপসিবল! আটটার আগে ছুটি নেই। কালও একই অবস্থা হবে মনে হয়। ডরোথি অন্য সময় আমাকে দেখে—

জুয়েলের মনে হল, শিরিনের সঙ্গে তার কোনদিন দেখা হবে না। জুয়েলের যদি এই সময় হঠাৎ কোনও কঠিন রোগ হত, তাহলেও কি তার পেট থেকে কিডনি বাদ দেওয়া হত? কিন্তু ইচ্ছে করে তো সেরকম অসুখ ডেকে আনা যায় না। তার জ্বর সেরে গেল পরের দিনই।

কামাল, বাবলুদের সঙ্গে দেখা হলে রাগে তার গা জ্বলে যায়। ওরা তার প্রশংসা করতে-করতে তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে। আর অনেকে দাওয়াত দিতে চাইছে। জুয়েল এড়িয়ে গেল। জ্যাকসন হাইটে একটা বইয়ের দোকানে সে মাঝে-মাঝে আড্ডা দিতে যায়। সেখানেও যেতে আর ইচ্ছে করে না! বাঁচার একমাত্র উপায় পালিয়ে যাওয়া। সব বাঙালিরা তাকে কাপুরুষ, ছোটলোক, কথার খেলাপী এইসব বলবে। বলুক! হারুনই ঠিক বলেছে। চাচা, আপন প্রাণ বাঁচা! স্যার বুড়ো হয়েছেন। আর ক'টাদিন বাঁচা-না-বাঁচায় কী আসে যায়! জুয়েল কেন অনর্থক ঝুঁকি নিতে যাবে?

যদি সে রটিয়ে দেয়, তার মা খুব অসুস্থ, একেবারে মুমূর্ষ, তাকে এক্ষুনি দেশে ফিরে যেতে হবে! মাস্টারমশাই বড়, না মা বড়?

আগে একটা টিকিট কাটা দরকার। হাতে অত টাকা নেই। ক্রেডিট কার্ডে ওভারড্র করা যায় যতটা, আর কিছু ধার...। বাঙালি ট্রাভেল এজেন্টদের কাছে যাওয়া ঠিক হবে না। গোপন রাখতে হবে, আগে দেখতে হবে, সোমবারের আগের কোনও টিকিট পাওয়া সম্ভব কি না।

এক সর্দারজির সঙ্গে জুয়েলের আলাপ হয়েছে, তার কাজের জায়গায় প্রায়ই আসে। টুয়েন্টি সেকেন্ড স্ট্রিট ঠিকানা খুঁজে হাজির হল জুয়েল। রবিবার একটা টিকিট আছে। জুয়েল পুরো দাম এখন দিতে পারবে না শুনেও সর্দারজি রাজি হয়ে গেল, টিকিট দিতে। তাকেও অবশ্য মায়ের অসুখের কল্পিত করুণ কাহিনিটি শোনাতে হল।

জুয়েলের মা থাকেন নেত্রকোণার এক গ্রামে। তিনি সত্যিই গুরুতর অসুস্থ কি না অন্যেরা জানবে কী করে? জুয়েল তবু ঠিক করল শনিবার বিকেলে সে কাউকে কিছু জানাবে না। শিরিনকেও না।

সে জিনিসপত্র গুছোতে লাগল গোপনে। হঠাৎ দেশে গেলে অনেকের জন্য টুকিটাকি উপহারও নিতে হয়। এখন সেসব কিনতে গেলে যদি বন্ধুরা কেউ দেখে ফেলে?

শনিবার দুপুরে কামাল তার সুপার মার্কেটে উপস্থিত হল। মুখখানা যেন কালি মাখা। থমথমে গলায় বলল, চল, এক্ষুনি একবার হসপিটালে যেতে হবে। স্যার তোকে দেখতে চেয়েছেন। জুয়েল প্রায় কুঁকড়ে গিয়ে বলল, আজই অপারেশান হবে? কথা ছিল যে সোমবার! কামাল বলল, না রে, স্যার সিংক করেছেন। আজ সকাল পর্যন্ত বেশ ভালো ছিলেন, উঠে বসেছিলেন। হঠাৎ কন্ডিশান এত খারাপ হল। তুই তো দিতে চেয়েছিলি। কিন্তু আর লাগবে না, ডাক্তারেরা বলেছেন, মাত্র কয়েক ঘণ্টা আয়ু। তোর নাম বলছেন বারবার।

আজ ক্যাবিনে অন্য পেশেন্ট নেই। অধ্যাপক হায়দারকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছেন বাংলাদেশের অনেক মানুষ। অধ্যাপকের শরীরের সঙ্গে যুক্ত অনেক নল, একজন নার্স বসে আছে পাশে। অধ্যাপকের

বাকরোধ হয়ে গেছে, শুয়ে আছেন নিঃস্পন্দভাবে, কিন্তু চক্ষু দুটি খোলা।

জুয়েলকে দেখে সবাই সসম্ভ্রমে জায়গা দিল। প্রত্যেকের চোখের ভাষায় যেন ফুটে উঠল, এই যে এসেছে সেই মহৎপ্রাণ যুবকটি। বাবলু জুয়েলের কাঁধ ধরে নিয়ে এল একেবারে রোগীর শিয়রের কাছে।

তাঁর মুখে মৃত্যুর চিহ্ন স্পষ্ট। তবু যেন তিনি চিনতে পারলেন জুয়েলকে। একটা হাত তুলতে গেলেন, পারলেন না। জুয়েলই তার হাত চেপে ধরল।

সেই হাত যেন কিছু বলতে চাইছে।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত দেখতে এসেছেন, তাই একটু পরেই জুয়েল সরে গেল একপাশে।

বাবলু তার হাতে একটা কাগজ দিয়ে বলল, এইটা স্যারের বালিশের পাশে ছিল, তোকে চিঠি লিখেছিলেন।

জুয়েল দ্রুত চোখ বোলাল ঃ

পরম স্নেহাস্পদ জুয়েল,

আজ অনেকটাই ভালো আছি। আশা করছি, এ যাত্রা বেঁচে যাব। একটি কিডনি বদল করতে পারলেই সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন চিকিৎসকেরা। তুমি যে আমাকে স্বেচ্ছায় কিডনি দিতে চাইলে, এর থেকে বড় কিছু পাওয়া ক'জন মানুষের ভাগ্যে ঘটে? আমার তিনটি কন্যা, পুত্র সন্তান নেই। ছাত্ররাই আমার পুত্রের সমান। আর সকল ছাত্রের মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠ। তুমি নামেও জুয়েল। তোমার হৃদয়টিও জুয়েল। দু-একটি কাজ বাকি আছে, যদি অন্তত বছরতিনেক আয়ু পাই।

জুয়েল আর একবার স্যারের মুখের দিকে তাকাল।

যাক, স্যার যে শেষপর্যন্ত জেনে গেলেন না যে জুয়েল আসলে ঝুটো পাথর, সেইটুকুই তার তৃপ্তি। সেই শুধু নিজেকে চিনেছে।



যে জীবন দেখা হয়নি

মাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এই নিয়ে তৃতীয়বার।

প্রথমবার যত উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা, সবাই যেমন ভয় পেয়েছিল, তৃতীয়বার ততটা নয় ঠিকই। দুবারই তো তিনি ফিরে এসেছেন। তবু উদাসীন তো থাকা যায় না—কলকাতার রাস্তা, মায়ের বয়েস হয়েছে উনসত্তর, একটা হাঁটুতে ব্যথা, চোখের ছানি কাটাতে হবে, যখন-তখন বিপদ হতে পারে।

আজ ছুটির দিন। আগের দুবারও ছুটির দিনই অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন। প্রথমবার, পাঁচ-সাত মিনিট আগেও নিপু মাকে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে দেখেছে। তারপর সুজাতা মা-মা বলে ডাকল, সাড়া পাওয়া গেল না। ওপরের কোনও ঘরে মা নেই, ছাদ থেকে তো আর উড়ে যেতে পারেন না, নিশ্চয়ই নীচে নেমে এসেছিলেন, বেরিয়ে গেছেন সদর দরজা দিয়ে, দেখতে পায়নি কেউ।

যদিও এমনিতে সুস্থ মানুষ, তবু এটা একটা রোগ। হ্যাঁ, রোগ ছাড়া আর কী! চমৎকার একটি সংসার, দুটি ছেলে ও একটি মেয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত, স্বামী এখনও বেশ কর্মক্ষম, সরযূর কোনও অভাববোধ থাকার কথা নয়। এতখানি বয়েস পর্যন্ত তিনি কখনও তেমন কোনও আঘাত পাননি, এমনকী তাঁর বাবা-মা আজও বেঁচে আছেন। যোধপুর পার্কের বাড়িটি তৈরি হয়েছে বছর-

দশেক আগে, বাড়িটির গড়নই এমন যে দুই ছেলের দুটি অংশে সবকিছু আলাদা, অথচ যাওয়া-আসার, মেলামেশার কোনও অসুবিধে নেই। সরযূর সম্মতি নিয়েই তাঁর স্বামী অরবিন্দ এভাবে বানিয়েছিলেন। আলাদা সংসার হয়েও একভাবে থাকার এটাই শ্রেষ্ঠ উপায়। আর-একটা অংশে চারখানা ঘর একতলা-দোতলা-তিনতলা মিলিয়ে। তার মধ্যে দুটি ঘর বন্ধই পড়ে থাকে—বছরে একবার মেয়ে আসে জামার্নি থেকে, তার জন্য বরাদ্দ। সোনালি থাকে প্রায় তিন-চার সপ্তাহ, সেই ক'টাদিন সকলের জন্য রান্না হয় একসঙ্গে।

বাড়িতে গাড়ি আছে দুখানা। ড্রাইভার একজন, দ্বিতীয় গাড়িটি ছোট ছেলে বিপ্লবই চালায়। বড় গৌতমের অফিস থেকে গাড়ি আসে।

শীতের দুপুর ছিল সেদিন। একটু আগে সকলের খাওয়াদাওয়া হয়ে গেছে, কেউ-কেউ একটু গড়িয়ে নিচ্ছে, একতলায় বসবার ঘরে ক্যারাম খেলছে বাচ্চারা। সরযূ বসে ছিলেন তিনতলার ঘরে জানলার ধারে, এখান থেকে একটা বেশ বড় পুকুর ও গাছপালা দেখা যায়।

আজ বেশি খাওয়া হয়ে গেছে। সরযূর বাপের বাড়ি থেকে বড় এক হাঁড়ি রাবড়ি ও গোটা পঞ্চাশেক নতুন গুড়ের সন্দেহ পাঠিয়েছে। সরযূর ছোটভাই অবনী নিজে নিয়ে এসেছে এবং রাবড়ি ও সন্দেশ মুখে দেওয়ার জন্য জোরাজুরি করেছে প্রত্যেককে, এটাই নাকি তার মায়ের নির্দেশ। সরযূর পাঁচ ভাই, প্রত্যেকেই বেঁচে আছে এবং পাঁচ ভাইয়ের এই একটি মাত্র বোন বলে সবাই সরযূকে দারুণ ভালোবাসে। প্রায়ই নানারকম খাবার, উপহার পাঠায় এ-বাড়িতে। পশ্চিমবাংলার অনেক চা বাগান বাঙালির হাতছাড়া হয়ে গেলেও সরযূর বাবার চা বাগানটি এখনও আছে—অবস্থা বেশ সচ্ছল।

জানলার ধারে বসে থাকতে-থাকতে সরযূ দেখছেন, পুকুরটার মাঝখানে এক-একবার মাছ ঘাই দিচ্ছে, অমনি বড়-বড় বৃত্ত জমে যাচ্ছে জলে। একটার-পর-একটা বৃত্ত, সেগুলো ভাঙছে পাড়ের কাছে এসে। একটা মাছরাঙা সেরকম একটা বৃত্তের ঠিক মাঝখানে ডুব দিল। কে যেন গান গাইছে, পুকুরের ধারে ঝোপের আড়ালে তাকে দেখা যাচ্ছে না।

তাতেই সরযূর কী যে ভাবান্তর হল, তিনি জানলার কাছ থেকে সরে গেলেন। শাড়ি বদলালেন না, চুল আঁচড়ালেন না, শুধু হ্যান্ডব্যাগটা নিয়ে নেমে এলেন সিঁড়ি দিয়ে। বসবার ঘরে নাতিনাতনিরা ক্যারাম খেলছে, তারা কিছুই লক্ষ করল না। ড্রাইভার মানিক গাড়ির একটা দরজা খুলে রেখে ঘুমোচ্ছে, তার পাশ দিয়ে চলে গেলেন সরযূ। একটা সাইকেল রিকশা নিয়ে কেন তিনি ঢাকুরিয়া রেলস্টেশনে চলে এলেন, তিনি নিজেই জানেন না।

একটু পরেই একটা ট্রেন এসে দাঁড়াল। তিনি একটি ফেরিওয়ালাকে জিগ্যেস করলেন, 'এ গাড়ি কি সোনারপুরে যাবে?' সে মাথা হেলিয়ে দিল।

খানিকদূর যেতে-না-যেতেই সোনারপুর। নেমে পড়লেন সরযূ। যদিও কয়েক জায়গায় স্টেশনের নাম লেখা আছে, তবু তিনি কয়েকজনকে জিগ্যেস করলেন, 'এটাই কি সোনারপুর? এটাই কি সোনারপুর?' তিনি এখানকার কাউকেই চেনেন না, সোনারপুরে তাঁর কোনও গন্তব্যও নেই।

এদিকে বিকেল হতে-না-হতেই সারা বাড়িতে হুলুস্থুল পড়ে গিয়েছিল। মা নেই, সারা বাড়িতে কোথাও নেই।

সকলের কাছেই এটা অবিশ্বাস্য। সরযূ কখনও বাড়ি থেকে একলা বেরোন না। দোকানপাট কিংবা আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি গেলে কেউ-না-কেউ থাকেই সঙ্গে। তাঁর থিয়েটার দেখার শখ আছে। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে-দেখে থিয়েটার বাছেন, ছেলের বউদের বলেন, 'চলো না দেখে আসি।' তাদের অসুবিধে থাকলে নিজে একা যান বটে, তা বাড়ির গাড়ি নিয়ে—মানিক খুব বিশ্বাসী ড্রাইভার।

দুপুর থেকে মানিক গাড়িতেই রয়েছে, তবু তাকে রেখে সরযূর কোথায় যেতে পারেন? সব আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে খোঁজ নেওয়া হল—কেউ কিছু জানে না, তারপর হাসপাতালগুলিতে, তারপর থানায়।

সোনারপুরে সরযূ দেখলেন, কিছু লোক স্টেশনের বাইরে চলে গেল, কিছু মানুষ হাঁটতে লাগল রেললাইনের পাশ দিয়ে। কিছু না ভেবে তিনিও হাঁটতে লাগলেন ওদের সঙ্গে। অন্য লোকেরা একটু পরেই ভেতরে-ভেতরে ঢুকে গেল, তিনি তবু হাঁটছেন—একা। বিকেল হয়ে আসছে, অন্ধকারে সরযূ চোখে ভালো দেখেন না। দিগন্তের একপাশে ডুবে যাচ্ছে সূর্য, আকাশের সেইদিক এখন রক্তবর্ণ। সরযূ তাকিয়ে রইলেন সেই দিকে। এক ঝাঁক হাঁস উড়ে যাচ্ছে পশ্চিমে, ঠিক যেন একটা মালা। সরযূ মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগলেন। তাঁর পাশ দিয়ে ঝমঝমিয়ে একটা ট্রেন চলে গেল। আর কয়েক ইঞ্চি এদিক ওদিক হলে তিনি ছিটকে পড়তেন, অথচ ট্রেনটার দিকে তিনি ভ্রূক্ষেপও করলেন না।

একটু পরেই ট্রেনলাইন কাটাকুটি করে গেছে একটা রাস্তা। সেখানে একটা সাইকেল রিকশা বেল বাজিয়ে তাঁকে ডাকল, তিনি উঠে পড়লেন। হাঁটার তো অভ্যেস নেই, পায়ে ব্যথা হয়েছে।

অনেক রাস্তা ঘুরিয়ে সাইকেল রিকশা আবার তাঁকে নিয়ে এল স্টেশনে। সে যা ভাড়া চাইছে দিয়ে দিলেন সরযূ। কোথায় কত ভাড়া হয়, সে বিষয়ে তাঁর কোনও জ্ঞানই নেই।

প্ল্যাটফর্মে একটা খালি বেঞ্চে বসামাত্র শুরু হয়ে গেল ধুন্ধুমার কাণ্ড। একদল লোক হুড়মুড় করে ছুটে গেল, তাদের পেছন-পেছন ধেয়ে এল আর-একটি দল। প্রথম দলটি মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। দ্বিতীয় দলটির হাতে লাঠিসোঁটা, তারা তর্জন গর্জন করতে লাগল সেই অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে। কয়েক মিনিট পরেই অন্ধকার থেকে উড়ে এলো বোমা। তখন এরাও বোমা ফাটাল। ঝপঝপ করে বন্ধ হয়ে গেল সব দোকান, অদৃশ্য হয়ে গেল যাত্রীরা, লাঠালাঠি-বোমাবুমি চলল প্ল্যাটফর্ম জুড়ে। শুধু সরযূ যেখানে বসেছিলেন, সেখানেই বসে রইলেন, যেন তিনি সিনেমা দেখছেন।

চল্লিশ-পঞ্চাশ মিনিট চলল এই রকম ধুমধড়াক্কা, তারপর এল পুলিশ বাহিনী। কেউ মরেছে টরেছে কি না বোঝা গেল না, দু-একজন আহত হয়ে কাতরাচ্ছিল। তাদের টেনে নিয়ে গেল সঙ্গীরা, পুলিশ বীরদর্পে লাঠি ঘোরাতে লাগল ফাঁকা প্ল্যাটফর্মে।

হঠাৎ তাদের একজনের চোখ পড়ল সরযূর দিকে। একবার দেখামাত্র বোঝা যায়, এই রমণীটি এখানে বেমানান। যতই আটপৌরে শাড়ি পরে থাকুন, তাঁর চেহারায় রয়েছে সচ্ছল পরিবারের ছাপ। এককালে রূপসী ছিলেন, এখন যথেষ্ট বয়সে হলেও সেই রূপের জ্যোতি একেবারে মিলিয়ে যায়নি, শরীরও খুব বেশি ভাঙেনি, চোখদুটোতে রয়েছে আভিজাত্যের রেশ।

প্রথমে একজন কনস্টেবল কথা বলতে শুরু করেছিল, তাকে সরিয়ে দিল একজন অফিসার। এ লাইন দিয়ে অনেক মাছওয়ালি, তরকারিওয়ালি যাতায়াত করে, এই বয়েসেরই সেরকম কেউ বসে থাকলে পুলিশ তাকে তুই-তুই করত। কিন্তু সরযূকে দেখে স্বাভাবিকভাবেই অফিসারটি জিগ্যেস করল, 'ম্যাডাম, আপনি এখানে কী করছেন?'

সরযূ সরলমনে বললেন, 'এমনি বসে আছি।'

অফিসারটি চোখ কপালে তুলে বলল, 'এখানে বসে আছেন। গুণ্ডারা এত বোমাবাজি করল, আপনাকে কিছু বলেনি?'

সরযূ বললেন, 'না তো! ওরা নিজেরাই মারামারি করছিল।'

অফিসারটি বলল, 'আপনার গায়ে লেগে যেতে পারত। আপনি সরে যাননি কেন? আপনি সব দেখলেন, ওরা সাক্ষী রাখতে চায় না, তাদেরও খুন করে দেয়—'

কিছুক্ষণ কথা বলার পর অফিসারটি বুঝলেন, এই মহিলা তার চেনাশুনা জগতের বাইরের

মানুষ। যোধপুর পার্কে বাড়ি, বলছেন ওঁর এক ছেলে ইন্ডিয়ান অয়েলের ম্যানেজার, এসব যদি সত্যি হয়, তাহলে উঁচুতলায় নিশ্চয়ই যোগাযোগ আছে। এঁকে আর ঘাঁটানো উচিত নয়। তবু একবার তার সন্দেহ হল, উঁচুজাতের বেশ্যা নয় তো? অনেক ভদ্রঘরের বউরাও...। কিন্তু সেরকম হলে সোনারপুর রেলস্টেশনে বসে থাকবে কেন? বয়েসটাও বেশি...

অফিসারটি অতি সহৃদয়ভাবে নিজের উদ্যোগে পুলিশের গাড়িতে সরযূকে বাড়ি পৌঁছে দিল।

সে বাড়ি তখন যেন শোকের বাড়ি। রাত দশটা বেজে গেছে, তবু কেউ কিছু খায়নি। মাকে ফিরে পাওয়ার আনন্দের চেয়েও বড় হয়ে ওঠে কৌতূহল, মা কোথায় গিয়েছিলেন? কেন গিয়েছিলেন?

সরযূ কোনও উত্তর দেন না, ঠোঁট টিপে-টিপে হাসেন। অনেক কথা শোনার পর শুধু বললেন, 'ফিরে তো এসেছি। আর চিন্তা করছিস কেন?'

সরযূর স্বামী দিবানাথের ইঞ্জিনিয়ারিং পার্টসের ব্যাবসা, দীর্ঘকাল ধরে সার্থকভাবে চালাচ্ছেন, এখন ছোটছেলেই সব কিছু দেখে। কয়েক বছর ধরে দিবানাথের মন খুব ঝুঁকেছে ধর্মের দিকে, প্রায়ই হরিদ্বারে গিয়ে কয়েক সপ্তাহ কাটিয়ে আসেন এক সাধুর আশ্রমে। বাড়িতে থাকার দিনগুলিতেও অধিকাংশ সময় জপতপ আর ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে কাটান। সরযূ তাঁর স্বামীর সঙ্গে কয়েকবার গেছেন সেই আশ্রমে। এখন আর যেতে চান না, ঠাণ্ডায় তাঁর হাঁটুর ব্যথা বাড়ে।

দিবানাথ গম্ভীর ধরনের মানুষ। জপতপ করেন বটে, কিন্তু ছোটছেলের কাছ থেকে নিয়মিত ব্যাবসার হিসেব বুঝে নেন এবং প্রতি রাতে খানিকটা মদ্যপানের নেশা ছাড়েননি।

মদের গেলাসে শেষ চুমুক দিয়ে দিবানাথ জিগ্যেস করলেন, 'তুমি একটা অ্যাডভেঞ্চার করে এলে, একাই, না সঙ্গে কেউ ছিল?'

সরযূ বললেন, 'বয়েসটা খেয়াল নেই বুঝি? আমার মতন বুড়ির সঙ্গে কে যেতে চাইবে?'

দিবানাথ বললেন, 'পুরুষমানুষ ভাবলে কেন? তোমার বয়েসি কোনও মহিলাও তো যেতে পারে?'

সরযূ বললেন, 'সেরকমই বা কে আছে?'

'কোথায় গিয়েছিলে?'

'যেদিকে দুচোখ যায়।'

'আমি কি তোমাকে কোনও কষ্ট দিয়েছি? আমার বিরুদ্ধে তোমার কোনও অভিযোগ আছে?'

'না তো!'

'আমি যে প্রায়ই হরিদ্বারে যাই, সেটা তোমার পছন্দ নয়?'

'যাবে না কেন? অনেক বছর ধরে খেটেছ, এখন যেখানে বিশ্রাম নিতে ইচ্ছে হচ্ছে যাবে...

'তুমি সঙ্গে থাকলে ভালো লাগে। বুড়ো বয়সে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে শরীরের টান আর না থাকলেও মনের টান তো থাকেই।'

'ওখানে গেলে যে হাঁটুর ব্যথায় আমি খুব কষ্ট পাই।'

কথাবার্তা এর চেয়ে বেশিদূর আর এগোল না।

পরদিন দুপুরে সুজাতা অবশ্য ছাড়ল না অত সহজে।

দুই পুত্রবধূর মধ্যে ছোটছেলের বউ সুজাতার সঙ্গেই সরযূর ভাব। বড়ছেলের বউ নলিনী গুজরাতের মেয়ে, ব্যবহার-ট্যবহার খুবই ভালো, তবে এখনও বাংলা ভাষাটা তেমন শেখেনি, তার সঙ্গে গল্প জমে না। নিজের মেয়ে সোনালি বিদেশে থাকে। এই সুজাতাই যেন তাঁর মেয়ের মতন। সুজাতা যেমন আবদার করে, জেদ করে, নলিনী তেমন পারে না।

সুজাতা সরযূর খাটের পাশে বসে পড়ে বলল, 'আমি তোমায় ছাড়ছি না মা। আমি গল্প শুনতে ভালোবাসি, এখন আর কেউ নেই, এবার তুমি বলো।'

সরযূ বললেন, 'গল্প আবার কী?'

সুজাতা বলল, হ্যাঁ, গল্প আছে। আমি একটা আন্দাজও করেছি। বলব?'

'হ্যাঁ, বল না।'

'তুমি শ্রীরামপুরে গিয়েছিলে? ঠিক নয়?'

'ওমা, শ্রীরামপুরে যাব কেন?'

'গত মাসে অলকমামা এসেছিলেন, ওঁর বউয়ের শ্রাদ্ধে নেমন্তন্ন করতে। আমি শুনেছি, অলকমামা তোমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। সারাজীবন ধরেই তোমাদের মধ্যে একটু প্রেম ছিল। এখন অলকমামার বউ নেই, তাই তাকে তুমি সান্ত্বনা দিতে গিয়েছিলে।'

'দূর পাগল। প্রেম না ছাই! ওসব বুঝিই না, তোরা গল্পের বই পড়ে-পড়ে...আমি শ্রীরামপুরে যাইনি।'

'সত্যি কথা বলছ?'

'এই বয়েসে তোর কাছে আমি মিথ্যে কথা বলব?'

'তবে কোথায় গিয়েছিলে?'

'সোনারপুর।'

'সোনারপুর! সেখানে কী আছে?'

সরযূ একটুক্ষণ চুপ করে গেলেন। কেন সোনারপুর গিয়েছিলেন, তার কারণটা এখনও তিনি নিজেই জানেন না। পুকুরের জলের বৃত্ত দেখতে-দেখতে হঠাৎ তার মনে সোনারপুর নামটা এসেছিল। ওই জল কিংবা মাছরাঙা পাখির সঙ্গে সোনারপুরের কী সম্পর্ক? তবু হঠাৎ-হঠাৎ কোনও গানের লাইন, কোনও জায়গার নাম মানুষের মনে এসে যায়।

তিনি আস্তে-আস্তে বললেন, 'সোনারপুর নামটা কতবার শুনেছি, খবরের কাগজেও দেখি প্রায়ই, কেমন সুন্দর নাম—সোনারপুর, সোনারপুর। তাই হঠাৎ মনে হল। এ জীবনে জায়গাটা একবার নিজের চোখে দেখব না? তাই ট্রেনে চেপে...

গালে হাত দিয়ে সুজাতা বলল, 'এ কী অদ্ভুত কথা! তুমি সোনারপুর যেতে চাইলে আমরা তোমায় নিয়ে যেতে পারতাম না? গাড়িতে আর কতক্ষণ লাগে?'

সুজাতার মুখের গড়ন সরস্বতী প্রতিমার মতন। বড়-বড় দুটো চোখ, এরকম চোখে রাগ, বিস্ময়, দুঃখ এসব যেন বেশি-বেশি স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। সে একটা কৌটো থেকে অনবরত লবঙ্গ খায়।

সরযূ বললেন, 'দল বেঁধে গাড়ি করে ঘুরলে কিছুই ভালো করে দেখা হয় না।'

সুজাতা ঠোঁট উলটে বলল, সোনারপুরে কী-ই বা দেখবার আছে? আমি তো গেছি, পচা জায়গা।'

সরযূর মনে পড়ে গেল, রেলস্টেশনের সেই মারামারির দৃশ্য। নিজের চোখে ওরকম কিছু দেখবেন, তা তিনি কখনও কল্পনাও করেননি।

সে দৃশ্যটার কথা জানালেন না সুজাতাকে। বললেন, 'পচা হোক, ভালো হোক, সোনার নামে একটা জায়গা যখন থাকে, সেটা দেখা হবে না এ জীবনে?'

সুজাতা বলল, 'এরকম জায়গা তো কত আছে পৃথিবীতে, সব কি দেখা যায় নাকি?'

সরযূ বললেন, 'সোনারপুর নামটা আমার খুব পছন্দ।'

একটু থেমে, অনেকটা আপনমনে আবার বললেন, 'আমার ছোটবেলা কেটেছে চা বাগানে। সেখানে কতরকম চাকর-বাকর, রান্নার লোক, মালি, আরামের শেষ নেই। কিন্তু আমাদের বাইরে বেরুবার হুকুম ছিল না। একটু বড় হতেই পাঠিয়ে দেওয়া হল শিলঙের কনভেন্ট স্কুলে। বিয়ে হয়ে গেল সতেরো বছরে, ব্যাস! শ্বশুরবাড়ির বিরাট সংসার, তার মধ্যেই কেটে গেল এতগুলো বছর। আমি বাইরের কিছুই দেখিনি। কোনওদিন রাস্তায় পায়ে হেঁটে যাইনি।'

এর প্রায় ছমাস পর দ্বিতীয়বার বাড়ি থেকে চলে যান সুজাতা। কোনও ঝগড়াঝাঁটি, মন কষাকষি হয়নি, এমনিই হঠাৎ। সেবারে ফিরলেন রাত কাটিয়ে পরের দিন। কোনওরকম বিপদে যে পড়েননি, সেটাই অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। বাস বদল করে পৌঁছেছিলেন বসিরহাট। সেখানে নদীতে খেয়া পারাপার হয়। তিনিও একটা নৌকোয় গাদাগাদি ভিড়ের মধ্যে ওপারে গিয়েছিলেন। কোনও একটা বাংলা ফিল্মে এরকম একটা দৃশ্য দেখে সরযূর মনে হয়েছিল, তিনি তো জীবনে কখনও নৌকোয় চেপে কোনও নদী পার হননি। যদি হঠাৎ মরে যান, তা হলে এই অভিজ্ঞতাটা জীবনে বাদ থেকে যাবে।

ইচ্ছামতী নদীর ওপারে পৌঁছে সরযূ লোকজনদের জিগ্যেস করলেন, 'সুন্দরবন কোথায়?'

লোকেরা অবাক। এখান থেকে সুন্দরবন অনেক দূর, এদিক দিয়ে কেউই যায় না। ক্যানিং থেকে যাওয়া সহজ। এরকম একজন সম্ভ্রান্ত চেহারার মহিলা সুন্দরবনে কোথায় যাবেন, কার কাছে যাবেন, জিগ্যেস করলে সরযূ ঠিক মতন উত্তর দিতে পারেন না। সুন্দরবনের নামটা ছাড়া তাঁর যে আর কিছুই জানা নেই। ততক্ষণে বসিরহাট থেকে ফেরার বাস বন্ধ হয়ে গেছে। এক সহৃদয় মুসলমান ভদ্রলোক সরযূকে নিয়ে গেলেন নিজের বাড়ি, কত যত্ন করলেন, নিজের বাগানের আম খাওয়ালেন...

এই ঘটনা শুনতে-শুনতে ভয়ে সুজাতার মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। লোকটি যদি বদমাশ হত? সরযূকে ভুলিয়ে ভালিয়ে বাড়ি নিয়ে গিয়ে সবকিছু কেড়ে নিয়ে খুন করে ফেলত যদি? সরযূর কানের দুল দুটো যে হীরের!

সরযূ হেসে বলেছিলেন, 'তোরা সবসময় খারাপটা ভাবিস কেন? পৃথিবীতে কি ভালো লোক নেই?'

সুজাতার তবু ভয় যায় না।

সরযূর সহজে অসুবিসুখ হয় না, সেবারে বসিরহাট থেকে ফিরে এসে জ্বরে পড়েছিলেন, সাধারণ সর্দিজ্বর। সেই উপলক্ষে তাঁর ছেলেরা তিনজন ডাক্তার ডেকে আনল, তাঁদের মধ্যে একজন নিউরোলজিস্ট, একজন সাইকিয়াট্রিস্ট। পরীক্ষা করানো হল অনেকরকম। ডাক্তাররা গোপনে রিপোর্ট দিল, সরযূর মাথার কোনও গোলমাল নেই, তাঁকে কোনওক্রমেই পাগল বলা যায় না।

তাহলে কেন একজন উনসত্তর বছর বয়েসের মহিলা ছেলেপুলে নাতিনাতনিতে ভরা সংসার ফেলে হঠাৎ-হঠাৎ একা-একা চলে যান? তিনি কোথাও—যে-কোনও জায়গায়—যেতে চাইলেই তো তাঁকে নিয়ে যাওয়া হবে। একা বাইরে যাইয়াই তো সাংঘাতিক বিপদের ঝুঁকি।

সুজাতা শাশুড়ির হাত জড়িয়ে ধরে বলেছিল, মা, তুমি আর এমনভাবে যাবে না, কথা দাও। আমাদের কত দুশ্চিন্তা হয়, তুমি বোঝো না?'

কথা দেননি সরযূ, শুধু মিটিমিটি হেসেছেন।

এবারে সকালবেলাতেই বেরিয়ে গেলেন সরযূ। আত্মীয়জনদের টেলিফোন করার কোনও মানে হয় না, আগের দুবারের থেকেই বোঝা গেছে, তিনি ওসব জায়গায় যাবেন না। কোথায় যে যেতে পারেন, সেটা অনুমান করাই দুষ্কর। একবার সোনারপুরে, একবার বসিরহাটে, এবার কি তা হলে হাওড়ার দিকে? বিপ্লব ছুটে গেল হাওড়ায়। কিন্তু কত ট্রেন যায়, কোন ট্রেনে মা উঠে পড়েছেন, তা কি জানা সম্ভব? দুবার বিপাকে পড়েননি বলে যে এবারও পড়বেন না...বিপ্লবের চোখ জ্বালা করে, সে পাগলের মতন প্ল্যাটফর্মে ছোটাছুটি করে।

দুপুরের মধ্যেই সরযূর খোঁজ পাওয়া গেল, খুবই আকস্মিকভাবে।

সরযূর মেজভাই বাদল মোটর সাইকেল চেপে যাচ্ছিল সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউ ধরে। হঠাৎ তার

খটকা লাগল। একটু আগে সে যা দেখল, তা কি চোখের ভুল? হ্যাঁ, ভুল হতে বাধ্য, হয়তো চেহারার খানিকটা মিল আছে। তবু সে মোটর সাইকেল ঘুরিয়ে এল উলটোদিকে।

চোরবাগানের কাছে একটা গলির মধ্যে লম্বা লাইন, নানা বয়সের নারীপুরুষ—কেউ বসে, কেউ দাঁড়িয়ে আছে, তারই মধ্যে বসে থাকা একজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে সরযূর মুখের অনেকটা মিল। মিল আছে, কিন্তু সরযূ হতে পারে না। একটা ছেঁড়া ময়লা শাড়ি পরা, মাথার চুল ধুলোমাখা, মুখেও কালো-কালো দানা, নিশ্চিত কোনও ভিখিরি মেয়েছেলে। ভিখিরি মেয়েরা মহিলা কিংবা নারী হয় না, তারা মেয়েছেলে, বড়জোর স্ত্রীলোক।

মোটর সাইকেল ছেড়ে তবু দাঁড়িয়ে রইল বাদল।

কোনও ধনী ব্যক্তির শ্রাদ্ধ উপলক্ষে এখানে ভিখিরিভোজন হবে। এখন খাবার বিলি হচ্ছে না, আগে সবাইকে টিকিট দেওয়া হয়ে গেছে, সেই টিকিট নিয়ে শ-দেড়েক ভিখিরি লাইন দিয়ে অপেক্ষা করছে, খাবার আসবে যথাসময়ে।

সেই ভিখিরিটাই অন্য কোনওদিকে তাকাচ্ছে না, নখ খুঁটছে আপন মনে। পেছন থেকে ঠেলাঠেলি হলে সরে-সরে বসছে। একবার প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল সামনের দিকে। তারপর যেই মুখ ফেরাল, তার ঠোঁটের পাতলা হাসি দেখে বাদলের বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। ভিখিরিরা এভাবে হাসে না।

বাদল কাছে এসে ডাকল, 'দিদি।'

সরযূ বললেন, 'তুই আবার এখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? বাড়ি যা।'

বাদল বলল, 'তুমি এ কী করছ দিদি?'

সরযূ বললেন, 'আজ দুপুরে আমি এখানে খাব।'

'তুমি এখানে খাবে? তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?'

'কেন মাথা খারাপ হবে? খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখলাম, আজ এখানে বিনা পয়সায় খাওয়াবে, তাই চলে এলাম।'

'কেন, তোমাকে বিনা পয়সায় খেতে হবে কেন?'

সরযূ মুখ তুলে বললেন, 'অত জোরে-জোরে কথা বলিস না। আমার কাছে আয়। কানে-কানে বলছি।'

বাদলকে হাঁটু গেড়ে বসতে হল। সরযূ ফিসফিস করে বললেন, 'তুই, আমি বড়লোকের ঘরে জন্মেছি। কোনওদিন কিছুর অভাব হয়নি। গরিবদের চিনিই না। গরিবরা কী খায়, তাও জানি না। এসব না জেনেই মরে যাব? একদিন অন্তত ওদের সঙ্গে বসে খেয়ে দেখি।'

বাদল প্রবলভাবে মাথা নেড়ে বলল, 'একে পাগলামি ছাড়া আর কী বলে? বাবা-মা শুনলে কত কষ্ট পাবে বলো তো।'

'বাবা-মাকে কিছু বলিস না।'

'আমাদের বাড়ির একটা মানসম্মান আছে।'

'মনে কর, আজকের দিনটায় আমি তোদের বাড়ির কেউ না।'

'দিদি, উঠে এসো, প্লিজ।'

'জ্বালাতন করিস না, বাদল, তুই যা না এখান থেকে। মনে কর, তুই আমাকে দেখিসনি।'

বাদলের পকেটে মোবাইল ফোন। খবর চলে গেল চতুর্দিকে। আধঘণ্টার মধ্যে এসে গেল দুটো গাড়ি। একদিক থেকে সরযূর দাদা-বউদি, অন্যদিক থেকে বিপ্লব আর সুজাতা। সবাই মিলে অনুরোধ, উপরোধ, কাকুতি-মিনতি করতে লাগলেন, সরযূ কিছুতেই জায়গা ছেড়ে উঠবেন না।

অন্য ভিখিরিরা মজা পেয়ে গেছে, হাসছে। একজন বড়লোকের বাড়ির গিন্নি বসেছে তাদের

সঙ্গে খিচুড়ি খেতে, এরকম মজা কি আর সহজে পাওয়া যায়। শ্রাদ্ধবাড়ির লোকেরাও জেনে গেল যে একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা বসেছেন কাঙালিদের লাইনে।

তাদের দুজন এসে হাত জোড় করে বলল, 'মাসিমা, আপনি ভেতরে আসুন। আপনার জন্য আলাদা ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আপনি এসেছেন, এ আমাদের কত সৌভাগ্য।'

সরযূ বললেন, 'ইস, আমার এত লজ্জা করছে। এই বাদলটাই যত নষ্টের গোড়া। আপনারা ব্যস্ত হবেন না। আমি এদের সঙ্গে বসেই খাব ঠিক করেছি।'

সুজাতা কাছে এসে বলল, 'এ শাড়িটা তো দেখছি মানদার।'

সরযূ দুষ্টু মেয়ের মতন হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, ওর ঘর থেকে চুরি করেছি।'

সুজাতা বলল, 'ছদ্মবেশ ধরেছ। অদ্ভুত ছেলেমানুষি!'

'সব বুড়ো মানুষদেরই মাঝে-মাঝে ছেলেমানুষ সাজতে ইচ্ছে হয়। তুই-ও বুড়ো হলে বুঝবি।'

'তোমার এরকম জেদের কোনও মানে হয় না। শ্রাদ্ধবাড়ির খিচুড়ি খাবার ইচ্ছে হয়েছে, এঁরা এত করে বলছেন, ভেতরে বসে খাবে চলো—'

'খিচুড়ি খেতে তো আমি আসিনি। এদের সঙ্গে একসঙ্গে খাব বলে এসেছি।'

'এই ধুলোকাদার মধ্যে...তোমার ঘেন্নাও করে না? এদের অভ্যেস আছে, তোমার অসুখ করে যাবে...'

'অসুখ হলে তোরা চিকিৎসা করাবি।'

'আমরা সবাই মিলে অনুরোধ করছি, তুমি কেন শুনবে না? ওঠো, ওঠো।'

'অমন করে বলিস না। তুইও বোস না আমার পাশে।'

'আমি? মরে গেলেও পারব না। মা, তোমাকে দেখে আমার কান্না পাচ্ছে।'

'কাল বারান্দা থেকে দেখছিলাম, তুই একজন রিকশাওয়ালার সঙ্গে দরাদরি করছিলি। ও পাঁচ টাকা চাইছিল, তুই কিছুতেই দিবি না। চারটে টাকা ছুড়ে দিলি রাস্তায়।'

'ওই রিকশাওয়ালাটা মহা পাজি। আমাদের বাড়ি থেকে বাজার অত কাছে, চার টাকা রেট, তবু এমন জোর করছিল!'

'বিপ্লবের প্রতি বছর মাইনে বাড়ে অনেক টাকা।'

'এরকম তুলনা করার কোনও মানে হয় না।'

'রিকশাওয়ালারা কী খায়, তুই জানিস?'

'মা, ওঠো।'

সরযূ হাত বাড়িয়ে সুজাতার হাত ধরে খুব কোমল গলায় বললেন, 'বোস না আমার পাশে। একদিন এদের সঙ্গে বসে খেয়েই দেখি না কেমন লাগে?'

এবার সত্যিই চোখে জল এসে গেল সুজাতার। কাঞ্জিভরম সিল্কের শাড়ি পরেই বসে পড়ল নোংরা রাস্তায়। মুখ ফিরিয়ে বলল, 'তোমরা যাও, আমি আজ মায়ের সঙ্গেই খাব।'

ভালোবাসার দিনগুলি

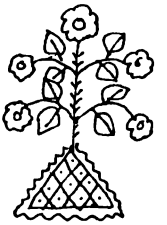

২৪ মার্চ, ১৯৮৫

আজ রাঙাদাদু এসেছিলেন। ইস, মানুষটা কী বুড়োই হয়েই গেছেন। হঠাৎ একেবারে ফোকলা, ওপরের পাটিতে মাত্র দুটো দাঁত। আগেও মাথার চুল ধপধপে সাদা ছিল, কিন্তু এক মাথা সাদা চুল, এখন আর চুল নেই-ই বলতে গেলে! চার-পাঁচ বছর আগেও রাঙাদাদুকে কী ভালোই বাসতুম। উনি এ-বাড়িতে এলেই সবসময় আমি বসে থাকতুম ওঁর পাশ ঘেঁষে। সবাই ঠাট্টা করত। পিংকি মাসি বলত, মিলি, তুই কি তোর রাঙাদাদুকে বিয়ে করবি নাকি?

আমি বলতুম, হ্যাঁ, বিয়ে করবই তো!

রাঙাদাদু আমায় জড়িয়ে ধরে বলতেন, এইটা হবে আমার রাঙা বউ!

রাঙাদাদু কী একটা জরদা খেতেন, কী সুন্দর গন্ধ বেরুত ওঁর মুখ দিয়ে। আর কত মজার-মজার গল্প বলতেন।

একটা গল্প মনে আছে। উনি একবার দক্ষিণেশ্বর থেকে নৌকোয় চেপে আসবার সময় নৌকোটা ভুস করে ডুবে গেল। রাঙাদাদু সাঁতার জানেন না। তাই শুনে সবাই জিগ্যেস করল, তারপর কী হল? রাঙাদাদু বললেন, আর কী হবে, আমি ডুবে গেলুম। সবাই আবার জিগ্যেস করল তারপর? তারপর? রাঙাদাদু বললেন, জলে ডুবে গেলে কী হয়? মানুষ মরে যায়। আমিও মরে গেলুম! আমি সত্যি-সত্যি সে কথা বিশ্বাস করে কেঁদে ফেলতে যাচ্ছিলুম, আমার ছোটমাসি বলল, বাঃ, এই যে আপনি বসে আছেন, তা হলে কি আপনি ভূত নাকি? রাঙাদাদু বললেন, ভূত কি না আমায় ছুঁয়ে দেখো! ছোটমাসি যে-ই হাত বাড়িয়ে ছুঁতে এল, আমি সেই হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বললুম, না, না, আমি ছুঁয়ে দেখব। আমি দেখব! রাঙাদাদু হাসতে-হাসতে আমার মাথাটা বুকে টেনে নিয়ে বললেন, না রে, আমি সত্যি-সত্যি মরিনি। জলে ডুবে গেলুম ঠিকই, তারপর ভেসে উঠলুম কাশীতে! সেখানে একজন সাধু আমার চোখে ফুঁ দিতেই জ্ঞান ফিরে এল।

রাঙাদাদু আমার মায়ের মামা। ডায়মন্ড হারবার থেকে মাঝে-মাঝে বেড়াতে আসেন আমাদের বাড়িতে। এক সপ্তাহ না এলেই ছটফট করতুম আমি। মাকে বারবার জিগ্যেস করতুম, কবে আসবেন, রাঙাদাদু কবে আসবেন?

এর মধ্যে বাবা ট্রান্সফার হয়ে গেলেন বলে আমরা সবাই চলে গেলুম ডাল্টনগঞ্জ। সেই সময়টা আর রাঙাদাদুর সঙ্গে দেখা হয়নি। আমার খুব কষ্ট হত। কলকাতায় আমার কত বন্ধু, কিন্তু সবচেয়ে বেশি কষ্ট হত রাঙাদাদুর জন্য।

এক বছরে মানুষ এত বদলে যায়! মাঝখানে রাঙাদাদুর নাকি কী অসুখ হয়েছিল। শুধু চেহারা খারাপ হয়ে যায়নি, গলার আওয়াজটাও কেমন যেন খোলা-খোলা হয়ে গেছে।

আমাকে ডেকে পাশে বসালেন। মার আর ভালো লাগল না। ওর মুখে সেই মিষ্টি গন্ধটাও নেই, গায়ে বিচ্ছিরি ঘামের গন্ধ। সুদীপ একবার আমাকে ডাকল, আমি উঠতে যেতেই রাঙাদাদু বললেন, রাঙাগিন্নি, কোথায় যাচ্ছ? বসো-বসো।

আজ রাঙাগিন্নি ডাকটা আমার মোটেও পছন্দ হল না। সত্যি-সত্যি ওরকম বুড়ো লোককে কেউ বিয়ে করে নাকি?

রাঙাদাদু আমায় জড়িয়ে ধরলেন, আমি ছটফটিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সুদীপের সঙ্গে চলে গেলুম বারান্দায়। সুদীপ জিগ্যেস করল, এই মিন্টি, ওই বুড়ো লোকটা তোকে জড়িয়ে ধরে কেন রে?

এতদিন আমি নিজেই রাঙাদাদুর গা ঘেঁষে বসেছি। আজ হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, বাজে লোক!

১৬ জুন ১৯৮৫

মাধ্যমিকে সুদীপ প্রথম দশ জনের মধ্যে এসেছে।

সুদীপ পড়াশুনোয় এত ভালো, এ জন্য কেউ অবাক হয়নি। সুদীপের মা বললেন, ওর ফার্স্ট হওয়া উচিত ছিল।

ছোটমাসি সুদীপের মাকে বলল, অরুণাদি, তোমার ছেলে এত ভালো রেজাল্ট করেছে, একদিন খাওয়াও সবাইকে।

অরুণা মাসি ঠোঁট উলটে বললেন, ভালো রেজাল্ট আবার কী! অন্তত ফার্স্ট-সেকেন্ড হলেও কথা ছিল। মা বললেন, অরুণা, তোর মোটেই এরকম কথা বলা উচিত না! এবারে যে ফার্স্ট হয়েছে, তাকেও তো আমরা চিনি। অঞ্জনার ছেলে দীপঙ্কর! দীপঙ্করের সঙ্গে সুদীপের কোনও তুলনা হয়? সুদীপ ব্যাডমিন্টনে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ইস্কুলের যে নাটক হল, তাতে কী দারুণ পার্ট করেছে সুদীপ। স্কুল ডিবেটেও ফার্স্ট। ওর সঙ্গে দীপঙ্করের তুলনা হয়? দীপঙ্কর তো লেখাপড়া ছাড়া আর কিছুই জানে না। আর সুদীপ যে এত কিছু করেও স্ট্যান্ড করেছে, ওর কৃতিত্বই বেশি।

মা তো ঠিক বলেছেন। সুদীপের সঙ্গে কারুর তুলনা হয় না।

২৭ নভেম্বর ১৯৮৫

আমি, অঞ্জনা আর মণিদীপা আজ স্বভূমিতে একটা গানের জলসা শুনতে গিয়েছিলুম। এমনিতে তো শুধু আমাদের তিনজনকে যেতে দিত না, সুদীপ আমাদের সঙ্গে যেতে রাজি হল বলেই আমরা পারমিশন পেলুম।

সুদীপ প্রথমেই বলল, ট্যাক্সি করে নিয়ে যেতে পারব না। বাসে চেপে যেতে হবে কিন্তু।

আমরা তাতেই রাজি। বাসে বেশ ভিড়। আমরা তিনজন তবু বসার জায়গা পেয়ে গেলুম, সুদীপকে আগাগোড়া দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই যেতে হল। বাসে আরও কত লোক, তাদের সকলের চেয়েই সুদীপ যেন আলাদা। কীরকম সোজা হয়ে দাঁড়ায়। চুল আঁচড়ায় না ভালো করে, জামার বোতাম লাগায় না, তবু সুদীপকে সবকিছু মানায়।

বাস থেকে নেমে সুদীপ বলল, আমার কাছাকাছি থাকবে সবাই। কেউ হারিয়ে গেলে কিন্তু আমি খুঁজতে পারব না। সে নিজের দায়িত্বে বাড়ি ফিরবে। অঞ্জনা বলল, আহা, আমরা কি কচি খুকি নাকি? হারিয়ে গেলে বাসে উঠে বাড়ি চলে যাব।

মণিদীপা বলল, একা-একা তো যেতেই পারি। তবে একা বাড়ি ফিরলে মা যে কতরকম প্রশ্ন করবে। উফ্, ভাবলেই বিচ্ছিরি লাগে!

সুদীপ হাসতে-হাসতে আমার থুতনিটা ছুঁয়ে দিয়ে বলল, এই মিন্টিটা তো সত্যিই এখনও ছোট। ওকে আমার হাত ধরে থাকতে হবে।

সুদীপ কেন এই কথা বলল, আমি জানি। ছোট বলে নয়, সুদীপ আমাকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে। আর অঞ্জনাকে তবু কিছুটা পছন্দ করলেও মণিদীপাকে দেখতে পারে না। মণিদীপার সঙ্গে সব সময় ওর ঝগড়া হয়।

সুদীপ ওপরে এসে ঢোকার মুখেই আমাদের আইসক্রিম কিনে খাওয়াল। দোকানটার সামনে বেশ ভিড়, আমরা তিনজন দাঁড়িয়ে রইলুম একটু দূরে। সুদীপ এক সঙ্গে সবকটা আইসক্রিম নিয়ে এল। প্রথমটা দিল কাকে? অঞ্জনা নিজে থেকেই হাত বাড়িয়ে ছিল, তবু সুদীপ তাকে পাত্তা না দিয়ে প্রথমে আমাকেই তো দিল!

ফেরার পথে সুদীপ সবসময় আমার হাত নিজের মুঠোয় রেখে দিল।

এ মা, আমি কী করে ফেলেছি! ডায়েরি লিখতে গিয়ে অন্যমনস্কভাবে একটা পুরো পাতায় শুধু লিখে গেছি সুদীপ, সুদীপ, সুদীপ!

মা দেখলে কী বলবে। অবশ্য, আমার এই ডায়েরি কেউ দেখবে না। এমন লুকিয়ে রাখব। এটা আমার গোপন, গোপন, গোপন!

৬ অক্টোবর ১৯৮৭

গত এক মাস ধরে আমার দিনগুলো ফুরফুরে প্রজাপতির মতন কেটে যাচ্ছে। সুদীপ রোজ সন্ধেবেলা আমার পড়াশুনো দেখিয়ে দিতে আসে। রীতিমতন মাইনে দিয়ে তাকে রাখা হয়েছে।

সুদীপ আসে ঠিক সাড়ে ছ'টায়, সাড়ে আটটা পর্যন্ত থাকে। প্রত্যেকটা সাবজেক্ট বুঝিয়ে দেয় কী চমৎকারভাবে। আমি কোনওদিন ফার্স্ট হইনি, এবার বোধহয় আটকানো যাবে না আমাকে। কতজন যে হিংসে করবে।

সুদীপের আঙুলগুলো কী লম্বা-লম্বা। ফরসা মুখখানায় একটু-একটু গোঁফ উঠেছে। টানা টানা চোখ। কিছুতেই জামায় বুকের বোতাম আটকাবে না।

বারবার ওর বুকের দিকে আমার চোখ চলে যায়। ইচ্ছে করে ওর পুরো বুকটা দেখতে।

পড়তে-পড়তে আমি অন্যমনস্ক হয়ে যাই। সুদীপ কিন্তু আমার দিকে বিশেষ তাকায় না। পড়ার সময় অন্য দিকে মন দেয় না।

মাঝে-মাঝে আমি ইচ্ছে করে ওর আঙুল ছুঁয়ে দিই।

৭ জানুয়ারি ১৯৮৮

আজ আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন। হে ডায়েরি, তোমাকেও সব কথা বলা যাবে না।

৯ মার্চ ১৯৮৮

মা-বাবা বহরমপুরে গেল, আমার কিছুতেই যেতে ইচ্ছে করল না। এমনিতে আমার গাড়িতে দূরে কোথাও যেতে ভালো লাগে, আর ছোটমাসিদের বাড়িটাও ভালো, ছাদ থেকে গঙ্গা দেখা যায়, কিন্তু

হঠাৎ এত গরম পড়েছে যে এখন আর কোথাও যেতেই ইচ্ছে করে না। বড্ড গরম! আমাদের গাড়ি তো এ সি নয়, জানলা বন্ধ রাখলেও খুব গরম, আর খোলা রাখলেও গরম হাওয়ায় খুব কষ্ট হয়।

মা বকুনি দিলেন সারাদিন ধরে। কিছুতেই আমাকে রেখে যেতে রাজি নন। আমি নাকি একা থাকতে পারব না। আমি কি এখন কুচি খুকি নাকি যে একা থাকতে পারব না? আবার মা বলছে, ও বড় হয়ে যাওয়াটাই নাকি আমার দোষ! তা ছাড়া, একা কোথায়, শান্তিপিসি তো থাকছেই। রঘু থাকছে।

মা যত বকুনি দেয়, আমার ততই জেদ বাড়ে। যাব না, যাব না, কিছুতেই যাব না।

শেষ পর্যন্ত আমারই জয় হল।

মা-বাবাকে নিয়ে গাড়ি স্টার্ট দিল সকাল সাড়ে ন'টায়। তার এক ঘণ্টা পরেই শুরু হল ঝড়, তারপর অনেকক্ষণ বৃষ্টি। গরম কমে গেল অনেকখানি। এই রকম দিনে গাড়িতে বেড়াতে যাওয়া সত্যিই আরামের। রাস্তা এখন ভালো হয়ে গেছে, চার ঘণ্টায় পৌঁছে যাওয়া যায়। একটু-একটু আফসোস হতে লাগল, আবার কবে বহরমপুরে যাব কে জানে।

কিন্তু আমি কি গরমের ভয়েই যেতে চাইনি? সত্যি কথা বলো তো? সন্ধেবেলা সুদীপ আসবে। বহরমপুর গেলে তিনদিন সুদীপের সঙ্গে দেখা হবে না। পড়াশুনোর কত ক্ষতি হবে।

বিকেলে যে-ই ছ'টা বেজে যায়, তারপর থেকেই একটা ছটফটানি শুরু হয়ে যায়। সুদীপ সাধারণত দেরি করে না। কিন্তু আজই এল সাতটা বাজিয়ে। সঙ্গে আবার একজন বন্ধু।

আমাদের একতলার বসবার ঘরটা পড়বার ঘর। আবার কোনও-কোনওদিন বাবার বন্ধুরা এসে পড়লে তিনতলায় আমার শোওয়ার ঘরেও চলে যেতে হয়। আজ বাবার বন্ধুরা কেউ আসবে না, তবু তিনতলায় ঘরটা ঠিক ঠাক করে রেখেছিলাম। বেশ নিরিবিলিতে পড়াশুনো হবে। শান্তিপিসি তো সারা সন্ধে দোতলার ঘরে বসে টিভিতে পরপর সিরিয়াল দেখে। আর রঘুকে না ডাকলে তেতলায় আসবে না। এমনিতেই ডেকে-ডেকে পাওয়া যায় না।

আজই সুদীপ সঙ্গে একজন বন্ধুকে নিয়ে এল?

বসবার ঘরে এসে সুদীপ বলল, মিন্টি, আগে আমাদের দু-কাপ চা খাওয়াও তো! আমার এই বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিচ্ছি, এর নাম জীবনময় সেন, খুব ভালো কবি।

লোকটিকে দেখে প্রথমেই আমার অপছন্দ হল। কবি হোন আর যাই-ই হোন, দেখতে কেমন যেন অদ্ভুত! মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। তেমন লম্বা নয়, অথচ বেশ ভুঁড়ি আছে। তা ছাড়া, এই লোক সুদীপের বন্ধু কী করে, ওর থেকে অন্তত দশ বছরের বড় বলেই তো মনে হয়।

জীবনময়বাবু প্রথমেই আমাকে দুম করে জিগ্যেস করলেন, তুমি গান গাইতে পারো?

আমি গান গাইতে পারি কি না পারি, তা একজন অচেনা বাইরের লোককে জানাতে যাব কেন? আমি বললুম, না, গান জানি না।

তিনি বললেন, কিন্তু তোমার দুচোখে গানের সুর আছে। এখনও চর্চা করলে গাইতে পারবে।

চোখে আবার গানের সুর থাকে নাকি? কী সব অদ্ভুত কথা! এসব আমার ভালো লাগে না।

জীবনময় ঘুরে ঘুরে আলমারির বইগুলো দেখতে লাগলেন।

সুদীপ চা খেতে খেতে জিগ্যেস করল, বাড়িতে আর কেউ নেই? কীরকম ফাঁকা-ফাঁকা লাগছে।

বাবা-মায়ের বহরমপুর যাওয়ার কথা জানিয়ে আমি ওর দিকে চোখের ইঙ্গিত করলুম। মানে, এই লোকটাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছ কেন?

সুদীপ আমার সে ইঙ্গিত বুঝল না।

একটু বাদে বলল, মিন্টি, কিছু মনে কোরো না, আজ আর পড়ানো হবে না। আমার একটা কাজ পড়ে গেছে। লক্ষ্মীটি, আজ নিজে-নিজে পড়ে নাও।

আমার বুকটা ধড়াস করে উঠল। বলে কী আজই ও চলে যেতে চায়? আমি এত আশা করে বসে আছি, আমার মুখ দেখে কিছুই বুঝতে পারল না?

একটাও কথা বললুম না, সুদীপ সত্যিই চলে গেল। শুধু একবার হাত রাখল আমার কাঁধে। আর ওই জীবনময় লোকটা এমন অভদ্র, যাওয়ার সময় কিছুই বলল না আমাকে। তারপর সারা সন্ধে...।

১০ মার্চ ১৯৮৮

আজ আবার বৃষ্টি নামল সন্ধেবেলা। বহরমপুরেও কি বৃষ্টি পড়ছে?

সুদীপ এল আধঘণ্টা দেরি করে। আমি আর নীচে নামিইনি, বসেছিলাম তিনতলার ঘরে। রঘু ওকে পৌঁছে দিয়ে গেল।

ঘরে ঢোকামাত্র আমি ছুটে গিয়ে...।

সুদীপও আমার...।

কীরকম যেন একটা গন্ধ পেলুম ওর মুখে। একবার গা গুলিয়ে উঠল। কিন্তু সারা শরীর এমন কাঁপছিল যে সেটা মনে রইল না।

সুদীপ আদর করলে প্রথম কিছুক্ষণ আমি কথাই বলতে পারি না।

তারপর টেবিলে এসে বসার পর জিগ্যেস করলুম, তুমি কাল চলে গেলে কেন?

সুদীপ বলল, কাল? ও হ্যাঁ, কী যেন, আমার এক বন্ধুর সঙ্গে জরুরি কথা ছিল।

কোন বন্ধু?

ওই যে আমার সঙ্গে এসেছিল। ও কিন্তু খুব নামকরা কবি। তুমি তো কবিতা পড়ো না, তা হলে বুঝতে।

ওই লোকটা অত বয়েস, তোমার বন্ধু হয় কী করে?

বন্ধুত্বের সঙ্গে বয়েসের কী সম্পর্ক? আমাদের চিন্তার মিল আছে।

তুমি চলে গেলে...আমার কথা একবারও মনে পড়ল না?

তোমার কথাই তো সর্বক্ষণ মনে পড়ে, মিন্টি।

আবার আমি ওর মুখ থেকে একটা বাজে গন্ধ পেলুম।

এটা কিসের গন্ধ!

নাঃ, আর লিখতে ইচ্ছে করছে না।

২২ মার্চ ১৯৮৮

সুদীপ এখন এলাচ মুখে দিয়ে আসে। সেটা আরও বিচ্ছিরি লাগে। ওর সেই বাজে বন্ধুটা, জীবনময়, কবি না ছাই, তার পাল্লায় পড়ে সুদীপ মদ খেতে শিখেছে। এর মধ্যে তিন দিন আসেনি। মণিদীপা বলল, এরমধ্যে একদিন ও গ্লোব সিনেমায় ইভনিং শো-তে সুদীপকে মদ খেয়ে হল্লা করতে দেখেছে। মণিদীপা কার সঙ্গে সিনেমায় গিয়েছিল, তা অবশ্য বলল না।

অঞ্জনা আবার একটা অদ্ভুত কথা বলল। মণিদীপার সঙ্গে সুদীপের নাকি প্রায়ই দেখা হয়।

অথচ বাইরে এমন ভাব দেখায়, যেন ওদের দুজনের খুব ঝগড়া।

আমি সুদীপের সঙ্গে একলা কোথাও বেড়াতে যেতে পারি না। আমাদের বাড়িতে সেরকম পারমিশন নেই। মা-বাবার সঙ্গে লুকোচুরি করতেও আমার ইচ্ছে করে না।

সুদীপও তো লুকিয়ে আমার সঙ্গে কোথাও দেখা করার কথা বলেনি। বাড়িতে পড়াবার সময় সুযোগ পেলেই...। কিন্তু এখন আর কাছে যেতে ইচ্ছে করে না।

২৮ জুন ১৯৯২

আমরা মাঝে-মাঝে যে শারীরিক আনন্দ পাই, তা মোটেই নিছক শারীরিক নয়। কেউ একটু হাত ছুঁলেই শিরশিরানি হয়, আবার অন্য কেউ সেই হাতটা স্পর্শ করলেই হাতটা সরিয়ে নিতে ইচ্ছে হয়।

আমরা একই মানুষ, দুবছর আগে যার স্পর্শে কেঁপে উঠতাম, এখন তাকে দেখলেই মনটা ঘিনঘিন করে। রাঙাদাদুর ব্যাপারটা অন্য রকম। ওঁর সঙ্গে তো নারী-পুরুষের সম্পর্ক ছিল না। তখন আমি কত ছোট, শরীরের অনুভূতিই ছিল না। আমি বড় হয়ে উঠতে-না-উঠতেই রাঙাদাদু বড্ড বেশি বুড়ো হয়ে গেলেন। আহা, মরেও গেলেন এর মধ্যে।

কিন্তু যে সুদীপকে আমি ভালোবেসেছিলুম, যে প্রথম পুরুষ হিসেবে আমার রক্তে উন্মাদনা জাগিয়েছিল, সেই সুদীপকেই যখন জানতে পারলুম, শুধু মদের নেশাই তাকে ধরেনি, সে হয়ে উঠেছে প্রচণ্ড মিথ্যেবাদী, আর একই সঙ্গে অনেক মেয়ের সঙ্গে...।

যে সুদীপের ছোঁয়ার জন্য আমি ব্যাকুল হয়ে থাকতুম, সেই সুদীপই একদিন আমাকে জড়িয়ে ধরতে আসতেই ওর গায়ে থুতু দিয়েছি। মণিদীপার সঙ্গে সুদীপকে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় আমি নিজে দেখেছি। অন্য কারুর কথা শুনে নয়, নিজের চোখকে তো অবিশ্বাস করা যায় না।

সুদীপকে আর কোনওদিন আমি দেখতেও চাই না।

সেদিন কী কান্না কেঁদেছি! কেন কেঁদেছি, সুদীপ তা কোনওদিন বুঝতে পারবে না। আমি ছেলেমানুষি মন নিয়ে সুদীপকে আমার জীবনের একমাত্র পুরুষ হিসেবে ধরে নিয়েছিলুম। আর কারুকে আমার দরকার নেই। সুদীপ তার মর্যাদা রাখল না।

সুদীপের সঙ্গে আর দেখা হয়নি, তবু তার খবর না রেখে পারিনি। পড়াশুনোয় অত ভালো ছিল, কিন্তু নিজেকে একেবারে নষ্ট করে ফেলল। এম-এ-তে রেজাল্ট বেশ খারাপ। শেষপর্যন্ত ডব্লু বি সি এস পরীক্ষা দিয়ে কোনওক্রমে ছোটখাটো একজন অফিসার হয়েছে। মণিদীপার সঙ্গে ডিভোর্স হয়ে গেল বিয়ের এক বছরের মধ্যে। এখন থাকে জলপাইগুড়ি।

প্রথম যেদিন সুদীপ আমাকে আদর করেছিল, তার সেদিনের মুখচ্ছবিটা আমার মনের মধ্যে বাঁধানো থাকবে। সে যে আমার জীবনের প্রথম পুরুষ। তার পরের দিককার চেহারাটাই অস্পষ্ট হয়ে গেছে।

আমি জীবনময়কে জিগ্যেস করেছিলুম, আপনি সুদীপকে মদ ধরালেন, ও নষ্ট হয়ে গেল, কিন্তু আপনি নিজে তো কখনও বেচাল হন না।

জীবনময় বললেন, নন্দিনী, আমি হচ্ছি শয়তান, মানুষকে ধ্বংস করাই আমর কাজ। শয়তান নিজে কি কখনও ধ্বংস হয়?

এই কথা বলার সময় জীবনময় ভুরু অনেকটা তুলে, চোখ পাকিয়ে, ঠোঁট বেঁকিয়ে মুখটা যতদূর সম্ভব বিকৃত করে শয়তান সাজবার চেষ্টা করলেন। তা দেখে আমি হেসে বাঁচি না।

জীবনময় মাঝে-মাঝেই শয়তান সাজবার চেষ্টা করেন। একদিন কোথা থেকে এলেন মাথা

ফাটিয়ে, মস্ত একটা ব্যান্ডেজ বাঁধা। দেখেই আমার বুকটা ধক করে উঠল।

উনি সগর্বে বললেন, আজ কী হয়েছে জানো?

ন্যাশনাল লাইব্রেরির মাঠে আজ সকালে দেবদূত গেব্রিয়েলের সঙ্গে আমার দ্বন্দ্ব যুদ্ধের অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল। আমার মাথায় সামান্য চোট লেগেছে, কিন্তু আমি ওকে এমন ঠেঙিয়েছি যে পালাবার পথ পায় না। এখন স্বর্গের হাসপাতালে শুয়ে আছে, আর এদিকে আসবার সাহস করবে না।

জীবনময় সব সময় যেন একটা অন্য জগতে থাকেন। এই রকম কথাই বলেন। এখন আর আমি অবাক হই না।

আমি বললুম, গ্রেবিয়েল তো ক্রিশ্চানদের দেবদূত।

সে তোমার সঙ্গে লড়াই করতে আসবে কেন?

জীবনময় বললেন, তোমাদের হিন্দু শাস্ত্রে কোনও দেবদূত আছে নাকি? যমদূত আছে। হিন্দুশাস্ত্রে তো শয়তানও নেই!

মৃত্যুর দেবতা আছে। যমরাজ।

যমরাজ আর শয়তান তো এক নয়। যম কখনও অন্যায় করেন না, সময় না ফুরোলে কারুর কাছে আসেন না। সেই জন্যই তাঁর আর এক নাম ধর্মরাজ। এই পৃথিবীতে যত পুঞ্জীভূত অন্যায়, তার প্রভু হচ্ছে শয়তান। এখন তো তারই রাজত্ব চলছে!

আসলে পা পিছলে পড়ে গিয়ে মাথা ফাটিয়েছেন, তাই না?

নন্দিনী, আমার কখনও পদস্খলন হয় না। মদ খেলে আমার পা টলে না। দেবতাদের রাজা ইন্দ্র একজন খুব নাম করা মাতাল জানো তো? বেদে এক জায়গায় ইন্দ্র গর্ব করে বলেছেন, উনি তিরিশটা হ্রদ ভরতি সোমরস পান করতে পারেন। আমি একদিন ইন্দ্রকে বললুম, কমপিটিশান হয়ে যাক। এ-যুগের সোমরস হচ্ছে প্রিমিয়াম স্কচ। এক লিটার ব্ল্যাক লেবেল একজন এনে দিয়েছিল বিদেশ থেকে, তা নিয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে হল আমার আসর পানের প্রতিযোগিতা। ওমা, একেবারে পেঁচি মাতাল। বলে কিনা জল মিশিয়ে খাবে! ব্ল্যাক লেবেলে কেউ জল মেশায়? আমি বললুম, ওসব চলবে না। স্ট্রেট পান করতে পারো তো চলে এসো। ব্যাস। তিন পেগ শেষ করতে-না-করতেই অজ্ঞান। বেদে বড়-বড় বাণী ঝেড়েছে!

ইন্দ্রের সঙ্গে কমপিটিশানটা কোথায় হল? স্বর্গে?

না, না, স্বর্গ ফর্গ আমার সহ্য হয় না। উর্বশী নামে একটা থুরথুরে বুড়ি বড্ড জ্বালাতন করে। আমরা বসেছিলুম ডায়মন্ডহারবারের এক বাগানবাড়ির ছাদে।

বুঝেছি, ইন্দ্র মানে ইন্দ্রজিৎ সরকার। তার বাগান বাড়ির কথা অনেক শুনেছি। একদিন আমায় নিয়ে যাবেন না?

নন্দিনী, যেসব পুরুষ মানুষ প্রেম করার নামে মেয়েদের ভুলিয়ে ভালিয়ে বাগান বাড়ি কিংবা গেস্ট হাউস কিংবা রিসর্টে নিয়ে যায়, আমাকে সেই দলে ফেলো না। আমার বুকে প্রেমও নেই, আর মেয়েদের ঠকাবার বাসনাও নেই।

৮ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩

মাকে বলে দিয়েছি, আমার ওপর জোর করে কোনও লাভ নেই। আমি যে কোনওদিন বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে পারি। জীবনময়কে আমি বিয়ে করব কি করব না, তা পরে ভেবে দেখব। এখনও সময় হয়নি। তোমাদের আপত্তি থাকলে আমি লেডিজ হস্টেলে গিয়ে থাকব।

কাল হলদিয়া যাওয়ার জন্য একটা ব্যাগ গুছিয়ে নিচ্ছিলুম, মা দরজার কাছে এসে বলল, তুই জামাকাপড় নিচ্ছিস যে, রাত্তিরে ফিরবি না?

যদি বেশি রাত হয়, তা হলে ফেরা হবে না। কাল সকালে—।

ওখানে থাকবি কোথায়?

গেস্ট হাউস বুক করা আছে।

আর কে-কে আছে?

মা, এটা কী আমাকে জেরা করা হয়ে যাচ্ছে না? আমি যথেষ্ট বড় হয়েছি। আমার কি নিজের ভালো মন্দ বোঝার ক্ষমতা নেই?

মা হঠাৎ আঁচলে চোখ চাপা দিল। কী হল? আমি এমন কি খারাপ কথা বলেছি? কাছে গিয়ে মায়ের পিঠে হাত রাখলুম।

এবারে আমারও চোখে জল এসে গেল। মাকে আমি খুবই ভালোবাসি। কিন্তু সব কথা মাকে আর এখন বলা যায় না। আমি যে ইচ্ছে করে আঘাত দিতে চাইছি, তা নয়। এই ধরনের জীবন তো মা কখনও কাটায়নি। তাই বুঝতে পারবে না।

একজন পুরুষের সঙ্গে যদি একদিন আমি কোথাও যাই, এমনকি রাত্তিরে এক সঙ্গে থাকি, তাতে কী এমন দোষ হয়?

হলদিয়াতে জীবনময় একটা অদ্ভুত কাণ্ড করল। কোথায় তার সেই বিদ্রোহী, বেপরোয়া কথাবার্তা তার বদলে হঠাৎ এত দুর্বল, নরম হয়ে গেল।

এর আগেও আমি জীবনময়ের সঙ্গে রাত কাটিয়েছি। কখনও ওর সঙ্গে আমার শারীরিক সম্পর্ক হয়নি। ও একবারও জোর করেনি। বন্ধুর মতন গল্প করেছি। জীবনময় যখন একটু-একটু মদ্যপান করে, তখন ওকে দেখতে আমার বেশি ভালো লাগে। মুখে যতই বারফাট্টাই করুক, ও মোটেই বেশি মদ খায় না, মাতালও হয় না। একটু-একটু নেশার সময় ও বড় সুন্দর কথা বলে, কত বিষয়ে পড়াশুনো করেছে। যখন কবিতা আবৃত্তি করে, তখন মনে হয়, এই পুরুষই তো আসলে হ্যান্ডস্যাম।

কাল মাত্র দু-পেগ মদ খাওয়ার পর জীবনময় বললেন, নন্দিনী, তুমি আমাকে আপনি-আপনি করো কেন? আজ থেকে তুমি বলবে। আর একটা কথা, আমি টের পাচ্ছি, আমার বুকের ভেতরটা শুকিয়ে আসছে। প্রেম ছাড়া কবিতা লেখা যায় না। তুমি আমাকে রক্ষা করো। এবার থেকে আমরা একসঙ্গে থাকতে চাই। যদি তুমি চাও, আমি বিয়ে করতেও রাজি আছি...।

৮ জুন ১৯৯৮

কতদিন ডায়েরি লিখিনি। এক সাদা খাতা জমে আছে, পুরোনো লেখাগুলো আজ সেখান থেকে পড়ছিলুম। ইস, কী ছেলেমানুষটা না ছিলুম। কী কাঁচা লেখা! এগুলো ছিঁড়ে ফেলতে হবে।

জীবনময় আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, তার উত্তরে আমি ঠিক কী বলেছিলুম, মনে নেই, লিখেও রাখিনি।

অদ্ভুত মজার ব্যাপার, তাই না? অমন বিদ্রোহী মানুষটা, যে নিজেকে শয়তানের সঙ্গে তুলনা করত, সে হঠাৎ বিয়ে পাগলা হয়ে গেল?

আমি প্রত্যাখ্যান করার এক মাসের মধ্যে ও বিয়ে করে ফেলল অনন্যা নামের একজনকে। এর মধ্যে দুটি সন্তানের পিতা। লিখছেও খুব।

জীবনময়কে আমি বন্ধু হিসেবেই চেয়েছিলুম, স্বামী হিসেবে ওকে মানায় না। অনন্যার মতন

শান্ত-শিষ্ট, গৃহিণী ধরনের মেয়েই ওর যোগ্য বউ। আমাকে এখন রিসার্চের কাজ নিয়ে দিল্লি থাকতে হয়।

একাডেমি পুরস্কার নিতে জীবনময় দিল্লি এসেছিল, বেশ কয়েকবছর পর আমার সঙ্গে দেখা। একটা বিকেল দুজনে কাটিয়ে দিলুম লোদি গার্ডেনসে। পুরোনো দিনের মতন গল্প হল। এই তো বেশ। ওর একটা কবিতার কয়েকটা লাইন মুখস্ত বলে ওকে চমকে দিলুম। ওর ধারণা ছিল, আমি কবিতা একেবারেই পড়ি না, বুঝি না।

এখন কবিতা পড়তেই আমি বেশি আনন্দ পাই। জীবনময়ের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর থেকেই আমি কবিতার রস নিতে শিখেছি।



বংশধর

একমাত্র সেন্টুদের বাড়িতেই বিনা উপদ্রবে সিগারেট খাওয়া যায়। অন্য অনেক বাড়িতে এমনকী বাচ্চারাও এসে চোখ রাঙায়, মায়েরা বলে, প্লিজ বাইরে গিয়ে খান। মে মাস, তবু বাতাস এখনও কনকনে ঠান্ডা, ঘরের ভেতরকার উষ্ণ আরাম ছেড়ে বাইরে গিয়ে সিগারেট টানার আনন্দটাই মাটি হয়ে যায়।

সেন্টুদের বাড়িতে এই ঝামেলা নেই। বাড়িতে কোনও মহিলা নেই, বাচ্চাকাচ্চা নেই, ওরা দুই ভাই বিয়েই করেনি। বড় ভাই মিন্টুর ঠোঁটে সবসময় সিগারেট ঝোলে।

সেইজন্য প্রত্যেক শনি-রবিবার ওদের বাড়িতেই আড্ডা জমে।

আর-একটা সুবিধে, ওদের বাড়ির কাছে টিউব স্টেশন, বাসেও আসা যায়। গাড়ি পার্ক করার এত ঝামেলা যে নিউইয়র্ক শহরে অনেকেই গাড়ি নিয়ে আসতে চায় না। মিটার পার্মিং-এ খানিকটা সময় অতিরিক্ত হয়ে গেলেই একশো পাঁচ ডলার ফাইন! পুলিশগুলো ঠিক যেন ওঁত পেতে থাকে।

এখন কুইন্‌সে সেন্টুদের বাড়িতেই শুরু হয়েছে নাটকের রিহার্সাল। চরিত্র মাত্র তেরোটি, প্রায় পঁচিশ-তিরিশ জন হাজির হয় সন্ধেবেলা। অভিনয় ছাড়াও নাটকের প্রোডাকশনের ব্যাপারে অনেক লোক লাগে। লাইট, সাউন্ডের দায়িত্ব নিজেদের, এখনকার লোক ভাড়া করতে গেলে প্রচুর খরচ, এমনকি নিজেরাই সেট বানিয়ে ফেলেছে। এদেশে থাকতে-থাকতে অনেকেরই ছুতোর মিস্তিরি, কলের মিস্তিরি, এমনকি ঘাস কাটার কাজও মিলে যায়। সব পুরুষই রান্না করতে পারে। এখানেই প্রায় রোজই বিরিয়ানি কিংবা খিচুড়ি রান্না হচ্ছে। সেন্টুদের বাড়ি এখন হট্টমেলা। রিহার্সাল ছাড়াও খাওয়া-দাওয়ার টানেও আসে অনেকে। পরিচালক রক্তিম রহমান অতি কড়া ধাতের মানুষ। মহড়ার সময় কোনও গোলমাল হলেই সে রেগে-মেগে বলে, আই কুইট!

সত্যিই সে দরজার দিকে চলে গেলে তাকে আবার ধরে আনতে হয়।

মাঝে-মাঝেই সে চেঁচিয়ে ওঠে, সাইলেন্স! সাইলেন্স!

একদিন সে চন্দ্রিমাকে এমন বকুনি দিয়েছিল যে কেঁদে ফেলেছিল সে বেচারি। বড়লোকের আদুরে মেয়ে, জীবনে প্রথম বকুনি খাচ্ছে নাটক করতে এসে!

চন্দ্রিমা এখনও এ-দেশের রাস্তায় একা চলা ফেরা করতে পারে না। তবে নিয়ে আসেন বালি সাহেব, আবার ফেরত নিয়ে যান। তিনি ব্রুকলিনে চন্দ্রিমাদের প্রতিবেশি, চন্দ্রিমার বাবাকেও

চেনেন অনেক দিন ধরে। রিহার্সালের সময় সর্বক্ষণ তিনি চুপ করে বসে থাকেন একটা চেয়ারে, আর পাইপ টানেন।

এই আলি সাহেবের উপস্থিতি নিয়েও প্রথম-প্রথম আপত্তি তুলেছিল রক্তিম। ভুরু কুঁচকে প্রযোজক গৌতমকে জিগ্যেস করেছিল, হু ইজ দ্যাট গাই? ওকে এখান থেকে হঠাও।

আলি সাহেব চন্দ্রিমার প্রায় অভিভাবক, তা জেনেও রক্তিম বলেছিল, অন্য ঘরে বসতে বল। কাজের সময় একজন নিষ্কর্মা লোককে দেখলে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়।

কিন্তু রক্তিমের এ-দাবি মানা সম্ভব নয়। আলি সাহেব তো নিছক চন্দ্রিমার ড্রাইভার নন, অনেকে তাঁকে চেনে, তিনি একজন বিশেষ সম্মানীয় ব্যক্তি। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজতত্ত্বের অধ্যাপক ছিলেন, অবসর নিয়েছেন দু-বছর আগে। তিনি যেমন সুপুরুষ তেমনই নম্র, শোভন ব্যবহার অনেক ছেলেমেয়েকে গোপনে সাহায্য করেন, তা কেউ-কেউ জানে।

তাঁকে কখনও বলা যায় অন্য ঘরে একা বসে থাকতে? তা ছাড়া তিনি একটি কথাও বলেন না, আপন মনে পাইপ টানেন, মনে হয় রিহার্সালের ব্যাপারটা তিনি বেশ উপভোগ করেন।

রক্তিমকে ঠাণ্ডা করার পর আলি সাহেবকে একটি ছোটো ভূমিকায় নামার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। তিনি সলজ্জ ভাবে বলেছিলেন না, না, ওসব আমি পারব না।

মাস দু-একের মধ্যেই বেশ জমে উঠল রিহার্সাল। থ্যাংকস গিভিং-এর সময় প্রথম অভিনয় হবে ম্যানহাটনে। রিহার্সালের মাঝখানে মাঝে-মাঝে তর্কাতর্কি, মত বিরোধ তো হবেই। আলি সাহেব কিন্তু এখনও বসে থাকেন নিঃশব্দে। কোনও পক্ষ নিয়ে মতামত দেন না।

নাটকটির বিষয়বস্তু ঐতিহাসিক। সিপাহী বিপ্লব এবং সম্রাট বাহাদুর শাহের অন্তিম দশা নিয়ে এর কাহিনি। সংলাপে কিছু-কিছু উর্দু আছে, তার উচ্চারণ নিয়ে রক্তিম ও গৌতম আলাদা-আলাদা মত দেয়।

একদিন রক্তিম আলি সাহেবের কাছে এসে জিগ্যেস করল স্যার, আপনি উর্দু জানেন?

ঠোঁট থেকে পাইপটা নামিয়ে আলি সাহেব বললেন, খুব জানি না, একটু-আধটু!

মোটেই একটু-আধটু নয়, বোঝা গেল তিনি শুধু উর্দু নয়, আরবি ফারসি ভাষাতেও বিশেষ পণ্ডিত। সংলাপে একটা শব্দ আছে, কসবি। সেটা আসলে কসবি নয় কশবি? আলি সাহেব বললেন শব্দটা এসেছে আরবি কসব থেকে, সুতরাং কসবি হওয়াই স্বাভাবিক, তবে বাংলায় কশবি উচ্চারণ করলেও দোষ নেই!

তেমনি নাটকে আছে 'রিয়াৎ', এটা কি ছাপার ভুল? 'রেয়াৎ' হবে না? আলি সাহেব বললেন, ঠিক ছাপার ভুল নয়, আরবি শব্দটি হচ্ছে রিআয়ৎ, তার থেকে উর্দুতে রিয়াত বা রিয়াৎ, বাংলা হয়ে গেছে রেয়াৎ!

কিন্তু জিগ্যেস না করলে আলি সাহেব নিজের থেকে কিছুই বলেন না। তাঁর পাণ্ডিত্য জাহির করার কোনও চেষ্টাই নেই।

এখন আলি সাহেবকে সবাই আরও বেশি শ্রদ্ধা করে, রিহার্সালের সময় তার একধারে চেয়ারে বসে পাইপ টানার দৃশ্যটি না থাকলেই খালি-খালি লাগে।

এর মধ্যে গৌতমের বন্ধু অনিমেষ এল কলকাতা থেকে। সে একজন বিখ্যাত সাংবাদিক। রিহার্সাল দেখতে এসে প্রথমেই আলি সাহেবের দিকে চোখ পড়ায় সে বলেছিল, আরে আপনি এখানে? আপনিও নাটক করছেন নাকি?

এরা পরস্পরের পরিচিত দীর্ঘদিনের। অনিমেষ আলি সাহেবের সঙ্গে গল্প করল সর্বক্ষণ।

সেদিন রাত্তিরে গৌতমের বাড়িতে কিছুটা মদ্যপানের পর অনিমেষ বললেন, অনেকদিন পর আলি সাহেবকে দেখলাম। তোমরা ওঁর পুরো পরিচয় জানো? গ্রেট ম্যান। এনসাইক্লোপিডিয়ার মতন অগাধ জ্ঞান। আর কত খানদানি বংশের মানুষ, মুর্শিদাবাদে নবাব প্যালেসের পাশের বাড়িটাই ওঁদের।

আমি সে বাড়িতে গিয়ে থেকেছি। বাংলার এক সময়ের নবাব মিরজাফরের স্ট্রেট বংশধর।

গৌতম চমকে উঠল।

মিরজাফরের নাম শুনলে চমক লাগবেই। আমাদের জাতীয় ইতিহাসে মিরজাফর একটি অতি কলঙ্কিত নাম। দুর্বল মেরুদণ্ডহীন, বিশ্বাসঘাতক মিরজাফর বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদৌল্লাকে শেষ করে দিয়ে দেশটা তুলে দিয়েছিলেন ইংরেজদের হাতে।

গৌতম বলল, ইতিহাসে সিরাজকে যেমন ট্র্যাজিক হিরো হিসেবে দেখানো হয়, তার অনেক দোষ, শুধু মিরজাফর নন, আরও অনেকের দারুণ রাগ আর ঘৃণা ছিল সিরাজের ওপর।

সে যাই হোক, দুশো বছরের আগের ইতিহাস টেনে এনে এখনকার কোনও মানুষকে বিচার করা যায় না। যে কোনও সমাজে এখন আলি সাহেবের মতন মানুষকে আদর্শ পুরুষ বলে মনে করতে হবে।

যথেষ্ট বয়স হলেও আলি সাহেবের শরীর এখনও একটুও ভাঙেনি, সৌম্য মুখখানিতে সব সময় স্মিত হাসি লেগে থাকে। মেয়েদের প্রতিও তাঁর ব্যবহার অতি ভদ্র।

এই দলে যে ক'জন মেয়ে আছে, তাদের মধ্যে চন্দ্রিমাই সব চেয়ে রূপসি। সে কেমিস্ট্রিতে পি এইচ ডি করছে, ভালো গান গায়, এখনও বিয়ে করেনি। তার প্রতি ছেলেরা তরল চোখে তাকাবে, তার কাছাকাছি থাকতে চাইবে, কেউ আলতো করে তাঁকে ছুঁয়ে দেবে। এগুলো মোটেই অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু আলি সাহেব তা দেখেও কখনও গার্জেনগিরি করার চেষ্টা করেন না। গৌতম সরকার নিজেই চন্দ্রিমার প্রতি বিশেষ দুর্বল, কিন্তু সে-ও কখনও আলি সাহেবকে ঈর্ষা করার কারণ খুঁজে পায়নি।

তবুও বংশ পরিচয় জানবার পর গৌতম আলি সাহেবকে খানিকটা অন্য চোখে দেখে। মিরজাফরের রক্ত রয়েছে এই নিপাট ভালো মানুষটির শরীরে। সে খবর নিয়ে জেনেছে, মির্জা আলি নামে পরিচিত হলেও ওঁর আসল নামটি বেশ লম্বা, আগেকার দিনের নবাব বাদশাদের যেমন হত।

একদিন সে একটু নিরিবিলিতে আলি সাহেবকে জিগ্যেস করেই ফেলল। আপনার শরীরে নাকি নবাব বংশের রক্ত আছে।

আলি সাহেব সোজাসুজি গৌতমের চোখের দিকে তাকিয়ে জবাব দিলেন, হ্যাঁ আছে বোধহয়, হোমিওপ্যাথিক ডোজে। আমাদের এক পূর্বপুরুষ কিছুদিনের জন্য বাংলার মসনদে বসেছিলেন। তাঁর নাম শুনলে অবশ্য অনেকেই ঘেন্নায় নাক কুঁচকোয়। মিরজাফর! কিন্তু আমি কী করব বলুন, আমার জন্ম তো আমার নিজের পছন্দ মতন হয়নি। তবে সিরাজ সম্পর্কে ইতিহাসে যা লেখে, আমাদের পরিবারে অন্যরকম গল্প প্রচলিত আছে। নিজের বংশকে সবাই বড়ো মনে করে। আমার বাপ-দাদারা মনে করতেন, সিরাজই আসলে বিশ্বাসঘাতক। তবে, আমি ওসব নিয়ে মাথা ঘামাই না! আট পুরুষ আগে আপনার পূর্ব পুরুষ কে ছিলেন, তা কি আপনি জানেন?

গৌতম বললেন, আট পুরুষ? আমার বাবা, ঠাকুরদা, আর তাঁর বাবা, এই তিন জনের নাম জানি, তারপর আর কারুর নামই জানি না! বিখ্যাত ফ্যামিলি না হলে কে আর হিস্ট্রি রেখে দেয়?

আলি সাহেব মুচকি হেসে বললেন, এমনও তো হতে পারে, আপনার এক পূর্বপুরুষ ছিলেন ডাকাত কিংবা ভিখিরি।

গৌতম বলল, তা তো হতেই পারে। কিছুই জানি না যখন!

আলি সাহেব বললেন, মহাভারতের কর্ণের উক্তিটাই সার সত্য। কোন কুলে জন্ম, তা দৈবায়ৎ, কিন্তু আমার পৌরুষ নিজের আয়ত্তে।

আপনি কি সংস্কৃতও জানেন নাকি?

এই একটু-আধটু। ভাষা শেখা আমার শখ।

রক্তিমের ডাকাডাকি শুনে গৌতম চলে গেল।

নাটক মঞ্চস্থ করার দিন যত এগিয়ে আসছে, ততই উদ্দীপনা বাড়ছে। রক্তিম ছুটি নিয়ে ফেলেছে অফিস থেকে। অনেক রাত পর্যন্ত রিহার্সাল চলে, তার পরেও খাওয়া-দাওয়া। সেন্টুরা দু-ভাই আতিথেয়তার ব্যাপারে খুব উদার। খাদ্যপানীয়ের জন্য চাঁদা করার প্রস্তাব উঠেছিল, সেন্টু তা উড়িয়ে দিয়েছে।

আলি সাহেব রিহার্সালের পরের আড্ডায় থাকতেও চান না। তিনি মদ্যপান করেন না, খাওয়ারও বহু বাছ-বিচার আছে, লাল মাংস কিংবা বিরিয়ানি ছোঁন না।

আলি সাহেব থাকতে না চাইলে চন্দ্রিমাকেও চলে যেতে হয়। কিন্তু নায়িকা না থাকলে কি নাটকের দলের আড্ডা জমে, আলি সাহেবের বদলে অনেকেই চন্দ্রিমাকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এক পায়ে খাড়া।

আলি সাহেব আপত্তি করেন না, শুধু তিনি চন্দ্রিমাকে জিগ্যেস করেন, তুমি পরে যাবে?

চন্দ্রিমা কিছু উত্তর দেওয়ার আগেই রক্তিম খানিকটা কর্তৃত্বের সুরে বলে, হ্যাঁ আজ চন্দ্রিমা পরে যাবে। ওর সঙ্গে আমার দরকারি কথা আছে।

রক্তিমের কথার রুক্ষতা চাপা দেওয়ার জন্য গৌতম তাড়াতাড়ি বলল, আপনি চিন্তা করবেন না, আমি চন্দ্রিমাকে ঠিক পৌঁছে দিয়ে আসব।

আলি সাহেব একা চলে যাওয়ার পর সেন্টু জিগ্যেস করল, দাদা রিটায়ার্ড লোক, তবু এত বাড়ি ফেরার তাড়া কেন? বাড়িতে কচি বউ আছে বুঝি?

চন্দ্রিমা বলল, যাঃ, উনি বিয়েই করেননি!

গৌতম বলল, সে কি, কেন?

চন্দ্রিমা বলল, লোকে কেন বিয়ে করে কিংবা করে না, তা কি অন্য কেউ বলতে পারে?

সেন্টু বলল, বোধহয় যৌবনে কোনও মেয়ের কাছে ল্যাং খেয়েছেন!

রক্তিম বলল, চন্দ্রিমা তোমাকে উনি রোজ নিয়ে আসেন, এতক্ষণ চুপ করে বসে থাকেন, অথচ নাটকে কোনও ইন্টারেস্ট নেই। তা হলে কি তোমার ওপরে কিছু আঠা আছে?

চন্দ্রিমা সপ্রতিভ মেয়ে। সে হাসতে-হাসতে বলল, তা তো থাকতেই পারে। না থাকলেই আমি অপমানিত বোধ করতুম। আমি একটা সুন্দরী মেয়ে না?

আলি সাহেবের মতন রাশভারি ব্যক্তির সামনে তাঁকে সমীহ করে কথা বলতে হয়। আড়ালে এই ধরনের মানুষকে নিয়ে ঠাট্টা ইয়ার্কি করা যৌবনের ধর্ম।

আলি সাহেব শুধু একদিন সবাইকে শুধু অবাক নয়, হতভম্ব করে দিলেন।

এটা থিয়েটারের গল্প নয়, আলি সাহেবেরই গল্প।

মন্ট্রিয়েল থেকে একদিন এল স্বপন। সে সেন্টুদের দূর সম্পর্কে আত্মীয়। নিউ ইয়র্কে এলে এই বাড়িতেই থেকে যায়। স্বপনও একজন নাট্য পরিচালক, মন্ট্রিয়েলে সে বাঙালিদের মধ্যে বেশ বিখ্যাত। নিউ ইয়র্কেও কয়েকজন তাঁকে চেনে, সবাই তাকে স্বপনভাই বলে ডাকে।

লম্বা ছিপছিপে চেহারা, এমন ফরসা রং যে বাঙালি বলে মনেই হয় না, চোখের মণি কটা। চিমনির মতন সর্বক্ষণ সিগারেট টানে। রিহার্সাল শুরু হতে-না-হতেই সে নানারকম মতামত দিতে শুরু করল।

রক্তিম কারুর ফোঁপরদালালি সহ্য করে না, কিন্তু যেহেতু স্বপন ভাইয়ের নাট্য পরিচালক হিসেবে খ্যাতি আছে, তাই তাকে মেনে নিতে হল।

রিহার্সাল আগেই আরম্ভ হয়ে গেছে। চন্দ্রিমাকে নিয়ে আলি সাহেব পৌঁছলেন একটু দেরিতে। আলি সাহেব যথারীতি বসলেন নিজের চেয়ারে। তাঁর সঙ্গে স্বপন ভাইয়ের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কথা কারুর মনে এল না।

চন্দ্রিমাকে দেখেই স্বপন বলল, বাঃ, নায়িকাটি তো ভারি বিউটিফুল, এতেই তো নাটকের অর্ধেক বাজিমাৎ! আমি তোমাকে মন্ত্রিয়েলে ইনভাইট করলে তুমি আসবে? চন্দ্রিমা বলল, ভেবে দেখব। এখন বলতে পারছি না।

আলি সাহেব ভুরু কুঁচকে স্বপনের দিকে তাকালেন।

চন্দ্রিমা সংলাপ শুরু করার একটু পরেই স্বপন বলল তোমার থ্রো ঠিকই আছে। কিন্তু এখানে হাঁটাটা ঠিক হচ্ছে না।

রক্তিম বলল, এই সিনে আমিই খুব আস্তে-আস্তে হাঁটতে বলেছি।

স্বপন বলল, আস্তে জোরের ব্যাপার নয়। অহংকার বোঝাতে গেলে দা চিন মাস্ট বি আপ! হাঁটার সময় অন্যদের দিকে না তাকিয়ে, চিবুকটা উঁচু করে—

চন্দ্রিমার কাছে এসে তার চিবুকটা আঙুল দিয়ে তুলে বলল, এইরকম—

হঠাৎ যেন সেখানে বজ্রপাত হল।

আলি সাহেব হুংকার দিয়ে বলে উঠলেন, হাউ ডেয়ার ইউ!

সবাই হতচকিত, স্বপন, নিজেও কিছু বুঝতে না পেরে বলল, কী হল?

আলি সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, তুমি ওকে টাচ করলে কেন? আগে ওর পারমিশান নিয়েছ? প্রথমেই এসে ভালগার ভাবে কথা বলতে শুরু করেছ?

স্বপন এবার রক্তিমের দিকে ফিরে বলল, এ লোকটা কে?

রক্তিম আমতা-আমতা করে বলল, ইনি আমাদের মানে বিশিষ্ট একজন।

স্বপন চিবিয়ে-চিবিয়ে বললেন, অ্যাকটিং শেখাবার জন্য পারমিশান নিতে হবে? শুধু তো চিবুকটা ছুঁয়েছি, দরকার হলে কোমর ধরেও হাঁটা শেখাতে হয়।

আলি সাহেব হিংস্র গলায় বললেন, শাট আপ! নাটকের রিহার্সাল মানে বেলেল্লা করার জায়গা নয়!

আলি সাহেবের এরকম রুদ্রমূর্তি কেউ কখনও দেখেনি।

স্বপন বলল, বেলেল্লা! আমি বেলেল্লা করছি। তুমি কে হে হরিদাস পাল? ভদ্রভাবে কথা বলতে জানো না?

আলি সাহেব এক পা এগিয়ে এসে বললেন, আমাকে তুমি ভদ্রতা শেখাবে? তুমি একটা স্কাউন্ড্রেল! দেখেই বোঝা যাচ্ছে, তুমি মেয়েদের সঙ্গে।

স্বপন চেঁচিয়ে বলল, গেট দা হেল আউট অফ হিয়ার!

আলি সাহেব বললেন, ইউ গেট আউট!

তারপরই একটা প্রচণ্ড ঘুষি কষালেন স্বপনের নাকে। স্বপন ছিটকে পড়ে গেল, তার মাথা খুব জোরে ঠুকে গেল একটা চেয়ারে। মাথা ফাটল, নাক দিয়েও গলগল করে রক্ত বেরুতে লাগল।

সবাই চেপে ধরল আলি সাহেবকে। চন্দ্রিমা কাছে এসে বলল, চাচা, এ কী করলেন?

আলি সাহেব এখনও ফুঁসছেন। দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, বেশ করেছি। আরও মারা উচিত। ও একটা লোফার...

স্বপনকে নিয়ে যাওয়া হল পাশের ঘরে। সেন্টু ফোন করল এক চেনা ডাক্তারকে। এর মধ্যে রক্ত বন্ধ করা দরকার। এক-একজন এক-একরকম পরামর্শ দিচ্ছে। কিন্তু বাড়িতে কোনও ওষুধ নেই। ব্যান্ডেজ বাঁধার কাপড়ও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

স্বপন অজ্ঞান হয়ে যায়নি, কিন্তু আচ্ছন্নের মতন হয়ে আছে। সেই অবস্থাতেই ফিসফিস করে বলল, হারামির বাচ্চাটাকে ধরে রাখ। ওকে পুলিশে দেব। আমি কেস করব ওর নামে।

এর মধ্যেই চন্দ্রিমা বুদ্ধি করে আলি সাহেবকে প্রায় জোর করে টেনে নিয়ে বেরিয়ে গেছে।

আজ আর রিহার্সালের কোনও আশা নেই।

ঘটনার আকস্মিকতায় সবাই বিমূঢ় বনে গেছে। ছোট-ছোট জটলায় কথা হচ্ছে নীচু স্বরে। সকলেই দোষ দিচ্ছে আলি সাহেবকে। স্বপন ভাই তো তেমন কিছু করেনি। সে নামকরা নাট্য পরিচালক। চন্দ্রিমা নিজেও কিছু আপত্তি করেনি, স্বপন ভাইয়ের যদিও মেয়ে ঘটিত ব্যাপারে বদনাম আছে, কিন্তু এখানে...

ডাক্তার এসে গেছে। স্বপনের মাথায় আঘাত বেশ গুরুতর।

সেন্টু আড়ালে ডেকে গৌতমকে বলল, চন্দ্রিমাকে ডেকে বলতে হবে, ওই আলি সাহেবকে আর এখানে আনা চলবে না। না হলে আমরা এখানে রিহার্সাল হতে দেব না।

গৌতম বলল, খুবই দুঃখিত ভাই। তোমার মেহমানকে এমন অপমান করা, তাও বিনা কারণে খুবই অন্যায়! চন্দ্রিমার ওপর আলি সাহেবের খুবই উইকনেস, এত জেলাস।

সেন্টু বলল, শুধু আমার মেহমান নয়, স্বপন ভাই কত খানদানি বংশের লোক তা জানো? উনি নিজে কারুকে বলতে চান না। কিন্তু আমরা তো জানি উনি নবাব আলিবর্দির ডাইরেক্ট বংশধর।

দারুণ অবাক হয়ে গৌতম বলল, কী? কার বংশধর! আলিবর্দি মানে সিরাজের?

সেন্টু বলল ইয়েস। ডকুমেন্ট আছে। স্বপন ভাইয়ের আসল নাম তো নওসের খান।

গৌতম অস্ফুট স্বরে বলল, সিরাজের বংশধর।

আলি সাহেবের বংশ পরিচয় সে কারুকে জানায়নি। আলি সাহেবও স্বপন ভাইয়ের বংশ পরিচয় জানেন না। তবু ওকে দেখামাত্রই যেন জ্বলে উঠলেন। আট পুরুষ আগেকার ঝগড়া বয়ে এনেছে রক্তের মধ্য দিয়ে, এখন তা মেটেনি?

তা হলে কি সিরাজ আর মিরজাফরের মধ্যে ঝগড়ার মূল কারণ ছিল নারীঘটিত? ইতিহাস এ ব্যাপারে নীরব।



যমজ কাহিনি

মাস তিনেক আগে কেনা হয়েছিল হাঁসগুলো। মোট আটটা। বোলপুর বাজারে শুধু রবিবার হাঁস বিক্রি হয়। আশে পাশের গ্রাম থেকে নিয়ে আসে চাষিরা। বেশ ছোট ছিল তখন। বাচ্চা হাঁস দেখতে তেমন ভালো হয় না, কেমন যেন দুর্বল প্রাণী মনে হয়। বাচ্চা কুকুর দেখলেই যেমন আদর করতে ইচ্ছে করে, হাঁসেরা তেমন নয়।

এই তিনমাসেই বেশ বড় হয়ে গেছে। পুকুরের জলে ভেসে বেড়ায়, এখন তাদের রূপ ফুটেছে খুব। তেজি আর স্বাস্থ্যবতী। প্রত্যেকটিরই পালকে কত রকম রং।

জানলা দিয়ে পুকুরটা দেখা যায়।

কলম হাতে নিয়ে লেখক চেয়ে থাকেন পুকুরের দিকে। তাঁকে একটা গল্প লিখতে হবে। এখনও এক লাইন শুরু হয়নি।

হাঁসেদের মধ্যে কোনটি পুরুষ আর কোনটি মেয়ে তা চেনা খুব শক্ত। ডাক শুনে বুঝতে হয়। কোনও-কোনও হাঁস দারুণ গলায় জোরে প্যাঁক-প্যাঁক করে ডাকে। কোনও-কোনও হাঁসের ডাক ফ্যাঁস-ফ্যাঁস ধরনের। ওরা এখনও ডিম দিতে শুরু করেনি। দীনবন্ধুর মতে, এবার যে-কোনওদিন ডিম পাড়বে।

গল্প লিখতে হবে, এখনও লেখকের মাথায় কিছুই আসছে না।

পুকুরটা বেশি বড় নয়, শীতকালে খুবই ছোট দেখায়। এখন ভরা বর্ষায় থই-থই করছে। পদ্মপাতায় ছেয়ে গেছে অনেকটা।

হাঁসগুলো মাঝে-মাঝে জল থেকে উঠে এসে পাড়ে ঘুরে বেড়ায়। হাঁসদের মধ্যে একবারেই দলাদলি নেই। আটখানা হাঁস সবসময় একসঙ্গে থাকে। একজন জল থেকে উঠে এলেই অন্যরাও আর জলে থাকে না। কাছাকাছি কোনও মানুষ দেখলেই ওরা আবার জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। একসঙ্গে।

বাগানের লোহার গেটটা কেউ খুললেই ক্যাঁচ করে একটা শব্দ হয়। অমনি সে দিকে চোখ চলে যায়।

সে বুড়িটা এসে ঢুকছে। একেবারে থুলথুলে বুড়ি। মনে হয়, বয়েসের গাছ পাথর নেই। কেউ যদি বলে, তাও অবিশ্বাস্য মনে হবে না। শরীরটা দুমড়ে বেঁকে গেছে, কোনওক্রমে হাঁটতে পারে, কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে ওঠার ক্ষমতা নেই। সিঁড়ির কাছে এসে বসে পড়ে।

পাশের রাস্তা দিয়ে আস্তে-আস্তে হেঁটে যাচ্ছে দুটি তরুণী। পৃথিবীর নিয়মই এই, বুড়ির বদলে যুবতী মেয়েদের দিকেই পুরুষ মানুষের আগে চোখ যাবে।

দুটি তরুণীরই সাজ পোশাকের চাকচিক্য দেখে বোঝা যায়, তারা শহুরে মেয়ে। দুজনের যেন একইরকম চেহারা। যমজ নাকি?

লেখক কৌতূহলী হয়ে উঠলেন।

মাঝে-মাঝে তাঁর কাছে মেয়েরা দেখা করতে আসে। অটোগ্রাফ চায়। তবে, সাধারণত তাদের সঙ্গে একজন পুরুষ থাকে। আবার অনেকে ছুটির দিনে এখানে জমি খুঁজতে আসে কলকাতা থেকে। তাদেরও সঙ্গে স্বামী কিংবা অভিভাবকদের থাকার কথা। মেয়ে দুটি এ-বাড়ির দিকেই তাকাচ্ছে।

সাধারণত লেখার সময় কেউ দেখা করতে এলে তিনি বিরক্ত হন। তবে মেয়েরা এলে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। গরমের সময় তাঁর খালি গায়ে থাকা অভ্যেস। কোনও দর্শনার্থিনী এলে তিনি গায়ে একটা জামা গলিয়ে নীচে নেমে যান।

যমজ মেয়ে কিংবা যমজ ছেলে নিয়ে তিনি এ-পর্যন্ত কোনও গল্প লেখেননি। এই মেয়ে দুটির সঙ্গে কথা বললে একটা নতুন গল্পের উপাদান পাওয়া যেতে পারে।

উলটো দিক থেকে সাইকেলে একটি লোক আসছে। মেয়ে দুটি তাকে কী যেন জিগ্যেস করল। তারপর দ্রুত পায়ে এগিয়ে যেতে লাগল সামনের দিকে। ওরা অন্য কোনও বাড়ির সন্ধান করছে। খুব সম্ভবত ওরা বাংলা বইটই পড়ে না।

বুড়িটি হেঁটে আসছে থপথপিয়ে। হাঁসগুলো তার পাশ দিয়ে চলে গেল। অন্য কোনও মানুষের এত কাছে ওরা আসে না। ওরা কি বুঝে গেছে যে এই বুড়ির পক্ষে হাত বাড়িয়ে একটা হাঁস ধরে ফেলারও ক্ষমতা নেই?

বুড়িটি লেখকের চেনা। বারো বছর আগে শান্তিনিকেতনের এই বাড়িটি করার সময় থেকেই দেখছেন। একইরকম চেহারা। এত আস্তে কথা বলে যে প্রায় বোঝাই যায় না। তবে, এইটুকু জানা গেছে যে, তার দুই ছেলেই মারা গেছে। সে থাকে নাতির সংসারে। সেখানে সে যে পরম যত্ন আদর পায় না, তা অনুমান করা শক্ত নয়। লেখকের স্ত্রী প্রতিবারই তাকে কুড়িটা টাকা দেন, সে বিড়বিড় করে অনেক আশীর্বাদ করতে-করতে চলে যায়।

এই বুড়িটিকে নিয়ে কি লেখা যায় গল্প? যাবে না কেন, প্রত্যেকের জীবনেই থাকে গল্প। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা সতীনাথ ভাদুড়ির হাতে ভালো খোলে এরকম গল্প। এই লেখকের মনে এখনও ঝিলিক মারছে। ওই তরুণী দুটি কি সত্যিই যমজ ছিল? ওরা এ-পাড়ায় কার বাড়িতে গেল?

একবার এই বুড়িটি কিন্তু প্রায় একটি গল্পের উপাদান হয়ে উঠেছিল।

নতুন বাড়ি বানাবার পর প্রথম-প্রথম খুব উৎসাহের সঙ্গে প্রতিবারই এসে ক্যামেরায় অনেক ছবি তোলা হত। সঙ্গে আসত বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়দের কেউ-না-কেউ। একবার সেইরকম ছবি তোলা হচ্ছে। সেই সময় এসে পড়ল বুড়ি। একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে বলল, ও বাবা, আমার একটা ছবি তুলে দাও না গো! আমার ছবি দেখি নাই কোনওদিন।

বুড়ির চোখ দুটি ঘোলাটে। দৃষ্টিশক্তি আছে কি না সন্দেহ, যদিও নিজেই হেঁটে-হেঁটে আসে। সেবার লেখকের দুই শ্যালিকা এসেছিল, ছোটো শ্যালিকাই জিগ্যেস করেছিল, ও বুড়িমা, তুমি চোখে দেখতে পাও?

মাথা নাড়তে-নাড়তে বুড়ি বলেছিল, না-গো-না, সব ঝাপসা। এই তোমার মুখখানিও ভালো দেখতে পাচ্ছি না গো মা! চোখ গেছে।

বোঝাই যায়। কখনও ছানি কাটানো হয়নি, এর চোখ দুটি প্রায় অন্ধই বলাই যায়। ছবি তুললে তো নিজেই দেখতে পাবে না। তবু মানুষের ছবির প্রতি এমনই মায়া।

গ্রুপ ছবি ছাড়াও বুড়ির আলাদা করে দুটি ছবি তুলেছিলেন লেখক। কিন্তু দুঃখ ও লজ্জার কথা, সে ছবি ওঠেনি। বড়ো শ্যালিকার দুষ্টু ছেলেটি ক্যামেরাটি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে পেছনটা একবার খুলে ফেলেছিল, আলো ঢুকে শেষের দিকে সাত আটখানা ছবি সাদা হয়ে গেছে।

পরের বার গিয়ে বুড়িকে কী বলা হবে? লেখক খুবই অস্বস্তির মধ্যে পড়েছিলেন। শ্যালিকার ছেলের ওপর রাগও করা যায় না।

ছোটো শ্যালিকা বলেছিল, ওকে একটা অন্য ছবি দিয়ে দিন না। আমার ছবিটা দিয়ে দিন। ও তো কিছু বুঝতেই পারবে না।

এই উপাদান নিয়ে অনায়াসেই একট ছোটো গল্প উতরে দেওয়া যেত। বুড়িকে এক সুন্দরী যুবতীর ছবি দেওয়া হল, সে সেই ছবিখানা নিয়েই আনন্দ করতে-করতে চলে গেল...।

কিন্তু লেখক সে গল্প লেখেননি। এর মধ্যে একটা নিষ্ঠুরতা আছে।

আসলে, পরের বার যাওয়ার পর বুড়ি সেই ছবির কথা জিগ্যেসই করেনি। তার কিছু মনে নেই। এর অ্যালজাইমার্স ডিজিজ আছে নির্ঘাত!

হঠাৎ পুকুরের জলে ঝপাং করে একটা জোর শব্দ হল।

লেখক এখনও গল্প শুরু করতে পারেননি, শব্দটায় চমকে উঠলেন। এত জোরে শব্দ কীসের হতে পারে। উঠে গিয়ে তিনি অন্য জানলা দিয়ে দেখতে লাগলেন।

পুকুর ধারে পাশাপাশি তিনটে তালগাছ। জমি কেনার সময় থেকেই এই গাছ তিনটে ছিল। লেখক যে কোনও গাছ কাটার বিরোধী। তাই বাড়ি তৈরির সময় এমনভাবে নকশা করা হয়েছে যাতে গাছ তিনটিকে বাঁচিয়ে রাখা যায়। তারপর পাশ দিয়ে কাটা হয়েছে পুকুর।

এখন গাছ তিনটিকে বেশ মানানসই মনে হয়। ছোটো পুকুরটাকেও অনায়াসেই বলা যায় তাল পুকুর। নজরুলের কবিতা আছে, বাবুদের তালপুকুরে, হাবুদের ডাল কুকুরে, সে কি বাস করল তাড়া...।

অন্য অনেক গাছেরই নারী-পুরুষ ভেদ থাকে না, কিংবা সহজে বোঝা যায় না। কিন্তু তাল গাছ একেবারে মানুষের মতনই। তিনটে গাছের মধ্যে প্রথম একটি গাছে জটা বেরিয়ে এল। অর্থাৎ পুরুষ। কোনওদিনই ফল হবে না। তৃতীয়টাতে পরের বছর ফুল ফুটল। যথা সময়ে পাওয়া গেল অনেক তাল, প্রায় তিরিশ ছত্রিশটা। মাঝখানের গাছটা এখনও চুপচাপ, নারী না পুরুষ বোঝা যাচ্ছে না। এই তিনটে তালগাছ নিয়েও তো গল্প লেখা যায়। মাঝখানের গাছটা যদি ফল ফলাতে শুরু করে। তা হলে দুজন নারী ও একজন পুরুষ। আর এরও যদি জটা বেরিয়ে আসে। তাহলে দুই পুরুষ ও এক নারী। অনায়াসে হতে পারে ত্রিকোণ প্রেমের কাহিনি।

কিন্তু আরম্ভ করা যাবে কীভাবে!

ভাদ্র মাসে তাল নিজে থেকেই খসে পড়ে। এ-বছর এই প্রথম শুরু হল, প্রথমটাই পড়েছে পুকুরে।

লেখক চেঁচিয়ে বললেন, দীনবন্ধু, একটা তাল পড়েছে, তুলে নাও!

তাল পড়ার শব্দে হাঁসগুলো ভয় পেয়ে পুকুরের অন্যদিকে ডাঙায় উঠে পড়েছে।

ওপরে উঠেই হাঁসগুলো ডানার জল ঝেড়ে ফেলার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ঠিক যেমন মেয়েরা স্নান করে উঠে গামছা দিয়ে মাথার চুল ঝাড়ে।

মেয়েদের মাথার চুল ঝাড়ার দৃশ্য লেখক দেখলেন কোথায়? সবাই তো বাথরুমে স্নান করে। গামছা উঠে গেছে, তার বদলে তোয়ালে। মেয়েরা আর বড় চুলও রাখে না। তাঁর ছোট শ্যালিকা ও তার এক বান্ধবী এই পুকুরে স্নান করেছে কয়েকবার। সাঁতার কেটে উঠেই গায়ে তোয়ালে জড়িয়ে চলে গেছে বাড়ির ভেতরে বাথরুমে।

আসলে উপমাটা মনে আসে বাল্যস্মৃতি থেকে। ছেলেবেলায় গ্রামে দেখেছেন, মেয়েরা ব্লাউজ-শায়া না পরে, শুধু শাড়ি জড়িয়ে নামত পুকুরে। বিশেষ করে মনে পড়ে, যমুনা পিসির কথা, লম্বা চুল ছিল পিঠ ছড়ানো, প্রায় লাফিয়ে-লাফিয়ে চুল ঝাড়তেন গামছা দিয়ে, আর কী যেন গান গাইতেন গুনগুনিয়ে। লেখকের বয়েস তখন দশ কিংবা এগারো, আর যমুনা পিসির উনিশ-কুড়ি।

অন্য অনেক মেয়ের কথাই মনে নেই, শুধু যমুনা পিসির চেহারাটাই এখনও স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করে।

সেই যমুনা পিসি এখন কোথায়? ওঃ হো, তিনি তো আত্মহত্যা করেছিলেন গায়ে আগুন লাগিয়ে। তাই নিয়ে গ্রামে কী হইচই।

কেন আত্মহত্যা করেছিলেন! মনে নেই। কিংবা ওই বয়েসি ছেলের সামনে কেউ এ-বিষয়ে আলোচনা করেনি।

ওই যমুনা পিসিকে নিয়ে গল্প লেখা যায় না? একটি কুমারী মেয়ের আত্মহত্যা ঘিরে অনেক রহস্য রোমাঞ্চ থাকে। অনেক কিছু বানানোও যায়। একজন লেখকের পক্ষে এসব খুব সোজা।

তবু কলমে একটা শব্দও লেখা হল না। প্রথম বাক্যটি লেখাই আসল কাজ, তারপর তরতরিয়ে এগিয়ে যাওয়া যায়।

যমুনা পিসির সঙ্গে আর একজনের মুখ মিলে যাচ্ছে। তার নামও যমুনা। কিন্তু যমুনা নামটি এখনও পুরোনো হয়নি। সেই ভাবে প্রমথেশ বড়ুয়ার স্ত্রীর নাম ছিল যমুনা, প্রথম দেবদাস ফিলমের নায়িকা। লেখক এই ফিলম দেখেননি। আজও কোনও-কোনও মেয়ের নাম যমুনা হয়। 'আত্মপ্রকাশ' উপন্যাসের নায়িকার নাম যমুনা ছিল না?

এই মহিলার নাম যমুনা চ্যাটার্জি। নিউক্লিয়ার ফিজিকসের অধ্যাপিকা, বাউলে-তে থাকেন। দেশে আসেন মাঝে-মাঝে। তাঁর স্বামী বিশ্বরূপ লেখকের এক বন্ধুর বন্ধু। গত বছর যমুনা আর অরিন্দম শান্তিনিকেতনে বেড়াতে এসে দুদিন থেকে গেছে এই বাড়িতে।

স্বামী-স্ত্রী দুজনেই খুব সুন্দর, দুজনেই অনেক লেখাপড়া জানে, আবার ঠাট্টা ইয়ার্কি আড্ডাতেও বেশ জমিয়ে তুলতে পারে। তবু দুজনের সম্পর্কের মধ্যে কোথাও যেন একটা সূক্ষ্ম ফাটল আছে তা শুধু লেখকের চোখেই ধরা পড়েছিল।

একদিন বিকেলে ছাদে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল। কাছেই সেই তিনটে তাল গাছ। যমুনা চ্যাটার্জি নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের অত বড় পণ্ডিত হলেও তালগাছের যে নারী ও পুরুষ আলাদা হয়, তা জানে না। শহরের অনেক মেয়েই জানে না। যমুনা চ্যাটার্জি প্রথমে তালগাছকে মনে করেছিল নারকোল গাছ। কচি তাল দেখে সে ভেবেছিল ডাব।

কথায়-কথায় লেখক যখন বললেন, মাঝখানের গাছটার লিঙ্গ নির্ণয় হয়নি, খুবই অবাক হয়ে গেল যমুনা। সে দু-বার জিগ্যেস করল, সত্যিই এরকম বোঝা যায়?

লেখকের স্ত্রী বললেন, দ্যাখো না, ওই যে ওপাশের গাছটা, মাথার কাছ থেকে জটা বেরিয়ে ঝুলছে। ওই লম্বা-লম্বা জিনিসগুলোকে জটা বলে, তাতেই বোঝা যায় পুরুষ। আর এ-পাশে গাছটায় অনেক তাল হয়েছে দেখতেই পাচ্ছ। কাল তোমাদের তালশাঁস খাওয়াব।

যমুনা বলল, আমি সামনের বছরেই এটা দেখবার জন্য আসব। মাঝখানের গাছটা কী হয়, আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে।

একটা তালগাছের লিঙ্গ জানবার জন্য সুদূর আমেরিকা থেকে একজন চলে আসবে, এটা শুনতে অদ্ভুত লাগে!

যমুনার স্বামী জিগ্যেস করল, হঠাৎ তোমার এত কৌতূহল কেন?

যমুনা তার দিকে যেন জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে বলল, ওই তালগাছটাও যদি পুরুষ হয়...আমি দেখতে চাই, ওরা পাশাপাশি কেমন ভাবে থাকে! মানুষের মধ্যে তো, দুজন পুরুষ আর-একজন মেয়ের মধ্যে কোনও সম্পর্ক হলেও কত ঝগড়াঝাঁটি মারামারি, কত ঈর্ষা, কত ভুল বোঝাবুঝি...

লেখকের স্ত্রী হাসতে-হাসতে বললেন, গাছেরা তো ঝগড়া করতে পারে না, মারামারি করাও সম্ভব নয়। তা ছাড়া আলাদা-আলাদা মেয়ে গাছ আর ছেলে গাছ হলেও ওদের মধ্যে তো ঠিক শারীরিক সম্পর্ক হয় না।

যমুনা বলল, একজন মেয়ের যদি দুজন পুরুষের সঙ্গে মানসিক সম্পর্কও হয়, তাও কি মানুষরা সহ্য করতে পারে? তখনই লেখক যমুনা চ্যাটার্জির জীবনে একটা গল্পের গন্ধ পেয়েছিলেন।

সে গল্পও লেখা হয়নি।

কয়েক মাস পরেও লোক মুখে খবর পাওয়া গিয়েছিল, যমুনার সঙ্গে তার স্বামীর বিচ্ছেদ হয়ে গেছে।

লেখক যা ভেবেছিলেন, বিচ্ছেদের কারণ মোটেই তা নয়। বিশ্বরূপ চ্যাটার্জির নাকি যৌন রোগ ধরা পড়েছে। অথচ সব কাহিনি তো জীবন থেকেই নিতে হয়।

দীনবন্ধু পুকুরে নেমে তালটা তুলছে। অতবড় ফল হলেও তাল জলে ডোবে না।

লেখকের স্ত্রী বুড়িটাকে টাকা দিয়ে দিলেও সে এখনও যায়নি। পুকুর ধারে দাঁড়িয়ে সে জিগ্যেস করছে, ওটা কী পড়ল গো? অ্যাঁ? তাল নাকি? অ্যাঁ?

কেউ তার কথার উত্তর দিচ্ছে না। বুড়িটার নিশ্চয়ই লোভ হয়েছে। কিন্তু বছরের প্রথম তাল অন্য কারুকে দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। এরপর অবশ্য অনেক তাল পাড়া-প্রতিবেশিদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে হবে।

আরও একজন বুড়ি, কিছুটা কম বয়েস, গাঁট্টা-গোঁট্টা, বেচারা, মাঝে-মাঝে মুড়ি চিঁড়ের মোয়া আর নাড়ু বিক্রি করতে আসে। মোটেই ভালো খেতে নয়, শুধুই কিটকিটে মিষ্টি। লেখক একদিন একটা মোয়া মুখে দিয়েই ফেলে দিয়েছিলেন, বলেছিলেন, নাঃ মোয়া ফোয়া চলবে না। ওসব ছেলেবেলাতেই ভালো লাগে।

এখানে অল্প বয়সি ছেলেমেয়ে কেউ নেই, মোয়া কে খাবে? কলকাতা থেকে উৎপল এসেছে, সেও মোয়া পছন্দ করে না। মোয়াউলি কিছুতেই বারণ শোনে না। সে নিজেই গুনে-গুনে প্রতিটি দশটা করে সাজিয়ে দেয় শালপাতায়। বলছি আমাদের লাগবে না, লেখকের স্ত্রী এরকম ধমক দিলে সেও রাগের সঙ্গে বলে ওঠে, তোমরা না নিলে আমার চলবে কী করে? ইচ্ছে না হয় পয়সা দিও না!

তখন বাধ্য হয়েই তাকে পনেরো টাকা দিতে হয়। সে আবার পরের দিন আসে।

লেখকের স্ত্রী মাত্র দুটো নাড়ু খান, বাকি সব পড়েই থাকে। দীনবন্ধু ওগুলো খায় না। অন্য কারণে। সে বৈষ্ণব, সব জাতের ছোঁয়া খায় না! বৈষ্ণব ধর্মের এই পরিণতি! চৈতন্যদেব যখন হরিদাসকে কোল দিয়েছিলেন।

লেখক একদিন খেলাচ্ছলে হাঁসদের দিকে দুটো মোয়া ছুড়ে দিয়েছিলেন। ওরা দিব্যি খেয়ে নিল। তবে ভেঙে দিলে সুবিধে হয়। হাঁসেরা সর্বভুক। ওদের খিদেরও শেষ নেই। সারাদিনে যত খাবারই দেওয়া হোক, ওরা ঠিক খেয়ে নেবে। শুধু নারকোল নাড়ুগুলো ওদের ঠিক পছন্দ নয়। ঠুকরে চলে যায়।

বুড়ি এখনও দাঁড়িয়ে আছে, লেখকের স্ত্রী তার কাছে গিয়ে তার হাতে অনেকগুলো নারকোল নাড়ু তুলে দিলেন।

প্রথমটায় সে বুঝতে পারল না, কী জিনিস। মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে গন্ধ শুঁকল, তারপর জিভ ঠেকাল।

তারপর সে মুখ তুলে এমন একটা স্বর্গীয় হাসি দিল, যেন এমন উপহার সে জীবনে পায়নি। নাড়ুগুলোকে বাড়ি থেকে বিদায় করার জন্যই যে তাকে দেওয়া হল, সে প্রশ্ন তোলা এখানে অবান্তর! যে পেয়েছে, তার খুশি হওয়াটাই বড় কথা।

সাইকেল রিকশা চেপে একজন কেউ আসছে। থামল এই বাড়ির গেটের সামনে। লেখক তাকিয়ে রইলেন, যুবকটি অচেনা। কোনও নবীন লেখক কিংবা পত্রিকার সম্পাদক হতে পারে। যুবকটি খুবই রূপবান। লেখক হওয়ার চেয়ে তার পক্ষে সিনেমার নায়ক হইয়াই স্বাভাবিক। সিনেমা না হোক, টিভি সিরিয়ালে।

যুবকটি নামল না, দীনবন্ধুকে কী যেন জিগ্যেস করল, লেখক শুনতে পেলেন না।

সে চলে যাওয়ার পর দীনবন্ধু ওপরের দিকে মুখ তুলে বলল, বোনোবানীর কথা জিগ্যেস করছিল!

লেখক তো জিগ্যেস করেননি, তবু দীনবন্ধু এটা জানাতে গেল কেন? তবে লেখকের কৌতূহল হয়েছিল ঠিকই, সেই তরঙ্গ কি দীনবন্ধুর কাছে পৌঁছে গেছে?

'বন-বানী' নামে কাছেই একটা গেস্ট হাউজ আছে। যমজ মেয়ে দুটিও কি সেখানেই গেছে? এই ছেলেটি যাচ্ছে ওদেরই খোঁজে?

এই রকম এক জোড়া মেয়েকে লেখক এক সময় চিনতেন। অনেক কাল আগের কথা। তখন তিনি উঠতি লেখক এবং বেকার। সারাদিনে টিউশনি করতেন তিন জায়গায়। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে এক বাড়িতে দুটি যমজ মেয়েকে পড়িয়েছিলেন মাস ছয়েক। বড়োলোকের বাড়ি, কিন্তু সংসারের লোকজন খুব কম। বাবা-মা অনেক সময়ই থাকে না। আজকের মেয়েদুটির চেয়ে ওদের বয়েস ছিল কিছটা কম, দুজনেই সবেমাত্র কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে ভরতি হয়েছে!

ফুটফুটে দুটি মেয়ে, হুবহু একরকম মুখ। ওদের নাম ছিল সোনা আর মণি। কিন্তু কার নাম কোনটা তা বোঝা অসম্ভব। ওদের মা-ও চিনতে পারতেন কিনা কে জানে। আলাদা করার জন্য এক জনের চুলে নীল রঙের, আর একজনের সোনালি ফিতে বাঁধা থাকত। ভুল হত তবু।

এই ভুল নিয়ে নানারকম মজা হত রোজই। শুধু একদিনই অন্যরকম। দুই বোনের মধ্যে একজন ছাড়া সেই দিনটির কথা অন্য কেউ জানে না। ওদের বাবার বোম্বাইতে বদলি হওয়ার জন্য ছ'মাস বাদে এই টিউশনিটা চলে যায় লেখকের।

সে আসলে গৃহশিক্ষক হিসেবে লেখকের বেশ সুনাম হয়েছিল। মন দিয়ে পড়াতেন তো বটেই। কক্ষনো কামাই করতেন না। ঝড়-বাদল স্ট্রাইক-হাঙ্গামা, তার মধ্য দিয়েও হেঁটে আসতেন।

সেদিনটাও ছিল দুর্যোগের দিন। সেদিন আকাশ কালো, বিকেল থেকে মাঝে-মাঝে মেঘ ডাকছে। ঠিক সাড়ে ছ'টায় লেখক গিয়ে উপস্থিত হলেন সে-বাড়ির দোতলার ফ্ল্যাটের দরজায়। গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতন সেদিন আবার চলছে লোডশেডিং। কলিংবেল বাজছে না, উঠতি লেখক দরজায় টকটক শব্দ করলেন। অন্যদিন দরজা খুলে দেয় একজন বুড়ো কাজের লোক, সেদিন দরজা খুলল, দুজন ছাত্রীর মধ্যে একজন।

বসবার ঘরটা অন্ধকার। একটা মোমও জ্বালা হয়নি।

লেখকের পকেটে সিগারেট দেশলাই। তিনি একটা কাঠি জ্বেলে বললেন, বাতি-টাতি কিছু নেই?

মেয়েটি বলল, আজ আর পড়া হবে না।

লেখক বললেন, অন্ধকারে আর কী করে পড়া হবে! আমি মিনিট পনেরো অপেক্ষা করতে পারি, যদি তার মধ্যে আলো আসে।

মেয়েটি বলল, অন্ধকারে বসে থাকবেন? রঘুটা বাজার করতে গেল, এখনও ফেরার নাম নেই। মোম-টোম কোথায় রাখে জানি না!

লেখক বললেন, তা হলে আমি চলে যাব?

মেয়েটি বলল, একটু দাঁড়ান, আমি রান্না ঘরে একবার খুঁজে দেখি। আপনার দেশলাইটা দিন তো!

ঠিক তখনই বিরাট আওয়াজ করে একটা বাজ পড়ল। মেয়েটি ভয় পেয়ে দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরল লেখককে।

এরকম আওয়াজে অনেক পুরুষেরও বুক কেঁপে ওঠে। মেয়েরা তো ভয় পাবেই। লেখক বললেন, খুব কাছেই বোধহয় বাজ পড়েছে, যাক ভয়ের কিছু নেই। দ্যাখো, যদি মোমবাতি—

মেয়েটি কিন্তু আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করল না। এবং লেখককে দারুণ চমকে দিয়ে বলল, আপনি আমাকে চুমু খাবেন না?

লেখক বললেন, যাঃ, ও আবার কী কথা!

মেয়েটি বলল, কেন, সিনেমায় যে দেখা যায়, এই সময় চুমু খেতে হয়!

লেখক বললেন, সিনেমায়...সে তো নায়ক নায়িকারা...আমি তো

মেয়েটি বলল, তাতে কী হয়েছে? আমায় কেউ এখনও চুম খায়নি। বাড়িতে এখন কেউ নেই।

লেখক জিগ্যেস করলেন, তোমার বোন কোথায়?

মেয়েটি বলল, সে বাথরুমে ঢুকেছে। সহজে বেরুবে না।

তারপর সে নিজেই লেখকের মুখের কাছে নিয়ে এল স্বর্গের পরীদের মতন নিজের নরম অধোরষ্ঠ।

লেখক শুকদেব নন। তিনি স্বাস্থ্যবান, সূক্ষ্ম অনুভূতিপরায়ণ যুবক। ছাত্রীদের সঙ্গে তিনি কখনও প্রেম করার চেষ্টা করেননি। কিন্তু কোনও মেয়ে নিজে থেকে ঠোঁট বাড়িয়ে দিয়েছে, এ-অভিজ্ঞতা তাঁর আগে হয়নি। তবু অতিকষ্টে নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করে তিনি বললেন, না, না, এটা ঠিক নয়। তুমি কোনজন!

মেয়েটি খিলখিল করে হেসে বলল, কেন?

ওই হাসিতে সংযমের বাঁধ ভেঙে গেল। অপূর্ব মিষ্টি সেই হাসিটি যে ঠোঁটে লেগে আছে, সে ঠোঁট তো অমৃত।

চুম্বনটি বেশ দীর্ঘস্থায়ীই হল। মেয়েটি কিছুতেই ছাড়তে চাইছে না। হঠাৎ এক সময় আলো জ্বলে উঠল, তখনই মেয়েটি ছিটকে সরে গিয়ে চলে গেল ভেতরে।

খানিক পরে তারা দু-বোন ফিরে এল একসঙ্গে। কোনও একজনেরও চোখে সামান্য ইঙ্গিত নেই, ঠিক অন্যদিনের মতন। লেখকের তখনও বুক কাঁপছে।

তারপর আরও আড়াইমাস পড়িয়েছিলেন তিনি সে বাড়িতে। কোনওদিন এক মুহূর্তের জন্যও তিনি বুঝতে পারেননি, কোন মেয়েটির ঠোঁটের সঙ্গে মিলেছিল তাঁর ঠোঁট।

ওরা বোম্বাই চলে যাওয়ার পর আর জীবনে কখনও ওদের সঙ্গে দেখা হয়নি। ব্যাপারটা মধুর স্মৃতি হয়ে ছিল অনেক দিন, তারপর আস্তে-আস্তে ফিকে হয়ে যাচ্ছিল। আজ

আবার মনে পড়ল।

হাঁসগুলো আবার ডেকে উঠল একসঙ্গে। কোনও কারণ নেই, তবু কেন হঠাৎ-হঠাৎ ডেকে ওঠে? সাপ-টাপ দেখেছে নাকি। বর্ষার সময় পুকুরে অনেক ঢোঁড়া সাপ আসে। হাঁসরা সাপকে ভয় পায় না। হাঁসেদের সারা গায়ে পালক। সাপ ছোবল মারবে কোথায়? প্রকৃতিই ওদের এই আত্মরক্ষার উপায় দিয়েছে।

এক লাইনও গল্প লেখার নাম নেই, লেখক হাঁস-টাঁস নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিল। সম্পাদক তাড়া দিচ্ছেন রোজ। সারা পৃথিবীতেই গল্প ছড়িয়ে আছে, চোখের সামনেও ঘুরে বেড়ায় অনেক গল্প, শুধু ঠিক জায়গায় ধরা দরকার। কিছুতেই যে তিনি আরম্ভ করতে পারছেন না।

লেখকের স্ত্রী তলা থেকে বললেন, অনেক বেলা হল, তুমি চান করতে যাবে না?

চড়াৎ করে বিদ্যুৎ চিড়ে গেল আকাশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। হাওয়ার বেগ বেড়েছে, মনে হয় ঝড় আসন্ন। শিগগির বৃষ্টি আসবে।

লেখক ঠিক করলেন, যদি অনেকক্ষণ জোর বৃষ্টি হয়, তা হলে আজ আর স্নান করবেন না। আজ রেইনি ডে। খাওয়ার পর আর লিখতে বসতে ইচ্ছে করবে না।

গেটের বাইরে কলকণ্ঠ শোনা গেল। সেই দুটি মেয়ে আর রূপবান যুবকটি এক সঙ্গে ফিরে যাচ্ছে। এ-বাড়ির সামনে দাঁড়াল।

একটি মেয়ে গলা তুলে বলল, আমরা ভেতরে গিয়ে পুকুরটা দেখতে পারি?

দীনবন্ধুর বদলে এখন উৎপল একটা নিম গাছ থেকে পাতা পাড়ছে। সে বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আসুন না।

দোতলার ঘরে বসা লেখককে ওদের দেখতে পাওয়ার কথা নয়। ওরা লেখকের সঙ্গে দেখা করতেও আসেনি।

ভেতরে ঢুকতে-ঢুকতে অন্য মেয়েটি বলল, কী সুন্দর হাঁসগুলো দ্যাখ!

বিদ্যুৎ চমকের মতনই লেখকের মনে হল, এই মেয়ে দুটি কি সেই সোনা আর মণি? এখন লেখক ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালে ওরা নিশ্চয়ই খুব চমকে উঠবে।

ওই সিনেমার স্টারের মতন ছেলেটি ওই দুজনের মধ্যেকার প্রেমিক?

লেখক কোন মেয়েটিকে চুমু খেয়েছিলেন, তা আজও জানেন না। কিন্তু মেয়েটি তো জানে। এই ছেলেটি তার প্রেমিক হলে সে কি তাকে প্রথম চুম্বনের অভিজ্ঞতার কথা বলে দিয়েছে?

তারপরই লেখক মনে-মনে হাসলেন। যাঃ, এই মেয়েদুটি সোনা আর মণি কী করে হবে? সে তো বহুবছর আগেকার কথা। এতদিনে সোনা আর মণি গিন্নিবান্নি হয়ে গেছে, এমনকি ওদের নাতি-নাতনি হয়ে যাওয়াও আশ্চর্য কিছু নয়।

এই মেয়ে দুটি খুব সম্ভবত যমজ বোনও নয়। খুবই চেহারায় মিল আছে, কিন্তু বোধহয় বয়েসের তফাতও আছে দু-তিন বছর।

তবু লেখক এর মধ্যে একটা গল্পের গন্ধ পেয়ে গেলেন। যদি এতগুলি বছর সঙ্কুচিত করে চার-পাঁচ বছরে আনা যায়?

একজন গৃহশিক্ষক এক ঝড় বাদলের সন্ধ্যায় দুটি যমজ ছাত্রীর মধ্যে একজনকে একবার চুমু খেয়েছিল, এটা নিয়ে কোনও গল্প হয় না।

কিন্তু চার-পাঁচ বছর পর যদি মেয়েদুটির সঙ্গে আবার হঠাৎ লেখকের দেখা হয়ে যায়, সঙ্গে ওদের একজনের প্রেমিক, তা হলে মনে-মনে একটা খেলা চলতে পারে।

লেখক পেয়ে গেছেন গল্পের প্রথম লাইন।

তিনি লিখলেন, সেদিনও ছিল এক বজ্র-বিদ্যুতের সন্ধ্যা। সারা শহর অন্ধকার...



শ্মশানবন্ধু

নাইট ডিউটির সময়টাতেই সবচেয়ে অসুবিধে হয়। দিনেরবেলা এখন পর্যন্ত তেমন কিছু গণ্ডগোল হয়নি। একটু-আধটু অপমান সহ্য করতে হয়, তা এমন কিছু নয়। অপমান গায়ে না মেখে বালির মতন ঝেড়ে ফেললেই হল।

সকালের ডিউটি ন'টা থেকে তিনটে পর্যন্ত। ঠিক তিনটের সময় বাড়ি ফেরার ট্রাম ধরে অমল। রাস্তায় ট্রাফিকের গোলযোগ না থাকলে পৌনে চারটের মধ্যে বাড়ি পৌঁছে যায়, বেহালার ট্রাম স্টপ থেকে মাত্র দশ-পা দূরে বাড়ি। অমলের পকেটে চাবি রাখতে হয়, এসময় বাড়িতে আর কেউ থাকে না, অমলকেই দরজা খুলে ঢুকতে হয়।

মায়ের ফিরতে-ফিরতে সাড়ে চারটে বেজে যায়, তিনি এসে চায়ের জল চাপান। মাঝখানের এই সময়টুকুই টেলিফোনের পক্ষে আদর্শ। মিলিকে সে বলে দিয়েছে, অফিসে যাতে কোনও ক্রমেই ফোন না করে, এই ব্যাপারে অফিসে খুব কড়াকড়ি চলছে। ব্যক্তিগত ফোন অপছন্দ করা হয়, ফোন রিসিভ করলেও লাইন আটকে রাখা বরদাস্ত করা হয় না। অমল নিজেই ফোন করবে। এখন বাড়িতে শুয়ে-শুয়ে বেশ আরামে গল্প করা যায় মিলির সঙ্গে। একটু-আধটু অসভ্য কথাও বলা যেতে পারে।

মিলি প্রায় প্রত্যেকদিনই জিগ্যেস করে, আজ অফিসে কী হল? সেরকম কোনও খবর এসেছে?

সকাল বা দুপুরে কোনও জবর খবর আসে না। বড়-বড় ঘটনাগুলো ঘটতে থাকে সন্ধের পর। মিলির ধারণা, খবরের কাগজের লোকেরা অনেক কিছুই আগেভাগে জেনে যায়, তাই সে-ও জেনে নিতে চায়।

এই সময়টায় চতুর্দিকে গাদাখানেক বই ছড়িয়ে খাটের ওপর বসে থাকে মিলি, আর এক মাসের মধ্যে তাকে পি এইচ ডি-র থিসিস জমা দিতে হবে। সেটা লেখাও শেষ হয়ে গেছে, এখন কারেকশান চলছে, তারপর টাইপ করা, কপি মিলিয়ে দেখা, তাই মিলি বাড়ি থেকে বেরুতেই পারে না। অফিসে একদিন ছুটি নিয়ে অমল আড্ডা দিতে গিয়েছিল, মোটেই আড্ডা জমেনি, মিলির মুখে এখন শুধু তার থিসিসের কথাই ঘুরেফিরে আসে। অত পড়াশুনোর কথা অমলের ভালো লাগে না। জ্ঞানের কথায় প্রেম আড়ালে চলে যায়।

বিকেলের ডিউটি পরের সপ্তাহে তিনটে থেকে ন'টা। ফিরতে-ফিরতে রাত এগারোটা তো হতেই পারে। সর্বক্ষণই যদি অফিসের কাজ করবে, তা হলে সে বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গে আড্ডা দেবে কখন? অমলের বাবারও একটু রাত করে বাড়ি ফেরা স্বভাব। তিনি এক-একদিন তাঁর এক বন্ধুর বাড়ি থেকে মদ্যপান করে আসেন। তবে বেচাল হন না কোনওদিন।

তার পরের সপ্তাহ থেকে শুরু হয় নাইট ডিউটি। ন'টা থেকে রাত তিনটে। এর মধ্যে ঘুমোবার কোনও উপায় নেই। অবশ্য তিনটে পর্যন্ত থাকতে হয় না। দুটো-আড়াইটের মধ্যেই পেজ মেকআপ হয়ে যায়, তারপর বাড়ি ফেরা। আগেকার দিনে নাকি নাইট ডিউটির পর সবাই অফিসেই শুয়ে পড়ত, এখন আর সে নিয়ম নেই, অফিসের গাড়ি সেই নিশুতি রাতে সবাইকে বাড়ি পৌঁছে দেয়। অত রাতে বাড়ির লোককে খুলে দিতে হয় দরজা।

অমলের কাছে অবশ্য চাবি থাকে।

পরশু রাতে রাত তিনটের সময়েও মা জেগে ছিলেন। তাঁর উপন্যাস পড়ার নেশা। এক

একটা বই ধরার পর শেষ না হলে ছাড়েন না। রাত্তির ছাড়া তাঁর পড়াশুনোর আর সময়ও তো নেই। তাঁর স্বামীর মতন তিনিও চাকরি করেন, তবু সংসারের সব কাজ তো তাঁকেই সামলাতে হয়।

উপন্যাস পড়তে-পড়তেও মাঝে-মাঝে ঘড়ির দিকে চোখ রাখছিলেন মা। অমল জানে না। অন্যান্য রাতেও ছেলে বাড়ি ফেরার সময় একবার তিনি জেগে ওঠেন। তাঁর ঘুম খুব পাতলা।

সেদিন তিনি রাত তিনটের সময় গাড়ি থামার শব্দ পেয়ে দাঁড়িয়েছিলেন জানলার পাশে।

অমল যথাসম্ভব কম শব্দ করে দরজা খোলে। তারপর পা টিপে-টিপে নিজের ঘরে চলে যায়। দিদির বিয়ের পর সে একটা নিজস্ব ঘর পেয়েছে। শিয়রের কাছে রাখা থাকে জলের বোতল।

মা এসে বললেন, হ্যাঁ রে খোকা, তুই আজ ট্যাক্সিতে এলি কেন? অফিসের গাড়ি কী হল?

হঠাৎ কেঁপে উঠল অমল।

মায়ের সামনে মিথ্যে কথা বলতে হলে সে সরাসরি চোখের দিকে তাকায় না। মুখটা অন্য দিকে ফিরিয়ে রাখে।

তারপরেই সে বলল, রাত্তিরের দিকে যে গাড়িগুলো দেয়, ভাড়াগাড়ি তো, সব লঝঝড়ে, ড্রাইভারগুলো শেষ রাত্তিরে এত জোরে চালায়, আজ গাড়িটা একটা ল্যাম্প পোস্টে ধাক্কা মারল—

মা নিদারুণ উৎকণ্ঠার সঙ্গে বললেন, অ্যাঁ! কোথায় লেগেছে তোর!

অমল বলল, ফরচুনেটলি আমার কোথাও লাগেনি, ড্রাইভারটিরই কপাল ঠুকে গেছে, কিন্তু গাড়ি আর স্টার্ট নিল না। পরিতোষ ছিল আমার সঙ্গে বাধ্য হয়ে একটা ট্যাক্সি নিলাম, পরিতোষ আমাকে নামিয়ে দিয়ে গেল—।

মা তবু কাছে এসে অমলকে ভালো করে দেখলেন, হাত দিলেন তার মাথায়।

অমল বলল, আমার লাগেনি বলছি তো!

আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ার পর অমল বুঝতে পারল, তার গল্পটার বেশ বড় একটা খুঁত আছে। ট্যাক্সি থেকে নেমে সে ভাড়া মিটিয়েছে, মা কি সেটা দেখেননি! পরিতোষ নামিয়ে দিয়ে গেল বলাটা ঠিক হয়নি।

দুদিন বাদে, বিকেল পাঁচটায় অমল দাঁড়িয়ে আছে বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামের কাছে, কোথায় যাবে ঠিক করতে পারছে না, হঠাৎ একটা গাড়ি এসে থামল তার সামনে।

জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে কৃষ্ণরূপ বলল, কী রে! এখানে দাঁড়িয়ে কী করছিস?

অমল বলল, আমার মন বলছিল, ঠিক পাঁচটার সময় কৃষ্ণরূপ ঘোষ এই রাস্তা দিয়ে যাবে। তাই অপেক্ষা করাছিলাম, তোর জন্য।

কৃষ্ণরূপ বলল, তাই বুঝি? তা হলে উঠে পড় গাড়িতে!

কৃষ্ণরূপ কাজ করে একটা বিজ্ঞাপন সংস্থায়, এটা তার অফিসের গাড়ি। সারাদিন তাকে অনেক জায়গায় ঘুরতে হয়।

গাড়িটা আবার চলতে শুরু করলে কৃষ্ণরূপ বলল, এখন অফিসে ফিরব, খানিকক্ষণ কাজ আছে। তুই একটু বসবি। তারপর দুজনে বেরুব। ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে একটা বাউল গানের ফাংশান আছে, তোকে নিয়ে যাব সেখানে। যাবি তো?

অমল বলল, হ্যাঁ, যেতে পারি। আমাকে আজ আর অফিসে যেতে হবে না। আজ ছুটি নিয়েছি। এখন বিকেলের ডিউটি চলছে। বিকেলগুলো অফিসের বদ্ধ ঘরে কেটে যায়। বাইরে ঝড়বৃষ্টি হলেও টের পাই না।

কৃষ্ণরূপ জিগ্যেস করল, ক'দিনের ছুটি নিয়েছিস?

অমল বলল, শুধু আজই। বেশি ছুটি দিতে চায় না। বিশ্বদাকে তো তুই চিনিস, একটু চান্স পেলেই গলাবাজি করে।

কৃষ্ণরূপ একটুক্ষণ ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল বন্ধুর দিকে।

অফিসে পৌঁছে নিজের টেবিলে বসে কৃষ্ণরূপ বলল, নীচের একটা ক্যান্টিনে ভালো ফ্রেঞ্চ টোস্ট করে, অর্ডার দিয়ে দিচ্ছি, চায়ের সঙ্গে খেয়ে নে। কাগজটাগজ পড়। আমাকে একবার ম্যানেজারের ঘরে যেতে হবে। মিনিট পনেরো লাগবে।

কৃষ্ণরূপ উঠে যাওয়ার পর অমলের মনটা খচখচ করতে লাগল। কৃষ্ণরূপ ওভাবে তাকাল কেন!

কৃষ্ণরূপের ফিরতে-ফিরতে আধ ঘণ্টা কেটে গেল।

টেবিলের কাগজপত্র গুছোতে-গুছোতে সে অমলকে জিগ্যেস করল, এতক্ষণ ভেবে-ভেবে কী ঠিক করলি?

অমল বলল, কী ঠিক করলাম মানে? বাউল গান শুনতে যাব তো বলেইছি।

—তুই আমাকে ঠিক বন্ধু বলে মনে করিস না, তাই না?

—কেন?

—বন্ধুর কাছে কোনও বন্ধু যদি এসব কথা গোপন করে, তাহলে সে আর বন্ধু কীসের?

—এসব কথার মানে।

—ন্যাকা সাজিস না, অমল, ন্যাকা সাজিস না। কাল তুই বিকেলে শুভ্রাংশুর অফিসে আড্ডা দিতে গিয়েছিলি। ছুটি নিসনি। দিন তিনেক আগে তোকে নন্দনের সিনেমা হলে দেখা গেছে। ছুটি নিয়েছিলি? দ্যাখ, আমরা অ্যাড এজেন্সির লোক, সব খবরের কাগজের নাড়িনক্ষত্রের খবর রাখি। তোর যে চাকরি চলে গেছে, সেটা জানব না!

অমল ফ্যাকাসে মুখে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল বন্ধুর দিকে। তারপরই সামলে নিয়ে বলল, তুই আর কারওকে বলিসনি তো? এখন কিছুতেই জানানো চলবে না। কিছুতেই না!

কৃষ্ণরূপ বলল, এ-খবর কখনও বেশিদিন চাপা দিয়ে রাখা যায়! বাড়িতেও জানাসনি?

—না।

—আর মিলিকে?

—না। কিছুতেই না। এর মধ্যে আমাকে আর একটা চাকরি জোগাড় করতেই হবে।

—অত সহজে নয়। চাকরি থাকতে-থাকতে অন্য চাকরিতে যাওয়া যায়। একবার চাকরি গেলে অন্য কেউ চান্স দিতে চায় না। মনে হচ্ছে, কিছু গণ্ডগোল আছে। এমনিতেই এখন বাজার খুব টাইট! তুই বিশ্ব দাশগুপ্তকে চটালি কী করে? কাজে ফাঁকি দিয়েছিস?

—মোটেই না। আমার কাজে কেউ খুঁত ধরতে পারবে না। বিশ্বদারও কোনও ক্ষতি করিনি। একদিন শুধু...জানিস তো বিশ্বদা কীরকম ছটফটে স্বভাবের, সব সময় অফিসময় ঘুরে বেড়ায় আর সবাইকে বকাবকি করে, আমি ক্যান্টিনে বসে চুপিচুপি শুভ্রকে বলেছিলাম, বিশ্বদার গণ্ডগোলটা কী জানিস? নিশ্চয়ই খুব শুকনো লঙ্কার ঝাল খায়, সেই জন্যই ওর গুহ্যদ্বারে খুব জ্বালা করে, আর তাই নিজের চেয়ারে পেছন ঠেকিয়ে বেশিক্ষণ বসতে পারে না। সেই কথাটাই কেউ বিশ্বদার কানে তুলে দিয়েছে। এটা তো একটা ইয়ার্কি। এ-জন্য কারও চাকরি যায়!

—বিশ্ব দাশগুপ্ত বদমেজাজি লোক। কেন এসব বাজে ইয়ার্কি করতে যাস?

—আড়ালে কেউ একটু ইয়ার্কি ঠাট্টা করতে পারবে না!

কৃষ্ণরূপ বলল, তুই মিলান কুন্দেরার জোকস নামে একটা উপন্যাস পড়িসনি? পোস্টকার্ডে একজন ছাত্র তার বন্ধবীকে একটা যৌন ইয়ার্কি করেছিল, সোসালিস্ট কান্ট্রির এক দাদার হাতে সেই পোস্টকার্ড পড়ে, একটা নিরীহ ঠাট্টার জন্য প্রেমিক-প্রেমিকা দুজনের জীবনই দুর্বিষহ হয়ে যায়।

একটু থেমে কৃষ্ণরূপ বলেছিল, আমাদের দেশটা সে রকম নয়। শুধু এই জন্য কারও চাকরি খেয়ে দেওয়া এই বাজারে খুবই ইনহিউম্যান ব্যাপার। হয়তো এটাই একমাত্র কারণ নয়। সব খবরের কাগজেই এখন ছাঁটাই হচ্ছে। কমপিউটারের জন্য তিনজনের কাজ একজন করতে পারে। এখন

কেউ পার্মানেন্ট পোস্ট পায় না, সব কন্ট্র্যাক্ট।

অমলের চাকরি গেছে ঠিক চব্বিশ দিন আগে। বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো নোটিস ধরিয়ে দেওয়া হল। তাকে তিন মাসের মাইনে দিয়ে দেওয়া হবে, পরের দিন থেকেই তার আর অফিসে আসার দরকার নেই।

চিঠিখানা সে প্রথমে বিশ্ব দাশগুপ্তকেই দেখিয়ে অসহায়ভাবে জিগ্যেস করেছিল, এটা কী হল? আমি কী দোষ করেছি?

বিশ্ব দাশগুপ্ত গম্ভীরভাবে বলেছিল, এটা কোনও দোষ-গুণের প্রশ্ন নয়। কোম্পানির সিদ্ধান্ত। আমার কোনও হাত নেই। আরও হয়তো কয়েকজনকে চলে যেতে হবে।

বিশ্ব দাশগুপ্তর কথাটা পুরোপুরি সত্যি নয়। একটা আড়ালের ইয়ার্কি শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে সে অমলের চাকরি খায়নি, তা ঠিক। মালিকদেরই সিদ্ধান্ত। কিন্তু মালিকরা তো অমলের মতন সাধারণ কর্মীদের চেনে না। কাকে-কাকে ছাঁটাই করা হবে, সে ব্যাপারে বিশ্ব দাশগুপ্তর কাছেই পরামর্শ চেয়েছে। বিশ্ব দাশগুপ্ত প্রথমেই অমলের নাম পাঠালেন কেন?

বাড়িতে জানাতে পারেনি, মিলি বা অন্য বন্ধুদের জানাতে পারেনি। অমল প্রতিদিন ডিউটির হিসেব করে বাড়ি থেকে বেরোয়, ঠিক সময়ে ফিরে আসে। রাস্তায়-রাস্তায় ঘোরে, পার্কে বা ময়দানে শুয়ে থাকে। চেনা রেস্তোরাঁয় যায় না। ন্যাশনাল লাইব্রেরির ধার ঘেঁষে না, কারণ ওখানে মিলি যায় প্রায়ই।

আর-একটা চাকরি তাকে যেমন করে হোক জোগাড় করতেই হবে। কিন্তু কী করে তা সম্ভব? বন্ধুবান্ধবদের কাছে সে দয়া চাইতে পারে না। শুধু অ্যাপ্লিকেশান পাঠালে আজকাল কোথাও চাকরি হয়!

এখন মে মাস, দুপুরবেলা অসহ্য গরমের মধ্যেও তাকে মাঠেঘাটে থাকতে হয়। জুলাই মাসের সাত তারিখে মিলির সঙ্গে তার বিয়ের দিন ঠিক হয়ে আছে। তখন বৃষ্টি নামবে।

মিলির সঙ্গে কথা হয় শুধু টেলিফোনে। মিলির সামনাসামনি যেতে তার ভয় হয়, যদি সে বুঝে ফেলে? মেয়েরা অনুভূতি দিয়ে অনেক কিছু বোঝে। মা বোধহয় প্রায় বুঝে ফেলেছেন, মুখে কিছু বলেননি এখনও।

মা আর বাবা দুজনেই এখনও চাকরি করেন। অমলের উপার্জন না থাকলেও এক্ষুনি খাওয়াপরার সমস্যা নেই। দেশে তো কত বেকার ছেলে, বেকার থাকা এমন কী লজ্জার ব্যাপার! কিন্তু বেকার থাকা আর চাকরি খাওয়ার অনেক তফাত আছে। সবাই ধরে নেবে, সে অযোগ্য।

সকাল দুপুর-বিকেল তবু কেটে যায়, কিন্তু রাত আড়াইটে-তিনটে পর্যন্ত সে কোথায় সময় কাটাবে? এই সময় রাস্তায় রাস্তায় ঘোরাও নিরাপদ নয়, মাঠে শুয়ে থাকা নিরাপদ নয়। কোনও বন্ধুর বাড়িতেও থাকা যায় না। একদিন সে আবিষ্কার করল, একমাত্র শ্মশানগুলিই সারারাত জাগ্রত, সবসময়ই মানুষ আসে, সেখানে এক জায়গায় বসে থাকলে কেউ কিছু প্রশ্ন করে না।

একদিন সিনেমায় একটা নাইট শো দেখতে গিয়ে সে প্রায় ধরা পড়ে যাচ্ছিল আর কি! মিলি তার মা-মাসিদের একটা বড়ো দলের সঙ্গে এসেছে। অমলের খুব কাছেই ওদের সিট। অমল তাড়াতাড়ি মাথা নীচু করে ফেলেছে। তারপর অন্ধকারের মধ্যে সরে পড়েছে চুপিচুপি!

দেখা হলে কী হত? সে কি একদিন অফিস থেকে বেরিয়ে বিখ্যাত কোনও সিনেমা দেখতে আসতে পারে না? সেটা তো অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু প্রবল এক লজ্জা তাকে ছেয়ে ফেলে।

সাতই জুলাইয়ের আগে অন্য কোনও চাকরি জোগাড় করতে না পারলে কী হবে? এখনও পর্যন্ত কোনও আশা পাওয়া যায়নি।

শ্মশানের কাছাকাছি দোকানগুলোও খোলা থাকে সারারাত। সিগারেট পাওয়া যায়, চা কিংবা ঘুগনি-আলুদরদম খাওয়া যায়। কত রকম মানুষ আসে।

উত্তর কলকাতার শ্মশানগুলোতেও সে যায়। ওদিককার শ্মশানের পরিবেশ তার বেশি পছন্দ

হয়, কারণ, পাশেই গঙ্গা। সিঁড়িতে বসে নদী দেখতে-দেখতে দিব্যি সময় কাটে। তবে ট্যাক্সি ভাড়া বেশি পড়ে।

এর মধ্যে একদিন শ্মশানে বসে থাকতে-থাকতে এমন ঘুম এসে গিয়েছিল যে জেগে উঠেছে ভোরবেলা। বাড়ি ফিরেছে ট্রামে। সেদিন তার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। শেষ রাতে ট্যাক্সিতে ফিরলে মা আবার দেখে ফেলতে পারেন, তাই সে মাকে বলল, এখন থেকে সকাল হলেই ফিরব, অফিসে থেকে যাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে।

কেওড়াতলা শ্মশানে একদিন এক কাণ্ড হল।

রাত সাড়ে এগারোটা, এখনও অনেকটা সময় কাটাতে হবে। আজ এত ভিড় যে কোথাও শুয়ে পড়বারও জায়গা নেই। খাট সমেত শবদেহগুলি নামিয়ে রাখা হচ্ছে, একেবারে লাইন পড়ে গেছে।

নতুন একটা শববাহকের দল আসছে, পাশ দিয়ে অমল যাচ্ছে সিগারেট কিনতে। হঠাৎ সে একেবারে বিশ্ব দাশগুপ্তর মুখোমুখি। সে ভয়ে একটু কেঁপে উঠল।

বিশ্ব দাশগুপ্ত খানিকটা বিস্মিতভাবে বললেন, অমল? তোমার...কেউ গেছেন?

অমল বলল, না। আমি এমনিই...

বিশ্ব দাশগুপ্ত যেন উত্তরটা শুনতে পেলেন না। আবার বললেন, তুমি আমার মায়ের খবর পেয়ে এসেছ? তোমাকে কে বলল?

কয়েক মুহূর্ত মাত্র দ্বিধা করে অমল বলল, সন্ধেবেলা আপনাদের পাড়ায় আমার এক বন্ধু থাকে, তার কাছে গিয়েছিলাম, তখনই শুনলাম।

বিশ্ব দাশগুপ্ত বললেন, ঠিক পাঁচটা দশ মিনিটে। ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক। ডাক্তার ডাকারও সময় পাওয়া যায়নি। আমি তখন অফিসে—

অমল বলল, আপনাদের বাড়িতে দুবার গেছি, মাসিমা কত যত্ন করেছেন। আমার মতন একজন সামান্য লোককেও গত বছর জোর করে পায়েস খাওয়ালেন। মাথায় হাত রাখলেন। তাই খবরটা শুনে ইচ্ছে হয়েছিল, মাসিমাকে শেষ প্রণাম করে আসি। আপনি যদি রাগ করেন, সেই ভয়ে বাড়িতে ঢুকিনি।

বিশ্ব দাশগুপ্ত উদাসীনভাবে বললেন, তুমি বাড়িতে এলে কি আমি...এখানে কতক্ষণ অপেক্ষা করছ?

অমল কিছু বলার আগেই তিনি ধরা গলায় বললেন, অফিস-অফিস করে তো সর্বক্ষণ...বাড়িতে কতটুকু সময়ই বা থাকি, মা'র সঙ্গে দিনের-পর-দিন একটা কথাও হয়নি, ভেতরে-ভেতরে যে এতটা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, কক্ষনো মুখ ফুটে বলেননি, আমি দু-সপ্তাহের মধ্যে এক দিনও মায়ের পাশে গিয়ে বসিনি...তুমি দু-বার মাত্র মাকে দেখেছ, তার জন্য এই শ্মশানে, এত রাতে...

হঠাৎ অমন জাঁদরেল মানুষটি কেঁদে উঠলেন শিশুর মতন। অমল হাত বাড়িয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দিতে গেলে তিনি অমলের কাঁধে মাথা রাখলেন। তাঁর কয়েকজন সঙ্গী অবাক হয়ে দেখতে লাগল এই দৃশ্য।

কাঁদতে-কাঁদতে বিশ্ব দাশগুপ্ত এলোমেলোভাবে বলতে লাগলেন, মাকে তো আমি ভুলেই গিয়েছিলাম, যদিও এক বাড়িতে...একটা আয়া রেখে দিয়ে, শেষ সময় মা আমার নাম ধরে ডেকেছিল, তখন আমি অফিসে...অমল, তোমার জন্য আমি কিছুই করিনি, কতটুকুই বা আমার ক্ষমতা...তুমি হয়তো ভেবেছ...

আস্তে-আস্তে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে অমল বলল, বিশ্বদা, আমি কি একবার মাসিমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে পারি?



রূপকথার রাজারানি

এক দেশে এক রাজা ছিল, তার একটা চোখ পাথরের।

সেই রাজার তিন রানি, একজন জাদুবিদ্যা জানে, একজন সারাদিন ঘুমোয় আর সারারাত জাগে, সবচেয়ে ছোট রানির একটাও দাঁত নেই। জন্ম থেকেই তার দাঁত ওঠেনি, তাই সে চোখ দিয়ে হাসে।

যে রানি জাদু জানে, তার নাম আশ্চর্যময়ী।

আর নিশাচরী রানির নাম চাঁদনি।

ছোটরানির নাম ফুটফুটি, এটাই তার ভালো নাম আর ডাক নাম।

রাজার নাম রাজচন্দ্র, তাই শুধু রাজা বললেই চলে। এই রাজাটি খুব চিনেবাদাম ভালোবাসে। তাই তার রাজ পোশাকের দু-পকেট ভরতি চিনেবাদাম থাকে সবসময়।

আশ্চর্যময়ী ইচ্ছেমতন ঝড়-বৃষ্টি ডেকে আনতে পারে। প্রাসাদের অলিন্দে দাঁড়িয়ে এক-এক সন্ধেবেলা সে আকাশের দিকে দু-হাত তুলে বলে, আয়-আয়। একটু পরেই শোঁ-শোঁ শব্দ শুরু হয়।

রাজার বড় দুঃখ, তার কোনও দুঃখবোধ নেই।

দুঃখ কাকে বলে, তা সে জানেই না। কোনওদিন তার এক ফোঁটাও চোখের জল পড়েনি।

একটা চোখ না থাকলেও কি মানুষ কাঁদে না? জন্মান্ধরাও তো কাঁদে। এই রাজা কাঁদতে শিখলই না!

নিশাচরী মেজরানি রাত্তিরবেলা স্নান করতে ভালোবাসে।

রাজপ্রাসাদের পেছন দিকে অনেকটা বাগান। তার পাশেই একটা ছোট নদী। নদীটি ছোট হলেও সারা বছরই ছলছল করে জলস্রোত।

রাত্তিরবেলা স্নান করলে আরু লাগে না। মধ্যরাত্রি পেরিয়ে গেলে ছোটো নদীটিতে নেমে চাঁদনি মনের আনন্দে সাঁতার কাটে।

আসল রাজ্য শাসন করে মন্ত্রী, সেনাপতি আর কোটাল। রাজা শুধু চিনেবাদাম খায় আর গল্প শোনে। দুঃখের গল্প। রোজই একজন দুজন লেখক-কবিকে ডেকে আনা হয়, তারা প্রাণপণে দুঃখের কাহিনি বানায়, রাজাকে কাঁদাতে পারলেই তো মিলবে প্রচুর পারিতোষিক। এখনও পর্যন্ত কেউই সক্ষম হয়নি।

রাজপুত্র কিংবা রাজকন্যা কি নেই? আছে কয়েকজন, কিন্তু তারা এলেবেলে। তারা গায়ে ফুঁ-দিয়ে বেড়ায়।

বিকেলবেলা যখন কবি-লেখকরা গল্প-গাথা শোনাতে আসে, তখন আশ্চর্যময়ীকে ধারেকাছে দেখা যায় না। চাঁদনি তখন ঘুমোয়। শুধু ফুটফুটি মাঝে মাঝে এসে রাজার পাশে বসে।

ফুটফুটির বয়েস মাত্র তেইশ। এই বয়েসের মেয়ে সম্পূর্ণ ফোকলা, এরকম কেউ কখনও দেখেনি। তার হাসি-বিচ্ছুরিত চোখ দুটির জন্য তার মুখে একটা সুন্দর আভা ফুটে ওঠে, তাই তাকে বিয়ে করার জন্য অনেক হোমরাচোমরা রাজা, মহারাজা, শ্রেষ্ঠী, যোদ্ধারা উঠে পড়ে লেগেছিল। রাজা রাজচন্দ্র অনেক টাকা-পয়সা খরচ করে ফুটফুটিকে জিতে এনেছেন।

কেউ একজন প্রস্তাব দিয়েছিল, ছোটরানিকে নকল দাঁত পরিয়ে দিলেই তো হয়। আজকাল

কত রকম ব্যবস্থা হয়েছে।

তাই শুনে রাজা এমন চটে গেল যে তখনই সে ব্যক্তিকে পাঠিয়ে দিল নির্বাসনে।

ফুটফুটিকে সঙ্গে নিয়ে গল্প শোনা মহা মুশকিলের ব্যাপার। অতি কাঁচা দুঃখের গল্প শুনতে-শুনতে মাঝপথে তার চোখের হাসি মুছে যায়। টপ-টপ করে জল ঝরতে থাকে, তারপর সে ফুঁপিয়ে ওঠে।

তা দেখে রাজার হাসি পায়।

এ-রাজা গান-বাজনা বিশেষ পছন্দ করে না। নর্তকী-বাঈজি নিয়ে রাত্রি যাপনের শখ নেই। তার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে চিনেবাদামের খোসা ভাঙার শব্দ। মুচুর-মুচ। মুচুর-মুচ।

তবু এ-প্রাসাদের অন্দরে কেউ একজন লুকিয়ে-লুকিয়ে বাঁশি বাজায়। যখন-তখন বেজে ওঠে বাঁশি। বাঁশির শব্দ গোপন রাখা যায় না। তবে যে বাজায়, সে থাকে লুকিয়ে।

ফুটফুটির কান্না শুরু হলে আর থামতেই চায় না। তখন রাজা রক্তচক্ষে তাকায় সেদিনকার আহূত কবিটির দিকে। সে যে কাজের জন্য এসেছিল, তার উলটো ফল ফলেছে।

কবিটি ভয়ে পালায়। রাজা মুঠো-মুঠো চিনেবাদাম খেয়ে মেজাজ শান্ত রাখার চেষ্টা করে, রাগ কমতে শুরু করলে হাসে আপন মনে।

আশ্চর্যময়ী একদিন জিগ্যেস করেছিল, হ্যাঁ রে ফুটফুটি, তুই ওইসব পচা-পচা গল্প শুনে কাঁদিস কেন রে? সবই তো একঘেয়ে। আমি দু-একবার শুনে ফেলেছি। গল্পগুলোতে থাকে শুধু কারা খেতে পায় না খিদের জ্বালায় মরে কিংবা বন্যায় বাড়িঘর ডুবে যায়। আর কবিগুলো ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সেই সীতাহরণ কিংবা দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, নামগুলো খালি বদলে দেয়। অন্যের দুঃখের কথা শুনে কাঁদবার কী আছে!

ফুটফুটি চোখের পাতা বিস্ফারিত করে বলে, ওমা, আমি অন্যের দুঃখের কথা শুনে কাঁদতে যাব কোন দুঃখে? যেই ওসব গল্প শুনি, অমনি আমার নিজের দুঃখগুলোর কথা মনে পড়ে যায়।

আশ্চর্যময়ীর আরও আশ্চর্য হয়ে বলে, তোর আবার কীসের দুঃখ রে?

ফুটফুটি বলে, আছে গো দিদি! কত দুঃখ। মেয়েমানুষের কি দুঃখের শেষ আছে?

আশ্চর্যময়ী গালে হাত দিয়ে বলে, শোনো মেয়ের কথা! আমরা কি মেয়েমানুষ নাকি? আমরা তো রানি। আমাদের কি রান্নাঘরে গা-পোড়াতে হয়, না ব্যাটাছেলের জামা-কাপড় কাচতে হয়? আমাদের কি পায়ে কাঁটা ফোটে? আমাদের কি পরপুরুষরা টানাটানি করে?

ফুটফুটি জিগ্যেস করে, দিদি গো, তোমার কোনও দুঃখ নেই? সারা জীবনে একটাও?

আশ্চর্যময়ী একটু চিন্তা করে বলে, একটা না হোক আধখানা আছে। সে কথা আমি কারওকে বলি না, সেজন্য আমার কান্নাও পায় না।

চাঁদনির দুঃখ আছে কি না, তা ঠিক জানা যায় না। সে প্রায় কথাই বলে না কারও সঙ্গে। কথা বলবে কখন, সারাদিন তো সে ঘুমিয়েই থাকে। আর যখন সে জাগ্রত, তখন অন্যেরা ঘুমন্ত।

রাত্রির তৃতীয় প্রহর পার হলে, যখন রোগী, ভোগী, এমনকী চোরেরাও ঘুমিয়ে পড়ে, তখন চাঁদনি প্রাসাদের আনাচেকানাচে ঘুরে বেড়ায়। খানিক আগে নদীতে সাঁতার কেটে এসেছে বলে তার শরীরটা চনমনে হয়ে আছে, অঙ্গে বেশি পোশাকের বালাই নেই, শুধু ঝুমঝুম করে বাজে তার পায়ের নূপুর।

এক-একদিন দেখা হয় একটা ভূতের সঙ্গে। ভূতটাকে প্রায় পোষা ভূত বলা যায়। সে দাঁড়িয়ে থাকে সিঁড়ির নীচে, ঝাপসা-ঝাপসা চেহারা। চাঁদনি তাকে মোটেই ভয় পায় না।

চাঁদনি তাকে জিগ্যেস করে, আজ কেমন আছিস রে ভুতু?

ভূতটি আর্তস্বরে বলে ওঠে, আমাকে শরীর দাও, শরীর দাও।

চাঁদনি বলে, সে আমি কী করে দেব? তুই কেন মরতে গিয়েছিলি? মরার পর কি শরীর থাকে?

ভূতটি বলল, কেউ যদি খুব করে চায়, তা হলে আমরা শরীর নিয়ে ফিরে আসতে পারি। তুমি কি একটিবারও আমাকে চাইবে না?

চাঁদনি বলে, তুই আমার সঙ্গে সাঁতার কাটতে পারবি?

ভূতটি বলল, ধ্যাত, কী যে বল? ভূতেরা কখনও জলে নামে নাকি? কোনও গল্পে শুনেছ?

চাঁদনি বলল, তা হলে থাক তুই ভূত হয়ে। আজ পর্যন্ত আমি একজনও সাঁতারের সঙ্গী পেলাম না।

প্রাসাদের ছাদে দুপুরবেলা দাঁড়িয়ে আছে আশ্চর্যময়ী। ঝড়ের বেগ বাড়ছে ক্রমশ। এখনও বৃষ্টির দেখা নেই, কালো আকাশ চিরে ঝলসাচ্ছে লকলকে বিদ্যুৎ। ভেঙে পড়ছে গাছের ডাল। পাখিরা সামলাতে পারছে না সেই ঝড়ের তীব্রতা। গাছের শুকনো পাতার মতন মাটিতে ঝরে পড়ছে মৃত পাখি।

আশ্চর্যময়ী দাঁড়িয়ে আছে স্থির হয়, পতাকার মতন উড়ছে তার শাড়ির আঁচল। আবেশে চোখ বুজে যাচ্ছে তার, সারা শরীরে যেন রভসের সুখ।

একটু পরে রাজা উঠে এল ছাদে।

বড়রানির কাঁধে হাত রেখে বলল, আশ্চর্য, তুমি এই ঝড় ডেকে এনেছ?

রানি উত্তর দিল না।

রাজা বলল, এবার থামাও। শুনলাম নাকি প্রজাদের বাড়িঘর, ভেঙে পড়ছে।

ঝড়কে ডেকে আনতে পারে আশ্চর্যময়ী, কিন্তু থামাবার ক্ষমতা তার নেই। এখানে তার জাদুবিদ্যা নিস্ফল।

কথার উত্তর না পেয়ে রাজা আশ্চর্যময়ীর চুলের মুঠি ধরে প্রবল ধাক্কায় তাকে ফেলে দিল মাটিতে। আশ্চর্যময়ী সঙ্গে-সঙ্গে চেতনাহীন।

তারপরই কমতে লাগল ঝড়।

আকাশের দিকে তাকিয়ে রাজা বলল, বাঃ, তা হলে আমিও একটা জাদু শিখলাম!

নিত্য নতুন কবি ও কথাকার খুঁজে বার করাই দুরূহ হয়ে উঠেছে। সবাই তো ব্যর্থ হয়েছে রাজাকে কাঁদাতে। আর নতুন লেখক পাওয়া যাবে কোথায়?

মন্ত্রীমশাই হয়রান। সেনাপতিও কোটালকে অলিতে-গলিতে খোঁজাখুঁজি করতে পাঠায়।

ভীমরাও নামে একজন বিদ্রোহী প্রজাদের খেপিয়ে বেড়াচ্ছে, তাকে ধরা যাচ্ছে না কিছুতেই। মাঝে-মাঝেই একজন দুজন এরকম মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, তারপর তাদের ছিন্ন মুণ্ড ধুলোয় গড়ায়। এই ভীমরাও অনেকদিন পালিয়ে বেড়াচ্ছে, তাকে নিয়েও মন্ত্রীমশাই ব্যতিব্যস্ত হয়ে আছে। অবশ্য ধরা সে পড়বেই, শুধু কয়েকটা দিনের অপেক্ষা।

একদিন এক রাজপুত্র এক শ্রমিক পল্লিতে গিয়ে...। থাক, রাজপুত্রদের কথা থাক। এক গল্পে বেশি চরিত্র থাকলে মুশকিল হয়।

সন্ধে হয়-হয়, হঠাৎ বাঁশির শব্দ শুনে রাজা উৎকর্ণ হয়ে উঠল। কে বাঁশি বাজায়? সেপাই, শান্ত্রী, প্রহরী-দ্বারপাল কেউ জানে না। বাইরের কেউ লুকিয়ে আছে রাজপ্রাসাদে? যদি বদ মতলবে কেউ লুকিয়ে থাকতে চায়, তা হলে বাঁশি বাজিয়ে জানান দেবে কেন?

রাজার মনে খটকা লেগে থাকে। চিনেবাদাম খেতে থাকে মুঠো-মুঠো।

ফুটফুটির ঘরের সামনের বারান্দায় অনেকগুলো পাখির খাঁচা। এইসব পোষা পাখিগুলোকে ফুটফুটি নিজের হাতে ছোলা খাওয়ায়। ওদের মধ্যে তার সবচেয়ে প্রিয় একটা ময়না।

ফুটফুটির সঙ্গে সেই ময়নার অনেক মনের কথা হয়। ময়নাটা মানুষের মতন কথা বলতে

পারে না, ফুটফুটিই পাখিদের ভাষা জানে। ফুটফুটির ঘরের দিকে যেতে যেতে রাজা অনেক সময় শোনেন সেই পাখি আর তাঁর ছোটো রানির বাক্যালাপ, কিছুই বুঝতে পারেন না।

রাজা যে সব সময় প্রাসাদেই বসে থাকেন, তা নয়। মাঝে-মাঝে তিনি নগর পরিভ্রমণে যান ছদ্মবেশে। কোনওদিন ফকির-দরবেশ সাজেন, কোনওদিন স্ত্রীলোক। নগর ছাড়িয়ে পল্লীগ্রামেও চলে যান, শুনতে পান মানুষের ঝগড়াঝাঁটি, কান্নাকাটি। এ সবও যেন পাখির ভাষার মতন, কিছুই তাঁর বোধগম্য হয় না।

একদিন একজন নবীন কবিকে ধরে আনা হল, তার নাম সুজয়। এর আগে কয়েকবার তাকে অনুরোধ করা হয়েছিল, সে আসতে চায়নি।

কবিটি বলল, মহারাজ, আপনাকে কাঁদাবার মতন কোনও গল্প-কবিতা আমার জানা নেই। তাই আমি এতদিন আসিনি। তবে, আমি একজনের জীবনী লিখছি, সেটা শেষ হলে আপনাকে শোনাবার ইচ্ছে আছে।

রাজা জিগ্যেস করল, কার জীবনী?

সুজয় বলল, আপনার।

রাজা ভুরু কুঁচকে, চিবুকে হাত ঘষতে-ঘষতে বলল, আমার? তুমি আমার জীবনের কতটুকু জানো?

কবি বলল, আপনার জন্মকাহিনি কিংবা বাল্যজীবন সম্পর্কে কিছুই জানি না বটে, কিন্তু আমি লিখছি আপনার ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ে।

আমার পরজন্ম নিয়ে?

না, না, এই জন্মই। অদূর ভবিষ্যতের সব কথা। ধরুন, শুরু হয়েছে এ-বছর থেকেই। এখনও অবশ্য পুরোটা শেষ হয়নি।

যতখানি লিখেছ তাই-ই শোনাও।

কবিটি মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে পাঠ করল সেই আখ্যান কাব্য।

সব শুনে রাজা গম্ভীরভাবে জিগ্যেস করল, এ সবই আজগুবি কাহিনি।

কবি বলল, না মহারাজ, সত্য ঘটনা অবলম্বনে।

রাজা বলল, যা এখনও ঘটেনি, তা সত্য হবে কি না, তুমি জানলে কী করে?

কবি বলল, রামের জন্ম না হতেই রামায়ণ লেখা হয়নি? সব ঠিক-ঠিক মিলেছিল কি না? কবিরা এরকম পারে।

রাজা বলল, আচ্ছা, পরবর্তী সাতটা দিন দেখা যাক!

সেই যে একদিন ছাদে উঠে রাজা আশ্চর্যময়ীর কেশাকর্ষণ করে ঝড় থামিয়েছিল, তারপর থেকে আর একবারও ঝড় আসেনি। বৃষ্টিময় মেঘও আসেনি। খর তপ্ত হচ্ছে বাতাস।

এর মধ্যে আশ্চর্যময়ীর সঙ্গেও রাজার কোনও কথা হয়নি।

এক দাসীর মুখে খবর পেয়ে রাজা দৌড়ে গেল আশ্চর্যময়ীর ঘরে। সেখানকার দৃশ্য দেখে রাজা একেবারে তাজ্জব।

সারা ঘর ভরতি চুল ছড়ানো। কালো মেঘের মতন পিঠ-কোমর ছড়ানো চুল ছিল আশ্চর্যময়ীর। প্রায় সব উঠে গেছে। শেষ কয়েকগাছি চুল টেনে-টেনে তুলছে আশ্চর্যময়ী।

রাজা শুধু বলল, এ কী?

আশ্চর্যময়ী মুখ ফেরাল। তার নাকের নীচে গোঁফ গজিয়েছে, গালে নবীন তৃণের মতন দাড়ি। দৃষ্টিতে লাল রঙের আভা।

রাজার বুক কেঁপে উঠল।

সেই কবিটি লিখেছিল না, রাজার এক রানি হঠাৎ একদিন পুরুষ হয়ে যাবে?

রানি যদি পুরুষ হয়ে যায়, সে কি হবে রাজার প্রতিদ্বন্দ্বী?

দ্রুত সেখান থেকে বেরিয়ে এসে রাজা প্রহরীদের হুকুম দিল, এ-ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখ। আর কোনওদিন খুলবে না।

একটু শান্তি পাওয়ার জন্য রাজা গেল ফুটফুটির ঘরের দিকে।

পাখির খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে আছে ফুটফুটি। তার দু-চোখে ঝিলমিল করছে হাসি।

রাজা জিগ্যেস করল, কেমন আছিস রে ফুটফুটি?

ফুটফুটি দুদিকে দুটি হাত ছড়িয়ে দিল। তারপর কথা বলল পাখির ভাষায়।

এরপর দুদিন ধরে রাজা ফুটফুটিকে কথা বলাবার চেষ্টা করে গেল। কোনও লাভ নেই। ফুটফুটি মানুষের ভাষা একেবারেই ভুলে গেছে।

রাজার মনে পড়ল, পাখিদের দাঁত থাকে না। ফুটফুটি আস্তে-আস্তে পাখি হয়ে যাবে?

দুপুরবেলা হা-হা করছে বাতাস। প্রাসাদটা যেন বড় বেশি নির্জন। লোকজন সব গেল কোথায়? একজন প্রহরীকে দেখতে পেয়ে রাজা বলল, শিগগির মন্ত্রীকে ডেকে আন।

রাজা এল চাঁদনির ঘরে। পালঙ্কে শুয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে চাঁদনি।

রাজার তার শরীর ধরে নাড়াচাড়া করে বলতে লাগল, ওঠ, ওঠ, কেন, কেন তুই প্রত্যেকদিন সারাদিন ঘুমোবি? কেনই বা তা আমি সহ্য করব?

চাঁদনি উঠে বসল। চোখ যেন খুলতেই পারছে না।

আবার রাজার বকুনি শুনে সে চোখ মেলল অতি কষ্টে। তার চোখের রং সাদা।

কাতরভাবে চাঁদনি বলল, মহারাজ, আমি দিনেরবেলা দেখতে পাই না। সূর্যের আলো আমার সহ্য হয় না। আপনি আমাকে বকুন, মারুন, যা ইচ্ছে করুন। মাঝরাত্তিরে আমাকে জন্ম দিয়ে আমার মা মরে গেছে। তাই আমি শুধু রাত্রি চিনি।

সবই তো মিলে যাচ্ছে। যত নষ্টের গোড়া ওই কবিটা।

ওর লেখা থামিয়ে দিতে পারলে বাকি অংশটা মিলবে না। এর মধ্যে আরও অনেকটা লিখে ফেলেছে নাকি?

রাজা চিৎকার করে উঠল, ওরে, কে কোথায় আছিস। শিগগির ওই সুজয় নামের কবিটাকে ধরে নিয়ে আয়।

কেউ উত্তর দিল না। এর মধ্যে বেজে উঠল সেই লক্ষ্মীছাড়া বাঁশিটা।

রাজা নিজে ছোটাছুটি করে খুঁজতে লাগল সেই বংশীবাদককে। না পেয়ে, ক্লান্ত, অবসন্ন হয়ে শুয়ে পড়ল এক সময়।

রাজাদের সম্পূর্ণ অসহায় দেখায়, যখন তারা নিঃসঙ্গ।

মধ্যরাতে ঘুম ভেঙে উঠে রাজা দেখল, কোথাও কেউ নেই। ডাকাডাকি করেও সাড়া পাওয়া গেল না কারও।

কবির লেখা এই অংশটা রাজা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারেনি। তাও সত্যি হল? তবে কি সেনাপতি নিহত হয়েছে ভীমরাও-এর হাতে? মন্ত্রী নিরুদ্দেশ? আর সবাই পালিয়েছে ভয়ে?

রাজা নিজের মুখে হাত দিয়ে দেখল, কী যেন চটচট করছে। রক্ত নাকি? না, জল। তিনি জিভ দিয়ে একটু চেটে দেখলেন। এর নাম কান্না?

তারপর রাজা বুঝতে পারল, কান্না বেরুচ্ছে তার পাথরের চোখ দিয়ে। অন্য চোখটা শুকনো।

সেই কবি নিজের কথা কিছু বলেনি। সে কোথায়?

সে নদীতে সাঁতার কাটছে চাঁদনির সঙ্গে। চাঁদনি এত দিন পর পেয়েছে তার সাঁতারের একজন সঙ্গী। দুজনে সাঁতারে-সাঁতরে চলে যাচ্ছে ছোট নদী থেকে বড় নদীতে, তারপর সমুদ্রের দিকে।



দৃশ্যাবলী

একদিন রুচি তার বাবা-মায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। তার বারো বছরের জীবনের প্রথম বিদ্রোহ।

উপলক্ষ্যটা অতি সামান্য।

এমনিতেই সবাই জানে। রুচি বাচ্চা বয়েস থেকেই শান্ত ধরনের মেয়ে, একটুও জেদি নয়, গুরুজনদের কথার অবাধ্য নয়, সে আপনমনে থাকে। সে মন দিয়ে পড়াশুনো করে, ছবি আঁকে। অন্য বাচ্চা মেয়েদের তুলনায় তার একটাই বৈশিষ্ট্য, সে প্রায়ই আপনমনে কথা বলে। বেশ জোরে-জোরে। পাশের ঘর থেকে শুনলে মনে হয়, সত্যিই যেন তার সামনে কেউ রয়েছে। অন্য কেউ এসে পড়লেই সে লজ্জা পেয়ে থেমে যায়।

ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে বাবা-মায়েদের, বিশেষত মায়েদের নানারকম আশঙ্কা থাকে। প্রথম-প্রথম শ্রীলা ভাবতেন, এটা বুঝি তাঁর মেয়ের কোনও অসুখ। হাতের কাছেই ডাক্তার রয়েছে, শ্রীলার নিজের মেজদাই পি জি হাসপাতালের হার্ট সার্জন। তিনি শ্রীলার ভয়ের কথাটা শুনে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। না, না। রুচি একেবারে নর্মাল চাইল্ড। চিন্তার কিছু নেই। বয়েস হলে ওসব কেটে যাবে।

তাতেও অবশ্য শ্রীলার চিন্তা ঘুচে যায়নি। বাড়ির লোক ডাক্তার হলে তার ওপর যেন বেশি ভরসা করা যায় না। শ্রীলার মেজদা সত্যেশ সেনগুপ্ত হার্ট স্পেশালিস্ট, বাইপাস অপারেশন করেন, কিন্তু হার্ট আর মন যে এক নয়, তা এখন সবাই জানে। কাব্য করে যতই হৃদয়ের কথা বলা হোক, আসলে কিন্তু হৃদয় বা হৃৎপিণ্ডে মন থাকে না, মনের স্থান মস্তিষ্কে। এটা যদি রুচির মনের অসুখ, হয়, তাহলে শল্য-চিকিৎসক সত্যেশ সেটা বুঝবেন কী করে!

পরিবারে একজন ডাক্তার থাকলে অন্য কিছু ডাক্তারদের সঙ্গেও চেনা হয়ে যায়। সত্যেশের ছাত্র জীবনে, মেডিক্যাল কলেজের তিন-চারজন বন্ধুকে শ্রীলা বিয়ের আগে থেকেই চেনে। তাদের মধ্যে একজন, দীপ দাশগুপ্ত, বন্ধুর এই ছটফটে, বিদ্যুৎ ঝলকের মতন কিশোরী বোনটির দিকে প্রায়ই তরল চোখে তাকাত। দীপ দাশগুপ্ত সুদর্শন পুরুষ। চক্ষুদুটি খুবই গভীর, সে-চোখ দিয়ে তরল দৃষ্টি নিক্ষেপ করা সোজা কথা নয়। শ্রীলাও যে-কোনও গল্পের বই পড়তে-পড়তে নায়কের চেহারাটা ঠিক দীপ দাশগুপ্তর মতন কল্পনা করে নিত। মাঝে-মাঝে কাঁধে হাত রাখা আর একদিন, হঠাৎ যেন লেগে গেল, এইভাবে বুক ছোঁওয়া ছাড়া দীপ দাশগুপ্ত শ্রীলার সঙ্গে আর বেশি দূর এগোননি, চলে গেলেন বিলেতে। ফিরে এলেন মেমবউ নিয়ে। এখন তিনি বিখ্যাত মনোরোগবিশেষজ্ঞ, তাঁর চেম্বারে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেতে অন্তত একমাস লাগে। তাঁর সেই মেম-বউ আর নেই, এখনকার স্ত্রী পাঞ্জাবিনী। শ্রীলার সঙ্গে হঠাৎ কখনও কোনও নেমন্তন্ন বাড়িতে দেখা হলে এখনও তিনি তরল চোখে তাকান, তবে ওই পর্যন্তই, কাঁধে হাত রাখা আর চলে না।

শ্রীলা একদিন সস্ত্রীক দীপ দাশগুপ্তকে নেমন্তন্ন করল নিজেদের ফ্ল্যাটে। সঙ্গে আরও কয়েকজনকে অবশ্য। কিন্তু মেজদা সত্যেশ তখন নেপালে, মেজদাকে বাদ দিতেই চেয়েছিল শ্রীলা।

দীপ দাশগুপ্তকে শ্রীলা মেয়ের সম্পর্কে উদ্বেগের কথা জানাল। সঙ্গে-সঙ্গে এ-কথাও বলল,

রুচিকে সে কিছুতেই দীপ দাশগুপ্তের চেম্বারে নিয়ে যেতে পারবে না। মনের যে কোনও রোগের চিকিৎসক হলেই এদেশে তাঁদের বলে পাগলের ডাক্তার। যদি জানাজানি হয়ে যায় যে রুচিকে দীপ দাশগুপ্ত দেখছেন, তাহলেই সবাই ধরে নেবে, মেয়েটা পাগল!

দু-পেগ হুইস্কি পান করার পর দীপ দাশগুপ্ত রুচির ঘরে গিয়ে বলল, তোর সঙ্গে আমি একটু গল্প করব। তোর আপত্তি নেই তো?

মামার বন্ধু এসে কথা বলতে চাইলে রুচি আপত্তি করবে কেন? সে তো আর জানে না যে দীপ দাশগুপ্তর কথা বলা মানে চিকিৎসার প্রক্রিয়া। জানলেই বা সে কী করত! বাড়িতে বেশি লোকজন এলে সে তার নিজের ঘরে লুকিয়ে থেকে পড়াশুনোর ভান করে, অন্যদের সঙ্গে কথা বলতেই লজ্জা করে তার। নিজের সঙ্গে কথা বলার সময়ই সে সবচেয়ে সহজ ও স্বচ্ছন্দ।

রুচির একটা নিজস্ব ঘর আছে। বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান বলেই এই সুবিধেটা পেয়েছে সে। দেওয়ালে অনেক ছবি ও পোস্টার সাঁটা। তার বয়েসি ছেলেমেয়েরা যেমন অনেক খেলোয়াড় বা গায়কের ছবি পুজো করে, রুচির ঘরের ছবিগুলি অবশ্য তাদের নয়, সবই প্রকৃতির। পাহাড়, সমুদ্র, নদী, অরণ্য, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও ক্যালেন্ডার থেকে কেটে রাখা। নিজের আঁকা ছবি সে সহজে কারুকে দেখাতে চায় না। তার ঘরে গল্পের বইও কম নেই।

দীপ দাশগুপ্ত রুচির চেয়ারটায় বসে, একটা চুরুট ধরিয়ে প্রথমে ঘাড় ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে ঘরটার ছবি ও বই দেখতে লাগলেন।

তাঁর প্রথমেই মনে হল, তিনি রুগি দেখেন নিজের চেম্বারে। আসলে, মনোরোগের চিকিৎসা করতে গেলে, প্রত্যেক রুগির বাড়িতে গিয়ে তার নিজস্ব পরিবেশটাই দেখা দরকার। কিন্তু তার সময় কোথায়?

তারপর তিনি ভাবলেন, রুচির এখন যা বয়েস, তার মা শ্রীলাকেও তিনি প্রথম দেখেছিলেন ঠিক এই বয়েসে। বারো-তেরোই হবে, সদ্য পিউবার্টি এসেছে। শ্রীলার সঙ্গে তার মেয়ে রুচির মুখের ও শরীরের গড়নেরও বেশ মিল আছে। অর্থাৎ দীপ দাশগুপ্ত একটুক্ষণের জন্য ফিরে গেলেন নিজের প্রথম যৌবনে। কিশোরী শ্রীলাকে যখন প্রথম দেখেন, তখন তাঁর নিজের বয়েস উনিশ-কুড়ি। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন, সত্যেশদের চেতলার বাড়িতে, এক মেঘলা সন্ধ্যায়, কেন যেন কাছাকাছি কেউ আর ছিল না। তিনি শ্রীলার কাঁধে হাত রেখে তাকে টেনেছিলেন বুকের দিকে।

ডাক্তারি পাশ করার পর তিনি ইচ্ছে করলেই অনায়াসে বিয়ে করতে পারতেন শ্রীলাকে। তা হয়নি, দুজনের জীবন গেছে অন্য দিকে। যদি তিনি শ্রীলাকে বিয়ে করে ফেলতেন, তাহলে কি এই রুচি নামের মেয়েটি তাঁর আত্মজা হত? জিন ফ্যাক্টর ও ক্রোমোজোম বিষয়ে শেষতম জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও এরকম একটা অবাস্তব, অলীক চিন্তা একজন চিকিৎসকেরও মাথায় আসতে পারে।

একটুক্ষণের জন্য দীপ দাশগুপ্ত নিজেরই মন বিশ্লেষণ করলেন।

না, এই মেয়েটিকে দেখে আর নিজের মেয়ের মতন মনে হচ্ছে না, কিংবা বাৎসল্য রসও জাগছে না। (দুটি বিবাহেই তিনি কোনও সন্তানের জনক হননি) রুচি তাঁর অচেনা। সে একটি কিশোরী, বয়েসের তুলনায় বাড়বাড়ন্ত, যেন এর মধ্যেই কৈশোর ছাড়িয়ে যৌবনের দ্বারে এসে করাঘাত করছে।

তিনি রুচিকে বললেন, তোমার বয়েসি একটা মেয়ে আমার মতন বুড়োদের সম্পর্কে কীভাবে, তা নিয়ে আমি দশটা প্রশ্ন করতে চাই। মাঝখানে কেউ এসে যাতে ডিসটার্ব না করে, তাই তুমি দরজাটা বন্ধ করে দাও!

দীপ দাশগুপ্ত কী কী প্রশ্ন করেছিলেন, তা শুধু ওরা দুজনেই জানে। ঘণ্টা খানেক পরে বেরিয়ে এসে, আরও একটা হুইস্কি খেয়ে, তিনি শ্রীলাকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে বলেছিলেন, তোমার মেয়ে সম্পর্কে দুশ্চিন্তার কোনও কারণই নেই। পারফেক্টলি নর্মাল অ্যান্ড হেলদি চাইল্ড। অন্যদের তুলনায় রুচি একটু বেশি কল্পনাপ্রবণ। বেশি লোকের সঙ্গে মেশে না, কিন্তু নিজের মনে-মনে কিছু

চরিত্র তৈরি করে নিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলে। তাতে তো ভয়ের কিছু নেই। হয়তো রুচি ভবিষ্যতে আর্টিস্ট হবে। আর্টিস্টরা এরকম হয়। তবে, শুধু একটা ব্যাপারে তোমাদের সতর্ক থাকতে হবে। ওর অন্তত আঠারো-উনিশ বছর বয়েস হওয়া পর্যন্ত ওকে একলা-একলা কোথাও যেতে দিও না। এই ধরনের অতিরিক্ত কল্পনাপ্রবণ ছেলেমেয়েরা, একা-একা বাড়ির বাইরে গেলে হারিয়ে যেতে পারে। এরকম অনেক কেস হিস্ট্রি আছে। আর আমাদের দেশে, মেয়েদের ব্যাপারে যে বেশি সাবধান হতে হয়, তা বলাই বাহুল্য।

দীপ দাশগুপ্তর এই শেষোক্ত সতর্কবাণীর জন্যই রুচির জীবন বিষময় হয়ে গেল।

রুচির বাবা আর মায়ের দৃষ্টিভঙ্গির অনেক তফাত।

শ্রীলা যেন নিজের বাল্য ও কৈশোরের কথা একেবারেই ভুলে গেছে। সে যে ওই বয়সে কত দুরন্ত ও ছটফটে ছিল, নিজের অভিভাবকদের লুকিয়ে কিছু-কিছু অসমীচীন কাজটাজও করেছে। তা আর মনেই পড়ে না। এই বারো বছর বয়েসেই রুচির বুকে ঢেউ দেখা গেছে। সে রজঃস্বলা হয়েছে, সুতরাং যৌন চেতনা এসে গেছে। যৌন চেতনা এসে গেলেই সেসব মেয়েদের প্রলোভন দেখাবার জন্য অনেক বাঘ-সিংহ ঘুরে বেড়ায়। অর্থাৎ এখন মেয়েকে সর্বক্ষণ রাখতে হবে চোখে-চোখে।

লেখাপড়া শিখে, কোনও বুড়ো অফিসারের বউ হওয়ার জন্য তৈরি হওয়ার আগে মেয়েকে বাইরের পৃথিবীর আলো-বাতাসের স্পর্শ পাওয়ার অধিকার দেওয়া যায় না। মেয়ের ভবিষ্যত এখন মায়ের হাতে।

রুচির বাবা রজত একটু ন্যালাক্ষ্যাপা ধরনের মানুষ। রজত একটা মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানির মোটামুটি উঁচু পদের অফিসার হিসেবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে বটে, নিজের সংসারে তার ব্যক্তিত্ব কমজোরি। সে তার স্ত্রীকে ভয় পায়, স্ত্রীর অনুশাসন নতমস্তকে মেনে চলে। ব্যাপারটা হয়তো এত সরল নয়। স্ত্রীকে ভয় পাচ্ছে কেন রজত? শ্রীলাও চাকরি করে বটে, কিন্তু বিদ্যা-বুদ্ধি ও উপার্জন রজতেরই অনেক বেশি। আসলে সে অতি ভদ্রলোক এবং অপছন্দ করে নাটকীয়তা। শ্রীলার মতামতের বিরুদ্ধতা করতে গিয়ে যদি ঝগড়াঝাঁটি বেধে যায়, তাহলে হঠাৎ চুপ করে যায় রজত। সব ঝগড়াঝাঁটির মধ্যেই খানিকটা নাটুকেপনা থাকে, তাতে কোনও ভূমিকা নেওয়ার বদলে হঠাৎ নিঃশব্দ হয়ে গিয়ে মৃদু-মৃদু হাসি দেওয়াটাই সে বেশি উপভোগ করে।

রজতের ব্যক্তিগত ধারণা, ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে উঠবে গাছপালার মতন, স্বাধীন ও স্বাভাবিকভাবে। গোড়ার দিকে একটু নজর রাখতে হয় যে বাইরের প্রভাবে বিপথে যাচ্ছে কি না। যদি দেখা যায়, তাদের নিজস্ব মতামত গড়ে উঠেছে, তা হলে আর তাদের ওপর খামোকা বেশি বেশি বিধিনিষেধ প্রয়োগের কোনও মানেই হয় না। রজত নিজেও এভাবেই বর্ধিত হয়েছে এক বড় একান্নবর্তী পরিবারে। যে মেয়ে স্কুলের পড়াশুনো ঠিকঠাক করে, আবার ছবিও আঁকে, তার সম্পর্কে অকারণ দুশ্চিন্তার কোনও কারণই নেই। সেই জন্যই রজত তার মেয়ের কোনও ইচ্ছেতেই বাধা দেয় না। কিন্তু শ্রীলা যখন রুচি সম্পর্কে নানারকম বিধিনিষেধ আরোপ করতে যায়, তখন রজত তা পছন্দ বা সমর্থন না করলেও প্রতিবাদ করে না। যেন রুচি শ্রীলার একলারই মেয়ে, সে যা ভালো বোঝে করুক।

অনেকেরই মনে হবে, রজতটা একটা ব্যক্তিত্বহীন মাগ ভেড়ুয়া! একমাত্র শ্রীলাই সেটা বিশ্বাস করে না। সে জানে, রজত বাইরে যতই দুর্বলতা দেখাক, আসলে ভেতরে-ভেতরে সে কঠিন পুরুষ, হঠাৎ যে কখন বিস্ফোরণ ঘটাবে, তার ঠিক নেই। শ্রীলা প্রায়ই রজতের দিকে সংশয়ের দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

নেমন্তন্ন আর নেমন্তন্ন! সচ্ছল উচ্চবিত্ত, এমনকী মধ্যবিত্ত পরিবারেও এটা একটা আধুনিক ব্যাধি। এখন অবশ্য নেমন্তন্ন বদলে বলা হয় পার্টি। আজ এর বাড়ি, কাল ওর বাড়ি। সকলেরই

মনে মনে একটা হিসেব থাকে। এক মাসে তুমি যদি ছ'টা পার্টিতে আমন্ত্রিত হও, তাহলে তোমার বাড়িতেই ডাকতে হবে সপ্তম পার্টি। তুমি যদি ওই বৃত্তের মধ্যে না থাকো, তা হলেই তুমি সামাজিকভাবে নীচু হয়ে যাবে, ছিটকে যাবে সেই বৃত্ত থেকে।

কেউ-কেউ অবশ্য এই হিসেবেরও ঊর্ধ্বে উঠে যায়। নিজের বাড়িতে পার্টি দেয় ঘনঘন। সে যে প্রতিদানের অপেক্ষা না রেখেই অন্যদের ডাকে, তাতেই প্রমাণ করতে চায়, তার আর্থিক জোর অন্যদের চেয়ে বেশি।

রণ চৌধুরি সে রকমই একজন। একটা ব্যাটারি কোম্পানির ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। মাইনে ছাড়াও অতিথি আপ্যায়নের জন্য বিশেষ তহবিল আছে হয়তো। তবে, এ-কথাও ঠিক, মানুষটি দিলদরিয়া, মজলিশি এবং হইচই, আড়ম্বর পছন্দ করেন। রণের স্ত্রী বিদুষী এবং সুগায়িকা, প্রচুর পানীয় ও খাবারদারের সঙ্গে তার স্ত্রী জিনিয়া যখন সঙ্গীত পরিবেশন করে, তখন আবেশে ও তৃপ্তিতে রণের চোখ বুঁজে আসে।

এসব পার্টির নিয়ম এই যে পরিচিতদের মধ্যে থেকে বেছে-বেছে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে কয়েকজনকে ডাকা হয় এক-একবার। রণ চৌধুরীর বাড়ির পার্টিতে শ্রীলা ও রজতের কিন্তু আমন্ত্রণ থাকে প্রত্যেকবার, ওরা নিয়মের মধ্যে পড়ে না, কারণ জিনিয়া আর শ্রীলা একসঙ্গে কলেজে পড়েছে। জিনিয়া নিউ মার্কেটে বাজার করতে এলে তার ছেলেমেয়ে দুটিকে রেখে যায় শ্রীলার বাড়িতে। ছেলেমেয়ে দুটি যমজ, ঠিক রুচির বয়েসি।

শ্যামনগরে বিশাল কম্পাউন্ডের মধ্যে রণ চৌধুরির বাংলো। তা যেমনই সুদৃশ্য, তেমনই বাইরের জগৎ থেকে একেবারে আদলা এবং প্রচুর কাজের লোক। রণ চৌধুরির পার্টি বন্ধু-বান্ধবরা সবাই পছন্দ করে, খাদ্য-পানীয়, আড্ডা, গান-বাজনা সবদিক থেকেই ভালো, শুধু একটাই অসুবিধে, গাড়ি চালিয়ে যেতে হয় অনেকখানি, ফিরতে-ফিরতে রাত দুটো-আড়াইটে তো হয়ই!

ইদানীং সবই ছোট-ছোট পরিবার। স্বামী-স্ত্রী ও একটি দুটি সন্তান। স্বামী ও স্ত্রী এই ধরনের পার্টিতে গেলে ছেলেমেয়েরা থাকবে কোথায়? রণ চৌধুরির পার্টিতে অবশ্য কোনও অসুবিধে নেই, কোয়ার্টারে অনেকগুলি কক্ষ, বন্ধু-বান্ধবের ছেলেমেয়েরাও আসে, অন্য ঘরে জটলা করে, টিভি দেখে, খাওয়া-দাওয়া করে ঘুমিয়েও পড়তে পারে। শ্রীলা ও রজত প্রত্যেকবারই রুচিকে নিয়ে এসেছে, মধ্যরাত্রি পেরিয়ে যাওয়ার পর বাড়ি ফেরার সময় ঘুমন্ত রুচিকে পুতুলের মতন টেনে-টেনে এনে শুইয়ে দিয়েছে গাড়িতে।

এবারেই রুচি বলল, সে যাবে না।

কেন যাবে না?

রুচি কোনও কারণ জানাবে না। শুধু বলল, ইচ্ছে করছে না।

মানুষের ইচ্ছে অনেক সময় যুক্তির ধার ধারে না। বামনের যেমন চাঁদ ধরার ইচ্ছে হয়। রাজার ছেলে ইচ্ছে করে সিংহাসন ত্যাগ করে। কারওর দুধ খেতে ইচ্ছেই করে না, কেউ মদের নেশার মতন দুধ বেশি খায়। কারোর মেঘের ডাক শুনলে বিছানায় যেতে ইচ্ছে করে না, কেউ ইচ্ছে করে সব আলো নিভিয়ে বসে থাকে অন্ধকারে।

শ্রীলা বারবার জিগ্যেস করতে লাগল, কেন যাবি না? গত মাসেও তো গেছিস, টুম্পা আর বাবলুর সঙ্গে ক্যারাম খেলতে পারিস কিংবা খেলতে যদি না চাস, কত বই আছে ও-বাড়িতে—

রুচি তবু যেতে রাজি নয়, দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে রইল।

মেয়ের এমন জেদ দেখে শ্রীলা হকচকিয়ে গেল। আগে তো কখনও দেখেনি। অধিকাংশ মানুষই কার্যকারণ সম্পর্কে জানতে চায়, ব্যবহারের দুর্বোধ্যতা পছন্দ করে না। রুচি হঠাৎ বদলে গেল কেন?

রজত বলল, থাক না। অত জোর করার কী দরকার?

শ্রীলা ঝাঁঝিয়ে উঠে বলল, জোর করব না মানে? ও একলা-একলা থাকবে বাড়িতে?

থাকুক না।

একলা থাকবে? কোনওদিন থেকেছে? তুমি কিছু বোঝো না, সোঝো না।

ও যদি যেতে না চায়!

কেন যেতে চাইছে না, সেটাই তো জানতে চাইছি। আগের দিন কিছু হয়েছে ও-বাড়িতে? কেউ খারাপ ব্যবহার করেছে?

কী রে রুচি, কিছু হয়েছে আগের দিন?

রুচি দু-দিকে মাথা নাড়ল।

তবে যাবি না কেন?

রুচি আবার চুপ।

রজত বলল, আমার মনে হয় ও যখন যেতে চাইছেই না, তখন থাক না বাড়িতে। ও এখন বড় হচ্ছে।

বড় মানে কত বড়? বারো বছর, নভেম্বরে তেরোতে পড়বে, এখনও পাঁচ মাস দেরি। এই বয়েসে আমরা—

আবার বাজে কথা বলছ। ছেলেদের কথা আলাদা। এই বয়েসের মেয়েকে কেউ বাড়িতে একা রেখে যায়? চারদিকে কত কী কাণ্ড ঘটেছে!

ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে থাকবে, তাতে আর ভয়ের কী আছে! রুচি, তুই কারুকে দরজা খুলবি না। কারুকেই না। চেনাশুনো হলেও না।

হঠাৎ শ্রীলার চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে গেল। ঢেউ খেলে গেল কপালে।

তার মনে পড়ে গেল দীপ দাশগুপ্তর কথা।

ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে রাখলে বাইরের কেউ আসতে পারবে না। কিন্তু রুচি নিজেই যদি দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে যায়? আগে কখনও একলা কোথাও যায়নি। আগে কখনও এরকম জেদ তো দেখায়নি! দীপদা বলেছেন, আঠারো-উনিশ বছর বয়েস পর্যন্ত মেয়েকে চোখে-চোখে রাখতে। একা বেরুলে হারিয়ে যেতে পারে।

আরও কিছুক্ষণ মেয়েকে বোঝাবার চেষ্টা করলে শ্রীলা। কিন্তু রুচি অনড়। শ্রীলার মেজাজ চড়ে গেল, ইচ্ছে করল মেয়ের মাথায় চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকাতে। কিন্তু কোনওদিন সে মেয়ের গায়ে হাত তোলেনি। সেরকম দরকারই হয়নি।

পুরো সাজগোজ হয়ে গেছে, তবু শ্রীলা বলল, ঠিক আছে, তাহলে আমরাও যাব না! দরকার নেই!

এটা কথার কথা। এই ধরনের পার্টি শ্রীলার খুব পছন্দ। খুব মজা হয় তো বটেই, একটু জিন খেয়ে শ্রীলা নাচতে শুরু করে, সবাই হাততালি দেয়।

রজত বলল, যাব না? তন্ময় আর যমুনাকে তো আমাদের গাড়িতেই তুলে নিয়ে যাওয়ার কথা। ওরা অপেক্ষা করে বসে আছে।

তাহলে তো যেতেই হবে। শ্রীলা একটা ছুতো পেয়ে বিবেকের দায়মুক্ত হল। তন্ময়দের তুলে নিয়ে যাওয়ার কথা দেওয়া আছে। রজতকে একা ছেড়ে দেওয়াও যায় না। বউয়ের নজর ছাড়া হলেই রজত বেশি মদ খেয়ে মাতাল হয়ে পড়ে। আর ওই যমুনা, সে রজতের পাশ ছেড়ে নড়ে না। রজতও যমুনা সম্পর্কে বেশ দুর্বল।

এবার শ্রীলা দুম করে বলে ফেলল, তাহলে আমি বাইরে থেকে তালা দিয়ে যাব।

রজত আঁতকে উঠে বলল, সে কী, এত বড় মেয়েকে...তালা বন্ধ করে যেতে হবে কেন?

শ্রীলা বলল, এত বড় হয়েছে বলেই তো...বড় হয়েছে। বুদ্ধি তো বাড়েনি, কখন কাকে দরজা

খুলে দেবে...একে একা রেখে গেলে আমার কিছুতেই শান্তি হবে না।

রজত বলল, যাঃ, তালা দিয়ে গেলে বিশ্রী দেখাবে।

দেখাক বিশ্রী।

রুচি জেদ ধরতে থাকে, শ্রীলারও জেদ কম নাকি?

রজত জানে, সে স্ত্রীর সঙ্গে তর্ক করলেও লাভ হয় না। সে তাকিয়ে রইল মেয়ের দিকে। রুচি চুপ করে আছে।

তা হলে কি তালা বন্ধ অবস্থায় থাকতেও ওর আপত্তি নেই।

শ্রীলা সত্যিই বাইরে বেরিয়ে একটা তালা লাগিয়ে দিল। মেয়ের সঙ্গে আর কথা বলল না একটাও।

ফ্ল্যাটে একজন কেউ আছে, তবু দরজা ভেতর থেকে বন্ধ রাখা আর বাইরে তালা দেওয়ার অবস্থাটা এক হতে পারে না।

রুচি আপত্তি করেনি। কিন্তু সেই মুহূর্তে সে মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছে, আর কোনওদিন সে মা-বাবার সঙ্গে কোনও পার্টিতে যাবে না। সে বন্দিনী হয়ে থাকতেও রাজি।

বন্দিনী অবস্থায় এমন অনেক কিছু করা যেতে পারে, যা রুচি আগে কখনও করেনি। সে নাচতে পারে, চেঁচিয়ে গাইতে পারে, মাটিতে গড়াগড়ি দিতে পারে, রান্নাঘরে গ্যাস জ্বালিয়ে একসঙ্গে চারটে ডিম সেদ্ধ করে খেতে পারে।

আজকের নেমন্তন্নটা কয়েকদিন আগে থেকেই ঠিক করা ছিল, তাই এ-বেলার জন্য রান্না হয়নি। রান্নার দিদিকে ছুটি দেওয়া হয়েছে।

রুচিকে অবশ্য না খেয়ে থাকতে হবে না।

ফ্রিজে ভাত আছে, গতকালের খানিকটা মাংসও আছে, সেসব মাইক্রোওয়েভে গরম করে নিতে বলা হয়েছে রুচিকে। রুচি এখনও রান্না শেখেনি, কিন্তু গরম করে নিতে পারে।

এখন রাত পৌনে আটটা। মা-বাবার ফিরতে ফিরতে সাড়ে বারোটা কিংবা পৌনে একটা তো হবেই!

এর মধ্যে কেউ যদি এসে দরজায় বেল দেয়?

তপনকাকা তো আসতেই পারে। এ-পাড়ারই একটা স্টুডিওতে সাউন্ড রেকর্ডিং-এর কাজ করে তপনকাকা। রাত ন'টার ছুটির পর প্রায়ই এখানে আসে, বাবার সঙ্গে হুইস্কি খায়। তপনকাকা কি জানে যে আজ বাড়িতে কেউ থাকবে না?

ধরা যাক জানে না।

কয়েকবার বেল দেওয়ার পর বাইরের তালাটা নজরে পড়বে, কেউ নেই বুঝতে পেরে ফিরে যাবে।

তালা দেওয়া ফ্ল্যাট নিঃশব্দ থাকে। কিন্তু রুচি যদি তখন ভেতর থেকে জিনিসপত্র টানাটানির শব্দ করে? তখন মুখের অবস্থাটা কী রকম হবে তপনকাকার? ভাববে নিশ্চয়ই, ভেতরে চোর ঢুকে বসে আছে।

কিংবা, রুচি যদি তখন হিহি করে হেসে ওঠে? একবার হেসেই চুপ করে যাবে। বাইরে থেকে ডাকলেও সাড়া দেবে না।

তখন কি তপনকাকা ভূতের ভয়ে দৌড়ে পালাবে, না পুলিশে খবর দেবে?

তপনকাকার সেই অবস্থাটা ভেবেই হাসি পেয়ে গেল রুচির।

তপনকাকার স্টুডিওটা দু-বার দেখতে গিয়েছিল রুচি। কিছু-কিছু টিভি সিরিয়ালের শুটিং হয় ওখানে। বিশেষত নাচ-গানের দৃশ্য। কী রকম যেন রূপকথার জগতের মতন।

গত সপ্তাহে রুচি যেদিন দেখতে গিয়েছিল, সেদিন ছিল একটা ঐতিহাসিক ধারাবাহিকের

শুটিং, নবাবের দরবারে নাচছে রূপা গাঙ্গুলি। একটানা হয় না, হঠাৎ থেমে যায়, কে যেন বলে ওঠে আবার করতে হবে। ক্যামেরা সরাতে হয়। রূপা গাঙ্গুলি নাচ থামিয়ে এসে একটা বেতের মোড়ায় বসে কোকোকোলার বোতলে চুমুক দেয়। তপনকাকার কানে হেডফোন।

আজও কি সেইরকমই দৃশ্য হচ্ছে?

তপনকাকার কাজ শেষ হলে আজ আসবে, কি আসবে না?

রুচি বেশ জোরে-জোরে বলে উঠল, তপনকাকা, প্লিজ চলে এসো! বেশ মজা হবে।

তপনকাকা কান থেকে হেডফোন সরিয়ে জিগ্যেস করলে, কে, কে, ডাকছে আমাকে?

তপনকাকা, তুমি আজ ইন্দ্রধনু অ্যাপার্টমেন্টে আসবে না?

রুচি? কেন রে? আজ আমার ছুটি হতে দেরি হবে!

কত দেরি? সাড়ে ন'টা, দশটা হলেও এস!

দশটা? তা হতে পারে। কি রান্না হয়েছে আজ তোদের বাড়িতে?

মাংস আছে। আমি ডিম সেদ্ধ করে দিতে পারি।

আসছি!

লিফটের দরজাটা এই সাততলায় এসে খুলল। শব্দটা ঠিক টের পাওয়া যায়। তপনকাকা এবার বেল দেবে। তালাটা দেখতে পাবে না।

সাড়া দেবে না রুচি। তপনকাকা হকচকিয়ে যাবে। তারপর তালাটা দেখতে পেয়ে—

সত্যি-সত্যি দরজায় কেউ বেল দিল।

সারাদিন নানারকম ফেরিওয়ালা আসে। রাত্তিরে তো কেউ আসবে না। অন্য কোনও আত্মীয়স্বজন হতে পারে।

পা টিপে-টিপে, নিঃশব্দে দরজার কাছে গিয়ে ম্যাজিক আইতে চোখ রাখল রুচি। একজন লম্বা মতন লোক, তার গায়ে বর্ষাতি। বর্ষাতি কেন, বাইরে কি বৃষ্টি পড়ছে নাকি? না তো! ফরসা মুখ, সরু গোঁফ, মাথায় অনেক চুল। কে এই লোকটি, রুচি তো চেনে না।

লোকটি বেল দিয়েই যাচ্ছে। কোনও সাড়া শব্দ করছে না রুচি। তার একটু-একটু ভয় করছে। অথচ চোখ সরাতেও পারছে না। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে অচেনা আগন্তুককে।

এবারে লোকটি তালাটা দেখতে পেয়েছে। একটুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

দরজার তলা দিয়ে কী যেন ঢুকিয়ে দিচ্ছে। একটা কাগজ। রুচি সঙ্গে-সঙ্গে সেটা তুলল না। পিছিয়ে গেল কয়েক পা।

আবার লিফটের দরজার শব্দ। ফিরে যাচ্ছে লোকটি। ম্যাজিক আই দিয়ে আবার দেখে নিল রুচি, লিফট নেমে গেছে, লোকটি নেই।

সে কাগজটা তুলল।

খবরের কাগজ থেকে কাটা একটা রঙিন ছবি। বরফ ঢাকা একটা পাহাড়ের চূড়া। কোনও ক্যাপশান নেই। কোনও পাহাড় তা বোঝা যাচ্ছে না। রুচি ছবিটা উলটে পালটে দেখল, কোনও কথা বা কারুর নামও লেখা নেই। এরকম একটা ছবি দেওয়ার মানে কী? কে দিল, তাও তো বোঝা যাবে না।

রুচি নিজের ঘরের দেওয়ালে এই ধরনের ছবি সেঁটে রাখে। বরফ ঢাকা পাহাড়ের ছবি একটাও নেই। সেই জন্যই কি কেউ দিয়ে গেল? কিন্তু লোকটি জানবে কী করে যে রুচির এরকম একটা ছবি দরকার ছিল? কে ওই রহস্যময় পুরুষ। সে আজকেই এল কেন?

সব কেন-র তো উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় না।

রুচির খুব ইচ্ছে করল, লোকটির সঙ্গে কথা বলতে। কিন্তু সে তো কোনও ক্রমেই দরজা খুলতে পারত না।

সে দৌড়ে চলে এল বারান্দায়।

যদি লোকটিকে এখান থেকে দেখা যায়। যদি তার হাঁটার ভঙ্গি দেখে চেনা যায়।

পাঁচতলার বারান্দাটির উঁচু রেলিং। রুচি যখন ছোটো ছিল, প্রায়ই রাস্তার দিকের এই বারান্দায় এসে বাইরের দিকে তাকিয়ে বসে থাকত চুপ করে। সাবধানতার জন্য রেলিং উঁচু করা হয়েছিল। এখন রুচির গলা পর্যন্ত।

সে একটা টুল এনে তার ওপর দাঁড়িয়ে ঝুঁকে দেখল অনেকখানি। সেই রেইনকোট পরা লোকটিকে দেখা গেল না, এর মধ্যেই বেরিয়ে গেছে কিংবা এ-বাড়িরই অন্য ফ্ল্যাটের কেউ?

এ-বাড়ির কেউ হলে গায়ে বর্ষাতি চাপিয়ে রাখবে কেন? রুচি ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখল, আকাশে মেঘ আছে, কুণ্ডলী পাকাচ্ছে মেঘ, ঢেকে দিয়েছে চাঁদ, বৃষ্টি হতেও পারে। কিন্তু বৃষ্টি নামবার আগেই কেউ বর্ষাতি গায়ে চাপিয়ে রাখবে?

তারপর রুচির মনে হল, বাইরের দরজায় তালা লাগালেও তো এই ফ্ল্যাট থেকে বাইরে বেরুনো যায়। কেন, এই বারান্দা দিয়ে।

পাঁচতলার বারান্দা দিয়ে অবশ্য রাস্তায় নামা যায় না। কিন্তু খাঁচার পাখি যা পারে না, জেলখানার বন্দিরা যা পারে না, রুচি তা পারে। ডানা মেলে আকাশে উড়ে যেতে। রাত পৌনে একটায় মা ফিরে এসে দেখবে, দরজার বাইরে তালা বন্ধই আছে! কিন্তু রুচি নেই ভেতরে।

না, রুচি অত বোকা নয়। সে জানে, তার ডানা নেই। আকাশে উড়তে গেলে সে ধপাস করে পড়ে যাবে রাস্তায়। এত উঁচু থেকে পড়লেই আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে যাবে। সে মরবে কেন? মাকে চমকে দেওয়ার জন্যই কি কেউ মরে। আরুণির চিঠির উত্তর দেওয়া হয়নি এখনও।

তা ছাড়া, পাঁচতলার ওপর থেকে পড়লে যদি ফ্রকটুক উলটে যায়, খুব বিশ্রী দেখাবে, লজ্জার ব্যাপার হবে।

রুচি টুল থেকে নেমে এল। ইচ্ছে করলেই যে বন্ধ ফ্ল্যাট থেকে বেরুনো যায়, এইটুকু জেনেই ভালো লাগল তার।

রুচি একটা গোলাপি রঙের ফ্রক পরে আছে। নেমন্তন্ন বাড়ি যাওয়ার জন্য মা শালোয়ার কামিজ বার করে রেখেছিল। দু-একদিন শাড়িও পরেছে রুচি। তার ক্লাসের অনেক মেয়ের চেয়ে সে লম্বা, শাড়ি পড়লে তাকে প্রায় বড়দের মতন দেখায়। বড়দের জগতে প্রবেশ করতে ঠিক আর কতদিন বাকি আছে? আরুণি একদিন বলেছিল, স্কুল ছেড়ে কলেজে এলেই ছেলেমেয়েরা আর ছেলেমেয়ে থাকে না, তখন তারা তরুণ-তরুণী হয়ে যায়। আরুণি যেমন কলেজে ঢুকেছে। রুচির যে এখনও অনেকটা দেরি।

অথচ শাড়ি পরলে কেউ-কেউ তাকে কলেজের তরুণী মনে করে।

আমি যদি একদিন শাড়ি পরে কলেজে যাই তোর সঙ্গে? কেউ বুঝতে পারবে?

তুই কলেজে যাবি। ভ্যাট! দেখতেই ধ্যাড়েঙ্গা হয়েছিস। তোর মুখ দেখলেই যাবে, এখনও তোর নাক টিপলে দুধ বেরোয়।

আমি মোটেই দুধ খাই না।

দুধ খেতে হবে কেন? তোর মুখখানাই বাচ্চা হরিণের মতন।

বাচ্চা হরিণ? আমি তো দেখিনি। তুই দেখেছিস?

অনেক দেখেছি। গত বছর যে বেতলা রিজার্ভ ফরেস্টে গেলুম। একঝাঁক হরিণ তার মধ্যে তিনটে বাচ্চা। একটি বাচ্চা হরিণের মুখ ঠিক তোর মতন। সেটা আবার খুব লাজুক

আরুণি প্রায়ই ওর বাবা-মায়ের সঙ্গে অনেক জায়গায় বেড়াতে বলেছিল ঠিকই।

রুচি ঠিক করল, সে ফ্রক ছেড়ে নে শালোয়ার কামিজ পরে নিজেকে

অন্য সময় সে বাথরুমে গিয়ে পোশাক পালটায়। কিংবা নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে। এখন তো তার কোনও দরকার নেই।

বারান্দা থেকে ভেতরে এসে সে ফ্রকটা খুলে ফেলল। তারপর প্যান্ট। কেউ দেখবার নেই। এই অবস্থায় সে সারা ফ্ল্যাট ঘুরতে থাকে। রান্নাঘরে গিয়ে খাবার গরমও করতে পারে। গুমোট গরমের মধ্যে এখন আর কিছু না পরলেও চলে। তার একটুও লজ্জা করছে না।

বর্ষাতি গায়ে দিয়ে কে এসেছিল? কেন দরজার তলা দিয়ে শুধু একটা পাহাড়ের ছবি দিয়ে, আর কিছু না জানিয়ে, অদৃশ্য হয়ে গেল একেবারে?

শরীরে একটাও সুতো নেই, সেই অবস্থায় সে বাবা-মায়ের ঘরে ঢুকে দাঁড়াল বড়ো আয়নাটার সামনে। নিজেকে দেখল।

আমি বাচ্চা হরিণ? মোটেই না।

এই ঘরটায় রুচি বেশি আসে না। এ-বছরের নতুন ক্যালেন্ডারটা সে আগে ভালো করে দেখেইনি।

তিনখানা ঘরের অ্যাপার্টমেন্ট। একখানা তো বসবার ঘর, আর যতদিন দিদি ছিল, ততদিন রুচির নিজস্ব ঘর ছিল না। দিদির ঘরে সে পড়তে বসত বটে। কিন্তু রাত্তিরে এসে ঘুমোতো মা-বাবাদের সঙ্গে। দিদিটা এমন হিংসুটে, কিছুতেই নিজের বিছানায় শুতে দিত না রুচিকে।

দিদি চলে গেছে চার বছর আগে।

দিদিকে নিয়ে অশান্তি চরমে উঠেছিল। সে যেন প্রতিজ্ঞা করে বসেছিল, সে মা-বাবার কোনও কথা শুনবে না। যখন ইচ্ছে বাড়ি ফিরবে, সঙ্গে বন্ধুদের নিয়ে আসবে, মেয়ে আর ছেলে বন্ধু, ঘরের দরজা বন্ধ করে হা-হা-হি-হি করবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তাকে শাসন করার কোনও উপায় নেই। বাবা তো কিছুই বলবে না। মা যতই বকুনি দিক, টুকুন বলবে, তাহলে আমাকে হস্টেলে পাঠিয়ে দাও।

উনিশ বছর বয়েস থেকেই টুকুনের এরকম স্বভাব পরিবর্তন শুরু হয়। সবাই বলত, শ্রীলার দুটি মেয়ে সম্পূর্ণ দুরকম, টুকুনের সঙ্গে রুচির কোনও মিলই নেই। রুচির চেয়ে টুকুন বেশি সুন্দর। অবশ্য বুলা মাসি বলেছিল, আরও বড় হলে রুচির রূপ খুলবে।

টুকুন নিজেই জানিয়েছিল, সে কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে গাঁজা খেয়েছে। মদও চেখে দেখেছে দু-একবার। এসব স্বীকার করতে তার কোনও লজ্জা নেই। একদিন বাবাকে সে স্পষ্টাস্পষ্টি জিগ্যেস করেছিল, তুমি কলেজ জীবন থেকে মদ খাওনি? কবে থেকে শুরু করেছ, সত্যি করে বলো।

রজত সত্য গোপন করতে পারেনি, সে বলেছে, হ্যাঁ, তা শুরু করেছি বটে, কিন্তু গাঁজাটাজা খাইনি।

তোমাদের সময় ওটার চল হয়নি।

চল হয়নি কী বলছিস? তুই জানিস না। এ-দেশের ভদ্রলোকের ছেলেমেয়েরা গাঁজা খেতে শিখেছে আমেরিকান হিপিদের কাছ থেকে। সেই ষাটের দশকে। আমার কলেজের বন্ধুরাও খেত, কিন্তু আমি কখনও টান দিইনি।

লা ঝাঁঝিয়ে উঠে বলেছিল, আমিও তো প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়েছি, আমি কোনওদিন ওসব ছুঁয়ে দেখেনি। যত রাজ্যের বাজে ছেলেমেয়েরা।

টুকুন বলেছিল, ওসব নিয়ে একটু এক্সপেরিমেন্ট করলে মোটেই বাজে ছেলেমেয়ে হয় না। সুজয়কে তো তুমি চেনো, সে হায়ার সেকেন্ডারিতে থার্ড হয়েছিল—

মু ভালো রেজাল্ট করা অনেক ভালো ছেলেই কলেজে এসে বখে যায়। অনার্স পর্যন্ত

রাখতে পারে না। দেখবি, ওই সুজয়টা উচ্ছন্নে যাবে!

রুচি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল।

গাঁজা কাকে বলে, তা সে জানেই না তখন। উচ্ছন্ন কথাটারও মানে জানে না।

রজত বলেছিল, হ্যাঁ, আমরা একটু-আধটু ওসব করেছি বটে, তাও বাড়িতে লুকিয়ে। বাবা-মাকে ভয় পেতাম। তোরা খোলাখুলি এসব করিস কী করে?

শ্রীলা বলেছিল, তুমিই তো লাই দিয়ে মেয়েটার মাথা খেয়েছ!

টুকুন বলেছিল, বাবা-মায়ের কাছে লুকোনোটাই তো খারাপ! তোমাদের আত্মবিশ্বাসের অভাব ছিল। আমি ভালোই জানি, ওসব একটু-আধটু চেখে দেখলেও আমি নষ্ট হয়ে যাব না।

বাবা চুপ করে গেলেও মায়ের সঙ্গে রোজ-রোজ ঝগড়া লাগত টুকুনের। তারপর সুজয় উচ্ছন্নে গেল কি না কে জানে, চলে গেল দিল্লি, তার সঙ্গে সঙ্গে টুকুন। এখন ওরা জার্মানিতে।

তারপর থেকে বাড়িটা শান্ত হয়ে গেছে।

রুচি যখন এই ঘরে শুতো, তখন তার একটা আলাদা খাট ছিল। এখন সেই খাটটা কোথায় গেল কে জানে!

একটা রাত্তিরের কথা রুচি কিছুতেই ভুলতে পারে না। এমনিতে তার গাঢ় ঘুম। হঠাৎ একদিন ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, ঘর অন্ধকার, একেবারে মিশমিশে অন্ধকার নয়, কিছু একটা শব্দ পেয়ে তার মনে হয়েছিল, পাশের বিছানায় মা আর বাবা মারামারি করছে আর কী যেন বলছে!

সে ভয় পেয়ে মা বলে ডেকে উঠেছিল। সঙ্গে-সঙ্গে ওঁরা দুজনেই চুপ। আর কোনও শব্দ নেই।

সে উঠে আলো জ্বেলেছিল।

মা আর বাবা চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে পাশাপাশি। রুচি বাথরুমে গেল, ফিরে এল, আবার নিভিয়ে দিল আলো, এর মধ্যেও মা-বাবার ঘুম ভাঙল না। তবে সে মারামারির শব্দ আর কথা শুনেছিল কী করে? তবে কি সত্যি-সত্যি কিছু শোনেনি, সেটা স্বপ্ন?

সেই খটকাটা আজও যায়নি।

অনেকদিন পর রুচি শুয়ে পড়ল এই বিছানায়।

এতে কেমন যেন বড়দের গায়ের গন্ধ। অন্যরকম।

রুচি নিজে কবে, ঠিক কখন থেকে বড়দের জগতে ঢুকবে? বড়দের জগত মানে একলা-একলা বাড়ি থেকে বেরুবার স্বাধীনতা। নিজের বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া। নিজের পোশাক নিজে বেছে নেওয়া।

কলেজে ভরতি হলেই সেই স্বাধীনতা পাওয়া যায়? তার যে অনেক দেরি।

বিছানাটায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করতে-করতে হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ায় সে ধড়মড় করে উঠে বসল।

যদি সে এই বিছানায় ঘুমিয়ে পড়ত? মা-বাবার বিছানায় একদিন ঘুমোনো দোষের কিছু নয়, কিন্তু সে যে কিচ্ছু পরে নেই! মা-বাবা ফিরে এসে, তালা খুলে ঢুকে, ঘুমন্ত রুচিকে এই অবস্থায় দেখলে—

খাট থেকে নেমে, দৌড়ে গিয়ে ফ্রকটা পরে নিল রুচি। তার খিদেও পেয়েছে।

ফ্রিজ থেকে বার করল ভাত আর মাংস। স্টিলের বাটি মাইক্রোওয়েভ ওভেনে দেওয়া যায় না, রুচি জানে। রান্নাঘরে এসে খুঁজতে লাগল সাদা রঙের পাত্র।

হঠাৎ তার একটা দরজা চোখে পড়ল অন্য দিকের দেওয়ালে। সেদিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইল রুচি।

এ-দরজাটা অনেকদিন খোলা হয় না। এদিক থেকে ছিটকিনি বন্ধ। পাল্লায় গায়ে ঝুলকালি

জমে গেছে। আশ্চর্য, অন্য সময় এ-দরজাটার কথা মনেও পড়ে না।

ছিটকিনিটা খোলার চেষ্টা করল রুচি। খুব টাইট হয়ে গেছে, হাতে কালি লেগে যাচ্ছে। তবু খুলে দেখার জন্য ঝোঁক চেপে গেল রুচির। একটা হাত মোছার ন্যাকড়া এনে ছিটকিনিটা ধরে বেশ কিছুক্ষণ ধরে নাড়াচাড়া করতে-করতে খুলে গেল এক সময়।

একটু দুষ্টুমির হাসি ফুটে উঠল রুচির ঠোঁটে।

বড়রাও জানে না, এমন একটা কিছু জেনে ফেললে দারুণ আনন্দ হয়।

এই দরজাটার বাইরেও একটা খুব সরু বারান্দা। কোনও রকমে একজন মানুষ যেতে পারে। সেই বারান্দাটার আর একদিকে বাথরুম, সেখানেও একটা পেছনের দরজা আছে।

পুরোনো আমলের বাড়ি।

একসময় বাড়ির মেথররা পেছনের একটা ঘোরানো লোহার সিঁড়ি দিয়ে আসত বাথরুম পরিষ্কার করতে। সদর দরজা দিয়ে ঢুকে, ঘরের ভেতর দিয়ে মেথরদের বাথরুমে যাওয়ার নিয়ম ছিল না। এখন চোর-ডাকাতদের ভয়ে সে নিয়ম বদলে গেছে। ঘোরানো সিঁড়িটা এখনও আছে বটে, কিন্তু একেবারে তলার জায়গাটা ঘিরে দেওয়া হয়েছে পাঁচিল দিয়ে, বাইরের কেউ আসতে পারবে না।

কিন্তু রুচি তো ইচ্ছে করলে নেমে যেতে পারে এই সিঁড়ি দিয়ে! মা কিংবা বাবা সেটা খেয়ালই করেননি, এই সিঁড়িটার কথা মনেই নেই। তাহলে আর বাইরে তালা লাগাবার কী মানে হয়?

ঘোরানো সিঁড়িটা দিয়ে কয়েক ধাপ নামলও রুচি। সে বন্দিনী নয়, ইচ্ছে করলেই বেরিয়ে যেতে পারে, এই জানাটাই যথেষ্ট। এখন আর সে যাবে কোথায়!

পেছন দিকের পাঁচিলের ওপাশেই একটা বস্তি।

মা-বাবাদের ঘর থেকেও বস্তিটা দেখা যায়, কিন্তু সে ঘরের বস্তির দিকের জানলাটা বন্ধই থাকে সবসময়, যাতে ওখানকার আওয়াজ-টাওয়াজ শোনা না যায়। এই সিঁড়ি দিয়ে সবকিছু দেখা যায় স্পষ্ট। উঠোন, রান্নাঘর, স্নানের জায়গা। একটা টিউবওয়েলের ঘটাং-ঘটাং শব্দ হচ্ছে।

একটা ঘর থেকে বেরিয়ে, উঠোন পেরিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল একটি মেয়ে। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই আবার বেরিয়ে এসে উঠোনের তার থেকে কাপড়-জামা তুলতে লাগল।

এত ওপর থেকে দেখেও মেয়েটিকে চিনতে পারল রুচি। ওর নাম অলকা। এই বাড়িরই অন্য একটা ফ্ল্যাটে কাজ করেছে কিছুদিন। হয়তো রুচিরই বয়েসি, কিংবা এক বছরের বড়।

রুচিদের চব্বিশ ঘণ্টার কোনও কাজের লোক নেই। ঠিকে কাজের মেয়ে আছে দুজন, একজন ঘরের সব কাজ করে, আর একজন রান্না। রান্নার মেয়েটি সন্ধে সাতটার মধ্যে রাত্তিরের রান্না সেরে চলে যায়। ফ্ল্যাটের মধ্যে সর্বক্ষণ কোনও কাজের লোক ঘুরঘুর করবে, তা পছন্দ নয় শ্রীলার। সে পুরুষও রাখে না। নিউ আলিপুরে তার দিদির বাড়িতে একজন নতুন কাজের লোক জামাইবাবুকে কুত্তার বাচ্চা বলেছিল, তারপর থেকে সমস্ত আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে পুরুষ কাজের লোক রাখা নিষিদ্ধ।

বাসনমাজা-ঘরমোছার মেয়েটি একবার দেশে যাওয়ার জন্য এক মাসের ছুটি নিতে চেয়ে, বদলি হিসেবে এনেছিল এই অলকাকে। তাও এক বছর আগের কথা। অলকা মেয়েটি দেখতে বেশ, গায়ের রং মাজা মাজা, শুধু তার নাকে একটা নাকছাবি দেখে মজা লেগেছিল রুচির। তার চেনাশুনো কোনও মেয়ে নাকে ওসব পরে না।

মেয়েটির নাম শুনে শ্রীলা হাসতে-হাসতে বলেছিল, আমরা ছোটবেলায় দেখেছি, কাজের মেয়েদের নাম মানদা, ক্ষেমি, টেঁপির মা এই সবই হত। এখন কেমন সব শৌখিন নাম, সুপ্রিয়া, পাপিয়া, মল্লিকা। এখন আর তফাত বোঝার উপায় নেই। অলকা নামটাও বেশ।

রজত বলেছিল, তোমার শ্রীলা নামটাও কিন্তু তেমন আধুনিক নয়। ওই নামেও কাজের মেয়ে থাকতে পারে। নাম রাখার ব্যাপারে তো কোনও বিধিনিষেধ আরোপ করা যায় না!

শ্রীলা বলেছিল, আর তোমার রজত নামটাই বা কী এমন ভালো?

রজত বলেছিল, আমাদের অফিসে একজন বেয়ারার নামও রজত। সবাই যখন তাকে ডাকবার জন্য রজত, রজত বলে চ্যাঁচায়, তখন আমি চমকে চমকে উঠি। সকলেরই যে-কোনও নাম রাখার স্বাধীনতা আছে।

রুচি বলেছিল, মা, ওর নাম কিন্তু অলোকা নয়, অলকা!

তুই কী করে জানলি? অলোকা আর অলকায় কোনও তফাত আছে নাকি? সবাই তো অলোকাই বলে!

অলোকা নামের কোনও মানে হয় না।

মানে হয় না? এই মেয়েটা, তুই লিখতে পড়তে জানিস কিছু? নিজের নাম লিখতে পারিস?

হ্যাঁ, পারি।

নামের বানান কর তো।

অ, লয়ে ও কার, কা।

দেখলি?

ওটা ভুল।

রজত বলেছিল, আমার মনে হয়, রুচি ঠিকই বলছে। অলকা মানে কুবেরের রাজধানী। তবে, অলোকা শব্দটারও বোধহয় কোনও মানে আছে।

না নেই।

তুই এত জোর দিয়ে বলছিস কী করে রে রুচি?

আমাদের গানের ইস্কুলে গীতাদি একটা গানের ডিকটেশন দিচ্ছিল, তাতে একটা লাইন ছিল, 'কোন অলকার বিরহিণী রে, চাহনি ফিরে'। তখন গীতাদি বললেন, অলকা মানে অলকাপুরী। অলোকা লিখো না, তার কোনও মানে হয় না। বাড়ি এসে আমি ডিকশিনারি দেখলাম, অলকা কথাটার আরও মানে হয়। অলকানন্দা নদীর ধারের শহর; আট থেকে দশ বছর বয়েসের মেয়ে; মুখে চন্দনের ছাপ। আর অলোকা বলে কোনও কথাই নেই ডিকশিনারিতে। শুধু অলোক আছে, তার মানে হচ্ছে পাতাল। কিংবা কোনও নির্জন জায়গা।

একটি কাজের মেয়ের নামের প্রসঙ্গে হঠাৎ জানা গেল, রুচি খুব মন দিয়ে বাংলা পড়ে। রজত একেবারে চমৎকৃত।

মেয়েটিকে বেশ পছন্দই হয়েছিল শ্রীলার, কিন্তু রজত রাখতে রাজি হয়নি। এতটুকু মেয়ে, চাইলড লেবার সে পছন্দ করে না। তা ছাড়া মেয়েটি প্রায় তার নিজের মেয়ের সমবয়েসি। রুচি পড়াশুনো করবে, আর মেয়েটি ঘরের কাজে খেটেখুটে মরবে, এ-দৃশ্য খুবই দৃষ্টিকটু।

এ-বাড়িতে রাখা না হলেও অন্য একটি ফ্ল্যাটে কাজ পেয়েছিল অলকা। সিঁড়িতে প্রায়ই দেখা হত তার সঙ্গে।

একদিন রুচি তাকে বলেছিল, এই, তুমি কিন্তু নিজের নাম আর অলোকা লিখবে না।

বেড়ালের মতন ফ্যাঁস করে উঠে মেয়েটি বলেছিল, বেশ করব লিখব, তুমি ইস্কুলে যাও, আমি কি যাই? আমি তো পাতালের মেয়ে!

কথাটা খুব বুকে লেগেছিল রুচির।

সে ইস্কুলে যায়, অলকা কেন যায় না? ওরা গরিব বলে? রুচি যদি বস্তিতে জন্মাতো, তাহলে সে-ও লেখাপড়া না শিখে লোকের বাড়িতে ঝি-এর কাজ করত? কেউ তো ইচ্ছে করে কোথাও জন্মাতে পারে না। তবু জন্মের জন্য এত তফাত হয়ে যায়!

অলকাপুরী প্রায় স্বর্গের মতন, আর অলোকা মানে পাতাল। মেয়েটা কী রকম বলল, আমি তো পাতালেরই মেয়ে!

রুচিদের পাঁচতলার ওপরের ফ্ল্যাটটা অলকাপুরী, আর বস্তিটা পাতাল?

রুচিকে দেখলেই ও মেয়েটা কেমন যেন রাগ-রাগ করে তাকায়। রুচি সেধে কথা বলতে চাইলেও উত্তর দেয় না।

এখন রুচি দেখল, উঠোনের তার থেকে জামা-কাপড় তোলার পর অলকা রান্নাঘর থেকে একটা তোলা উনুন নিয়ে এল বাইরে। সেটা গনগন করে জ্বলছে। একটা মোড়া নিয়ে সেই উনুনের সামনে বসে অলকা রুটি সেঁকতে লাগল। কেমন যেন বড়দের মতন ভাব।

অলকা সকালবেলা দুধ আনতে যায়, কাজের বাড়ির লোক দোকান থেকে এটা-সেটা কিনে আনে। একদিন রুচি সর্দার শঙ্কর রোডে অণু মাসিদের বাড়ি গিয়েছিল মায়ের সঙ্গে, গাড়িতে যেতে-যেতে হঠাৎ দেখল, রাস্তা দিয়ে একা-একা হেঁটে যাচ্ছিল অলকা। এতদূরেও একা-একা আসার স্বাধীনতা আছে মেয়েটার। বস্তিতে জন্মেছে বলেই রুচির অনেক আগে আগেই সে বড়দের জগতে চলে এসেছে।

রণ চৌধুরীদের বাড়িতে রুচি কেন গেল না, তা কোনওদিন কারুকে বলবে না।

বাবলুর মামাটা খুব অসভ্য। ব্যস, এই পর্যন্তই যথেষ্ট।

টুম্পা আর বাবলু দুজনেই বেশ ভালো। ওদের সঙ্গে গল্প করতে, ক্যারাম খেলতে ভালো লাগে। কিন্তু ওদের মামাটা সেই ঘরে একবার আসবেই আসবে।

সেই মামাটা আরুণির সঙ্গে একই কলেজে পড়ে। আরুণির বন্ধু, সে নাকি দারুণ ডিবেট করে, আবার ক্রিকেট খেলায় কলেজের টিমের ক্যাপ্টেন। আরুণি তার এই বন্ধু ঋজুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

এটা কী করে হয়, একই মানুষ, অন্যদের কাছে ভালো, অথচ এক একজনের কাছে খারাপ? বাইরে ভালো, গোপনে খারাপ!

আরুণি থাকে এই বাড়িরই তিনতলার ফ্যাটে। রুচিদের মতন ওদের পরিবারটা অত ছোটো নয়। আরুণিরা তিন ভাই, দু-বোন, আবার একটা পিসিও থাকে, সর্বক্ষণ জমজমাট বাড়ি।

আরুণির নিজস্ব পড়ার ঘর নেই বলে সে প্রায়ই ছাদে উঠে আসে বই নিয়ে। ছুটির দিন সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত ছাদেই কাটায়। খোলা ছাদ, গরম কালে দারুণ গরম, তারও আরুণির ভ্রূক্ষেপ নেই। শুধু জলের ট্যাঙ্কটার পাশে একটুখানি ছায়া পড়ে।

রুচিদের ফ্ল্যাটে পাঁচতলায়, তার ওপরেই ছাদ। বাড়ির অন্য কেউ ছাদে বিশেষ যায় না।

একদিন দুপুরবেলা হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হল। সে দিনটা ছিল পনেরোই আগস্টের ছুটি। আরুণির ছাদে থাকবার কথা। বৃষ্টি পড়লে সে কী করে? কৌতূহলে রুচি ছাদে উঠে গিয়ে ছাদে উঁকি দিল।

বেশ বৃষ্টি পড়ছে। তারই মধ্যে জলের ট্যাঙ্কের পাশে গুটি-গুটি মেরে বসে আছে আরুণি। হাতে বই। বৃষ্টির ছাঁট গায়ে লাগছে, তাতে যেন হুঁশই নেই।

রুচি দৌড়ে গিয়ে বলল, অ্যাই, বৃষ্টিতে ভিজছ কেন? উঠে এসো, উঠে এসো!

আরুণি বই থেকে চোখ তুলে এমনভাবে তাকাল, যেন সে কিছু শুনতে পাচ্ছে না, দেখতেও পাচ্ছে না। সাদা চোখ।

তারপর বলল, তুই ভিজছিস কেন? তোর না গত মাসে জ্বর হয়েছিল? বৃষ্টিতে ভিজলে আবার তোর জ্বর হবে। যা পালা!

বৃষ্টিতে ভিজলে বুঝি তোমার জ্বর হতে পারে না?

না।

আ-হা-হা!

সত্যিই বৃষ্টিতে ভিজলে আমার কিছু হয় না। আমার নাম যে আরুণি।

নামের সঙ্গে আবার বৃষ্টি ভেজার কী সম্পর্ক!

আছে, আছে। যার নাম রুচি, সে বৃষ্টিতে ভিজলেই ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ করে হাঁচবে! তারপর জ্বরে পড়বে। আর যার নাম আরুণি, সে বৃষ্টিকে কলা দেখাবে। তুই আরুণি নামের মানে জানিস? আরুণি কে ছিল?

জানি না।

যা, ডিকশিনারি দেখ গিয়ে। এক্ষুনি যা।

আরুণির কাছ থেকেই রুচি ডিকশিনারি দেখতে শিখেছে। কথায়-কথায় সে হঠাৎ একটা শক্ত কথার মানে জিগ্যেস করে। রুচি না পারলে সে নিজে মানে বলে দেয় না। অভিধান দেখার জন্য জোর করে।

রুচিদের একটা বেশ মোটা বাংলা অভিধান আছে। সেটার মধ্যে শুধু কথার মানে নয়, অনেক গল্পও থাকে।

আরুণি নামে একজন ঋষিকুমার ছিল। মানে ছাত্র ঋষি, তার গুরুর নামটা বেশ শক্ত মতন। সেই গুরুর চাষবাসের জমি ছিল, একদিন খুব বৃষ্টিতে জমি-টমি ভেসে যাচ্ছে, তাই গুরুর আদেশে আরুণি গেল জমির আল আটকাতে। এত জোরে বৃষ্টির তোড় যে আল আর আটকানো যায় না। তাই আরুণি সেখানে শুয়ে পড়ে জল আটকে রাখল। সারাদিন দারুণ বৃষ্টি, আরুণির আর পাত্তা নেই, সন্ধের সময় গুরু তাকে খুঁজতে-খুঁজতে এসে দেখলেন, আরুণি জল-কাদা মেখে ভূত হয়ে আছে। তা দেখে গুরু তাকে আশীর্বাদ করলেন, তার একটা অন্য নাম হয়ে গেল। অত বৃষ্টিতে ভিজেও আরুণির জ্বর হয়নি!

নামের মিল আছে বলেই এই আরুণিও বৃষ্টিতে ভিজবে? পরেও রুচি দেখেছে, বৃষ্টির মধ্যে আরুণি দিব্যি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। ওর সত্যিই জ্বর হয় না।

একদিন রুচি জিগ্যেস করেছিল, আরুণিদা, তুমি মদ খাও?

মদ? হঠাৎ এরকম বাজে কথা বলছিস কেন?

খাও কিনা বল না!

না।

সত্যি বলছ?

তোর কাছে মিথ্যে কথা বলতে যাব কেন? মানুষ যাকে ভয় পায়, তাকে মিথ্যে কথা বলে।

তুমি গাঁজা খাও?

দূর-দূর!

তুমি কলেজে পড়ো, এ সব খাও না?

কলেজে পড়লেই বুঝি মদ-গাঁজা টানতে হবে? পুঁচকে মেয়ে, তোকে এ সব কে শিখিয়েছে?

আমার দিদি যে বলত—

আমি কোনওদিন সিগারেটও টেনে দেখেনি। আমার সামনে অন্য কেউ সিগারেট ধরাবার সাহস পায় না। কলেজের কিছু ছেলেমেয়ে ও সব করে, এক ধরনের ব্রাভাডো দেখাতে চায়।

ব্রাভাডো মানে কী?

দুঃসাহস দেখানেপনা। নিজেদের অ্যাডাল্ট প্রমাণ করার চেষ্টা। কারুর-কারুর কিছুদিন পরে ওই ঝোঁক কেটে যায়। কেউ-কেউ নেশাখোর হয়ে মরে!

রুচি বুঝতে পারে, কলেজে পড়া মানেই বড় হয়ে যাওয়া বটে, কিন্তু সব বড় হওয়া একরকম নয়।

আর একটা ব্যাপার, কেউ-কেউ যখন রুচির কাঁধে হাত রাখে, আদর করার নামে বুকে

জড়িয়ে ধরতে চায়, তখন তার খারাপ লাগে। আবার দু-একজন সম্পর্কে ইচ্ছে হয়, একবার অন্তত তার হাতটা ছুঁয়ে দিক।

আরুণি কখনও তার হাত ছোঁয় না। আর আরুণিরই বন্ধু ঋজু কেন ওরকম অসভ্যতা করে?

এখন বাড়িতে বাবা-মা নেই, আরুণিদা এলে অনেক গল্প করা যেত। আরুণিদা অনেক বই পড়ে। দিদির বইগুলো সব রেখে গেছে, আরুণিদা মাঝে-মাঝে বই ধার নিতে আসে।

কিন্তু বাইরের থেকে তালাবন্ধ, আরুণিদা আসবে কী করে?

আছে, আছে, উপায় আছে তো!

ওই যে মেথরদের সিঁড়ি!

ওই সিঁড়ি দিয়ে রুচি যেমন নেমে যেতে পারে, সেইরকমভাবে আরুণিও তো উঠে আসতে পারে ওপরে।

আরুণি জানবে কী করে ? টেলিফোনে ডাকা যায়।

কিন্তু প্রস্তাবটা শুনে আরুণি যদি বকুনি দেয়? আরুণি তো তার বন্ধু নয়। আরুণি বড়দের দলে চলে গেছে, বড়রা ছোটদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে না।

আরুণিদা, আরুণিদা, তুমি এখন কী করছ?

হঠাৎ এ-কথা জিগ্যেস করার মানে? ভ্যারেন্ডা ভাজছি।

না, সত্যি কী করছ বলো না?

আমি টিভি দেখি না! টেলিফোনে ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা গল্প করি না। রাত ন'টার সময় ভদ্রলোকেরা যা করে, তাই করছি। বই পড়ছি একটা।

তুমি একবার আমাদের ফ্ল্যাটে আসবে?

কেন?

আমাদের বাড়িতে এখন কেউ নেই।

বাড়িতে কেউ নেই বলে আমাকে আসতে হবে, এ-কী অদ্ভুত কথা।

যদি বলি, একা থাকতে আমার ভয় করছে!

ভয় করছে? সাধে কি আর পুঁচকে মেয়ে বলি। একা থাকলে ভয় পাওয়ার বদলে কত ভালো-ভালো কাজ করা যায়। প্রাণ খুলে বেসুরো গলায় গান গাইতে পারিস।

আমার মোটেই বেসুরো গলা নয়। তা ছাড়া রোজই তো গান প্র্যাকটিস করি। আমার আজ এমন কিছু করতে ইচ্ছে, যা অন্যদিন করি না।

তোর সেরকম ইচ্ছে হতে পারে। কিন্তু আমার সেরকম ইচ্ছে হবে কেন? আমার তো ইচ্ছে করছে, এই হাতের বইটা শেষ করতে। শোন, তোর যদি সত্যিই ভয় করে, তা হলে তুই চলে আয় আমাদের ফ্ল্যাটে। মাসিমা-মেসোমশাই যতক্ষণ না ফেরেন, এখানে কাটাতে পারিস। আমাদের সঙ্গে খেয়ে নিতে পারিস। তুতানের সঙ্গে টিভি দেখতে পারিস। আমাকে এখন বিরক্ত করবি না, যাঃ!

এটা টেলিফোনের কথা নয়। এমনি-এমনি কথা। যেন আরুণি দাঁড়িয়ে আছে সামনে। রুচি সবসময় দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে কথা বলে। সে জানে, ফোন করলে এই ধরনের কথা বলত আরুণি।

আরুণির কোনও কলেজের বন্ধু ডাকলে কি সে যেত না? রুচি যখন কলেজে যাবে, ততদিনে আরুণি কলেজ ছেড়ে চলে যাবে অফিস-টফিসে। আরুণিদার সঙ্গে তার বিয়েও হবে না। যদিও রুচি লক্ষ করেছে, বর আর বউদের মধ্যে, বউদের বয়েস বরেদের চেয়ে কম হয়। অন্তত পাঁচ-ছ বছর। তার নিজের বাবাই তো মায়ের চেয়ে ন'বছরের বড়। কিন্তু আরুণিদার কাছে ওর কলেজের অনেক

মেয়ে আসে। তাদের মধ্যে জয়তী নামের মেয়েটার সঙ্গে আরুণিদার বেশি ভাব। ওই জয়তীটাই আরুণিদাকে বিয়ে করে ফেলবে।

খিদে পেয়েছে, অথচ খেতে ইচ্ছে করছে না।

নিজের খাবার নিজে-নিজে খেতে কি ভালো লাগে?

অন্যদিন যা করে না, সেরকম একটা কিছু কী করা যায়?

রান্নাঘরের গ্যাস জ্বালাতে গিয়ে যদি আগুন ধরে যায় হঠাৎ? কালকের মাংস মোটেই খাবে না রুচি, সে ডিম সেদ্ধ করেই খাবে। সে গ্যাস জ্বালতে পারে।

তবু যদি আগুন লেগে যায়?

পাঁচতলায় আগুন লাগলে গোটা বাড়ির লোক ভয় পেয়ে যাবে। ছুটে এসে যদি দেখে, বাইরে তালা, তা হলে ধরেই নেবে ভেতরে কেউ নেই। পেছনের সিঁড়িটার কথা ক'জনের মনে আছে?

গ্যাসের আগুন জ্বেলে সেদিকে তাকিয়ে রইল রুচি।

কোনওদিন যা মনে হয়নি, সে রকম একটা অদ্ভুত চিন্তা মাথায় এল তার। এমনি-এমনি যদি আগুন না লাগে, তা হলে ইচ্ছে করে আগুন ধরিয়ে দিলে কেমন হয়?

দাউ-দাউ করে জ্বলছে আগুন। ছোটাছুটি করছে সারা বাড়ির মানুষ। বাথরুমের শাওয়ার খুলে চুপ করে বসে আছে রুচি।

ধারা জলের নীচে বসে থাকলেও কি তার গায়ে আগুনের আঁচ লাগবে?

যাঃ, ইচ্ছে করে কেউ নিজেদের বাড়িতে আগুন লাগায় নাকি? তাতে রুচি হয়তো প্রাণে মরবে না, পেছনের সিঁড়িটা তো আছেই। কিন্তু তার বইগুলো পুড়ে যাবে না। মা আর বাবার কত শখের জিনিস। চিঠির তাড়া। বিয়ের আগে মা আর বাবা কত চিঠি লিখেছে দুজনকে। দিদি একদিন সব পড়েছে আর হেসে গড়াগড়ি গেছে।

মা আর বাবার চিঠি পড়তে নেই। দিদি ও সবকিছু মানে না।

গত বছর দিদি একবার এসেছিল, কিন্তু এখানে একদিনও থাকেনি রাত্তিরবেলা। দিনের বেলা এসেছে মাঝে-মাঝে। সুজয়দা নাকি প্রতিজ্ঞা করেছে, কখনও সে মা-বাবার সঙ্গে দেখা করতে আসবে না।

বাইরের সিঁড়িটাই মন টানছে বারবার।

বাবা-মাকে সত্যি চমকে দেওয়া যায়, যদি রুচি ওই সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায় রাস্তায়। রাত্তিরে আর ফিরলোই না। বাবা আর মা অনেক রাতে এসে দেখবে, খাঁচার পাখি নেই। জেলখানায় বন্দী নেই।

কিন্তু কোথায় যাবে রুচি?

এখন রাত সাড়ে ন'টা মোটে, এখনও রাস্তায় মানুষজন হাঁটছে, কিন্তু তাদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা খুব কম। দিনেরবেলা মেয়েরা রাস্তায় বেরুতে পারে, কিন্তু রাত হলেই বাঘ-ভালুক বেরোয়, তারা শুধু মেয়েদের ধরে-ধরে খেয়ে ফেলে।

দিদি যখন প্রথম-প্রথম রাত ন'টা-দশটায় বাড়ি ফিরত, তার সঙ্গে তর্ক হত রোজ। মায়ের মুখে-মুখে কথা বলতে একটুও আটকাতো না দিদির।

দিদি একদিন বলেছিল, একতলার প্রীতম আর আমি সমান বয়েসি। সে-ও এই মাত্র বাড়ি ফিরল। ওর মা তো প্রীতমকে এই জন্য বকেন না। আমি কী দোষ করলাম?

মা বলেছিলেন, সমান বয়েসি হলেও, একটা মেয়ের কতরকম বিপদ হতে পারে। পুরুষদের তা হয় না।

দিদি বলেছিল, বিপদ মানে কী? আমি কি গলি ঘুঁজি বা মাঠের মধ্যে ঘুরি যে গুণ্ডা-বদমাইসদের পাল্লায় পড়ব? বড় রাস্তায় ট্রাম-বাসে যাতায়াত করি, তাতে আবার বিপদের কী আছে? আসলে

তোমরা মান্ধাতার আমলে পড়ে আছ। যেই বারো বছর বয়েস হয়ে যায়, অমনি ছেলে আর মেয়েদের সম্পর্কে তোমাদের বিচার আলাদা হয়ে যায়। মেয়েরা ছ'টার মধ্যে বাড়ি ফিরতে বাধ্য, আর ছেলেরা খেলতে যাবে, ন'টা-দশটায় বাড়ি ফিরবে।

মেয়েদের কেন বারণ করা হয়, তা তুই বুঝিস না?

হ্যাঁ, বুঝি। কিন্তু যে-ব্যাপারটার জন্য তোমরা ভয় পাও, সেটা বুঝি দিনের বেলা হতে পারে না? এই কথাটা জেনে রাখো, অনেক মেয়ে দিনের বেলাতেও চরিত্র নষ্ট করে!

চরিত্র নষ্ট করার মানেটা রুচি বোঝেনি।

এখনও তো ট্রাম-বাস চলছে। রুচি যদি বেরিয়ে একটা বাসে চেপে ডিপো পর্যন্ত চলে যায়? আবার ফেরত বাসে চেপে বসবে।

রুচি বেরিয়ে পড়ল।

সত্যি নয়, মনে-মনে।

সে হেঁটে যাচ্ছে, কেউ তার দিকে তাকাচ্ছে না। বাঘ-ভালুক ঘুরে বেড়াচ্ছে না। মোড়ের মাথায় আসতেই একটা দোতলা বাস এসে দাঁড়াল।

পয়সা আনতে ভোলেনি রুচি। তার একটা ছোট্ট ব্যাগ আছে। কন্ডাক্টর কাছে এসে জিগ্যেস করল, কোথায় যাবে?

রুচি তো জানে না, এই বাসটা কতদূর পর্যন্ত কিংবা কোন রাস্তা দিয়ে যায়। সে একটু ভেবেই বলল, ডিপো পর্যন্ত।

একতলা নয়, দোতলায় এসে বসেছে রুচি। আর মাত্র তিন-চারজন যাত্রী, দূরে-দূরে বসা। জানলা দিয়ে রাস্তাটাকে মনে হচ্ছে অন্যরকম। অনেক বেশি চওড়া। দোকানগুলো বন্ধ।

যদি ফেরার বাস আর না থাকে?

এই বাসেই ঘুমিয়ে থাকবে তা হলে? সকালবেলা বাসটা তো চলবেই। একটা রাত মা-বাবা চিন্তা করুক না, বেশ হবে!

খানিকবাদে নামবার জন্য একজন লোক উঠে দাঁড়াল। তাকে দেখেই ধক করে উঠল রুচির বুকটা। রেইন কোট পরা, লম্বা একজন মানুষ। এই তো সে! দরজার তালা দিয়ে একটা পাহাড়ের ছবি দিয়ে চলে এসেছিল।

কে এই লোকটি?

সে রুচির কাছে এসে থমকে দাঁড়িয়ে বলল, চলো, এবার নামতে হবে যে!

রুচির মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। বুক কাঁপছে। সে মিনমিনে গলায় বলল, এখানে নামতে হবে? কেন?

লোকটি বলল, বাঃ, এখানেই নেমে তো বাস পালটাতে হয়। সেই বাস পাহাড়ে নিয়ে যাবে। সে পাহাড় চূড়ায় বরফ জমে আছে।

রুচি বলল, পাহাড়ে যাব? আপনার সঙ্গে?

সেইরকম তো কথা ছিল। তুমি পাহাড়ে যেতে চাওনি?

কিন্তু আপনাকে তো আমি চিনি না।

যেতে যেতে চেনা হবে। আমি তো তোমাকে চিনি। দুজনের মধ্যে একজন চিনলেই যথেষ্ট।

পাহাড়ে যেতে তো অনেক দিন লাগবে। সোমবার আমার ভূগোল পরীক্ষা।

অনেকদিন কেন লাগবে? বড়জোর ঘণ্টা দু-এক। ওঠো, ওঠো, আর দেরি কোরো না--

ঘোরানো সিঁড়িটায় দাঁড়িয়ে আপনমনে কথা বলছে রুচি। কিন্তু ওই রকম একজন লোক সত্যি ছবি দিয়ে গিয়েছিল। আর কখনও দেখা হবে লোকটির সঙ্গে?

না, এত রাতে রাস্তায় বেরিয়ে বাসে চাপতে পারবে না রুচি। মা-বাবাকে অতটা

শাস্তিও দিতে পারবে না।

সে নীচের দিকে তাকিয়ে রইল।

পাশের বস্তির সেই উঠোনে এখন গোল হয়ে বসেছে তিন চারজন। তাদের সামনে থালা। গরম-গরম রুটি সেঁকে এক একজনের থালায় তুলে দিচ্ছে অলকা। কী তরকারি দিয়ে রুটি খাচ্ছে, তা বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু ওদের খাওয়ার মধ্যে যেন একটা আনন্দ রয়েছে। একটা হিল্লোল আছে। অন্য ধরনের সুখ আছে।

আবার খুব খিদে পেয় গেল রুচির।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল কয়েক ধাপ। মনে-মনে নয়, সত্যি। আবার কিছু মনে পড়ায় দৌড়ে উঠে এলে ওপরে।

গ্যাসটা জ্বালাই রয়েছে। সাংঘাতিক কাণ্ড হতে পারত। তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দিল গ্যাস। এবার সে ঠিক করে ফেলেছে, কী করবে। যা অন্য কোনওদিন করে না।

দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে সে আবার নামতে শুরু করল। যত নীচে নামছে, তত বস্তিটা স্পষ্ট হয়ে আসছে। তিনতলায় আরুণিদের ফ্ল্যাট। এখনও সে পড়ছে? এই সিঁড়ি দিয়ে রান্নাঘর আর বাথরুম ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না।

একেবারে নীচে নেমে এলে আর বস্তিটা দেখা যায় না। উঁচু দেওয়াল তোলা আছে। এখান দিয়ে বস্তিতে যাওয়ারও কোনও উপায় নেই।

সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে খানিকটা রাস্তা ঘুরে সে এল বস্তির মধ্যে। সেই উঠোনে। মোট চারজন নারী-পুরুষ গোল হয়ে বসে আছে, তাদের পাশে বসল।

দুজন পুরুষ, আর দুজন নারী। আর উনুনের কাছে মোড়ার ওপর বসা অলকা। ঘামে চকচক করছে তার মুখ। বাকি চারজন রুচিকে দেখল, চিনতে পারল কি না বোঝা গেল না, কেউ কিছু বললও না।

অলকা ঠিকই চিনেছে। তার মুখে রাগ-রাগ ভাব। সে রুচিকে বলেছিল, আমি পাতালের মেয়ে। রুচি নেমে এসেছে সেই পাতালে।

রুচি কিছু বলছে না দেখে অলকা জিগ্যেস করল, কী চাই?

রুচি তার চোখে চোখ রেখে মিনতি করে বলল, আমার খিদে পেয়েছে!

অলকা বলল, খিদে পেয়েছে তো এখানে কেন? দোকানে যাও!

রুচি তাকিয়ে দেখল। অন্যদের বাটিতে বেগুন পোড়া মাখা। ধনে পাতার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

রুচি বলল, আমায় একটা রুটি আর বেগুনপোড়া দেবে?

একজন প্রৌঢ়া রুচির দিকে একখানা বাটি এগিয়ে দিয়ে বলল, দে অলোকা, ওকে রুটি দে।

রুচি বলল, অলোকা নয়, অলকা।

অলকা ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, না, আমাকে অলোকাই বলবে।

অন্যরা এটা ঠিক বুঝতে পারল না। একজন বলল, আমার আর রুটি লাগবে না। এবার ওকে দে তো মা।

রুচি বলল, একখানা দিলেই হবে।

অলকা অন্যদিকে না তাকিয়ে এক মনে রুটি সেঁকছে, গরম রুটি উলটেও দিচ্ছে। ফুলে উঠেছে রুটিটা। অলকা দু-আঙুলে সেটা তুলে আলতো করে ফেলে দিল রুচির বাটিতে।

রুচি মাটিতে থেবড়ে বসে পড়ে, রুটিটা ছিঁড়ে-ছিঁড়ে খেতে লাগল বেগুনপোড়া দিয়ে।



ময়নার বোন

ময়না আর বুধনি খুন হওয়ার পরে কেটে গেছে দেড় মাস। এই জোড়া খুনের কোনও কিনারাও হয়নি, কেউ ধরাও পড়েনি। কে খুন করেছে তা সবাই জানে, পুলিশও জানে নিশ্চয়ই, কিন্তু পুলিশের খাতায় খুনের উল্লেখই নেই। লেখা আছে, অজ্ঞাত কারণে মৃত্যু।

দুজন মানুষ, বিশেষত দুটি যুবতী মেয়ে খুন হলে পুলিশ কত রকম তদন্ত করে, কুকুর আনে, ডিটেকটিভরা গোপন অনুসন্ধানে লেগে যায়, এ সব থাকে গল্পের বইতে। কিংবা শহরে ও রকম হয় বোধহয়। গ্রামের গরিব ঘরের দুটি মেয়ে কেন মরল, কীভাবে মরল, তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। দু-চারদিন পর সবাই ভুলে যায়।

অসুখে ভুগে মৃত্যু হলে তবু বাড়ির লোকেরা কয়েকদিন কাঁদে। কিন্তু খুন-টুনের ব্যাপার হলে বাড়ির লোকরা জোরে শোক প্রকাশ করতেও ভয় পায়। কেন না, খুনীরা তখনও নজর রাখে সে বাড়ির ওপর।

শুধু মিলন সমিতির লোকজনেরাই সে মৃত্যু মেনে নিতে পারেননি। সে সমিতির পরিচালক জীবনদা থানায় ঘোরাঘুরি করেছেন কয়েকবার, এস ডি ও-র কাছেও সুবিচার চেয়েছেন।

এস ডি ও কিংবা থানার দারোগা কেউই খারাপ ব্যবহার করেন না জীবনদার সঙ্গে। খাতির করে বসতে বলেন, চা খাওয়াতে চান। এস ডি ও ভদ্রলোকের ব্যবহার খুব সুহৃদয়, তিনি বলেন, এর মধ্যে ফাউল প্লে আছে বুঝতেই পারছি। কিন্তু থানার রিপোর্ট না পেলে আমি কিছু করতে পারি না। এস ডি পি ও সাহেবকে খোঁজ নিতে বলেছি।

থানার দারোগার নাম সুকোমল নন্দী। নিশ্চয়ই বাবা-মা অনেক আশা করে এই নাম রেখেছিলেন। এরকম নিষ্ঠুর মানুষ কদাচিৎ দেখা যায়। ব্যবহারে অবশ্য তা বোঝার উপায়টি নেই। নিজে চায়ের কাপ নিয়ে এসে রাখেন জীবনদার সামনে, টেবিলের ওপর।

সুকোমল নন্দীর একটাই কথা, খুনের প্রমাণ কোথায় বলুন!

ময়না আর বুধনির বাড়ি ছিল প্রায় পাশাপাশি। মাঝখানে শুধু কয়েকটা খেজুর গাছ। ময়না বিয়ের দু-বছরের মধ্যেই বিধবা, বুধনি'র বিয়েই হয়নি। ওরা দুজনেই তাঁত বোনা শিখছিল মিলন সমিতিতে।

একদিন ভোরবেলা দেখা গেল, একটা জলার ধারে পড়ে আছে ওদের মৃতদেহ। দীনু নামে একজন জেলে সেই সাতসকালে মাছ ধরতে গিয়ে ওদের দেখতে পায়। কারুর শরীরেই কোনও গুলির দাগ বা ছোরাছুরির ক্ষত নেই।

দারোগা বললেন, আত্মহত্যা, বুঝলেন স্যার, আত্মহত্যা ছাড়া আর কী হবে বলুন!

জীবনদা বললেন, আত্মহত্যা? দুজনে একসঙ্গে? আমাদের সমিতিতে আসতো, বেশ ভালোই কাজ শিখেছিল, সকলের সঙ্গে হেসে কথা বলত, খামোখা হঠাৎ আত্মহত্যা করতে যাবে কেন বলুন?

দারোগা বললেন, মানুষ কেন যে আত্মহত্যা করে, তা অনেক ক্ষেত্রেই জানা যায় না। হয়তো ওদের প্রেমঘটিত কোনও ব্যাপার ছিল।

প্রেম শব্দটা শুনে জীবনদা ভুরু কুঁচকে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। ময়না আর বুধনির জীবনে প্রেমের মতন শৌখিন ব্যাপার একেবারেই অবাস্তব। দুজনেরই তেমন রূপ বা স্বাস্থ্য ছিল না।

জীবনদা বললেন, আত্মহত্যা, শেষরাতে একটা জলার ধারে এসে আত্মহত্যা করবে কেন? এর কোনও যুক্তি আছে।

একগাল হেসে দারোগা বললেন, এই দেখুন, আবার যুক্তির কথা বলছেন। মেয়েরা কখন কী করে, কেন করে, তা বোঝা শিবের বাপেরও অসাধ্য। ওরা কেন বিছানায় শুয়ে আত্মহত্যা করেনি, কেন গলায় দড়ি দিয়ে ঝোলেনি কিংবা গায়ে আগুন দেয়নি তা বোঝার আর কোনও উপায়ই নেই। হয়তো ওদের বাড়ির লোকদের ঝামেলায় ফেলতে চায়নি। সারা শরীরে কোনও ইনজুরি নেই, কী করে খুনের কেস বলব বলুন!

—ইনজুরি না থাকলেও খুন হতে পারে না? গলা টিপে মারতে পারে।

—গলায় সেরকম কোনও দাগ ছিল না। রিপোর্টে কিছু লেখা নেই।

—যিনি রিপোর্ট লিখেছেন, তিনি না দেখতে পারেন। কিংবা দেখলেও ইচ্ছে করে না লিখতে।

—আমি নিজে গেসলাম ইনস্পেকশানে। গলায় কোনও হাতের ছাপ দেখিনি।

—আরও অনেক রকমভাবে খুন করা যেতে পারে। বিষ খাইয়ে, মুখে বালিশ চাপা দিয়ে...। পোস্ট মর্টেমেরও কোনও ব্যবস্থা হল না।

—এটা কি মশাই বিলেত-আমেরিকা পেয়েছেন?

দারোগাবাবু বোঝালেন যে, গ্রামদেশে সে রকম ব্যবস্থাই নেই। ডেডবডি রাখার জন্য মর্গ নেই। প্রচণ্ড গরমে বডি পরদিনই পচতে শুরু করেছিল। পোস্ট মর্টেমের জন্য জেলা শহর কিংবা কলকাতায় পাঠাতে হয়। পুরো বডি না পাঠিয়ে ভিসেরা নামে একটা প্রত্যঙ্গ পাঠালেও চলে। শহর থেকে তার রিপোর্ট আসতে কত বছর লাগবে তার ঠিক নেই। অনেক সময় রিপোর্ট আসেই না। ডোমদের বলা হয়েছিল, তারা ভিসেরার ব্যাপারটা বুঝতেই পারেনি, দুটো বডিই পুড়িয়ে দিয়েছে।

জীবনদা উত্তেজিতভাবে বললেন, এসব আপনি যাই-ই বলুন বড়বাবু, আপনিও জানেন, আমিও জানি, মেয়ে দুটো খুন হয়েছে!

দারোগাবাবু হাতের পেন্সিল দিয়ে টেবিলে টক-টক শব্দ করতে-করতে শান্ত গলায় বললেন, আপনি জানতে পারেন, কিন্তু আমি জানি না। খুনের মোটিভ কী? দুটো অবলা মেয়েছেলে, গায়ে গয়নাগাঁটিও ছিল না, তাদের কেন খুন করা হবে বলুন। কার দায় পড়েছে!

জীবনদা বললেন, তার কারণ আমাদের সমিতিতে যোগ দেওয়ার আগে ওরা দুজনে মদ বিক্রি করত। জেলেপাড়ায় চুল্লুর ঠেকে বসত!

দারোগাবাবু ভুরু তুলে সবিস্ময়ে বললেন, তাই নাকি?

জীবনদা বললেন, আপনি এটা জানতেন না। এখানে চুল্লুর ঠেক যেন দিন-দিন বাড়ছে, তা জানেন আশা করি?

—তা জানি। আমরা মাঝে-মাঝেই রেড করি। ব্যাটাদের ধাওয়া করে দূর করে দিই।

—না, ওদের দূর করে দ্যান না। এক জায়গা থেকে সরে অন্য জায়গায় বসতে বলেন। ওদের কারবার ঠিকই চলছে।

—এ তো হল অন্য কথা। আগে বলুন, মেয়ে দুটো চুল্লু বিক্রি করত বলেই খুন হল কেন? আমি তো এর মানে বুঝতে পারছি না। তাও একজন নয়, দুজনে এক সঙ্গে।

—এর মানে খুবই সোজা। চুল্লু বিক্রি করলে ওরা খুন হত না। আরও তো কত মেয়ে চুল্লু বেচে। শুধু এই দুজন চুল্লুর ঠেক ছেড়ে দিয়ে যোগ দিয়েছিল আমাদের সমিতিতে। ওই নোংরা কাজের মধ্যে জড়িত না থেকে ওরা সৎ ভাবে চেয়েছিল। তাঁতের শাড়ি বোনা শিখে নিজেরা উপার্জন করতে পারত।

—তা বেশ তো। আপনাদের সমিতির ওপর যাতে কখনও হামলা না হয়, আমরা সেদিকে নজর রাখি।

—সে কথা হচ্ছে না। আমাদের সমিতির ওপর হামলা করার সাহস কারুর নেই। যাতে চুল্লুর ঠেক ছেড়ে আর কোনও মেয়ে আমাদের সমিতিতে আসতে না চায়, সৎপথে ফিরে যেতে না চায়, তাই ওই দুটি মেয়েকে খুন করে অন্যদের ভয় দেখানো হল।

—এসব, দাদা আপনি গপ্পো বানাচ্ছেন। প্রথমত খুনেরই কোনও প্রমাণ নেই।

—সে প্রমাণ আপনারাই লোপ করেছেন। কারা খুন করেছে, তাও আপনি ভালো জানেন!

—বটে! আপনিই বলে দিন না।

—যারা চুল্লুর ব্যাবসা চালায়। কার্তিক আর দুলাল যাদের পাণ্ডা! দুলালের সঙ্গে আপনার খুবই দহরম মহরম আছে শুনেছি।

—শুনেছেন? বেশ করেছেন। এ বার আমার নামে রিপোর্ট করুন ওপরওয়ালার কাছে। লিখুন যে, আমি ঘুষ খাই! লিখুন, লিখুন, ভালো করে লিখুন! তবে, একটা কথা আপনাকে বলে দিই দাদা। আপনি কার্তিক আর দুলালের নাম করলেন, ওদের আড়ালে কে-কে আছেন, তা কি জানেন? জানেন, চুল্লুর ব্যাবসা মানে কত কোটি টাকার ব্যাবসা? এসব জানার চেষ্টা করুন।

॥ ২ ॥

মিলন সমিতিতে যোগ দিয়ে ময়না আর বুধনি তাঁতের কাজ শিখে কিছু হাত খরচ পেতে শুরু করেছিল। চুল্লুর ঠেকের রোজগারের চেয়ে তা কিছু কম হলেও এই উপার্জনে তার আনন্দ ছিল বেশি। চুল্লুর ঠেকে বসবার সময় তাকে অনেক অপমান সহ্য করতে হত, নেশার ঝোঁকে কেউ-কেউ তার হাত ধরে টানত। মিলন সমিতিতে চমৎকার হাসি খুশি পরিবেশ, কাজের সঙ্গে-সঙ্গে গান গাওয়া হত।

এই উপার্জনের টাকায় ময়না তার ভাই-বোনের জন্য নতুন জামা কিনে দিয়েছে। কখনও কিনে আনত পাটালি গুড়, ফুলকপি। চাল-ডাল কিনেও সংসারের সাহায্য করত, একবার শখ করে বেশি দাম দিয়ে কিনে এনেছিল মুগের ডাল। এর আগে, এ-বাড়িতে কখনও মুগের ডাল রান্না হয়নি।

ময়নারা চার ভাই বোন, তার মধ্যে বড় দাদা আসানসোলে কিছু একটা কাজ নিয়ে চলে গেছে, এ-বাড়ির সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখে না। অন্য ভাই-বোন দুটি ছোটো। মা নেই। নিজস্ব জমি জিরেও নেই, বাবা অন্যের জমিতে মজুরি করে। ময়নার মৃত্যুতে শোক করার চেয়ে বেশি দুশ্চিন্তা হল অভাব নিয়ে। ময়নার উপার্জনটুকু বন্ধ হয়ে গেল, সেই অভাবটা ভরাট হবে কী করে?

বুধনিদের সংসারে অনেক লোক, তিনটি বাচ্চাকে নিয়ে এগারোজন, সেই জন্য এক জনের চলে যাওয়াটা বেশি টের পাওয়া যায় না। কিন্তু ময়নার অভাবে তাদের বাড়িটা যেন ফাঁকা হয়ে গেছে।

ময়নার পরের বোনের নাম সতী, সবে মাত্র সে সতেরোয় পা দিয়েছে। সতী ইস্কুলে পাঁচ ক্লাস পর্যন্ত পড়েছে, তারপর পড়া ছেড়ে দিতে হয়েছে, কারণ বড়ো ইস্কুল অনেকটা দূরে, হেঁটে যাওয়া যায় না। বাসে কিংবা ভ্যান গাড়িতে চেপে ইস্কুলে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। সে এখন বাড়িতে বসেই বড়ি দেয়, ঘুঁটে দেয়, তার উপার্জন যৎসামান্য।

জীবনদা মাঝে-মাঝে আসেন এ-বাড়িতে। একটা সাইকেল নিয়ে তিনি গ্রামে-গ্রামে ঘুরে বেড়ান, ভয় ওর কিছু নেই। আশ্চর্য ব্যাপার, আজ পর্যন্ত কেউ তাঁর গায়ে হাত তুলতে সাহস পায়নি। রাজনীতির ছেলেরাও তাঁকে সমীহ করে। কারণ, তিনি কোনও দলেই নেই। মিলন সমিতি তাঁর ধ্যানজ্ঞান, এই সমিতির এমনই সুনাম হয়েছে যে খবরের কাগজের লোকেরা প্রায়ই সেই সমিতির কাজকর্ম দেখতে আসে।

জীবনদার ইচ্ছে, সতীকে তিনি তাঁদের সমিতির কাজে লাগিয়ে দেবেন। সে-ও সেখানে

নানারকম হাতের কাজ শিখে স্বাধীনভাবে উপার্জন করতে পারবে। শেখার সময়ও সে পাবে হাত খরচ।

সতীর বাবা তাতে কিছুতেই রাজি নয়। আবার এই বিপদের ঝুঁকি নেওয়া যায়? ময়নাকে যারা মেরেছে, তাদের কোনও শাস্তিই হল না। এরপর তারা যদি সতীকেও মারে?

জীবনদা বললেন, ওইসব গুন্ডা-বদমাশদের কাছে হার স্বীকার করতে নেই। তাতে ওরা আরও বেড়ে যায়। আমাদের সমিতির লোক সতীকে নিয়ে যাবে আবার বাড়ি পৌঁছে দেবে। ভয়ের কিছু নেই।

ময়নার বাবার নাম ফটিক। তার চেহারাটা বড়, কিন্তু বুকে হাঁপানির রোগ আছে। শীতকালেও সে গায়ে কোনও জামা রাখতে পারে না। মেজাজটা সবসময় খিটখিটে হয়ে থাকে।

সে বলল, আমারে মাপ করেন দাদা। আপনি ভালো কাজ করতেছেন তা জানি। কিন্তু ওসব আমাদের সহ্য হবে না। যেমন করে পারি, এ-মেয়েরে আমি বিয়ে দিয়ে পার করে দেব!

জীবনদা ধমক দিয়ে বললেন, মেয়ে কি কুকুর-বেড়াল নাকি যে পার করে দেবে? সতীকে বরং ডাকো, জিগ্যেস করে দেখি, ও কী চায়। ও যদি রাজি থাকে—

সতী মেয়েটি আরও অল্প বয়েস থেকেই চুপচাপ স্বভাবের। তার কোনও চাহিদা নেই, দাবি নেই। এতদিন ছেঁড়াখোঁড়া ফ্রক পরে থাকত, এখন শরীর বাড়ন্ত হয়েছে, শাড়ি না পরলে চলে না। মিলন সমিতি থেকে টাকা পেয়ে ময়না শখ করে নিজের জন্যেও একটা শাড়ি কিনেছিল, খুন হওয়ার রাতে ভাগ্যিস সে শাড়িটা তার পরনে ছিল না। এখন সতী সেই শাড়ি পরে বাইরের লোকের সামনে বেরোয়।

পাঁচ ক্লাস পর্যন্ত পড়ার ফলে এখন সে যে-কোনও ছাপা অক্ষর দেখলেই পড়তে চায়। ঠোঙার কাগজ পর্যন্ত। বাড়িতে কোনও বই নেই, পঞ্চাননতলায় সপ্তাহে দু-দিন হাট বসে, সেই হাট ভেঙে গেলে অনেক ছেঁড়া খবরের কাগজ পড়ে থাকে, সতী সেগুলো কুড়িয়ে আনে।

জীবনদার প্রশ্ন শুনে সে উত্তর দিতে চায় না। অনেকবার পীড়াপীড়ির পর বলে, জানি না!

জীবনদা বিরক্ত হয়ে ওঠেন। এই ন্যাকামির জন্যই মেয়েরা কিছু করতে পারে না। একটা সতেরো বছরের মেয়ে নিজের ভালো মন্দ বুঝবে না? পয়সা কড়ির এত টানাটানি, বিক্রি করার মতন জমিও নেই, তা হলে এ-মেয়ের বিয়ে হবে কী করে?

সেদিনের মতন জীবনদা চলে গেলেন। তার পরের দিনই, বৃষ্টি পড়ছে টিপটিপ করে, পিছল হয়ে গেছে উঠোন, মাটি ফুঁড়ে উঠে আসছে কেঁচো, তারই মধ্যে ভিজতে-ভিজতে হাজির হল এক আগন্তুক।

লোকটির পরনে পাজামা আর ছাই রঙা শার্ট। তার গলায় একটা রুমাল বাঁধা। গলায় কেন রুমাল বাঁধে কেউ-কেউ? রুমাল তো পোশাক নয়, এখন শীতকালও নয় যে মাফলারের মতন কাজ করবে। তবু কিছু লোক গলায় রুমাল বাঁধে বোধহয় শুধু এটুকুই বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য যে সে বিশেষ কিছু শক্তির অধিকারী।

দাওয়ায় বসে বিড়ি টানছিল ফটিক, সে জিগ্যেস করল, কে?

লোকটি নিজের পরিচয় না দিয়ে বলল, আমায় দুলালদা পাঠিয়েছে।

বৃষ্টির দিনে ফটিকের হাঁপানি বাড়ে, তাতে আরও মেজাজ খারাপ হয়। বৃষ্টির জন্য মাঠের কাজও বন্ধ।

সে বলল, কোথাকার দুলাল?

লোকটি সেই দুলালেরও পরিচয় না দিয়ে বলল, আমি কালকেপুর থেকে আসছি। আপনার মেয়ে হঠাৎ মারা গেছে শুনেছি? সে কিছুদিন দুলালদার বিজনেসে কাজ করেছে। তা দরুণ কিছু টাকা পাওনা আছে। সামনের হপ্তায় পেয়ে যাবেন। আর আপনার আর একখানা মেয়ে আছে, তাকে

দুলালদা কাজ দেবে বলেছে। আমার সঙ্গে যদি যায়---

টাকা পাওয়ার কথা শুনে প্রথমে একটু উৎসাহিত হলেও পরের কথাটায় চমকে উঠল।

—আমার মেয়ে তোমার সঙ্গে যাবে? কোথায় যাবে?

—ওই যে বললুম, দুলালদা তাকে কাজ দেবে বলেছে! শুধু-শুধু বাড়িতে বসে থাকবে কেন?

—কাজ দেবে? চুল্লুর ঠেকে বসবে? রাত বিরেতে বাইরে থাকবে? না যাবে না। যাবে না, যাবে না, যাবে না! আমার টাকার দরকার নেই। আমার মেয়ে বাড়িতে বসে থাকবে, তাতে তার কী?

ফটিক নিজে খুব চুল্লুর নেশা করত একসময়। রোজগারের বেশিরভাগ অংশই বাড়িতে আনতে পারত না।

ময়নার মৃত্যুর পর সে আর চুল্লু ছোঁয়নি। তার মনে হয়, ওই চুল্লুর মধ্যে মিশে আছে তার মেয়ের রক্ত।

লোকটি বলল, ওখানে না। দুলালদা নিজের বাড়িতে কাজ দেবে।

কোথা থেকে দারুণ সাহস পেয়ে গেল ফটিক তা কে জানে। সে হঠাৎ চেঁচিয়ে বলল, নিকাল। আমার বাড়ি সে নিকাল। আমার মেয়ে কারুর বাড়িতে কাজ করতে যাবে না। ওকে আমি মিলন সমিতিতে পাঠাব। হ্যাঁ, পাঠাবোই তো!

গলায় রুমাল-বাঁধা লোকটি একটুও উত্তেজিত না হয়ে, আরও কাছে এগিয়ে এসে বলল, শুধুমুধু চ্যাঁচ্যাচ্ছেন কেন? দুলালদা আপনাদের ভালোর জন্যই বলেছে। আপনার মেয়ে কাজ করলে টাকা পাবে। আপনি পাঠাতে না চান, পাঠাবেন না! তবে আর একটা কথা জেনে রাখুন, ওই মিলন সমিতি-ফমিতি টিকবে না। উঠে যাবে! একটা কথা শুনুন, মেয়েটা আমার সঙ্গে চলুক, ওখানে গিয়ে দেখুক, কাজটা তার পছন্দ কি না। পছন্দ না হলে ফিরে আসবে! দুলালদা ওকে নিয়ে যেতে বলেছে।

ফটিক কিছুতেই পাঠাতে রাজি নয়। সে আরও চ্যাঁচামেচি শুরু করল।

এর মধ্যে বেরিয়ে এল সতী। আর হাতে একটা পুঁটুলি। পরনে ময়নার সেই শাড়ি।

সে মৃদু গলায় বলল, বাবা, আমি যাব। আমি কাজ করব।

স্তম্ভিত ফটিক প্রথমে কোনও কথা বলতে পারল না। তারপর সে মেয়ের হাত ধরে আটকাবার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না ধরে রাখতে।

সতী চলে গেল।

॥ ৩ ॥

দুলালের বাড়ি একটা নয়। সে তিন জায়গায় থাকে। সে যখন যেখানে যায়, সতীকেও সঙ্গে যেতে হয়। প্রত্যেকটা বাড়িতেই বেশ কিছু নারী-পুরুষ থাকে, সকলেই কী সব কাজে ব্যস্ত, তা সতী ঠিক বোঝে না।

তবে, একটা ব্যাপার সে বোঝে, এই সব নারী-পুরুষরা তার গ্রামের চেনাশুনো মানুষদের মতন নয়। এদের খাওয়া দাওয়ার সময়ের ঠিক নেই, ঘুমোবার সময়ের ঠিক নেই। কখনও খাওয়া হয় রাত দুপুরে, সারারাতে কেউ বিছানায় যায় না। আবার দিনের বেলা ঘুমোয়। এরা কেউ কারুর স্বামী বা স্ত্রী নয়, অথচ সেরকমই ব্যবহার করে মাঝে-মাঝে।

দুলাল প্রথম থেকেই পছন্দ করেছে সতীকে। সে বলে দিয়েছে, তুই সব সময় আমার সঙ্গে থাকবি অন্য কেউ গায়ে হাত দিতে এলে আমাকে বলে দিবি, তার হাত ভেঙে দেব!

দুলালের কাছে সতী তার কুমারীত্ব বিসর্জন দিল বিনা আপত্তিতে। সে যেন বুঝে গেছে, এটাই তার বেঁচে থাকার একমাত্র উপায়। মিলন সমিতিতে যোগ দিলে এরা তাকে ছাড়ত না। তারও

অবস্থা হত দিদির মতন।

চুল্লুর ঠেকে অবশ্য তাকে বসতে হয়নি এখনও।

মাসের পর মাস কেটে গেল, সতী আর নিজের বাড়িতেও যায়নি একবারও। একজনের হাত দিয়ে মাঝে-মাঝে কিছু টাকা পাঠায়। তার বাবাও এখন সব বুঝেছে, টাকা নিতে আপত্তি করে না।

এর মধ্যে একদিন একটা ঘটনা ঘটল।

দুলালের প্রধান জুড়ি কার্তিককে দেখা যায় মাঝে-মাঝে। দু-জনে অনেক রাত জেগে নানারকম শলাপরামর্শ করে। সেইসঙ্গে মদ্যপানও চলে। এরা নিজেরা অবশ্য চুল্লু খায় না।

দুলাল অনেক মদ খেয়েও তেমন বেচাল হয় না। কিন্তু কার্তিক যেন মাতাল হতেই ভালোবাসে। মাতাল হয়ে সে হল্লা করে, নাচে, মেয়েদের ধরে টানাটানি করে।

ওদের মদ্যপানের সময় সতীকে পাশে বসতে হয়। সে টুকটাক খাবার এনে দেয়। গেলাসে মদ ঢেলে কতখানি জল মেশাতে হয়, তাও সে শিখে গেছে।

সে রাতে প্রচুর মদ খাওয়ার পর, কার্তিককে থেকে যেতে বলা হলেও সে শুনল না, জরুরি কাজের নাম করে চলে গেল। তার জিপ গাড়ি আছে, নিজেই চালায়। কোনওদিন অ্যাকসিডেন্ট করেনি। সে রাতেও কার্তিকের জিপ ঠিকই চলছিল, হঠাৎ তার বমি পেয়ে গেল। একটা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে রাস্তা। বমি পাচ্ছে কিন্তু বমি বেরুচ্ছে না, প্রবলভাবে ওয়াক-ওয়াক শব্দ করতে-করতে সে গাড়ি থামাতে বাধ্য হল। নীচে নামতে গিয়ে সে পড়ে গেল ধপাস করে। দু-এক মিনিট ছটফটিয়েই একেবারে স্থির।

পরদিন কী করে যেন রটে গেল, কার্তিককে মাঝ রাত্তিরে জঙ্গলের মধ্যে ভূতে মেরে ফেলেছে। এর আগে কত বেশি মদ খেয়েছে সে। এমনভাবে কেন মরতে যাবে?

পূর্ণিমা নামের একটি মেয়ে চুপিচুপি সতীকে বলল, বেশ হয়েছে, ঠিক হয়েছে। ওই কার্তিক হারামজাদাটাকে মেরেছে ময়না আর বুধনির ভূত। ওদের তো কার্তিকটাই গলা টিপেছিল।

পূর্ণিমা তিনটে চুল্লুর ঠেক চালায়। নিজেও খুব নেশা করে, সে নাকি দুলালের ডানহাত। কিন্তু সে মনে-মনে এদের এত ঘেন্না করে তা সতী কল্পনাও করেনি।

কার্তিকের মৃত্যুসংবাদ শুনে খুব ভয় পেয়ে গেল দুলাল। তিনদিন সে বেরুলোই না ঘর থেকে। সত্যি কার্তিককে ভূতে মেরেছে? ময়না-বুধনির ভূত এসে প্রতিহিংসা নিচ্ছে? কার্তিক ওদের গলা টিপে ধরেছিল আর দুলাল একটা বালিশ চাপা দিয়েছিল ওদের মুখে।

তিনদিন পর একটু ঠিক হলেও সন্ধের পর আর একা কোথাও যায় না দুলাল। বেরুলেও তাড়াতাড়ি ফিরে আসে। সতীকে নিয়ে ঘরে খিল দেয়। মনে-মনে তার ধারণা হয়েছে, সতী কাছে থাকলে ময়না এদিকে এগোবে না।

আরও কয়েক মাস পরে সতী একদিন বমি করল। সে মদ খায় না। এ অন্যরকম বমি।

পূর্ণিমা বলল, এই রে! পেট বাধিয়েছিস! খসাতে গিয়ে মরে না যাস দেখিস!

সতীর খুব মরার ভয়। সে বেঁচে থাকতে চায়, যে-কোনও উপায়ে।

পূর্ণিমার কাছ থেকেই সে জানল, এখানে বাচ্চাকাচ্চা কেউ পছন্দ করে না, তাতে অনেক ঝামেলা। এক ডাক্তারবাবুর সঙ্গে পেট খসাবার ব্যবস্থা করা আছে, তবে পাস্তু নামে একটি মেয়ে এই করতে গিয়ে মারা গিয়েছিল।

আর যদি সতী তার সন্তানকে নষ্ট করতে না চায়? সে বাপের বাড়ি ফিরে যাবে।

পূর্ণিমা বলল, পাগল নাকি? এখানে একবার ঢুকলে আর বেরুনো যায় না, জানিস না? দ্যাখ না, দুলাল তোকে বড়জোর আর বছরখানেক পেয়ার করবে, তারপর তোকে পাঠিয়ে দেবে অন্য একটা ডেরায়।

সতী তার পায়ে ধরে অনুরোধ করল, এখুনি যেন পূর্ণিমা তার গর্ভের অবস্থা অন্য কারুকে না বলে।

এক রাত্তিরে সতী খুব নরমভাবে দুলালকে জিগ্যেস করল, তোমার বাবা হতে ইচ্ছে করে না? নিজের ছেলে কিংবা মেয়েকে কোলে বসিয়ে আদর করতে ইচ্ছে করে না?

সতীর থুতনি ধরে দুলাল বলল, তোর বুঝি বউ হওয়ার খুব শখ হয়েছে? ল্যাংড়াকে বিয়ে করবি তো বল, ব্যবস্থা করি। আমি ওসব ঝুট ঝামেলার মধ্যে নেই।

দুলালের মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল সতী।

তার কয়েকদিন পরেই সে চুপিচুপি পালাল দুলালের ডেরা থেকে। কোথায় যাবে সে? বাড়িতে ফিরলে দুলালের লোকজন ঠিক আবার ধরে আনবে?

মাঝ রাত্তিরে জানলায় টকটক শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গেল জীবনদার। জানলা খুলে দেখলেন, ছায়ার মতন দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে। সঙ্গে আর কোনও লোক নেই।

সতীকে তিনি একবার মাত্র দেখেছেন, তাই চিনতে পারলেন না।

সতী বলল, আমি ময়নার বোন।

জীবনদার খুব রাগ এসে গেলেও অনেকটা সামলে নিয়ে বললেন, সেই এলি এখানে। এত দেরি করে? আমি যখন আনতে গিয়েছিলাম, তখন মুখ দিয়ে একটা কথা বেরোয়নি।

সতী বলল, আমি এখানে বেশিদিনের জন্য থাকতে আসিনি। আজকের রাতটা। তারপর আপনি আমায় থানায় পৌঁছে দেবেন?

জীবনটা বললেন, থানায়? থানায় গিয়ে কী হবে?

যে-সতী এমনিতে কথাই বলতে চায় না, সে এখন স্পষ্ট করে বলল, থানায় দুলালের নামে নালিশ করব। আমার পেটে দুলালের সন্তান। আমার দিদিকে ওরা খুন করেছে, তা প্রমাণ করা যায়নি, কিন্তু আমার এ-অবস্থার জন্য ও শাস্তি পাবে না? আইন আছে তো!

জীবনদা বললেন, ভেতরে এসে এখন শুয়ে থাক। পরে ওসব কথা হবে, তোর পেটে যে দুলালের সন্তান তার প্রমাণ হবে কী করে?

সতী বলল, রক্ত পরীক্ষাতেই বোঝা যাবে। আর একটা কী আছে না, ডি এন এ।

জীবনদা বললেন, কী বললি? কী বললি? তুই এসব জানলি কী করে?

সতী বলল, আমি তো খবরের কাগজ পড়ি। মুখস্ত করে রেখেছি। এখন তো সহজেই জানা যায়।

পরের দিন সতীকে রেখে দেওয়া হল পাহারা দিয়ে।

এর মধ্যে জীবনদা যোগাযোগ করলেন তাঁর এক সাংবাদিক বন্ধুর সঙ্গে। প্রতুল দাস নামে এক উকিলকেও ডাকা হল। তারপর সদলবলে গেলেন থানায়।

দারোগাবাবু এ বার আর কথার মার প্যাঁচে জিততে পারলেন না।

কোনও মেয়েকে গর্ভবতী করে তাকে স্ত্রীর স্বীকৃতি না দেওয়াটা দণ্ডনীয় অপরাধ। আদালত থেকে একরকম নির্দেশ দেওয়া আছে কঠোরভাবে। সমস্ত ঘটনাটা ফলাও করে ছাপা হবে কলকাতার একটা বড় কাগজে। পরের দিনই উকিলবাবুটি আবেদন করবেন আদালতে।

দারোগাবাবু একটু সময়ের জন্য উঠে গেলেন। তাঁর অফিসের ওপরওয়ালা আর অফিসের বাইরের ওপরওয়ালাদের সঙ্গে কী কথা হল কে জানে। ফিরে এসে অন্য মূর্তি ধরলেন।

জীবনদাকে বললেন, আপনি তো ঠিক কথাই বলেছেন। ডি এন এ টেস্টে যদি প্রমাণ হয়, তা হলে ওই শুয়োরের বাচ্চা দুলালকে দশ বছর জেল খাটাব। আপনারা এফ আই আর দিন। আমি ওকে পিছ মোড়া করে বেঁধে আনব। বেগড়বাই করলে মেরে হাড় গোড় ভেঙে দেব!

দুলাল নিজেই এসে ধরা দিল। সে দেখল এই সময়ে তার পাশে কেউ নেই। যাদের নামে সে ত্রাসের রাজত্ব চালায়, তারাও তাকে ত্যাগ করেছে।

শেষপর্যন্ত আর আদালতে যেতে হল না। তাকে প্রস্তাব দেওয়া হল, সে জেল খাটতে চায় না, সতীকে বিয়ে করতে রাজি আছে। জেলের গরাদের বদলে বিয়ের ফাঁসটাই বেছে নিল সে। থানার কম্পাউন্ডেই রীতিমতন মন্ত্র পড়ে বিয়ে হয়ে গেল দুজনের। নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সমিতির দুজন সদস্যাও সেখানে উপস্থিত।

দুলালকে বলে দেওয়া হল, তার ওপর সবসময় নজর রাখা হবে। এরপর যদি সে তার স্ত্রীকে অবহেলা বা অত্যাচার করে, তাহলে আবার টেনে আনা হবে থানায়।

নববধূর সাজে সতী চলে গেলে দুলালের জিপ গাড়িতে।

ডেরায় এসে নিজের ঘরে বসে বোতলে দু-চুমুক দিয়ে খানিকটা ধাতস্থ হল সে। তারপর সতীকে বলল, তোর পেটে-পেটে এত ছিল?

সতী বলল, আমার পেটে তোমার বাচ্চা, সে-ই আমাকে এই বুদ্ধি দিয়েছে।

একটু থেমে সে শান্ত গলায় বলল, কার্তিককে আমি খুন করেছি। তার মদে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিলাম। তোমাকেও আমি একদিন ওইভাবে মারতাম, কিন্তু এর মধ্যে আমার পেটে সন্তান এসে গেল যে! আমার সন্তানের বাবাকে আমি মারব কী করে?

দুলাল চেঁচিয়ে হঠাৎ কান্না মেশানো গলায় চেঁচিয়ে বলে উঠল, তোর দিদিকে আমি মারতে চাইনি, বিশ্বাস কর, একটা ওয়ার্নিং দিয়ে ছেড়ে দিতাম, কিন্তু ওই হারামজাদা কেতোটাই...তুই বিশ্বাস কর!

সতী বলল, বিশ্বাস করলাম। এই দ্যাখো, আমার পেটে তোমার সন্তান সব শুনছে। ও নড়ছে, হাত দিয়ে দ্যাখো—

দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে অনেকে। তাদের মধ্যে থেকে পূর্ণিমা জোরে বলে উঠল, কি গো, বিয়ে হল, ফুলশয্যা হবে না? এই যে ফুল এনেছি, বিছানায় ছড়িয়ে দে সতী!

জানলা দিয়ে কেউ এক গুচ্ছ ফুল ছুড়ে দিল খাটের ওপর।

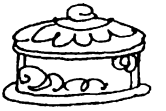

সোনার কাঠির স্পর্শ

নির্মলা রায় কোনওদিন ভাবতে পারেনি যে, তার জীবনে কখনও কোনও আকস্মিক ঘটনা ঘটবে। নিজেকে নিয়ে ভাববারই বা সময় কোথায়? বেশির ভাগ মানুষেরই জীবন কেটে যায় নিস্তরঙ্গ দিঘির মতো। কিছু আনন্দ-দুঃখ, অভাব, কিছু স্বপ্নভঙ্গ কিছু চাওয়া এবং পাওয়ার অমিল। নাটক নভেলের মতো আকস্মিক ঘটনা প্রবাহ বা হঠাৎ জীবনের গতি বদলানো ক'জন মানুষের জীবনে হয়।

নির্মলা ট্রামের অপেক্ষায় ছিল। একটু রাত হয়েছে, ঠিক শীত নেই, হাওয়াতে কেমন যেন গা-টা শিরশির করে। অনেকক্ষণ দেরি হচ্ছে ট্রাম আসতে। ক্লান্তিতে শরীরটা ভেঙে আসছে, সারাদিন একটুও বিশ্রাম নেই।

পাশের পানের দোকানে দু-তিনটে ছেলে বসে জটলা করছে। নির্মলা একটু সরে দাঁড়াল। ছেলেগুলোর জন্য নয়, দোকানের আয়নায় তার মূর্তি ভেসে উঠছে বলে। নির্মলা নিজের রূপ দেখতে চায় না। একটা শুকনো বাঁশপাতার মতো চেহারা তার। উপমাটা সে নিজের মনে ভেবেছে। তার রূপ নেই, তার রং ফরসা নয়, তার স্বাস্থ্য নেই। এরপর তার চোখ নাক কীরকম, সে কথাই আসে

না। নিজের কথা ভেবে কখনও তার সমস্ত শরীর শিউরে ওঠে, যেন তার পায়ের নীচে এক অতলস্পর্শ পাতাল, দিনের-পর-দিন সে একটু-একটু করে নেমে যাচ্ছে। সমস্ত জীবনটাই তার শুধু কীটপতঙ্গের মতো বেঁচে থাকার চিন্তা, শুধু ট্যুইশন আর মাস্টারি।

ক্লান্তি আর ক্ষিদে মিলে কেমন যেন একট অভিমান আসে। কার বিরুদ্ধে অভিমান সে নিজেই জানে না। বুকের মধ্যে খানিকটা বাষ্প জমা হয়ে ওঠে। শেষের ট্যুইশনটা এমন বিরক্তকর। এক বড় লোক বেনেতি মসলার দোকানদারের মেয়েকে পড়াতে হয়। ওর মামা-মা জীবনে কখনও বই ছুঁয়ে দেখেনি বোধহয়। বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছে, একটু বর্ণপরিচয় করানো দরকার। কিন্তু বিয়ের নামেই মেয়েটার ভাবভঙ্গি দেখে ঘেন্না করে নির্মলার। দূরে একটা বাস দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু তার যে ট্রামের মাস্থলি টিকিট আছে। শুধু-শুধু বেশি পয়সা খরচা করবে?

মনে-মনে যখন নির্মলা এই অতিরিক্ত পয়সা খরচ নিয়ে তর্ক করছে তখনই তার জীবনের সেই নাটকীয় ঘটনাটি ঘটল। নির্মলা যা কোনওদিন ভাবেনি। স্বপ্ন নয়, স্বপ্নের মতো। একটা চকচকে নতুন মডেলের মোটর এসে দাঁড়াল তার সামনে। তার মধ্যে থেকে একটা ঝকমকে চেহারার যুবক মুখ বাড়িয়ে বলল, 'নির্মলা দেবী, চিনতে পারেন? নমস্কার।'

নির্মলা অবাক হয়ে নমস্কার করল, কিন্তু চিনতে পারে না। অথচ কেমন যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, এই রকম মুখ তার অনেকবার দেখা।

'চিনতে পারলেন না তো?' যুবকটি হাসল। 'আমার নাম সুবিমল চৌধুরী'। অনুশীলনাকে মনে আছে তো? আমি তার দাদা। সেই যে অনুশীলার বিয়েতে...'

নির্মলার মনে পড়ল। সে যখন কলেজে পড়ত, তার সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল অনুশীলার। কিন্তু সেসব দিনের কথা এখন আর তার মনে পড়ে না...

কোথায় অনুশীলা আছে সে খবরও সে রাখে না। অনুশীলার বিয়েতে সে গিয়েছিল ঠিকই। বিরাট বড়লোকের বাড়িতে বিয়ে, সেখানে তার দাদার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল কি না মনে পড়ল না। তবু সে বলল, 'কেমন আছেন? অনুশীলা কেমন আছে?'

একটুক্ষণ এই সব কথা হল। অনুশীলা আছে কালিম্পং-এ, তার স্বামী মিলিটারি অফিসার। গত বছর কলকাতায় এসেছিল সে—পুরোনো বন্ধুদের খোঁজ করছিল...তার একটা ছেলে হয়েছে। আপনার সঙ্গেও দেখা করবার খুব ইচ্ছে ছিল...।

নির্মলা ভাবল, দেখা না হয়ে ভালোই হয়েছে। দেখা হলেই বা সে কী করত?

সুবিমল চৌধুরী বলল, 'আপনি কোন দিকে যাবেন? যদি অনুমতি করেন, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসতে পারি।'

'না, না, আপনাকে কষ্ট করতে হবে না...আমি এমনিই চলে যাব। ওই যে ট্রাম এসেছে।'

ততক্ষণে গাড়ির দরজা খুলে সুবিমল চৌধুরি নেমে এসেছে। সমস্ত শরীরে তার একটা আশ্চর্য উজ্জ্বলতা। নিখুঁত ইস্ত্রি করা দামি পোশাক, চুল আর জুতো সমান চকচকে। মনে হল তার সমস্ত শরীরে, পোশাকে, তার গাড়িতে কোথায় এতটুকু ধুলো নেই। কোনও কিছুই মলিন নয়। সে বলল, 'আমার এখন কোনও কাজ নেই...আপনাকে পৌঁছে দিতে আমার কোনও অসুবিধা হবে না, উঠুন।'

নির্মলার আপত্তি টিকল না। তাকে গাড়িতে উঠতে হল। সুবিমল চৌধুরী গাড়ি স্টার্ট দিয়ে বলল, 'দেখুন, আপনাকে আমি কেমন দূর থেকে দেখেই চিনতে পেরেছি। আর আপনি তো আমাকে চিনতেই পারলেন না।'

নির্মলা গোপনে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখেছিল তার দিকে। তার কথা শুনে একটু হাসল। ভাবল, এমন যুবকদের ভুলে যায় দু-ধরনের মেয়েরা। এক, যারা অতুলনীয়া সুন্দরী এবং ভাগ্যবতী—যারা একটু আঙুল হেলালে এরকম অসংখ্য যুবক ছুটে আসে। আর যারা নির্মলার মতো। যাদের রূপ নেই, বিত্ত নেই,—যারা স্বপ্নেও এসব যুবকদের পাওয়ার আশা করে না, তারাও এদের সঙ্গে

কখনও আলাপ হলেও ভুলে যায়। এদের মনে রাখে, যারা মাঝারি রকমের সুন্দরী—যারা সব কিছুতে মাঝারি। তারাই এদের পাওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে, দুঃখও পায়।

কিন্তু এই সুবিমল চৌধুরী হঠাৎ তার দিকে এমন মনোযোগ দেখাচ্ছে কেন? নির্মলা খুব অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। তার প্রতি এমন সৌজন্য দেখাবারই বা কী দরকার। অনুশীলার দাদা। অনুশীলার সঙ্গেই কতকাল দেখা হয় না তার দাদাকে মনে রাখবার তো কথাই ওঠে না। কিন্তু নির্মলা রায়, একটা শুকনো বাঁশপাতার মতো যার চেহারা—তার প্রতি উৎসাহ দেখাল এমন একজন মানুষ। নির্মলা একটুও খুশি হল না, এমন একজন মানুষের সঙ্গ পেয়ে।

সুবিমল চৌধুরী ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'আজ সন্ধেটা কিন্তু সুন্দর। এ-বছর এমন সুন্দর সন্ধে একটিও আসেনি। চলুন, কোথাও গিয়ে যদি একটু চা খাই, আপনার খুব আপত্তি হবে?'

নির্মলা প্রত্যাখ্যান করার একটু সুযোগ পেল। বলল, 'দোকানে চা খেতে আমার একেবারে ভালো লাগে না। আপনি আমাকে এখানেই নামিয়ে দিন।'

'না, না, কী আশ্চর্য' সুবিমল সঙ্গে-সঙ্গে বাধা দিল নির্মলাকে 'চা খাওয়াটা না হয় বন্ধ থাক।'

'না, তা হয় না, আমার জন্য আপনি চায়ের তৃষ্ণাটা নষ্ট করবেন।' সুবিমলের গলার স্বরটি খুব মিষ্টি। বলল, চায়ের তৃষ্ণাও অন্যান্য সব তৃষ্ণারই মতো। যতক্ষণ না মেটানো যায় ততক্ষণই ভালো লাগে। আজকের এমন সুন্দর সন্ধেটা—তাকে কিন্তু ফিরিয়ে আনা যাবে না।

'আপনাকে যদি সোজা পথে না গিয়ে একটু ঘুরিয়ে বাড়ি পৌঁছে দিই—আপনার কি খুব আপত্তি হবে?' সুবিমল চৌধুরীর গলায় কোনও জড়তা নেই। যেন নির্মলার সঙ্গে তার কতকালের পরিচয়। যার সঙ্গে আলাপের কথা নির্মলা মনেও করতে পারে না, সে কি করে তাকে রাত্রিবেলা গাড়িতে করে বেড়াবার কথা বলতে পারে। তবু সুবিমল চৌধুরীর গলায় কী যেন আছে, তার কথায় আপত্তি করা যায় না। তা ছাড়া নির্মলার লোভ হল—শেষ পর্যন্ত কী হয় দেখতে। কেন সে সোজা পথ চায় না।

সুবিমল আবার বলল, 'দেখবেন, আজ সন্ধেবেলা বেড়াতে আপনার খুব ভালো লাগবে।'

নির্মলার ভালো লাগা, মন্দ লাগা নিয়ে কে কবে ভেবেছে? তার তো কিছু ভালো লাগা মন্দ লাগা নেই। তার শুধু বেঁচে থাকা। নির্মলা শুধু ভেবে-ভেবে কারণ বার করার চেষ্টা করতে লাগল। তবে কি লোকটা সেই ধরনের প্রতারক—যারা মেয়েদের নানা রকমভাবে মুগ্ধ করে, তারপর সুযোগ নেয়। কিন্তু নির্মলা ভাবল, এমন সভ্য, সুন্দর প্রতারক তো তার ছাব্বিশ বছরের জীবনে কখনও আসেনি।

খুব দামি গাড়ি সুবিমল চৌধুরীর। চলবার সময় প্রায় শব্দ হয় না। গঙ্গার পাড় ধরে চলেছে। অন্ধকার। সামনের সিটের এক কোণে নির্মলা রায়, এক কোণে সুবিমল চৌধুরী। গাড়ির মধ্যে একটু আলো। নির্মলা গোপনে দেখতে লাগল সুবিমল চৌধুরীকে। আশ্চর্য উজ্জ্বলতা। আশ্চর্য সুন্দর সে। তার শরীরের কোথাও যেন কোনও অসামঞ্জস্য নেই। পুরুষ মানুষ যদি নিখুঁতভাবে সুন্দর হয়, তবে তাকে কেমন যেন নির্বোধ দেখায়। কিন্তু সুবিমল চৌধুরী অন্যরকম। তাকে দেখলে তৃপ্তি আসে। পোশাক-পরিচ্ছদগুলো নিপুণভাবে তার গায়ে এঁটে আছে। স্টিয়ারিং হুইলের ওপর তার একখানা হাত, তার চোখের মধ্যে লাল আভা, স্বাস্থ্যের দীপ্তি। তার পাশে নির্মলা দেখল নিজেকে। একটা শুকনো বাঁশ পাতার মতো চেহারা। ধপধপে তাঁতের শাড়িখানা যেন তাকে বিদ্রূপ করছে। তার হাতের আঙুলগুলোও কেমন যেন ফ্যাকাসে, রুগ্ন মনে হচ্ছে। সমস্ত দিকে তার দুঃখ আর অভিশাপ। তার বাবার হাঁপানি রোগ—প্রেসের কম্পোজিটরের কাজ। তারা চার বোন। একটা ভাইও নেই। প্রত্যেকটা বোনকে তারই মতো দেখতে। বাড়িতে প্রতিদিন কারণে-অকারণে বাবা, মা, বোনেদের মধ্যে ঝগড়া। গরিব হলে ঝগড়ার কোনও কারণ দরকার হয় না। যাদব সরকার বাইলেনের অন্ধকার ঘরের নির্মলা রায় বসে আছে এই দামি গাড়িতে, এখনও তার বিশ্বাস হচ্ছে না।

হঠাৎ নির্মলা নিজেকে ভীষণ অসহায় মনে করতে লাগল। মনে হল তাকে বাঁচাবার কেউ

নেই। এই যুবকটি তাকে মহত্ত্ব দেখাতে এসেছে। কৃপা করে তাকে কৃতার্থ করতে এসেছে। সে কত বড়লোক—কত সুন্দর, সে দয়া করে এই কুরূপা মেয়েটির সঙ্গে আজ এই সন্ধেটা বিসর্জন দিতে এসেছে। নির্মলার আর কিছু ছিল না, কিন্তু আত্মসম্মানটুকু ছিল...তাও সে হারাতে বসেছে।

গাড়িটা কলকাতার ভিড় ছাড়িয়ে একটু বাইরে এসেছে। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে কথা বলল সুবিমল চৌধুরী 'আপনি হয়তে বিশ্বাস করবেন না নির্মলা দেবী, আপনাকে আমি খুঁজছিলাম। প্রথম যেদিন আমি আপনাকে দেখি—তারপর থেকেই আমি আপনার কথা ভেবেছি।'

নির্মলা চুপ করে রইল। মনে-মনে বলল, মিথ্যে কথা। এসব কথা মেয়েদের কাছে এসে বলতে হয়—স্তুতি মেয়েদের প্রাপ্য। কিন্তু তার কাছে স্তুতি কেন—সে কি স্তুতির যোগ্য, তার কী দেওয়ার আছে?

সুবিমলের গলায় একটু দ্বিধা নেই। একটুও মনে হয় না—সে বানিয়ে বলছে। বলল, 'শীলার বিয়েতে ওর অনেক বন্ধু এসেছিল, তাদের কয়েকজনকে আমি চিনতুম আগের থেকে। কিন্তু এক ঘর মেয়ের মধ্যে প্রথম আপনার ওপরই চোখ পড়ে।'

মিথ্যে-মিথ্যে।

'আপনার ওই চোখ—অমন উজ্জ্বল, অমন গভীর চোখ আমি আর কখনও দেখিনি।'

মিথ্যে, মিথ্যে। নির্মলা চোখ বুজল। তার গা-হাত-পা কাঁপছে। এসব কী শুনছে সে? এ রকম দুর্বোধ্য কথা সে কখনও শোনেনি। সে একটা কথাও বলতে পারল না।

সুবিমল এক ঝলক তাকিয়ে দেখল নির্মলার দিকে। একটু সরে এল। নির্মলার একটা হাত ধরল সে। 'আপনি কি মনে করবেন জানি না, আমি...

'ছাড়ুন' নির্মলা এক টানে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিল। এইবার সে বুঝতে পেরেছে সব। সমস্ত কিছুই দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। বলল, 'আপনি গাড়ি থামান, আমি এখানেই নেমে যাব।'

সুবিমল হাত ছাড়িয়ে নিয়ে একটা অস্ফুট শব্দ করল।

নির্মলার সমস্ত লজ্জা, সমস্ত দ্বিধা চলে গেছে। একটুও ভয় পেল না সে । সুবিমলের দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে বলল, 'সত্যি করে বলুন, আপনি কে? কী আপনার উদ্দেশ্য। অনুশীলার কোনও দাদার কথা আমার মনে নেই। যতদূর মনে পড়েছে তার বিয়ের সময় কোনও লোকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়নি।

আপনি কে?

সুবিমল একটুক্ষণ চুপ করে রইল। তার আশ্চর্য সুন্দর মুখে একটা রেখাও বদলাল না। নির্মলার দিকে চেয়ে একটু হেসে বলল, 'আপনি সত্যিই আমাকে এখনও চিনতে পারেননি?'

'না। এক-একবার মনে হচ্ছে, আপনি একটি প্রতারক। সভ্যতার, সৌজন্যের মুখোশ পরে এসেছেন। কখনও মনে হচ্ছে আপনি একটি ভাবপ্রবণ মাতাল। কী করছেন আপনার নিজের খেয়াল নেই। আর কখনও মনে হচ্ছে, আপনি সাক্ষাৎ স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন। আমার মতো সামান্য মেয়েদের দয়া করাই আপনার পেশা।'

সুবিমল বলল, 'আর থাক।'

'আপনি গাড়ির দরজা খুলে দিন—আমি এখানেই নেমে যাব।'

সুবিমল চমকে উঠল। 'সে কি, এত দূরে এই অন্ধকার রাস্তায়?'

'হ্যাঁ, এখানেই। গাড়ির মধ্যেও কম অন্ধকার নয়।' নির্মলার প্রত্যেকটা কথা উঁচু সুরে বাঁধা যেন ঝনঝন করছে। ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে পড়েছে সে। কলকাতা ছাড়িয়ে এসে নির্জন পথে গাড়ি থেমে আছে। একঘেয়ে ঝিঁঝির ডাক, গাছের পাতার শব্দ, অন্ধকার রাত। সুবিমল বলল, 'না, তা হয় না, এখানে পথে চোর-ডাকাতের ভয় আছে।'

'চোর-ডাকাতেরা আমাকে ছেড়ে দেবে। আমার কাছ থেকে তাদের নেওয়ার কিছুই নেই।'

সুবিমল বলতে গেল,—আপনি ভুল করছেন। নির্মলা তাকে চুপ করিয়ে দিল। হঠাৎ নির্মলা

দু হাতে মুখ ঢেকে ছেলে মানুষের মতো কেঁদে ফেলল। কান্না মেশানো গলায় বলল, 'বলুন আপনি কে? কেন এসেছেন আমার কাছে। আমাকে অপমান করবার, আমার চেহারা নিয়ে বিদ্রূপ করবার অধিকার কে দিয়েছে আপনাকে। কে চেয়েছে আপনার দয়া?'

'মানুষের বাইরের রূপটুকুই বুঝি সব?'

নির্মলা কথা বলল না, কাঁদতে লাগল শুধু। কান্নার আবেগে তার সমস্ত শরীরটা ফুলে-ফুলে উঠেছে। ওসব কথা শুনলে তার ন্যাকামি মনে হয়। বাইরের চেহারাটা কদাকার হলে, ভেতরের রূপ কে দেখতে চায়?

সুবিমল অত্যন্ত ধীর এবং শান্ত গলায় বলল, 'আপনি যখন আমাকে চিনতে পারেননি, তখন আর আমার অন্য কিছু পরিচয় দেওয়ার নেই। আমাকে আপনি বিশ্বাস করুন। আপনাকে আমি বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসছি।'

সমস্ত ফেরার পথটায় একটাও কথা হল না। নির্মলা শুধু সেই হাতে মুখ ঢেকে চুপ করে বসে রইল। শুধু একটানা মৃদু শব্দ শোনা যেতে লাগল—যন্ত্রের কিংবা কান্নার।

নির্মলার বাড়ির গলিতে গাড়ি ঢোকে না। একটু দূরে বড় রাস্তায় গাড়ি থামল। নির্মলা একটিও কথা না বলে নেমে গেল গাড়ি থেকে। যতক্ষণ গলির মধ্যে নির্মলাকে দেখা গেল—ততক্ষণ গাড়িটা দাঁড়িয়ে রইল। তারপর আস্তে-আস্তে চলে গেল। নির্মলা একবার ফিরেও তাকাল না যুবকটির দিকে।

বাড়িতে ঢুকবার আগে নির্মলা যেন নিজেকে ফিরে পেল। নিজেকে প্রস্তুত করে নিল একটু। এতক্ষণ সে কোথায় ছিল? এই তো তার নিজের জায়গা, তার চিরকালের জায়গা। প্রতিদিনের মতো ক্লান্ত, অবসন্ন নির্মলা রায়। বাড়িতে পাঁচ ঘর ভাড়াটে। একটু রাত হয়েছে—তাই কলকাকলি একটু কম। তাদের ঘরেও সকলের খাওয়া হয়ে গেছে। রান্নাঘরে শুধু মা তার ভাত নিয়ে বসে আছেন—যেন বিধবা মা তার একমাত্র ছেলের জন্য বসে আছে। নির্মলা একমাত্র ছেলেরই মতো। তারই টুইশান, মাস্টারিতে সংসার চলে। কিছু খেতে পারল না নির্মলা। অন্য দিনের চেয়ে আজ আরও অনেক-অনেক ক্লান্তি লাগছে।

নির্মলা কাপড়টা পর্যন্ত বদলাল না। কিছুক্ষণ নিঝুম হয়ে বসে রইল। তিনটে বোন শুয়ে আছে—নয় থেকে কুড়ির মধ্যে বয়েস। প্রত্যেকেই কালো। কেউই সুন্দরী নয়। এদের একদিন কেউ এসে হয়তো অপমান করে যাবে—দয়া দেখাতে আসবে। নির্মলা দেওয়ালের কাছে আয়নাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। রাত্রে মেয়েদের আয়নায় মুখ দেখতে নেই। নির্মলা দেখল, তার মুখে এখনও চোখের জলের দাগ শুকোয়নি। আয়নার মধ্যে যেন দেখা গেল সেই যুবকটিকে, সুবিমল চৌধুরি। ওই লোকটা আজ তাকে স্পর্শ করেছে। তার ছাব্বিশ বছরের জীবনে কখনও এমন হয়নি। ওই লোকটাকে সে ঘৃণা করবে? ওকে ভুলে যাওয়াই উচিত। সত্যি ও কে? কোথা থেকে এসেছিল? ও তো ইচ্ছে করলেই কত সুন্দরী মেয়েদের পেতে পারে, তবু নির্মলাকে ছুঁতে এসেছিল কেন?

'দিদি, তুই শুবি না?'

নির্মলা ছোট বোনের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। ন'বছরের মেয়েটা ঘুম-ঘুম চোখে কিছুক্ষণ অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর আস্তে-আস্তে মুগ্ধ গলায় বলল, 'দিদি, আজ তোকে কী সুন্দর দেখাচ্ছে। রংটাও ফরসা হয়ে গেছে। তার কী হয়েছে রে?



জন্ম ২১ ভাদ্র ১৩৪১ (৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪), ফরিদপুর, বাংলাদেশ। শিক্ষা কলকাতায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ.।

টিউশনি দিয়ে কর্মজীবনের শুরু। তারপর নানা অভিজ্ঞতা।

প্রথম রচনা শুরু কবিতা দিয়ে। 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। কবি হিসেবে যখন খ্যাতির চূড়ায়, তখন এক সময় উপন্যাস রচনা শুরু করেন। প্রথম উপন্যাস 'আত্মপ্রকাশ'। শারদীয় 'দেশ' প্রত্রিকায় প্রকাশিত। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'একা এবং কয়েকজন'। ছোটদের মহলেও সমান জনপ্রিয়তা। কাকাবাবু, নীল মানুষ, বিশ্বমামা আজও ছোটদের টানে। আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন দু-বার, ১৯৮৩-তে পান বঙ্কিম পুরস্কার। ১৯৮৫-তে সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার। এরপর ছোটদের সাহিত্যে সার্বিক অবদানের জন্য পেয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'বিদ্যাসাগর স্মৃতি পুরস্কার'। পত্র ভারতী থেকে এ পর্যন্ত প্রকাশিত বই 'বারোটি উপন্যাস', 'ভালোমন্দ দ্বিধাদ্বন্দ্ব' এবং 'কিশোর কল্পবিজ্ঞান সমগ্র'। সম্পাদিত বই দু-খণ্ডে সমাপ্ত 'শতবর্ষের সেরা প্রেমের উপন্যাস'।